প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

ত্রয়োদশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২০ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী কার্য্যালয়

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২০ কার্ত্তিক—চৈত্র,

১৩শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা।

অন্ধের কাহিনী (গল্প)—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৫
অবিচারের শেষ বিচার (নাটক)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ... ৭
অরণ্যবাস (উপন্যাস)—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ, বি-এল ২৬, ১৭১, ২৮৭, ৩৮৫, ৪৮৪, ৬১৩
অলক্ষ্য (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ৪৪৩
আগুনের ফুলকি (উপন্যাস)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ১৯, ১২৩, ৩১৯, ৪০৮, ৪৪৬, ৫৮৩
আভ্যুদয়িক (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩০
আমেরিকার প্রজাতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন সেন, এম্‌-এ ... ৩৭৫
আলোচনা [পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস সি; বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ ইত্যাদি; আকবরের সভায় ?ীরা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার] ... ৪৯০
আলোচনা [ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন]—শ্রীবিনোদবিহারী রায় ... ১৫৫
আলোচনা ... ৩৩৫
আলোচনা—শ্রীকালীপদ মৈত্র ... ৪৭৮
ইউরোপে বাঙ্গালী পলোয়ান (সচিত্র) ... ১৭৭
ইজ্জতের জন্য (কবিতা, সচিত্র)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৩৮
ইংলণ্ডের নূতন রাজকবির কবিতা (পাপিয়া, গান, সাথ)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৭৬
উৎসাহের জয়—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯২
উদ্বোধন—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ ৪৭৩
উদ্ভিদের অনুভব-শক্তি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫৫
একতাবিধানের উপায়—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস ৩৬৪
একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস ২৬৯

একটি মন্ত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৩৫৬
কষ্টিপাথর (সচিত্র) ৯৪, ১০৩, ৩১২, ৪১৬, ৫[illegible]
কানাডায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা (সচিত্র) ১[illegible]
কীটজীবনী (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ১০২
ফরাসী রাজ্যে বাঙ্গালী (সচিত্র)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ... ২৯৬
গবেষণা—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ২৭৫
গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬৯
গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৩৭১
গীতাপাঠ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... [illegible]
গোত্র—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি [illegible]
গোলাপের জন্ম (কাহিনী)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৭
চিকিৎসা (গল্প)—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
চিত্র-পরিচয়—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই [illegible]
চিরন্তনী (কবিতা) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ... ২[illegible]
ছাতা (গল্প)—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০২
ছোট ও বড়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ৫০[illegible]
জরি-শল্মা-চুমকি-মঞ্জিলা (সচিত্র)—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ...
জলন্দর কন্যা-বিদ্যালয়—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস
ঝড়ো হাওয়া (গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল ...
দরিদ্র ডিউক—শ্রীঅতসী দেবী ...
দানতত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীবনমালী বেদান্ত-তীর্থ, এম-এ ... ১০[illegible]
৺দীনবন্ধু মিত্র (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
দুর্ভিক্ষ নিবারণ—অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ ...
দেশের অশান্তি ও আশঙ্কার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়—শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
দেহ ও মস্তিষ্ক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস ...
দোল (গান)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
দ্বিপদী (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
ধরণী (কবিতা)—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল
ধানের উফরা রোগ (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ...

রসামাত (সচিত্র)—
হন রায়চৌধুরী ... ২১৬
-অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল
ধ্যায়, এম-এ ... ৩৬৯
(কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৭
—মুদ্রারাক্ষস ও শ্রীদ্বিজদাস
দত্ত এম-এ, প্রভৃতি ১৬৩, ৩০২, ৪৪৩, ৬৬৪
পূর্বভা (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ৫৮৯
বর্ণ-বৈচিত্র্য—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন ১১০
ক—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় ... ৪৮০
প্রাচীন ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-
... ১১৪
পূজা (সচিত্র)—শ্রীহরিপ্রসন্ন
বিদ্যাবিনোদ ... ৪৬৭
সংখ্যা—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ... ২৭২
—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ৬৫০
—শ্রীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ ... ৪৬০
(সচিত্র)—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র ১৫৯
আকার—শ্রীরাসবিহারী
য়, এম-এ, বি-এল ... ৮৬
কোষ (সমালোচনা)—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৬৩২
বৌ (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৯
বিবাহ ও বরপণ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ
চৌধুরী, এম-এ ... ৬১৯
বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দু-
সমাজ—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল ১৩৩
(গল্প)—শ্রীভুবনমোহন সেনগুপ্ত ৫১
২০৮, ৪৩২, ৫৪৪, ৫৫৫
বর (সচিত্র)—শ্রীদেবেন্দ্র-
সেন, এম-এ, বি-এল ৬৫২
জাতিভেদ—শ্রীবিজয়চন্দ্র
বি-এল
ীন ও নবীন—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ
এম-এ ১১৭
—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ৫৯৮
অধঃপতনের
—অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র
এম-এ ... ৩৪৯, ৫১৬, ৬৮৯

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
ভাস্কর্য্যে শিশুচিত্র (সচিত্র)—শ্রীঅশ্বিনী-
কুমার বর্ম্মন ...
মণিহার (গান)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...
মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা—শ্রীজ্যোতি-
রিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ২৪, ১২০, ৩৩০, ৩৯
মালা ও নির্ম্মাল্য (সমালোচনা)—শ্রীমহেশ-
চন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি
মিত্রমূর্ত্তি (সচিত্র)—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
মিয়াকো ওদোরি (সচিত্র) —শ্রীসুরেশ-
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০৮
মূর্ত্তি (সচিত্র)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সি-আই-ই
মূর্ত্তি-সংগ্রহ—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
মৃত্যুস্বয়ম্বর (কবিতা, সচিত্র)—শ্রীসত্যেন্দ্র-
নাথ দত্ত ...
যাওয়া আসা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি—
শ্রীঅমলচন্দ্র হোম
রাজর্ষি রামমোহন (কবিতা) —শ্রীসত্যেন্দ্র-
নাথ দত্ত
রিয়ার চাষ—শ্রীগণপতি রায়
লাঞ্ছিতা (গল্প)—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল,
এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ, ভারতী,
সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ
শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয়
পণ্ডিতগণের মত—শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
শুশুনিয়া (সচিত্র)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো-
পাধ্যায়, এম-এ ...
সতীন (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ
সমাজ বা দেশাচার (সমালোচনা)—
ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,
এল এল-ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত
সমালোচনা—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী
সুখমৃত্যু (কবিতা)—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি
স্পর্শ (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ
হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী (সচিত্র)—
শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, এ
হিন্দুবিবাহে পাত্রী নির্ব্বাচন—অধ্যাপক
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম
বি-এসসি

লেখকের নাম ও তাঁহাদের রচনা

শ্রীঅতসী দেবী—
দরিদ্র ডিউক ... ৩৮২
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই—
মূর্ত্তি (সচিত্র) ... ২১৩, ৩৪১
যাওয়া আসা ... ৪৪৫
চিত্রপরিচয় ... ৫৫৪
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল—
পুস্তক-পরিচয় ... ১৬৩
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল—
অরণ্যবাস (উপন্যাস)—২৬,১৭১,২৮৭, ৮৫,৪৮৪,৬১৩
শ্রীঅমলচন্দ্র হোম—
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ২০৫
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত—
ভবিষ্যতের ধর্ম্ম ৫৯৮
শ্রীঅমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
প্রতিহিংসার মুলুক ... ৪৮০
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ—
ভাস্কর্য্যে শিশুচিত্র (সচিত্র) ১৮৬
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়—
অবিচারের শেষবিচার (নাটক) ... ৭
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ—
জরী, শম্মা, চুমকি, মঞ্জিলা (সচিত্র) ৬২
শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ—
স্পর্শ (কবিতা) ... ৭০
শ্রীকালীপদ মৈত্র—
ব্যুৎপত্তি-রহস্য .. ৪৭৮
শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—
দেশের অশান্তি ও আশঙ্কার কারণ ও তন্নিবারণের উপায় ৪২২
শ্রীকিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত—
রঙের লুকোচুরি ৩৩১
শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস—
জর্ম্মণীর কন্যাবিদ্যালয় ৫৩৪
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ—
পুস্তক-পরিচয় ১৬৩
উদ্বোধন ৪৭৩
শ্রীগণপতি রায়—
বিয়ারিচাষ
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—
আগুনের ফুলকি (উপন্যাস)—১২, ১২৩, ৩১৯, ৪০৮, ৪৪৬, ৫৮৩
বায়ুবহে পূরবৈয়া (গল্প) ... ৩৯
সতীন (গল্প) ... ২৪২
বাঙ্গালা-শব্দকোষ (সমালোচনা) ... ৩৩২, ৬৬২
পঞ্চশস্য ৭১, ২৩৭, ৩৯৮, ৫০৮, ৫৭৭
কষ্টিপাথর ৯৪, ১০৩, ৩১২, ৪১৬, ৫৩৮,
বরপণ (গল্প) ৬৫০
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—
মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা, ২৪, ১২০,৩৩০,৩৯৫,৪৫৯
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল-এম-এস—
দেহ ও মস্তিষ্ক ... ৮০
পঞ্চশস্য ... ১৩১
পুস্তক-পরিচয় ...
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়—
প্রাচীন ঋষিগণ ও উদ্ভিদতত্ত্ব ... ১১৪
গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী ... ৩৭১
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—
কেরৌলী রাজ্যে বাঙ্গালী (সচিত্র) ২৯৬
শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন—
প্রাকৃতিতে বর্ণ বৈচিত্র ... ১১০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র—
কীটজীবনী (সচিত্র) ... ১৫২
ধানের উফরা রোগ (সচিত্র) ... ৪৬৯
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বি-এল
বিংশশতাব্দীর বর (কবিতা, সচিত্র) ৬৫২
শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ—
পুস্তক-পরিচয় ... ৪৬৯
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
গীতাপাঠ ... ৫২২
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—
প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র ... ৩৩৭
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ—
ব্রহ্মবাদ, প্রাচীন ও নবীন ... ১১৭
বর্ণাশ্রম ... ৪৬০
কন্যাবিবাহ ও বরপণ

শ্রীনরেন্দ্র দেব—
গোলাপের জন্ম (কাহিনী) ... ৭৭
শ্রীনন্দিনীমোহন রায়চৌধুরী—
পতিতজাতি-উদ্ধার সমিতি (সচিত্র) ২৭৬
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—
ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ ... ৩১৯, ৫১৬, ৫৮৯
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল—
বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ ১৩৩
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত ৪৯
উদ্ভিদের অনুভবশক্তি ... ৪৫৫
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ—
সুখমৃত্যু (কবিতা) ... ৩৯৭
অলক্ষ্য (কবিতা) ... ৪৪৩
পূর্ণতা (কবিতা) ৫৮৯
শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, এম-এ—
দানতত্ত্ব ... ১০১, ২৫৩
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, এম-আর-এ-এস—
বৈদিক যুগের জাতিভেদ ... ১
একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি ... ২৬৯
একতাবিধানের উপায় ... ৩৬৪
শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়—
বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ নির্ম্মাণ ১৩১
সাহারা মরুভূমি ... ১৩১
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী—
সমালোচনা ... ৯৬২
শ্রীবিনোদবিহারী রায়—
ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন ... ১৫৫
শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, এল এল-বি—
হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী(সচিত্র) ৬১৫
শ্রীভুবনমোহন সেনগুপ্ত—
বিদ্যুতের ভয় (গল্প) ... ৫১
শ্রীভুবনমোহন সেন, এম-এ—
আমেরিকার প্রজাতন্ত্র ... ৩৭৫
শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—
গোত্র ... ৩৩
গবেষণা ... ২৭৫
পুস্তক-পরিচয়
মাল্য ও নির্ম্মাল্য (সমালোচনা) ২৮১
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার—
আকবরের সভায় মীরা (আলোচনা) ৭৪৯
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
দ্বিপদী (কবিতা) ... ১০৩
মণিহার (গান) ... ২৬৮
ছোট ও বড় ... ৫০০
গান ৫১৯
একটি মন্ত্র ৬৫৬
দোল (গান) ৬৮২
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি-এল—
ধরণী (কবিতা) ... ৩২
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, বি-এ—
মূর্ত্তিসংগ্রহ ... ৯২
ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা (সচিত্র) ১৯২
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ—
শুশুনিয়া (সচিত্র) ৪৯১
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ—
দুর্ভিক্ষ নিবারণ ১৭৯
পল্লীচর্য্যাবিধান ৩৬৯
শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র—
বহুরূপী নক্ষত্র (সচিত্র) ১৫৯
শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি-এল—
বাঙ্‌লা ভাষার আকার ... ৮৬
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ, ভারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ—
বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ ৪৯
লাঞ্ছিতা (গল্প) ৫৩৬
শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল—
ব্যবসায়ের প্রকৃতির তারতম্যে মৃত্যুর ও আয়ুর তারতম্য ১৩২
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—
শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ... ৬৭২
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—
বঙ্গের বিবাহসংখ্যা ২৭২
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এল এল ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত—
সমাজ বা দেশাচার (সমালোচনা) ২৭৯
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এস সি—
পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত ৪৯
হিন্দুবিবাহে পাত্রীনির্ব্বাচন ৬৯১
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—
পুরীর চিঠি (কবিতা) ... ৩৯
ইংলণ্ডের নূতন রাজকবির কবিতা (কবিতা) ৭৬
রাজর্ষি রামমোহন (কবিতা) ৬৮১

৺দীনবন্ধু মিত্র (কবিতা) ১৯২
চিরন্তনী (কবিতা) ২০৭
আভ্যুদয়িক (কবিতা) ২৩০
ইজ্জতের জন্য (কবিতা) ৩৩৮
মৃত্যুস্বয়ম্বর (কবিতা) ৬৪৮
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল—
উৎসাহের জয় ৩৯২
মিয়াকো ওদোরি (সচিত্র) ৬০৫
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল—
ঝড়ো হাওয়া (গল্প) ৩০৫
শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—
অন্ধের কাহিনী (গল্প) ৫৫
ছাতা (গল্প) ৪০২
চিকিৎসা ৬০৮
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ—
মিত্রমূর্ত্তি (সচিত্র) ৩৪
বঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা (সচিত্র) ৪৬৭

চিত্রসূচী

অঙ্গুলি ও তাহার আকার ২৫১
অতিভঙ্গ ৩৫৫
অধর ও তাহার আকার ২৩৫
অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ ৫৬৫
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সী, ভী, রামন্ ... ৫৬৫
অধ্যাপক হেজার ৫১০
আকাশ প্রদীপ (রঙিন)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই কর্ত্তৃক অঙ্কিত—প্রচ্ছদপট
আভঙ্গ ৩৪৫, ৩৪৭
আমেরিকার লাল লোক ও সাইবেরিয়ার লোক ৭৫
আসমান-ঝোলায় কাশ্মীর যাত্রা ... ৬৮১
ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি ৭৬
উত্তম নবতাল মূর্ত্তি ২১৯
উরু ও তাহার আকার ২৫৫
এডিনবরায় যতীন্দ্রচরণ গুহ ... ১৭৭
কণ্ঠ, চিবুক ও তাহার আকার ... ২৩৯
কর, পদ ও তাহার আকার ... ২৫৯
কর্ণ ও তাহার আকার ২৩১
কালীদীঘীর পাড়ে ইন্দিরা (রঙিন)—শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত ... ২৬৯
গজদন্তনির্ম্মিত পুতুল ইত্যাদি ... ৬২৬
গজদন্তপ্রতিবপন করা দারুশিল্প ... ৬২৭
গজদন্তনির্ম্মিত হাওদা-সওয়ারী হাতী ... ৬২৮
গজদন্তনির্ম্মিত দুর্গাপ্রতিমা ... ৬২৯
গজদন্তনির্ম্মিত ময়ূরপঙ্খী ৬৩০
গজদন্তনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ৬৩১
গজদন্তনির্ম্মিত শিকারদৃশ্য ৬৩২
খোবরের পাথরের হাঁসুলি ১৭৮
খোবর মুগুর ভাঁজিতেছেন ১৭৮
গোপন কথাটি ১৯০
গোলাম আলি ছাগলা, ... ৪৩৩
ঘুমপাড়ানো বন্দুকের-গুলি ৪৫০
চিত্রকর—শ্রীচারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত ... ৯১
চিঠি— ঐ ... ৯১
চিন্তামণি ঠাকুর ৪৬৮
চলি চলি পা পা ১৮৭
জগদ্ধাত্রী (রঙিন)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত ১১৬
জঙ্ঘা, জানু ও তাহার আকার ... ২৫৭
জরি, শল্মা, চুমকি, মস্লিনা প্রস্তুত-প্রণালী ... ৬২-৬৮
জাপানের ভূমিকম্প প্রতিষেধক মন্দির ... ৪০৯
জাপানী চা-উৎসবে চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ... ৬০৬
জাপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল ... ৬০৭
জাপানী নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গী ... ৬০৭
ঝরণায় স্নান ১৮৭
তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার চিকিৎসা ... ৬৭৮
তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন শিশুমূর্ত্তি ... ৪০০
ত্রিভঙ্গ ৩৫১, ৩৫৩
ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ২১৫, ২১৭
দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যায়বিরোধী বীর ভারতনারী যাঁহারা প্রথমে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন ৩৩৯
দেবশিশু (রঙিন)—সার যশুয়া রেনল্ড্‌স কর্ত্তৃক অঙ্কিত ৪৮০
ধানের উফরাপোকা ৪৭৯
ধানের উফরা রোগ ৪৭০
ধূমপ্রতিকার ৫৫৮

ধূমপ্রতিকারের যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ . ৫১৫
নবপরশু নক্ষত্রের নিকটস্থ নীহারিকা . ১৬২
নয়ন ও তাহার আকার ২২১
নারয়িণ সিং, নন্দসিং সিন্ত্রা, বলবন্ত সিং . ১৬৯
নাসা, নাসাপুট ও তাহার আকার . ২৩৩
পালঘাট পতিতজাতির স্কুল স্থাপন . ২১১
পালঘাট পতিতজাতির স্কুলের প্রথম ছাত্রদল .. , ... ২১৮
প্রচ্ছদপট (রঙিন) ... ..
প্রজাপতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা .. ১৫৩
প্রবাসী—প্রচ্ছদপট
প্রবাসীর স্বদেশ যাত্রা (রঙিন)—শ্রীসুকুমার রায়, বি-এসসি কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে—প্রচ্ছদপট
ফড়িংএর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ১৫৪
ফিলিপিনোদিগকে ব্যাটবল খেলিতে শেখানো হইতেছে ৬৭৯
ফিলিপিনোদিগকে কলের গান শুনাইয়া শিক্ষাদান ৬৮০
বক্ষ, কটি ও তাহার আকার .. ২৪৩
বড়োদার রাজকুমারী ইন্দিরা ও কুচবেহারের মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ ও মাল্যবন্ধন . ২১২
বন্যাদায় . ৯৪-৯৫
বহুরূপী নক্ষত্র . ১৬১
বিমল বয়স (রঙিন)—সার জশুয়া রেনল্ডস কর্ত্তৃক অঙ্কিত . ২৪
বিশ্বস্ততা (রঙিন)—জে, বি, গ্রিউজ ৫১৮
বিংশশতাব্দীর বর ৬৫৩
বিষ্ণু . ১৯৭
বেয়াত্রিচে চেঞ্চী (রঙিন)—গীদো রেনি কর্ত্তৃক অঙ্কিত . ১৩২
বোলপুরে রবীন্দ্র-সদমে গত ৭ই অগ্রহায়ণে উপস্থিত জনমণ্ডলী ৩৩৩
ব্যাবিলনের প্রাচীন প্রাসাদপ্রাচীরে ইটে গাঁথা ঘোটকমূর্ত্তি .. ৬৯৮
ব্যাবিলোনিয়ায় ভূগর্ভোত্থিত প্রস্তরের সিংহমূর্ত্তি . ৩৯৯
ব্রহ্মা . ১৯৭
ভাগ সিং এবং তাঁহার পরিবার .. ১৭০
ভ্রূযুগ ও তাহার আকার .. ২২৫
মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর ৪৩৪
মাননীয় লালুভাই শামলদাস . ৪৩৫
মাননীয় শরচ্চন্দ্র রায় বিহিণদাস . ৪৩৬
মানব-সন্তানের সার্ব্বজনিক-সংঘের প্রস্তর-খিলান মন্দিরে উপাসনা ৭৩-৭৪
মায়ের পেটের ভাই ... ১৯০
মিত্রমূর্ত্তি ... ৩৫
মুখ ও তাহার আকার ... ২২৩
যমুনার পথে (রঙিন)—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত ১
রথের পাশে রাধারাণী মালা গাঁথিতেছে (রঙিন)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত ... ৩৯২
রাও বাহাদুর, দেওয়ান কৌরামল চন্দনমল ৪৩২
রাও বাহাদুর দেওয়ান তারাচাঁদ শৌকিরাম ৪৩৩
রাও বাহাদুর বলচাঁদ দয়ারাম ... ৪৩৬
রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৯৭
রাও বাহাদুর দেওয়ান হীরানন্দ ক্ষেম সিং ৪৩৫
রামের কৌশল্যাকে স্বীয় বনবাস-সংবাদ প্রদান—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত ৩
শরীর ও তাহার আকার ... ২৪১
শান্তির মন্দির ... ৫০৮
শার্লৎব্রন্তে ... ৫১০
শার্লৎব্রন্তের প্রণয়লিপি ... ৫১১
শুশুনিয়া পর্ব্বতের বিষ্ণুচক্র ... ৪৯৩
শুশুনিয়া পর্ব্বতের বিষ্ণুচক্রের খোদিত লিপি ৪৯৫
শেষ বোঝা (রঙিন)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই অঙ্কিত ... ৪৪৫
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু ... ৫৫৩
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ... ৫৫২
শ্রীমতী ননীবাঈ ... ৫৫৩
শ্রীমতী যমুনাবাঈ সক্কই ... ৫৫৪
শ্রীমতী সেখ-মহতাব-পত্নী দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যায়বিরোধী কারাবরুদ্ধা বীর মুসলমানমহিলা ... ৩৪০
শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী .. ৬৪৯
শ্রীযুক্ত গান্ধি, তাঁহার সেক্রেটরী কুমারী শ্লেসিন্, এবং তাঁহার প্রধান সহকারী মিঃ ক্যালেনব্যাক্ ... ৪৩১
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রঙিন)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে . ২১৩
সমভঙ্গ ৩৪৩
সায়ংসন্ধ্যা (রঙিন)—শ্রীযামিনীরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত ... ৩৪১
সেতু-শিল্পাগার ... ৫১৭
স্কন্ধ ও তাহার আকার ... ২৪১

হাকিম সিং ও তাঁহার ভ্রাতা ... ১৭০
হাকিম সিংহের পরিবার ... ১৬৯
হাস্যরাম বিবিণদাস ... ৪৩৪
হস্ত ও তাহার আকার ... ২৪৯
হিরণ্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায় গ্রহণ
(রঙিন)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর ... ৫৫৫

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২০

১ম সংখ্যা

বৈদিক যুগের জাতিভেদ

কেহ বা বলিতেছেন, জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং কেহ বা বলিতেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। ইঁহাদের কাহারও সহিত ইতিহাসলেখকের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। জাতিভেদ তুলিতে হয়, তোল; রাখিতে হয়, রাখ। ইতিহাসলেখককে কেবল নিষ্কামভাবে জাতিভেদের উৎপত্তি, পরিবর্দ্ধন এবং প্রকৃতির কথা যথাযথ বুঝিতে হইবে, এবং লিখিতে হইবে। যে জিনিষটি যেমন ছিল বা আছে, তাহাকে ঠিক্ তেমনি করিয়া দেখিতে হইবে; এই প্রকার সত্য-প্রদর্শনের ফলে কাহার স্বার্থসিদ্ধি হইবে বা কাহার স্বার্থনাশ হইবে, সে কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও ইতিহাস-লেখকের পক্ষে পাপ।

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন যুগের সামাজিক রীতির সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক সাক্ষী হইল—(১) সামবেদের মন্ত্র এবং (২) ঋগ্বেদের সামাতিরিক্ত প্রাচীন অংশ। সামবেদের সকল মন্ত্রই যখন ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তখন বিচার করিয়া কেবল ঋগ্বেদের সাক্ষ্য দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

জাতিভেদ বলিলে আমরা এ কালে যাহা বুঝি, সেইরূপ ভাব বুঝাইবার মত কোন শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্ত ছাড়িয়া দিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে আর্য্যদলের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদের কথাই ধরিতে পারা যায় না। স্বদেশ-বিদেশের সকল পণ্ডিতই এখন স্বীকার করিতেছেন যে, যদি কেবল ভাষা লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে অতি সাধারণ বুদ্ধির লোক পর্য্যন্তও নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে, মূল ঋগ্বেদের মন্ত্র যে-ভাষায় রচিত পুরুষ-সূক্তটি সে-ভাষায় রচিত নহে; এবং উহার ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের বলিয়া সকলেরই মনে হইবে। অন্য পক্ষে আবার এ কথাও বিচার করিতে হইবে যে, এই পুরুষ-সূক্ত প্রভৃতি অংশ যত আধুনিকই বলা যাক, বেশ পুরাতন। যে সময়ে প্রাচীন কালের মন্ত্রগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়া ঋক্ সংহিতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেই সংগ্রহের সময় নিশ্চয়ই ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত সংগৃহীত হইতে পারিয়াছিল। প্রাচীন ঋক্ সৃষ্টির যুগ কত প্রাচীন তাহা আমরা জানি না। যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঋক্‌গুলি সংহিতারূপে একত্র সংবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আধুনিক কালের প্রাচীনতা কত, তাহাও আমরা জানি না। কেবল এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষ-সূক্ত যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অন্য অংশে ব্রাহ্মণাদি ঐ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যে সময়ে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল, তখন যে-ঋগ্বেদের বহু পরবর্ত্তী যজুর্ব্বেদের সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, তাহা ঐ সূক্তের ৯ম ঋকে উল্লিখিত ঋক্, যজু প্রভৃতি নাম হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। এই পুরুষ-সূক্তটিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণাদি

বর্ণের কথা যে ১২শ ঋকে পাওয়া যায় (ঋ ১০ম-৯০, ১২), তাহাই অবিকল অথর্ব্ব বেদে (১৯অ-৬,৬), যজুর্ব্বেদে (বাজ ৩১,১১) এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩-১২,৫) পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মধ্যে লোকবিভাগে পাওয়া যায়—এক আর্য্য দল এবং অন্য আর্য্যেতর দল। আর্য্যেতর দলের কথা পরে বলিব। এখানে কেবল বলিয়া রাখি যে শূদ্র, বৈশ্য এবং রাজন্য শব্দগুলি পুরুষসূক্ত ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। "বিশ" বলিলে ঋগ্বেদে সর্ব্বত্রই আর্য্যদিগের দল বুঝায়। আর্য্যদিগের লোকসাধারণের নামই হইল "বিশ" (৬ ম—১, ৮ ; ৬ ম—২৬,১ ইত্যাদি)। যে হতভাগিনী নারী পতিতা হইয়া সর্ব্বজনভোগ্যা হইত, বৈদিক ভাষায় তাহার নাম ছিল "বিশ্যা" অর্থাৎ বিশ বা লোকসাধারণ-ভোগ্যা। এই শব্দটিই অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে "বেশ্যা" হইয়াছে ; এবং বেশভূষা হইতে উহার ভুল উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে রাজাকেই "বিশ্পতি" বলা হইত ; রাজার সর্ব্বসাধারণ আর্য্য প্রজামাত্রেই বিশ নামে উল্লিখিত হইত (ঋ৪-৫০, ৮; ৬-৮, ৪ প্রভৃতি ; অথর্ব্ব ৩ ১; ৪-৮, ৪ প্রভৃতি)। আর্য্যদিগের জনবিভাগের সময়েও (ঋ২-২৬, ৩) বিশ শব্দ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের এক দলের সহিত অন্য দলের যুদ্ধের কথায় "বিশং-বিশম্" (ঋ১০-৮৪,৪) পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ বলিতে পারি যে, বিশ কথার উল্লেখ মাত্রেই সমগ্র আর্য্যদল সূচিত হইত ; কাজেই ঋষিই হউন, আর যিনিই হউন, সকলকেই বিশশ্রেণীভুক্ত বা বৈশ্য বলা যাইতে পারিত। ঋগ্বেদের ভাষায় অথবা প্রাচীন বৈদিক ভাষায় ক্ষ+ত্ অর্থ হইল সম্পৎ ; এবং উহার উত্তর র প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ "ক্ষত্র" অর্থ হইল ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ক্ষমতাশালী (ঋ১-২৪,১১;১-১৩৬,১; ৪-১৭, ১ ; অথর্ব্ব ৩-৫, ২; ৫ ১৮, ৪ ইত্যাদি)। প্রভুতা অর্থে এবং সম্পত্তি দান করিবার ক্ষমতা অর্থে দেবতাকেও বহু স্থানে ক্ষত্র বলা হইয়াছে। এ অর্থে ঐশ্বর্য্যশালী আর্য্যদলের যে-কেহ ক্ষত্রপদবাচ্য হইতে পারিতেন এবং হইতেন।

ব্রাহ্মণ শব্দের সাধারণ অর্থ মন্ত্র ; তবে দুই এক স্থলে এই শব্দ হইতে পুরোহিত অর্থও ধ্বনিত হয়। যাঁহারা ঋষি হইতেন অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইতেন, তাঁহাদেরই নাম হইতে পারিত "বিপ্র"। বিপ্ অর্থ মন্ত্র : এবং উহার সহিত র যোগ করিলে মন্ত্রযুক্ত বা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থ হইত। যিনি বিপ্র হইতেন, তাঁহার পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোক অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন, বেদে এরূপ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অভাব নাই। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা, ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদ ছিল না, কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় বলিয়া, ইহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখিতেছি না। এ কালের সকলেই জানেন যে পুরূরবা প্রভৃতি রাজারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন ; এবং তাঁহাদের রচিত মন্ত্র সকল বেদেই স্থান লাভ করিয়াছে। রাজা বলিয়া কিংবা স্ত্রী-লোক বলিয়া ঋষি হইবার পক্ষে কাহারও বাধা ছিল না। রাজা না হইয়াও যাঁহারা খাঁটি ঋষি, তাঁহারাও রাজত্ব পাইবার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; এবং যুদ্ধে স্বয়ং সেনানায়ক হইয়া সৈন্যগণের সংখ্যা ও বলবৃদ্ধির জন্য দেবতাদিগের স্তুতি করিয়াছিলেন (ঋ ১ম—৮স্ এবং অন্যান্য সূক্ত)। আর্য্যরমণীরাও তখন যুদ্ধে যাইতেন ; খেলের স্ত্রী বিশ্পলার একখানি পা যুদ্ধে কাটা গিয়াছিল ; এবং দেবতারা তাঁহার লোহার পা গড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ঋষি কক্ষীবান্ বর্ণনা করিয়াছেন (ঋ ১ম—১১৬, ১৫)। সকল শ্রেণীর আর্য্যনারীরাই যে দ্রুত গমনে এবং পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পটু ছিলেন, এই কথাই ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে দেখিতে পাই। আর্য্যনারী যদি তখন মন্থর গমনে প্রশংসিতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিবার ক্ষমতার কথা একটি বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইত না।

ঋষিগণ যেমন ধনরত্নের জন্য প্রার্থনা করিতেন, রাজা হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, শতবর্ষ পরমায়ু প্রার্থনা করিতেন (ঋ ২-২৭, ১০ ও অন্যান্য), তেমনি শ্রেষ্ঠতম পাত্রীরূপে রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেন (ঋ ৫-৬১র সায়ণটীকা বিশেষ দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলিয়া শ্রেণী-

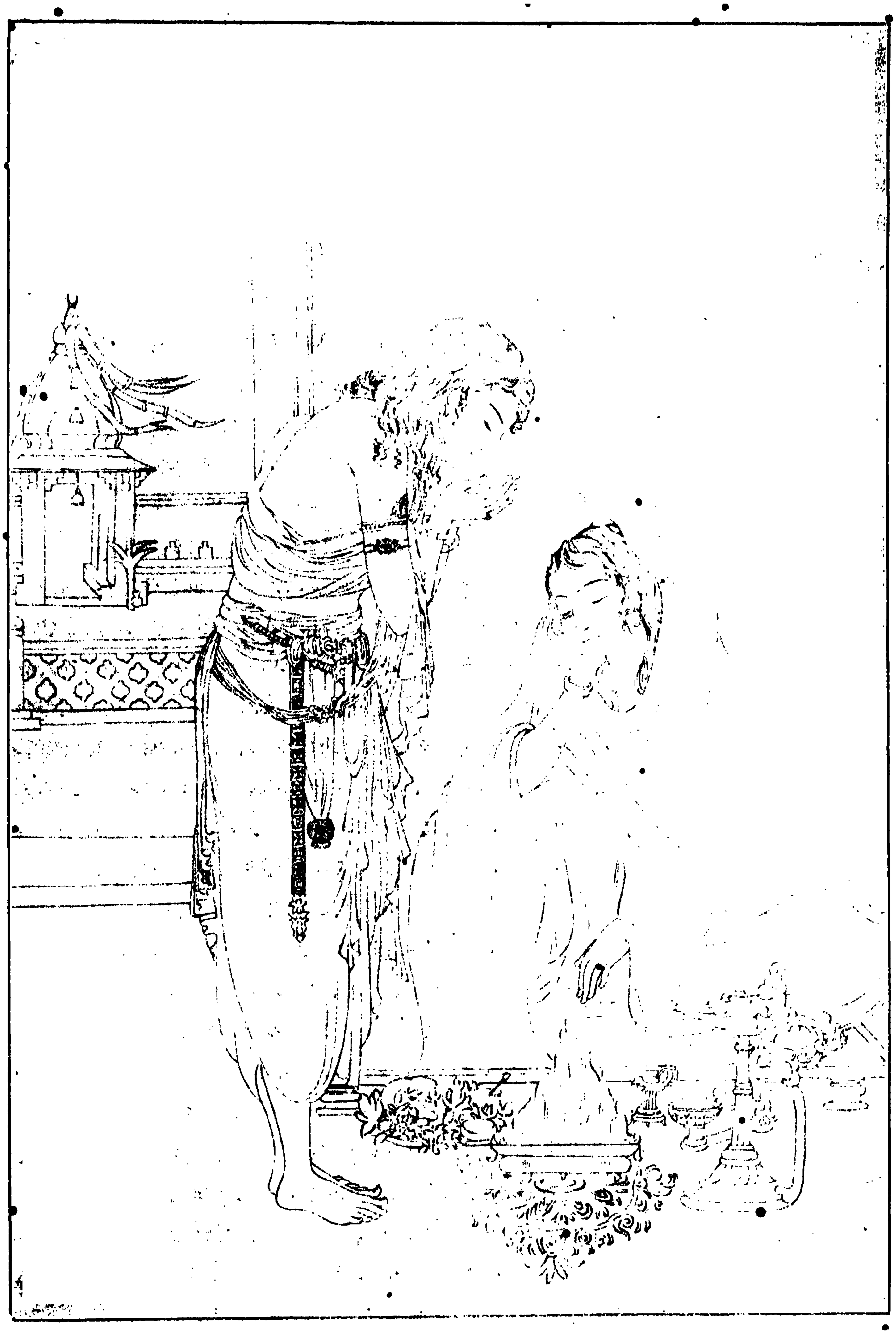

রামের কৌশল্যাকে স্বীয় বনবাস সংবাদ প্রদান।
(শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।)

বিভাগ হইবার পরেও ঐ তিন শ্রেণী যে দ্বিজ-পদবাচ্য হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। দ্বিজশব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আর্য্য-দলের সকল লোকই নিজে নিজে যজ্ঞ করিবার অধিকারী ছিলেন। ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন ভাষায় অগ্নিকে প্রথমতঃ "দ্বিজন্মা" বা "দ্বিজ" বলা হইত। তাহার কারণ এই যে অগ্নি দুইখানি কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন হইত (ঋ ১-৬০, ১এর সায়ণ-টীকা দ্রষ্টব্য)। অগ্নি-লইয়া-যজ্ঞকারীগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে অগ্নির দ্বিজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কার দ্বারা দুইবার জন্ম হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া দ্বিজ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা সুসাধ্য নয়।

উপরে ঋষিবর্গে রাজাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। উহা দেখিয়া কেহ কেহ অতি অর্ব্বাচীন যুগের পৌরাণিকী কথা লইয়া বলিতে পারেন যে, কোন কোন ব্যক্তি হয়ত বা তপস্যা করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে কথা আদৌ সত্য নহে। বিশেষভাবে এ বিষয়ে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে;—এবং কেহ কেহ অতি ৫ ষ্পকররূপে বিশ্বামিত্র নামের "মিত্র" অংশটুকু বাঙ্গালী কায়স্থের মিত্র উপাধির সঙ্গে মিলাইতে চাহেন। বিশ্বামিত্রের খাঁটি বৈদিক গল্প হইতেই পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, ইচ্ছা করিলে যে-কেহ আজ রাজার কার্য্য, কাল প্রজার কার্য্য ও অপর দিন মন্ত্রব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত। এই বিষয়ের দুইটি খাঁটি উপাখ্যান বৈদিক গ্রন্থ হইতে দিতেছি।

বেদে বিশ্বামিত্র এবং দেবাপির যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাহা আমরা একালে ভুল বুঝিতে পারি; কিন্তু সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণসাহিত্য এবং বৃহদ্দেবতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, সযত্নে তাহার অনুসরণ করিয়া এই গল্প দুইটি পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

সূক্তপাঠের ফলশ্রুতি দেখাইতে গিয়া বৈদিক বৃহদ্দেবতায় লিখিত হইয়াছে যে, গাথিপুত্র (গাধি নহে) বিশ্বামিত্র প্রথমে রাজকার্য্য করিতেন; এবং পরে ঋষিব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন পালি গ্রন্থেও ঠিক্ এইরূপ দেখিতে পাই যে, কোন কোন রাজা কেবল নিজের ইচ্ছায় "ইসি পবজ্জা" (ঋষি হইবার জন্য প্রব্রজ্যা) করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র জাতিতে ছিলেন ক্ষত্র, পরে ব্রাহ্মণ হইলেন, এ কথা ঠিক্ নহে। বৃহদ্দেবতার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায় ঠিক্ এইরূপ লিখিত আছে—

> প্রশাস্য গাং বস্তপসাভ্যগচ্ছৎ
> ব্রহ্মর্ষিতামেক শতং চ পুত্রান্
> স গাথিপুত্রস্ত্ব জগাদ সূক্তং
> সোমস্যমেতাগ্নেয়ং পরে চ।

ঋষিব্রত অবলম্বন করিয়া ইনি অনেক মন্ত্রের দ্রষ্টা বা সূক্তের দ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবার পরই সুদাস্ রাজার কুলপুরোহিত হইয়াছিলেন; এবং বশিষ্ঠকুলের সহিত ইঁহার বিবাদ ছিল।

দেবাপির আখ্যান হইতে এই ভাবটি আরও পরিষ্কার হইবে। ঋষ্টিসেনের দুইটি পুত্র ছিল, যথা—(১) দেবাপি এবং (২) কৌরব শন্তনু (শান্তনু নহে)। জ্যেষ্ঠ দেবাপির চর্ম্মরোগ (ত্বগ্‌দোষ) ছিল বলিয়া, ঋষ্টিসেন তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিলেও, তিনি রাজা হইলেন না। পরে প্রজারা শন্তনুকে রাজা করিল। শন্তনু রাজা হইবার পর ১২ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়; প্রজারা তখন এই দুর্নিমিত্ত জ্যেষ্ঠাতিক্রম কারণেই ঘটিয়াছে, স্থির করিল। শন্তনু প্রজাবর্গ সহিত দেবাপির নিকটে গিয়া তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবাপি কহিলেন—"আমি ত্বগ্‌দোষী; রাজা হইব না। কিন্তু রাজা শন্তনুর পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ করিয়া বৃষ্টি করাইব।" দেবাপি পুরোহিত হইয়া যে যে ঋক্ উচ্চারণ করিয়া বৃষ্টি করাইয়াছিলেন, তাহা লিখিত আছে। ঐ ঋক্‌গুলি বৃষ্টি নামাইবার মন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাচীন কালে আর্য্য বলিয়া যে একটি দল ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বহুপ্রকারের ব্যবসায়ভেদসত্ত্বেও জাতিভেদ ছিল না। তবে সেই যুগে আর্য্য এবং আর্য্যেতর দলের মধ্যে কি প্রকার প্রভেদ এবং সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

ঋগ্বেদে বর্ণ অর্থে সর্ব্বদাই রঙ্ বুঝা যায়; তবে

কয়েকটি স্থলে আর্য্যেতর লোক হইতে আপনাদিগকে বিভিন্ন করিতে গিয়া "আর্য্যবর্ণ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—ঋ ৩-৩৪, ৯। আর্য্যবিরোধী বা আর্য্য হইতে স্বতন্ত্র লোকদিগের নাম সর্ব্বত্রই "দস্যু" এবং কোন কোন স্থলে "দাস" পাওয়া যায়। রঙের বিভিন্নতা অনুসারে জাতির নাম, অর্থাৎ বর্ণভেদের কথা, কেবল এইরূপ স্থলেই পাওয়া যায়; অন্যত্র নাই। অতি অর্ব্বাচীন বৈদিক যুগের কাঠকসংহিতায় (১১, ৬) বৈশ্যের শুক্লবর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে; এবং কালক্রমে আর্য্যসমাজে আগত রাজন্যকে ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষমতাশালী দ্রবিড়বংশীয়েরা পদমর্যাদার বলে আর্য্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু খাঁটি জাতি-সাধারণ বা বৈশ্যের মধ্যে তখনও সম্ভবতঃ অন্য জাতি অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত অধিক পরবর্ত্তী যুগেই শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ, রাজন্যের রক্তবর্ণ এবং ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণের কথা পাওয়া যায়।

দস্যু এবং দাস বলিতে বৈদিক যুগে কাহারা সূচিত হইত, তাহার বিচার করিতেছি। দস্যু শব্দের আদিম অর্থ কোন জাতিবিশেষ বলিয়া মনে হয় না; কেবল শত্রু অর্থেই দস্যু শব্দ ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বৈদিক পণ্ডিত (Zimmer) জিমারের মন্তব্য এবং (Macdonell) ম্যাকডোনেলের সমালোচনা দ্রষ্টব্য (Vedic Mythology, p. 158)। ঈরাণের ভাষায় দস্যুর অপভ্রংশ "দন্হু" শব্দ শত্রুর অধিকৃত প্রদেশ অর্থে ব্যবহৃত। দস্যু-মাত্রেই এক জাতির লোক নহে বলিয়া কোথাও কোথাও এ শব্দে অতিমানব শত্রু সূচিত হইয়াছে (১-৩৪, ৭ ও অন্যান্য), কোথাও বা আপনাদের লোকের মধ্যে যাহারা যজ্ঞবিরোধী বা দেববিরোধী (১০-২২, ৮; ৮-৭০, ১১ ও অন্যান্য), তাহাদিগকে দস্যু বলা হইয়াছে; কোথাও বা ঐ শব্দ দ্বারা অনাস বা খর্ব্বনাস লোকের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের সকল শ্রেণীই আর্য্যের নিকট মৃধ্রবাক্ ছিল না; অর্থাৎ সকলেরই যে ভাষা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না, এমন নহে! খাঁটি আর্য্যও যে বৈদিক দেবতাদিতে অবিশ্বাসী বলিয়া হীনভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে (ঋ ১০-৩৮, ৩)। আর্য্যেতর শত্রুশ্রেণীর মধ্যে অনেককে "শিশ্নদেবাঃ" বা লিঙ্গপূজক বলা হইয়াছে (ঋ ৭-২১, ৫; ১০-৯৯, ৩)।

"দাস" শব্দটি স্থলে স্থলে "দস্যুর" মত শত্রু অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, সুস্পষ্টভাবে ঐ শব্দ দ্বারা একটি ক্ষমতা-শালী জাতিকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাহাদের "পুর" ছিল, লৌহময় দুর্গ ছিল (ঋ২-২০, ৮; ১-১ ৩,৩; ৩০ ১২,-৬; ৪ ৩২,১০ ইত্যাদি)। তাহারা বিশ বা লোকসাধারণ লইয়া রাজ্য করিত (১-১২,৪); এবং সামাজিক উন্নতির প্রভাবে এই দাসেরা একেবারে আর্য্য হইয়া আর্য্য-সমাজভুক্ত হইয়া যাইত (ঋ৫-৩৪,৬)!

একালে কেহ কেহ "দাস" শব্দের উপর চটিয়া "দাস" স্থলে "দাশ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটা সুবিধার কথা মনে করি না; কারণ বৈদিক "দাস" অনেক স্থলেই ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, দাসরমণী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদাহৃত কবষের মত অনেক ব্রাহ্মণ-বংশের জন্মদাত্রী হইতেন। কিন্তু "দাশ" যজুর্ব্বেদেও মৎস্যজীবী ধেবর জাতি (ধীবর নহে) অর্থে ব্যবহৃত।

বৈদিক যুগের শেষভাগে এ কালের জাতিভেদের মত জাতিভেদ সৃষ্ট না হইলেও, যখন কর্ম্ম বা ব্যবসায়ের হিসাবে ব্রাহ্মণ ও রাজন্য এবং বৈশ্য শ্রেণীর বিভাগ হইয়া গিয়াছিল, তখন সামাজিক সম্মানে কে বড় ছিল, কে ছোট ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নয়। ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা পূজাপাঠ করিতেন, তাঁহারা দৈববিপত্তি অতিক্রম করিতে পারিতেন বলিয়া খুব সম্মানিত ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-অভেদে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাঁহাদের সম্মানও খুব কম ছিল না। বংশ-পরম্পরায় মন্ত্রের গ্রন্থ যাঁহাদের অধিকারে ছিল, এবং ঐ মন্ত্র মুখস্থ রাখিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা যে মোক্ষবিষয়নিরপেক্ষ (secular) সাহিত্যের সেবাকারীদিগের সম্মান একেবারে ডুবাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা মনে হয় না। বেদ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দিব। দেবতাপূজার মন্ত্র-উচ্চারণকারীরা বৈদিক

যুগে ঋষি হইতেন; আর যাঁহারা দশ জনের চিত্তবিনোদনকারী, সাহিত্যরচনা করিতেন, বা লৌকিক কথার কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদের নাম হইত "কারু"। যে কারণেই হউক, ধর্ম্ম-সাহিত্য বা ঋষিসাহিত্য রহিয়া গিয়াছে; এবং সুপ্রাচীন কারুসাহিত্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যাঁহাদের বিদ্যা কেবল নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আবদ্ধ ছিল না, বরং সর্ব্ব বিষয়ের আলোচনায় রত ছিল, তাঁহারা ভয়ের পাত্র ছিলেন না বটে; কিন্তু বেশ আদর ও ভক্তির পাত্র ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ক্ষমতাশালী রাজাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইতে না পারিলে যখন ধনরত্নলাভ করা সহজ হইত না, তখন রাজন্যবর্গের সম্মানও খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণের মন্ত্রশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য এবং গৌরবের কথাই রক্ষিত থাকিবার কথা। কিন্তু লোকসাধারণের প্রাচীন সাহিত্যের অভাবে বৈদিক কতকগুলি উক্তি পরিদর্শন করিয়াই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী ব্রাহ্মণবর্গ আপনাদের কথা যতই বাড়াইয়া বলুন না কেন, অর্ব্বাচীন যুগের শ্রেণী-বিভাগের দিনেও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব অধিকতর বলিয়া স্বীকৃত হইত। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অথর্ব্ব বেদের পঞ্চম কাণ্ডে "ব্রহ্মজায়াদেবত্য" সূক্তে ব্রাহ্মণ-পত্নীর কথা আছে। ঐ সূক্তের প্রথম ঋকে মাতরিশ্বার দোহাই দিয়া, এবং দ্বিতীয় ঋকে ব্রাহ্মণ-পত্নীর প্রতি সোম, বরুণ, মিত্র এবং অগ্নির ব্যবহারের কথা বলিয়া, তৃতীয় ঋকে কথিত হইতেছে—ব্রাহ্মণ যে রমণীর "হস্ত" ধারণ করিবেন, সকলে সেই রমণীকে ব্রাহ্মণের জায়া বলিয়া জানিবেন; তাঁহার প্রতি যদি কোন অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে রাজন্যের রাজ্য সুরক্ষিত রহিবে; কেহ তাঁহাকে কোন দৌত্যে প্রেরণ করিবেন না। চতুর্থ হইতে সপ্তম ঋকে আছে—যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ-পত্নীর অবমাননা হয়, বা তাঁহার প্রতি দুর্নীতিজনক কার্য্য কৃত হয়, সে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিবে।

অষ্টম এবং নবম ঋকে আছে—যে রমণী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্য দশটি পতিও লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ যখন সেই রমণীর হস্ত ধারণ করিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের জায়া হইলেন; এবং তখন ব্রাহ্মণই কেবল তাঁহার পতি; অন্য কেহ তাঁহার পতি হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণই যে তাঁহার পতি,—কিন্তু রাজন্য বা বৈশ্য নহেন, এ কথা পঞ্চ জনের সকল মানবকেই সূর্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তাহার পর দশম ঋকে একটি নজির দেখাইয়া, পরবর্ত্তী কয়েকটি ঋকে ব্রাহ্মণপত্নী হরণের কুফলের কথা উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ-জায়াকে দেবতারা হরণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজারাও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা সকলেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন (১০)। রাজারা ব্রাহ্মণপত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়া-ছিলেন, এবং বিস্তৃত (উরুগায়) পৃথিবী সম্ভোগ করিয়া-ছিলেন। যিনি ব্রাহ্মণপত্নী ফিরাইয়া না দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন, তাঁহার পত্নী বন্ধ্যা হয়; তিনি শত সন্তানদায়িনী (শতবাহী) সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন না। তাঁহার পুকুরে যে পদ্ম পর্য্যন্তও ফুটিবে না, এ কথাও ১৬ ঋকে আছে।

সূক্তটির শেষ ঋক্ বা অষ্টাদশ ঋকে আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীটি না পাইয়া অপহরণকারীর দ্বারে এক রাত্রিকাল দুঃখে অতিবাহিত করেন, তবে ঐ ব্যক্তির দোহা গাই পর্য্যন্ত দুধ দিবে না। এ অভিসম্পাত সে কালে খুব কঠোর ছিল।

ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজন্যদিগের অমঙ্গল ঘটিবার কথা আছে। কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষমতায় মত্ত হইয়া ঋষিদিগের পত্নী হরণ করিতেন, এবং পরে ফিরাইয়া দিলে ঋষিরা যে সে পত্নী গ্রহণ করিতেন, এবং অপহৃতা পত্নী পাইবার জন্য রাজার দ্বারে প্রার্থী হইয়া যে দুঃখ-ভোগ করিতেন, এ সকল কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। আরও অর্ব্বাচীন যুগের (কিন্তু আমাদের পক্ষে বেশ প্রাচীন) অনেক সাহিত্যেই এই শ্লেষাত্মক কথা পড়িয়া থাকি যে, লোক অর্থেই বলবান্ হয় এবং অর্থ থাকিলে মূর্খও পণ্ডিত হয়।—কথা এই—প্রাচীন কাল হউক; বা অর্ব্বাচীন কালই হউক, চিরকালই অতি স্বাভাবিক নিয়মে রাজন্যবলই শ্রেষ্ঠ বল হইয়া আসিয়াছে। অর্থ-বলের জন্য মানসম্ভ্রমটা এই হীন কলিযুগেরই বিশেষ ধর্ম্ম নহে। ঐ প্রকার সম্মান ভাল কি মন্দ, সে কথার

বিচারের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। বৈদিক যুগে যে-শ্রেণীর জাতিভেদ এবং ক্ষমতাভেদ প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অবিচারের শেষবিচার *

(চীন নাটক)

পাত্র-পাত্রী।

চৌঙাঙ্কো—চীন্ রাজ্যের সমরসচিব।

চীঙীং—মৃত বিচারসচিব চাউতানের পুত্র মৃত চাউছোর দ্বার-কবিরাজ।

হাঙ্কুয়া—টৌঙাঙ্কোর অধীনস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী।

কোংলুন—চাউতানের প্রিয়বন্ধু এবং অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজ-সভাসদ।

চীং পৈ—চাউছোর পুত্র।

ঙৈফঙ্—বিচার বিভাগীয় উচ্চতম কর্ম্মচারী।

রাজকন্যা—চাউছোর পত্নী।

ছিয়াৎছি বা পূর্ব্বাভাষ।

ছিন্ রাজসভায় যুবক টৌঙাঙ্কো বৃদ্ধ চাউতানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। এমন কি, তন্নিযুক্ত গুপ্তঘাতকও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ছিন্‌রাজ লিঙ কোং ইউরোপীয় কোনো নরপতির নিকট হইতে চিংগাও নামক একটি দুর্দ্দান্ত কুকুর উপহার পান এবং টৌঙাঙ্কোকে তাহা রাজপ্রসাদস্বরূপ দান করেন। সে তাহাকে কাপ্পাডোসিয়ার সেণ্ট জর্জ্জের প্রক্রিয়ায় † শিক্ষিত করিতে লাগিল।

অবশেষে, একদা টৌঙাঙ্কো রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ছিন্-রাজকে সংবাদ দিল, চিংগাও কুকুর জনতার মধ্য হইতে বিশ্বাস-ঘাতককে টানিয়া বাহির করিতে পারে; এবং রাজসভাতেও সেরূপ দুষ্ট ব্যক্তির অভাব নাই।

রাজ-অনুজ্ঞায় ইঙ্গিতপ্রাপ্ত বুভুক্ষিত কুকুরটা লিঙ্‌কোংএর পার্শ্বস্থ চাউতানের দিকে প্রধাবিত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই যদি সে পলাইয়া গাড়ীতে না উঠিত, চিংগাও তাহাকে কোনো ক্রমেই আস্ত রাখিত না।

অনন্তর ধূর্ত্ত টৌঙাঙ্কো রাজার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে চাউ-তানের বংশ নিপাত করিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। ইহার পরেই রাজার আদেশে চাউছো এবং তৎপত্নী রাজকন্যা ব্যতীত চাউতান সহ তাহার বংশের প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। দুর্ব্বৃত্ত ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লিঙ্‌কোংএর নাম জাল করিয়া রজ্জু, বিষাক্ত মদ্য এবং একখানি ভুজালী চাউছোর নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার পছন্দমতো মৃত্যু-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আদেশ করে।

চাউতানের পুত্র চাউছো ভুজালী দ্বারা আত্মহত্যা করিবার পর, রাজকন্যা এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টৌঙাঙ্কোর প্রাসাদ।

(টৌঙাঙ্কো আসীন।

টৌ। ভয় হ'চ্চে, যদি চাউছোর ছেলেই হয়!—যৌবনে সে যে প্রবল শত্রু হ'য়ে উঠ্‌বে আমার!—রাজ-কন্যাকে বন্দী রাখাই ঠিক। রাত হ'য়ে এলো, লোকটা আস্‌চে না কেন!

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। ঠিক—ছেলেই। সব্বাই বল্‌চে এই বাপহারা শিশুই চাউদের বংশধর।

টৌ। বটে!—এ-ই চাউদের—; আঃ গর্ভস্রাব হয়েও মরল না!—কী বিপদ! আচ্ছা, ঠিক হ'য়ে যাবে এখন—তা' দ্যাখ্, হাঙ্কুয়াকে খবর দে, আমার হুকুম, বিধবার সদর দরজার ওপর সে অনবরত যেন নজর রাখে। যদি কোনো রকমে ছেলেটা খোয়া যায়, হাঙ্কুয়ার সমস্ত বংশের কাটা মাথাগুলো আগুন দিয়ে পোড়ানো হবে। সমস্ত সহরময় এই কথা রটিয়ে দিগে যা!—কারো কোনো ছল চাতুরী, কিচ্ছু খাট্‌বে না; তা যদিই হয়, সব এক সাপ্টা হ'য়ে যাবে—হাঁ!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—চাউ-কুটী।

(বিধবা রাজকন্যার প্রবেশ)

রাজ-ক। বুক না ফেটে কি হৃদয় ফাটে না গো? ওঃ—অসহ্য! সব সেরে ফেলেছে, একটি মাত্র বেঁচে, সবে মাত্র একটি, কোলের সেটি। যাবার কালে তিনি ব'লে গেলেন, দেখো, যদি ছেলে পাও, তাকেই চাউবংশধর ব'লে জেনো। মনে রেখো, উপযুক্ত বয়সে সে এই নীচ হিংসার

---

* চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মূলগ্রন্থ চাউ-চি-কৌ-এল (চাউবংশের অনাথ শিশু) চীন ভাষায় প্রণীত হয়। Jesuit missionary Du Halde সাহেব ইহার অনুবাদ করেন। তৎপরে ১৮২৬ জানুয়ারী মাসে নাটকখানি লণ্ডনের সাময়িক পত্রিকায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়।

† শত্রুর আকৃতি অনুযায়ী অবিকল ফাঁপা একটি চর্ম্মমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পশ্বাদির রক্ত ও অন্ত্র দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া সেইটার দিকে উপবাসী কুকুরকে লেলাইয়া দেওয়া হইত।

প্রতিশোধ নেবেই।—কী ক'রে, ছেলেটাকে বাঁচাই!—কে আপনার লোক আছে, এ-কে রক্ষা করে? চিঙীং? —সে কি—?—বিশ্বাস কর্ব্বো? সে না তাঁর বড় আত্মীয় ছিল! বলি তো।

(ঔষধের বাক্স সহ চীঙীংএর প্রবেশ)

চী। ডেকেছিলেন? কেন মা!

রাজকুমারী। চীঙীং—! না, কাঁদ্‌বার সময় নেই;—দেখ্‌ছ, বংশটাকে? কী ক'রে লোপ পেতে বসেছে, বুঝছ? এ-ই একমাত্র পুঁজি; এর বাবা, কোনো মতে একে বাঁচাতে বলে' গেছেন; এর 'পরেই প্রতিশোধের ভার রয়েচে। কিছুতেই কি এ-কে বাঁচাতে পারো না চিঙীং?

চী। শোনেন নি বুঝি সে? সমস্ত সহরের দরজায় দরজায় হুকুম-নামার কাগজ লট্‌কিয়ে দিয়ে টৌঙাঙ্কৌ রটিয়েছে, চাউ-শিশুকে বাঁচিয়ে কারুরই নিস্তার নেই, তা'কে সবংশে নির্ম্মূল হ'তে হবে।—কী ক'রে কি করি, মা"

রাজ-কু। কথায় বলে না, বিপদেই বন্ধু, চীঙীং? সমস্ত বংশটার এক ফোঁটা রক্ত এ, এ-কে বাঁচাও—এ-কে বাঁচাও বন্ধু!

(জানু পাতিয়া)

চীঙীং, দয়া কর, দয়া কর চীঙীং! তিন শো নরনারীর আশা এ, ভরসা এ,—এর দিকে চেয়ে এই প্রতিনিধিকে বাঁচাও!—অপত্যস্নেহে এ-কে বাঁচিয়ে দিতে বল্‌ছি, ভেবোনা।

চী।—না-না, উঠুন মা, উপায় ভাবুন! নিয়ে যেন গেলুম,—যখন টের পাবে সে—? ধনে প্রাণে ধ্বংস হ'য়ে যাব যে, মা!

রাজ-কু। ভেবো না।—বুঝেছি চীঙীং! এই সব গোল পরিষ্কার হয়ে যাবে। যতক্ষণ এ একেবারে নিরাশ্রয় অসহায় না হচ্ছে, ততক্ষণ এ-কে কেউ দেখবে না। আমার চোখে এই অশ্রু দেখ, আর, বিশ্বাস কর।

(আত্মহত্যা)

চী। আগে এ অনুমান করিনি। যা'ক্‌, অনিবার্য্য—হ'য়ে গেল। এখন? পালাই!

(পেট্‌রায় শিশুকে লুক্কায়িত করিয়া গ্রহণ)

ঈশ্বর, করুণা করো!—এই মাত্র বেঁচে,—সব গেছে। ধরা পড়ি যদি,—জানি, মৃত্যুই। না, বাঁচ্‌তেই হবে;—নইলে কিছুতেই চল্‌বে না। স্বর্গ মর্ত্ত্যের কোনো সুখ চাইনে প্রভু, এ-কেই বাঁচিয়ে তুল্‌তে চাই।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য :—চাউকুঠীর বহির্ভাগ।

(সৈন্য সহ হাঙ্কুয়ার প্রবেশ)

হা। এই দিকে, ওদিকে, সে দরজাটায়,—ঐ গাছ-তলাতে সব দাঁড়িয়ে, সজাগ থেকে পাহারা দাও! সাবধান, ছেলেটা যেন স'রে না যায় মনে রেখো,—মাথা উড়ে যাবে তা' হ'লে ব'লে রাখ্‌ছি—এই-ই হুকুম।—টৌঙাঙ্কৌ! বড়ই বেড়ে উঠেছ তুমি দেখছি; সইবে কি? আকাশের ভালো ভালো চাঁদগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে—এ তুমি কি করছ, মূর্খ?—কে?—

(ভিতর হইতে বাক্স সহ চীঙীংএর প্রবেশ)

আটক কর এ-কে!—কে তুমি?

চী। কব্‌রেজকে চেনো না হাঙ্কুয়া

হা। এ ধারে, কোত্থেকে?

চী। ওষুদ দিয়ে এলুম এ বাড়ীতে।

হা। কী সে?

চী। যেমনটী বুঝেছি।

হা। —যা'ক্‌, ও বাক্সে কি?

চী। ঐ ওষুধ পত্তর।

হা। শুধু ওষুধ পত্তর?

চী। নয় তো কি?

হা। কিচ্ছু নেই আর?

চি। দেখ্‌তে চাও?

হা। না, যাও তবে চ'লে যাও।

(চীঙীংএর প্রস্থান)

শোনো চীঙীং!

(আহ্বান ও চীঙীংএর পুনঃ প্রবেশ)

সত্যিই বল্‌ছ কিচ্ছু নেই তোমার বাক্সে!

চী। খুলে দেখিয়ে দিই।

হা। দেখো, শেষটায় আবার—

চী। বলছি, দেখে নাও—

হা। আচ্ছা, যাও।

(চীঙীং প্রস্থানোন্মুখ)

না, দাঁড়াও ;—চীঙীং, আমি তোমার বাক্স দেখ্‌তেই চাই। নিশ্চয় তুমি ছেলেটাকে নিয়ে চলেছ। দাঁড়াও। আমায় ঠকিয়ে যাবে ?—আমি জানি তুমি চাউদের নিমক্‌খোর। তোমার দৃষ্টি অমন কেন ? পালাচ্ছ, যেন দৌড়ের ঘোড়া ; —কিন্তু ফির্‌ছ, যেন চীনের পুতুলটী !

চী। আমি স্বীকার করি, হাঙ্কুয়া, আমার প্রতি চাউদের মায়ামমতা ছিল। দয়া কর, আমায় সুবিধে দাও বন্ধু !

হা। কি ক'রে তা' হ'বে ?—প্রাণ বাঁচিয়ে তবে না তা' ?—তাই বা তুমি পারছ কৈ ?

(পার্শ্বচরের প্রতি)

স'রে যাও এখন, আমি ডাকব।

(চীঙীংএর বাক্স খুলিয়া)

সুন্দর ওষুধ, চিঙীং—এ শিশু !

চী। (সভয়ে নতজানু) হাঙ্কুয়া, হাঙ্কুয়া,—নরকের বৃত্তান্ত কি কানে পৌঁছে নি ?—চাউতান কি প্রভুভক্ত ছিল না গো ? চিংগাওর দাঁতের পাটী থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে লিংচার * সাহায্যে সে পাহাড়ে পালিয়ে গেল ; খোঁজই হ'ল না আর তা'র ;—জল্‌জলাট সংসারটা রাজরোষে উড়ে পুড়ে গেল, —একমাত্র —বন্ধু, একমাত্র এই শিশু, বংশের প্রদীপটী নিভিয়ে দেবে ?—মানুষেরই প্রাণ তো তোমারও হাঙ্কুয়া !

হা। তুমি যদি জান্তে চীঙীং, কী অতুল ধনসম্পত্তি এই শিশুর মূল্যে টৌঙাঙ্কৌ আমায় দেবে ! না, চীঙীং, হাঙ্কুয়াও মানুষ। সাবধানে এ-কে নিয়ে চলে যাও ভাই, দেবার মতো জবাব আমি দেবো তখন—যাও !

চী। বাধিত—চিরবাধিত হলাম, হে হাঙ্কুয়া, আমার হৃদয় তোমার নিকট পরম কৃতজ্ঞ হ'য়ে রইল।

(প্রস্থান ও প্রত্যাবর্ত্তন)

হা। (চীঙীংকে নতজানু হইতে দেখিয়া) ফিরছ কেন ? ওঠ, যাও, চ'লে যাও,—খুব জোরে ছুটে চলে' যাও ! না, না, হাঙ্কুয়া মিথ্যাবাদী নয় ; সে ছলনা করে না ; হাঙ্কুয়া,—প্রতি বাক্য তার প্রাণপণেই বলে।

চী। চমৎকার লোক তুমি হাঙ্কুয়া !

(প্রস্থান ও পুনরাগমন)

হা। আবার—? বিশ্বাস করছ না বুঝি ?—ছি-ছি ! মনের বল কৈ তোমার ?—সাহসেরই যে খুব দরকার এখানে।—নইলে, কী ক'রে করবে এ গুরুতর কাজ ? আত্মবিসর্জ্জনে দৃঢ়তা নেই তোমার, আর ঐ ছেলেকে তুমি বাঁচাতে চাও ?—কে দিয়েছে এ কাজ তোমায় ? প্রয়োজন হ'লে, মরতেও হবে ;—পার ?—শিখেছ ? নইলে এ কাজ তোমার নয়কো ; যাও, প্রাণ-দানে নির্ভীকতা অভ্যাস কর গে, চিঙীং !—যাও !

চী। হাঙ্কুয়া ! হাঙ্কুয়া !—যদি ধরা পড়ি, মর্‌ব ;—কিন্তু এই অনাথটীর কি হবে তখন, তাই ভেবে আকুল হচ্চি ভাই ! না, আমায় ধর, নিয়ে চল, এতে তোমার যথেষ্ট পাওনা রয়েছে, হতভাগাকে নিয়ে একসঙ্গে ম'রে জঞ্জাল মিটিয়ে দিই।

হা। বিশ্বাস হচ্ছে না এখনো তোমার ? তবে প্রমাণ গ্রহণ কর বন্ধু, প্রাণের বিনিময়ে তোমায় নিশ্চিন্ত ক'রে গেলুম।

(ছুরিকায় আত্মহত্যা)

চী। বড্ড জিতে গেলে হাঙ্কুয়া ! না, কেউ দেখে ফেল্‌বে। তৈপীং গাঁ'র দিকে পালাই ;—সেখানে গিয়ে যা হয় ঠিক ক'রে ফেল্‌ব।

(নতজানু হইয়া হাঙ্কুয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টৌঙাঙ্কৌর কক্ষ।

(রক্ষী সহ টৌঙাঙ্কৌর আগমন)

টৌ। ব্যস্ত কি !—হ'য়ে এল ? হাঙ্কুয়াকে পাঠিয়েছি —নিশ্চিন্ত থাক ! আকাশে পালাবে ? হাসির কথা ?—কি জেনে এলি ?

(চরের প্রবেশ)

চর। খবর খুব খারাপ, ধর্ম্ম-অবতার।

টৌ। খারাপ !—কি—সে, কী ?

* চাউতানের অনুগ্রহ-জীবিত জনৈক নগরবাসী।

চর। রাজকন্যা, হাঙ্কুয়া, নিজে নিজে খুন হ'য়ে—

চৌ। এইও—চ্চুপ্ ! হাঙ্কুয়া !—আত্মহত্যা ! অর্থ কি ? আর গর্ভস্রাব সেই ছেলেটা ? ম'রে গেছে ? কী খবর নিয়ে এলি, কম্‌বক্ত ! এখন ? দ্যাখ্ এই নে—হুকুম ! রাজার নাম-সই ?—এই ;—দেখেছিস্ ?—, প্রতি গলির প্রতি প্রাণীর কানে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে দে, সব্বাইকে তাদের কোলের ছেলেগুলিকে নিয়ে আমার বাড়ী হাজির হ'তে হবে। না মেনে নিস্তার নেই, গোষ্ঠীকে গোষ্ঠী ধ্বংস ক'রে ছাড়ব। এইবারটী ঠিক হবে।—

(চরের প্রস্থান)

রাজার নাম জাল করেছি। এক-একটী ক'রে সমস্ত ছেলেগুলোর মাথা উড়িয়ে দিয়ে—তবে অন্য কথা। নিশ্চয়ই, এদের মধ্যেই, হতভাগাটা আছেই আছে।—ব্যস, এই ঠিক। কোপের মুখের পাথরকুচি সব—তুলোর মতো উড়্‌বে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ—তৈপীং পল্লী।

(তোরঙ্গ স্কন্ধে চীঙীংএর প্রবেশ)

চী। ভয় খাচ্ছ চীঙীং ?—সাবধান টৌঙাঙ্কো ! নিজের প্রতি তোমার নিজেরই ঘৃণা হয় না ?—জঘন্য ! কী সাঙ্ঘাতিক পাপ সে প্রচার করেছে ;—নিরীহ শিশু-গুলিকে একে একে কেটে কেটে উড়িয়ে দেবে ! খোকা, —খোকা,—কি ক'রে তোরে বাঁচাই। এই যে, তৈপীং পল্লী ;—কোংলুনের বাড়ী এখানেই। বৃদ্ধ এখন অবসর নিয়ে বাড়ী ব'সে রয়েছে। চাউতানের বন্ধুতা-—না, নিশ্চয়ই সে ভোলে নি। সে চাষা নয়।

(নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রান্তরালে বাক্সটী রাখিয়া)

এইখানে থাক, খোকামণি !—এই যাব, আর ফিরব !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ঃ—কোংলুনের গৃহ।

(কোংলুন ও চীঙীংএর প্রবেশ)

কোং। ......না, আর কিছু দরকার আছে তোমার আমার এখানে চীঙীং ?

চী। বাড়ী এসে বসেছেন, আর তো দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাই একবারটী নমস্কার করতেই আসা গেল।

কোং। খবর সব বেশ ভাল তো ? ওঃ, বহুদিন ওদিকে যাই নি।

চী। কই আর ভালো ! সেদিন আর নেই মশাই। টৌঙাঙ্কোর দাপটে একদম সব অদল বদল হ'য়ে গিয়েছে।

কোং। রাজা কি আজকাল খুব ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

চী। আপনি ভুলে যান, দেখ্‌তে পাই ! ইএঙ্কুনের সময়েও খারাপ লোকের অভাব ছিল না, আর এ ত লিঙ্‌কোং। মন্দ যে, সে, ঈশ্বরের পাশ কাটিয়ে চলে।

কোং। জানি চীঙীং, সব বুঝি ; চাউতানের দুরদৃষ্ট আমার অজানা নয়। হায়, একটা বিস্তীর্ণ বংশ লুপ্ত হ'য়ে গেল।

চী। রাজা ঘুমুতে পারেন,—পুণ্য তা পারেন না। আপনার চোখে অশ্রু দেখছি, আর অবিশ্বাস করি না—দয়া ক'রে' চাউএর ভিটার প্রদীপটুকু রক্ষা করুন।

কোং। কি বল্‌ছ পাগল ?—গুছিয়ে সোজা ক'রে বল। অত বড় সংসারটা,—রক্তের নীচে তাদের কবর হ'য়ে গেল,—কেউ আছে কি বল্‌তে পার ?—চীঙীং—!

চী। দেখ্‌ছি শেষটুকুই জান্তে পান নি। আমি সরিয়েছি—না, না, আমি পারি নি,—হ্যাঁ আমি লুকিয়েছি ; পায়ে ধরি—চুপ করুন। ঐ শুন্‌বে—এক্ষুনি ঘস্‌ড়িয়ে টেনে নিয়ে গিয়েই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে। শেষ—সর্ব্বশেষ বেঁচেছে সেই শিশু ;—হামাগুড়ি দিতে জানে না, এত ছোট্ট সে—

কোং। স্থির হও। কোথায় রেখে এসেছ তা'কে ?

চী। রাজকন্যা মরে গেল। ব'লে গেল, এ-কে বাঁচিও চীঙীং, নইলে একটা ব্যর্থ প্রতিহিংসা হা-হা ক'রে আকাশে আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। ছেলে-টাকে নিয়ে বের হচ্ছিলুম, হাঙ্কুয়া ধ'রে ফেললে। শেষে নিজে আত্মহত্যা ক'রে আমায় ছেড়ে দিলে। আমি জানি আপনিই এদের আসল বন্ধু ছিলেন ;—তাই, আপনার চরণেই আশ্রয় নিয়েছি।

কোং। ছেলে কোথায়, উত্তর দাও।

চী। সে—সে,—আচ্ছা, আমি তা'কে নিয়ে আসি।

কোং। ঘাবড়াচ্ছ কেন? যাও, নিয়ে এস।

চী। না, যাই, এই চল্লুম। ঈশ্বর! তোমারই এই মানুষ! এতক্ষণ হয় তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

(প্রস্থান)

কোং। তোমায় প্রশংসা করতুম চীঙীং!—লাভ নেই; আর তা তুমি চাও-ও না। আশ্চর্য্য সৃষ্টি এই চৌঙাঙ্কৌ! মোহপাশের মতো, মহা পাপের মতো—উৎকট, আর কদাকার! ছিঃ, জনসমাজে কেন জন্মেছিলি!

(চীঙীংএর প্রত্যাবর্ত্তন)

চী। না, সে কথা শুনিয়েই যাই। সয়তান মন্ত্রী হুকুম জারি করেছে—

কোং। ও!—জানি। সব জানি!

চী। জানেন তবে। আপনি বলুন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছেলেটাকে আপনার কাছে দিয়ে যাই। এ দিকের ঋণ থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি অন্য কাজে যেতে পারি। খোকার অত-বড়ই আমার নিজেরও এক খোকা আছে। চাউদের বংশ রাখ্‌বার জন্যে আমি তা'কে বলি দেবো। নিরীহ শিশুদের বাঁচাবার জন্যে, ছেলের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটাও এগিয়ে দেবো;—খোকাকে লুকিয়ে, যান, চৌঙাঙ্কৌকে খবর পাঠান, চাউপুত্রকে আমি লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু শতবার পায়ে পড়ি আমি আপনার, দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই পুণ্যের,—চাউ-কুমারকে বড় করবার ভার আপনার;—তাকে দিয়ে নিহত বংশের প্রতিশোধ তুল্‌তে আপনিই রইলেন।—বলুন, স্বীকার করুন।

কোং। তোমার বয়স?

চী। ৪৫এর এদিকে নয়।

কোং। তবে বোঝো। এখনও কুড়ি-টী বছর চাই তোমার, এ ছেলেকে দিয়ে প্রতিশোধ তুলতে। আমার বয়স তখন হবে ৯০; সে বয়সে কিছু করা আমায় দিয়ে সম্ভব মনে কর?—ক্ষেপেছ?—শোন, ছেলে দিতে চাইছ তুমি ত, বেশ, নিয়ে এস তা'কে এখানে আমার এই বাড়ীতে। আমাকে ধরিয়ে দাও, তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি চরম শান্তি লাভ করি;—এদিকে তুমি চাউ-সন্ততিকে পালন ক'রে মানুষ ক'রে তোলো। সুন্দর এই অবসর, এই সুযোগ। আর, ৬৫, সে ৯০এর চেয়ে ঢের যুবা; নয় কি, চিঙীং?

চী। তা হোক, কৃতজ্ঞতার এত বেশী মূল্য আপনি দেবেন না, প্রভু,—আমাকেই ধরিয়ে দিন।

কোং। মরা একটা বেশী কিছু নয়, বন্ধু,—ভেবে দেখ, কী গুরুতর কর্ত্তব্যে তোমায় নিয়োজিত ক'রে গেলুম। যাক্—বাধা দিওনা; আমি যা মনে করি, তা' করিই। ভবিষ্যৎ-বাণী করছি চীঙীং, মনে রেখো, ২০ বছর পরে আমাদের এই প্রতিহিংসার বিজয়দুন্দুভি ঠিক—ঠিক বেজে উঠ্‌বে। আর, এ শরীরে, অত সুদীর্ঘ পরমায়ু আমার, আশা করছ কি ক'রে, ভাই!

(চীঙীং রুদ্ধশ্বাসে নীরব)

কোংলুনকে আসমুদ্র-পৃথিবীতে বিখ্যাত করেছিলুম, এ গর্ব্ব আমি করতে পারি। তা'র সব্বাই জানে, কী ছিলুম! নিয়তির ঝড়ে, একেবারে ভেঙে পড়েছি চীঙীং,—কি করব? এখন যা' এ দেখ্‌ছ—খালি মলাট; এর আসল আসল সব পাতাগুলো ঝড়ে ছিঁড়ে উড়ে গিয়েছে।—যা'ক্,—

(দীর্ঘশ্বাস)

যা' বলি, পালন কর। এখনও যেটুকু পারি তা থেকে নিজেকে জুয়োচুরি ক'রে ছিনিয়ে সরিয়ে নেব না।

চী। ঈশ্বর! একটি সুমহান্ আত্মা তোমার করুণার শান্তি-ছায়ায় নীরবে তোমাতে ম'জে ছিল, নির্ব্বোধের মতো এখানে এসে আমি এ কী কল্লু'ম!

কোং। চুপ কর উন্মাদ! সত্তর আর কত এগুত? দুদিনের আগু পিছুতে আমার ভারী ব'য়ে যাচ্ছে!

চী। ভাবুন, ভেবে দেখুন আর একটী বার, কি সাজ্যাতিক উত্তর দেবার জন্যে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই কাজ আপনি তুলে নিলেন!

কোং। ভুলে যাচ্ছ কোংলুনকে চীঙীং! বাতুল! তা'কে কি প্রতিজ্ঞা বল, যা সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ভিতরে কাজ আরম্ভ না করে?

চী। যাই হোক্, ছেলেটাকে বাঁচানই চাই। কিন্তু

আপনি বেশ জানেন, সে দুর্দ্দান্ত কি ভীষণ;—তা'র অত্যাচার সহ্য করতে পারবেন? সওয়াল জবাবের বেলা, যদি কোনরূপে আমার নাম প্রকাশ হ'য়ে পড়ে—সব মাটি হবে, সবাই নিপাত যাব, কোনো কাজই হবে না।

কোং। না বুঝে প্রতিজ্ঞা করাই আমার চির রোগ; ভাবি, পরে। যতই বিপদ দেখি, ততই তাকে পা'র তলায় চেপে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চল্‌তে থাকি। এই ক'রে সাড়ে তিন কুড়ি বছর গেল;—আজ দুটো 'বুড়ো গাধা' 'সাদা চুলো সয়তান' সম্বোধনে পিছু লাফ্ দিয়ে অপঘাতে আত্মহত্যা কর্‌ব?—ছোঃ! কিছু চিন্তা করতে হবে না,—কর্ত্তব্য ক'রে যাও, বৃদ্ধের নীতিবাক্যই এই।

চৌ। তবে আর সময় নেই দেবতা। পুত্রদের নিয়ে আসি। পৃথিবীতে আমি না তুমি,—কে মানুষ, তার বিচার একদিন হবেই; তুমি জিতে আমাদের জিতিয়ে নেবে, এ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।

(নতজানু ও প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—টৌঙাঙ্কোর প্রাসাদ।

(পার্শ্বচর সহ টৌঙাঙ্কোর প্রবেশ)

টৌ। হাতছাড়া হ'য়ে পালালই শেষটায়! টৌঙাঙ্কো?—সে আগুন জ্বালায়। তা' দিয়ে মহাসমুদ্র সৃষ্টি করে। পৃথিবীকে পুড়িয়ে, সাদা ছাই তৈরী ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে শূন্যে মুঠোয় মুঠোয় উড়িয়ে দিয়ে রগড় দেখে!—কাল-বৈশাখীর ভৈরবী শক্তিতে তা'র প্রতি-লোমকূপ অনুপ্রাণিত।—অথচ গোপন, অথচ নির্ব্বাক, মৌন সে। আর তিন দিন। আর তিন দিন। এর পরেই আমি শত্রুশূন্য হব। ছেলেটা যদি চাউদের একটা ছেলে মাত্রই হ'ত—ভাবতুম না। ওর মধ্যে বিরাট একটা সংসারের বিশাল প্রতিহিংসা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠছে। হতে দেওয়া হবে না, ছিনু রাজ্য শিশুশূন্য ক'রে আমি নিষ্কণ্টক হব।—কে?

(চৌঙীংএর প্রবেশ)

চৌ। (আপন মনে) ছোট সেই খাতাখানা। এক পৃষ্ঠাও লেখা হয়েছে কি না-হয়েছে, অমনি সেটা শেষ হয়ে গেল, বাস্! সে একখানা ক্ষুদ্র ইতিহাস; আমারি ছেলেটার।

(দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে)

কর্ত্তব্যের বরদান যাই হো'ক্, তা'র পূজা যে বড় মর্ম্মন্তুদ তাতে আর সন্দেহ নেই।

(চিন্তা ও দীর্ঘশ্বাস)

যা'ক্, রেখে এলুম তা'কে। এখন, স্থির হও আকাশ, শান্ত হও বায়ু, কোংলুনের জামায় আগুন লাগিয়ে দিই।

(প্রকাশ্যে)

কে তুমি সৈনিক, জানাও, আমি হারাণো ছেলের খবর পেয়ে এসেছি।

সৈ। সে কি! কে তুই সয়তান? ও, আপনি? দাঁড়ান।—হুজুর, ইনি কি বল্‌বেন।

টৌ। অ্যাঁ? কে?—কি?

চৌ। গরীব ভৈষজ্যজীবী। নাম আমার চৌঙীং। চুপ্ কর সৈনিক। ধর্ম্মাবতার, আমি চাউশিশুর উদ্দেশ পেয়েছি।

টৌ। কী, কী বল্‌ছ?—তা'র খবর এনেছ?—কোথায় সেই শত্রুর শেষ?

চৌ। বুড়ো কোংলুন—!—আঃ, চুপ্ কর সৈনিক। লিউ-লিউ-তৈপীং যাঁর নাম শুনেছেন অবিশ্যি বোধ হয়। আর, কোংলুনকেও আপনি খুব ভালই চেনেন,—নয় কি?

টৌ। যাক্,—আচ্ছা,—কি ক'রে তুমি এ টের পেয়েছ?

চৌ। তিনি আমার পরিচিত। একটা পরামর্শ নেবার জন্যে সেদিন আমি তাঁর ওখানে যাই। তাঁর শোবার ঘরে একটি শিশুকে দেখ্‌তে পেয়ে ভাব্‌লুম, নিঃসন্তান বৃদ্ধের কে এ? এল কোত্থেকে? সন্দেহ হ'ল, এই সেই চাউদের ছেলেটা নয় তো! জিজ্ঞেস কর্‌লুম;—আর, অমনি তাঁর মুখশ্রী বিবর্ণ হয়ে উঠল, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীরবেই রইলেন তিনি।—সন্দেহ ঘনীভূত হ'ল—

টৌ। নিকালো সয়তান্!—এ শত্রুতা তোমার! কোংলুনকে আমি খুব ভালো জানি।—না-না, সত্যি বল, নইলে মনে রেখো, তুমি আর জীবন্ত থাকবে না।

চৌ। রাগুন! আমি বল্‌ব,—সত্যিই বল্‌ব।

কোংলুনের সঙ্গে আমার কেন, কা'রো কোনো শত্রুতা নেই। তবুও এলুম,—কর্ত্তব্যের দায়ে। তারপরে আমার স্বার্থ রয়েছে, এ-তে। আমি নিঃসন্তান নই। সমগ্র রাজ্যের শিশুগুলির হত্যার আর্ত্তনাদ আমি কল্পনা ক'রে শিউরে উঠেছি।—পারি নি আমাকে সম্বরণ করতে।—ছুটে এসেছি—ছুটে এসেছি প্রভু! হয় তো সে হতভাগা আপনার কাছে এক দিন বে'র হ'য়ে পড়্বেই, কিন্তু, আজ আমার যা' ক্ষতি হ'য়ে যাবে, পৃথিবী-সমুদ্র ওলট্‌ পালট্‌ ক'রেও তা আর পূরণ কর্ত্তে পারব না।

টৌ। (সোল্লাসে) ঠিক, তোমার অনুমান ঠিকই চীঙীং। হাঁ, সে একদিন চাউতান কুকুরেরই বন্ধু ছিল বটে, মনে পড়ে গেল।

(পারিপার্শ্বিকের প্রতি)

সৈন্য;—কোংলুন না পালায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য :—কোংলুনের আশ্রম।

(কোংলুনের প্রবেশ)

কোং। বেঁচেও পারতুম। তবু মরছি। কৈফিয়ৎ? —নাই! আমি স্বাধীন জীব। সে, কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না। তা'র উদ্দেশ্য রহস্যময়ই থাকুক। ধুলো উড়ছে, না?—ব্যস্,—এল। হাঁ, প্রস্তুত। মৃত্যু! চিরদিবসের মতো আমি তোমায় উপহাসই করি।

(সৈন্য সহ টৌঙাক্কো ও চীঙীংএর প্রবেশ)

টৌ। এই বাড়ী, চীঙীং?

চী। এই বাড়ী।

টৌ। এই যে তুমি সেই ধূর্ত্ত গাধা কোংলুন। কোংলুন, তোমার সাহস ও স্পর্দ্ধা হাস্যোদ্দীপক।

কোং। (স্বগতঃ) অভিনয় করতে হবে। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌ছেন আপনি, সচিব!

টৌ। সুন্দর পছন্দ এই বুড়ো শেয়ালটার!—রাজ-প্রতাপকে ঠেলে ফেলে মরা চাউতানের বন্ধুতাকে সম্মান দিয়েছে। প্রেতলোকে সে তোমায় এর প্রতিদান দেবে, নিও। কেন তুমি চাউছোর শিশুটিকে লুকিয়েছ মর্কট? —জবাব দাও।

কোং। কি বল্‌ছেন প্রভু? আমি ঘাড়ের উপর একটা মাথা নিয়েই ঘর করি।

টৌ। স্তব্ধ হও ভণ্ড!—এই তুমিই স্বীকার কর্ব্বে জানি, কিন্তু সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয় না।

(সৈন্যের প্রতি)

চাবুক।

(শাস্তি চলিতে লাগিল)

কোং। হে ধর্ম্ম—হে ধর্ম্ম—বিনা প্রমাণে শাস্তিলাভ করি সাক্ষী হও। হে আকাশ—হে মৃত্তিকা—মহাপ্রলয়ের দিনে ইশাদী তোমরাই, দেখ, বিনা বিচারে আমার শাস্তি হয়।

টৌ। চীঙীং মিথ্যা বলেছে?—বিনা প্রমাণে!

কোং। চীং—ইং?—তুমি!—রাজসচিব, ওর কথা আপনি শুনেচেন!—ও দুনিয়ায় একটি অদ্ভুত চিজ্। আর, এত পিপাসা আপনার মন্ত্রী মহাশয়, যে, তিন শত ব্যক্তির রক্তেও তা নিবারিত হয় নি, এই কচি প্রাণটা—

টৌ। মুখ বন্ধ কর চাষা, শুন্‌তে আসি নি তোমার ঐ উন্মত্তের প্রলাপ—মুমূর্ষুর বিকার-উক্তি। লুকিয়েছ ঠিক্। বাঁচবার আশা থাকে, বে'র কর, ছেলে চাইই আমি।

কোং। না-না, আমি জানিনে, লুকুই নি, কেউ দেখেনি, কাউকে বলিনি,—যে খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা রটিয়েছে।

টৌ। তবুও!—চাবুক—খুব জোরে চাবুক!—বল কি না দেখ্‌ছি।

(শাস্তি)

চীঙীং, তুমি অভিযোগ করেছ, তুমিই ঐ পাকা মেড়াকে চাবুকে স্বীকার করাও।

চী। বৈদ্যকে এ আদেশ দেবেন না প্রভু; সে, লাঠি নয়, ঔষধ প্রয়োগই শিখে এসেছে এতদিন।

টৌ। চীঙীং কোংলুনকে ভয় কর? তবে ওকে ধরিয়ে দেবার এত সখ হয়েছিল কেন? টৌঙাক্কোর পরিচয় অতি সহজ চীঙীং!

চী। (স্বগত) শেষটায় এও হবে! নিরুপায় আমি; সামনে কর্ত্তব্য; অনেক এগিয়েছি, আর ফির্‌বার জো নেই।

(প্রকাশ্যে)

—কি করব বলুন!

(যষ্টি গ্রহণ)

টৌ। ওতে হবে না, শক্তখানা ন্যাও—বড় দেখে। আমি বল্‌ছি, কোনো ভয় নেই তোমার।

চী। এবার?—

(মুগুর গ্রহণ)

টৌ। কী আরম্ভ করেছ এ? ঐ মুগুরের এক আঘাতও কি সহ্য করতে পারবে ঐ জীর্ণ সয়তান?—কা'কে স্বীকার করাবে তা হ'লে?

চী। তবে করতে বলেন কি আমায়?

টৌ। না-ম'রে-না-ম'রে অনুভব করবে এবং টৌঙা-ঙ্কোকে ভালো ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুঝবে—এই আমি চাই। বুড়ো গাধা, আমি টৌঙাঙ্কো।

চী। (স্বগত) আকাশের দেবতা তাঁ'কে দয়া করুক। (প্রকাশ্যে) কোংলুন! দোষ মেনে, ছেলে দিয়ে ক্ষমা নেওয়াই কর্ত্তব্য; এ খামকা কষ্ট পাচ্ছ।

(শাস্তি)

কোং। (মুদ্রিত নেত্রে স্বগতঃ) ছিঁড়ে গেল, ছিঁড়ে গেল, বৃদ্ধ জীবনের শিথিল গ্রন্থিগুলি, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে' খুলে খুলে যাচ্ছে। এ শেষ ভবিষ্যৎ—অন্তিম নিয়তির জন্য আজীবন প্রতীক্ষা ক'রে ছিলুম!—না না, কর্ত্তব্য যেন না হারাই;—অভিনয়ই সম্পূর্ণ হোক্! (প্রকাশ্যে) কে তুমি আমার পেছনে লেগেছ?

টৌ। চীঙীংকে তুমি খুব ভালো করেই জানো বোধ করি।

কোং। কী—! (চক্ষুরুন্মীলন) চীঙীং!—সুন্দর!

(বসিয়া পড়িল)

চী। শুন্‌বেন না প্রভু, এ সব বজ্জাতি।

কোং। কী শত্রুতা ছিল, কী করেছিল এ বৃদ্ধ তোমার চীঙীং, যে, তুমি—

চী। ফুরসৎ নেই, শীঘ্র বল, তুমি স্বীকার কর।

কোং। করতেই হবে সব—! তবে স্বীকার করি।

চী। হাঁ প্রাণ মহার্ঘ; তা'কে বাঁচাও,—স্বীকার কর—কর!

কোং। টৌঙাঙ্কো, স্বীকারই যখন করছি, তখন বলি, আমরা দুজনেই লিপ্ত।

টৌ। ধন্যবাদ দিই তোমায়। জীবন মঞ্জুর করব, সত্য বল তোমার অন্য সাথী কে?

কোং। বল্‌ব? না, সে আর কি ক'রে বলি?

টৌ। ইতস্ততই করছ তবু?

চী। বুড়ো শকুন, আঃ, কী সব সুরু করে দিয়েছ? সে সম্পূর্ণ নিরীহ।

কোং। আমি কোংলুন চীঙীং! আমায় কারো ভয় নেই, মনে রেখো।

টৌ। কে দুইজন?—পাজি! বল না!—একি!

কোং। চূড়ান্ত শাস্তিতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ, দেখ্‌ছ না টৌঙাঙ্কো সাহেব! সবুর—সবুর!

টৌ খালি বাজে সময় নষ্ট। নাঃ, ও হবে না। তোমার শাস্তি মৃত্যু। মেরে ফেলে দাও গাধাটাকে।

সৈন্য। জয়—জয়—জয় প্রভু! খুঁজে খুঁজে আপনার কুঠুরীটাতে সেই ভয়ঙ্কর ছেলেটার পাত্তা হয়েছে।

টৌ। (লম্ফে) বটে!—এই সে! —বাঃ!—নিয়ে আয়্‌ত সয়তানের বাচ্চাটাকে দেখি। ওর গরম গরম তাজা রক্ত দিয়ে, আমার জুতো জোড়াটা থেকে মাথার টুপীটা পর্য্যন্ত লাল রঙে রাঙিয়ে খুসী হই! ভণ্ড ষাঁড়! এখন এ কী দেখ্‌ছ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে?—বলেছিলে কি? বা—, বাহবা—তোফা, তোফা—এই এক, দুই,—তিন্—

(ভুজালী দ্বারা শিশুর হৃদয়ে তিনবার আঘাত)

চমৎকার, শেষ!

(চীঙীং এই সময় দুই হাতে সবলে স্বীয় বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রহিল)

কোং। টৌঙাঙ্কো! চণ্ডাল! অদ্ভুত প্রেত তুমি; কিন্তু সাবধান সয়তান মনে রাখো, কালো পাতায় অগ্নি-বর্ণের কালীতে পাপ লেখা প'ড়ে গেল তোমার। ক্ষমা নেই তোমার, মার্জ্জনাও নেই। বাঁচবার আশা রেখে একাজে হাত দিইনি, তাও বলে রাখি। পথ বেছে নিইছি নিজেই,—বসো, আসি।

সৈন্য। কোংলুন আত্মহত্যা ক'রে প'ড়ে গেল।

টৌ। রসাতলে যা'ক্ সে, মরুক। শুনিনা তা'র কোনো কথা আর। খুব করেছ চীঙীং তুমি আমার, চল্‌তই না কিছুতে তুমি না হলে।

চী। পূর্ব্বেই বলেছি দয়াময়, কারো সঙ্গে শত্রুতায় আমি এ কাজে হাত দিই নি। রাজ্যের ছেলেগুলোকে, আর, আমার নিজের বাছাকে বাঁচাবার জন্যেই আমার এত চেষ্টা।

টৌ। বিশ্বস্ত বন্ধু তুমি চীঙীং, এস, আমার বাড়ীতে তোমার স্থান। আমার প্রতি সম্মান—তোমার। ছেলেকেও নিয়ে চল। সে লেখাপড়া শিখ্‌বে। যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হবে। এ বয়সেও আমি অপুত্রক কি না, তাকেই পোষ্য গ্রহণ ক'রে আমার পদে প্রতিষ্ঠিত করব ;—চল!

চী। অযোগ্যের প্রতি আপনার এ অনুগ্রহে আমি কৃতজ্ঞ ; হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিই আপনাকে।

টৌ। চুপ্। চলে এস। আমি এখন বড় ঠিক নেই। একটা ভীষণ ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—টৌঙাঙ্কোর প্রাসাদ।

(টৌঙাঙ্কোর প্রবেশ)

টৌ। চাউদের শেষ শিখা নিভিয়ে দিয়েছি—আজ কুড়ি বছর। চীঙীং ছেলে দিয়েছে। নাম রেখেছি, টৌচিঙ্। সে শিখ্‌ছে। যুদ্ধের আঠারো রকম কৌশলেই সে এমন সুদক্ষ হয়ে উঠেছে, আমার নীচেই সে এখন। সুন্দর বড় হ'য়ে পড়েছে এরই ভিতরে। হাঁ, লিঙ্‌কোংকে সরাতেই হবে ; সিংহাসন আমারই। আর, টৌচিঙ্‌কে তা' স্বেচ্ছায় অবলীলাক্রমে দান ক'রে সুখী হব, অভিপ্রায় করেছি। এ নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ আমার। কে ওল্টাবে? টৌচিঙ্ বুঝি এখন লেখাপড়ায় ব্যস্ত। আচ্ছা ফিরে আসুক ; সে সব সবুরে হবে।

(প্রস্থান। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যদিক দিয়া এক বাণ্ডিল কাগজ হস্তে চীঙীংএর প্রবেশ)

চী। কেমন টুক্ ক'রে সময় চ'লে যায়! টৌঙাঙ্কো এই কুড়ি বছর ছেলেটাকে ভারী আদর করে' শিখিয়ে পড়িয়ে বাড়িয়ে তুল্‌ছে। আসল ঢাকা পড়ে আছে, এ সেও জানে না, ওও জানে না। বুড়ো হয়ে এলুম, যদি মরি, সব নষ্ট হবে! মুস্কিল! আগাগোড়া সকল ব্যাপার এই কাগজে আমি আঁকিয়েছি ; দেখে সে যখন নিশ্চয় পুছ্‌বে—সব খুলে বল্‌ব তা'কে আজ। পারে না সে প্রতিহিংসা ভুল্‌তে, যদি শোনে,—ঠিক ভুল্‌বে না। পাঠ-মন্দিরে গিয়ে একটু প্রতীক্ষা ক'রে বসি।—হাঁ।

(প্রস্থান। কিয়ৎকাল পরে অন্যদিক দিয়া রক্ষীবেষ্টিত টৌচিঙ্ নামধারী চিংপৈর প্রবেশ)

চীং। ঘোড়া নিয়ে যা—বাবা কোথায়?

সৈন্য। তিনি পড়্‌ছেন।

চিং। বল্, আমি এসেছি।

সৈন্য। (প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশান্তর) আসুন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—পাঠ-মন্দির।

(চীঙীং)

চী। কত দামী জিনিস সঙ্গে ক'রে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছ তুমি চাউ-পরিবার! আমার একমাত্র সন্তান—হোঃ—সে কথা আর না, এখন দেখি ধুঁয়োর নীচে আগুন কতটুকু আছে।

(চিংপৈর প্রবেশ)

চিং। এইমাত্র এসে পৌঁছেছি বাবা!

চী। খাবার খেয়ে এস গিয়ে, যাও।

চিং। বাবা! রোজ ফিরে এসে আপনাকে ভারী খুসী-খুসী দেখি, আজ আপনার স্বর দুঃখপূর্ণ, চক্ষু অশ্রুবহ—কী এ? কোথাও কি কিছু অবমান পেয়েছেন?—বলুন!

চী। তা'র উৎস যে কোথায়—তা' বল্‌তুম এবং বল্‌বও। যাও আগে খাবার খেয়ে এস।

(চিংপৈর প্রস্থান)

আর পারিনা—

(দীর্ঘশ্বাস)

এইবার শেষের আদ্যারম্ভ। হৃদয়—ওরে হৃদয়! আমি তোমায় জানি।

(অঙ্গুলী দ্বারা বক্ষে আঘাত)

চৌঙাকেও ! ঈর্ষায় ঈর্ষায় একটা অস্বাভাবিক দুর্গন্ধের মতো হয়ে উঠেছ তুমি। দানবী পাপের জমানো বরফও তোমার ন্যায় আরক্ত উত্তপ্ত নয়। তুমি, কি?—তুমি, কি?

(চিংপৈর পুনঃ প্রবেশ)

চিং। না, আপনি বলুন, কে আপনার অবমান করেছে?—আমি কেমন একটা অশান্তি ভোগ করছি;—বলুন!

চী। আসছি এক্ষুনি, এসে বল্‌ছি সব, বস বৎস।

(প্রস্থান)

চীং। বাণ্ডিলটাতে কি আছে! ছবি। এ কি ছবি সব!

(খুলিয়া দেয়ালে রক্ষা)

কী—কী ছবি এ সব—! রক্ত-বস্ত্র প'রে কে ঐ লোকটি কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে কালো পোষাকপরা ভদ্রলোকটীর দিকে? কে এ? টৌঙাঙ্কৌ না? কুকুরটাকে মেরে ফেলে' এ-ই বা কে ভাঙ্গা চাকার গাড়ী ধ'রে রয়েছে? এ সবের মানে কি! কিচ্ছু লেখাও নেই যে। আবার, এ ভদ্রলোকটি কে?—রজ্জু, বিষাক্ত মদ্য, ভুজালী তাঁর সামনে;—কে—? ঈস, আত্মহত্যা ক'রে ফেল্লেন! ঐ যে বৈদ্যের পা'র তলায় নতজানু বিধবা মহিলা, ছেলে কোলে,—এ কেন? —কি প্রহেলিকা! ইনিও আত্মহত্যা কল্লেন!—উঃ! যা'ক্,—সমস্ত ঘটনার মূল কে শুনতেই হয়েছে আমার।

(চৌঙীংএর প্রত্যাবর্ত্তন)

চী। পুত্র, আপন মনে কি ব'কে যাচ্ছ?

চিং। দয়া করে বলুন পিতা, কি এ সমস্ত ছবিতে? আমি ভারী ব্যগ্র হয়েছি।

চী। বলি। শোনো। এই ঐতিহাসিক ছবির সঙ্গে তোমার সমগ্র জীবন ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ রয়েছে,—শোনো। রক্তবস্ত্র পুরুষটীকে দেখ্‌ছ, ঐ? ও একজন যোদ্ধা।

(ইত্যাদি পূর্ব্ব ঘটনা বর্ণন)

চিং। (নীরব। নানাভাবে প্রবুদ্ধ)

চী। ক্ষুধিত হিংসা এবার শুষ্ককণ্ঠে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠল। রক্ত চাই—মাংস চাই, এ চীৎকার কত ভীষণ! সম্মুখে যা'-যা' পড়ল, সব ফেটে চুরমার হয়ে গেল; প্রলয়ের পর প্রলয়,—প্রলয়ের পর প্রলয়,—সে কি শুনবে? শুন্‌তেই চাও কি?—বিপুল পরিবার,—উড়ে গেল! নক্ষত্রসমষ্টি ভেঙ্গে ছিঁড়ে পড়ল! রইল, না—সে কথা থা'ক্। হাঙ্কুয়া কোংলুন আত্মদান ক'রে তা'কে রেখেছে; সে ঘুমাক্। শান্তিতে আছে সে,—না, সে ঘুম তার ভেঙ্গে কাজ নেই।

চিং। না-না, বলুন—'চৌঙীং' কে?—আপনিই কি?

চী। কত চৌঙীং আছে!

চিং। আছে। কিন্তু, এমন চৌঙীং? এ কি মানুষ?—মানুষের সংজ্ঞা কি, পিতা?

চী। সংজ্ঞা নাই—সংজ্ঞা নাই—তা'র হৃদয়ই নাই যখন, তখন কী আছে তা'র? এক কড়ার বিশ্বাস করি না তা'কে! বিকট, জঘন্য সে!—জ্বলন্ত অদ্ভুত!

চিং। আপনি বলুন, খুলে বলুন, আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছি; কি ক'রে ফেল্‌ব এখুনি, সাবধান! বলুন, কোথায় সেই ছেলে?

চী। না-ই! সে ছেলে নাই, সে ছেলে নাই! অথচ সে ছেলে আছেই! কুড়ি হ'ল বয়স তা'র, পুরো চার হাত উঁচু সে, লেখা পড়ায় পণ্ডিত, শাস্ত্রবিজ্ঞানে সুনিপুণ,—আর, তা'র মা, বাপ, ভরা সংসারের সবখানি নিষ্ঠুর হত্যা-মৃত্যুতে একেবারে বিলুপ্ত;—জড়, কাঠের পুতুল সে সন্তান, চিংপৈ!—তবু সে আছেই?—আছে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, ম'রে, প'চে আছে।—ইস্, অপমানিত বংশ, উৎসাদিত পূর্ব্বপুরুষ,—আর, দগ্ধভাগ্য সেই সন্তানের, সে আত্মবিস্মৃত, পরানুগৃহীত। চিংপৈ! চিং! সে মহা হত্যার প্রতিশোধ এখনো বাকী আছে। কাজ নেই তা'র স্বাভাবিক অবস্থাতে থেকে;—সে পুত্র ক্ষেপে খুনে ডাকাতের দলের মতো দপ্‌ ক'রে একেবারে জ্ব'লে উঠ্‌ক্! হত্যায় হত্যায়, সংহারে ধ্বংসে মহাপ্রলয়ের তুমুল ঝটিকা তু'লে দিক্! পাহাড়ে সাগরে ঠোকাঠুকি লেগে চীন্ সাম্রাজ্য গুঁড়োগুঁড়ো হ'য়ে যা'ক্! শত্রুর রক্ত দিয়ে এই পটের প্রতিমূর্ত্তির ঠোঁটে ঠোঁটে হাসি আঁকিয়ে দেখাক্!—তবেই কর্ত্তব্য তা'র চরিতার্থ;—তবেই পুত্র সে পিতার!

চিং। শরীরে বিদ্যুৎঝঞ্ঝনা অনুভব করছি পিতা, স্পষ্ট বলুন,—কা'কে লক্ষ্য করে এ কী বল্‌ছেন ?

চী। বুঝতে পার নি !—বুঝ্‌তে পার নি, কি বলছ পাগল ! টৌঙাঙ্কোকে জান না ? পিতামহ চাউ-তানের নাম শোন নি ?—পিতা চাউছো ?—মাতা রাজকন্যা ? ক্ষুদ্র টাঙীং ? সকলের চাইতে এই কথাটা বুঝতে পার নি কি, যে চিংপৈ, সেই চাউদের এক মাত্র বংশদুলাল, তিনশত পিপাসিত আত্মার পানীয় শোণিত দিবার জন্যে কেবল রয়েছ—তুমি—?—

চিং। কী ?—কী বল্‌ছেন ?

(বসিয়া পড়িল)

চী। ওঠো ! জাগো ! প্রবুদ্ধ হও !—ভুলো না তোমার প্রতিহিংসা রয়েছে। ওঠো ! জাগো ! প্রবুদ্ধ হও! শোনো, প্রেত-আত্মা-সমূহ ঐ অনবরত ডাকে, তোমারেই ! ওঠো ! জাগো ! প্রবুদ্ধ হও !—

চিং। (প্রতি উচ্চারণে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল) আজ—নূতন নহে; সত্য-জীবনের সম্ভোগ আরম্ভ আমার। বাক্যব্যয় নিষ্ফল। আমি আপনাকে প্রণাম করি।

(নতজানু হইয়া সম্মান প্রদান)

চী। মনে রেখো, তুমিই শেষ—আর নেই। মরবার ক্ষমতাও রইল না তোমার, যতদিন না প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হবে। বৎস ! প্রতিপদে তোমার নিজের দিকে চেয়ে দেখো, নিজেকে স্মরণ রেখো !

চিং। যখন জেগেছি, নিজেকে চিনেছি, তখন আর আমায় অবিশ্বাস করি না।—আসি।

প্রস্থান)

চী। আগে সরকারী আইন লঙ্ঘন না ক'রে দেখো, চিংপৈ !—না, অনুসরণ করি,—ও একলাটী,—যদি প্রয়োজন হয় !

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্যঃ—রাজবর্ত্ম।

(চিংপৈর প্রবেশ)

চিং। সুন্দর নিশ্চিন্ত রয়েছে পাপী টৌঙাঙ্কো

টৌঙাঙ্কো ! আজ চাউ-প্রেত-আত্মাদের আহ্বান। এই—এই সে। আশ্চর্য্য পাপী !

(রক্ষী সহ টৌঙাঙ্কোর প্রবেশ)

টৌ। (স্বগত) তবু, কাজ !. শেষ নেই। বিশ্রাম নেই !—তবে এ কী করলুম সব ! না, মিথ্যা এ দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। টৌচিং আমায় বিরাম দিক্‌। দেখি।

চিং। সয়তান !

টৌ। কে ? টৌচিং। তুমি যে এখানে, পুত্র !

চিং। পুত্র— ? তুমি কা'কে পুত্র বলছ ? কুড়ি বছর পূর্ব্বে চাউদের প্রতি তোমার ব্যবহার স্মরণ কর। আমি পুত্রই—হাঁ, চাউছোর। সুখী হ'লুম, তুমি এত শীঘ্র আপনা হ'তেই আমার প্রতিহিংসার কবলে এসে পড়েছ।

টৌ। কে তোমায় আমার বিরুদ্ধে এতখানি বিষাক্ত ক'রে তুলেছে টৌচিং !—এ মিথ্যা রচনা।

চিং। চুপ কর পিশাচ ! সত্যকে চিরকাল চেপে চেপে চল্‌বে, এতই বলশালী তুমি— ! —ফুঃ !

টৌ। (ভ্রূকুটি পূর্ব্বক) অকৃতজ্ঞ !—

(প্রস্থানোন্মুখ)

চিং ! দাঁড়াও ! তুমি বন্দী।

(টাঙীংএর প্রবেশ)

চী। ধন্য ভগবানকে, যে, টৌঙাঙ্কো, তুমি স্বচ্ছন্দে ধরা পড়েছ। আগুনকে চাপ্‌তে চাও ?—অত্যদ্ভুত খেয়ালী !—আগুনে পুড়ে ছাই হয়—এ হবেই, যা'বে কোথা না হ'য়ে ? মানুষকে কি খুব বীর ঠাউরিয়ে রেখেছিলে টৌঙাঙ্কো ? সে যে সসীম ! মানবত্বের অপমান ও ব্যভিচারে, যখন ভাবি জিতে গেলুম, তখন অন্তর্যামী হাসেন—নিশ্চয়, এ নিশ্চয়।

চিং। রক্ষিগণ, এই রাজআজ্ঞা।

(প্রদর্শন)

এই আমার নির্দ্দিষ্ট শত্রু। আমার হুকুন, এ-কে হাতে পায়ে বেঁধে দরবারে নিয়ে যাও। আর, আসুন, বৈদ্যরাজ !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য :—দরবারের পার্শ্ববর্ত্তী বিচার-মণ্ডপ।

(য়ৈফঙ্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

য়ৈ। ধর্ম্মশাস্ত্র বলে—পাপ একটি অনন্ত ফলন্তগাছের ফল। সে বাড়ে; কেবলই বড় হতে থাকে। কিন্তু দৈ দিন পাকে, বোঁটাও নরম হয়, ধপ্ ক'রে প'ড়ে পৃথিবীকে নড়িয়ে দেয়—এতটা সাঙ্ঘাতিক!—টৌঙাঙ্কো ক্রমাগত উঠ্‌ছিল।—মূর্খ! প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলা, সে কি মুখের কথা? মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে। টেনে নামিয়ে আনে।—যা'ক্।

(চিংপৈ চীঙীং ও বন্দী টৌঙাঙ্কোর প্রবেশ)

চিং। রাজ-আজ্ঞা চিরজয়ী হউক।

(নতজানু)

য়ৈ। টৌঙাঙ্কো! তোমার বিচার হবে। বল্‌বার আছে কি তোমার কিছু?

টৌ। সাম্রাজ্য ও ছিনরাজের হিতার্থে আমি অনেক কাজ যা ভাল মনে করতুম তা'র অনুষ্ঠান করেছি। এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই।

য়ৈ। কোনো কথা রাজার আর শুনতে বাকী নেই টৌঙাঙ্কো। তোমার অপরাধ-সংক্রান্ত প্রচুর কাগজপত্র রাজদরবারে আলোচিত হয়ে গিয়েছে। তুমি আত্মসমর্থন করছ না। তবে শোনো। রাজ-আজ্ঞা—মৃত্যুদণ্ড;—তোমায় মরতে হবে।

টৌ। টৌঙাঙ্কোকে ভীত করবার মতন লোক প্রলয়েরও অনন্তকাল পরে জন্মাবে—আজ না। আমি বীর! মরণ আসে, আসুক—দাঁড়িয়ে মর্‌ব,—নিজের পা'র উপর দাঁড়িয়ে মর্‌ব। লোকে দেখ্‌বে—প্রকৃত বীরত্বের আশ্চর্য্য মহিমা।

য়ৈ। জালিয়াৎ! বীরত্বের বড়াই কর? তুমি লজ্জাহীন।

চিং। হুজুর আমরা সুবিচার চাই।

য়ৈ। ধূর্ত্ত টৌঙাঙ্কো! তুমি দাঁড়িয়ে মর্‌তে চেয়েছ। আচ্ছা, তাই হবে। প্রকাণ্ড রাজপথে, উচ্চ হত্যামঞ্চে তোমার বক্ষ অবধি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত আগুনে পুড়্‌বে;—এদিকে ক্ষুধিত বন্য কুকুর তোমার উপরের আধখানা শরীর ছিঁড়ে খাবে।—তবু মনে হচ্ছে, তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি মনুষ্য-মস্তিষ্কে আবিষ্কৃত হ'তেই পারে না;—এ যা' হ'ল, অতি লঘু—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

চী। বৎস আমার, এস, বিচার-আসনতলে প্রণত হই। রাজকন্যা—তোমার গর্ভধারিণী স্বর্গীয়া মাতার উদ্দেশে প্রণত হও। হাঙ্কুয়া ও কোংলুনের পবিত্র আত্মার স্মৃতিকে সম্মান দান কর!

(চিংপৈ তাহা করিল)

চিং। আর, বৈদ্যরত্ন চীঙীং, তুমি?

চী। চুপ্। আমার কত আনন্দ আজ, দেখ, সত্যের এক টুক্‌রা ক্ষুদ্র শক্তি, বৃহৎ অধর্ম্মের সঙ্গে প্রাণপণে ল'ড়ে—জিতেছে! এই জয়ই তো ধ্রুব। যাক্, প্রিয় চিংপৈ! তোমার প্রতিবিধিৎসা পূর্ণ হ'ল; তোমার নিহত বংশ আজ সম্পূর্ণ মনস্কাম! আমি—! না, আমি কিছু না। আবেগ ক্ষমা করো ঈশ্বর!

য়ৈ। সকলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ছিনরাজের ঘোষণা শ্রবণ কর। দুর্ব্বৃত্ত টৌঙাঙ্কোর আচরিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে হ'য়ে গেল। চিংপৈ, তুমি সরকার থেকে 'চাউভন্' উপাধি লাভ করেছ।

(চিংপৈ নতজানু)

তোমার পিতৃপিতামহের নাম সসম্মানে সরকারী কাগজপত্রে লেখা হ'য়ে রইল। হাঙ্কুয়া ও কোংলুনের আদর্শ আমরা শিক্ষার জন্য অনুমোদন করি, তাদের সমাধির উপর সরকারী খরচে সমুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হবে। চীঙীং, সরকার তোমায় নামমাত্র মূল্যে বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রদান করছেন।

(চীঙীং নতজানু)

রাজা স্বয়ং নিজ ক্ষতি তুচ্ছই মনে করেন;—অতএব এস, সকলে তাঁর পুণ্যোচ্চারণ করি।

(সকলের নতজানু হইয়া তথা করণ)

(যবনিকা)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাঁহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে বাদ্‌লিন পিয়েত্রী অর্সোর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সোর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।]

(১৪)

মৌতের গান গাহিয়া কলোঁবা ক্লান্ত ও বেদম হইয়া পড়িয়াছিল, কথা বলিবার শক্তিও তাহার অবশেষ ছিল না। তাহার দাদার কাঁধের উপর তাহার মাথা রাখিয়া দুই হাতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সে পথ চলিতেছিল। অর্সো যদিও ভগিনীর গানের ভাবে, কথায় ও ইঙ্গিতে অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে ভগিনীকে একটিও তিরস্কারের কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না। সে তাহার ভগিনীর এই উত্তেজনার অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া থাকিয়াই বাড়ী পৌঁছিল এবং দরজায় আসিয়া দরজায় ঘা দিল। সাভেরিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া ভয়পাংশুল মুখে বলিল—"ম্যাজিষ্টার সাহেব!" এই কথা শুনিয়াই কলোঁবা সোজা হইয়া দাঁড়াইল—নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া একখানা চেয়ারের পিঠের উপর হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইল—চেয়ারখানা তাহার হাতের তলে স্পষ্টই কম্পিত হইতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মামুলি ভদ্রতার বাঁধা গৎ আওড়াইয়া এমন অসময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসার জন্য গৃহস্থের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া কলোঁবাকে অনুযোগের ভাবে তীব্র আবেগের বিপদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলেন এবং মৃত্যুশোকের বিলাপ লইয়া এত বাড়াবাড়ি করার প্রথার নিন্দা করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, মানুষ মরে, সেই শোকই ত অসহ্য, তাহার উপর মৌত-গায়িকাদের গানের উত্তেজনা বাতাস দিয়া অগ্নি উদ্দীপনের ন্যায় বিষম অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। অবশেষে খুব সন্তর্পণে কলোঁবার শেষ গানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সম্বন্ধে সামান্য একটু অনুযোগ করিয়া সত্বর কথা পাল্টাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—রেবিয়া মশায়, আপনার সেই ইংরেজ বন্ধুরা আমায় আপনাকে প্রীতিসম্ভাষণ জানাতে বিশেষ করে' বলে' দিয়েছেন; মিস নেভিল আপনার ভগিনীকে বন্ধুত্বের শত শত সম্ভাষণ জানিয়েছেন, আর আপনার জন্যে একখানা চিঠিও দিয়েছেন।

অর্সো বলিয়া উঠিল – মিস নেভিল চিঠি দিয়েছেন?

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—দুর্ভাগ্যক্রমে সে চিঠি এখন আমার সঙ্গে নেই, কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা' পাবেন। তাঁর বাবার অসুখ করেছিল; আমাদের ভয় হয়েছিল হয়ত বা তাঁকে আমাদের দেশের কাল-

অরেই ধরল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভাগ্যে ভাগ্যে তাঁর বিপদ কেটে গেছে; এখন তিনি কেমন আছেন তা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন—তাঁরা বোধ হয় শিগ্‌গিরই এখানে আসছেন।

—মিস নেভিল খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন?

—ভাগ্যে ভাগ্যে বিপদ কেটে গেলে পরে তিনি বিপদের পরিমাণ টের পেয়েছিলেন। মিস নেভিলের মুখে আপনাদের ভাই বোনের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই।

অর্সো মাথা নত করিল।

—আপনাদের দুজনের ওপর তাঁর খুব টান। তাঁর বাহ্যিক ভাবটা একটু হাল্কা রকমের হলেও তার মধ্যে খুব একটি মহিমা আছে, আর তার অন্তরালে লুকানো আছে চমৎকার বুদ্ধি।

অর্সো বলিল—আঃ তা আর বলতে! সোনার মেয়ে! দেখলে চক্ষু জুড়োয়!

—আমি ত একরকম তাঁর অনুরোধেই এখানে এসেছি। যে সাংঘাতিক সম্ভাবনা এখানকার সকলের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে সে-সব কথা আপনার সামনে উল্লেখ করতে এখন আমি চাইনে। কিন্তু বারিসিনি সাহেব গাঁয়ের দারোগা আর আমি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট থাকতে সে রকম ভয়ের একটুও কারণ ত আমি দেখতে পাই না। আমি শুনেছি কতকগুলো মাথাপাগলা গুণ্ডাগোছের লোক আপনাকে নাচিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু আপনি বিরক্ত হয়ে সে-সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি সব শুনেছি—আপনার মতন লোকের এইই ত কর্ত্তব্য।

অর্সো চেয়ারের মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিল—কলোঁবা, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তুমি শুতে যাও।

কলোঁবা ঘাড় নাড়িল। সে তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভাব ধারণ করিয়া তাহার কৌতূহলী চোখদুটিতে একদৃষ্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতে লাগিলেন—বারিসিনি সাহেবের ইচ্ছে যে, এই রকম শত্রুতা ... অর্থাৎ কি না পরস্পরের প্রতি একটা যে অবিশ্বাসের ভাব আছে সেটা, আপোষে মিটিয়ে ফেলে।... আপোসে আপনাদের একটা মিটমাট হয়ে গেলে আমিও...

অর্সো কথার মাঝখানেই একটু ব্যথিত স্বরে বলিল—আমি বারিসিনি দারোগার উপর কখনো আমার বাবার খুন চাপাইনি। কিন্তু তবু তার সঙ্গে সদ্ভাব করা আমার কিছুতেই পোষাবে না। সে একটা গুণ্ডার নামে একখানা চিঠি জাল করেছিল—নিজে না জাল করুক, সেই জাল চিঠির দোষ আমার বাবার ঘাড়ে চাপিয়েছিল। সেই চিঠিই হয়ত আমার বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আপনার মতন লোকের এমন অন্ধ বিশ্বাস বড় দুঃখের কথা। ভেবে দেখুন, ওরকম চিঠি জাল করা বারিসিনির মতন লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমি তার চরিত্রের কথা বলছিনে..., যদিও আপনি তার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তবু আপনার মন তার বিরুদ্ধ হয়ে আছে... কিন্তু তার মতন একজন আইনজ্ঞ লোক...

অর্সো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দেখুন মশায়, একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবেন। সে চিঠি বারিসিনি জাল করেনি বললে আমার বাবাকেই জালিয়াত বলা হয়। তাঁর অসম্মানে আমারই অসম্মান!

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—কর্ণেল রেবিয়ার সততার পরিচয় আমার চেয়ে কেউ বোধ হয় বেশি জানে না।...কিন্তু ... সেই চিঠির জালিয়াত কে তা এখন জানা গেছে।

কলোঁবা ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে সরিয়া গিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল—কে সে?

—সে একটা মহা বদমায়েস পাজি লোক—তার সে বদমায়েসি আপনারা কর্সিকেরাও ক্ষমা করবেন না, সে চোর। তার নাম তোমাজো বিয়াঁশি। সে এখন বাস্তিয়ার জেলে আছে, সে স্বীকার করেছে যে সে-ই ঐ চিঠি জাল করেছিল।

অর্সো বলিল—সে কে? তাকে ত আমি চিনিনে। তার কোন্ দেশে বাড়ী?

কলোঁবা বলিল—সে এই দেশেরই লোক; আমাদের একজন পুরোণো কলুর ভাই। সে পাজি ত বটেই, অধিকন্তু মিথ্যাবাদী। তার কথা মনে হলেও রাগ হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতে লাগিল—আপনারা তার চিঠি জাল করার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছেন না বোধ হয়। যে কলুর কথা আপনার ভগিনী বল্লেম, তার নাম ছিল বোধ হয় থিয়োডোর; সে আপনার বাবার কাছে খাজনা করে' একটা কল জমা নিয়েছিল; সেই কলটা যে-জলের স্রোতে চল্‌ত, সেটার দখলস্বত্ব নিয়ে বারিসিনি আপনার বাবার সঙ্গে মকদ্দমা আরম্ভ করে। কর্ণেল খুব সাদা লোক ছিলেন, নাম মাত্র খাজনায় কলটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমাজো ভাবলে যে যদি কলটা বারিসিনিরা দখল করে তাহলে ত খাজনা ঢের বেড়ে যাবে, বারিসিনি ত আর ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়; তখন সে ঐ জাল চিঠি পাঠিয়ে বারিসিনিকে জব্দ করবার মতলব করলে। আপনি পুলিশ কমিশনরের এই চিঠিখানা পড়লেই সব ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

অর্সো চিঠি পড়িতে লাগিল; কলোঁবাও ভাইয়ের কাঁধের উপর দিয়া পড়িতে লগিল। চিঠিতে তোমাজোর জবানবন্দি বিস্তারিত ভাবে লেখা রহিয়াছে।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া কলোঁবা বলিয়া উঠিল—এ সব ওর্লান্দিকুসিয়ো বারিসিনির কারসাজি। সে মাসখানেক হ'ল, যেমন শুনেছে দাদা আসছে অমনি ছুটে বাস্তিয়াতে গিছল, সেই তোমাজোকে ঘুষ দিয়ে ভাপিয়ে ভুজিয়ে নিজে সাফাই হবার জন্যে এই কীর্ত্তিটি করেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া বলিল—আপনার দেখছি সকলতাতেই সন্দেহ? এমনি করে কি সত্যনির্ণয় হয়? মশায়, আপনি বলুন ত, আপনার ত রক্ত ঠাণ্ডা আছে, আপনি কি মনে করেন? আপনিও কি শ্রীমতীর মতো মনে করেন যে একজন লোক যাকে চেনে শোনে না তার খাতিরে জালসাজির দোষটা নিজের ঘাড়ে খামখা নিতে পারে?

অর্সো পুলিশ কমিশনরের চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ তৌল করিয়া করিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিল; কারণ, যেদিন হইতে সে বারিসিনিকে দেখিয়াছে সেদিন হইতে তাহাকে বিশ্বাস করা অর্সোর পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তবুও চিঠি পড়িয়া অবশেষে সে বলিতে বাধ্য হইল যে এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ হইতেছে।

কিন্তু কলোঁবা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—তোমাজো বিয়াংশি মহা ফেরেব-বাজ! তার কি? সে জেল খাটবার ভয় রাখে না; জেল হলেও সে জেল থেকে পালাবে; এ ত জানা কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া গা-ঝাড়া দিয়া কলোঁবার কথা গ্রাহ্য না করিয়া অর্সোকে বলিল—দেখুন মশায়, আমি ওপর থেকে যে রকম খবর পেয়েছি তা আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে জানিয়ে শুনিয়ে আমি খালাস। এখন আপনার কর্ত্তব্য আপনার কাছে। আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা আপনি কারু কথায় আচ্ছন্ন হ'তে দেবেন না, আশা করি; আরো আশা করি যে আপনার বিবেচনা আপনার ভগ্নীর... অনুমানের মতন অমন নিজের মনগড়া হবে না।

অর্সো তাহার ভগিনীর ব্যবহারের জন্য দুই চারিটি কথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল যে তোমাজোই যে একমাত্র দোষী সে বিষয়ে তাহার আর কোনো সন্দেহ নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রস্থানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যদি বেশি রাত হয়ে গেছে মনে না করেন, তাহ'লে অনুগ্রহ করে চলুন না আমার সঙ্গে, মিস নেভিলের চিঠিখানা নিয়ে আস্‌বেন··· আর এখন আমায় যে কথা বললেন সেই কথাটা বারিসিনিকেও আপনি নিজে বলে' আসবেন। তা হ'লেই সব গোল চুকে যাবে।

কলোঁবা ব্যস্ত হইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—অর্সো দে-লা রেবিয়া কখনো বারিসিনির বাড়ী মাড়াতেও যাবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিল—শ্রীমতীই দেখছি এ বাড়ীর কর্ত্রী—

কলোঁবা দৃঢ়স্বরে বলিল—আপনাকে সবাই ঠকাচ্ছে। আপনি দারোগাকে চেনেন না। সে একটি আস্ত সয়তান, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভণ্ড। আপনাকে আমি মিনতি করে' বলছি, অর্সো দে-লা রেবিয়াকে দিয়ে এমন কাজ করাবেন না, যার জন্যে তার মাথায় লজ্জা-অপমানের বোঝা চেপে বসবে।

অর্সো তীব্রস্বরে বলিল—কলোঁবা, রাগের ঝোঁকে তুই কি আবোল তাবোল বলছিস?

—দাদা! দাদা! তোমার বাবার রক্তের নিশান সেই পেটারী তোমায় দিয়েছি—তার কথা মনে কর। সেই পেটারীর দোহাই—আমার কথা রাখ—তোমার আর বারিসিনির মধ্যে তোমার বাপের রক্তের গণ্ডি আঁকা রয়েছে—সেই রক্তগণ্ডি ডিঙিয়ে তুমি বারিসিনির বাড়ীতে যেয়ো না!

—ছি, লক্ষ্মী বোনটি আমার!

—না দাদা না, তুমি যেতে পাবে না। তুমি যদি যাও আমি এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারব না, তুমি আর আমায় দেখতে পাবে না।...দাদা দাদা, আমায় তুমি দয়া কর।

কলোঁবা দাদার পায়ের উপর উবুড় হইয়া পড়িল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—শ্রীমতীর এমন অল্পবুদ্ধি দেখে আমি ভারি দুঃখিত হচ্ছি। রেবিয়া মশায়, আপনি ওঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্রমশ ঠিক করে নেবেন, আশা করি।

ম্যাজিষ্ট্রেট দরজা খুলিয়া একটু আগাইয়া অর্সো অনুসরণ করিতেছে কি না দেখিবার জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।

অর্সো বলিল—আমি ত এ-কে ছেড়ে এখন যেতে পারছিনে।... কাল সকালে যদি...

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আমি খুব ভোরে চলে যাব।

কলোঁবা হাত দুখানি জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—দাদা, অন্তত কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আজ রাত্তিরটা আমায় সময় দাও, আমি বাবার কাগজপত্তরগুলো আর একবার দেখি। আমায় এইটুকু অবসর দিতে অস্বীকার কোরো না।

—আচ্ছা! আজ রাত্রে তোর যা দেখতে হয় দ্যাখ্। কিন্তু এর পর তোর এই লজ্জাজনক বাড়াবাড়ি নিয়ে আমায় আর দগ্ধাস নে বলে রাখছি।... ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার কাছে আমি হাজারোবার ক্ষমা চাই।... আমি ভারি অস্বস্তি অশান্তি ভোগ করছি। আজকের রাতটা পোহালে যেন বাঁচি।

ম্যাজিষ্ট্রেট যাইতে যাইতে বলিল—রাত্তিরটা বিশ্রাম করুন। আশা করি সকালবেলা আপনার মনে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে না।

কলোঁবা উচ্চস্বরে বলিল—সাভেরিয়া, লণ্ঠন নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে যা। দাদার জন্যে একখানা চিঠি উনি তোর হাতে দেবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেলে অর্সো বলিল—কলোঁবা, তুই আমাকে বড্ডই জ্বালাতন করে' তুলেছিস। তুই কি বরাবর প্রমাণ অগ্রাহ্য করেই চলবি?

—তুমি ত আমাকে সকাল পর্য্যন্ত সময় দিয়েছ দাদা। আমার হাতে সময় অতি অল্প। তবু আমি এখনো আশা ছাড়ি নি। —বলিয়া কলোঁবা এক থোলো চাবি লইয়া উপরের তলায় ছুটিয়া উঠিয়া গেল। যে আলমারি দেরাজে কর্নেল রেবিয়া তাঁহার কাগজপত্র রাখিতেন সেই দেরাজ তাড়াতাড়ি খোলা ও কাগজপত্র হাঁটকানোর শব্দ সেখান হইতে শোনা যাইতে লাগিল।

(১৫)

সাভেরিয়া অনেকক্ষণ হইল গিয়াছে, এখনো ফিরিল না। অর্সো অপেক্ষা করিয়া করিয়া যখন একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া ছটফট করিতেছে তখন সাভেরিয়া একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে বালিকা শিলিনা। সে কাঁচা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, তখনো তাহার ঘুমের ঘোর কাটে নাই, সে চোখ রগড়াইতেছিল।

অর্সো বলিল—খুকি, এত রাত্রে তুমি কি করতে এসেছ?

শিলিনা বলিল—দিদিঠাকরুণ ডেকে পাঠিয়েছেন।

অর্সো মনে মনে ভাবিল—এ-কে নিয়ে আবার কি সয়তানি খেলা হবে?

অর্সোর তখন আর বেশি কিছু বলিবার অবসর ছিল না, সে তাড়াতাড়ি লিডিয়ার চিঠি খুলিতে লাগিল। শিলিনা সেই অবসরে কলোঁবার সন্ধানে প্রস্থান করিল।

অর্সো চিঠি খুলিয়া দেখিল চিঠির আরম্ভে কোনো পাঠ নাই, শেষেও শুধু নামটি সই। অর্সো চিঠি পড়িতে লাগিল—

"আমার বাবার একটু অসুখ করেছিল। তাতে কয়ে'

তিনি এমন লিখনকুণ্ঠ হয়ে গেছেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর প্রতিনিধির কাজ করতে হচ্ছে। সেই সেদিন আমরা যখন সমুদ্রতীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে তিনি তখন পা ভিজিয়ে ফেলেছিলেন, আপনি ত জানেনই। আপনাদের চমৎকার দেশের জ্বর তার বেশি ছলছুতার অপেক্ষা রাখেনি। আপনার দেশের এই ব্যাজস্তুতি শুনে আপনার মুখের যে কি রকম ভাব হচ্ছে, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি; আপনি নিশ্চয় আপনার ছোরা হাতড়াচ্ছেন; কিন্তু বাঁচোয়া, যে, আপনার বোধ হয় আর দ্বিতীয় ছোরা নেই। যে একখানা ছিল সেখানা কলোঁবা ঠাকরুণ আমায় দিয়ে ফেলেছেন। আপনার বোধ হয় তার জন্যে এখন পস্তানি হচ্ছে! যাক, মোট কথা, আমার বাবার জ্বর অল্প আর আমার ভয় বিষম রকমেরই হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ভারি চমৎকার অমায়িক লোক, তিনি তাঁরই মতন অমায়িক একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি দুদিনে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। বাবার আর জ্বর হয়নি; বাবা শিকারে যেতে প্রস্তুত; আমিই তাঁকে কোনো রকমে আটকে রেখেছি।

"আপনার পাহাড়ে আস্তানা লাগছে কেমন? আপনার বাড়ী ত অনেক-কেলে পুরোণো? ভূত আছে? আপনাকে এত সব জিজ্ঞাসা করছি কেন জানেন?—আপনি বাবাকে ছাগল, হরিণ, বরাহ প্রভৃতি শিকার জুটিয়ে দেবেন বলে' গিয়েছিলেন তাই। আমরা বাস্তিয়া যাবার পথে হয়ত আপনার আতিথ্য স্বীকার করতেও পারি। রেবিয়া-বংশের পুরাতন জীর্ণ বনিয়াদী-বাড়ী বনিয়াদ সমেত আমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে না আশা করি।

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আপনাদের সব কথা শুনেছি। তিনি ত কথা বলতে আলেন না—ভালো কথা মনে পড়ল, তিনি কথায় কথায় শুনিয়ে দিয়েছেন যে, আমায় দেখে নাকি তাঁর মাথা ঘুরে গেছে!—তাঁর কাছে শুনলাম যে বাস্তিয়ার পুলিশ তাঁকে খবর দিয়েছে যে একটা কয়েদী বদমায়েস নাকি তার দোষ স্বীকার করেছে; তাতে করে' আপনার পুরাতন সন্দেহ অমূলক হয়ে যাবে। আপনাদের শত্রুতা আমাকে ভারি চিন্তিত করে' রেখেছিল, এখন সব মিটমাট হয়ে গেলে আমি বাঁচি। আপনি বুঝতে পারবেন না যে এতে আমার কেন আর কতখানি আনন্দ হচ্ছে। আপনি সেদিন যখন সেই সুন্দরী খুনের-চাপান-গাইয়ের সঙ্গে বন্দুক হাতে নিয়ে মুখ ভার করে' বিদায় নিলেন সেদিন আপনাকে দস্তুর-মত কর্সিক বলেই মনে হয়েছিল।

"বাস! ঝোঁকের মাথায় আমি অনেকখানি লিখে ফেলেছি দেখছি। আপনি হয়ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চলে যাচ্ছেন—আমার মনটা তাই ভালো নেই কিনা!

"আমরা যখন আপনার পাহাড়ে দেশের পথ ধরব, তখন শ্রীমতী কলোঁবা ঠাকরুণকে আমি চিঠি লিখে খবর দেবো। ইতিমধ্যে তাঁকে, বুঝলেন, তাঁকে আমার হাজার হাজার প্রণয়-সম্ভাষণ জানাবেন। আমি তাঁর-দেওয়া ছোরাখানার খুব সদ্ব্যবহার করছি—নভেলের পাতা কাটছি; কিন্তু সেই উগ্রচণ্ড ভয়ঙ্কর চিজটি এই সামান্য কাজ করতে বিষম আপত্তি করছে, এবং প্রতিবাদ-স্বরূপ আমার বইখানির এমন দুর্দ্দশা করেছে যে দেখলে কষ্ট হয়।

"বিদায়, তবে বিদায়! বাবা লিখে দিতে বললেন যে 'আমার (অর্থাৎ তাঁর) ভালোবাসা জানবেন।' ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ শুনবেন, তিনি লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার মনে হয়, কেবল আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে' আপনাকে সব বলবার জন্যেই তিনি তাঁর শফর-যাত্রায় ঘুর হলেও আপনাদের ওখানে যাবেন। উনি কোথায় একটা কিসের ভিত্তিস্থাপন করতে যাচ্ছেন; ব্যাপারটা খুব সমারোহ করেই হবে অনুমান হচ্ছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমি মজলিসের জলুস বাড়াতে সেখানে উপস্থিত থাকব না। জরির পোষাক, রেশমী মোজা, সাদা কোমরবন্দ পরে' হাতে রূপোর কর্নিক নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন ভিত্তিস্থাপন করবেন তখন তাঁকে খুব জমকালোই দেখাবে!—তার ওপর আবার বক্তৃতা আছে! তারপরে হাজার কণ্ঠে রাজার জয়ধ্বনি আর লক্ষ হাতের করতালি সভাটা নিতান্তই সরগরম করে' তুলবে।

"আমাকে দিয়ে দেখতে দেখতে চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আপনার মনে মনে খুব অহঙ্কার হচ্ছে, না? আমি কিন্তু হায়রান ও হালাকান হয়ে উঠেছি। এই দুঃখের শোধ নেবার জন্যেই আমি আপনাকে সুদীর্ঘ জবাব লেখবার অনুমতি দিচ্ছি। ভালো কথা, আপনি ত পিয়েত্রানরা দুর্গে নিরাপদে পৌঁছানো খবরটাও আমায় কৈ লেখেন নি? বেশ লোক যা হোক। "লিডিয়া।

"পুনশ্চ—আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শুনে তাঁর পরামর্শ-মত কাজ করবেন। আমাদের সকলেরই এই মত। এতে আমি বিশেষ সুখী হব।"

অর্সো তিন চারি বার চিঠিখানি পড়িল। এক-একবার পড়ে আর মনে মনে প্রত্যেক কথার শতেক রকম টীকা ভাষ্য ব্যাখ্যা করে। তারপরে সুদীর্ঘ এক জবাব লিখিল। একজন লোকের ভোরে আজাকৃসিয়ো যাইবার কথা ছিল। অর্সো সেই রাত্রেই সাভেরিয়াকে দিয়া সেই চিঠি তাহার কাছে পাঠাইয়া দিল। তখন আর বারিসিনির দোষ সত্য কি মিথ্যা তাহা লইয়া ভগিনীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা রহিল না, লিডিয়ার চিঠি তাহার চোখে যে গোলাপী নেশা লাগাইয়া দিয়াছিল তাহাতে সে সমস্ত জগৎ আনন্দের হাসিতে মধুময় দেখিতেছিল, তাহার মনে তখন না ছিল সন্দেহ আর না ছিল ঘৃণা। কিছুক্ষণ ভগিনীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া যখন দেখিল যে সে আর আসে না, তখন অর্সো শুইতে গেল—আজ তাহার অন্তর আনন্দের ফুৎকারে স্ফীত লঘু হইয়া যেন নাচিতেছে—এমন খোলসা মন তাহার জীবনে কখনো হয় নাই।

কলোঁবা শিলিনাকে কতকগুলি গোপন উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া সমস্ত রাত বসিয়া পুরাতন কাগজপত্র পড়িতে লাগিল। ভোর হব-হব সময়ে গুটিকত কাঁকর-কুচুই তাহার জানলার উপর আসিয়া পড়িল; এই সঙ্কেত পাইয়া সে নামিয়া বাগানে গেল এবং একটা চোরা দরজা খুলিয়া দুজন দুষমন-চেহারার লোককে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

[De La Mazeliere র ফরাশী গ্রন্থ হইতে]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

***

মোগল-সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইদেশে তখন সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল; সুতরাং মোগলসাম্রাজ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সামন্ততন্ত্রের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করিলে সুবিধা হইবে।

প্রাথমিক অভিযানাদির সময়, সর্দ্দারেরা বিজিত ভূমিতে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে; উহারা একসঙ্গে শাসনকর্ত্তা, রাইয়ৎ (vassal), অশ্বারোহী সেনার সর্দ্দার, দস্যুদলের সর্দ্দার ছিল। বহুদিন পরে,—যখন দিল্লির রাজাদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হিন্দুস্থান হইতে প্রথমে তাঁহারা যে সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সৈন্যকে পরাভূত করিবার জন্য উক্ত সর্দ্দারের দল হইতে আর এক সৈন্যদল গঠিত হয়। ঐ সর্দ্দারেরা সকল দেশের ভাগ্যান্বেষীদিগকে আহ্বান করিল। কিন্তু তখন রাজস্ব ভাল আদায় হইত না বলিয়া,—নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক কতকগুলি সৈনিক পোষণ করিবার সর্ত্তে, এই ভাগ্যান্বেষীগণ জায়গীর প্রাপ্ত হইল। উহাদিগকে "আমীর" ও মনসব দার—এই খেতাব দেওয়া হইল।

বদাওনি লিখিয়াছেন ঃ—

রাজার খাসমহলের জমি (খালিসা) ব্যতীত, সমস্ত দেশটাই আমীরগণের জায়গীর-ভূমি। উহারা দুষ্টবুদ্ধি, বিদ্রোহিতার জন্য সততই প্রস্তুত, নিজ লভ্যের জন্য রাজকর হইতে অর্থব্যয় করিত; সৈন্য পরিদর্শনের জন্য উহাদের সময় হইত না, এবং প্রজাদিগের হিতকল্পে উহাদের অণুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। রাজ্যের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, উহারা স্বয়ং কতকগুলি ক্রীতদাস ও মোগল-অনুচর সঙ্গে করিয়া আসিত, কিন্তু উহাদের উৎকৃষ্ট সৈনিকগণকে সঙ্গে আনিত না। (খিলিজিগণ ও শের-শা কর্ত্তৃক, স্থাপিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আকবর এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক আমীর প্রথমে বিংশতি অশ্বসৈন্যের নায়কপদ লাভ করিত। তাহার পদোন্নতি ক্রমানুসারে হইত এবং এই সর্ত্তে হইত যে, প্রতি সৈন্যপ্রদর্শনের সময় উহারা স্বকীয় পদমর্য্যাদার অনুরূপ আপন-আপন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে আনিবে। সেই সময়, তাহাদের অশ্বদিগকে চিহ্নিত করিয়া রাখা হইত,—সুতরাং সর্দ্দারেরা ঐ অশ্বগুলি পরে কাহাকেও ধার দিতে

বিমল বয়স।

সার জশুয়া রেনল্ডস্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

পারিত না, বা বিক্রয় করিতেও পারিত না।) এই-সকল রাজবিধি সত্ত্বেও আমীরেরাই অশ্বসৈন্যের প্রকৃত সর্দ্দার ছিল, এবং সৈন্যদিগের অবস্থাও খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। সৈন্যপ্রদর্শনের সময়, আমীরেরা স্বীয় ভৃত্যদিগকে কিংবা দরিদ্র লোকদিগকে সৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিত এবং জায়গীর পাইবার পর তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে পুনঃ প্রেরণ করিত। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, চারিদিক্ হইতে সওদাগর, তন্তুবায়, কার্পাস-পরিষ্কারক, সূত্রধর, গন্ধবণিক—কতক মুসলমান, কতক হিন্দু—ইহারা ধার-করা ঘোড়া সঙ্গে আনিয়া তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া লইত, এবং এইরূপে উহারা হয় মনসব্ নয় "ক্রোড়ী", "অহদি", ও "দাখিলি" হইত। কিছুদিন পরে, ঘোড়াও দেখা যাইত না, ঘোড়ার জিন্‌ও দেখা যাইত না, সেই লোকগুলা পদাতিকের কাজ করিত। (১)

তদ্বিপরীতে আবুল-ফজল বলেন :—

সকল যুগের জ্ঞানীরাই একই কথা বলেন এবং এই এক-বিষয়ে সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায় :—সামঞ্জস্যবিহীন সংখ্যা জিনিসটা কি ?—না, উহা সেই ধূলারাশি যাহা বিশৃঙ্খলা হইতে সমুত্থিত হয়,—উহা কেবলই গোলযোগ, উহা অরাজকতা। এইরূপই পঞ্চভূত ...এইরূপই জীবজন্তু,—যাহারা আত্মরক্ষার জন্য সম্মিলিত হয়... এইরূপই মনুষ্যগণ। দুষ্টবুদ্ধি ও উদ্দামপ্রবৃত্তির বশীভূত মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা একজন সর্দ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করে ; তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এই বশ্যতার উপর নির্ভর করে ; কেননা, তাহাদের ষড়রিপু, তাহাদের কুপ্রবৃত্তিসমূহ অবিরত তাহাদিগকে নূতন নূতন পাপ-পথে ধাবিত করে। এমন কি অনেক সময়, তাহাদের কৃত অপরাধ ও কুকর্ম্ম দৈববিধান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অজ্ঞানমেঘ অপসারিত করিবার উদ্দেশে, ঈশ্বর একজন মানুষকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকেই তিনি সুপরামর্শ প্রদান করেন, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখেন...কিন্তু যেহেতু কোন এক মানবের শক্তি এই কার্য্যসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, অতএব ঈশ্বরের সেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তি নিজের সাহায্যের জন্য কতকগুলি লোক নির্ব্বাচন করিবেন, আবার ইহাদের সাহায্যের জন্যও অন্য কতকগুলি লোক নির্ব্বাচন করিবেন। এই জন্যই সম্রাটবাহাদুর কতকগুলি মনসব্‌দারকে মনোনীত করিয়াছেন। তাহাদের উপরেই তিনি অশ্বসৈন্যের ভারার্পণ করিয়াছেন ; এই অশ্বসৈন্যের সংখ্যা পাঁচহাজার পর্য্যন্ত উঠিতে পারে ; দশহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব কেবল সম্রাটের পুত্রদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (২)

আবুল-ফজল যাই বলুন না কেন, আকবর অনিচ্ছাক্রমেই এই মনসবের প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিয়াছিলেন। উহার অশুভফল যতটা পারেন তিনি কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে, তিনি সামন্ত-আমীরদিগকে রাজদরবারের আমীর করিয়া তুলিলেন ; যে-সকল বিশ্বস্ত মন্ত্রী ঐকান্তিক রাজসেবার দরুন পুরস্কারলাভের যোগ্য বিবেচিত হইত তাহাদিগকে তিনি মনসবদারী দিয়া অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। কিন্তু এখন আর কাহাকেও জায়গীরদারের আধিপত্য দেওয়া হইত না। তাহারা সম্রাটের প্রাপ্য রাজকর (যাহার সহিত বার্ষিক খাজনাও মিশ্রিত ও একীভূত) ছাড়া অন্য কর প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিত না। উহাদের পদ বংশগত ছিল না ; এমন-কি জীবনকাল পর্য্যন্তও ঐ পদ কেহ অধিকার করিতে পারিত না। সম্রাট প্রায়ই মনসব্‌দারদিগকে স্বীয়পদ হইতে বিচ্যুত করিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে, তাহাদের পদোন্নতি করিয়া দিতেন। ফলত মনসবদারদিগের পদমর্য্যাদার একটা সোপান ছিল ; ইহাকে রুশ্‌দেশের "চিন" (Tchin) বলা যাইতে পারে ; কেননা, এই রুশীয় প্রতিষ্ঠান এবং এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান—উভয়ই মোগলদিগের মধ্যবর্ত্তিতাসূত্রে—চীনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয়। এই প্রত্যেক পদমর্য্যাদার অনুরূপ একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকের উপর নেতৃত্বভার দেওয়া হইত। কিন্তু এই-সকল পদ অবৈতনিক ছিল। মনসব্‌দারের নিয়োগপত্রে যত জনের উপর নেতৃত্ব উল্লিখিত হইত, মনসব্‌দার তাহার চতুর্থ বা পঞ্চম অংশের ভরণপোষণভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া যে টাকা বাঁচিত তাহাই আভিজাত্য-সমুত্থিত আয় বলিয়া বিবেচিত হইত। দশসহস্র বা ততোধিক লোকের সর্দ্দারগণ আমীর নাম গ্রহণ করিত (আমীরের বহুবচনে 'উম্‌রা'—য়ুরোপীয়েরা এই উম্‌রাকে "Omrah" করিয়াছেন)। আবুল-ফজল বলেন, আমীরের সংখ্যা ৬৬ জন ছিল ; কিন্তু ১৫৯৬ অব্দের তালিকায় ত্রিশজনের অধিক নাম পাওয়া যায় না ; ঐ সময়ে নিম্নতর পদবীর ১৩৪৪ মনসব্ ছিল। কোন কোন সর্দ্দার "আমীর-উল্‌-উম্‌রা" (আমীরের আমীর) এই উপাধি ধারণ করিতেন। কিছুকাল পরে, মনসব্‌দার ও আমীরগণের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয়। আইন্‌-ই-আক্‌বরীতে হিন্দু আমীরদের নাম অল্পই প্রদত্ত হইয়াছে, যথা :—অম্বরের রাজপুত রাজা বিহারী মল্ল, ও প্রখ্যাত সেনাপতি ও কোষ-সচিব তোদর-মল্ল। কিন্তু সমস্ত রাজপুত রাজারাই বস্তুত সম্রাটের অধীন-নৃপতি এবং মনসব্‌দারের সমকক্ষ পদধারী সেনানায়ক ছিলেন। (৩)

(১) বদাওনি (Blochmann)

(২) আইন-ই-আকবরী।

(৩) আমীর নহে—এইরূপ মনসব্‌দারদিগের মধ্যে হিন্দুর

পক্ষান্তরে, আকবর একটি চিরস্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। এই সৈনিকেরা সাক্ষাৎভাবে সরকার হইতে তাহাদের অশ্ব ও বেতন প্রাপ্ত হইত; উহারা "অহদি", "দাখিলি" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি—যাহা মোগল-রাজত্বকে রক্ষা করিয়াছিল—সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

আকবরের রাজত্বকালে, দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও ৪০ হাজার পদাতিক, বন্দুকধারী বা গোলন্দাজ লইয়া সৈন্যমণ্ডলী গঠিত হয়। এই অঙ্ক কাগজেই দেখা যাইত, শান্তির সময়ে উক্ত অঙ্কের অন্তর্গত কার্য্যকরী সৈন্য উহার পঞ্চমাংশেও উপনীত হইত না। কিন্তু ঔরংজেবের পশ্চাতে সর্ব্বদাই পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও ১৩০টা কামান থাকিত; যুদ্ধের সময় রাজপুতসৈন্য ও আমীরদিগের সৈন্য লইয়া সবসুদ্ধ দেড়লক্ষ যোদ্ধা তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর, অধঃপতনের আরম্ভ হয়। আমীরেরা পুনর্ব্বার স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। উচ্চতম ও নিম্নতম বিচারের অধিকার উহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিল এবং নিজ লভ্যের উদ্দেশে সমস্ত রাজকর আদায় করিতে লাগিল।

যুদ্ধ হইতেই জন্ম, পুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য বরাবর সামরিক রাজশাসনেরই পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। যাবৎ সম্রাট অধিকতম সৈন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন, তাবৎ অন্য সেনাপতিরা তাঁহাকে সম্মান করিত। কিন্তু সম্রাট যখনই সৈনিক ও দলপতিসুলভ গুণগুলি হারাইলেন, তখনই তাঁহার অধীন সেনানায়কেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং প্রত্যেকেই আপন-আপন ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। (৪) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ধান্য পাকিয়া উঠিলে, পর্ব্বত হইতে হরিণের পাল নামিয়া ধান্য নষ্ট করিতে থাকায়, হরিণ তাড়াইবার জন্য ক্ষেত্রনাথ মাচা বাঁধিয়া রাত্রিতে পাহারার ব্যবস্থা করিলেন ও কলিকাতা হইতে তিনটি বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক টোটাদার বন্দুক দেখিতে আসিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বন্দুক ছোড়া শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ শুনিয়া বলিলেন, আগে শস্য সব খামারে উঠুক তারপর বিবেচনা করা যাইবে।

মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।]

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র শস্যক্ষেত্র ও পাহাড় দেখিবার জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। উভয়ে

সংখ্যা আরও বেশী ছিল। আমীর কিংবা আমীর নহে—এইরূপ দুইশত অশ্বারোহী-নায়ক মনসব্‌দারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিল।—Blochmann.

(৪) ঔরংজেবের রাজত্বকালেও মন্‌সবের পদ বংশগত হয় নাই। Bernier লিখিয়াছেন,—সম্রাটই সমস্ত ভূমির অধিস্বামী; তিনিই সমস্ত অভিজাতবর্গের উত্তরাধিকারী। আমীরদিগের পুত্র পৌত্রেরা প্রায়ই ভিক্ষু-দশায় উপনীত হইত, উহারা বাধ্য হইয়া কোন আমীরের অশ্বসৈন্যের অন্তর্গত সামান্য সৈনিকের পদ গ্রহণ করিত...তথাপি. কোন কোন আমীর স্বীয় জীবদ্দশাতেই, তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিত। অধিকাংশ ওমরাই নীচকুলোদ্ভব এবং সর্ব্বদেশীয় ভাগ্যান্বেষীদলের লোক। মোগল-সম্রাট্ স্বকীয় ইচ্ছানুসারে উহাদের পদোন্নতি বা পদাবনতি করিয়া থাকেন। (Colbert এর প্রতি লিখিত পত্র—দ্রষ্টব্য)

Blochmann শা-জাহানের সৈন্যসম্বন্ধে "পাদশা-নামা" হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"বর্ত্তমান সম্রাটের আমলে, বেতন-ভোগী অশ্বসৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ; এই অশ্ববৃন্দের চতুর্থাংশ পরিচিহ্নিত হইয়া থাকে। পরগণার শাসনকার্য্যের জন্য ফৌজদার, ক্রোড়ী, ও শিক্ষকেরা যে ত্রুপ্-সোয়ার সংগ্রহ করে, তাহা উক্ত অঙ্কের অন্তর্ভূত নহে। (এই ত্রুপ্-সোয়ারেরা পুলিসের কাজ করে)। এই দুইলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এইরূপে বিভক্ত, যথা:—আট হাজার মনসব্‌দার, সাত হাজার অহদি ইত্যাদি; একলক্ষ পঁচাশি হাজার সৈনিক,—রাজা, আমীর ও অন্যান্য মনসব্‌দারের আনীত সৈন্যদলভুক্ত। তাছাড়া, চল্লিশ হাজার পদাতিক, বন্দুকধারী, গোলন্দাজ, পলিতা-বাহক।" দুইলক্ষ অশ্বারোহীর মধ্যে,—যাহাদের অশ্ব পূর্ব্বে পরিচিহ্নিত হইয়াছে এইরূপ কেবল পঞ্চাশ-হাজার অশ্বারোহী প্রথম আহ্বানেই তাহাদের সৈন্যদলে আসিয়া মিলিত হইতে পারিত। Bernier ঔরংজেবেরও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দুইলক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোলন্দাজসৈন্য। বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সহিত ৭০০ মেঠো কামান ছিল। (বাবরের স্মৃতিলিপি ও "তারিখ-ই-রশিদি" দ্রষ্টব্য)। আইন-ই-আকবরীতে এরূপ বহু সহস্র কামানের উল্লেখ আছে, যাহার মধ্যে কতকগুলি কামান হইতে ১২-মন ওজনের গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। মোগলদের আমলে, ভারত আগ্নেয় অস্ত্র গঠনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

দুইটী বন্দুক ও কিছু টোটা সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে লখাই সর্দ্দারও চলিল।

কাপাসক্ষেত্রে কার্পাসবৃক্ষের অবস্থা দেখিয়া সতীশচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি অড়হর, গম, যব, আলু প্রভৃতিরও আবাদ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। লখাই সর্দ্দার পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একদিনও পর্ব্বতে আরোহণ করেন নাই। পর্ব্বতারোহণ করা অতীব শ্রমসাধ্য হইলেও, গিরিজাত অরণ্যানীর শোভা দেখিয়া উভয়ে অতিশয় পুলকিত হইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র উদ্ভিদশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; এই কারণে, তিনি একটী নূতন বৃক্ষ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে তাঁহারা একটী গুহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। গুহাটি এরূপ প্রশস্ত যে, তন্মধ্যে দুই শত লোক স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া থাকিতে পারে। একটী অখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর সেই গুহার ছাদস্বরূপ হইয়াছে। দাঁড়াইলে, ছাদ মস্তক স্পর্শ করে না। গুহার দুইদিকে প্রবেশ ও নির্গমের জন্য স্বাভাবিক দুইটী দ্বার আছে। গুহার তলদেশ অসম ও উন্নতানত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তররাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই গুহার মধ্যে উপবেশন করিলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়, এবং এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। কোনও বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার নিমিত্ত এরূপ স্থান আর নাই। কিন্তু গুহার অভ্যন্তর হইতে সহসা একটী বিজাতীয় দুর্গন্ধ উত্থিত হওয়ায়, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র উভয়ে লখাই সর্দ্দারকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল যে বাদুড়ের বিষ্ঠা চারিদিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছে। কিন্তু এই দুর্গন্ধটি ঠিক্ বাদুড়ের বিষ্ঠারও নহে। সম্ভবতঃ কোন হিংস্র জন্তু এই গুহার মধ্যে বা নিকটে অবস্থান করিতেছে। তাহারই গাত্র বা বিষ্ঠা হইতে এই বিজাতীয় দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছে। লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সেইস্থানে অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না এবং তৎক্ষণাৎ গুহা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হইলেন।

পর্ব্বতশৃঙ্গে শেফালিকা পুষ্পবৃক্ষের বন। এই সময়ে শেফালিকা পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে রাশি রাশি পুষ্প পড়িয়া ছিল এবং তাহাদের সুমধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র সহসা এইস্থানে উপস্থিত হইয়া মনে করিলেন, তাঁহারা যেন কোনও দেবরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। পর্ব্বতশৃঙ্গে একটী সুবৃহৎ অখণ্ড শৈল ছিল। সেই শৈলের পার্শ্বে একটী বৃহৎ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া শৈলের উপর স্নিগ্ধ শীতল ছায়া প্রদান করিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন; এইজন্য উভয়ে সেই পরিচ্ছন্ন শৈলমূলে উপবেশন করিয়া শ্রম অপনোদন করিতে লাগিলেন।

এই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পশ্চিমদিকে বল্লভপুর গ্রামটি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া একটী মনোহর চিত্রপটের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। পূর্ব্বদিকে বহুদূরব্যাপিনী সশৈলকাননা উপত্যকাভূমি নিজ বিস্তৃত বক্ষের উপর স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। সেই সুবৃহৎ উপত্যকার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা লোকালয় নাই। তন্মধ্যে কোথাও অরণ্য, কোথাও কানন, কোথাও বিসর্পিণী তটিনী, কোথাও সকানন শৈল, কোথাও তৃণাচ্ছন্ন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এবং কোথাও স্বভাবখাত কমলশোভিত প্রকাণ্ড সরোবর। সরোবরের নির্ম্মল জলে বন্যহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে মৃগপাল বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা শিখিদল বিহার করিতেছে। সেই মনোহারিণী উপত্যকাভূমি হইতে নানাবিধ সুকণ্ঠ পক্ষীর সুমধুর রব সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে অস্পষ্টভাবে উপনীত হইতেছে। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র প্রকৃতিদেবীর এই চমৎকারিণী শোভা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন,

কাহারও মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, স্বর্গের নন্দন কাননের বৃত্তান্ত পাঠ ক'রেছ; কিন্তু তাও বুঝি সৌন্দর্য্যে এই উপত্যকার তুল্য হ'বে না। আমি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি; কিন্তু এমন সুন্দর স্থান কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে না। সংসারের অসার কোলাহল ত্যাগ ক'রে, এই স্থানেই জীবনযাপন কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য, এত বড় উপত্যকা, আর এই উপত্যকা এমন উর্ব্বরা, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও জনমানুষের বাস বা সঞ্চার নাই। ভারতবর্ষের কত স্থানে যে কত উর্ব্বরা ভূমি প'ড়ে আছে, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপত্যকাটি আবাদ কর্‌তে পার্‌লে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হ'তে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রতি কেহ মনোনিবেশ কর্‌তে চায় না। সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, চাক্‌রী বাক্‌রী ছেড়ে এই রকম স্থানে এসে বাস করি, আর কৃষিকার্য্য করি। এদেশের জমীদারগুলিকেও নিতান্ত নির্ব্বোধ ব'লে মনে হচ্ছে। বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য তাঁদের কোনও চেষ্টা নাই। আর তাঁদেরই বা দোষ কি? প্রকৃত শিক্ষার অভাবই তাঁদের অবনতির কারণ। এই যে উপত্যকার সৌন্দর্য্য দেখে তুমি আমি মুগ্ধ হচ্ছি, তাও আমাদের যৎসামান্য শিক্ষার গুণে। তুমি কি মনে কর, এদেশের আদিম অধিবাসীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে তোমার আমার মতন মুগ্ধ হয়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "সেরূপ মুগ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব কথা। তবে প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হ'য়ে, তা'দের মনেও যে একটী সামান্য ভাবতরঙ্গ না উঠে, তা নয়। আমি সেদিন মুণ্ডারীদের একটী গান শুনে ভারি চমৎকৃত হয়েছিলাম। গানটি এই :-

এসা সাকাম্‌-জিলিপ্‌ জিলিপ্‌।
বড় সাকাম্‌ জুলুপ্‌ জুলুপ্‌,
আরি লিকাম্‌ পাওরি হে,—
'আকি লিকাম্‌ পাওরি।

এর অর্থ এইরূপ :—অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলি চিক্‌ চিক্‌ কর্‌ছে; বটগাছের পাতাগুলি চক্‌ চক্‌ কর্‌ছে। বটগাছের পাতাগুলি থালার মত চৌড়া। ইত্যাদি। সুতরাং অসভ্য লোকেও যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয়, তা নয়। তবে কথা এই যে, তাদের মন মার্জ্জিত নয় ব'লে, তাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয় না। যেমন সূর্য্যের আলোক। সূর্য্যের আলোক সকল বস্তুতেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়; কিন্তু স্বচ্ছ জল বা স্বচ্ছ কাচের উপর তা যেমন প্রতিফলিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সুশিক্ষা না পেলে, চিত্ত মার্জ্জিত হয় না, সুতরাং শিক্ষাটা যে জীবনের সকল কার্য্যে ও বিভাগেই নিতান্ত আবশ্যক, তার আর কোনও সন্দেহ নাই।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্‌ কথাই বলেছ। আমিও ঐ কথাই বল্‌ছিলাম। এই কৃষিকার্য্যের জন্যও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমি বিশেষভাবে কৃষি-কার্য্যটি শিখেছি ব'লে, এই উপত্যকাটি দেখে এর অদ্ভুত লোকপালিকা শক্তির কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু জমীদার মশাই তা না বুঝ্‌তে পেরে এটি ফেলে রেখে দিয়েছেন। আমি পাহাড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত স্থানে যে কত প্রকার সুন্দর মৃত্তিকা দেখেছি, তা তোমাকে বলি নাই। সেই মৃত্তিকার মধ্যে সুন্দর কেওলীন্‌ দেখলাম, লালরংয়ের আর হল্‌দেরংয়ের এলামাটী (red and yellow ochre) দেখ্‌লাম। এই সব মাটী এক এক স্থানে কোটী কোটী মণ পাওয়া যেতে পারে। এইগুলি কল্‌কাতায় রপ্তানী কর্‌লে বহু অর্থলাভ হ'বে। এই সামান্য স্থানটুকু ভ্রমণ করেই আমি এদেশে প্রকৃতি দেবীর সঞ্চিত যে প্রভূত ধনরত্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা'তে বিস্মিত হ'য়ে পড়েছি। না জানি, এই সমস্ত প্রদেশে কতই ধনরত্ন সঞ্চিত আছে! ক্ষেত্তর, তুমি এদেশে বাস ক'রে খুব ভাল কাজই করেছ। তুমি এ অঞ্চলে যত ভূমিসম্পত্তি পাও, কিনে ফেল। আর একটী কাজ কর। তোমার তিনটি ছেলের মধ্যে একটীকে বৈজ্ঞানিক কৃষি ও ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা দাও। তোমার বড় ছেলে নগেন্দ্র তোমার দক্ষিণ হস্ত; তা'কে তুমি ছেড়ে দিতে পার্‌বে না। তোমার ছোট ছেলে, নরু ভারি চমৎকার লোক হ'বে,

কিন্তু সে নিতান্ত শিশু। তোমার মেজ ছেলে সুরেন্দ্রটির প্রকৃতি কিছু গম্ভীর। লেখাপড়া শিখ্‌তেও তার যথেষ্ট যত্ন আছে। তুমি ঐ ছেলেটিকে ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাও। এখানে স্কুলকলেজ কিছু নাই। তুমি তোমার সুরেন্দ্রকে আমার সঙ্গে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দাও। আমি তা'কে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব, আর নিজে তা'কে লেখাপড়া শেখাব। যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি, তা হ'লে, তোমার ঐ ছেলেকে আমি পাকা এগ্রিকাল্‌চারিষ্ট ও ইঞ্জিনীয়ার কর্‌ব। তুমি কিছু টাকা কড়ি জমিয়ে ফেল। সুরেন্দ্র বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী ও ইঞ্জিনীয়ারীং সম্বন্ধে উত্তম শিক্ষা পেলে, সে তোমাকে ক্রোড়পতি ক'রে ফেল্‌বে, তা আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌ছি। কিন্তু তুমি এই অঞ্চলে নিকটে নিকটে উর্ব্বর মৌজা পেলেই তা খরিদ ক'র্‌বে। আমি এই প্রদেশের যে রত্নৈশ্বর্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা তুমি পাচ্ছ না। যদি পার, এই উপত্যকাটি সর্ব্বাগ্রে জমীদারের কাছে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে হাত কর। আর এর নাম 'নন্দন-কানন' রেখো। নন্দন-কাননই বটে! কি চমৎকার! কি চমৎকার!"

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি কখনও এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেন নাই বা এই উপত্যকাটি দেখেন নাই। সুতরাং ইহা কোন্ জমীদারের সম্পত্তি, তাহা তিনি জানিতেন না। শৈলের অদূরে এক বৃক্ষতলে লখাই সর্দ্দার বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "লখাই, এই মৌজাটি কার?"

লখাই সর্দ্দার প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা বলিল। তার মর্ম্ম এইরূপঃ—পূর্ব্বে ইহা গৌরসিংহ জমীদারের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সাঁওতালী হাঙ্গামার সময় উক্ত জমীদার সাঁওতালগণের সঙ্গে যোগ দিয়া পুরুলিয়া লুণ্ঠন করিতে যাওয়ায়, সরকার বাহাদুর তাঁহাকে ধরিয়া ফাঁসী দেন ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া খাস্ করিয়া লয়েন। সেই অবধি ইহা সরকার বাহাদুরের খাস্ সম্পত্তি। এখানে কাহারও গাছ কাটিবার বা এক কোদালি মাটী উঠাইবার হুকুম নাই। এখানে কেহ কোনও জন্তুকে শীকার করিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের তহশীলদার কখনও কখনও এই মৌজায় জঙ্গল বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করেন মাত্র।

ক্ষেত্রনাথ লখাইকে মৌজার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, লখাই বলিল "ইটোর নাম নন্দনপুর বটে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষেত্তর, তোমার কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই জঙ্গলদেশেও কবি আছে। এই মৌজার নাম আর 'নন্দনকানন' রাখ্‌তে হ'বে না। 'নন্দনপুর' নামটিই বেশ। তোমার কোনও চিন্তা নাই। যখন এটি গভর্ণমেণ্টের খাস্ মহাল, তখন আমি এটি তোমার হাতে এনে দিচ্ছি। তুমি কাপাসের চাষটায় বেশ সফলতা দেখাও। একবার ডেপুটী কমিশনার সাহেবকে খুশী কর্‌তে পার্‌লেই হ'ল।"

সেই সময়ে পর্ব্বতশৃঙ্গের অপর পার্শ্বে এক পাল হরিণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া, লখাই সর্দ্দার বন্দুক লইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ তাহাকে বলিলেন "লখাই, ওদিকে আর কেন যাচ্ছ?"

লখাই হাত নাড়িয়া বলিল, "তুই অত নাই চেঁচাস্, গলা। হরিণগুলান্ মানুষের সাড়া পালো পালাব্যেক্।"* এই বলিয়া লখাই সর্দ্দার মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "লখাইয়ের কথাবার্ত্তা ঐরূপ বটে; কিন্তু তার হৃদয়টি ভাল। আমি তার মত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত লোক অতি অল্পই দেখেছি। হরিণের পাল যেদিন থেকে আমার ধান নষ্ট করেছে, সেই দিন থেকে তাদের উপর তার ভয়ানক রাগ। সে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে হরিণ শীকার কর্‌তে যায়; কিন্তু একদিনও হরিণ মার্‌তে পারে নাই। আজও, দেখ না, হরিণ দেখেই বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন।

* প্রভু, আপনি অত উচ্চস্বরে কথা বলিবেন না। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলে হরিণগুলি পলাইবে।

সেই সময়ে তাঁহাদের মস্তকের উপরিভাগে বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া একটী পক্ষী তাহার সুমধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "বউ, কথা কও।" সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই পক্ষীর সেই সুমধুর স্বর শুনিয়া চমকিত ও আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এখানে চিরবসন্ত বিদ্যমান দেখ্‌ছি। আজ ভোরের সময় কোকিলের কুহুরব শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম থেকে উঠেছি। ঐ উপত্যকাভূমি হ'তে মাঝে মাঝে পাপিয়ারও ডাক শুন্‌তে পেয়েছি। আবার মাথার উপর এই বউ-কথা-কও পাখী মধুর অথচ করুণ স্বরে প্রণয়িনীর মান ভাঙ্গাচ্ছে। ব্যাপার কি হে? এ দেশ যে সত্যসত্যই নন্দন-কানন!"

পাখী আবার ডাকিল "বউ, কথা কও।" সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "ওহে পক্ষিবর, আমায় কেন আর ওকথা শোনাও? ক্ষেত্তর ভায়াও বোধ করি মানভঞ্জনের পালা এতদিন শেষ করেছেন। আর আমায় তো ইহজীবনে সে পালার অভিনয় কখনও করতেই হ'ল না। সুতরাং তুমি এখান থেকে সরে পড়।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আমি মানভঞ্জনের পালা প্রায় এক রকম শেষ করেছি বটে; কিন্তু তোমায় যে সে পালার অভিনয় কর্‌তে হবে না, তা কে বল্‌লে?··· আচ্ছা সতীশ, তুমি বিয়ে ক'র্‌লে না কেন? বিয়ে ক'রে ঘর সংসার ফাঁদতে কি ইচ্ছা হয় না?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বিয়ে আমি করি নি কেন, তা অনেক সময় আমি নিজেও ভালরূপে বুঝ্‌তে পারি না। বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা যে কখনও হয় নি, তাও নয়। তবে সে ক্ষণিক ইচ্ছা। এ আমি এক রকম বেশই আছি। দেখ, কারুর জন্য কোনও ভাবনা চিন্তা নাই। যা পাই, তা নিজের জন্য ও ইচ্ছামত খরচ করি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বিয়ে কর্‌বার জন্য তিনি আমাকে মাঝে মাঝে জেদ্ কর্‌তেন বটে; কিন্তু এখন জেদ্ কর্‌বার আর কেউ নাই, আর আমিও বেঁচেছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "তা বুঝ্‌লাম। কিন্তু তোমার ভাইভগ্নী তো আর কেউ নাই। সংসারে তুমি একাকী। এদিকে তুমি মোটা বেতনও পাও। আর তোমার কিছু অভাবও নাই। এরূপ স্থলে, বিয়ে কর্‌লে কি কোনও দোষ হ'ত?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তবে তোমায় বলি, শোন। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে; তার উপর কুলীন ব্রাহ্মণ। লেখাপড়াও কিছু শিখেছি। বিয়ে কর্‌ব মনে কর্‌লে আমি কত বিয়ে কর্‌তে পার্‌তাম বিয়ে কর্‌তে আমার আদৌ মন উঠে না তো আমি কি কর্‌ব, বল? যখন কলেজে পড়ি, তখন একটী ক'নে দেখ্‌তে গিয়েই বিয়ের উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়। সেই অবধি বিবাহে আর রুচি নাই।"

ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি রকম?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বল্‌ছি, শোন। তখন আমরা চাঁপাতলার মেশে থাক্‌তি। এক ঘট্‌কী সর্ব্বদা আমাদের মেশে যাওয়া আসা কর্‌ত। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, এইটি অবগত হ'য়ে সে আমাদের মেশে এক কুলীন কন্যার সন্ধান এনে রোজই আমার কাছে আর বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেই মেয়ের রূপগুণের বর্ণনা কর্‌ত। মেয়ের বাপ বীডন্ ষ্ট্রীটে থাক্‌তেন, আর ছোট লাটের দপ্তরে কি একটী বড় কাজ কর্‌তেন। তিনি একদিন আমার অজ্ঞাতসারে আমাদের মেশে এসে আমাকে দেখে যান, আর বোধ করি আমাকে পছন্দও করেন। কেননা, ঘট্‌কী তার পর আমাদের মেশে ঘন ঘন যাওয়া আসা কর্‌তে লাগ্‌ল, আর নগদ টাকা ও গহনা ইত্যাদির লোভ্ দেখাতে লাগ্‌ল। বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমাকে বল্‌লে 'চল, মেয়ে দেখে আসি।' আমিও কতকটা তাদের অনুরোধে প'ড়ে, আর কতকটা কৌতূহলপরবশ হ'য়ে তাদের সঙ্গে একদিন রবিবারে মেয়ে দেখ্‌তে গেলাম। মেয়ের বাপ আগে থেকেই আমাদের যাওয়ার কথা জান্‌তেন। আমরা তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ব'স্‌লাম। মেয়েটি প্রায় পনর বছরের; দেখ্‌তেও নেহাৎ মন্দ নয়। তার বাপ তাকে হালফ্যাশানে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বৈঠক-খানায় নিয়ে এলেন। মেয়েটির কথাবার্ত্তায় কেমন একটী নিকৃষ্ট ধরণের ফিরিঙ্গীয়ানা ভাব লক্ষিত হ'ল।

সে ভাবটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ বালিকারও ভাব নয়, আর আমাদের দেশের উন্নতিশীল বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মার্জ্জিত-রুচি বালিকাদেরও ভাব নয়। সেই কারণে, প্রথমেই তোমাকে ব'লে রাখি যে, মেয়েটিকে দেখে আমার মনে কোনও অনুরাগ বা উল্লাসের উদয় হয় নাই। আমি যেন একজন নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষের মত তার কথা-বার্ত্তা শুন্‌তে লাগ্‌লাম। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই মেয়েটি যেন আমাদের সংসারে ও আমার জীবনে বেশ মানানসই হ'বে না—যেন খাপছাড়া হ'বে। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, আমি তাদের বাড়ী থেকে শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পার্‌লেই যেন বাঁচি বাস্তবিক, যখন মেয়ে দেখা শেষ হ'ল, আর আমরা হ্রদের ধারে বেড়াতে লাগ্‌লাম, তখন আমি যেন হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম! মেয়ের সেই বিজাতীয়,—ও তোমায় বল্‌তে কি—সেই কেমন-এক-রকম অদ্ভুত ভাব দেখে আমার মন বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম, স্ত্রীর নমুনা যদি এই রকম হয়, তা হ'লে আমি জীবনে কখনও বিয়ে কর্‌ব না। সেই কারণে, আমি আর কখন কোথাও মেয়ে দেখি নাই, আর বিবাহ কর্‌তেও সম্মত হই নাই।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমার মনের ভাব বুঝ্‌লাম। হিন্দু পরিবারের একটী হিন্দুয়ানী ভাব আছে, তাহাই হিন্দুর বিশিষ্টতা বা জাতীয়ত্ব। সেই জাতীয়ত্বের সঙ্গে যা মিশ্‌ খায় না, সেইটি আমাদের ভাল লাগে না, বা তা কখনও আমাদের নিজস্ব হ'তে পারে না। যেমন হিন্দুর গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রোটন্‌ অপেক্ষা তুলসী গাছের অধিকতর শোভা, আর বিলাতী পুষ্পবৃক্ষ অপেক্ষা একটী যুঁইঝাড়ের অধিকতর সার্থকতা! এ সব কথা সত্য বটে; কিন্তু তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে তুমি যদি ক্রোটন্‌ রোপণ কর্‌তে না চাও, তা হ'লে একটী তুলসী গাছ তো অনায়াসে রোপণ কর্‌তে পার? তুলসী গাছের তো অভাব নাই; সন্ধান কর্‌লেই পাবে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সন্ধান কর্‌লে তুলসী গাছ যে পাওয়া যেত না, বা এখনও পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে আমি সবিশেষ কোনও চেষ্টা করি নাই, আর চেষ্টা কর্‌বার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখি না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, তুমি বল্লভপুরে যে 'সচল স্থলপদ্ম'টি দেখেছ, সেটিকে তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ কর্‌লে কি রকম হয়? তুমি যেমনটি চাও, ইনি ঠিক্‌ তেমনিটি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে; কুলীনকন্যা; প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে লালিতা পালিতা; স্বভাবচরিত্রে কোনও কৃত্রিমতা নাই; ঠিক্‌ সচল স্থলপদ্মই বটে। ইংরাজী না জান্‌লেও, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে; প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে গৃহিণীকে বাল্মীকির মূল রামায়ণ পাঠ ক'রে শোনায়। আর শুনেছি, প্রত্যহ শিবপূজো না ক'রে জলগ্রহণও করে না। আজ ছয় মাস আমরা তাকে দেখ্‌ছি, এমন মধুরস্বভাবা, মধুর-ভাষিণী আর সলজ্জা মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নাই। শুভ্র পুষ্পের ন্যায় ইনি নির্ম্মল ও পবিত্র। আমি তোমাদের মেলটেলের কথা জানি না। কিন্তু তুমি ও ভট্টাচার্য্য মশাই যখন এক গোত্রের নও, তখন আদান প্রদানে কোনও আপত্তি হ'বে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।"

ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "তুমি যে চমৎকার ঘট্‌কালী কর্‌তে পার, দেখ্‌ছি! আচ্ছা, এখন ওসব কথা যাক্‌। তোমাদের 'সচল স্থলপদ্ম' সম্বন্ধে, আর তাঁদের বংশ-সম্বন্ধে আরও পরিচয় জানা আবশ্যক। আমাদেরও পরিচয় ভট্টাচার্য্য মশাইকে জান্‌তে হ'বে। আমাদের হিন্দুসমাজটি অষ্টবন্ধনে বাঁধা; এ সমাজের মধ্যে অবাধ প্রেমের স্থান নাই। সংযমের উপরেই হিন্দুসমাজের স্থিতি, গতি ও উন্নতি। সংযমের অভাব হ'লেই হিন্দুর হিন্দুত্ব থাক্‌বে না।"

পাখী আবার ডাকিয়া উঠিল, "বউ, কথা কও।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার এই পাখীটা বড় জ্বালাতন কর্‌লে, দেখ্‌ছি। চল, এখান থেকে স'রে পড়া যাক্‌।"

সেই সময়ে লথাই সর্দ্দার মৃগয়ায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আবার একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, "চোখ্ গেল, চোখ্ গেল।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "এ যে আবার পাপিয়াও এসে পড়ল, দেখ্‌তে পাচ্ছি। সত্যসত্যই এরা আমাদের এখান থেকে তাড়ালে। অসময়ে বসন্তের আবির্ভাব! লক্ষণ বড় ভাল নয়।"

লখাই সর্দ্দার বলিল, "ইটোর নাম পাপিয়া নাই বটে! ইটো দেওরা।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "দেওরা? দেওরা নাম কেমন ক'রে হ'ল?"

লখাই বলিল "পাখ্‌টো কি রাকাড়্‌ছে, তুই নাই শুন্‌তে পাচ্ছুস্? ঐ যে পাখ্‌টো ব'ল্‌ছে 'শ্বশুর হে—শ্বশুর হে—দেওর কে হয়? দেওর কে হয়?"*

সতীশ ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "এইজন্যই বুঝি পাখীর নাম দেওরা হয়েছে? আচ্ছা, লখাই, আর একটী পাখী ঐ যে ডাক্‌ছে, ওর নাম কি?"

লখাই বলিল, "উটোর নাম আকু-পাকু হে। ঐ পাখ্‌টো জোড় হার'য়ে আকু-পাকু করুছে কি না?"†

আবার উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "ক্ষেত্তর, কে বলে এদেশে কবি নাই? এই পাখীটির আকু-পাকু নামই ঠিক্। আর আমার যখন কোনও ভাই নাই, আর তুমিও ভাসুর হ'বার দাবী রাখ, তখন দেওর কে হ'বে, তার মীমাংসার ভার তোমার উপরেই রইল।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

* "পাখীটি কি বলে ডাক্‌ছে, তা আপনি শুন্‌তে পাচ্ছেন না? ঐ যে পাখীটি বল্‌ছে "শ্বশুর গো, দেওর কে হয়? দেওর কে হয়?"

†"এই পাখীর নাম আকু-পাকু। পাখীটি জোড় অর্থাৎ সঙ্গিনী হারিয়ে হাকু-পাকু বা ছটফট্ করুছে কি না, তাই ওর নাম 'আকুপাকু' হ'য়েছে।"

ধরণী

নবমুকুলের গন্ধে আকুল—অধীর
বসন্ত-পবন,
কলকণ্ঠ-কুহরিত মাঙ্গলিক গীতে
মুখরিত বন।
মোহিনী ধরণী—আজি
নব পুষ্পভারে সাজি'
হেরিছে হৃদয়ে নব
প্রণয়-স্বপন।

২

ক্ষুব্ধ বৈশাখের বায়ু আতপ্ত—প্রখর
রবির কিরণ,
বিকশিত পুষ্পবনে শ্রান্ত ভ্রমরের
অলস গুঞ্জন।
মানিনী ধরণী—আজ
ছিন্ন করি' ফুল-সাজ
ভূতলে বিছায় তা'র
অঞ্চল-শয়ন।

৩

দলিত অঞ্জননিভ পুঞ্জ মেঘ দলে
মেদুর অম্বর,
আঁধারিয়া দশ দিশি বরষার ধারা
ঝরে ঝরঝর।
শূন্যগৃহে একাকিনী
কাঁদে ধরা-বিরহিণী,
দিগন্ত-বিলীন আঁখি,
কাতর অন্তর।

৪

খচিত উজ্জ্বল নীল শারদ আকাশ
শুভ্র মেঘস্তরে;
সরোবরে শতদল—শুভ্র বন ফুল
শ্যামল প্রান্তরে।
ধরণী—সৌভাগ্যবতী
পতিসোহাগিণী সতী,
মিলন-মধুর হাসি
প্রফুল্ল অধরে।

৫

মলিন ফুলের শোভা, সিক্ত দুর্ব্বাদল
হিম-বরিষণে;
হেমন্তের শস্যক্ষেত্র রঞ্জিত বিমল
সুবর্ণ বরণে।
জননী ধরণী—স্নেহে
সন্তানে ডাকিয়া গেহে,
ভাণ্ডার খুলিয়া রত
অন্ন-বিতরণে।

স্তব্ধ যত গীতগান, তুহিন-শীতল
বহে সমীরণ,
ঝরিয়া গিয়াছে জীর্ণ পত্র পুষ্পরাশি—
বিশীর্ণ কানন।
তুচ্ছ আভরণ যত;
বাসনা-বন্ধন গত,—
তাপসী ধরণী—আজি
ধ্যানে নিমগন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

গোত্র

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভাষা হইতে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাষা প্রকৃতপক্ষেই রত্নগর্ভা—ইহাতে অনেক রত্ন নিহিত রহিয়াছে। আমরা অনেক কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার অর্থ প্রণিধান করিয়া দেখি না এবং অনেক সময়ে ভুল অর্থে সেই সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রাচীন ভাষা আলোচনা না করিলে বর্ত্তমান ভাষা সব সময়ে পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমরা অদ্য ঋগ্বেদের সাহায্যে 'গোত্র' শব্দটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব ভাষার অন্তরালে কত তত্ত্ব লুকায়িত রহিয়াছে।

'গোত্র' একটী প্রচলিত কথা; কিন্তু ইহার অর্থ-বিষয়ে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নাই। প্রকৃতিবাদ অভিধানে লিখিত আছে, "গোত্র = গু (শব্দকরা)+ত্র, সংজ্ঞার্থে; যে পূর্ব্বপুরুষদিগকে উক্ত করে।" কেহ কেহ বলেন গোত্র = গো (=পৃথিবী) + ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড = যিনি পৃথিবীকে রক্ষা করেন বা পালন করেন অর্থাৎ ভরদ্বাজাদি ঋষি। এ সমুদয় অর্থই মনঃকল্পিত বলিয়া মনে হয়। যেখানে সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে কোন গোলমাল হয় না বরং অর্থ পরিষ্কার হয় সেখানে সাধারণ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। গোত্র = গো + ত্রৈ + ড; এখানে 'গো' এবং 'ত্রৈ' শব্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিলেই, "গোত্র" শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হইবে। গো = গোরু এবং ত্রৈ = ত্রাণ করা; যাহা গোরুকে রক্ষা করে তাহাই গোত্র অর্থাৎ গোশালা, 'গোয়াল'। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ঋগ্বেদ পাঠ করিলে সেই সিদ্ধান্তকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত হইল।

১। একস্থলে (১৫১।৩) আছে—হে ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাদিগের জন্য 'গোত্র' খুলিয়া দিয়াছিলে (ত্বম্ গোত্রম্ অঙ্গিরোভ্যঃ অবৃণোঃ)।

২। "সোমরসের মত্ততায় ইন্দ্র দৃঢ় 'গোত্র' ভগ্ন করিয়াছিলেন"—গোত্রা সহসা মদে সোমস্য দৃংহিতানি ঐরয়ৎ। ২।১৭।১।

৩। "তুমি গো সমূহের 'গোত্র'কে খুলিয়া দিয়াছিলে" গবাম্ গোত্রম্ উৎ অসৃজঃ। ২।২৩।১৮।

৪। "'গোত্র' বিদীর্ণ করিয়া আমাদিগকে গো দান কর, উপভোগযোগ্য ধনাদি আমাদিগের নিকট আগমন করুক, হে মঘবন্! তুমি আমাদিগকে গো দান কর" (আ নঃ গোত্রা দদৃহি—ইত্যাদি ৩।৩০।২১)।

৫। "হে ইন্দ্র! আমাদিগের যে পিতৃগণ গো সমূহের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাহাদিগের নিন্দক কেহ নাই। মহিমাবান্ পরাক্রমশালী ইন্দ্র ইহাদিগের জন্য দৃঢ় 'গোত্র' খুলিয়া দিয়াছিলেন" (ইন্দ্র এষাম্ দৃংহিতা মাহিনবান্ উত গোত্রাণি সসৃজে দংসনাবান্ ৩।৩৯।৪)।

৬। "তুমি আমাদিগের নেতা; অঙ্গিরাগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তুমি 'গোত্র' ভেদ করিয়া (গোত্রা রুজন্) বহু ধন প্রদান করিয়াছিলে।" ৪।১৬।৮।৭।

৭। "হে উষা! এখন অঙ্গিরাগণ তোমার গো সমূহের 'গোত্র'কে প্রশংসা করিতেছে (গোত্রা গবাম্ গৃণন্তি)। তাঁহারা মন্ত্র দ্বারা গোত্র ভেদ করিয়াছিলেন (বিভিদুঃ) ৬।৬৫।৫।

এখানে কিরণকে 'গো'র সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

৮। একস্থলে বলা হইয়াছে যে স্তোতৃগণ গোত্র লাভের জন্য (গোত্রস্য দাবনে) স্তুতি করিতেছে (মোক্ষমূলারের সংস্করণে ৮।৬৩।৫; বোম্বাই সংস্করণে ৮।৫২।৫)।

৯। "আমাকে 'গোত্র' অর্পণ কর" (ময়ি গোত্রম্) ৮।৫০।১০।

১০। "তুমি অঙ্গিরাদিগের জন্য 'গোত্র' উন্মুক্ত করিয়াছিলে" গোত্রম্ অঙ্গিরোভ্যঃ অবৃণোঃ অপ। ৯।৮৬।২৩।

১১। "আমি দধীচি ও মাতরিশ্বাকে 'গোত্র' প্রদান করিয়াছিলাম (আদদে গোত্রা) ১০।৪৮।২।

১২। একস্থলে ইন্দ্রকে 'গোত্রভিদম্' 'গোবিদম্' বলা হইয়াছে ১০।১০৩।৬। যিনি গোত্র ভেদ করেন তিনি গোত্রভিৎ।

১৩। অপর একস্থলে বৃহস্পতির রথকে 'গোত্রভিদম্' বলা হইয়াছে ২।২৩।৩।

রথে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের 'গোত্র' হইতে গাভী আনয়ন করা হয় এইজন্য এখানে রথকেই 'গোত্র-ভিদ্' বলা হইয়াছে।

১৪। একস্থলে বলের সহিত গোত্রে প্রবেশ করিবার (অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানঃ) কথা বলা হইয়াছে। ১০।১০৩।৭ এবং অথর্ব্ববেদ ১৯।১৩।৭।

এই সমুদয় [illegible] পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় 'গোত্র' ='গোশালা', যেখানে গোরুকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

প্রাচীনকালে পশুই—বিশেষতঃ গোরুই—লোকের প্রধান সম্পত্তি ছিল। পাশ্চাত্য ভাষাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজী Pecuniary = অর্থ সম্বন্ধীয়; লাটিন Pecus হইতে নিষ্পন্ন এবং এই শব্দের অর্থ পশু।

গোরু দল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে, হিংস্রজন্তু গোরুবাছুর লইয়া পলায়ন করিতে পারে এবং শত্রুগণও এই সমুদয় অপহরণ করিতে পারে। এই সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গোরুবাছুরকে একটী স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; ইহারই নাম গোত্র বা গোষ্ঠ। প্রাচীনকালে গোরু লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ঋগ্বেদে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে—মহাভারতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা দুর্ব্বল কিম্বা একাকী বাস করিত তাহাদের পক্ষে এসব রক্ষা করা মহা বিপদ হইয়াছিল। সেইজন্য সকলকেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইত। দল হইলেই নেতা থাকা চাই; যাঁহারা গুণে, জ্ঞানে, ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকেই নেতৃত্বে বরণ করা হইত। বশিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপে দলপতি হইয়াছিলেন। এক এক দলের এক এক 'গোত্র' ছিল। গোত্রপতির নাম হইতেই গোত্রের নাম হইত; এইরূপে বশিষ্ঠ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, কাশ্যপ গোত্র ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহারা অত্রির দলে থাকিত তাহারা বলিত আমরা অত্রি গোত্রের লোক; যাহারা ভরদ্বাজের দলে থাকিত তাহারা বলিত আমরা ভরদ্বাজ গোত্রের লোক;—পরিচয় দিবার সময় লোকে গোত্র দ্বারাই পরিচয় দিত।

যাহারা কোন একটী গোত্রে বাস করিত তাহারা যে সকলেই এক রক্তের সম্পর্কীয় লোক তাহা নহে—বিভিন্ন পরিবারের লোক দলবদ্ধ হইয়া এক গোত্রপতির আশ্রয় গ্রহণ করিত। এপ্রকারও ঘটিত যে একজন এক সময়ে এক গোত্রে রহিয়াছে, কালে হয়ত সে অপর গোত্রে চলিয়া গেল। গৃৎসমদ অঙ্গিরা-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ভৃগুবংশে যোগ দিয়াছিলেন।

প্রথমে 'গো' লইয়াই 'গোত্র' রচিত হইয়াছিল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'গো' সম্পর্ক চলিয়া গেল—কিন্তু দল ও দলপতি রহিয়াই গেল। পূর্ব্বে যেমন লোকে 'গোত্র' দ্বারাই পরিচিত হইত, 'গো'-সম্পর্ক চলিয়া যাইবার পরও সেই পূর্ব্বের নামেই পরিচিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সেই গোত্র দ্বারাই পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু এখন সে 'গো'ও নাই—সে 'গোত্র'ও নাই।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

মিত্রমূর্ত্তি

বঙ্গদেশে অদ্যাপি যে-সকল মূর্ত্তি-শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বিষ্ণু, বুদ্ধ ও সূর্য্য পর্য্যায়ের মূর্ত্তির সংখ্যাই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে মূর্ত্তি শিল্পের উৎকর্ষ-কালের মধ্যে, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং সৌরধর্ম্ম সমধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

উল্লিখিত ত্রিবিধ মূর্ত্তির প্রতি পর্য্যায়ে, বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন গঠনের এবং বিভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তিগুলি ভাস্করগণ কর্ত্তৃক

তক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বুদ্ধ ও বিষ্ণু পর্যায়ের মূর্তি-গুলির বিভিন্ন অবস্থা ও আখ্যা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বহু আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু সূর্য্য-মূর্তির পার্থক্য সম্বন্ধে ততদূর আলোচনা অদ্যাপি হইতেছে না। ইহার ফলে আমরা উপানৎ-পরিহিত এবং সপ্তাশ্ব-যোজিত মূর্তিমাত্র-কেই এক সাধারণ সূর্য্যমূর্তি আখ্যা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি।

মূর্তি-শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে এপর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সূর্য্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিষ্ণু ও বুদ্ধ-মূর্তির ন্যায় ঐ-সকল মূর্তির মধ্যেও পরস্পর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ মূর্তি সমূহের কোনোটীতে দ্বাদশা-দিত্যের মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, কোনোটীতে বা দ্বাদশা-দিত্যের মূর্তির স্থলে একাদশটী মূর্তি তক্ষিত হইয়া মূলমূর্তি-দ্বারা দ্বাদশাদিত্যের সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। কোনো-টীতে বা দ্বাদশাদিত্যের মূর্তি একেবারেই তক্ষিত হয় নাই। অনুষঙ্গী-মূর্তির সংখ্যাও কোনোটীতে অল্প এবং কোনোটীতে অধিক। এই-সমস্ত বৈলক্ষণ্য যে ভাস্করগণের খামখেয়ালী, এইরূপ বিবেচনা করাও যুক্তি-সঙ্গত নহে। পুরাণে ভগবান্ ভাস্করের দ্বাদশমূর্তির উল্লেখ আছে। উহাই দ্বাদশাদিত্য নামে খ্যাত দ্বাদশাদিত্যের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে "শব্দকল্পদ্রুম" নামক অভিধানে পুরাণ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে;—"ত্বষ্টৃ-কন্যা সংজ্ঞা আদিত্য-পত্নী আদিত্যস্য তেজঃ সোঢ়ুমসমর্থা অতস্তস্যাঃ পিতৃকৃতাদিত্য-দ্বাদশখণ্ডা দ্বাদশাদিত্যাঃ। তেষাং দ্বাদশ মাসেষ্বেকৈকস্যোদয়ঃ।"

ত্বষ্টার কন্যা, আদিত্য-পত্নী সংজ্ঞা, আদিত্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহার পিতা (ত্বষ্টা) আদিত্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহারই এক একটী এক এক মাসে উদিত হন।

উক্ত দ্বাদশাদিত্য বৈশাখাদি মাস ভেদে কি কি নামে উদিত হ'ন কূর্ম্ম পুরাণের ৪০ অধ্যায়ে তাহা নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

বরুণো মাঘ মাসেতু সূর্য্যপূষাতু ফাল্গুনে।
চৈত্রে মাসি ভবেদীশো ধাতা বৈশাখ-তাপনঃ॥
জ্যৈষ্ঠমূলে ভবেদিন্দ্র আষাঢ়ে সবিতা রবিঃ।
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃস্মৃতঃ॥
পর্জ্জন্যোঽশ্বযুজিত্বষ্টা কার্ত্তিকে মাসি ভাস্করঃ।
মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণু সনাতনঃ॥"

সূর্য্যদেব মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুন মাসে পূষা, চৈত্র মাসে ঈশ, বৈশাখ মাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে সবিতা, শ্রাবণ মাসে বিবস্বান, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে ত্বষ্টা, কার্ত্তিক মাসে ভাস্কর, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র এবং পৌষ মাসে বিষ্ণু নামে আখ্যাত

মিত্রমূর্তি।

কোনো না কোনো পুরাণগ্রন্থে সূর্য্যদেবের এই দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ প্রকার মূর্তির বর্ণনা বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নহে। অধুনা বহু পুরাণগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অনেক পুরাণ আমাদের বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য। বিগত ১৩১৮

বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যা "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" "চুঁচুড়ার সূর্য্যমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধের শেষে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে, উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়, "বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্র" হইতে দ্বাদশাদিত্যের অন্তর্গত মিত্রদেবের মূর্ত্তির পূর্ণ পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এই গ্রন্থে দ্বাদশাদিত্যের অন্তর্গত মিত্রমূর্ত্তি ব্যতীত অপর একাদশ আদিত্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ভরসা করি প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রে মিত্রমূর্ত্তির পরিচয় নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথিং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুক-চর্ম্ম-বক্ষসম্॥
অকুঞ্চিত সুকেশস্তু প্রভামণ্ডল-মণ্ডিতম্।
কেশ-বেশ-সমাযুক্তং স্বর্ণরত্ন-বিভূষিতম্॥
নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে বামে রাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা।
সর্ব্বাভরণ-সংযুক্তা কেশহার-সমুজ্জ্বলা॥
এবমুক্তে রথস্তস্য মকরধ্বজ ইষ্যতে।
মুকুটঞ্চাপি দাতব্যমন্যৎ সর্ব্বং সমণ্ডলম্॥
একবক্ত্রাঙ্গি গা দণ্ডো স্কন্দস্তেজো করাম্বুজম্।
কৃত্বাতু স্থাপয়েৎ পূর্ব্বং পুরুষাকৃতরূপিণৌ॥
হয়ারূঢ়স্তু কুর্ব্বীত পদ্মস্থং বাচ´নামকম্।
স দিব্যমানবপুষং সর্ব্বলোকৈকদীপকম্॥
জাতিহিঙ্গুল্যসংস্থাপ্য কারয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্।
চতুর্ব্বাহুর্দ্বিহস্তোবা রেখামণিবিভাজনা॥
দ্বিহস্তস্থসরোজন্ম সবলাশ্বরথস্থিতঃ।
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালোচ খড়্গিনৌ॥"

(বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্প)

(মিত্রদেব) সপ্তাশ্ব ও সারথিযুক্ত একচক্র মহারথে অধিষ্ঠিত। দুই হস্তে পদ্ম এবং বক্ষে কঞ্চুক ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কেশগুলি অকুঞ্চিত এবং প্রভা মণ্ডল-মণ্ডিত। কেশ সুবেশযুক্ত এবং স্বর্ণ-রত্ন-বিভূষিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নিক্ষুভা, বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী। উভয়ে সর্ব্বাভরণসংযুক্তা এবং কেশহার-সমুজ্জ্বলা। উক্ত রথ মকরধ্বজ বলিয়া বিখ্যাত। সকলেরই মণ্ডলযুক্ত মুকুট দিতে হইবে। মিত্রদেবের সম্মুখ ভাগে পুরুষরূপী দুইটী মূর্ত্তি করিতে হইবে, তন্মধ্যে দণ্ড বা যমের এক বক্ত্র এবং স্কন্দ তেজোকরাম্বুজ হইবেন। দিব্যদেহধারী এবং সর্ব্বলোকের আলোকদানকারী বার্চকে হয়ারূঢ় পদ্মের উপর স্থাপন করিবে। সূর্য্যের মণ্ডল জাতি-ও-হিঙ্গুল-' বর্ণবৎ হইবে। চতুর্ভুজই হউক আর দ্বিভুজই হউক, মিত্রদেবকে রেখামণি দ্বারা সুশোভিত, দ্বিহস্তোপরি পদ্ম ও সবলাশ্বরথে স্থাপন করিবে। দণ্ড ও পিঙ্গল নামক খড়্গধারী দুইটী দ্বারপালকেও রাখিতে হইবে। *

উল্লিখিত মূর্ত্তির পরিচয়ে, মিত্রদেব ও তাঁহার অনুষঙ্গী-গণের পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় চুঁচুড়ার-সূর্য্যমূর্ত্তি এবং ময়ূরভঞ্জের দুর্গম জঙ্গলে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি, এতদুভয়কেই মিত্রমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উক্ত প্রবন্ধে ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের চিত্র সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় মিত্রমূর্ত্তি হইলেও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রোক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মিত্রমূর্ত্তির যে চিত্র সংযোজিত হইল, পাঠকগণ তাহার সহিত উল্লিখিত পরি-চয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন।

মিত্রদেবের দুই হস্তে সনালবিকশিত পদ্ম। বক্ষস্থল কঞ্চুক দ্বারা আবদ্ধ। মস্তকে সুশোভন মুকুট। হস্তে কেয়ূর ও কর্ণে কুণ্ডল। বামস্কন্ধ হইতে নাভির উপরিভাগ পর্য্যন্ত মাল্যাকারে গ্রথিত উপবীত। পরিধেয় বসন সুবিন্যস্ত। পশ্চাৎদিক হইতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থূল-মাল্য দোদুল্যমান। পদদ্বয় উপানৎ-পরিহিত। পদতলে বিকশিত বৃহৎপদ্ম, তন্নিম্নে সপ্তাশ্ব যোজিত। ঠিক মধ্য-স্থলের অশ্বটীর পৃষ্ঠে উদ্যত হস্তে সারথি অরুণ উপবিষ্ট। মিত্রদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে নিক্ষুভা এবং বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী দণ্ডায়মানা; তাঁহারা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা। সম্মুখের দুই পার্শ্বে দুইটী পুরুষমূর্ত্তি; তাঁহাদের মধ্যে বাম পার্শ্বেরটী দণ্ড অর্থাৎ যম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অসি। দক্ষিণ পার্শ্বেরটী স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়। স্কন্দের একহস্তে বিকশিত পদ্ম ও অপর হস্তে ঘৃতভাণ্ড, তাঁহার উদর স্থূল এবং বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু বিরাজিত। মিত্রদেবের ঠিক সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া —বার্চ অর্থাৎ বরুণ। দণ্ড ও স্কন্দের দুই পার্শ্বে খড়্গধারী দুইটী দ্বারপাল শোভা পাইতেছে। উহাদের মধ্যে একের

* নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ।

নাম দণ্ড এবং অপরের নাম পিঙ্গল। উভয়েই মল্ল বেশে দণ্ডায়মান।

পাঠক দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রোক্ত মিত্রমূর্ত্তির পরিচয়ের সঙ্গে আলোচ্য মূর্ত্তির কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে! ভাস্কর যেন উক্ত গ্রন্থ সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মূর্ত্তিখানা তক্ষণ করিয়াছে! স্বীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ভাস্কর বেশভূষা বিষয়ে বিশেষ আড়ম্বর করিয়াছে বটে কিন্তু মূল বিষয়ে উল্লিখিত পরিচয়ের কোনো প্রকার অপলাপ সংসাধিত হয় নাই। শাস্ত্রোক্ত পরিচয়ে, অনুষঙ্গীগণের সংখ্যা সারথি সহ নয়টী। আলোচ্য মূর্ত্তিতেও ঠিক তাহাই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

মূর্ত্তিখানির শীর্ষদেশে কীর্ত্তিমুখ-চিহ্ন বিরাজমান রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই উহার প্রাচীনত্ব সূচিত হইবে। শিল্প হিসাবেও যে মূর্ত্তিখানি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত, তাহাতেও সন্দেহের কোনো কারণ নাই।

এই সৌরযুগের অবসানে এখনো আমাদের দেশে মিত্রসপ্তমীতে (অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসাদির নিয়ম প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। মিত্রসপ্তমী সম্বন্ধে "সম্বৎসর-কৌমুদী" নামক গ্রন্থে, ভবিষ্য পুরাণ হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে;—

> অদিতেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মিত্রোনাম দিবাকরঃ।
> মার্গশীর্ষস্য মাসস্য শুক্লেপক্ষে শুভেতিথৌ॥
> সপ্তম্যাং তেন সাখ্যাতা লোকেঽস্মিন মিত্রসপ্তমী।
> তত্রোপবাস কর্ত্তব্যো ভক্ষ্যানথ ফলানি বা॥

এই মূর্ত্তিখানি ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের রাজকুমার "ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার" নামক ইতিহাস-গ্রন্থ-প্রণেতা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়ের পুস্তকাগারে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তিনি এই মূর্ত্তির পরিচয় প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিয়া এবং শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ইহার আলোকচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমাকে বিশেষ সুহায়তা করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

পুরীর চিঠি

ধূ ধূ বালির বিথার যেথা মিলায় পারাবারে
আমি এখন রয়েছি সেই পাতাল-পুরীর দ্বারে।
সম্মুখে নীল জলের রাশি নেই কিনারা কূল,—
ফোটেনা এই কালীদহে রাঙা কমল ফুল।
হীরাকষের কষ মেতেছে তুঁতের রসে রসি'
গড়ায় যেন বিশ্বলোকের ললাট-লিপির মসী।
আস্‌মানী নীল রঙের সাথে জলঙ্গা নীল মেশে,—
জগৎ যেন মিলিয়ে যাবে প্রলয়-মেঘের দেশে!

*   *   *   *

নীল কাজলের তুলি আমার চোখে বুলায় কে রে!
যে দিকে চাই নিবিড় নীলে নয়ন আসে ভেরে!
মায়া-কাজল মন্ত্র-পড়া—ভুল কিছু নেই তায়,—
মায়া-ভুবন মুক্ত হেরি আমার ডাহিন বাঁয়।
পাতাল-পুরীর সিং-দরজায়, উছল ঢেউয়ের পাশে,
ময়াল-সাপের হুড়কা ঠেলে নাগবালারা আসে;
মুক্তা-ঘেরা ঘোম্‌টা তুলে চোখ্ মেলে যেই তারা,
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফেনা ফটিক-পারা।

*   *   *   *

ফেরৎ ঢেউয়ের পথ আগুলে দাঁড়ায় 'বাঘা' ঢেউ,
সাপ্‌টে তিমি গিল্‌তে পারে এম্‌নি বৃহৎ কেউ!
বলের গর্ব্বে পর্ব্বে পর্ব্বে সাগর ওঠে ফুলে
দিগ্‌দিগন্তে অঙ্গ মেলে অট্টহাসি তুলে!—
সরিৎ-পতির হস্তামলক শুষ্ক বসুন্ধরা,
তিমি-গেলা তিমিঙ্গিলা আতঙ্কে আধ্‌মরা।—
চৌদ্দ মাদল বাজে হঠাৎ,—হৃদয় ওঠে মেতে,—
হরধনুর্ভঙ্গ-খেলা ভঙ্গ-তরঙ্গেতে।

*   *   *   *

দক্ষিণের এই দ্বারে স্বয়ং মৃত্যু আছেন বুঝি
চারদিকে তাই যমের মহিষ ঢেউয়ের যোঝাযুঝি,
চারদিকে তাই হাপর চলে, হাঁপর হ'য়ে দেখি,
চারদিকে তাই মাথা কোটে স্বর্গলোভী ঢেঁকি!
ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলেছে শুধু ঢেউয়ের মেলা,
ঢেউয়ের সাথে তলায় কৃত সাগরিকার ভেলা।

কঙ্কাবতীর নৌকা—তাও—এড়ায়নি এই চোখ,—
নেবু-ফুলের ডোর জড়ানো গলুইটা ইস্তক !

লাখ্ হাতীর ওই হল্‌কা বেরোয় কার শোভা-যাত্রাতে ?
বরুণ-পুরীর বাড়ব-ঘোড়া ছুট্‌ছে সাথে সাথে !
এরাই বুঝি বাঁধা ছিল কপিল-গুহা-তলে
ছাড়া পেয়ে ছুট্‌ল হঠাৎ ঘুণ্টি-মালা গলে।—
কোন্ দিকে ধায়, নেই ঠিকানা,—ঠিক লেগেছে 'ভুলো'
ভিড় করে তার পিছন নেছে দ্রবিড় কতকগুলো !
ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণান্ত হয় তরঙ্গ-সঙ্কটে,—
জলোৎকা আর সঙ্কটা মাছ আছড়ে পড়ে তটে।

* * * *

কতই কথা লিখ্‌ছে সাগর লিখ্‌ছে বারো মাস
উতলা ঢেউ লিখ্‌ছে সাগর-মথন-ইতিহাস ;
দেখ্‌ছি আমি মুহুর্মুহু জাগ্‌ছে দিকে দিকে
সাপের রশি সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে ;
উঠ্‌ছে সুধা, ফুট্‌ছে গরল ; যাচ্ছে যেন চেনা
আড়ক-হাতে লক্ষ্মী !—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো ;—চল্‌ছে অভিনয়
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা—দুরন্ত দুর্জ্জয়।

ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে
নীল-জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে !
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল উল্‌টে গেল পট
ঘাঘরা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট !
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায়
ফেনার চারু চিকণ কারু দুল্‌ছে পায়ে পায়।
কালীদহের কমল-কলি কালিপেটা পাখী
চরণে তার শুভ্র ফুলের অঞ্জলি দেয় আঁকি।

* * * *

এই সমুদ্র—ভীষণ, মধুর ;—কাছে থেকেও দূর ;
জগৎ-পতির গোপন ছবির রহস্য-মুকুর।
এই তো হরি-বাসর-রাতের শয্যা সুবিস্তার,
শেষ-তোলানি সোনার মোহর—ঊষার কিরণভার।
জ্যোৎস্না-রাতে এই সমুদ্র আনন্দ-ফোয়ারা ;—
কালো অগুরুর পাত্রে ঝরে চন্দনেরি ধারা।

ঢেউয়ের হাজার কুব্জা হেথায় করছে ঠেলাঠেলি
কুঁজায় সোজা করে যে তায় দেখবে নয়ন মেলি।

এই সমুদ্র বিশ্বরাজের বিমুক্ত রাজপথ,
জগৎ-জয়ের শক্তি-সাধন্-মার্গ সুমহৎ।
কঠোর পণের কুঠার দিয়ে মোদের ভৃগুরাম
হঠিয়ে এরে, গড়েছিলেন নগর অভিরাম !
এই সমুদ্রে বশে এনে বঙ্গ-যুবরাজ
বিজয় সিংহ পরেছিলেন সম্রাটেরি তাজ।
শ্রীমন্ত এ পার হয়েছেন ভয়-ভাবনা ভুলে
অগস্ত্য এ পান করেছেন অঞ্জলিতে তুলে !

* * * *

এই সমুদ্র,—কান্ত, রুদ্র,—বিরাগ এবং স্পৃহা
অঘোর-শয়ান স্বয়ম্ভুদেব—তাঁর প্রতিমা ইহা।
এই সমুদ্র চতুর্ম্মুখের মতন চতুর্দ্দিকে
মারণ ঘোষে অথর্ব্বে আর শান্তি সামে ঋকে।
এই সমুদ্র অগাধ অকূল দুরন্ত দুর্গম,—
শক্তিমানের সাঁতার-পানি, দুর্ব্বলের এই যম,—
এই সমুদ্র—গণ্ডূষে এ পান ক'রেছি মোরা,
পার হ'তে আজ পাঁতি খুঁজি—অগস্ত্যের আব্-খোরা।

* * * *

এই সমুদ্র রক্ষা করে আপন বক্ষ-নীড়ে
বুদ্ধদেবের পুণ্য-পূত ভিক্ষা-পাত্রটিরে।
মৈত্রী-মন্ত্রে হ'বে যেদিন দীক্ষা সবাকার
মৈত্রেয় দেব বুদ্ধ হবেন—বিশ্বে অবতার ;
যুদ্ধ যেদিন লুপ্ত হ'বে শুদ্ধ হবে মন
সেদিন সাগর ফিরিয়ে দেবে গচ্ছিত সেই ধন ;
চতুর্ম্মহাদেশের লোকে তুল্‌বে বরণ ক'রে
প্রেমের কণায় রাজ-ভিখারীর পাত্রখানি ভ'রে।

* * * *

এই সমুদ্র !—কুক্ষিতে এর আগুন আছে, বলে,
আমি জানি আঁধারে এর জলে জোনাক্ জ্বলে।
ভেলার আঠা অন্ধকারে জড়ায় যখন আঁখি—
ঘরে যখন ফিরেছে লোক কুলায়-মাঝে পাখী—
তখন জ্বলে ঢেউয়ের মালায় জলের জোনাক পোকা
তটের সীমায় চূর্ণ হীরা—নেইক লেখা জোখা ;

লুঠেছি সেই সাপের মাণিক ভয় করিনি ফণা
ধরেছি দুই হাতে লুফে বাড়ব-শিখার কণা।

এই সমুদ্র—খাম-খেয়ালি,—খেয়ালের এই ধাম,—
পাতাল-পুরীর দ্বারে লেখায় 'স্বর্গ-দুয়ার' নাম!
এই সমুদ্র,—মুদ্রা তো ঢের, - রত্ন আছে পেটে,
পেলাম মাত্র রঙীন্ ঝিনুক—বেলার বালি ঘেঁটে।
এই সমুদ্র,—সমূহ ঘুম আছে ইঁহার হাতে,—
পাচ্ছি প্রসাদ যখন তখন দিনে এবং রাতে।
এই সমুদ্র কর্ম্মী স্বয়ং কাজ-ভুলানোর রাজা
ত্রিসীমায় এঁর যে এসেছে কাজ-ভোলা তার সাজা।
লিখ্‌ব কোথায় পুরীর কথা,—হ'লনা তার লেশ
সাগরের সাত কাহণ কথায় পুরীর চিঠি শেষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ

(গল্প)

(১)

মেয়ে-স্কুলের গাড়ীর সহিস আসিয়া হাঁকিল—"গাড়ী আয়া বাবা!"

অমনি কালো গোরো মেটে শ্যামল কতকগুলি ছোট বড় মাঝারি মেয়ে এক-এক মুখ হাসি আর চোখভরা কৌতুকচঞ্চলতা লইয়া বই হাতে করিয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একটি ছোট মেয়ে একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ময়ূরের পেখম-শিহরণের মতন কাঁপাইয়া তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান একটি কিশোরী সুন্দরীকে বলিল—"দেখ ভাই বিভা-দি, এ আবার কি রকম সহিস!"

বিভা তাহার সুন্দর চোখ দুটি নূতন সহিসের মুখের উপর একবার বুলাইয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—"কি রকম সহিস আবার? অত হাসছিস কেন মিছিমিছি?"

ছোট মেয়েটি তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"কত বড় ঘোড়ার কতটুকু সহিস!"

এতক্ষণে তাহার হাসির কারণ বুঝিতে পারিয়া সব মেয়ে ক'টিই হাসিয়া হাসিয়া বার বার তাহাদের স্কুল-গাড়ীর ছোট্ট নূতন সহিসের দিকে চাহিতে লাগিল।

সহিস বেচারা একেবারে নূতন, তাহাতে বালক; এই সব ফুলের মতো মেয়েদের পরীর মতো বেশ দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গিয়াছিল; এখন তাহাদের হীরক-ঝরা হাসির ধারা দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল; সঙ্কোচে লজ্জায় থতমত খাইয়া সে একবার ঈষৎ চোখ তুলিয়া অপাঙ্গে মেয়েদের দিকে তাকায় আবার পরক্ষণেই চক্ষু নত করে।

বিভার মনে পড়িল রবিবাবুর ইয়ুরোপের ডায়ারির কথা। ইটালিতে আঙুরের মতো একটি ছোট্ট মেয়ে-প্রকাণ্ড একটা মোষকে দড়ি ধরিয়া চরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া চশমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্রাজুয়েট স্বামীর ছোট্ট নোলক-পরা বৌএর উপমা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। বিভারও তাই ভারি হাসি পাইল। সে হাসিমুখে তাহার সঙ্গিনীদের ধমকাইয়া বলিল—"নে নে থাম, শুধু শুধু হাস্‌তে হবে না। চ।"

পশ্চাৎ হইতে পুরাতন সহিস চীৎকার করিয়া উঠিল—"আস না বাবা! বহুত দেরী হচ্ছে যো!"

মেয়েগুলি কাহারো শাসন না মানিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে লজ্জিত কুণ্ঠিত বালক সহিসের হাতে নিজেদের বই শেলেট খাতা চাপাইয়া দিয়া চলন্ত ফুল-গুলির মতো আপনাদের চারিদিকে একটি রূপের মোহের আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া একে একে গিয়া গাড়ীতে উঠিল—কোনোটি ফুটন্ত, কোনোটি ফোটো-ফোটো, কোনোটি বা মুকুল কলিকা। সহিস দুজন গাড়ীর পিছনে পা-দানের উপর চড়িয়া দাঁড়াইল। গাড়ী দূরের মেঘ-গর্জ্জনের মতো গুরু-গম্ভীর শব্দে পাড়াটিকে উচ্চকিত করিয়া অপর পাড়ায় মেয়ে কুড়াইতে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

যে মেয়েটি প্রথমেই হাসির ফোয়ারার চাবি খুলিয়া দিয়াছিল সে লম্বা গাড়ীর অন্ধকার জঠরের ভিতর হইতে গাড়ীর পিছন দিকের চৌকো জানলার ঘুলঘুলির মুখের কাছে সেই নূতন সহিসকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

আবার হাসিতে কুটিকুটি হইয়া বলিল—"দেখ বিভাদি দেখ, ওর মাথায় কি টোকা-পানা চুল!"

বিভা গাড়ীর পিছনের জানলার মুখের কাছেই বসিয়া ছিল। সে একবার যেন বাহিরের দিকে চাহিতেছে এমনি ছলে নূতন সহিসকে দেখিয়া লইল। তাহার একমাথা বাবরি চুল রুক্ষ জটায় এলোমেলো হইয়া মুখের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে। তাহার মাঝখানে যেন কালো পাথর কাটিয়া কুঁদিয়া-বাহির-করা কিশোর সুকুমার মুখখানি একটি নীল পদ্মর মতো, রমণীর হাসির সম্মুখে লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিভা সংক্রামক হাসি কষ্টে চাপিয়া চোখ দুটিতে তিরস্কার হানিয়া হাসির রাণী সেই মেয়েটিকে বলিল—"দেখ্ ভিমরুল, ফের হাসলে মার খাবি।"

এ শাসনে কেহই বশ মানিল না। এক-এক বাড়ী হইতে এক-একটি নূতন মেয়ে আসিয়া গাড়ীতে চড়ে আর হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া হাসির প্রবাহ আর থামিতে দেয় না। গাড়ীর ভিতরে ভিড়ও যত বাড়ে, ঠাসাঠাসির মধ্যে হাসিও তত জমাট হইয়া উঠে।

কিশোর সহিসটি সেই ঘুলঘুলির মুখের কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া নিরাশ্রয় অসহায় ভাবে কিশোরীদের হাসির সূচীতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে আপনাকে লুকাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার লুকাইবার জো ছিল না। তখন সে যথাসম্ভব এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিভার আড়ালে আপনাকে গোপন করিল। সে ছাতুখোর মেড়ো এবং একেবারে গঁওয়ার হইলেও এটুকু সে বুঝিতে-ছিল যে যে-মেয়েটি জানলার মুখের কাছে বসিয়া আছে সে মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া না-হাসিতেই চাহি-তেছে; সে সকলের হাসির হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে বাঁচাইত। সে একবার করুণ নেত্রে বিভার দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকাইয়া, কুণ্ঠিত নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েস্কুলের বিশ্বদহ দীর্ঘ গাড়ী পথ কাঁপাইয়া, পথিক-দের ব্যগ্র সচকিত করিয়া, হাজার দৃষ্টির উপর অতৃপ্তির ঝিলিক হানিয়া, বিরাট অবহেলার মতন, একবুক আনন্দ-প্রতিমা বহিয়া স্কুলে গিয়া পৌঁছিল। কিশোর সহিস অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২)

সে মুচির ছেলে। তাহার নাম কাল্লু।

ছেলে হাকিমের দপ্তরে নোকরি পাইবে আশায় তাহার বাপ তাহাকে ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল। প্রথমে যে স্কুলে সে ভর্ত্তি হইতে গেল সেখানে সে মুচির ছেলে বলিয়া স্কুলের কর্ত্তারা হইতে ছাত্ররা পর্য্যন্ত আপত্তি তুলিয়াছিল। শেষে আরা শহরে এক সাহেব মিশনরির স্কুলে স্থান পাইয়া সে বছর ছয়েক ইংরেজি ও নাগরী শিক্ষা করিয়াছিল। তারপর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে গ্রামের মাতব্বরেরা বলিল কাল্লুর লিখা পড়ি শিখিয়া কোনো ফায়দা নাই; তাহার বাপদাদার পেশা অবলম্বন করাই তাহার উচিত। তখন বেচারা বইয়ের দপ্তর ফেলিয়া জুতা সেলাইয়ের থলি ঘাড়ে করিল। তাহার হাকিমের দপ্তরে নোকরি করিয়া মাতব্বর হওয়ার কল্পনা বাপের মৃত্যুর সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। তবু তাহার জাতভাই বিরাদরীর মধ্যে কাল্লুর খাতির হইল যথেষ্ট—সে তুলসীকৃৎ রামায়ণ পড়িতে পারে; সে বিরাদরীর পঞ্চায়েৎ মজলিসে তোতা-কাহিনী, বেতাল পচিশী, চাহার দরবেশ পড়িয়া শুনাইতে পারে; খত চিঠ্ঠি বাচাইতে পারে; এবং সাড়ে সাত রূপেয়া তনখা হইলে এক রোজের মজদুরী কত, বা শতকরা দশ রূপেয়া সুদ হইলে এক রূপেয়ার সুদ কত মুখে মুখে কষিয়া দিতে পারে।

এইরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ও প্রণয়রসমধুর বিচিত্র-ঘটনাপূর্ণ কেতাব পড়িয়া কাল্লুর কিশোর চিত্ত পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর তাহার গাঁয়ে গঁওয়ার লোকদের মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। সে স্থির করিল একবার কলকাত্তা যাইতে হইবে; সেখানে তাহার চাচেরা ভাই বহুত টাকা কামাই করে।

কাল্লুকে বাধা দিবার কেহ ছিল না; সে জগৎ-সংসারে একা। আপনার বাপের হাতিয়ারগুলি থলিতে ভরিয়া সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার ভাই বলিল যে রাস্তায় রাস্তায় রোদে বৃষ্টিতে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুতা সেলাই করিয়া বেড়াইতে তাহার বড় তক্‌লিফ্‌ হইবে; তাহার চেয়ে কাল্লু স্কুলে নোকরি করুক। স্কুলে একটি নোকরি খালি আছে।

স্কুলে নোকরি শুনিয়া কাল্লু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চাই কি সে সেখানে নিজের বিদ্যাচর্চ্চারও সুবিধা করিয়া লইতে পারিতে পারে। তাহার পর যখন শুনিল যে সেটা জনানী স্কুল, তখন তাহার কল্পনাপ্রবণ মন সেখানে পদ্মাবতী, শাহারজাদী ও পরীবানুদের স্বপ্নে ভরপুর হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরীবানুদের সহিত প্রথম দিনের পরিচয়ের সূত্রপাত তাহার তেমন উৎসাহজনক মনে হইল না। পরীর মতো বেশভূষায় মণ্ডিত ফুলের মতো মেয়েগুলি যেন হাসির দেশের লোক!

কাল্লু ঘোড়ার সাজ খুলিয়া দানা দিয়া উদাস মনে আসিয়া আস্তাবলের সামনে একটা শিশু-গাছের ছায়ায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েগুলো তাহাকে দেখিয়া অমন করিয়া মিছামিছি হাসিয়া খুন হইল কেন? তাহার চেহারার মধ্যে হাসি পাইবার মতো এমন কি আছে? তাহার গাঁয়ের বাচ্চী, আকালী, পবনী ত তাহাকে দেখিয়া কৈ এমন করিয়া হাসে না! কিসমতিয়া ইঁদারা হইতে কলসীতে জল ভরিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিত বটে, কিন্তু তাহার হাসি ত এমন খারাপ লাগিত না—তাহার সেই দিল্‌-লগীতে ত দিল্‌ প্রসন্নই হইয়া উঠিত! যত নষ্টের গোড়া ঐ কোঁকড়া-চুল-ওয়ালী ছোঁড়ী! ভিমরুলের উপর তাহার ভারি রাগ হইতে লাগিল—সেইই ত প্রথমে হাসি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সব মেয়েগুলোই খারাপ—কেবল—কেবল—ঐ গোরী বাবা ভারি ভালো! সে তাহাকে দেখিয়া হাসে নাই, সকলকে হাসিতে মানা করিয়াছে, ভিমরুলকে মারিতে পর্য্যন্ত চাহিয়াছিল! ঐ বাবা বহুত নিক্‌! বহুৎ খাপসুরৎ!

কাল্লু বসিয়া বসিয়া যত ভাবে ততই তাহার বিভাকে বড়ই ভালো লাগে। সে তাহার দৃষ্টিতে কেমন করুণা ভরিয়া একবার উহার দিকে তাকাইয়াছিল! সে কেমন করিয়া উহাকে সকলের হাসির আঘাত হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেছিল! বহুত নিক্‌! বহুত খাপসুরৎ! সেই গোরী বাবা!

(৩)

এইরূপে সে দিনের পর দিন ধরিয়া কত মেয়েকে দেখিতে পায়, কত মেয়ের হাত হইতে সে বই গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো মেয়েই তাহার প্রাণের উপর তেমন আনন্দের ছটা বিস্তার করে না, যেমন হয় তাহার বিভাকে দেখিলে। আর সকলের কাছে সে ভৃত্য, গাড়ীর সহিস, সে অস্পৃশ্য মুচির ছেলে—কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত অপরাধীর মতন; কিন্তু বিভাকে দেখিলেই তাহার অন্তরের পুরুষটি তারুণ্যের পুলকে জাগিয়া উঠে, মনের মধ্যে আনন্দের রসের শিহরণ হানে, তাহার দৃষ্টিতে কৃতার্থতা ক্ষরিয়া ঝরিয়া বিভার চরণকমলের জুতার ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বসন্তের অলক্ষিত আগমনে তরুশরীরে যেমন করিয়া শিহরণ জাগে, যেমন করিয়া নবকিশলয়দলে তাহার অন্তরের তরুণতা বিকশিত হইয়া পড়ে, যেমন করিয়া ফুলে ফুলে তাহার প্রাণের উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মধুতে গন্ধে যেমন করিয়া ফুলের প্রাণে রসসঞ্চার হয়, বিভাকে দেখিয়া কিশোর কাল্লুর অন্তরের মধ্যেও তেমনি একটি অবুঝ যৌবনের বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল, তাহার অন্তরের পুরুষটি প্রকাশ পাইবার জন্য মনের মধ্যে আকুলিব্যাকুলি করিতে লাগিল। তাহার শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যবর্ত্তী অপটু অক্ষম মন চাহিতেছিল সেও তেমনি করিয়া আপনার অন্তরবেদনা তাহার আরাধিতার চরণে নিবেদন করে যেমন করিয়া বজ্রমুকুট পদ্মাবতীকে তাহার হৃদয়বেদনা নিবেদন করিয়াছিল, যেমন করিয়া শাহজাদা পরীজাদীকে তাহার মর্ত্ত্যমানবের মনের ব্যথা বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে অক্ষম, অতি হীন, তাহার মনের কোণের গূঢ় গোপন প্রণয়বেদনা সে কেমন করিয়া এই অনুপম মহীয়সী রমণীর চরণে নিবেদন করিবে। সে যদি তাহাদের গ্রামের কিসমতিয়া হইত, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না; কিন্তু ইহার ত কিসমতিয়ার সহিত কোনোই মিল নাই! এ না পরে চিলি চুহুরি লাহেঙ্গা, না পরে হাঁটি আঙিয়া;

না যায় ইঁদারায় জল আনিতে, না সে কাজরী গীত গাহিয়া তাহাকে সাহসী করিয়া তোলে! এ যে এজগতের জীব নয়! এর পরণের শাড়ীখানি বিচিত্র মনোরম ভঙ্গিতে তাহার কিশোর সুকুমার তনু দেহখানির উপর সৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মতন অনুলিপ্ত হইয়া আছে; ইহার গায়ের ঝালর-দেওয়া ফুলের-জালি-বসানো জামাগুলির ভঙ্গি যেন কোন্ স্বর্গলোকের আভাস দেয়; ইহার পায়ে জুতা, চোখে সুনেহরী চশমা! ইহার কাছে সে কত হীন, কত অপদার্থ, কি সামান্য! সে আপনার মনের ভাবলীলার বিচিত্র মাধুর্য্যের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতায় নিজেই কুণ্ঠিত লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল, সে পরের কাছে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না!

এমন কি বিভার সামনে দাঁড়াইতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল! সে যেন অপবিত্র অশুচি, দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভয়ে সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া উঠে। আপনার দেহ মন শিক্ষা সহবৎ জন্ম কর্ম্ম কিছুই তাহার বিভার উপযুক্ত ত নহে।

তবুও সে অন্তরের যৌবন-পুরুষের তাড়নায় আপনাকে যথাসাধ্য সংস্কৃত দর্শন করিতে চাহিল। সে রাস্তার ধারে একখানি ইট পাতিয়া বসিয়া দেশওয়ালী হাজামের কাছে হাজামত করাইল; কপালের উপরকার চুল খাটো করিয়া ছাঁটিয়া মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও দুই পাশে দুই কোণ করিয়া থর কাটিল। তার পর বাজার হইতে একখানি টিন-বাঁধানো আয়না ও একখানি কাঠের কাঁকই কিনিয়া দীর্ঘ বাবরি চুলগুলিকে প্রচুর কড়ুয়া তেলে অভিষিক্ত করিয়া শিশু-গাছের তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাঁধের উপর কুঞ্চিত সুবিন্যস্ত ফণাকৃতি করিয়া তুলিল। সেদিন সে নাহিয়া ধুইয়া মাজিয়া ঘসিয়া আপনাকে চকচকে সাফ করিয়া যথাসাধ্য নিজের মনের মতন করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার সহিসের পোষাকটা তাহার মোটেই রুচি-রোচন হইতেছিল না। নীল-রং-করা মোটা ধুতির উপর হলদে পটি লাগানো নীল রঙের খাটো কুর্ত্তা ও নীল পাগড়ী তাহাকে যে নিতান্ত কুৎসিত করিয়া তুলিবে, ইহাতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি ও লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, সেই কুৎসিত উর্দ্দি পরিয়াই তাহাকে বিভার সম্মুখে বাহির হইতে হইবে। তখন সেই পোষাকই অগত্যা যথাসম্ভব শোভন সুন্দর করিয়া পরিয়া সেদিন সে গাড়ীর পিছনে চড়িয়া বিভাকে স্কুলে আনিতে গেল।

কিন্তু তাহাতেও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার চক্ষুশূল সেই ভিমরুল মেয়েটা তাহাকে দেখিয়াই আবার হাসিয়া গড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে, আবার ফ্যাশান করে' চুল কাটা হয়েছে!"

তাহার সেই বিশৃঙ্খল রুক্ষ চুলই মেয়েদের চোখে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহাকে নব বেশে দেখিয়া তাহাদের আবার ভারি হাসি আসিল। বিভা ঈষৎ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া যখন চক্ষু ফিরাইয়া ভিমরুলকে বলিল—"কি হাসিস!" তখন কাল্লুর চোখদুটি আগুনের ফুলকির মতন ভিমরুলের দিকে চাহিয়া জ্বলিতেছিল। ভিমরুল হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখ বিভা-দি, ও কেমন করে' তাকাচ্ছে!" বিভা যেই তাহার দিকে স্মিত মুখে তাকাইল অমনি তাহার দৃষ্টি কোমল প্রসন্ন হইয়া যেন বিভার চরণে আপনার জীবনের কৃতার্থতা নিবেদন করিয়া দিল। বিভা ভিমরুলকে ধমক দিয়া বলিল—"কৈ কি করে' তাকাচ্ছে আবার!" ভিমরুল বলিয়া উঠিল—"না বিভা-দি, ও এমনি করে' কটমট করে' তাকাচ্ছিল, তুমি ফিরে চাইতেই অমনি ভালো মানুষটি হয়ে দাঁড়াল!"

ক্রমে তাহার নূতন বেশও মেয়েদের চোখে সহিয়া গেল। একজন পুরুষ তরুণ যে নিত্য তাহাদের সেবা করিতেছে এ বোধ তাহাদের মনে আর জাগ্রত রহিল না। কিন্তু সেই তরুণ সহিসের মনে তরুণী একটি নারীর ছাপ দিনের পর দিন গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার মনে হইত সে একদিন বিভার চরণতলের ধূলায় পড়িয়া যদি বলিতে পারে যে সে একেবারে সাধারণ নয়, নিতান্ত অপদার্থ নয়, সেও তাহাদেরই মত স্কুলে ইংরেজি পড়িয়াছে, এখনো দু চারটা ইংরেজি বাত

সে পড়িতে পারে, সে রামায়ণ পড়িতে পারে, কাহানিয়া পড়িতে পারে!—তবে তাহার জীবন সার্থক হইয়া যায়। কিন্তু পারিত না সে কোনো দিন বিভাকে একলা পাইত না বলিয়া, পারিত না সে ভিমরুলের হাসির হুলের ভয়ে! তখন সে ভাবিত, মুখের কথা যাহাকে খুসি শুনানো যায়, আর মনের কথা মনের মানুষটিকেও শুনানো যায় না কেন? মনের মন্দিরে সে যে-সব পবিত্র অর্ঘ্য সাজাইয়া সাজাইয়া তাহার আরাধ্য দেবতার আরতির আয়োজন করিতেছিল, তাহা যদি তাহার দেবতা অন্তর্য্যামী হইয়া অনুভব করিতে পারিত! দেবতা যদি অন্তরের মুখর ভাষা না বুঝে, তবে মূক মুখের ভাষায় সে ত কিছুই বুঝাইতে পারিবে না!

তবু একদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া সে বিভার হাত হইতে বই লইতে লইতে উপরকার বইখানির নাম যেন নিজের মনেই পড়িল—লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস অ্যাণ্ড রোম্!

ভিমরুল অমনি হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিল—"বিভাদি, বিভাদি, তোমার সহিস আবার ইংরিজি পড়তে পারে! এইবার থেকে তুমি ওর কাছে পড়া বলে' নিয়ো!" ভিমরুলের চেয়ে বড় একটি মেয়ে সরযূ হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"লিগেণ্ডস্! লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস অ্যাণ্ড্ রোম্! লেজেণ্ডস্কে ভাই লিগেণ্ডস্ বলছে!" বিভা হাসি-মুখে কাল্লুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তুই ইংরিজি পড়তে পারিস?" কাল্লুর মনের সমস্ত বিদ্রূপগ্লানি লজ্জা সঙ্কোচ বিভার হাসিমুখের একটি কথায় কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"হাঁ বাবা, হাম ত কয়ইক বরষ ইংলিশ পড়া থা!" বিভা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। কাল্লু সাহস পাইয়া বলিল যে, সে গোরীবাবার পড়িয়া-চুকা পুরাণা-ধুরাণা একখানা কেতাব পাইলে এখনো পড়ে। বিভা হাসিয়া বই দিতে স্বীকার করিল। গর্ব্বের আনন্দে কাল্লুর মন ফুলিয়া উঠিল। আজ সে বিভার কাছে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছে! বিভা আজ তাহার সহিত কথা বলিয়াছে! বিভার প্রথম দান আজ সে পাইবে! ভিমরুল যে তাহাকে 'পণ্ডিত সহিস' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া কত হাসিল, আজ আর সেদিকে সে কানই দিল না।

সেই দিন হইতে সে আবার পাঠে মন দিল। বিভা তাহাকে একখানা ইংরেজি বই দিয়াছে; সেইখানি পাইয়া সে ভরা মনে শিশু-গাছের তলায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিল। প্রথমে বই খুলিয়াই সে খুঁজিতে লাগিল বইয়ের কোথাও গোরী বাবার কোনো নাম লেখা আছে কি না; কোথাও কোনো নাম খুঁজিয়া সে পাইল না। সে শুনিয়াছে ভিমরুল তাহাকে বিভাদি বলিয়া ডাকে। বিভাদি আবার কি রকম নাম? তাহাদের গাঁয়ে একটি মেয়ের আবাদীয়া নাম আছে, একটি ছেলের নাম আছে বিদেশীয়া; পার্ব্বতীয়া, পরভাতীয়া নামও হইতে পারে। কিন্তু বিভাদি, সে কি রকম নাম? সে মনে মনে ভাবিয়া ঠিক করিল উহার নাম দুলারী কি পিয়ারী হইলে বেশ মানায়। সে স্থির করিল গোরী বাবাকে সে পিয়ারী নামেই নিজের মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এই বইখানি পিয়ারী পড়িয়াছে; বইয়ের স্থানে স্থানে পেন্সিলের দাগ ও দুই-একটা কথার মানে লেখা আছে—সেগুলি পিয়ারীই লিখিয়াছে, তাহার সোনার মতো আঙুলগুলি এই বইয়ের বুকের উপর বুলাইয়া বুলাইয়া গিয়াছে! বইখানি তাহার কাছে পরম অমূল্য নিধি হইয়া উঠিল। সে সমস্ত দিনের অবসরের সময় সেখানিকে খুলিয়া কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া থাকে; কদাচিৎ এক আধ লাইন পড়ে, শুধু বইখানিকে কোলে করিয়াই তাহার আনন্দ। রাত্রে সে বইখানিকে বুকের কাছে লইয়া শোয়। যখন বইখানি আস্তাবলে তাহার কাপড়ের বোচকার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া বইখানিকে ছাড়িয়া দুবেলা মেয়েদের আনিতে ও রাখিতে যাইতে হয়, তখন তাহার মন সেই বইখানির কাছেই পড়িয়া থাকে। তখন সে অবাক হইয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবে।

একদিন তাহাকে ঐরূপে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভিমরুল বলিয়া উঠিল—"বিভাদি, বিভাদি, দেখ, সহিসটা তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখ!" বিভা একবার চকিতে কাল্লুর দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া হাসিমুখে বলিল—"তুই ভারি দুষ্ট হচ্ছিস ভিমরুল!"

কাল্লু বিভাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া ব্যথিত অনুতপ্ত হইয়া নিজের অসাবধান দৃষ্টি নত করিল। সেইদিন হইতে সে এক মুহূর্ত্তের বেশি বিভার দিকে আর চাহিতে পারিত না। সে যে হীন, সে যে মুচি, সে যে ঘোড়ার সহিস—সে যে বিভার দিকে তাকাইতে সাহসী এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবারও যোগ্যতা তাহার যে নাই!

এই ক্ষণিকের চকিত দর্শনই তাহার জীবনের আনন্দ-প্রদীপ! যেদিন ছুটি থাকে, সেদিন তাহার সহকর্ম্মীরা হুড়ুক, খঞ্জনী ও করতাল খচমচ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাইয়া গোলমাল করিয়া ছুটি উপভোগ করে, আর কাল্লু গাছতলায় বইখানি কোলে করিয়া উদাস মনে আকাশের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া থাকে। কেহ তাহাকে গানের মজলিসে যোগ দিতে ডাকিলে সে ওজর করিয়া বলে—"জী বহুৎ সুস্ত্ হ্যায়. আচ্ছী নেহি লাগতা!" প্রাণ আজ তাহার বড় অসুস্থ, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। যেদিন বিভাদের বাড়ী হইতে স্কুলে অপর সকল মেয়ে আসে, কেবল বিভা আসে না, সেদিন সকলের বইয়ের বোঝা হাতে করিয়া কাল্লু বিভার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে —"উয় বাবা জায়েগী নেহি?" যখন শুনে আজ সে যাইবে না, তখন সে একবার বাড়ীর দিকে একটি চকিত দৃষ্টি হানিয়া গাড়ীর পিছনে গিয়া উঠে, এবং চলন্ত গাড়ী হইতে যতক্ষণ সেই বাড়ী দেখা যায় ততক্ষণ বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যায় যদি কোনো জানলার ফাঁকে একবার পিয়ারীর খাপসুরৎ মুখখানি তাহার নজরে পড়ে! দীর্ঘ অবকাশের সময় তাহার দেশওয়ালী সকলেই বাড়ী চলিয়া যায়, ঘোড়া তখন কুকের বাড়ীতে পোষানি থাকে, সহিসদের ছুটির দরমাহা মিলে না। কিন্তু কাল্লু নিজের সঞ্চিত অর্থে একবেলা দুটি চানা ও একবেলা একটু ছাতু খাইয়া দীর্ঘ অবকাশ কলিকাতাতে পড়িয়াই কাটায়. পিয়ারী যে-শহরে আছে সে-শহর ছাড়িয়া সে দূরে যাইতেও পারে না। দিনের মধ্যে একবারও অন্তত বিভাদের গলি দিয়া সে বেড়াইয়া আসে, সেই গলিটাতে গিয়াও তাহার আনন্দ, যে বাড়ীর মধ্যে পিয়ারী আছে তাহার দর্শনেও তাহার পরম সুখ! ছুটির সময়কার উদাস দীর্ঘ কর্ম্মহীন দিনগুলি কোনো রকমে কাটাইয়া রাত্রে কেরোসিনের ডিবিয়ার প্রচুর ধূমোদ্গম দেখিতে দেখিতে কাল্লু ভাবিতে থাকে সেই কিতারই কথা। কবে সে তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়াছিল, কবে সে তাহার সহিত দয়া করিয়া কি কথা বলিয়াছিল, কবে তাহার হাত হইতে বই লইতে গিয়া আঙুলে একটু আঙুল ঠেকিয়াছিল! তাহার নিকষের মতো কালো দেহে সেই সোনার মতো আঙুলের ঈষৎ স্পর্শ লাগিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে সোনার রেখা আঁকিয়া দাগিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাই সে বিভার প্রভাতারুণরশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল হাসির আলোকে এক মনে মুগ্ধ নয়নে বসিয়া বসিয়া দেখিত! দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত অন্তর প্রভাতের পূর্ব্বাকাশের মতো একেবারে সোনায় সোনায় মণ্ডিত হইয়া সোনা হইয়া উঠিত! পূজা ও হোলিতে সহিসেরা সকল মেয়ের নিকট হইতেই কিছু কিছু বকশিশ পায়; কাল্লু বিভার কাছ হইতে যে সিকি-দুয়ানিগুলি পাইয়াছিল সেগুলিকে একটি গেঁজেয় ভরিয়া কোমরে লইয়া ফিরিত, বিরহের দিনে গেঁজে হইতে সেগুলিকে বাহির করিয়া হাতের উপর মেলিয়া ধরিয়া সে দেখিত যেন রজতখণ্ডগুলি বিভারই শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তির মতন তাহাকে দেখিয়া হাসির বিভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে!

এমনি করিয়া দিনের পর দিন গাঁথিয়া বছরের পর কত বছর চলিয়া গেল। কত মেয়ে স্কুলে নূতন আসিল, কত মেয়ে স্কুল হইতে চলিয়া গেল। কাল্লুর চোখের সামনে তিল তিল করিয়া কিশোরী বিভা যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ সুন্দরী হইয়া উঠিল। কেবল কোনো পরিবর্ত্তন হইল না কাল্লুর মনের এবং অদৃষ্টের। কিন্তু তাহার কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিভা এম-এ পাশ করিয়া স্কুলে পড়াইতেছে; কাল্লু লেখাপড়া জানে বলিয়া বিভা তাহাকে দুপ্রহরের জন্য বেহারা করিয়া লইয়াছে। সকাল বিকাল সে সহিসের কাজ করিয়া দুপ্রহরে গোরী-বাবার বেহারার কামও করে। ইহাতে তাহার পাওনা বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেশেরও পরিবর্ত্তন ও পারিপাট্য হইয়াছে। এখন সে অন্ততঃ দুপুর বেলাটা চুড়িদার পায়জামার উপর ধোয়া চাপকান পরিতে পায়;

মাথার চুলগুলিকে সেই কাঠের কাঁকইখানি দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার উপর শাদা কাপড়ের পাগড়ী বাঁধে। আর গোরী-বাবার আপিস-ঘরের দরজায় সে পাষাণমূর্ত্তির মতো নিশ্চল হইয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। এখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পিয়ারীকে দেখিতে পায়।' তাহার দিল্ এখন পুরা ভরপুর আছে!

এই সময়ে একজন বাবু বড় ঘনঘন কাল্লুর গোরী-বাবার কামরায় আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সহিত বিভার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। তাহার গায়ের রং এমন সুন্দর যে সোনার চশমা যে তাহার নাকে আছে তাহা সহসা বুঝিতে পারা যায় না; সুন্দর সুগঠিত শরীর; দেখিবার মতো তাহার মুখখানি। কিন্তু ইহাকে কাল্লু মোটেই দেখিতে পারিত না। ইহাকে দেখিলেই কাল্লুর মাথায় খুন চড়িত, তাহার চোখ দুটা কয়লার মালসায় দুখানা জ্বলন্ত আঙারের মতন জ্বলিয়া উঠিত।

প্রথম যেদিন এই সুন্দর যুবকটি আসিয়া হাসিহাসি মুখে পরদা-টানা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নিস্পন্দ কাল্লুর হাতে একখানা কার্ড দিয়া বলিল—"মেম সাহেব কো সেলাম দেও।" তখনই তাহার হাসিবার ভঙ্গিটা কাল্লুর চোখে কেমন-কেমন ঠেকিল। সে কার্ড লইয়া সন্তর্পণে পর্দ্দা সরাইয়া বিভার হাতে গিয়া কার্ডখানি দিল। কার্ড পাইয়াই বিভা যেমনতর হাসিমুখে উৎফুল্ল হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবুকো সেলাম দেও।"—বিভার তেমনতর উৎফুল্ল আনন্দমূর্ত্তি কখনো কাল্লুর দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তাই গোরী-বাবার এইরূপ আনন্দের আতিশয্য কাল্লুর মনে কেমন একটা অশুভ আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। তারপর যখন সে পর্দ্দাটা একপাশে সরাইয়া ধরিয়া যুবকটিকে বলিল—"যাইয়ে।" এবং পর্দ্দার ঈষৎ ফাঁক দিয়া কাল্লু দেখিতে পাইল যুবকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিভা হন হন করিয়া আগাইয়া আসিল ও যুবকটি দুই হাতে বিভার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া মুগ্ধ নয়নে বিভার দিকে চাহিয়া রহিল, এবং বিভারও চোখদুটি আবেশময় বিহ্বলতায় ও সুখের লজ্জায় ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল, তখন কাল্লুর অন্তরাত্মা অনুভব করিল সেই আগন্তুক যুবক—ডাকু হ্যায়! সে কাল্লুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে। সেইদিন হইতে তাহার মন যুবকটির প্রতি হিংসায় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দিনের পর দিন যত সে বিভার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল ততই কাল্লুর নিষ্ফল ক্রোধ তাহার অন্তরে আগুন লাগাইয়া তাহার চোখদুটাকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার বুকের মধ্যে যখন ধকধক করিয়া উঠিত তখন মনে হইত সে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতের দশ আঙুলের নখে করিয়া তাহার বুকটাকে ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া রক্ত খাইতে পারিলে তবে শান্ত হয়। সে শক্ত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিত, কিন্তু সে এমন করিয়া চাহিত যে তাহার অন্তরের সকল জ্বালা যেন দৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই ডাকুটাকে দগ্ধ ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। আজ সে কত বৎসর ধরিয়া কৃপণের ধনের মতন যে-বিভাকে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ দিয়া ঘিরিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, সেই তাহার পলে পলে সঞ্চিত সর্ব্বসুখ এই কোথাকার কে একজন হঠাৎ আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে, শুধু একখানা গোরা চেহারা ও একজোড়া সুনেহ্রী চশমার জোরে! কাল্লু কালো কুৎসিত মুচি, কিন্তু তাহার অন্তরে পিয়ারীর প্রতি যে একটি ভক্তি পুঞ্জিত পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছু কি ঐ বাবুটার অন্তরে আছে? যদি থাকিত তবে কি সে বিভার সম্মুখে অমন করিয়া বকবক করিয়া বকিতে পারিত, অমন হো হো করিয়া হাসিতে পারিত, অমন করিয়া পা ছড়াইয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িতে পারিত! লোকটার মনে এতটুকু সম্ভ্রম নাই, এতটুকু সঙ্কোচ নাই, এতটুকু দ্বিধা ভয় আশঙ্কা নাই! সে যেন ডাকাত, জোর করিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে!

কাল্লু শুনিয়াছিল যে কয়লার মধ্যে হীরা হয়। সে যদি কয়লার মতো কালো তাহার বুকের মধ্যে হীরার মতো উজ্জ্বল বিভাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিত! যদি সে কালো মেঘ হইয়া বিদ্যুতের মতো এই তরুণীটিকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই ডাকাত লোকটার মাথায় বজ্রের মতো গর্জ্জন করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া এক

নিমেষে তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া ফেলিতে পারিত! কিন্তু যতই সে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যতই সে নিজের যে কি দাবী তাহা নিজের কাছেই সাব্যস্ত করিতে পারিতেছিল না, যতই সে নিজেকে অসহায় মনে করিতেছিল, ততই তাহার অস্বস্তি বাড়িতেছিল, ততই তাহার অন্তর জ্বলিয়া চোখ দুটাতেও আগুন ধরাইয়া তুলিতেছিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার চোখ দুটা বুনো মহিষের চোখের মতো যেন আগুন হানিতে থাকে; কিন্তু তখনই যদি বিভা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহার সেই অগ্নিদৃষ্টি অমৃতে অভিষিক্ত দুটি ফুলের অঞ্জলির মতো তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে!

একদিন কাল্লু পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিল সেই সয়তানটা বিভার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া, নিজের হাত হইতে একটা আংটি খুলিয়া বিভার আঙুলে পরাইয়া দিল! তাহারই চোখের উপরে!

আজ কাল্লুর সর্ব্বাঙ্গে একেবারে আগুন ধরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের পুরুষত্ব উন্মত্ত হইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত পীড়িত বিদলিত করিতে লাগিল! তাহার পায়ের তলা দিয়া মাটি সরিয়া চলিতে লাগিল, তাহার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাগলের মতো টলিয়া টলিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল! কোথায় তাহার আশ্রয়? কোথায় তাহার অবলম্বন?

কতক্ষণ সে এমন ছিল সে জানে না। অকস্মাৎ দেখিল তাহার সম্মুখে সেই যুবকটি দাঁড়াইয়া হাসিমুখে দুটি টাকা ধরিয়া বলিতেছে—"বেয়ারা, এই লেও বক্‌শিশ!" কাল্লু দেখিল সেই যুবকের ঠোঁটের উপর ও ত হাসি নয়, ও যেন আগুনের রেখা! তাহার হাতে ও ত টাকা নয়, ও যেন দুখণ্ড উল্কা! আর সেই লোকটা ত মানুষ নয়, সে সাক্ষাৎ সয়তান! ইহারই কথা সে মিশনরী সাহেবদের কাছে পড়িয়াছিল, আজ একেবারে তাহার সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ! তাই উহার বর্ণ অমন আগুনের মতন! তাই উহাকে দেখিলে কাল্লুর অন্তরে অমনতর অগ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠে! কাল্লুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল, তাহার চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইতে লাগিল, তাহার দশাঙ্গুলের নখের মধ্যে রক্তপিপাসা ঝঞ্ঝনা হানিয়া গেল! এমন সময় তাহার কানে গেল কোন্ স্বর্গের পরম দেবতার অমোঘ আদেশ "কাল্লু, বাবু বক্‌শিশ দিচ্ছেন, নে!" কাল্লু মন্ত্রবশ সর্পের মতো মাথা নত করিয়া তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিল, যুবকটি তাহার হাতের উপর টাকা দুটি রাখিয়া দিল।

কাল্লুর মনে হইতে লাগিল টাকা দুটা তাহার হাতের তেলো পুড়াইয়া ফুটো করিয়া অপর দিক দিয়া মাটিতে ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া যাইবে। সে-ঝনৎকার তাহার কাছে বজ্রবিদারণ-শব্দের ন্যায় মনে হইল। সে প্রাণপণে টাকা দুটাকে চাপিয়া মুঠি করিয়া ধরিল, হাত পুড়িয়া যাক কিন্তু টাকা দুটা মাটিতে পড়িয়া অট্টহাস্য করিয়া না উঠে!

যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইল এই অগ্নিখণ্ড দুটা সেই সয়তানটার মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ হইত। তাড়াতাড়ি ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে টাকা ছুড়িতে গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই, সে একা দরজার একপাশে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

কাল্লু মুস্কিলে পড়িয়া গেল এই টাকা দুটা লইয়া সে কি করিবে! এ সে লইল কেন, এ ত সে লইতে পারে না! কি করিবে, কি করিবে সে এই টাকা দুটা লইয়া! তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে যেন টাকার মতো চাকা চাকা আগুনের চোখ জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল—সেগুলা যেন সেই আগুনের লোকটার চশমাপরা চোখ দুটার হাসিভরা ক্রূর দৃষ্টি!

কাল্লু টাকা দুটাকে মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সে কোথায় ফেলিবে এই বিষের চাকতি দুটা! যেখানে পড়িবে সেখানকার সকল সুখ সকল আনন্দ সকল শুভ সকল হাসি যে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে!

তাহাকে টাকা হাতে করিয়া ভাবিতে দেখিয়া একজন ভিখারী তাহাকে বলিল—"এক্ পয়সা ভিখ্ মিলে বাবা!" কাল্লু হঠাৎ যেন অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি দুটা টাকাই সেই পঙ্গুর হাতে দিয়া

ফেলিল। অনন্তা উড়ে তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"কি রে কাল্লু, তু কল্পতরু হউচি পারা!" স্কুলময় রটিয়া গেল কাল্লুর মুনিবের বিয়ে হইবে বলিয়া কাল্লু মনের আনন্দে একটা ভিখারীকেই দুটা টাকা দান করিয়া দিয়াছে!

(৫)

আজ বিভার বিবাহ। সেখানে কত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কাল্লুর হয় নাই। তবু তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। স্কুলের বোর্ডিঙের মেয়েদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে; তাহাদের গাড়ীর সঙ্গে কাল্লুকে বিনা নিমন্ত্রণেও যাইতে হইবে। আজ তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়ের দিন। যেখানে আজ আলোক-সমারোহের মধ্যে সুসজ্জিত হইয়া হাসিমুখে সেই সয়তান ডাকাতটা চিরজন্মের মতো তাহার পিয়ারী গোরী বাবাকে আত্মসাৎ করিতে আসিবে, সেখানে আজ কাল্লুকে সহিসের নীল রঙের কুৎসিত উর্দ্দি পরিয়া ম্লান মুখে বিনা আহ্বানে যাইতে হইবে, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না, তাহাকে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

তবু তাহাকে যাইতে হইল। তাহার চোখের সামনে সেই সয়তানটা নিজের হাতে বিভার হাত ধরিয়া ফুলের মালায় বাঁধিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য দখল করিয়া লইল। তখন সে পুষ্পবিভূষণা আলোকসমুজ্জ্বলা সভা হইতে আপনার অন্ধকার দুর্গন্ধ আস্তাবলে আসিয়া বিচালির বিছানায় শুইয়া বিভার দেওয়া বইখানি বুকে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

সেই দিন হইতে স্কুল তাহার কাছে শূন্যাকার অন্ধকার। শতেক বালিকা যুবতীর হাসি সৌন্দর্য্য আনন্দ-লীলা সত্ত্বেও একজনের অভাবে সেস্থান নিরানন্দ অসুন্দর! সে গাড়ীর পিছনে চড়িয়া বিভাদের বাড়ীতে যায়, কিন্তু সেখান হইতে বিভা আর স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাতে বই দেয় না; গাড়ীর জানলাটির কাছে বিভার সোনার কমলের মতন অপরূপ সুন্দর মুখখানি আর হাসিতে ঝলমল করে না! সেই বাড়ী হইতে বাহির হয় কাল্লুর চক্ষুশূল সেই ভিমরুলটা, আর সে-ই গাড়ীর মুখের কাছে বসিয়া বসিয়া তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসে!

এ রকম জীবন কাল্লুর অসহ্য হইয়া উঠিল। সে একদিন ছুটির দিনে বিভার নূতন বাড়ীতে গিয়া গোরী বাবার সহিত দেখা করিয়া বলিল, যে, গোরী বাবা যদি তাহাকে কোনো নোকরি দেয় ত তাহার পরবস্তী হয়। বিভা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কাল্লু, স্কুলের চাকরী ছাড়বি কেন? ওখানেই ত বেশ আছিস।"

কাল্লুর বুক এই প্রশ্নে যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহার অশ্রুসাগর যেন উথলিয়া পড়িতে চাহিল। পিয়ারী, তুই, তুই এমন বাত পুছলি! এতটুকু দয়া তোর হইল না! এতটুকু বুদ্ধি তোর ঘটে নাই! সে কি বলিবে, কেমন করিয়া বলিবে, যে, স্কুলের নোকরি কেন আর তাহার ভালো লাগিতেছে না। কাল্লু মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিভা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, স্কুলের চাকরী ছাড়বি কেন?"

কাল্লু ধীর স্বরে বলিল—"জী নেহি লাগতা!" এর বেশী আর সে কি বলিবে! প্রাণ তাহার সেখানে থাকিতে চাহিতেছে না, সেখানে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে!

বিভা বলিল—"আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি একবার বাবুকে বলে' দেখি।"

বাবুর নামে কাল্লুর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। যে সয়তান তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, ভিক্ষার জন্য হাত পাতিতে হইবে তাহার কাছে! কাল্লু বলিয়া উঠিল—"গোরী বাবা, হাম নোকরি নেহি......" কাল্লু চাহিয়া দেখিল বিভা তখন চলিয়া গিয়াছে।

বিভা গিয়া স্বামীকে বলিল—"ওগো শুনছ, দেখ, আমাদের স্কুলের সেই যে সহিসটা আমার বেয়ারার কাজ করত, সে আমার এখানে কাজ করতে চায়। তাকে রাখব? তাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, বড় ভালো লোক সে।"

বিভার স্বামী সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কে, সেই কালো কুচকুচে সয়তানটা? সে ভালো লোক! তুমি দেখনি তার চোখের চাউনি—যেন কালো বাঘের চোখ! তাকে রেখো না রেখো না, সে কোন্ দিন ঘাড় ভেঙে রক্ত খাবে, আমায় সে খুন করবে!"

বিভা হাসিয়া বলিল—"অনাছিষ্টি ভয় তোমার! সবাই ত আর তোমার মতো সুন্দর হ'তে পারে না। ভগবান ওকে কালো করেছে তা এখন কি হবে?"

বিভার স্বামী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"শুধু কালো রং নয়, তার ঐ ছুরির নখের মতো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো যেন একেবারে মর্ম্মে গিয়ে বেঁধে। ওকে বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়া! সে কিছুতেই হবে না।"

বিভা স্বামীর স্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া আর কিছু বলিল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গিয়া ডাকিল—"কাল্লু!"

কাল্লু আর সেখানে নাই। কাল্লু চলিয়া গিয়াছে।

বিভা মনে করিল তাহার স্বামীর কথা শুনিতে পাইয়া কাল্লু বোধ হয় ব্যথিত আহত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বিভাও ইহাতে একটু বেদনা অনুভব করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। আহা গরীব বেচারী!

কাল্লু স্কুলে গিয়া, কর্ম্মে ইস্তফা দিল। তাহার আলাপীরা বলিল, তুই কাজ ছাড়িয়া করিবি কি? কাল্লু বলিল, সে জুতা সেলাই করিবে। ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা স্থির করিল কাল্লু নিশ্চয় বাউরা হইয়া গিয়াছে, নতুবা কাহারো কি কখনো এমন নোকরি ছাড়িয়া জুতা সেলাই করিবার সখ হয়? তাহারা কত বুঝাইল, কাল্লু কোনো উপদেশই কানে তুলিল না।

কাল্লু বিভার নিকট হইতে যে সিকি-দুয়ানিগুলি বকশিশ পাইয়াছিল তাহাতে কোঁড়া ঝালাইয়া পাটোয়ারকে দিয়া রেশম ও জরি জড়াইয়া গাঁথাইয়া লইয়াছিল। সেই মালাটিকে সে আজ গলায় পরিল। তারপর সেলাই বুরুশের সরঞ্জামের সঙ্গে বিভার-দেওয়া বইখানি থলিতে ভরিয়া থলি কাঁধে উঠাইয়া স্কুল হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল। পথে তাহার দেখা হইল ভিমরুলের সঙ্গে। ভিমরুল হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে, সহিস আবার সেলাই ক্রুশ সেজেছে! লা-ক্রুষ!" কাল্লু একবার তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া গেট পার হইয়া পথের জনস্রোতে ভাসিয়া পড়িল।

বিভা হঠাৎ জানলার কাছে গিয়া দেখিল তাহাদের বাড়ীর অপর দিকের ফুটপাথের উপর কাল্লু তাহার জুতা সেলাইয়ের তোড় জোড় লইয়া বসিয়া আছে। বিভাকে দেখিয়াই তাহার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বুঝাইয়া দিল সে স্কুলের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং সে বেশ সুখেই আছে। কিন্তু বিভা কেন অকারণে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, সে আর জানলায় দাঁড়াইতে পারিল না।

তারপর হইতে রোজই বিভা দেখে সকাল বিকাল দুবেলাই কাল্লু সেই ঠিক এক জায়গাতেই বসিয়া থাকে—রৌদ্র নাই বৃষ্টি নাই সে বসিয়াই থাকে, কোনো দিন তার কামাই হয় না। অতিবৃষ্টির সময়ও সে নড়ে না, জুতার তলায় হাফসোল দিবার চামড়াখানি মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া সে ঠায় বসিয়া বসিয়া ভিজে; দারুণ রৌদ্রের সময়ও সে নড়ে না, গামছাখানি মাথার পাগড়ির উপর ঘোমটার মতন করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া সে বসিয়া বসিয়া দরদর করিয়া ঘামে! বর্ষা ঘনাইয়া আসিলে সে আনন্দে কাজরীর গান গাহে—

পিয়া গিয়া পরদেশ,
লিখত নাহি পাঁতি রে;
রোয় রোয় আঁখিয়া,
ফাটত মেরি ছাতি রে!

উৎসবের দিন সুসজ্জিতা বিভাকে গাড়ী চড়িয়া কোথাও যাইতে দেখিলেও তাহার গান পায়, সে গাহে—

করি উজর শিঙার
তু চললু বাজার,
তেরি কাজর নয়না
ছাতি তোড়ত হাজার!

তাহার গানে শুধু ছাতি টুটিবারই সংবাদ সে ছুতায় নাতায় প্রকাশ করিত। পথের লোকে এই রসপাগল মুচির কাছে জুতা সেলাই করাইতে করাইতে এমনি সব গান শুনিত—

নৈয়া ঝাঁঝরি,
অন পরি মউজ ধারা,
বায়ু বহি পুরবৈয়াঁ,
অব কস মিলন ভঁয়ে হুঁ হামারা।
রহি গো পংথ, পাগর পবনা,
সুনহর ঘুংঘট কাজর-নয়না।
পার করো গোঁসাইয়া।

তাহার টুটা নৌকা, তাহার উপর অবিরল বর্ষণ, এবং প্রবল পবন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কাজল-নয়না মেঘ সোনালি বিদ্যুতের ঘোমটা টানিয়া রহিয়াছে। পথ এখনো অনেক বাকি। মিলনের আশা তাহার আর নাই। তাই তাহার ব্যথিত অন্তর হায় হায় করিয়া দেবতার শরণ মাগিতেছিল—ওগো স্বামী, ওগো প্রভু, তুমিই আমার এই ভগ্ন জীবনতরণীকে পাড়ে ভিড়াইয়া দাও, ওগো পাড়ি জমাইয়া দাও!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত।

গত জ্যৈষ্ঠমাসের "প্রবাসীতে" মাননীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে Westermarckএর মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশী হইবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মেয়ের সংখ্যা অধিক হইবে।" Westermarkএর কথাই আবার অনুপাত হিসাবে Hofacker-Sadler Law বলিয়া প্রসিদ্ধ:—

(১) পিতা মাতার অপেক্ষা বয়সে বড় হইলে প্রতি ১১৩ পুত্রে ১০০ কন্যা।

(২) পিতা মাতা সমবয়স্ক হইলে প্রতি ৯৩·৫ পুত্রে ১০০ কন্যা।

(৩) পিতা মাতার অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলে প্রতি ৮২·৫ পুত্রে ১০০ কন্যা।

এই Hofacker-Sadler Law লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ঠিক এই অনুপাতে পুত্র কন্যা জন্মে না। আবার কাহারও মত যে Hofacker-Sadlerএর নিয়ম একেবারে ভুল। আমার নিকট ভারতবর্ষের সেন্সাস বিবরণ না থাকায় আমি আমাদের দেশে এই নিয়ম খাটে কিনা মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। সতীশবাবু এ সম্বন্ধে মিলাইয়া দেখিয়া ফলাফল জানাইলে বাধিত হইব।

এই ত গেল অনুপাতের কথা। এখন জন্মের কারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

বাস্তবিক পুত্রকন্যা জন্মের কারণ লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। কেবল জন্মমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও জীবনীশক্তি (vitality) আলোচনা করিলে বিশেষ কোনও সুফল ফলিবে না। সম্প্রতি জীবতত্ত্ববিদগণ স্ত্রী-পুরুষ জন্মিবার কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই মত, ডিম্বের (ovum) গুণেই স্ত্রী ও পুরুষ জন্মিয়া থাকে। ইঁহারা বলেন যে স্ত্রী ও পুরুষ উৎপাদনকারী দুইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ডিম্ব আছে। তাঁহাদের মতের অনুকূলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়টি প্রমাণ উদ্ধৃত করেন:—

প্রথম। কতকগুলি পোকার (যেমন Dinophilus) দুইপ্রকার ডিম্ব হইয়া থাকে—কতকগুলি বড় আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড়গুলি হইতে চিরকালই স্ত্রীজাতির উৎপত্তি আর ছোটগুলি হইতে পুংজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। Hyditina নামক জন্তুরও এইরূপ দুই প্রকার ডিম্ব (ovum) দেখা যায়।

দ্বিতীয়। মেরুদণ্ডহীন (invertebrates) জন্তুদের মধ্যে পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় (Parthenogenesis)। অনেক স্থলে ইহাই বংশরক্ষার একমাত্র উপায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপে উৎপাদিত বংশের প্রত্যেকটিই স্ত্রীজাতীয়। আবার কোন কোন জন্তু কখনও বা পুরুষের সংস্রব ব্যতিরেকে (Parthenogenetically) কখনও বা সাধারণ নিয়মে বংশরক্ষা করিয়া থাকে। শেষোক্ত জীবগণের কখনও কখনও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ জন্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ডিম্বেই (ovum) লিঙ্গনির্ণয়কারী ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে।

তৃতীয়। মানুষের যে যমজ জন্মাইয়া থাকে তাহাতে কখনও কখনও একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা জন্মিতে দেখা যায়। ইহাকে false twins বলে। মাতার জরায়ুর মধ্যে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ফুল (placenta) অবলম্বন করিয়া জীব দুইটি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ স্থলে একটি পুত্র ও অপরটী কন্যা জন্মিতে পারে বা দুইটাই কন্যা বা দুইটিই পুত্র জন্মিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি ডিম্ব হইতে দুইটি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন একটিমাত্র ডিম্ব দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় তখন জরায়ুর মধ্যে একটি ফুল অবলম্বন করিয়া যমজ সন্তান জন্মিয়া থাকে। ইহাকে Identical বা True twins বলা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে দুইটা জীব চিরকালই এক লিঙ্গের হইয়া থাকে। অর্থাৎ হয় দুইটাই পুত্র না হয় দুইটাই কন্যা হইবে, কখনও একটি পুত্র অপরটি কন্যা হইবে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্ত্রী-বা পুরুষ লিঙ্গ ডিম্বের উপরই নির্ভর করে।

কিন্তু এসকল তর্ক মানিয়া লইলেও বীর্য্যাণুর (Spermatozoa) যে কোনও কার্য্যকারিতা নাই একথা বলিলে চলিবে না। যখন স্ত্রী ও পুং ডিম্ব (ovum) থাকিতে পারে, তখন স্ত্রী ও পুং বীর্য্যাণুর থাকিবে না কেন? যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম্ব ও বীর্য্যাণুর মিলনেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে তখন বীর্য্যাণুর কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আরও কথা, পুত্রকন্যার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির কতক পিতার মত ও কতক মাতার মত হইয়া থাকে। বীর্য্যাণুর কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিলে Heredity অস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু এরূপ করিতে কেহই স্বীকৃত নহেন। কাজেই পুরুষের বীর্য্যাণুর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আরও দেখা যায় যে-মৌমাছি পুরুষের সহিত সঙ্গম না করিয়া বংশবৃদ্ধি করে তাহার সকলগুলাই পুংজাতীয়, কিন্তু যেগুলি সাধারণ নিয়মে জন্মিয়া থাকে তাহার সকলগুলাই স্ত্রীজাতীয়।

১৯০৬ সালে Wilson অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্ত্রী ও পুং ডিম্বের ন্যায় কোনও কোনও পোকার স্ত্রী ও পুং বীর্য্যাণু (Spermatozoa) আছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে কতকগুলি বীর্য্যাণুতে অযুগ্ম chromosome * থাকে; তিনি এইরূপ অযুগ্ম chromosomeকে X chro-

* প্রত্যেক cellএর একটি করিয়া কেন্দ্র বা nucleus থাকে,

mosome নামে অভিহিত করেন। এইরূপে X chromosome দ্বারা মিলিত হইলে ডিম্ব হইতে পুংজাতির উদ্ভব হয়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন কতকগুলি পোকাতে X chromosome আছে, আর অপর কতকগুলিতে ঠিক এইরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট chromosome আছে। এইগুলিকে তিনি chromosome নামে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে যে ডিম্বগুলি X chromosomeযুক্ত বীর্য্যাণুর সহিত মিলিত হয় সেগুলি হইতে স্ত্রী, আর যেগুলি chromosomeএর সহিত মিলিত হয় সেগুলি হইতে পুংজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অপর কতকগুলি জন্তু আছে যাহাদের বীর্য্যাণুতে একপ্রকার বিশেষ chromosomeএর অস্তিত্ব আছে। ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎজীবের লিঙ্গ নির্ণীত হইয়া থাকে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ভবিষ্যৎ জীবের লিঙ্গ কেবল ডিম্ব বা বীর্য্যাণু বা উভয়ের মিলনের উপর নির্ভর করে। ১৯১০ সালে আমেরিকার বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ Morgan প্রমাণ করেন যে মিলিত ডিম্ব এবং বীর্য্যাণুর লিঙ্গের উপরই ভবিষ্যৎ জীবের লিঙ্গ নির্ভর করিয়া থাকে। কখন কখন আবার এই ডিম্ব বা বীর্য্যাণুর মধ্যে যেটি অধিক শক্তিসম্পন্ন (of relative higher potency) তাহারই অনুযায়ী শাবকের লিঙ্গ নির্ণীত হয়।

নিম্নশ্রেণীর জীবজগতে যেমন দুই প্রকার ডিম্ব ও বীর্য্যাণুর অস্তিত্বের পরিচয় পাই মানুষের যদি এইরূপ একটা পার্থক্য পাই তবে সব গোল চুকিয়া যায়। তাহা না হইলে সেন্সাস হইতে এই সমস্ত বিষয় মীমাংসা করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত "পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত" নামক প্রবন্ধটী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছিলাম তাহাতে কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছেন। তজ্জন্য দুই একটী কথা লিখিতেছি।

পুত্রকন্যা জন্মের সমুদায় কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। পুরুষ ও স্ত্রী বীজ (sex-cells) হইতে কি প্রকারে ছেলে বা মেয়ে জন্মিয়া থাকে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুবীক্ষণ সহযোগে যে-সকল গবেষণা করিতেছেন তাহার সাহায্যে আপাততঃ কোনও সত্য নির্ণয়ের আশা নাই। তাই statistical method অবলম্বন করিয়া আমরা যতটা অগ্রসর হইতে পারি আমি তাহাই চেষ্টা করিয়া দেখিতেছিলাম। আচার্য্য টমসন অনেকগুলি কারণের মধ্যে তিনটী কারণই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, (১) পিতামাতার বয়সের তারতম্য, (২) পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ যখন একত্র হয় তখন তাহাদের বয়সের তারতম্য. (৩) বংশানুক্রম।* আমি ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কারণটীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য statistics সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি, কেননা দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে গবেষণা এক্ষণে অসম্ভব। প্রথমটীর জন্য সেন্সস অধ্যয়ন করি এবং তৃতীয়টীর জন্য নিজেই সংবাদ সংগ্রহ করিতে থাকি। বহুব্যক্তিকে কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীর ৬৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তালিকাখানি পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি।

এখনও কার্য্য শেষ হয় নাই—তবে এপর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে বংশানুক্রম একটী কারণ বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। বহুসংখ্যক পরিবারের সংবাদ গৃহীত হইলে যদি দেখা যায় শতকরা ৯০ বা ৯৫ স্থলে বংশানুক্রমের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বংশানুক্রম অন্যতম কারণ—অপরাপর কারণের প্রভাবে বাকি পাঁচ কি দশ স্থলে অসঙ্গতি হইতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইহার মধ্যে কতকগুলি জড়ান সূতার ন্যায় দ্রব্য দেখা যায়, এইগুলিকে Chromosome বলে। যখন একটি cell দুই ভাগে বিভক্ত হয় তখন এই Chromosomeগুলি ঠিক অর্দ্ধেক ভাগে প্রত্যেকটিতে থাকে। Chromosomeএর সংখ্যা ২ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল Chromosome যুগ্ম অর্থাৎ ২ দিয়া ভাগ করা যাইতে পারে।

* Prof. Thomson's Heredity, p, 505,

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ।

বৈশাখের প্রবাসীতে আশুবাবুর 'বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ' নামক প্রবন্ধে একস্থলে একটি ভুল ছিল। ভুলটি এই, আশুবাবু বলিয়াছেন "ইহাতে (অর্থাৎ ছন্দঃ-কুসুম নামক কাব্যে) পাণ্ডব-চরিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে।" ললিতবাবু জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন "গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ও পাণ্ডবচরিত নহে, কৃষ্ণলীলা মানভিক্ষোপন্যাস।" ললিতবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, কিন্তু আশুবাবুর ভ্রমের উৎপত্তি বোধ হয় এইরূপে হইয়াছে।

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একখানির নাম ছন্দঃকুসুম ও অপরখানির নাম পাণ্ডবচরিত। এই দুইখানি গ্রন্থের কিছু বিবরণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে একখানি গ্রন্থের মলাটের বিজ্ঞাপন হইতে প্রদত্ত হইতেছে। "ছন্দঃকুসুম কাব্য।... ইহাতে ছন্দোমঞ্জরী-প্রোক্ত যাবতীয় ছন্দের মূল লক্ষণ, সংস্কৃত উদাহরণ ও তন্নিম্নে তত্তৎছন্দে নিবদ্ধ সাধুভাষায় বিরচিত কবিতাবলী বর্ণসংখ্যানুসারে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।...সমগ্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মানভিক্ষোপন্যাস ও যুগল-মিলন বর্ণিত হইয়াছে।" "পাণ্ডব-চরিত কাব্য।...ইহাতে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।"

আশুবাবু উক্ত গ্রন্থ দুইখানির একখানিও দেখেন নাই। সংস্কৃতচন্দ্রিকা নামক মাসিকপত্রে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা পাঠ করিয়া তাহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমালোচনাতেই ছন্দঃকুসুম ও পাণ্ডবচরিত যে পৃথক্ গ্রন্থ তাহা বুঝিবার উপায় আছে। যথা "ছন্দঃকুসুমং তৎসাহিত্য-স্বরূপং পাণ্ডবচরিতঞ্চ", "পুস্তকদ্বয়ন্তু", "পুস্তকদ্বয়ং পঠিত্বা" ইত্যাদি [সংস্কৃতচন্দ্রিকা ১৮০৬ শাক জ্যৈষ্ঠ]।

ললিতবাবু অবশ্য 'ছন্দঃকুসুম'ই দেখিয়াছেন। পাণ্ডবচরিত সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নাই। "ছন্দঃকুসুম ও পাণ্ডবচরিত

নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে ইহা জানিলে আর পূর্ব্বোক্ত গোলমালের অবকাশ থাকে না।

রচয়িতার যথার্থ নাম ভুবনমোহন রায়চৌধুরী। কিন্তু হেমবাবু মাইকেলের সমালোচনায় ভুবনচন্দ্র লিখিয়াছেন। তাহা ভুল। আশু বাবু "ভুবনমোহন চৌধুরী" লিখিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সমালোচনা তাঁহার অবলম্বন, তাহাতে আছে "শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন চতুর্ধুরিণা কৃতম্।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

আকবরের সভায় মীরা।

১৩২০—ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে "ভারতীয় সঙ্গীত" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে মীরা-বাই-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ইনি উদয়পুরের রাজার পত্নী। আকবরের সভায় ইনি গান করিয়াছিলেন।"

"বিদ্যাসাগর" বলিলেই যেমন আমরা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝি, "মীরাবাই" বলিলেও তেমনি মিবারপতি রাণা কুম্ভের সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী মীরাবাইকে মনে হয়। অতএব "ভারতীয় সঙ্গীতের" উদ্ধৃত অংশ পাঠে কিছু গোলে ঠেকিয়াছি।

প্রথম গোল এই যে, ঐতিহাসিক হিসাবে মীরাবাইয়ের স্বামী রাণা কুম্ভের রাজত্বকালে উদয়পুরের অস্তিত্ব ছিল না। কুম্ভের উত্তর পুরুষ রাণা উদয়সিংহ উদয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। মিবার-রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিতোর নগর মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া উদয়পুর নামে নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপিত করেন। কিন্তু তাহা রাণাকুম্ভের বহুদিন পরে। সুতরাং মীরাবাই "উদয়পুরের রাজার পত্নী" কিরূপে হইতে পারেন?

কিন্তু ইহা ত সামান্য কথা। প্রধান গোলযোগ লেখকের দ্বিতীয় উক্তিতে—"আকবরের সভায় ইনি (মীরাবাই) গান করিয়াছিলেন।" এই কথা শুনিলেই মনে হয়,—যেন মিবারের রাজ-কুল-বধূ পেশোয়াজ পরিয়া মোগলসম্রাটের দরবার আমে নাচ-গানের মহলা দিয়াছিলেন। পরন্তু ইহা মিবার-রাজবংশের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা নহে। কিন্তু লেখক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে উপরি উদ্ধৃত কথা কহিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

বস্তুতঃ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইতিহাসে আমরা লেখক মহাশয়ের উক্তির প্রতিকূল প্রমাণই পাইতেছি। প্রথমতঃ রাণা কুম্ভ ও আকবর সমসাময়িক নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষের ব্যবধান। কুম্ভ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মানবলীলা সম্বরণ করেন, আর আকবর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মোগলসাম্রাজ্য লাভ করেন। এমত অবস্থায়, রাণা কুম্ভের মহিষী গান গাহিবার জন্য আকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত কি?

"ভক্তমাল" নামক প্রাচীন গ্রন্থে অনেক আজগুবী গল্পের অবতারণা আছে। ঐতিহাসিক তথ্যে অনভিজ্ঞ "ভক্তমাল"-কবি আকবর শাহকে মীরার সমকালিক বলিয়া লিখিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, মীরার সঙ্গীতকুশলতার খ্যাতি শুনিয়া আকবর তাঁহার গান শুনিবার অভিপ্রায়ে, তানসেনকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে চিতোরে আগমন করেন, এবং বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাণী মীরার সঙ্গীত শ্রবণ করেন। "ভক্তমাল"-কবির কল্পনাও আকবরকেই মীরার 'সভায়' আনিয়াছেন, মীরাকে 'আকবরের সভায়' লইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই।

রাণী মীরাবাই সম্বন্ধে রাজস্থানের-ইতিবৃত্ত-লেখক মহাপ্রাণ টড্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উপলব্ধ হয় যে, রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী মীরাবাই সৌন্দর্য্যময়ী, ধর্ম্মশীলা, বিদ্যাবতী ও কবিত্বশালিনী ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার রচিত দোঁহাসকল তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজ্ঞী যে সঙ্গীতানুরাগিনী এবং সঙ্গীতকুশলা ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। দোঁহা কবিতা মাত্র, গান নহে। "ভক্তমালে"র বর্ণনাতে বিশ্বাসস্থাপনও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিরাপদ নহে। অতএব কেমন করিয়া বলিব যে, মীরাবাই 'আকবরের সভায়'—অথবা অন্য কাহারও সভায়—'গান করিয়াছিলেন'? টড্ মহোদয় আরও বলিয়াছেন যে, মীরাবাই যমুনাসৈকত হইতে দ্বারকাধাম পর্য্যন্ত সমুদয় বৈষ্ণব মন্দির সন্দর্শন করিয়াছিলেন। মীরার আকবর-সভায়—কিম্বা অন্য কাহারও সভায়—গমনের বৃত্তান্ত সত্য হইলে, টড্ সাহেব সে কথাও লিপিবদ্ধ করিতে কখনই বিরত থাকিতেন না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিদ্যুতের ভয়

(মার্ক টোয়েনের গল্প হইতে)

মিঃ ম্যাক উইলিয়ম্ বলিতে লাগিলেন—লোকে বিদ্যুতের ভয়ে যেরূপ ভীত হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। যদিও কখন কখন কুকুর, ও কদাচিৎ দুই একজন পুরুষ মানুষকেও বিদ্যুতের ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়, তবুও স্ত্রীলোকেই ইহাকে বেশী ভয় করে। স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ সয়তানের ও কখন কখন নেংটি ইঁদুরের সামনেও নির্ভয়ে যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যুৎ দেখিলেই একেবারে কাবু হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আমি একরাত্রে 'মর্টিমার, মর্টিমার' শব্দে জাগ্রত হই, ও অতিকষ্টে ঘুম ভাঙ্গাইয়া শুনিতে পাই যে, আমার স্ত্রী কাতর স্বরে আমায় ডাকিতেছেন। তখন আমাদের দুজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—

'ইভি, তুমি কি ডাকছিলে? কি হয়েছে? তুমি কোথায়?'

'আমি জুতো ও আলো রাখবার ছোট ঘরে। এই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে তোমার ওখানে শুয়ে ও রকম করে' ঘুমাতে লজ্জা করে না!'

'লোকে ঘুমালে কিরূপে লজ্জিত হ'তে পারে? ঘুমালে কি লজ্জা থাকে যে লোকে লজ্জিত হবে?'

'তুমি বেশ লোক, মর্টিমার, তোমার কি ছাই লজ্জা আছে!'

সেই সময়ে আমি স্ত্রীর ক্রন্দন সংবরণের শব্দ শুনিতে পাইলাম ও সেই শব্দ শুনিয়াই আমি কড়া উত্তর না দিয়া বলিলাম, 'আমি বড় দুঃখিত হলাম; এরূপ ব্যবহার ইচ্ছা করে করি নাই। ফিরে এস, ইভি, আর—'

'মর্টিমার...'

'কি হয়েছে?'

'তুমি এখনও বিছানায় আছ নাকি?'

'নিশ্চয়; কেন তাতে...'

'শীঘ্র বিছানার বাহির হও। তুমি তোমার নিজের জন্য যদিও সাবধান না হও, আমার আর ছেলেদের জন্যও সাবধান হওয়া তোমার উচিত।'

'কিন্তু, ইভি, আমি...'

'আমার সঙ্গে এখন তর্ক করিও না, মর্টিমার। তুমি নিজেও বেশ জান, আর সমস্ত বইতেও আছে, যে, ঝড়-বৃষ্টির সময় বিছানার মত বিপদজনক স্থান আর নাই। তুমি কেবল তর্ক করবার জন্য জীবনটাকে নষ্ট করবে দেখছি।'

'কি আপদ, আমি এখন বিছানায় নাই। আমি...' (এই সময়ে বিদ্যুতের আলোয়, বজ্রাঘাতের শব্দে ও স্ত্রীর ভয়ব্যঞ্জকস্বরে আমার কথা শেষ হইতে পাইল না)।

'দেখ, কিরূপ পরিণাম হয় দেখ। এরূপ সময়ে তুমি শপথ করলে কিরূপে, মর্টিমার?'

'আমি শপথ করি নাই, আর এ আমার কথা কইবারও কাল নয়। ইভি, তুমি বেশ জান—অন্ততঃ তোমার জানা উচিত—যে আমি কথা না কইলেও ঠিক্ এইরূপ হ'ত। আকাশ যখন বিদ্যুতে ভরা থাকে...'

'বেশ, তর্ক কর, তর্ক কর; কেবল তর্কেই পটু; কর, কর, তর্ক কর। তুমি বেশ জান যে এখানে একটিও লোহার শিক্ নাই, আর তোমার স্ত্রী ও ছেলেরা পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' আছে। একথা জেনে শুনেও তুমি কি করে ও রকম কথা বল? আবার কি করছ? দেশলাই জ্বালছ? মর্টিমার, তুমি পাগল নাকি?'

'ভাল জ্বালা বটে, আলো জ্বালাতে ক্ষতি কি? এই ঘরটি ত ঠিক নরকের মত অন্ধকার। আর...'

'নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, শীঘ্র নিবিয়ে দাও। তুমি দেখছি আমাদের সকলকেই সারবে। তুমি বেশ জেনো আলো বিদ্যুৎকে যেমন আকর্ষণ করে, এমন আর কোন জিনিষই করে না। (গুড়—গুড়-ড়-র-কক্কড়র-কড়র) ঐ শোন। কি করছ দেখ।"

'কি দেখব, কি করেছি? আলো বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আলো কখন বিদ্যুৎ জন্মায় না। এবারেও...'

'লজ্জাও করে না? মৃত্যু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আর এসময় তুমি এই রকম কথা কইচ। যদি তোমার... মর্টিমার!'

'কেন?'

'তুমি কি আজ উপাসনা করেছিলে?'

'না। আমি করব মনে করেছিলাম, কিন্তু ১২ × ১৩ কত হয় তাই হিসাব করতে...'

(গুড়-ডুড়-ডুড়-কড়-ড়-র-চড়াৎ)

'হায়, হায়, হায়, আর আমাদের রক্ষা নাই। এরূপ সময়ে তুমি উপাসনা করতে ভুললে, মর্টিমার? তোমার দোষেই আমরা সবাই মরছি, এরূপ সময় উপাসনা ভোলে মানুষে?'

'কিন্তু তখন 'এরূপ সময়' ছিল না। আকাশে এতটুকুও মেঘ ছিল না; আর আমি কি করে জানব যে ঝড়বৃষ্টি হ'বে। এ ত প্রায় হয়, এ নিয়ে তোমার গোল করা বড় অন্যায়। চার বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি উপাসনা না করায় ভূমিকম্প হয়, তখন থেকে আজ অবধি আমি একদিনও ত উপাসনা করতে ভুলি নাই।'

'মর্টিমার, কি বলছ? তুমি কি জ্বরের কথা ভুলে গেলে?'

'তুমি জ্বরের কথা প্রায়ই বল। এ তোমার বড় অন্যায়! এ কথা না বলে' তুমি কোন কথা কইতে পার না? আমি সব সইতে পারি, কিন্তু যদি তুমি ফের...'

(ক্রুম-ক্রুম-কড়র-ড়-র-গুম্-গুম্-ডুম্)

'হায়, হায়, হায়। বজ্রাঘাত বাড়ীতেই হয়েছে।

আজ রাত্রিতেই আমাদের শেষ হ'বে। আমরা মারা গেলে মর্টিমার যদি তুমি কখন এই সব কড়া কথা ভাব, যদি কখন মনে পড়ে...... মর্টিমার।'

'আঃ! আবার কি?'

''তোমার কথায় বোধ হয়...... মর্টিমার, তুমি কি সত্যই আগুন রাখবার জায়গার (fire-place) সামনে?'

'হাঁ, সেই দোষই এখন করেছি বটে। তারপর?'

'শীঘ্র সরে এস, শীঘ্র সরে এস। তুমি আমাদের সকলকেই মারবে দেখছি। তুমি কি জাননা যে খোলা চিম্নি যেমন বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে সেরূপ আর কিছুই করে না।...... এখন আবার কোথায় গেলে?'

'জানালার সাম্‌নে।'

'তুমি কি পাগল? সরে যাও, সরে যাও। কোলের ছেলেরা অবধি জানে যে ঝড়ের সময় জানালার মত বিপদজনক স্থান আর নাই। আর তুমি, বুড়ো মিন্সে, ছেলের বাপ হয়েও ওখানে গেলে! হায়, আজ দেখ্‌ছি মারা যেতে হ'বে। এখন...... মর্টিমার!'

'কেন? কি করব?'

'ও কে খস্ খস্ করছে?'

'আমি।'

'কি করছ?'

'আমার ইজেরের উপর-দিক কোন্‌টা তাই ঠিক ি।'

'শীঘ্র ওসব দূরে ফেলে দাও, ফেলে দাও। পশম ও বুনাতের মত বিদ্যুৎ আকর্ষণ করতে কোনো জিনিষ আর নাই জেনো। যখন তুমি এইসব পরছ, তখন আমার বিশ্বাস যে তুমি ইচ্ছা করেই জীবন নষ্ট করতে চাও। আমাদের জীবন ত সর্ব্বদাই স্বাভাবিক বিপদে পরিপূর্ণ; তা'র উপর তুমি আবার ইচ্ছা করে বিপদ বাড়াচ্ছ! আবার গান গাইছ? কি ভাবছ তুমি, অ্যাঁ?'

'কেন গান গাইতে ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কি? বিলক্ষণ! আমি তোমাকে শত সহস্র বার বলেছি যে গানের শব্দতরঙ্গ আকাশে বিদ্যুৎ সঞ্চারণে বাধা দেয়, আর...... মর্টিমার দরজা খোলা হচ্ছে কি জন্য?'

'কেন তাতেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি মৃত্যু আর কি! দরজা খুললেই ঘরে বাতাস ঢোকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঢোকে, এ কথা সকলেই জানে। বন্ধ কর, বন্ধ কর; আরও চেপে বন্ধ কর। এ সময়ে তোমার মত পাগলের সঙ্গে থাকা কি ভয়ানক! মর্টিমার আবার ওখানে কি করছ?'

'কিছু নয়, কেবল জলের কল খুলছি। ঘরটা ভয়ানক গরম; আমি মাথাটা একবার ধুয়ে নিতে চাই।'

'তোমার নিশ্চয়ই বুদ্ধি লোপ হয়েছে দেখ্‌ছি। যদি বিদ্যুৎ অন্য জিনিষে এক বার লাগে, তবে জলে পঞ্চাশ বার লাগে। কল বন্ধ কর বল্‌ছি। হায়! আমাদের আর কেউ বাঁচতে পারবে না! তুমিই আমাদের বাঁচতে দেবে না! আমার বোধ হয়...... মর্টিমার ওটা কি পড়্‌ল?'

'ও একখানা ছবি।'

'তুমি বুঝি দেয়ালের কাছে গেছ। দেয়ালের মত আর কিছুই বিদ্যুৎ আকর্ষণ করতে পারে না, এও জান না ছাই! সরে এস, সরে এস! আবার শপথ কচ্ছ? তোমার পরিবারে এরূপ বিপদের সময় তুমি কি করে শপথ কর বল দেখি? আমি যে তোমায় পালকের বিছানার কথা বলেছিলাম তা'র কি হল?'

'সে ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছি! তা ভুলবে বৈকি! আজ যদি সে বিছানা ঘরের মাঝখানে পাতা থাকৃত, তবে আমরা সকলেই নিরাপদ হতেম। শীঘ্র তুমি আমার কাছে এস।'

আমি তখন সেই ঘরের ভিতরে গেলাম। কিন্তু ঘরটি নিতান্ত ছোট ও বন্ধ থাকাতে দু'জনে থাকিতে বড় কষ্ট হইল। আমি বাহিরে আসিলাম, কিন্তু গৃহিণী বলিলেন—

'তুমি যে মরবে মনে করেছ, সেটি আমি হ'তে দিচ্ছি না; তোমায় রক্ষা আমি করবই। আমার টেবিলের উপর হ'তে সেই জার্ম্মান বইখানা আর বাতি ও দেশলাই দাও। কিন্তু ঘরের ভিতর আলো জেলো না যেন।'

আমি সেই ঘোর অন্ধকারে কয়েকটা ফুলদানী ও অন্যান্য আসবাব ভাঙ্গিয়া, বই, বাতি ও দেশলাই

গৃহিণীকে দিলাম। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে লাগিলেন ও আমিও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাইলাম।

'মর্টিমার ও কিসের শব্দ ?'

'ওটা বিড়াল।'

'বিড়াল ! ওটাকে শীঘ্র ধরে' হাত ধোবার যায়গায় পুরে রাখ। বিড়ালগুলা কেবল বিদ্যুতে ভরা। কি সর্ব্বনাশ !'

আমি আবার কান্নার শব্দ শুনিলাম। তাহা না হইলে আমি এক পাও নড়িতাম না।

যাহা হউক আমি অনেক টেবিল ও চেয়ার উল্টাইয়া কিঞ্চিৎ শারীরিক আঘাত পাইয়া বিড়ালটিকে ঘরে পুরিলাম। আমি দুই শত টাকার জিনিষ ভাঙ্গিলাম। তার পর গৃহিণী বলিতে লাগিলেন—

'মর্টিমার, এই বইয়ে লেখা আছে যে ঘরের মাঝখানে চেয়ারে দাঁড়ানই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু দাঁড়াবার আগে চেয়ারখান অপরিচালক (nonconductor) দিয়ে তাতে বিদ্যুৎ পরিবাহন বন্ধ (insulate) করতে হবে। চারটা কাচের গেলাসের উপর চেয়ারের চারটা পা রাখ ত ! (কড়্‌কড়্‌-কড়-ড়র-ব্যাং-গুম্‌-গুড়ুম্‌) ঐ শোন। শীঘ্র কর মর্টিমার শীঘ্র কর।'

আমি তখন সমস্ত কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া অনেক কষ্টে চারিটা সংগ্রহ করিয়া চেয়ারের চারিটি পায়া গ্লাসের উপর রাখিয়া স্থির ভাবে উপদেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

'মর্টিমার, এ কথাগুলোর মানে কি ? Wahrend evies gwellers etc. আমরা ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের নিকটে রাখব ? না—দূরে রাখব ?'

'দেখ, ইভি, এখানটা একটু গোলমেলে ঠেকছে; আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য আমাদের অতি নিকটে রাখাই কর্ত্তব্য।'

'আমারও তাই বোধ হয়, কারণ তা হলে আমাদের চারিদিকে ঐ জিনিষগুলা শিকের কাজ করবে ! তুমি শীঘ্র তোমার পিতলের টুপিটা পর।'

আমি অগত্যা সেই গরমে সেই বৃহৎ ভারি টুপি পরিলাম। তখন গৃহিণী আবার বলিতে লাগিলেন—

'মর্টিমার, তোমার শরীরের মধ্যভাগ এইবার রক্ষা করা উচিত। তুমি তোমার পিতলের কোমরবন্দ ও তলোয়ার পর।'

'এখন তোমার পায়ের দিক বাঁচান উচিত। মর্টিমার এইবার তুমি ঘোড়ায় চড়বার কাঁটা পায়ে পর।'

আমি নিঃশব্দে আদেশ প্রতিপালন করিলাম ও যত দূর পারিলাম মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিলাম।

'মর্টিমার, এর অর্থ কি ? Das lanten ist etc. ঝড় বৃষ্টির সময় ঘণ্টা বাজান উচিত কি না ?'

'আমার বোধ হয়, ইভি, ঘণ্টাবাজান উচিত। আর প্রতি কথার মানে করতে গেলেও......'

'সে কথা থাক্‌। আর দেরী করো না তবে। মর্টিমার, দালানে আমাদের বড় ঘণ্টাটা আছে। শীঘ্র সেইটা নিয়ে ঐ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে খুব জোরে বাজাও। আঃ ! এইবার আমরা রক্ষা পেলাম; এ যাত্রা আমরা বেঁচে যাব মর্টিমার।'

আমি সেই চেয়ারে উঠিয়া যথাসাধ্য জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। ৮।৯ মিনিট পরেই আমার জানালার ফাঁক হইতে ভিতরে আলো প্রবেশ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—'কি হয়েছে ? কি ব্যাপার ? শীঘ্র দরজা খোল।'

জানালার বাহিরের লোকেরা আমার রাত্রিবাস পোষাকের উপর যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

আমি তখন ঘণ্টা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে নামিয়া বলিলাম, 'কিছুই নয়; পাছে আমাদের বাড়ীতে বজ্রাঘাত হয় এই ভয়ে আমি বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছিলাম। আজকার রাত্রিটা কি ভয়ানক—কেবল ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রঘাত আর বৃষ্টি !'

'ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রঘাত, বৃষ্টি ! মিঃ ম্যাকউইলিয়মস, তুমি পাগল হয়েছ না কি ? আজ ত অতি পরিষ্কার রাত্রি।'

আমি তখন জানালা খুলিয়া দেখিয়া এত আশ্চর্য্য হইলাম যে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম 'সে কি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি

না। আমি জানালার ভিতর হ'তে বিদ্যুতের আলো ও বজ্রের শব্দ ঠিক শুনেছি।'

আমার কথা শেষ না হইতেই প্রাণ ভরিয়া হাসিবার জন্য একটির পর একটি করিয়া সমাগত ভদ্রলোকেরা মাটিতে শুইতে লাগিল—হাসিতে হাসিতে দুইজন দম্ আটকাইয়া মারা গেল। জীবিতদের মধ্যে একজন বলিল, 'তুমি যদি কিছু পূর্ব্বে জানালা খুলিতে! তুমি বিদ্যুৎও দেখ নাই, বজ্রাঘাতের শব্দও শোন নাই, কেবল কামানের আলো দেখেছ ও শব্দ শুনেছ। অনেক রাত্রিতে গারফিল্ড প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হয়েছেন এই খবর আসে, সেই জন্য এই সব আড়ম্বর।'

এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, এত রকম বাঁচিবার উপায় সত্ত্বেও লোকে যে কিরূপে বজ্রাঘাতে মরে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

শ্রীভুবনমোহন সেনগুপ্ত।

অন্ধের কাহিনী

(গল্প)

(১)

সে জন্মান্ধ!

বেচারী দৃষ্টিহীন চক্ষে মাতার স্নেহ-করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিত—কি দেখিত তা সেই জানে!

লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না,- কেন, কি দোষে সে জন্মান্ধ হইল। মাতা ভুবনমোহিনীর ভাসা ভাসা টানা চোখ দুটীর সুখ্যাতি করিত না এমন লোকই ছিল না; তাঁহার গোলাপ ফুলের মত নিখুঁত ফুটফুটে রঙ লোকে উপমার মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী বড় সুলভ নহে,—ইহাই সাধারণের অভিমত ছিল। পিতা জমিদার তারাশঙ্কর বাবুও নিতান্ত কেলুনা ছিলেন না। কিন্তু তবু তাঁহাদের পুত্র মনোহর জন্মান্ধ হইল কেন তাহা কে বলিয়া দিবে? সকলি প্রাক্তন!

সে যাহা হউক মনোহর যে জন্মান্ধ এ কথা ধ্রুব সত্য! সোনালী রঙের সূর্য্যকিরণ সে শুধু উত্তাপ বলিয়াই জানিত; নানা রঙের ফুলগুলি তাহার নিকট কেবল সুগন্ধের আধার বলিয়াই মনে হইত। যাহারা তাঁহাকে স্নেহ করিত তাহাদিগকে সে সেই স্নেহ-কোমল স্বরের আধার বলিয়া জানিত; তাহাদিগের স্নেহচুম্বন ও অশ্রুই তাহাদিগের একমাত্র পরিচয়চিহ্ন ছিল!

সংসার,—পৃথিবী—বলিলে সে বুঝিত কতকগুলি নিষ্ঠুর আঘাতের সমষ্টি; পদে পদে সে তাহাতে আহত হয়, আর বেদনাপ্লুত অন্তরের স্মৃতিপটে সেগুলি সে মুদ্রিত করিয়া রাখে; সংসার সম্বন্ধে তাহার মনে এইরূপ সংস্কারই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল! আলো-ছায়া, দিন-রাত্রি, সৌন্দর্য্য-আকৃতি, দূরত্ব-ব্যবধান, সুন্দর-কুৎসিত—এসব কথাগুলোর কুহেলিকাপূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ সে একদিনও পায় নাই!

লোকের বিশ্বাস, একটা অঙ্গহীন হইলে অন্য অঙ্গের কার্য্যকারী ক্ষমতা সাধারণের অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। কথাটা সত্য। সকল অন্ধ অসাধারণ ক্ষমতাবান না হউক অন্ধের অনুভব ও শ্রবণ করিবার শক্তিটা যে অসাধারণ হইয়া উঠে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অন্ধ মনোহরের টাকার অভাব ছিল না। পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী একমাত্র সেই! কিন্তু তাহা অপেক্ষা সে অধিক মূল্যবান মনে করিত জননী ও ভগ্নী লীলার স্নেহ! পিতা বড় আশা করিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহের ধন মনোহর মানুষ হইলে তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে; কিন্তু যখন দেখিলেন সে জন্মান্ধ, তাহার আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে পরলোকের পথে অগ্রসর হইলেন।

দিনের পর দিন বহিয়া চলিল, মনোহরও বাল্য হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিল। তাহার অসম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। উন্নত তাহার হৃদয়খানি ভদ্রজনোচিত বিনয়ে নত হইল।

অন্ধজীবনে তাহার একমাত্র সম্বল ছিল গীত; তাহাই তাহার তৃপ্তি, তাহাই তাহার সাধনা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গাহিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল; বীণার কোমল ঝঙ্কারের ন্যায় তাহার সুমধুর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রাগিণীর করুণ

ঝঙ্কার দিকে দিকে সুধা-বৃষ্টি করিত ; সে স্বরে কত সময় সে আপনিই মুগ্ধ, তন্ময় হইয়া পড়িত। বীণা এসরাজ প্রভৃতি বাজাইবারও তাহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। অনেক সময় সুলিখিত পুস্তকপাঠ শ্রবণ করিয়াও সময় অতিবাহিত করিত।

সাগরের বেলাভূমির নিকটে তাহার একখানি উদ্যান-বাটিকা ছিল। জীবনের অধিকাংশ সময়ই সে সেই স্থানে অতিবাহিত করিত। ঊর্ম্মিমালার গভীর গর্জ্জন তাহার নিকট দূরাগত সংগীতের মূর্চ্ছনা বলিয়া বোধ হইত। সে স্থানে থাকিলে তাহার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব শান্তির ছায়া-পাত হইত সেরূপ নির্ম্মল, প্রশান্ত তৃপ্তি তাহার আর কিছুতেই লাভ হইত না। সহরে বাস করিতে সে বড় নারাজ! সহরে বাস করিতে যে তাহার ভয় হয় একথা কাহারও নিকট স্বীকার না করিলেও সহরে বাস করিতে সে একেবারেই সম্মত ছিল না।

কখন কখনও সে পর্ব্বতের সানুদেশে ভ্রমণ করিতে যাইত ; প্রথমে সেই উদার গাম্ভীর্য্য তাহার হৃদয়ে শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়া দিত, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ থাকিবার পর আর সেই নীরব প্রদেশে বাস করা সুখকর মনে হইত না। তখন অগত্যা সঙ্গীর হস্ত ধরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত।

এইরূপে ক্রমে তাহার বৈচিত্র্যবিহীন অন্ধজীবনের চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু বৈচিত্র্যময় পৃথিবী সাগর ও আকাশ দেখিবার অবকাশ তাহার একদিনের জন্যও ঘটিয়া উঠিল না।

অগাধ ধনের অধিকারী মনোহরের চক্ষু আরাম করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিতে লাগিলেন। মনোহর নীরবে তাহাদের আদেশ পালন করিয়া অটুট্ ধৈর্য্যের সহিত চিকিৎসাধীন রহিল, কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইলনা, সকলেই নিরাশ অন্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অসীম ধৈর্য্যশালী মনোহর একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া আবার আপনার অবস্থায় মগ্ন রহিল। সে একদিনের জন্যও দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবে এ দুরাকাঙ্ক্ষা করে নাই ; কাজেই নিরাশার কৃষ্ণ যবনিকা আসিয়া তাহার অন্তরের শান্তি ঢাকিয়া ফেলিতে পারিল না।

নরেশ তাহার অন্ধজীবনের একমাত্র সুহৃৎ ও সঙ্গী ছিল। আপন সহোদরের ন্যায় দিবারাত্রি সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া মনোহরের মরুময় নিঃসঙ্গ দিনগুলা মধুময় করিয়া তুলিত। একদিন নরেশ আসিয়া বলিল,—"মনু, এতদিন বাদে বুঝি তোমার চোখ সারবে। আমি একজন হাকিমের সন্ধান পেয়েছি। দিল্লিতে তার বাড়ী ; শুনেছি চোখের অসুখ সারাতে সে একেবারে ধন্বন্তরী! কি বল—আনব তাকে একবার ?"

"ক্ষতি কি, দেখতে পার, আমার কিন্তু ভাই বিশ্বাস হয় না।"—মনোহরের মুখে একটু নৈরাশ্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সেদিন আর সে সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। পরদিন প্রথম ট্রেনেই নরেশ হাকিমের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

* * * * *

যথাসময়ে নরেশ দিল্লি হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনোহরের মাতাকে বলিল,—"কাজ শেষ ক'রে এসেছি বড়-মা! লোকটার চেহারা তেমন ভাল নয়, কিন্তু ক্ষমতা একেবারে আশ্চর্য্য। আমি নিজে চোখে হোসেনের অদ্ভুত কাজ দেখে এসেছি।" নরেশ মনোহরের মাতাকে বড়-মা বলিত, তাহার জননী শৈশবেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মাতৃহারা যুবক নরেশ মনোহরের মাতার নিকট হইতেই মাতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। হাকিমের কার্য্যের বিস্ময়কর বিবরণ মনোহরের মাতার নিকট বর্ণনা করিয়া সে বলিল,—"হাকিম হোসেন মনোহরের চিকিৎসা করতে রাজী হয়েছে, তবে একটা কথা—"

উৎকণ্ঠিত ভাবে মনোহরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কথাটা আবার কি ?"

"লোকটা গোড়া বেঁধে কাজ করতে চায়। সে বলে মনোহর যদি জন্মান্ধ হয় তা হ'লে স্বর্গের ধন্বন্তরী স্বয়ং এসেও আর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবেনা।"

জননীর স্নেহ-করুণ প্রাণ দমিয়া গেল। গভীর উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—"কিন্তু মনোহর ত জন্মান্ধ !"

"হোসেন মনোহরকে দেখেনি বটে কিন্তু তার বিশ্বাস ও জন্মান্ধ নয় ; জন্মের পর অন্ততঃ ঘণ্টা কতকও ওর দৃষ্টিশক্তি ছিল। সে বলে জন্মান্ধ লোক শতকরা একজনও আছে কি না সন্দেহ।"

"কই, বাবা আমার তা ত' মনে হয় না। জন্মে অবধি অমনি দৃষ্টিহীন চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমিও বরাবর লক্ষ্য করেছি কিন্তু কখনও ওর দৃষ্টিশক্তি আছে ব'লে মনে হয়নি ত'।"

"সে কথা এখন থাক। দেখাই যাক না একবার শেষ চেষ্টা করে। আমরা যখনই ডাকব তখুনি সে আসবে বলেছে; তবে লোকটার পয়সার ঝাঁই কিছু বেশী। আগে বোধ হয় অনেক দিন দুঃখুকষ্ট পেয়েছে, তাই পয়সাটা এখন চিনেছে ভাল।"

"তা হোক, বাছাকে আমার যদি সে ভাল ক'রে দিতে পারে তবে আমিও তাকে পরিতোষ করব,—আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে যদি সে মনোহরের চোখ ফিরিয়ে দিতে পারে তাতেও স্বীকার আছি আমি। তুমি বাবা অনেক করেছ, আর একবার দিল্লি গিয়ে লোকটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।"

"তার জন্যে ভাববেন না। আমি আজই রাত্তিরের ট্রেনে চ'লে যাব।"

সেই দিবসই নরেশ দিল্লিযাত্রা করিল।

(২)

নরেশ যখন হাকিম হোসেনকে সঙ্গে লইয়া মনোহরের নিকট উপস্থিত হইল, মনোহর তখন একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল,—"আবার একজন এসেছেন? আমি মনে ক'রেছিলুম ডাক্তারের হাত এড়িয়েছি।"

নরেশ বলিল,—"ক্ষতি কি আর একবার চেষ্টা করতে? ফল কিছু না হ'লেও অনিষ্ট হবে না কোন, একথা নিশ্চয় জেনো।"

মনোহর আর কোন কথা কহিল না বা আপত্তি করিল না, নীরবে হোসেন সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

হোসেন প্রথম দর্শনেই বলিলেন,—"নরেশ বাবু! আশা আছে এখনো;—খুব সম্ভব আরাম হবেন।"

তাহার পর তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। মনোহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বোধ হয় বেশ মনে সাহস আছে?"

"কি রকম সাহস?"

"অর্থাৎ যাকে বলে সহ্যগুণ। মনে করুন যদি......"

"হ্যাঁ, তা আর বলতে হবে না। চিকিৎসায় কোন ফল না হ'লে আমি বিশেষ বিস্মিত হই না। তার কারণ আমি যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব এ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও মনে স্থান দিই না।"

"না, আপনি যে আরোগ্যলাভ করতে পারবেন না তা আমি বলছি না। তবে হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে নাও হ'তে পারে, তাই বলছি।"

"তার জন্যে ভাববেন না, এমন আমায় অনেক বার সহ্য করতে হয়েছে। এতদিন যত ডাক্তার দেখেছেন সবাই নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছেন, কাজেই এ ব্যাপার আমার কাছে নতুন নয়।"

"বেশ। কিন্তু আর-একটু কথা আছে। আগে বেশ ক'রে বুঝে দেখুন, তার পর কাজ আরম্ভ করা যাবে। মনে করুন আপনি আরোগ্যলাভ করলেন, পৃথিবীর শোভা দেখলেন, লোক দেখলেন, জগতের সৌন্দর্য্যের এক অংশ দেখলেন, কিন্তু তার পরই আবার যে অন্ধ সেই অন্ধই হলেন; দৃষ্টিশক্তি কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক মিনিট পরেই আবার নিভে গেল। এরকম অবস্থায় আরাম হবার আর কোন আশাই থাকে না। একবার এসে যদি দৃষ্টিশক্তি চ'লে যায় তা হ'লে পীরেরও সাধ্য নেই তাকে ফিরিয়ে আনে।"

বহুক্ষণ ধরিয়া মনোহর নীরবে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—"তাতে আঘাতটা একটু বেশী লাগবে বটে। কিন্তু তা হোক।"

"ভেবে দেখুন, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, এ ক্ষণিক দৃষ্টিলাভের অর্থ কি! তার ফল কি হবে! আপনি এখন অন্ধ, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, রমণীর রূপ আপনি অনুভব করতে পাননি, কাজেই একরকম বেশ আছেন। কিন্তু সে সব একবার দেখার পর আবার যদি আপনি অন্ধ হন তখন অন্তরে কতটা আঘাত লাগবে একবার বুঝুন। অনুশোচনায়, অনুতাপে, হৃদয় তখন পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, অন্ধজীবনের ওপর তখন দারুণ ঘৃণা জন্মাবে, তাই বলছি আবার ভেবে দেখুন, হঠাৎ একটা কাজ ক'রে পরে তার জন্যে সারা জীবনটা বিষময় ক'রে তুলবেন না।"

"তা হোক আপনি যখন বলছেন আরোগ্য লাভের আশা আছে তখন আমি চিকিৎসা করাবই—তা ভবিষ্যতে যদি তার জন্যে দারুণ অনুতাপ করতে হয় তাও স্বীকার। এভাবে আর দিন কাটাতে পারি না!"

"হ্যাঁ, আপনার আরাম হবার আশা আছে—বিশেষ আশা আছে;—অন্ততঃ আমার অল্প বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি তাতে আমি কিরা ক'রে বলতে পারি আপনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তবে সেটা কতক্ষণ থাকবে তা বলতে পারি না। এখন আপনি যা বলেন।"

"আমার আর বলাবলি কিছু নেই, আপনি চিকিৎসা আরম্ভ করুন।"

সেই দিবস হইতেই হাকিম সাহেব চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনোহর একটী অন্ধকার কক্ষে বন্দী হইল; তাহার চক্ষের পল্লবের উপর ঔষধের প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অধিক বাক্যব্যয় বা কোন প্রকার ব্যায়াম করা নিষিদ্ধ হইল। বেচারা একেবারে বেকার ভাবে দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। সে যে আরোগ্য লাভ করিবে, এ কথা সে তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তবে মনের মধ্যে যে একটুও আশা হয় নাই এ কথাও বলা যায় না। আশা তাহার কানে কানে বলিয়া দিত,—"নিশ্চয়ই ভাল হবে তুমি! আমার কথা বিশ্বাস কর, কেন মিছে নিরাশ হচ্ছ; অবিশ্বাসকে জোর ক'রে মন থেকে তাড়িয়ে দাও;—আমি বলছি তুমি ভাল হবেই হবে!" মন সে কথা বিশ্বাস করিত না।

এমনি ভাবে প্রায় দুই মাস অতীত হইয়া গেল। হাকিম তাহারই বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন, অন্য কোথাও যাইতে পান নাই। নিত্যই তিনি মনোহরকে আশা দিতেন,—"আর কি, আপনার সময় ত হ'য়ে এসেছে, আর একটা মাস বই ত না; মনে জোর আনুন, বেশ উৎসাহে দিনগুলো কাটিয়ে দিন।"

চক্ষের পটি কিন্তু সেই প্রথম দিন হইতে আর খোলা হয় নাই। হাকিম বলিয়াছিলেন পূর্ণ তিন মাস সেটী এমনি ভাবে বাঁধা থাকিবে।

প্রথম প্রথম মনোহরের দিনগুলি বেশ নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইত; কিন্তু চক্ষু খুলিবার দিন যত নিকট হইতে লাগিল তাহার চিত্তও তত অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। "যদি না ভাল হই! যদি মিনিট কতক পরেই আবার অন্ধত্ব ফিরে আসে! হা ভগবান! একি করলে! হৃদয়ে বল দাও নাথ!"—এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার চিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

তখন চোখ খুলিবার আর পাঁচদিন মাত্র বাকী! সেদিন আর হাকিম সাহেব আসিলেন না। মনোহরের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। "তবে বোধ হয় কিছু মন্দই হয়েছে! চোখ বোধ হয় একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেল। হা ভগবান! কেন এ দুর্ম্মতি দিলে আমায়! এ আমার কি হ'ল নাথ!"

দ্বিপ্রহরে নরেশ আসিয়া যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল তখন আকুল কণ্ঠে মনোহর তাহাকে একবার হাকিমের কক্ষে যাইতে বলিল।

নরেশ ফিরিয়া আসিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল,—"হাকিম হোসেন ঘরে নেই, তার জিনিষপত্তরও কিছু নেই, একখান কেবল তোমার নামে চিঠি ছিল।"

মনোহর সাগ্রহে বলিল,—"পড় ত, পড় ত চিঠিখানা, কি লিখেছে শুনি।"

নরেশ পড়িতে লাগিল,—

মহাশয়

নসিবপুরের জমিদার মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমি এখনি তথায় যাইতে বাধ্য হইলাম। আপনি মনে করিবেন না। আপনাকে একবার বলিয়া গেলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা আর পারিলাম না। জমিদার মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের চক্ষে ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে;—সে রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি আমায় আশাতীত পুরস্কার দিবেন লিখিয়াছেন—এ সুযোগ আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আপনার ভয় পাইবার বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; আমার যাহা করিবার তাহা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি; এখন আমার থাকায় না-থাকায় সমান। আপনার নসীবে থাকিলে ও খোদার মরজি হইলে উহাতেই আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন আর পাঁচ দিন পরে আপনার চোখের বন্ধন খুলিয়া

ফেলিবেন। ভাগ্যে যদি দৃষ্টিশক্তি লাভ লেখা থাকে তবে তখনই উহা লাভ করিবেন ; তবে আমার ভয় হয় শক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। সেই সময়ের জন্যই আমি বিশেষ চিন্তিত রহিলাম ; আবার দশ দিনের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব।

অনুগৃহীত—হোসেন আলি।

চিঠি শুনিয়া মনোহরের মনে আবার আশা হইল। তবে আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাব! তবু ভাল, আমি ত ভেবেছিলুম বুঝি আর চোখ আরাম হ'ল না! আচ্ছা, যদি ঘণ্টা কতক পরেই আবার দৃষ্টিশক্তি চ'লে যায়! ওঃ সে কি ভয়ানক, কি নিষ্ঠুর! যাক সে কথা, তা ভেবে ত' কোন ফল নেই, মিথ্যে মনে কষ্ট পাওয়া, যা অদৃষ্টে আছে তা হবেই, আমি আর ভেবে কি ক'রব?

(৩)

আজ মনোহর চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিবে। কিন্তু সে জন্য বেচারার মনে একটুও উৎসাহ ছিল না, বরং কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার সারা হৃদয়টা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সে চেষ্টা করিয়াও বন্ধন খুলিতে পারিল না। এই সৌন্দর্য্যময় জগৎ প্রথম দর্শন করিয়া সে কি ভাবে আত্মসম্বরণ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাহার আরও ভয় হইল চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া যদি দেখে যে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই আসে নাই তবে...... তবে কি হ'বে......?

মনোহরের পার্শ্বে তাহার জননী ভুবনমোহিনী এবং ভগ্নী লীলা উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনোহরের এই বিলম্ব তাঁহারা আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না!

"না মা! আমার সাহস হ'চ্ছে না—কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না ; বড় ভয় করছে! আঃ কি কুকাজই করেছি! লোকটাকে চিকিৎসা করতে না দিলেই হ'ত ভাল, এত ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হ'ত না। কি যে দুর্ম্মতি হ'ল তখন! বেশ সুখে ছিলুম আগে—মনে বেশ শান্তি ছিল,—কিন্তু এখন এই এত কাণ্ডের পরও যদি চোখের সাম্‌নে থেকে অন্ধকারের যবনিকা খ'সে না যায় তা' হ'লে আর জন্মে যে সে শান্তি পাবনা।

"আরও ভয়ের কারণ কি জান? এই তোমরা,—তুমি আর লীলা! আমার কথার মানে বুঝতে পারছনা? তা কি ক'রেই বা পারবে? কত দিন তোমরা পাখী, ফুল, নানারঙ, কত সচল পদার্থ, শিশু, সূর্য্য চন্দ্র তারা, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতির কথা ব'লে আমার মনকে প্রলুব্ধ করেছ। এখনও আমি আমার পুরাতন বন্ধু সমুদ্রের গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছি,—তার গন্ধ ভেসে আসচে.........সমুদ্র দেখে কিন্তু আমি কখনও আশ্চর্য্য হব না......কিন্তু মা, ভাব দেখি ......হয়ত—হয়ত এসব দেখে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারব না......কিন্তু যদি পারি তা আমি একা থেকেই পারব—তোমরা থাকলে হয়ত হবে না!"

"তুমি একা থাকবে মনু?"

"আশ্চর্য্য হচ্ছ? ভগবানের পূজার সময় একাই ত' থাকা উচিত! আমার তাই ভাগ্যলিপি.........একাই আমি সে বিধিলিপি ভোগ করব। তোমরা এখন বাইরে যাও। তা নইলে হয়ত আমি চোখ খুলতেই পারব না!"

জননী ও লীলা বহু অনুনয় বিনয় ও মান অভিমান করিয়াও যখন তাহার নিষ্ঠুর সংকল্প দূর করিতে পারিলেন না তখন অগত্যা বাহিরে গমন করিলেন।

মনোহর দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে বলিল,—"আমি তোমাদের স্নেহকরুণ মুখ দেখবার মত মনকে সবল না ক'রে দোর খুলব না। তোমরা কিন্তু আমি না বললে এস না। জোর ক'রে যেন দোর খুলতে চেষ্টা কর' না! আচ্ছা রোস, আমি চাবি দিয়ে সে পথ বন্ধ করছি। আর একটু সবুর কর—আচ্ছা ভাব'দিকি আমি কতদিন কি ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করেছি! তোমরা এইটুকু ধৈর্য্য ধরতে পারছ না?"

মাতা একবার শেষ অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"কিন্তু মনু!......"

"না মা! আর কিন্তু নয়! এতে একটুও কিন্তু নেই!"—তাহার স্বরে দৃঢ়তা ছিল। অগত্যা জননী নিরস্ত হইলেন। মনোহর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। যাইবার

সময় আবার বলিল,—"মনে থাকে যেন না ডাকলে এস না।"

শেষে যখন মনোহর আপন ঈপ্সিত নির্জ্জনতা পাইল তখন সে একবার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একি হাত এরূপ কাঁপে কেন! তাহার মনের মধ্যে একটা কি অনিশ্চিত ভয় আসিয়া দেখা দিল; —যতই বিলম্ব হইতে লাগিল সেও তত অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে অতি সন্তর্পণে চক্ষের বন্ধন মুক্ত করিয়া ফেলিল!

বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি তাহার অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল। ঐ যে সে দেখিতে পাইতেছে!

নয়ন-পল্লবে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কি! স্বাভাবিক ভাবেই তাহা উঠানামা করিতে লাগিল। তাহার নয়ন-সমক্ষে স্বপ্নের ছবির মত অস্পষ্ট কি কতকগুলা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; ক্রমে সেগুলা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ঐযে ওটা কি? সমুদ্রের একটী ক্ষুদ্র ঢেউয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে কিয়ৎক্ষণ সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল। তাইত এ আবার কি?

ক্রমে উত্তরোত্তর সে ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সে-গৃহে আর একা থাকিতে তাহার সাহস হইল না। মনে করিল ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে,—তখনি ছুটিল; কিন্তু যায় কোথা? দ্বার কোথায় তাহা সে স্থির করিতে পারিল না! কি করিয়া স্থির করিবে? দ্বারের আকার ত' সে কখনও দেখে নাই! ভয়ে তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিল; আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে না পারিয়া নিকটেই একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া মাতা ও লীলাকে ডাকে। তাহারা আসিয়া দ্বার ঠেলিলেই কোনটী দ্বার তাহা সে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু দৈব তাহাকে সে কার্য্যও করিতে দিল না। ভয়ে সে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যে, বহু চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিলনা। কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়াছিল। অগত্যা বেচারা চেয়ারে বসিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

অদূরে সমুদ্রের উপর পালভরে একখানি নৌকা যাইতেছিল, বিস্ময়-মূক মনোহর সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ওটা আবার কি? যেন পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে! তবে ঐ বুঝি পাখী? তাই হবে! কিন্তু তাহা হইলে সাদা মত ওটা কি উহার দেহের সহিত লগ্ন রহিয়াছে? পূর্ব্বে সে পুস্তকে নৌকার বিবরণ বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু এক্ষণে তাহা চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

পার্শ্বে একখানি সংবাদপত্র পড়িয়াছিল। সমুদ্রের চঞ্চলবায়ু চুপি চুপি চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানি নাড়িয়া দিয়া গেল। বিস্মিত মনোহর তাহাকে মানব বলিয়া ভ্রম করিয়া চমকিয়া উঠিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বায়ুবিক্ষুব্ধ হইয়া বেলাভূমে গীতের মূর্চ্ছনার ন্যায় করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া আসিয়া পড়িতেছিল; সেই চিরপরিচিত শব্দে চক্ষু তুলিয়া মনোহর আবাল্য-সুহৃদ সমুদ্রকে দেখিল—চিনিল! কিন্তু এইখানে সে আবার একটু গোলে পড়িল। যতদূর দৃষ্টি চলে নীল সমুদ্র কেবল অসীম বলিয়াই মনে হয়; ক্রমে তাহা চক্রবাল রেখার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। মনোহর ভাবিল,—"তবে কি উচ্চের ঐ নীল অংশও সমুদ্র?" সে কখনও আকাশ দেখে নাই; কাজেই আকাশকেও সমুদ্র বলিয়া ভ্রম করিল!

বেলাভূমের উপর দিয়া অর্দ্ধনগ্ন একটী শিশু ছুটিয়া গেল। মনোহর তাহা কি হইতে পারে তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। তবে কি ঐ মানুষ নাকি? আবার তাহার সারা দেহখানি কাঁপিয়া উঠিল।

এই ভাবে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

স্নেহ-ব্যাকুল জননীর আর ধৈর্য্য রহিল না; তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন; চকিত দৃষ্টিতে মনোহর দ্বার দেখিয়া লইল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আবার তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন মনোহর বলিল,—"এখন না; আমি ভাল হয়েছি—বেশ দেখতে পাচ্ছি সব!"

জননী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"তবু এখনো দোর খুলবি না?"

মনোহর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ভূমে পড়িয়া গেল। অগত্যা হস্ত পদে ভর দিয়া অতিকষ্টে পুনরায় গিয়া চেয়ারে বসিল।

ক্রমে আরও দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্নেহব্যাকুল জননী আরও দুইবার আসিয়াছিলেন কিন্তু মনোহর দ্বার খুলে নাই; অবশেষে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সে বলিল,—"এবারে যখন আস্‌বে সেই সময় দোর খুলব!"

আবার সে আকাশ ও সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একি? ক্রমে যে সব অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে! সমুদ্রের সে নীলবর্ণ যে কালো হইয়া যাইতেছে! তবে একি হইল? তবে......তবে বুঝি !

সে আর ভাবিতে পারিল না, অজ্ঞাত ত্রাসে তাহার সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মনে পড়িল হাকিম বলিয়া গিয়াছে,—দৃষ্টিশক্তি হয়ত ঘণ্টাকতক পরেই চলিয়া যাইবে! সে মনে করিল তবে বুঝি আবার তাহার পূর্ব্ব অন্ধত্ব ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে! তাহার মনে হইল,—এখন যদি আবার দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায় তাহা হইলে আর বাঁচিব না—বাঁচিলেও মনে একটুও শান্তি থাকিবে না! হায় হায়! কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিল সে! ইহার অপেক্ষা যে তাহার অন্ধজীবন শতগুণে ভাল ছিল!

ক্রমেই তাহার নয়নের সমক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। নিরাশায় তাহার সারা প্রাণখানি ভরিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। মর্ম্মপীড়িত মনোহর দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া পাগলের ন্যায় দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। করুণ আর্ত্তনাদে সারা বাটীখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া সে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

যখন পুনরায় তাহার লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইল বুঝি সে পৃথিবী ছাড়িয়া পরলোকের নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কারণ তখন সে চতুর্দ্দিকের বস্তুগুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। গৃহের বায়ুর মধ্যে একটা কিসের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখের উপর একখানি স্নেহব্যাকুল মুখ ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মনোহরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই তাঁহার স্নেহময়ী জননী!

"মনু! দেখতে পাচ্ছিস?"

"হঁ্যা; এখন যে ম'রে গেছি, এখন আর দেখতে পাব না!"

জননী সস্নেহে পুত্রের কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন, —"বালাই, মরবি কেনরে পাগলা! আগে যেখানে ছিলি এখনো সেই পৃথিবীতেই আছিস্! শোন শোন, আগে আমায় বলতে দে, তার পর তুই যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করিস। এখন সেই পৃথিবীতেই আছিস—বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছিস; শুধু আমাদের দোষেই তুই আজ এই কষ্টটা পেলি; তা বাবা কি ক'রে জানব বল........"

"জ্যান্ত বেলায় ক্ষণিকের জন্যে মনে হয়েছিল যেন দেখতে পাচ্ছি তার পরই আবার অন্ধত্ব ফিরে এল।"

"ওরে পাগল না না, এখনো তোর দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে।"

ঠিক সেই সময়ে নরেশ আসিয়া বলিল,—"আর আজীবন তা থাকবেও।"

"হঁ্যা;—আর তোর দৃষ্টিশক্তি যাবে না। তুই যাকে অন্ধত্ব মনে করেছিলি সে অন্ধত্ব নয়, সন্ধ্যার অন্ধকার। রোজ সেই সময় একটু একটু ক'রে দিনের আলো নিভতে থাকে, তার পর রাত্রি আসে, বুঝেছিস পাগল!"

কিন্তু বহুক্ষণ তর্ক চলিলেও মনোহর সে দিন আর কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। *

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* একটি ইংরেজি গল্প অবলম্বনে।

জরি শল্মা-চুমকি মঞ্জিলা

জরি-শিল্পের সৃষ্টি ঠিক কোন সময়ে হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হইলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উহার প্রচলন ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, বিবাহের সময়ে সীতাদেবী জরিযুক্ত গোলাপী রঙের একখানি শাড়ী পরিয়াছিলেন। মিশর দেশের সুরক্ষিত শবগুলিকে 'সপুরট' পরিচ্ছদে আবৃত করা হইত এবং ট্রয়নগর অবরোধের সময়েও এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

জরির তার তৈরী করিবার মজুর বা মস্ত্রী—পৈরা ও পৈরী

মূল জরি-শিল্পের প্রাচীনত্বের দাবী-সমর্থন-পক্ষে উক্তরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও, উহার অন্তর্গত শল্মা, চুমকি ও মঞ্জিলার কার্য্য সুদূর অতীতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতে ইহার প্রচলন মুসলমানদের আমলে হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভারতের যে-সকল নগর বিভিন্ন সময়ে মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল এই শিল্পের কার্য্য সেই-সকল স্থানেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান কারিগরই ইহার পরিচালক—মুসলমান যুগের সহিত এই শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ইহাও একটী কারণ বটে।

পাটনা ও কলিকাতা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইয়াকুব বা জ্যাকবের পুত্র য়ুসুফ বা জোসেফ এই শিল্পের আবিষ্কর্ত্তা। জোসেফ স্বয়ং অবসরমত রুমালের উপর এই শিল্পের চর্চ্চা করিতেন। এই প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি এ দেশের জরি-ব্যবসায়ীগণ মুসলমান বর্ষের শেষ বুধবারে জোসেফের উদ্দেশে নিয়াজ অর্থাৎ পূজা দিয়া থাকে; এবং অগ্রে ঐরূপ পূজার অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ এই শিল্প-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না।

শল্মা চুমকি ও মঞ্জিলার কাজে তেমন বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। এই কার্য্যের প্রধান যে অঙ্গ তাহা কারিগরের হাতের কৌশলেই সম্পন্ন হয়। তার উপর সাধারণ একটা টেবিল, গোটা দুই টেকুয়া, একটা চরকা, ছোট একটা হাতুড়ী, একখানা কাঁচি, একটা ছোট চিমটা, একটা নেহাই, দুচার টুকরা লোহা ইত্যাদি সামান্য রকমের কয়েকটী উপকরণ হইলেই যথেষ্ট।

মঞ্জিলা সাদা ও হলদে এই দুই রকমের হয়। সাদা মঞ্জিলা রৌপ্যনির্ম্মিত এবং হলদে মঞ্জিলা রূপার উপর সোনার গিলটী-করা। সময়ে সময়ে দস্তার তারের উপর রূপার হল করিয়াও সাদা মঞ্জিলা তৈরী করা হয়। এই শ্রেণীর মঞ্জিলাকে ঝুটা এবং বিশুদ্ধ রৌপ্য মঞ্জিলাকে সাঁচ্চা পর্য্যায়ে অভিহিত করা হয়।

রূপার তারের উপর সোনার গিলটী করার প্রক্রিয়া এইরূপ:—৪০ হইতে ৬০ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের রূপা গলাইয়া একটী ছাঁচে ঢালিতে হয়। ঐ ছাঁচটী সরু শলাকার ন্যায় এবং উহার একদিক মোমবাতির অগ্র-

ভাগের ন্যায় শুণ্ডাকৃতি। গলিত রৌপ্য ইহার মধ্যে জমিয়া শুণ্ডমুখ শলাকার অবয়ব ধারণ করে। এই শলাকার গায়ে অতি পাতলা সোনার পাত মুড়িয়া উহাকে রেশমী সূতায় আবৃত করিয়া অগ্নির উপর ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলেই সোনার পাত রূপার গায়ে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়া গিল্‌টীর কার্য্য করে। সাধারণতঃ ৪০ হইতে ৬০ তোলা পর্য্যন্ত রূপা গিল্‌টী করিবার জন্য দশবার আনা সোনার প্রয়োজন হয়। সোনার পরিমাণ ইহার কম-বেশী হইলে গিল্‌টীর রংও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে।

গিল্‌টী করিবার জন্য রৌপ্যনির্ম্মিত যে শলাকাটী ছাঁচে প্রস্তুত করিতে হয়, মঞ্জিলার মূল উপাদানই তাহা। এই শলাকাটীকে পাসা বা কাঁদ্‌লা বলে এবং যাহারা কাঁদলা তৈরী করে তাহাদের নাম কাঁদলা-কশ্। সাদা মঞ্জিলা, সাঁচ্চা বা ঝুটা কাঁদ্‌লার রূপান্তর, এবং হলুদে মঞ্জিলার মূল সোনার-গিল্‌টী-করা কাঁদ্‌লা। মঞ্জিলা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ঘাওয়া নামক একটী যন্ত্রের সাহায্যে ইস্পাত-নির্ম্মিত পাত্র-বিশেষের গাত্রস্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ছিদ্রের মধ্য দিয়া পর্য্যায়ক্রমে পরিচালনা করিয়া কাঁদ্‌লাটীকে যথেষ্ট সরু করিয়া লইতে হয়। অতঃপর ইহা রিল-সূতার টেকুয়ার ন্যায় একটী টেকুয়ার গায়ে জড়ানো হয়। এই টেকুয়াটী ফুটখানেক উচ্চ একটী টেবিলের এক প্রান্তে সংলগ্ন থাকে। ইহার বিপরীত প্রান্তে লোহার-হাতলযুক্ত আর একটী বড় টেকুয়া অবস্থিত থাকে। এই টেকুয়া দুইটীর বৃত্ত যথাক্রমে তিন ও ছয় ইঞ্চি এবং ইহারা পৈরী ও পৈরা নামে পরিচিত। পৈরী ও পৈরার ব্যবধান-পথের মধ্যদেশে টেবিলের উপর খাঁজের মধ্যে বসানো ইস্পাতনির্ম্মিত একটী পাত্র থাকে, উহাকে যন্তর বা যন্ত্রী বলে।

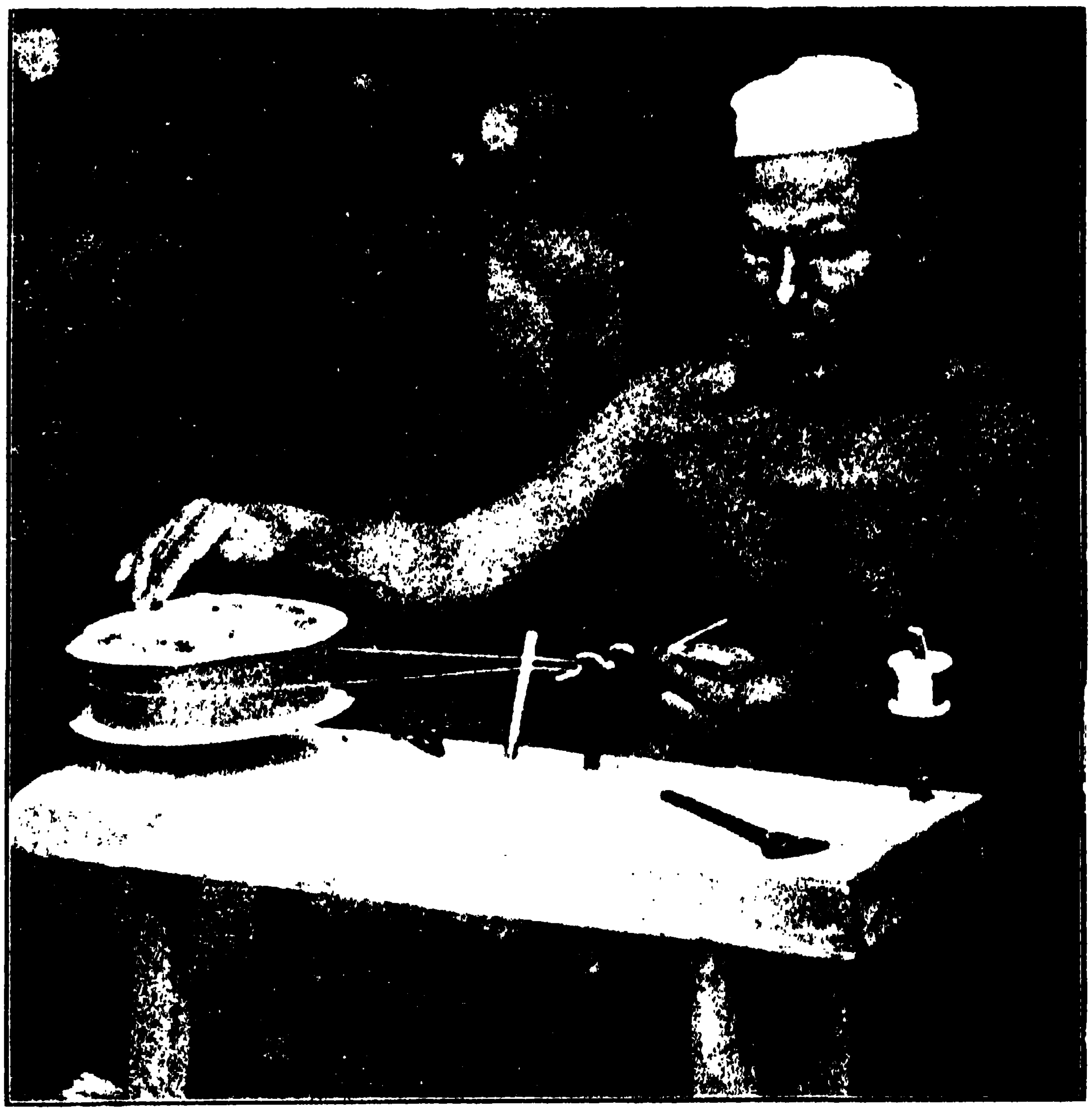

কোরা শল্মা প্রস্তুতের যন্ত্র ও প্রণালী।

এই যন্তরটীর গায়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা পরিসরের কতকগুলি ছিদ্র আছে। পৈরীর গায়ে জড়ানো কাঁদ্‌লাকে মঞ্জিলার আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার সময়ে উহার এক প্রান্ত এই ছিদ্রগুলির কোনটীর মধ্য দিয়া প্রসারিত করিয়া লইয়া পৈরার ঊর্দ্ধভাগে আঁটিয়া দিতে হয়। পরে পৈরার হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে উহা যেমন পৈরীর গায়ের পাঁচ খুলিয়া পৈরার গায়ে জড়াইতে থাকে, তেমনি যন্তরের যে ছিদ্র দিয়া উহা বিসর্পিত হয় তদনুরূপ পরিসরের মঞ্জিলার রূপ ধারণ করে। সূক্ষ্মতম মঞ্জিলা প্রস্তুত করিবার সময়ে ঐ কাঁদ্‌লাকে পর্য্যায়ক্রমে যন্তরের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ছিদ্র-মুখে গলাইয়া আনিতে হয়। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে চাপ দিয়া চুলের ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মঞ্জিলাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন যন্তরের ছিদ্র-পথের চাপে উহা শক্ত হইয়া উঠে, অন্যদিকে উহার ঔজ্জ্বল্যও অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

দোব্‌কা শল্মা বা বাদ্‌লা বা লামেট্টা এবং চুমকি প্রস্তুত-প্রণালী।

সাধারণতঃ এক তোলা ওজনের ধাতুনির্ম্মিত কাঁদ্‌লা দ্বারা মোটা ৬০০ গজ ও সরু ১২০০ গজ লম্বা মস্‌লিনা প্রস্তুত হইতে পারে। যাহারা এই তারতৈরী করেতাহা-দিগকে 'তারকীশ' (ফার্শী তার, কশীদন-টানা) বলে।

পূর্ব্বে এ দেশের সমস্ত কারিগরই মস্‌লিনা তৈরীর জন্য দেশী যন্তর ব্যবহার করিত। অদ্যাপি কলিকাতায় উহারই প্রচলন আছে। কিন্তু পাটনা সহরে উহার বদলে বিলাতী যন্তরের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতী যন্তর টাকার ন্যায় পুরু এবং এক ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। ইহার গাত্রস্থ ছিদ্রগুলি উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতররূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। ইহা দেখিতে একটু সুন্দর এবং ইহার বহির্ভাগ সোনার হলকরা। এই বাহ্যিক চাকচিক্যেই মুগ্ধ হইয়া দরিদ্র শিল্পীগণ ঘরের টাকা পরের পায়ে বিলাইয়া দিতে ব্যস্ত, অথচ ইহাদের ঘরের জিনিস কার্য্যকারিতায় ইহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে এবং দামেও অনেক সস্তা।

শল্মা মস্‌লিনার সংস্করণ-বিশেষ। মস্‌লিনার ন্যায় ইহার রংও সাদা ও হল্‌দে হইয়া থাকে। অধিকন্তু পাকানো পাকানো গোল মস্‌লিনা দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহার নাম হয় কোরা শল্মা, এবং চ্যাপ্‌টা মস্‌লিনা দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহাকে দোব্‌কা শল্মা বলে।

কোরা শল্মা প্রস্তুতের জন্য যেসকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তন্মধ্যে একটী চাকা ও লৌহনির্ম্মিত গোল চরকা প্রধান। চাকাটী একটী টেবিলের এক প্রান্তে এবং চরকাটী তৎসন্নিকটে সংস্থিত থাকে। চাকাটীর কিঞ্চিৎ দুরে দুইটী ডাণ্ডার মাথায়, ছিদ্রমধ্যে, একটী লৌহশলাকা আড় করিয়া রাখা হয় এবং তাহার সহিত একটী সরু বাঁশ বাঁধিয়া চরকার একাংশের সহিত একগাছা সূতা গাঁটিয়া চাকাটীর সংযোগ বিধান করা হয়। যে মস্‌লিনা হইতে শল্মা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা চাকাটীর বিপরীত দিকে টেবিলের অপর প্রান্তে একটী রিল-টেকুয়ার গায়ে জড়ানো এবং উহার এক মুখ চরকার সহিত সম্বদ্ধ থাকে। শল্মা তৈরী করিবার সময়ে শুধু চাকাটী ধরিয়া ঘুরাইলেই উহার বেগে লৌহশলাকাটী এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চরকাটীও ঘুরিতে থাকে। উহার টানে রিল-টেকুয়ার গাত্রস্থ মস্‌লিনা খুলিয়া গিয়া চরকার গায়ে জড়াইয়া গিয়া কোরা শল্মার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন আকারের শল্মা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেক রকম কাজের জন্য এক-একটি বিভিন্ন নক্সার চরকা ব্যবহার করিতে হয়।

দোব্‌কা শল্মার প্রস্তুতপ্রণালী কোরা শল্মারই অনুরূপ। তবে কোরা শল্মা তৈরীর সময়ে যেমন গোল মস্‌লিনার আবশ্যক হয়, ইহার জন্য তেমনি চ্যাপ্‌টা মস্‌লিনা ব্যবহার করিতে হয়। চ্যাপ্‌টা মস্‌লিনা বাদ্‌লা হইতে

সৃষ্ট এবং বাদ্‌লাও সাধারণ মল্লিলার উপাদানে প্রস্তুত। দুই তিনটী ছিদ্রবিশিষ্ট লৌহময় ডালাবিশেষের ছিদ্রপথে সাধারণ মল্লিলা গলাইয়া আনিয়া তৎসম্মুখস্থ মসৃণ নেহাইর উপর হাতুড়ি দ্বারা উহা পিটাইলেই বাদ্‌লা প্রস্তুত হয়। ছিদ্রমুখে গলাইবার সময় একদিকে যেমন কারিগরগণ ক্ষিপ্রভাবে তারের মুখ পিটাইয়া চ্যাপ্‌টা করে, অন্যদিকে বাম হাতের অঙ্গুলী দ্বারা ঐ তার সুচারুরূপে চালনা করিতেও থাকে। ক্ষিপ্রতার সহিত তার সরাইয়া সরাইয়া দিলেও এমন হিসাব করিয়া সরায় যাহাতে তারের সরানো অংশের সমস্তটাই হাতুড়ির এক আঘাতে চ্যাপ্‌টা হইয়া যায়।

দেওয়ালী, কাশর ও কামদানী, এই তিন পর্য্যায়ে বাদ্‌লা বিভক্ত। দেওয়ালী বাদ্‌লা অপেক্ষাকৃত একটু চ্যাপ্‌টা রকমের, কিন্তু কাশর সরু ও হাল্‌কা। কামদানী বাদ্‌লা সূতী বা রেশমী কাপড়ের উপর কারচুবির কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

দোব্‌কা শল্মা ব্যতীত, কাঙ্কনী বা মোতি তার, কল্লাবাতুন ও সোনা রূপার থাল প্রস্তুতের নিমিত্তও বাদ্‌লার আবশ্যক হয়।

কাঙ্কনীর প্রস্তুত-প্রণালী কোরা শল্মার ন্যায়। তবে ইহার জন্য যে চরকার আবশ্যক হয় তাহা কোরা শল্মার চরকার ন্যায় গোল না হইয়া নাটুয়ার ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি বা সমকোণ হওয়ার প্রয়োজন। সোনারূপার থালের কার্য্যে সূক্ষ্মাকৃতি বাদ্‌লা লাগে। এইরূপ বাদ্‌লা তৈরীর জন্য যন্তরের ছিদ্রমধ্যে একগাছি গোল মল্লিলা আঁটিয়া রাখিয়া পরে তন্মধ্য দিয়া বাদ্‌লার উপাদান সাধারণ মল্লিলা গলাইয়া আনিতে হয়; তাহাতে এই মল্লিলার একদিক চাপ পাইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া উঠে। এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার মল্লিলা দ্বারাই সোনারূপার থাল তৈরী হয়।

রেশমী সূতার সহিত সোনা বা রূপার তার জড়াইয়া কল্লাবাতুন তৈরী হয়। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নরূপ ঃ—

প্রথমতঃ রেশমী সূতা সামান্য রকম একটু পাকাইয়া লইতে হয়। পরে উহা চরকায় জড়াইয়া উহার এক প্রান্ত কড়িকাঠে সংলগ্ন আংটার মধ্য দিয়া আনিয়া একটী টেকুয়ার সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। ঐ অবস্থায় টেকুয়াটী হাঁটুর উপর রাখিয়া পাক দিলে উহার সহিত সংলগ্ন সূতায় যেমন পাক পড়িতে থাকে, তেমনি সন্নিকটস্থ আর একটী চরকায় জড়ানো সোনা বা রূপার মল্লিলার একদিক উহার নিম্নভাগে লাগাইয়া ধরিলে তাহাও উহার সহিত পাক পাইয়া জড়াইয়া পড়ে। এই কার্য্যের

কল্লাবাতুন বা জরি-জড়িত রেশম।

সময়ে মল্লিলা আল্গাভাবে ছাড়িয়া না দিয়া হাত দিয়া উঁচু করিয়া রেশমী সূতার গায়ে লাগাইয়া ধরা দরকার। কারিগরগণ এই উভয় কার্য্য এক সময়ে দুই হাতে অতি দ্রুতভাবে করিতে থাকে। এবং এক পাকে যতটা কল্লাবাতুন তৈরী হয় তাহা টেকুয়ার এক অংশে জড়াইয়া রাখিয়া পরে আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সোনা বা রূপার তারের আংটী হইতে চুমকি প্রস্তুত

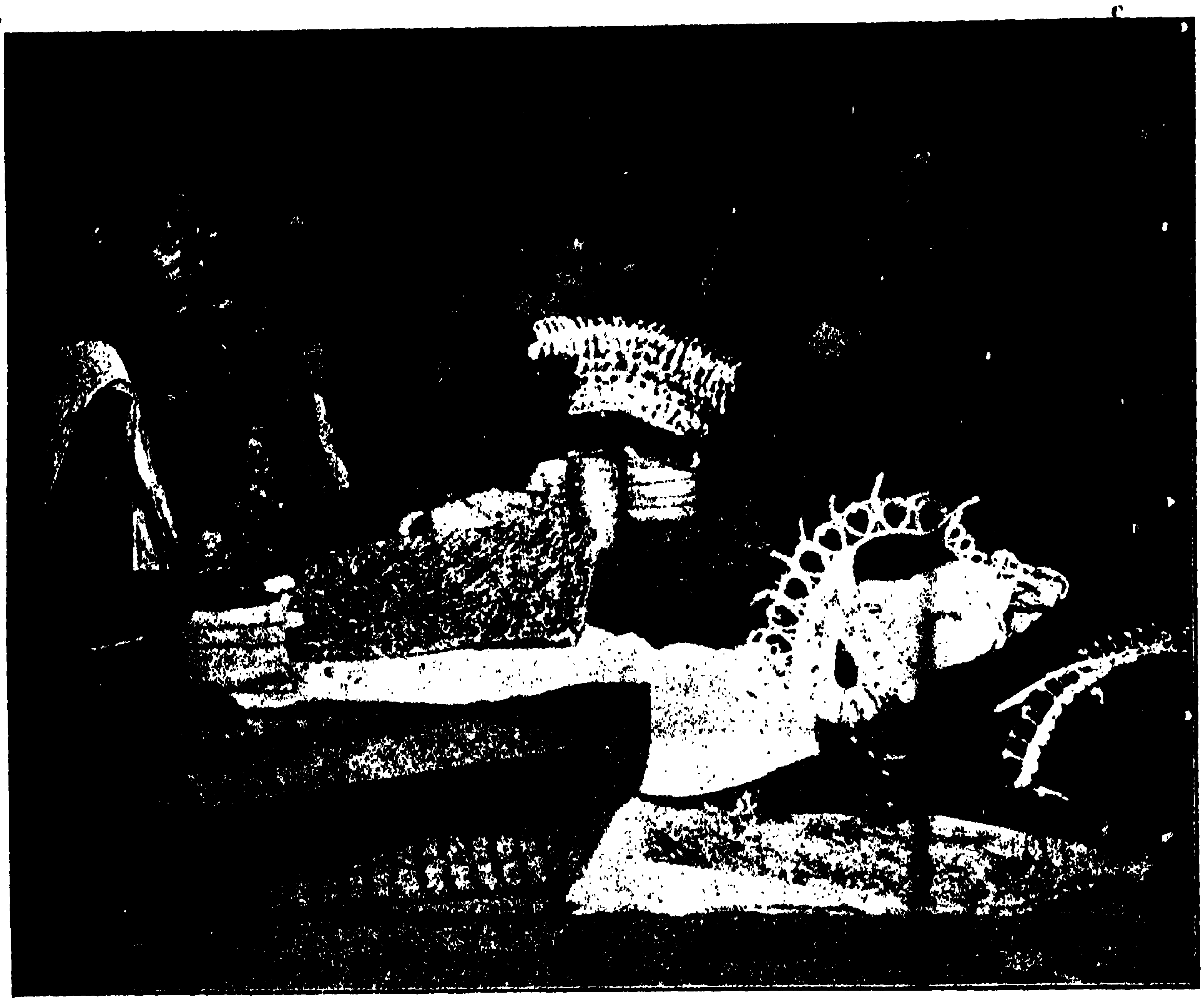

প্রতিমার ডাকের সাজ তৈরী।

হয়। এক ইঞ্চির বারো বা ষোল ভাগ আকারের গোল একটা লৌহশলাকার গায়ে সোনা বা রূপার তার জড়াইয়া রাখিলে উহা লম্বমান ক্ষুদ্র আংটীশ্রেণীতে পরিণত হয়। এই আংটীগুলির এক একটী কাঁচি দ্বারা কাটিয়া পৃথক করিয়া চিমটার সাহায্যে নেহাইর উপর ফেলিয়া হাতুড়ি-পেটা করিলেই চুমকি প্রস্তুত হইল।

শল্মা, চুমকি ও মজ্জিনা পূর্ব্বে এদেশের অনেক কাজে লাগিত। প্রতিমার ডাকের সাজ, হাতীঘোড়ার জিন, ঝুল, সাজ প্রভৃতি তৈরীর জন্য এবং ধনীলোকের ব্যবহার্য্য জুতা, টুপী, পাগ, পোষাক পরিচ্ছদে এবং রেশমী ও পশমী বস্ত্রে নানাবিধ কারচুবি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ প্রচলন ছিল। ঐসকল কার্য্যে অদ্যাপি উহার ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে যাত্রা-থিয়েটারের পোষাক ও নাচওয়ালীর সাজসজ্জা প্রস্তুতের নিমিত্ত ইহার পসার স্থলবিশেষে কথঞ্চিৎ বৃদ্ধিও পাইয়াছে।

এদেশে ডাকের সাজের প্রচলন কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই। তবে দুই শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে ইহার ব্যবহার ছিল, প্রসিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সঙ্গীতে কবি মহামায়ার বিশ্ব-মাতৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে 'তুচ্ছ ডাকের সাজে' সাজাইতে নিষেধ করিতেছেন।

পূর্ব্বে এই ডাকের সাজ প্রস্তুত করা মালাকরগণের জাতীয় ব্যবসায় ছিল। অধুনা উহা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসম্প্রদায়েরই অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার কুমারটুলী ও মেছুয়াবাজার মহল্লায় ডাকের সাজের অনেকগুলি কারখানা ও ভবানীপুরেও একখানি দোকান আছে। এই-সকল কারখানায় প্রায় ১২৫ জন পুরুষ ও ৩০০ স্ত্রীলোক কাজ করে। এই কার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকের আয় মন্দা বাজারেও দৈনিক

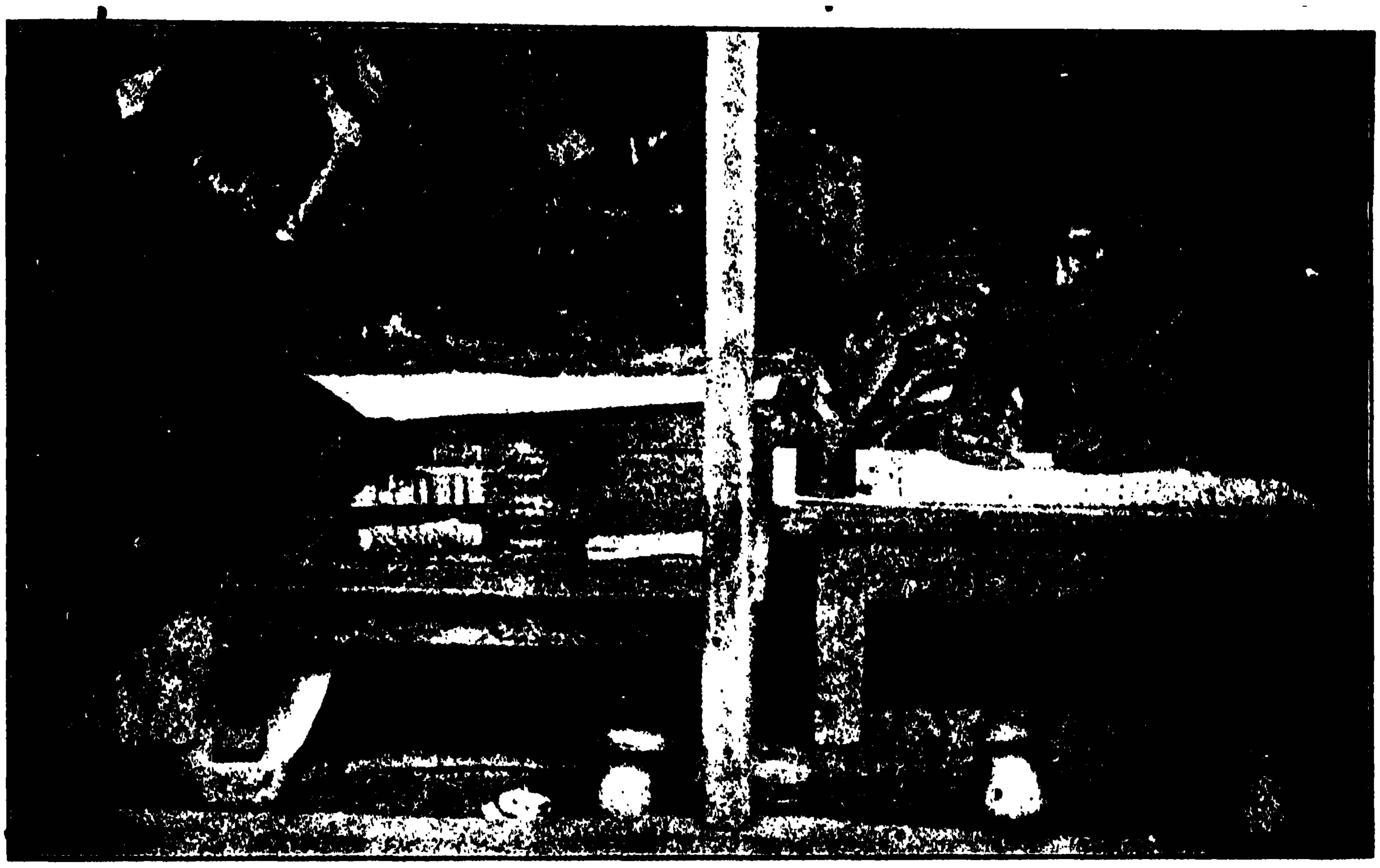

প্রতিমার ডাকের সাজ তৈরী।

চারি পাঁচ আনার কম নহে; পূজার সময়ে ঐ আয়ের পরিমাণ দশ বারো আনাও হয়। যে-সকল স্ত্রীলোক এই কার্য্য করে তাহারা অধিকাংশই মধ্যশ্রেণীর হিন্দু। ইহারা ঘরে বসিয়া অবসরমত ইহার কোন কোন অংশের কার্য্য করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। কোন কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোকের পক্ষে এই কার্য্যই উপজীবিকার মূল। তাহারা ইহার সাধারণ অংশের কার্য্য করিয়া প্রত্যহ দেড় হইতে আড়াই আনা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে।

ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও সেরপুরেও ডাকের সাজের উৎকৃষ্ট কাজ হইয়া থাকে।

প্রতিমার কাঠাম সাজাইবার সরঞ্জাম—গম্ভীরা, লপট ও কল্কা হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট, আঁচলা, বাজু, হার, তাবিজ, কঙ্কণ প্রভৃতি প্রতিমার অঙ্গের যাবতীয় ভূষণ ডাকের সাজের অন্তর্ভুক্ত। মুকুট, আঁচলা ও অলঙ্কারাদি প্রতিমার আকারানুযায়ী বিভিন্ন মাপের, এবং গম্ভীরা, কল্কা প্রভৃতি ১২।১৪ ইঞ্চ চওড়া করিয়া তৈরী হয়। নানারূপ চিত্রের ছাঁচে রাঙের পাত ফেলিয়া চাপ দিয়া কল্কা ও গম্ভীরা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ গম্ভীরা হইতে কল্কার উপর কারুকার্য্য অনেক বেশী থাকে।

মোম ও গন্ধবিরজার সহযোগে উৎপন্ন একপ্রকার লেই দিয়া কাপ, আংটী, রাং, চুমকি, জামিরা, বিছাচাকী বসাইয়া আঁচলা প্রস্তুত হয়।

কাপ শোলা হইতে প্রস্তুত। মালাকরেরা ধারাল ছুরি দ্বারা শোলা পাতলা করিয়া কাটিয়া ইহা তৈরী করে। আংটী বাদ্‌লাজড়িত লোহার গোলাকার তার বিশেষ। লাল, সবুজ ইত্যাদি বিবিধ রঙের ধাতুর পাতকে জামিরা বলে; এবং ঐ জামিরাকে চুমকির নক্সায় কাটিলেই বিছাচাকী হয়।

আঁচলার উপর যে প্রকার কারুকার্য্য করার প্রয়োজন কাপের গায়ে তাহার নক্সা টানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ কাপগুলিতে লেই মাখাইয়া একটী তুলার গদির উপর রাখিয়া কণুই বা পা দ্বারা চাপ দিতে হয়। তারপর আংটী দ্বারা রচিত আবশ্যকীয় পরিকল্পনার দাগ উহার উপর লওয়া হয়। স্ত্রীলোকগণ ঐ দাগ অনুসারে কাপের কোন কোন অংশ নরুন দ্বারা কাটিয়া ফেলে এবং উহার নীচে জামিরা লাগাইয়া ফাঁকগুলিকে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট করিয়া তোলে। অতঃপর উপরের দিকে প্রয়োজনানুরূপ চুমকি, বিছাচাকী, রঙীন কাগজ ইত্যাদি লাগাইয়া আঁচলার অবয়ব সম্পূর্ণ করে।

মুকুট তৈরীর জন্য যে সকল জিনিস লাগে, তন্মধ্যে

নিম্নলিখিত উপকরণগুলিই প্রধান :—(১) লোহার তারের ফ্রেম। (২) জামিরা। (৩) রাং। (৪) চুমকি। (৫) বিছাচাকী। (৬) বকুল। (৭) কিরকিরা।

বকুল—বাদ্‌লা দ্বারা আবৃত ডিম্বাকার শোলার খণ্ড-বিশেষ; এবং কিরকিরা—রেসা অর্থাৎ মোড়ানো বাদ্‌লা দ্বারা বদ্ধমুখ ইঞ্চিপ্রমাণ আংটী।

উপরি-উক্ত লোহার তারের ফ্রেমটী বাদ্‌লা দ্বারা

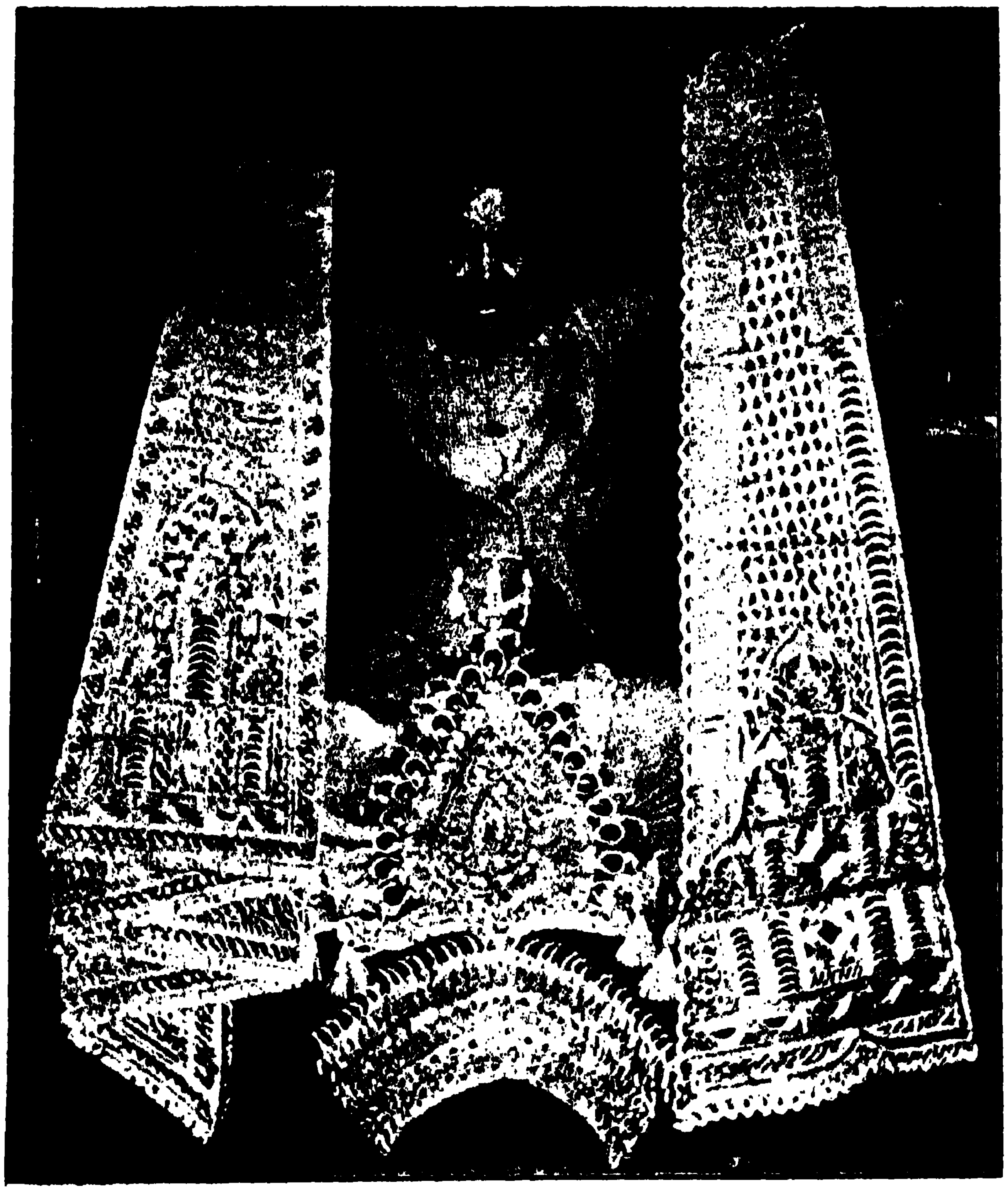

প্রতিমার ডাকের সাজের মুকুট ও আঁচলা।

আবৃত করিয়া তদুপরি বকুল, কিরকিরা, বিছাচাকী, চুমকি, জামিরা ও রাঙের পাতের যথাযথরূপ সন্নিবেশে মুকুট তৈরী হইয়া থাকে।

বাজু, হার, কঙ্কণ প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীও উক্তরূপ। উহার ফ্রেম লোহার বদলে শোলা দ্বারা তৈরী হইয়া থাকে এবং তদুপরি বিবিধ বর্ণের লেই মাখিয়া তাহা ধাতুর পাত দ্বারা আবৃত করা হয়।

শল্মা, চুমকি, কাঙ্‌নী, বাদ্‌লা ইত্যাদির দ্বারা টুপী, পাগ, জুতা, জ্যাকেট, কোমরবন্ধ ইত্যাদির উপর জরির কার্য্য করা হয়। মখমল, রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি উহা দ্বারা ভূষিত হইলে তাহাকে জরদোজী বলে। যাহারা জরদোজীর কার্য্য করে তাহারা জরদোজ নামে পরিচিত। জরদোজগণের প্রত্যেকেই প্রত্যহ ॥০ হইতে ১৲ পর্য্যন্ত রোজগার করে।

মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় কল্লাবাতুন দ্বারা উৎকৃষ্ট জরির কার্য্য করা হয়। হাতীঘোড়ার সাজ, ঝালরযুক্ত সামিয়ানা, পালকীর ঘেরাটোপ, উপাসনা-মন্দিরের কার্পেট, কোমরবন্ধ, মণিব্যাগ, জুতা, টুপী, বডিস্, জ্যাকেট, গাউন প্রভৃতির উপর কারচুবি সাধারণ জরি দ্বারা করা হয়। এই-সকল জরির কার্য্য তাঁতে এবং সূচী দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে। উৎকৃষ্ট জরির কার্য্য মখমল বা বনাতের উপর করাই প্রশস্ত। তুলার বস্ত্রের উপর জরি বসানো হইলে তাহাকে কামদানী বলে। যে-সকল বস্ত্রে সোনার জরি অধিক ব্যবহৃত হয় তাহা কিংখাব নামে পরিচিত। কোন কোন কিংখাবে সোনা রূপার জরির সহিত রেশমী সূতাও মিশানো থাকে।

কোন কোন রেশমী কাপড়ের উপর উঁচু করিয়া জরি বসাইয়া একপ্রকার কারচুবি করা হয়। আহম্মদাবাদ, আওরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, মুলতান, সুরাট, পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ প্রকার জরিযুক্ত, রেশমী শাড়ী যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। বেনারসী শাড়ী রেশমের উপর জরি তোলার আর একপ্রকার দৃষ্টান্ত। বঙ্গদেশের স্ত্রীমহলে এই শাড়ীর যথেষ্ট আদর।

হাতীঘোড়ার সাজ ও টুপীর উপর কারচুবির নিমিত্ত সোনারূপার জরি ব্যবহৃত হয়। মাননীয় কলিন্ সাহেবের ১৮৯০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ—পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই কার্য্যে দক্ষ বহু শিল্পী আছে, এমন কি

একমাত্র পাটনাতেই ১০০০ কারিগর এই কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জরি (কল্লাবাতুন) পাটনা ও মুর্শিদাবাদে তত বেশী তৈরী হয় না ; উহার অধিকাংশই বারাণসী ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানী হয়।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদাদি, গোটা, কিনারা, আঁচলা, ফিতা, পাড় প্রভৃতি অনেকাংশ জরিযুক্ত থাকে। উহা পৃথক পৃথক ভাবে বহু নক্সায় তৈরী হয়। ইহার টানা ও পড়েনে জরি ও রেশমী সূতা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা, পাটনা, বারাণসী ও মুর্শিদাবাদ এই কার্য্যের প্রধান স্থল।

কলিকাতায় বিবাহ উপলক্ষে বরের ব্যবহার্য্য এক প্রকার জরির পোষাক পাওয়া যায়, উহার অন্তর্গত জুতা, শিরপেচ, চাপকান প্রভৃতি সমস্তই শল্মা, চুমকি ও মঞ্জিলা দ্বারা শোভিত। উহার প্রস্তুত-প্রণালী যাত্রা বা থিয়েটারের পোষাকেরই অনুরূপ। বিবাহের টোপরও সোলার উপর শল্মা চুমকি দিয়া তৈরী হয়।

শট্‌কা অর্থাৎ গড়গড়ার নল জরি-শিল্পের আর একটী উদাহরণ। এই-সকল নল কল্লাবাতুন ও ঝুটা মঞ্জিলা উভয় দ্বারাই খচিত করা হয়। এবং জরির তারতম্য অনুসারে ইহাদের মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

পশ্চিম দেশীয়া দরিদ্রা স্ত্রীলোকগণ উৎসব ও তামাসাদি দেখিবার সময়ে এক প্রকার রঙীন কাপড় পরিধান করে। উহাতে কারচুবির নিমিত্ত সাধারণ শল্মাদি ব্যবহৃত হয়।

সোনারূপার পাতা এই শিল্পের এক প্রকার-ভেদ। ইহা আসল ও নকল উভয় রকমেরই হইতে পারে। নকল পাতার একটা কারখানা পূর্ব্বে কলিকাতার মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু কলে প্রস্তুত ঐ জাতীয় বিলাতী পাতার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা জয়লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া বহুদিন হইল ফেল্ পড়িয়াছে।

আসল পাতার চারিটী কারখানা চিৎপুরে আছে। পাটনা-নিবাসী নাজির হোসেন ও তাহার কর্ম্মচারী মহম্মদ তকী ইহার কার্য্যে বিশেষ নিপুণ। নাজির হোসেনের দোকান লোয়ার চিৎপুর রোডে স্থিত। মহম্মদ তকী এই দোকানে ২০৲ বেতনে কার্য্য করিতেছে।

আসল সোনারূপার পাতা বিশুদ্ধ সোনারূপা দ্বারা প্রস্তুত হয়। এক তোলা সোনা বা রূপার পাত ১৬০ বা ১৪০ অংশে বিভক্ত করিয়া ঐ সংখ্যক তালাযুক্ত ৬″×৪″ আকারের মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত একটী ব্যাগের প্রত্যেক খোপে এক এক টুকরা পাত রাখিয়া তাহা হাতুড়ি দ্বারা পিটাইলেই ৪″×৫″ পরিসরের সোনা বা রূপার পাতা তৈরী হয়। ঐরূপ পাতার স্বর্ণনির্ম্মিত এক একটী ১৮৲ দরে ও রৌপ্যনির্ম্মিত এক একটী ১৷৷০ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এইরূপ সোনা রূপার পাত স্তবকে স্তবকে সজ্জিত থাকে বলিয়া চলিত কথায় তাহাকে সোনার তবক বা রূপার তবক বলে; এই তবক সৌখীন মিষ্টান্ন বা পানের গায়ে মুড়িয়া সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকারভেদে জরি-শিল্পের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার এতগুলি দ্বার মুক্ত থাকা সত্ত্বেও ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেশীয় অন্যান্য শিল্পের ন্যায় দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় শিল্পের এইরূপ অধোগতি দেখিয়াই পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

> পাটনায় হস্তনির্ম্মিত শিল্পের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে, অন্য কোন ক্ষেত্রে সেরূপ দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। এস্থানে প্রায় সকল রকম শিল্প-কর্ম্মই পরিচালিত হইয়া থাকে; কিন্তু উহার কোনটীই তেমন খ্যাতি কি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। এই-সকল শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও বড় একটা দেখা যায় না।

পূর্ব্বে জরি-শিল্প পাটনাবাসী অনেকের বংশগত ব্যবসায় ছিল। কিন্তু অধুনা ঐ-সকল ব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে।

পাটনায় ১৯১০ সালে যেসকল ব্যক্তি জরি-শিল্পের এবং শল্মা-চুমকি-মঞ্জিলার কার্য্য করিতেছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নাম	ঠিকানা
কজ্জুমিঞা	
আলি আহম্মদ	
হাজী আকবর	কসাহাত কা ময়দান।
হাজী মহম্মদ ইসমাইল	
আবদুল রহমান (হাজী তগীরামের পুত্র)	

নাম		ঠিকানা
দৌলত মিঞা	...	মোগলপুর।
সুপন মিঞা	..	কালু খাঁ কা বাগ।
আবুহুল্লা	..	সদর গলী।

এই স্থানের ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণের উৎসাহের অভাবকেই এই শিল্পের অধোগতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। "জনসাধারণের উৎসাহ" অর্থে ইহারা এই বুঝে যে, সকলে ইহাদিগকে যেমন জিনিসাদি তৈরীর যথেষ্ট ফরমাস দিবে তেমনি তজ্জন্য অগ্রে টাকা দাদনও দিবে। এইরূপ অভিনব "উৎসাহ" দিয়া এই শিল্পের পুনরুদ্ধার করা জনসাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, তাহার বিচার পাঠক-সাধারণ সহজেই করিতে পারেন। শিল্পজীবীগণের দারিদ্র্য ও শ্রমকুণ্ঠাই তাহাদিগকে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। এই স্থানের শিল্পের এহেন দুর্দ্দশার আরো একটি কারণ এই যে, জনসাধারণ বারাণসীতে সর্ব্বদা তৈয়ারী মাল পাইতে পারে এবং সেস্থানের জিনিসের কারুকার্য্যও উৎকৃষ্ট। পাটনায় এই শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণও যেমন অল্প, তেমনি একমাত্র বিহার ব্যতীত অন্য কোন স্থলে তাহার রপ্তানীও হয় না।

পাটনার ন্যায় কলিকাতায়ও জরি-শিল্পের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও ইহা বিশেষ উন্নত ছিল। তখন একমাত্র মেছুয়াবাজারেই ইহার নয়টী সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ-সকল দোকানের প্রত্যেকটীতে ২০।২৫ জন সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত ছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকেই দৈনিক ২৲ হইতে ৫৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিত।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে একজন জার্ম্মান বণিক কলিকাতায় আসিয়া ঐ-সকল দোকান হইতে এই শিল্পের বিবিধ নমুনা চাহিয়া লইয়া যায়। ইহার পর বৎসরই ঐরূপ দ্রব্য কলে প্রস্তুত হইয়া জার্ম্মানী হইতে এদেশে আমদানী হয়। হস্ত-প্রস্তুত এদেশীয় দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় ঐ জাতীয় জার্ম্মানীর জিনিস সস্তা হইলেও তখন পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর প্রস্তুত সামগ্রী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হওয়ায় ঐ সময়ের প্রতিযোগিতায় শিল্পের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। কিন্তু তৎপর বৎসরই জার্ম্ম্যানগণ এ বিষয়ে চরম উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করায় দেশীয় শিল্পের অধোগতি হইতে আরম্ভ করে।

১৯১০ সালে মেছুয়াবাজারে তিনখানি মাত্র জরির দোকান ছিল। উহার এক দোকানের মালিক সেখ কালু ও তাহার কর্ম্মচারী মোসাহেব আলী এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। কিন্তু তাহাদের অশেষ নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহারা তখন আর তেমন কাজকর্ম্মের ফরমাস পাইতেছিল না। জার্ম্মানীর দৌলতে এদেশের মজ্লিসার কারবার একরূপ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু চুম্‌কির কার্য্যে জার্ম্মানগণ এখনও তেমন কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে সমর্থ না হওয়ায়, উপরি-উক্ত দোকানগুলি উহারই কার্য্য লইয়া কায়ক্লেশে কোন প্রকারে বর্ত্তিয়া ছিল। এখন কোনো দোকান আছে কিনা আমরা জানি না।

জার্ম্মানীর জরি-শিল্প দামে ও কাট্‌তিতে এদেশের শিল্পকে পরাভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে জিনিসের গুণের পরীক্ষায় জয়ের বিচার হইতে পারে, সেস্থলে উহা ভারতজাত দ্রব্যের কাছেও ঘেঁসিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ডব্লিন সহরের মেলায় প্রদর্শিত সোনারূপার জরিযুক্ত পশমী বস্ত্রের নমুনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐরূপ নমুনা লইয়া জার্ম্মানীর যে-সকল শিল্পী মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের জিনিস ২।৪ দিন বাদে মরিচা ধরায় নমুনা মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিতে হইত; কিন্তু ভারতজাত ঐ বস্ত্র মেলার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তুল্যরূপ ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সভ্য জগতের সমক্ষে ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্পর্শ

কে দিল ঢালিয়া হরিচন্দন পল্লবরস সঙ্গে
নিঙাড়ি ইন্দুকিরণাঙ্কুর মরি মরি মোর অঙ্গে।
কে দিল মানস-পরিতর্পণ জীবনৌষধিবিত্ত
সুধায় সিক্ত করিল, তিক্ত তাপজর্জ্জর চিত্ত।
সঞ্জীবন এ পরিমোহন যে পুরাপরিচিতস্পর্শ
অঙ্গে অঙ্গে প্রেমতরঙ্গে জাগায় নবীন হর্ষ।
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে আকুলানন্দবন্যা
বিবশ করিছে প্রাণ, আনি পুনঃ জড়তা পুলকজন্যা

পঞ্চশস্য

কবির শারীর-ক্রিয়া (British Medical Journal)—

ডাক্তার ডেভিড এ আলেকজাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি ব্রিটিশ্ মেডিক্যাল্ জার্নাল্ পত্রিকায় এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন যে, সিওোর পাত্রিজি যেমন বাগ্মীর শারীর-ক্রিয়া সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন, সেইরূপ যদি কবির সম্বন্ধে করিতেন তাহা হইলে মন্দ হইত না। কবিতা ও সঙ্গীত কেন আমাদের ভাল লাগে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাবকে ছন্দের নিগড়ে বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তিটা মানুষের কেন হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা অনুচিত বলিয়া মনে হয় না। একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়—এ প্রবৃত্তিটা জগৎ-নিয়মের একটি ধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বের সকল প্রকার শক্তির প্রকাশের মধ্যে সঙ্গীতের যাহাকে তাল বলে, সেইরূপ একটা তাল থাকিতে দেখা যায়। প্রকৃতির বিপুল হৃৎপিণ্ডটা যেন জীবের হৃৎপিণ্ডেরই মত তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে। লেখক প্রশ্ন করিতেছেন—শ্বাসগতির সহিত কবিতার ছন্দের কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা কি একবারেই অসম্ভব? Hexameter কবিতার সহিত যে শ্বাসগতির সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। Hexameter (ষট্‌মাত্রিক) কবিতার আবৃত্তিকালে তাহা হাতে-হাতেই টের পাওয়া যাইতে পারে।

মেরী হ্যালক গ্রীনওয়াল ১৯০৫ সালের জুন মাসের Poet Loreএর পুনর্মুদ্রন করিয়া তাহার একখণ্ড ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্নাল পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন যে একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তির কোন একটা সঙ্গীতকে বিশ্লিষ্ট করিলে, তাহার মধ্যে রাগরাগিণী, তাল লয়, স্বরের উত্থান পতন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। শুধু গেয় কবিতাতেই যে এ-সকল থাকে তাহা নহে—অন্যান্য কবিতাতেও ইহার অভাব লক্ষিত হয় না। অনেক সময় আবার এ-সকল এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে থাকে যে, অঙ্কপাত দ্বারা তাহা প্রকাশ করাও অসম্ভব নয়। লেখিকার কথার ভাবে এই মনে হয় যে নাড়ীর গতিই কবিতার ছন্দের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি বলেন এ সজীব বিশ্বের যেন একটা হৃৎপিণ্ড রহিয়াছে। ইহার স্পন্দনের তালের সঙ্গে প্রকৃতি তাল মিশাইয়া চলিতেছে। মধুপের গুনগুন্ গুঞ্জনে; ময়ূরের কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্যে, ব্যাঘ্রের ঝম্পে, বিশ্বের সকল জীবের সকল ক্রিয়ার মধ্যে এই বিশ্বজনীন তাল রক্ষিত হইতেছে। চৈতন্যের আধার এই যে মস্তিষ্ক, ইহার ধমনীগুলি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সহিত নৃত্য করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভাবের তরঙ্গের উত্থান ও পতন হইতেছে। লেখিকা প্রসঙ্গটি এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন যে ইংরাজি ভাষার সকল দীর্ঘ ছন্দের কবিতা এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র ছন্দের কবিতা হৃৎপিণ্ডের লাব্ ডাপ্ লাব্ ডাপ্ (lubb dup, lubb dup) ধ্বনির সহিত তাল মিশাইয়া লিখিত হইয়াছে।

একবার একটি জার্ম্মান এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে সকল ভাষায় পান সম্বন্ধে যত কবিতা আছে, ভোজন সম্বন্ধে তাহা নাই কেন? শ্রীমতী গ্রীনওয়াল তাহার উত্তর দিয়াছেন। ইনি বলেন পানকালে হৃৎপিণ্ডের উদ্দীপনা হয়—এইজন্যই পান সম্বন্ধে এত কবিতার বাহুল্য।

শ্বাসগতি না নাড়ির গতি কোন্‌টা কবিতার ছন্দকে অনুশাসন করে তাহা physiologist (শারীরক্রিয়াবিদ্যাবিৎ) বলিতে পারেন। কেবল তাঁহারাই ইহার বিচার করিতে সমর্থ। অনেকেই বলেন সঙ্গীত আর ললিত কবিতা ইহারা ঠিক যেন এক মায়ের পেটের ভাইবোন্। ইহাদের অনৈক্য হওয়া সম্ভবপর নয়। কার্লাইল একস্থানে বলিয়াছেন—কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই যে কবিতা লেখা যায়, তাহা নহে। ইহার জন্য সঙ্গীতের রসবোধও থাকা চাই। যে ব্যক্তি গান বোঝেনা তাহার পক্ষে কবিতা লেখা একেবারে অসম্ভব। কথাটা পুরাপুরি সত্য বলিতে পারা যায় না। এমন অনেক কবির নাম করিতে পারা যায় যাঁহারা সঙ্গীত বুঝিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আবার খুব ভাল সঙ্গীতজ্ঞ কবি এমন কবিতা লিখিয়াছেন, যাহাতে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের একান্ত অভাব। ব্রাউনিং ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহার মত সঙ্গীতজ্ঞ কবি খুব অল্পই দেখা যায়—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহার মত বাগ্‌-আকারের কর্কশ (ragged) কবিতা অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন।

কবির শারীর-ক্রিয়ার বিশেষত্ব কি তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কাবানিস বলেন কবিতা লেখা, ও তো এক রকম পেটের গোলযোগ বই আর কিছুই নয়! বলা বাহুল্য পেট অর্থে এখানে যকৃতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীনেরা যকৃতকেই ভাববৃত্তি বা passionএর উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে কবির শারীরক্রিয়ার বিশেষত্ব যে কি তাহার আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। কোন্ অজ্ঞাত শক্তি কবিকে কবিতা লিখিতে নিযুক্ত করে—তাহা চিরকালই অজ্ঞেয় রহস্যগর্ভে নিহিত থাকিবে।

ডাক্তার।

তামাকের অপকারিতা (The Literary Digest)—

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকান মেডিসিন পত্রিকায় তামাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছিলেন—তামাক অপরিণত বয়স্কদিগের পক্ষেই অনিষ্টকর—বয়স্ক ব্যক্তিদিগের তামাকু সেবনে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে লেখক তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কথাটা কিন্তু গুড্ হেল্‌থ্ পত্রিকার সম্পাদকের ভাল লাগে নাই। তিনি ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন লেখকের উক্তির প্রথম অংশের সহিত তাঁহার কোনই মতবিরোধ নাই—কিন্তু ইহার শেষ অংশের সহিত তিনি কিছুতেই একমত হইতে পারেন না। তামাক যে পরিণত বয়স্কদের কোন ক্ষতি করেনা—একথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। অধিক তামাক সেবনে অন্ধতা রোগ জন্মাইতে পারে, এ কথাটিও যে লেখকের শ্রুতিগোচর হয় নাই তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। প্যারী নগরীর বিখ্যাত ডাক্তার Bonchard হৃদ্‌রোগ ও ধমনীরোগের প্রধানতম কারণ বলিয়া এই তামাককেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এযে কেবল তাঁহার একার মত তাহা নহে—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক চিকিৎসকও ঐরূপ অভিমত

প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সৈন্যবিভাগে প্রবেশপ্রার্থীদের মধ্যে যাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়, তাহাদের শতকরা ৯০ জনের "tobacco heart" নামক হৃদ্‌রোগ থাকিতে দেখা যায়। ডাক্তারদের মতে ৭ম এড্‌ওয়ার্ড (Edward VII) ও মার্ক টোয়েন্ (Mark Twain)এর মৃত্যুর কারণ এই tobacco heart নামক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইঁহারা দুজনেই যে অতিরিক্ত ধূমপান করিতেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। গত দশ বৎসর মধ্যে হৃদ্‌রোগ ও ধমনীরোগে মৃত্যুসংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময় মধ্যে তামাকের ব্যবহারটাও যে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। অতএব তামাক যে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যহানি করেনা একথা আর কি করিয়া বলা যাইতে পারে? যাহারা কুস্তি শিখিতে যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি ধূমপানাসক্ত থাকে, বিজ্ঞ ওস্তাদ তাহাকে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহেন না। সম্পাদক মহাশয় বলেন—(Yale Harvard Boat-race) ইয়েল ও হারভার্ডের প্রতিযোগী নৌকা বাচ খেলার সময় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এই বাচে ইয়েলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; তাহার কারণ ইয়েলের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের ছাত্রদের ধূমপান-অভ্যাসটাকে দোষের বলিয়া মনে করেন না।

তামাক যে কিড্‌নী বা বুক্ক নামক মূত্রযন্ত্রের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে—একথা চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, যে, ধূমপায়ীদের মধ্যে অন্ততঃ দশজনের মূত্রে এল্‌বুমেন্ নামক পদার্থ থাকিবেই থাকিবে।

তামাকের বীর্য্যকে নিকোটিন্ বলে। এযে একটা ভয়ানক বিষ, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ১/৮ গ্রেন নিকোটিন্ দ্বারা একটা ছাগলকে অনায়াসে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। লণ্ডন নগরের বিখ্যাত চিকিৎসক, ডাক্তার রাইট স্থির করিয়াছেন, ধূমপায়ীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ যত সহজে হইতে পারে, এমন আর কাহারও নহে। অতএব তামাক যে বয়স্কদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর নয়, এ কথার মূলে কোনই সত্য নাই। তামাক জীব, উদ্ভিদ্, শিশু, বৃদ্ধ, সকলেরই পক্ষে, সকল অবস্থাতেই অনিষ্ট উৎপাদন করিতে সমর্থ।

ডাক্তার।

রাসায়নিক খাদ্য (The Literary Digest)—

এতদিনে বুঝি বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন সত্যসত্যই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন "মানুষ, আর তোমাকে খাদ্যের জন্য কৃষিকায, কি পশুপালন করিতে হইবে না। এখন হইতে রসায়নাগার হইতেই তোমার দেহের পরিপোষণের উপযোগী পদার্থ সমূহ সরবরাহ হইতে থাকিবে।" কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিতেছিল। দুই একটি বিষয়ে সফলতার লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। শর্করা ও চর্ব্বি এ দুটা জিনিস রসায়নশালায় কৃত্রিম উপায়ে বহুদিন হইতেই প্রস্তুত হইতেছে। গুণে ইহারা যে ইক্ষুজাত শর্করা ও শূকরমেদ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শুধু শর্করা ও মেদ খাইয়া ত মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জীবনধারণের জন্য এল্‌বুমেন্ বা প্রোটিড্ খাদ্যের একান্ত আবশ্যক। ইহা না হইলে, দেহের পোষণ ও ক্ষয়পূরণ কোন মতেই হইতে পারে না। দুধে, ডিমে, মৎস্য মাংসে এবং দাইলে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়াই এ-সকল না হইলে আমাদের কোন মতেই চলিতে পারেনা। বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্য্যন্ত ইহাদের তুল্য কোন খাদ্যই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই—কখনও যে পারিবেন তাহার আশাও নাই। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে ডাক্তার এল্‌ডারহাল্‌ডেন যে একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে প্রোটিড্ (proteid) না হইলেও আমাদের চলিতে পারে। তিনি বলেন প্রোটিড খাদ্যের আদর্শ হইতেছে ডিম্ব। ডিমটি খাওয়ার পর পাকাশয় মধ্যে পাকাশয়ের পাচক রস দ্বারা উহা এমিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। এই এমিনো এসিড অন্ত্রের গাত্র দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং সেই সময় উহা আবার নূতনতর প্রোটিডে রূপান্তরিত হয়। এবং এই রূপান্তরিত প্রোটিড দ্বারাই দেহের পরিপোষণ ও ক্ষয়পূরণ ক্রিয়া সাধিত হয়। কোন জন্তুকে প্রোটিড খাইতে না দিয়া, যদি এমিনো এসিড দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রোটিড খাদ্যের ফলই বা না হইবে কেন? ডাক্তার এল্‌ডারহাল্‌ডেন কুকুরকে প্রোটিড না দিয়া এমিনো এসিড দিয়া সমান ফল পাইয়াছেন। কুকুরের বেলায় যদি এমিনো এসিড দ্বারা ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের বেলায় বা তাহা না পাওয়া যাইবে কেন? মানুষের উপর এ বিষয়ে এখনও কোন পরীক্ষা হয় নাই—শীঘ্রই যে হইবে এমন আশা করা যায়। শর্করা, চর্ব্বি ইতিপূর্ব্বেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, প্রোটিড যদিচ হয় নাই বটে কিন্তু কুকুরের বেলায় অন্ততঃ দেখা গিয়াছে যে এমিনো এসিড দ্বারা প্রোটিডের কায অনায়াসেই চলিতে পারে। তাহা হইলে খাদ্যের আর কোন উপকরণেরই জন্য কৃষিকায ও পশুপালনের উপর নির্ভর করিতে হইবে না—রসায়নশালা হইতেই সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু সম্ভব হইলেও ইহাদের বিস্তীর্ণ ভাবে ব্যবহারের সুযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই—শীঘ্র হইবে তাহারও সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। কিন্তু রোগ-বিশেষে এই কৃত্রিম রাসায়নিক খাদ্যের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার আশা করা যায়। এই মনে করুন, পাকাশয়ের ক্ষত (gastric ulcer) রোগে। এই রোগে অনেক সময় অস্ত্রচিকিৎসা করার আবশ্যক হয়। অস্ত্রচিকিৎসার পর স্থানটির যাহাতে বিশ্রাম ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা না করিতে পারিলে আরোগ্যের আশা থাকে না। পাকাশয়ের বিশ্রাম মানে—এমন কিছু না-খাওয়া যাহাকে জীর্ণ করিতে পাকাশয়ের কোন সাহায্য আবশ্যক করে। এরূপ স্থলে রোগীকে অনাহারে রাখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু অনাহারেই বা রোগীকে কতদিন রাখা যাইতে পারে? রোগীর পরিপোষণের একটা উপায় করা ত চাই। ডাক্তার এল্‌ডারহাল্‌ডেন বলেন—এমিনো এসিড দ্বারা এ কাযটি উত্তমরূপে চলিতে পারিবে। ইহাকে জীর্ণ করিতে পাকাশয়কে মোটেই খাটিতে হইবে না—তাহার বিশ্রামের কোনই বাধা উৎপন্ন হইবে না, অথচ দেহের পরিপোষণ কাযটি উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে।

ডাক্তার।

খাদ্যাতঙ্ক (The Literary Digest)—

অধ্যাপক এম্ নাইল্‌স্ (M. Niles) মেডিক্যাল রেকর্ডস্ পত্রিকায় খাদ্যাতঙ্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন খাদ্যাতঙ্ক একপ্রকার বায়ুরোগ-বিশেষ। ইহার লাটিন্ বৈজ্ঞানিক

নাম "Sitophobia" (সিটোফোবিয়া)। এই রোগের বিশেষত্ব এই যে রোগী মনে করিয়া থাকে কোন একটা বিশেষ সাধারণ খাদ্য অপরের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ দোষাবহ, এমনকি প্রাণনাশকও হইতে পারে। সিটোফোবিয়া বা খাদ্যাতঙ্কের ন্যায় আরও অনেক বিষয়ে ফোবিয়া বা আতঙ্ক থাকিতে পারে। এক-একটা লোক আছে তাহারা কোনমতেই কোন বদ্ধ স্থানে যাইতে পারে না। এরা মনে করে সেরূপ স্থলে গেলেই তাহাদের প্রাণবায়ু শেষ হইয়া যাইবে; এইরূপ আতঙ্ককে ল্যাটিন ভাষায়—"Agoraphobia" (এগোরেফোবিয়া) কহে। আবার ইহার বিপরীত ফোবিয়া বা আতঙ্কও না থাকিতে পারে এমন নহে। এক এক ব্যক্তি দিবারাত্রি সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ স্থানেই থাকিতে ভালবাসে। মুক্ত খোলা যায়গায় কিছুতেই যাইতে পারে না। এরূপ আতঙ্ককে "Claustrophobia" (ক্লস্ট্রোফোবিয়া) কহে। এই রকম কত ফোবিয়াই যে আছে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সকল ফোবিয়া বা আতঙ্ককেই চিকিৎসকগণ বায়ুরোগের সামিল মনে করিয়া থাকেন। খাদ্যাতঙ্ক নামক ফোবিয়াতে কোন একটা বিশেষ খাদ্য সম্বন্ধেই রোগীর চিত্তবিকার দেখা যায়; অন্যান্য বিষয়ে সে অপর দশজনেরই মত সম্পূর্ণ সুস্থপ্রকৃতি-বিশিষ্ট।

এক ফেরিওয়ালার মাখনের উপর বিজাতীয় ভয় ছিল। বেচারা যেখানেই যাইত তাহার খাদ্যে যাহাতে মাখন না দেওয়া হয়, তাহার জন্য রাঁধুনীকে তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত। আর এক ব্যক্তির রসুনের উপর বড় ভয় ছিল। সে একটা হোটেলে বাস করিত। হোটেলে মাংসের মধ্যে রসুন না দিলে চলে না। এই কারণে বেচারাকে বাধ্য হইয়া মাংস খাওয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। একদা এক ডাক্তারের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সে ব্যক্তি মাংস আহার করিয়াছিল—কিন্তু আহারের পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে সে ডাক্তারকে এক পাও নড়িতে দেয় নাই। ইহার পর হইতে লোকটার রসুনাতঙ্কটা কাটিয়া গেল। অনেক স্থলেই ভয়টা যে অহেতুক তাহাতে আর সন্দেহ নাই—কিন্তু স্থল-বিশেষে ভয়ের জিনিসটা জোর করিয়া খাওয়াইলে যে কোনই অনিষ্ট হয় না একথা বলা যাইতে পারে না। ইহার বিজ্ঞানসঙ্গত যুক্তিও যে না আছে এমন নহে। সকলেই জানেন প্রবৃত্তি ও রুচিপূর্ব্বক খাইলে পাচক রস যেরূপে নিঃসরণ হয়—এমন ভয়ে ভয়ে খাইলে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পরিপাক-ক্রিয়ায় যে বিঘ্ন ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ডাক্তার নাইল্‌স্ বলেন খাদ্যাতঙ্ক অনেক স্থলে রোগীর স্বভাববৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে—আবার ইহা ব্যক্তিগত শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও বড় অল্প নির্ভর করেনা। এক ব্যক্তি জুন মাসের আপেল ফল খাইতে পারিত না। তাহাদের আস্তাবলের নিকট একটা জুন-আপেলের গাছ ছিল। এই ঘটনা হইতে তাহার ঐ ফলের উপর অসম্ভব ঘৃণা জন্মিয়াছিল। আর এক ব্যক্তি Galfish নামক এক প্রকার মাছ খাইতে পারিত না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, একটা মলমূত্র-পূর্ণ নদীর জলে বিস্তর Galfish থাকিতে দেখিয়া তাহার উক্ত মৎস্যের উপর অসম্ভব ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এ-সকল কারণ ছাড়া খাদ্যাতঙ্কের আরও একটা প্রবল কারণ থাকিতে দেখা যায়। খাদ্যবিশেষের নিন্দা করিয়া সময় সময় সংবাদপত্রাদিতে লেখা বাহির হয়। এই-সকল লেখা পাঠ করিয়া কাহারো কাহারো মনে কোন একটা বিশেষ খাদ্যের প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মায়। আমিষ খাদ্যের প্রতি এইরূপ অন্যায় কটাক্ষ হওয়ায়, অধুনা অনেকেই মৎস্য মাংসাদি ত্যাগ করিয়া ঘোরতর নিরামিষাশী অথবা ফলাহারী হইয়া পড়িতেছেন।

এখন এই খাদ্যাতঙ্ক নিবারণের উপায় কি? ইহা অবশ্য মনের রোগ, সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে দেহ অপেক্ষা মনের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাঁধার দোষে অনেক খাদ্য রোগীর সহ্য হয় না—এরূপ স্থলে এগুলিকে এমন ভাবে রাঁধিতে হইবে যাহাতে রোগীর পেটে অনায়াসে সহ্য হইতে পারে। রোগীর মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করাই এ রোগ অপনোদনের প্রধান উপায় মনে করিতে হইবে। তাহার অজ্ঞাতসারে দ্রব্যটি খাওয়াইয়া পরে তাহার ভুল ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা মন্দ উপায় নহে। ডাক্তার নাইল্‌স্ বলেন খাদ্যাতঙ্ক যতক্ষণ কোন একটা তুচ্ছ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ইহার চিকিৎসা না করিলেও চলে; কিন্তু ইহা যদি আবার কোন একটা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে আর উপেক্ষা করিলে চলিবে না—সেরূপ স্থলে কালবিলম্ব না করিয়া অকারণ অন্যায় ভয়টা দূর করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এস্থলে শারীরিক শ্রম (যতক্ষণ ক্লান্তি না দেখা দেয়) ইহার অপনোদনের একটা উত্তম উপায়। ইহাতে খুবই ক্ষুধার উদ্রেক হয়—এবং ব্যস্ত থাকা বশতঃ রোগীর মনে চিন্তা ভয় প্রভৃতির তেমন সুযোগ ঘটিতে পায় না। এ অবস্থায় শরীরের জন্য যে দ্রব্যটির একান্ত আবশ্যক সেটা আপনা হইতেই রোগীর অভ্যাস হইয়া যায়।

ডাক্তার।

নূতন ধর্ম্ম (Les Documents du Progres):—

এই ধর্ম্মের আদি জন্মস্থান তিব্বতে, ধর্ম্মের নাম "মানব-সন্তানের সার্ব্বজনিক সংঘ"। এই ধর্ম্ম এখন ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করিতেছে। এই ধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে ইংলণ্ড-প্রবাসী হিন্দু, পার্সী, আরবী, ও ইংরেজ প্রভৃতি তিন চার হাজার লোক আছে; ইহাদের উপাসনা-মন্দির ইংলণ্ডের প্রাচীন প্রস্তর-খিলান

প্রস্তর-খিলানের মধ্যস্থ বেদি-শিলার নিকটে "মানব-সন্তানের সার্ব্বজনিক সঙ্ঘ"-ভুক্ত উপাসকেরা উপাসনা করিতেছে।

(Stonehenge); এইগুলিকে উহারা সূর্য্যমন্দিরের প্রতিনিধি মনে করিয়া লইয়া এইখানেই পূজার্চ্চনা করে। এই-সমস্ত

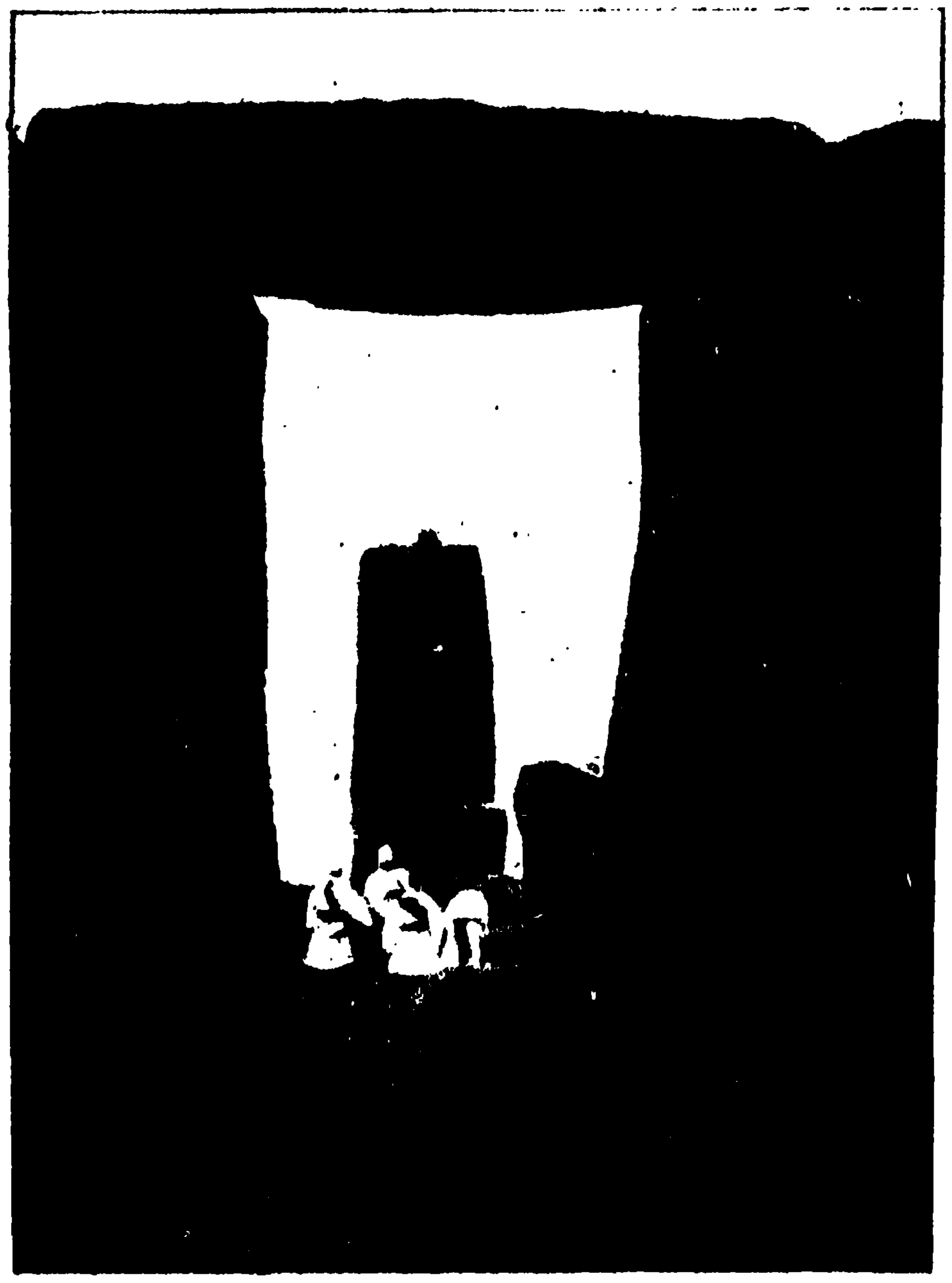

"মানব-সন্তান সংঘ" প্রাচীন
সূর্য্যমন্দিরে উপাসনা করিতেছে।

প্রস্তর-খিলান অতি আদিম যুগে, যখন মানুষ পিতলের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, লোহার পরিচয় যখন পায় নাই, তখনকার তৈয়ারী। দুখানা অখণ্ড প্রস্তর খাড়া করিয়া তাহার মাথায় একখানা প্রস্তর আড়াআড়ি শোয়াইয়া দিয়া এই খিলান তৈয়ারী। এইরূপ খিলানের চক্রে একটি বৃত্তাভাস রচনা করিয়া মধ্যস্থলে পাঁচটি প্রকাণ্ড খিলানে বৃত্তার্দ্ধ রচিত হইত, তাহার মধ্যস্থলে একটি অতিকায় প্রস্তর প্রোথিত হইত, তাহাকে বেদি-শিলা বলিত। "মানবসন্তানের সার্ব্বজনিক সংঘ"-ভুক্ত লোকেরা প্রত্যূষে এই বেদিশিলা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সূর্য্যস্তব করে—"যাহা কিছু আছে, হইতেছে ও হইয়াছে তাহার মধ্যে এক দিব্য দেবতার বিরাট উদ্দেশ্য দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। জগৎ-প্রকৃতিতে কিছু অমঙ্গল বা অশোভন নাই। সমস্ত বিশ্বসংসার এক অনির্ব্বচনীয় পূর্ণমঙ্গলের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে—তাহার ফলে সমস্ত বস্তু সুন্দর হইতে সুন্দরতর, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর হইতেছে। এই বিরাট বিশ্বসত্তার পশ্চাতে যে বিশ্বশক্তি বিরাজমান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই মহিমা প্রতিফলিত করিয়া প্রকাশমান। যিনি বিশ্বশক্তি তিনি অনন্ত অখণ্ড, তিনি সত্য, তিনি সুন্দর, তিনি প্রেমময়, তিনি আমাদের হৃদ্‌বিহারী।"

তারপর যখন প্রথম সূর্য্যরশ্মি বেদিশিলা চুম্বন করে তখন "পবিত্র পঞ্চ" পুরোহিতেরা সমাগত পূজকদিগকে প্রশ্ন করে—"ভাইসব, কেন আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়াছি?" তখন সকলে একবাক্যে বলে—"অনন্ত দেবের মহিমা ও সত্য স্বরূপ, অপরিমেয় প্রেম ও শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য, তাঁহারই প্রতিনিধি মহাপ্রাণ পবিত্র পঞ্চকের অনুশাসন অনুসারে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি।"

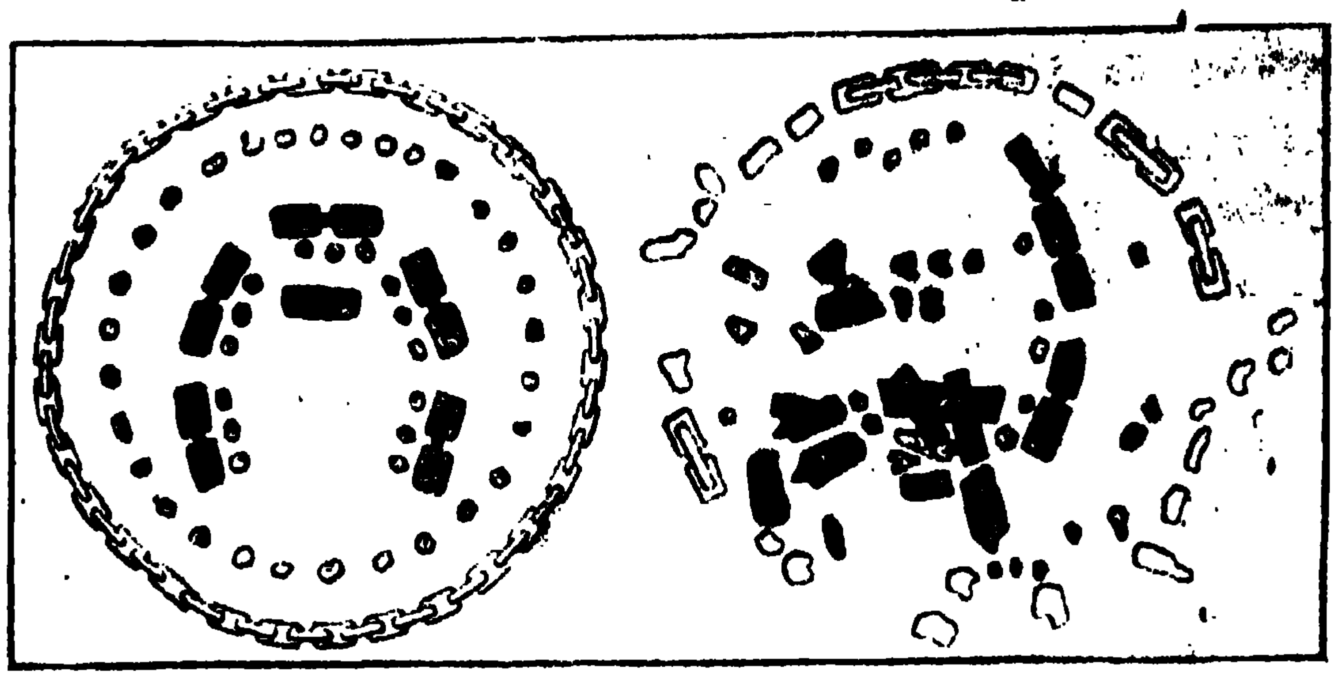

প্রস্তর-খিলানের বৃত্তের নক্সা।
বাম দিকের নক্সায় আদিম শৃঙ্খলা, এবং ডাহিন দিকের নক্সায় তাহার বর্ত্তমান ভগ্নদশা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তারপর সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। এবং এক এক দিন এইরূপ পূজার্চ্চনা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

চারু।

আমেরিকার লাল লোক কি এশিয়ার মঙ্গোলিয়ান?

(The Scientific American)—

সাইবেরিয়ার অনেক জাতির রীতিনীতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত আমেরিকার লাল লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়; তাহাদের শরীর ও মনের গঠনও প্রায় একরূপ। ইহাতে অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন যে এশিয়ার উত্তরাংশে হিমপ্রলয়ের সময় কতক লোক আমেরিকায় পলায়ন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং এশিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা খুব নিকট জাতি।

এই সাদৃশ্য-অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া য়েনিসি ও সেলেঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী প্রাচীন শবসমাধি "কোরগা" অনুসন্ধান ও খনন করিয়া প্রস্তরযুগের মানবের যে-সমস্ত কঙ্কাল ও করোটি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও এই অনুমান সমর্থন করিতেছে।

যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্ত্বেও একই জাতি-পরিবারের লোক দেশ ও কালে অত্যন্ত তফাৎ হইয়া পড়িয়াও বিভিন্নপরিবেষ্টনের মধ্যেও নিজেদের দেহের গঠন, মনের প্রকৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতিনীতি এখন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ও একই রূপ রাখিতে পারিয়াছে।

চারু।

সাইবেরিয়ার লোক।

আমেরিকার আদিমঅধিবাসী লাল লোক।

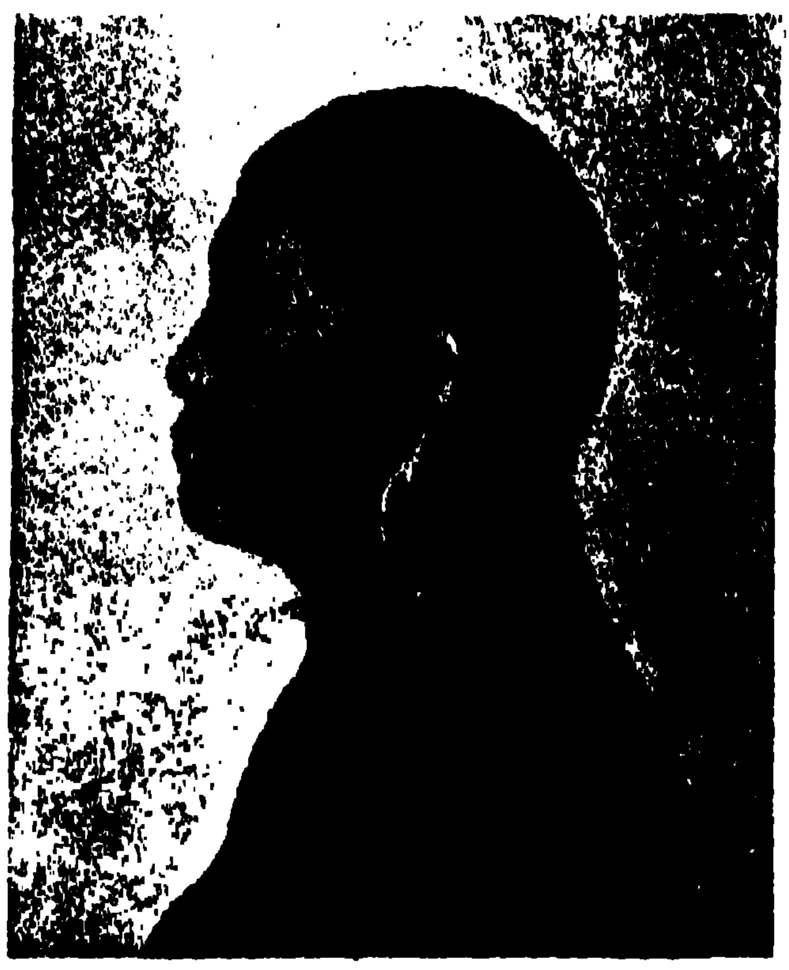

সাইবেরিয়ার লোক।

ইংলণ্ডের রাজকবি (The Literary Digest):—

ইংলণ্ডের রাজকবি আলফ্রেড অষ্টিনের মৃত্যুর পর কে সেই পদ পাইবার যোগ্য তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে খুব একটা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রাজকবি টেনিসনের পর সুইনবার্ণকে ঐ পদ লইবার জন্য সাধিলে সুইনবার্ণ বলেন যে "আমি রাজা থাকাটাই পছন্দ করি না, আমি রাজকবি হইব কি?" সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া অক্ষম কবি অষ্টিনকে সেই পদে বরণ করা হয়। টেনিসনের পরেই রাজকবি হওয়াতে অষ্টিন মহাকবি টেনিসনের কবিত্বখ্যাতির আওতায় পড়িয়া গিয়া আর নিজেকে বিখ্যাত করিবারও সুযোগ পান নাই। সতের বৎসর অষ্টিন সেই পদে ছিলেন; সুতরাং এই সতের বৎসর লোকের মনের সম্মুখে রাজকবির অস্তিত্বটা তেমন স্পষ্ট হইয়া ছিল না। রাজকবির পদ শূন্য হওয়াতে সাধারণের মন আবার সজাগ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজা যখন অভিমত প্রকাশ করিলেন যে আজকাল মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কাব্যকলার মধ্যেও এমন বিচিত্র ভাবলীলা দেখা যাইতেছে, যে, এখন একজন কোনো লোককে রাজকবি বলিয়া চিহ্নিত করা অসম্ভব, সুতরাং অন্যায়।—তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল যে রাজকবির পদটা এইবার বোধ হয় উঠিয়া যাইবে।

তবু সাধারণের মধ্যে নানা জনকে উক্ত পদের যোগ্য বলিয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। এই পদ যে সর্ব্বদাই দেশের তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিকে দেওয়া হয়, তাহা নহে—এই পদ রাজভক্তির পুরস্কার মাত্র; এই পদ ড্রাইডেন, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উঁহারা কেবলমাত্র তাঁহাদের কবিপ্রতিভার পুরস্কারের জন্যই সে পদ পান নাই। রাজভক্তির পুরস্কার হইলেও, ন্যায়ে অন্যায়ে রাজকার্য্যের সমর্থন করিতে হইবে এরূপ একটা ধারণা রাজার পক্ষে থাকিলেও, লোকে ঐ পদের জন্য শ্রেষ্ঠ কবির দিকেই তাকাইতে থাকে। এইজন্য অনেকেই আঁচিয়াছিল যে আলফ্রেড নোয়েস ঐ পদ পাইবেন—পর পর তিন আলফ্রেড, আলফ্রেড টেনিসন, আলফ্রেড অষ্টিন, আলফ্রেড নোয়েস—রাজকবি হইবেন। নোয়েসের কবিপ্রতিভার কাছে ইংলণ্ডের অপরাপর প্রসিদ্ধ কবি উইলিয়ম ওয়াটসন, কিপলিং, ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স্‌, অষ্টিন ডবসন, জন মেজফিল্ড, শ্রীমতী মেনেল প্রভৃতির কবিপ্রতিভা ম্লান বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল যখন মহামন্ত্রী এস্কুইথ বরমাল্য দিয়া রবার্ট ব্রিজেসকে বরণ করিলেন। কেহ তাঁহার নাম মনেও ভাবে নাই। তাঁহার বয়স হইয়াছে ৬৯ বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় তিনি কোনো নূতন সুর বা বিশেষ বাণী জগতে প্রচার করেন নাই। এক অক্ষম কবির উত্তরাধিকারী আর এক অক্ষম কবি। তাঁহার অক্সফোর্ডের শান্ত নির্জ্জন বাসভবনের মতন তাঁহার কবিতাও নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের। তবে তাহার মধ্যে চার্ব্বাকপন্থীদের আনন্দের সহিত খৃষ্টপন্থীদের আত্মনিবেদনের বিষণ্ণতার যে অপরূপ মিলন নির্দ্দোষ ছন্দে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি কতকটা এই পদের দাবী রাখিতে পারেন। তাঁহার কবিতায় সূক্ষ্ম রঙিন বিচিত্র উজ্জ্বল কিছু নাই; তাঁহার কবিতায় জীবনের গতিশক্তির পরিচয় নাই, আছে পরিচয় শান্তির; প্রেমের উন্মাদনা নাই, আছে প্রেমের শিক্ষা; প্রকৃতির কলকণ্ঠ নাই, আছে প্রকৃতির শান্ত মৌনতা।

রবার্ট ব্রিজেস নবনিযুক্ত রাজকবি, যৌবনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের জন্য ইটন ও অক্সফোর্ডে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ক্রিকেট খেলায় ও দাঁড় বাহিতে দক্ষ। তিনি অক্সফোর্ডের ডাক্তার। ১৮৮২ সালে তিনি বিবাহ করিয়া আপনার কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন আবাসে কাব্য-ও-সাহিত্যচর্চ্চাতেই জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ছন্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁহার Milton's Prosody বইখানি ইংরেজি কাব্যের ছন্দ সম্পর্কীয় পুস্তকের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। তিনি প্রাচীন ছন্দে অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন—সেগুলি এমন কঠিন যে গ্রীক ছন্দের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান না থাকিলে তাহা উপভোগ করা যায় না। এজন্য তিনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত বা সমাদৃত কবি নহেন।

London Sphereএর মতে ব্রিজেসের রচনা সম্পূর্ণ কবিত্বময়। তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেহ থাকে ত ইয়েট্‌স্‌। তাঁহার গীতিকবিতাগুলির মধ্যে প্রচুর কলানৈপুণ্য আছে।

রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস স্বীয় পুত্রকে লইয়া আমাদের কবি

ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি ডাক্তার রবার্ট ব্রিজেস।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; এবং আমাদের কবির সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হওয়াটা তাঁহারা সৌভাগ্য ও সম্মান বোধ করিয়াছেন।

টাইম্‌স পত্রে ইংলণ্ডের রাজকবি নিয়োগের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা ইংলণ্ডের রাজকবিদের নাম ও তারিখ দিলাম:—

নাম	জন্ম	নিয়োগ	মৃত্যু
জিওফ্রী চসার	১৩৪০ ?	১৩৬৮	১৪০০
জন গাওয়ার	১৩২৫ ?	১৪০০	১৪০৮
হেনরী স্কোগান	১৩৬১ ?	......	১৪০৭
জন কে	......	......	......
এণ্ড্রু বার্ণার্ড	......	১৪৮৬	১৫২৩
জন স্কেল্‌টন	১৪৬০ ?	১৫১৩	১৫২৯
রিচার্ড এডওয়ার্ডস্‌	১৫২৩ ?	১৫৬১	১৫৬৬
এডমণ্ড স্পেন্সার	১৫৫৩	১৫৯০	১৫৯৯
সামুয়েল ডানিয়েল	১৫৬২	১৫৯৯	১৬১৯
বেন জনসন	১৫৭৩	১৬১৯	১৬৩৭
সার উইলিয়ম ডেভেনাণ্ট	১৬০৫	১৬৩৮	১৬৬৮
জন ড্রাইডেন	১৬৩১	১৬৭০	১৭০০
টমাস শ্যাড্‌ওয়েল	১৬৪০	১৬৮৮	১৬৯২
নেহাম টেট	১৬৫২	১৬৯২	১৭১৫
নিকোলাস রো	১৬৭৩	১৭১৫	১৭১৮
রেভারেণ্ড লরেন্স এউসডেন	১৬৮৮	১৭১৮	১৭৩০
কলি কিবার	১৬৭১	১৭৩০	১৭৫৭
উইলিয়াম হোয়াইটহেট	১৭১৫	১৭৫৭	১৭৮৫
টমাস ওয়ারটন	১৭২৮	১৭৮৫	১৭৯০
হেন্‌রী জেম্‌স্‌ পাই	১৭৪৫	১৭৯০	১৮১৩
রবার্ট সাদে	১৭৭৪	১৮১৩	১৮৪৩
উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ	১৭৭০	১৮৪৩	১৮৫০
আলফ্রেড লর্ড টেনিসন	১৮০৯	১৮৫০	১৮৯২
আলফ্রেড অষ্টিন	১৮৩৫	১৮৯৬	১৯১৩

এই-সমস্ত কবির মধ্যে অনেকেরই রচনা কিছুই বাঁচিয়া নাই, কেবল তাহাদের নাম হয় সরকারী দপ্তরে নয়ত শক্তিশালী সমসাময়িক অপর কবির ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে মাত্র আছে।

রবার্ট ব্রিজেসের কবিতার কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

চারু।

ইংলণ্ডের নূতন রাজকবির কবিতা

(ইংলণ্ডের নূতন রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্‌ বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সপুত্রক আসিয়া সাক্ষাৎ করেন; এবং বলেন "আমি নব্য ইংলণ্ডের সহিত প্রতিভা-প্রতিমা বিদেশী কবিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।")

পাপিয়া

কোত্থেকে, বল্‌, আসিস্‌ তোরা, কোন্‌ পাহাড়ে ঘর?
না জানি সেই পাহাড় হবে কতই মনোহর!
কোন্‌ নদীটির তরল তানে শিখিস্‌ তোরা গান?—
কোথায় সে বন জোনাক্‌-জ্বালা?—বলে দে সন্ধান;
সেই বনে সেই ফুলের বনে ফিরতে আমার আশ,—
ঝুর্‌ঝুরে বায় ভুর্‌ভুরে ফুল যেথায় বারমাস।

—না গো না—সে ধূসর পাহাড় উষর অতিশয়,
ক্ষীণ নদীটি লুপ্তধারা,—নদী সে আর নয়।
গান আমাদের তৃষার ভাষা—কাঁদার স্বপনে,
অশ্রু-আঁখির ঝাপ্‌সা আলো-দুখের গহনে;
মূর্চ্ছাহত মূর্চ্ছনা তার ছন্দে না ফোটে,
বিমুখ আশার গভীর ভাষা নিশ্বাসে টোটে।
অন্ধকারের ঘেরা-টোপে আমরা একাকী,—
উচ্ছ্বসিয়া উচ্চে গাহি,—কিছুই না ঢাকি;
রাত্রে শুধু যায় যা' বলা সেই কথা বলি,—
মর্ত্ত্যজনের শ্রবণ মনে পুলক উথলি।
ভোর হ'লে ফের নয়ন মুদি স্বপন-সুখাতুর,
ডালে পালায় হাজার গলায় ওঠে যখন সুর।

গান

যে ফুল ঝরে পরশ ভরে
তাতেই আমার মন,
পাপ্‌ড়ি-তাঁবুর বাসরে যার
রঙের আলাপন !
পূর্ব্বরাগের অধিক স্মৃতি,—
মিলন-রাতের মধুর রীতি,—
এক নিমেষে এক নিশ্বাসে
যুগের অভিনয় ;
গান্‌ যেন মোর এমনি ধারা
ফুলের মত হয়।

মূর্চ্ছনাতে মূর্চ্ছে যে সুর
ভালবাসি তায়,—
আকাশে না লিখ্‌তে লেখা
বাতাসে মিলায় !
দীপ্ত প্রাণের তপ্ত শিখা—
আগুন-আখর রক্ত-লিখা,—
এক নিমেষে উদয়, আবার
এক নিমেষেই লয় ;
গান যেন মোর এম্‌নি ধারা
সুরের মত হয়।

ঝরে' যা গান ! ফুলের মতন
মরে' যা তুই, হায়,
ডরাস্‌ নে রে ফুলের মরণ,—
মূর্চ্ছা মূর্চ্ছনায়।
উড়ে যা তুই দূরে যা আজ,—
এখানে তোর ফুরিয়েছে কাজ,—
ফুরিয়েছে রে বাঁচিয়ে রাখা
অমৃতে প্রণয় ;
রূপের আঁখি ভরুক জলে,
এসেছে সময়।

সাধ

মৃত্যু যখন আস্‌বে মোদের ঘরে
প্রথম যেন আমার কাছেই আসে,
তুমি থেকো এম্‌নি আলো করে
কুঁড়েয় আমার ক্ষুদ্‌-কুঁড়োদের পাশে।
খুসী থেকো, মনটি রেখো খাসে,—
খুসী থেকো খোকায় বুকে ধ'রে ;
ভু'ল না গো গাইতে মৃদু ভাষে—
যে গান শুধু গাঁথা তোমার তরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

গোলাপের জন্ম

(খ্রীষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনী)

রোজেতা কৃষকদের কন্যা। এক বৃদ্ধা পিতামহী ব্যতীত ইহ সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। রোজেতার মুখখানি অতি সুন্দর। কালো কালো ডাগর দুটী চোখের তারা ; ফুলের পাপড়ীর মত ক্ষীণ দু'খানি অধরপুট। সুচিকন রেশমী চুল তাহার সুন্দর মুখখানি বেষ্টন করিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

রোজেতা প্রতিদিন ঝরণায় জল আনিতে যাইত। একদিন সে তাহার পূর্ণ কুম্ভ লইয়া ঝরণার তীরে একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বারোহণে এক সুকুমার যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোজেতার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জল চাহিলেন। রোজেতা তৎক্ষণাৎ অতি যত্নের সহিত আপনার পূর্ণ কলস হইতে ঝরণার সেই স্বচ্ছ শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহাকে পান করাইল।

তৃষ্ণার্ত্ত যুবক সেই দেশের রাজকুমার ; তিনি রোজেতার এই সরল শিষ্ট ব্যবহারে ও তাহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে একান্ত মুগ্ধ হইলেন ; রোজেতার সেই বারিপূর্ণ প্রস্তরকুম্ভ আপনি বহন করিয়া তাহাদের কুটীরে পৌঁছাইয়া দিলেন। রোজেতা এজন্য অতি বিনীত কণ্ঠে কুমারকে বহু ধন্যবাদ দিল।

কুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোজেতাকে

আর ভুলিতে পারিলেন না। রোজেতার কোমল কণ্ঠের সুমিষ্ট ধন্যবাদ কুমারের কানে যেন বীণার মত নিয়ত বাজিতে লাগিল। শরতের স্নিগ্ধ সন্ধ্যার অস্ফুট চন্দ্রালোকে, প্রকৃতির শ্যাম শোভায় সুশোভিত কলস্বনা নির্ঝরিণীর তটে, প্রথম-যৌবন-স্পর্শে-সমুজ্জ্বল যে এক রূপসী কৃষক বালিকাকে তাহার প্রস্তরকুম্ভ লইয়া ধূসর শিলাতলে অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন, কুমার সে অভিনব চিত্রখানি কিছুতেই তাঁহার চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

তারপর প্রতিদিনই যুবরাজকে সেই নির্ঝর সমীপে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি রোজেতার নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেন। বালিকার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইতেন। রোজেতার বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার জলের কলস প্রতিদিনই তাহাদের কুটীরপ্রাঙ্গনে পৌঁছাইয়া দিতেন। ক্রমে তিনি রোজেতার পিতামহীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং বৃদ্ধাকে তাহার মনের মত কথা বলিয়া খুসী করিতে লাগিলেন। এই রকমে দিন যায়।

কিছুদিন পরে রাজকুমার একদিন রোজেতার পিতামহীকে জানাইলেন যে তিনি বৃদ্ধার ঐ ভ্রমরনয়না নাতিনীটীকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছেন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। বৃদ্ধা শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইল এবং তাহার নাতিনী যদি প্রস্তুত থাকে তবে তাহার নিজের এ বিবাহে কোন অমত নাই জানাইল। রোজেতা কিন্তু এই নব পরিচিত যুবককে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে তাহাদের সেই দ্রাক্ষাপত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীরখানিকে আর তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে এতদূর ভালবাসিত যে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া সে কোথাও যাইতে রাজি নহে।

যুবরাজ তখন আপনার প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তিনিই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী; রোজেতাকে দেশের রাণী করিবেন ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিবেন ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখাইলেন; রোজেতা তথাপি সম্মত হইল না। তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সংসারের মধ্যে ঐ নাতিনীটী ভিন্ন আর অন্য কোনও অবলম্বন ছিলনা। সে কাহার কাছে তাহার এই অশীতিপর পিতামহীকে রাখিয়া যাইবে? সে কাছে না থাকিলে যে, তাহার ঠাকুরমার একদণ্ডও চলিবে না! রোজেতা রাণী হইবার প্রলোভন হেলায় পরিত্যাগ করিল।

যুবরাজ রোজেতার এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। একজন সামান্য কৃষকদুহিতা তাঁহার এই অযাচিত অগাধ প্রেম, তাঁহার রাজসিংহাসনের অর্দ্ধাংশ এত অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিল! রাজকুমার ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং এই অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তারপর কিছুদিন যায়। রোজেতা এখন নিজেই আপনার জলের কলসটী বহিয়া একাকী বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পথে আসিতে আসিতে এক-একদিন সেই অজ্ঞাত যুবরাজকে তাহার মনে পড়ে; সেদিন তাহার কক্ষের সে পাষাণ কলসটী যেন কিছু অধিক ভারি বলিয়া মনে হয়। রোজেতার ক্ষীণ কটীতট সেদিন সে পূর্ণকুম্ভের গুরুভার যেন আর বহন করিতে চায় না!

একদিন রোজেতা এইরূপ কাতরভাবে তাহার জলের কলস বহিয়া কুটীরে ফিরিতেছে। সেদিন ঝরণায় তাহার একটু অধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; ভরা সন্ধ্যায় নিবিড় অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠিতেছে—এমন সময় জনকয়েক বলিষ্ঠ লোক হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া রোজেতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। রোজেতা কত কাঁদিল, কত চীৎকার করিল, কিন্তু কেহই তাহার উদ্ধারের জন্য আসিল না।

রোজেতাকে যাহারা লইয়া গেল তাহারা সেই যুবরাজের অনুচর। রোজেতাকে আনিয়া তাহারা যুবরাজের প্রাসাদের এক সুদৃঢ় কক্ষে বন্দিনী করিয়া রাখিল। যুবরাজ নানা উপায়ে তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রোজেতা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তখন কুমারের অনুচরেরা তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, রোজেতা নীরবে তাহাদের সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া রহিল। তখন সেই নিষ্ঠুর অনুচরবর্গ নিরুপায় হইয়া রোজেতাকে নগরের ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া গেল ও বহু নগরবাসীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া

রোজেতার নামে একটা দুরপনেয় মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া দিল। ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতেরা রোজেতার অপরাধের বিচার করিলেন এবং তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া—জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

যেদিন রোজেতা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য নগরের মধ্যস্থলে আনীত হইল সেদিন যাবতীয় নগরবাসী সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছিল। চারিপার্শ্বে শুষ্ক কণ্টকতরু সজ্জিত করিয়া রোজেতাকে তদুপরি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিতের দল তখনও রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। রোজেতা স্থির অবিচলিত কণ্ঠে তখনও বলিতেছে "ঈশ্বর জানেন, আমি নির্দ্দোষী! আমি কোনও অপরাধে অপরাধী নহি।" কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য অনেকের হস্তের দীর্ঘ মশালগুলা তখন প্রজ্বলিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা শেষবার রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার সুযোগ দিলেন—রোজেতার মুখে তখনও সেই এক কথা, যে, সে নির্দ্দোষী। নিষ্ঠুর পুরোহিত-সম্প্রদায় তখন রোজেতাকে মহাপাপিয়সী স্থির করিয়া তাহাকে বহু অভিসম্পাত দিলেন ও সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন।

ধূ ধূ করিয়া রোজেতার চারিপার্শ্বে রাশিকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! অগ্নির ভীষণতার সহিত সহস্র নগরবাসীর একটা পৈশাচিক অট্ট উল্লাস-রোল মিশিয়া চারিদিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি তুলিল!

কিন্তু সে প্রলয়ধ্বনি দিগন্তে বিলীন হইতে না হইতে উন্মত্ত জনতার শ্রবণ-কুহরে যেন সহসা স্বর্গের কোন অশ্রুতপূর্ব্ব বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিকার রোজেতা যুক্ত করে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে জননী মেরীর স্তুতিগান করিতেছে!

"মাগো! জগজ্জননী! এ নিখিল-বিশ্ব-রচয়িতা ধাতার ধাত্রী তুমি!—তোমার অজানিত কি দোষ আছে মা?—তোমার ঐ দুটী রাঙ্গা চরণতলে নিত্য চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়! তোমার ঐ কনকপ্রতিমা ঘিরিয়া ঘিরিয়া সপ্ত গ্রহতারা নৃত্য করে!—তোমার অগোচর কি পাপ আছে জননী? তুমি ত জান গো মা! তোমার সন্তান সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! তবে এস মা! নেমে এস! সন্তানকে অভয় দাও! এই ভীষণ অনলতাপ অপেক্ষাও অসহ্য কলঙ্কভার হ'তে তোমার নিরপরাধিনী কন্যাকে রক্ষা কর জননী!"

তখন প্রবল বায়ু বহিতেছিল। কোটী কোটী অগ্নি-শিখা লক্ লক্ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল। যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে! হৃদি-লগ্ন-যুক্তকর,—একাগ্রতায়-নিমীলিত-আঁখিযুগ—রোজেতার সেই ভক্তি-অনুপ্রাণিত সুন্দর মুখখানি অনলতাপে রক্তাভ হইয়া যেন তখন একটা অনৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছিল! চারিদিকের সমবেত জনতা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে ক্ষণেকের জন্য তাহাদের মস্তক অবনত করিয়াছিল!

সহসা যেন কাহার মৃদু কোমল কর-স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া রোজেতা চক্ষু উন্মীলন করিল—সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সুরলোকের এক মহীয়ান দেবদূত তাহার পার্শ্বে নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত পক্ষ বিস্তার করিয়া—রোজেতাকে গভীর মমতার সহিত বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহার বেদনাতুর আঁখিপল্লবে তদীয় স্নিগ্ধ শান্তিময় কোমল করপুট সস্নেহে বুলাইয়া দিতেছেন। হর্ষ-বিস্ময়ে পুলকিত রোজেতা অতি সঙ্কোচের সহিত একবার আপনার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সে লেলিহান অগ্নিশিখা আর সেখানে নাই! তৎপরিবর্ত্তে তাহার চারিপার্শ্বে বিবিধ বর্ণের এক অপরূপ স্বর্গীয় কুসুমরাশি স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে! আর তাহারই বিচিত্র সৌরভে দশ দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে!

সেদিন সেই প্রথম গোলাপ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল! সেই প্রথম সেদিন বিশ্বমানব ভক্তের পবিত্র আত্মার মত স্নিগ্ধ অভিরাম গোলাপ কুসুমের দিব্য সৌরভের আঘ্রাণ পাইল! রোজেতার নামে তাহার নাম হইল রোজ!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

রাজর্ষি রামমোহন

(গ্রীক্ bumos বা বেদীভূমক ছন্দের অনুসরণে)

তোমারে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায়
তব শ্রাদ্ধদিনে বঙ্গ। চিত্ত তার ধায়—
তোমার সমাধিতীর্থে; হে মনস্বী! নিত্য-স্মরণীয়!
নব্য বঙ্গে তুমি গুরু, ব্রহ্মনিষ্ঠ! ওহে সত্যপ্রিয়!
আশা দিয়া ভাষা দিয়া বাঁচালে স্বদেশ,
অর্থহীন নারীহত্যা-পাতকের শেষ—
করিলে, বাঁচালে বহু প্রাণী,
যুক্তিবলে মুক্তি দিলে আনি';
বেদান্ত, কোরান, বাইবেলে
মিলালে তুমি হে অবহেলে;
নবযুগ প্রবর্ত্তিলে তুমি
উদ্বোধিলে সুপ্ত মাতৃভূমি;
উচ্চে ধরি' তর্ক-তরবার
বিশ্বমৈত্রী করিলে প্রচার!
কীর্ত্তি তব কীর্ত্তনীয় প্রতিভা অদ্ভুত!
বিশ্বে মহা মিলনের তুমি অগ্রদূত;—
যুগ-যুগন্ধর রাজা! রাজ-পূজা—প্রাপ্য সে তোমার;—
মরিয়া মিলালে তুমি বিশ্বসামে চিত্ত বাঙ্গালার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেহ ও মস্তিষ্ক

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, উইণ্ডসর্ ম্যাগাজিন্ (Windsor Magazine) পত্রে, ডাক্তার টম্‌সন্ "দেহ ও মস্তিষ্ক" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে, তিনি বলেন যে, বহুদিন ধরিয়া লোকের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কোনই ধারণা ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মস্তিষ্ক বা তদর্থবাচক কোন শব্দই থাকিতে দেখা যায় না। এরিষ্টটল্ (Aristotle) যদিচ মস্তিষ্কের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার যে-ধারণা ছিল, তাহা আজকালকার দিনে, আমাদের নিকট নিতান্তই হাস্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহার মতে মস্তিষ্কের কায, শরীরের গরম রক্তকে ঠাণ্ডা করিয়া হৃৎপিণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের যে-সকল কায তাহা আমরা কতকটা স্পষ্ট দেখিতে পাই—কিন্তু মস্তিষ্ক এমনি নীরবে কায করিয়া থাকে এবং তাহা এত অনুমানসাপেক্ষ, যে, এখন পর্য্যন্ত ইহার সকল ক্রিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইতে পারে নাই। মনীষী গ্যালেন্ (Galen) ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে মস্তিষ্ক (Conscious mind) চিন্ময় আত্মার আধারমাত্র। ইহার পর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বহুদিন আর কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার টম্‌সন্ যে-বৎসর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন সে সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহই জানিতেন না যে, চিন্তার সহিত মস্তিষ্কের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা—মস্তিষ্ক মনের ইন্দ্রিয় মাত্র। ফুস্‌ফুসে যে-সকল বায়ুকোষ (air cells) আছে, তাহাদের সকলেরই যেমন একই কায—মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশেরও তেমনি একই কায। দর্শন, শ্রবণ, অনুভব, চিন্তা প্রভৃতি ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে,—এই সহজ সত্যটিও সে সময় তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এ ভ্রমটি দূর হইতে কিছুকাল বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইয়াছিল, সেগুলি বাঁদর কুকুর প্রভৃতির মস্তিষ্কের উপর; মানব-মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা করার সে সময় কোনই সুযোগ ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার জন্য, মস্তিষ্কে-যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এ ব্যাপারটি সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তারগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রোগবিশেষে, কিম্বা মস্তিষ্কে কোনরূপ গুরুতর আঘাত লাগিলে, মানসিক ক্রিয়ার যে-সকল ব্যতিক্রম ঘটে, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিবার কালে, তাঁহারা উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাক্যোচ্চারণ ব্যাপারটির উল্লেখ করা যাক্। কথা কহিতে একা মানুষই সমর্থ, অন্য জীবের এ শক্তি থাকিতে দেখা যায় না। চিন্তার সহিত বাক্য নিয়ত সম্বদ্ধ। মানুষ যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, বাক্যের দ্বারা তাহা করিয়া থাকে। সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগে, স্থলবিশেষে, বাক্য-

উচ্চারণের ক্ষমতাটি লোপ পাইতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে বাক্যোচ্চারণ করিবার শক্তিটি নিহিত থাকে, ইহাদের সে স্থানটি জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়।

একদিন হাঁসপাতালে একটি রোগী আসে। এ ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। ইহার শ্রবণশক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় নাই—এ ব্যক্তি মনে মনে পুস্তকাদি পাঠ করিতে এবং তাহা বুঝিতেও সমর্থ ছিল। ইহার বন্ধুরা বলে—এক দিবস, সুরাপানে প্রমত্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি ইহার চক্ষুর মধ্যে তাহার ছাতার অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহাতে তাহার চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই বটে—কিন্তু ছাতার অগ্রভাগ মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। ইহা মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে কথন-কেন্দ্র (uttering speech centre) নিহিত ছিল। এই স্থানটিই যে কথন-কেন্দ্র, তাহার প্রমাণ এই যে, যেখানেই মস্তিষ্কের ঐ স্থলটির অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেখানেই রোগীর বাকশক্তি বিলুপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আবার এই স্থলটি ছাড়া মস্তিষ্কের অন্য কোন অংশের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও, রোগীর বাক্‌শক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব মনে কর, মস্তিষ্কটি বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একটি অট্টালিকা-বিশেষ। এই অট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে যেন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে—এবং ইহার প্রতি-প্রকোষ্ঠে জলবহা নালী গিয়াছে। এখন কোন কারণে কোন একটি প্রকোষ্ঠের নালা যদি কমজোর হয়, তাহা হইলে ভিতরের জলের চাপে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে এবং উক্ত প্রকোষ্ঠের দ্রব্যগুলি জলের স্রোতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে অন্যান্য প্রকোষ্ঠ-স্থিত দ্রব্যাদির কোনই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মস্তিষ্কের মধ্যে যে-সকল রক্তবহা ধমনী আছে—তাহারা কতকটা জলবহা নালারই সদৃশ। মস্তিষ্কের কার্য্যের জন্য বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যক। এই-সকল ধমনী মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্য দিয়া যে-সময় রক্ত গমন করে, সে-সময় উহাদের গাত্রে একটা বিশেষরূপ চাপ (pressure) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন কারণে ধমনীর গাত্র কমজোর হয়, তাহা হইলে, রক্তের চাপে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে। পুরাতন কিড্‌নি (Kidney) রোগে, এবং গাউট্ (Gout) রোগে এরূপ প্রায়ই হইতে দেখা যায়। ধমনী ফাটিয়া গেলে নিকটস্থ মস্তিষ্কপদার্থ রক্তস্রোতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ইহার ফলে, মস্তিষ্কের ঐ অংশের যাহা ক্রিয়া, তাহার বিলোপ অথবা ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য মস্তিষ্কে তিনটি কেন্দ্রের আবিষ্কার হইয়াছে। প্রথমটি শ্রবণকেন্দ্রের সন্নিকট; শব্দসমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া এখানে নীত হইয়া সংরক্ষিত হয়; দ্বিতীয় স্থলটি দর্শনকেন্দ্রের সন্নিকট—চক্ষুদ্বারা শব্দসমূহ এই স্থলে নীত হয়। আর তৃতীয় স্থলটি দ্বারা স্বরযন্ত্র (larynx), জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতির পেশীসমূহের সংকুঞ্চন ও প্রসারণ হওয়ায়, বাক্যোচ্চারণ হয়। পূর্ব্ববর্ণিত রোগীর ছত্রাগ্রভাগ দ্বারা এই শেষোক্ত স্থলটীর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, সেই কারণেই সে কথা কহিতে পারিতেছিল না।

পাঠশক্তির লোপ।

উচ্চারণকেন্দ্র ও পাঠকেন্দ্র যে এক নহে তাহা নিম্নের রোগিণীর বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়। একটি রমণী এক দিবস প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি সংবাদপত্র বা পুস্তক কিছুই পড়িতে পারিতে-ছেন না। তিনি মনে করিলেন বুঝি তাঁহার চক্ষুর কোন-রূপ দোষ ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু পরে বুঝিলেন তাঁহার দৃষ্টিশক্তির কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই—গৃহের তাবৎ পদার্থই তিনি দেখিতে সমর্থ। তাঁহার শ্রবণশক্তিরও কোন গোলযোগ ঘটে নাই—বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তিও সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিল। সম্ভবতঃ নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মস্তিষ্কের middle cerebral artery নামক ধমনী, যাহা পাঠ-কেন্দ্রে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহার অবরোধ বশতঃ ঐরূপ ঘটিয়া থাকিবে! সন্ন্যাস (apoplexy) নামক রোগে, বাক্যোচ্চারণের বিভিন্ন কেন্দ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একটি ভদ্রলোকের উচ্চারণ ও পাঠশক্তি সহসা বিনষ্ট

হইয়া যায়—কিন্তু তাঁহার শ্রবণশক্তি পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী থাকে। এ ব্যক্তি আর-একটি রহস্য পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সে রহস্যটি হইতেছে যে, বাক্য ও অঙ্ক এ দুইটি বিষয়ের জন্য মস্তিষ্কে স্বতন্ত্র স্থল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই ভদ্রলোকটী কথা কহিতে ও লিখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অঙ্ক লিখিয়া দিলে পড়িতে তাঁহার কোনই গোলযোগ হইত না। বড় বড় হিসাব নিকাশ তিনি অবাধে করিতে ও বুঝিতে পারিতেন।

বাক্যের বিভিন্ন কেন্দ্র।

সঙ্গীতের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে আবার স্বতন্ত্র কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট আছে। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া গেলে, খুব সুনিপুণ সঙ্গীতবেত্তাও কোন গানেরই স্বরলিপি পাঠ করিতে পারেন না, যদিচ পুস্তকাদি পাঠ করিতে তাঁহার কোনই গোল ঠেকে না। আবার এমন ঘটনাও ঘটিতে দেখা গিয়াছে, কোন ব্যক্তির স্বরলিপি পাঠ করিবার শক্তিটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিন্তু স্বরলিপি ছাড়া অন্য বিষয় পাঠ করার ক্ষমতাটি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগে মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হইলে, বাক্য উচ্চারণ বিষয়ে যে-সকল ব্যতিক্রম ও ও বৈলক্ষণ্য ঘটে সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে এই মনে হয়, কোন পুস্তকাগারে ভিন্ন ভিন্ন শেল্‌ফে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাবলি সজ্জিত থাকে, আমাদের মস্তিষ্কেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থল নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ যখন কোন একটি নূতন ভাষা শিখিতে থাকেন, সে সময় উক্ত ভাষার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কে একটি নূতন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন ইংরাজ, যিনি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজি ব্যতীত, ফরাসী, ল্যাটিন্ গ্রীক্ ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন—তাঁহার কথা উল্লেখ করা যাক্। এমন ঘটিতে দেখা গিয়াছে—মস্তিষ্কের রোগবিশেষে, অথবা গুরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের অনিষ্ট সাধিত হইলে, এ ব্যক্তি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরাজি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, ফরাসী ভাষা নির্ভুল না হইলেও কতকটা পড়িতে পারেন, ল্যাটিন তদপেক্ষা নির্ভুল পড়িতে পারেন, গ্রীক পড়িতে তাঁহার একটিও ভুল হয় না। এই ঘটনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অবাধে করিতে পারা যায় যে, ইঁহার মস্তিষ্কে যে শেল্‌ফে ইংরাজি ভাষা ছিল, সেটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ফরাসী ভাষার শেল্‌ফখানির কতকটা, ল্যাটিন্ অথবা অত্যল্প অনিষ্ট ঘটিয়াছে, আর গ্রীক্‌ভাষার শেল্‌ফখানির মোটেই অনিষ্ট হয় নাই। আর-একটি কথা এই যে, মস্তিষ্কে যে-সকল ভাষার শেল্‌ফ্ আছে, তাহাতে ক্রিয়াপদসমূহ সর্ব্বাগ্রে সজ্জিত, সর্ব্বনাম ও বিশেষণপদসমূহ তাহার পর সজ্জিত এবং বিশেষ্যপদ সকলের পরে সজ্জিত হয়। নিম্নের ঘটনাটিতে কথাটা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে। একব্যক্তি কথা কহিতে অসমর্থ বলিয়া, হাঁসপাতালে আসে। ডাক্তার টমসন্ তাহার কারণ এইরূপ স্থির করেন যে, মস্তিষ্কের যে-স্থানটিতে কথন-কেন্দ্র (speech centre) অবস্থিত, এ ব্যক্তির মস্তিষ্কের সেই স্থানটিতে একটি অর্ব্বুদ (tumour) জন্মাইয়া তাহার বাক্‌শক্তির তিরোধান ঘটাইয়াছে। পটাশিয়াম্ আইয়োডাইড্ (Potassium Iodide) নামক ঔষধ সেবনে এরূপ অর্ব্বুদ দুর হইয়া থাকে। ডাক্তার টম্‌সন্ রোগীকে তাহাই ব্যবস্থা করিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন, যে, ঔষধ সেবনে রোগীর যদি উপকার হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে পারিবে, বিশেষ্য পদ সর্ব্বশেষে পারিবে। ১৫ দিন ঔষধ সেবন করার পর রোগী যখন পুনরায় হাঁসপাতালে আসে, ডাক্তার টম্‌সন্ তাহার সম্মুখে একখানি ছুরিকা ধরিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তো এটা কি?" সে উত্তর করিল "তুমি কাটবে।" অতঃপর একটি পেনসিল্ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করায় কহিল "তুমি লিখ্‌বে।" বহুদিন অতীত হইলে তবে এ ব্যক্তি বিশেষ্যপদ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার একটু কারণও যে না আছে এমন নহে। মানবশিশু যখন প্রথম কথা কহিতে শিখে তখন সে ক্রিয়াপদগুলিই শিক্ষা করিয়া থাকে। ক্রিয়াসমূহ আমাদের ভিতরের জিনিস—বাহিরের নয়। দেখা, শুনা, করা প্রভৃতি ক্রিয়া আমাদের নিজস্ব, আর যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, কি করা যায় তাহা বাহিরের পদার্থ; ইহাদের নামকরণ আমরা পরে করিতে শিখি। যে-সকল বিশেষ্যপদের সহিত আমরা সর্ব্বশেষে পরিচিত হই, ভুলিবার সময়, সেইগুলিই আগে ভুলিতে

আরম্ভ করি। 'এই কারণেই বুদ্ধর' লোকের নাম করিবার সময় প্রায়ই ভুল করিয়া বসেন।

মানুষ ও বানরের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

জীবজগতে মানুষে ওরাংওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরগুলির সহিত একশ্রেণীভুক্ত। মানুষের সহিত এই-সকল বানরের যে খুবই সাদৃশ্য আছে, একথা সকলেই জানেন। মানুষ ও বানরের দেহস্থ যন্ত্রসমূহ অনেকটাই একরূপ। অধ্যাপক হাক্‌স্‌লি (Huxley) প্রতিপন্ন করিয়াছেন মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কে বাহ্যতঃ কোনরূপ অসাদৃশ্য নাই তথাপি মন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটা শিম্পাঞ্জিকে যতই শিখাও না কেন, সে কিছুতেই সাহিত্যের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না—আফিসের হিসাব রাখিতে সমর্থ হইবে না। মানুষকে শিখাইলে সে সব কাজই করিতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন বানরই সহস্র চেষ্টায় এ-সকল শিখিতে সমর্থ হয় না। এই তো গেল মানুষ ও বানরের মধ্যে একরূপ পার্থক্য। আবার এক হিসাবে মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে, বানরকে তাহা বলা যায় না। মানুষের সৃজন-ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষের যদি এ ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে জগতে আমরা কয়টা পদার্থ দেখিতে পাইতাম ? নদীর উপরকার সেতুটি মানুষের আশ্চর্য্য সৃষ্টিমহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। মানুষ ও বানরের কার্য্যাবলি আলোচনা করিলে, এই মনে হয় যে, মানুষ ও বানরের মস্তিষ্কের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকিলেও গুণগত পার্থক্য যে খুব বেশী মাত্রায় আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

অধুনা স্থির হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক চিন্তাবৃত্তির আধার নহে। ইহা চিন্তাকারীর চিন্তার যন্ত্র মাত্র। সে কেমন ? যেমন বেহালাখানি বাদকের সুর বাহির করিবার যন্ত্রমাত্র। বেহালার নিজের সুর বাহির করিবার শক্তি নাই। মস্তিষ্কেরও সেইরূপ নিজের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। যাহার মস্তিষ্কের ওজন যত বেশী, সে তত বুদ্ধিমান—এ কথার মূলে কোন সত্য নাই। 'বর্ত্তমানকালে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ (Helmholtz)-এর তুল্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কে জন্মাইয়াছে ? আশ্চর্য্য এই যে, ইঁহার মস্তিষ্কের ওজন, একটি সাধারণ ব্যক্তির মস্তিষ্কের অপেক্ষা অনেক কম। অধুনা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আর একটি অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ; সে তত্ত্বটি হইতেছে—চিন্তা করিবার সময় আমরা সমস্ত মস্তিষ্কটাকে কাযে নিযুক্ত না করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্রকে নিযুক্ত করিয়া থাকি। হস্ত পদাদির যেমন দক্ষিণ বাম আছে, মস্তিষ্কেরও তাহা আছে। ইহাদের একটাই চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কাযে ব্যাপৃত হয়, অপরটা অলসভাবে বসিয়া কাটায়। অনেক সময় এমন ঘটিতে দেখা যায়, মস্তিষ্কের অর্দ্ধাংশ একবারে নষ্ট হইয়াও রোগী বহুদিন জীবিত আছে—তাহার মানসিক ক্ষমতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এস্থলে অলস মস্তিষ্কটাই নষ্ট হয়—যেটি চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়—সেটি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অবস্থিতি করে।

প্রত্যেকের মাথায় একটি করিয়া অলস মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কই যদি চিন্তা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কারণ হয়, তাহা হইলে, যাহার মাথা যত বড় সে তত চিন্তাশীল হইবে—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে দেখা যায় না। মানুষের দুটি চক্ষু আছে বলিয়া সে কোন জিনিসকে দুটা না দেখিয়া একটাই দেখে, আবার এক চোখে দেখিলেও সেই একটাই দেখে। দুটি মস্তিষ্ক আছে বলিয়া মানুষ দ্বিগুণ চিন্তা করেনা। এখন প্রশ্ন এই যে, চিন্তা করিবার কালে আমরা দুইটি মস্তিষ্ক (দক্ষিণ ও বাম) নিয়োজিত না করিয়া একটাই বা করি কেন ? আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সে সময়, আমাদের দক্ষিণ, বাম, কোন মস্তিষ্কটাই চিন্তা করিবার উপযোগী থাকে না। মানসিক ক্ষমতা সমূহ আমাদের স্বোপার্জ্জিত জিনিস। ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেহ বাক্য উচ্চারণ করেনা। নবজাত শিশুর চক্ষু কর্ণাদি থাকিয়াও না-থাকার সামিল বলিতে হয় ; কেননা এ-সকল দ্বারা সে কোন পদার্থেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা শিশু ক্রমে ক্রমে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে থাকে। শিক্ষার দ্বারা তাহার মস্তিষ্কের স্থান-বিশেষের

পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কেন্দ্র বিরচিত হয়। এই কারণেই যতদিন অনুশীলন ও অভ্যাস দ্বারা তাহার মস্তিষ্কে বেহালা বাজাইবার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্রের উদ্ভব না হয় ততদিন কেহ সুনিপুণ বেহালাদার হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, সময় ও অনুশীলনের আবশ্যক। একটি মস্তিষ্ক দ্বারা যখন কায চলিতে পারে, তখন উভয় মস্তিষ্ককে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রমের আবশ্যক কি? এই অকারণ কালক্ষয় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্যই, মানুষ একটা মস্তিষ্ককেই পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এখন কথা এই—দক্ষিণ ও বাম এই দুইটা মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ মস্তিষ্কটা চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী হয়? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যাহারা প্রধানতঃ দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের বেলায় বাম মস্তিষ্ক, আর যাহারা বাম হস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ মস্তিষ্কটি পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বাক্য-উচ্চারণ-কেন্দ্র এবং অন্যান্য জ্ঞানকেন্দ্র-সমূহ প্রধানতঃ বাম মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বে ইসারায় মনোভাব ব্যক্ত করে। সঙ্কেত ও ইঙ্গিত একরূপ অস্ফুট ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের মস্তিষ্কে হস্ত-সঞ্চালনের-কেন্দ্র-সমূহ যেস্থলে অবস্থিত, তাহার অব্যবহিত পরেই বদন, ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতির পেশীগুলির কেন্দ্র সংস্থাপিত। ইহার ফলে এই হয় যে, শিশু হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে করিতেই ওষ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি নাড়িতে আরম্ভ করে। ওষ্ঠ জিহ্বা, বদন প্রভৃতি নাড়িলে ধ্বনি প্রকাশ হয়। এবং এই ধ্বনিই কালক্রমে বাক্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে, শিশুর মস্তিষ্কে বাক্যোচ্চারণের কেন্দ্রের আবির্ভাব হওয়ার পর হইতে, কালক্রমে চিন্তা-কেন্দ্রের এবং তাহার পর জ্ঞান-কেন্দ্রের সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহা হইলে, আমরা এই দেখিতেছি যে, বয়সের সহিত আমরা আমাদের বাম মস্তিষ্কে কতকগুলি করিয়া কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়া লই। এ সকল ব্যতীত আমাদের মস্তিষ্কে আরও কতকগুলি করিয়া কেন্দ্র থাকে; এগুলি সহজাত অর্থাৎ আমাদের জন্মকাল হইতেই বর্ত্তমান থাকে। এ কেন্দ্রগুলি আবার আমাদের মস্তিষ্কের বাম দক্ষিণ উভয় অংশেই সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে। এ কেন্দ্রগুলির কি কাজ? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দর্শন-কেন্দ্রের উল্লেখ করা যাক। চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলে বটে, কিন্তু চক্ষুর নিজের দেখিবার কোন শক্তি নাই। মস্তিষ্কেরই একা দেখিবার শক্তি আছে। চক্ষুর রেটিনা (retina) নামক পর্দ্দায় পদার্থের যে প্রতিবিম্ব পড়ে Optic nerve (দর্শন-স্নায়ু) দ্বারা তাহা মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্দ্রে নীত হয় এবং ঠিক সেই সময় পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। আমাদের যেমন দক্ষিণ ও বাম দুইটা দর্শনেন্দ্রিয়, তেমনি মস্তিষ্কের দক্ষিণ ও বামে দুইটা দর্শন-কেন্দ্র আছে। যদি কোন ব্যক্তির দক্ষিণ ও বাম মস্তিষ্কস্থিত দর্শন-কেন্দ্র দুইটি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে, চক্ষু থাকিয়াও সে ব্যক্তি অন্ধ হয়। দর্শন-কেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, অনুভব প্রভৃতির জন্য যে-সকল কেন্দ্র আছে, সেগুলি ছাড়া আমাদের দক্ষিণ ও বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আর কতগুলি কেন্দ্র আছে। আমাদের দেহে যে-সকল ইচ্ছাধীন পেশী আছে—এই কেন্দ্রগুলি সে-গুলিকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। এই-সকল কেন্দ্র হইতে স্নায়ুসমূহ উৎপন্ন হইয়া নিম্নে আসিতে আসিতে এক স্থানে পরস্পর কাটাকাটি করে—ঠিক যেমন ইংরাজি X অক্ষরের বাহু দুটি পরস্পর কাটাকাটি করিয়াছে সেইরূপ আর কি। ইহার ফলে দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পেশী-সমূহ বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র-দ্বারা এবং বাম পার্শ্বস্থ পেশী-সমূহ দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্র-দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কারণে কোন ব্যক্তির দক্ষিণ মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত, আর বাম মস্তিষ্কের কেন্দ্র নষ্ট হইলে দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়।

একটি অতিরিক্ত মস্তিষ্কের আবশ্যক কি?

চিন্তা-কার্য্যের জন্য যদি একটিমাত্র মস্তিষ্ক হইলেই চলে, তবে দুইটা মস্তিষ্ক রহিয়াছে কেন? এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের দৈহিক ক্রিয়াগুলির

জন্য দক্ষিণ বা বাম উভয় মস্তিষ্কেরই আবশ্যকতা আছে। অনুভব করিবার জন্য ও পেশী-সমূহের সঞ্চালনের জন্য দুইটি মস্তিষ্কই, তুল্য আবশ্যক। আর একটি কথা এই যে, শৈশবে কোন কারণে কাহারও যদি চিন্তা এবং অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত মস্তিষ্কটি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অপরটিকে ঐ-সকল কার্য্যের উপযোগী করিয়া না তুলিতে পারা যায় এমন নহে।

উভয় মস্তিষ্ককে চিন্তাদি কার্য্যের উপযোগী করা উচিত কি না ?

অনেকে মনে করেন, আমাদের উভয় মস্তিষ্ককেই যদি চিন্তাদি কার্য্যে অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে খুবই সুবিধা হইবার কথা। ইহাঁদের বিশ্বাস মস্তিষ্কের যত বেশী অংশ চিন্তাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে, ততই ভাবের আধিক্য হইতে থাকিবে। ইহাঁরা জানেন না যে মস্তিষ্কের ভাব-সৃজনের কোনই শক্তি নাই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। একটি বালিকা দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার না করিয়া সকল কাজেই বাম হস্ত ব্যবহার করিত। এই কারণে তাহার বাম হস্তখানি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহার ফল এই হয় যে, উক্ত বালিকার বাক্য উচ্চারণের কেন্দ্রগুলি সম্যক পরিণত হইতে পারে নাই।

মস্তিষ্কে কেন্দ্রের স্ফুটন।

মস্তিষ্কে কোন একটা নূতন কেন্দ্রের উদ্ভব করিতে হইলে, রীতিমত সাধ্য সাধনার আবশ্যক। একটি বয়স্ক ব্যক্তি যদি কোন বিদেশীয় ভাষায় পারদর্শী হইতে চাহেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া উক্ত ভাষার শব্দাদি অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাতে ঐ-সকল শব্দ তাঁহার মস্তিষ্কের উচ্চারণ-কেন্দ্রে স্থানলাভ করিবে এবং আবশ্যকমত মুখে আসিতে সমর্থ হইবে। এ ব্যাপারটি নিতান্ত সহজ নয়—ইহাতে যথেষ্ট ইচ্ছা-(Will)-শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক করে।

ইচ্ছা (Will) নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বিশেষ।

কুম্ভকার যেমন একতাল কাদা লইয়া তাহা হইতে তাহার ঈপ্সিত পদার্থ নির্ম্মাণ করে, মানুষের ইচ্ছাও (Will) তেমনি মস্তিষ্ককে গঠিত করিয়া তুলে। সূর্য্যরশ্মি যেমন চক্ষুর রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তেজিত করে, মানুষের ইচ্ছাও তেমনি মস্তিষ্ক পদার্থকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় ইচ্ছাও (Will) নির্দ্দিষ্ট ভৌতিক পদার্থ বিশেষ। সূর্য্যরশ্মির যেরূপ physical chemical ও physiological কার্য্য দৃষ্ট হয়, ইচ্ছারও তাহা না থাকিবে কেন ?

মনের লাগাম।

ইচ্ছাকে মনের লাগাম বলিতে পারা যায়। চিন্তাকালে ইচ্ছা মনকে সংযত করিয়া রাখে; মন আবার দেহকে সংযত করে।

জীবনে নিষ্ফলতার কারণ।

চিন্তাকালে যতটা সংযমের আবশ্যক এমন আর কোন কালে নহে। চারিদিক হইতে ভাবস্রোত আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা যতই দুর্ব্বল হইব, ভাবস্রোত ততই প্রবলতর হইতে থাকিবে। ক্ষয়রোগে রোগী যখন একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন আমরা এই দেখি যে, রোগীর চিন্তার ও ভাবের যেন কূলকিনারা নাই। শেষে ইহা অসঙ্গত প্রলাপে পরিশেষিত হয়। মানবজীবনে অসম্বদ্ধ, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা দ্বারা কোনই ফল হয় না। বরঞ্চ অনর্থ যথেষ্টই হইতে দেখা যায়। সকলেরই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকিলে, ভাবের আধিক্যে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই না। যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যানুযায়ী কথা কহে, চিন্তা করে, কার্য্য করে, সেই যথার্থ মানুষ। এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের মানসিক শক্তি খুবই বেশী, কিন্তু এক ইচ্ছাশক্তির অভাবে, তাহাদের এ-সকল গুণ কোনই কাজে লাগে না—তাহাদের জীবন একবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। এই কারণে সকলেরই আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। যাহাদের আত্মসংযম নাই, তাহাদের দশা অনেকটা ভগ্নপ্রাকার-নগরীর তুল্য—বেষ্টন-প্রাচীরের অভাবে নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

বাঙলা ভাষার আকার

গত কয়েকমাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী "ভারতীতে" বাঙলা ভাষার আকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলা কথাবার্ত্তার ভাষা ও ছাঁদ আরও অধিকভাবে সাহিত্যের মধ্যে প্রচলনের জন্য তিনি এমন অনেক কথা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার অভিমতগুলি কিছু অতিরিক্ত ও অসংলগ্ন বোধ হয়, তবে তিনি যখন নিজেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি 'ওকালতি' করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ মূলে যখন তাঁহার সহিত আমাদের ঐক্য রহিয়াছে, তখন খুঁটিনাটি লইয়া বাদা-নুবাদ না করিয়া, আমাদের বক্তব্য নিজের ভাবেই বলিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতিভাষা ও 'আলালি' ভাষার বিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রই একরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সেই বিবা-দের ছায়া লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটা বড়রকম বিতর্ক তোলার তেমন সঙ্গত কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র অভি-মত ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত-নিষ্পন্ন শব্দের সহিত চলিত কথার যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে যে ভাষা, তাহাই যথার্থ সাধুভাষা। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখ-কেরা এই সূত্র অবলম্বনেই লিখিয়া আসিতেছেন, তবে অবশ্য বিষয়, রুচি ও যোগ্যতা ভেদে, ও ভাষার স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে, নানা শ্রেণীর রচনার বিকাশ হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় নূতন সুর, লয় ও মূর্চ্ছনা দিয়াছেন, এবং কত বিচিত্র শিল্পসম্পদে উহাকে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মূল কাঠাম এখনও বজায় আছে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের ধারণা, চূর্ণ ও সংহত, গম্ভীর ও সরস, সুষ্ঠু ও সতেজ, এক কথায় সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বাংশে 'কাটাল' গদ্যের যে-আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অব্যাহত রহি-য়াছে, এবং যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দিকে অধিক-তর মনোযোগী হই তাহা হইলে আজ-কালকার লেখার দু একটি যে প্রধান দোষ তাহা অনেক পরিমাণে সংশো-ধিত হইতে পারে।

কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে চলিত শব্দ এবং বিশেষতঃ ক্রিয়াপদগুলি লেখা উচিত কি না? আমাদের বিবেচনায় এই তর্কটি তেমন গুরুতর নয়। প্রমথ বাবু বলেন এইরূপই লেখা উচিত। কিন্তু আমরা অকুণ্ঠিতভাবে এ মতে সায় দিতে পারি না। লিখিতভাষা সকলেই বুঝে, সকলেই ব্যবহার করিতে পারে, কাহা-রও অভিমানে আঘাত করে না। এরূপ অবস্থায় কলি-কাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে লিখিত ভাষার অবাধ পরিবর্ত্তন করিলে নাহক্ জবরদস্তি করা হইবে। কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার সংযোগ বেশী তফাৎ হইয়া পড়িলে, লিখিত ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়ে যথার্থ কথা। কিন্তু বাঙলাদেশের বারআনা লোক যখন কলিকাতার dialect ব্যবহার করে না, প্রত্যুত এমন বাঙালী বিরল নয় যাহাদের নিকট কলিকাতার dialect বাস্তবিকই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বোধ, তখন প্রমথবাবু যে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন, যেদিক দিয়াই হউক, তাহার হাত তিনি একেবারে এড়ান্ কি করিয়া?

সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা ভাষায় উচ্চারণতত্ত্বের বিশেষ দৌরাত্ম্য নাই। আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, আমরা স্ব-ইচ্ছায় সে উৎপাত যেন ডাকিয়া না আনি। স্বরবর্ণের দু-একটী বক্র উচ্চারণ (যেমন 'কেন'র 'এ'কার), ব্যঞ্জন-বর্ণের দু-একটি জটিল উচ্চারণ (যেমন S, Z), ইহা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু অভাব দেখি না। দুই চারিটি সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে উপস্থিত বর্ণমালার দ্বারাই সে অভাব পূরণ হইতে পারে। আমাদের ভাষায় লুপ্ত অক্ষর প্রায় নাই। অকারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হসন্ত উচ্চারণ একটা ব্যতিক্রম স্থল বটে, তবে উহার নিয়ম সোজা। যুক্ত অক্ষরের কৃত্রিম উচ্চারণও নাই বলিলেই হয়। যা' কিছু গোলযোগ রহিয়াছে চলিত বা প্রাদেশিক শব্দের বানান লইয়া, এবং বাস্তবিক ভাষার যদি কোন আশু সংস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে, ত' সে এইখানে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, ষত্ব, ণত্বের নিয়ম সাধারণতঃ সংস্কৃত-নিষ্পন্ন পদের সম্বন্ধেই খাটে। তদ্ভিন্ন অপর সকল

শব্দের বানান যত সরলভাবে হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়, এবং সুখের বিষয় আমাদের ভাল লেখকদের ঝোঁকও সেই দিকে। যে-সকল প্রাদেশিক শব্দের বানান ব্যবহারে একরূপ বিধিবদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাদের স্বতন্ত্র কথা। তবে চলিত শব্দ ও প্রত্যয়ের বানান সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইলে বড় ভাল হয়। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দমালা একেবারে সংগৃহীত ও অভিধানভুক্ত হউক, এরূপ বলি না। তবে সাধারণ চলিত শব্দের ও প্রত্যয়ের গঠন ও উচ্চারণপ্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, সাহিত্যের আদর্শে উহাদিগকে যথাযথ বানান করিবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম থাকিলে সুবিধা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ, অথবা সেইরূপ কোন প্রামাণ্য কেন্দ্র হইতে, যথোচিত প্রকাশ্য আলোচনার পর, যদি এইরূপ কতকগুলি সূত্র প্রচারিত হয়, এবং দেশের বিশিষ্ট সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রগুলি যদি সেগুলি মানিয়া চলেন, এবং নিজেদের প্রকাশিত রচনায় উহাদের ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেন, তবে অচিরে সাহিত্যের মধ্যে একটা অতি আবশ্যকীয় শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে।

বহিরবয়বগত ঐক্য ভাষার একটা প্রধান জিনিস, সুতরাং ব্যাকরণের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকিলেও সাহিত্যে যে শিষ্টরীতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার সহসা ব্যভিচার করা উচিত নয়। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ যে পরিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক স্থলে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ উচ্চারণের অনুযায়ী বিকৃত বানান সাহিত্যে চালাইতে গেলে, ইষ্টের বদলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্থল, কলিকাতা অঞ্চলে 'অ'কারান্ত শব্দ মাত্রই 'ও'কারান্ত করিয়া উচ্চারণ করা একটা রোগের মধ্যে। উহা যে প্রাদেশিকতা তাহার আর সন্দেহ নাই, এবং সাহিত্যে কখনই অনুকরণীয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং 'ভালো' 'কালো', 'খাবো', 'যাবো', এইরূপ লেখার আমরা পক্ষপাতী নহি। শুধু 'অ'কারান্তই বা বলি কেন, কলিকাতা অঞ্চলে আদিতে 'অ'কারযুক্ত ও সামান্যতঃ স্বরান্ত পদেরও নানারূপ বিকৃত উচ্চারণ দেখা যায়; যথা, 'প্রিতি' ('প্রতির' স্থানে), 'প্রিসিদ্ধ', বা 'প্রোসিদ্ধ', 'প্রোবাস', 'সত্যি', 'মিথ্যে', 'দিশী', 'বোন,' 'মোন', ইত্যাদি। মিশ্র স্বরবর্ণের উচ্চারণ ত একেবারেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; যেমন, 'দেওয়াল' বা 'দেয়াল' স্থানে 'দেল', 'দোয়াত' স্থানে 'দোত', 'ওয়ালা' স্থানে 'ওলা' ('সন্দেশওলা,' 'কাপড়ওলা'), ধোঁয়া স্থানে 'ধোঁ', 'বিয়ে' 'বেহাই' (বা 'বেয়াই'), 'বেহান' (বা ('বেয়ান') স্থানে যথাক্রমে বে,' 'বেই' 'বেন্,' ইত্যাদি। কয়েকটি এইরূপ অপভ্রষ্ট পদ প্রমথ বাবুর রচনায়ও স্থান পাইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি; যথা, 'হয়তো,' 'বোঝানো,' 'হিসেব,' 'বিদ্যে' (বাগছন্দে?), 'রক্ষে'। এমন কতকগুলি কথা আছে যেগুলি 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করা উচিত কি না সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে*। সেগুলি না হয় ছাড়িয়া দিই। মোট কথা 'অ'কারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ আমরা সাধারণতঃ হসন্ত ভাবে উচ্চারণ করি। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন 'ঐ'কার কি 'ঔ'কার যুক্ত শব্দ হইলে, অথবা উপান্তে 'ত' বা যুক্ত অক্ষর থাকিলে, আমরা স্বরান্ত ভাবে উচ্চারণ করি, যেমন, 'কৃত,' 'পঠিত,' 'মৌন', 'শৈল,' 'ফর্দ্দ', ইত্যাদি। ক্রিয়াপদগুলির অবশ্য স্বরান্ত উচ্চারণই হইয়া থাকে। যেখানে স্বরান্ত উচ্চারণ হয়, কলিকাতা অঞ্চলে সেখানে 'ও'কারের টান থাকে।—অথচ সেখানে লিখিত 'ও'কার ঠিক পুরা উচ্চারণ করিলে বেয়াড়া শুনায়। অনেক সময়ই কলিকাতা অঞ্চলের এইরূপ শব্দের যে উচ্চারণ হয়, তাহা 'অ'কার এবং 'ও'কারের মাঝামাঝি রকমের একটা। এই জন্য 'অ'কারান্ত শব্দ 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করিয়া অনর্থক বৈষম্য সৃষ্টি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। এইরূপ কৃত্রিম phoneticsএর উত্তম নমুনা 'মতো' ও 'কী' এই দুইটি শব্দ। সৌখীন সাহিত্যের বাজারে আজকাল ইহাদের পুরা কাটতি। অথচ এইরূপ বানানের কোন সার্থকতা দেখি না। 'মত' 'অভিমত' অর্থে, বিশেষ্য শব্দ, উহার উচ্চারণও হসন্ত। 'মত' বিশেষণ অর্থে, ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি শব্দের ন্যায়

* যেমন, 'উল্টো' 'বেসুরো'। সাবেক রীতি অনুসারে লিখিলে 'উল্টা' 'বেসুরা' এইরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু উহা সকলে না পছন্দ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে 'উল্ট' 'বেসুর' এইরূপ লিখিয়া 'অ'কারান্ত ভাবে উচ্চারণ করিলে হানি আছে কি?

(যেমন, 'এত', 'তত', 'যত', 'কত') স্বরান্ত ভাবে উচ্চারিত হয়। ইহার উপর না-হক্ একটা 'ও'কার যুড়িয়া দিবার কি তাৎপর্য্য? কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে হইলে, 'মতো'-তেও ত কুলায় না, 'মোতো' লিখিতে হয়। 'কি'র স্থান ও অর্থভেদে দীর্ঘ উচ্চারণ হয় সত্য। কিন্তু উহা ত মাত্রা বা ঝোঁক বা Emphasisএর কথা। এই নিয়মে বানান পরিবর্ত্তন করিলে, অনেই স্থলেই ত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ লিখিতে হয়। এ-সব খেয়ালের বেশী প্রাদুর্ভাব সাহিত্যের পক্ষে হিতকর নয়। উচ্চারণ উড়ন্ত, অশরীরী শক্তি, কত সূক্ষ্ম কারণে মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই জন্যই সাহিত্যে বানানের বাঁধ দেওয়া আবশ্যক। নচেৎ এমন বর্ণমালা এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই, যাহার দ্বারা মুখের ভাষার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম টানটুন্ সম্যকরূপে লিখিত আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। করিবার বিশেষ দরকার আছে বলিয়াও মনে হয় না।

এখন কথা রহিল ক্রিয়ার রূপ লইয়া। আমরা স্বীকার করি কতকগুলি লিখিত ক্রিয়াপদ কিছু বেশী 'লতান' বা লম্বা, এবং অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিবার বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়। ভাষার গতি ক্রিয়াতে, সুতরাং ক্রিয়াগুলি 'লড়্‌বড়ে' হইলে ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ হয় না। লিখিত ভাষার একটা অভ্যস্ত লয় আছে, সেজন্য লিখিত ভাষা পড়িবার সময় এ অভাব তত ধরা পড়ে না, কিন্তু যখন আমরা বক্তৃতা করিতে উঠি, তখন উহা সহজে ধরা পড়ে। এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙলায় বক্তৃতার প্রসারের ও কথা-বার্ত্তার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াগুলি লিখিত ভাষায় ক্রমশঃ প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তবে এ সম্বন্ধে আমরা রক্ষণশীল নীতির কিছু পক্ষপাতী। ক্রিয়া-পদগুলি ভাষার currency বা চলিত মুদ্রা। ইহার দ্বারাই দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, বাঙলার সকল প্রদেশের মধ্যেই লিখিত ভাষা সহজবোধ্য ও সুখসেব্য হইয়াছে। ভাষার currency ঠিক রাখিতে পারিলে, ভাষার উপর 'আর্য্য আক্রমণ'ই হউক বা 'মুসলমান আক্রমণ'ই হউক, কিছুতেই তেমন ভীত হইবার কারণ দেখি না। কারণ যে-সকল শব্দই বাঙলা ভাষায় ঢোকাইবার চেষ্টা করা হউক না কেন, যেগুলি বাঙলার প্রকৃতির সহিত মিশ্ খাইবে, সেইগুলিই থাকিয়া যাইবে। অপরগুলি কৃত্রিম উত্তেজনার অবসানে উপযুক্ত রসের অভাবে মরিয়া যাইবে। বর্ত্তমান ক্রিয়ার রূপগুলি বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চারণ-বৈষম্যের মধ্যে কতকটা মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার রূপগুলি যাহাতে কতকটা সেই স্থান রক্ষা করিতে পারে এবং কালে সকলের গ্রাহ্য হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের যাত্রা, কথকতায় (থিয়েটারের কথা ধরিব না, কেননা উহা খাঁটি কলিকাতার জিনিস), এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, যাহা খুব দীর্ঘও নয় অথচ খুব হ্রস্বও নয়। সেইরূপ একটা আদর্শ আমাদের সাম্‌নে থাকিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত ক্রিয়ার রূপ লিখিত ভাষার অভ্যস্ত লয়ের উপর অনেক দিন আধিপত্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং, আপাততঃ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ক্রিয়ার উভয়বিধ আকারই প্রচলিত থাকুক, ইহার বেশী বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। লেখকের রুচি ও প্রয়োজন ভেদে যখন যেমন ভাল মনে করিবেন, ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় একটা সামঞ্জস্য হইয়া কালে একপ্রকার আকারই অবশ্য প্রবল ও গ্রাহ্য হইবে। তবে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা উচিত মনে করি, তখন যেন তাহার মধ্যে অনাবশ্যক গ্রাম্যতা না ঢোকাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি সুপরিজ্ঞাত নিয়ম * থাকিলে ভাল হয়। প্রমথ বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কলিকাতা অঞ্চলের 'উম্'-ভাগান্ত ক্রিয়ার রূপ কোন কালে দেশময় গ্রাহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

* আমরা ব্যাকরণের সূত্র প্রণয়নের স্পর্দ্ধা রাখি না, তবে সংক্রিয়া রূপের একটা সাধারণ খসড়া দেওয়া যাইতে পারে—

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি—

'ইয়া' স্থানে 'এ' বা 'য়ে'—ক'রে ('কোরে' নয়), খেয়ে। অকারান্ত ক্রিয়া একারান্ত। ইতে স্থানে তে—ক'র্‌তে (কোর্‌তে নয়), খেতে, হ'তে ('হোতে' নয়)। 'ইলে' স্থানে 'লে'—ক'র্‌লে (কোর্‌লে নয়), ইঃ।

অথচ তিনি উহা অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি কিছু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় না ?

লিখিত ভাষার যে সংকীর্ণতা বা আড়ষ্টভাবের কথা প্রমথ বাবু বলিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ যে মুখের ভাষার সহিত উহার কম সংযোগ এমন নয়, আর একটা গুরুতর কারণ এই যে আমাদের সভ্য সমাজের মুখের ভাষাই বড় দুর্ব্বল। আমাদের কথাবার্ত্তা শিথিল, বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো, এবং নানাবিধ ইংরাজির বুক্‌নিতে কণ্টকিত। একজন ভদ্র ইংরাজ কি হিন্দুস্থানীর কথাবার্ত্তার সহিত একজন সমান অবস্থার বাঙ্গালীর কথাবার্ত্তা তুলনা করিলেই আমরা এ প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যখন প্রকাশ্যসভায় মুখোমুখি করিয়া কিছু বলিতে হয়, তখনই আমাদের এ দারিদ্র্য সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের ভাষার সমস্ত অভাব ও দোষ একমাত্র সাধুভাষার উপর চাপান সঙ্গত নয়। আবার চলিত ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও ঢের মেকী চলে। ভাষা ক্ষিপ্র ও চটুল হইলেই জোরাল ও অর্থবোধক হয় না, এবং আস্ফালনপরায়ণ হইলেই স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না। আমরা যে কথোপকথনের ছাঁদের লেখার সময় সময় এত বড়াই করি, অনেক সময়ই কি উহা ইংরাজদিগের জোর করিয়া কথা বলার যে একটা ধরণ আছে, উহার ক্ষীণ ও কষ্টকর প্রতিধ্বনি নয় ? সুতরাং এ দিকেও কোন কৃত্রিমতা না আসিয়া পড়ে, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যেমন চলিত শব্দ সাধু শব্দের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে হইবে, সেইরূপ সাধু শব্দগুলির আরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দরকার। ব্যবহারের অভাবে আমরা সাধু শব্দগুলিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সাধু ভাষার যে আড়ষ্টভাব ইহাও তাহার এক কারণ। সাধারণ কথাবার্ত্তায় সাধু শব্দ ব্যবহার করা আমরা জেঠামি মনে করি। ইহা নিতান্ত ভুল। শব্দ ব্যবহারেই উজ্জ্বল ও মোলায়েম হইয়া উঠে। প্রমথ বাবু 'সাহিত্যিক' শব্দটি বিশেষণ অর্থে ব্যবহার করিতে নারাজ। কিন্তু যদি সমান অর্থবোধক ঐরূপ একটি শব্দ সহজে না মিলে, তবে উহাই সাহসের সহিত ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহার করিতে করিতেই উহা কানে আর তত বেসুর লাগিবে না। এই যে ইংরেজিতে নিত্য নূতন নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন নূতন জীবনের অবস্থার সহিত পরিচয়ের ফলে, রাশি রাশি নূতন শব্দ উদ্ভাবিত ও আহৃত

২। সমাপিকা ক্রিয়া—বর্ত্তমান-কাল—'ইতেছে' 'ইতেছ' 'ইতেছি' প্রভৃতি বিভক্তির 'ই' বা 'ইতে'-র লোপ	কর্‌তেছে (পূর্ব্ববঙ্গ), কর্‌ছে (পশ্চিম বঙ্গ), ইঃ। স্বরান্ত ক্রিয়া, হইলে বিভক্তির 'ছ'-র স্থানে 'চ্ছ' ; খাচ্ছে, দিচ্ছি '(খাচ্চে', 'দিচ্চি, নয়)। অন্যথা, খেতেছে যেতেছে, ইঃ (পূ, ব)।
৩। সমাপিকা ক্রিয়া—অতীতকাল (১) 'ইল', 'ইলে', 'ইলাম' বিভক্তির 'ইকারের লোপ' এবং 'অ'কারান্ত ধাতু 'এ'কারান্ত।	কর্‌ল, খেল ইঃ। কর্‌লাম, কিন্তু 'কোরলাম' বা—'কোরলুম' নয়।
(২) 'ইয়াছে', 'ইয়াছ', 'ইয়াছি' এই-সকল বিভক্তির স্থানে 'এছে', 'এছ', 'এছি' (ক্রিয়া স্বরান্ত হইলে 'য়েছে' 'য়েছ' 'য়েছি'।)	করেছে, খেয়েছে ইঃ। 'করেচে,' 'খেয়েচে' নয়।
(৩) 'ইয়াছিল', ইঃ স্থানে 'এছিল' বা 'য়েছিল'	ক'রেছিল খেয়েছিল ইঃ।
(৪) 'ইতেছিল' প্রভৃতির স্থানে 'ই', বা 'ইতে'র লোপ--	কর্‌তেছিল বা কর্‌ছিল, ইঃ। কিন্তু 'কচ্ছিল' নয়। স্বরান্ত ক্রিয়া—খেতেছিল বা খাচ্ছিল, দিচ্ছিল, ইঃ।
৫। সমাপিকা ক্রিয়া ভবিষ্যৎকাল 'ইব'-র 'ই'-র লোপ	ক'র্‌ব, খাব ('কোরবো', 'খাবো' নয়।
৬। অনুজ্ঞা (ভবিষ্যৎ) 'ইও'-র 'ই'-র লোপ, 'অ'কারান্ত-ধাতু 'এ'কারান্ত।	করিও, ধরিও, খাইও স্থানে ক'রো, ধ'রো, খেয়ো। এ-ক্ষেত্রে 'কোরো', 'ধোরো' এরূপ লেখাও সঙ্গত কিনা বিবেচনার স্থল।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে মূল পরিবর্ত্তন অসমাপিকা বিভক্তির 'ই'-কার লইয়া। কোথায় 'ই'-কারের লোপ, কোথায় রূপান্তর হয়। আর সব পরিবর্ত্তন আনুসঙ্গিক ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য। সমাপিকা ক্রিয়াগুলি প্রায়ই অসমাপিকা ক্রিয়া ও 'আছ্‌' ধাতু লইয়া গঠিত, সুতরাং একই নিয়ম অনুসরণ করে।

আদিতে 'অ'কারযুক্ত ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত আকারে প্রায়ই 'অ'কারের একরূপ 'এড়ান' উচ্চারণ হয়, তাহা 'অ', 'ও', 'ই' লইয়া মিশ্রিত। এরূপ স্থলে 'অ'-কারের পরে (') এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের যে প্রথা আছে তাহা মন্দ না ; যেমন ক'রে, ধ'রে ইত্যাদি।

হইতেছে, উহার সকলগুলিই কি ব্যাকরণসঙ্গত না সকলগুলিই সাধারণ ইংরাজের জিহ্বা, কর্ণের সহিত পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসে? অথচ ব্যবহারের গুণেই সে সমুদয় সাহিত্যের সহিত অবাধে মিলিয়া যায়। লোকে কথায় বলে, ব্যবহারের গুণে পরও আপন হয়। ভাষার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। এইরূপ হয় না বলিয়াই আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দমালা পোষাকি কাপড়ের মত বিশেষজ্ঞের সিন্দুকে তোলা থাকে, এবং অব্যবহারে পোকায় কাটে। মূল কথা, আমাদের ভাষার প্রধান দরকার, উহার আভ্যন্তরীণ পুষ্টি। আমাদের প্রধান দোষ, কৃত্রিম সৌষ্ঠব-প্রয়াস ও বাহুল্য বচসা। আমাদের লেখায়, অনেক সময়, অর্থ কথার ভিড়ে পথ দেখিতে পায় না। সত্য কথা পরিমিত ভাষায় বলার জন্য যে শিক্ষা, সংস্কার ও (প্রমথ বাবু মাপ করিবেন) 'সাহিত্যিক' উপলব্ধির প্রয়োজন সে দিকে আমাদের তেমন আস্থা লক্ষিত হয় না। ভাষা, অন্ততঃ গদ্যভাষা, যেরূপ হওয়া উচিত, প্রায় তাহা হয় না। অর্থাৎ, উহা সাক্ষাৎ প্রয়োজন-মুখে সজোরে নিজের খাত কাটিয়া লয় না। আমাদের ভাষা, আঁকিয়া বাঁকিয়া, বাধা বিঘ্ন এড়াইয়া, সহজ অথচ ঘুর পথ খুঁজিয়া লইতে চায়। প্রমথ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন—"আসল সর্ব্বনেশে ভাষা হচ্ছে 'চন্দ্রাহত' সাহিত্যিকরা ইংরাজি বাক্যের যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করেছে, সে ভাষা।" * অবশ্য কোন শ্রেণীর রচনা উল্লিখিত-রূপ 'ত্রিদোষ'-আশ্রিত হইলে, তাহার উদ্ধারের আশা বড় অল্প। কিন্তু সাহিত্যিক হইলেই 'চন্দ্রাহত' হইবে এমন নয়, অনুবাদেরও ভাল মন্দ আছে, রান্না ভাল হইলে 'খিচুড়ি'ও সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য। অনুবাদের কথা যদি আসিল, তবে একথা বলিতে হইবে, যে, বর্ত্তমান অবস্থায় অনুবাদ—ভাষা, ভাব ও আদর্শের অনুবাদ—আমাদের একটা প্রধান সম্বল। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলের কৃতিত্ব এক বা অপর শ্রেণীর অনুবাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এ অনুবাদ যে শুধু ইংরাজি ও সংস্কৃতে নিবদ্ধ থাকিবে এমন নয়। আমাদের উপচয়নের ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রশস্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের, বিশেষ হিন্দী ও উর্দ্দুর সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। শেষোক্ত কারণে প্রমথ বাবুর কথিত 'মুসলমান আক্রমণ' হইতে একেবারে যে সুফলের অপ্রত্যাশা করি এমন নয়। যিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে উহা অনেক সময় কত সুন্দর ভাবে, কথায় কথায় তর্জ্জমা হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য উপনিষদ অনুবাদ করিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ এই-সকল রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বারা এমন ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে যে উহা বাঙ্গালা ভাষার একান্ত নিজস্ব জিনিস। অনুবাদের কথায় কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে আমরা প্রতিভার অগৌরব করিতেছি। কেননা তাহা হইলে এ প্রসঙ্গে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম করিতাম না। নব্য বাঙলার লেখকদের মধ্যে যদি কাহারও প্রতিভা অবিসম্বাদীরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারে ত এই তিন জনের। আমাদের বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান অবস্থায় নানা ভাষা হইতে আমাদিগকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে বাঙলা ভাষাতে লেখকগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রীতি ও শিষ্ট আদর্শের প্রতি যেন বীতশ্রদ্ধ না হন্। কেননা উহারা শিল্পের ন্যায় সাহিত্যের প্রাণ। যদি শিষ্টরীতির যথোচিত মর্য্যাদা না থাকিত তাহা হইলে ইংরাজি ভাষা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া, ও নানারূপ প্রাদেশিকতা, অপভাষা ও উচ্চারণবৈষম্য সত্ত্বেও, কখন সাহিত্যের এমন একটা অখণ্ড আদর্শ বজায় রাখিতে পারিত না—সুতরাং যদি আমরা ২৫।২৬টি জিলার মধ্যে লিখিত ভাষার একটা সমন্বয় স্থাপিত করিতে না পারি, এবং যাহার যাহা ইচ্ছা সেইরূপভাবে লিখি, তবে তাহা একটা বিশেষ পৌরুষের কথা নহে। ভাষার শৈশবে প্রতিভা-

* বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন যে খিচুড়ি ভাষার যদি নমুনার আবশ্যক হয়, ত উপরিউদ্ধৃত বাক্যটি তাহাই। কিন্তু আমরা বাস্তবিক মনে করি যে এইরূপ সাহস করিয়া লিখিতে লিখিতেই কথাবার্ত্তায় সহজ সুরটি সাহিত্যের মধ্যে ধরিতে পারিব।

চিত্রকর।

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
আজ সকালে পেয়েছি তার চিঠি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি-ক্রমে।

শালী লেখক বা dialect বিশেষের অনেকটা আধিপত্য খাটিতে পারে। কিন্তু ভাষা একরূপ গড়িয়া উঠিলে, ততটা স্বাধীনতা থাকে না, থাকা বোধ হয় উচিতও নয়। অবশ্য যখন আমরা বাঙলা ভাষার শিষ্ট আদর্শ রক্ষা করার কথা বলিতেছি, তখন কেহ যেন আমাদের কথা ভুল না বুঝেন। আমরা বাঙলা ভাষাকে 'বাবু' করিতে চাহি না, ইহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে প্রমথ বাবুর সহিত আমাদের সম্পূর্ণ এক মত। আমাদের বিশ্বাস আমরা বাঙলা সাহিত্যকে প্রাত্যহিক সহস্র প্রয়োজনের সহিত ভাল করিয়া মিলাইতে পারি নাই। জীবনের বিচিত্র কর্ম্মশালার অনেক প্রকোষ্ঠের দ্বারই আমাদের সাহিত্যের নিকট রুদ্ধ। একদিকে যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, সুকুমার সাহিত্য, রাজনীতি ও সভ্য জগতের নানা উচ্চতর ব্যবসায়ের নিমিত্ত সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই হাট, বাজার, মাঠ, পথ, ঘাট, আসর, আখড়া, অন্তঃপুর, এক কথায় আমাদের সনাতন দেশীয় জীবনের সহস্র আচার ব্যবহার ও মেলামেশার মধ্য হইতে সজীব, চলিত ভাষার বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, সাহিত্যের শিষ্টরীতি বজায় রাখিলে, বাঙলার সকল প্রদেশ হইতেই, শুধু শব্দ নয়, অনেক সজীব idiom, সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। আমাদের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা শুধু কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকিবে এরূপ কোন কথাই নাই।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বলিয়া সাহিত্যের কোন সোনার কাঠি, রূপার কাঠি নাই। ইংরাজির দেখিলেই বুঝা যায়, মানসিক প্রকৃতির রুচি ও বিষয় অনুসারে, কোন লেখক সাধু শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন, কোন লেখক চলিত শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন। কৃতী লেখকের হাতে উভয়বিধ রচনাই সজীব হইয়া উঠে। মূলে দুইটি জিনিসের প্রধান আবশ্যক। লিখিবার মত একটা বিষয় থাকা চাই ও লিখিবার একটা নিষ্ঠা থাকা চাই। এই দুটি জিনিস থাকিলে, শিক্ষিত লেখক যেরূপ ভাষায়ই লিখুন না কেন, তাহা কখনই অকিঞ্চিৎকর হইবে না। তবে ভাষায় যথার্থ ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে মূল মন্ত্র, তাহা স্বতন্ত্র। উহার নাম প্রতিভা। নব্য বঙ্গভাষায় দুই চারিটি প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যতে আরও হইবে। আমাদের সাধারণের কর্ত্তব্য যে ভবিষ্যতের প্রতিভাবান লেখকের জন্য আমরা ভাষার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারি। কাল পূর্ণ হইলে যখন সেইরূপ প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইবে, তখন দেখিতে পাইব যে তাঁহার হস্তে এই আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গভাষা পুরাণ-বর্ণিত মন্ত্রপূত দৈবাস্ত্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবে, এবং তাঁহার লিখিত বা কথিত বাণী, সাধুচলিত শব্দ নির্ব্বিশেষে, শ্বেত পক্ষযুক্ত নিশিত সায়কের ন্যায় বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিবে।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মূর্ত্তি সংগ্রহ

"পরেষামুপকারার্থং যজ্জীবতি সজীবতি।"

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-কলাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহোদয় আশ্বিনের "প্রবাসী" পত্রে "পত্তন" নামক প্রস্তাবে, অধ্যাপক হেভেলের নবপ্রকাশিত "ভারতীয় স্থাপত্য" নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতের যে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলা ঠিক আমাদের, সেইগুলাকেই ফাগুর্সনপ্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে মত দিয়া আমরা কতকাল আমাদের নয় বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছি;—আর আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়, ইহাই একজন সাহেব আমাদের হইয়া জগতে ঘোষণা দিতেছেন। ইহার পর আমরা যেন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন করিতে না চলি।" (১০১ পৃষ্ঠা)

"আমরা" বলিতে যদি যে দুই একটী লোক প্রাচীন শিল্পের দিকে সময় সময় দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন শুধু তাঁহাদিগকেই বুঝায়—অপর সাধারণ ত "কেবা আখি মেলে" বলিয়া নিস্পন্দ—তাহা হইলে উদ্ধৃত বাক্যের প্রথমাংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফাগুর্সনপ্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আর এক হিসাবে "আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়" বলিয়া অনেকদিন পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হেভেলের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে দুই একজন বাঙ্গালী এ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমার স্মরণ হয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিয়া, বোম্বাইএর "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রে ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফাগুর্সনই হউন, মিত্রই হউন, আর হেভেলই

হউন, আমরা অন্ধভাবে কাহারও অনুসরণের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাদ দিয়া, শুধু ফাগুসনপ্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণকে এবং অধ্যাপক হেভেলকে লইয়া, ভারতীয় স্থাপত্যের আলোচনার "পত্তন" সমীচীন মনে হয় না।

উদ্ধৃত বাক্যের উপসংহারে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সংশয় হয়। হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে আমাদের (ভারতবাসীগণের) নয়কে হয় বলিয়া ঘোষণা দিতেছেন বলিয়াই কি কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী আর নিজেকে "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের" অধিকারী ভাবিতে পারিবেন না? "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যে"র অর্থ কি? বিশ্বকর্ম্মা ভারতের আদর্শ শিল্পী। প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন-নিচয়ের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, তাহাই উপকথায় বিশ্বকর্ম্মার কৃত বলিয়া কথিত। সুতরাং "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্য" অর্থ ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের মহিমাপ্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে তৎপ্রতি ভক্তি সঞ্চারিত করা। হেভেল সাহেব পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়াই কি এদেশের লোকের "নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী" ভাবিবার অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে? শুধু তাহাই নয়, "গর্ব্বভরে অনুসন্ধান সমিতি ও মুর্ত্তিভবন গঠন"ও নিষেধ। এখানে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ খলিফা ওমারকেও পরাভূত করিয়াছেন। খলিফা ওমার, কোরান থাকিতে অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া, এলেকজেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার পোড়াইবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভবিষ্যতে নূতন গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে তিনিও নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। হেভেল সাহেবের নূতন গ্রন্থ হাতে পাইয়া অবনীন্দ্রবাবু ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে গ্রন্থরচনার কল্পনা বা তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উপাদান সংরক্ষণের আয়োজন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। খলিফা ওমারের অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও মুসলমানেরা গ্রীস ও রোমের দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়েন নাই; পরন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দীক্ষায় য়ুরোপবাসীর গুরুগিরি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রবাবুর "পত্তন" পড়িয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকার সম্বন্ধে সহসা দাবী ত্যাগ করিবেন, এরূপ মনে হয় না।

"পত্তন"প্রবন্ধে "অনুসন্ধান সমিতির" ও "মুর্ত্তিভবনের" পাণ্ডাদিগের সম্বন্ধে ব্যবহার পর্ত্তন করিয়া যুগপৎ অপর একখানি পত্রিকায় —আশ্বিনের "ভারতীতে" (৫৮৮—৫৯১ পৃঃ) অবনীন্দ্র বাবু "প্রাণ প্রতিষ্ঠা" করিয়াছেন। "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" প্রাণের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। যথা

"এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে Havell সাহেবের Indian Architecture নামক পুস্তকের সমালোচনা অসম্ভব এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। কিন্তু মুর্ত্তিভবন-স্থাপন এবং যাদুঘরের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ানোতে যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা সেই কথাই বলিতে চাহি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে কথাটা "পত্তনে" এবং "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" জ্বালাময়ী ভাষায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হেভেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই অবনীন্দ্রবাবুর প্রাণে জাগরূক ছিল। অবনীন্দ্রবাবুর ন্যায় স্বনামধন্য ভাব-নায়কের কথা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে। যাঁহাদিগকে একরূপ প্রাণে বধ করিবার জন্য "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার (অবনীন্দ্র বাবুর) প্রত্যেকটি কথা বিশেষ রূপে বিচার করিয়া, যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করেন, এবং যাহা বর্জ্জনীয় বিবেচিত হয়, সাধারণের নিকট তাহার সম্বন্ধেও একটি কৈফিয়ৎ দেন। এই হিসাবেই এই প্রস্তাবে "প্রাণ প্রতিষ্ঠার"ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ—মুর্ত্তি-অনুসন্ধানকারীদিগের বিরুদ্ধে অবনীন্দ্র বাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন

"যে দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধার করিতেছি, সেই দীঘির ধারেই হয়ত মূর্ত্তি-রচয়িতার কোন বংশধর উপবাসে মরিতেছে, তাহার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি কোন দিন পড়িয়াছে?"

"ভাঙা মূর্ত্তির ধূলা ঝাড়িয়া তত লাভ নাই, যত লাভ যাহারা মূর্ত্তিকে গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়াতে।"

"যাহারা মূর্ত্তি গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়া" মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহা করিবে কে? যাহার শক্তি আছে সেইত করিবে। যাঁহারা এখন মফস্বলে নিয়মমত মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকের সহিতই আমার পরিচয় আছে। ভাস্কর বা চিত্রকরগণের কথা দূরে থাক, নিকট আত্মীয়গণের "জীর্ণদেহের ধূলা এবং শীর্ণ মুখের মলিনতা" ঘুচাইয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁহাদের নাই। তাহার উপর সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য অতৃপ্ত অনুসন্ধান-স্পৃহা তাঁহাদের জীবনকে ভারবহ করিয়া রাখিয়াছে। অবনীন্দ্র বাবু তুলি হাতে করিয়া, বাস্তব মানব-আকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, যে ভাবে চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, লেখনী লইয়াও এবার মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সেইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। "যদি সাহেবের মত মূর্ত্তি সংগ্রহেরই বাতিক আমাদের সম্পূর্ণ চাগিয়া উঠে" এই নিষ্ঠুর ভাষা যখন তিনি প্রয়োগ করিতেছিলেন, তখন কি তাঁহার স্মরণ ছিল না যে, বেসরকারী মূর্ত্তি সংগ্রাহকগণের আর্থিক বিশেষ কোন সুবিধা হওয়ার আশা নাই। তাঁহারা যে ভাবের প্রেরণায় কষ্টলব্ধ অবসর সময়টুকু কষ্টকর মূর্ত্তি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যয় করেন, সেই ভাবকে "বাতিক চাগা" বলিয়া উপহাস করা চিত্তবৃত্তির আলেখ্য-রচয়িতা শিল্পীর মুখে শোভা পায় না।

মূর্ত্তি-অনুসন্ধানকারীগণের মধ্যে যাঁহারা "দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধারের" "যত্ন করেন" তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনকে জানি, যিনি ধনী বলিয়া কথিত হইতে পারেন এবং যাঁহার দুই চারিখানা দামী ছবি কিনিয়া দুএকজন ভাস্কর বা চিত্রকরকে কিছু উৎসাহ দানের শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন রুচি আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় সে রুচি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, য়ুরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালা এবং শিল্পশালা দর্শনের ফলে তাহা পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। ইহার উপরে একটি জিনিসে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে—সেটী ইতিহাস। অবনীন্দ্র বাবু "পত্তনে" বা "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" ইতিহাসের নামও করেন নাই। যাঁহারা শিল্পী বা শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদের জন্য যেমন কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত, যাঁহারা ঐতিহাসিক বা ইতিহাসানুরাগী তাঁহাদের জন্যও কর্ম্মক্ষেত্র তেমনি উন্মুক্ত। উচ্চ অঙ্গের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণ কখনও ইতিহাসে অবজ্ঞা করেন নাই। রস্কিনের Stones of Venice নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম অংশের নাম Foundation বা "পত্তন"। এই "পত্তনে"রও আলোচ্য বিষয় ইতিহাস। যাঁহারা ইতিহাসের উপাদান জ্ঞানে মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া জনসমাজে তাঁহাদিগকে খাটো করিয়া শিল্পের

সিটিব..এজের ছাত্রেরা আমতার বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্য করিতেছে। (হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে)।

বিশেষ যে কিছু উপকার হইবে তাহা মনে হয় না। বরং তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, আধুনিক শিল্পীদিগের কিছু সুবিধা .করা যাইতে পারে। যাঁহারা "রমেশ ভবনের" উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা বোধ হয় অবনীন্দ্র বাবুর মনোমত মন্দির গড়িতে রাজি হইবেন। যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চার সুবিধার জন্য "মূর্ত্তি-ভবন" প্রতিষ্ঠার কল্পনা রাখেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য যে-সকল নিদর্শন নাই তাহাদের প্রতিকৃতি রাখিতে বাধ্য হইবেন এবং প্রতিকৃতি-গঠন-নিপুণ শিল্পী নিয়োগ করিতেও বাধ্য হইবেন। সুতরাং "মূর্ত্তি-ভবন" প্রতিষ্ঠার স্পৃহা যদি কোথাও জাগিয়া থাকে, তবে তাহাকে অভিসম্পাত না করিয়া, আশীর্ব্বাদ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ। মূর্ত্তি সংগ্রহের ফলে কিরূপে জাতীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বারান্তরে দেখাইব।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

কষ্টিপাথর

ভারতী (আশ্বিন)

বন্যাদায়—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

দামোদরের উদরে আজ এ কী ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী!
বাঁধ ভেঙে, হায়, হন্তা হয়ে বন্যা এল সর্ব্বনাশী।
রাঙামাটির মুলুকে আর রাঙামাটির নাই নিশানা,
চারিদিকে অকূল পাথার—চারিদিকে জলের হানা।
দেউল-গুলোর দুয়োর ভেঙে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুৎ দাঁড়ায় নি কেউ কবাট ধ'রে।
নীচু হওয়ার নানান্ দুঃখ—খুলে কি আর বল্‌ব বেশী,
বর্ষা হ'ল কোন্ পাহাড়ে—ডুবল নাবাল বাংলা দেশই।

* * *

এ দামোদর গোবিন্দ নয়,—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হৃষ্ট চিতে!
জগৎ-হিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকূল ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা,
এই মহিষের বাঁকা দু শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
চুসিয়ে চলে ডাইনে বামে সোনার দেশের পাঁজর খসে।
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যেজন পালন করে;
লম্বোদরী জন্তলা এ—গজ গিলেছে দম্ভ ভরে!

* * *

মুছে দেছে গ্রামের চিহ্ন চেটে নেছে ভিটের মাটি,
মরণ-টানে টান্‌ছে ডুরি সাতটা জেলায় কান্নাহাটি।
ধনে প্রাণে ঢের গিয়েছে,—হিসাব তাহার কেউ জানেনা,
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—খবর তাদের কেউ আনে না।
আলগা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে
পুড়ছে রোদে উপবাসী ভিজছে মল-বৃষ্টিধারে,

আমতার নিকটস্থ বালুচরের বন্যাপীড়িত লোকেরা সাহায্যলাভার্থ আর এক গ্রামে আসিয়াছে। (হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে)।

হারিয়েছে কেউ পুত্রকন্যা হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়,
আজকে আধা-বাংলাদেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়।

*　　　*　　　*

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায় নি দিশা,
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা ;
কত নারী বিধবা আজ, অনাথ কত সদা-বধূ,
কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎফুলের মধু।
বর-ক'নেতে ভাস্‌ছে জলে হলুদ-বরণ সুতা হাতে,
ফুল-শেযে কার কাল এসেছে, বান এসেছে বিয়ের রাতে।
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার ফোকর মৌচাকেতে,
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক' খেতে।

*　　　*　　　*

বট-পাকুড়ের ফেঁক্‌ড়িগুলো অবশ হাতে পাকড়ে ধরে
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে।
অবাক হ'য়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে।
'হাল্‌' পুছিলে,—জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধি-হত।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবী,—আজকে এদের বন্যাদায়।

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে একলা এল কোন্ গাঁ হ'তে জলের তোড়ে।
ভুল্‌তে ধরে ঠেক্‌ল ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁক্‌ড়ে পায়া জলের তলে মরা মায়ের অমর মায়া।
লুপ্ত আজি পীযূষ-ধারা মৃত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলের ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে ?
এক রাতে কার স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায়,
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ ?　আজ অভাগার বন্যাদায়।

*　　　*　　　*

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁতরে যে ফের ফিরল গাঁয়ে
বাঁধা-গরুর খুল্‌তে বাঁধন তুল্‌তে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি,
ফিরতে সে আর পারে নি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি' ;
নেই বেঁচে সেই চাষার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,
আছে তাহার কোলের ছেলে আছে তাহার আতুর পতি ;
তাদের কে আজ পথ্য দেবে আজকে তারা নিঃসহায়,
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায়।

*　　　*　　　*

আসল গেছে ফসল গেছে গেছে দেশের মুখের ভাত,
সাম্‌নে 'পূজো'—নূতন ধুতির সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত।

কোথায় গেছে হালের বলদ কোথায় গেছে দুধের গাই,
কার ভিটেতে কে রয়েছে,—কিছুরই খোঁজ খবর নাই।
উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূন্য-হওয়ার শোকে,
শুন্‌ছে না সে কিছুই কানে দেখছে না সে কিছুই চোখে;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

* * *

অনুজ-সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য্য করে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে,—স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।
আজকে যেন প্রলয়-বুকে সুপ্ত জ্যোতির্লেখা হাসে
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা?
সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আজ্‌কে শোনো উঠছে কেঁদে;—
বধির হ'য়ে থাক্‌বে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত,—যেমন ধারা কন্যাদায়,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায়।

* * *

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাঁদের পুণ্যে লক্ষপ্রাণী দেখবে ফিরে সুবৎসর;
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়,—সপ্তকোটির এদেশটিতে।
ভরতে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।
শাকান্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে।
তুষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টি ভিক্ষা জয়-হবে দুর্ভিক্ষ প'রে।
গরীব-সেবাই ঈশ্বর সেবা,—ভারতবাসী ভুলছ তাও?
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

* * *

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা-জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে ধরম রাখে;
তারাও আজি মর্ত্যে বসি চিত্ত-আরাম স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ-শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে।
সার্থকতা দ্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়া মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হ'তে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয়।
যুগে যুগে পুণ্যে খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ো নাগো; রক্ষা কর বন্যাদায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবীড়ী উপাদান—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা আর্য্য এবং দ্রবিড় সভ্যতার মিশ্রণে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উপর দ্রবিড় জাতীয়দিগের ভাষার প্রভাব কতখানি কেবলমাত্র বঙ্গভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের জন্যও এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তারের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে-সকল দ্রবিড়-জাতীয়েরা বাস করিত, তাহাদের ভাষা এখন বাঙ্গালা। কাজেই পূর্ব্বকালে কোন্ জাতির কি ভাষা ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্ধ্র দেশের রাজারা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আর্য্য-ভাষার উপর তাঁহাদের ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়াছে যে, যে-সকল আর্য্যেতর প্রচলিত শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, চেষ্টা করিয়া সে-সকল শব্দের অর্থ দিবার জন্য আমরা আদিম শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়া, সংস্কৃত শব্দের কাছাকাছি করিয়া তুলিয়াছি। বঙ্গদেশে এমন অসংখ্য গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা একালে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। সকল নামেরই যে অর্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত।

দ্রবিড় জাতির সহিত অত্যধিক পরিচয়ের পর সংস্কৃত ভাষাতেও উহাদের অনেক শব্দ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছিল। (১) প্রাচীন সংস্কৃতে অশ্বের "ঘোটক" নাম ছিল না। তেলেগু ভাষার "গুর্‌রা-মু" ("মু" সকল বিশেষ্য শব্দেই প্রায় লাগে) অন্ধ্র-রাজাদের আমলে "ঘোড়া" হইয়াছিল; গুজরাটে "ঘোড়া" পাওয়া যায়। "ঘোড়া" ক্রমে "ঘোটক" হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও বরিশাল-অঞ্চলে "ঘোড়া"র উচ্চারণ তেলেগুর "গুর্‌রা"র অনুরূপ। (২) মলয়ালম্ এবং তামিল ভাষায় পাহাড়ের নাম "মলৈ"। "মলৈ"কে (উহার "গিরি" অর্থ থাকা সত্ত্বেও) "গিরি" শব্দের যোগে "মলয়গিরি" করিয়া তুলিয়াছি। (৩) "মীন" পাণ্ড্য-জাতিদিগের কুলদেবতা। বৈদিক যুগেরও বহু পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত মৎস্যর "মীন" নাম পাওয়া যায় না; তাহার পর কিন্তু মৎস্য-অবতারের নাম একেবারে "মীন অবতার", ওড়িশার কন্ধদিগের ভাষাতেও মাছের নাম "মীন" এবং কানাড়ার ভাষাতেও ঐ অর্থে "মীনু"রূপ পাওয়া যায়। (৪) "কর্পূর" জিনিসটা দক্ষিণ দেশে উৎপন্ন এবং সেখান হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়াছিল। তামিলের "করপ্‌পু" সংস্কৃতে "কর্পূর" হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে টিসিয়াস্ ভারতবর্ষ হইতে আমদানি এই পদার্থকে ঠিক "করপ্‌পু" বলিয়াই লিখিয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশের ভাষাতেই তামিলের "কু" প্রত্যয় "কা," "কে," "গ" প্রভৃতিরূপে হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ওড়িয়ায় প্রচলিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল শব্দকোষের কথায় নয়, ভাষার বিশেষত্ব যে ব্যাকরণে, তাহাতেও দ্রবিড়ী প্রভাব দেখিতে পাইতেছি।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত কয়েকটি আর্য্যেতর শব্দ—

১। আকালি (তামিল)—ক্ষুধা=আকাল (বাঙ্গালা=দুর্ভিক্ষ। শব্দটির "কাল" কথার সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। ২। কোকা ও কোকি (ওরাঁও)—ছোট ছেলে ও মেয়েকে বলে; যথা—কোকাই-হাদু, কুকুকি-হাদু=খোকা ও খুকী (বাঙ্গালা); পূর্ব্ববঙ্গে কোকা ও কুকি ঠিক অবিকল প্রচলিত আছে। ৩। গোড়া (তেলেগু)—ঘরের ভিত ও দেওয়াল—বাঙ্গালায় ঘরের ভিত অর্থে ব্যবহার না থাকিলেও ভিত্তি বা মূল অর্থে 'গোড়া' কথার ব্যবহার আছে, যথা—আগাগোড়া; দ্বিতীয় অর্থাৎ দেওয়াল অর্থের "গোড়া", "গোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায়" কথায় পাওয়া যায়। ৪। চাপা (তেলেগু)—তেলেগু এবং তামিল ভাষাতে "চ" এবং "শ"এর এক উচ্চারণ; তাহাছাড়া "চপ" লিখিলে "চাপা" উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালায় উহা "শপ" উচ্চারিত হইবে; ইহার অর্থ "মাদুর"। ৫। চক্কনি (তেলেগু)—সুন্দর অর্থে, যেমন, সুন্দরী স্ত্রী তেলেগুতে

হইবে "চক্‌কনি" স্ত্রী। এই "চক্‌কনি" হইতে বাঙ্গালার চিকণ; দৃষ্টান্ত—"চিকণ কালা"। সুন্দর অর্থে "চিকণ" বাঙ্গালায় খুব ব্যবহৃত। ৬। "ঝিঙ্গা" (মুণ্ডা)—এই তরকারির ফলের সংস্কৃত নাম "জ্যোৎস্নী"। ৭। তা-লা (তেলেগু)—তালৈ (তামিল) =মাথা, বাঙ্গালায় "মাথার তেলো"তে এই "তা-লা" রহিয়াছে। এতদিন সংস্কৃত 'তালু' হইতে 'তেলো' আসিয়াছে, মনে হইত। 'তালু' কিন্তু বদনবিবর-মধ্যগত 'টাকরা' নামক স্থান। ৮। তাল্লি (তেলেগু)—তায় (তামিল)=মা; বাঙ্গালার "তালই" ("তাওই") সম্পর্কে এই পিতৃ-মাতৃবৎ শব্দের চিহ্ন আছে। ৯। তোটা (তেলেগু) —তোট্টম্ (তামিল)=বাগান; অনেক গাছ একসঙ্গে থাকিলে, ওড়িয়াতে "তোটা" বলে, যেমন "আমতোটা" শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। ১০। নালু, নালুকা (তামিল)=জিভ্; বাঙ্গালায় "নোলা"। ১১। নি-জ (তামিল)=সত্য; বাঙ্গালা নিজ্জস্ (সত্য ও ঠিক)। মালদহের "নিচোড়"। [নিজ্জস কি নির্য্যাসের অপভ্রংশ নহে ?] ১২। পালু (তেলেগু)—পাল্ (তামিল)=দুধ; বাঙ্গালায় "পালান" কথায় উহার চিহ্ন রহিয়াছে। ১৩। পট্টু (তেলেগু ও তামিল)=রেশম ও রেশমের কাপড়। আমাদের "পাট" এবং সংস্কৃতের "পট্টবস্ত্র" এই পটুটু হইতে। [পটু নামক পশ্মী বস্ত্রও আছে।] ১৪। পিল্লই (তামিল)—পিল্লা (তেলেগু) =ছেলে; উড়িয়াতে ঠিক্ "পিলাই" আছে; পূর্ব্ববঙ্গে "পোলা" ব্যবহৃত; বাঙ্গালায় "ছেলে-পিলে"। ১৫। পুলই বা বুলই (তামিল)—বিল্লি (তেলেগু)—বিলেই (ওড়িয়া)—প্রাচীন পালিতে, বৈদিক্ ও প্রাচীন সংস্কৃতের "মার্জ্জারকে" "বিলার" এবং "বিড়াল"-রূপে পাই, "বিড়াল" শব্দ অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেই ব্যবহৃত। [মালদহে বিড়ালকে বিলাই বলে।] ১৬। পৈয়ন্ (তামিল)—পৈয় (তেলেগু) —পুঅ (ওড়িয়া)=পো (বাঙ্গালা)। ১৭। বানা (তেলেগু) =বৃষ্টি; ইহা হইতে আমাদের বৃষ্টি বা বৃষ্টিজনিত জলবৃদ্ধি বা "বান" হইয়াছে। [বন্যা হইতে নহে কেন ?] ১৮। বা-না (তামিল)=ধ্বজা; ওড়িয়াতে ঠিক্ এই অর্থেই ব্যবহৃত, চণ্ডীদাসেও এই অর্থের ব্যবহার পাই। ১৯। বেদুরু (তেলেগু) =বাঁশ; এই বাঁশের রঙ্ হইতে সংস্কৃত "বৈদূর্য্য"। ২০। বঁটি (মুণ্ডা)—মুণ্ডাদের কেবল এই দ্রব্য-নামটি বাঙ্গালা দেশে গৃহকর্ম্মের অস্ত্রবিশেষে পাওয়া যায়। ২১। বিটি (তামিল) —অন্তস্থ "ব"এর উচ্চারণ করিতে হইবে; ইহার অর্থ "ঘর"; ইহা হইতে আমাদের "ভিটে"। [পূর্ব্ববঙ্গে ভিটি বা বিটিই বলে।] ২২। মাখন্ (তামিল)=পুত্রের আদরের ডাক; বাঙ্গালার আদরের "মাখনলাল" প্রভৃতি কথায় ঐ অর্থই মনে পড়ে। [?] ২৩। মো-ট (তামিল)—উচ্চারণ "মোটা"=বোঝা বা তল্পি; সম্বলপুর অঞ্চলে ঠিক্ তামিল ধরণে "মোটা" উচ্চারিত হয়। ২৪। য়িটু (তামিল)—ইটু—ঠিঠু=বাজে; পূর্ব্ববঙ্গে "বাজে" শব্দে কোথাও কোথাও "ঠা-ঠা" ব্যবহার আছে ("সধবার একাদশী")। ২৫। গুল্ (তামিল)—এটি শব্দ নহে; বহুবচন-বোধক প্রত্যয়। বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া ভাষায় তামিলের গুল্ (গুলি) বহুবচন বুঝাইবার জন্য "গুলি" "গুলা" প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। আসামের সীমানার কাছে এই "গুলা" "গিলা"রূপে ব্যবহৃত হয়। আসামের ভিতরে এই "গিলা" আবার "গিলাক" হইয়াছে। খাঁটি আসামে "গিলাক" পাওয়া যায় না; কিন্তু "বিলাক" পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত মূল-হারাণো শব্দ—

১। উসাস্—হাল্কা। ২। ওলা—নামা। ৩। কাড়ে—বাহির করে। ৪। কাঁথ—দেওয়াল। ৫। কৈরোয়াল—বৈঠা, দাঁড়। ৬। কোয়ালি—গান। ৭। খুরি—ছোট বাটী। ৮। গোহারি—দোহাই দেওয়া। ৯। ছেলি—ছাগল। ১০। টাবা—লেবুবিশেষ। ১১। নেউটিয়া—ফিরিয়া। ১২। পাছড়া উত্তরীয়। ১৩। বাট—পথ। ১৪। বুলা—বেড়ান। ১৫। বানা—ধ্বজা। ১৬। বাহুড়া—ফেরা। ১৭। ব্যাজ সুদ। ১৮। লদা—বোঝাই করা। (চণ্ডীদাস)। ১। উত্তর—বিলম্ব। ২। কাছাড়—এখনকার আছাড় অর্থে; ওড়িয়াতে "কচারি হেবা" রূপে আছে। ৩। খাড়া ডাটা। ৪। জোহার—প্রণাম। ৫। পেলাপেলি—ঠেলাঠেলি। (ধর্ম্মমঙ্গল)।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি প্রচলিত দেশী বা অনার্য্য শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—(১) আঁটকুড়িয়া—বা আঁটকুড়ে; (২) কিরিয়া বা দিব্যি, শপথ, কিরা; (৩) ও—প্রত্যুত্তরজ্ঞাপক; (৪) ওগো, গো—সম্বোধন-জ্ঞাপক; (৫) ঘরা (সূর্য্যের তাপ)—এই অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল; এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে; (৬) গাছ; (৭) গাড়ু; (৮) গুণ্ডা—বা গুঁড়া; (৯) গোটা—এক; অখণ্ড এক; (১০) কছার—যেখানে বন বেশী নাই, কিন্তু অল্প অল্প আছে, অথচ চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম; অনেক স্থলে উদ্ভিদ্ বিশেষের ঝোপ জঙ্গলকে 'কসাড় বন' বলে। এই অর্থে আসামের প্রান্তস্থিত "কছার" বা কাছাড় দেশের নামের উৎপত্তি; (১১) পাতিল—ছোট হাঁড়ি; (১২) পিণ্ডা—পিঁড়ে, দাওয়া; (১৩) বেঁৎৎ—সাবধান করিয়া ধরার নাম; পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের ভাষায় ব্যবহৃত আছে; (১৪) পেঁঠি বা পাঁঠী; পাঁঠা শব্দ ওড়িয়ায় নাই; (১৫) পোক—পোকা; (১৬) ডড়ুম—বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলে [ও পূর্ব্ববঙ্গে] এক শ্রেণীর চা'লভাজাকে "ডড়ুম" বলে।

কতকগুলি অত্যন্ত ব্রীড়াব্যঞ্জক অশ্লীল শব্দ ওড়িশায় এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই। কোন কোন ঐরূপ অশ্লীল ওড়িয়া শব্দ নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশ ডিঙ্গাইয়া মালদহে অথবা পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে। এমন অনেক অনার্য্য শব্দ একদিকে ওড়িশায় প্রচলিত আছে এবং অন্যদিকে আবার একেবারে আসামে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আউ (চালদা), জুই (আগুন) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। শুনিয়াছি, জুই কথাটি নাকি কাশ্মীরেও ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুলির কাল্পনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি সযত্নে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, এবং প্রতিবেশী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া যথার্থ ব্যুৎপত্তি স্থির করা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইবে।

ভারতী (আশ্বিন)

আর্য্য-নারীর প্রাচীন অবস্থা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল "নারী"; এই নারী শব্দ "নর" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই।

যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য "নারী" শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী। যাঁহারা পুরের বা গৃহের কার্য্যই আপনাদের মনের মত করিয়া স্বাধীনভাবে চালাইতেন, তাঁহাদের নাম ছিল "পুরং-ধি"।

নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না। ঋগ্বেদের দিনের নারীরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইতেন না। দ্রুতগমনের বিশেষ দৃষ্টান্ত দিবার জন্য ঋগ্বেদে (১, ৫৬, ২) উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা যেমন

দ্রুতপদে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, স্তোত্রসাহায্যে স্তোতাও সেইরূপ দ্রুতপদে ইন্দ্রের স্বর্গে আরোহণ করুন।

বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ ছিল না এবং আর্য্যনারীরা যে ইচ্ছা-মত অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে চিরকাল কুমারী থাকিতে পারিতেন, বহু পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্তও যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হয়। সকলেই জানেন যে পূর্ব্বকালের স্মৃতির বিধানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির কাহারও "গোদান" নামক সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ বিবাহ হইতে পারিত না। বৈদিক ভাষায় গোদান শব্দটির অর্থই হইল দাড়ি-গোঁফ; দাড়ি-গোঁফ উঠিবার পরের সংস্কারটি কখনও পুরুষের পক্ষে অল্প বয়সে হইতে পারিত না। বিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রাদিতে যে-সকল বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ভিন্ন সে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

খাঁটি বৈদিক ভাষায় "বর" অর্থই হইল wooer। বয়স্কা পত্নী-সংগ্রহ করিতে হইলেই পুরুষকে বর হইতে হয়।

বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকটসম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও কোন্ কোন্ স্থলে বিধবা-বিবাহ হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এবং বৈদিক সাহিত্যে ঋষিদিগের পারিবারিক জীবনের যতটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে একপত্নী-গ্রহণই সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল এবং আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণের বহু পত্নী থাকিলে প্রথমটিই খাঁটি পত্নীপদবাচ্য হইতেন, এবং তিনিই যজ্ঞের অধিকারিণী হইতেন। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুত্রবতী অন্য কোন ভার্য্যা পত্নীসংজ্ঞা লাভ করিতেন। পত্নী ব্যতীত অন্য বিবাহিতা স্ত্রীরা কেবল জায়া নামে আখ্যাতা হইতেন।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র ছিল। কুমারী অবস্থায় নারী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, এবং বিবাহের পর তিনি যে-সকল উপহার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল, এবং তিনি সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন। নারীরা যখন মন্ত্র রচনা করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাব ছিল, এ কথা বলা চলে না। নারীরা সকলেই নৃত্য এবং গীত শিক্ষা করিতেন।

বৈদিক যুগে পুত্রকন্যাদিগের নিকট মাতার সম্মান বড় অধিক ছিল। কোন পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ না থাকিলে ভগিনীকে ভ্রাতার রক্ষণাধীনে থাকিতে হইত; ভ্রাতা না থাকিলে "ভ্রাতৃব্যেরা" রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এ যুগে Cousin অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ প্রচলিত নাই বলিয়া বৈদিক ভাষার ভ্রাতৃব্য কথাটির প্রচলন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সত্য যুগের কথা হইলেও বৈদিক যুগে পতিতা রমণী ছিল; এবং তাহারা বড় বড় ঋষিদিগের অস্পৃশ্যা ছিল, এ কথা বলা চলে না। পতিতারা বিশ্ বা আর্য্যশ্রেণীর লোকসাধারণের ভোগ্য ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছিল "বিশ্যা"। শব্দটির ব্যুৎপত্তির কথা বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শব্দের ই-কার স্থানে এ-কার হইয়া গিয়াছিল। বিশ্যার অন্য নাম ছিল "রামা" এবং "ন-গ্না"। "গ্না" শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল সম্মানিতা মহিলা, এবং পরে অর্থ হইয়াছিল দেব-পত্নী। যাহাদিগের পক্ষে গ্না হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহারাই হইত ন-গ্না। কালক্রমে ব্যবহারের নির্লজ্জতার হিসাবে নগ্না অর্থ লজ্জাহীনা হইয়াছিল, এবং ঐ শব্দের একটি পুংবাচক নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়া পরিচ্ছদশূন্য অর্থে "নগ্ন" শব্দ রচিত হইয়াছিল।

কৈফিয়ৎ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—

(Terza Rima ছন্দে)

শুনাব নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস ॥

যৌবনে বাসনা ছিল দুনিয়ার ছবি
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি ॥

ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে
আকাশের নীল আর অরুণের লাল।
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে ॥

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবীর গুলাল,
অথচ ছিলনা বেশি অন্তরের ঘটে।
এ কবি ছিলনা কভু রাণীর দুলাল ॥

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে ॥

হেথায় হয়না কভু গুরুর আকাল।
পড়িনু কত না জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল ॥

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ,
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ।

বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।

নেত্রপথে এসে দুটী সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে,—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি।
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে ॥

ফলকথা কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি ॥

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর
সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,
সুরু হল সেই হতে সংসার-সমর ॥

পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিলনা স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ ॥

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানে হৃষিকেশ।
কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে!

এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শঃ নিকেশ॥

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক।

এ সব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন্ আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর॥

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান॥

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ।
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে॥

এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ সুর একধারে করিয়া নিক্ষেপ॥

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ-প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ॥

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"॥

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ'।

বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ—বীরবল—

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নব সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহলে যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই নব সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য নয়।

পুরাকালে মানুষে যা কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দুচারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহু-সংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়, কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো—কি যে বেরলো তাতে বেশি কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয় লিখতে হয়। আমাদের নব সাহিত্যে কোনরূপ "শ্রম বিভাগ" নেই—তার কারণ যে ক্ষেত্রে "শ্রম" নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সেস্থলে তার বিভাগ আর কি করে হ'তে পারে? তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশ কাল পাত্রের সমবায়ে এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই।

লেখকেরা বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে নিবৃত্ত না হলে বঙ্গসরস্বতীকে পথে দাঁড়াতে হবে। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে "বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী"। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে—দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না।

ছবি ফাউ দিয়ে মেকী মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। নর্ত্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্য্যাদা বাড়ে না। যেদিন থেকে বাঙ্গালাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পর দিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। আমার বিশ্বাস এদেশে একালে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ এবং আলেখ্য ব্যাখ্যানে

নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ ভুল দৃষ্ট হয়। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম। আর্টের ক্রিয়া অনুসরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্চে, প্রতিভার চরণে শিকলি পরাণো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনও অবসর নাই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্য-সামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিম্বা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বল্‌তে পারেন, যে, "চিত্রে আমরা গণিত শাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।" প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আস্‌ছে, তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। একটি কোন সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্য্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক সত্যটি তেমন ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে' সে সম্বন্ধে কোনরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসীকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উঠত না। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনায় নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য, তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনও রূপ পরিচয় থাকত তাহলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না, এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্ম্ম-চক্ষুর পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া করে দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্য বস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন;—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জ্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জ্জনীয়। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চাল্‌শে ধরা নয়। যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার, এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবি-কল্পনা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিভার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা, প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্য-বশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারিনে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্যবস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের মনে যে-সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব্ব এবং মহার্ঘ, যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনো-ভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক্ না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব ম'রে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। মানুষ মাত্রেরই মনে দিবা-রাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ কর্‌বার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখ্‌বেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পার্‌বেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলা-ক্রমে রচনা করা এক জিনিষ নয়। ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্য-পরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে লোকিকতা প্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন কর্‌তে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত কর্‌তে হলে, সাধনার আবশ্যক, এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহমনকে বাহ্য-জগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যের দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্ত্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক্ অন্ততঃ নিজের উপকার করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রবাসী কার্য্যালয় ১৯শে আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর হইতে ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

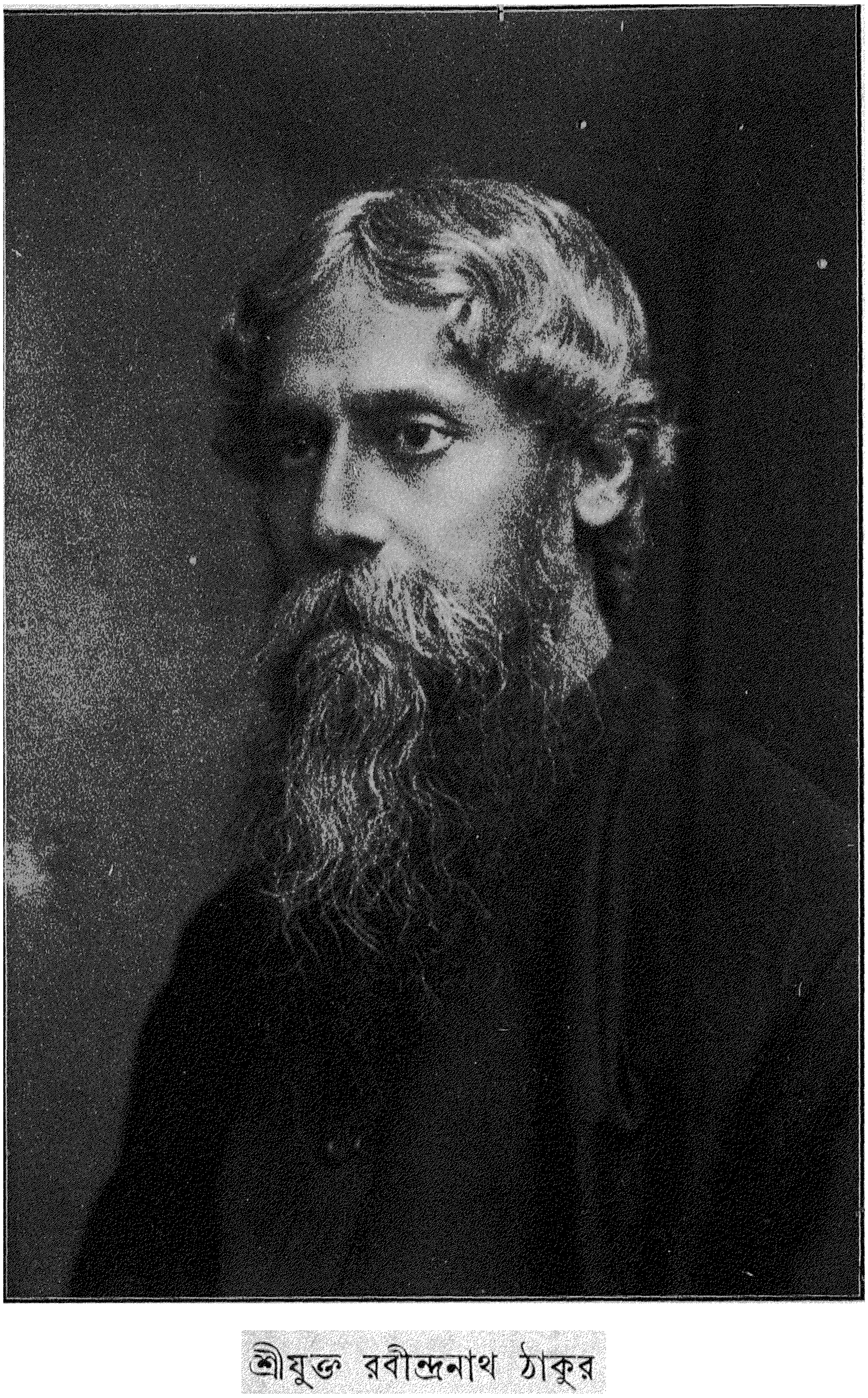

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Photograph by Elliot & Fry, London.

ENGRAVED AND PRINTED BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ ২য় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩২০	২য় সংখ্যা

দানতত্ত্ব

নাস্তি দান সমো নিধিঃ।

এই দানতত্ত্ব প্রবন্ধটী মদীয় "সনাতনধর্ম্মতত্ত্ব"গ্রন্থের দানখণ্ডের একাংশ। "সনাতনধর্ম্মতত্ত্ব" একখানি ধর্ম্ম-শাস্ত্রনিবন্ধ। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অনুকরণে উহার নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ নিবন্ধগ্রন্থের রচনায় যেরূপ ধর্ম্মপ্রাণতা, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। কিন্তু যোগ্যতর ব্যক্তিরা এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া, অগত্যা আমিই এ কার্য্যে হাত দিয়াছি, এবং মাসিকপত্রে উহার অংশ প্রচার করিয়া সবিনয়ে সমালোচনা ভিক্ষা করিতেছি।

এইরূপ নিবন্ধ কিরূপ আদর্শ লইয়া বিরচিত হওয়া উচিত, তাহার আভাস মদীয় Sanskrit Learning in Bengal নামক ইংরাজি পুস্তিকার ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বোধসৌকর্য্যার্থে উপক্রমণিকা স্বরূপ উহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

With a set of *Smârtas* educated on the lines indicated above, it would be quite possible to compile a new Code of the Hindu Religion, which would unify all the divergent sects of the Hindu Community. The age of *Raghunandana* is gone. Let the *Smârtas* try to produce a new Code, a Code that would be in keeping with the liberal spirit of the ancient scriptures, a Code that would effectively enlarge the roomy fold of Hinduism and include in it such sects as the *Brâhmas* and the *Arya-samâjists.* Hinduism has survived many rude shocks, because it has always known how to adopt itself to its changed environment. Is it too much to expect that the future *Smârtas* would be able to compile a Code that would effectively contain all that is good in the new Religions?

প্রতিগ্রহ দান ও ভরণ দান।

হিন্দুশাস্ত্রে মোটামুটি দুইরকম দানের উল্লেখ আছে, (১) প্রতিগ্রহ-দান, ও (২) ভরণ-দান। পূর্ণিমায় ভোজ্য-দান, গ্রহণে দান, তীর্থে দান, শ্রাদ্ধে দান প্রভৃতি প্রতিগ্রহ দান; ইহার পাত্র সুব্রাহ্মণ। আর বর্ণনির্বিশেষে গরীব দুঃখীকে দান ভরণ-দান। যেমন গরীবের ভরণ বা প্রাণধারণের ব্যবস্থা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তেমনি শ্রাদ্ধাদিতে সুব্রাহ্মণে দানও শাস্ত্রবিহিত। "ধর্ম্মসমাজ ও স্বাধীন চিন্তায়" (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা) সুব্রাহ্মণের লক্ষণ কতক দেখান হইয়াছে।

শ্রীমৎ পরমহংস ভোলাগিরির মুখে এই কথার আভাস এই বৎসরই প্রথম পাইয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় এ তত্ত্বটী এমন ভাবে বলিয়াছিলেন যেন ইহা একটী সর্ব্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত।

ভরণ-দানের পাত্র।

মাধবাচার্য্যস্বকীয় পরাশরভাষ্যে (১ম খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা) বলিতেছেন—

পঙ্গ্বন্ধবধিরা মূকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে।
ভর্ত্তব্যাস্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ॥

যাঁহারা পঙ্গু অন্ধ বধির মূক বা ব্যাধিপীড়িত, তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে, কিন্তু হে মহারাজ, তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ দিবে না।

প্রতিগ্রহদানের পাত্র।

প্রতিগ্রহ একমাত্র শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিকেই দিতে হইবে। ইঁহারাই প্রতিগ্রহের অধিকারী। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে—

অক্রোধনা ধর্ম্মপরা সত্যনিত্যা দমে রতাঃ।
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্॥ ৩৩॥
অমানিনঃ সর্ব্বসহা দৃঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্ব্বভূতহিতা মৈত্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্॥ ৩৪॥
অলুব্ধাঃ শুচয়ো বৈদ্যা হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ।
স্বকর্ম্মনিরতা যে চ তেভ্যো দত্তংমহাফলম্॥ ৩৫॥
প্রজ্ঞাশ্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ। ৩৮
গামশ্বং বিত্তমন্নং বা তাদৃশে প্রতিপাদয়েৎ॥ ৩৯

যাঁহারা ক্রোধবিমুখ, ক্রিয়াপরায়ণ, প্রতিজ্ঞাপালক, দমযুক্ত, তাঁহারা সুব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহা পুণ্য হয়। যাঁহারা অমানী, সর্ব্বসহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের হিতকারী ও স্নেহবান্, এবং যাঁহারা লোভহীন, শুচি, বিদ্বান্, লজ্জাযুক্ত, সত্যবাদী, ও স্বকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল হয়। (এক কথায়) যাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে এবং যাঁহার স্বভাব ভাল ও যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এমন লোককে গরু, ঘোড়া, টাকাকড়ি, ভাত প্রভৃতি দান করিবে।

দানের অপাত্র—(১) অনুষ্ঠানরহিত পরোপদেশক।

যাঁহারা লোককে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে পটু, কিন্তু নিজেরা উহা পালন করেন না, তাঁহারা দানের যোগ্যপাত্র নহেন। যথা—মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—

যে তু ধর্ম্মং প্রশংসন্তশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
অনাচরন্তঃ স্বদ্ধর্ম্মং সঙ্করেৎভিরতাঃ প্রভোঃ॥ ২০
তেভ্যো হিরণ্যং রত্নং বা গামশ্বং বা দদাতি যঃ।
দশবর্ষাণি বিষ্ঠাং স ভুঙ্‌ক্তে নিরয়মাশ্রিতঃ॥ ২১

যাঁহারা ধর্ম্মের কেবল প্রশংসা করিয়াই এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন, কিন্তু নিজেরা উহার অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাদিগকে সোনা, রত্ন, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দিলে নরকে যাইতে হয় অতএব প্রতিগ্রহদান এবংবিধ ব্যক্তিকে দিতে নাই।

(২) সঞ্চয়ী,

যাঁহারা টাকা জমানের জন্য, বড় লোক হইবার জন্য, দান গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেও দান করিতে নাই। বৃদ্ধমনু বলিয়াছেন—

সঞ্চয়ং কুরুতে যশ্চ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ।
ধর্ম্মার্থং নোপযুঙ্‌ক্তে চ ন তং তস্করমর্চ্চয়েৎ॥
অপরার্ক ২৮৬ পৃষ্ঠা, পরাশরভাষ্য ১ খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।

যিনি চারিদিক হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া ধন সঞ্চয় করেন, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে ঐ ধনের ব্যয় করেন না, তিনি চোর; তাঁহাকে প্রতিগ্রহদান দ্বারা সম্মানিত করিতে নাই।

(৩) অসদ্ব্যয়ী,

যিনি অসৎকার্য্যে ব্যয় করেন, তিনিও দানের পাত্র নহেন। বৃদ্ধমনু বলিয়াছেন

পাত্রভূতোঽপি যো বিপ্রঃ প্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রহম্।
অসৎসু বিনিযুঞ্জীত তস্মৈ দেয়ং ন কিঞ্চন॥
অপরার্ক ২৮৬ পৃষ্ঠা; পরাশরভাষ্য ১খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।

যে ব্রাহ্মণ দানপাত্রের অন্যান্য গুণের অধিকারী হইয়াও, প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া খারাপ কাজে উহার ব্যয় করেন, তাঁহাকে কিছুই দিতে নাই

অপাত্রে দানে রাজদণ্ড।

অসৎপাত্রে দান করিলে হিন্দু রাজারা কোনও কোনও স্থলে তজ্জন্য দাতাকে দণ্ড পর্য্যন্ত দিতেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ (৩।৫) ও অত্রি (২২ শ্লোক) বলিয়াছেন

অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥

অধ্যয়নবিমুখ ব্রতহীন দ্বিজেরা যে গ্রামে ভিক্ষা পায়, রাজা সেই গ্রামকে দণ্ডিত করিবেন, কেননা ঐ গ্রাম চোরের অন্নদাতা। যে ভিক্ষা বিদ্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসের সহায়রূপে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই ভিক্ষা দ্বারা যদি মূর্খের ও ভণ্ডের পোষণ হয়, তবে যে দেশের অমঙ্গল হইবে, এবং ঐরূপ ভিক্ষাদাতারা যে দেশের শত্রু বলিয়া রাজার দণ্ডার্হ হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অধার্ম্মিককে কোন বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও উহা দেওয়া অন্যায়। এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপের কোনও আশঙ্কা নাই। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন (৫।২৩)

প্রতিশ্রুত্যাপি অধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ।

পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া থাকিলেও অধার্ম্মিককে দান করিতে নাই।*(মিতাক্ষরা ১।২০১ দেখুন)। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে আছে

কৃশায় কৃতবিদ্যায় বৃত্তিক্ষীণায় সীদতে।
অপহন্যাৎ ক্ষুধাং যস্তু ন তেন পুরুষঃ সমঃ॥ ৫৯। ১১

বিদ্বান গরীব কৃশ ক্ষুধিতের ক্ষুধা যে দূর করে, তাঁহার সমান পুরুষ আর নাই।

প্রতিগ্রহ-দানের উদ্দেশ্য।

এই-সকল শাস্ত্রবচন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিগ্রহদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ধার্ম্মিক বিদ্বানের বৃত্তিবিধান করা। যাঁহারা দেশের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিদ্যার চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে "ভৃতক" বা মাহিনার চাকর করিয়া দেওয়া শাস্ত্রের অনভিপ্রেত।

ভৃতক যাজক ও অধ্যাপকের দোষ।

ইংলণ্ডে ধর্ম্মযাজকেরা মাহিনার চাকর এবং তাঁহাদের বিস্তর আসবাব ও ধন আছে। আমাদের যেন উহার অনুচীকির্ষা না হয়। সেখানে সব ভাল, আমাদের সব মন্দ—এইরূপ ভাবিবার কারণ নাই। অবশ্য আমরা বাল্যকাল হইতে ঐ কথা অভ্যাস করি, কিন্তু উহা ভুলিতে হইবে। ইংলণ্ডের পাদরিরাও যে আর বহুদিন রাজকর্ম্মচারী থাকিবেন তাহা বোধ হয় না। ইংলণ্ডে শিক্ষকেরা অনেকে মাহিনার চাকর, তাই আমাদের দেশেও ভৃতকাধ্যাপকের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আজ যে আমাদের দেশে বিদ্যালোচনার ফলে, লোকের জীবন উন্নত হইতেছে না, তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, ইদানীন্তন অধ্যাপকেরা ভৃতকাধ্যাপক। তাঁহারা মাহিনা পান এবং পড়ান। প্রত্যেক ছাত্রকে "মানুষ" করা যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, এদেশে শিক্ষাদানের অপর নাম যে "মানুষ করা," তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ছাত্রের পাশের সুবিধা করিয়া দেন, তাঁহাদিগকে "মানুষ" করিতে, এমন কি বিদ্বান্ করিতেও, চেষ্টা করেন না। এই জন্য শাস্ত্রে ভৃতকাধ্যাপকের এত নিন্দা আছে। স্বাধীনভাবে, নিজের মনোমত করিয়া, ছেলেদের গঠন করার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিলে, তাঁহারা শিক্ষাদানে সমস্ত মনপ্রাণ নিযুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন তাহা হইবার যো নাই। এখন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা বা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যেরূপ চালান, শিক্ষকেরা সেইরূপ চলিতে বাধ্য। একদিন দুইজন অধ্যাপকের মধ্যে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকদের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। একজন বলিতেছিলেন "আমরা ছাত্রদিগকে বিদ্যাবান্ বা মানুষ করিতে চেষ্টা করি না, এবং অনেকের উহা করিবার সামর্থ্যও নাই। আমাদের মধ্যে কয়জনে তাঁহাদের অধ্যাপিত বিদ্যায় প্রকৃত পারদর্শী, প্রকৃত হৃদয়গ্রাহী? অনেকেই ত এম-এ পাশ করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন, এবং আর কিছু শিক্ষিতব্য আছে, এমন মনেও করেন না। ইহা ছাড়া, কেবল জ্ঞানের বিশালতা ও গভীরতা দ্বারা শিক্ষকদের কৃতার্থতা হয় না। শিক্ষকদিগকে সর্ব্বোপরি শুদ্ধাচারী ও শীলবান্ হইতে হইবে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরাও এ বিষয়ে দোষী। তাঁহারা কেবল ভাল পাশ-করা অধ্যাপক চান; তাঁহারা প্রকৃত মানুষ বা প্রকৃত পণ্ডিতের আদর করেন না।" দ্বিতীয় অধ্যাপক গভীর নৈরাশ্যের সহিত উত্তর করিলেন "আমরা কি ঐ জন্য নিযুক্ত হইয়াছি? আমাদের উদ্দেশ্যই ছেলে পাশ করান। ঐ উদ্দেশ্য আমরা যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছি, তদ্রূপ আর কেহই পারিবে না। মানুষ করা বা বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মানের প্রয়োজন হইলে অবশ্য শীলবান্ ও বিদ্যাবান্ শিক্ষকের দরকার হয়, কিন্তু আজকাল উহা আমাদের নিকট প্রত্যাশিত বলিয়া গণ্য হয় না।"

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, শিক্ষকদিগকে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। প্রথম, শিক্ষকনিয়োগের সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একমাত্র সুশীল শুদ্ধাচারী ও বহুশ্রুত (learned) লোককেই শিক্ষক করিতে হইবে। এইরূপ লোকেরা সাধারণত স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবেন না, আর শতের মধ্যে দুই চারি জনে করিলেও, তাঁহাদিগকে নিগৃহীত করা কঠিন হইবে না। শিক্ষকদিগকে পদে পদে বেড়িয়া রাখিলে, দেশের অশেষ অকল্যাণ হয়।

বৃত্তিকর্ষিত শিক্ষক।

ইহা ছাড়া, বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের মাহিনা অতি কম। তাঁহাদের জীবিকা ঐ টাকায় চলে না। কাজেই তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিক্ষাদানব্রতে নিযুক্ত হইতে পারেন না। প্রাচীন ভারতে এই দুই বিষম বিপদ ছিল না। যাহাতে ভৃতকাধ্যাপক বা বৃত্তিকর্ষিত অধ্যাপক না থাকে, তখন তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক মানুষকে দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করিতে হইত। ঐ-সকল কার্য্যে বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই দান গ্রহণ করিতে পারিতেন (প্রতিগ্রহদান)। তাঁহারা সৎকার্য্যে প্রতিগ্রহার্জ্জিত বিত্তের ব্যয় করিতেন, টাকা জমাইতে পারিতেন না। একবার জমাইতে আরম্ভ করিলে, লোকে তাঁহাদিগকে আর "সুপাত্র" বলিয়া মনে করিতেন না, প্রত্যুত তাঁহারা তস্কর বলিয়া গণ্য হইতেন।

সঞ্চয়ং কুরুতে যশ্চ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ।
ধর্ম্মার্থং নোপযুঙ্‌ক্তে চ ন তং তস্করমর্চয়েৎ॥

টাকা-জমান-রোগ যে-দেশের শিক্ষক-শ্রেণীতে প্রবেশ করে, সে দেশের কোন উন্নতিই হইতে পারে না। শিক্ষকেরা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্য প্রতিগ্রহ করিতেন। লোকে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া আদরের সহিত দান করিতেন। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়া অবশ্যভর্ত্তব্য পোষ্যবর্গের জন্য এবং পরোপকারার্থ ব্যয় করিতেন। অসৎ লোকের দান গ্রহণ করিতেন না। রাজারাজড়ারা ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া দান করিতে চাহিলে, সুব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহে অস্বীকৃত হইতেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে আছে

ন তু পাপকৃতাং রাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্নন্তি সাধবঃ। ৬১।৫

এইরূপে, প্রতিগ্রহ-দানের সুনিয়মে, দেশের ধর্ম্মযাজকেরা ও শিক্ষকেরা নিজেরাও ভাল কাজ করিতে বাধ্য হইতেন এবং দেশের সাধারণ লোকেও ভাল কাজ করিতে বাধ্য হইতেন।

শাস্ত্রে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করার যে শত শত বচন আছে, উহার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, দেশের শিক্ষক এবং যাজক মহাশয়েরা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য হা হা করিয়া বেড়াইতে বাধ্য না হন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষক ও যাজকেরা একদিকে যেমন অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতেন না, অপর দিকে তেমনই তাঁহারা টাকা জমাইতে বা অপব্যয় করিতেও পারিতেন না।

ভরণ-দানের পাত্র।

দ্বিতীয় প্রকার দানকে ভরণ-দান বলিয়াছি। যাঁহারা পঙ্গু অন্ধ বধির বা ব্যাধিত বলিয়া উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণ প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য

পঙ্গ্বন্ধবধিরা মূকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে।
ভর্ত্তব্যাস্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ॥ ৭

গরীবেরা ধনীর পোষ্য।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন

দেয়মনাথেভ্যোঽবশ্যং বিপ্রাদীনাঞ্চ ভেষজম্।১।৬

অনাথদিগকে দান করা এবং ব্রাহ্মণদিগকে ঔষধ দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য। মহর্ষি দক্ষ (২।৩৬—৪২) দীন অনাথ ক্ষীণ আশ্রিত প্রভৃতিকে ধনীর অবশ্যপালনীয় পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনঃ সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥
জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যোঽপি ধনযুক্তস্য পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকঃ পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তচ্চরেৎ॥
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্ত্রী, সন্তান, গরীব, আশ্রিত, অতিথি, অভ্যাগত, অগ্নি, জ্ঞাতি, বন্ধু, ক্ষীণ, অনাথ বা অন্য-আশ্রিত (?) ইহারা ধনীর পোষ্যবর্গ। পোষ্যবর্গের ভরণ প্রশংসাজনক এবং উহাতে স্বর্গ হয়। পোষ্যবর্গের পীড়নে নরক হয়। যত্নের সহিত পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ করিবে। যাঁহারা সম্পত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীন, অনাথ এবং সৎপাত্রকে (?) দান করিবেন। যাঁহারা এ জন্মে দান করেন না, তাঁহারা পরজন্মে পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ভরণ-দানের শ্রেষ্ঠতা।

শাস্ত্রে এই ভরণ-দান বা পোষণ-দানের ভূরি প্রশংসা আছে। দক্ষ বলিয়াছেন—

দয়ামুদ্দিশ্য যদ্দানমপাত্রেভ্যোঽপি দীয়তে।
দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
অপরার্ক ২৮৩ পৃষ্ঠা।

দীন, অন্ধ এবং অন্যান্য কৃপার পাত্রগণ প্রতিগ্রহ-দানের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও দয়াবশত উহাদিগকে যে দান করা হয়, তাহার ফল অনন্ত দেবল বলিয়াছেন (অপরার্ক ২৮৯ পৃষ্ঠা)

অনুক্রোশবশাদ্দত্তং দানমক্ষয়তাং ব্রজেৎ।

দয়াবশত যে দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।

সারসংগ্রহ।

মোটের উপর দুই রকম দান দাঁড়াইল। (১) প্রতিগ্রহ দান, ইহার পাত্র দেশের গরীব ধার্ম্মিক শিক্ষক ও যাজকগণ। ইহার ফলে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত, লোক-শিক্ষা ও যাজনে নিযুক্ত হইতে পারেন। (২) ভরণ-দান—ইহা গরীবের প্রাপ্য। ইহার ফলে, যাঁহারা ব্যাধি প্রভৃতির দরুণ স্বকীয় জীবিকা-উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহারা অন্নবস্ত্রাভাবে মারা পড়েন না।

দানবিধির মূলসূত্র—ভূতহিত বা মনুষ্যহিত।

উপরিলিখিত এবং অন্যান্য দানবিধির মূলসূত্র বেদব্যাস-স্মৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে

দাতা ভূতহিতে রতঃ।

যিনি ভূতহিতে রত তিনিই প্রকৃত দাতা ভূতহিতই দানের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (৭।১১।১০)

অন্নাদেশ্চ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেম্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥

শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বজনিক অঙ্গগুলির উল্লেখ করিতে করিতে বলিয়াছেন “ভূতদিগকে অন্নাদি যথোপযুক্তরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে ও বিশেষত মনুষ্যদিগকে উপাস্যদেবতা ও নিজআত্মা বলিয়া মনে করা” সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ। দানের মুখ্য উদ্দেশ্য ভূতহিত, বিশেষত মানুষের হিত। যে-দানে মানুষের বা প্রাণীর যত উপকার হয়, সে দান তত পুণ্যজনক, ইহাই দান-বিধির প্রধান-সূত্র এই জন্যই মহাভারত (১৩।৬৯ অধ্যায়) গোদানের প্রশংসা করিতে গিয়া গরুর, এবং নন্দিপুরাণে (অপরার্ক ৩৯৬ পৃঃ) বিদ্যাদানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে গিয়া বিদ্যার, উপকারিতা বুঝান হইয়াছে। এই জন্যই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে (পরাশরভাষ্য ১ খ, ১৯২ পৃঃ)

যস্যোপযোগি যদ্দ্রব্যং দেয়ং তস্যৈব তদ্ ভবেৎ।

এবং নন্দিপুরাণে আছে (অপরার্ক ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

উপযোগ্যং চ যদ্ যস্য তৎ তস্য প্রতিপাদয়েৎ।

যে দ্রব্য যাঁহার উপকারে আসিবে, সে দ্রব্য তাঁহাকে দিবে। এই জন্যই

শ্রান্তস্য যানং তৃষিতস্য পানম্
অন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য “সদা প্রদেয়ম্”।

শ্রান্তকে যান, পিপাসিতকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে অন্ন দিবে। গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে অক্ষয়তৃতীয়ায় এবং বৈশাখ মাসে জলদান সুপ্রচলিত। শীতপ্রধান কাশ্মীরে শীতকালে তাওয়া (কাঙ্‌রি) ও অগ্নিদান প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে অগ্নিদানের বিধান আছে

ইন্ধনানি চ যো দদ্যাদ্ বিপ্রেভ্যঃ শিশিরাগমে।
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়াযুক্তস্তু দীপ্যতে॥
সংবর্ত্তস্মৃতি ৫৮ শ্লোক।

এইরূপ দুর্ভিক্ষে অন্নদান (অত্রি ৩৩২ শ্লোক), রোগীকে ঔষধ-পথ্য-দান (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২০৯ ; আপস্তম্ব ৬ ; সংবর্ত্ত ৫৮ শ্লোক ও ৮৫ শ্লোক), দেশবিপ্লবে যাঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দান (মহাভা ১৩।২৩।৫৪, ৫৭), প্রভৃতি সকল দানেরই অন্যতম স্পষ্ট উদ্দেশ্য ভূতহিত বা মানবহিত।

স্বজনকে উপেক্ষা করিয়া পরজনে দান অধর্ম্ম।

স্বজনকে বা নিকটস্থ ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া দূরস্থ ব্যক্তিকে দান করাও এই জন্যই নিষিদ্ধ।

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥
মনু ১১।৯

তস্মান্নাতিক্রমেৎ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণান্ প্রাতিবেশ্মিকান্।
ভবিষ্যপুরাণ, অপরার্ক।

গরীব দুঃখী আত্মীয়দিগকে সাহায্য না করিয়া পরজনে দান করিলে, সে দানে পুণ্য হয় না। যে-সকল বাঙ্গালী বরিশালখুলনা ষ্টীমার পুড়িয়া লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি-নাশে কোনও রূপ দুঃখপ্রকাশ বা আর্থিক সাহায্য করেন নাই, কিন্তু বিলাতি জাহাজ টিটানিকের ধ্বংসে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, তাঁহারা কাজটা তত ভাল করেন নাই। বিদেশীয়ের হিতও অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু নিজের গ্রামের ও দেশের হিত না করিয়া বিদেশে হিত করিতে যাওয়া অবিহিত, কেননা ঐরূপ করিলে প্রকৃত পক্ষে

অহিতই বেশী হয়। এইরূপে বৃত্তিরহিত পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে সর্ব্বস্বদানও প্রকৃতপক্ষে ভূতহিতের পরিপন্থী বলিয়া নিষিদ্ধ (দক্ষ ৩।১৯ ; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৫)। অতএব সকল দানেরই উদ্দেশ্য মানুষের বা ভূতের হিত এই মূলসূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দান করিতে হইবে।

ধ্রুব, আজস্রিক, কাম্য ও নৈমিত্তিক দান।

এখন দেখা যাউক শাস্ত্রে দানের কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং আধুনিক সমাজে ঐ-সকল ব্যবস্থা কতদূর শুভাবহ।

মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন

ধ্রুবমাজস্রিকং কাম্যং নৈমিত্তিকমিতি ক্রমাৎ।
বৈদিকো দানমার্গোঽয়ং চতুর্ধা বর্ণ্যতে বুধৈঃ॥
প্রপারামতড়াগাদি সর্ব্বকাম * ফলং ধ্রুবম্।
তদাজস্রিকমিত্যাহুর্দীয়তে যদ্ দিনে দিনে॥
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্ত্রীবালার্থং যদিষ্যতে।
ইচ্ছাসংস্থং তু তদ্দানং কাম্যমিত্যভিধীয়তে॥
কালাপেক্ষং ক্রিয়াপেক্ষমর্থাপেক্ষমিতি স্মৃতম্।
ত্রিধা নৈমিত্তিকং প্রোক্তং সহোমং হোমবর্জ্জিতম্॥
(অপরার্ক ২৮৯ পৃঃ ; পরাশরভাষ্য ১।১৮২ পৃঃ)

দান চারি প্রকার—(১) ধ্রুব (২) আজস্রিক (৩) কাম্য (৪) নৈমিত্তিক। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দানের চতুর্ধা বিভাগ বেদসিদ্ধ। (১) প্রপা আরাম তড়াগ প্রভৃতি ধ্রুব, উহা সর্ব্বকামপ্রদ ; (২) যাহা রোজ রোজ দেওয়া যায়, তাহাকে আজস্রিক বলে। (৩) অপত্য বিজয় ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির কামনা করিয়া যে দান করা হয়, তাহা কাম্য। (৪) নৈমিত্তিক দান তিন রকম, কোনটী কালাপেক্ষ, কোনটী ক্রিয়াপেক্ষ, কোনটী অর্থাপেক্ষ ; ইহার প্রত্যেকটীতে হোম থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

ধ্রুবদান।

এই চারিরকম দানের মধ্যে, ধ্রুবদানের দিকে হিন্দু-সমাজের তত দৃষ্টি নাই। কিন্তু উহাই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

* বোধ হয় প্রকৃত পাঠ সর্ব্বকালফলম্। এই-সকল দানের নাম ধ্রুবদান, কেননা ইঁহাদের ফল ধ্রুব অর্থাৎ চিরস্থায়ী। আজ একটী তড়াগ খনন করিয়া উৎসর্গ করিলে, তাহার জল বহুবৎসর লোকের ভোগে আসে। অবশ্য যেরূপ পাঠ আছে, তাহাতেও বেশ অর্থ হয়।

জলদান।

গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাব হইতেছে, অথচ ধনীরা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতেছেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে-জিনিস যত উপকারী, তাহার দানে তত পুণ্য হয়। মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন

যদ্ যত্র দুর্লভং দ্রব্যং যস্মিন্ কালেঽপি বা পুনঃ।
দানার্হৌ দেশকালৌ তৌ স্যাতাং শ্রেষ্ঠৌ ন চান্যথা॥
(পরাশরভাষ্য ১।১৮১ পৃঃ)

যে স্থানে এবং যে সময়ে যে দ্রব্য দুর্লভ, সেই স্থানে ও সেই সময়ে সেই দ্রব্যের দান শ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এখন পানীয় জল দুর্লভ; পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলদান করা এখন শ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্ম্ম। মহাভারতে আছে (১৩।৬৫।৩)

পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ।

পানীয়দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, ইহা মনু বলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে যে-সমস্ত প্রাচীন পুষ্করিণী ভরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়ার উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের সংস্কার চাই। শাস্ত্রে বলে

বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥
(লিখিত সংহিতা ৪ শ্লোক)
কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্॥
(বিষ্ণুস্মৃতি ৯১ অধ্যায়)

বাপী, কূপ, তড়াগ এবং দেবমন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া দিলে, নূতন তৈয়ার করার ফল হয়।

বিদ্যাদান।

দেশের লোক ঘোর অজ্ঞানে ডুবিয়া আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, এবং সামান্য পাটীগণিত বা জ্যামিতি, ইহাও সাধারণে জানে না। উচ্চশিক্ষা দেশে নামত বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু কার্য্যত যত বিএ, এম্ এ বা তর্কতীর্থ স্মৃতিতীর্থ জন্মিতেছে, ততটা বিদ্যা বাড়িতেছে না, বিদ্যানুরাগ বাড়িতেছে না। দেশে বিদ্যাবিস্তারের প্রয়োজন। শাস্ত্রে বলে

বিদ্যা চ মুখ্যং দানানাম্।

বিদ্যাদান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ইংরাজি বা সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই উচিত বিদ্যাবিস্তারের সহায়তা করা ; আর যাঁহারা অধ্যা-

পনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের উচিত লোককে বিদ্যানুরাগী করিতে চেষ্টা করা।

অবিদ্বান্ ও অধনীও বিদ্যাদান করিতে পারে।

"বিদ্যাদান" অর্থ কেবল অধ্যাপনা নহে। তাহা হইলে একমাত্র সুশিক্ষিত অধ্যাপকেরাই বিদ্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতেন। যে-কোনও প্রকারে বিদ্যাপ্রচারের সহায়তার নাম বিদ্যাদান। অপরার্ক বিদ্যাদান প্রকরণে আলমারী দান, দোয়াত দান, কলম দান, পাতা দান * পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা যে, অবিদ্বান্ ও ধনহীন ব্যক্তিও বিদ্যাদানের পরম পুণ্যলাভে বঞ্চিত নহেন, কেননা সকলেই অগত্যা একটা দোয়াত বা একটী কলম দান করিতে সমর্থ।

যথাবিভবতো দদ্যাদ্ বিদ্যাং শাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
যেঽপি পত্রমসীপাত্রলেখনীসম্পুটাদিকম্॥
দদ্যুঃ শাস্ত্রাভিযুক্তায় তেঽপি বিদ্যাপ্রদায়িনাম্।
যান্তি লোকান্ শুভান্ মর্ত্ত্যাঃ পুণ্যলোকা মহাধিয়ঃ॥
(নন্দিপুরাণ, অপরার্ক ১।৪০৩ পৃঃ)

যাঁহার যেরূপ সম্পত্তি আছে, তিনি সেইরূপ বিদ্যাদান করিবেন, বিত্তশাঠ্য করিবেন না। যাঁহারা পাতা, দোয়াত, কলম, আলমারী প্রভৃতি বিদ্যানিরত ব্যক্তিকে দান করেন, সেই-সকল মহাশয় ব্যক্তিরা বিদ্যাপ্রদায়ীদিগের প্রাপ্য শুভলোক লাভ করেন।

ধ্রুব ও আজস্রিক বিদ্যাদান।

অন্যান্য দানের ন্যায়, বিদ্যাদানও ধ্রুব, আজস্রিক, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই চারিভাগে বিভক্ত। বোম্বাইর বণিক্ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ যে দুইলক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন, উহা ধ্রুবদান। উহার দ্বারা শত শত বর্ষ ধরিয়া লোকের বিদ্যালাভের সুযোগ হইবে। শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয়ের দান (১৫ লক্ষ), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের দান (১০ লক্ষ), শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজের দান (২॥০ লক্ষ), ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দান (মাসিক ১০০৲), ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দান (১॥ লক্ষ), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দান (আর কত উল্লেখ করিব?) এ সমস্তই ধ্রুবদান। ভারতীয়েরা বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য প্রাচীনকালে খুবই বুঝিতেন, এখনও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ধ্রুব উপাধ্যায় নিয়োগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুব উপাধ্যায় নিয়োগ (Endowing Professorships) বিলাতী আমদানি নহে। শাস্ত্রে আছে—

বৃত্তিং দদ্যাদুপাধ্যায়ে ছাত্রাণাং ভোজনাদিকম্।
কিমদত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থদর্শিনা॥
অগ্নিপুরাণ ২১১।৫৫

যিনি উপাধ্যায়কে বৃত্তি এবং ছাত্রদিগকে ভোজনাদি দেন তাঁহার সর্ব্বদানের ফল হয়; তিনিই যথার্থ ধর্ম্মকামার্থদর্শী।

উপাধ্যায়স্য যো বৃত্তিং দত্ত্বাধ্যাপয়তে দ্বিজান্।
কিং ন দত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থদর্শিনা॥
ভবিষ্যোত্তর পুরাণ, অপরার্ক ১।৩৯১ পৃঃ।

যিনি উপাধ্যায়ের বৃত্তি দিয়া অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার সর্ব্বদানের ফল হয়। মূলাজোড়ের সংস্কৃত পাঠশালা, বর্দ্ধমানের বিজয়-চতুষ্পাঠী, রাজসাহীর হেমন্তকুমারী টোল, কাশীর রণবীর পাঠশালা, শ্রীগোপালবসু মল্লিকের ফেলোশিপ্, প্রভৃতি এই শ্রেণীর দান।

গরীব ছাত্রদিগকে অন্নবস্ত্রদান।

গরীব ছাত্রদিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিলে, বিদ্যাদানের মহাপুণ্য লাভ হয়।

ছাত্রাণাং ভোজনাভ্যঙ্গং বস্ত্রং ভিক্ষামথাপি বা।
দত্ত্বা প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সর্ব্বকামানসংশয়ঃ॥

যাঁহারা ছাত্রদিগকে ভোজন, অভ্যঙ্গ, বস্ত্র, অথবা ভিক্ষা দেন, তাঁহাদের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। এই দানও ধ্রুব বা আজস্রিক, নিত্য বা নৈমিত্তিক হইতে পারে।

বলাইচাঁদ ও নিস্তারিণী দাসীর ধ্রুববিদ্যাদান।

কলিকাতায় ৺ নিস্তারিণী দাসী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দুঃস্থ সংস্কৃতাধ্যায়ী পাঁচশজন ছাত্রের খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ধ্রুববিদ্যাদান। গ্রামে গ্রামে লোকে যে, বাড়ীতে নিঃসম্পর্কিত ছাত্র রাখিয়া পড়ান, উহা আজস্রিক বিদ্যাদান। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি।

* তখন তাল-পাতায় ও ভোজপাতায় গ্রন্থ লিখিত হইত। এখন পত্রদান　　কাগজদান করিতে হইবে।

সুবর্ণবণিক, সাহা, যোগী প্রভৃতির সামাজিক সম্মানলাভের প্রকৃত পন্থা।

আজকাল সুবর্ণবণিক, সাধু, যোগী প্রভৃতি জাতি নিজেদের জল চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য বিগত আদমসুমারির সময় কেহ কেহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতদিগের পাতি লইয়াছেন। এ-সকল বেশ হইয়াছে। ইহার ফলে, সরকারি জাতিবিবরণে এই-সকল জাতি উচ্চতর স্থান লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কাগজে উচ্চ হইলে কি হইবে? কোনও ব্রাহ্মণ, এমন কি যাঁহারা পাতি দিয়াছেন তাঁহারাও, তাঁহাদিগের দান গ্রহণ করিবেন কি? তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল খাইবেন কি? পাতি পাইলেই বড় হওয়া যায় না। বড় হওয়ার পথ স্বতন্ত্র। সাধু জাতি (সাহা জাতি) ও সুবর্ণবণিক্ জাতি বঙ্গের বৈশ্য। তাঁহাদের অর্থ আছে। তাঁহারা সুবর্ণবণিক-কুলভূষণ ৺ বলাইচাঁদ ও ৺ নিস্তারিণীর পদাঙ্কানুসরণ করুন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহুতর অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের দত্ত বাড়ীতে বাস করিয়া, তাঁহাদের দত্ত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই-সকল অধ্যাপকেরা যখন দেশের নেতা হইবেন, তখন কি ইঁহারা সুবর্ণবণিকের পদমর্য্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবেন? এই হইল বড় হওয়ার প্রকৃত পথ। হিন্দুসমাজ কাহাকেও চাপিয়া রাখে না। ভারতীয় আর্য্যেরা কোনও জাতির ধ্বংস করেন নাই, সকলকেই টানিয়া উপরে তুলিয়াছেন। অবশ্য গত ৪।৫ শত বৎসরের ইতিহাসে ভারতীয় আর্য্যদিগের এই মহত্ত্ব তত পরিস্ফুট নহে। কিন্তু বরাবর এমন ছিল না। এই সে দিনও আসামে গিয়া বাঙ্গালী পর্ব্বতীয়া গোসাঞিরা কি না করিয়াছেন?

সাধু-মঠের প্রস্তাব।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের সাহা-বণিকেরা দেশের গৌরব। তাঁহারা কলিকাতায় ব্রাহ্মণছাত্রদিগের সংস্কৃত পড়ার জন্য অনায়াসে লক্ষ টাকা দান করিতে পারেন। ঐ টাকায় একটা সাহামঠ (বা সাধুমঠ) প্রতিষ্ঠিত হউক। উহাতে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের এবং কলিকাতার অন্যান্য টোলের পঁচিশজন গরীব ব্রাহ্মণ ছাত্রের বাসস্থান এবং প্রত্যেক ছাত্রকে খোরাকি ব্যবদ মাসে ১০টাকা দেওয়া হউক। ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে, সাহাজাতির মান বাড়িবে। 'পাতি লইয়া বড় হয় না, দান করিয়া বড় হয়। এইরূপ বিদ্যাদানের ফলে সাহাজাতি তাহার ন্যায্য দাবি অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন, দেশেরও ধর্ম্মবৃদ্ধি জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে।

বড়ত্বের মানদণ্ড।

বঙ্গদেশে কোন্ জাতি কত বড়, তাহার একটা পরীক্ষা এই যে, কোন্ জাতি পরার্থে কত কাজ করিয়াছেন? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শ্রেষ্ঠ ছিলেন কেন? তাঁহারা পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তাঁহারা পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিয়া অর্থকে অবহেলা করিতেন, তাই তাঁহারা বড় হইয়াছিলেন। স্বার্থত্যাগই বড়ত্বের একমাত্র মানদণ্ড। বঙ্গে আর বলাইচাঁদ নিস্তারিণী নাই?

লাইব্রেরী স্থাপন।

গ্রামে গ্রামে সাধারণের জন্য পুস্তকালয় স্থাপন করিতে হইবে। শাস্ত্রে পুস্তকদানের ভূরি প্রশংসা আছে।

> সম্পূজয়িত্বা তচ্ছাস্ত্রং দেয়ং গুণবতে তথা।
> সামান্যং সর্ব্বলোকানাং স্থাপয়েদথ বা মঠে॥ *
> অনেন বিধিনা দত্ত্বা যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
> তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ মে।
> যৎ ফলং তীর্থযাত্রায়াং যৎফলং যজ্ঞযাজিনাম্।
> কপিলানাং সহস্রেণ সম্যগ্ দত্তেন যৎ ফলম্।
> তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পুস্তকৈকপ্রদানতঃ॥
> ভবিষ্যোত্তর, অপরার্ক ১।৩৯০ পৃঃ।

গ্রন্থ লিখাইয়া উহা গুণবান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। অথবা সর্ব্বলোকের ব্যবহারের জন্য উহা মঠে রাখিয়া দিবে। এই বিধি অনুসারে একখানি পুস্তক দান করিলে,

* এই বচনে মঠে বা দেবালয়ে সাধারণের জন্য পুস্তকদানের ব্যবস্থা আছে। এটা অতি শোভন ব্যবস্থা। বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুশীলন একত্র হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয় "দৌলতপুর একাডেমি" দেবালয়ের সংস্রবে স্থাপন করিয়া স্বকীয় সনাতনধর্ম্মহৃদয়গ্রাহিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।

আজকাল দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্মিলনের ফলে, সর্ব্বধর্ম্মের লোকের জন্য ধর্ম্মসম্পর্কবর্জিত সাধারণ লাইব্রেরি অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হিন্দুরা দেবালয় স্থাপন করিয়া, তথায় বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিলে, সাধারণ হিন্দুরা ঐ জন্য আহ্লাদের সহিত অধিকতর অর্থ দিতে পারিবে।

তীর্থযাত্রার; যজ্ঞের ও সহস্র গরুদানের ফল হয় অগ্নি-পুরাণে আছে—

বিদ্যাদানমবাপ্নোতি প্রদানাৎ পুস্তকস্য তু।

পুস্তক দান করিলে বিদ্যাদানেরই পুণ্য হয়।

প্রাচীন দেবালয়ের সংস্কার ও উহাদিগকে বিদ্যামন্দির করণের প্রস্তাব।

গ্রামে গ্রামে যে-সকল সাধারণ প্রাচীন দেবালয় আছে, তাহার সংস্কার করিতে হইবে। তাহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া, মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজে ছাপিয়া, ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না; উহাদের উদ্ধার করিতে হইবে। উহারা শিল্পের ক্ষুদ্র নিদর্শন মাত্র নহে। উহারা মহত্তর ভারতীয় ধর্ম্মের, প্রাণের, ভাবের নিদর্শন। যদি সেই ধর্ম্ম, সেই প্রাণ, সেই ভাব দেশে পুনরায় না আসে, তবে বৃথা ছবি তোলা, বৃথা গলাবাজি, বৃথা গবেষণা। শাস্ত্রে আছে

কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্॥
বিষ্ণুস্মৃতি, ৯১ অধ্যায়।

কূপ, আরাম, তড়াগ এবং দেবালয়ের পুনঃসংস্কারকারী মূলনির্ম্মাতার পুণ্য লাভ করে। শাস্ত্রের এই পরিষ্কার নির্দ্দেশ সত্ত্বেও নূতন দেবালয় স্থাপনে বেশী পুণ্য হয় মনে করা উচিত নহে। যাহা আছে তাহার রক্ষা করিয়া পরে নূতনের সৃষ্টি করিতে হইবে। পুরাতনের উপেক্ষা করিয়া, নিজের বা নিজকুলের নাম রক্ষা করিবার জন্য নূতন মঠ স্থাপন করিলে ক্ষণস্থায়ী নাম হইবে, কিন্তু কাম হইবে না। গ্রামের সাধারণ দেবালয়ে গ্রামস্থ লোক-সকল সমবেত হইয়া যাহাতে প্রত্যহ ধর্ম্মালোচনা করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। উহা মঠের অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে

সামান্যং সর্ব্বলোকানাং স্থাপয়েদথবা মঠে।

অর্থাৎ সদ্‌গ্রন্থ মঠে সর্ব্বসাধারণের জন্য রাখিয়া দিবে। কেবল তাহা নহে।

শিবালয়ে বিষ্ণুগৃহে সূর্য্যস্য ভবনে তথা।
সর্ব্বদানপ্রদঃ স স্যাৎ পুস্তকং বাচয়েত্তু যঃ॥
অগ্নিপুরাণ ২১১।৫৭।

শিব, বিষ্ণু বা সূর্য্যের মন্দিরে যিনি পুথি দেন, তিনি সর্ব্ব দানের ফল লাভ করেন।

শিবালয়ে বিষ্ণুগৃহে সূর্য্যস্য ভবনে তথা।
যঃ কারয়তি ধর্ম্মাত্মা সদা পুস্তকবাচনম্।
গোভূহিরণ্যবাসাংসি শয়নান্যাসনানি চ।
প্রত্যহং তেন দত্তানি ভবন্তি পুরুষর্ষভ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন জানাতি বিদ্যাবিরহিতঃ পুমান্।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র ধর্ম্মাত্মা বিদ্যাদানরতো ভবেৎ॥
ভবিষ্যোত্তর, অপরার্ক ১৩৯১ পৃষ্ঠা।

শিবমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে বা সূর্য্যমন্দিরে যে ধর্ম্মাত্মা রোজ পুস্তক পাঠ করান, তাঁহার গো, ভূমি, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি দানের ফল হয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানেন না, অতএব ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদা বিদ্যাপ্রদানে রত হইবেন। কেবল দেবালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। দেবালয়ে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে স্থান সকলের মিলন-ভূমি, সাধারণের বিদ্যাপীঠ।

মঠ দেওয়া।

অনেকে মাতাপিতার চিতার উপর ইষ্টকপিণ্ড স্থাপন করিয়া মনে করেন, মঠ-স্থাপনের ফল হইল। উহা সম্পূর্ণ ভুল। মঠে প্রত্যহ দেব-পূজার বিধান থাকিবে, প্রত্যহ বিদ্যার আলোচনা হইবে; তবেই উহার মঠত্ব রক্ষা হইবে। কেবল ইষ্টকপিণ্ডে মঠ হয় না। অমর বলিয়াছেন "মঠশ্ছাত্রাদি-নিলয়ঃ"—যেখানে বিদ্যার্থীরা থাকে, যেখানে বিদ্যার আলোচনা হয়, তাহাই মঠ। মাতাপিতার স্মৃতির জন্য বিদ্যালোচনাবিহীন, দেবপূজা-বিহীন কেবল ইষ্টকপিণ্ডস্থাপন দেহাত্মবাদীরই শোভা পায়। মৃত আত্মীয়দিগের প্রতি ভক্তি ও স্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ ঐরূপ মঠাদিরও মূল্য আছে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধান এই যে স্মৃতিচিহ্ন কেবলমাত্র জড়পিণ্ডে বা আলেখ্যে পর্য্যবসিত না হয়। উহার সংস্রবে বিদ্যাদানের ও দেবপূজার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মানুষ স্বভাবত যাহা চায়, তাহারই মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে পাইবার বিধান হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব

শ্রাদ্ধে-বিদ্যাদান।

শ্রাদ্ধাদিতে বিদ্যাদানে বিশেষ পুণ্য আছে। এখনও অনেকে শ্রাদ্ধে গীতা-পুস্তক দান করেন। তা ছাড়া শ্রাদ্ধে গীতা বিরাট উপনিষদাদি পাঠের বিধি ও রীতি আছে। কেবল আবৃত্তিতেই ঐ বিধি চরিতার্থ হয় না। ঐ-সকল

পড়িয়া বা পড়াইয়া লোককে শুনাইতে হইবে, বুঝাইতে হইবে। তবেই গীতা-পাঠ, বিরাট-পাঠ, উপনিষৎ-পাঠ সার্থক হইবে।

মাতাপিতার চিতার উপর ইষ্টকপিণ্ড মঠ স্থাপন না করিয়া, সে টাকাটা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে দান করা বিধেয়। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম। সামর্থ্য থাকিলে প্রকৃত মঠ অর্থাৎ দেবালয়-বিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই ভাল, কিন্তু সেরূপ সামর্থ্য অল্প লোকেরই আছে। উহা বহু ব্যয়সাধ্য।

বিদ্যাদানের অর্থ কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিদ্যাদান নহে।

এতক্ষণ বিদ্যাদানের কথা লিখিলাম। কেহ যেন মনে না করেন যে শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাদান কেবল বেদ স্মৃতি পুরাণাদির দান। নন্দিপুরাণে আছে

কলাবিদ্যাস্তথা চান্যাঃ শিল্পবিদ্যাস্তথাপরাঃ।
শস্যবিদ্যা চ বিততা এতা বিদ্যা মহাফলাঃ॥
আয়ুর্ব্বেদপ্রদানেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি।
শ্লোকং প্রহেলিকাং গাথামথান্যদ্বা সুভাষিতম্।
দত্ত্বা প্রীতিকরং যাতি লোকমপ্সরসাং শুভম্॥
(অপরার্ক ১।৩৯৬—৩৯৯ পৃ)

ভবিষ্যোত্তরে আছে

শস্ত্রশাস্ত্র কলাশিল্পং যো যমিচ্ছেদুপার্জ্জিতুম্।
তস্যোপকারকরণে পার্থ কার্য্যং সদা মনঃ॥
বাজপেয়সহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎ ফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি বিদ্যাদানান্ন সংশয়ঃ॥

যুদ্ধবিদ্যা, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, আয়ুর্বিদ্যা, এমন কি শ্লোক প্রহেলিকা গাথা, যিনি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে চান, তাঁহাকে সেই বিদ্যালাভের সাহায্য করিতে হইবে। সহস্র বাজপেয় যাগ ভাল করিয়া করিলে যে ফল হয়, বিদ্যাদানে সেই ফল হয়।

জিলায় জিলায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। সাধারণতঃ কালেজে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা ছাড়াও কলাবিদ্যা (Fine Arts), শিল্পবিদ্যা (Mechanical Arts), শস্যবিদ্যা (Agriculture), আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিখিয়া দেশের লোক ধন্য হউক।

(ক্রমশ)

শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী।

প্রকৃতিতে বর্ণ বৈচিত্র্য

কবিগণ যেস্থানে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া আনন্দলাভ করেন বৈজ্ঞানিক তাহার ভিতর হইতে কোন-না-কোন প্রয়োজনের অর্থ বাহির না করিয়া ছাড়েন না। জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কবিগণ ও সাধারণ মানব এতদিন কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের বিকাশই দেখিয়া আসিতেছিলেন; মানবমাত্রই মনে করিত প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র্য কেবলমাত্র মানবের আনন্দের জন্যই প্রকৃতিতে স্থান পাইয়াছে। তাহা ব্যতীত ইহাদের আর কি অর্থ থাকিতে পারে? আমাদের আনন্দ ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের কৃপায় আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে! তাঁহারা ইহার ভিতর হইতে কত অদ্ভুত তত্ত্বই না বাহির করিয়াছেন? কালে হয় তো আরো কত তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইবে।

বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডারউইন সাহেব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই ভ্রম দূরীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি পৃথিবীর নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা নিয়মের শৃঙ্খলা দেখিতে পান। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সহিত অধিকাংশ প্রাণিদেহের বর্ণের সহিত একটা মিল আছে, তিনি তাহা লক্ষ্য করেন। শুভ্র মেরুপ্রদেশের অধিকাংশ প্রাণীই তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ তুষারের ন্যায় শুভ্র; মরুভূমির পশু ও পাখীদের বর্ণ সাধারণতঃ মরুভূমির বালুকারাশিরই ন্যায় ধূসর; কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীর বর্ণ কাদারই ন্যায় মেটে; যে যে প্রজাপতি যে যে বিশেষ পুষ্পের মধুপান করে তাহাদের পাখার বর্ণ সেই সেই পুষ্পেরই অনুরূপ; যে-সকল কীট পতঙ্গ কচিপাতা অথবা ডাঁটা প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের গায়ের বর্ণ কচিপাতা অথবা ডাঁটারই ন্যায় সবুজ; ঝিঁঝিঁ পোকা গাছের ডালে থাকে, তাহাদের বর্ণও গাছের বাকলের ন্যায়; দাম অথবা পানা-পচা জলাশয়ের মৎস্যের দেহ কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু

পরিষ্কার জল অথবা প্রবাল-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানের মৎস্যের দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল। এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এমন কি পাখীদের ডিমের মধ্যেও তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির সঙ্গে মিল রক্ষা করিবার একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বর্ণ-শৃঙ্খলার অর্থ কি? মহামনস্বী ডারউইন সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। ইহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়াই তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের একটি নিগূঢ় ও গভীর তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিলেন আমরা তাহা হইতেই জানিতে পারিলাম উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষা প্রধানতঃ তাহাদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করিতেছে, আমাদের আনন্দের কারণ হওয়াই ইহাদের একমাত্র সার্থকতা নহে।

এমন কতকগুলি জন্তু আছে, যাহারা সময় বিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেদের দেহের বর্ণ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বহুরূপীর (Chameleon) বর্ণ পরিবর্ত্তন তো প্রবাদরূপেই পরিণত হইয়াছে। কয়েক শ্রেণীর ভেক ও গিরগিটি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ যে-কোন সময়ে যে-কোন বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এমন আরো অনেক জন্তু আছে, যাহারা বিপদের সময় নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের ইচ্ছানুরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে।

ডারউইন ও তাঁহার শিষ্যগণ এইরূপ নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাদের এই কথাটিকে যথাসাধ্য দৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এতদিন পর্য্যন্ত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের এই কথায় সায় দিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ সম্বন্ধে যতই পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চলিতেছে ততই তাঁহাদের এই কথা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। সন্দেহের কারণ—আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও বংশরক্ষার জন্য প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য সকল স্থানে তো খাটে না! যে যে স্থানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদদের আত্ম-রক্ষা ও বংশবৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে আমরা কি বলিব? শুধু দুই এক স্থলে এইরূপ অর্থশূন্য বোধ হইলে কোন কথাই ছিল না। অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের বংশরক্ষার পক্ষে কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকের মধ্যে যখন একটা ঐক্য লক্ষিত হয় তখনই আমরা তাহাকে একটা নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিরই মূলগত কারণ এই ব্যাখ্যাটিকে এখন আর একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

সূর্য্যের শুভ্ররশ্মির মধ্যে যে রামধনুর সাতটি বর্ণ নিহিত আছে একথা এখন আর কাহারো নিকট অপরি-জ্ঞাত নহে। সূর্য্যকিরণের এই সাতটি বর্ণ ভূতলের সকল পদার্থের উপরই আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সকল পদার্থেরই সূর্য্যকিরণের এই সাতটি বর্ণকে একসঙ্গে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; কেহ হয় তো একটি, কেহবা দুইটি, কেহবা তিনটি, কেহবা চারিটি, পাঁচটি, ছয়টিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, বাকিগুলিকে ফিরাইয়া দেয়। যে পদার্থের যে বর্ণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই আমরা সেই পদার্থের সেই বর্ণ দেখিতে পাই। ভূতলের সকল পদার্থের প্রকৃতি একরূপ নহে, সুতরাং প্রকৃতিতে যে বিচিত্র বর্ণের স্থান হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবে কে? কাহার নিকট হইতে আমরা ইহার যথাযথ উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। বিজ্ঞানের মতে সূর্য্যেরই শুভ্ররশ্মি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের উপর পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ সূর্য্যের শুভ্ররশ্মি ও আকাশের নীল বর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও বিজ্ঞান এই কথাই বলে।

বিজ্ঞান এতদুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু তবু তো ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। বিজ্ঞানের এই

ব্যাখ্যা কি সকল স্থানেই খাটে? একই বৃক্ষের একই ফুলের মধ্যে অথবা একই জন্তুর গায়ের লোমের মধ্যে কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সার্থকতা কি? বিজ্ঞান বর্ণ-বৈচিত্র্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাতে কি এই প্রশ্নের সমাধান হয়

যে-সকল স্থানে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বর্ণ-বৈচিত্র্যকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সহায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সকল স্থানেই এই নিয়ম প্রয়োজ্য হইতে পারে কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। উত্তরমেরু প্রদেশের প্রাণিদেহের বর্ণ শুভ্র হওয়ায় আমরা স্থির করিয়া লইয়াছি ইহা তাহাদের আত্মরক্ষারই প্রয়াস। বিজ্ঞানের নিকট হইতে কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান বলে উত্তাপ ও আলোকের অভাবই উত্তরমেরুতে এইরূপ শুভ্রবর্ণের কারণ।

কতক অংশে বিজ্ঞানের এই কথা সত্য হইলেও সর্ব্বস্থানে ইহার মিল কোথায়? শীতমণ্ডলে উজ্জ্বলবর্ণের উদ্ভিদ ও প্রাণীরও তো অভাব নাই।

এই তো গেল সাধারণ ভাবে দেখা; বিশেষ বিশেষ উদাহরণ উদ্ধৃত করিলে আমাদের আরো বিপদে পড়িতে হয়। শুভ্র পালকবিশিষ্ট পাখীদের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য নিয়ম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। অধিকাংশ শুভ্র পাখীই জলচর; বিশেষতঃ সামুদ্রিক পাখীদের মধ্যে এই জাতীয় পাখীর সংখ্যাই বেশী। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে শুভ্রবর্ণের স্থলচর পাখী খুব অল্পই দৃষ্ট হয়—এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য যদি একমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ও বংশবৃদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে এই নিয়মটি সামুদ্রিক পাখীদের বেলায় কতদূর খাটিতেছে তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত

সত্য সত্যই কি শুভ্র পালক তাহাদিগকে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে? কই তাহা তো মনে হয় না। শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে প্রতিবৎসরই তো অসংখ্য অসংখ্য গাংশালিক নিহত হয়। স্থলচর পাখীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি পূরাপূরীভাবে খাটিতেছে বলিয়া তো মনে হয় না। মানুষ অথবা অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে, কেবলমাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদদের আত্মরক্ষার জন্য এত বিচিত্র বর্ণ প্রকৃতিতে স্থান পাইয়াছে, তাহা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়?

সূর্য্যকিরণই প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ ইহা মানিয়া লইয়াও আমাদের নিষ্কৃতি পাইবার জো নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতু এবং বহুমূল্যবান উজ্জ্বল প্রস্তর প্রভৃতির জন্ম মৃত্তিকা-গর্ভে। মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে খনন করিয়া বাহিরে আনিবার পূর্ব্বে সূর্য্যের আলোক অথবা উত্তাপের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু উজ্জ্বলতায় ধরণীপৃষ্ঠের কোন্ পদার্থ ইহাদের সমকক্ষ? সমুদ্রের অতলগর্ভে এমন অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বাস করে যাহারা উজ্জ্বলতায় ধরণীপৃষ্ঠের কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; অথচ তাহাদের বাস স্থানে কোন দিনও সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের প্রবেশ লাভ ঘটে নাই।

বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উদ্ভিদজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগকে কম গোলমালে পড়িতে হয় না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে কোন কোন বিশেষ ফুল অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় সেইরূপ বিশেষ বিশেষ ঋতুতেও পুষ্পমধ্যে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের আধিক্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এবং আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই নিয়মটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, আমাদের দেশে বর্ষায় ও শরতে, বনে ও বাগানে শাদা ফুলের বাহারই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, উদাহরণ স্বরূপে বেল, জুঁই, মালতী, মল্লিকা, টগর, গন্ধরাজ, করবী, রজনীগন্ধা, কাশ, শিউলি প্রভৃতি ফুলের নাম করা যায়। বসন্তকালের অধিকাংশ ফুলই হলুদে অথবা হলুদে শাদায় মিশানো; বন্যপুষ্পের অধিকাংশই হলুদে। অন্যান্য বর্ণের ফুল যে এ সময়ে একে-

বারেই প্রস্ফুটিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু এই সময়ের অধিকাংশ পুষ্পই এই দুইটি বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ।

ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এক এক জাতীয় ফুলকে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। জুঁই জাতীয় ফুলকে একমাত্র শাদা ভিন্ন অন্য কোনো বর্ণের হইতে দেখা গিয়াছে কি? জবা জাতীয় ফুল সাধারণতঃ লাল অথবা শাদায় লালে মিশানো। জুঁইকে জবার ন্যায় লাল অথবা জবাকে জুঁইয়ের ন্যায় খাঁটি শাদা হইতে সম্ভবতঃ কেহ কখনো দেখে নাই। গোলাপ ফুলের মধ্যে প্রায় সকল বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু খাঁটি নীলবর্ণ কোন গোলাপের মধ্যে মোটেই দেখা যায় না। বিজ্ঞান অথবা প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না।

উদ্ভিদরাজ্য সম্বন্ধেও এই কথা; প্রাণিজগতেও বর্ণ-বৈচিত্র্যের জটিলতার অভাব নাই। জন্তু-জানোয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; একশ্রেণী মাংসাশী ও অন্যশ্রেণী নিরামিষাশী। বর্ণ সম্বন্ধে এই দুই শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। মাংসাশী জানোয়ারদের অধিকাংশেরই গায়ে ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল গোল চক্র আঁকা। উদাহরণ স্বরূপে কুকুর, বিড়াল, বাঘ, চিতা, হায়েনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; শৈশবাবস্থায় সিংহের শরীরেও ডোরা ডোরা দাগ দেখা যায়। কিন্তু তৃণভোজী জানোয়ারদের মধ্যে কদাচিৎ এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে যে এই ডোরাকাটা অথবা গোল চক্রবিশিষ্ট জন্তু একেবারে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। জেব্রা, জিরাফ এবং কয়েকজাতীয় হরিণের গায় এইরূপ ডোরা ডোরা দাগ এবং গোল গোল চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এই ডোরা ডোরা দাগ সম্বন্ধেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার মতো বিশেষত্ব আছে। মাংসাশী জানোয়ারদের গায়ের দাগ সাধারণতঃ কোন উজ্জ্বল বর্ণের উপর কালো ডোরা আঁকা, কিন্তু তৃণভোজী জন্তুদের ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পাখীদের মধ্যেও এই ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল চক্রের অভাব নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ পাখীদেরও অধিকাংশই শিকারী পাখী। মাছের মধ্যেও এইরূপ চিত্র-বিচিত্র বর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

পশুদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে আরো একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। পশুদের সমস্ত শরীর ভিন্ন ভিন্ন লোমে আবৃত হইলেও মেরুদণ্ডের উপরিভাগ সাধারণতঃ ঈষৎ কালো এবং বক্ষঃস্থলের লোম সাধারণতঃ ঈষৎ শুভ্র হইতে দেখা যায়। মৎস্যের বেলায় কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই স্থানে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রয়াসই ইহার মূলগত কারণ বলিয়া মনে হয়। মৎস্যের নিম্নদেশ হইতে বিপদের আশঙ্কা বেশী, সুতরাং ইহাদের নিম্ন অংশ ঈষৎ কৃষ্ণ হওয়ায়, জলের মধ্যে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার সঙ্গে ইহারা সহজেই মিশিয়া যায়। কিন্তু পশুদের উপরিভাগ হইতে বিপদের আশঙ্কা বেশী, সেইজন্য ইহাদের মেরুদণ্ডের উপরিভাগ কালো লোমে আবৃত হওয়ায় ইহারা সহজেই সবুজ বনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারে।

বন্যজন্তুদের মধ্যে গৃহপালিত জন্তুদের মতো এত চিত্রবিচিত্র জন্তু খুব অল্পই লক্ষিত হয়। এইরূপ হইবার একটি কারণ এই মনে হয়, যে, গৃহপালিত জন্তুদের যেরূপ চিত্র-বিচিত্র জন্তুর সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয় বন্যজন্তুদের সেরূপ হয় না। পাখীদের মধ্যেও এই বিশেষত্বটুকু আছে। পায়রার নাম উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যায়।

পাখীদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও কয়েকটি নিয়ম লক্ষ্য করিবার মতো আছে। অধিকাংশ সঙ্গীতকারী পাখীদের বর্ণ ফেকাসে; উজ্জ্বল পালকবিশিষ্ট পাখীদের কণ্ঠস্বর সাধারণতঃ কর্কশ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দাগ কেবল মাত্র কুক্কুটজাতীয় পাখীর মধ্যেই লক্ষিত হয়।

এইবার পতঙ্গরাজ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই স্থানেও জটিলতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। ডাঁসের (moth) পাখার বর্ণ সাধারণতঃ ফেকাসে। অনেকের মতে দিনের বেলায় সূর্য্যালোকে বাহির না হওয়াই এইরূপ ফেকাসে হই-

বার কারণ। কিন্তু সর্ব্বস্থানে তো এই নিয়মটি খাটে না। এমন অনেক ডাঁস আছে যাহারা দিনে মোটেই বাহির হয় না অথচ তাহাদের পাখার বর্ণ যথেষ্ট উজ্জ্বল; আবার যাহারা দিনে ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়ায় তাহাদের পাখার বর্ণ ফেকাসে। এ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জো নাই; বরঞ্চ প্রজাপতির যে পাখাগুলি অন্যান্য পাখার ভাঁজের মধ্যে থাকে সেই গুলিই সাধারণতঃ অন্যান্য পাখা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর।

এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এপর্য্যন্ত ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারেন নাই। কোন দিন ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে কি না কে জানে? তবে বিজ্ঞান যেরূপ আশ্চর্য্য-কর্ম্মী তাহাতে একেবারে নিরাশ হইবারও কারণ নাই।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

প্রাচীন ঋষিগণ ও উদ্ভিদতত্ত্ব

ইংরাজী উদ্ভিদবিদ্যা পাঠকালে মনে হইত পত্র-পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ শস্যশ্যামল ভারতভূমিতে বাস করিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ লিনিয়স (Linnœus), ডি ক্যাণ্ডোল (De Candole) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় উদ্ভিদশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন কি না? যাঁহারা বাল্যকাল হইতে পুষ্পচয়ন ও তাহার দ্বারা পরম-পিতার পূজা করিতেন, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নির্জ্জন অরণ্যে বসবাস করিতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যাঁহাদিগের বালিকারাও আশ্রমস্থিত বৃক্ষাদির জীবন রক্ষার জন্য সযত্নে আলবালে জলসেচন করিতেন, কখন বা রসাল বৃক্ষের সহিত মাধবীলতার বিবাহ দিয়া সখীগণ মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহারা যে চিরসহচর উদ্ভিদ-দিগের বিষয়ে আলোচনা করিতেন না এরূপ অনুমান করা যায় না; নতুবা কবিরাজী শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল কিরূপে? কি উপায়ে তাঁহারা অবগত হইলেন যে অনেক উদ্ভিদ মানবের রোগ নিবারণে সক্ষম? বিশল্য-করণীর রক্তস্রাব নিবারণ করিবার ক্ষমতা, গোয়ালে লতার পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ক্ষত আরোগ্যের শক্তি কখনই বিনা পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

ফলতঃ অতি প্রাচীনকালেও আর্য্যঋষিগণ উদ্ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিলেন বলিয়াই উদ্ভিদকে স্থাবর জীব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বৃক্ষাদির উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ জীবেরই ন্যায় কালসাপেক্ষ। ইহাদিগের মধ্যেও শৃগালাদি জীবের ন্যায় মাংসাশী উদ্ভিদের অভাব নাই। মাংসাশী বৃক্ষের বিষয় অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। বেদেরা আঠার সাহায্যে যেরূপে পক্ষী শিকার করে, 'sundew' নামক উদ্ভিদ সেইরূপে পিপীলিকা শিকার করিয়া থাকে। মধুর লোভে হতভাগ্য পিপীলিকা পত্রস্থিত আঠায় আটকাইয়া জীবন হারায়। Pitcher Nepenthus নামক উদ্ভিদের পত্রে ঘটের ন্যায় পাত্র জন্মে। ঐ-সকল পত্রের অভ্যন্তরে মধুর ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহার লোভে হতভাগ্য মক্ষিকা যেই উহার মধ্যে প্রবেশ করে, অমনি ঘটের ঢাকুনি বন্ধ হয় এবং মক্ষিকাটি ঐ রসে জীর্ণ হইয়া যায়। আবার যে কৌশলে জীবপ্রবাহ রক্ষা পাইয়া থাকে, উদ্ভিদ-বংশ রক্ষার জন্য প্রকৃতিদেবী সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। জীবের মধ্যে যেরূপ স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, উদ্ভিদরাজ্যেও সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। পুষ্পের পরাগ-নিষেকক্রিয়া, বীজোৎপত্তি, বংশবিস্তার, আত্মরক্ষার কৌশল প্রভৃতি আলোচনা করিলে জীব ও উদ্ভিদে যে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই, জগতের সর্ব্বত্রই যে একই বিরাট নিয়ম কার্য্য করিতেছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। দারুণ গ্রীষ্মের সময় উহাদিগের মৃতপ্রায় অবস্থা, আবার বর্ষা সমাগমে সতেজভাব ও পুষ্পাদির উদ্ভব, অগ্নিদাহে অকাল-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় অবলোকন করিয়া কে না স্বীকার করিবেন যে উহারাও জীবের ন্যায় সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে? ফলতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জীবের ন্যায় উদ্ভিদের সুখদুঃখ-বোধ প্রমাণ করিয়াছেন। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন ঋষিগণ যে উদ্ভিদদিগকে জীব-

মধ্যে গণ্য করিবেন—গতিশক্তিবিহীন একপ্রকার জীব বলিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা জানিতেন "সকল ভূতের মধ্যে তিন প্রকার বীজ রহিয়াছে:— অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি।" ছান্দগোপনিষদ্। ৬।৩

"বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি।" ঐতরেয় উপনিষদ্।৫।৩।

"কাল-পর্য্যায়ে যাহা পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হয় উহাকে উদ্ভিজ্জভূত বলা যায়")।

"ভিত্ত্বা তু পৃথিবীং যানি জায়ন্তে কালপর্য্যয়াৎ।
উদ্ভিজ্জানি চ তান্যাহু র্ভূতানি দ্বিজসত্তমাঃ॥—মহাভারত।

ভগবান্ মনু উদ্ভিদজাতিকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—

ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান ও বল্লী। সমুদায় উদ্ভিদই স্থাবর (জীব)। তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে ও অন্য কতকগুলি রোপিত কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বহুপুষ্পযুক্ত ও ফল পাকিলেই মরিয়া যায় উহারা ওষধি (যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি)। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয় তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্পিত হউক বা ফলবন্ত হউক উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ কহে (যেমন বট, ডুমুর ইত্যাদি)।

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ড প্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ বহুপুষ্প ফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষা স্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছ গুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুণা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ॥ মনু ১।৪৬-৪৯।

বাস্তবিক বট বা ডুমুরের যে ফুল হয় না তাহা নহে। যাহাকে বটের ফল বা ডুমুর বলা হয় উহার অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প জন্মিয়া থাকে। সেই সকল ফুল হইতে অসংখ্য বীজ উৎপন্ন হয়। রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির পুষ্পগুচ্ছকে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু বট বা ডুমুরের পুষ্পগুচ্ছ সাধারণ লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। ফলের আকৃতিবিশিষ্ট একটী আবরণের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এই জন্যই বটাদিবৃক্ষকে পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। গোলাপাদির শাখা হইতে নূতন উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবকে (amoeba) বহুঅংশে বিভক্ত করিলেও নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ফল পাকিলে অর্থাৎ সন্তান উৎপন্ন হইলে ধান্য যবাদি ওষধি যেরূপ মরিয়া যায়, কাঁকড়া, মাকড়শা প্রভৃতি অনেক জীবও সেইরূপ সন্তান প্রসব করিয়াই জীবলীলা সাঙ্গ করে। সুতরাং জীব ও উদ্ভিদের মূলতঃ পার্থক্য কোথায়?

গুচ্ছ (মল্লিকাদি) ও গুল্ম (বংশাদি) নানা প্রকার। তৃণজাতিও বহুবিধ। প্রতান (লাউ কুমড়া ইত্যাদি) ও বল্লী (গুড়চাদি) বহু প্রকার। ইহারা বহুরূপ কর্ম্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন। ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহারা সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে! একই পিতামাতার সন্তান হইয়াও কেহ উন্মাদ, কেহ বা জগৎবিখ্যাত কবি, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহবা চিররুগ্ন, আবার কেহবা সুস্থদেহ; এক ভাই রাজার পালিতপুত্র ও চিরসুখী, আবার অন্য ভাইয়ের দিনান্তে শাকান্নও যোটে না। সেইরূপ একই ঝাড় হইতে উৎপন্ন একখানা বাঁশ হইতে দেবপূজার জন্য পুষ্পপাত্র (সাজি) ও অপর বাঁশ হইতে মেথরের ঝাঁটা প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা জীবের ইহ-জীবনের সুখদুঃখ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা যে উদ্ভিদদিগকে কর্ম্মফলে তমোগুণযুক্ত চলৎশক্তিবিহীন জীব বলিয়া মনে করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বৃহৎ-শার্ঙ্গধর-কৃত পাদপ-বিবক্ষা-প্রকরণেও উদ্ভিদদিগকে গুণানুসারে বনস্পতি (বট, ডুমুর ইত্যাদি), দ্রুম (আম, জামাদি), লতা, ও গুল্ম এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষিশাস্ত্রানুসারে উদ্ভিদজাতি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে:—১। অগ্রবীজ অর্থাৎ যাহাদের আগা কাটিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয়। ইহার অপর নাম কাণ্ডজ বলা যাইতে পারে, যেমন গোলাপ, বট ইত্যাদি। ২। মূলজ অর্থাৎ যাহাদের মূল পুঁতিলে গাছ জন্মে অর্থাৎ কন্দজ (কচু, পদ্ম ইত্যাদি)।

৩। পর্ব্বযোনি অর্থাৎ যাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ জন্মে (আখ)। ৪। স্কন্ধজ অর্থাৎ যাহারা অন্য-গাছের গুঁড়ির উপর জন্মে (epiphyte or parasite, যেমন আলোকলতা, রাস্না, ধেয়ো orchids, ইত্যাদি)। ৫। বীজরুহ অর্থাৎ বীজ রোপণ করিলে যাহাদের গাছ জন্মে (নারিকেল, আম ইত্যাদি)। ৬। সম্মূর্চ্ছজ—ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ পরস্পর সমাহিত হইয়া কর্দ্দম-মৃত্তিকাকে পাক করিলে এবং তাহা হইতে যে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে তাহারাই সম্মূর্চ্ছজ।

আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ উদ্ভিজ্জের জাতি, শ্রেণী, নাম ও লক্ষণ সকল উক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বীজ, অঙ্কুর, মূলাদির উৎপত্তির বিষয় বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায়ই অবগত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ অপেক্ষাও সমধিক জানিতেন—আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুণ পর্য্যালোচনা করিলেই উহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। রাঘবভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুষ্ম বিপাচিত।
বস্তুনা ব্যূহমানা তু বীজত্বং প্রতিপাদ্যতে॥
তথাব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভসা পুনঃ।
উচ্ছূনত্বং মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং প্রয়াতি চ॥
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তি রঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাত্মকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবং পুনঃ॥"

"জলসিক্ত ভূমি অভ্যন্তরস্থ উষ্মা দ্বারা পচমান হইলে সেই পাকজনিত বিকার বিশেষ যখন বায়ু কর্ত্তৃক গৃহীত বা সংঘাতভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিদ-জন্মের বীজ অর্থাৎ উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। ঐ অব্যক্ত বীজ হইতে প্ররোহ জন্মে। সেই প্ররোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজ উৎপন্ন হয়। ব্যক্ত বীজসকল জলে আর্দ্র হইলে প্রথমে ফুলিয়া উঠে ও মৃদুত্ব বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে তাহাই ভবিষ্যৎ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ হইয়া উঠে। সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের পরিণামে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে উহার আত্মা বা দেহভাগ (কাণ্ড) আবার কাণ্ড হইতে প্রসব (পুষ্প ফলাদি) জন্মে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উদ্ভিদের তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেন—মূল, কাণ্ড ও পত্র; ফুল, ফল বা বীজ পত্রেরই পরিণাম বলিয়া থাকেন। এমন দিন হয়ত আসিবে যখন তাঁহারাও আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় বলিবেন যে পত্র হইতেই কাণ্ডেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। পত্র বিনা যে উদ্ভিদ দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না, পত্রই যে ফুস্ফুস-স্থলীর কার্য্য করে ও শ্বাস প্রশ্বাসের প্রধান উপায় তাহা যখন প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তখন পত্রের একান্ত অভাবে যে উদ্ভিদদেহ অর্থাৎ কাণ্ড থাকিতে পারে না ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই অর্থাৎ পত্রই কাণ্ড ও ফুল ফলাদির কারণ বলিতে পারা যায়।

এতদ্ভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে ত্বক্‌সার, অন্তঃসার, নিঃসার প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। এইহেতু সহজেই স্বীকার করিতে হয় যে প্রাচীন ঋষিগণ উদ্ভিদতত্ত্ব অবশ্যই অবগত ছিলেন। কৃষিপরাশর, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। চরক-মুনির নিম্নলিখিত বচনটিও প্রাচীন উদ্ভিদ-তত্ত্বের পরিচায়ক:—

"মূলত্বক সারঃ নির্য্যাস নাল স্বরস পল্লবাঃ।
ক্ষীরা ক্ষীরং ফলং পুষ্পঃ ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।
পত্রানি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদোগণঃ।

তবে প্রাচীন আর্য্যপ্রণালী বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অবলম্বিত পন্থা হইতে অনেকটা পৃথক্ ছিল। তাঁহারা কোন ব্যক্তির পরিচয় দিবার সময় জীবনী লিখিবার সময়—আধুনিক কালের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করিয়া ঘড়ি ধরিয়া সন তারিখ বেলা ঘণ্টা মিনিট লিখিতেন না, জন্ম তারিখের হিসাবই থাকিত না। ব্যক্তিটির জীবনের মূল ঘটনা ও গুণাবলী বিশদভাবে প্রদর্শন করিতেন মাত্র। কারণ পাঠকের পক্ষে—সমগ্র মানবের পক্ষে—উহাই প্রকৃতপক্ষে জানিবার—শিখিবার বিষয়। জন্মের এক আধ ঘণ্টা বা দিনের ইতর বিশেষে বিশেষ কিছু যায় আসে না। উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা কালেও সেই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা Roxburghর উদ্ভিদবিদ্যার ন্যায় পত্রপুষ্পাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাযুক্ত গ্রন্থের উত্তরাধিকারী হইতে পারি নাই। ইহাতে যে বাস্তবিকই আমাদের কিছু ক্ষতি হয় নাই তাহা নহে, কবিরাজী গ্রন্থে কাকলী, ক্ষীরকাকলী, প্রভৃতি এমন অনেক উদ্ভিদের নাম উল্লেখ আছে যে উহাদিগকে নিঃসংশয়ে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। ডাক্তারী

জগদ্ধাত্রী।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

পরীক্ষোত্তীর্ণ কবিরাজ মহাশয়েরা যদি দেশীয় উদ্ভিদগণের আকারাদির বর্ণনা পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে করিয়া উহার সহিত আয়ুর্বেদোক্ত গুণাবলী যথাক্রমে সংযোজিত করেন তবে বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জীব ও উদ্ভিদের সাম্য, আঘাত পাইলে উভয়েরই একইরূপ সাড়া দিবার প্রণালী, সুখদুঃখ বোধ ইত্যাদি জটিল বিষয় আধুনিক প্রণালীমতে প্রমাণ করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা শৃগালাদি নিকৃষ্ট জীবের আত্মা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন সেই-সকল পণ্ডিতদিগের পক্ষে অবশ্য পরমাত্মার সর্ব্বঘটে বিদ্যমানতা বিশ্বাস করা বা অনুভব করা বাস্তবিকই কষ্টকর। দূর হইতে দেখিলে যাহাদিগকে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি বলিয়া মনে হয় এইরূপ অপূর্ব্ব মনোহর ঋতুপুষ্প-পরিপূর্ণ আনন্দোৎফুল্ল উদ্ভিদদিগকেও এইজন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যঋষিদিগের ন্যায় স্থাবর জীব বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন ঋষিদিগের এইখানেই বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

ব্রহ্মবাদ—প্রাচীন ও নবীন

ভারতীয় ব্রহ্মবাদ অতি প্রাচীন বস্তু। "একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বলিয়া ঋগ্বেদে যে একেশ্বরবাদের সূচনা হইয়াছিল, তাহাই উপনিষদে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রহ্মতত্ত্ব আর কোথাও প্রচারিত হইয়াছে কি না তাহা জানি না। জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত এই সভ্যতার যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রও এই উপনিষদ্-সকল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জিনিষ আর জগতের শাস্ত্রভাণ্ডারে পাওয়া যায় নাই। তাই বলিয়া এই ব্রহ্মবাদের আনুষঙ্গিক যাহা কিছু সকলই যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। এই দুই তিন হাজার বৎসর জ্ঞানবিজ্ঞানাদিতে যে মহা বিপ্লবকর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আজ সহসা সেই উপনিষদ্-যুগে যাইয়া উপনীত হইতে পারি না। তাহার মত অসম্ভব ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নতুবা তাহা কোনও কাজে লাগিবে না; মৃতজীবের কঙ্কাল যেমন যাদুঘরে থাকে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মজ্ঞানকে যদি আমরা তেমনি পুস্তকাগারের এক কোঠায় আবদ্ধ করিয়া না রাখিতে চাই, তাহা হইলে উহাকে জীবনে সাধন করিতে হইবে। তবেই উহা জীবন্ত হইয়া জগতের কাছে আত্ম-প্রকাশ করিবে। এই কার্য্য সাধনের পথে দুইটী বিঘ্ন আছে—বিঘ্ন দুইটী হইতেছে সন্ন্যাস ও দেববাদ—উভয়ই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী, উভয়কেই পরিহার করিতে হইবে।

ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইহার সঙ্গে জাতিভেদের অহি-নকুল সম্বন্ধ—উভয়ে একসঙ্গে থাকিতেই পারে না। পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে ভ্রাতার সঙ্গে বাদ চলে না। গৃহে ব্রহ্মজ্ঞান আনিলে জাতিভেদ থাকে না, অথচ বর্ণাশ্রম ছাড়াও সমাজ চলে, এ জ্ঞান পরিপুষ্ট হইবার সুযোগও তখন হয় নাই, এবং যাহা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতনের সম্মুখীন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তখন জাগে নাই; তাই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাকে চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। তখন দেখা গেল ইহা বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলেই সব ছাড়িয়া ফকীর হইয়া যাইতে হইবে? এরূপ স্থলে হয় ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে; না হয়, গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যাহা, মানবসভ্যতা ও সাধনার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ যাহা, যাঁহারা এই বিকাশ লাভ করিতেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ সকলেই সেই সম্পদ লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে, তাহা

হইতেই পারে না। তাই তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন যতক্ষণ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া উপাসনা করা হইবে ততক্ষণ কেহ জাতিভেদ মানিতে পারিবে না, মানিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মচক্রে মহেশানি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ। কিন্তু চক্রের বাহিরে আসিলেই জাতিভেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন। অর্থাৎ স্কুলে গোল হইলেও পৃথিবীটা বাড়ীতে যে-চ্যাপ্টা সেই চ্যাপ্টা। এ নিতান্তই বিরোধী ব্যাপার। এমন করিয়া মানবজীবন চলে না, অখণ্ড মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই, ব্রহ্মজ্ঞান স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সব জাতি একত্র আহার করিতে পারে, না করিলেই অপরাধ। স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি, পাপ হইবে এই ভয়ে পাণ্ডার মুখে ভাত তুলিয়া দিলেন বটে কিন্তু সমস্ত শরীর কম্পিত হইল, একবারের বেশী দু'বার হস্ত উঠিল না।

আমাদের ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই তিনি রহিয়াছেন। আমাদের প্রতি-চিন্তা, প্রতি-বাক্য, প্রতি-কার্য্য তাঁহারই সত্তাতে পরিপূর্ণ। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, "যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—আমাদের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা, সুতরাং আমাদের ব্রহ্মচক্র পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদ অনুশীলন করিবার অবসরই থাকিতেছে না। অন্যদিকে আবার এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হিন্দুর ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট মিশন্। আমরা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম জগৎকে বিলাইতে যাইতে পারি না। যে ধর্ম্ম আমরা নিজেরাই ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছি, তাহা জগৎকে বিলাইতে যাইব কোন্ লজ্জায়? তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবে এ ধর্ম্ম তোমার কি উপকারে আসিয়াছে তখন কি চক্ষুস্থির হইবে না! বিশেষতঃ, যাহারা সংসারে থাকিয়া পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান কি তাহাদেরই বেশী উপকারে আসিবে না? ইহা সন্ন্যাসীর ভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সংসারীর অত্যাবশ্যকীয় নিত্য অবলম্বনীয় বস্তু। ইহা না বুঝিয়াই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মহা সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা আর এখন সন্ন্যাসীদিগকে আমাদের জীবনের সার বস্তু হরণ করিয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে দিতে রাজী নহি। সকলেই জানেন, স্পেন এক সময়ে কেমন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন নিভিয়া গেল। কেন? সুপ্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গ্যাল্টন বলেন যে Inquisition তাহার কারণ। হুকুম হইল, যিনি প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তাহাকেই হত্যা করা হইবে। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার ফল হইল এই, যাহারা প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারিল না, তাহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ইহাদের দ্বারা যে-সমাজ গঠিত হইল তাহা যে অবনতির দিকে যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহারা ধর্ম্ম ছাড়িল না তাহারা হয় দেশত্যাগ করিল না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। এইরূপে মহত্ত্বকে উপড়াইয়া ফেলিলে সমাজ যে কেবল আগাছার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর কি কোন সংশয় থাকিতে পারে? যুগযুগান্ত ধরিয়া আমাদের সমাজের এই দশাই ঘটিয়াছে। যিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন, হয়, তিনি তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন; না হয়, সংসারের খাতিরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। যদি চলিয়া গেলেন, তো শিক্ষা ও বংশানুক্রম দুই দিক্ হইতেই সমাজ এই উচ্চ সাধনার সুফল হইতে বঞ্চিত হইলেন। আর যদি থাকিয়া গেলেন তবে তিনি বুঝিলেন এবং বুঝাইলেন উচ্চ ধর্ম্ম সংসারীর জন্য নহে। ইহার বিষময় ফল সমাজের উপর বিশেষ ভাবেই ফুটিয়াছে। কোন উচ্চনীতির কথাও শুনিলে লোকে বলে, সংসারে থাকিয়া ওসব চলে না। ধর্ম্ম ও সংসার এই দুইএর মধ্যে একান্ত বিরোধ ঘটাইয়া মানব জাতির যে অনিষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনিষ্ট আর কোনও একটী বিষয়ের দ্বারা হইয়াছে কি না সন্দেহ। জাতীয় জীবনের যাহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা আর এই অমঙ্গলের পথ অবরোধ না করিয়া পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক্ সাধনা এই গৃহেই

করিতে হইবে। অতএব জাতিভেদের অবসর-গ্রহণ অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় কথা দেববাদ। উপনিষদের সময়ে পৌত্তলিকতা ছিল না। পৌত্তলিকতা ভারতীয় ধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যুকালীন দান। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মও এত সূক্ষ্ম ও নির্গুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে উপাসনার জন্য মূর্ত্তিপূজা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম তো আদৌ উপাস্য বাদ দিয়াই আরম্ভ হয়। পরে যখন উপাস্য গৃহীত হইলেন তখন বহু মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। উপাসনার প্রথমেই তাঁহারা মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। কেন না, অমূর্ত্তের সঙ্গে আদিতেই যাহাদের পরিচয় নাই পরিণামে ভগ্নদশায় তাহারা তাঁহাকে পাইবে কোথা হইতে। ইহাই এদেশে মূর্ত্তিপূজার ইতিহাস। এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরোপাসনা বাদ দিয়া মানুষকে তাহার নিজশক্তির উপর দাঁড় করাইয়া ধর্ম্ম গড়িতে যাইলে যে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। এত বড় উচ্চ নীতিতত্ত্বের উপরে যাহার ভিত্তি, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার দিনে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ পূজা আর কোন মানুষই পাইতে পারে না সেইরূপ পূজার অধিকারী বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব যাহার নেতা এবং অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি যাহার রক্ষা ও পরিপোষণে ব্যয়িত, সেই ধর্ম্ম ভীষণ তান্ত্রিক বামাচারে দেশকে ডুবাইয়া অন্তর্হিত হইল, সেকথা ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সাক্ষ্য পাইয়াও যাহারা আবার ঈশ্বরবিহীন নীতির উপরে মানব-সমাজ গড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজেরাও বিনাশকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন আর সমাজকেও বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, ঋষিগণ দেবতাদের অস্তিত্ব মানিতেন এবং তাঁহাদের পূজারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপভাবে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মবাদের কোনও হানি হয় না। তাঁহারা দেবতাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা মানিতেন না। দেবতার শক্তি ব্রহ্মশক্তিরই প্রকাশ। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার আখ্যায়িকার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে, যে, মানুষ আগে যাহাই মনে করুক না কেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারে দেবতাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বে যদি ব্রহ্মবাদের কোনও হানি না হয়, তবে মানুষের অপেক্ষা কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবের অস্তিত্বে ব্রহ্মবাদের হানি হইবে কেন? আর দেব-পূজার যে ব্যবস্থা, সেরূপ পূজা উচ্চ শ্রেণীর জীবকে আমরাও করিয়া থাকি। লাট বড়লাট রাজরাজড়ারা কোন উপকার করিলে আমরা কি তাহাদের স্তুতিবাদ করি না? না, প্রত্যুপকারের আশায় উপঢৌকনাদি দেই না? মানুষের দ্বারা যে, দেবতার পূজা, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দেবতারা জলবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের শস্য উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তোমরা যজ্ঞধূমের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা কর, নতুবা দান গ্রহণ করিয়া প্রতিদান না করার জন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। নিতান্ত চোরের ন্যায় তাহাদের দান গ্রহণ করিও না।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ৩।১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ॥

৩।১২। গীতা।

কিন্তু তাঁহাদের এই দেববাদের মধ্যে মানবজাতির শৈশবের পরিচয় মাত্র পাই। শিশু যেমন সকল বস্তুকেই স্বানুরূপ ব্যক্তিত্বের আরোপ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে, মানব জাতি শৈশবেও তাহাই করিয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে দেরী হয় না। আমরা এই প্রাকৃতিক শক্তিসত্ত্বের কাছে যেরূপ অসহায়, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী অসহায় ছিলেন। এক দিকে হঠাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া সব বিনাশ করিয়া দিল, আবার কাজের বেলায় সাধ্য সাধনা করিয়াও পাওয়া গেল না। তখন উপহার লইয়া উপস্থিত হওয়ার মত স্বাভাবিক আর কি আছে? আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া এই শক্তিসমূহ কার্য্যে লাগাইতেছি। সুতরাং আমাদের কাছে দেবতাদের নিকট উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা

চলিয়া গিয়াছে। আমরা শারীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি যে দেহযন্ত্র (Organism) ছাড়া কোনও পরিমিত ব্যক্তিত্ব বাস করিতে পারে না, এবং কোনও বৈজ্ঞানিক চাতুরীর দ্বারা জল বায়ু অগ্নিকে দেহযন্ত্র বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতাগণ কাজেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা দেবতা মানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অল্পই নৈতিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। এবং দেবোপাসকদের ধর্ম্মভাবের প্রতিও বিশেষ সমীহা করিতেন না। উভয় দলের মধ্যে বিশেষ প্রীতির বন্ধন ছিল না। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, যে, যিনি দেবতার উপাসনা করেন তিনি দেবতার পশু। মানুষ যেমন চায় না তাহার পশুর সংখ্যা কমুক, তেমনই দেবতারাও চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হউক। কেননা, তাহাতে দেবতার পশু কমিয়া যায়। ঋষিরা দেবতা ও দেবোপাসক উভয়কেই নিতান্ত কৃপার পাত্র মনে করিতেন। ঋষিরা দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বরং তাঁহাদের উপহাসেরই বস্তু ছিলেন—কোন কাজেও আসিতেন না, কোন বাধাও দিতেন না। যেন বিশ্বাস করিতে হয় বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নহে! এ বিশ্বাস যেন ছিল কতকটা প্রাচীনকালের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তাঁহাদের কাছে দেবতার অস্তিত্ব কার্য্যতঃ অনস্তিত্বের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং যখন পূর্ব্বমীমাংসাকার তর্ক তুলিলেন ইন্দ্র বলিয়া যদি কোন দেবতা বাস্তবিকই থাকিতেন তবে তোমাদের আহ্বানে তিনি ঐরাবত সহ ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট তো চুরমার হইয়া যাইবার কথা; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র; তখন দেবতাদের মহা প্রস্থানের ঘণ্টা পড়িল। তিনি দেবতা বাদ দিয়া যজ্ঞ রাখিলেন। কিন্তু উত্তরমীমাংসা দেবতা রাখিয়া যজ্ঞের হীনতা সম্পাদন করিলেন। সুতরাং দুই মীমাংসার অধিকারী আমাদের কাছে যজ্ঞ ও দেবতা উভয়েই বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্মের বিকাশের ইতিহাসের ইহা একটী ছিন্নপত্র মাত্র। আজ যে ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিবর্ত্তন-পথেই হইতেছে। কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ এই দেবতাবর্গকে কম নাস্তানাবুদ করেন নাই। তাঁহারা আদেশ করিয়াছিলেন যে দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা অর্চ্চনা করিবেন,—সর্ব্বে দেবা তং বলিমাবহন্তি। তাই নবীন ব্রহ্মোপাসক দেবতাদিগকে আপনার উপাসনার উপকরণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া সমস্ত রজনী কাটাইয়া দিতেন, দাবানলে ভগবানের বহ্নুৎসব দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেন, আবার বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের সেই ভীষণ গর্জ্জন, "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমের" চরণে উপহার দিতেন। সাধারণ জীব যেখানে ভয়ে ভীত হইয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মবাদী সেখানে "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতমের" লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন। কেননা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, সর্ব্বে দেবা শুং বলিমাবহন্তি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere-র ফরাশী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মোগলদিগের রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এবং উহাদের সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশ—এ-দুই একই জিনিস। কিন্তু গোড়ায় যে-সকল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর সামরিক চিহ্নের ছাপ ছিল, সে-সকল হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া মোগলসাম্রাজ্য ও জনসমাজ ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

মুনসবদার ও রাজপুতদিগের উপর নজর রাখিবার জন্য, এবং তাহাদের হস্ত হইতে যে-সকল কাজ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই-সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ আকবর কতকগুলি পরিদর্শক বা সুবাদার (রাজপ্রতিনিধি) নিযুক্ত করিলেন।

উত্তর-ভারতে ১২টি সুবা এবং দাক্ষিণাত্যে প্রথমে তিনটি, পরে ছয়টি সুবা গঠিত হয়।

আবুল-ফজল, সুবাদারের কাজের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"সুবাদার, বাদ্‌শার স্থলাভিষিক্ত। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশের সৈন্য ও প্রজাবর্গ তাঁহার আজ্ঞাধীন এবং তাঁহার ন্যায়ানুগত শাসন-কার্য্যের উপর তাহাদের সুখসমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুবাদার এরূপ কখনই মনে করেন না যে তাঁহার পদ চিরস্থায়ী, প্রত্যুত ইঙ্গিত মাত্রেই রাজদরবারে হাজির হইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন।" (১)

সুবাদারের নীচেই ফৌজদার বা প্রদেশের সেনাপতি। আবুল-ফজল বলেন ঃ—

সম্রাট-বাহাদুর সাম্রাজ্যের সুখসমৃদ্ধির উদ্দেশে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য এক এক সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন; এইরূপে, অনেকগুলি পরগণার ভার কতকগুলি বিশ্বস্ত ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার সুবিবেচনা ও রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই কর্ম্মচারীগণ, 'ফৌজদার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাদের পদ সুবাদারের ঠিক নীচে। যদি কোন ভূস্বামী, কোন রাজস্ব-সংগ্রাহক, কোন ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হয়, ফৌজদার প্রথমে মিষ্ট বাক্যে তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন; তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রধান কর্ম্মচারীদিগের লিখিত জবানবন্দি সংগ্রহ করিবেন এবং বিদ্রোহীর শাস্তি দিবার জন্য বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। (২)

আকবরের উত্তরাধিকারীদিগের আমলে, বিপুল পরিমাণে ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায়, কর্ম্মচারীদিগকে জায়গির দেওয়া হইত। জায়গিরের উপসত্ব তাহারা ভোগ করিত, কেবল তাহার পঞ্চমাংশ রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইত। আরও একশতাব্দী পর্য্যন্ত, মোগল সম্রাটেরা, সুবাদার-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা, ও তাহাদের পুত্র-দিগকে ঐ পদে স্থাপন করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ পদগুলি পৈতৃক হইয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি সুবাদার অসংখ্য প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়া পড়িল;—যেমন বঙ্গদেশে, ও অযোধ্যায়। বিশেষতঃ নিজাম; নিজাম প্রথমে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তিনি শীঘ্রই রাজ্যাধিপতি হইয়া উঠিলেন।

* * *

বড় বড় কালিফদিগের রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া, আকবর শাসনকার্য্য হইতে বিচারকার্য্যকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন,—কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি শিয়া, কি সুন্নি সকলেই সমানভাবে ও পূর্ণ-মাত্রায় ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয়। "সদর" নির্ব্বাসিত হইল। যাহাদের বিচারসিদ্ধান্ত আইন রূপে গৃহীত হইত সেই উলেমারা নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বড় বড় নগ-রের নিজস্ব বিচারপতি ছিল (মীর-আদি বা কাজি)। মেদিনা ও বোগ্দাদের ব্যবহারতত্ত্ববাগীশগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধা-রিত মুসলমান আইন অনুসারেই এই-সকল বিচার-পতি বিচার-নিষ্পত্তি করিতেন। কিন্তু আকবর দণ্ডগুলির কঠোরতা একটু কমাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুরা স্বকীয় প্রাচীন বিধিব্যবস্থা ও বর্ণভেদগত প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাসকল নিয়মিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ঐ-সকল কার্য্যে মুসলমানদিগের কোন দরদ ছিল না।

কতকগুলি কোতোয়ালের হাতে পুলিসের ভার ছিল। "আইন-ই-আকবরী" হইতে এই চিত্তাকর্ষক অংশটা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কোতোয়ালের সুরক্ষকতায় এবং রাত্রিতে পাহারাওয়ালা-দিগের টহল-পাহারায় নাগরিকেরা বিশ্রাম লাভ করে ও নিরাপদে অবস্থিতি করে। দুর্বৃত্তেরা নিজ নিজ আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্যে বাস করে। কোতোয়াল, বাড়ীর ও লোক-চল্‌তি রাস্তার একটা সংখ্যা-তালিকা রাখিবেন; নাগরিকেরা যাহাতে পরস্পরের সহায়তা করে, সাধারণের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য প্রত্যেক নাগরিক আপনার বলিয়া মনে করে, কোতোয়াল এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। কতকগুলি আবাস-গৃহ লইয়া এক একটি অঞ্চল গঠিত হইবে, এক-একজন কর্ম্মচারী তাহার পরিদর্শন করিবেন এবং তিনি প্রতিদিন তাঁহার পরিদর্শনকার্য্যের বিবরণ দাখিল করিবেন।"

আরও দুইটী শাসননীতি হইতে মোগলশাসনের একটা লাক্ষণিক পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—প্রথমত—ইহা পিতৃশাসনতন্ত্র; কোতোয়াল সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, লোকের পারিবারিক কাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, দরিদ্রদিগকে কাজ করিবার জন্য বাধ্য করিবেন, এবং ধনীদিগের অতিব্যয় নিবারণ করি-বেন। দ্বিতীয়ত—ইহা গুপ্তচরশাসনতন্ত্র; এমন কোন জাতিবর্ণ নাই, এমন কোন ব্যবসায় নাই, যাহার মধ্যে কোতোয়ালের নিযুক্ত লোক না থাকে। আবুল-ফজল যে রাজনীতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছেন এবং যে-ভাবে পরা-

(১) আইন-ই-আক্‌বরী।
(২) আইন-ই-আক্‌বরী।

মর্শ দিয়াছেন তাহার মধ্যে চানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোগলদের মধ্যে এই প্রভাবই প্রবল ছিল।

আইনের চোখে সবাই সমান—এই নীতিসূত্রটি আকবর স্থাপন করেন। জাহাঙ্গীর ও শা-জাহান এই নীতি অনুসারেই চলিতেন; কিন্তু আরংজেবের আমল হইতে জোর-জবর্দ্দস্তি-নীতির সূত্রপাত হইল। আরংজেবের মৃত্যুর পর যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন শাসন ও বিচারের পার্থক্যও আর রক্ষিত হইল না। অবশ্য তখনও প্রত্যেক নগরের এক একটি নিজস্ব কাজি ছিল; কিন্তু পল্লীগ্রামে, মনসব্‌দার প্রভৃতি কর্ম্মচারী ক্রমে জায়গীরদার হইয়া উঠিল, রাজস্বের ইজারাদার হইয়া উঠিল; জমিদারেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার আপন হস্তে অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিল।

যে সাম্রাজ্যের মধ্যে, জায়গীরদারদিগের মধ্যে সমস্ত ভূমি বিভক্ত ছিল, যেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত, সেখানে সম্রাটের কোষাগারে খাজনা দাখিলের কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা। আকবর সুবাদার ও ফৌজদারদিগের হস্ত হইতে কর-সংগ্রহের ভারটা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সুবাদারের পার্শ্বে তিনি রাজস্বসচিব দেওয়ানকে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রদেশের সমস্ত বিভাগেই ("ক্রোড়া") দেওয়ানের প্রতিনিধি থাকিত। বিশৃঙ্খল সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ও সমস্ত কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের মধ্যে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ হেতু ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, প্রাদেশিক সুবাদারগণ আপনারাই রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করে। সেই আদায়ী রাজস্বের কেবল পঞ্চমাংশ মাত্র তাহারা সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইত। সম্রাটের খাস-মহলে, প্রতিবৎসরেই রাজস্বের আদায় উত্তরোত্তর কমিতে লাগিল; তখন রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইল; জমিদার ও মনসবদারের মধ্যে পার্থক্য আর বড় রহিল না। সে পার্থক্য শীঘ্রই উঠিয়া গেল। আবার সুবাদারদিগেরও কতকগুলি নিজস্ব জমিদার ছিল। সুবাদারেরা যেরূপ সম্রাটের রাজস্ব অপহরণ করিত, সম্রাটের অর্থশোষন করিত, ইহারাও সেইরূপ সুবাদারের রাজস্ব অপহরণ করিত, সুবাদারের অর্থশোষণ করিত।

রাজ-কর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদিকে, রাজস্বের সহিত ভূমির খাজনা এক-সামিল হইয়া গিয়াছিল; কেননা, সমস্ত ভূমিই সরকারের নিজস্ব ছিল। হুমায়ুনের সফল প্রতিদ্বন্দ্বী শের-শা ইতিপূর্ব্বে একটা ন্যায্য ভিত্তির উপর এই ভূমি-কর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত রাজ্যের একটা জরিপ-চিঠা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ফসলের পূর্ব্বে রাজস্বের কর্ম্মচারী খাস-মহলের ফসলের মূল্য স্থির করিতেন. ফসলের যে অংশ সরকারের প্রাপ্য এবং যে মূল্যে কৃষকেরা ঐ অংশ ক্রয় করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। কতকগুলি প্রদেশে, দশ বৎসরের জন্য একটা বার্ষিক খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। ভূমি-করও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের আমলে সমস্ত রাজস্ব ৫০ কোটি ফ্র্যাঙ্ক (প্রায় ২৭ কোটি টাকা) ও আরংজেবের আমলে প্রায় ১০০ কোটি ফ্র্যাঙ্কে উঠিয়াছিল।

অন্যান্য করসম্বন্ধে প্রত্যেক সম্রাটের আমলে কিছু-না-কিছু তারতম্য ও ইতর-বিশেষ ছিল। আকবরের পূর্ব্বে, বিধর্ম্মীদের উপর স্থাপিত জিজিয়া-কর, হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগের উপর শুল্ক, আভ্যন্তরিক শুল্ক (ঙমৃঘা) প্রভৃতি ছিল। বিরক্তিজনক বলিয়া প্রথমোক্ত দুইটি কর এবং বাণিজ্যের অনিষ্টকর বলিয়া তৃতীয় করটি আকবর রহিত করেন। কিন্তু আরংজেব জিজিয়া পুনঃস্থাপন করেন। আকবরের আমলে, যে দুই প্রধান কর আদায় হইত তাহার মধ্যে একটি অস্থায়ী সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, আর একটি দাক্ষিণাত্যের দেয় বার্ষিক রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। এই অর্থের দ্বারা আরংজীবের দিগ্বিজয়ের বৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর যে শুল্ক ছিল, অনেক সময়ে তাহার নূতন বন্দোবস্ত হইত, এবং পরিবর্ত্তনও হইত। সুরাট নগরী পণস্বরূপ সম্রাটকে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া আত্মবিক্রয় করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ব-পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীরই সমতুল্য ছিল। আকবরের আমলে উহা এক শত কোটি

ফ্র্যাঙ্ক ও আরংজীবের সময়ে দুই শত কোটি ফ্র্যাঙ্কে উঠিয়াছিল।

আরংজীবের মৃত্যুর পর সুবাদারেরা স্বাধীন হইয়া পড়িল; সম্রাটের সরকারী কোষাগারে প্রতি বৎসরেই উহারা কম-কম করিয়া খাজনা দাখিল করিতে লাগিল। এই সুবাদারেরা নিজ নিজ খেয়াল-অনুসারে প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আর দৃষ্ট হয় না, সর্ব্বত্রই যদৃচ্ছাক্রমে কর সংগৃহীত হইতে দেখা যায়।

ইহাই মোগল-প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের স্থূল রেখাচিত্র। প্রথম ঐতিহাসিকগণ যাঁহারা এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার সুন্দর বন্দোবস্ত এবং উহার কার্য্যোপযোগিতা ও সফলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন এসিয়িক রাষ্ট্রের আয় দুইশত কোটি ফ্র্যাঙ্ক হইতে পারে—ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা বলা আবশ্যক, মোগলেরা চীনীয়দিগের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পারস্য, রোম ও বৈজান্শিয়া হইতে গৃহীত কালিফদিগের প্রতিষ্ঠানসমূহ অবগত ছিল—সুতরাং বড় বড় সাম্রাজ্যের শাসনসম্বন্ধীয় সমস্ত প্রচলিত প্রথাই অবগত ছিল। আর, শাসনসম্বন্ধীয় ক্রমবিকাশের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে:—প্রথমে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের উপর জয়লাভ করে; আবার এই রাজতন্ত্র—যাহা প্রথমে প্রবল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, পরে ইহা অরাজকতায় পরিণত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদ্‌লিন পিয়েত্রী অর্সোর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সোর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অর্সো তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।]

(১৬)

সকাল ছটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন চাকর অর্সোর বাড়ীর দরজায় আসিয়া ঘা মারিতে লাগিল। কলোঁবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে বলিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া

কলোঁবার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কলোঁবা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিয়া দিল যে তাহার দাদা সিঁড়ি উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাওয়াতে তাহার পা মচকাইয়া গিয়াছে; এক পা চলিবারও তাহার সামর্থ্য নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যেন অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করেন; এবং যাইবার পথে যদি এই বাড়ী হইয়া যান তাহা হইলে অর্সো অত্যন্ত বাধিত হইবে।

ইহার অল্প পরেই অর্সো নীচে নামিয়া আসিয়া ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার খোঁজ করিতে কোনো লোক পাঠাইয়াছিল কি না।

কলোঁবা দিব্য সহজভাবে বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট বলে' পাঠিয়েছিলেন যে তিনি এখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

আধ ঘণ্টা খানেক বারিসিনিদের বাড়ীর দিকে কোনোই সাড়া শব্দ শুনা গেল না। তখন অর্সো কলোঁবাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে কিছু নূতন খেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে কি না। কলোঁবা বলিল সে একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই তাহার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিবে।

কলোঁবা খুব শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকিবার ভান করিলেও তাহার চোখে মুখে তীব্র উত্তেজনার আভাস ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অবশেষে বারিসিনিদের বাড়ীর ফটক খুলিল; ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রমণের বেশ পরিয়া প্রথমে বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে বৃদ্ধ বারিসিনি দারোগা এবং তাহার পশ্চাতে তাহার দুই পুত্র। সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে পিয়েত্রানরার অধিবাসীরা সেই জেলার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিদায়-যাত্রা দেখিবার জন্য পথের ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; তাহারা যখন দেখিল যে ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া বরাবর রেবিয়াদের বাড়ীর দিকেই চলিল, তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। গাঁয়ের মাতব্বর লোকেরা বলাবলি করিল—উহারা আপোশ করিতে যাইতেছে!

একজন বৃদ্ধ বলিল—আমি ত তোমাদের আগেই বলে' চুকেছি, যে, অর্সো আন্তনিয়ো যখন য়ুরোপে অতকাল থেকে এল, তখন তার আর একটা সাহসের কাজ করবারও মুরোদ নেই—ওটা একেবারে বয়ে গেছে!

একজন রেবিয়া-ভক্ত লোক বলিয়া উঠিল—বারিসিনিরাই ত তার কাছে সাধতে যাচ্ছে, সে ত আর এদের বাড়ী সেধে আসে নি? এরাই ত দাঁতে কুটো করে' ক্ষমা ভিক্ষে করতে চলেছে!

বৃদ্ধ বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেটই ত এদের সকলকে এমন করে' পাক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা সাহস করে কিছু বলতেও পারছে না; ছেলে দুটো চোখের সামনে বাপের অপমান দেখেও কিছু বলতে পারছে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে দিব্য সোজা হইয়া অক্লেশে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া অল্প আশ্চর্য্য হইল না। দু কথায় কলোঁবা তাহার মিথ্যা কথার জন্য ক্ষমা চাহিয়া বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আপনি যদি অন্য জায়গায় থাকতেন, তা হ'লে আমার দাদা কালকেই আপনাকে সেলাম করতে যেত।

অর্সো আমতা আমতা করিয়া থতমত খাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বার বার করিয়া বুঝাইতে চাহিল যে এই-সব মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভিতরে তাহার কোন যোগ সাজোস নাই, এ-সমস্ত তাহার অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বৃদ্ধ বারিসিনি অর্সোর ব্যাকুল মিনতি ও ভগিনীকে তিরস্কার-করা দেখিয়া তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াই লইতেছিল, কিন্তু বারিসিনির ছেলেরা এ কথা গ্রাহ্যই করিল না। অর্লান্দিকৃসিয়ো বলিল—আমরা কচি খোকা ত নই, মশায়ের রসিকতা বিদ্রূপ একটু আধটু বুঝবার বয়েস হয়েছে আমাদের!

ভ্যাসান্তেলো বলিল—আমার বোন যদি আমাকে নিয়ে এমন প্রবঞ্চনা করত, তা হ'লে আমরা তার ফিরে ওরকম করার ঝোঁক তুরন্ত ঝাড়িয়ে দিতাম!

এই রকম কথা যে-রকম স্বরে বলা হইল তাহাতে অর্সো অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভদ্রতা আর রক্ষা করিতে পারিল না। সে বারিসিনিদের দিকে এমন করিয়া তাকাইল যে তাহারা সে দৃষ্টিতে বন্ধুতার এতটুকুও চিহ্ন সন্দেহ করিতে পারিল না।

যাহাই হোক সকলেই বসিল, কেবল কলোঁবা রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কথা সুরু করিয়া প্রথমে সেই দেশের কুসংস্কার সম্বন্ধে দুই চারিটা মামুলি কথা বলিয়া শেষে বলিল যে রেবিয়া ও বারিসিনির মধ্যে যে বন্ধশত্রুতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ কেবল মাত্র ভুল আর সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর দারোগাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, অর্সো কখনো বারিসিনি-পরিবারের কাহাকেও তাহার পিতার খুনের জন্য দায়ী বা দোষী করেন না; এই দুই পরিবারের মধ্যে যে মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছিল সেই সম্বন্ধে অর্সোর মনে কিছু সন্দেহ ছিল বটে; সেরূপ সন্দেহ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের কথাও নহে, কারণ অর্সো বহুকাল দেশ-ছাড়া, লোকে যেমন বুঝাইয়াছে তেমনি তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতিকার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার মন খোলসা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মনে আর এতটুকু সন্দেহ বা বিরাগ নাই, তিনি দারোগা বারিসিনি ও তাঁহার ছেলেদের সহিত প্রতিবেশীর যোগ্য আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক ও উৎসুক।

অর্সো কেমন আড়ষ্টভাবে বিরক্তি ও অনিচ্ছার সহিত মাথা নাড়িল; দারোগা বারিসিনি বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিল তাহা কেহই শুনিতেও পাইল না; তাহার পুত্রেরা ছাদের কড়িকাট গণিতে মন দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবারে পাল্টা অর্সোকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় কলোঁবা তাহার ওড়-নার নীচে হইতে কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিয়া গম্ভীরভাবে বন্ধুত্বস্থাপনপ্রয়াসী উভয় দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমাদের এই দুই পরিবারের মধ্যকার বিরোধ বিবাদ মিটে যাচ্ছে, এতে আমার মন খুসি হয়ে উঠেছে; যাতে করে' এই মিলন বেশ আন্তরিক হয়, আর এতটুকু সন্দেহ ও অবিশ্বাস অবশেষ না থাকে, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা... ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তোমাজো বিয়াঁশির একরার আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি, সে যে-রকম বদ লোক, তাকে সহজে বিশ্বাস করাও ত যায় না।... আমি বলেছিলাম যে হয়ত দারোগা সাহেবের ছেলেরা তার সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করেছিল...

অর্লাণ্ডিকৃসিয়ো বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—মিথ্যে কথা! আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি!

কলোঁবা তাহার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি হানিয়া খুব শান্ত ভাবেই বলিতে লাগিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আপনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাজো দেশের ডাক-সাইটে গুণ্ডার বেনামিতে দারোগা সাহেবকে যে ভয় দেখিয়েছিল তার আসল উদ্দেশ্য ও কারণ কি। যে কলটা আমার বাবা নামমাত্র খাজনায় তোমাজোর ভাই থিয়োডোরকে জমা দিয়েছিলেন সেই কলটা হাত-ছাড়া না হয়, এই না তার উদ্দেশ্য ছিল?

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—ঠিক তাই।

অর্সো তাহার ভগিনীর বাহ্যিক শান্ত ভাব দেখিয়া ঠকিয়া গিয়া বলিয়া বসিল—হাঁ৷ হাঁ, সেই বিয়াঁশি লোকটা যে-রকম বদমায়েস, সে যখন এই কাণ্ডে লিপ্ত আছে জানা গেল, তখন ত সব পরিষ্কার হয়েই গেল।

কলোঁবার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—সেই জাল চিঠিখানার তারিখ ছিল ১১ই জুলাই। তোমাজো তখন তা হলে ভাইয়ের বাড়ীতেই ছিল।

দারোগা বারিসিনি একটু ত্রস্তব্যস্ত হইয়া থতমত খাইয়া বলিল—হুঁ।

তখন কলোঁবা জয়ের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—তবে তোমাজো বিয়াঁশির স্বার্থ কি ছিল চিঠি জাল করায়? তার ভাইয়ের পাট্টার মেয়াদ ত তখন ফুরিয়ে গেছে; আমার বাবা তাকে ১লা জুলাই পর্যন্ত জমা দিয়েছিলেন। এই আমার বাবার হিসেবের খাতা; এই পাট্টা, আর কবুলিয়ৎ; আজাক্সিয়োর একজন লোকের এই চিঠি, সে নতুন বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করেছিল।

এই বলিয়া কলোঁবা তাহার হাতের সমস্ত কাগজ-পত্রগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

সকলেই এক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া রহিল। দারোগা স্পষ্ট বিবর্ণ হইয়া উঠিল; অর্সো কাগজগুলি দেখিবার

জন্য ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল; কাগজগুলি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট গভীর মনোযোগ করিয়া পড়িতেছিল।

'অল্ান্দিকৃসিয়ো রাগে লাল হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমাদের ঠাট্টা করা হচ্ছে! বাবা, এখান থেকে চলে চলুন। আমাদের এখানে আসাটাই উচিত হয়নি।

বৃদ্ধ বারিসিনির প্রকৃতিস্থ হইতে কিছুক্ষণ লাগিল। সে কাগজগুলি দেখিতে চাহিল; ম্যাজিষ্ট্রেট কোনো কথা না বলিয়া কাগজগুলি তাহার দিকে আগাইয়া দিল। দারোগা তাহার সবুজ রঙের চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া দিয়া, নিতান্ত অগ্রাহের ভাবে কাগজগুলির উপর চোখ বুলাইতে লাগিল; শাবকের গুহা হইতে হরিণকে বাহির হইতে দেখিলে বাঘিনী যেমন করিয়া তাকায় কলোঁবা তেমনি করিয়া চোখ পাকাইয়া দারোগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দারোগা বারিসিনি তাহার চশমা কপাল হইতে নাকের উপর নামাইয়া দিয়া কাগজগুলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল—কিন্তু স্বর্গীয় কর্নেল সাহেবের দয়ার খবর জান্‌ত ব'ল' তোমাজো মনে করেছিল... স্বভাবতই তার মনে হয়েছিল যে...কর্নেল সাহেব তার জমা খারিজ করে' তাকে উদ্বাস্ত করবেন না..কাজেও হয়েছিল তাই, সে কলের দখলীকার হয়েই ছিল... তবে...

কলোঁবা তাহার কথায় বাধা দিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল—সে ত আমি তাকে কলের দখলীকার রেখেছিলাম। বাবা মারা গেলে, আমাদের বিষয় আশয়ের বিলিব্যবস্থা ত আমিই করেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—যাই হোক, এই তোমাজো স্বীকার করেছে যে, সে এই চিঠি লিখেছিল...এটা ত স্পষ্ট শাদা কথা।

অর্সো বাধা দিয়া বলিল—হ্যাঁ আমার কাছে এটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই-সমস্ত কাণ্ডটার তলে তলে একটা প্রকাণ্ড জোচ্চুরি লুকনো আছে।

কলোঁবা বলিল—আমার আরো একটা কথার প্রতিবাদ করতে বাকি আছে।

সে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং ব্রান্দো, তাহার সঙ্গী পণ্ডিত মশায় এবং কুকুর বিস্কো হল-ঘরে প্রবেশ করিল। ফেরারী দুজন নিরস্ত্র হইয়াই আসিয়াছিল। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া খুব সম্ভ্রমের সহিত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের অকস্মাৎ আবির্ভাবে সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দারোগা চেয়ার-সুদ্ধ চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল; তাহার ছেলেরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া পিতার সামনে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেটে হাত ভরিয়া ছোরা মুঠি করিয়া ধরিল; ম্যাজিষ্ট্রেট তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুট দিল; এবং অর্সো লাফাইয়া ব্রান্দোর উপর পড়িয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—পাজি বদমায়েস কাহাঁকা! এখানে কেন মরতে এসেছিস?

—এ সব আগাগোড়া ষড়যন্ত্র! গুপ্ত আক্রমণ!—বলিতে বলিতে দারোগা দরজা খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাভেরিয়া বাহির হইতে ডবল খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

ব্রান্দো বলিল—আপনারা যখন সকলেই ভালো মানুষ, তখন আমাদের দেখে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমাদের যেমন ভাবেন আমরা তেমন বদ লোক নই। আমরা কোনো রকম কু মতলবে এখানে আসিনি। ম্যাজিষ্টর সাহেব, আমরা আপনার গোলাম। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব, আস্তে, একটু আস্তে ঘাড়টা টিপবেন, নইলে দম আটকে যাবে যে।—আমরা এখানে সাক্ষী দিতে এসেছি। এস পণ্ডিতজী, তুমিই বল তোমার বলা-কওয়া আসে ভালো।

পণ্ডিত ফেরারী বলিতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার নাম গিয়োকান্তো শাস্ত্রী, আমি পণ্ডিতজী নামেই সমধিক পরিচিত। ... আমাদের এই দিদিমণি, তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই, তিনি আমাকে তোমাজো বিয়াঁশি নামক একজন লোকের সম্বন্ধে আমি কি জানি তাই বলতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি সেই লোকটার সঙ্গে হপ্তা তিনেক বাস্তিয়ার জেলখানায় বাস করে' এসেছি। তার সম্বন্ধে আমি এই জানি যে......

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিল—থাক, তোমার কষ্ট করতে হবে না। তোমার মতন লোকের কাছ থেকে আমি কিছু শুনতে চাইনে।......রেবিয়া মশায়, আমার বিশ্বাস, এই সব জঘন্য ষড়যন্ত্রে আপনি কিছুমাত্র লিপ্ত নন। কিন্তু আপনার বাড়ীর মালিক কে? আপনি? এই দরজাটা খুলিয়ে দেওয়ান। আপনার ভগ্নী যে এই-সব দাগী বদমায়েসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, এর জবাবদিহি তাঁকে করতে হবে।

কলোঁবা জোরে বলিয়া উঠিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, এই লোকটি কি বলে তা অনুগ্রহ করে আপনাকে শুনতে হবে। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করাই আপনার ধর্ম্ম, সত্য নির্ণয় করাই আপনার কর্ত্তব্য! বলুন আপনি, গিয়োকান্তো শাস্ত্রী।

বারিসিনিরা তিন বাপবেটায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হুজুর, ওর কথা শুনবেন না।

ফেরারী পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—যদি সকলে একসঙ্গে অমন করে' চেঁচায়, তবে শোনা না-শোনা সমানই হবে। জেলখানায় উক্ত তোমাজো আমার সঙ্গী ছিল—বন্ধু নয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন খুব ঘন ঘন এই অর্লান্দিকৃসিয়ো মশায়।......

বারিসিনি পুত্রেরা দুই ভাই সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—মিথ্যা কথা! কখনো না, কখনো না!

পণ্ডিতজী গম্ভীর ভাবে বলিল—দুই 'না' এক 'হাঁ'র সমান। 'দ্বিপ্রতিষেধে একং কার্য্যং'—ব্যাকরণের বচন। তোমাজো ঘুষ খেয়ে—মিঠাই ও মদ খেয়েছে প্রচুর। ভালো রকম খাওয়াটায় আমার বেজায় রকম রুচি আছে—ওটা আমার একটা বদ্‌রোগের সামিল। ঐ মুখখু লোকটার সঙ্গ আমার নিতান্ত অরুচিকর হলেও, তার দেওয়া ভোজ বেশ মুখরুচি হবে মনে করে' আমি অনেকবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দস্তর মতো খ্যাঁট দিয়ে মজা মেরেছি। তার নিমক খেয়েছিলাম বলে' আমি তাকে আমার সঙ্গে পালিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। ......একটি তরুণী......তার সঙ্গে আমার একটু ভাবসাব ছিল......আমাকে জেল থেকে পালাবার তোড়জোড় জোগাড় করে' দিয়েছিল। তোমাজো পালাতে অস্বীকার করলে—সে বললে যে দারোগা বারিসিনি পুলিসের বড় সাহেবকে পর্য্যন্ত সুপারিশ করে' বেড়াচ্ছে; সে বেকসুর খালাস হয়ে বরফের মতো নির্ম্মল খ্যাতি আর পকেটপোরা টাকা নিয়ে যখন শিগগিরই বেরুবে, তখন সে আর পালাতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমি আর কি করি, একলাই মুক্ত হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লাম। বাহুল্যেনালম্।

অর্লান্দিকৃসিয়ো জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—এই লোকটার কথা আগাগোড়া মিথ্যা। আমরা যদি বদ্ধ না থাকতাম, আর আমাদের হাতে বন্দুক থাকত, তবে কোনো বেটার মুরোদ হত না এমন সব যা-তা কথা বলে।

ব্রান্দো বলিয়া উঠিল—মিথ্যে বড়াই করে' পণ্ডিতজীকে ঘেঁটিয়ো না বলছি অর্লান্দিকৃসিয়ো। মজাটি টের পেয়ে যাবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট অধৈর্য্য ভাবে দরজায় লাথি মারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রেবিয়া, আমাদের আপনি বেরুতে দেবেন কি না?

অর্সো চীৎকার করিতে লাগিল—সাভেরিয়া, সাভেরিয়া, দরজা খোল সয়তানী, দরজা খোল।

ব্রান্দো বলিল—আর একটু অপিক্ষে করুন। আমরা আগে চম্পট দি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, উভয় পক্ষের বন্ধুর বাড়ীতে যদি শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তবে দুর্ব্বল পক্ষকে আধ ঘণ্টা ছুটি দেওয়া রীতি চলিত আছে, এ অবিশ্যি আপনি জানেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়া তাহাকে যেন বিদ্ধ করিতে চাহিতেছিল।

ব্রান্দো বলিল—আপনাদের সকলকার খিদ্‌মদ্‌গার সেলাম করছে।

তারপর ডান হাতখানা সটান লম্বা করিয়া তাহার কুকুরকে বলিল—ব্রিস্কো, আও, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকো সেলাম করো!

কুকুর লাফাইয়া দুই পায়ে দাঁড়াইয়া সেলাম করিল, ফেরারী আসামীরা এক লাফে রান্না-ঘরে গিয়া নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র উঠাইয়া লইল, এবং বাগানের খিড়কি দরজা দিয়া

নিমেষ মধ্যে অন্তর্ধান করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ক্যাঁচ করিয়া শব্দ করিয়া যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল।

অর্সো প্রগাঢ় ঘনীভূত ক্রোধবিক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—বারিসিনি সাহেব, জাল জুয়াচুরী মিথ্যা কারসাজীর জন্যে দোষী আপনি। আমি আপনার বিরুদ্ধে জজ সাহেবের কাছে আজই নালিশ দায়ের করব। হয়ত জাল জুয়াচুরীর চেয়েও বড় রকমের নালিশও রুজু হ'তে পারে, জেনে রাখবেন।

দারোগা বলিল—আর আমিও ছেড়ে কথা কইব মনে করবেন না রেবিয়া মশায়। আপনার বিরুদ্ধে জবরদস্তি অবরোধ করে' রাখা, আর গুণ্ডা বদমায়েসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার নালিশ করব। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাকে পুলিসের হেফাজতে রেখে দেবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট কড়া স্বরে বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর কর্ত্তব্য অবশ্য করবেন। পিয়েত্রানরায় শান্তিভঙ্গ না হয় আর ন্যায়বিচার হয় এও তিনি অবশ্য দেখবেন। আমি আপনাদের সকলকেই এ কথা বলছি জেনে রাখবেন।

দারোগা আর ভ্যাঁসান্তেলো ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অর্লান্দিকৃসিয়োও পিছু হঠিয়া হঠিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, তখন অর্সো ভারি গলায় তাহাকে বলিল—তোমাদের বাবা বুড়ো মানুষ, এক ঘুষিতে গুঁড়িয়ে যাবে বেচারা। তোমাদের দু ভাইয়ের জন্যে ও জিনিসটা তোলা রইল।

এ কথার জবাবে অর্লান্দিকৃসিয়ো একেবারে ছোরা খুলিয়া ক্ষেপার মতো অর্সোর ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া গিয়া পড়িল। কিন্তু সে তাহার অস্ত্র চালাইবার পূর্ব্বেই কলোঁবা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং জোর করিয়া ছোরাখানা ছিনাইয়া লইল, আর অর্সো তাহার মুখের উপর গোটাকত ঘুষি কষাইয়া দিতেই সে কয়েক পা পিছু হঠিয়া টাল খাইয়া দরজার উপর গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া ভ্যাঁসান্তেলো নিজের ছোরা খুলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু কলোঁবা এক লাফে একটা বন্দুক উঠাইয়া লইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে এ দ্বন্দ্ব সমানে সমানে নহে। এবং ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটিয়া আসিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

—আচ্ছা দেখে নেব অর্সো আন্তোঁ!—বলিয়া অর্লান্দিকৃসিয়ো ছুটিয়া বাহির হইয়া ধড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, যাহাতে অর্সো তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বাহির হইতে না পারে, এবং তাহারা প্রাণে প্রাণে বাড়ী পৌঁছিতে পারে।

অর্সো এবং ম্যাজিষ্ট্রেট হলঘরের দুই প্রান্তে দুজন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ঝাড়া পনর মিনিট; আর কলোঁবা যে বন্দুকটা আজকার দ্বন্দ্বে জয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছে তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একবার এ-কে একবার ও-কে বিজয়গর্ব্বভরা দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—কী সর্ব্বনেশে দেশরে বাবা, কী সর্ব্বনেশে দেশ! দেখুন রেবিয়া মশায়, আপনারই দোষ হয়েছে। আমি আপনার জবানী মুচেলকা চাই যে আপনি কোনো রকম বে-আইনী কাজ করবেন না, আর এই বিশ্রী ব্যাপারটার মীমাংসা আদালতে যা হ'বে তাই মেনে চলবেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ঐ হতভাগা গর্দ্দভটাকে মেরে অন্যায় করেছি বটে, কিন্তু আমি শেষে ওকে মেরেছি। যাই হোক যে আমাকে শাসিয়ে গেল তার জবাব না দেওয়াটাআমার পক্ষে অন্যায় হবে।

—না না, সে আপনার সঙ্গে মারামারি করবে না!... তার যা পাওনা ছিল সে ত তা বেশ পেয়ে গেছে।

কলোঁবা বলিল—আচ্ছা সে আমরা দেখে নেব।

অর্সো বলিল—অর্লান্দিকৃসিয়ো আমাকে কচি খোকা ঠাওরেছে; আমি তাকে টেরটি পাইয়ে ছাড়ব যে সাহসে শক্তিতে আমি নেহাৎ খোকা নই। সে চোখের পলকে ছোরা খুলে কেবল লাফিয়ে পড়েছিল, আমি হ'লে ঐ সময়ের মধ্যেই ছোরার কাজও নিকেশ করে ফেলতাম! আমার মনটা খুব খুসি হয়ে উঠছে যে আমার বোনটির হাতের কস্ নেহাৎ বিলাসিনী অবলার মতন নয়!

ম্যাজিষ্ট্রেট জোরে বলিয়া উঠিল—আপনারা মারামারি করবেন না, আমি আপনাদের বারণ করছি!

—হুজুর আমাকে মাপ করবেন, যেখানে নিজের সম্মানের কথা সেখানে আমার মন ছাড়া আমি আর কারো হুকুম মানিনে।

—আমি আপনাকে হুকুম করছি আপনারা মারামারি করতে পারবেন না।

—আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন...,অর্থাৎ যদি আমি নিজেকে ধরতে দি। কিন্তু তাতে করে' অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় শুধু বিলম্ব ঘটানো হবে মাত্র। আপনি ত নিজে মানী লোক, আপনি বেশ জানেন যে আত্মসম্মান রক্ষা করতে হ'লে আমার আর গত্যন্তর নেই।

কলোঁবা বলিল—যদি আমার দাদাকে আপনি গ্রেপ্তার করেন, তা হ'লে আধখানা গাঁয়ের লোক ক্ষেপে উঠে বেশ একটু গোলন্দাজী করবে।

অর্সো বলিল—দেখুন মশায়, আমি আপনাকে মিনতি করে' নিবেদন করছি যে আমাকে আপনি একটা গোঁয়ারগোবিন্দ মনে করবেন না। কিন্তু এ কথাও আমি আপনাকে বলে রাখছি যে দারোগা বারিসিনি যদি শুধু দারোগার ক্ষমতা জাহির করবার জন্যে বে-আইনী ভাবে আমায় গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করে, তাহলে আমি কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করব।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আজ থেকে বারিসিনি দারোগাকে আমি সসপেণ্ড করলাম; আজ থেকে সে আর দারোগা নয়। ......দেখুন মশায়, আপনাকে আমার বেশ লাগছে। এই জন্যে আমি আপনার কাছে এই সামান্য অনুরোধ করছি যে, আমি সফর সেরে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি বাড়ীতে একটু চুপচাপ করে' থাকবেন। আমি তিন দিনের বেশি দেরি করব না। আমি জজ সাহেবকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসব, আর আমরা এই আপশোষের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত মীমাংসা করে ফেলব। এ কদিন আপনি কোনো রকম ঝগড়া বিবাদ করবেন না, স্বীকার করছেন ত?

—আমি স্বীকার করতে পারছিনে মশায়, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে অর্লান্দিকৃসিয়ো আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে, আর তাহ'লে আমি চুপ করে থাকতে পারব না।

—এ কী রেবিয়া মশায়! যে বোকাটাকে আপনি মিথ্যাবাদী জালিয়াত মনে করেন আপনি ফরাশী সেনানী হয়ে তার সঙ্গে লড়াই করবেন?

—আজ্ঞে, আমি তাকে মেরেছি।

—কিন্তু একটা ছোটলোককে যদি আপনি মারেন, আর সে আপনার সঙ্গে লড়তে চায়, তাহলে কি আপনি তার সঙ্গেও লড়বেন নাকি? যাক। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে আরো সামান্য অনুরোধ করছি—অর্লান্দিক্‌সিয়োর সঙ্গে চেষ্টা করে দেখা করবেন না। ... সে যদি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তবে আপনি লড়বেন, আপনাকে আমি অনুমতি দিচ্ছি।

—সে আমাকে লড়তে ডাকবেই, আমার এতে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে লড়াইয়ে ডাকাবার জন্যে আমি তাকে আর ঘুষিটা ঘাষাটা দেবো না।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন লম্বা লম্বা ডেগ ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—কী ভয়ানক দেশরে বাবা, কী সর্ব্বনেশে দেশ! এখন কবে যে ফ্রান্সে পৌঁছে হাঁপ ছাড়ব!

কলোঁবা তাহার মধুর স্বরে মধু ঢলিয়া দিয়া বলিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, বেলা হয়ে গেছে, একটু কিছু জল খেয়ে গেলে আমরা সম্মানিত হব।

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া ফেলিল।—আমি অনেকক্ষণ এখানে আছি......; এটা যেন পক্ষপাতের মতন দেখাচ্ছে।......আমার এখন যাওয়াই উচিত।.....দেখুন কলোঁবা, আজ আপনি মহা একটা দুর্দ্দৈবের সূচনা করে' তুললেন হয়ত।

অর্সো বলিল—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, এটুকু অন্তত আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আমার ভগ্নীর মনের ধারণাটা কি রকম সত্য আর খাঁটি। আমারও মনের সকল সন্দেহ এখন দূর হয়ে গেছে; আপনিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে দোষী যে কে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট হাতের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—এখন চল্লুম মশায়। মনে রাখবেন যে পুলিশের জমাদারকে হুকুম দিয়ে যাচ্ছি সে আপনাদের সমস্ত চাল চলনের ওপর নজর রাখবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেল।

কলোঁবা বলিল—দাদা, এ তোমার ইউরোপ নয়; অর্ল্যান্দিকৃসিয়ো জানেই না যে ডুয়েল লড়বার নিয়ম কি! আর তাকে মেরে ফেললে যে খুব একজন সৎ আর সাহসী লোককে মারা হবে, তাও নয়।

—কলোঁবা, তুই ভয়ানক শক্ত মেয়ে। তুই আমাকে ছোরার মুখ থেকে বাঁচিয়েছিস, এর জন্যে আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ। তোর হাতখানা আমায় দে, আমি তোর চুমু খাব। কিন্তু দেখ্, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে; যা কিছু করতে হয় তা আমি নিজেই বুঝে শুনে করব। তুই কি জগৎ-সংসারের সব জিনিস জানিস না বুঝিস। এখন আমায় কিছু খেতে দে; তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট রওনা হয়ে চলে গেলে, শিলিনা মেয়েটাকে একবার ডেকে দিস, সে দূতের কাজে খুব পাকা দেখেছি। আমার একখানা চিঠি পাঠাবার জন্যে তাকে দরকার হবে।

যতক্ষণ কলোঁবা জলখাবারের জোগাড় করিতেছিল, ততক্ষণে অর্সো উপরে নিজের ঘরে গিয়া নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিল—

"আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে জেদ করেছিলেন; এ সম্বন্ধে আমারও ঔৎসুক্য বড় কম নয়। কাল সকালে ছটার সময় জলার ধারে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি পিস্তল ছোড়ায় ওস্তাদ, এজন্য আপনাকে পিস্তল-যুদ্ধে আমন্ত্রণ করতে চাইনে। শুনলাম যে আপনি গোলন্দাজ ভালো; তাই সই; আমরা দুজনেই দুনলা বন্দুক নিয়ে যাব। আমি গাঁয়ের একজন কাউকে সালিসী করবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে যাব। যদি আপনার ভাই আপনার সঙ্গে যান, তবে আর একজন দ্বিতীয় সালিস অনুগ্রহ করে সঙ্গে নেবেন, এবং আমাকেও আগে একটু খবর দেবেন, কারণ তা হলে আমাকেও দুজন সালিস জোগাড় করে' নিয়ে যেতে হবে। ইতি—

অর্সো আন্তনিয়ো দেলা'রেবিয়া।"

ম্যাজিষ্ট্রেট ঘণ্টাখানেক পুলিসের জমাদারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মিনিট কয়েকের জন্য বারিসিনিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একজন আরদালী চৌকীদার সঙ্গে লইয়া কর্ট যাত্রা করিল। মিনিট পনর পরে শিলিনা অর্সোর লেখা চিঠিখানা লইয়া গিয়া অর্ল্যান্দিকসিয়োর হাতে দিয়া আসিল।

সমস্ত দিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যার সময় চিঠির জবাব আসিল। সে চিঠিতে বুড়া বারিসিনির দস্তখত, এবং তাহার মর্ম্মকথা এই, যে, অর্সো তাহার পুত্রকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা সে জজ সাহেবের নিকট পেশ করিবে। ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়িয়া এমন সহজে অর্সোর বদমায়েসির শাস্তির সুবিধা করিয়া দিল তাহাতে বারিসিনিদের সততা ও সাধুতাই প্রমাণিত হইবে।

ইতিমধ্যে পাঁচছয়জন পাইককে ডাকাইয়া কলোঁবা নিজেদের বাড়ীতে চৌকী দিবার ব্যবস্থা করিল। অর্সোর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা বাড়ীর সমস্ত জানলা দরজা হইতে বন্দুক আওয়াজ করিতে লাগিল এবং দেহাতের অনেক লোক আসিয়া অর্সোকে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পণ্ডিত ফেরারীর পর্য্যন্ত একখানা চিঠি আসিয়া হাজির; সে তাহার নিজের ও ব্রান্দো উভয়ের হইয়া লিখিয়াছে যে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস দিয়া অর্সোকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে তবে তাহারা পুলিশকে একবার দেখিয়া লইবে, অর্সো যেন নিশ্চিন্ত থাকে। সে চিঠিতে পুনশ্চ লিখিয়াছে—ভালো কথা, আপনি কি জানেন, আমার বন্ধু ব্রান্দো তার কুকুরকে যে হিকমৎ শিখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেদিন দেখাইয়া আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের মত কি? শিলিনা ছাড়া আমি ত আর দ্বিতীয় কোনো ছাত্র ছাত্রী দেখি নাই যে ব্রান্দোর কুকুরের অপেক্ষা অধিক নম্র এবং আনন্দিত ভাবে নিজের শিক্ষিত বিদ্যা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ নির্ম্মাণ Les Documents du Progres) :—

মাংসাগারী মানব "think not of morrow" (আগামী কল্যর জন্য চিন্তা করিও না) এই সহজপাল্য উপদেশটী বর্ণে বর্ণে এত দিন পালন করিয়া আসিয়াছে। ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া আহার করিতে কিছুই বাকি রাখে নাই। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, এই-সকল গৃহপালিত পশুদিগকে ভক্ষণ ভিন্ন আমাদের অন্য কাজেও ইহারা বিশেষ ভাবে লাগিয়া আসিতেছিল। ঘোড়ার রস ভক্ষণ করিতে করিতে (বিশেষতঃ জার্ম্মানিতে) দেখা গেল গাড়ীটানা ইত্যাদির জন্য ঘোড়ার অভাব ঘটিতেছে। ভাগিস্ বিজ্ঞান ছিল, তাই বিদ্যুৎ ও বাষ্পকে ঘোড়ার খাটুনি খাটাইয়া ঘোড়ার অভাব অনুভব করিতে দেওয়া হইল না। এবার পয়স্বিনী গাভীকে নিঃশেষ করিতে গিয়া পয়োধারার অভাব কল্পনায় মানবজাতিকে বিশেষ শঙ্কিত হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতে গোরক্ষিণী সভা ইত্যাদি করিয়া সে অভাব নিবারণ করিবার প্রয়াস হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি মাংসভক্ষণ-নিষেধক কোন প্রকার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া এবারও বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইয়াছেন। সম্প্রতি তিন জন জার্ম্মান রসায়নবিৎ দুগ্ধ গঠনের উপকরণ-সকল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশ্লেষণ করিয়া রসায়নাগারে দুগ্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রথমে গোদুগ্ধকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে কি কি উপকরণ কি পরিমাণে আছে তাহা সম্যক নির্ণয় করিয়াছেন। গরুর খাদ্যমধ্যে সেই সামগ্রী কি পরিমাণে আছে তাহাও দেখিয়াছেন। তৎপর রসায়নাগাররূপ গাভীকে সেই খাদ্য আহার এবং হজম করাইয়া অর্থাৎ গাভীর উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে দুগ্ধের উপকরণ-সামগ্রী নিষ্কাসিত করিয়া সেই সামগ্রীর যথাপরিমাণ সংমিশ্রণে দুগ্ধ প্রস্তুত হইয়াছে।

ক্লৌসেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিগ্লার (Rigler) একটি কৃত্রিম দুগ্ধ তৈয়ারীর কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলটির কার্য্য-প্রণালী খুব সহজ, এক দিকে কতকগুলি ঘাসপাতা খোল ভূষি দিয়া কল ঘুরাইলেই অপর দিকে বোতলে দুগ্ধ ভরিয়া উঠে। এই দুগ্ধের রং শুভ্র, স্বাদ মিষ্ট, এবং বিশেষ গুণ এই যে ইহাতে জন্তুর গায়ের বোটকা গন্ধ থাকে না। সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জ-জাত বলিয়া ইহা নিরামিষাশীরও খাদ্য। ইহা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা ঢের সস্তা।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বলিয়া এই দুগ্ধ স্বভাবতঃই বীজাণুমুক্ত; সুতরাং এই দুগ্ধ পান করিলে কোনোরূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই।

অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর হাঁসপাতাল-সমূহে এই দুগ্ধ রোগীদিগকে পান করাইয়া ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করা হইতেছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্ প্রমুখ অনেকানেক বৈজ্ঞানিকেরা এই দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ইহা খাঁটি গোদুগ্ধ-তুল্য গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ, ও আস্বাদ ও আহার করিয়া স্বাদু ও বলপুষ্টিকারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই দুগ্ধ লণ্ডন সহরে প্রতি কোয়ার্ট (প্রায় তিন পোয়া) তিন পেনিতে (তিন আনায়) বিক্রয় হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সাহারা মরুভূমি (The American Machinist):

সাহারা মরুভূমি লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে গুভীর গবেষণা চলিতেছে। সাহারার বিস্তৃতি ১৮,০০,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ প্রায় আমাদের ভারতবর্ষের সমান; য়ুরোপ হইতে কিছু ছোট। পৃথিবীর এত বড় একটা জায়গা এমন অকাজে পড়িয়া রহিয়াছে, স্বভাবতঃই ইহার প্রতি মানবের চক্ষু আকৃষ্ট হয়। শুধু যে নিরীহ বেচারার মত অকাজে পড়িয়া আছে তাহাও নহে, ইহার আশে পাশে যে-সমস্ত জায়গায় মানবের বসতি আছে সেখানকার লোকদের অনেক সময় এই বিরাটকায় দানবপ্রায় মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসের জ্বালা নীরবে সহ্য করিতে হয়। তাহাতে ক্ষতি বিস্তর।

সাহারার অধিকাংশ স্থান সাগরবক্ষ হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। কিন্তু তাহার চারি পাশের জমী উচ্চ থাকায় সমুদ্রের জল সাহারাতে প্রবেশ করিতে পারে না। একটা প্রস্তাব এই যে ভূমধ্যসাগর অথবা এটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে একটা নালা কাটিয়া যদি সাহারার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে সাহারা মরুভূমি সাহারা সাগরে পরিণত হইয়া যাইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বের অর্দ্ধদগ্ধ দেশ-সকল সুজলা সুফলা হইয়া উঠিবে এবং নৌচালন সুগম হইয়া মানবের গতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। কিন্তু এই প্রকার কার্য্য নিরাপদ কিনা তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ভূমধ্যসাগর এই ভাবী সাগর হইতে পরিমাপে অনেক ছোট। যদি ভূমধ্যসাগর হইতে এই প্রস্তাবিত নালা কাটা হয় তবে সাহারা এক চুমুকে ভূমধ্যসাগরের সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে, এবং ভূমধ্যসাগর, এটলাণ্টিক ও লোহিতসাগর ইত্যাদি হইতে নিজের ক্ষতিপূরণ করিতে থাকিবে। ভূমধ্যসাগরের চারিদিক হইতে জলের এই আকর্ষণের ফলে সেখানে জলের একটা সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদী লোকে বলিতেছেন যে নালাটা ছোট করিয়া কাটা হইলে তাহা দ্বারা অকস্মাৎ এত অধিক জল স্থানান্তরিত হইবে না যাহার ফলে এই প্রকার কোনো জলবিপ্লবের আশঙ্কা আছে। যাহা হউক যদি এটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত সাহারাকে যুক্ত করা হয় তবে এই আশঙ্কা বিশেষ থাকিবে না। কিন্তু যে দিক দিয়াই নালা কাটা হউক না কেন, আর একটা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে অনেকে বলিতেছেন। সকলেই জানেন আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগর হইতে একটা উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত বহিয়া ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিক দিয়া উত্তর দিকে কিছু দূর গিয়া শেষ হইয়াছে। এই উষ্ণ স্রোত ইংলণ্ডকে দারুণ শীত হইতে রক্ষা করিতেছে। সাহারা-জনিত জলের আলোড়নে এই উষ্ণ স্রোতের নির্দ্দিষ্ট পন্থার ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি এই স্রোত ইংলণ্ডের পথ ছাড়িয়া অন্য কোথাও দিয়া প্রবাহিত হয় তবে ইংলণ্ড প্রবল শীতের প্রকোপে পড়িয়া জমিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভীতি যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা শুধু ইংলণ্ড প্রভৃতি দু-চারিটা দেশ সংক্রান্ত নহে, তাহা সমগ্র পৃথিবী সংক্রান্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে গলিত তরল পদার্থ অবস্থিত আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এই তরল পদার্থের উপরে চতুর্দ্দিকের চাপ প্রায় সমান; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ সকল দিকেই সমান শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া আছে। তাই পৃথিবীটা যথাযথ হইয়া আছে। কিন্তু একটা সুপক্ক আঙ্গুর ফলের একদিকে

বেশী চাপ পড়িলে যেমন তাহার ভিতরকার তরল রস এক দিক দিয়া না হয় অন্য দিক দিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি বৎসর-বৎসর ঝড়-বৃষ্টি নদ-নদী দ্বারা স্থানান্তরিত মৃত্তিকাদির ভারের পরিবর্ত্তনে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের একদিকে অধিক চাপ পড়ে এবং অন্যদিক ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া ভিতরকার তরল পদার্থ উদ্গিরণে পুনরায় চতুর্দ্দিকের ওজন সমান হইয়া পড়ে। এই সঙ্গে ভূমি-কম্প হইয়া কোনো জায়গা বসিয়া গিয়াও এই ভার-সমন্বয়ের সহায়তা করে। অনেক বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন যে সাহারার উপরে যদি হঠাৎ এই প্রভূত পরিমাণ জলরাশির ভার চাপাইয়া দেওয়া হয়, এবং তদ্ধেতু সেই সঙ্গে অন্য সাগরের উপরের ভার কমিয়া যায় তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত তরল পদার্থ এই ভার-বৈপরীত্যে এমন প্রবল শক্তিতে, প্রভূত পরিমাণে এবং ভীষণ ভাবে কোনো আগ্নেয়গিরি দিয়া বাহির হইবে যে সেই গলিত পদার্থের নির্গমনে বহু দেশ দগ্ধ এবং সেই সঙ্গে ভূমি-কম্পের প্রবল স্পন্দনে প্রায় সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আর একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, সাহারাকে সাগরে পরিণত না করিয়া অন্য এক প্রকারে ইহাকে অধিক আবশ্যকীয় কার্য্যে লাগান যাইতে পারে। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৬,০০০,০০০,০০০ টন কয়লা পোড়াইলে যত উত্তাপ হয়, প্রতিদিন সাহারার উপরে সেই পরিমাণ সূর্য্যের তাপ পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর এক বৎসরে উৎপন্ন সমস্ত উদ্ভিদ ওজন করিলে ৩২০০০০০০০০০ টন হয়, এবং তাহা পুড়াইলে যে তাপ হয় তাহা ১৮০০০০০০ টন কয়লা পোড়ানো তাপের সমান। এই তাপ যদি কোনো প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারা যায় তবে তাহা দ্বারা অসংখ্য কলকারখানা চালানো যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই-সকল কলকারখানায় চুল্লী, চিমনী বা ডাইনামো (dynamo) কিছুই থাকিবে না, থাকিবে শুধু কতকগুলি বিবিধ ধরণের এবং পরিমাপের আয়না ও আতস কাচ (lense)।

কালে পৃথিবী হইতে পাথুরে কয়লা লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিতেছেন যে সূর্য্যতাপ হইতে যখন উদ্ভিদ জন্মে ও পুষ্টিলাভ করে, তখন সাহারার অফেজো তাপ হইতে এত উদ্ভিদের পুষ্টি ও নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হইতে পারিবে যে উত্তর-কালের মানব কয়লার অভাবে কিছুই কষ্ট পাইবে না।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ বাক-বিতণ্ডা চলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ কার্য্যটি করা হইবে এখনও তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই—সৃষ্টি, স্থিতি, না প্রলয়।

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়।
জব্বলপুর বাঙ্গলা লাইব্রেরী।

ব্যবসায়ের প্রকৃতির তারতম্যে মৃত্যুর ও আয়ুর তারতম্য—

পেল্‌মেল্ গেজেটের প্যারীনগরস্থ সংবাদদাতা বলেন যে ফরাসি দেশের সীন্ ডিপার্টমেন্টের তথ্যসংগ্রাহক (Statistician for the Department of the Seine) ডাক্তার জ্যাকোয়েস্ বার্টিলন্ সাহেব সম্প্রতি কতকগুলি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন—তদ্দৃষ্টে কোন্ কোন্ ব্যবসায় বা কার্য্যাবলম্বীদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা কত জানা যায়। তাঁহার মতে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ—অমিতাচার, মাদক-দ্রব্য সেবন, এবং বুক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও স্নায়ু সংক্রান্ত ব্যারাম, বহুমূত্র রোগ, আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনা (accidents)।

উন্মুক্ত বাতাস সেবন করিতে করিতে যে-সকল ব্যবসায় বা কার্য্য করা যায়—সেইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর; কিন্তু ইহাতে চলা ফেরার বিশেষ আবশ্যক, নতুবা অঙ্গে নিয়ত বাতাস ইত্যাদি লাগিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। এ জন্যই পশুপক্ষীরক্ষক এবং উদ্যানরক্ষক প্রভৃতি দীর্ঘজীবী হয়, পক্ষান্তরে শকট প্রভৃতি চালকগণ (যাহাদের শরীরে বাতাস ইত্যাদি লাগে অথচ চলাফেরার ব্যাপার নাই) অধিক দিন বাঁচে না।

বার্টিলন্ সাহেবের তালিকা দৃষ্টে প্রকাশ—এন্‌জিন্ চালক কাট্‌কাটা কার্য্যে এবং ময়দা প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত লোক, শিক্ষক, আইন-ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্মযাজক শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। চিকিৎসক, রসায়নবিৎ, স্থপতিবিদ্যাবিৎ আইন-ব্যবসায়ীদিগের কেরাণী, পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারী, ভ্রমণশীল সওদাগর, মুদী, ফল-বিক্রেতা, টুপিওয়ালা এবং ঘড়ী প্রস্তুত এবং চামড়া পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত লোকগণের মধ্যে মৃত্যুর হার অল্প। বাটীর চাকর এবং কোচ্‌ম্যানের মধ্যেও তদ্রূপ।

সাধারণ বড় কর্ম্মচারী, ট্রাম্‌ওয়ে ও গ্যাসের কার্য্যে নিযুক্ত লোক, মৎস্য ও পোষাজন্তু ইত্যাদি ফিরিওয়ালা, বস্ত্রাদি বিক্রেতা, জিন্ নির্ম্মাতা, রুটিওয়ালা, শস্যপেষণ-যন্ত্রাধ্যক্ষ, কষাই, মাঝি, গাড়োয়ান, নাবিক এবং সাইকেল্ গাড়ি ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের মধ্যে মৃত্যুর হার গড়পড়তা অপেক্ষাকৃত বেশী। জন-মজুরেরা, স্বল্পায়ু; চিকিৎসক, খনির কার্য্যে ব্যাপৃত লোক, প্রস্তর-খোদক দোকানের কর্ম্মচারী, শকটাদি চালক, সহিস্, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়সওয়ার, খবরের-কাগজ-বিক্রেতা, প্রস্তর-সওদাগর, মুদ্রাকর, কামার, পত্রবাহক, ধূমনালী-মার্জ্জক, নাপিত এবং গায়কদের মধ্যেও তদ্রূপ।

আইন-ব্যবসায়ীগণ কেন দীর্ঘজীবী এবং গায়কেরা কেন অল্প বয়সে মরে? উষ্ণীষ-নির্ম্মাতা কেন শীঘ্র ভবলীলা সাঙ্গ করে?—এ-সকল জটিল প্রশ্ন—এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

আত্মহত্যা এবং বহুমূত্র—মৃত্যুর দুইটী প্রধান কারণ। সাধারণতঃ, সমাজের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদেরই এই ব্যামোহ হয়—যথা, সাধারণ বড় কর্ম্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, মদ্যবিক্রেতা, কৃষক এবং ধর্ম্মযাজক শ্রেণী। সকল শ্রেণীর মধ্যেই আত্মহত্যা দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে ইহা বেশী এবং কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে কম। মুদী, লোহালক্কড়ওয়ালা বস্ত্রাদি বিক্রেতা, পিপানির্ম্মাতা, পাক্কিওয়ালা; তামাকবিক্রেতা, আইনব্যবসায়ীর কেরাণী এবং স্থপতিবিদ্যাবিদ্‌গণের মধ্যে ইহা অধিকতর দেখা যায়; এবং পশমী-কাপড়-বিক্রেতা, দোকানের কর্ম্মচারী ছুরি কাঁচি ইত্যাদি ব্যবসায়ী, উষ্ণীষনির্ম্মাতা, বাড়ীর চাকর, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও রসায়নবিদ্‌গণের মধ্যে আত্মহত্যা নিয়ত ঘটে। কিন্তু মদ্যপায়ী ও তাহাদের কর্ম্মচারীগণ, ধূমনালী-মার্জ্জক, কসাই, ফলবিক্রেতা, এবং সঙ্গীতশাস্ত্রালাপীদিগের মধ্যে আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা সচরাচর দেখা যায়।

শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল।

বাগ্মীর শারীরক্রিয়া, The Physiology of the Orator (British Medical Journal):

বিশ্লেষণ ও পরিমাণক্রিয়াকেই অনেকে (Science) বিজ্ঞানের প্রধানতম অঙ্গ মনে করিয়া থাকেন। এখন বৈজ্ঞানিক যুগ।

বেয়াত্রিচে চোঞ্চি।

গিদো রেণী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

এ সময় মানুষের সকল কায, সকল বৃত্তিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, বীজগণিতের অথবা রসায়নের সঙ্কেত চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বালজাক্ (Balzac) গ্রন্থের নায়ক নীচধাতু হইতে উচ্চধাতু প্রস্তুত করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্ত্রীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তিনি এই বলিয়া মনে সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন যে অশ্রু কি দিয়া প্রস্তুত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। সে দিন হাউস্ অফ্ কমান্স্ (House of Commons) মহাসভায় টমাস্ ওয়েক্‌লী (Thomas Wakely) কি করিয়া কবিতা লিখিতে পারা যায়, তাহার একখানি (Prescription) ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করিয়া শ্রোতাদের বেশ একটু আনন্দ দিয়াছিলেন।

সিগ্‌নর্ এল্, এম্, প্যাট্রিজি (Signor L. M. Patrizi) ইতালীয় একজন নামকরা লেখক। তিনি বাগ্মীর শারীরতত্ত্ব বিষয়ে সম্প্রতি একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। প্যাট্রিজি বলেন বাগ্মিতা কতকগুলি (physical laws) ভৌতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বক্তার বুকের আয়তন, তাহার দম ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের (rhythm) ছন্দের উপরই বক্তৃতাটির পদবিন্যাস প্রভৃতি নির্ভর করে। যে ব্যক্তি কৃশকায়, যাহার বক্ষদেশ তেমন প্রশস্ত নহে, তাহার নিকট দীর্ঘপদ-ও-বাক্যযুক্ত বক্তৃতার আশা কোন মতেই করা যায় না। ইহাদের বক্তৃতা প্রায়ই ভাঙ্গাভাঙ্গা ও রুক্ষ গোছ হয়। বিশালবক্ষ ব্যক্তিদের বক্তৃতা সচরাচর খুবই গুরুগম্ভীর ও সুদীর্ঘ হয়। বক্তৃতাকালে বক্তার দেহমধ্যে রক্তসঞ্চালন কেমন হয়, প্যাট্রিজি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। একটা বক্তৃতায় বক্তার দেহে কতখানি ফস্‌ফরাস (Phosphorus) কতখানি অঙ্গারক (Carbon) ক্ষয় হয়, তিনি তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্যাট্রিজির মতে বক্তৃতা দিতে বক্তার কতখানি শক্তির ব্যয় হয়, তাহা মাপ করিয়া কিলোগ্রাম্ (Kilogram) নামক রাসায়নিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব নয়। তিনি সেকালের ও একালের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বাগ্মীর কথা দ্বারা আপনার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্যাট্রিজি বলেন—বাগ্মীপুরুষ সাধারণতঃ পুষ্টদেহ ও মাংসল হয়। মনের সম্বন্ধে ইহাদিগকে দার্শনিকদের সহিত তুলনা না করিয়া সৈনিকপুরুষদের সহিত তুলনা করাই অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের বিচার ও চিন্তাশক্তি চিরদিনই অপক্ক থাকে। বুদ্ধিও ইহাদের যে খুব বেশী থাকে তাহাও নহে। কিন্তু স্মরণশক্তি বিলক্ষণই থাকিতে দেখা যায়। প্রতিভাবান্ পুরুষের ন্যায় ইহাদের কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবার শক্তি নাই। সাধারণ কর্ম্মীপুরুষের যে-সকল দোষগুণ থাকে বাগ্মীর সে সকলই থাকিতে পারে। কোন প্রসিদ্ধ বাগ্মীর বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাঠ করিলে তাহাতে সার কথা, নূতন কথা অতি অল্পই থাকিতে দেখা যায়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী জন্ ব্রাইট্ (John Bright) সম্বন্ধেই কেবল একথাটি খাটে না। বাগ্মী শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের উপর কায করে—আবার শ্রোতার দলও বাগ্মীর হৃদয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। শ্রোতার করতালি, ও উৎসাহ-নাদে বক্তার রক্ত গরম হইয়া উঠে—তিনি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠেন। বক্তৃতা করার বিপদই এখানে। সিগ্‌নর্ প্যাট্রিজি বক্তাকে যেরূপ ভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন, শ্রোতাকেও যদি সেইভাবে বিশ্লিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে বক্তা ও শ্রোতা ইহাদের, কে কাহার হৃদয়ে কতটা কায করে, তাহা জানিবার পক্ষে আমাদের খুব সুবিধা হইত। বক্তৃতায় যে বিশেষ কোন বুদ্ধির খরচ হয় প্যাট্রিজি তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না।

প্যাট্রিজির সকল কথাই যে সত্য ও যুক্তিযুক্ত আমাদের তাহা মনে হয় না। তবে তাঁহার কথায় যে কোন সত্য নাই এ কথা কেহই বলিতে পারেনা। বাগ্মী খুবই সাধারণ ভাবকে এমনি ভাবে প্রকাশ করেন যে তিনি যেন প্রত্যাদিষ্ট (inspired) হইয়া একটা নূতন সত্য প্রকাশ করিতেছেন। বক্তৃতায় শব্দের আড়ম্বর যতটা থাকে, ভাবের আড়ম্বর তাহার এককড়াও থাকে কিনা সন্দেহ। বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মাতিয়া উঠে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বক্তৃতাটি ছাপা হইয়া বাহির হইলে তাহাতে মাতিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শূন্যগর্ভ বাক্যে ও অসম্বদ্ধ যুক্তিতে লোকে কি করিয়া বিচলিত হয়, তাহাই আশ্চর্য্য।

ডাক্তার।

বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ

কয়েক বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের কতিপয় ব্রাহ্মণ উকিল ও মোক্তারের উদ্যোগে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান লেখক তৎকালে মুন্সীগঞ্জে বাস করিতেন। যে কারণে ও যে ভাবে ব্রাহ্মণসভার উৎপত্তি হয়, তাহার অনুসন্ধান অনাবশ্যক। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা মানুষের দুর্ব্বলতাকেও স্বীয় ইচ্ছার সাধনযন্ত্র করিয়া থাকেন। তাই বুঝি আজ এই ব্যবহারাজীবসৃষ্ট ধর্ম্মসভার প্রকৃতপক্ষেই সমাজমঙ্গল-হেতুত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর সম্মুখে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালী তাহার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কিন্তু অমানিশার অন্ধকারে বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্ত্রস্ত ও সচকিত হইয়া পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। আজ উচ্চনীচ, ভদ্রেতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদয় বাঙ্গালীরই এই অবস্থা। ঈদৃশ সময়ে যিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে গন্তব্য নির্দ্দেশের আশাও প্রদর্শন করেন, তাঁহাকেই লোকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে। এই কারণেই বিপন্ন, বিভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণগণ অতি দ্রুত ব্রাহ্মণসভার প্রত্যাশিত সুনায়কত্বের অধীনে আপনাদিগকে স্থাপন করেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণসভার পতাকাতলে যে সামাজিক শক্তিসমবায় ঘটে, তাহা উদ্যোক্তাগণের প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়া বিগত ৫।৬ বৎসরকাল পরিচালিত হইতেছিল। আজিও হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই, আজিও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণ কথঞ্চিৎ নেতৃত্ব করিতেছেন। তাই অপরাপর বর্ণের উন্নতি-চেষ্টা-প্রসূত সমিতিসমূহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণসভার গুরুত্ব অধিক, একথা অস্বীকার করা যায় না। এস্থলে একটী বৃহত্তর ব্যাপারের সহিত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণসম্মিলনের তুলনা অমার্জ্জনীয় না হইতে পারে। পলাশিক্ষেত্রে বঙ্গরাজলক্ষ্মী ইংরেজ রাজশক্তিকে বরমাল্য প্রদান করেন। তৎপর দিল্লীশ্বরের ইংরেজকে বস্তুতঃ দেয় কিছুই ছিল না। তথাপি রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ সুচতুর ক্লাইব দিল্লীশ্বর হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনন্দ গ্রহণ করেন। হতশ্রী, শক্তিহীন, হৃতরাজ্য বাদসাহ শাহ আলমের সেই কলমের খোঁচার মূল্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। সুবা বাঙ্গালার বার্ষিক রাজস্বের প্রায় দশমাংশের বিনিময়ে তাহা ক্রীত হইয়াছিল। সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদের সমবেত ফুৎকার অদ্যাপি হিন্দু সমাজে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ব্রাহ্মণসম্মিলনের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা দৃষ্টে তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারিদিক হইতে আমরা যতই সংবাদ পাইতেছি, ততই বুঝিয়াছি সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের' নির্দ্ধারণ সমূহের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' অত্যল্প কালমধ্যে বিক্রমপুর-বাসীর গভীর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণেতর বিদেশ-প্রত্যাগত যুবক সমাজে পুনর্গৃহীত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণসভার নিকট আবেদন করেন। অন্যান্য অনেক সামাজিক বিষয় ব্রাহ্মণসভায় মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণসভাও সহৃদয়তার সহিত এই-সকল বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণসভা দূরবর্ত্তী স্থানসমূহেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বর্ষে প্রধানতঃ কাশী-প্রবাসী কয়েকজন বিক্রমপুরবাসী ও স্বনামখ্যাত বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর জমিদারীর ম্যানেজার সুপরিচিত বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে ও উদ্যোগে বিগত ২রা ও ৩রা কার্ত্তিক তারিখে মুন্সীগঞ্জে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের' অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

'মহাসম্মিলন' বস্তুতঃই মহাসম্মিলন হইয়াছিল। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন ও সত্যচরণ শাস্ত্রী, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহের উকিল বাবু হরিহর চক্রবর্ত্তী, ধামগড়ের বাবু সতীশচন্দ্র রায়, বিক্রমপুরের পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ও বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাস্ত্রপারদর্শী বাবু আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য, কাশীর ব্রাহ্মণসভাসংস্পৃষ্ট বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন বাবুর অনুবর্ত্তী কাশীর কণ্ট্রাক্টর বাবু কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়, এবং নবদ্বীপ, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন এবং বিক্রমপুরের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সাকল্যে প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের তুলনায় পণ্ডিতসংখ্যা অতি অল্প হইয়াছিল।

সভাস্থলে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনুপস্থিত বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজা মহারাজা প্রভৃতি এবং অপরাপর লোকের সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রাম পঠিত হয়। কংগ্রেস্ বা কন্‌ফারেন্সে তদপেক্ষা অনেক অল্পসংখ্যক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, সমুদয় বঙ্গবাসী মহাসম্মিলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

অনেক বক্তা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের চরণধূলিপূত বিক্রমপুর সম্বন্ধে যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুরবাসীগণ গৌরববোধ না করিয়া পারেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন বিক্রমপুর সেনরাজগণের রাজধানী, কৌলীন্যের উৎপত্তিস্থল, এবং আধুনিক ব্রাহ্মণ-গণের এক অতি প্রধান কেন্দ্র, অতএব বিক্রমপুরই ব্রাহ্মণ-সভার উপযুক্ত জন্মস্থান। বিদেশাগত বক্তাগণের বিক্রমপুর

সম্বন্ধে ঈদৃশী ভাব ও উক্তি বিক্রমপুরবাসীর হৃদ্‌গত কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিতেছে।

বিদেশাগত ভদ্রলোকদিগের উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা ও সৎকার করিতে অসমর্থতা হেতু বিক্রমপুরবাসী আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি তাঁহারা নিজগুণে আমাদের ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

বঙ্গের নানা-স্থান-বাসী বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গসমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া মহাসম্মিলনে পরস্পরকে সৌহার্দ্দ জ্ঞাপন করিলেন, একই হিতচিকীর্ষা সকলের হৃদয় আন্দোলিত করিল, এবং সভান্তে সকলে সেই শুভসম্মিলনের স্মৃতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে সম্মিলনের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইহাই সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব। এই অধিবেশনের এতদতিরিক্ত আর কোনও প্রশংসা করা যায় না।

সম্মিলনে যেসকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী বা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নই সভাপতিত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের ব্রাহ্মণ নায়কগণের নয়ন ও মন ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা ধনবত্তা দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিল। অন্যথা শাস্ত্রী ও তর্করত্ন মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজোপাধিক শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়কে তাঁহারা কদাপি সভাপতি মনোনীত করিতেন না। রাজা বাহাদুর আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে কিছুই বলিতেছি না। তাঁহার শিষ্টাচার এবং অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সম্মিলনে তাঁহার উপস্থিতি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের বিষয়। অধিকন্তু যদিও তিনি শেষকালে মনোমোহন বাবু ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণ-প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তাঁহার ন্যায় রাজনীতিকুশল, বিচক্ষণ ব্যক্তি সভাপতির আসনে উপবিষ্ট না থাকিলে বর্ত্তমান একদেশ-দর্শী সম্মিলনের কার্য্যপরিচালন সুকঠিন হইত। কিন্তু সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যে সভায় সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ধনপতির সভাপতিত্ব অপরিহার্য্য হয়, সে সভাকে ব্রাহ্মণ-সভা আখ্যাপ্রদান শব্দার্থের ব্যভিচার মাত্র। রাজা বাহাদুরের নিজ ভাষায় বলিতে গেলে ধনীগণ ক্ষাত্রশক্তির অঙ্গীভূত দিল্লীদরবারের ন্যায় 'ঘোষণা' সভার অথবা বণিকগণের 'ঝনঝনা' সভার উপযুক্ত সভাপতি হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের 'মন্ত্রণা' সভায় ধনীর সভাপতিত্ব নিতান্তই অশোভন, অনুপযোগী ও স্বস্থানাতি-ক্রমী। ব্রাহ্মণসভার উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী। সুতরাং তাঁহাদের আহূত সভায় ধনীর সভাপতিত্ব বিশেষতঃ নিন্দনীয়।

সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের যুগোচিত ব্রাহ্মণপ্রীতি বণিকগণেরও লোভনীয়। যে ব্রাহ্মণকুলতিলক সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া সম্মিলনকে ধন্য করিয়াছেন, তিনি সভাস্থলে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের পত্রের প্রতি যে গুরুত্ব স্থাপন করেন, অনেক ব্রাহ্মণ রাজার পত্রের প্রতিও তাদৃশ গুরুত্ব স্থাপন করেন নাই। সভাস্থ সকলেই তাহা লক্ষ্য করেন এবং একটুক কানাকানিও হয়। ব্রাহ্মণপ্রবর নাকি স্মিতমুখে জনান্তিকে বলিয়া-ছিলেন, 'রাজা শ্রীনাথকে আমাদের পক্ষে কমিট (commit) করাইয়া লইলাম।'

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন সভাতে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধেই ভোট লওয়া হইবে না। নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের মন্ত্রণা-সভায় কোন্ মত গৃহীত বা অনুসৃত হইবে, তাহা নির্ব্বাচিত মধ্যস্থ নির্দ্দেশ করিতেন। কলির ব্রাহ্মণ-সভায়ও সেই প্রাচীন রীতির অনুকরণে ইংরেজী ভোটপ্রথা * 'একঘরে' হইল। 'একঘরে' কিন্তু নিতান্ত গৃহশূন্য নহে; কারণ ভোটের জন্য মহা-সম্মিলনও একটুক স্থান রাখিয়াছিলেন—সভাপতি ও

* ভোটপ্রথা ইংরেজি বা য়ুরোপীয় প্রথা নহে; ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভোটপ্রথা প্রচলিত ছিল। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রমাণ করিয়াছেন (An Introduction to Hindu Polity) যে, প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র শাসন বিশেষ প্রচলিত ছিল, এবং ভোটের নাম ছিল "যে-

তৎকথিত মধ্যস্থ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাবু অম্বিকাচরণ উকিল ও অন্যান্য সভ্যগণ সভাপতির এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা সত্বেও প্রস্তাবটী গৃহীত না হইলে সভাপতি মহাশয় সভাপতিত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রতিবাদকারীগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

শুনিয়াছি সভাধিবেশনের পূর্ব্বে কয়েকটী বিএ, এমএ, উপাধিধারী 'বালক' নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ দ্বারা মনোমোহন বাবুর অনুচরগণের বড়ই বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন! অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত তিনটী অপূর্ব্ব নীতি অনুসরণের প্রস্তাব করেন ঃ—

১। সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ ইতিপূর্ব্বে যে-সকল প্রস্তাব মুসাবিদা করিয়াছেন, সেই সেই প্রস্তাব বিনা আলোচনায় সম্মিলনের গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ সম্মিলন তো আলোচনার স্থান নহে!

২। 'বালকদের' কথা শুনা যাইবে না।

৩। সভায় ভোট লওয়া হইবে না; সভাপতির ঘোষণা দ্বারা প্রস্তাবগুলি গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে।

যদিও তৎকালে এই-সকল নীতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মনঃপূত হয় নাই, তথাপি পরিণামে এই-সকল নীতি অনুসারেই সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল! মনোমোহন বাবুর বিরুদ্ধমতাবলম্বী ২।১ জন মাত্র অতি কষ্টে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটীর সামান্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; সময়াভাবের উজুহাতে আর সকলেরই কণ্ঠরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহন বাবুর অনুকূল বক্তাদের বক্তৃতা-কালে কোনও সময়াভাব হয় নাই।

যাঁহারা ঈদৃশ ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সভা আহ্বান না করাই সঙ্গত। নির্জ্জনে ও নীরবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্ব্য পন্থা। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢাকে ঢোলে সভা না করিলে জিদও বজায় থাকে না, নেতৃত্বাভিমানেরও আহুতি হয় না।

যবনিকার অন্তরালে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছে; তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা কালক্রমে ব্রাহ্মণ-সভা বিদ্বেষ-সভা মাত্রে পরিণত হইতে পারে।

মনোমোহন বাবুর কোনও সুযোগ্য অনুবর্ত্তী আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 'আপনারা সভায় আসিয়া প্রতিবাদ ও গোলযোগ করিবেন; সেইজন্যই আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বকই আপনাদিগকে ও আপনাদের মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগকে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনারা অনাহূত আসিয়াছেন। অভ্যর্থনা সভা (অর্থাৎ তিনি ও তৎপন্থীগণ) ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে বলিতে না দিতে পারেন।' ইহা হইতেই পাঠকগণ সভাতে পণ্ডিত-সংখ্যার আপেক্ষিক অল্পতার কারণ বুঝিবেন। বস্তুতঃ উদ্যোক্তাগণ জ্ঞাতসারে কোনও রক্ষণশীলতা বিরোধী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তথাপি উপস্থিত সভ্যগণের অনেকাংশ উদারমতাবলম্বী ছিলেন।

উদ্যোক্তাগণ নির্দ্ধার্য্য প্রস্তাবসমূহের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে তিনটী সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি ছিল। সংক্ষেপতঃ সেই প্রস্তাব তিনটীর মর্ম্ম এই—

১। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রপাঠ করিতে দেওয়া হইবে না।

২। কায়স্থগণকে উপবীত ধারণ করিতে বা অপরাপর নিম্নবর্ণসমূহকে উচ্চবর্ণের অনুকরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

৪। বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে পুনগ্র্হণ করা হইবে না।

উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন হিন্দু আচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিতান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আচার কি, তাহা কি তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? মনোমোহন বাবু কি তাঁহার চাকুরী ও চাকুরীস্থলবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে গমনপূর্ব্বক অজিনাসনে শয়নোপবেশন ও প্রভুগৃহের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের পরিবর্ত্তে

বহুতরা" বা "যে-ভূয়সিকম্" ; ballot-votingকে বলিত "শলাকা-গ্রহণ"। "পঞ্চজনার" মধ্যে "গণরায়ণি" শাসনপ্রথা এদেশে য়ুরোপের আমদানি নহে।

বর্ত্তমান সময়েও অনেক জাতির সামাজিক মীমাংসা পঞ্চায়ত সভায় ভোট লইয়া করা হয়।—সম্পাদক।

স্বচ্ছন্দ বনজাত দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন? ব্রাহ্মণ ডাক্তারগণ কি তাঁহাদের জীবনোপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজনযাজন আরম্ভ করিবেন? অপর হিন্দুসাধারণ কি ডাক্তারদের অন্ন ত্যাগ করিবেন? চিকিৎসক সম্বন্ধে মহামুনি পরাশরের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাগণ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? শামলা-শোভিত, চাপকানাবৃত-দেহ উদ্যোক্তাদিগের কূটবুদ্ধিপরিচালনবৃত্তি বারত্রয় সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ দ্বারাই ব্রাহ্মণোচিত আচারে পরিণত হইবে কি? তাঁহারা কি মুসলমানী শামলা ও চাপকান এবং ইংরেজী জুতা, সাবান, বরফ, সোডা, লেমনেড, চা, বিস্কুট, ঔষধ, কলেরজল ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবেন? যে-সকল পুত্র মেধাহীন তাহাদিগকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-পিতা সভাস্থলে স্বীয় বৈদিকধর্ম্মপ্রীতি ঘোষণা করিয়া আসর জাঁকাইতে পারেন, কিন্তু যে পুত্র ইংরেজী স্কুলে প্রতিবৎসর পাশ করিয়া প্রমোশন পায়, বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহাকে স্কুল বা কলেজ ছাড়াইয়া কোন পিতা চতুষ্পাঠীতে পাঠাইবেন কি? যে স্কুল বা কলেজে ইংরেজ মুসলমান বা শূদ্র শিক্ষক বা অধ্যাপক আছেন, তথায় তাঁহারা স্ব স্ব পুত্রগণকে প্রেরণে বিরত হইবেন কি? অথবা ব্রাহ্মণসন্তান ও অন্ত্যজবর্ণের ছাত্রদের আসনের পার্থক্য সাধন করা যাইবে কি? ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নিরপেক্ষ ইংরেজের দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তে মনুর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন? বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ কি কুসীদ-লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? আর যদিই সে অঘটন সংঘটিত হয়, তবে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান ইন্সিওর্যান্স্ কোম্পানী প্রভৃতির কি দশা হইবে?

জগত্তারা, জগদম্বা, ভগবতী, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি আমাদের মাতা মাতামহীগণ প্রসবান্তে অগ্নি সেকেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আধুনিক ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণ বাবুগণের ননীবালা, পারুলবালা, সুকুমারী, স্নেহলতা প্রভৃতি গৃহিণীগণের প্রসবান্তে ব্রাণ্ডী সেবন কি সেই বাবুগণই প্রবর্ত্তন করেন নাই? যদি ইংলণ্ডে কুক্কুটমাংস ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব হয়, তবে পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম এই সুরাপানের কি ব্যবস্থা হইবে? আর যাঁহাদের ইংলণ্ডযাত্রার শক্তির অভাব, তাঁহাদের গঙ্গাজলপক্ক কুক্কুটমাংস সেবনের প্রায়শ্চিত্ত রঘুনন্দন ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে টেম্স্ নদীর জলের প্রায়শ্চিত্তাতীত মহাপাতকত্ব কোন স্মৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও আমরা জানিতে চাই।

গৃহে অতিথি-সমাগম হইলে স্ববৃত্তিপর ব্রাহ্মণবাবু স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অতিথির আহারান্তে অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক এগারটার পর আপিসে যাইতে পারিবেন কি? রজনীযোগে সকলের আহারান্তে বামনঠাকুর স্বাভিপ্রেত স্থানে প্রস্থান করার পর ব্রাহ্মণবাবুর অট্টালিকা অতিথিপদধূলিপূত হইলে গৃহিণীবাবু দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদাঙ্গারধূমে স্বীয় হরিণনয়ন অরুণ করিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-সৎকার করিবেন কি? আর ননীবালাকে তাদৃশ অশনি-সম্পাত-সম কঠোর আদেশ প্রদান করিতে ব্রাহ্মণবাবুর সাহসে কুলাইবে কি? ননীবালার সেই ঘোর বিপৎকালে অনাচরণীয় অন্ত্যজের হস্তপক্ক মিষ্টান্নই কি বাবুর একমাত্র ভরসাস্থল হইবে না?

আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। যদি আচারহীন ব্রাহ্মণের শাস্ত্র পাঠ নিবারণ করিতে হয়, তবে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ হইতে শাস্ত্র পাঠ উঠিয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহাও বাঞ্ছনীয় হয়, তবু তাহা সাধন করিবার শক্তি ব্রাহ্মণসম্মিলনের আছে কি? সম্মিলন কি ভারতবর্ষ হইতে মুদ্রাযন্ত্র বিতাড়িত করিতে পারিবেন? অথবা ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের পোষ্টাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন? আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কেন, কোন্ হিন্দু বা অহিন্দুর শাস্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণসম্মিলনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? যাহা অসম্ভব, তাহা প্রস্তাব করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র লাভ।

তারপর কায়স্থগণের উপনয়নের বিষয়। কায়স্থগণের উপবীত ধারণের চেষ্টা আমরা নিতান্তই দুষণীয় মনে করি। কায়স্থগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের ত্রিদণ্ডীস্থলে ত্রিগুণিত ত্রিদণ্ডী গ্রহণ করিলেও আমরা আপত্তি করিব না বা তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে

বলিতে হয়, তাঁহারা দূষিত অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিশ-দিনের-স্থলে-দশদিন-অশৌচপালন-জনিত নহে, অথবা ব্রাহ্মণ-ও-কায়স্থের-বাহ্যপার্থক্যলোপাশঙ্কা জনিত কল্পনা মাত্রও নহে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কোনও অসমতা নাই। শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার, জীবনোপায় ও জীবনযাত্রা-প্রণালী বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ। সুতরাং বাস্তবিক বৈষম্যের অভাবহেতু বাহ্য বৈষম্য লোপ কোনও সহৃদয় ব্যক্তিকে ব্যথিত বা ভীত করিতে পারে না। কিন্তু কায়স্থগণের উপনয়নপ্রবৃত্তি অদ্ভুত রক্ষণশীলতাপ্রসূত, এই সম্মুখোন্মুখী উন্নতির যুগে পশ্চাদুন্মুখী স্থিতিশীলতা অবনতির ছায়া।

কায়স্থগণ এ বিষয়ে ভেদবুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইতেছেন। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ উপনীত হইতেছেন; কিন্তু যাহাদিগকে অন্যে শূদ্র বলে এবং যাহারা নিজেরা কায়স্থনামে পরিচিত হইতে চাহে, সেই দে-দত্ত-প্রভৃতি-বংশোপাধিক কায়িকশ্রমজীবী ব্যক্তিগণের উপনয়ন-লিপ্সার প্রতি কায়স্থগণ নিরতিশয় বিদ্বেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সে বিদ্বেষ অনুদার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থের বিন্দুমাত্র ন্যূন নহে।

কায়স্থগণ তাঁহাদের উপনয়নাধিকারের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের জন্যও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ইহা বালকোচিত আত্মপ্রতারণা মাত্র। কায়স্থের উপনয়ন শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তদ্বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। বঙ্গসমাজ অনভিমত স্থলে কদাপি শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কায়স্থগণ ইহা নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের উপনয়নাধিকার শাস্ত্রপ্রসূত নহে, পরন্তু তাঁহাদের আত্ম-শক্তিজনিত। 'শূদ্র'গণ এখনও তাদৃশ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই তাহাদের উপনয়নাধিকার নাই। যেদিন তাহারা আবশ্যকীয় শক্তিলাভ করিবে, সেদিন তাহাদের উপনয়নও শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

যে বর্ণে প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, সীতারাম, সূর্য্যকান্ত, কেদাররায়, রামচন্দ্ররায়, এবং লালাবাবু, রাণী কাত্যায়নী, রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, তরুদত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং অগণিত অন্য বহু কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বর্ণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন, সেজন্য কীটদষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক আওড়াইবার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। শক্তিমান্ চিরকালই সম্মানার্হ। যখন ভারতবর্ষে 'হিন্দু-সূর্য্য মধ্যাহ্ন কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, তখনও এই বর্ণভেদ-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ-বক্ষে অবস্থান করিয়া অন্ধ্রবংশীয়গণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের উপবীত ধারণের বৈধতা প্রতিপাদনের শক্তি সংস্কৃত শ্লোকের নাই, কিন্তু তাঁহাদের আত্মশক্তির আছে।

যাহা হউক জাতীয়তার হিসাবে দূষণীয় হইলেও কায়স্থগণ যখন উপবীত ধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার অধিকার কাহারও নাই; জিদ বজায় ও স্বার্থপরতা ব্যতীত বিঘ্ন জন্মাইবার কোন কারণও দেখিনা। ব্রাহ্মণগণ পরিপন্থী হইলে শুধু নিজেরা অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত ও হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।

কায়স্থরা ব্রাহ্মণের নিকট কোন বিষয়েই নির্ভরশীল নহেন; আমরা তাঁহাদের বাড়ী না গেলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীতই চলিতে পারিবেন ও চলিতে অভ্যস্ত হইবেন। কিন্তু কায়স্থ ও অপরাপর জাতির সাহায্য ব্যতীত কয়জন ব্রাহ্মণের জীবনাতিপাত হইতে পারে? মনোমোহন বাবুর ন্যায় কয়েকজন ভাগ্যবান্ চাকুরীজীবী ও কয়েকজন উকিল, মোক্তার ইত্যাদি দ্বারাই কি ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত? অন্যান্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ-প্রধান বিক্রমপুরেও পণ্ডিতগণ এবং কায়স্থযাজী বহুব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কি কায়স্থগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, না করিতে পারিবেন? কায়স্থগণের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের পৌরাহিত্যাধীনেই হইতেছে না? বস্তুতঃ কায়স্থের উপনয়ন নিবারণ ব্রাহ্মণসমাজের শক্তির ...ীত।

হিন্দুসমাজে এ পর্য্যন্ত যত বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছে, প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, দেবীবর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ। আমেরিকার আর্য্যগণ তত্রত্য অনার্য্যদিগকে যে ভাবে স্বসমাজ-বহির্ভূত ও নির্ম্মূল করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ তত্রত্য অনার্য্যদিগকে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত ও রক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে সভ্যসমাজভুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব। আজিও ব্রাহ্মণগণ অর্দ্ধসভ্য অনার্য্যদিগকে আর্য্য ঋষিদিগের বংশধর কল্পনায় নূতন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুসভ্য হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা চক্ষুষ্মান্ ইংরেজগণও স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজ বর্ণ সমূহকে নির্য্যাতন করিতেন বলিয়া যিনি যাহাই বলুন, চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান তাঁহাদের উন্নতি বিধানই ব্রাহ্মণশাসনের একমাত্র ফল। আজ কি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সেই গৌরবান্বিত অধিকার ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন? তাঁহারা কি উপনয়নপ্রয়াসী কায়স্থগণের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্মান ও সমাজ-নেতৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন না? কায়স্থের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের গৌরব ও ব্রাহ্মণ-বিহিত সমাজ-পদ্ধতির সার্থকতা নহে? মধ্য ভারতের গোঁড়গণ কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্বাধীনেই উপবীত-ধারী রাজপুতে পরিণত হয় নাই? অনার্য্য গোঁড়কে উপবীত প্রদান করার পর আর্য্যবংশসম্ভূত কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

যাহা হউক মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ প্রতিপক্ষের দৃঢ় প্রতিবাদের আশঙ্কায় শাস্ত্রপাঠ-নিবারণ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী সাহস করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করেন নাই। কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী এই পরিবর্ত্তিত আকারে সম্মিলনের সম্মুখে উপস্থিত হয়—

'ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সেই সেই জাতির বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা।'

ইহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই; বরং ব্রাহ্মণগণ অপরাপর বর্ণের মঙ্গলানুধ্যানে ব্রতী হইতেছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইবেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রোমান্ ব্রাহ্মণ কেটোর কার্থেজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ন্যায় সম্মিলনের প্রস্তাবক মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তদুপলক্ষেই কায়স্থের উপনয়ন ও তদ্বৎ অন্যান্য বিষয়ে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় তখন বলিতে বাধ্য হইলেন 'এ সকল সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক'। মনোমোহন বাবুর অনুচরগণ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। একজন বলিয়া উঠিলেন 'তবে এত টাকা ব্যয় করিয়া সভা করিলাম কেন?' অপর একজন বলিলেন 'এই প্রস্তাবে এসব কথা আসে না, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝি নাই।' প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, 'যদি আপনারা কথা না বুঝিয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া থাকেন, তবে আমি তার কি করিব?'

রক্ষণশীল উদ্যোক্তাগণের তৃতীয় আপত্তিজনক প্রস্তাব বিলাতফেরতদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ না-করা সম্বন্ধে। বাবু অম্বিকাচরণ উকিল প্রস্তাবটীর প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 'এই বিষয় এই সভায় মীমাংসা হইতে পারে না; এ বিষয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তির জন্য এক স্বতন্ত্র কমিটী গঠিত হওয়া সঙ্গত।' তাহাতে উদ্যোক্তাগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ঐ সভাতেই ভোট-গ্রহণ-নিষেধের সুযোগে আপনাদের মনোমত প্রস্তাব পাশ করাইয়া লওয়াই তাঁহাদের আত্যন্তিক চেষ্টা হইল। তখন বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চারি বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-সভার কোলার অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে লওয়া হইবে। তদনুসারে আমি বিলাতফেরতদিগের সঙ্গে আহার করিয়াছি, এবং কোন কোন বিলাতফেরত ব্যক্তির কন্যা হিন্দুসমাজে বিবাহিত হইয়াছে। যদি আজ বিলাতফেরত বর্জ্জন বিহিত হয়, তবে আমার ও যাঁহারা বিলাতফেরতদের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ব্যবস্থা হইবে?' বিপদ গণিয়া মনোমোহন বাবু বলিলেন, 'হাঁ, কোলা-সভায় বিলাত-

ফেরতদিগকে গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইছাপুরা সভায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।' অন্য কোন কোন ব্যক্তিও কম্পিতকণ্ঠে ক্ষীণ স্বরে শ্রীশবাবুর স্পষ্ট বাক্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোলাসভার নির্দ্ধারণ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সম্মিলনস্থলে শ্রীশবাবুর সহিত আহার করিতেও কেহ কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই।

যখন বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী আলোচিত হয়, তখন একজন ব্রাহ্মণ করজোড়ে সভাপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! একটী দুঃখের কথা বলিতে চাই। শিষ্যবাড়ী আহার করিতে গিয়াছিলাম। ঐ শিষ্য জাপানপ্রবাসীর বাড়ী আহার করিয়াছে বলিয়া এই পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকে আমাকে আটক দিলেন; সমস্তদিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যাকালে বিবন্দি হইতে (শিষ্যের বসতিগ্রাম) ফিরিয়া আসিলাম। আরো দুই দিন এইরূপ হইয়াছে। তৎপর বালাসুর গ্রামে এক বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া দেখিলাম এই পণ্ডিত মহাশয়গণ (এস্থলে বক্তা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইতে লাগিলেন) আমার সেই শিষ্যদের সহিত আহার করিতে বসিয়াছেন। পোড়া কপাল! আমিও বসিয়া গেলাম। মহারাজ! তিন দিন অভুক্ত রহিলাম, আমার শিষ্যও আমাকে ছাড়িয়া গেল; শেষে এই পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে পরের বাড়ীতে সেই শিষ্য লইয়া পংক্তিভোজন করিলাম! এই দুঃখের কথা কাহাকে বলি?'

যাহা হউক বিপক্ষের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দেখিয়া উদ্যোক্তাগণ একটুক নরম হইলেন। শেষে প্রস্তাবটী যে আকারে গৃহীত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে উভয়মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের এক কমিটী গঠিত হইবে। তাঁহারা যে মীমাংসা করেন, তাহাই গৃহীত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের নিষ্পত্তি প্রকাশের পূর্ব্বে বিক্রমপুরবাসীগণ বিলাতফেরতদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীশবাবুকে নিজমতের পোষকতায় বক্তৃতা করিতে দেন নাই; শ্রীশবাবুর মতাবলম্বী অন্য কাহাকেও মুখ খুলিতেও দেন নাই। সভাপতি মহাশয় বলেন শ্রীশবাবু একাকী প্রতিবাদী আছেন, একথা লিপিবদ্ধ হইবে। অমনি চারিদিক হইতে 'আমরা প্রতিবাদী, আমরা প্রতিবাদী' এই ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যাঁহারা প্রতিবাদী আছেন, তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রতিবাদকারীর তালিকায় লিখিত আছে।

রাজা বাহাদুর, শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি কাহাকেও বিলাত যাওয়ার বিরোধী দেখিলাম না; এমন কি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মনোমোহন বাবু প্রভৃতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন বিলাত গিয়া শিক্ষালাভ কর, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু দেশে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্রবাসরূপ সুখটুকু পরিত্যাগ কর; সমাজের বাহিরে বাস কর। অর্থাৎ, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।" তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের যুবকদের মধ্যে কি এমন স্বার্থত্যাগী নাই যে দেশের জন্য বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এই সুখটুক পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বাস করিয়া স্বদেশের সেবা করিতে পারে?' হিন্দুজাতি ধর্ম্মগতপ্রাণ, একথা বাল্যকাল হইতে শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়াছে। যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ হয় তবে মনোমোহন বাবু প্রভৃতি বিলাত যাইতে ব্যবস্থা দেন কি প্রকারে? আর যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ না হয়, তবে বিলাত-প্রত্যাগতগণ কেন সমাজে গৃহীত হইবেন না? বিলাত যাওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু বিলাত-প্রত্যাগতের সমাজে গৃহীত হওয়া দোষ, মনোমোহন বাবু প্রভৃতির এই ব্যবস্থার রহস্যোদ্ভেদ কে করিবে? ইহা ডিপ্লোম্যাসি হইতে পারে কিন্তু ইহা ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণোচিতও নহে।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা সম্ভব কি? বিক্রমপুরে বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর 'চল' হইতেছেন, এই প্রত্যক্ষ সত্যটাও কি মুদিতনয়ন সম্মিলনের-উদ্যোক্তাগণ দেখিবেন না? মূকবধির-বিদ্যালয়ের যামিনী বাবুর গৃহে হাসাড়া, ডেওটশালী প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ প্রকাশ্যভাবে পংক্তি-ভোজন করিয়াছেন এবং যামিনী বাবুর কন্যাগণ হিন্দুসমাজে বিবাহিত হইয়াছেন।

সোনারঙ্গের, বৈদ্যগণ মুন্সীগঞ্জের উকিল বাবু রত্নেশ্বর সেনের বিলাত-প্রত্যাগত পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে চল করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের অন্যতম উকিল বাবু উমেশচন্দ্র দাসের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাস, আমেরিকা হইতে আসিয়া দীর্ঘকাল মুন্সীগঞ্জে উমেশবাবুর গৃহে বাস করিয়াছিলেন; অথচ উমেশবাবুর গৃহে মুন্সীগঞ্জের আব্রাহ্মণ সকলে রত্নেশ্বর বাবুকে লইয়া আহার করিয়াছেন। সম্প্রতি মালখানগরের সুপ্রসিদ্ধ বাবুগণ প্রকাশ্যভাবে বিলাত-প্রত্যাগতের সহিত আহার করিয়াছেন। শুনিয়াছি বজ্রযোগিণীতেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। বিক্রমপুর হইতে প্রতি বৎসর সর্ব্বজাতীয় বহু যুবক আজকাল সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আজ বিক্রমপুরের পণ্ডিতের পুত্র পর্য্যন্ত বিলাতপ্রবাসী। যে-সকল দীর্ঘশিখ ব্রাহ্মণপ্রবর স্ফীতবক্ষে সম্মিলনে ব্রাহ্মণ্যের গৌরব ঘোষণায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবারস্থ যুবকগণও প্রধানতঃ অর্থাভাবে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তাহাও আমরা অনবগত নহি। আর ঐ যুবকদের পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিও যে তাঁহাদের বিদেশগমনে নিতান্ত নারাজ তাহাও নহে। তবে কথাটা এই যে নিজপুত্র অর্থাভাবে বা মেধাহীনতা বশতঃ যদি ব্যারিষ্টারীর অযোগ্য হয়, তবে প্রতিবেশীর পুত্র ব্যারিষ্টার হইলে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করা যায়? একদা কোন ব্যবহারাজীব ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'যতদিন নিজ পরিবারের কেহ বিলাত না যায়, ততদিন কিছুতেই বিলাত যাওয়ার সমর্থন করিব না।' এবারকার সম্মিলনের গতিও আমাদের নিকট এইভাবপ্রসূতই বোধ হইল।

যাহা হউক উপরে আমরা যে-সকল তীব্র সমালোচনা করিলাম, তাহা সত্ত্বেও পুনরায় বলিতেছি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন বস্তুতঃই নিরতিশয় সার্থকনাম হইয়াছিল। সম্মিলন আমাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেস্ ইত্যাদিতে দেহি দেহি রবে গগন বিদীর্ণ করিয়াও আমরা আমাদের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ উন্নতি সাধন করিতে পারি নাই; প্রকৃত লক্ষ্য ও গন্তব্য পন্থাও নির্ণয় করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের নেতৃত্বেও কংগ্রেস ও তদ্বৎ সভাসমূহ ভারতীয় প্রকৃতি-পুঞ্জকে প্রত্যক্ষভাবে স্বকীয় পতাকাতলে সম্মিলিত করিতে পারে নাই। আর আজ পূর্ব্ববঙ্গের নগণ্যস্থান মুন্সীগঞ্জের অজ্ঞাতনামা ও ক্ষুদ্রশক্তি সামান্য কয়েকজন উকিল মোক্তারের আহ্বানে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন, আর ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহ তাঁহাদের নিস্তেজ কণ্ঠের ক্ষীণস্বর শ্রবণের জন্য উদ্গ্রীব হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ও আশার কথা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জীবনে কদাপি স্ব স্ব পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত কোন বিষয়ের কোন তত্ত্ব রাখেন না, আজ তাঁহারা ব্রাহ্মণসভার আহ্বানে সমাজের মঙ্গলালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। ব্রাহ্মণসভা আত্মনিবদ্ধকে সমাজনিষ্ঠ করিবার উপায় স্বরূপ হইতেছে।

সূক্ষ্মদর্শী সমাজনায়কের পক্ষে ইহা অতি শুভ মুহূর্ত্ত। ব্রাহ্মণসম্মিলনের নামমাহাত্ম্যের সূত্রাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ এবং তৎ সহ সমগ্র বঙ্গসমাজের উন্নতি বিধানের এই প্রশস্ত সময় ও উপায়। ব্রাহ্ম সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কংগ্রেসে বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণসভায় একজন সুদক্ষ ও স্বার্থত্যাগী নেতার আবির্ভাব হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে সংবিধান ও সুপরিচালনা দ্বারা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সোপান নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন।

এবার মহাসম্মিলনে কলিকাতা, বীরভূম, ও মৈমনসিংহ হইতে তত্তৎ স্থানে আগামী অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। আগামী শীতঋতুতে কলিকাতায় মহা-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপে বঙ্গের প্রত্যেক জেলা বা বিক্রমপুরের ন্যায় প্রধান প্রধান পরগণার বিভিন্ন গ্রামে প্রতি বৎসর একটী স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সভা ও বিভিন্ন জেলার সদরে বা অন্য প্রধান প্রধান স্থানে প্রতিবৎসর সমগ্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের একটী মহাসম্মিলন অধিবেশিত হইলে অচিরকালমধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বঙ্গসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণসভা এ পর্য্যন্ত রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন, পরিণামেও তদ্রূপই চলিবেন; অন্যথা ব্রাহ্মণ-সভার হিতকারিতা বিনষ্ট হইবে।

স্বার্থের হিসাবেও ব্রাহ্মণগণের মহাসম্মিলন রক্ষা ও পুষ্ট করা কর্ত্তব্য। বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভার অনতিদীর্ঘ জীবন-কালেই আমরা দেখিতেছি কায়স্থ, সুবর্ণবণিক এবং অন্ত্যজ জাতি সমূহের অনেক সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসাভার ব্রাহ্মণসভার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণগণের গৌরব বটে।

ইদানীং আমরা নিম্নবর্ণসমূহের উন্নতি চিন্তা করিতেছি। যদি তাহারা ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন হইতে অনুকূল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে অতি সহজে অনেক জটিল সামাজিক সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারিবে; নমঃশূদ্রগণের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় আমাদিগকে আর ভীত করিতে পারিবে না। কিন্তু মহাসম্মিলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে কোন ব্রাহ্মণই এই-সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম নহেন।

উপসংহারে আমরা ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই-তেছি। মুন্সীগঞ্জের যে-সকল উকিল মোক্তার প্রথম ব্রাহ্মণসভা আরম্ভ করেন, তাঁহারাও আমাদের হৃদ্গত ধন্যবাদের পাত্র। ব্রাহ্মণসভার সুদূরগামী হিতকারিতা তাঁহারাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদের হস্ত দ্বারা স্বীয় কার্য্য সাধন করিতেছেন।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
উকিল,
ঈশ্বরদাস লেন, ঢাকা।

সতীন

(গল্প)

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে-কোলে পূজা দিবার মানত করিয়া, মাদুলি কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া, নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইল না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিয়া শুনিয়া স্বামীর আর একটি বিবাহ দিল। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর সংসার মানায়!

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তখন সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর যে স্বামী তাহার ছিল, যাহার জীবনের সহিত তাহার সুখ দুঃখ জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই স্বামীকে নৃত্যকালী হাসি-মুখে প্রশান্ত মনে তরঙ্গিণীকে দান করিয়া, সেই নবীন দম্পতির সেবা ও যত্নের ভার গ্রহণ করিল। নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ছোট বোন্‌টির মতন যত্ন করে, সখীর মতো তরঙ্গিণীকে প্রণয়ের দীক্ষা দেয়, নবযৌবনা তরঙ্গিণীর বৃদ্ধ স্বামীকে লইয়া রঙ্গ রসিকতা করে, তাহাদের দু-জনের নূতন প্রণয়ের ভাবলীলা ও কুণ্ঠিত গোপন মিলন-প্রয়াস দেখিয়া কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করে।

তরঙ্গিণীও বাপের বাড়ী হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিদির যত্ন মমতায় একদিনের তরেও মুখ মলিন করি-বার অবসর পায় নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্য-কালী তাহাকে "দিদি আমার, বোন্‌টি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া বার বার বিবিধ সামগ্রী খাওয়ায়; সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহার নিজের হাতে বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচ বার পাঁচ রকম করিয়া সাজায়; নৃত্যকালী নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিয়া, আলতা পরাইয়া, তরঙ্গিণীকে জেদ করিয়া জোর করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয়।

সংসারের এতটুকু কাজও তরঙ্গিণীকে করিতে হয় না। সংসারের সমস্ত সেবা ও কর্ম্মের ভার নৃত্য-কালীর; হাসি আনন্দ ও সম্ভোগের জন্যই যেন তরঙ্গিণীর জীবন।

তাহার পর যখন তরঙ্গিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইল তখন নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাহার এত দিনের সাধ এইবার তরঙ্গিণী হইতে পূর্ণ হইবে। সে একটি সোনার চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার ঘর সংসার উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া রাখে, অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে

টিক টিক করিয়া বেড়ায়, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজর না লাগে; সু-ভালাভালি দুজন দুঠাঁই হইয়া গেলে সে বাঁচে। তরঙ্গিণী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে বা এঘর ওঘর করিবার সময় মাথায় একটা খড়কুটা গুঁজিয়া না রাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিণীকে বলে—পেটের কাঁটাটা আমার কোলে একবার ফেলে দে, তারপর তোর যা খুসি তাই করিস, আমি আর তোকে তখন কিছু বলব না।

যেদিন তরঙ্গিণী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি, আর আমি বাঁচব না।—সেদিন নৃত্যকালীও সুখে ও দুঃখে তাহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিল। এই বেদনার ভিতর দিয়া তাহাদের উভয়ের মাতৃত্ব আজ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে।

তরঙ্গিণীর একটি পুত্রসন্তান হইল। নৃত্যকালী সেই আঁতুড় ঘরেই একরাশ করবীফুলের মতো শাদা ধবধবে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রু-সজল হাসিমুখে তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ দেখ, আমার কেমন খোকা হয়েছে!

তরঙ্গিণী সুখের গর্ব্বভরা হাসিমুখে বলিল—দিদি, খোকা ত তোমারই!

সেই দিন হইতে নৃত্যকালীর কাজ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এতদিন সে একটি বৃদ্ধ খোকা ও একটি তরুণী খুকিকে পরম যত্ন ও আগ্রহে মানুষ করিতেছিল, এখন আর একটি নূতন শিশু খোকার ভার তাহার উপর পড়িল। খোকাকে তেল-মাখানো, সেঁক দেওয়া, নাওয়ানো, ধোয়ানো, দুধখাওয়ানো, কাজল-পরানো সমস্ত তাহারই ভার। খোকা সমস্ত দিনরাত তাহারই কাছে থাকে, একএকবার কেবল মাই দিবার জন্য সে খোকাকে ঙ্গিণীর কোলে দেয়। তখন তরঙ্গিণী হাসিয়া বলে—দিদি, তোমার খোকাকে আমি মাই দেবো কেন?

নৃত্যকালী সুখের হাসিতে দুঃখ ঢালিয়া দিয়া বলে—কি করব বোন, বিধাতা আমায় বঞ্চিত করেছেন! নইলে কি আমি তোকে এ কষ্টটুকুও দিতাম! আমায় বিধাতা দুধ দেন নি, তাই তোকে আমার খোকার দুধমা রেখেছি!

নৃত্যকালীর স্বামী একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিল—খোকাকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে? আমাদের দিকেও একটু দেখো?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তোমায় দেখবার জন্যে ত তরিকে এনে দিয়েছি।

স্বামী লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিল।

তরঙ্গিণী একদিন হাসিয়া বলিল—দিদি, খোকা হয়ে অবধি তুমি আর আমার খোঁজও কর না, যে, তরি মরল কি বাঁচল!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলি চুম্বন করিয়া বলিল—ষাট ষাট, অমন কথা মুখে আনতে আছে! তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের সুখ! তুই আমাকে সোনারচাঁদ খোকা দিয়েছিস, আমাদের এই আঁটকুড়ো নিরানন্দ সংসারে হাসি এনেছিস! তুই যে আমার ছোট বোন তরি! তোর ঘরসংসার তুই এখন চিনে শুনে নে—চিরকাল কি দিদির হাততোলা নিয়ে থাকবি? আমায় ছুটি দে, আমি আর সংসারের কেউ নই, আমি আর খোকা এখন দুজনে মিলে খেলা করবার ছুটি নিয়েছি, কাজ করবার অবসর এখন আর আমার নেই। আমি দেখতে শুনতে পারিনে, তুই এখন সব দেখ শোন। নিজের শরীরের যত্ন করিস, আর যে বুড়োটাকে তোর হাতে দিয়েছি, সেটাকেও একটু যত্ন করিস।

তরঙ্গিণী লজ্জিত হইয়া বলিল—না দিদি, সে আমি পারব না। তোমার কাজ আমি করতে যাব কেন? তুমি আমায় না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, আমার কিছু ভালো লাগে না!

তরঙ্গিণীকে আবার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তুই এখন বড়সড় হয়েছিস, এখনও দিদির হাততোলা হয়ে থাকলে লোকে বলবে কি? বলবে, তোর ঘরসংসার আমি তোকে ঠকিয়ে দখল করে বসে আছি।

তরঙ্গিণী দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া নৃত্যকালীর দিকে

তাকাইয়া বলিল—দিদি, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি! ফের ওরকম কথা বল্লে আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করব কিন্তু বলে রাখছি।

বলিতে বলিতেই তরঙ্গিণীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অভিমান গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৃত্যকালী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গালে কপালে চুম্বন করিয়া সজল চোখে হাসিয়া বলিল—ছি পাগলী, এই তুচ্ছ কথায় কাঁদলি!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-ব্যথিত স্বরে বলিল—কেন তুমি আমাকে অমন কথা বললে? বল আর কখনো বলবে না!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—চুপ কর্ লক্ষ্মীটি, চুপ কর্। আমি আর কখনো বলব না। কিন্তু কখনো যদি তোর সংসারের ভার হাতে নেবার ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে আমায় বলতে লজ্জা করিস নে। তুই বলবা মাত্তর তোর ঘরকন্না তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে একপাশ হব। কেবল খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিসনে।

তরঙ্গিণী অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া নৃত্যকালীর দিকে বেদনাভরা কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দিদি, আবার ঐ কথা! আমি যে তোমার ভালোবাসায় কেনা দাসী! আমাকে ও সব কী বলছ?

নৃত্যকালী তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—তুই আমার বোন, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই আমার খোকার দুধমা! তোকে আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি। তবু কথাটা বলে রাখলাম!

এমনিতর সুখের মিলনে হাসি আনন্দে তাহাদের তিনটি প্রাণীর সংসার একটি শিশুকে ঘিরিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। খোকা দিনে দিনে তাহার নব নব আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়া সংসারটিকে আনন্দে হাসিতে সুখে ভরিয়া তুলিতে লাগিল।

খোকার যখন বছর দেড়েক বয়স; যখন সে চারটি ধবধবে সাদা দুধের দাঁত বাহির করিয়া নৃত্যকালীকে বলে—জি, এবং তরঙ্গিণীকে তা-তি বলিয়া ডাকে; যখন সে দুধ খাইতে ও কাজল পরিতে বিষম আপত্তি জানাইতে শিখিয়াছে; এবং যখন সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের শিশি-বোতল ভাঙিয়া মধু ও তেল একত্র মিশাইয়া পেটে মাথায় মাখিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছে; তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্যকালী দালানে বসিয়া খোকার সহিত চাঁদামামার পরিচয় করিয়া দিতেছিল এবং চাঁদামামাকে খোকার কপালে একটি টি দিয়া যাইবার জন্য ধান ভানিলে কুঁড়ো, মাছ কুটিলে মুড়ো, ও উড়কি ধানের মুড়কির মোয়া দিবার লোভ দেখাইতেছিল; খোকা তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুখানি বিস্তারিত করিয়া কচি কলার ছড়ার মতো আঙুলগুলি ঘন সঞ্চালিত করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিতেছিল—আ আ চি!—এবং একএকবার মাতা নৃত্যকালীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—জি! চি!—আরবার তরঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—তা-তি! চি!

এমন সময় উঠান হইতে কে একজন রমণী বলিয়া উঠিল—গেরস্তরা বাড়ী আছ গো?

নৃত্যকালী বলিল—কে গা?

আগন্তুক রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—আমরা কুটুম গো!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ ত কে?

তরঙ্গিণী উঠিয়া দালানের ধারে গিয়াই বলিয়া উঠিল—ওমা, বামা যে! তুই কোত্থেকে এলি?

বামা হাসিয়া গলায় আঁচলের খুঁটটা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এইচি।

তরঙ্গিণী বলিল—মাসিমার সঙ্গে! কৈ মাসিমা কোথায়?

বামা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—মা ঠাকরুণ, কৈ গো, এস না গো।

আর একটি রমণীমূর্ত্তি অন্ধকার আবছায়া হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি দালান হইতে উঠানে নামিয়া গিয়া দ্বিতীয় রমণীর পদধূলি লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—দিদি, আমার মাসিমা এসেছেন

নৃত্যকালী খোকাকে কোলে করিয়া দালানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তরঙ্গিণীর আহ্বানে উঠানে নামিয়া গিয়া তরঙ্গিণীর মাসিমার পদধূলি লইয়া বলিল—এস মা এস!

মাসিমা নৃত্যকালীকে লক্ষ্য না করিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, এই বুঝি তোর খোকা?

এই প্রশ্নে তরঙ্গিণীর কেমন লজ্জা বোধ হইল। খোকা কেবল তাহার, এ কথা সে নৃত্যকালীর সম্মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? খোকা যে তাহার অপেক্ষা তাঁহার দিদিরই বেশি, ইহাও বা সে কেমন করিয়া একজন আগন্তুক বাহিরের লোককে বুঝাইবে? তাহারা দুই সতীন স্নেহ ও সখিত্বের যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া নিরুপদ্রবে খোকাকে লইয়া আনন্দে আছে তাহার মধ্যে একজন অপর লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তরঙ্গিণীর মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইল। তরঙ্গিণীর মনে হইল তাহারা বেশ ছিল, তাহাদের এই সুখনীড়ের মধ্যে তাহার মাসিমা কেন আসিয়া পড়িল, তাহার মাসিমা কি তাহাদের ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে? তরঙ্গিণী আর মাসিমার দিকে চাহিতে পারিল না। সে কোনো কথা না বলিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া রহিল।

মাসিমা এই সলজ্জ নীরবতা তরঙ্গিণীর নব মাতৃত্বের লক্ষণ মনে করিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে বলিল—এস দাদা বাবু, এস!

খোকা দুইহাতে নৃত্যকালীর বুকের ও পিঠের কাপড় মুঠি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যকালীর বুকের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া লাগিয়া গিয়া বলিল—জি, ভ!

নৃত্যকালী খোকাকে একটু ঠেলিয়া মাসিমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, যাও! উনি দিদিমা!

খোকা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—ভ!

বামা একমুখ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—আমার ঠেঞে এসবে খোকাবাবু?

খোকা তেমনি ভাবে নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভ! ভ!

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—অচেনা লোকের কাছে যায় না বুঝি? এই নেও দাদামণি দেখ!

মাসিমা দুটি টাকা বাহির করিয়া খোকার সম্মুখে ধরিল। খোকা টাকা লইতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল—ভ! ভ!

তখন নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, তুই নে ত। তোর কাছে গিয়ে যদি মাসিমার কাছে যায়।

তরঙ্গিণী হাত পাতিল।

খোকা নৃত্যকালীকে জড়াইয়া থাকিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিল—তা-তি, ভ!

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, তোর ছেলে ত বাছা আমার কাছে আসবে না। এই নে তোর বেটাকে সন্দেশ কিনে খাওয়াস। মিষ্টিমুখ হ'লে যদি আমায় মিষ্টি চোখে দেখে!

তরঙ্গিণী একবার নৃত্যকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

নৃত্যকালী বলিল—আবার টাকা কেন মাসিমা! পায়ের ধুলো দিয়ে অমনি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের এই কত দুঃখের গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক! খোকা আমার কোল বাছে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ বাপু, ও মুখই দেখতে পাচ্ছে না। এস দালানে এস। তরি, একখানা কিছু পেতে দে বসতে।

মাসিমা নৃত্যকালীর কোনো কথায় সাড়া না দিয়া তরঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—জামাই কোথায়, ওদিকে জামাই নেই ত?

মাসিমা যে নৃত্যকালীর সহিত কথা কহিতেছে না ইহা তরঙ্গিণীর মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। কাজেই সেও মাসিমার কোনো কথায় জবাব দিতে পারিতেছিল না।

নৃত্যকালী বলিল—না, উনি বাড়ীতে নেই। এস মাসিমা। তরি, মাসিমার পা ধোবার জল দে, ওর গরদখানা দে। মাসিমা কাপড় ছেড়ে জপ করে নিন, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে জলখাবার করে আনি।

তরঙ্গিণী মাসিমার কাছ হইতে সরিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু যখন নৃত্যকালী জলখাবার আনিতে গেল তখন তরঙ্গিণীকে একাকী তাহার মাসিমার কাছে থাকিতে হইল। ইহাতে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মাসিমা বলিল—তরু, ঐ নাকি তোর সতীন?

সতীন শব্দটা তরঙ্গিণীর কানে বাজিল। সে মৃদুস্বরে বলিল—উনিই দিদি।

—তোকে খুব কষ্ট দ্যায় দেখছি।

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—না মাসিমা, দিদি আমায় খুব ভালো বাসেন।

মাসিমা বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল—আ নেকি, তুই তেমনি নেকিই আছিস এখনো! একটা মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যাস! মিছরীর ছুরী মুখে মিষ্টি লাগে বলে' মনে করিস যে বুকে যখন বেঁধে তখনও তেমনি মিষ্টি লাগে? ঐ বুঝি তোর ভালোবাসা। এসে বাড়ীতে পা দিতেই ত বুঝতে পারছি, তুই বাড়ীর দাসী, আর বাড়ীর গিন্নি ঐ ডাইনি মাগী! তরি যা পা ধোবার জল দে, তরি যা কাপড় দে তরি যা বসতে দে! আর, আমি যাই জলখাবার দি! তুই দাসীর খাটনা খেটে মরবি, কিন্তু সংসারটি ওর মুঠোর ভেতর! তোর সংসারে তুই পরের হাততোলায় কেমন করে আছিস! আমরা হ'লে ত একদণ্ড থাকতে পারতাম না!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—এর আর হাততোলা থাকা কি? দিদি যদি অযত্ন করতেন ত কষ্ট হ'ত। দিদি নিজে না খেয়ে আমায় খাওয়ান, নিজে না পরে' আমায় পরান, দিদি আমার ছেলেকে মায়ের বাড়া যত্ন করেন!

মাসিমা হাসিয়া বলিল—ওরে তাইত কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তারে বলে ডা'ন! ঐ ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে নিয্যস! ছেলেকে অত ন্যাওটো করচে কেন তাও বুঝি বুঝতে পারিসনে হাবা মেয়ে! ছেলে ওর ন্যাওটো হ'লে তোকে নাথি ঝ্যাঁটা কোস্তা বাড়ন মারলেও তুই ওর কিছু করতে পারবিনে; ছেলের জন্যে তোকে সব সয়ে থাকতে হবে। দুটো মিষ্টি কথা আর লোক-দেখানো আত্তি, এই দেখেই তুই ভুলেছিস! সতীন সম্পর্ক কি কখনো ভালো হয়রে নেকি! শক্ত হ, শক্ত হ, এখনো সময় আছে, ছেলেটাকে ডাইনীর মায়া থেকে বাঁচা! কথায় না বলে, বাঁঝার আত্তি বাঘিনীর পথ্যি! তাতে এ আবার বাঁঝা সতীন!

তরঙ্গিণী লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার মাসিমাকে কেমন করিয়া বলিবে যে, যেদিন হইতে সে এবাড়ীতে আসিয়াছে সেই দিন হইতে স্বামী সম্পূর্ণ তাহার, দিদি তাহার সতীন নয়। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—দেখি জলখাবার হ'ল কি না।

মাসিমা খুসি হইয়া বলিল—হ্যাঁ, নিজের ঘরকন্না নিজে দেখ শোন, এই ত চাই!

তরঙ্গিণী মনে করিল সতীন সম্পর্কটা বড় খারাপ, সহজেই লোকে ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া বসে। মাসিমা দুদিন থাকিলেই বুঝিতে পারিবে দিদি তাহার কেমন মানুষ!

দুদিন ছাড়িয়া চারিদিন গেল, মাসিমার ধারণার কোনো পরিবর্ত্তন সে বুঝিতে পারিল না। মাসিমা ও তাঁহার সহচরী বামা নিরন্তর তাহার কানে বিষ উদ্গিরণই করিতেছে।

তরঙ্গিণী অতিষ্ঠ হইয়া একদিন নৃত্যকালীকে বলিল—দিদি, ওরা কবে যাবে? যোগ ফোগ ত চুকে বুকে গেল; আর কতদিন গঙ্গা নাইতে হ'বে?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—কেন তরি, মাসিমা দুদিন আছেন তাতে তুই ব্যাজার হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর হাসির সঙ্গে হাসিতে পারিল না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—না দিদি, আমরা দুটিতে নিরিবিলি বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এক যোগ নয়ত গোলযোগ এসে জুটল! দিদি, পাজি পাঁজিগুলো এত গোলযোগও বাধাতে জানে!

নৃত্যকালী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। মাসিমা শুনতে পেলে কি ভাববেন? তোর বাড়ীতে ত আর ওঁরা চিরকাল থাকতে আসেন নি। তুই অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী কেমন করিয়া বলিবে সে কেন ব্যস্ত হইতেছে। তাহার যে দুঃখ তাহা সহিবারও নয় বলিবারও নয়। তরঙ্গিণী বলিল—ব্যস্ত হব না? খোকা হয়ে অবধি ত তুমি আমায় আগের মতন যত্ন কর না; তার ওপর মাসিমা এসে ত তোমায় একদণ্ড কাছে পাওয়াই ভার হয়েছে। তুমি আর কারু বেশি যত্ন করলে আমার বড় রাগ হয়!

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিল—হিংসুটে, ভয় নেই রে ভয় নেই, তোর দিদিকে তুই না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইহার পর তরঙ্গিণী নৃত্যকালীকে আর কিছু বলিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া মাসিমার কাছে বসিয়া বলিল—মাসিমা, তুমি কবে বাড়ী যাবে?

—বাড়ী ত শিগগির যাওয়া দরকার। বাড়ীতে সব অবিলি করে' ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছি ইঁদুরে বাঁদরে কি করছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোর ঘরকন্নারও ত একটা বিলিবন্দেজ না দেখে আমি নড়তে পারছিনে।

—আমার ঘরকন্নার বিলিবন্দেজ আমি করে নেব; তার জন্যে তোমার ঘরকন্না অবিলি করে থাকতে হবে না মাসিমা।

—কেন, আমাকে তুই তাড়াতে পারলে যে বাঁচিস দেখছি!

তরঙ্গিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না তা কেন। তবে জামাইবাড়ী এতদিন এসে আছ, আমার ভারি লজ্জা করছে।

—জামাই কি কিছু বলেছে?

—না।

—তবে ঐ ডাইনী মাগী কিছু বলেছে বুঝি! যাই দেখি একবার মাগীর ধুদ্ধুড়ী ধুয়ে দিয়ে আসি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি কি তার বাপের বাড়ীতে এসেছি?—এ আমার আপনার বোনঝির বাড়ী! খুব করব আসব! একবার কেন একশ বার আসব! কোথায় সেই শতেকখোয়ারী হারামজাদী মাগী!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ মাসিমা, কি কর? দিদি কিছু বলে নি।

বামা হাসিয়া পরম বিজ্ঞ ভাবে বলিল—মুখে না বলুক, মনে মনে বলেছে। গুণ করে' নিজের মনের কথাটা আর মনে চালান করে দিইচে।

মাসিমা বলিল—বামা, আজকে ত শনিবার আছে। আজ সন্ধেবেলা তোর সেই জলপড়াটা তরুকে দিস ত। গুণ টুন গুণো কেটে যাবে।

বামা বলিল—তাই খেয়ো দিদিমাণ, তাই খেয়ো। বড় জবর জলপড়া। এ আমাদের গাঁয়ের বিন্দে হাড়ি তুষ্টু গয়লাকে শিখিয়েছিল; তার ঠেঞে মোর শিক্ষে। এর ফল পেরতক্ষ হাতে হাতে দেখে নিয়ো। যেমন জলটুকু খাবে অমান বুক এস্তক হিম হয়ে যাবে, প্রাণডা যেন জুড়োবে। আর যে লোক গুণ ওষুধ করেছে তাকে একেবারে বিষ নজরে দেখবে।

দিনের পর দিন অহরহ ও অনুক্ষণ এইরূপ মন্ত্র জপ শুনিতে শুনিতে ক্রমশ তরঙ্গিণীর মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই ত সতীন তাহাকে কেন ভালোবাসিবে, সতীনকে কি কখনো ভালো বাসা যায়? যে স্বামীর ভাগ কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে ভালো বাসা কি সোজা কথা? আর একজন মেয়ে যদি নোলক পরিয়া আসিয়া মল বাজাইয়া এখন তাহার স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসে তবে কি তরঙ্গিণী তাহাকে একদণ্ডও বরদাস্ত করিতে পারে? সে তাহাকে নখে টিপিয়া মারিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়! নিজের ছেলে হয় নাই বলিয়া নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ঘরে আনিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ছেলেটি দখল করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে। ছেলে হওয়ার পর হইতে নৃত্যকালী ত বাস্তবিকই তাহাকে আর তেমন যত্ন করে না, তাহার খাওয়া পরা সম্বন্ধে আগের মতো খোঁজ খবর লয় না। সমস্ত সংসার তাহার মুঠার ভিতর, সে হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তরঙ্গিণীর। পাছে তরঙ্গিণী নিজের সংসার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লয় তাই তাহাকে নৃত্যকালী সংসারের একখানা কুটা ভাঙিয়া দুখানা করিতে দেয় না। তরঙ্গিণীকে একটিও কাজ করিতে না দিয়া নৃত্যকালী যে একাই খাটিয়া মরে, ইহা

ত তাহার মমতা নহে, পূরাদস্তুর স্বার্থপরতা! তরঙ্গিণীকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিবার ফন্দি! সমস্তর না হোক, সে অর্দ্ধেকের ভাগী ত? অর্দ্ধেকেরই বা কেন? নৃত্যকালীকে অশ্রদ্ধা করিয়া ত্যাগ করিয়াই না তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? তাহার স্বামীর যে পুত্রধনের অভাব নৃত্যকালী হইতে মিটে নাই তাহা সেই না মিটাইয়াছে? সমস্ত তাহার—স্বামী তাহার, খোকা তাহার, ঘরকন্না তাহার! অথচ তাহার যেন কিছুই নয়—স্বামী যেন নৃত্যকালীর দয়ার দান, খোকা বাজেয়াপ্ত, ঘরকন্না বেদখল! ইহার প্রতিকার তাহাকে করিতেই হইবে।

এত কথা তরঙ্গিণী নিজে গুছাইয়া মনে ভাবিতে পারে নাই। তাহার মাসিমা ও মাসিমার সহচরী বামা বিনাইয়া বিনাইয়া গুছাইয়া গুছাইয়া তাহার মনের সম্মুখে এই-সমস্ত কথা দিনের পর দিন সাজাইয়া ধরিতেছিল।

তরঙ্গিণী মুখ ভার করিয়া থাকে। নৃত্যকালী যদি জিজ্ঞাসা করে—তরি, তোর হ'ল কি? অমন করে' থাকিস কেন?

তরঙ্গিণী বলে—না, কিছু ত হয়নি। শরীরটা ভালো নেই।

প্রথম প্রথম নৃত্যকালী মনে করিত যে মাসিমা এতদিন আছে বলিয়া বোধ হয় তরঙ্গিণী কুণ্ঠিত ও বিরক্ত হইতেছে। কিন্তু সে অল্প লক্ষ্য করিয়াই বুঝিল যে তাহার অনুমান যথার্থ নয়; এখন তরঙ্গিণী সদাসর্ব্বদাই তাহার মাসিমার কাছে কাছেই থাকে; তিনজনে মিলিয়া সর্ব্বদাই ফিসফিস গুজগুজ হয়, নৃত্যকালীকে দেখিলেই চুপ করে। নৃত্যকালী বুঝিল যে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু সে তরঙ্গিণীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

তরঙ্গিণীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে নৃত্যকালী এতদিন তাহাকে নিছক ঠকাইয়া আসিয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার নিজের হাতে না লইলে নয়। তখন তাহার মনে পড়িল যে নৃত্যকালী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল যে যেদিন তাহার ইচ্ছা হইবে মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে সংসার হইতে সরিয়া যাইবে।

তরঙ্গিণী আস্তে আস্তে গিয়া নৃত্যকালীর কাছে বসিল। নৃত্যকালী একবার তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তরি, এতদিনে দিদিকে মনে পড়্‌ল? এখন আর দিদির কাছে থাকতে ভাল লাগে না, না?

তরঙ্গিণী বাঁ হাতের বালা ডান হাত দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—দিদি, ভাঁড়ার-ঘরের আর সিন্দুকের চাবিগুলো আমাকে দাও।

নৃত্যকালী তাহার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বলিল—কেন, কি নিবি?

তরঙ্গিণী মাথা নত করিয়া বলিল—কিছু নেব না।

—তবে?

—চাবিগুলো আমার কাছেই রাখব।

—তা হ'লে সংসার থেকে আমায় এতদিনে ছুটি দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—আঃ! বাঁচলাম তরি! তোর ঘরকন্না তোরই ত দেখা উচিত। এই নে চাবি। কিন্তু খোকাকে কেড়ে নিসনে, লক্ষ্মী বোন আমার!

নৃত্যকালীর চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তরঙ্গিণী সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িল। সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল—তরি, চাবি যে পড়ে রইল!

তরঙ্গিণী বলিল—না দিদি, চাবি আমার চাইনে। ও তোমারই থাক।

কোথা হইতে মাসিমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চাবিগুলি হস্তগত করিয়া বলিল—তরু, বড় মেয়ে তোকে চাবি দিচ্ছে, নে। কেমন মেয়ে বাছা, বড় মেয়ে চাবি রাখবে না, তুই রাখবি নে, ত রাখবে কে? থাক তবে আমারই কাছে।

মাসিমা চাবিগুলি লইয়া তরঙ্গিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল। নৃত্যকালী অবাক হইয়া মাসিমার গমন-পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মাসিমা গিয়া তরঙ্গিণীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—হ্যাকা মেয়ে কোথাকার! ডাইনীর চোখের মায়া-কান্না দেখে অমনি গলে' গেলেন! ভাগিস আমি কাছাকাছি ছিলাম!

বামা বলিল—সব ত দিলে, কিন্তু মাগীর প্যাটরাটা ত দেখলেনি। ঐটার মধ্যে ও সব লুকিয়ে রেখে দিইচে।

মাসিমা বলিল—ভালো বলেছিস বামা! দেখ তরু, মাগীর প্যাটরা একবার খুলে দেখে নিগে যা।

তরঙ্গিণী জোরে ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—সে আমাকে দিয়ে হবে না মাসিমা।

—তবে আমি বলিগে।

—না মাসিমা, খবরদার ও রকম করে' দিদিকে অপমান করলে আমি মাথায় কাটারী মেরে রক্তগঙ্গা হব।

মাসিমা অমনি নাকি কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, কি সব্বনেশে কথা বলিস তরু! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! কি জবর ডাইনী ও মাগী! তোকে একেবারে বশ করে' ভেড়া করে রেখেছে! তোর যা-খুসি করগে যা; কালকে আমি বাড়ী চলে যাব। কেন রে বাপু নিজের সব বইয়ে ছইয়ে পরের জন্যে বুকের রক্ত জল করা!

মাসিমা ক্রমশ ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে চক্ষে অঞ্চল আরোপ করিল। বামাও চোখ মুছিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একটিও সান্ত্বনার কথা বলিল না।

পরদিন মাসিমার বাড়ী যাইবার কোনো উদ্যোগই দেখা গেল না। বরং উল্টা মাসিমা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি হাতে পাইয়া সংসারের বিলি বন্দেজ করিতে মনঃসংযোগ করিল। রোজ দুধ লওয়া হয় দুই সের এক সের খোকা খায়, আধ সের খোকার বাবা খায়, বাকি আধসের নৃত্যকালী ও তরঙ্গিণী খাইত। মাসিমা আসার পর নৃত্যকালীর দুধের ভাগ মাসিমার বরাদ্দ হইয়াছিল। সেই বরাদ্দই কায়েমি হইয়া গেল। রাত্রে সকলেই লুচি খাইত; এখন নৃত্যকালীর জন্য ভাতের বরাদ্দ হইল—এয়োস্ত্রী মানুষের দুবেলা ভাত খাওয়াই ত উচিত! মাসিমা বিধবা মানুষ তাঁহার লুচি ত না খাইলেই নয়। বছরে চারখানা কাপড়ের বেশি কেনা বাজে খরচ, ফোতো নবাবী—নৃত্যকালীর বাক্সভরা কাপড় আছে, পূজার সময় তাহার আর নূতন কাপড় কেনার দরকার নাই। নৃত্যকালী দোক্তা খায় বলিয়া তাহার পানের খরচ বেশি—নেশা ভাঙ যাহার করিতে হয় সে নিজের খরচে করুক, সংসার হইতে সে বাজে খরচের জন্য পয়সা কেন পাইবে? বাড়ীতে দুজন দাসী ছিল, একজন সংসারের ঘরকন্নার কাজ করিত, আর একজন দুই বৌএর কাজ করিত—এখন একজন ঘরকন্নার কাজ করিয়াই ছুটি পায় না, অপরজন তরঙ্গিণীর কাজ করিয়া মাসিমার বাতে তেল মালিশ করিয়া ও মাথার পাকা চুল তুলিয়া সময় পায় না।

নৃত্যকালী কিন্তু হাসিমুখেই এ-সমস্ত সহ্য করিতেছিল; সে একদিনে দোক্তা আর পান খাওয়া ছাড়িয়া দিল; নিজের কাপড় সে নিজে কাচে; অশ্রদ্ধার দানও সে হাসিমুখে গ্রহণ করে। কেহ তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে—বাড়ীতে দুটি বৈ ত ঝি নেই, কুটুম্ব মানুষ বাড়ীতে, পাছে তাঁদের কষ্ট হয় তাই ঝিয়েদের ওঁদের কাছে কাছেই থাকতে বলে' দিয়েছি।

এইরূপ বিলি বন্দেজ করিয়া মাসিমা যখন দেখিল যে নৃত্যকালী কোনো আপত্তি তুলিল না, জামাইয়ের কানেও এ কথা উঠিল না, তখন সে সাহস পাইয়া তরঙ্গিণীর কানে মন্ত্রজপ করিতে সুরু করিয়া দিল—দেখ্ তরু তুই কি ভাবছিস জানিনে, আমি তোরই ভালোর জন্যে সংসারের খরচ কমিয়ে আনছি—যে দুপয়সা বাঁচবে সে তোরই, আমার কি বল্না! কিন্তু মাগী কি সয়তান, টুঁ শব্দটি করছে না! ও কি তুকতাক করবার মতলবে আছে। তোর সোয়ামীর কাছে তোর যে আদর সে তোর খোকার জন্যেই না? নইলে ও হ'ল গিয়ে ওর সময়ের বৌ, ওর ওপর সোয়ামীর যতখানি টান হবে ততখানি কিছু আর তোর ওপর হবে না। এখন খোকার কোনো রকম ভালো মন্দ করতে পারলেই ওর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এখন খোকাকে ত ওর ত্রিসীমানায় যেতে

দেওয়া ঠিক হবে না। দেখিসনে খোকাকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে হাঁ করে' কেমন তাকিয়ে থাকে!

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ছঁ্যাত করিয়া উঠিল। বাস্তবিক ত সে দেখিয়াছে নৃত্যকালী খোকাকে সামনে বসাইয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখে। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—অমন করে' তাকিয়ে থাকলে কি হয়?

বামা বলিল—বুকের রক্ত শুষে লেয় গো বুকের রক্ত শুষে লেয়! মন্তর পড়ে' সাত দিন তাকালেই হাতি মালট খায়, ও ত একরত্তি বাচ্চা! আমাদের গাঁয়ের ইচ্ছে বুড়ী অমনি করে' আমার ভাসুর-পোর পেরাণডা শুষে খেয়েছিল—না গা মা ঠাকরুণ, তুমি ত সব জান!

মাসিমা মুখ অত্যন্ত ম্লান করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ মা জানি বলেই ত ভাবনা! কিন্তু তরু ত কথা শুনবে না। জামাইকে বলে' ওকে এক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেওয়া উচিত!

মাসিমার অবিশ্রাম মন্ত্র জপে তরঙ্গিণীর মন নৃত্য-কালীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেও সে একবার বাঁকিতে-ছিল, একএকবার দিদির প্রাণ-ঢালা স্নেহ স্মরণ করিয়া সমস্ত বিরূপ ভাব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু যখন তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে তাহার সৌভাগ্যের নিদান বুক-চেরা ধন খোকাকে প্রাণে মারিবার জন্য নৃত্যকালী চেষ্টায় আছে, তখন তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীকে একেবারে বিষের মত বোধ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তরঙ্গিণী স্বামীকে গিয়া বলিল—ওগো শুনেছ, বড় গিন্নি আমার খোকাকে রোজ তুক করে......

নৃত্যকালী কিছু না বলিলেও তাহার স্বামী অনুমানে বুঝিতে পারিতেছিল যে মাসিমার ব্যবহার নৃত্যকালীর প্রতি বিশেষ হৃদ্য ত নহেই, বরং নৃত্যকালী যেন কিছু উৎপীড়িত হইতেছে। মাসিমা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের সুখের সংসারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে তরঙ্গিণীর স্বামী তরঙ্গিণীর উপরও একটু বিরক্ত হইয়াই ছিল, মনে করিতেছিল সেই বোধ হয় মাসিমাকে ধরিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাই এখন তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালীর নামে লাগাইতে শুনিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—যাও যাও যাও, ওসব ছোটলোকের মতন কথা শুনতে চাইনে। ও বুকের রক্ত জল করে' তোমার ছেলে মানুষ করছে কিনা, তার এই পুরস্কার! কে তোমাকে এসব শেখাচ্ছে? আগে ত তুমি এমন খোলো ছিলে না। ফের ও রকম কথা মুখে আনলে ঝাড়ে মূলে সবাইকে একদিনে একসঙ্গে দূর করে' দেবো!

সূত্রপাতেই স্বামীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া গিয়া মাসিমার কাছে পড়িল। মাসিমা সব শুনিয়া বলিল—এ-সমস্তই ঐ ডাইনী মাগীর খেলা; ও মন্তর পড়ে' তোর ওপরে জামাইয়ের মন চটিয়ে দিচ্ছে। হয় নয় তুই ভেবে দেখ—জামাই কি কখনো তোকে এমন করে' একদিনও বকেছে?

তরঙ্গিণী দেখিল, সত্যই ত, স্বামী শুধু সোহাগই করিয়াছে, তিরস্কার আজ এই প্রথম এবং অতি অকস্মাৎ! তখন তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাইত মাসিমা, তবে কি হবে?

মাসিমা গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি ত বাছা কবে থেকে পয় পয় করে বলছি যে বিষদাঁত চেপে বসবার আগে সাবধান হ। এখন ও কামড়ে ধরেছে—তোর কপাল ভাঙতে আর দেরি নেই। সোয়ামীর মন কেড়ে নিলে, ছেলে কেড়ে নিলে, তোর আর থাকল কি! আহা ছেলে নয়ত যেন রাজপুত্তুর! রোগে ভোগে মরে, সহ্য হয়, এ আলটপকা গিলে খাবে গা!

সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া মাসিমার পায়ে পড়িয়া বলিল—মাসিমা, আমার খোকাকে তুমি বাঁচাও!

মাসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাঁচাই আর কেমন করে' মা—মাগীর চোখের আড়াল না করলে শিবের সাধ্য নেই যে বাঁচায়। একেবারে মকৃথম কামড় কামড়েছে! ছেলে দিনকের দিন একেবারে নীলমূর্ত্তি হয়ে উঠছে দেখছিস নে?

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তবে মাসিমা আমি খোকাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই চল।

মাসিমা হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মা, তাতেই কি নিস্তার আছে! খোকার নাড়ী পোঁতা যে

এখানে ! নাড়ীর টানে ঐ প্রাণপুরুষকে টেনে বার করে' আনবে !

তরঙ্গিণী ভয়ে একেবারে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বলিল—মাসিমা তবে উপায় ?

—উপায় এক-মাত্তর ঐ মাগীকে সরানো।

—কেমন করে' সরাব ? ওঁকে বলতে গেলাম...

বামা বলিয়া উঠিল—না না, অমন করে' নয়। ডাইনীকে কি অমন করে' সরায় ? তুক তরিবৎ করে' সরাতে হয়।

তরঙ্গিণী ধাস্ত হইয়া বলিল—তুই কিছু জানিস বামা ?

বামা ঘাড় কাত করিয়া আতার বীচির মতো মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হিঁ ! তেরোস্পর্শ দিনে তেমাথা পথের ওপর ঘেঁটকল আর নির্ব্বিষী দিয়ে ঘেঁটুঠাকরুণের পূজো করতে হবে ; উপোষ করে ভরসন্ধ্যেবেলা ঠিক যেই একটি তারা উঠেছে অমনি একটা আফলা শিমূল গাছের কাছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাতটা পাতা তুলতে হবে, আর মন্তর বলতে হবে—

শিমূল, শিমূল, শিমূল !
শত শত্তুর নির্ম্মূল !
আঠায় কাঁটায় ভরা গা,
শত শত্তুরের মাথা খা !
আঠায় আঁটো
কাঁটায় বেঁধো,
যে আমার সঙ্গে শত্তুরতাই সাধে
তার সঙ্গে শত্তুরতাই সেধো !

তারপর সেই সাতটি পত্তর মাথায় করে নিয়ে গিয়ে উলুঙ্গ হয়ে জলে যমের দুয়োর দক্ষিণমুখো হয়ে একটা ডুব দিতে হবে। পাতা সাতটি ভেসে উঠলেই বুঝবে যে নির্ব্বিষী হয়েছে ; আর, একটি পাতাও যদি মাথায় লেগে থাকে তবে বুঝবে যে কামড় তখনো ছাড়ে নি !

মাসিমা তাড়াতাড়ি বলিল—তোর সেই পাগলাকালীর গুঁড়োটা তরুকে দিস না ? যতবড়ই ডাইনী হোক, মা-কালীর কাছে ত আর বড়াই খাটবে না ?

বামা বলিল—হ্যা দ্যাখ ! ডাকিনী যোগিনী হল গে মা-কালীর দাসী, মা-কালীর কাছে তাদের আবার বড়াই কি ? বজ্জি মনে করেছ মাঠাকরুণ ! সেই গুঁড়োর একরত্তি দিলেই যত বড় ডাইনি হোক চোখ উল্টে পড়তেই হবে। সে গুঁড়ো কি আমি কম কষ্টে জোগাড় করেছিনু ? গয়েসপুরের কালীর মোহন্তকে এক বোতল মদ দিয়ে ছিদাম মোড়ল এনেছিল—বল্লে না পেত্যয় যাবে, অমাবস্যের রাত্রে চাঁড়ালের মাথার খুলিতে চিতার আগুনে মদ দিয়ে ঐ ওষুধ তৈরি ! ওর কি কম মাহিত্তির !

এই বলিয়া বামা করজোড়ে উদ্দেশে কি জানি কাহাকে প্রণাম করিল। দেখা-দেখি মাসিমাও প্রণাম করিল। ভয়ে ভয়ে তরঙ্গিণীও করিল।

তরঙ্গিণী বলিল—সে কি গুঁড়ো ? বিষ টিষ নয় ত ?

বামা বলিল—আরে রাম রাম ! বিষ নয়, বিষ নয়। মা-কালীর পেরসাদ, চরণধূলি !

স্থির হইয়া গেল বামার উপদেশ অনুসারে তরঙ্গিণী নৃত্যকালী ডাইনাকে ঝাড়াইয়া ভিটেছাড়া করিবে।

একাদশীর দিন সমস্ত তুকতাক করিয়া তরঙ্গিণী এক বাটি দুধের সঙ্গে একটা শাদা গুঁড়ো মিশাইয়া রাখিল, রাত্রে নৃত্যকালীকে খাইতে দিবে, সকালে সে চক্ষু উল্টাইয়া পড়িয়া থাকিবে। তরঙ্গিণী বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ বামা, ও বিষ টিষ নয় ত ?

বামা বলিল বিষ কেনে হবেক গো ? আমরা কি মানুষ খুন করি ?

তরঙ্গিণী ভয়ে বিবর্ণ মুখে বলিল—দেখিস বামা, হিত করতে যেন বিপরীত না হয়।

বামা জোর দিয়া বলিল—না গো না, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।

সন্ধ্যার পর নৃত্যকালী রান্নাঘরে খোকার দুধ আনিতে গেল। তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেখিয়াই তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, কি নেবে?

—খোকার দুধ।

—খোকার দুধ ঐ ক্ষিতুরে বাটিতে আছে। ঐ সর-ফুলে বাটির দুধ নিয়ো না যেন, ও দুধ তোমার জন্যে আছে।

নৃত্যকালী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিল—আমার জন্যে ! আমি কি দুধ খাই ?

তরঙ্গিণী থতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—মাসিমার আজ একাদশী কিনা, তাই একটু রেখেছি!

নৃত্যকালী আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া দু-বাটির দুধ এক করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল।

তরঙ্গিণী দেখিল যে নৃত্যকালী জগন্নাথী বাটিতেই দুধ লইয়া গেল। কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই শাদাগুঁড়ো মা-কালীর চরণরেণু বলিয়া এতক্ষণ মনকে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, ভুলক্রমে খোকার তাহা খাওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া তরঙ্গিণী ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই শাদা গুঁড়া যে বিষ, ইহা এখন সে নিজের মনের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল সাদা গুঁড়া মিশাইয়াছিল সরফুলে বাটিতেই ত ঠিক? শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে ত নয়? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত গোলমাল ঠেকিতে লাগিল—একবার মনে হয় শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে গুঁড়া মিশাইয়াছে, একবার মনে হয় সরফুলে বাটিতে। সে ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে যে বাটি আছে তাহাতে আঙুল দিয়া দেখিতে গেল তলায় গুঁড়া থিতাইয়া আছে কি না। বাটিতে আঙুল দিতেই দেখিল বাটিতে দুধ নাই, বাটির তলায় গুঁড়া কিচকিচ করিতেছে! তরঙ্গিণী একেবারে পাগলের মতো হইয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি দিদি, ও দুধ খোকাকে খাইয়ো না, খোকাকে ও দুধ খাইয়ো না!

তরঙ্গিণী দালানে উঠিয়া দেখিল নৃত্যকালী খোকাকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেছে। তরঙ্গিণী বাঘিনীর মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একহাতে নৃত্যকালীর হাত চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে বাটি তুলিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত দুধটা নিজে খাইয়া ফেলিয়া বাটিটা দূরে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

নৃত্যকালী হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে বলিল—আ মর পোড়ারমুখী, তুই দিনকের দিন পাগল হচ্ছিস নাকি, ছেলের দুধটা খেয়ে ফেল্লি, আমি এখন খোকাকে কি খাওয়াই বল্ ত?

এতক্ষণে তরঙ্গিণী নিশ্বাস লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নৃত্যকালীর পা ধরিয়া বলিল—দিদিগো, সয়তানীদের কথা শুনে দুধে আমি বিষ দিয়েছিলাম তোমায় খাওয়াব বলে। তার ফল আমি হাতে হাতে পেলাম। দিদি, তোমার খোকাকে তুমি বাঁচাও।

নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি খোকার গলায় আঙুল দিতেই খোকা যে দু ঝিনুক দুধ খাইয়াছিল তুলিয়া ফেলিল। সুস্থ সবল খোকা অল্পক্ষণ একটু অবসন্ন হইয়া থাকিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাক্তারের চেষ্টাতেও তরঙ্গিণী বাঁচিল না। তরঙ্গিণী অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পড়িতেও ক্ষীণকণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, খোকা বাঁচবে?

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর ভূমিলুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাঁচবে তরি বাঁচবে। তুইও বেঁচে উঠে তোর খোকাকে তুই নে, আমি আর তোর খোকার ভাগ নেব না।

তরঙ্গিণী আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! দিদি, তোমার খোকা, তোমারই রইল! আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো! পায়ের ধুলো দেও দিদি! একবার ওঁকে ডাক, পায়ের ধুলো নেব!

এমন সময় মাসিমা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল—ওরে তরু রে, এ কি সর্ব্বনাশ হল রে!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর দিকে বিষাবিষ্ট ম্লান দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—আঃ দিদি! ওদের এখান থেকে দূর করে' দাও!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীটজীবনী

কতকগুলি পোকা আমাদের ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি করে; বহু আয়াসে জমি প্রস্তুতের পর উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া, বিশ্বাসযোগ্য স্থানের বীজ বপন করিয়া অনেক কৃষককে পরে হতাশ হইতে হয়; কোথা হইতে পালে পালে পোকা আসিয়া ফসলকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং কৃষকগণ জমিদারের খাজনা দেওয়া ত দূরের কথা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পোকার উৎপত্তি

প্রজাপতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।
১—পাতার উপর ডিম। ২—একটী ডিম বর্দ্ধিতাকার।। ৩—কীড়া পাতা খাইতেছে। ৪—কীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থা। ৫—কীড়ার পুত্তলি হইবার পূর্ব্বাবস্থা। ৬—পুত্তলি। ৭—পুত্তলি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গিয়াছে।
৮ ও ৯—প্রজাপতি।

সম্বন্ধে আমাদের কৃষকদিগের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার আছে এবং ইহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়া এইরূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে কীট নিবারণের পরীক্ষিত উপায়গুলি তাহারা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করে না। এইরূপ কুসংস্কার থাকাতে কৃষকেরা ফসলের পোকা নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে যে সকল অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে তাহা একেবারে অনর্থক, এবং উহা কখনও ফলপ্রদ হইতে পারে না। কৃষকের ধারণা যে কোন প্রকার উচ্চ জমিতে চাষ করিবার সময় যদি উহাতে একটী ভাঁটুগাছের ডাল রবিবার সকালে পুঁতিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ জমির ফসলে কখনও উই লাগিবে না। এইরূপ কুসংস্কারের সংখ্যা এত প্রচুর যে উহা এখানে তালিকাবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের আকার বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার অনেকের ধারণা এই যে ঝড়ের সঙ্গে পোকা আসে কিম্বা মাটী অথবা আকাশ হইতে পোকার উৎপত্তি হয়। কীটজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনভিজ্ঞতাই এইরূপ কুসংস্কারের প্রধান কারণ। সচরাচর আমরা যে শুঁয়াপোকা দেখিতে পাই তাহার জীবনের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করিতে চান না। কীটজীবনী অতি অদ্ভুত, এবং গৃহপালিত অন্য কোন প্রাণীর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে (Sepidoptera) প্রজাপতি ও (Orthoptera) ফড়িংএর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া কীটজীবনী বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রজাপতির জীবনে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে—ইহা চতুর্জন্ম। ডিম, কীড়া, পুত্তলি ও পতঙ্গ। পাখীর মত স্ত্রী-প্রজাপতিও ডিম পাড়িয়া থাকে—ইহার ডিম ছোট ছোট, ও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, ডিম পাড়িবার ধরণও অন্যরূপ; ছোট ছোট ডিমগুলি পাতা কিম্বা ফুলের উপর একএকটী করিয়া পাড়িয়া যায়। অনেক ডিম এত ছোট যে শুধু-চোখে দেখাই অসম্ভব। পাখীরা ডিমকে কিম্বা ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে উহাদিগকে যেরূপ যত্ন করে প্রজাপতিরা তাহার কিছুই করে না এবং উহাদের জন্য খাদ্যেরও কোনও ব্যবস্থা রাখে না। গাছের ডালে পাতায় ফুলে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। তবে এরূপ স্থানে ডিম পাড়ে যে ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা যেন অনায়াসে খাদ্য পাইতে পারে। কীড়া ডিম হইতে বাহির হইয়াই কচিপাতা কিম্বা গাছের ভিতরের শাঁস খাইতে আরম্ভ করে এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; কীড়ার আকৃতিতে মায়ের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য থাকে না; মায়ের ন্যায় ইহার ডানা কিম্বা শুঁড় (Proboscis) কিছুই

থাকে না, মোটে উড়িতে পারে না। ইহার ৫ হইতে ৮ জোড়া পা থাকে; ৮ জোড়া পায়ের মধ্যে মাথার নিকটস্থ তিনজোড়া পায়ে গিরা আছে। দেহের মধ্যস্থলের ৪ জোড়া ও লেজের কাছে এক জোড়া পা আছে —এই ৫ জোড়া পায়ের সাহায্যেই ইহারা চলিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ কীড়ার দেহই মসৃণ, কোন কোন কীড়ার গায়ে লোম আছে, এবং ইহাদিগকেই আমরা শুঁয়াপোকা বলিয়া থাকি। শুঁয়াপোকা সকলেই দেখিয়াছেন, ইহার আকৃতির বিশদ বিবরণ দিবার আবশ্যক নাই। কিছুদিন খাইয়া কীড়া প্রথম খোলস (moult) ছাড়ে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং আকৃতিরও বিভিন্নতা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত কীড়া সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কিছুকাল অন্তর অন্তর খোলস ছাড়ে; ৫।৬ বার খোলস ছাড়িবার পরই ইহার পূর্ণাবস্থা আসে। প্রত্যেক খোলস-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীড়ার রং ও আকৃতির বিশেষ প্রভেদ হয়। কীড়া অবস্থাতেই ইহা ফসলের ক্ষতি করে। শেষ খোলস ছাড়ার পরই কীড়াটী খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং ২।৩ দিন পরেই পুত্তলি হয়। পুত্তলি অবস্থায় কিছুই খায় না এবং চুপ করিয়া নড়ন-চড়ন-রহিত হইয়া থাকে। এখন পাতার উপর নিজের মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া তাহার সহিত পিছনকার পা জড়াইয়া নীচের দিকে মাথা করিয়া ঝুলিতে থাকে; কোন কোন পোকা মাটীর নীচে গুটি প্রস্তুত করে। কীড়ার এই পরিবর্ত্তিত আকৃতিকে পুত্তলি কহে। এখন ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখ চোখ প্রভৃতি স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল বায়ুপথ (spiracles) দৃষ্ট হয়। পুত্তলি ডিম্বাকার ও নানাবিধ রংএর হইয়া থাকে। অল্পদিন পরে পুত্তলি হইতে একটী প্রজাপতি বাহির হয়; ইহা কিয়ৎক্ষণ মন্দ গতিতে চলিয়া বেড়ায়, পরে বড় বড় ডানা বর্দ্ধিত, বিস্তৃত ও দৃঢ় হইয়া উঠে। প্রজাপতির চারিটী বড় বড় ডানা ও ছয়টী পা আছে। কীড়ার ন্যায় কামড়াইবার মুখ নাই, ইহার পরিবর্ত্তে দীর্ঘ শুঁড় আছে; এই শুঁড়ের সাহায্যেই ইহারা ফুলের মধু চুষিয়া খায় এবং তাহাই প্রজাপতির

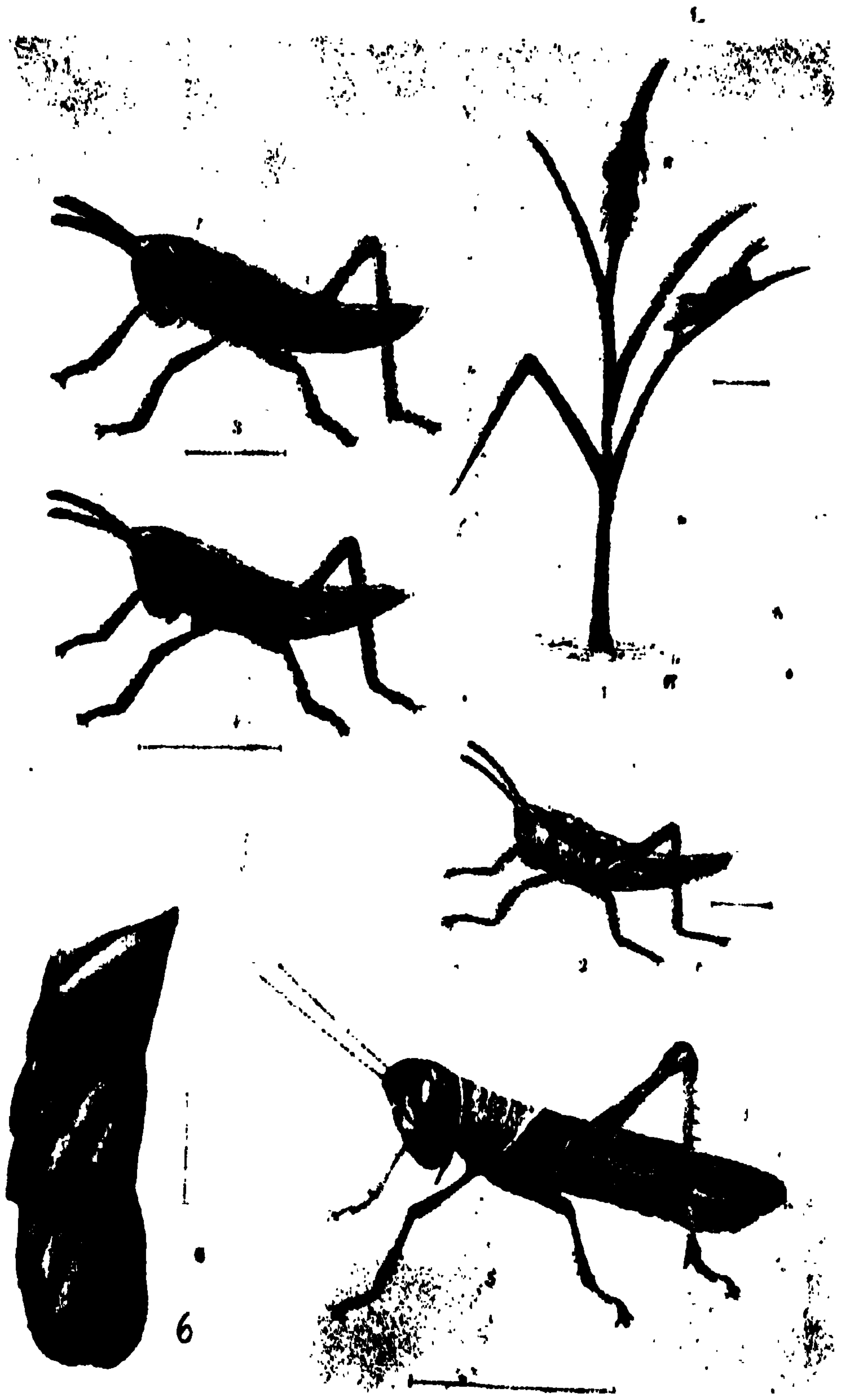

ফড়িংএর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।
১—পাতার উপর সদ্যপ্রসূত ফড়িং। ২—ফড়িংএর প্রথমাবস্থা। ৩, ৪—ফড়িংএর দ্বিতীয় অবস্থা। ৫—পরিণতবয়স্ক ফড়িং। ৬—ডিম্ব-সমষ্টি (আবরণসহ)। [চিত্রগুলি পুষার চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।]

খাদ্য। প্রজাপতির দেহে লোম আছে, ইহার ডানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইসে ঢাকা। ইহাই কীটের পতঙ্গ অবস্থা; এই অবস্থাতেই পোকা পরিণত হইল এবং এখন স্ত্রী-পতঙ্গ ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতেই পুনরায় কীড়া বাহির হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে চতুর্জন্ম পোকার চারি জন্মের অবস্থার আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ডিমের সহিত কীড়ার আকারের কোন মিল নাই, কীড়ার সহিত পুত্তলির ও পুত্তলির সহিত পতঙ্গের আকারের কোনও সাদৃশ্য নাই। প্রজাপতি, মশা, মাছি, ধামসা পোকা, চেলে পোকা, সাপের মাসিপিসি, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে, শসাকুমড়ার হলদে পোকা

ইত্যাদি চতুর্জন্ম। প্রথম চিত্রে প্রজাপতির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে।

সকল প্রকার কীটের জীবনবৃত্তান্ত ঠিক প্রজাপতির মত নহে। অন্যান্য কীটের জীবনে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা ফড়িংএর জীবন আলোচনা করিলে কতকটা বোধগম্য হইবে। স্ত্রী-ফড়িং মাটির উপর কিম্বা নীচে একস্থানে রাশীকৃতভাবে অনেকগুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহার অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে এই ডিম হইতে ছোট ছানা (nymph) বাহির হয়। ইহা আকারে ডিম্বের দ্বিগুণ হইয়া থাকে এবং বেশ কার্য্যতৎপর (active) হয়। ইহার সাধারণ আকৃতি মায়ের মতই হয়, লম্বা লম্বা পা এবং পিছনের পা দুইটী খুব দীর্ঘ হয় এবং পূর্ণাবয়ব ফড়িংএর ন্যায় মস্তক ও তাহাতে দুইটী শুং (Antennae) ও মুখ প্রভৃতি সমুদায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদের মধ্যে ইহার ডানা থাকে না, সুতরাং ইহা কেবল লাফাইতেই পারে, উড়িতে পারে না। এই সময় গায়ের রংও বেশ পরিষ্কার থাকে। বড় ফড়িংএর ন্যায় ইহা গাছের ডাঁটা ও পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। প্রজাপতির কীড়ার ন্যায় ইহাও খোলস ছাড়ে এবং প্রত্যেক খোলস-পরিবর্ত্তনের পর ইহা আকৃতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রংএরও বদল হয়। চতুর্থবার খোলস ছাড়িবার পর দেহের উপরিভাগে, বক্ষের (thorax) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের (segment) উপর দুইটী গোলাকার অংশ (lobes) দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পর প্রত্যেক খোলস-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই গোলাকার অংশ দুইটী কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে ষষ্ঠ বা সপ্তমবার খোলস ছাড়িবার পর পূর্ণায়তন ডানার আকার ধারণ করে—ইহার জননেন্দ্রিয়ও এই সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই ফড়িংএর পরিণত অবস্থা (adult stage), এখন ইহা আর খোলস ছাড়ে না। অল্প কিছুদিন পরেই স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে, আবার ডিম হইতে ছোট ফড়িং বাহির হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ফড়িংএর জীবন প্রজাপতির জীবন হইতে বিভিন্ন এবং ইহা ত্রিজন্ম। ত্রিজন্ম পোকার পুত্তলি-অবস্থা নাই। ডিম হইতে বাহির হইলেই ছানা মায়ের মত দেখিতে হয়, ইহার মা যেরূপভাবে আহার করে ইহাও ঠিক সেই প্রকারে খায়, বস্তুতঃ ইহার জীবন মায়ের জীবনেরই অনুরূপ; ইহা সকল সময়েই খাইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ ফড়িং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রজাপতির জীবনে হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। গঙ্গা ফড়িং, আরসুলা, উচ্চিংড়ে, গান্ধি, ভোমাপোকা ইত্যাদি ত্রিজন্ম। দ্বিতীয় চিত্রে ফড়িংএর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখান হইয়াছে।

পোকা সমস্ত বৎসর ধরিয়া তাহার বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না। প্রধানতঃ তিনটী কারণ ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, যথা, শীতের প্রাচুর্য্য, অত্যধিক উত্তাপ, ও খাদ্যের অভাব। দেখা গিয়াছে যে অধিক সংখ্যক পোকার শীতকালে কর্ম্মপটুতা থাকে না এবং তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পোকার এই নিশ্চল অবস্থার নাম নিদ্রাবস্থা (hibernation)। পোকার নিদ্রার কোনও সাধারণ (universal) নিয়ম নাই। কোন কোন পোকার শীতকালেই বংশবৃদ্ধি হয়, এই সময়েই ইহারা খাইয়া বৎসরের অবশিষ্ট কাল নিদ্রায় কাটাইয়া দেয়। পোকা কতকাল নিদ্রা যাইবে তাহা স্থানীয় জলবায়ু, খাদ্য, ও পোকার স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কোন শ্রেণীর পোকা একস্থানে নিদ্রিত থাকে, আবার অপর স্থানে সেই শ্রেণীরই পোকা ফসলের সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। পোকারা ডিম্ব, কীড়া, পুত্তলি ও পতঙ্গ অবস্থাতে নিদ্রা যাইতে পারে। পোকার নিদ্রা সম্বন্ধে সঠিক করিয়া এখন অধিক কিছু বলা যায় না। কীটতত্ত্ববিদেরা ইহার বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতেছেন।

কৃষিকলেজ,
সাবোর, ভাগলপুর } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

আলোচনা

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন।

ডিসেম্বর মাসের "ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় আমি হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন, ভবদেবের প্রশস্তি, শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন, ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং কুলজী গ্রন্থের সাহায্যে "বঙ্গে বর্ম্মা রাজবংশের"

ইতিহাস উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। গত শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর চাহিয়াছেন। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যত বাদ প্রতিবাদ হয়, ততই প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের পথ পরিষ্কৃত হয়।

বঙ্গের বর্ম্মা রাজবংশের যে তিনখানি তাম্রশাসনের সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে নবাবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি নাই। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনখানির অধিকাংশই অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যথাসাধ্য ইহার একটী পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। রাখাল বাবু নাকি এই পাঠ তাম্রশাসনের সহিত মিল করিয়া দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবুর সমস্ত পাঠ তাম্রশাসনে নাই। তাম্রশাসন পাঠে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাখাল বাবুর বিশুদ্ধ পাঠ কোন কাগজে প্রকাশ হইয়াছে কি না আমি জানি না, তজ্জন্যই নগেন্দ্র বাবুর পাঠের উপর নির্ভর করিয়াছি। আশা করি রাখাল বাবু তাঁহার সংশোধিত পাঠ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ইতিহাস আলোচনার সুবিধা করিয়া দিবেন।

শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি পাওয়া যায় নাই। নগেন্দ্র বাবু ২০০ বৎসরের হস্তলিখিত বৈদিক কুলপঞ্জিকায় ইহার অনুলিপি পাইয়াছেন। একে এই তাম্রশাসন কেহ দেখে নাই, তাহাতে আবার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবার অযোগ্য কুলপঞ্জিকায় তাহার অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাই রাখাল বাবু এই তাম্রশাসনের পাঠ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেন বংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের পাঠ দেখিলেই সহজে জানিতে পারা যায় যে, উভয়ই এক ছাঁচে ঢালা। অনুলিপিটী দেখিবামাত্র বোধ হয় যে ইহা বর্ম্মাবংশীয় কোন রাজার খোদিত লিপি হইতে পারে না। লেখক বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন হইতে এই অংশ নকল করিয়া লইয়াছেন। কেবল "সেনকুল-কমল" স্থানে "বর্ম্মকুল-কমল" লিখিয়াছেন। নকল প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেশব সেনের বা বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই অংশ বসুজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে রচয়িতা শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম দেন নাই কি জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে, তখনও শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই এবং রচয়িতা ভরসা করিয়া শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।"

রাখাল বাবুর এই কথাগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়—

(ক) শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"ইহ খলু বিক্রমপুর-নিবাসি কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত সতত বিরাজমানাশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি বর্ম্মকুলকমল-প্রকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-(১) বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্যামল বর্ম্মদেব পাদবিজয়িনঃ।"

(খ) কেশব সেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"ইহ খলু জম্বুগ্রাম-পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন দান-কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন দেব পাদবিজয়িনঃ।"

(গ) বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"ইহ খলু স্কন্ধগ্রাম-পরিসর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বল্লালসেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজ-পতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-মদন-শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন পাদানুধ্যাত অশ্বপতি গজপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিশ্বরূপ সেন পাদবিজয়িনঃ।"

কেশবসেন যাঁহাকে "অরিরাজ-সূদন" লিখিতেছেন, বিশ্বরূপ তাঁহাকে অরিরাজ লিখিতেছেন—কেশবসেন যাঁহাকে শঙ্কর গৌড়েশ্বর করিয়াছেন, বিশ্বরূপ তাঁহাকে "বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর" করিয়াছেন। বল্লালসেন দানসাগর গ্রন্থে "নিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর' লিখিয়াছেন, বিশ্বরূপ "অরিরাজ নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর" লিখিয়াছেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেন কেহই আপনাদিগকে স্ব স্ব তাম্রশাসনে অরিরাজ বা অরিরাজ-সূদন অথবা শঙ্কর গৌড়েশ্বর বা বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর ইত্যাদি লিখেন নাই, কেশব ও বিশ্বরূপ এই উপাধি পাইলেন কোথায়? পাইলেই বা উভয়ে মিল নাই কেন? ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, কোন একখানি তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া এই দুইখানি তাম্রশাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেশবসেনের তাম্রশাসনে "মাধব" কাটিয়া "কেশব" করা হইয়াছে, তাহাতেও কি সন্দেহ হয় না?

শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে অরিরাজ এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনে অরিরাজ-সূদন, অরিরাজ-ঘাতুক দেখিয়া কি বুঝা যায় না যে, শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া এই তাম্রশাসন লেখা হইয়াছে? শ্যামলবর্ম্মা কেশবসেনের পূর্ব্বের না হইলে তিনিই বা অরিরাজ-ঘাতুক হইলেন কিরূপে? বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে "অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর" লিখা হইয়াছে তাহাও শ্যামল-বর্ম্মার তাম্রশাসনের নকল। একই বিজয়সেন কেশবসেনের তাম্রশাসনে অরিরাজ-সূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর, আবার বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর গৌড়েশ্বর হইতে পারেন না। অতএব এই দুই তাম্রশাসনই শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া যে জাল করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। "অশ্বপতি, গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি" প্রভৃতিও শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিয়া লিখিয়াছে। শ্যামলবর্ম্মার মাতামহ কর্ণগাঙ্গেয় তাঁহার তাম্রশাসনে এই-সকল উপাধি লাগিয়াছেন। শ্যামল মাতামহের উপাধি আত্মসাৎ করিতে পারেন, কিন্তু কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের ঐ উপাধি গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং রাখাল বাবু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন **শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন জাল নহে।** যে কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রশাসন

(১) রাখাল বাবুর "অধিরাজ" পাঠ ভুল।

তিনি খাঁটি বলিয়া শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন জাল বলিয়াছেন সেই দুই তাম্রশাসনই ঠিক নহে।

২। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে এমন কোন কথা নাই যদ্দারা বুঝা যায় যে, জাতবর্ম্মা রাজা ছিলেন। রাখাল বাবু "সার্ব্বভৌমশ্রী" অর্থে "স্বাধীন রাজা" করিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজা থাকিলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে রাজত্বজ্ঞাপক, রাজা, ভূপতি, নরপতি ইত্যাদি কোন শব্দ থাকিত। বরং লিখিত আছে—

জাতবর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ।
দয়াব্রতং রণঃক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ ॥ ৭

অর্থাৎ "শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল।"

ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে জাতবর্ম্মা ভীষ্মের ন্যায় ছিলেন অর্থাৎ ভীষ্মের ন্যায় দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, ভীষ্মের ন্যায় যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল এবং ভীষ্মের ন্যায় রাজ্য জয় করিয়া জাতবর্ম্মা তাহা ত্যাগ করতঃ চিরকাল কেবল সেনাপতিত্বই করিয়াছেন। আর কত স্পষ্ট চান? আরও প্রমাণ আছে। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ
শ্রীমাঞ্জগৎ-প্রথম-মঙ্গল নামধেয়ঃ।
কিম্বন্ন্যামাখিল-ভূপ-গুণোপপন্নো
দোষৈ (র্ম্ম) নাগপি পদং ন কৃতঃ প্রভুর্ম্মে ॥ ৯

অর্থাৎ "জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান শ্যামলবর্ম্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অধিক কি বর্ণনা করিব? অখিল-নরপাল-গুণ-বিভূষিত আমার প্রভুতে দোষসমূহ কিয়ৎ-পরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।"

এই "প্রথম মঙ্গল নামধেয়" অর্থ প্রথম রাজা হওয়া। অখিল নরপালত্ব জাতবর্ম্মার ভাগ্যে ঘটিয়াছে এমন প্রমাণ তাম্রশাসনে একটীও নাই। অতএব ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে আমরা পাইলাম—বজ্রবর্ম্মার বংশে শ্যামলবর্ম্মাই প্রথম রাজা।

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকাতেও তাহাই লেখা আছে—

"বেদ গ্রহ গ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।" অর্থাৎ "শ্যামল বর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) নিজ বলে শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।" সুতরাং শ্যামল বর্ম্মা যে নিজ ভুজবলে রাজা হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কুলজী ও তাম্রশাসন একমত হইতেছে। (এই কারণে ৯৯৪ শকও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।) অতএব জাতবর্ম্মা রাজা ছিলেন না, তাই "সার্ব্বভৌমশ্রী" অর্থ "সার্ব্বভৌমকীর্ত্তি" মাত্র। শ্যামলবর্ম্মাও তজ্জন্যই স্বীয় তাম্রশাসনে পিতার নাম দেন নাই।

কোন তাম্রশাসনে "কুলকমলের" উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পিতার নাম না দেওয়াই শ্যামলবর্ম্মার কুলকমল লিখিবার কারণ। তাহাই দেখিয়া কেশব ও বিশ্বরূপ সেন স্ব স্ব তাম্রশাসনে "বর্ম্মকুল-কমল" স্থানে "সেনকুলকমল" করিয়াছেন। শ্যামল বর্ম্মার পিতার নাম আবিষ্কার না হওয়াই যদি পিতার নাম উল্লেখ না করিবার কারণ হয় তবে যিনি কুলপঞ্জিকা দেখিবেন তিনিই মানিতে পারিবেন, তাম্রশাসনে পিতার নাম উল্লেখ না থাকিলেও কুল-পঞ্জিকাকারগণ বিজয় সেনকে তাঁহার পিতা করিয়াছেন। সুতরাং যদি শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃত্রিম কৃত হইত তবে তাহাতে বিজয় সেনের নাম এবং সেনকুল-কমলই দেখা যাইত, বর্ম্মকুলকমল লেখা থাকিত না।

৩। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে ৬ শ্লোকে লিখিত আছে—

অভবদথ কাদাচিদ্‌যাদবীনাং চমূনাং
সমর-বিজয়-যাত্রা-মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূনাং সোমবদ্‌ বান্ধবানাং
কবিরপিচ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্ ॥ ৬

অর্থাৎ "কোনও এক সময়ে যাদব সেনার সমরবিজয়-যাত্রা-মঙ্গলরূপী বজ্রবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধবদলের পক্ষে চন্দ্র, কবিদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতকুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।"

ইহাতে বুঝিলাম বজ্রবর্ম্মা বীর ছিলেন; কবিশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ছিলেন এরূপ কোন কথা ইহাতে নাই। "যাদব সেনার সমর-বিজয়-যাত্রা মঙ্গলরূপী" অর্থ কি? যাদব সেনা বঙ্গদেশ জয়ের জন্য যাত্রা করিয়াছিল, ইনি সেই সেনাদলে রাজা ছিলেন না, সেনাপতিও ছিলেন না, কেবল মঙ্গলরূপী ছিলেন অর্থাৎ বজ্রবর্ম্মা সঙ্গে থাকাতেই তাহারা যেন জয়ী হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিলাম তিনি যাদব সেনা সহ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

৪। এই যাদব সেনা লইয়া কে আসিয়াছিল? ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—বজ্রবর্ম্মা "হরের্বান্ধবা" অর্থাৎ হরির জ্ঞাতি। এই হরি কে? ভবদেবের প্রশস্তিতে দেখিতে পাই, হরিবর্ম্মা বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে জানিতে পাই, বিক্রমপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম জ্যোতিবর্ম্মা। মহারাজাধিরাজ-শব্দ দ্বারা জানা যাইতেছে, জ্যোতিবর্ম্মা রাজা ছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে জানা যায় তাঁহারা যদুবংশজাত। তাহা হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—জ্যোতিবর্ম্মা যাদব সেনা লইয়া বঙ্গ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, জ্ঞাতি বজ্রবর্ম্মা তৎসহ আসিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের পরে কোন প্রবল শত্রু বঙ্গ অধিকার করিবার প্রমাণ নাই, এই জন্যই লিখিয়াছি, জ্যোতিবর্ম্মা রাজেন্দ্র চোল সহ আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল চলিয়া গেলে, জ্যোতিবর্ম্মা তদধিকৃত উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় এবং বিক্রমপুরে রাজা হইলেন। ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভবদেবের প্রশস্তি তাহার প্রমাণ।

৫। হরিবর্ম্মার ১৯ রাজ্যাঙ্কে বঙ্গাক্ষরে লিখিত "অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনও ৪২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। অতএব আমরা ৪২ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল ধরিতে পারি।

হরিবর্ম্মার পরে তৎপুত্র রাজা হইয়াছিলেন, ইহা ভবদেবের প্রশস্তিতে পাওয়া যায়। ভবদেব হরিবর্ম্মার ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রশস্তিতে জীবিত প্রভুর নাম না দিয়া মৃত প্রভু হরিবর্ম্মার নাম দিলেন কেন? ইহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন, ভবদেবের প্রশস্তি এবং পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে বুঝা যায়, শ্যামল বর্ম্মা হরিবর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া অর্থাৎ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ভবদেবের প্রশস্তির পূর্ব্বেই শ্যামল বর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন, এই জন্যই ভবদেব স্বীয় প্রশস্তিতে তাঁহার কাপুরুষ

জীবিত প্রভুর নাম না দিয়া তৎপিতা পূর্ব্ব প্রভুর নাম করিয়াছেন। হরিবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে বিক্রমপুর তাঁহাদের রাজধানী থাকায় জানা যায়, একের অভাবেই অন্যে রাজা হইয়াছে, সুতরাং হরিবর্ম্মার পরে তৎপুত্র, তৎপরে শ্যামল, তৎপরে ভোজ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন হরিবর্ম্মার পুত্রের পরে "শ্রীচন্দ্র" বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন (সাহিত্য ১৩২০। শ্রাবণ ২১৮ পৃষ্ঠা)। তাহা হইতে পারে না। পৃথক্ প্রবন্ধে তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

৬। রাখাল বাবুর মতে "১০২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ১ম রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। তিনি যে ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাঢ় জয় করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না।" ১০২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইলে ১০২০ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় আপত্তি কি? "পূর্ব্বে" বলিলে সময় ঠিক বুঝা যায় না। কি প্রমাণে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও বলেন নাই। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসের "প্রবাসীতে" "লক্ষ্মণ সেনের সময়" নামক প্রবন্ধে (৩৯৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন, ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহীপাল দেবের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন—

খৃষ্টাব্দ ১০২৫—প্রথম মহীপালের মৃত্যু।
" ১০৪০—নয়পালের মৃত্যু। ১৫ বৎসর রাজত্ব।
" ১০৫৩—তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু। ১৬ বৎসর রাজত্ব।
" ১০৫৫—২য় মহীপালদেবের মৃত্যু।
" ১০৫৫—২য় শূরপালের মৃত্যু।
" ১০৯৭—রামপালের মৃত্যু। ৪২ বৎসর রাজত্ব।
" ১১০০—কুমারপালদেবের মৃত্যু।
ইত্যাদি।

তাঁহার এই সময় নির্ণয়ে আমার আপত্তি আছে, তথাপি এখানে তাঁহার হিসাবমতই দেখা যাউক। কুমারপাল স্বীয় মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে কামরূপের সামন্ত রাজপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বৈদ্যদেব তাঁহার, "সং ৪ সূর্য্যাগত্যা বৈশাখ দিনে ১" এবং "বৈশাখে বিষু(ব) ত্যাক্ষ স্বর্ণার্থং হরিবাসরে" তাম্রশাসন দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আর্থার ভিনিস সাহেব দেখাইয়াছেন ১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪২ এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে একাদশী তিথিতে মেষ সংক্রান্তি হইয়াছে। বৈদ্যদেবের নামের পূর্ব্বে "মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক" দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে মারপালের মৃত্যুর পর বৈদ্যদেব স্বাধীন হইয়া এই তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। সুতরাং ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেব তাম্রশাসন দিয়া থাকিলে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে কুমারপালের মৃত্যু ধরা যাইতে পারে। ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই পারে না। অতএব রাখাল বাবুর হিসাব ঠিক রাখিয়া সন পরিবর্ত্তন করিলে—

খৃষ্টাব্দ ১০৯৫—কুমারপাল দেবের মৃত্যু।
" ১০৯২—রামপালের মৃত্যু।
" ১০৫০—২য় শূরপালের মৃত্যু।
" ঐ —২য় মহীপালের মৃত্যু।
" ১০৪৮—তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু।
" ১০৩৫—নয়পাল দেবের মৃত্যু।
" ১০২০—মহীপাল দেবের মৃত্যু।

অর্থাৎ ১০২০ খৃষ্টাব্দে মহীপাল দেবের মৃত্যু স্থির হয়। সুতরাং রাখাল বাবু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ১০২০ খৃষ্টাব্দের পরে রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইতে পারে না। ইহা আমার নূতন আবিষ্কার বটে কিন্তু কোন তাম্রশাসনের বলে নহে, তাঁহার অবলম্বিত সেই প্রাচীন গিরিলিপি অনুসারেই বটে। রাজেন্দ্র চোলের কোন তাম্রশাসন নাই। লিখিবার ভুলে গিরিলিপি স্থলে তাম্রশাসন হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এখন সম্ভবতঃ রাখাল বাবু ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাপথাভিযান শেষ হওয়া সম্বন্ধে আর আপত্তি করিবেন না।

৭। রাজেন্দ্র চোল সহ হরিবর্ম্মার পিতা জ্যোতিবর্ম্মার যাদব সেনা লইয়া বঙ্গে আগমন উপরে প্রমাণিত হইয়াছে। তদনুসারে ১০২০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিবর্ম্মার বঙ্গে আগমন ধরিতে পারি। আরও প্রমাণ আছে—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে হরিবর্ম্মা চন্দ্র বর্ম্মার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪৫৭ পৃঃ) তিনি বলেন, "ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে আভাসপ্রাপ্ত হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার প্রপিতামহ বজ্রবর্ম্মারও কিয়ৎ পুরুষ ঊর্দ্ধতন, তাহা "হরের্বান্ধবা" কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।" ইহাতেই কি প্রমাণ হইল, হরিবর্ম্মা বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্বের? তাহা হইতে পারে না। তাম্রশাসনের ৬ শ্লোকে বজ্রবর্ম্মার জন্ম লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই স্থির করা যাইতে পারেনা যে বজ্রবর্ম্মার জন্মের পূর্ব্বে হরিবর্ম্মা ছিলেন।

হরিবর্ম্মা জাতবর্ম্মার সমসাময়িক। ৮ম শ্লোকের, "বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং" দেখিয়া বুঝা যায় যে এই গোবর্দ্ধন ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিতে লিখিত ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন। জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই, "বীরস্থলীমধ্যে ভুজলীলা দ্বারা বসুমতীবর্দ্ধনকারী" (১) গোবর্দ্ধনও বিকল হন নাই। না হউন, কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে জাতবর্ম্মা, গোবর্দ্ধন ও হরিবর্ম্মা সমসাময়িক। জাতবর্ম্মা কর্ণদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালও কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং জাতবর্ম্মা ও তৃতীয় বিগ্রহপাল সমসাময়িক। তৃতীয় বিগ্রহপাল ১০৩৮-১০৫১ খৃষ্টাব্দ (মতান্তরে ১০৫৩-১০৬৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। অতএব জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি ১০৩৮ হইতে ১০৬৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা "ভোজবর্ম্মার পূর্ব্বে হরিবর্ম্মাকে স্থাপন করিতে পারেন নাই", (৪৫৭ পৃষ্ঠা) তাঁহারা কিছু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

হরিবর্ম্মা বঙ্গদেশে রাজা ছিলেন, তাঁহার ৪৫।৫০ বৎসর পরে ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। বজ্রবর্ম্মা ও জাতবর্ম্মা রাজা ছিলেন না, তাই প্রথিতনামা হরিবর্ম্মার নাম করিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হরিবর্ম্মা শ্লোকের নম্বর অনুসারে বজ্রবর্ম্মার পূর্ব্বের নহেন, তাম্রশাসনের পূর্ব্বের বটেন।

৮। আমরা উপরে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার মতে শ্যামল বর্ম্মা ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে নিজ ভুজবলে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু বলেন, "শ্যামল বর্ম্মার তারিখ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থকারগণ একমত নহেন। ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার মতে ১১৬৪ শকে বা ১২৪২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন। অতঃপর কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।"

(১) ভবদেবের প্রশস্তি ১২ শ্লোক।

আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার উক্তি সহ তাম্রশাসন ঐক্য হওয়ায়, ৯৯৪শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) যে শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। *ঈশ্বর বৈদিকের মত ঠিক নহে, ভুল। ১১৬৪ শক অর্থাৎ ১২৪২ খৃষ্টাব্দ হইতেই পারে না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া এখানে বিশেষ আলোচনা করিলাম না, এই প্রবন্ধ সমস্ত পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

৯। জ্যোতিবর্ম্মা ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সহ বা তৎপরে একাকী আসিয়া থাকিলে, শ্যামল বর্ম্মা পর্য্যন্ত ১০৭২-১০২০=৫২ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত ৪২ রাজ্যাঙ্ক বাদ দিলে ১০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। হরিবর্ম্মার পুত্র অধিক দিন রাজ্য করেন নাই, তাহা ভবদেবের প্রশস্তিতে জানা যায়। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব বৎসরাধিক কাল ধরিলে জ্যোতিবর্ম্মার রাজত্বকাল আট বৎসর ধরিতে কোন বাধা থাকে না। তাই আমি "বঙ্গে বর্ম্মারাজবংশ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, জ্যোতিবর্ম্মা ১০২০—১০২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, হরিবর্ম্মা ১০২৯—১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার পুত্র ১০৭১—১০৭২ খৃষ্টাব্দের কয়েক মাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপরে আমরা দেখাইয়াছি হরিবর্ম্মা, জাতবর্ম্মা ও গোবর্দ্ধন ১০৩৮—১০৬৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ছিলেন। তৎসহ এই সময় ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। এস্থলে কুলপঞ্জিকায় বিশ্বাস না করিলেও ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মার রাজ্যপ্রাপ্তি অবিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। শ্যামলবর্ম্মা বিজয় সেনের করদ ছিলেন, এ কথাতেও কোন বাধা হয় না। কারণ বল্লাল সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে বিজয় সেনের কাল। ১০৭২—১১১৯=৪৭ বৎসর হয়। এই ৪৭ বৎসর মধ্যে শ্যামলের বিজয় সেনের করদ হওয়া অসম্ভব নহে। কাজেই কুলজীর এ অংশও অবিশ্বাস করা যায় না।

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, কিলহর্ণ সাহেব ভবদেব-প্রশস্তির অক্ষর বিচার করিয়া তাহা "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে" উৎকীর্ণ বলিয়াছেন। আমরা ভবদেব-প্রশস্তির সময় ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পাইয়াছি, ইহা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা শেষ তৃতীয়াংশ বলা যাইতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দী বলিলে তাহার প্রথম ভাগ হইতে পারে, অন্যভাগও হইতে পারে। যদি প্রথমভাগ ধরা যায়, তবে আমাদের গণনার সহিত ৪০।৫০ বৎসরের প্রভেদ মাত্র হইতেছে। যে যে প্রমাণে আমি সময় নির্ণয় করিয়াছি, কেবল অক্ষর বিচার করিয়া যে সময় পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাহার মূল্য বেশী. সুতরাং ৫০ বৎসরের প্রভেদ ধর্ত্তব্য নহে। অতএব শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শক বা ১০৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছেন ধরিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

১০। "শ্যামলবর্ম্মা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, বিজয় সেন সেই সময় দক্ষিণ বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর পাল রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করিয়া নিজে স্বাধীন হইয়াছিলেন।" ইহা আমার নূতন আবিষ্কার বটে। বিজয় সেন বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে করিতে বরেন্দ্রে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সকল ঐতিহাসিকেরই স্বীকৃত বিষয়। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন শ্যামল বঙ্গদেশে বিজয় সেনের করদরূপে রাজত্ব করিয়াছেন, এই জন্যই আমি দেখাইয়াছি শ্যামল তখন বিজয় সেনের করদ ছিলেন না, বঙ্গদেশ সুযোগমত জয় করিয়া স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার তাম্রশাসনে "বঙ্গ বিষয় পাঠান্তর্গত" লিখিয়াছেন। তাম্রশাসন দানের পরে করদ হইয়াছিলেন।

১১। বল্লাল সেনের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার রাজ্যের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি বিক্রমপুর রাজধানী হইতে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি বিক্রমপুর জয় করিয়া এই তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। কারণ এই বিক্রমপুর ও বঙ্গ শ্যামলবর্ম্মার রাজ্য ছিল। বল্লাল সেন তাহা অধিকার না করিয়া দান করিতে পারেন না। বিক্রমপুরকেও রাজধানী বলিতে পারেন না। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে জানা যাইতেছে যে বিক্রমপুর ভোজবর্ম্মার রাজধানী ছিল। সুতরাং শ্যামলবর্ম্মার পরে ভোজ রাজা হইয়াছিলেন, তৎপরে বল্লাল বিক্রমপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন তাঁহার ৫ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, শ্যামল বিজয়ের করদ ছিলেন। করদের ভূমিদান করিবার ক্ষমতা নাই। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে স্বাধীনতাজ্ঞাপক মহারাজাধিরাজ ভোজ লিখিত আছে, সুতরাং ভোজবর্ম্মা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন, জানা যাইতেছে। বল্লাল সেন যে ভোজবর্ম্মা অপেক্ষা প্রবল, তাহা শ্যামল বর্ম্মার করদত্ব হইতেই জানা যায়। সুতরাং একটা সুযোগ ব্যতীত ভোজবর্ম্মা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। বিজয়সেনের মৃত্যু, বল্লাল সেনের মিথিলা জয় ইত্যাদি ব্যাপার এ সময় এত গুরুতর হইয়াছিল যে বল্লাল সেনের মৃত্যু ঘোষণা হওয়ায় সদ্যোজাত লক্ষ্মণ সেন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসেরই কথা। সুতরাং মূল রাজ্যে এইরূপ বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইলে সামন্তরাজগণ যে সেই সুবিধায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এ উদাহরণও বিরল নহে, সুতরাং এই সময়ে যদি ভোজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তাম্রশাসন দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এই সময় ভোজের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক চলিতেছিল সুতরাং ১১১৯—৪= ১১১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন পাইয়াছেন ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং এ তত্ত্ব আমার নূতন আবিষ্কার হইলেও অসঙ্গত নহে, বরং তাম্রশাসনানুমোদিত ঐতিহাসিক সত্য।

১২। শ্যামলবর্ম্মা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পাইয়াছেন এবং ভোজবর্ম্মা ১১১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন পাইয়াছেন। সুতরাং ১১১৫—১০৭২= ৪৩ বৎসর অর্থাৎ ১০৭২—১১১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্যামল বর্ম্মা রাজত্ব করিয়াছেন। ইহা তাম্রশাসনানুমোদিত সত্য এবং আমার নূতন আবিষ্কার বটে।

উপরে যাহা লিখিলাম তাহাতে আশা করি রাখাল বাবু আর বলিতে পারিবেন না যে, "কতকগুলি স্বপ্নলব্ধ তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছি (৪৫৭ পৃষ্ঠা)"।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

বহুরূপী নক্ষত্র

উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে কাল-সাগরে—অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বিংশ শতাব্দী বিবিধ জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, তাহার স্থান

অধিকার করিয়াছে। তড়িৎ ও তৈল হইতে উৎপন্ন বাষ্পচালিত যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিতে—মোটরকার, এরোপ্লেন Xরে প্রভৃতির আবিষ্কারে—জগৎ চমকিত হইয়াছে। জগদীশের বস্তুতত্ত্ব, প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়া এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা বহুপ্রকার অভিনব ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া লোককে বিস্ময়াবিভূত করিয়াছে। রেডিয়াম নামক ধাতুর আবিষ্কার হওয়ায় "সাত রাজার ধন মাণিকের" সন্ধান মিলিয়াছে। তাম্র লৌহ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা জানা গিয়াছে। এই-সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত তুলনায় জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও নিতান্ত কম উন্নতি হয় নাই। গণিতের সাহায্যে লক্ষকোটী যোজন দূরে স্থিত জ্যোতিষ্কগুলির পরস্পরের দূরত্ব নির্ণীত হইতেছে, তাহাদের স্বরূপ—তাহারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, কি উপাদানে তাহারা গঠিত, তাহাদের বর্ণ, আলোকের অবস্থা, গতির বেগ প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইতেছে। এমন সময়ে উত্তরাকাশে পরশু নামক নক্ষত্ররাশির মধ্যে একটী নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিকগণের হৃদয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। পরশু রাশিতে নূতন আবির্ভূত হওয়ায় ইহাকে জ্যোতিষীগণ নবপরশু নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নীলাম্বরে আমরা যে-সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু নক্ষত্র ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে, এইরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখাইলেও উহাদের প্রত্যেকে এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য স্বরূপ, বহু লক্ষকোটী যোজন দূরে থাকায় আমাদের নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক নক্ষত্রগুলি দৃশ্যতঃ স্থির বোধ হইলেও উহাদের গতি আছে। বহু দূরে স্থিত অদৃশ্য দুইটী নক্ষত্র এইরূপ গতিক্রমে পরস্পরের নিকট দিয়া যখন গমন করিতে থাকে, সেই সময়ে উহাদের মধ্যে নৈকট্য বশতঃ স্পর্শ-সংঘর্ষণ সংঘটিত হয়। এই প্রকার সংঘর্ষণের ফলে নূতন এবং বহুরূপী নক্ষত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এইরূপ সূর্য্য-সংঘর্ষণোৎপন্ন নব ও বহুরূপী নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাবের ন্যায় নভোমণ্ডলের আর কোন ঘটনাই মানুষের মনকে এরূপ বিস্ময়বিমুগ্ধ করিতে পারে না, যাহাতে তাহারা নীলাম্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে যত্ন করে। এইরূপ একটী ঘটনাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিপার্কাস (Hipparchus) নক্ষত্রগণের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ আর একটী ঘটনায় টাইকোব্রা (Tychobrahe) বীক্ষণাগারের বৈজ্ঞানিক আলোকাধার ও চুল্লী পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া নীলাম্বরের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে শূন্যমার্গে গ্রহ ও উপগ্রহগণের অবস্থানের বিবরণ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। গ্যালিলিও (Galileo) একটী সাময়িক নক্ষত্রের আবির্ভাব দর্শন করিয়া পৃথিবীর গতিবিষয়ক কোপর্ণিকাশের মতবাদ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বিগত ১৩১৮ সালে (বঙ্গাব্দের) গোধা (Lucerta) নামক নক্ষত্র রাশিতে, এসপিন (Mr. Espin) সাহেব একটী নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলী এবং বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই-সকল সাময়িক নক্ষত্র সম্বন্ধে পরলোকগত পণ্ডিত নিউকম্ব (Prof. Newcomb) বলিয়াছিলেন "নূতন নক্ষত্রগুলি সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে চমৎকারসম্বলিত বিস্ময়রসে নিমগ্ন করিয়া ফেলে; প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতগণও ইহাদের স্বরূপ সহজে অবগত হইতে পারেন না।" পরলোকগত Miss Agnes Clarke জ্যোতিষীগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "এই-সকল নব নক্ষত্র পূর্ব্বে কি ছিল, বর্ত্তমানেই বা ইহাদের স্বরূপ কি এবং ইহাদের পরিণতিই বা কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু এই-সকল দুর্জ্ঞেয় প্রতিপাদ্যগুলির সম্বন্ধে নিবিড়ভাবে আলোচনা করিলে উহাদের উৎপত্তির প্রণালীসম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না তাহা নহে। একটী বস্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে নিস্পন্দ ও অদৃশ্য ছিল, তাহা অকস্মাৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে দীপ্তিমান

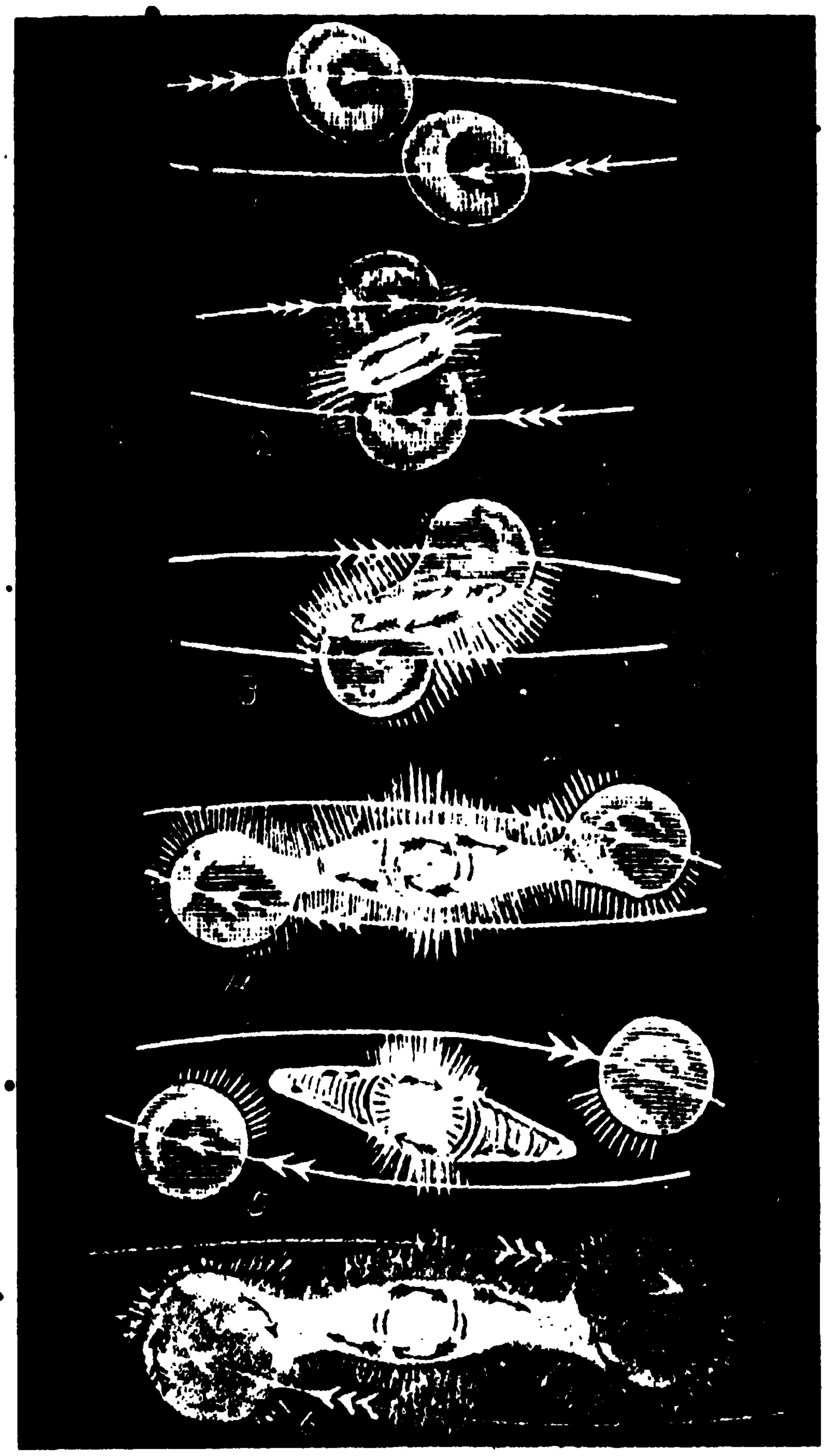

বহুরূপী নক্ষত্র।
১। দুটি নক্ষত্র পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া বিকৃতাকার হইতেছে।
২। নক্ষত্র-সংঘর্ষ। ৩। সংঘর্ষণান্তে নূতন নক্ষত্র সৃষ্টি।
৪। সংঘর্ষণান্ত নক্ষত্র-শরীরের বস্তুবিভাগ।
৫। নূতন মধ্যবর্ত্তী নক্ষত্র। ৬। মধ্যবর্ত্তী
নক্ষত্র-শরীরের সম্প্রসারণ।

হইয়া নক্ষত্ররূপে প্রতিভাত হয়। এই পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়? কেই বা এই পরিবর্ত্তন ঘটায়? এই-সমস্ত ব্যাপারের বিশালতা ধারণায় আনিতে মানুষের কল্পনা হা'র মানে। আমাদের নিকট পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি আমরা কল্পনায় বা গণিতের সাহায্যে ইহার ওজন অবগত হইতে পারি। আমাদের সূর্য্য আবার পৃথিবী হইতে লক্ষগুণ বড়, কিন্তু ঐ-সকল জলন্ত অগ্নিগোলকের কোন কোনটী আমাদের সূর্য্য হইতেও লক্ষকোটীগুণ বড় হইয়া থাকে।" নব-পরন্তু তারাটী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য অবস্থা হইতে উজ্জ্বলতম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিয়া, কয়েকমাস মধ্যে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে, তজ্জন্য যখন উহাদের সংঘর্ষণ হয়, তখন পরস্পরে সম্মুখীন ধাক্কা না দিয়া পাশাপাশি ঘর্ষিত হইয়া, উভয়ে উভয়ের গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। এই সংঘর্ষণকালে অর্থাৎ যখন উভয়ে উভয়ের গাত্রসংলগ্ন হয়, তখন উভয় সূর্য্য হইতে কতকটা অংশ জমাট বাঁধিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী নূতন নক্ষত্র গঠন করে; এই নূতন নক্ষত্রটী জন্মগ্রহণ করিয়াই এরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠে যে সে তখন তাহার জনক জননীর গমনপথ নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া নিয়মিত করে, তাহার জনক জননীও সন্তান-বাৎসল্য-প্রযুক্ত সেই নিয়মিত পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহারাই অবস্থাভেদে যুগল নক্ষত্র, কামরূপ এবং বহুরূপ তারা, নীহারিকা, ধূমকেতু প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ করিয়া নীলাম্বরে বিচরণ করিতে থাকে।

সূর্য্য-সংঘর্ষণোৎপন্ন নূতন নক্ষত্র, যাহারা দুইটী সূর্য্যের স্পর্শ-সংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মলাভ করে, তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের আকার গ্রহণ করিয়া স্বীয় উষ্ণতার প্রভাবে ক্রমশই আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই-রূপে এক একটী নূতন নক্ষত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশের দশলক্ষ মাইল স্থান অধিকার করিয়া বসে। নূতন নক্ষত্রটী যৎপরোনাস্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে, পরন্তু উহার আয়তন বৃদ্ধির সহিত উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; নূতন তারাটী যত শীঘ্র তাহার চরম উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, উহার পরমাণুর সম্প্রসারণ তত সত্বর নিবারিত হয় না, উহা ক্রমশই অধিকতর প্রসারিত হইতে হইতে নীহারিকার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে উহার উজ্জ্বলতা কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, উহার জ্যোতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমাণুর অন্তর্ব্বল, অর্থাৎ তাহার সম্প্রসারণ ও

সঙ্কোচনশক্তি, সমস্ত বস্তুতে সমান থাকে না, পরন্তু পরমাণুর ইহা একটি স্বধর্ম্ম যে, একই প্রকার উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের অন্তর্ব্বল সমান হয়। সীসকের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের একটী পরমাণু হইতে দুইশত সাতগুণ বেশী ভারী, কিন্তু সমান উত্তাপ প্রাপ্ত হইলে উভয়েরই অন্তর্ব্বল সমান হইয়া থাকে। উহাদের একের অর্থাৎ সীসকের বস্তু বা ভার বেশী, কিন্তু অপরের অর্থাৎ হাইড্রোজেনের বেগ বেশী। দুইটী নক্ষত্রের সংঘর্ষণ হওয়া মাত্রই তাহাদের সমস্ত উপাদান একই প্রকার গতিশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ নূতন নক্ষত্রটীর জন্মমাত্রই তাহার ভারীবস্তু অসম্ভব উত্তপ্ত হয় এবং লঘুবস্তু শীতল থাকে, কিন্তু যখন ভারীবস্তুর সমান উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন লঘুবস্তু, ভারীবস্তুর অন্তর্ব্বল নষ্ট করে এবং অস্বাভাবিক গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। নবপরশু নামক নূতন নক্ষত্রটীর হাইড্রোজেনের গতিবেগ অর্থাৎ সম্প্রসারিত হইবার শক্তি এক সেকেণ্ডে সহস্র মাইল পর্য্যন্ত জানা গিয়াছিল। এইরূপে লঘু এবং বায়বীয় পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুকে পশ্চাতে রাখিয়া দূরে চলিয়া যায়। লঘু উপাদানগুলি মণ্ডলাকারে বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর ভারী পদার্থগুলি বায়বীয় আকার ধারণ করিলেও সঙ্কুচিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিকিরণ-শক্তিহীন অত্যুজ্জ্বল পিণ্ডাকারে পরিণত হইতে চেষ্টা করে। এদিকে এই সময়ে লঘু উপাদানগুলিও তাহাদের বাহিরের দিকে সম্প্রসারিত হইবার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে, কারণ বস্তুর সম্প্রসারিত হইবার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমায় উপনীত হইলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া কেন্দ্রানুগ-শক্তিবলে পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাহার পূর্ব্বের উজ্জ্বলতা—যাহাকে সম্প্রসারিত হইবার সময়ে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ে আমরা উহাকে পুনরায় দেখিতে পাই। বহুরূপী নক্ষত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই এবম্বিধ সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের নির্দ্দিষ্ট সময় জানা গিয়াছে। এই সময়ে ইহাদের জ্যোতি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয়। আমরা নিম্নে এইরূপ কয়েকটী বহুরূপী নক্ষত্রের বিবরণ দিলাম। কৌতূহলী পাঠকগণ ইহাদের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

১। তিমিরাশির প্রথম তারা Oceti called also Mira) একটী রক্তবর্ণ বহুরূপী নক্ষত্র, ইহার পৌরাণিক নাম মার। তিনশত চৌত্রিশ দিনে এই তারাটী নানা রূপ ধারণ করে। পনর দিন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থুলত্ব ভোগ করিয়া তিন মাস যাবত ক্রমে কমিয়া কমিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং অদৃশ্য অবস্থায় পাঁচ মাস থাকে; তৎপরে ষষ্ঠ শ্রেণীর তারারূপে

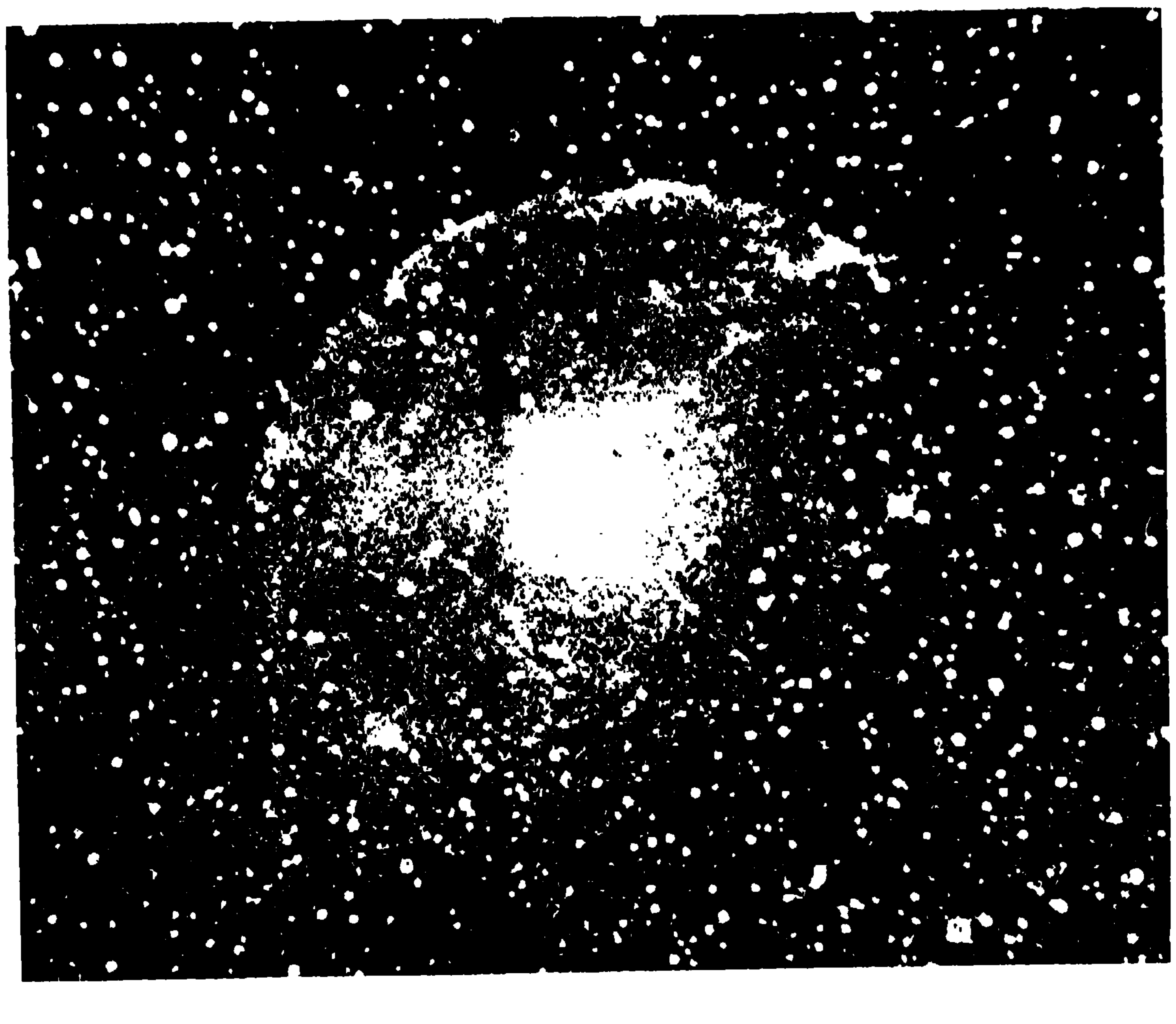

নবপরশু নক্ষত্রের নিকটস্থ নীহারিকা।

দৃষ্টিগোচর হইয়া তিন মাস মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১৬৭২ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে এবং ১৬৭৬ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে এই তারাটী লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছিল।

২। পরশুরাশির দ্বিতীয় তারা Persee একটী বিচিত্র বহুরূপী নক্ষত্র, ৬৯ ঘণ্টার মধ্যে ৬২ ঘণ্টা এইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার ন্যায় উজ্জ্বল থাকে, পরবর্ত্তী সাত

ঘণ্টার মধ্যে ইহার রূপের পরিবর্ত্তন হয়। এই সময়ে ইহা ৪র্থ শ্রেণীর তারায় পরিণত হয় এবং ২০ মিনিট এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার এইরূপ অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ ইহাকে দানবচক্ষু (Algol) নাম দিয়াছেন। ইহার পৌরাণিক নাম মায়াবতী।

৩। বীণারাশির তৃতীয় তারা Lyrae, ১২ দিন ২২ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার হ্রাস এবং বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়; একবার ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় তৃতীয় শ্রেণীর, আর ৬ দিন ১১ ঘণ্টায় চতুর্থ শ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই তারাটী আবার যুগল নক্ষত্র।

৪। শেফালী রাশির একটী তারা Scephei বহুরূপী যুগলনক্ষত্র, ৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ সেকেণ্ডের মধ্যে ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে রূপ পরিবর্ত্তন করে। ইহার মধ্যে ১দিন ১৪ ঘণ্টায় ৫ম হইতে ৩য় শ্রেণীতে উপনীত হয় এবং ৩ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ছোট হইয়া ৫ম শ্রেণীতে পরিণত হয়।

৫। অর্ণবযান রাশির দ্বিতীয় তারা মারীচ Argus একটী বহুরূপী তারা। ১৬৭৭ খৃঃ অঃ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হ্যালী সাহেব ইহাকে ৪র্থ শ্রেণীর তারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৭৪১ খ্রীঃ অঃ জ্যোতিষী ল্যাকেলী (Lacaille) ইহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়াছেন। তৎপরে ইহার ইতিহাস যতদূর জানা যায় লিখিত হইল। ১৮১১ খৃঃ অঃ হইতে ১৮১৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৪র্থ শ্রেণীর, ১৮২২ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮২৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ২য় শ্রেণীর এবং ১৮২৭ খৃঃ অঃ ইহা প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। পরে ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর হইয়া পুনঃ ১৮৩৮ খৃঃ অঃ প্রথম শ্রেণীর আকারে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ লুব্ধক ব্যতীত আকাশে ইহার সমান উজ্জ্বল তারা আর কেহই ছিল না। আজকাল ইহার এমনই দুরবস্থা যে দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখিবার উপায় নাই। এই তারাটীর নিকটস্থ তারাস্তবকটীও (H 2167) বহুরূপী (variable)।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

পুস্তক-পরিচয়

সরল ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র—

কলিকাতা মেডিক্যাল্ স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, এম্, বি প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ ২৪৮ পৃষ্ঠা। ছাপা, বাঁধাই মন্দ নহে।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন অনেকের নিকট সুপরিচিত। স্ত্রী-রোগ চিকিৎসায় ও ধাত্রীবিদ্যায় আমাদের দেশে যাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সুন্দরী বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বহুদিন ধরিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল্ স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন - সুতরাং উক্ত বিদ্যায় তাঁহার যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দখল আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শুধু ব্যুৎপত্তি থাকিলেই যে ভাল বই লেখা যায়, তাহা নহে—লিখিবার শক্তিও থাকা চাই। সুন্দরী বাবুর দেখিতেছি তাহারও অভাব নাই। তিনি সহজ ভাবে, সরল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কাজেই তাঁহার পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে কতকটা যে জ্ঞান জন্মায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি কথোপকথন-চ্ছলে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রধান পাত্রী বিমলা। ইনি "পাশ-করা" শিক্ষিতা ধাত্রী এবং আদর্শ ধাত্রী। গৃহিণী ও ধাত্রীদের দোষে জন্মের আনন্দ যে আমাদের দেশে অনেক স্থলেই নিরানন্দে পরিণত হয়, একথা তিনি বিলক্ষণই অবগত আছেন এবং ইহা দূর করিতে হইলে, গৃহিণী ও ধাত্রীদের অজ্ঞানতা ও অসতর্কতা বিদূরিত করা আবশ্যক এ কথাও তাঁহার অবিদিত নহে। তাই ইনি সুবিধা পাইলেই গৃহিণী মাত্রকেই সহজে প্রসব ও শিশুপালন বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন আর ধাত্রীগণ বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া, প্রসূতি ও শিশুর যাহাতে অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে তাহাদের সতর্ক করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী বোধ করেন না।

পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি বাঙ্গালী গৃহিণীদের জন্য লিখিত, দ্বিতীয় ভাগটি ধাত্রীদের উদ্দেশে লিখিত। বক্তব্য বিষয় সহজে বুঝাইবার জন্য পুস্তকখানিতে বিস্তর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই বঙ্গললনা ও বাঙ্গালী ধাত্রীদের উপযোগী হইয়াছে।

সুন্দরী বাবু (microscope) মাইক্রোস্কোপ্‌কে "দূরবীন্" বলিয়াছেন। এটা কি ঠিক হইয়াছে? আমরা ত (telescope) টেলিস্কোপ্‌কেই দূরবীক্ষণ বা দূরবীন্ বলিয়া জানিতাম।

ডাক্তার।

আহত জনের প্রথম প্রতিকার—

First Aid to the Injured (In Bengali). শিলচর মিলিটারী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীমহিমচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। ১৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৳০ আনা।

আকস্মিক দুর্ঘটনা সংসারে প্রতিদিনকার ব্যাপার বলিলেই হয়। হাত পা ভাঙা, জলে ডুবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি দৈব বিপদ আমাদের চারিদিকে নিয়তই ঘটিতে দেখি। ইহাদের রীতিমত চিকিৎসার জন্য সুশিক্ষিত ডাক্তারের যে সাহায্য আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থানটিতে দৈববিপদ ঘটে, সেখানে যে ডাক্তার উপস্থিত থাকিবে এমন আশা কেহই করিতে পারেন না।

সুতরাং আহত জনের প্রথম চিকিৎসার ভার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদেরই গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে কোন দুর্ঘটনায় কি করা উচিত—সে বিষয়ে সকলেরই একটু আধটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে, সাধারণের এ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। আমরা বিপদের সময়, রোগীকে লইয়া এমন সব ব্যাপার করিয়া বসি, যাহাতে অনেক সময় রোগীর সুবিধা না হইয়া বিশেষ অসুবিধাই হইতে দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবার সম্ভব। হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া খুবই সাধারণ বলিতে হইবে। মূর্চ্ছাবস্থায় রোগীকে উঠাইয়া বসাইতে বা দাঁড় করাইতে নাই, তাহাতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে—এস্থলে রোগীকে চিত করাইয়া শোয়াইয়া রাখিতে হয় এবং তাহার মাথাটা শরীর অপেক্ষা একটু নীচু করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি। মূর্চ্ছাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয়—দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ঠেলিয়া মস্তিকে রক্ত প্রেরণ করিতে পারে না, এই কারণেই রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে রোগীকে সোজা করিয়া বসাইলে, তাহার মূর্চ্ছা-অপনোদনের আর সম্ভাবনা কোথায়? এ-সকল বিষয় বুঝিতে হইলে, Physiology (শারীর-ক্রিয়া) বিদ্যায় সকলেরই একটু আধটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এ বিদ্যাটি চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বিলাতে কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা, সেখানকার মাসিক পত্রাদিতে এবং শিশু বিদ্যালয়ে এ-সকল বিদ্যার রীতিমত আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার ফলে, সে দেশের লোকদের আহতজনের প্রথম চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়। আমরা মহিমবাবুর এই চেষ্টাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি এই পুস্তক-খানিতে আহত ও পীড়িত জনের প্রথম প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিষয়টি বুঝাইবার জন্য পুস্তকখানিতে অনেকগুলি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার।

যৌন-নির্ব্বাচন—

শ্রীযুক্ত রাজা ও ফিউডেটরি চীফ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব প্রণীত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একখানি গ্রন্থের সমালোচনায় কবির ওড়িয়া কবিতার বঙ্গানুবাদের পরিচয় দিয়াছিলাম। এখানি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত মূল কবিতাগ্রন্থ। যে প্রাকৃতিক আকর্ষণে sexual selection বা যৌন নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে কাব্যরস যথেষ্ট থাকিলেও, আমরা সে তত্ত্ব ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেই পড়িয়া থাকি; কিন্তু কবি জীব-অভিব্যক্তির ঐ রহস্যটুকু লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এই কবিতা-গ্রন্থে কবি একদিকে তাঁহার বিজ্ঞান-আলোচনার এবং অন্যদিকে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কবির ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন। যে-সকল শব্দ সাধারণতঃ প্রচলিত ওড়িয়া সাধুভাষাতেও ব্যবহৃত নাই, এবং যে-সকল শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাতিয়া সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হইতে বাহির করিতে হয়, সে-সকল শব্দ কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। রচনা যত সরল এবং সুবোধ্য হয়, কবিতার ভাব ততই মধুর এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া থাকে। প্রেম-অভিব্যক্তির কবিতায় অপ্রচলিত কঠোর শব্দ অনেক স্থলে কবিতার সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ মলিন করিয়াছে। আশা করি, রাজা বাহাদুর তাঁহার ভবিষ্যৎ রচনায় প্রচলিত ওড়িয়া শব্দের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

শ্রী—

সংস্কৃত-শিক্ষা—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাগ। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবারাম শর্ম্মা প্রণীত। গ্রন্থকার পূর্ব্বে মুরাদাবাদ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, এখন তিনি বৃন্দাবনস্থ গুরুকুলের সংস্কৃতাধ্যাপক।

এখন চারিদিকে Direct methodএ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত-শিক্ষাপুস্তকখানিও খুব সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই বিরচিত। গ্রন্থখানি ভূমিকাশূন্য বলিয়া গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারা যায় না। কিন্তু পুস্তকের পাঠ-গুলির সমাবেশ দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে হিন্দী ভাষা হইতে সহজে Direct methodএ সংস্কৃত শিক্ষা দিতে গ্রন্থ কয়খানি রচিত হইয়াছে।

সে উদ্দেশ্য যে বিশেষ সফল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কারণ প্রথম ভাগ ২৭ পৃষ্ঠাতে সমাপ্ত। তাহার শেষ অংশে পত্র-লেখন-প্রণালী দেওয়া আছে, ও বালকের পক্ষে বেশ একটু কঠিন একখানি পত্র লিখিত আছে। পাঠগুলি বালকদের শিক্ষার শক্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া হু হু করিয়া শক্ত হইয়া চলিয়াছে।

ইহাকে Direct methodএ লিখিত সংস্কৃত-শিক্ষা বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকে Exercise সংযুক্ত করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাঠ বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং পাঠগুলির হিন্দী সংস্কৃত অনুবাদ আছে। পাঠগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে, অনেকটা বর্ত্তমানের প্রয়োজনানুগত।

সংস্কৃতের ন্যায় অপ্রচলিত ভাষাতে এরূপে গ্রন্থ রচনা করাও সহজ নহে। তবে যাঁহারা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের বহু উপকরণজাল ও পারিভাষিকতা হইতে অবশ্যজ্ঞাতব্য সরল অংশটুকু বাছিয়া বাহির করিয়াছেন তাঁহারা সকল ছাত্রের ধন্যবাদার্হ। এইক্ষেত্রে একমাত্র মহাপুরুষ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর, আর সকলে তাঁহার পথানুবর্ত্তী। হিন্দিতে পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগরের পন্থাই অনুগমন করেন। এই বক্ষ্যমান গ্রন্থখানিও প্রধানতঃ সেই ভিত্তির উপরেই স্থাপিত। বঙ্গদেশ হইতে উদ্ভাবিত সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহার কৃতকার্য্যতা প্রমাণ করিয়াছে এই গ্রন্থচতুষ্টয় তাহার সাক্ষী।

যাহা হউক Direct methodএ লিখিত না হইলেও ব্যাক-রণ ও Exercise হিসাবে পুস্তকখানি বেশ ভাল হইয়াছে। পুস্তক-খানির বিশেষ চমৎকারিত্ব তাহার তৃতীয় ভাগের সন্ধি-প্রকরণে। সন্ধিপ্রকরণটা গ্রন্থকার পাণিনীর Phonetic সূত্রগুলির দ্বারা খুব সহজে চমৎকার বুঝাইয়াছেন। বিষয়টি এত সরল করিয়াছেন যে, যে-কোন সংস্কৃতশিক্ষক শিক্ষার্থীকে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারেন—এবং সন্ধিপ্রকরণের সূত্রগুলি বেশ নিপুণতার সহিত বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার যে প্রাচীন প্রণালীর ব্যাকরণে বেশ সুপণ্ডিত তাহা তাঁহার সন্ধিপ্রকরণেই বোধ-করা যায়। তিনি যদি এইরূপ সুগম করিয়া লঘুকৌমুদী ও সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ দুখানি লেখেন তবে ছাত্রগণের অত্যন্ত উপকার হইবে। ভাল সূত্রব্যাখ্যার অভাবে লঘু-কৌমুদী বা পাণিনী ছাত্রগণের শক্তির অতীত হইয়া রহিয়াছে।

কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা সহিত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল্য সাধারণ ছাত্রের শক্তির অতীত।

এই ব্যাকরণে তিগন্ত সুবন্ত পদ সাধনের কোন সূত্র নাই। যদিও লিঙ্গ ও অন্ত বর্ণানুসারে শব্দসমূহের রূপ গুণ প্রকরণ অনুসারে ধাতু সমূহের রূপ করা আছে, তবু তাহা সাধিবার কোন নিয়ম লেখা নাই। সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ, লিঙ্গ, প্রত্যয়, ষত্ব ও ণত্ব বিধি একেবারেই নাই। তারপর প্রথম পাঠ হইতে ধাতু ও শব্দরূপ ছাড়া একপা পথও অগ্রসর হইবার উপায় দেখান নাই। কৃৎ ও তদ্ধিত দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা যে কতকটা সোজা হয় এবং চলতি ভাষা হইতে সংস্কৃতে যাইবার যে দুইটী সেতু, গ্রন্থকার তাহা দেখান নাই। সংস্কৃতে Direct method উদ্ভাবন করিতে হইলে এই পথেই চলিতে হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তথাপি ব্যাকরণ ও Exercise সাজাইয়া হিন্দী-ভাষাভাষী ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যাকরণখানিকে অত্যন্ত উপাদেয় করা হইয়াছে। সন্ধিপ্রণালীটা ব্যাকরণানুযায়ী অথচ সরল করিয়া ছাত্রদের সংস্কৃতবোধ অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। তাঁহার নিকট এইরূপ সুলভ অথচ সহজবোধ্য ব্যাখ্যা সমেত সুসজ্জিত লঘু-কৌমুদী ও সিদ্ধান্তকৌমুদী পাইতে ইচ্ছা করি। তাহা দ্বারা তিনি ভারতের তাবৎ সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর ধন্যবাদভাজন হইয়া রহিবেন।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—

(তিনভাগ একত্রে) শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৫২১; মূল্য ১৷৷০ (প্রাপ্তির স্থল শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা)।

আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তিনখণ্ড একত্রে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে :—(১) সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয় (২) মনুষ্য পরমেশ্বরকে জানিতে পারে কি না (৩) পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেকের সাক্ষ্য (৪) সাকার ও নিরাকার উপাসনা (৫) ব্রহ্মোপাসনার বিষয়ে আপত্তি খণ্ডন (৬) প্রার্থনা-তত্ত্ব (৭) প্রকৃত শাস্ত্র (৮) আত্মার স্বাধীনতা (৯) পাপ কি ? (১০) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (১১) মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ? (১২) অবতারবাদ, (১৩) অনাত্মবাদের অযৌক্তিকতা (১৪) আত্মার অমরত্ব (১৫) স্বর্গ, নরক ও মুক্তি। বিষয়গুলি অত্যন্ত কঠিন এবং এই গ্রন্থে এ সমুদয়ের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সহজেই মনে হইতে পারে গ্রন্থ দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু তাহা নহে ; দার্শনিক তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমরা পড়ি নাই। ইংরাজী ভাষাতেও এ প্রকার পুস্তক দুর্লভ। কেয়ার্ড (Caird) কিংবা মার্টীনো (Martineau) যদি এই গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলেও ইহা তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয় হইত। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার উপযুক্ত আদর হয় নাই। 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' যেমন সরল ও বিশদ, তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ। একদিকে যুক্তি অপরদিকে রসিকতা—উভয়ের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য এমন গ্রন্থ যে জনসমাজে বহুল প্রচারিত হয় না—ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। বাঙ্গালা পাঠকের মস্তিষ্ক কি এতই ক্ষীণ যে এ প্রকার দার্শনিক গ্রন্থও অধ্যয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে ?

(১) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর দর্শন (প্রথম ভাগ)—

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম এ, প্রণীত। পৃঃ ৷৷৵০+২৫৬, কাগজের মলাট, মূল্য দুই টাকা।

(২) অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। পৃঃ ।৵০+২০৬, কাগজের মলাট, মূল্য এক টাকা।

উভয় গ্রন্থই দার্শনিক ও তত্ত্ববিষয়ক এবং উভয় গ্রন্থকারই চিন্তাশীল ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

দ্বিজদাস বাবু ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—

"বৃদ্ধবয়সে, ক্ষীণ চক্ষু এবং ক্ষীণ মস্তিষ্ক লইয়া আমাকে একাকীই সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিতে হইতেছে। তবে আমার অনেক আত্মীয় এবং আত্মীয়া দয়া করিয়া হস্তলিপি এবং প্রুফ সংশোধন দ্বারা আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন।...ভ্রমপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে। সারা জীবনের পরিশ্রম মাটি হইবে, এই ভয়ে "বামনের চন্দ্রে হাত" মনে না করিয়া আমি শঙ্করদর্শন দেশে সুপরিচিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কারণ শঙ্করদর্শন ভারতমাতার মণিস্বরূপ। ভবিষ্যতে যখন উপযুক্ত লোক এই কার্য্যসাধনে ব্রতী হইবেন, আমার এই পরিশ্রম দ্বারা যদি তাঁহার কোন সাহায্য হয়, তবেই আমার এই বৃদ্ধবয়সের যত্ন সফল মনে করিব।"

এই গ্রন্থের ছয় অধ্যায় ; প্রথম অধ্যায়ে শঙ্করের জন্ম ও বালচরিত ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে শঙ্করের শিষ্যবর্গের অভ্যুদয় ; তৃতীয় অধ্যায়ে শঙ্করের কুমার চরিত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ ; চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা ; পঞ্চম অধ্যায়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত ও বিচার ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্করের অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিজদাসবাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নামরূপাদি সর্ব্ববিধ উপাধির অতীত, কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ।" এস্থলে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্' ইহাই সত্য তাঁহাতে জ্ঞাতৃত্ব অর্পণ করা যায় না (তৈঃ ভাঃ ২।১)। গীতাভাষ্যেও বলিয়াছেন—"অবিক্রিয় বিজ্ঞানস্বরূপে বিজ্ঞাতৃত্ব উপচার করা হইয়াছে—বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ (১৩।৩)।" আত্মার জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্বাদি সমুদয়ই উপচার বশতঃ—'কর্তৃত্বমুপচর্য্যতে আত্মনঃ (বৃঃ ভাঃ ৪।৩।২২), তেন কর্তৃত্বম্ উপচর্য্যতে ন স্বতঃ কর্তৃত্বম্ (৪।৩।১৭) ; তেন উপচর্য্যতে দ্রষ্টা ইত্যাদি (৩।৪।২)।

লেখক বলেন :—"বস্তুতঃ শঙ্করের উক্তির সহিত পঞ্চদশীর উক্তি-সকলের তুলনা করিলে, আমরা পঞ্চদশীর মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই বৈদান্তিক সংস্করণ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। যে অর্থে পঞ্চদশী মায়াবাদী, সেই অর্থে শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলিলে, শঙ্করের প্রতি অবিচার করা হইবে। এবং অবিচার যে করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই" (পৃঃ—১৯১)। দার্শনিক ক্ষেত্রে শঙ্কর মায়াশব্দ মুখ্য অর্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিচিত্র জগৎ-রচনা-কৌশল অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, শূন্যাত্মক ঐন্দ্রজালিক রচনা বা ভ্রমদর্শনাদি গৌণ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন না। তিনি নিজে তাঁহার মতকে মায়াবাদ নাম প্রদান করেন নাই। এমন কি মাধবাচার্য্যও শঙ্করের মতকে—'বিবর্ত্তবাদ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে মায়াবাদ বলিতে

হইলে, মায়াশব্দের অর্থ "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ঐশীশক্তি" বা পরাশক্তি করিতে হয়।" পৃঃ ১৯৯।২০০। অনেকে দ্বিজদাসবাবুর এ ব্যাখ্যাকেও প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

লেখক শঙ্করের সমুদয় মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই, দার্শনিক বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে তাঁহার সমুদয় মত গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক ইহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থে তিন অংশ। প্রথম অংশে (পৃঃ ১—১৩২) বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ; দ্বিতীয় অংশে (পৃঃ ১৩৩—১৩৮) সুফী অদ্বৈতবাদ; এবং তৃতীয়াংশে য়ুরোপীয় অদ্বৈতবাদ (পৃঃ ১৩৯—২০৬) আলোচিত হইয়াছে।

লেখকের মতে "জ্ঞানই আত্মার মূলস্বরূপ"—এবং এই মতের উপরই তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত। এবং এই মতের সাহায্যেই তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সময়ে যে-ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, যে-ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞাতৃরূপেই গ্রহণ করা হয়, সে ব্রহ্ম চিরদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না এবং এই প্রকার 'জ্ঞানসর্ব্বস্ব' ব্রহ্ম যে-দর্শনের ভিত্তি,—সে দর্শনও সুপ্রতিষ্ঠ নহে। বর্ত্তমান যুগের খ্যাতাপন্ন অধ্যাত্মবাদিগণও বুঝিতে পারিয়াছেন যে জ্ঞান সমুদয় অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেছে না; দর্শনের ভিত্তি এবং ব্রহ্ম—উভয়েরই প্রসার আবশ্যক। সুখের বিষয় সীতানাথ বাবুর দর্শনের ভিত্তি কেবল জ্ঞানমূলক হইলেও—তাঁহার দর্শন 'জ্ঞানসর্ব্বস্ব' নহে, সমগ্র আত্মাকেই তিনি দর্শনের বিষয় করিয়াছেন। তবে জ্ঞানমূলক দর্শন সমগ্র আত্মাকে নিজের বিষয়ীভূত করিতে পারে কি না তাহা বিচার্য্য। 'বিষয় অস্বতন্ত্র, জ্ঞানের আশ্রিত' —ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া সীতানাথ বাবু ঐতরেয় উপনিষৎ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং; প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—"এই সমুদয় প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; লোক 'প্রজ্ঞানেত্র'; প্রজ্ঞা সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা; প্রজ্ঞা ব্রহ্ম।" সীতানাথ বাবু বলিতে চাহেন সমস্ত জগৎ প্রজ্ঞার "বিষয়" সুতরাং জগৎ অস্বতন্ত্র। আমাদের মনে হয় বিষয়ীর সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, এখানে সে সম্বন্ধের কথা বলা হয় নাই। যে অর্থে বলা হয় 'সমস্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত' 'প্রাণে প্রতিষ্ঠিত,' 'আনন্দে প্রতিষ্ঠিত,' সেই অর্থেই এখানে বলা হইয়াছে সমস্ত প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এ অংশের সহিত প্রাচীন কিম্বা নবীন অধ্যাত্মবাদের (Idealismএর) কোন সম্বন্ধ নাই। আর বিজ্ঞানবাদ কখনও বলে না যে বিষয়ী বিষয়ের 'চালক'।

প্রশ্নোপনিষৎ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

হে সৌম্য। যেমন পক্ষিগণ বাসের জন্য বৃক্ষ আশ্রয় করে সেইরূপ এই সমস্তই পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। ৪।৭।

এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে "বিষয় অস্বতন্ত্র, জ্ঞানের আশ্রিত।" এই প্রমাণিত হয় যে "সমুদয়ই অস্বতন্ত্র এবং পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।"

উদ্ধৃত অপরাপর অংশও এই প্রকার।

সীতানাথবাবু বলিতে চাহেন শঙ্করাচার্য্য অধ্যাত্মবাদের বিরোধী নহেন কারণ তিনি বলিয়াছেন যে সমস্ত জগৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রিত। এ মত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে "জ্ঞান বস্তুতন্ত্র—পুরুষতন্ত্র নহে" (বেঃ ভাঃ ৩।২।২১)। এবং বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইয়াও যে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে এ বিষয়ে অনেক যুক্তি দিয়াছেন (২।২।২৮)। দ্বিতীয় কথা শঙ্কর পরব্রহ্মের 'জ্ঞাতৃত্ব'ই স্বীকার করেন না, সুতরাং এ জগৎ যে ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয় হইয়া আছে তাহা বলাই অসঙ্গত।

দ্বিজদাসবাবু এবং সীতানাথবাবু উভয়েই পুনর্জ্জন্মবাদের আলোচনা করিয়াছেন। সীতানাথবাবুর গ্রন্থে পুনর্জ্জন্মবাদ সমর্থিত হইয়াছে; দ্বিজদাসবাবু ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। সীতানাথবাবু বলেন "কোন-না-কোন আবরণ ব্যতীত জীব-ব্রহ্মের ভেদ অসম্ভব।" আমরা 'আবরণ'এর অর্থ বুঝি না। যাহাকে দেহ বলা হয় তাহাও আবরণ নহে, সমুদয়ই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অনুপ্রবিষ্ট। একস্থলে বলিয়াছেন—"কোন-না-কোন প্রকার শরীর, স্নায়বিক যন্ত্রের ন্যায় কোন-না-কোন জড়ীয় আশ্রয় একান্ত আবশ্যক।" অপর একস্থলে লিখিয়াছেন—"স্থূল শরীর না থাকিলেও কোন-না-কোন প্রকার সূক্ষ্মশরীর জীবাত্মার পক্ষে চিরকালই অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয় ... সসীম জ্ঞান বলিলেই কোন-না-কোন বেষ্টন বুঝায়—, সে বিষয় স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক।" অশরীরী আত্মা কি ভাবে কার্য্য করেন তাহা জানা সম্ভব না হইলেই কি কল্পনা করিতে হইবে ইহার পক্ষে একটা দেহ আবশ্যক। আর 'সসীম জ্ঞান' বলিলেই 'জড়ীয়' বেষ্টন বুঝাইবে ইহার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। জ্ঞান যদি 'গ্যাস'এর মত কোন জিনিষ হইত তাহা হইলে বোতলের মত একটা বেষ্টন বরং স্বীকার করা যাইত। আর সসীম জড়েরই কি সব সময়ে বেষ্টন থাকে?

'স্মৃতি নাই' সুতরাং পুনর্জ্জন্মবাদ গ্রহণ করা যায় না—দ্বিজদাসবাবু এই যুক্তি দিয়াছেন। সীতানাথবাবুর নিকট এ যুক্তির কোন মূল্য নাই, কারণ তিনি বলেন বাল্যকালের স্মৃতিও ত আমাদের নাই। এখানে আমাদের বক্তব্য এই—মানবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার যে একত্ব—ইহার প্রমাণ একমাত্র স্মৃতিই। বাল্যকালের স্মৃতি না থাকিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ঠিক পূর্ব্বে যে সময়—তাহার স্মৃতি ত আছে। এ স্মৃতিও যদি না থাকিত তবে আত্মার একত্বই থাকিত না। স্মৃতি নাই অথচ 'পূর্ব্বমুহূর্ত্তের আমি' এবং 'বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের আমি'—এই উভয় 'আমি' একই 'আমি,'—ইহা বলাই যায় না। আর ইহাদের একত্ব স্বীকার করিয়াও কোন লাভ নাই। এই দুই 'আমি'কে এক বলাও যাহা—'পূর্ব্বের আমি' বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং 'বর্ত্তমান আমি' নূতন সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলাও ঠিক তাহাই—উভয়ের ফল একই।

আর পুনর্জ্জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? ইহা দ্বারা বৈষম্য প্রমাণিত হয় না। বৈষম্যকে কর্ম্মফল বলিয়া মনে করা হয়। এখন প্রশ্ন এই:—আত্মার কি প্রথম জন্ম আছে? যদি বল আছে তাহা হইলে আবার সেই প্রশ্ন উঠিল—'ঐ জীবনের কর্ম্ম কাহার ফল'? আবার যদি বল প্রথম জন্ম নাই, আত্মার জন্ম অনন্ত—তাহা হইলে কোন মীমাংসাই হইল না। শেষে বলিতে হইল বৈষম্য অনন্তকালই আছে। প্রথম জন্ম স্বীকার করাও বিপদ আবার আবহমানকাল হইতে প্রত্যেকের জন্ম হইয়া আসিতেছে বলিলেও কিছু মীমাংসা হয় না। এ অবস্থায় পুনর্জ্জন্ম কল্পনা করা আবশ্যক।

বেদান্ত ব্যাখ্যা করিবার সময় সীতানাথবাবু সব সময়ে চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বেদান্ত সমর্থন করিবার দিকেই ইঁহার মনের গতি। ব্যাখ্যা দ্বারা বেদান্তের মতকে নিজের মতের অনুযায়ী করিয়া লইবার জন্য গ্রন্থকার অনেক স্থলে চেষ্টা করিয়াছেন।

সীতানাথবাবু বিশ্বাস করেন মুক্ত আত্মারও ব্যক্তিত্ব থাকে—ইহা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায় না, ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। উপনিষদে যে-সমুদয় স্থলে আত্মার লয় হইবার কথা আছে সে-সমুদয় অংশকেও গ্রন্থকার নিজের মতের অনুযায়ী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। উপনিষদে সব রকম মতই আছে। খাঁটি অদ্বৈতবাদও আছে, আবার দ্বৈতমূলক অদ্বৈতবাদও আছে। মুক্ত আত্মার একত্ববোধের কথা আছে, আবার একত্ববোধের অতীত অবস্থার কথাও আছে। এ সমুদয় বিভিন্নভাবের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। একটা ঐতিহাসিক সত্য আছে, এই ঐতিহাসিক সত্যকে চিরকালই বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাখ্যা করিবার সময় সব সময়ে এ কথাটা আমাদের মনে থাকে না। মতের একত্বে যত কল্যাণ, মতের বৈচিত্র্যে তদপেক্ষা কম কল্যাণ হয় না।

গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে সুফী অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।

তৃতীয়াংশের আলোচ্য বিষয় য়ুরোপীয় অদ্বৈতবাদ। ইহাও একটুকু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইলে ভাল হইত। তবে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও বেশ উপাদেয় হইয়াছে।

সীতানাথবাবুর সমুদয় মত ও যুক্তিপ্রণালী আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে তাঁহার গ্রন্থ গভীরচিন্তা-প্রসূত। এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে পাঠকগণ এই গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

পুরাতন প্রসঙ্গ—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, প্রণীত। মূল্য ৸৵৹ সিকা। এই পুস্তকের রচয়িতা, পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ মুখে বিবৃত কতকগুলি পূর্ব্বস্মৃতি সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থের অপ্রতুল নাই। Eckermann's Conversations of Goethe, Hazlitt's Conversations of Northcote, Coleridge's Table Talk, Roger's Table Talk, Boswell's Life of Johnson প্রভৃতি পুস্তকের আদর চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রাচীন ভারতেও আচার্য্যেরা অনেক স্থলেই শিষ্যদিগকে কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্য পরম্পরা সেই-সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে পরিণত করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় এ দেশের এই সনাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে এধরণের পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের যতদূর জানা আছে, বোধ হয়, শ্রীমঃকথিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” ছাড়া এরূপ প্রণালীর পুস্তক ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কখনও রচিত হয় নাই।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল একজন দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, নিরহঙ্কার, সত্যপরায়ণ ও প্রেক্ষাবান্ মনীষী একান্ত দুর্লভ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অধিকার, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তিনি যদি মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে অচিরাৎ উচ্চতম আসন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, প্রথম যৌবনে “বিচিত্রবীর্য্য” নামক একখানি বীররসাত্মক উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি তাঁহার উন্মেষোন্মুখী প্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে তদনুরূপ কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন এখন তাহা লুপ্তকল্প। আমাদের বেশ মনে পড়ে, বাল্যকালে “বিচিত্রবীর্য্য” পাঠ করিয়া আমরা উহার ওজস্বিনী ভাষায় এবং গ্রন্থের দেশহিতৈষী নায়ক বীর বিচিত্রবীর্য্যের অগ্নিময় উৎসাহ ও বীরত্বপূর্ণ উত্তেজনাবাক্যে যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গল্পটি এখন সব মনে নাই, কিন্তু একটি শব্দ এখনও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে—“কাপুরুষতা” (poltroonery)। আচার্য্য কৃষ্ণকমল “পল-বর্জ্জিনিয়া” নামক সুবিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস উক্ত ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া “অবোধ-বন্ধু” নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “জীবন-স্মৃতি” পাঠে জানা যায় যে, ঐ অনুবাদ তাঁহার কিশোর কল্পনাকে আকৃষ্ট ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল। সুকবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীও প্রিয় সুহৃৎ কৃষ্ণকমলের নিকট সাহিত্যানুশীলনে সামান্য সহায়তা লাভ করেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যের সহিত আচার্য্য কৃষ্ণকমলের সাক্ষাৎসম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয় বটে; কিন্তু তিনি যে দশবৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ছাত্রবর্গের মনে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি তিনি কিরূপ অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিষ্যত্বলাভ করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। রিপন কলেজেও তিনি বহুবৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এইরূপ গৌণ প্রভাবের পরিমাণ কে নির্ণয় করিতে পারে? যাঁহারা এখন আমাদের সমাজের নেতা এবং যাঁহারা বিবিধ বিধানে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শিষ্য বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন। জীবনের সায়াহ্নে শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ, পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় সাহিত্যচর্চ্চায় বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু এখনও তাঁহার ধীশক্তির ও মেধার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাই আমরা আজ গুপ্তমহাশয়ের গুরুভক্তি ও অধ্যবসায়গুণে এই বর্ষীয়ান্ মনীষীর পরিণত জ্ঞানের ও দূরদর্শনের ফলভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আলোচ্য পুস্তকখানি রচনা করিয়া গুপ্ত মহাশয় সমগ্র শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার রচনা সরস ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং তাঁহার বিশেষ গুণপনা এই যে, তিনি আচার্য্যের ভাব-নিচয় তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মতামতের বিস্তৃত উল্লেখ বা সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। এই গ্রন্থের ১০৯—১১৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ভাষার রীতি-বিশুদ্ধ রচনা সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠককে উহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে উক্ত কলেজে একজন-না-একজন বড়দরের খোট্টা পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন। ৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য যোগধ্যান নামক একজন খোট্টা পণ্ডিতের কাছে “লীলাবতী” পড়েন। তিনি প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য গঙ্গাজল কলসে ভরিয়া কাঁধে করিয়া আনিতেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন খোট্টাপণ্ডিত নাথুরামের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যে-সকল সংস্কার ও নিয়ম প্রবর্তিত করেন, আচার্য্য মহাশয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। যে-সকল মহাত্মারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান যুগের প্রথম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত, আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের মূল আদর্শ টেকচাঁদঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) কৃত "আলালের ঘরের দুলালের" তাদৃশ সমাদর করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সার তারকনাথ পালিত, দ্বারকানাথ মিত্র ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আচার্য্যমহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শেষোক্ত দুই মনস্বীর সহিত তাঁহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তদনুরূপ তাঁহাদের পরস্পরের সাহিত্য-সংলাপ শুনিব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হয় নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের বক্তা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার পেশাদারি থিয়েটারের পূর্ব্বতন থিয়েটারের যে কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন তাহা আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। বাল্যকালে প্রাগুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা" নামক একখানি হাস্যরসাত্মক নাটক পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তাহার একটি কবিতা এখনও স্মরণ হয়:—

"শ্রীপাট খড়দার ঘাটে, নিত্যানন্দ পাঁটা কাটে,
অদ্বৈত ধরেছে তার মুড়ি।
যত সব নেড়ানেড়ি, মুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি,
চৈতন্য দেখেন হুড়াহুড়ি॥"

উপসংহারে একটি ভ্রমের উল্লেখ করিব। "পুরাতন প্রসঙ্গের" ১৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত শকুন্তলা প্রকাশ করেন।" সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে মল্লিনাথ "অভিজ্ঞান-শকুন্তলের" কোনও টীকা করেন নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

সহজ ফটোগ্রাফী শিক্ষা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। ফটোগ্রাফী শিক্ষা আজকাল এতই সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য কতগুলি মোটামুটি উপদেশ লাভ করিয়াই, যে কেহ, অন্তত কোনরকমে কাজ চালাইবার মত ফটোগ্রাফার হইতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ অথবা এই শ্রেণীর শিক্ষাপুস্তকের দ্বারা বাস্তবিক শিক্ষার্থীর কোন উপকার হয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভাষাশৈথিল্যে গ্রন্থখানি অনেক স্থলেই বিশদ হয় নাই। বিষয়-নির্ব্বাচন ও মুখ্য গৌণ বিচারে লেখকের মাত্রাজ্ঞানের বিশেষ অভাব লক্ষিত হইল। লেন্স এক্স্পোজার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয় সামান্য দুচারি কথায় সারিয়া লেখক অনেক অবান্তর বিষয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন। পুস্তকে অনেক অযৌক্তিক মত ও ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

সু।

কানাডায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনা

উত্তর আমেরিকায় কানাডা নামে যে বৃটিশ উপনিবেশ আছে, তাহাতে এখন প্রায় ৫০০০ ভারতবাসী বাস করে। ইহারা প্রায় সকলেই পুরুষ, স্ত্রীলোক ২।৪ জন মাত্র আছে। চাষের কাজ ও অন্যান্য প্রকার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইহারা ১৯০৫-০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কানাডায় যাইতে আরম্ভ করে। ১৯০৭এর পর হইতে নানা কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে কানাডাবাসীর বিদ্বেষ ভাব প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, এই বিদ্বেষ ভাব তাহাদের কোন দোষের জন্য নহে। কারণ, তাহারা পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র, প্রভুভক্ত, বাধ্য এবং পানদোষাদিশূন্য। অধিকন্তু, তাহারা জাপানী ও চীনা কুলিদের মত অল্প পয়সায় কাজ করে না, কানাডার শ্বেতকায় কুলিদের সমান মজুরীতেই তাহারা কাজ করে। সুতরাং এ কথা বলিবার যো নাই যে তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়া শ্বেতকায় মজুরদের বেতন কমাইয়া দিতেছে। সম্পন্ন কৃষক ও অন্যান্য যাহাদের মজুরের দরকার, তাহারা এই ভারতবাসী শ্রমজীবীদিগকেই পছন্দ করে। তাহারা যে সকলেই মজুর, তাহা নহে। অনেকেরই নিজের জমী জায়গা আছে, অনেকে জমী কেনা বেচার ব্যবসা করিয়া ৮।১০ হাজার করিয়া টাকা জমাইয়াছে। এক জনের কারবারের মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

ইহাদের অধিকাংশই শিখ। কানাডার গবর্ণমেণ্ট কৌশল করিয়া এখন আর কোন ভারতবাসীকে তথায় যাইতে দিতেছেন না। তাহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে এই ৫০০০ হাজার পুরুষকে হয় স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইবে, নয় কানাডায় থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে হইবে;—তাহাদের বংশবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের তথায় যাইবার কোনই উপায় নাই।

যে কৌশলে ভারতবাসীর কানাডা যাওয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই:—

কোনও যাত্রী যদি তাহার নিজের দেশ হইতে ক্রমাগত একই জাহাজে এক টিকিটে কানাডায় না

নারায়ণসিং, নন্দসিং সিহু, বলবন্ত সিং।

আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিতে দেওয়া হইবে না।

ভারতবর্ষ হইতে একায়েক কানাডা পর্য্যন্ত কোন জাহাজ যাতায়াত করে না। ভারতবর্ষ হইতে কানাডা যাইতে হইলে চীন দেশের হংকং দিয়া বা অন্য পথে যাইতে হয়। সুতরাং এই কৌশল দ্বারা ভারতবাসীদিগের কানাডা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

প্রতি বৎসর চারি শতের অনধিক জাপানী কানাডা যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৫০ টাকা থাকিলেই হইল। এই দুটি নিয়ম পালন করিয়া যে-কোন জাপানী কানাডা যাইতে পারে, সেখানে নিজ পরিবার লইয়া যাইতে পারে, বা তথায় বিবাহ করিতে পারে। এই সব জাপানীদের কানাডাবাসীদের মত সমুদয় রাজনৈতিক অধিকার জন্মে।

চীনারাও মাথাপিছু ১৫০০ টাকা দিলেই কানাডা যাইতে পারে। তাহারা প্রত্যেকে ইচ্ছা করিলে এক বা একাধিক পত্নী আনিতে পারে। জাপানীদের মত ইহাদেরও রাজনৈতিক অধিকার জন্মে।

কিন্তু ভারতবাসীরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হইলেও তাহাদের কানাডা যাইবার জো নাই। ভারতবাসীদের প্রতি এরূপ অনুগ্রহের একটি কারণ নিউ ইয়র্কের লিটারেরী ডাইজেষ্ট নামক কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ হণ্ডুরাস্ আমেরিকার একটি বৃটিশ উপনিবেশ। তথাকার গবর্ণর সার এরিক্ জন্ ঈগল্‌স্ সোয়েন এক সময়ে ভারতবর্ষে সেনানায়কের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "কানাডায় ভারতবাসীরা স্বাধীন হইতে শিখে, জাতিভেদ রূপ সামাজিক প্রথাকে অবজ্ঞা করিতে শিখে। সুতরাং তাহারা যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া যায়, তখন তাহারা অসামঞ্জস্য ও অমিলনের হেতু হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাদের মনোমালিন্য জন্মায়, এবং এই প্রকারে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কার উদ্রেক করে।"

হাকিম সিংহের পরিবার; কানাডায় যাইবার টিকিটের জন্য দুবৎসর বৃথা হংকঙে অপেক্ষা করিতেছেন।

হাকিম সিং (উপবিষ্ট) ও তাঁহার ভ্রাতা জীবনসিং (দণ্ডায়মান)।

সুতরাং ভারতের নিমকখোর এই গবর্ণর মহাশয়ের মত এই যে ভারতবাসী কোথাও একটু মাথা উঁচু করিয়া বাস করিবার সুযোগ পাইলেই ভারত গবর্ণমেণ্টের বিপদ। অতএব ভারতবাসীদিগকে চির পরাধীন ভাবে ভারতবর্ষে বদ্ধ করিয়া রাখাই ভাল।

যাহা হউক, ইহা হইতে দুটি বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটা উচিত। (১) আমরা যত অধিক সংখ্যায় স্বাধীন দেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত হই, ততই মঙ্গল; সুতরাং আমাদের বিদেশ যাত্রার অধিকার যাহাতে লুপ্ত না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। (২) জাতিভেদ আমাদের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের একটি অন্তরায়; যদি কোন ইংরাজ এই প্রথার প্রশংসা বা সমর্থন করে, তবে তাহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্যে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাডা গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, স্থির করেন যে কানাডাপ্রবাসী সমুদয় ভারতীয়কে বৃটিশ হণ্ডুরাস্ নামক অনুর্ব্বর, জলশূন্য, আরণ্য প্রদেশে চালান করিয়া দেওয়া হউক। কানাডায় ভারতবাসীরা গড়ে জনপ্রতি মাসিক ১৮০৲ রোজগার করে। কানাডা গবর্ণমেণ্ট হণ্ডুরাসে তাহাদিগকে মাসিক নগদ ২৪ টাকা এবং আন্দাজ ১১৲ টাকার আটা, চাল, ডাল আদি সিধা দিতে অঙ্গীকার করেন। অধিকন্তু তাহাদিগকে কানাডার স্বাধীন মজুরীর পরিবর্ত্তে তথায় চুক্তিবদ্ধ কুলির মত কাজ করিতে হইত। কানাডা গবর্ণমেণ্টের কি দয়া, কি ন্যায়-পরতা! আর আমাদের গবর্ণমেণ্টই বা কেমন করিয়া এরূপ প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন, তাহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়গণ এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় তাহারা এখনও তথায় স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ অবিচার হইতেছে, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হীরা সিং কানাডার ভ্যাঙ্কুবর সহরে প্রায় ৪ বৎসর

ভাগ সিং এবং তাঁহার পরিবার।

বাস করিয়া তাহার পর স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য দেশে আসেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই মণ্টিগল্ নামক জাহাজে ভ্যাঙ্কুবর পৌছেন। তিনি পূর্ব্বে কানাডার অধিবাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে জাহাজ হইতে ডাঙ্গায় নামিতে দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষে চালান করিবার চেষ্টা করা হয়। হীরা সিং ভারতবর্ষে ইংরাজ পল্টনে থাকিয়া ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন;—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রাজভক্তির বেশ পুরস্কার যা হোক্। তিন হাজার টাকার নগদ জামিন দিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া তিনি আদালতে দরখাস্ত করিলেন। মোকদ্দমার ফল এই হইল যে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে আদালত "দয়া করিয়া" তাঁহার নিকট থাকিতে দিলেন!

ভাগ সিং ও বলবন্ত সিং দুজনেই ইংরাজ পল্টনে সিপাহী ছিলেন। দুজনে ৩ বৎসরের উপর ভ্যাঙ্কুবরে থাকিয়া স্ব স্ব স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আনিবার জন্য দেশে যান। কলিকাতার জাহাজ-কোম্পানীরা তাঁহাদিগকে একায়েক কানাডা যাইবার টিকিট বিক্রী করিতে অসম্মত হয়। তিন মাস ধরিয়া কলিকাতায় টিকিট কিনিবার বিফল চেষ্টা করিয়া তাঁহারা শেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন গবর্ণমেণ্ট বলেন, "অবশ্য তোমরা যাইতে পার;—কেবল কানাডার আই মানিলেই হইবে।" কিন্তু সেটা যে অসম্ভব! তার পর তাঁহারা হংকঙ্গে আসিয়া তথা হইতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যস্থিত সান্ ফ্রান্সিস্কো সহরে জাহাজ হইতে নামিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তথাকার যাত্রী-কর্ম্মচারীরা বলে, "তোমরা বৃটিশ প্রজা, বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত কানাডায় তোমাদিগকে নামিতে দেয় না, আমরা কেন তোমাদিগকে আমাদের দেশে নামিতে দিব?" অতএব তাঁহাদিগকে আবার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া হংকং ফিরিয়া আসিতে হইল। সেখানে তিন মাস থাকিয়া তাঁহারা আবার কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া ১৯১২ সালের ২২শে জানুয়ারী ভ্যাঙ্কুবর পৌছিলেন। তাঁহারা দুজনেই পূর্ব্বে ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইল, কিন্তু তাঁহাদের পরিবারবর্গকে নামিতে দেওয়া হইল না। তখন ভাগ সিং ও বলবন্ত সিং ৬০০০্ টাকার নগদ জামিন দিয়া কানাডা গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিলেন। মোকদ্দমায় বিস্তর টাকা খরচ হইল। তাহার পর "দয়া করিয়া" কানাডা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরিবারবর্গকে তাঁহাদের নিকট থাকিতে অনুমতি দিলেন!

এইরূপ দুই এক স্থলে মাত্র কানাডাগবর্ণমেণ্ট "দয়া" করিয়া ভারতবাসীর স্ত্রীপরিবারকে কানাডা প্রবেশ করিতে দিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহারা কানাডা যাইতে পারিতেছে না।

হাকিম সিং ঊনবিংশ বেঙ্গল ল্যান্সার্স্ অশ্বারোহী সৈন্যদলে ছিলেন। তিনি কানাডায় অনেক টাকা জমাইয়া পরিবারবর্গকে আনিতে দেশে যান। কিন্তু তাহার পরিবার এই দুই বৎসর হংকঙ্গে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু টিকিট পাইতেছেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন অনুরক্ত সিপাহীর প্রতি ইহা বড়ই অবিচার।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

কয়েকমাস হইল, নারায়ণ সিং, নন্দ সিং সিহঃ এবং বলবন্ত সিং কানাডাপ্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা স্বদেশবাসীর গোচর করিতেছেন। তাঁহারা পথে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষকে বক্তব্য জানাইয়া আসিয়াছেন।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের

জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।]

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈঠকখানায় বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইনিই আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়,—যাঁর কথা তোমাকে বল্‌ছিলাম।"

সতীশচন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইনি আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে পুরুলিয়া জেলার কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় সতীশবাবুর পরিচয় শুনিয়া আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজীবনের নিবাস কোথায়?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "বালী,—উত্তরপাড়া।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বালী উত্তরপাড়া! ওঃ, উত্তরপাড়ার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় যে আমার ভগ্নীপতি ছিলেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "বটে? কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় আমাদের দূর জ্ঞাতি। তাঁকে আমরা ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। তাঁর তো অনেক দিন স্বর্গলাভ হয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "হাঁ, প্রায় পঁচিশবৎসর হ'ল, তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমার বিধবা ভগ্নীটি এখনও জীবিত আছেন। তাঁর কোনও সন্তানাদি নাই। আপনার পিতার নাম?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "৺ কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "হাঁ, তাঁর নাম শুনেছি, বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল না। আমি পেটের জ্বালায় এই দূরদেশে প'ড়ে আছি, বাবা। ভগ্নীটি বিধবা হওয়ার পর থেকে আর আপনাদের দেশে যাওয়া আসা নাই। এই কুস্থানেই প'ড়ে আছি। যা হো'ক্, আজ বাবাজীবনকে এখানে দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। বাবাজীবন কোথায় বিবাহ করেছেন?"

সতীশচন্দ্র একটু মুস্কিলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আমি বিবাহ করি নাই।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বিবাহ করেন নাই? সে কি কথা? আপনি কুলীন সন্তান—আপনার আবার বিবাহের অন্তরায়? বিবাহ না কর্‌বার কারণ কি?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কারণ বিশেষ কিছুই নাই। বাল্যকালে পিতৃহীন হই; তার পর কলেজে লেখা পড়া শিখ্‌ছিলাম; তারপর জননীদেবীরও অভাব হ'ল। এই সব কারণে বিবাহ করি নাই।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "সে কি কথা? সংসারে থাক্‌তে গেলে, গার্হস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার আর সহোদর-সহোদরা কয়টি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "একটীও নাই; আমিই পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন "বটে? তবে তো আপনার বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই তো আপনার অল্প বয়স। আপনি বিবাহ না কর্‌লে আপনার বংশলোপ হবে যে! আপনার মত যোগ্যপাত্রে কন্যাদান কর্‌তে কত শত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রস্তুত আছেন। আহা, কত স্থানে কত কুলীন কন্যা অনূঢ়া রয়েছে! আপনি অবশ্যই বিবাহ কর্‌বেন। অন্যমত কর্‌বেন না।"

সতীশচন্দ্র তাঁহার কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। সেই সময়ে কেহ সতীশচন্দ্রের অন্তর-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাইত, তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত বহুকালের প্রেমের বাঁধটি সহসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং বন্যার জলে সমস্তই হাবুডুবু খাইতেছে।

সতীশচন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় ক্ষেত্র-

নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, নগিন আমাদের বাড়ী গিয়ে আমায় বল্‌লে যে, আপনার বাড়ীতে আপনার একটী বন্ধু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ এসেছেন। তাই না শুনে, আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে আস্‌ছি। এসে দেখি, বাবাজীবন আমাদেরই নিকট কুটুম্ব! আহা, আমার কি পরম সৌভাগ্য! আজ আমার কি সুপ্রভাত!" তার পর সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবাজীবন আমি তোমার সমুচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা কর্‌তে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি অতিশয় দরিদ্র। তবে পরিচয়ে জান্‌লাম, তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে। তোমাকে শাকান্ন খাওয়াতে আমার কোনও সঙ্কোচ নাই। এখানে যে কয়দিন থাক, আমার বাড়ীতেই শাকান্ন ভোজন কর্‌তে হবে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আপনি কি বল্‌ছেন? আপনার বাড়ীর শাকান্ন আমার পক্ষে রাজভোগের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তবে এখানে আমার কোনও অসুবিধা নাই। সঙ্গে পাচক-ব্রাহ্মণ আছে। ক্ষেত্রবাবু আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। ক্ষেত্রবাবুর যত্নের কোনও ত্রুটি নাই। তবে একদিন আপনার বাড়ীতে আমি যাব ও খেয়ে আস্‌ব। আপনি তজ্জন্য ব্যস্ত হবেন না। যদি পারি, আগামী কল্য আপনার বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন কর্‌ব।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় আহ্লাদে গদ্গদবিভোর-কণ্ঠ হইয়া বলিলেন "বাবাজীবন, এ তোমার যথেষ্ট ঔদার্য্যের পরিচয়। তোমাকে আমার বাড়ীর আতিথ্যগ্রহণ করাতে পারি, এ দুরাশা আমি করি না। তোমার সহৃদয়তা দেখে আমি বড় আনন্দিত হলাম। আগামী কল্য মধ্যাহ্নে বাবাজীবন অতি অবশ্য আমার বাড়ী আস্‌বে। আর, ক্ষেত্রবাবু, আপনিও আপনার ছেলেদের সহিত আমাদের বাড়ী এসে মধ্যাহ্নভোজন কর্‌বেন। আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পারি নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার বাড়ী প্রসাদ পাব সে তো সৌভাগ্যের কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—কাল মধ্যাহ্নে আমি সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ী যাব।"

সেই সময়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে সুরেন্দ্র বলিল "ভট্টাচার্য্য মশাই, মা একবার আপনাকে বাড়ীতে ডাকছেন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় অন্তঃপুরে গমন করিলে, ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "সতীশ, এখন কি বল্‌ছ ভায়া? আমি ঘট্‌কালী কর্‌তে জানি কি না, তা দেখ্‌লে? আমি গোড়া থেকেই বুঝেছি, "সচল স্থলপদ্মটি" এবার আমাদের গ্রাম থেকে উৎপাটিত হবে।"

সতীশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন "আরে, চুপ্ কর, চুপ্ কর। তোমার যে একটুও সবুর নাই। তোমার কাছে আমার এখন বসা হচ্ছে না। আমি ঐ মাঠের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র আপনার বিশৃঙ্খল মনোরাজ্যের শৃঙ্খলা সাধনের জন্য এবং আপনার মনের সহিত ভালরূপে বুঝাপড়া করিবার জন্য একাকী নিভৃত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র মাঠ পার হইয়া নন্দাজোড়ের ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা, আর তাঁহার মনেরও কোনও সন্ধান নাই; হয়ত, প্রেমবন্যার সম্মুখে পড়িয়া সে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! যখন মনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন বুঝাপড়া আর কাহার সঙ্গে হইবে? সতীশচন্দ্র তখন সে আশা ত্যাগ করিয়া প্রেমবন্যার রঙ্গভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, বর্ষাসমাগমে উভয়কূলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের মত প্রেমবন্যা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্থল প্লাবিত করিয়াছে! চারিদিকে কেবল কলকল, ছলছল শব্দ! কোথাও জল উছলিয়া পড়িতেছে; কোথাও ঘূর্ণাবর্ত্তসমূহে জলরাশি প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হইতেছে; কোথাও উল্লাসময় তরঙ্গের পশ্চাতে উল্লাসময় তরঙ্গ ছুটিতেছে; আর কোনও তরঙ্গাভিঘাতে কূল খসিয়া পড়িতেছে! বন্যার যেমন বেগ, তেমনই উল্লাস; যেমন কল্লোল, তেমনই প্রচণ্ডতা।

জলরাশি হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, কলকল শব্দে যেন চারিদিকেই ছুটিতেছে।

'হৃদয়ের এইরূপ অবস্থায় মনের উপর আধিপত্য থাকে না, এবং কোনও বিষয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তাও করা যায় না। সতীশচন্দ্র উদ্দেশ্যহীন পাদক্ষেপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কি করিতেছেন, বা কি দেখিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কখনও একটী বৃক্ষতলে বসিলেন; কখনও দ্রুতপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কখনও মন্থরগমনে চলিতে লাগিলেন; কখনও স্থিরভাবে কোথাও দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে, সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি ধীর পদক্ষেপে কাছারীবাটীতে উপনীত হইলেন। সেখানে উপনীত হইয়া অবগত হইলেন, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছেন। তিনি সেখানে কি উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

আবেগের পর অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে সতীশচন্দ্র অবসন্নমনে ও ক্লান্তদেহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন "সতীশ, আমি ভট্টাচার্য্যমশাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম; তোমার পরিচয় অবগত হ'য়ে অবধি, তাঁর মনে একটী দুরাশার উদয় হয়েছে। অনূঢ়া কন্যাদের পিতা মাত্রেরই মনে এইরূপ দুরাশার উদয় হয়, তা'তে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। ভট্টাচার্য্যমশাইয়ের ইচ্ছা, তিনি তোমার হাতে সৌদামিনীকে অর্পণ করেন, এবিষয়ে তোমার মত কি?"

কোথা হইতে সতীশচন্দ্রের মনটি সহসা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে এক ধাক্কা দিয়া তাঁহাকে চুপি চুপি বলিতে লাগিল "সতীশবাবু, চমৎকার প্রস্তাব! সুন্দরী সৌদামিনী—মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী, লক্ষ রমণীর শিরোমণি সৌদামিনী—তোমার হ'বে। আর কি চাও? সৌদামিনী তোমার হৃদয়ের অভাব পূর্ণ কর্‌বে; তার নিশ্বাসে সৌরভ ছুটবে; তার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হবে; তার মধুর হাস্যে তোমার গৃহ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠবে; তার সৌন্দর্য্যে তোমার গৃহ আলোকিত হবে। এই প্রস্তাবে এখনই সম্মত হও। এমন মাহেন্দ্রযোগ ত্যাগ ক'রো না।" সতীশচন্দ্র মনকে বলিলেন "আমি ইহজীবনে বিয়ে করব না বলেছিলাম, তার কি?" মন বলিল "ওরূপ কথা কেন বলেছিলে, তা তুমিই জান। আমার তো কিছু জান্‌তে বাকী নাই! বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছাটি তো বরাবরই ছিল; কেবল ভাল মেয়ে পাও নাই ব'লেই বিয়ে কর নাই। এখন তো পেয়েছ? তবে আর ইতস্ততঃ করা কেন? ঝাঁ ক'রে মত দিয়ে ফেল।"

সতীশচন্দ্রকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কি সতীশ, আমার কথা শুনে তুমি যে চুপ্‌ ক'রে রইলে?"

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নে সতীশের যেন চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন "চুপ্‌ না ক'রে থেকে আর কি কর্‌ছি, বল? আমি বিষম সমস্যায় পড়েছি। কিছু স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "সমস্যা আর কি? ভাল মেয়ে পাও নাই ব'লে তুমি এতদিন বিয়ে কর নাই। এখন সৌদামিনীকে তুমি যদি পছন্দ করে থাক, তাহ'লে বিয়ে কর্‌তে বাধা কি? আর তাকে পছন্দ না কর্‌বারই বা কারণ কি? রূপে গুণে, স্বভাব চরিত্রে, শিক্ষা দীক্ষায়, কুলে মানে তুমি যেমন মেয়েটি চাও, সৌদামিনী ঠিক্‌ তেমনিটি।...... ভট্টাচার্য্য মশাই বল্‌ছিলেন, তোমার যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে—(আমি সে কথাটা তাঁকে প্রকারান্তরে বলেছি), তখন অন্য কোনও আপত্তি না থাকলে এই যাত্রায় তুমি মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও। কাল বেশ ভাল দিন আছে। আর কাল যখন তোমার মধ্যাহ্নভোজনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে, তখন তুমি আশীর্ব্বাদের ব্যাপারটি সেরে গেলেই ভাল হয়।"

সতীশচন্দ্রের মন তাঁহার বুকে আর এক ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল "বাঃ বেশ কথা। শুভস্য শীঘ্রম্‌। সতীশ বাবু তুমি এ প্রস্তাবে অমত ক'রো না; এমন স্ত্রী

পাবে না। এমন অযাচিত দান ত্যাগ ক'রো না। যখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে, তখন আর দেরী করা কেন? আশীর্ব্বাদ,—বিবাহ সব শীঘ্র সেরে ফেল!" সতীশ মনকে ধমক দিয়া বলিলেন "তুমি তো বড় উতলা হ'য়ে পড়েছ, দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার যে একটুও সবুর নাই! তোমার যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কি কাজ হওয়া চাই! আমি কিন্তু তা কর্‌তে পারি না। আমি বিয়ে কর্‌ব না ব'লে জীবনের যে একটী পথ নির্দ্দিষ্ট করেছিলাম, সে পথটি হঠাৎ ছেড়ে দেব নাকি? আমি যদি বিবাহ না করি, তো কি হয়? এতদিন যে আমি বিবাহ করি নাই, তাতে আমি অমানুষ হ'য়ে গেছি নাকি? আমি যে-পথে যাব, সে পথে কি তুমি যাবে না?" মন আবার অবরুদ্ধ হইবার ভয়ে বলিল "যাব না কেন? আমায় যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাব। কোন্‌দিন আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি! কিন্তু একটা কথা বলি, রাগ ক'রো না। তুমি যদি তোমার নির্দ্দিষ্ট পথেই যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলে, তাহ'লে সৌদামিনী যে অনূঢ়া কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা এই কথাটি কেবল অনুমান ক'রেই তুমি একটু চঞ্চল হ'লে কেন? তাকে 'সচল স্থলপদ্ম' বলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে এত রসিকতা কর্‌লে কেন? তার পর যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুন্‌লে যে, তাঁরা তোমাদেরই পাল্টি ঘর, তখন আমার ঘরের কপাট একেবারে খুলে দিলে কেন? আমি তোমার ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লাম। বুঝ্‌তে পেরেই আমি বন্ধনমুক্ত হ'য়ে একেবারে সৌদামিনীর কাছে হাজির! তুমি নন্দার ধারে ধারে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে, আমায় খুঁজে বেড়ালে পাবে কোথায়? তুমি যাই বল, আমি তোমার হৃদয়ের ভাব জানি। তুমি যা চাও, আমি তাই খুঁজে পেয়েছি। আমায় তুমি আর আটক্ করে রাখ্‌তে পারবে না। আমি সৌদামিনীর কাছেই থাক্‌ব। তা যদি থাকি, তাহ'লে তুমি কাজ কর্ম্ম কর্‌বে কিরূপে? সেই জন্য বল্‌ছি, কূট তর্ক ছেড়ে দিয়ে, নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌বার বৃথা লোক-দেখানী প্রতিজ্ঞাটি ত্যাগ ক'রে সৌদামিনীকে আপনার কাছে নিয়ে এস; তাকে বিয়ে কর; আর বিয়ে কর্‌বার সূচনা স্বরূপ কাল তাকে আশীর্ব্বাদ করে ফেল। তাহ'লে তুমিও নিশ্চিন্ত; আমিও নিশ্চিন্ত। সকলে মিলে মিশে বেশ সুখে ও শান্তিতে কাল কাটান যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি সতীশ? অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌ছ আর মাঝে মাঝে একটু একটু হাস্‌ছ যে? আমার কথার তো কোনও উত্তর দিলে না? কাল আশীর্ব্বাদ করা সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আমার আর মত কি? আমি আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌ব না। সে কাজটা তুমিই সেরে ফেল।"

ক্ষেত্রনাথ দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন "আরে ছি, ছি, তুমি বল্‌ছ কি? তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণ, আর আমরা হলাম বৈশ্য! তুমি পাগল হ'লে না কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "পাগলই হয়েছি। যখন মনের উপর কোনও আধিপত্য রাখ্‌তে পার্‌ছি না, তখন পাগল হ'তে আর বাকী কি?" পরে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "মাহেন্দ্র ক্ষণেই আমি তোমাদের বল্লভপুরে পদার্পণ করেছিলাম, দেখ্‌তে পাচ্ছি। পূজোর ছুটিটা কোথায় এই অরণ্যের মধ্যে শান্তিতে কাটাব মনে করেছিলাম, না, এখানে আস্‌তে না-আস্‌তেই এক মস্ত ফ্যাসাদ! তোমার সত্ঠাকুরুণটি বুঝি স্থলপদ্ম-বনে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার আর সময় পেলেন না! এর আগে কত স্থানে কত সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়েছে; কিন্তু কখনও তো চোখ তুলে তাদের দেখ্‌বার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ কি সংযোগ? ভাগ্যবিধাতার একি লীলা? যে মন সহজে কখনও চঞ্চল হয় নাই, যাকে আজীবন কঠোর শাসনে দমন ক'রে রেখেছিলাম, সে আমাকে একটু অসাবধান ও অতর্কিত দেখে একেবারে মনের কপাট ভেঙ্গে অদৃশ্য! এমন মনকে আর বিশ্বাস করা যায় কিরূপে? এতদিনের সংযম, এতদিনের অভ্যাস —সব এক মুহূর্ত্তে বিফল হ'য়ে গেল? হতভাগ্য মন এখানে আমাকে একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আমাকে ত্যাগ ক'রে পরের গোলাম হ'য়ে গেছে! এমন বিশ্বাসঘাতক,—এমন নেমক্‌হারাম —আর দেখেছ কি?"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া তাহার মানসিক অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "দেখ, এখন আর আপশোষ করা বৃথা। মন যদি সদ্‌-ঠাকুরুণের গোলাম হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার পরামর্শ হ'চ্ছে যে, তাকে তাব কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে আবার ফাটকে আটক্ কর। তা হ'লেই তার সমুচিত দণ্ড হ'বে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "চমৎকার পরমর্শ দিয়েছ! আমি সে চেষ্টা কম করেছি নাকি? বরং ব্যাঘ্রীর মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে লওয়া সহজ, কিন্তু তোমাদের সদ্‌ঠাকরুণের কাছ থেকে আমার মনটিকে ছিনিয়ে লওয়া সহজ নয়। আমি আর ছেনাছিনি কর্‌তে পার্‌ব না, তা'তে মন আমার বশে থাক্ আর নাই থাক্। মনের উপর আধিপত্যের আশা আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "চল, চল, সায়ংসন্ধ্যা ক'রে এখন কিছু জলযোগ কর্‌বে চল।"

সতীশচন্দ্র আপনার উপর যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন "জলযোগ তো হ'বে। কিন্তু, ক্ষেত্তর, আমি এমন একটা কাট্-খোট্টা, নীরস আর শুষ্ক লোক! আমি কাজের কথা ভিন্ন কখনও অন্য কথা কই না, আর আমার মেজাজটাও কিছু কুড়া। সেই আমি কিনা একটী দিন তোমার এখানে এসে একেবারে বেহাল হ'য়ে পড়্‌লাম! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে? না, না, না, না, তোমার এখানে আমার আর থাকা হ'বে না। আমি কালই চ'লে যাব।" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য স্নানাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

ইউরোপে বাঙ্গালী পালোয়ান

বাঙ্গালী পালোয়ান শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ গোবর বাবু বলিয়া পরিচিত। তিনি কয়েক মাস হইল ইংলণ্ড গিয়াছেন। গত ৩১শে মে তারিখের হেল্‌থ্ এণ্ড ষ্ট্রেংথ্* নামক লণ্ডনের কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধটির নাম "ভারতবর্ষের বালক পালোয়ান গোবর, ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ ওজনের একটি কলার পরে।" † প্রবন্ধটির তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি। সম্পাদক লিখিতেছেন—

হ্যাম্পষ্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটি বাগানে আমি গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটা মাদুর বিছান; তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় ভারতবাসী প্রায় তারই মত প্রকাণ্ড ইংরাজ কুস্তিগীর ফিল্ লেনের সঙ্গে কুস্তি লড়্‌ছিল। ফিল খুবই হাঁপাচ্ছিল, গোবরকে বেদম করতে খুব চেষ্টা করছিল; কিন্তু গোবর কোন ক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

গোবর সবে কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে; কিন্তু কি ভীষণ যুবা! দৈত্যের মত তাহার দেহ! সে একটা প্রকাণ্ড বালকের মত; চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা তার কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা, কেননা সে এমন বলবান, এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

গোবর আমাদের খুব ভারী ভারী ওজনদার কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়তে এসেছে। সম্ভবতঃ অজেয় জিমি এসন্ ("The unconquerable Jimmy Esson") তার সঙ্গে লড়বে। কিন্তু গোবরের সকলের চেয়ে বড় সখ গচের সঙ্গে লড়া—সেই গচ্ (Gotch) যাকে এখনও পৃথিবীর কোন কুস্তিগীর ফেলতে পারে নাই।

গোবর যে ভাল পালোয়ান তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কারণ তারা পালোয়ানের গোষ্ঠী। ১৮৯২ সালে কলিকাতায় তার জন্ম হয়। তার জেঠা মহাশয় খুব বড় পালোয়ান ছিলেন এবং ঠাকুরদাদা তাঁর চেয়েও বড় কুস্তিগীর ছিলেন। সে ভারতের অনেক বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়েছে, কিন্তু কেউ তাকে হারাতে পারে নাই। কেউ পারবে কিনা সন্দেহ। গামার নাম শুনেছ ত? সেই গামা গোবরকে শিক্ষা দিত, কিন্তু তাকে কখনও ফেল্‌তে পারে নাই। গোলামের ভাই যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিস্ নগরে দিগ্বিজয়ী হয়েছিল, তার সঙ্গেও গোবর লড়েছে।

যে বাড়ীতে আমি গোবরকে আবিষ্কার কর্‌লাম তাতে অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্র থাকে। গোবর বেশ সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। ঐ ছাত্রাবাসে কোন চাকরাণী থাকে না। সুতরাং গোবর দেশের মত খোলা গায়ে কুস্তি করে।

সে বিলাতী খাদ্য ছোঁয়না। সব তার চাকররা রেঁধে দেয়। খুব পক্ষীমাংস ও মাখন সে খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি এক রকম উপাদেয় জিনিস তার ভারি প্রিয়। সে মদ স্পর্শও করে না; সিগারেট্ মাসে হয় ত এক আধ বার একটা টানে।

তার দু জোড়া মুগুর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন ২৫ সের; আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের। আমি তাকে দ্বিতীয় জোড়াটা ভাঁজতে দেখলাম।

সে বল্‌লে যে শরীরের সকল অঙ্গ চালনার জন্য যখন সে কুস্তিগীরদের সঙ্গে আপোসে লড়ে, তখন কেহই তার ঘাড়টা ভাল করে ধরতে পারে না বলে, ঘাড়টার যথেষ্ট ব্যায়াম হয় না। সেই জন্য

* "*Health and Strength*, the National Organ of Physical Fitness."

† "Gobar the 18 stone Boy Wrestler from India, who wears a collar 160 lbs. in weight."

সে একটা দু মণ ওজনের পাথরের হাঁসুলির মত পরে। এই (Collar) কলার টা ফ্যাশানেবল্ হবে না, তা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি। এই হাঁসুলিটা পরে, সে এই একটুখানি ব্যায়ামের জন্য বাড়ীর সিঁড়িতে ওঠানামা করে। আমি দেখ্‌লাম তাকে এই ভাবে এক তলা দু তলা উঠা নামা করতে। ঐ দ্রব্যটি পরে বেশী মাইল দৌড়াবার সখ আমার হবে না নিশ্চয়।

তাদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে একটি খুব ভারী পাথর আছে। তার উপরে মাঝখানে হাতল স্বরূপ একটা লোহার ডাণ্ডা লাগান আছে, গোবর ছাড়া কেউ আর সেটাকে নড়াতে পারলে না। কিন্তু গোবর চিৎ হয়ে শুয়ে সেটাকে লোহার হাতলটা দিয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে আন্‌লে এবং তারপর সোজা নিজের শরীরের উপর তুল্‌লে।

এটা রাষ্ট্র হয়েই গেছে যে গোবর ক্রষ্টাল্ প্যালেসে এংলোজর্ম্মান প্রদর্শনীতে লড়বে। যদি লড়ে, তাহলে তোমরা দেখ্‌তে যেতে ভুলো না। এই ভারতীয় হার্‌কিউলিসের চেহারাখানা দেখ্‌বার জন্যই যাওয়া সার্থক হবে। তার বিশাল শক্তি সত্ত্বেও তার মাংস-পেশী বেশ নরম এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে খুব সহজেই যে ভাবে যে দিকে ইচ্ছা চালাতে পারে।

গোবরের দৈর্ঘ্য ৬ফুট ২ইঞ্চি, ছাতির বেড় ৪৮ হইতে ৫০ ইঞ্চি, কোমর ৪২ ইঞ্চি, বাহুর গুলি ১৮ ইঞ্চি, কনুইয়ের নীচে ১৩॥০ ইঞ্চি, কব্জি ৮ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি, পায়ের ডিম ১৮ ইঞ্চি, গলা ১৮॥০ ইঞ্চি, ওজন তিন মণ।

এডিনবরায় যতীন্দ্রচরণ গুহ, ওরফে গোবর।

গোবর নামজাদা ইংরাজ কুস্তিগীর দুজনকেই হারাইয়া দিয়াছেন। গত ৩০শে আগষ্ট গ্লাসগো নগরে গোবর কাম্বেল (Campbell) সাহেবের সঙ্গে লড়েন এবং ৫০ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে তাহাকে পরাজিত করেন। তার পর এডিনবরার ওলিম্পিয়া নামক মল্লক্রীড়া-মঞ্চে যখন গোবর "অজেয় জিমি এসনের" সঙ্গে লড়েন, তখন লোকে লোকারণ্য। এসনের ওজন গোবরের চেয়ে সাত সের কম। এসন খুবই শক্তির ও কৌশলের পরিচয় দেয়, কিন্তু গোবর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রায় ৩০ ত্রিশ মিনিট চাপিয়া রাখে; এবং এসন হাঁপাইতে থাকে। এসন অনেক নিষিদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করায় তাহাকে মধ্যে মধ্যে সতর্ক করা হয়। যাহা হউক সে আবার উঠিয়া দাঁড়ায় কিন্তু গোবর ৩৯ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে তাকে প্রথম আছাড় দেয়। আর এক আছাড় দিলেই গোবরের জিত। কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না। এসন্ নিষিদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করায় পুনঃ পুনঃ তাহাকে সতর্ক করাতেও যখন সে শুধরাইল না, তখন মধ্যস্থ মহাশয় তাহাকে লড়িবার

অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং গোবরের জয় হইল।

এডিনবরায় অন্ধ্র (তৈলঙ্গ) দেশীয় ছাত্রদের অন্ধ্র-ভ্রাতৃমণ্ডলী নামক একটি সমিতি আছে। তাঁহারা গোবরকে ভোজ দিয়া, রেলওয়ে ষ্টেশনে বিদায় দিবার সময় মাল্যভূষিত করিলেন।

গোবরের পাথরের হাঁসুলি।

গোবর এখন ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে; কুস্তি দেখাইয়া সপ্তাহে দেড় হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। শীঘ্রই গচের সঙ্গে লড়িবার জন্য আমেরিকা যাইবেন।

গোবরের ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ অম্বু বাবু নামে বিখ্যাত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহও মস্ত পালোয়ান ছিলেন। তিনি অনেক সওদাগরী হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। অম্বু বাবু ও ক্ষেত্র বাবু পাঞ্জাবী ও পাঠান পালোয়ানদের অজ্ঞাত অনেক নূতন প্যাঁচ আবিস্কার করেন। পশ্চিমের অতি বড় পালোয়ানরাও কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু শিখিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইত না। অম্বু বাবুর পিতা অভয় বাবুর আয় বার্ষিক দুইলক্ষ টাকার উপর ছিল। এইজন্য অম্বু বাবু তাঁহার এই কুস্তির সখ মিটাইবার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিতেন। তাঁহার আখড়া একটা বিস্তৃত যায়গা ছিল। তাহাতে গোটা চল্লিশ গাভী এবং গোটা ত্রিশ ছাগল ছিল। তাঁহার কুস্তির সাগরেদরা দৈনিক ব্যায়ামের পর ইহাদের দুধ খাইত। তাছাড়া প্রিয় শিষ্যেরা প্রত্যহ খুব পুষ্টিকর ভাল ভাল খাদ্য পাইত।

ক্ষেত্রবাবু তাঁহার পিতা অম্বুবাবু অপেক্ষাও বৈজ্ঞানিক ভাবে কুস্তি শিখিয়াছিলেন। তা ছাড়া তিনি ঘুঁষি প্রয়োগেও খুব ওস্তাদ ছিলেন, এবং লাঠি ও ছোরা খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সামান্য সাধারণ খাদ্য ছাড়া প্রধানতঃ দৈনিক আট সের দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতেন।

গুহরা চারি পুরুষ ধরিয়া মুৎসুদ্দির কাজ করিতেছেন। গোবরের বাবা বাবু রামচরণ গুহ হোরমিলার কোম্পানীর মুৎসুদ্দি। তিনিও হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ দীর্ঘকায় পুরুষ।

গোবর মুগুর ভাঁজিতেছেন

গোবর প্রথমে তাঁহার জেঠা ক্ষেত্রবাবুর নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গামা, কাল্লু, রহমানী, প্রভৃতি পালোয়ানের কাছে শিক্ষা পান। তাঁহাকে কেহই ফেলিতে পারে নাই। এই পালোয়ানেরা রোজ ৪ হইতে ৬ টাকা বেতন পাইত।

গোবর এণ্ট্রেন্স্ ক্লাশ পর্য্যন্ত ইংরাজী পড়িয়াছেন।

বাঙ্গালীদের সাধারণ দৈনিক খাদ্য ছাড়া গোবর কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ আহার করিতেন। তিন পোয়া ঘি মিশ্রিত মাংসের আকৃনি, ৪০০ বাদাম ও এক ছটাক ছোট এলাচ, দেড় সের বেদানার রস, এক টাকার সোনার পাত ও দু আনার রূপার পাত, বাদাম ও মশলা মিশ্রিত ঠাণ্ডাই, এক সের দুধ, এবং প্রত্যহ এক টাকার ফল।

দুর্ভিক্ষ-নিবারণ*

আসন্ন দুর্ভিক্ষ।

সেদিন এক ভীষণ জলপ্লাবন বাংলা দেশের অনেকগুলি জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল। অসংখ্য গো-মহিষাদি পশু বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল। অসংখ্য লোক এখনও অন্নাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। অতিবৃষ্টির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল। সকলেই বলিতেছেন, এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ তাহার করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, অতি-বিস্তার-বদনা, অসংখ্য নরকঙ্কাল-শোভিতা সে দানবী সমগ্র বাংলা দেশকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সকলেই এজন্য ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ এদেশে যে নূতন, তাহা নহে। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অনেক লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে এমন কি সম্বৎসর ধরিয়াই দেখা যায়। বাস্তবিক যদি দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের দুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই আধুনিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ অর্থে অন্নাভাবে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্নদাতার অভাব বুঝায় না। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলেই সকলেই শিহরিয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষের কারণ।

দুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেকেই বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণ দ্রব্যের দুর্মূল্যতা। পূর্ব্বে এক টাকায় এমন কি একমণ চাউল ক্রয় করিতে পারা যাইত, এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্রেরা চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, দ্রব্যসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রব্যের মূল্য নয়-দশগুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রব্যের দুর্মূল্যতার সহিত দুর্ভিক্ষও জড়িত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাহা নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দুর্মূল্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না।

আমাদের দেশে দ্রব্যের দুর্মূল্যতা শুধু নহে, দুর্মূল্যতার সহিত দ্রব্যাভাব দেখা দিয়াছে। দ্রব্যাভাবই দ্রব্যের দুর্মূল্যতার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে অন্য দ্রব্যের সহিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অভাব।

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি।

এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে—(ক) কৃষকগণ দারিদ্র্য হেতু উপযুক্ত সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) উপযুক্ত শিক্ষা

* কলিগ্রামে মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে পঠিত, ১০ই কার্ত্তিক।

অভাবে তাহারা সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গ) গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখা যাইতেছে, (ঘ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে কৃষকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, (ঙ) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ হইতেছে না, (চ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসাতে কৃষকদিগের উৎসাহ নাই। এই সমস্ত কারণে দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) বিশেষতঃ খাদ্য-শস্য চাষের অবনতি—পাট আবাদ।

দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহা নহে; যে-সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই-সকল ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। দেশবাসীগণের অন্ন-সংস্থানের সহায় না হইয়া আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী যোগাইতেছে। বাংলা দেশে পর পর নীল তুঁত এবং পাটের চাষ ধান্যচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুঁত চাষ করিয়া কৃষকগণ মনে ভাবিয়াছিল তাহারা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। তাহারা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সত্য; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার-কাহিনী নীল এবং তুঁত আবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে—বাংলা দেশের কৃষকসমাজ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল এবং তুঁত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানি হয়; ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কাষ্টম্ হাউস পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পাট আবাদের পরিমাণ

	১৯১২	১৯১৩
বঙ্গদেশে	২,৫৭৬,৫০৩	২,৭৫৫,১৬৬+১৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৮,৩৪৪	৩১৮,৩৫৮+ ২০,০১৪
আসাম	৯৫,৬৪৭	৯৬,০৯০+ ৪৪৩
মোট	২,৯৭০,৪৯৪	৩,১৬৯,৬১৪ + ১৯৯,১২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বিহারে পাটের আবাদ ক্রমশই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	... ...	২৪১,৪০০	একর
১৯১০	... ...	২৪৮,২০০	"
১৯১১	... ...	২৫৮,১০০	"
১৯১২	... ...	১৯৮,৩০০	"
১৯১৩	.. ...	৩৩৮,৪০০	"

এখনকার পাটের সুবিধা আছে। কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মুখ্যভাবে পাটের চাষ পরিচালন করিতেছে না। পাটের চাষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বিস্তৃত হইতেছে; এবং এই বিস্তৃতির জন্য কুঠিয়ালগণ অপেক্ষা দালাল পাইকারগণই অধিক দায়ী হইয়াছে, কাজেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীল এবং তুঁত আবাদের মত পাট আবাদের একটা প্রধান দোষ আছে। পাট খাদ্য-শস্য নহে। কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অবশ্য হ্রাস পাইবে। কোন দেশের শ্রমজীবীর শক্তি এবং মূলধনের পরিমাণ অসীম নহে, তাহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বিদেশে রপ্তানির জন্য যদি পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয় সেই জমিতে পাটও হয়, পাটের বাজার-দর অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজনা দিয়া জমিদারের নিকট হইতে চাউল আবাদ ছাড়িয়া পাট আবাদের জন্য জোত লইয়া থাকে। এরূপে দেশে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট তিসি প্রভৃতি উপকরণ-শস্যের চাষ বাড়িয়া যাওয়া দেশের পক্ষে প্রভূত অনিষ্টকর। দেশে যে দুর্মূল্যতা দেখা গিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কমিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকাটী পাঠ করিলে আমরা হ্রাসের পরিমাণ বেশ বুঝিতে পারিব—

	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
১। চাউলের চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	৭০	৭১·৬	৬৯·৬	৭৩·৫	৭৩·৪	৭৩·৫	৭৫·৯	৭২·৮	৭৮·৭	৭৮·৫	
২। গম চাষের পরিমাণ (মিলিয়ন একর পরিমাপক হিসাবে)	১৮·৬	১৯·৬	২৩·৬	২৩·৫	২২·৪	২৫·১	১৮·৪	২১·২	২২·৭	২৪·৪	

এই কয় বৎসরে পাট এবং তুলার চাষ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও নির্দ্দেশিত হইল :—

১। পাটের চাষ (মিলিয়ন একর)	২·২	২·১	২·৫	২·৯	৩·১	৩·৫	৩·৯	২·৮৫	২·৮৭	২·৯৩	৩·১
২। তুলার চাষ (মিলিয়ন একর)	১০·৩	১১·১	১১·৯	১৩	১৩	১৩·৭	১৩·৯	১২·৯	১৩·১	১৪·৪	

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কেবলমাত্র ৭·১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পরিমাণ ঐ দশ বৎসরেই শতকরা ৫০·০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাট ইত্যাদি উপকরণ-শস্য চাষের কুফল।

মুর্শিদাবাদ জেলায় একজন খুব ধনী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার বাটীতে একবার তাঁহার জমিদারির সমস্ত প্রজাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজনের জন্য সকলেই উপবিষ্ট হইলে জমিদার মহাশয় তাহাদিগের সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহার পাচকগণের দ্বারা তাহাদিগকে পাটের কুচি পরিবেষণ করাইলেন। প্রজাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জমিদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় আমাদের জন্য এ কি খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ?" জমিদার মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন "দেখ, তোমরা আমার জমিদারিতে যাহা উৎপন্ন করিবে তাহা ভিন্ন অপর খাদ্য আমি কোথায় পাইব ? তোমরা ধান্য চাষ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সর্ব্বত্রই পাট চাষ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব পাট ব্যতীত তোমাদিগের অপর কোন খাদ্য আশা করা অনুচিত।" প্রজাবৃন্দ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জমিদার মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর যখন তাহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন সকলেই জমিদার মহাশয়ের উপাদেয় এবং কৌতুকপ্রদ শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসাবাদ করিতেছিল। সেই অবধি মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলে পাট চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। জমিদার মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সত্য এবং স্পষ্টভাবে বলা। জেলায় জেলায় যদি খাদ্য-শস্যের চাষ কমিয়া যায় তাহা হইলে সে দেশে অন্নাভাব না হওয়াই আশ্চর্য্য। কৃষকগণ পাট প্রভৃতির চাষে যদিও কিছু অধিক নগদ টাকা লাভ করিতে পারে, কিন্তু চাউলের মূল্য ততোধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। বিদেশী বণিক্‌দিগের প্রভাবে দেশীয় কৃষি বিদেশের প্রভূত ধনোৎপাদনের সহায় হইয়া যদি দেশবাসীগণের দারিদ্র্য আনয়ন করে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মূঢ় কৃষি-ব্যবস্থা স্বপ্নের অগোচর। আমরা কিন্তু এই মূঢ় ব্যবস্থা অন্ধভাবে পুরুষানুক্রম ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছি।

(গ) খাদ্যশস্য রপ্তানি।

শুধু খাদ্য-শস্যের চাষ যে কমিতেছে তাহা নহে, আমরা নিজেদের অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি। এস্থলেও বিদেশী বণিক্‌দিগের প্রভাব হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষের কোন-না-কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ রহিয়াছেই। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-শস্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে।

	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
চাউল রপ্তানি (মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে)	৩৪	৪৭·৪	৪৫	৪৯·৪	৪৩	৩৮·৭	৩৮·২	৩০·২	৩৯·২	৪৮	৫২·৪
গম রপ্তানি (মিলিয়ন cwt পরিমাপক হিসাবে)	৭·৩	১০·৩	২৫·৯	৪৩	১৮·৭	১৬	১৭·৬	২·১	২১	২৫·৩	২৭·২

এক মিলিয়ন cwt = প্রায় ১৩.৫ লক্ষ মণ।

১৮৯৫ সনে রুশিয়াতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু দেশে অন্নাভাব সত্ত্বেও অসংখ্য রেলগাড়ী শস্য বোঝাই করিয়া রুশিয়া হইতে বিদেশে যাইতেছিল। সেখানকার রাজসচিব হিলকফ ঐ রেলগাড়ী সমূহের বিদেশ যাত্রা নিষেধ করিয়া রুশিয়ায় উৎপন্ন সমস্ত শস্যের দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্ভিক্ষ থামিয়া গেল। আমাদের দেশে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনায়াসেই সমস্ত প্রদেশের অন্নাভাব দূরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমরা বিদেশে বৎসর বৎসর শস্য রপ্তানি করিতেছি।* কবি স্বদেশকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন, "চির কল্যাণময়ি তুমি ধন্য,—দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।" ধনবিজ্ঞানবিৎ এই প্রকার ব্যবস্থাকে দেশের পক্ষে ঘোর অকল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করেন,—নিজের ধন পরকে দিয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া অবশেষে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। ইহা স্তুতিবাদের বিষয় নহে। আর একজন কবির আক্ষেপে বাস্তবজীবনের প্রকৃত দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নিজ অন্ন পরে, করপণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে।
মথি অন্ন হরে, পর স্বর্গসুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি আজও দুখে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়।

(ক) কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র যে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা নহে। খাদ্য-শস্যের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, এবং উৎপন্ন শস্যের যাহাতে বিদেশে রপ্তানি না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপায়,—কৃষিশিক্ষার বিস্তার এবং যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী এবং যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে কৃষিরসায়নসম্মত সার এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিতে সাহায্য করা। যৌথ-মণ্ডলী স্থাপন করিলে গো-মহিষাদির উন্নতি এবং জীবন-বীমা সহজসাধ্য হয়। ঋণদানমণ্ডলীর লাভাংশ হইতে ষণ্ড ক্রয় করা যাইতে পারে, এবং গবাদির জীবন বীমার মাসিক চাঁদা লওয়া যাইতে পারে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ হইলে, ঋণদান-মণ্ডলী হইতে কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া, আহার্য্যাদি, শস্য-বীজ এবং হাল বলদ ক্রয় করিতে পারে। কৃষিশিক্ষা বিস্তৃত হইলে ব্যয় ও সময়সংক্ষেপকারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন হইবে, উপযুক্ত সার ব্যবহৃত হইবে, এবং পোকা ও অন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে গ্রামে গ্রামে কৃষিকার্য্যের সমবায়-প্রণালী সহজেই অবলম্বিত হইবে। বাস্তবিক আমাদের পল্লীগ্রামসমূহে দৈন্য দারিদ্র্য এরূপ গভীর এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে, সমস্ত বিষয়েই এক্ষণে সমবেত কার্য্য করা আবশ্যক। গ্রাম্য কৃষিশিক্ষা পরিচালনার জন্য, নদ নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও সংস্কারের জন্য, শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থার জন্য, নিয়মমত জল সরবরাহের জন্য সমবেতভাবে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সব বিষয়েই সমবেত কার্য্যপ্রণালী কল্যাণপ্রদ হইবে। তাহার পর স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য পল্লীগ্রামসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রেল লাইন যেখানে খুলা হইয়াছে, সেখানে বাঁধের নীচে দিয়া যাহাতে জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা

* শস্য রপ্তানি যে শস্যের দুর্মূল্যতার একটী প্রধান কারণ তাহা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টেও নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"Rice of which the exports have greatly increased durng the last two years 1901—03 remains extremely dear," * * * "wheat in India proper, like rice in Burma, is being grown more extensively for export and the recent revival of the foreign demand has produced exports bearing a far larger proportion to the consumption than in the case of rice."

Imp. Gazetteer of India, Vol. III. chap IX. p. 460.

"Of rice it may be said that present prices are as high as the famine prices of former years."

"The demand for export has undoubtedly influenced the price of rice and wheat directly, and through them the prices of the commoner food grains."

Imp. Gazeteer of India, Vol III. chap. IX. p. 461.

কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ছোট রেল গাড়ী (Light Railway) অধিক উপযোগী। তাহাতে যাতায়াত এবং দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির সুবিধা হয়, অথচ রেলগাড়ীর ভার অধিক না হওয়াতে বাঁধ নির্ম্মাণ আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য রেল লাইন জল সরবরাহের ব্যাঘাত করে না। ইউরোপের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে ছোট রেল লাইনগুলি বৈষয়িক উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে; অথচ জল সরবরাহের ব্যাঘাত না হওয়াতে নদনদীগুলি এবং তাহাদিগের শাখা প্রশাখাগুলির অবনতি হয় নাই এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি এখনও দেখা যায় নাই। আমাদিগের দেশে কিন্তু পল্লীগ্রামে ছোট রেলগাড়ীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করেন নাই।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে এইস্থলে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, রেললাইনের বিস্তার আমাদের উন্নতির একটী প্রধান লক্ষণ। রেলগাড়ী মনুষ্যের যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করে সত্য, এবং রেলগাড়ী ভিন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া অসম্ভব তাহাও সত্য। কিন্তু রেলগাড়ী যে-সকল সুবিধা প্রদান করিয়াছে তাহাদিগের বিনিময়ে আমরা কি হারাইতেছি তাহাও কি একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে? রেলগাড়ী কৃষিক্ষেত্রে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, উৎপন্ন শস্য লইয়া রেলগাড়ী তাহা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে মাত্র। গ্রামোৎপন্ন শস্য স্বদেশ অথবা বিদেশের সহরবাসীর আহার্য্য হয়, এই মাত্র। রেলগাড়ী শস্য উৎপন্ন করে না, কৃষকই সমাজের অন্নসংস্থানের ভার লইয়াছে, রেলগাড়ী তাহার বাহন মাত্র। বাহনের কাজ প্রভুকে সেবা করা। কিন্তু বাহন যদি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত প্রভুর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পিষিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সিন্ধুবাদের ভাগ্য এবং চতুরতা না পাইলে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন ঠিক সিন্ধুবাদ নাবিকের দশা হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকায় রেল লাইন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রেলকোম্পানীর নিকট হইতে দেশবাসীরা অনেকগুলি সত্ব আদায় করিয়া লয়। ঐ প্রদেশের শস্য ফসল ইত্যাদি অথবা শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী অন্য প্রদেশে রপ্তানি করিয়া যাঁহাতে দেশবাসীরা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কোম্পানী মাশুল খুব কমাইয়া দেয়। সুতরাং রেলকোম্পানী ঐ প্রদেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির প্রধান সহায় হয়। আমাদের দেশে রেলকোম্পানীগুলি তাহাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত, কোন শিল্পবিশেষকে সুবিধা প্রদান করিবার জন্য মাশুল কমাইয়া দেওয়া তাহাদিগের আলোচনার মধ্যেই আসে না। তাহার পর, ইউরোপ আমেরিকার পল্লীগ্রাম সমূহেরও কৃষি- এবং শিল্প-শিক্ষা বিস্তার হওয়াতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য রপ্তানি হয় না, গ্রামে গ্রামে শস্য সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং উপযোগী অনুষ্ঠান আছে এবং উপকরণ-শস্য উৎপন্ন হইলেও গ্রামবাসীগণ নিজেরাই কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে আপনাদিগের শিল্পশিক্ষার বলে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং রেলগাড়ী সেখানে কৃষককুলের ধনবৃদ্ধির কারণ। আমাদের দেশের কৃষকগণ সেরূপ শিক্ষিত নহে। কাজেই তাহারা রেলগাড়ীর মন্দটুকু লইয়াছে, ভালটুকু লইতে পারে নাই। রেলগাড়ী সে জন্য সভ্যতা নহে দৈন্যের লক্ষণ হইয়াছে। সমগ্র কৃষকসমাজ এক্ষণে বণিক্‌দিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আপনার অন্ন পরের হাতে অকুণ্ঠিতচিত্তে তুলিয়া দিতেছে এবং স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া পরের বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া গৌরব বোধ করিতেছে। তাই যখন রেলে যাই তখনই সন্দেহ হয় আমরা রেলের সঙ্গে শুধুই কেবল শিক্ষার উন্নতি, ভাবের আদানপ্রদানের দ্বারা জাতীয়তা গঠন, এক কথায় কেবল কি সুবিধা, সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। একটা বেদনার সুর,—দৈন্য দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকসমাজের একটা করুণ কাহিনী তখন কি মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে না? যখনই এই করুণ সুরটির উদয় হয়, তখন মনে হয়, এই যে রেল লাইন ইহা পাথরের উপর নহে, দেশের ৩০ কোটি কৃষকের বক্ষের উপর পাতা আছে, আর ঐ যে গুরু গুরু শব্দ তাহা ৩০ কোটি নরনারীর বিদীর্ণ হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ,—কেবল

'বুক-ফাটা দুখে
গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা।'

রেল-লাইন যতই বিস্তৃত হইতেছে ততই দেশের নদনদীগুলির প্রতি দৃষ্টি আমরা ঘুচাইতেছি। কৃষিপ্রধান দেশে নদনদীগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। আমাদের দেশে নদনদীগুলির যেরূপ ক্রমাবনতি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের শস্যশ্যামল দেশ যদি কোন কালে মরুভূমিতে পরিণত হয় তবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। জলসেচন এবং বাণিজ্যের সুবিধা হেতু নদনদীগুলির উন্নতি সাধন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ড্রেজার বসাইয়া নদীর মোহানার চর কাটিয়া দেওয়া এবং স্থানে স্থানে নদীতীর পাথর দিয়া বাঁধিয়া নদীর গতি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। দেশের অরণ্যসমূহ ধীরে ধীরে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে, ইহা অনাবৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। অরণ্যসমূহকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অরণ্যসমূহ রক্ষিত হইলে দেশে অনাবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা অধিক হয় না। সুবৃষ্টি হইলে এবং নদনদীগুলি সংস্কৃত হইলে, উহারা ম্রিয়মাণ হইবে না। নদী হইতে খাল কাটিয়া জল আনা তখন সহজসাধ্য হইবে এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচন এবং-জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকগণ অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিবে। কৃষিকার্য্যের স্থায়ী উন্নতি তখন সম্ভবপর হইবে।

(খ) পাট ইত্যাদি চাষের পরিমাণ হ্রাস।

আমাদিগের কৃষকগণ যাহাতে বিদেশীর কুঠি-কারখানার জন্য উপকরণ-শস্য উৎপন্ন করিয়া দেশীয় খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ কমাইয়া না দেয় তাহার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে উপকরণ-শস্য চাষের বিষময় ফল সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান আবশ্যক। কৃষকগণ স্বভাবতই নিজেদের ব্যক্তিগত লাভকে কখনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে না; যেখানে ব্যক্তিগত লাভ সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় সেখানে তাহারা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। উপকরণ-শস্য চাষে তাহাদিগের কিছু নগদ টাকা আসিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেশবাসীর যে অমঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু, মানুষ কেবল মাত্র অর্থ দিয়া বাঁচিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে যদি অন্নসংস্থান না হয় তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন বিফল হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, গ্রামবাসীগণের অর্থ আছে, অথচ বাজারে চাউল নাই, যে, তাহারা অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে পারে। অতএব পাট ইত্যাদি চাষ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের নিজেদের যে স্বার্থসিদ্ধি হইবেই তাহাও নহে,—পাট বিক্রয় করিয়া একশত টাকা মজুত রাখা অপেক্ষা এক মরাই ধান গৃহস্থের অধিক উপকারী। এই-সমস্ত কথা কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। তবেই উপকরণ-শস্য চাষ দেশে আর দেখা যাইবে না।

(গ) অবাধ শস্য-রপ্তানির প্রতিরোধ।

তাহার পর খাদ্য-শস্য রপ্তানি বন্ধ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দেশে শস্যের ব্যবসায় যাহাতে বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন এ গুরুতর কার্য্যে সফলতা লাভ করা সুকঠিন,—এবং শিক্ষিতদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায় দ্বারাও এ কার্য্য সাধিত হইবে না। গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি যৌথভাবে চাউল গম ইত্যাদির ব্যবসায়ে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গ্রামে গ্রামে শস্যআড়ৎ স্থাপন করিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামের শস্যআড়ৎগুলি পরস্পরকে শস্য-আদান-প্রদান-ব্যাপারে সাহায্য করিবে, এবং জেলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে একটী কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে। জেলার বিচক্ষণ ব্যবসায়ীগণ ঐ কেন্দ্র-আড়ৎ পরিচালনের ভার লইবেন, এবং ঐ জেলার কোন গ্রামে খাদ্যশস্যের মূল্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ গ্রামে শস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক জেলাতেই কেন্দ্র-শস্য-আড়ৎ থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে জেলায় জেলায় শস্যের আদান প্রদান চলিবে। কিন্তু কখনও বিদেশে রপ্তানির জন্য শস্যের ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অনুপযোগিতা।

অনেকে বলেন বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করা

মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিলে কুফল অবশ্যম্ভাবী; বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং প্রশস্ত পন্থা স্বভাবতই অনুসরণ করে এবং ঐ পথ যদি রুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উহা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। জার্ম্মাণী এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র তাঁহাদিগের স্বাভাবিক গতির উপর নির্ভর করে না। জার্ম্মাণী এবং আমেরিকায় রাষ্ট্র ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে আপনার নিজের শক্তির দ্বারা রক্ষা ও পালন করিয়াছিল, এই কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সেখানে এত উন্নতি। বাস্তবিক ব্যবসা ও বাণিজ্যকে অবাধে আপনাদের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে অনেক সময়েই শ্রেয় নহে। ভারতবর্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে রক্ষণ-ও-পালননীতি অবলম্বনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহুকাল হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে; কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রক্ষণনীতি অবলম্বন সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা হয় নাই। খাদ্য-শস্যের অবাধ রপ্তানি কোন দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার আমদানি করিয়া থাকে। যদি দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে স্বদেশের শস্য রপ্তানি করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের আমদানি দ্রব্যসমূহের তালিকা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতবর্ষ বাণিজ্য অথবা দ্রব্যবিনিময়ে লাভ করা দূরে থাক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যে-সমস্ত দ্রব্যের অভাবে কোন দেশ অত্যাবশ্যক আহার্য্য পরিচ্ছদাদি হইতে বঞ্চিত হয়, সে-সকল দ্রব্যের রপ্তানি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাই আহারের বিনিময়ে আমদানি হউক না কেন, বিদেশ হইতে ত জীবন ফিরিয়া আসিবে না। আবশ্যকীয় আহার্য্যাদি রপ্তানি করিয়া যদি সমাজ অন্নকষ্টে জর্জ্জরিত এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত ধনবৃদ্ধি হইলেও সে ধন কে ভোগ করিবে?

বাণিজ্যের ডাকিনী মূর্ত্তি।

এজন্য এক্ষেত্রে বাণিজ্য ধনবৃদ্ধির কারণ হইলেও ডাকিনীর মত প্রলোভন দেখাইয়া একদিকে যেমন সমাজকে একবারে মোহান্ধ করিয়া ফেলে অপর দিকে পলে পলে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া লয়; অথচ সমাজ তাহা অনুভব করিতে পারে না। বাণিজ্যের রূপ মাতৃমূর্ত্তি, দানবীর রূপ নহে। বাণিজ্য সমাজ শিশুকে তাহার স্তন্যপীযূষ পান করাইয়া, আপনার বক্ষে সতত ধারণ করিয়া সস্নেহে পোষণ করে। বাণিজ্য রক্ত দান করিয়া পুষ্ট করে, শোষণ করিয়া হত্যা করে না। আমরা বাণিজ্যের মাতৃমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ডাকিনীর রূপকে সমাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং পলে পলে ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়িয়া আপনাদিগের জীবন বলিপ্রদান করিতেছি।

বাণিজ্যক্ষেত্রে অপরিণামদর্শিতা।

যতদিন না আমাদের এই মোহ দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে বহির্বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু অতীত ইতিহাসে ভারতীয় বাণিজ্যসামগ্রী নিত্যপ্রয়োজনীয় শস্যাদি ছিল না। কার্পাস, রেশম কাপড়, মসলা, মস্‌লিন্, হীরক প্রভৃতি তখন বিদেশে রপ্তানি হইত। অতীতকালে নিজ অন্ন পরকে বিলাইয়া দিয়া ভারত ক্ষুধার তীব্র যাতনা অনুভব করিত না; ভারতবাসীগণ নিজেদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ভোগ বিলাসের সামগ্রী বিদেশে প্রেরণ করিত এবং তাহার বিনিময়ে প্রত্যেক বৎসর অজস্র পরিমাণে স্বর্ণ আমদানি করিত।

সর্ব্বপ্রথমে কৃষিশিল্প ব্যবসায় দ্বারা আভ্যন্তরিক অভাব মোচন, তাহার পর বিলাসভোগ এবং অবশেষে বাণিজ্যের দ্বারা উদ্বৃত্ত বিলাস-সামগ্রীর বিনিময়ে স্বর্ণাদি ধাতুর আমদানি করিয়া ধন সঞ্চয়ের উপায় করা—ইহাই পূর্ব্বের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে অনেক সময়ে ভারতীয় বাণিজ্য বিপরীত পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। স্বদেশের নিত্য অভাব মোচিত না হইয়া ভারতীয় শস্যাদি বিদেশে

প্রেরিত হইতেছে এবং তাহার বিনিময়ে বিলাস-সামগ্রী অত্যধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে। বিলাস-সামগ্রীর আমদানি এবং খাদ্যশস্যের রপ্তানি একদিকে অন্নকষ্ট অপরদিকে শ্রমজীবীগণের জীবিকার্জ্জনের জন্য বিদেশ গমনের কারণ হইয়াছে। অসংখ্য ভারতবাসী বৎসর বৎসর আফ্রিকা আমেরিকা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করিতেছে। অন্নাভাবে রোগাধিক্য হেতু সমাজের একদিকে শক্তিহ্রাস এবং বিদেশ যাত্রা হেতু অপরদিকে শক্তিনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপে সমাজ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা যে বিশেষ মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মূঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতার ফল যে ভারতবর্ষ এক্ষণে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছে তাহা বলিতে হইবে না।

প্রতিকার।

ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক্ষণে গভীর চিন্তা, ধীর এবং সংযতভাবে অভাব বিশ্লেষণ এবং পরিণামদর্শিতার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আর প্রয়োজনীয় হইয়াছে,—কেবল অভাববোধ নহে, অভাব-মোচনের জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, সমবেত উদ্যোগ, অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

ভাস্কর্য্যে শিশুচিত্র

ভাব বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কাব্যরূপে জনসমাজে প্রাণমাতান সঙ্গীতের অবতারণা করে। ভাষাকাব্যই হউক আর দৃশ্যকাব্যই হউক, উহা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া না উঠিলে, মানবজীবনে সুফল ও কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

ভাস্কর্য্য দৃশ্যকাব্য; ভাস্কর্য্য ও বিজ্ঞানে ভেদের কল্পনায় গভীর অজ্ঞানান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্পনার ভিতরে প্রাণটাকে সর্ব্বদা ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে যে একটা আত্মারাম সমগ্র হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া বসে, উহার মমতা মানবপ্রাণে বড় প্রবল; উহা মাকড়সার জালের মত মানুষের সকল কার্য্যকরী শক্তিকে তন্দ্রাময় মোহে জড়াইয়া ফেলে। সে মমতার স্রোতে সংসার ভাসিয়া যায়। সেই রস-সম্ভোগের তুলনায় সংসারের সকল সুখ ও প্রীতি অতীব স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং সংসারের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু প্রাকৃত ও সরল চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত সে সকলই অকাম্য ও অভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞান সুন্দরী অনাদৃতা অবলার মত মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কল্পনার কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে; এইরূপে মানবগণের সকল কর্ম্মজ্ঞান ও মহৎভাব কল্পনার আকারে উঠিয়া উঠিয়া আকাশে বিলীন হয়—জনসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যায়। ভাব ও বিজ্ঞানের বিচ্ছেদের ইহাই বিষময় ফল। আমরা ভারতবাসী আজ সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া নীরবে কাঁদিয়া মরিতেছি!

বলিতেছিলাম ভাব ও বিজ্ঞানে (Idea and technique) বিরোধ অসম্ভব কল্পনা। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের ফলে প্রতিপাদ্য বিষয়ে ভাবহানি ঘটে এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সুতরাং অসত্য। মানবপ্রকৃতি মূলতঃ সকল দেশে ও সকল সমাজে এক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্নরূপ সাধনার ফলে সমষ্টিগতভাবে, বাহিরের দিক দিয়া মানবচরিত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে সবই এক। একমাত্র কবিই মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মানবের হৃদয়-বীণার তারে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়েন। দৃশ্যকাব্যে কবির প্রতিভা অধিকতর সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হয়, সুতরাং দৃশ্যকাব্য মানবসমাজে অশেষ ফলোপদায়ক সকল দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ভাস্কর্য্য অন্যতম।

এই প্রবন্ধান্তর্গত পাঁচখানি চিত্রে ভাস্কর্য্যে নিপুণ ভাস্কর শিশুজীবনের বিচিত্র ইতিহাস কেমন সুন্দর শোভন প্রাণস্পর্শী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম চিত্রখানির (The First Steps) দিকে চাহিবা মাত্রই, পণ্ডিত মুর্খ, বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণেই

ঝরণায় স্নান।—Ch. R. Peyre কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ।

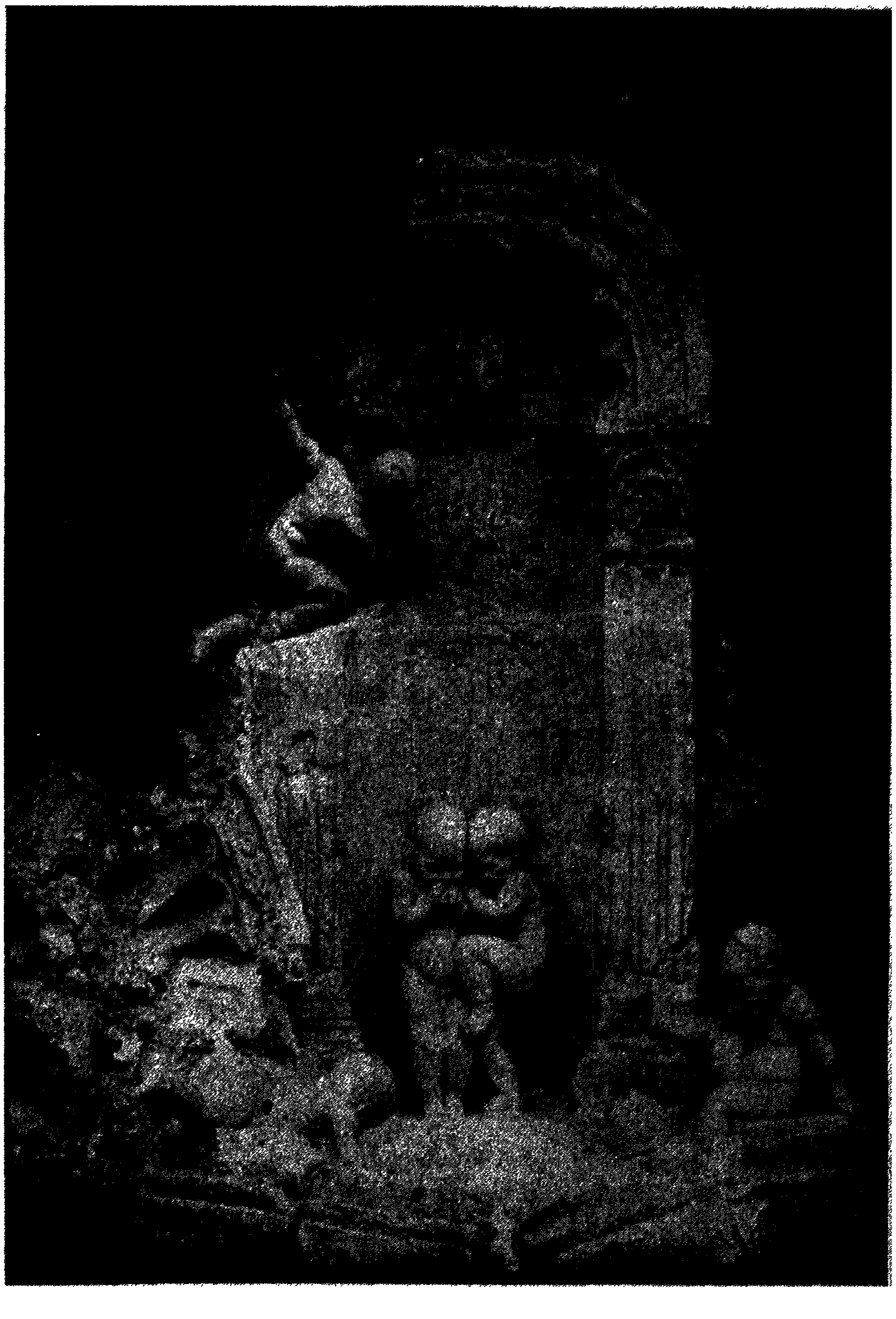

ঝরণায় স্নান।

"মায়ের পেটের ভাই"।

"গোপন কথাটি"।

ভাস্কর্য্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। দৃশ্য-কাব্য স্বপ্রকাশ, টিকাটিপ্পনি দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; ইহাতেই চিত্র ও ভাস্কর্য্য কিম্বা নাটকের সার্থকতা। "চলি চলি পা পা" বলিয়া মাতা শিশুসন্তানকে প্রথম চলিতে শিখাইতেছেন; এই প্রথম শিক্ষার আনন্দ ও সাবধান তন্ময়তা মাতাপুত্রের ভঙ্গীতে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মময় জীবন-স্রোতে এমন সুন্দর কাব্যজবা যিনি সস্নেহে ভাসাইয়া দিতে জানেন তিনিই ত যথার্থ কবি।

দ্বিতীয় চিত্রখানিতে (Brother's Kiss) "ভাইয়ের চুমু" খাওয়ার দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় ভাইটী হৈ হৈ করিয়া সারারাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ফুল কুড়াইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, পুকুরের পাড়ে ঘাটের পথে ঘুরিয়া বেড়ান হইতেছিল; হঠাৎ কি মনে করিয়া ছুটিয়া আসিল মায়ের কাছে; নিজেও প্রকাণ্ড লম্বা বীর কিনা! মায়ের কোলে ভাইএর মুখখানি নাগাল পাওয়াও কঠিন, কাজেই টানিয়া ভাইএর কচি মুখখানি নীচুতে নামাইয়া আনিয়া চুমো খাওয়া হইতেছে। মায়ের মুখেরই বা কি সুন্দর ভাব,—শিরীষ কুসুমের মত কোমল, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল। যে মন্ত্রবলে মানবপ্রাণের ভাব এমন সুন্দর করিয়া ভাস্কর্য্যে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়, সেই মন্ত্রশক্তির সাধনকল্পে চিত্রকর বা ভাস্করের কোন্ স্বার্থ অপরিহার্য্য থাকিতে পারে, কোন্ ক্লেশ অবহনীয় থাকিতে পারে?

তৃতীয় চিত্রখানিও (Shower Bath) বড়ই সুন্দর। নাদুস্ নুদুস্ দুইটী ভাইবোন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের খনি। লুকাইয়া ঝরণায় স্নান করিতে আসিয়াছে। বোনটী পিছনদিক হইতে ঠেলিয়া ভাইটীকে জলের নীচে লইয়া যাইতেছে। কপালে হঠাৎ ঠাণ্ডাজল লাগাতে ভাইটীর মুখখানিতে কেমন সুন্দর একটী ভাবের অবতারণা হইয়াছে। বোনটীর সোহাগে-গলা মুখখানিই বা কি সুন্দর! ছবিখানির দিকে চাহিলেই স্নেহ ও আনন্দের পুতুল এই শিশু দুইটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুখানি যেন অলক্ষিতে প্রসারিত হয়; দর্শকের হৃদয়ে এই আবেগময় স্নেহের অবতারণা করিতে সমর্থ হওয়াতেই, ভাস্করের কবিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ চিত্রখানিও (Children in the Fountain) আপনার পরিচয় আপনিই প্রদান করে। শিশুরা জল কাদা লইয়া মাখামাখি, হুড়াহুড়ি করিতেছে। শৈশবে নির্ম্মল সরলতার সঙ্গে যখন প্রথম খেলা আরম্ভ হয়, সেই মুকুল জীবনের মধুময় স্মৃতি কর্ম্মক্লান্ত জীবনে জাগরূক করিয়া যে ভাস্কর মানুষের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করেন, তিনি প্রশংসাভাজন।

পঞ্চম চিত্রখানি (Confidence) আরও চমৎকার। শিশু খেলা করিতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল মাকে কিছু বলিতে হইবে। কত যেন জরুরী গোপন কথা। তাই মায়ের কানে কানে বলা হইতেছে। মায়ের কান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গোপন কথাটী বলা দেহের দৈর্ঘ্যে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তাই ডিঙি মারিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া আকাশ-পাতাল বলা হইতেছে। গোপনীয় কথার মধ্যে ত "মা তুই যে বলেছিলি আজ আমায় খেলনা কিনে দিবি!" এমন প্রাণের কথাটী পশুপক্ষী, তরুলতা, নরকিন্নর কেহই শুনিতে পাইবে না! এমনি সুন্দর কত শত ভাবের অসংখ্য স্রোতস্বিনী মানবপ্রাণের উপর দিয়া নিরন্তর তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কবি তাহারই দুই একটীকে কখনও কখনও ধরিয়া আনিয়া, আকার দান করিয়া আমাদের আনন্দের জন্য মজুত করিয়া রাখেন।

তাই বলিতেছিলাম ভাস্কর্য্যে বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের কথা। ভাস্কর্য্য বলিতে আমরা আকৃতি বা মূর্ত্তি বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্তির ধারণা করিতে গিয়া আমাদিগকে অপরিহার্য্যরূপে একটা দেহের ধারণা করিতে হয়; দেহের কথা ভাবিতে গেলে অস্থি পঞ্জর, রক্ত মাংস ইত্যাদি দেহের সকল উপাদানের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে হয়। এ-সকল লইয়াই দেহ। ভাবকে আকার দানের কথা বলিতে গিয়া আকারের সঙ্গে যে দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই দেহের দেহত্বের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে কিছুই

অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞানহীন ভাস্কর্য্য কল্পনার তন্দ্রা আনিতে পারে কিন্তু তাহা ছাড়া মানুষের আর কোনই কাজে লাগে না। ফুলটীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সুগন্ধের সন্ধানে সারা ফুলবন ঘুরিয়া বেড়াইলে ফুলমালীকে যেমন হতাশ মনে ফিরিয়া আসিতে হয়, ভাস্কর্য্যের শিল্পাংশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া কবিত্বময় ভাস্কর্য্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও তেমনি শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। মানবের এই কর্ম্মের যুগে সকল চিত্তবৃত্তি কার্য্য-করনীশক্তি হইতে প্রসূত না হইলে সমাজের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। প্রাকৃত এবং চক্ষুগোচর সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আমাদের চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নাটকের কাব্য-সৌধ গড়িয়া না উঠিলে আমাদের অন্তরের দৈন্য ও বাহিরের ক্লেশ কিছুতেই ঘুচিবে না। চিত্র ও ভাস্কর্য্যে ভাব ও বিজ্ঞান, যখন "দোঁহে দোঁহা লাগি" নিগূঢ় প্রেমে মত্ত হইয়া বদ্ধ আলিঙ্গনে একীভূতপ্রাণে মূর্ত্তিময় হইয়া জনসমাজে দেখা দেয়, তখনই সমাজে সকল অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে।

লণ্ডন
২৯শে আগষ্ট। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ।

৺দীনবন্ধু মিত্র

তুমি ছিলে নাট্যকার হে বরেণ্য! ছিলে না'ক নট,
করতালি-মাধুকরী তুমি কভু করনি জীবনে;
সমাজ-শোধন-ব্রতে ব্রতী যারা ছিল কায়-মনে—
নব্য-বঙ্গে যারা গুরু—স্থাপিয়াছে সুমঙ্গল ঘট—

তাদের চরিত্র লয়ে তুমি ব্যঙ্গ করনি বিকট
বীভৎস-কুৎসিত ভাবে। হে রসিক! তব আলাপনে
ক্ষুণ্ণ নহে পুণ্য-ধারা; রোধ' নাই কণ্টক-রোপণে
উন্নতির পন্থা কভু। দেশবন্ধু তুমি নিষ্কপট।

অন্যায়ের বৈরী তুমি বিদ্রূপে বিঁধেছ অত্যাচার,
হাস্যমুখে চিরদিন করিয়াছ সত্যের ঘোষণ;—
নীলকর বিষধর করেছিল গরল উদ্গার,—
নীলকণ্ঠ সম তুমি নির্ভয়ে তা' করেছ শোষণ।
বারিকের ভিত্তি গড়ি' নিমচাঁদ করি' আবিষ্কার
হাসি দিয়া নাশি' রোগ করেছ হে সুপথ্যে পোষণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা

যাহা দেখিলে বা শুনিলে, মানব-মনে উদ্দীপনা-সূচক আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহার নাম ললিত-কলা। ললিতকলা উপভোগের সদ্য ফল, যোগ,—মনুষ্যের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা সত্য—শিব—সুন্দর তাহাতে [অহং হইতে নিরুদ্ধ] চিত্তবৃত্তির লয়;—পরিণাম ফল, নবজীবন লাভ। ললিতকলানিচয়ের মধ্যে চিত্রকলার স্থান অতি উচ্চ। "হরিভক্তিবিলাসে" [১৮শ বিলাসে] গোপালভট্ট "চিত্রজা প্রতিমার" মহিমা সম্বন্ধে "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র" হইতে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

"কান্তিভূষণ ভাবাঢ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ॥
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বুধৈঃ॥
চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমং।
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈ র্জন্মকোটিষু সঞ্চিতৈঃ॥
তস্মাচ্ছুভার্থিভি র্ধীরৈর্ম্মহাপুণ্য-জিগীষয়া।
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো নারায়ণঃ প্রভুরিতি" ॥ *

"যেহেতু চিত্রে কান্তি (শোভা), ভূষণ এবং ভাব প্রভৃতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত, চিত্রজা প্রতিমানিচয়ে ভগবান (উপাসকের) নিকটে আগমন করেন (অর্থাৎ চিত্রজা প্রতিমা দর্শন করিলে উপাসক ভগবানকে নিকটস্থ মনে করেন)। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ বলেন,—চিত্র পূজায় শত গুণ পুণ্য। বিলাস (লালিত্য) এবং বিভ্রমসম্পন্ন চিত্রলিখিত নারায়ণকে দর্শন করিলে কোটী জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। অতএব যাঁহারা ধীর এবং শুভ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহাপুণ্য লাভ করিবার জন্য পটে অঙ্কিত প্রভু নারায়ণকে পূজা করিবেন।"

শোভা এবং ভাবময় দেবতার চিত্র উপাসকের বা দর্শকের সালোক্য এবং সাযুজ্য লাভের সহায়তা করে। শোভাময় চিত্রমাত্রই চিত্তরঞ্জন করে এবং বিশুদ্ধভাবময় চিত্র চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্রকলা লোকশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়; চিত্রকর সমাজের গুরু স্থানীয়।

---

* শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক প্রথম উদ্ধৃত। Dawn, April, 1912.

সুতরাং চিত্রকলার পরিপোষণ এবং উৎকর্ষসাধন উন্নতিশীল মনুষ্যসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য ললিত-কলার ন্যায় চিত্রকলাও অধঃপতিত জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, সরকারী কলা-বিদ্যালয়নিচয়ে, পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি প্রচলনের যত্ন হইয়াছিল। কিন্তু সে যত্ন সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না! বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই যুগের দেশীয় প্রবর্ত্তক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদেশীয় পৃষ্ঠপোষক [কলিকাতা স্কুল অব আর্টের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ] ই, বি, হেভেল মহোদয়। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত নব্যচিত্রকর সম্প্রদায়ের মূল সূত্র "পাশ্চাত্য চিত্রকলারীতি বর্জ্জন এবং প্রাচীন দেশীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন।" এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাদিগের সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মুক্তহস্তে অর্থও ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু ফল যাহা এ পর্য্যন্ত ফলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশীয় লোকের মধ্যে মতভেদ আছে। "যে দিন থেকে বাঙ্গালাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে।"* সাহিত্য-সমাজে [যাঁহারা মাসিক পত্রের লেখক ও পাঠক তাঁহাদের মধ্যে] এইরূপ মতদ্বৈধ। সাহিত্য-সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণ [যাঁহারা আর্টষ্টুডিওর এবং রাজা রবিবর্ম্মার চিত্রের প্রতিলিপি ক্রয় করিয়া সাগ্রহে গৃহ সজ্জিত করেন, তাঁহারা] এই নব্যতন্ত্রের চিত্রকর-গণের চিত্র সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এই মতদ্বৈধের এবং ঔদাসীন্যের কারণ কি? যাঁহারা নবচিত্রকলার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ অপর পক্ষের অজ্ঞতা; পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত অপকৃষ্ট চিত্রের সহিত পরিচয়ে সঞ্জাত রুচি-বিকৃতি। কেবল যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেই নবচিত্রকলার মাহাত্ম্য অনুভবে অসমর্থ এমন নহে, যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী, এমন অনেক লোকেও নব্য চিত্রকলাকে একরূপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা দেখিতে যাইবার সময়, হঠাৎ পথের মধ্যে থামিয়া, লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাশয়, একটি কথা। আজকাল ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির নমুনা বলিয়া যে-সকল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, আপনাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি ত সেই রকমের নয়?" এই শ্রেণীর লোকের মত উপেক্ষার বস্তু নয়।† প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি অনাদর করিবার লোক ইঁহারা নহেন। সুতরাং প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি কি তাহা সাবধানে আলোচ্য।

বিংশ শতাব্দীতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে-মতের পরিপোষণার্থ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, দেবপ্রতিমা গঠন বা অঙ্কন সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর একজন বৈষ্ণব লেখকও সেই মতেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গোপালভট্ট ("হরিভক্তিবিলাস", ৮।৪) লিখিয়াছেন—

> ভক্ত্যৈব ভগবন্মূর্ত্তি প্রাদুর্ভাবোঽপি চেদ্ভবেৎ।
> কর্ত্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽত্র পূর্ব্বৈঃ সদ্ভিঃ প্রদর্শিতঃ॥

"যদিও ভক্তিবলেই ভগবানের মূর্ত্তি কল্পিত হইতে

* "বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ" (বীরবল), ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০।

† এই "সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" মহাশয় "সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী" হইতে পারেন; কিন্তু "প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতি"র সহিত তাঁহার পরিচয় কতটুকু, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী হইলেই যেমন পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মে না, প্রাচ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা আর দশজনের মত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও তদ্দারা ইউরোপীয় চিত্রকলা বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করি নাই। ইংরাজী কাব্যনাটকের রসজ্ঞ হইতে হইলেও আমাদের মত সাধারণ লোকদিগকে টেন ডাউডেন আদি সমালোচকদের আশ্রয় লইতে হয়। অথচ রসায়ন, ভূতত্ব, উদ্ভিদতত্ব গণিত প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত অনেক লোকও মনে করেন যে, চিত্রের রসজ্ঞ হইতে হইলে বিশেষভাবে কোন অধ্যয়ন, অনুশীলন বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না।—সম্পাদক।

পারে, তথাপি পুরাকালের সাধুগণের প্রদর্শিত উপায়ই এক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া গোপালভট্ট ["হরিভক্তি-বিলাসের"] "শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাব" নামক অষ্টাদশবিলাসে প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোপালভট্টের এই নিবন্ধ, বরাহমিহির প্রণীত "বৃহৎসংহিতা"র "প্রতিমা লক্ষণ" নামক ৫৭ অধ্যায় এবং তাহার টীকা এবং "মৎস্য পুরাণ" অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে প্রাচীন চিত্রকলারীতির পরিচয় প্রদান করিতে যত্ন করিব।

গোপালভট্টকৃত "মৎস্যপুরাণের" মতে প্রতিমা চারি প্রকার,—চিত্রজা, লেপ্যা (মৃণ্ময়ী), শাস্ত্রোৎকীর্ণা (পাষাণ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত) এবং পাকজা (ধাতুমূর্ত্তি)।

"পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা।"

"পটে, ভিত্তিগাত্রে এবং পাত্রগাত্রে অঙ্কিত প্রতিমাকে চিত্রজা প্রতিমা বলে।" প্রতিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রধান ব্যবস্থা,—প্রতিমার অবয়বের পরিমাণ। এই পরিমাণের মূল অঙ্ক (unit) প্রতিমার "স্বকীয় অঙ্গুল।" প্রতিমাকে যত দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়, সেই দৈর্ঘ্যকে ১০৮ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে "স্বাঙ্গুল" বা স্বকীয় অঙ্গুল বলে। এই ১০৮ স্বাঙ্গুল দৈর্ঘ্য কল্পনা-প্রসূত নয়, স্বভাবের অনুকরণ মাত্র। বরাহমিহির "পুরুষ-লক্ষণ" প্রসঙ্গে (বৃহৎ সংহিতা, ৬৭।১০৫) লিখিয়াছেন—

"অষ্টশতং ষণ্ণবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্।
উত্তমসমহীননামঙ্গুলসংখ্যা স্বমানেন॥ *

"স্বকীয় অঙ্গুল অনুসারে উত্তম পুরুষের পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল, মধ্যম শ্রেণীর পুরুষের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল, এবং হীন পুরুষের পরিমাণ ৮৪ অঙ্গুল।"

টীকাকার ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন,—"ভূপাদসংযোগ" হইতে "শিরোমধ্য" পর্য্যন্ত সূত্র ধরিয়া, পুরুষকে মাপিতে হইবে। গোপালভট্ট স্বাঙ্গুলের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া "পুরাণ তন্ত্রাদি" গ্রন্থ হইতে প্রতিমার বিভিন্ন অবয়বের পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন—

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে এই বচনটি দেখাইয়া দিয়াছেন।

"অন্যচ্চালিখিতং কার্যং লোকদৃষ্ট্বাঽখিলং বুধৈঃ।"

"এতদ্ভিন্ন যাহা এখানে লিখিত হয় নাই, পণ্ডিতগণ লোক-মধ্যে সেই সেই অঙ্গের সৌষ্ঠবাদি দেখিয়া, তাহা সম্পাদন করিবেন।" "হরিভক্তিবিলাসে"র টীকাকার "লোকদৃষ্ট্বা"র অর্থ লিখিয়াছেন, "লোকেষু তত্তদঙ্গ-সৌষ্ঠবাদি দৃষ্ট্বা"।

বরাহমিহির (৫৭।১৪) শাস্ত্রোৎকীর্ণা প্রতিমার মানের সহিত চিত্রজা প্রতিমার মানের কিরূপ প্রভেদ তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যথা—

"দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাচ্চতুর্দশায়ামতোঽঙ্গুলানি শিরঃ।
দ্বাদশ তু চিত্রকর্ম্মণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যাঃ॥"

"প্রতিমার মস্তকের পরিধি ৩২ অঙ্গুল এবং দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুল; চিত্রে পরিধির ১২ অঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, অপর ২০ অঙ্গুল অদৃশ্য থাকে।" চিত্রকরের জন্য গোলাকার অবয়বের বিস্তার এবং ভাস্করের জন্য পরিধির মান প্রদত্ত হইয়াছে। † প্রতিমার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং চাহনির ও হাসির ভঙ্গি সম্পাদন বিষয়ে গোপালভট্ট "হয়শীর্ষীয়ে"র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদি নিরীক্ষণং।
তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহং যত্নেন দেশিকৈঃ॥"

টীকা। "লক্ষণং অঙ্গসৌষ্ঠব-প্রকারং। যথা মুখস্য পূর্ণচন্দ্রাদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পদ্মপত্রেণ সাদৃশ্যমিত্যাদি। তত্তদঙ্গংবা কিঞ্চ। নিরীক্ষণমবলোকনং হসিতাদি চ দৃষ্ট্বা। তথা তেন লোকোত্তরবিষয়ক দৃষ্টলক্ষণ-প্রকারেণ বীপ্সা তদার্ঢ্যার্থী তত্তল্লক্ষণঞ্চ সামুদ্রকাদ্যুক্তং। সাক্ষাৎকস্মিংশ্চিৎ সুপুরুষে দৃশ্যমানঞ্চ জ্ঞেয়ং।"

'লোকের অঙ্গসৌষ্ঠব বা অবয়বলক্ষণ এবং হাসির এবং চাহনির ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক ঠিক সেইরূপ গঠন করিবেন।"

ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা ধর্ম্মের অঙ্গ। শিল্পশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধের ন্যায় পুণ্য-পাপকর এবং কল্যাণ-অকল্যাণকর। প্রতিমা অঙ্কনে কি কি নিষিদ্ধ, তাহা "মৎস্যপুরাণে" (২৫৯।১৫-২১) এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে—

† বিস্তারের তিনগুণ পরিধি।

"নাধিকাঙ্গা নহীনাঙ্গাঃ কর্তব্যা দেবতা কচিৎ ।
স্বামিনং ঘাতয়েন্ন্যূনা করালবদনা তথা ।
অধিকা শিল্পিনং হন্যাৎ কৃশা চৈবার্থনাশিনী ॥
কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্মাংসা ধননাশিনী ।
বক্রনাশা তু দুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী ॥
* * * * * *
সম্পূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রদা সদা ॥"

"দেবতার প্রতিমা কখনও অধিকাঙ্গী বা হীনাঙ্গী করিবে না। প্রতিমার বদন যদি ন্যূন বা ভয়ঙ্কর হয়, তবে স্বামীকে নাশ করে; অধিকাঙ্গী প্রতিমা শিল্পীকে বধ করে, কৃশাঙ্গী প্রতিমা অর্থনাশ করে। কৃশোদরী প্রতিমা দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করে এবং অস্থিচর্ম্মসার (মাংসহীন) প্রতিমা ধন নাশ করে। যে প্রতিমার নাসা বক্র তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, এবং যে প্রতিমা সংক্ষিপ্তাঙ্গ তাহা ভয়োৎপাদন করে। * * * যে প্রতিমা সম্পূর্ণাবয়বা তাহাই সর্ব্বদা আয়ু এবং ধনবৃদ্ধি করে।"

প্রতিমাকে কান্তি-বিলাস-বিভ্রমময়ী করিতে হইলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এই-সকল শাস্ত্রবচনে তাহাই বিহিত হইয়াছে। দুইদিক দেখিয়াই এই-সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। একদিক্, নিসর্গনিষ্ঠা (fidelity)—সুপুরুষের অবয়বে এবং মুখভঙ্গীতে যাহা কিছু শোভন তাহার অনুকরণ। কিন্তু সুপুরুষের সমুদয় সুলক্ষণ একাধারে কেবল সামুদ্রিক শাস্ত্রেই দেখা যায়, লোক-সমাজে অতি বিরল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সান্নিবেশের অবস্থাকেও কতকটা কল্পনার কার্য্য (ideality) বলিতে হইবে। নিসর্গনিষ্ঠা এবং কল্পনা (fidelity এবং ideality) এই উভয়ের সমন্বয় সাধনই আমাদের চিত্রকলার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শ, তাই শকুন্তলার বর্ণনা করিতে গিয়া, মহাকবি লিখিয়াছেন—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা"
"পটেতে লিখিয়া আগে বিধাতা করেছে পরে জীবন সঞ্চার।"

শিল্পশাস্ত্রে প্রতিমার অবয়ব-কান্তি-সম্পাদনের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, কি নিয়মে প্রতিমাকে "ভাবাঢ্য" করিতে হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই এবং থাকিতেও পারে না। ভাবাঢ্যতা বা সত্ত্বযোগ-পরিকল্পনা সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার কার্য্য। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সেরূপ প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। শিল্পী কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষা-সম্পন্ন হইবেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিবেন গোপালভট্টধৃত মৎস্য পুরাণের নিম্নোক্ত বচনে তাহা বিবৃত হইয়াছে—

"বিবিক্তে সংবৃতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
পূর্ব্ববৎ কালদেশজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ শুক্লভূষণঃ ॥
প্রযতো মিতাহারো দেবতাধ্যানতৎপরঃ ।
যজমানানুকূল্যেন বিদ্বান্ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
* * * *
শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ দ্রব্যং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ।
স্বস্তিবাচনকং কৃত্বা প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ ॥"

"সংযতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, মিতাহারী, দেবতাধ্যানতৎপর, বিদ্বান, শুক্লবসন শিল্পী (স্থপতি) যত্নবান হইয়া যজমানের কল্যাণের নিমিত্ত আবৃত নির্জ্জন স্থানে কার্য্য করিবে। * * শ্বেতচন্দন এবং শ্বেত পুষ্পের দ্বারা দ্রব্যকে (শিলা বা পটাদি উপাদান) ভক্তিভরে পূজা করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক প্রতিমাকে বিভাগ করিবে।"

ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম মাত্র প্রদত্ত হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলচিত্রকলার অভ্যুদয়ের সমসময়ে এই রীতিই যে যথাসম্ভব অনুসৃত হইত, গোপালভট্টের নিবন্ধই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই রীতির ফলে ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রমাণ দিব। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে প্রথম স্থান অজণ্টার গুহা-চিত্রাবলীর। মিসেস্ হেরিংহাম (Mrs. Herringham) প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে এবং তাঁহার নেতৃত্বে শ্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার অজণ্টার গুহা-চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মিসেস্ হেরিংহাম বলেন, অজণ্টাচিত্রের, (the outline is in its final state firm but modulated and realistic) বাহ্যরেখা সমাপ্তিকালে দৃঢ়তার সহিত অঙ্কিত অথচ ঢলঢল-ভাবময় এবং স্বভাবসঙ্গত।* মিসেস হেরিংহাম ১৭নং গুহায় অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে বলেন †—

* *Festival of Empire, Indian Section, Guide and Catalogues*. P. 29.
† Quoted in V. A. Smith's *A History of Fine Art in India and Ceylon*, Oxford, 1911, Pp. 293-294.

"Further, in Çave 17 there are three paintings by one hand very different from all the rest. They are (1) a hunt of lions and black buck; (2) a hunt of elephants; and (3) an elephant salaaming in a king's court—the companion picture to No. 2. These pictures are composed in a light and shade scheme which can *scarcely be paralled in Italy before the seventeenth century. They are nearly monochrome (warm and cool greys understood), except that the foliage and grass are dull green. The whole posing and grouping is curiously natural and modern, the drawing easy, light and sketchy and the painting suggestively laid in with solid brush strokes—in the flesh, not unlike some modern French painting. The animals—horses, elephants, dogs and black buck—are extremely well-drawn.*"

অর্থাৎ ১৭ নং গুহায় একই হাতের অঙ্কিত তিনখানি ছবি আছে। এই তিনখানি চিত্র অজণ্টার অন্যান্য চিত্র হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম চিত্রের বিষয় সিংহ এবং কৃষ্ণমৃগ শিকার; দ্বিতীয়, হাতী শিকার; তৃতীয়, একটি হাতী রাজদরবারে নমস্কার করিতেছে। এই চিত্রগুলিতে আলো ও ছায়া যথাবিধি পাশাপাশি রাখিয়া বর্ত্তুলাকৃতি দেখান হইয়াছে। আলো ও ছায়ার এরূপ সমাবেশ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইতালীয় কোন চিত্রে দেখা যায় না। চিত্রিত বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ববিন্যাসভঙ্গী এবং সমষ্টির সমাবেশভঙ্গী স্বাভাবিক এবং আধুনিক চিত্রকলা-সম্মত। অনেকানেক বিষয়ে এই সকল চিত্র আধুনিক ফরাসী চিত্রের সহিত তুলনীয়।"

এই তিনখানি চিত্র কোনও বিদেশীয় চিত্রকরের কৃত বলিয়া অনুমান করা যায় না, কেননা তৎকালে ভারতবর্ষের বাহিরে এরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই-সকল চিত্রের প্রধান গুণ স্বাভাবিকতা এবং তজ্জন্য আলো ও ছায়ার সুসমাবেশ। শাস্ত্রে দেবতা অঙ্কনের রীতি বিহিত হইয়াছে, মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি অঙ্কনের রীতি উক্ত হয় নাই। দেবপ্রতিমা অঙ্কনের রীতি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ নিসর্গনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় লৌকিকচিত্র অঙ্কনে নিসর্গই চিত্রকরের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত। নিসর্গানুসরণরীতির চরমোৎকর্ষ অজন্তার এই ১৭ নং গুহায় তিনখানি চিত্রে দৃষ্ট হয়। তৎকালে এইরূপ স্বভাবসম্মত-লৌকিকচিত্র-অঙ্কনক্ষম অনেক চিত্রকরই যে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ভাস, কালিদাস, হর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের নাটকসমূহে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ভারতীয় লৌকিক চিত্রকলারীতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। ধীবর হইতে প্রাপ্ত স্বীয় অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া, দুষ্মন্তের স্মরণ হইয়াছে, তিনি যথার্থই শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং নিরপরাধিনীর প্রত্যাখ্যানজনিত পশ্চাত্তাপ তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। দুষ্মন্ত স্বহস্তে চিত্রফলকে শকুন্তলার একখানি প্রতিকৃতি লিখিয়াছেন। তিনি বিদূষকের সহিত মাধবীমণ্ডপে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় চতুরিকা চিত্রফলকহস্তে প্রবেশ করিয়া "চিত্রগতা" শকুন্তলাকে দেখাইলেন। অমনি বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—

"সাধু বয়স্য। মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে।"

"সাধু সাধু! সুবিন্যস্ত অঙ্গে ভাবের অভিব্যঞ্জন সুন্দর হইয়াছে। (সমতল চিত্রফলকে) অবয়বের নিম্ন এবং উন্নত অংশগুলি এমন সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃত নিম্নোন্নত প্রদেশ দেখিবার সময় যেমন নেত্রগোলকের গতিস্খলন হয় এই চিত্রদর্শনের সময়েও সেইরূপ দৃষ্টিস্খলন হইতেছে।"

আলো ও ছায়ার সম্যক্ সমাবেশ ভিন্ন কি চিত্রের নিম্নোন্নত প্রদেশে দৃষ্টিস্খলন সম্ভব? এই চিত্র বর্ণনা যে কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত নয়, অজণ্টার ১৭ নং গুহার তিনখানি চিত্র তাহার সাক্ষী। কালিদাস স্বচক্ষে ওরূপ অনেক চিত্র দেখিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছেন,—"স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে!" বিদূষকের এই প্রশংসাবাক্য বিরহবিধুর দুষ্মন্তের হৃদয়ের ব্যথা যেন একটু অপসারিত করিল। দুষ্মন্ত সুনিপুণ শিল্পিসুলভ বিনয় সহকারে বলিলেন—

"যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥"

"যাহা চিত্রে অবিকল অঙ্কিত করা যায় না তাহা অন্য প্রকারে অঙ্কিত করিতে হয়। তথাপি তুলিকার রেখার দ্বারা তাঁহার লাবণ্য কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে।"

চিত্রখানি অর্দ্ধলিখিত হইয়াছিল মাত্র। তাই দুষ্মন্ত চতুরিকাকে বর্ত্তিকা (তুলিকা) আনিতে পাঠাইলেন।

বিদূষক সেই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি লিখিতে বাকী আছে ?" রাজা উত্তর করিলেন—

"কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী।
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরো র্নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥"

"হংসমিথুন-সুশোভিতা তটশালিনী মালিনী নদী লিখিতে হইবে; মালিনীর উভয়পার্শ্বস্থ মৃগদলমণ্ডিত হিমাদ্রির পবিত্র পাদদেশ লিখিতে হইবে। যাহার শাখা হইতে (মুনিজনের পরিধেয়) বল্কল ঝুলিতেছে এইরূপ তরুর অধোদেশে কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গে মৃগী বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে এইরূপ চিত্র নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।"

কালিদাস এস্থলে যেরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape অঙ্কনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যথাযথ অঙ্কিত করিতে হইলে, বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব এবং আপেক্ষিক আকার (Perspective) প্রদর্শন আবশ্যক। কালিদাসের এই একটি শ্লোকই সাক্ষ্য দান করিতেছে, যথাযথ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখিবার জন্য ভারতীয় চিত্রকর কিরূপ যত্নবান্ ছিলেন; কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, নিদর্শনাভাবে, তাহা বলা কঠিন। চীনদেশীয় চিত্রকরগণ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখনের নৈপুণ্য কতক পরিমাণে হয়ত ভারতশিল্পীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। চীনদেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়া সন্নিবেশের চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া চীনচিত্রকরের শিক্ষাগুরু ভারত-শিল্পীও সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে।

অজন্তার ১৭নং গুহার চিত্র এবং কালিদাসের শকুন্তলা প্রায় একই কালের সৃষ্টি। ভারতের শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র-সংস্থানের সেই গৌরবময় যুগের শেষ সীমায় ভবভূতি দণ্ডায়মান। ভবভূতির সময়ে কিরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র লিখিত হইত 'উত্তররামচরিতের' চিত্র-দর্শন-নামক প্রথম অঙ্কই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে সময়ে ভবভূতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার পর শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে) গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র দেশে ধীমান এবং বিতপাল নামক দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিতপাল ধীমানের পুত্র। উভয়ে পাকজা, এবং শাস্ত্রোৎকীর্ণা, এই ত্রিবিধা প্রতিমা নির্ম্মাণেই পটু ছিলেন, এবং সারা বাঙ্গালা, মগধ, এবং নেপালের শিল্পীগণ ইঁহাদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। ধীমান এবং বিতপাল যে কলারীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বৌদ্ধ নরপালগণের সময় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল, বৈষ্ণব বর্ম্ম-বংশের এবং সেন-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের ফলে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাই তারানাথের প্রদত্ত বাঙ্গলার শিল্পেতিহাসের সার মর্ম্ম।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ধীমানের ও বিতপালের প্রতিষ্ঠিত রীতিতে অঙ্কিত পাল ও সেন নরপালগণের সময়ের চিত্রজা প্রতিমার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু শাস্ত্রোৎকীর্ণা অনেক পাষাণ প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। এই-সকল প্রতিমা সম্পূর্ণাঙ্গ (statue in round) নহে, প্রস্তরফলকে আংশিকভাবে উৎকীর্ণ (relief sculpture) এক প্রকার অর্দ্ধচিত্র (half drawing)। এইরূপ দুইখানি পাষাণ-প্রতিমার চিত্র হইতে বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পরীতির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে যত্ন করিব।

প্রথম চিত্র, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার প্রতিমা। প্রতিমাখানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুত যামিনীকান্ত মুন্সী রাজসাহী জেলার তানোর থানার অন্তর্গত বারোপুটা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। হেমাদ্রির "ব্রতখণ্ডে" "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" হইতে ব্রহ্মার মূর্ত্তির এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণং কারয়েদ্বিদ্বান্ দেবং সৌম্যং চতুর্ভুজম্।
বদ্ধ পদ্মাসনস্থং তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরম্॥
জটাধরং চতুর্বাহুং সপ্তহংসরথস্থিতং।
বামে ন্যস্তেতরকরন্তস্যৈকস্যোদ্ধর্বগং ভবেৎ (?)॥
এতস্মিন্ দক্ষিণে পাণাবক্ষমালা তথা শুভা।
কমণ্ডলুং দ্বিতীয়েচ সর্ব্বাভরণধারিণম্॥
সর্ব্বলক্ষণযুক্তাস্যং শান্তিরূপঞ্চ পার্থিব।
পদ্মপত্রদলাগ্রাভং ধ্যানসংমিলিতেক্ষণম্।
অর্চ্চায়াঙ্কারয়েদ্দেবং চিত্রে বা বাস্তুকর্ম্মণি॥

"মৎস্য পুরাণে" (২৬০।৪০) ব্রহ্মার প্রতিমা নির্ম্মাণের যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে বাহন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "হংসারূঢ় কচিৎকার্য্য, কচিচ্চ কমলাসন।" আমাদের

চিত্রের ব্রহ্মামূর্ত্তি ঠিক শাস্ত্রানুরূপ নহে। শিল্পীর স্বাধীন রুচি এই বৈষম্যের কারণ। তথাপি চিত্রের ব্রহ্মায় শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার যাহাতে ব্রহ্মত্ব তাহা আশ্চর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর অবয়ব-গঠন-কৌশল উচ্চ অঙ্গের না হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ নিম্ন হস্তের জপের মালা যেন চলিতেছে। সমগ্র প্রতিমায় সৌম্যতা এবং শান্তিরূপ সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিল্পীর প্রতিভার প্রধান পরিচয়স্থল তিনখানি মুখ (চতুর্থ অদৃশ্য)। তিনখানি মুখই "ধ্যানসংমিলিতেক্ষণ," এবং অপার্থিব সুষমামণ্ডিত। এই তিনখানি মুখের দিকে তাকাইলে, মনে হয়,—

"ঐ দেখা যায় আনন্দধাম ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়;
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন"—

যেন সেই আনন্দধামের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুশিল্পী গ্রীক শিল্পীর মত পৌত্তলিক ছিলেন না। হিন্দু শিল্পীর নির্ম্মিত প্রতিমা অজ্ঞানের উপাস্য পুত্তলিকা নয়, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞান-পরিস্ফুট প্রেমপুষ্পাঞ্জলি! ব্রহ্মার পারিপার্শ্বিক সাবিত্রী এবং সরস্বতীর মূর্ত্তি গঠনে শিল্পী তেমন কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহন হংস স্বভাবসম্মত না হইলেও সু-কৌশলে উৎকীর্ণ, যেন ধীরে ধীরে হংস-গতি চলিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র, বিষ্ণুর প্রতিমা। এই প্রতিমাখানি ভগ্ন হইলেও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত যোগীগুম্ফার মন্দিরে এখনও পূজিত হইতেছে। প্রতিমার জানুর নিম্নভাগ অযত্নে উৎকীর্ণ, কারণ এই অংশ মন্দিরের বহির্ভাগস্থ দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইত না। এই বিষ্ণু-প্রতিমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে পদদ্বয় উপেক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধভাগে চিত্তসংযোগ করিতে হইবে। প্রতিমার মুখ যেমন কান্ত তেমন ভাবাঢ্য। এই প্রসন্ন গম্ভীর মুখমণ্ডলে জগৎমাতার বিশ্বজনীন প্রীতি এবং ন্যায়-পরতা সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হস্তচতুষ্টয়, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ গঠনে শিল্পী অত্যাশ্চর্য্য স্বভাবানু-করণসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অনুকরণে খুঁটি-নাটি উপেক্ষিত হইয়া প্রতি অঙ্গে অপার্থিব কমনীয়তা সংক্রামিত করিয়াছে। শান্তিদ দক্ষিণনিম্ন হস্ত যথার্থই যেন শান্তিধারা ঢালিতেছে। আজানুলম্বিনী বনমালা বনফুলের মালার মতই এলাইয়া পড়িয়াছে। এই "সৌম্য-রূপঃ সুদর্শনঃ" প্রতিমায় শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেবতাধ্যানতৎপর শিল্পী—

"লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদি নিরীক্ষণং
তথা তথৈব"—

গড়িয়া তুলিয়াছেন।

হেভেলও ভারতীয় ভাস্করকলার মূলে এই নিসর্গনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন হিন্দুহৃদয়ে নিসর্গ-প্রেমের অভাব বশতঃ হিন্দুস্থানে ললিতকলা অভ্যুদয়ের অবসর পায় নাই তাঁহাদের উত্তরে হেভেল বলেন—

"The sculptor who carved the great bull at Mamallapuram and elephants at Kanarak were as perfect masters of their art as the Greeks. Both the realism of such works as these and the idealism of the sublime Buddha at Anuradhapura, of the four-armed Siva of the Madras Museum, or of the four-headed Brahma at Leyden proceed from a reverent and profound study of nature, and neither the one nor the other could have been achieved without it."*

"যে-সকল ভাস্কর মামল্লপুরের বৃহৎ বৃষ এবং কণা-রকের হস্তী উৎকীর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যে গ্রীকগণের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপ মূর্ত্তির স্বাভাবিকতা এবং অনুরাধপুরের বুদ্ধমূর্ত্তির, মান্দ্রাজের যাদুঘরের চতু-র্ভুজ শিবের, এবং লেডেনের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা-মূর্ত্তির কল্পনা-কৌশল এতদুভয়ই শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং গভীর নিসর্গনিষ্ঠার ফল। নিসর্গনিষ্ঠা ব্যতীত স্বাভাবিকতা অথবা কল্পনাকৌশল দুটীর একটিও আয়ত্ত করা যাইত না।"

মুসলমানবিজয়ের পরবর্ত্তী সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের হিন্দুস্থানের চিত্রকলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সম্রাট্ আকবরের যত্নের ফলে মোগল চিত্রকলার অভ্যুদয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সাহজাহাঁর সময় ইহার পূর্ণ পরিণতি। মোগলচিত্রকলার বারণ্য এখন সর্ব্বত্রই আদরলাভ করিয়াছে, সুতরাং এস্থানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোগলচিত্রকলা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকরের আদর্শ হইতে পারে কি না ইহাই

* Havell, *The Ideals of Indian Art*, London, 1911, pp. 162—163.

ব্রহ্মা।

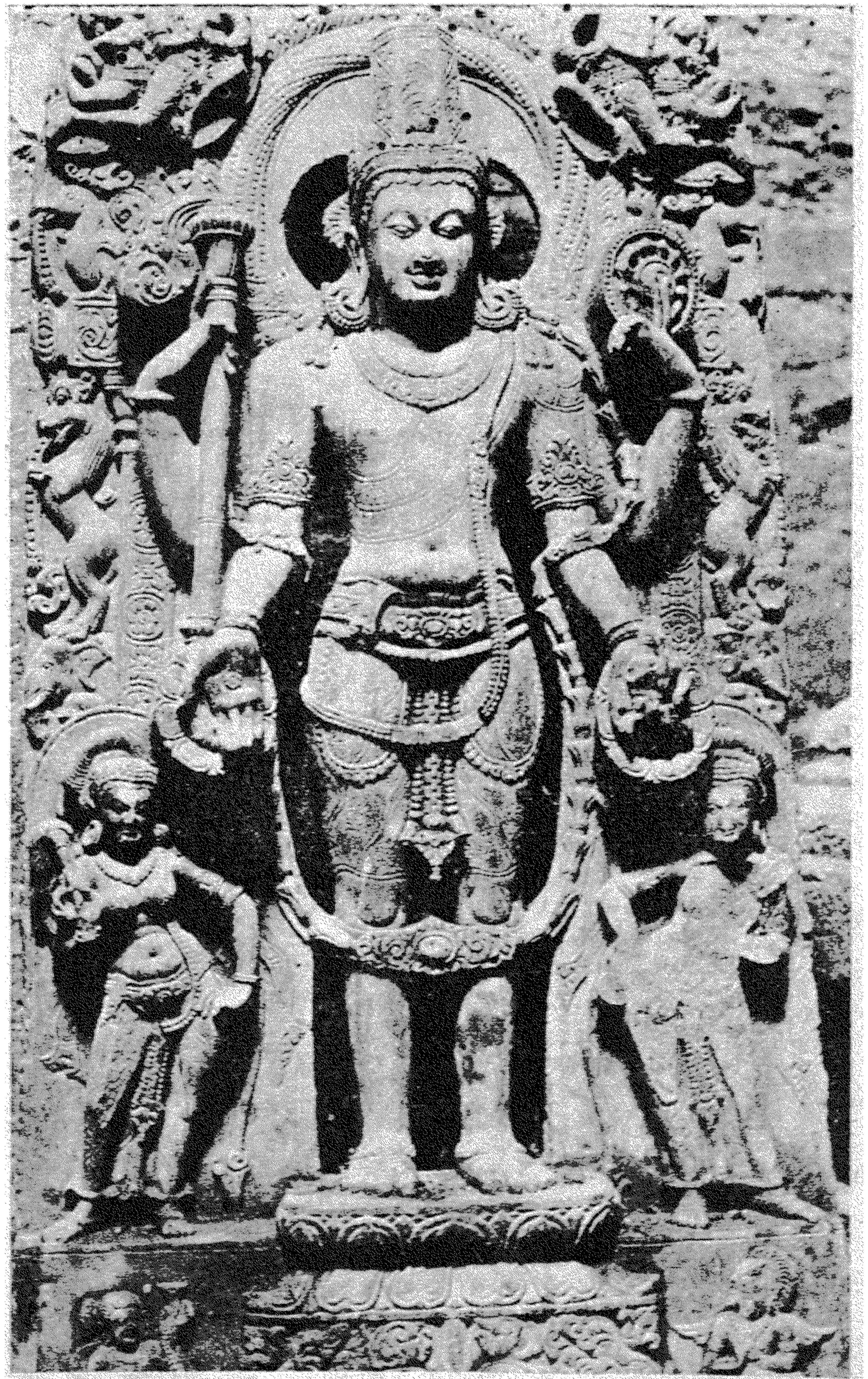

বিষ্ণু।

আলোচ্য। চিত্রকলা আমাদিগের কি উপকার সাধন করিতে পারে; হয়শীর্ষের ভাষায় চিত্র মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে ("অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ)"—মানুষের হৃদয়ে, নামে ভক্তি জীবে দয়া সঞ্চারিত করিতে পারে—অসম্পূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার দিকে চালিত করিতে পারে। কিন্তু মোগলচিত্রকলা বিলাসীর ভোগের বস্তু, ত্যাগীর বা যোগীর কেহ নয়; চিত্তহারী হইলেও উচ্চভাবোদ্দীপক নয়; ইহার ভিতর দিয়া উদ্দাম কল্পনা এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। *

তারপর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু চিত্রকলা। ডাক্তার কুমারস্বামী ইহার নাম রাখিয়াছেন "রাজপুত চিত্রকলা," এবং ভাবাঢ্যতায় মোগল চিত্রকলা অপেক্ষা ইহাকে উচ্চতর স্থান দান করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতনের সহিত তুলনায় রাজপুত চিত্রকলার স্থান কোথায়? এ স্থলে হেভেলের মত উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা—

"From the sixteenth century the creative impulse in Hindu art began to diminish, though its technical traditions have maintained their vitality down to modern times." †

"ষোড়ষ শতাব্দী হইতে হিন্দু শিল্পের সৃষ্টিক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যদিও হিন্দুশিল্পের বহিরঙ্গ-রচনা-রীতি-বিষয়ক সংস্কার অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে।"

* "The dominant themes in the art of the Period (Mogul Period) were therefore not religions, but the romance of love and of war, the legends of Musalman and Rajput chivalry, the pageantry of state ceremonial and portraiture."—*The Ideals of Indian Art*, p. 141

"On the whole, study of a multitude of examples of the outturn of Indo-Persian or Mughul school leaves the impression on my mind that its place in the art history of the world is that of a minor, not a major art. The best examples are charming, pretty, graceful, and so forth, but lack greatness. They are all too small to possess the dignity and breadth of large pictures, while they rarely display much imaginative power, and never, hardly ever, any serious religious emotion." V. A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon*, p. 497.

† *The Ideals of Indian Art*, p. 140.

উপসংহারে বাঙ্গালার নব্য চিত্রকলার কথা। কিন্তু আশ্বিনের এবং কার্ত্তিকের "প্রবাসী" ও "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত বাদানুবাদের পরে সকলে আমাকে নব্য চিত্রকলার নিরপেক্ষ সমালোচনার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ। আমিও এ প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। চিত্রকলা অনুভবের সামগ্রী। সুতরাং এ বিষয়ে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বলিলে ক্ষতি নাই। কলিকাতার ওরিয়েণ্টেল আর্ট সোসাইটীর একজন নব্যচিত্রকলানুরাগী সদাশয় সাধক সদস্যকে কিছুদিন পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বলুন ত, ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার এবং ভাস্করকলার মহিমা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নব্য চিত্রকলা বুঝিতে পারি না কেন?" যাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বচনবাগীশ নহেন, সুতরাং কথা কহিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন না, কিন্তু ব্যথিত হইলেন। আমিও সুজনের প্রাণে ব্যথা দিয়াছি বলিয়া কিছু সন্তপ্ত হইলাম। তারপর "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" (ভারতী, আশ্বিন, ৫৮৮-৫৯১ পৃঃ) পাঠ করিয়া নব্যচিত্রকলার প্রাণের কথা জানিতে পারিলাম। সে কথা, 'বিষ্ণুর চার হাতের পরিচয় ততটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা বিষ্ণুমূর্ত্তি-রচয়িতার দুই হাতের বরাভয়।' এ যুগে বিষ্ণুমূর্ত্তি রচিয়াছে কে যাঁহার বরাভয় মাগিতে হইবে? আমরা তাঁহার সন্ধান পাই নাই, হেভেলও তাঁহার সন্ধান পান নাই। তাই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের উপসংহারে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া লিখিয়াছেন— †

"For behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deep-rooted in the ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and art-guilds of Europe; only waiting for the spiritual and intellectual quickening which will renew its old creative instinct. The new impulse will come, as Emerson has said, not at the call of a legislature: it will come, as always, unannounced, and spring up between the feet of brave and earnest men.

অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুত্বের মধ্যে শিল্পের সজীব বীজ

† *Ibid*, pp. 143-144.

নিহিত রহিয়াছে। সেই বীজ প্রাচীন সৃষ্টিক্ষমতা পুনরায় লাভ করিবে—এখনও করে নাই—পুনরায় লাভ করিবে, কখন-না-কখন দেশের লোকের আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ জাগরিত হইবে। বাঙ্গলার এই জাগরণের উপায় কি? বাঙ্গালী যখন আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, সকল প্রকার বলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল—বাঙ্গলার প্রজা যখন অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজা নির্ব্বাচন করিত, বাঙ্গলার রাজা যখন "ভোজ—মৎস্য—কুরু—যদু—যবন—অবন্তী—গান্ধার—প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ নৃপতিপুঞ্জের গগনভেদী সাধুবাদের মধ্যে কান্যকুব্জের রাজপাট হইতে এক রাজা তুলিয়া দিয়া আর এক রাজা বসাইত, বাঙ্গলার শ্রমণ যখন হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া মধ্য এসিয়ার অধিত্যকায় "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের বীজ ছড়াইত, এবং যে কবিতাকুঞ্জের শেষ প্রতিধ্বনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ", বাঙ্গলার সেই কবিতাকুঞ্জের পিকগণ যখন মধুর গম্ভীর স্বরে গান করিত—তখন বাঙ্গলার নিয়তাহার, সংযতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবতাধ্যানতৎপর শিল্পীগণ যে স্বর্গীয় সুষমাময় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সাত শত বৎসরের পলি ঝাড়িয়া তাহার উদ্ধার সাধন, মন্দিরে মন্দিরে তাহার প্রতিষ্ঠা, এবং তন্ত্রমন্ত্র যোগে তাহার উপাসনা এই জাগরণের উপায়। কিন্তু হায়! "তাহার কথা হেথা কেহ ত বলে না, করে মিছে শুধু কোলাহল।" *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* রমাপ্রসাদ বাবু অজণ্টার কয়েকখানি ছবি 'স্বাভাবিক' বলিয়া তাহার উল্লেখ ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার অধিকাংশ ছবির প্রতিলিপি পুস্তকে ও ফোটোগ্রাফে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সেগুলিকে ত কোন ক্রমেই 'স্বাভাবিক' বলা যায় না। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি সেগুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে শতশত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার অধিকাংশই 'অস্বাভাবিক'। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি যোগ্য সমালোচকগণ সেগুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ললিতকলা বুঝিতে চান, তাঁহাদের এরূপ প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। হ্যাভেল প্রভৃতির প্রশংসা যদি এক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে অন্যত্রও অন্ততঃ বিবেচ্য হওয়া উচিত। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা, প্রভৃতি, আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকরগণের চিত্রের বিশেষ অনুরাগী।—সম্পাদক।

সম্পাদকের মন্তব্য। আমি যদি রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধটি বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে, তাঁহার মতে "স্বাভাবিকতা" (realism) মূর্ত্তির একটি উৎকর্ষলক্ষণ এবং তাঁহার উদাহৃত মূর্ত্তি দুটিও স্বাভাবিক। ঐ মূর্ত্তি দুটি (যাহাদের প্রতিলিপি প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হইল) যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে অবনীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার ছাত্রদের আঁকা এরূপ অনেক ছবির নাম করিতে পারি, যেগুলি ঐরূপ স্বাভাবিক।

আমি আমাদের দেশের আমার মত শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে দেশী ও বিদেশী ছবি কম ঘাঁটিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। দেশীয় আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন রীতির ছবি ছাপিয়া অর্থ—"নষ্ট" করিয়াছি এবং বিদ্রূপভাজন হইয়াছি সমুদয় ভারতবর্ষীয় সম্পাদকের চেয়ে বেশী। তাহাতে আমার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে এরূপ মনে হয় না। তবে, আমার ধারণা এই হইয়াছে যে অবনীন্দ্র বাবু ও তাঁহার ছাত্রেরা চিত্রকলার প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অনেকে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদের দু একটা মুদ্রাদোষে যেমন তাঁহার গুণ ঢাকা পড়ে না, তেমনি নবীন শিল্পীদের কোন কোন ছবিতে mannerismএর আতিশয্য থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নয়: এবং এই mannerism সব ছবিতেই আছে এরূপ মনে করা ভুল। হ্যাভেল সাহেবের মত যদি অন্য বিষয়ে গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে, নবীন শিল্পীদের তিনি যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা অবজ্ঞেয় না হইতে পারে।

আমি এক সময়ে রবিবর্ম্মা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলাম। আমার লেখা তাঁহার সচিত্র ইংরাজি জীবনচরিত এখনও বাজারে বিক্রী হয়। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে ছবি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত উত্তেজিত ভাবে চিঠি লিখিয়া রবিবর্ম্মার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তর্ক করিয়াছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে সেই মনস্বিনী বত্রিশ পৃষ্ঠা এক চিঠি লিখিয়া, একটু বিবেচনার পর, তাহা আমাকে পাঠান নাই; তাঁহার এই চিঠি বোধ হয় এখনও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট আছে। পরে স্বর্গীয়া লেখিকারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এই ভাবিয়া আমাকে ইহা পাঠান নাই যে আমি ছবি দেখিতে দেখিতে উহার মর্ম্মজ্ঞ হইব, তর্ক দ্বারা আমার চোখ খুলিবে না। মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু এখন, তাঁহার যেরূপ ছবি ভাল লাগিত, আমিও তদ্রূপ ছবির অনুরাগী হইয়াছি।

আমার আর একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে যেমন ছন্দঃপতন না ঘটাইয়া পদ্য লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, বা ছন্দে ভুল থাকিলেই কবিতার উৎকর্ষ লুপ্ত হয় না; তদ্রূপ প্রকৃত বস্তুর বা ইতর প্রাণীর বা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাপ, আকার, রং, ইত্যাদি ঠিক রাখিয়া ছবি আঁকিতে পারিলেই ললিতকলাকুশল (আর্টিষ্ট) হওয়া যায় না, বা ঐসব বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম হইলেই চিত্রকলা হিসাবে ছবিখানা অপকৃষ্ট হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ছন্দঃপতনও উৎকৃষ্ট কবির লক্ষণ নয়, "অস্বাভাবিকতা"ও উৎকৃষ্ট আর্টিষ্টের লক্ষণ নয়।

এ বিষয়ে কাহারও সহিত তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই। আমার যাহা অভিজ্ঞতা ও মত, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ বা বস্তুতন্ত্রতা যে আর্ট নহে, তাহা বুঝিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে।—সম্পাদক।

দ্বিপদী

১

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা ?

২

ভালো যে করিতে চাহে ফেরে দ্বারে এসে।
ভালো যে বাসিতে পারে সর্ব্বত্র প্রবেশে।

৩

প্রেমেরে যে করিয়াছে কর্ত্তব্যের অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ।

৪

ফুল দেখিবারে যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে।

৫

চাও যদি সত্যরূপে দেখিবারে মন্দ,
ভালোর আলোতে দেখ, হোয়োনাকো অন্ধ।

৬

ধুলায় মারিলে লাথি ঢোকে চোকে মুখে।
জল ঢালো বালাই নিমেষে যাবে চুকে।

৭

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বল শোনায় না মিঠে।

৮

হয় কাজ আছে তব, নয় কাজ নাই।
কিন্তু "কাজ করা যাক্‌" বলিও না ভাই।

৯

কাজ সে ত মানুষের এই কথা ঠিক্‌।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক্‌ তারে ধিক্‌।

১০

অবকাশ কর্ম্মে খেলে আপনারি সঙ্গে,
সিন্ধুর স্তব্ধতা খেলে সিন্ধুর তরঙ্গে।

১১

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়ে লভি তাই যাহা মূল্যবান।

১২

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটা-গাছ বোঁচা।

১৩

সব চেয়ে ভক্তি যার অস্ত্র-দেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয় আপনি সে হারে।

১৪

দর্পণে যাহারে দেখি সে ত শুধু ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব্ব করি অপূর্ব্ব এ মায়া।

১৫

আপনি আপনা চেয়ে বড় যদি হবে,
নিজেরে নিজের কাছে নত কর তবে।

১৬

একা এক শূন্যমাত্র, নাহি অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

১৭

প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদ বৃদ্ধি হবে।

১৮

মৃত্যুর ধর্ম্মই এক, প্রাণধর্ম্ম নানা।
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম্ম একখানা।

১৯

আঁধার একেরে দেখে একাকার করে'।
আলোক একেরে দেখে নানাদিকে ধরে'।

২০

হে প্রিয়, দুখের বেশে আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ বলে চিনি সেই ক্ষণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

(ভারতী-কার্ত্তিক)

উদ্ভিদাদির বৈদিক নাম—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

অতি প্রাচীন আর্য্যনিবাসে কি কি বৃক্ষলতাদি ছিল, সে-সকল কথা জানিতে পারিলে প্রাচীন আর্য্যনিবাসের ভৌগোলিক স্থিতি-বিষয়ক জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়।

বৈদিক যুগে উদ্ভিদ জাতি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইত, যথা—(১) "বীরুধ" (plant) এবং (২) "বনস্পতি" (tree)।

বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিংবা কোন বিশেষ গুণের জন্য আদৃত হইত, তাহাদের নাম ছিল "ওষধি"। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি প্রভৃতি সকল শ্রেণীকেই বুঝাইত।

বৃক্ষ-শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম :—শিকড়ের নাম ছিল "মূল" ; stem অর্থে "কাণ্ড" এবং "শাখা" ; "পর্ণ", "পুষ্প" এবং "ফল" শব্দগুলিও সে যুগে উহাদের আধুনিক অর্থেই ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এবং একালে যাহাকে "পল্লব" বলে, তাহার নাম পাওয়া যায় "বল্‌শ", এবং বৃক্ষের "স্কন্ধ" corona অর্থজ্ঞাপক। ফলের অন্য নাম "বৃক্ষ্য" হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বড় গাছ হউক, লতা হউক, ওষধি হউক, সকলগুলিই বৃক্ষ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল। বট প্রভৃতি বৃক্ষের বায়বীয় মূলের স্বতন্ত্র নাম ছিল "বয়া"। এই "বয়া" শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত নাই; অথচ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "বয়া" বঙ্গদেশের কোন কোন প্রদেশে এখনও বট গাছের "ঝুরি" অর্থে ব্যবহৃত আছে। বয়া শব্দটি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে "ব" নামেও প্রচলিত আছে।

যে শ্রেণীর উদ্ভিদ ঝোপ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে bush বলে, তাহাদের বৈদিক নাম ছিল "স্তম্বিনীঃ"। বাঁশ, তাল, খেজুর, কচু প্রভৃতি যে-সকল গাছে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটি করিয়া পাতা বাহির হইবার পর সেই পাতাটিরই খাপ বা আবরণের মধ্য হইতে আর একটি পাতা বাহির হয়, কিন্তু একসঙ্গে দুইটি পাতা নির্গত হয় না, তাহাদিগের নাম ছিল "একশুঙ্গাঃ"।

যদি একটি কাণ্ড বিভক্ত হইয়া বহু শাখায় পরিণত হইত, এবং শাখাগুলি আবার বিভক্ত হইয়া অনেক প্রশাখার সৃষ্টি করিত তবে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষগুলির নাম হইত "অংশুমতীঃ"। অন্য দিকে আবার যে গাছগুলির কাণ্ড শাখায় পরিণত না হইয়া ঊর্দ্ধ সীমা পর্য্যন্ত সোজা উঠিয়া যাইত, তাহাদিগকে "কাণ্ডিনীঃ" বলিত। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিদেরা দেখিতে পাইতেছেন যে Deliquescent এবং Excurrent শব্দদ্বয়ের অনুবাদের জন্য দুইটি চমৎকার শব্দ পাওয়া গেল। আশা করি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে এই শব্দ দুইটি নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে। "কাণ্ডিনী"র মধ্যে যে বৃক্ষগুলিতে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনেক শাখা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল "বিশাখাঃ"।

গাছে ফুল ফুটিলে গাছগুলিকে 'পুষ্পবতীঃ' বলিত বটে, কিন্তু যে-সকল গাছে ফুল ফুটে অর্থাৎ যাহারা flowering, তাহাদের নাম ছিল "প্রসূবরীঃ"। এখন এ অর্থে "সপুষ্পক" শব্দ চলিয়া গিয়াছে।

ডাঁটা বাহির হইয়া যখন ডাঁটার উপর ফুল ফুটে, তখন একটি অসংবদ্ধ প্রণালীতে ফুল ফুটিলে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে panicle বলে। এই panicleএর খাঁটি বৈদিক নাম "তূল"।

লতা অর্থে সাধারণ শব্দ ছিল "প্রতম্বতীঃ" ; এবং যে লতা গাছ বাহিয়া না উঠিলে বাড়িতে পারে না, তাহার নাম ছিল 'ব্রততি' এবং যাহারা সাধারণতঃ মাটিতেই বিস্তার লাভ করে, তাহাদের নাম ছিল "অলসালা"। বৈজ্ঞানিক প্রভেদ রক্ষা করিবার জন্য climber অর্থে 'ব্রততি' এবং creeper অর্থে "অলসালা" ব্যবহৃত হইলে মন্দ হয় না। শেষোক্ত শব্দটি কঠোর মনে হইলে অর্থ রক্ষা করিয়া "অলসা" শব্দ ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি ?

কাঠ বুঝাইবার জন্য "কৃমুক", "ক্রুমুক" এবং "দারু" শব্দ পাওয়া যায়। "পর্ণ" ভিন্ন পাতার অন্য কোন নাম পাওয়া যায় না। বাকলার নাম ছিল "বল্ক",—"বল্কল" নহে। প্রাচীন প্রাকৃতে বর্ণব্যত্যয়ে "বল্ক" "বক্ল" উচ্চারিত হইত, এবং সংস্কৃত ভাষায় ঐ দুইটি শব্দের খিঁচুড়িতে "বল্কল" শব্দ হইয়াছিল। গাছের আঠা, রস প্রভৃতি সকলেরই নাম ছিল "নির্য্যাস"।

এখন বর্ণমালাক্রমে বীরুধ এবং বনস্পতিদিগের নাম দিতেছি। (১) অজশৃঙ্গী (সম্ভবতঃ বাবলা), (২) অপামার্গ (আপাঙ্, ঔষধে ব্যবহৃত), (৩) অমলা (আম্‌লা, আমলকী), (৪) অমূলা (গাছে ঝুলিত, শিকড় হইত না এবং শরের মুখ বিষাক্ত করিবার জন্য উহার রস ব্যবহৃত হইত বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে ; একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই অমূলাকে Methonica Superba বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন), (৫) অরটু (Colosanthes Indica—ইহার কাঠে গাড়ির চাকার "ধুরো" প্রস্তুত হইত), ৬) অরাটকী (সম্ভবতঃ অজশৃঙ্গী হইতে অভিন্ন), (৭) অরুন্ধতী (এই ওষধি লতা বা ব্রততি বড় বড় গাছে উঠিত, এবং উহা "হিরণ্যবর্ণ" ছিল, এবং উহার ডাঁটার হুল থাকিত অর্থাৎ "লোমশবক্ষণা" ছিল বলিয়া অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত ; ইহাও লিখিত আছে যে, উহার রস গোরুকে খাওয়াইলে গোরু বেশি দুধ দিত, এবং ঐ লতা হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হইত), (৮) অর্ক (আকন্দ), (৯) অলাপু বা অলাবু (লাউ), (১০) অবকা বা শীপাল (গন্ধর্ব্বেরা নাকি ইহার শাক খাইতেন ; ইহা জলে জন্মিত। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকে শৈবল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ কেহ ইহাকে Blyxa Octandra সংজ্ঞা দিয়াছেন), (১১), অশ্মগন্ধা (উহার অর্থ এই যে ঐ ওষধি প্রস্তরগান্ধ ; পরবর্ত্তী সময়ে ইহারই নাম হইয়াছে অশ্বগন্ধা), (১২) অশ্বত্থ, (১৩) অশ্ববার (এক শ্রেণীর নলবিশেষ), (১৪) আণ্ডীক (পদ্ম), (১৫) আদার (আমাদের আদা) (১৬) আবয়ু (অন্য নাম সর্ষপ বা সরিষা), (১৭) আল (শস্যক্ষেত্রের আগাছা), (১৮) উদুম্বর (ডুমুর), (১৯) উর্বারু (শসা) (২০) উশনা (শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, সোমলতা না পাইলে উহা হইতে সোমরস বাহির করা হইত), (২১) এরণ্ড (খাঁটি বেদে উল্লেখ নাই ; অনেক পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই নামটি পাওয়া যায়), (২২) ঔক্ষগন্ধি—ষাঁড়ের গায়ের গন্ধবিশিষ্ট অর্থ হইলেও কোন সুগন্ধি ওষধিবিশেষ ; ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না, (২৩) কিয়াম্বু (কি প্রকারের শাক, তাহা জানা যায় না ; তবে যেখানে শব-দাহ হইত, সেখানে জলের মধ্যে লাগাইবার নিয়ম ছিল ; মৃতের সৎকারের ইহাও একটি অঙ্গ ছিল যে, কিয়াম্বু এবং (২৪) পাকদূর্ব্বা শ্মশানে লাগাইতে হইত ; (পাকদূর্ব্বা এ কালের জোয়ার), (২৫) কুমুদ, (২৬) কুষ্ঠ (ইহার আর এক নাম বিশ্বভেষজ, অর্থাৎ ইহা প্রায় সকল রোগেরই ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত ; এই বীরুধ হিমালয়ের উপরে পাওয়া যাইত, লেখা আছে), (২৭) জঙ্গিড় (ইহাকে Terminatia Arjuneya বলিয়া কেহ কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন)। (২৮) কর্কন্ধু (কেহ কেহ ইহাকে রক্তবর্ণ বদর বা কুল বলিতে চাহেন ; কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহা লাল কুমড়া ; ওড়িয়াতে কুমড়াকে "কথারু" বলে, এবং হয়-ত বা পূর্ব্বে ছাঁচি কুমড়াকে কর্কন্ধু বা কধু বলিত বলিয়াই লাউ ঐ "কধু" নামে আখ্যাত হয়), (২৯) কাকম্বীর কি বৃক্ষ, জানা যায় না। তৃণ এবং নলবর্গে কুশ, কাশ প্রভৃতি ব্যতীত (৩০) "কুশর" নামে একটি বড় নল-তৃণ উল্লিখিত দেখিতে পাই। এখন আক্‌কে অনেক স্থানে নলের মত তৃণ বলিয়া "কুশর" বলা হয়। অথচ এই বৈদিক কুশর শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত নাই। (৩১) কিংশুক, (৩২) খদির এবং (৩৩) খর্জ্জুর সম্বন্ধে কিছু বলিবার

নাই, তবে "খর্জ্জুর"এর দীর্ঘ-উকারটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। (৩৪) তিল। কিন্তু (৩৫) তিষক কি, তাহা জানি না। একজন পণ্ডিত উহাকে Symplocos Racimosa বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক্ বলিয়া মনে হইতেছে না। (৩৬) তৌলী এবং (৩৭) ত্রায়মাণ কি, তাহা জানা যায় না। (৩৮) নারাচী বলিয়া যে বিষাক্ত ওষধির নাম জানা যায়, শরে উহার প্রয়োগ হইত বলিয়াই হয়ত "নারাচ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩৯) পাটা—এক প্রকারের জলজ শৈবল বলিয়া মনে হয়। এখনও ঐ নামে শৈবল বা শৈবাল চিনি পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (৪০) পূতীক আমাদের পুঁই। (৪১) ন্যগ্রোধ আমাদের বটগাছ; (৪২) পলাশ। বেদে যে (৪৩) পিপ্পল শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ক্ষুদ্র ফল—পিঁপুল নহে। (৪৪) পীতুদারু অথবা পূতুদ্রু হিমালয়-জাত সরল বৃক্ষ বা দেবদারু। (৪৫) প্লক্ষ হইল পাকুড়, (৪৬ ও ৪৭) বদর এবং বিল্ব। (৪৮) প্রস্ব কোন বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয় না। সায়ণের টীকার অর্থ ধরিলে চারা গাছ বা তেউড় প্রভৃতি অর্থ হয়। ইংরাজি shoot কথাটিকে ওড়িয়ায় "গজা" বলিতে পারা যায়; বাঙ্গলায় কি বলিব? (কোঁড় বা কোঁড়া?) (৪৯) বজ সম্ভবতঃ আমাদের এ কালের বচ; (৫০) বিম্ব ঠিক্ তেলাকুচ বা তিক্তলকুচ বটে, এবং অথর্ব্ব বেদের (৫১) ভঙ্গ ঠিক্ নেশা করিবার ভাঙ্। (৫২) মঞ্জিষ্ঠা; (৫৩) মদুঘ (মধুঘ নহে) কোন মদ্য উৎপাদক বৃক্ষের নাম ছিল। (৫৪) বিষাঙ্কা কি প্রকার বিষাক্ত গাছ, তাহা জানা যায় না। (৫৫) শন আমাদের শণ বা hemp; কিন্তু (৫৬) শফক কি, তাহা ধরিতে পারা গেল না। (৫৭) শালুক ঠিক পদ্মের গাছের অঙ্কুর বা তেউড়। (৫৮) শমী বৃক্ষের নাম বেদে যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন পণ্ডিত-নির্দ্দিষ্ট Mimosa Suma বলিয়া উহাকে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথর্ব্ব বেদে উল্লিখিত আছে যে উহার পাতা চওড়া, এবং নির্য্যাস পান করিলে নেশা হয়। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে আছে যে, উহার রস মাখিলে শরীরের কেশ-বহুল স্থান সম্পূর্ণরূপে কেশশূন্য হয়। এই গাছের ডালেই অর্জ্জুন তাঁহার গাণ্ডীব ঝুলাইয়াছিলেন। (৫৯) শল্মলি (শাল্মলী নহে) বা শিম্বল ঠিক্ আমাদের "শিমুল"। প্রথম নামটিতে অতিরিক্ত আ-কার যোগ হইয়া সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, এবং দ্বিতীয় নামটি হইতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের "শিমুল" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। (৬০) সোমলতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু উহা যে কি প্রকারের বীরুধ্ ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের "নোবেল"-পুরস্কার প্রাপ্তি

কবি যখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"জগৎকবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব"

তখন অনেকে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—"এ সব নিতান্ত বাড়াবাড়ি, মিথ্যা স্তুতি মাত্র।" তাঁহাদের সেই হাসি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে সুদূর ভবিষ্যতে জগৎসাহিত্যের কষ্টি-পাথরে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকষ-রেখা জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই বিজ্ঞেরা তাহা না দেখিতে পাইলেও, তাহাদের বংশ-ধরগণ তাহা দেখিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে য়ুরোপ ও আমেরিকা বিস্মিত ও আনন্দমুগ্ধ, তখন বুঝিলাম, একদিন যাহাকে সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান হইতে চলিল। যাঁহারা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়াছিলেন তাঁহারা তখন বলিলেন—"ও একটা হুজুগ মাত্র।" কিন্তু আজ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা শুনিয়া অতিবড় সংশয়ী জনও অবনতমস্তকে স্বীকার করিবে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

সকলেই হয়তো উৎসুক হইয়া ভাবিতেছেন সংবাদটি কি? সংবাদটি এই ঃ—

(Reuter's Service)

London, Nov. 13, 1913.

The Nobel Prize for literature has been conferred on the Indian Poet Rabindranath Tagore.

অর্থাৎ—

"সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদত্ত হইয়াছে।"

কিন্তু "নোবেল পুরস্কার" জিনিষটা কি? "নোবেল পুরস্কার" বা "Nobel Prize" সমস্ত য়ুরোপ ও আমেরিকার মনস্বীগণের চরম সাধনার ও কামনার ধন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। সেখানে নোবেল-পুরস্কারলাভ অমরতালাভের নামান্তর মাত্র।

সুইডেনের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাইনামাইটের আবিষ্কারক আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল মৃত্যুকালে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ) কয়েকজন ট্রষ্টীর হস্তে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ২,৬২,৫০,০০০ দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, ন্যস্ত করিয়া এই মর্ম্মে এক উইল করেন যে প্রতি বৎসর মানবচেষ্টার নানাবিভাগে বিশ্বমানবের কল্যাণার্থ যাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাঁহাদের মধ্যে এই অর্থের আয় সমানভাবে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। পুরস্কারটি পাঁচভাগে বিভক্ত। পাঁচটি বিভিন্ন কর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্মীশ্রেষ্ঠকে পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা—(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ('ফিজিক্স') (২) রসায়ন শাস্ত্র (৩) চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ববিদ্যা (৪) সাহিত্য (৪) জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহনিবারণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা। কখনো কখনো দুইজন ব্যক্তি সমভাবে পুরস্কারযোগ্য

হইলে এই পুরস্কার দুই জনকেও দেওয়া হয়। এক একটী পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১২০০০০ একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা। স্ত্রীপুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই পুরস্কার পাইতে পারেন। তবে সাহিত্যের পুরস্কার সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে এই যে, যে-পুস্তক বিচার করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় লিখিত হউক আপত্তি নাই—কিন্তু সেটির অন্ততঃ একটি য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ থাকা প্রয়োজন। সুইডেনের "একাডেমী অফ লিটারেচার" বা সাহিত্য পরিষদের উপর সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রদানের বিচারভার ন্যস্ত আছে। পুরস্কারপ্রদাতা আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই পুরস্কার-প্রদান আরম্ভ হয়। সাহিত্যবিভাগে এ পর্য্যন্ত যে-সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যরথী পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯০১...সালী প্রুধোম (Sully Prudhomme) ইনি ফরাসী কবি। ইঁহার সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "Stances et Poèmes" সমালোচক-শ্রেষ্ঠ স্যাঁৎ-ব্যভ (Sainte-Beuve) কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁহার কাব্যখানি ফরাসী সাহিত্যজগতের একটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। জন্ম—১৮৩৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০২...থিওডোর মমসেন্ (Theodore Mommsen) ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই এই প্রসিদ্ধ জর্ম্মান ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ অবগত আছেন; ইঁহার রচিত রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের একত্র সমাবেশ কেবল ইঁহার ইতিহাসেই দেখা যায়। জন্ম—১৮১৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০৩...ব্যোর্ণস্টার্ণ ব্যোর্ণসন্ (Bjohrnsterne Bjohrnson) অনেকের মতে ইনি নরওয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ছোটগল্প লিখনেও ইনি একজন ওস্তাদ ছিলেন। অভিনয়-কার্য্যেও ইঁহার পারদর্শিতা বড় অল্প ছিল না। জীবনের অধিকাংশভাগ ইনি নরওয়ের জাতীয় রঙ্গশালার অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইনি রাজনীতিক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার রচিত নরওয়ের প্রাণোন্মাদকর জাতীয় সংগীত ফরাসী জাতীয় সংগীত "লা মার্শেইয়ের" মত এক অপূর্ব্ব বস্তু। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "তীর্থসলিলে" এই সংগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুবাদ করিয়াছেন। জন্ম—১৮৩২, মৃত্যু—১৯১০।

১৯০৪...ফ্রেডেরিক মিষ্ট্রাল (Frederic Mistral) ও জোসে একেগ্যারে (Jose Echegaray)।

১। ফ্রেডেরিক মিষ্ট্রালের জন্মভূমি ফ্রান্সের অন্তর্গত "প্রভেন্স" (Provence) প্রদেশ। ইনি সেই "প্রভেন্সের" প্রাদেশিক ভাষাকে (Provencal) ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রভেন্সাল ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে অতি শীঘ্রই মিষ্ট্রাল খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। এতদ্ভিন্ন তিনি "প্রভেন্সের" বহু ছড়া, ও কথা কাহিনী সংগ্রহপূর্ব্বক অনেকগুলি অতি মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 'প্রভেন্সাল' সাহিত্যকে অতি উচ্চস্থান দান করেন। জন্ম—১৮৩০।

২। জোসে একেগ্যারে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্পেনীয় নাট্যকার। জন্ম—১৮৩২।

১৯০৫...হেনরিক সিঙ্কিভিচ (Henryk Sinkiewicz) ইনি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস "কুও ভাডিসের" রচয়িতা। জাতিতে পোল। জন্ম ১৮৪৬।

১৯০৬...গিয়োসুয়ে কার্দ্দুচি (Giosue Carducci) ইটালীর কবি ও পণ্ডিত। ইঁহার 'সয়তান' সম্বন্ধে রচিত কবিতা ইটালীর কাব্য-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। জন্ম—১৮৩৬, মৃত্যু—১৯০৭।

১৯০৭...রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) জাতিতে ইংরাজ, জন্মস্থান বোম্বাই। আধুনিক ইংল্যাণ্ডের জনপ্রিয় কবি, ব্রিটীশ 'ইম্পীরিয়লিজম' বা সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। জন্ম—১৮৬৫।

১৯০৮...রাডল্‌ফ্ অয়কেন্ (Rudolph Eucken) জাতিতে জর্ম্মান; আধুনিক য়ুরোপের চিন্তারাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও পরিচালক। সরস ভাবে ও ভাষায় ধর্ম্ম ও দর্শনের উচ্চতত্ত্বপ্রচারে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি য়ুরোপে আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। এই মনীষী জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলি য়ুরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পঠিত হইতেছে।

১৯০৯...সেলমা লেজারলফ্ (Selma Lagerlof) ইনি স্ত্রীলোক। সুইডেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। অসাধারণ প্রতিভাশালিনী। জন্ম—১৮৫৮।

১৯১০...পল্ হেয়সি (Paul Heyse) জর্ম্মান ঔপন্যাসিক ও জর্ম্মানসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক।

১৯১১...মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck) জাতিতে বেলজিয়ান। নাট্যকার ও দার্শনিক। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যজগতে মেটারলিঙ্কের স্থান সকলের উপরে। তাঁহার নাটকগুলি মানবের অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্রনিগূঢ় অবস্থা ও অভিজ্ঞতার

বিবৃতি। মেটারলিঙ্কের একখানি symbolical বা বিগ্রহরূপী নাটক কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রবাসীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার "রঙ্গমল্লী" গ্রন্থে আছে। দার্শনিক প্রবন্ধাদি রচনাতেও মেটারলিঙ্ক সিদ্ধহস্ত। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ গদ্যগ্রন্থগুলি চিন্তাশীলের খোরাক, ভাবুকের উপভোগ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১২...জেরহার্ট হপ্টম্যান (Gerhart Hauptman) আধুনিক জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। য়ুরোপীয় সমাজের নানা জটিল সমস্যা ইনি নাট্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। হপ্টম্যান বিখ্যাত সুইডেনীয় নাট্যকার ইবসেনের শিষ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১৩...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম—১৮৬১।

সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে যে-সকল মনীষী এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে রনজেন্, অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরী, মার্কনি, স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে, মেচনিকফ্, রুজভেল্ট, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে য়ুরোপ যে কতদূর চমৎকৃত হইয়াছে, তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিই সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। পুরস্কারের সঙ্গে অর্থ আছে বটে, কিন্তু যে সম্মান ইহার সহিত জড়িত তাহার নিকট এক লক্ষ কেন এক কোটি মুদ্রাও অকিঞ্চিৎকর। আবার রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য সাহিত্যিকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রথমতঃ তিনি প্রাচ্যদেশবাসী। যদিও পাঁজিপুঁথিতে প্রাচ্যদেশবাসীকে নোবেল পুরস্কার প্রদানে কোন নিষেধ কিম্বা বাধা নাই, তথাপি সে দিকে যে য়ুরোপের একটা কত বড় সংস্কারগত বাধা আছে তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু কবির প্রতিভার আলোকে সকল সংস্কার, সকল বাধা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ য়ুরোপের কেন, সমস্ত বিশ্বের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে যাঁহারা নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বহুদিন ধরিয়া য়ুরোপীয় জগতে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সারাজীবন সাহিত্য-সেবায় তন্ মন্ ধন্ অর্পণ করিয়া জীবনের শেষ-ভাগে এই গৌরবমুকুট লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো কোন য়ুরোপীয় ভাষায় এক ছত্রও লেখেন নাই। অথচ বিদেশী-ভাষায় তাঁহার প্রথম রচনা য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিল। যখন এ কথা ভাবি তখনই আনন্দে, গর্ব্বে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এক শত বৎসরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান লাভ করিল। যিনি বাংলা ভাষাকে এই গৌরব-মুকুট পরাইয়াছেন আজ তাঁহার গৌরবে সমস্ত বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব, সমস্ত প্রাচ্য ভূমির গৌরব। তিনি আজ সমস্ত এসিয়ার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ কে না বলিবে

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা ?

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

চিরন্তনী

(Jean Lahor)

সকলি ক্ষণিক মোহ; তবু আহা! ভালবেস তবু;
ভালবেস—ক'র বাস কামনার স্বপন-ভুবনে;
স্পন্দিত হৃদয়খানি সঁপে দিয়ো—সঁপে দিয়ো কভু
আকাঙ্ক্ষিত বেদনায়,—যে বেদনা শ্রেয় মান' মনে।

সব মিছে, সব মায়া; প্রেমে তবু রাখিয়ো বিশ্বাস,—
ভালবেস নিরন্তর,—বেঁধ বাসা বাসনার দেশে;
প্রাণে যেন নিত্য জাগে অনুরাগ-অরুণ নিশ্বাস,
জীবনের ক'টা দিন—ফুঁকে দাও সুধু ভালবেসে।

গানের প্রাণের রসে মাতালের মত উঠ মাতি'
মনেরে উন্নত রাখি' উচ্চশিরে রহ দৃপ্ত ছবি;
চিত্ত হোক্ রাজোচিত রুচি চীনাংশুকে দিব্যভাতি
দেবতা না হও ওগো হ'তে পার মৃত্যুঞ্জয়ী কবি।

মিথ্যার জগতে, হায়, সত্য শুধু ভালবাসাবাসি,
সত্য খেয়ালের খেলা; ক্ষণপ্রভা-ক্ষণিক জীবন,—
মুহূর্ত্তে জাগিয়া হায়, শূন্যে ছড়াইয়া রশ্মিরাশি
মুহূর্ত্তেকে হয় হারা,—শূন্যতলে চির অদর্শন।

মত্ত বাসনার রাঙা রক্তভাতি মশালের আলো
পুলকি' জ্বলিছে একা মর্ত্ত্য মানবের আঁখি-আগে,
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি চারিদিক অন্ধকারে কালো,—
মরণের অন্ধকার—প্রাণশিখা নিবাইতে মাগে।

জ্বলে নাও প্রাণপণে,—জ্বলে নাও আলো দিবে যদি,
দাহ বিনা দীপ্তি নাই,—জ্বলে নাও প্রাণপণ-বলে;
নিবিলে জীবন-বাতি ভাল মন্দ ভেব নিরবধি
ধূলিতলে। অমুক কামনা-দীপ যতক্ষণ জ্বলে

গুপ্তধারা মৃত্যুনদী উচ্ছ্বসিছে গহ্বরে গহ্বরে
কে জানে গো অতর্কিতে কে কখন ডুবিবে অতলে,
নিঃশেষে পুড়িয়া নে রে নির্ব্বাণের আগে প্রাণ ভরে'
ভালবেসে কেঁদে হেসে কামনার মায়াতরুতলে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে যদি কেহ নূতন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাহা হইলে তাহা নূতন কিনা এবং নূতন হইলে আবিষ্ক্রিয়াটির মূল্য কি, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হই। কারণ, আমাদের দেশে এরূপ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম যাঁহাদের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এখন এরূপ আশা হইতেছে যে আমাদের এই দুরবস্থা চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না।

সুকুমারশিল্পক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষিতা করিয়া করিয়া এখন স্বাধীনভাবে ললিত কলার রস গ্রহণে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা করিবার প্রয়োজন বাঙ্গালীর বহুকাল হইতেই ছিল না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝদার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মত বুঝিয়া সুঝিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার, লোকের একান্ত অভাব বঙ্গদেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাই আজ তাঁহার নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দ্বারা জগতের সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হওয়ায়, আমরা অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি। "আমরা তাঁহাকে মোটেই চিনিতে পারি নাই; বিদেশী তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, তবে চিনিলাম," এরূপ চিন্তাপ্রসূত লজ্জায় ও ক্ষোভে আমাদিগকে মাথা হেঁট করিতে হইতেছে না। বাস্তবিক স্বদেশীয় মহৎব্যক্তির মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারার মত হীনতা সেই দেশবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? সেই হীনতা হইতে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

এ কথা কিন্তু বলিতে পারা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বঙ্গের "মান্যগণ্য" ব্যক্তিরাও বুঝিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রশংসিত হইবার পর, তথায় ভারতের সহকারী সচিব মণ্টেগু সাহেব তাঁহার গুণগান করার পর, বড়লাট সাহেব রবীন্দ্রনাথকে "Poet Laureate of Asia" বা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি বলার পর, কিছু দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Literature) উপাধি দিবেন। কিন্তু তিনি এবার বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বালকদিগের উপযোগী করিয়া সম্পাদন করিয়া "পাঠসঞ্চয়" নামে একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার জন্য পাঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কিম্বা উহার লিখন-রীতির (style) মধ্যে কোন প্রকারের গুণ দেখিতে না পাইয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। সেই নামঞ্জুর পুস্তকের লেখককে আজ বিশ্ববিদ্যালয় "সম্মানিত" করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কি উপাধি দিবেন বা না দিবেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগকে ইহা লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাহিত্যরসজ্ঞতা রাজপুরুষদের মোসাহেবীর সহিত হয় ত অভিন্ন, এরূপ সন্দেহ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে সত্য সত্যই বিশ্বপণ্ডিতদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদের প্রভাবেও যে বাংলা সাহিত্যের সম্মান হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ।

নোবেল জাতিতে সুইড্ ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সুইড্‌দিগের দ্বারা প্রদত্ত হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন সুইডেনের বিজ্ঞানপরিষদ্, চিকিৎসা বা শরীরতত্ত্ববিদ্যার বিচারক তদ্দেশের চিকিৎসক সমিতি, সাহিত্যের বিচার করেন সুইড্ সাহিত্যপরিষদ, এবং জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সদ্ভাব বর্দ্ধন এবং শান্তির স্থায়িত্ব বিধান কাহার দ্বারা অধিকতম পরিমাণে হইয়াছে, তাহা স্থির করেন পাঁচজন সুইডের এক পঞ্চায়েৎ। এই পাঁচ জন সুইডেনের ষ্টর্থিং বা প্রতিনিধি সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হন।

সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের জন্যই পুরস্কার দেওয়া হয় যাহা জীবনে ভাব ও সুকল্পিত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আসন দেয় ("the most distinguished of work an idealistic tendency in the field of literature," 'the most remarkable literary work *dans le sens d' idealisme*")। অর্থাৎ কিনা ডাল-ভাত-পয়সা রূপী "বস্তুতন্ত্র"টাটা না হইলেও চলে। কিন্তু গ্রন্থখানি

অলোকসামান্য হওয়া চাই, এবং সেরূপ গ্রন্থ লিখিতে সাধনারও প্রয়োজন হয়।

সুইডেন দেশজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র নহেন। সুইডেরা নিজেদের স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট; জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞানোন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত। কোন জাতির সঙ্গে তাঁহাদের রেষারেষি নাই। তাঁহাদের পুরস্কার দানের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব বা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি থাকে না। এই জন্য এপর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নানাজাতীয় লোকে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংরাজদের মধ্যে এপর্য্যন্ত সাহিত্যের জন্য একজন মাত্র (কিপলিং) নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহারও জন্ম ভারতবর্ষে, বোম্বাইয়ে। পদার্থবিদ্যায় দুজন (Lord Rayleigh ও Prof. J. J. Thomson), রসায়নে একজন (Sir W. Ramsay), চিকিৎসায় একজন (Sir R. Ross), এবং শান্তিভাব বর্দ্ধনে একজন (Sir W. R. Cremer) ইংরাজ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল। মানবজাতির লাভ এই হইল যে সাহিত্যের মনোময় রাজ্যে কার্য্যতঃ জাতিবর্ণদেশনির্ব্বিশেষে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল; মানবাত্মা স্বরূপে আশায় আকাঙ্ক্ষায় যে সর্ব্ব দেশে এক, তাহা আবার একবার নূতন করিয়া বুঝা গেল। বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল, তাহার সাহিত্য প্রাদেশিক নয়, বিশ্ববাসীর আদরের জিনিষ তাহাতে আছে। এই বোধ যদি আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আলস্য, পাশবতা, ভীরুতা এবং আশাহীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ করে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

কথায় বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এটাও জানা কথা যে অনেক সময় সূর্য্যের তাপ সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত বালির গরম সওয়া যায় না। তুমি যে জাতির বা যে রঙের লোক হও, লেখা পড়া জান বা না জান, বিলাত যাইতে পার, এবং যোগ্যতা থাকিলে যে কোন কাজ ইচ্ছা, করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিলে পার্লেমেন্টের সভ্য পর্য্যন্ত হইবার চেষ্টা করিতে পার, এবং যথেষ্ট যোগ্যতা থাকিলে ও অর্থব্যয় করিতে পারিলে সভ্য নির্ব্বাচিতও হইতে পার। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলি ভারতবাসীকে ঢুকিতে দিতে চায় না। অনেকে যাহারা ঢুকিয়াছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে বা নির্ব্বংশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অথচ ইংলণ্ডের সাহায্য ভিন্ন এই উপনিবেশগুলি আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের অহঙ্কারটা ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী।

আমরা একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে কানাডায় ভারতবাসীর কিরূপ লাঞ্ছনা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি তদপেক্ষাও বেশী অত্যাচার হইতেছে। নেটাল তথাকার একটি প্রদেশ। সেখানকার ইক্ষুক্ষেত্রে ও চিনির কারখানায়, এবং খনি প্রভৃতিতে কাজ করিবার জন্য বহু বৎসর অবধি ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ শত শত কুলি চালান হইত। সম্প্রতি আর নূতন চালান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আগেকার চালানের স্ত্রী ও পুরুষ কুলিদের চুক্তি ফুরাইয়া যাইবামাত্র তাহাদিগকে মাথা পিছু বার্ষিক ৪৫ টাকা ট্যাক্‌স্ দিতে হয়। তা ছাড়া চুক্তিমুক্ত কুলিদের ছেলেমেয়েদের ১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবামাত্র তাহাদিগকেও ঐ ৪৫ টাকা করিয়া ট্যাক্স্ দিতে হয়। ছেলেমেয়ে স্ত্রী পুরুষ যে কেহ ট্যাক্স্ দিতে না পারে, তাহাকে জেলে যাইতে হয়। সেই ভয়ে অনেকে আবার চুক্তিবদ্ধ কুলি হইয়া দাসের মত হীন ও দুঃখময় জীবন যাপন করে। অনেকে জেলে যায়। তন্মধ্যে অসহায়া বৃদ্ধা নারী পর্য্যন্ত আছে। এরূপ সত্য ঘটনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ বার্ষিক ৪৫ টাকা অন্য কোন উপায়ে দিতে না পারিয়া অনেক স্ত্রীলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। ভারতবাসীরা চান যে এই ট্যাক্‌স্ উঠিয়া যায়। শ্রীযুক্ত গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন তখন তথাকার অন্যতম মন্ত্রী স্মাট্‌স্ উহা উঠাইয়া দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন যে এমন কথা বলেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নিয়ম হইয়াছে যে কোনও মানুষের একাধিক পত্নী তথায় যাইতে পারিবে না, এবং বহুবিবাহের সন্তানও যাইতে পারিবে না। কিন্তু বহুবিবাহের ব্যাখ্যা হইয়াছে চমৎকার। কোনও হিন্দুর বা মুসলমানের যদি একটিমাত্র স্ত্রী থাকে, তাহা হইলেও সে বহুবিবাহিত! কেননা তাহাদের শাস্ত্রানুসারে হিন্দু ও মুসলমানেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে! অথচ ভারতবর্ষের আদমসুমারিতে প্রকাশ যে এদেশে বিবাহিত লোকের মধ্যে শতকরা একজনের বেশী বহুবিবাহিত নহে। এই আইনের ফলে অনেক স্বামীর একমাত্র স্ত্রী ও তাহার সন্তান তাহার নিকট যাইতে পারিতেছে না। শুধু তাই নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনে হিন্দু ও মুসলমান বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই গণ্য করিতেছে না। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মপত্নী সে দেশের আইনের চক্ষে উপপত্নী মাত্র এবং হিন্দুমুসলমানের সন্তানেরা অবৈধ সন্তানের মত তাহাদের পিতামাতার উত্তরাধিকারী নহে। ভারতনারীর এই ঘোরতর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত গাঁধি মহাশয়ের স্ত্রী ও দুই পুত্রবধূ, এবং অন্য অনেক

নারী এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে যাওয়া সম্বন্ধে যে নিষেধ-আইন আছে, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়া জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আইন মানিবেন না স্থির করিয়াছেন।

পূর্ব্বে নেটালবাসী ভারতীয়েরা অবাধে কেপ কলোনী প্রদেশে যাইতে পারিত। এখন সে অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ফ্রীষ্টেট প্রদেশে ত কোন ভারতবাসীর যাইবারই যো নাই; সেখানে জমীর মালিক হওয়া বা চাষ বা ব্যবসা করারও অধিকার কোন ভারতবাসীর নাই।

ভারতবাসীরা ফুটপাথে চলিতে পায় না। শ্বেতাঙ্গদের ট্রেণে বা ট্রামে যাতায়াত করিতে পায় না। অনেক সহরের নির্দ্দিষ্ট নিকৃষ্ট অংশে ব্যতীত বাস বা ব্যবসা করিতে পারে না। বিশেষ লাইসেন্স বা অনুমতি ভিন্ন ব্যবসা করিতে পারে না। এই অনুমতি একবার লইলেই চুকিয়া যায় না। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার লাইসেন্স বা অনুমতি পুনর্গ্রহণের সময় তাহা পান না। তাহাতে একান্ত নিরুপায় ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন।

এবম্বিধ নানা অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভারতবাসীরা অনেক আবেদন নিবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন নেটালের খনির কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া যে সকল স্থানে যাইবার আইন নাই, তথায় যাইতেছেন। শ্রীযুক্ত গাঁধির অধীনে অনেক পুরুষ স্ত্রীলোক বালক বালিকা ও শিশু যে সব স্থানে যাইবার ভারতবাসীর আইনসঙ্গত অধিকার নাই, তথায় যাইতেছেন। যেখানে ফেরি করিয়া জিনিষ বিক্রয়ের অধিকার ভারতবাসীর নাই, সেখানে সম্ভ্রান্ত মহিলারাও জিনিষ ফেরী করিতেছেন। গাঁধির দলের লোকেরা অর্দ্ধাশনে ট্রান্সভাল প্রদেশে যাইতেছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি শিশু মারা গিয়াছে। গাঁধি, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ এবং আরও শত শত নরনারী জেলেগিয়াছেন। ২০০০ খনির কুলিকে জোর করিয়া নেটালেধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিসে তাহাদের উপর জুলুম করিতেছে ও তাহাদিগকে শাসাইতেছে; কিন্তু তাহারা, ৪৫ টাকা ট্যাক্‌স্ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

যাহারা জেলে গিয়াছে তাহাদের পরিবারের জন্য এবং ধর্ম্মঘট করিয়া যাহারা বেকার অবস্থায় আছে, তাহাদের জন্য মাসিক অনূ্ন ৭৫,০০০ টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ভারতবর্ষ হইতে পাঠাইতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সামান্য কুলি রমণী পর্য্যন্তযে বীরত্ব দেখাইতেছেন, আমাদের এখানকার বড় বড় নেতাদেরও সে সাহস ও আত্মসম্মানজ্ঞান নাই। আমরা যদি সামান্য অর্থ দিয়াও এই বীর পুরুষও নারীদের সহায়তা করিতে না পারি, তাহা হইলে ধিক্ আমাদিগকে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, অযোধ্যা, সর্ব্বত্র হাজার হাজার টাকা উঠিতেছে। বাঙ্গালীকেও মুক্তহস্ত হইতে হইবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র এই ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব প্রজা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান। কিন্তু এই সাম্য বৃটিশ উপনিবেশ সকলে রক্ষিত হইতেছে না। তাই আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ নিজে সমুদয় ক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দেখাইতেছেন যে তাঁহারা এই হীন অবস্থা কখনও মানিয়া লইবেন না। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের চোখ খুলিবে। প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও আইন বেশী দিন টিকিতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনও টিকিবে না।

আমাদেরও যেন চোখ খুলে। দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শি জৈন একই ভাবে কষ্ট সহ্য করিয়া একই ভাবে অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশবাসী ভারতবাসীর যদি ইহাঁদের মত বুদ্ধি বিবেচনা ও স্বজাতিপ্রেম থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের এত দলাদলি ও মারামারি হইত না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা আমাদিগকে দল বাঁধিবার মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন, স্বার্থত্যাগ ও আত্ম বলিদান শিখাইতেছেন।

আর একটা বড় কথা শিখাইতেছেন—নেতৃত্ব কাহাকে বলে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যখন বঙ্গের নয় জন ভদ্রলোক নির্ব্বাসিত হন, তাহার পর মাসের পর মাস ধরিয়া বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ নেতা তাঁহার অনুচরদের বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও একটিও স্বদেশী বক্তৃতা করেন নাই। অপেক্ষাকৃত অবিখ্যাত লোকে কিন্তু করিয়াছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকায় কি দেখিতেছি? গাঁধি কি নিজে ঘরের কোণে বসিয়া অন্যকে জেলে যাইতে উত্তেজিত করিতেছেন? তাহা নহে; নিজে পূর্ব্বেও অনেকবার জেলে গিয়াছিলেন, এবারও গিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূরাও জেলে গিয়াছেন। ইহাকেই বলে নেতৃত্ব;—অপরকে যাহা করিতে বা সহিতে বলিব, সর্ব্বাগ্রে নিজে তাহা করিব ও সহিব। এমন নেতার কথায় লোকে সর্ব্বস্ব দিতে পারে, প্রাণপণ করিতে পারে।

এই বিবাদ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিবাদ নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ পোলাক ও ক্যালেনব্যাক্, ভারতবাসীদিগকে আইনভঙ্গ করিতে উত্তেজিত করার অভিযোগে জেলে গিয়াছেন। আরও অনেক শ্বেতাঙ্গ ভারতবাসীর পক্ষে আছেন। এদেশেও অনেক ইংরাজ আমাদের পক্ষে। পাদ্রি এণ্ড্রুস্ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের

বড়োদার রাজকুমারী ইন্দিরা ও কুচবিহারের মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ ও মাল্যবন্ধন

সাহায্যার্থ ১০০০্, আর একজন অজ্ঞাতনামা পাদরি ১৫০০্ এবং আরও অনেক ইংরাজ টাকা দিতেছেন।

যিনি যাহা পারেন, দান করিয়া ধন্য হউন। ঠিকানা—কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, হারিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বড়োদার মহারাজার কন্যা এখন কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী ইন্দিরা। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুচবিহারে বড়োদা রাজ্যের উন্নত শাসন ও শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন হইবে বলিয়া দেশবাসী আশা করিতেছে। এই আশা যাহাতে ফলবতী হয়, মহারাজা ও মহারাণী কি তাহার চেষ্টা করিবেন না?

বর্দ্ধমান বিভাগে জলপ্লাবন হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে এখনও লোকে কষ্ট পাইতেছে। কাঁথি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তজ্জন্য এখনও অনেক হাজার টাকার প্রয়োজন। অনেক জেলায়, বিশেষতঃ বাঁকুড়ায়, গৃহহীন লোকদের গৃহনির্ম্মাণের জন্যও অনেক টাকার দরকার। কেবল বাঁকুড়া জেলার জন্যই অন্যূন ৫০,০০০্ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ৪।৫ হাজার টাকা মাত্র আছে। যিনি যাহা পারেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইলে অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে।

চিত্র ও মূর্ত্তি স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক হইবে, এ তর্ক আজকালকার নয়। বাস্তবিক ছবি ঠিক্ স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ বিয়োগ করিতেই হয়। এমন কি ফোটগ্রাফ পর্য্যন্ত ঠিক্ স্বাভাবিক জিনিষটির অবিকল নকল হয় না। পক্ষান্তরে ছবি অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিনটা হাত বা কপালে একটা শিং আঁকিতে পারে না। কিন্তু কেহ যদি বলেন যে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ ও গায়ের রং ঠিক্ স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে ফরমাইস্‌টা কিছু কঠিন রকমের হয় এবং ললিতকলার দিক্ দিয়া অনেকটা নিষ্প্রয়োজনও হয়। বাস্তবিক মানুষের কোন্ অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি, তাহা বলা বড় কঠিন। কোন দুজনের মাপ ঠিক্ এক নয়। মাইলোর বীনস্ (Venus of Milo) প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম নমুনা বলিয়া গৃহীত হয়। কিছুদিন হইল একখানি সচিত্র ইংরাজী কাগজে অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের সঙ্গে এই মূর্ত্তির মাপের তুলনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে মূর্ত্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ ঠিক মিলে নাই। বাস্তবিক বিদ্রূপাত্মক ছবিতে যেমন হাস্যরসের উদ্রেকের জন্য কোন না কোন অঙ্গ খুব বড় বা খুব ছোট করা হয়, তেমনি শান্ত, বীর, প্রভৃতি রসের উদ্রেকের জন্য কিম্বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষের সৌন্দর্য্য সূচনা (suggest) করিবার জন্য, মাপ ও গঠনের কিছু ব্যতিক্রম করিলে কেন যে শিল্পের ব্যাকরণে ভুল হইবে, তাহা বুঝা যায় না। কবিদের উপর ত এরূপ কড়া আইন কেহ জারি করে না। সবাই জানে যে কোন মানুষের চোখ কাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় না, বা আঙ্গুল ঠিক্ চাঁপার কলির মত হয় না, বা গায়ের রং প্রস্ফুটিত মল্লিকার মত হয় না। অথচ আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, চম্পক কলির মত আঙ্গুল, এবং মল্লিকার মত বর্ণের উল্লেখ ত কাব্যে দেখা যায়। তাহাতে ত কাব্য গুলিকে কেহ অস্বাভাবিক অতএব অপকৃষ্ট বলে না। ঠিক্ মানুষের গায়ের মত রংটিও কে কয়টি চিত্রে দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। অতএব শিল্পীদের উপর কড়া আইন জারি করিয়া জুলুম করা উচিত নয়। আসল কথা শিল্পের প্রাণের খবরটা লওয়াই আগে দরকার। আর সবও দরকারী, কিন্তু প্রাণের মত দরকারী নহে।

নবীন বঙ্গীয় চিত্রকরদের কতকগুলি সুন্দর ছবি যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী প্রণীত সদ্যঃপ্রকাশিত হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ সম্বন্ধীয় ইংরাজী বহিখানি * কিনিতে পারেন।

চিত্রপরিচয়

প্রচ্ছদপট।

প্রচ্ছদপটে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রবাসী"র পরিকল্পনা রহস্যচিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসপুচ্ছচ্যুত লেখনী মানুষের হাতে পড়িয়া ক্রমাগত মুখে কালি মাখিতেছিল এবং কালি ছড়াইতেছিল। অকস্মাৎ একদিন আকাশপথে হংসকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল যে তাহার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে অমল শুভ্রতা, কালিমা-প্রলেপ তাহার কলঙ্ক। তাই সে কালি-ছড়ানো ও কালি-মাখা ছাড়িয়া শুভ্র সুবিমল হংসশরীর স্বীয় বাসস্থানের উদ্দেশে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে।

বেয়াত্রিচে চেঞ্চী।

উচ্চইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই শেলীর চেঞ্চী নামক কাব্যের কথা অবগত আছেন। বেয়াত্রিচে চেঞ্চীর পিতা ফ্রাসেস্কো তাঁহার উপর নানাবিধ পাশব অত্যাচার করায় তাঁহার ভ্রাতা ও বিমাতার চক্রান্তে ফ্রাসেস্কো নিহত হন; এই ষড়যন্ত্রে বেয়াত্রিচেও জড়িত আছেন এই সন্দেহে তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। মশানে নীত হইবার সময় বেয়াত্রিচে যে প্রকার নৈরাশ্য ও বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শকদিগের দিকে তাকাইয়াছিলেন, চিত্রকর গীদো রেনি তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রটি যথার্থ কাহার এবং কে আঁকিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। মূল ছবিখানি রোমনগরীস্থ বার্বেরিনি-প্রাসাদের সযত্নরক্ষিত অন্যতম রত্ন। অনেক শিল্পসমালোচক ইহাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিবাদব্যঞ্জক চিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Myths of the Hindus and Buddhists. By Sister Nivedita and Dr. Ananda Coomaraswamy. 15s. net. George G. Harrap and Company, 3 Portsmouth Street, Kingsway, London, W.C.

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

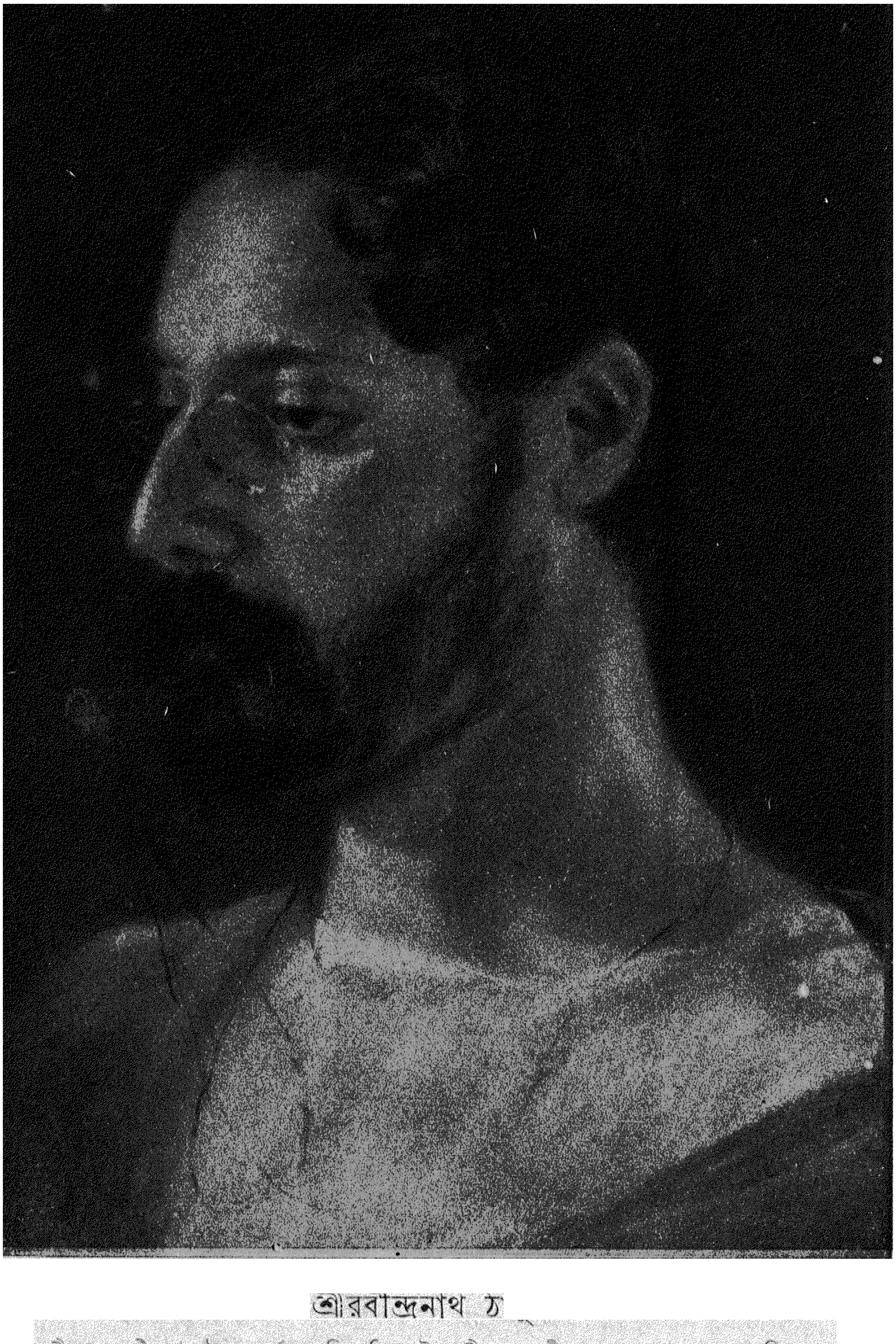

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুমতিক্রমে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২০

৩য় সংখ্যা

মূর্ত্তি

আমার প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং তাঁহার যত্নে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনীত শ্রীগুরু-স্বামী স্থপতিকে এবং আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান বেঙ্কটাপ্পা ও শ্রীমান নন্দলাল বসুকে ধন্যবাদ দিয়া মূর্ত্তি সম্বন্ধে এই সংগ্রহটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে এবং বিশেষ করিয়া নিখিল শিল্পসাগর-সঙ্গমে আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে শিল্পশাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি-লক্ষণ ও তাহার মাপ প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ না করেন অথবা নিজের নিজের শিল্পকর্ম্মকে চিরদিন শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃত-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত না করেন।

উড়িতে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি ততদিনই নীড় ও তাহার গণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিয়াই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়, তারপর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাখা চাই যে আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। আগে মূর্ত্তি রচিত হয়, পরে মূর্ত্তি-লক্ষণ, মূর্ত্তি-বিচার, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের মান পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। বাঁধন, চলিতে শিখিবার পূর্ব্বে [illegible] করিয়া দাঁড়াইতে শিখিবার অবসর দিবার জন্য; চিরদিন ঘরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নয়। মুক্তি ধার্ম্মিকের, আর ধর্ম্মার্থীর জন্য হচ্ছে ধর্ম্মশাস্ত্রের নাগপাশ; তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি হচ্ছে শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য, আর শিল্পীর জন্য হচ্ছে তাল, মান, অঙ্গুল, Light shade, perspective আর anatomyর বন্ধনমুক্তি।

ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কেহ যেমন ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা তাহার গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কি বিষম ভ্রান্ত যে মনে করে যে মাপিয়া জুখিয়া শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেই শিল্পজগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্পলোকের আনন্দবাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।

শ্রীক্ষেত্রের যাত্রী যখন প্রথম জগবন্ধু দর্শনে চলে তখন পাণ্ডা তাহার হাত ধরিয়া উঁচা নীচা ডাহিনা বাঁয়া এইরূপ বলিতে বলিতে দেবতাদর্শন করাইতে লইয়া যায়; ক্রমে যত দিন যায় পথও তত সড়গড় হইয়া আসে এবং পাণ্ডারও প্রয়োজন রহে না; পরে দেবতা যেদিন দর্শন দেন সেদিন দেউল মন্দির পূর্ব্বদ্বার পশ্চিমদ্বার ধ্বজা চূড়া উঁচা নীচা দেবতার পাণ্ডা ও অঙ্কশাস্ত্রের কড়া গণ্ডা সকলই লোপ পায়।

নদী এক পাড় ভাঙ্গে নূতন পাড় গড়িবার জন্য, শিল্পীও শিল্পশাস্ত্রের বাঁধ ভঙ্গ করেন সেই একই কারণে। এটা যে আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকারগণ না বুঝিতেন তাহা

নয় এবং শাস্ত্র-প্রমাণের সুদৃঢ় বন্ধনে শিল্পীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিলে শিল্পও যে বাঁধা নৌকার মত কোন দিন কাহাকেও আনন্দবাজারে পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে না সেটাও যে তাঁহারা না ভাবিয়াছিলেন তাহা নয়।

পাণ্ডিত্যের টীকা হাতে করিয়া শিল্পশাস্ত্র পড়িতে বসিলে শাস্ত্রের বাঁধনগুলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু বজ্র আঁটুনির ভিতরে ভিতরে যে ফস্কা গেরোগুলি আচার্য্যগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা করিয়া সযত্নে সঙ্গোপনে রাখিয়া গেছেন তাহার দিকে মোটেই আমাদের চোখ পড়ে না। "সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমা-লক্ষণম্ স্মৃতম্" এ কথার অর্থ কি শিল্পীকে বলা নয় যে, যখন পূজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্য প্রকার মূর্ত্তি গঠনকালে তোমার যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পার। আমি এই প্রবন্ধে ৩নং চিত্রে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তির দুইটি পৃথক নমুনা দিয়াছি—একটি শাস্ত্রসম্মত মাপ জোখ ঠিক রাখিয়া, অন্যটি ভারতশিল্পীরচিত শত সহস্র ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি হইতে যে-কোন-একটি বাছিয়া লইয়া, শাস্ত্রীয় টান আর শিল্পীর টান, দুইটানে দুই ত্রিভঙ্গ কিরূপ ফুটিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য।

সৌন্দর্য্যকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য যেদিন শাস্ত্রোক্ত মান পরিমাণ দিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেদিন হয়তো সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী কোন এক অজ্ঞাত শিল্পীর রচিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তিতে ধরা দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন—আমার দিকে চাহিয়া দেখ! আচার্য্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ও বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন "সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমা-লক্ষণম্ স্মৃতম্"—লক্ষ্মী, আমার শাস্ত্র ও প্রতিমা-লক্ষণ তোমার জন্য নয়, কিন্তু সেই-সকল মূর্ত্তির জন্য যেগুলি লোকে পূজা করিতে মূল্য দিয়া গড়াইয়া লয়। তুমি বিচিত্রলক্ষণা! শাস্ত্র দিয়া তোমায় ধরা যায় না, মূল্য দিয়া তোমায় কেনা যায় না!

সর্ব্বাঙ্গৈ সর্ব্বরম্যোহি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে।
শাস্ত্র-মানেন যো রম্য স রম্যো নান্য এব হি॥
একেষামেব তদ্ রম্যং লগ্নং যত্র যস্য হৃৎ।
শাস্ত্রমান-বিহীনং যদ্ রম্যং তদ্ বিপশ্চিতাম্॥

পণ্ডিতে বলেন শাস্ত্রমূর্ত্তিই সুন্দর মূর্ত্তি, কিন্তু হায় পূর্ণ সুন্দর লাখে তো এক মিলে না। একে ধলে শাস্ত্রছাড়া সুন্দর কি? আরে বলে সুন্দর সে, যে হৃদয় টানে প্রাণে লাগে।

(১)

তাল—ও মান।

আমাদের প্রাচীন শিল্পকারগণ মূর্ত্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—নর, ক্রূর, আসুর, বালা এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্ত্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন পাঁচ প্রকার তাল ও মান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

নরমূর্ত্তি=দশ তাল।
ক্রূরমূর্ত্তি=দ্বাদশ তাল।
আসুর মূর্ত্তি=ষোড়শ তাল।
বালা-মূর্ত্তি=পঞ্চ তাল।
কুমার-মূর্ত্তি=ষট্ তাল।

এক তালের পরিমাণ শিল্পকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, যথা—শিল্পীর নিজ-মুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে এক অঙ্গুল কহে, এইরূপ দ্বাদশ অঙ্গুলিতে এক তাল হয়।

নর বা দশ তাল পরিমাণে নরনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বাণ, বলী, ইন্দ্র, ভার্গব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়। **ক্রূর** বা দ্বাদশ তাল পরিমাণে চণ্ডী, ভৈরব, নরসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়। **আসুর** বা ষোড়শ তাল পরিমাণে হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, নমুচি, নিশুম্ভ, শুম্ভ, মহিষ, রক্তবীজ ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠনীয়। **বালা** বা পঞ্চ তাল পরিমাণে শিশুমূর্ত্তি, যেমন বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি এবং **কুমার** বা ষট্ তাল পরিমাণে শৈশবাতিক্রান্ত অথচ অতরুণ মূর্ত্তি, যেমন উমা, বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদি মূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়।

দশ, দ্বাদশ, ষোড়শ, ষট্ এবং পঞ্চ তাল ছাড়া মূর্ত্তি-গঠনে উত্তম নবতাল পরিমাণ ভারতশিল্পীগণকে প্রায়ই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই উত্তম নবতাল পরিমাণ অনুসারে মূর্ত্তির আপাদমস্তক সমান নয়ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এই এক এক ভাগকে তাল কহে। তালের

ত্রিভঙ্গ

Fig 3

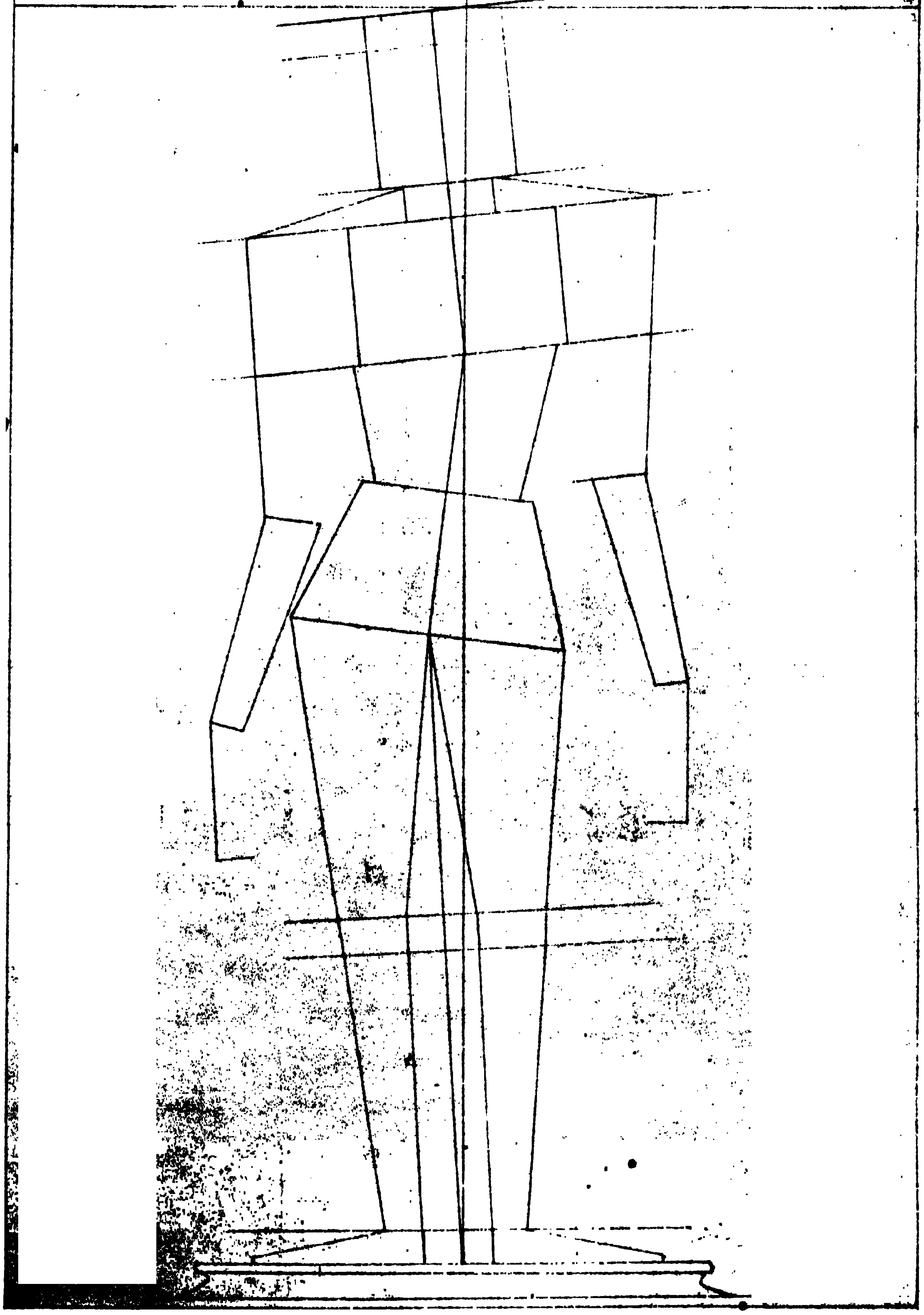

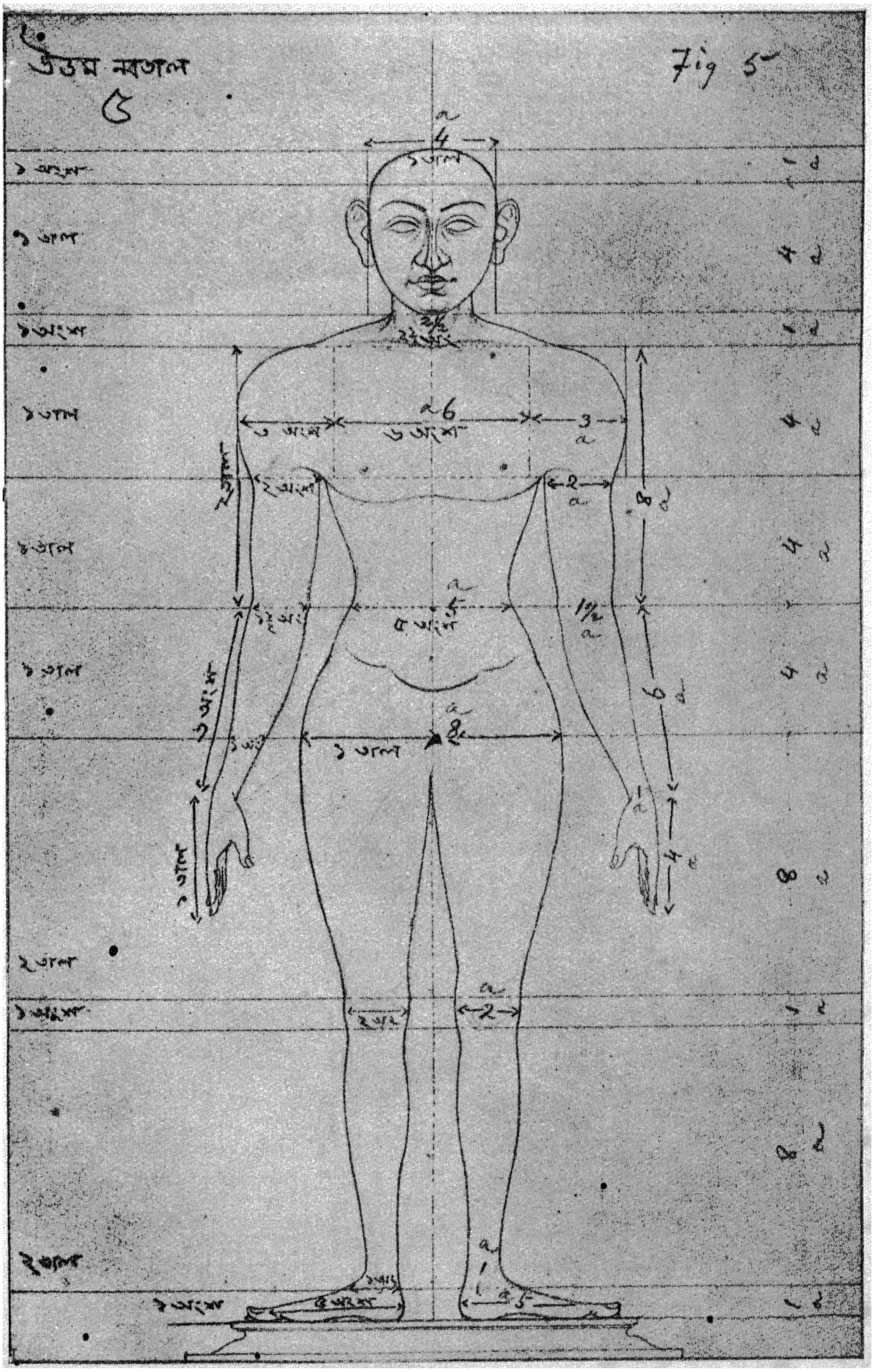
উত্তম নবতাল
৫
Fig 5

একচতুর্থ ভাগকে এক অংশ কহে। এইরূপ চারি অংশে এক তাল হয় এবং মূর্ত্তির আপাদমস্তকের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই ৩৬ অংশ বা নয় তাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৫নং চিত্রটি উত্তম নবতাল পরিমাণে অঙ্কিত।

উত্তম নবতাল পরিমাণে মূর্ত্তির দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা—ললাটের মধ্য হইতে চিবুকের নিম্নভাগ ১ তাল, কণ্ঠমূল হইতে বক্ষ ১ তাল, বক্ষ হইতে নাভি ১ তাল, নাভি হইতে নিতম্ব ১ তাল, নিতম্ব হইতে জানু ২ তাল এবং জানু হইতে পদতল ২ তাল, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট-মধ্য ১ অংশ, কণ্ঠ ১ অংশ, জানু ১ অংশ, পদ ১ অংশ। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা—মস্তক ১ তাল, কণ্ঠ ২॥০ অংশ, এক স্কন্ধ হইতে আর এক স্কন্ধ ৩ তাল, বক্ষ ৬ অংশ, দেহমধ্য ৫ অংশ, নিতম্ব ২ তাল, জানু ২ অংশ, গুল্ফ ১ অংশ, পদ ৫ অংশ। উত্তম নবতাল পরিমাণে মূর্ত্তির হস্তের দৈর্ঘ্য বা খাড়াই, যথা—স্কন্ধ হইতে কফোণী (কনুই) ২ তাল, কফোণী হইতে মণিবন্ধ ৬ অংশ, পাণিতল ১ তাল। প্রস্থ বা বিস্তার, যথা—কক্ষমূল ২ অংশ, কফোণী (কনুই) ১॥০ অংশ, মণিবন্ধ ১ অংশ।

মূর্ত্তির মুখ তিন সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—ললাটের মধ্য হইতে চক্ষু-তারকার মধ্য, চক্ষুর মধ্য হইতে নাসিকার অগ্র, নাসাগ্র হইতে চিবুক, এই তিনভাগ।

শুক্রাচার্য্যের মতে নবতাল-পরিমিত মূর্ত্তির প্রত্যঙ্গ সমূহের পরিমাণ, যথা—শিখা হইতে কেশান্ত ৩ অঙ্গুলি খাড়াই, ললাট ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, নাসাগ্র হইতে চিবুক ৪ অঙ্গুলি, গ্রীবা ৪ অঙ্গুলি খাড়াই। ভ্রূর পরিমাণ লম্বা ৪ এবং চওড়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি, নেত্রের পরিমাণ লম্বা ৩ অঙ্গুলি, চওড়া ২ অঙ্গুলি। নেত্রতারকা নেত্রের তিন ভাগের এক ভাগ। কর্ণের পরিমাণ—খাড়াই ৪ অঙ্গুলি, চওড়া ৩ অঙ্গুলি। কর্ণের খাড়াই এবং ভ্রূর দৈর্ঘ্য সমান হইয়া থাকে। পাণিতল দৈর্ঘ্যে ৭ অঙ্গুলি, মধ্যমাঙ্গুলির দৈর্ঘ্য ৬ এবং অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য ৩॥০ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠের দৈর্ঘ্য তর্জ্জনির প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত ও অঙ্গুষ্ঠের দুইটিমাত্র পর্ব্ব বা গাঁঠ এবং তর্জ্জনি প্রভৃতি আর সকল অঙ্গুলির তিন তিন গাঁঠ হইয়া থাকে। অনামিকা মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা অর্দ্ধ পর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অনামিকা অপেক্ষা এক পর্ব্ব, এবং তর্জ্জনি মধ্যমাঙ্গুলি অপেক্ষা এক পর্ব্ব খাটো হইয়া থাকে। পদতল দৈর্ঘ্যে ১৪ অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ ২, তর্জ্জনি ২॥০ বা ২ অঙ্গুলি, মধ্যমা ১॥০, অনামিকা ১॥০, কনিষ্ঠা ১॥০।

স্ত্রীমূর্ত্তির পরিমাণ পুরুষমূর্ত্তি অপেক্ষা প্রায় এক অংশ খাটো করিয়া গঠন করা বিধেয়।

শিশুমূর্ত্তির পরিমাণ, যথা—কণ্ঠের অধোভাগ হইতে পদ পর্য্যন্ত শিশুর দেহ তাহার নিজমুখের সাড়ে চার গুণ অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগ হইতে উরুমূল দুইগুণ এবং শিশু-দেহের বাকী অর্দ্ধাংশ মস্তকের আড়াই গুণ। শিশুমূর্ত্তির বাহু তাহার মুখের বা পদতলের দুই গুণ হইয়া থাকে। এবং শিশুর গ্রীবা খাটো, মস্তক বড় হয় ও বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর শরীর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় মস্তক সেরূপ বৃদ্ধি পায় না।

(২)

আকৃতি ও প্রকৃতি

সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর জগতে দুর্ল্লভ এবং এক মানবের আকৃতি প্রকৃতির সহিত অন্যের আকৃতি প্রকৃতির মোটামুটি মিল থাকিলেও ডৌল হিসাবে কোন একের দেহগঠন আদর্শ করিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। সকল মনুষ্যেরই দুই দুই হস্ত ও পদ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একইরূপ সত্য, কিন্তু মানব-জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা বিধায় নানা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে শিল্প-হিসাবে দেহ-গঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে, কিন্তু ইতর জীব জন্তু এবং পুষ্প পল্লব ইত্যাদির জাতিগত আকৃতির সৌসাদৃশ্য আমাদের নিকট অনেকটা স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, যেমন এক জাতীয় পত্র পুষ্প, হয় হস্তী, ময়ূর মৎস্যের গঠনের তারতম্য অধিক নাই, একটি অশ্বত্থপত্র অন্য পত্রগুলির মতই সূচ্যগ্র ও ত্রিকোণাকার; এক কুক্কুটাণ্ড অন্য কুক্কুট-ডিম্বের মতই সুডৌল সুগোল; এইজন্যই বোধ হয় আমাদের শিল্পাচার্য্যগণ মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডৌল অমুক মানুষের হস্ত পদাদির তুল্য না বলিয়া অমুক পুষ্প অমুক জীব অমুক বৃক্ষ লতা

ইত্যাদির অনুরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"মুখম্ বর্ত্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতিঃ" মুখের আকার কুক্কুট-ডিম্বের ন্যায় গোল। ৬ নম্বর চিত্রে ডিম্বাকৃতি মুখ ও পানের মত মুখ দেখান হইয়াছে। চলিত কথায় আমরা যাহাকে পানপারা-মুখ বলি তাহার প্রচলন নেপালে ও বঙ্গদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি-সকলে অধিক দৃষ্ট হয়। এখন মুখম্ বর্ত্তুলাকারম্ বলাতে বলা হইল যে মুখের প্রকৃতিই হচ্ছে বর্ত্তুলাকার, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ নয়; কিন্তু মুখের বা মুণ্ডের প্রকৃতিটা স্বভাবতঃ গোলাকার হইলেও মুখের একটা আকৃতি আছে যেটা বর্ত্তুলাকার দিয়া বোঝান চলেনা; সেইজন্যই বলা হইয়াছে "কুক্কুটাণ্ডাকৃতি" কুক্কুট-ডিম্বের ন্যায় বর্ত্তুল, ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে মস্তকের দিক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত মুখের গঠন কুক্কুট-ডিম্বের মত স্থূল হইতে ক্রমশঃ কৃশ হইয়া আসিয়াছে এবং মুখ লম্বা ছাঁদের হউক বা গোল ছাঁদেরই হউক এই অণ্ডাকৃতিকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না। এই অণ্ডাকৃতিকেই টিপিয়া টুপিয়া কুন্দিয়া কাটিয়া নানা বয়সের নানা মানবের মুখাকৃতির তারতম্য শিল্পীকে দেখাইতে হইবে। তাম্রঘট নানা স্থানে টোল খাইলেও যেমন ঘটাকৃতিই থাকে, তেমনি নানা ছাঁদের মুখের ডৌল এই অণ্ডাকৃতির ভিতরেই নিবদ্ধ রহে। ঘটের প্রকৃতি যেমন ঘটাকার, মুণ্ডের প্রকৃতিও তেমনি অণ্ডাকার। পানের মত মুখ, পাঁচের মত মুখ, এমন কি প্যাঁচার মত যে মুখ তাহাও এই অণ্ডাকারেরই ইতর বিশেষ।

৭ নং চিত্র, ললাট, যথা—"ললাটম্ ধনুষাকারম্" কেশান্ত হইতে ভ্রু পর্য্যন্ত ললাট, এবং ইহা ঈষৎ-আকৃষ্ট ধনুকের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার।

৮নং চিত্র, ভ্রুযুগ—"নিম্বপত্রাকৃতিঃ ধনুষাকৃতির্ব্বা।" ভ্রুযুগের দুই প্রকার গঠনই প্রশস্ত—নিম্বপত্রাকার ও ধনুকাকার। নিম্বপত্রের ন্যায় ভ্রু প্রায়শঃ পুরুষমূর্ত্তিতে এবং ধনুকের ন্যায় ভ্রু প্রায়শঃ স্ত্রীমূর্ত্তি-সকলে ব্যবহৃত হয়। এবং হর্ষ ভয় ক্রোধ প্রভৃতি নানা ভাবাবেশে ভ্রুযুগ ধনুকের ন্যায় বা বায়ুবিচলিত নিম্বপত্রের ন্যায় উন্নমিত, অবনমিত, আকুঞ্চিত ইত্যাদি নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৯নং চিত্র, নেত্র বা নয়ন—"মৎস্যাকৃতিঃ"। নয়নের ভাব ও ভাষা যেমন বিচিত্র তেমনি নয়নের উপমারও অন্ত নাই। সেইজন্য সফরীর (পুঁটিমাছের) সহিত তুলনা দিয়া ক্ষান্ত হইলে ডাগর চোখ, ভাসা চোখ ইত্যাদি অনেক চোখই বাদ পড়ে, সুতরাং কালে কালে নয়নের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণন করিয়া নানা উপমার সৃষ্টি হইয়াছে যথা—খঞ্জন-নয়ন, হরিণ-নয়ন, কমল-নয়ন, পদ্মপলাশ-নয়ন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে খঞ্জন- ও হরিণ-নয়ন প্রায়শঃ চিত্রিত নারীমূর্ত্তিতে ও কমল-নয়ন পদ্মপলাশ-নয়ন এবং সফরীর ন্যায় নয়ন পাষাণ- ও ধাতু-মূর্ত্তি-সকলে কি দেব কি দেবী উভয়ের মূর্ত্তি গঠনেই ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় যাহাকে বলে পটলচেরা-চোখ তাহার উল্লেখ শিল্পশাস্ত্রে কিম্বা প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু অজন্তা গুহায় চিত্রিত বহু নারীমূর্ত্তিতে পটলচেরা চোখের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

নারী-নয়নের প্রকৃতিই চঞ্চল; তাই মনে হয় যে শিল্পাচার্য্যগণ সফরী খঞ্জন এবং হরিণ এই তিন চঞ্চল প্রাণীর নয়নের সহিত উপমা দিয়া নারী-নয়নের কেবল প্রকৃতিটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা নয়, খঞ্জন হরিণ কমল পদ্মপলাশ সফরী ইত্যাদি উপমা বিভিন্ন নয়নের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নয়নের নানাভাব ও আকৃতিটাও আমাদের বুঝাইয়া দেয়। খঞ্জন-নয়নের সকৌতুক বিলাস আর সফরী-নয়নের অস্থির দৃষ্টিপাতে এবং হরিণ-নয়নের সরল মাধুরীতে, পদ্মপলাশ-নয়নের প্রশান্ত দৃকপাতে এবং কমল-নয়নের আমিলিত ঢল ঢল ভাবে যেমন প্রকৃতিগত প্রভেদ তেমনি আকৃতিগত পার্থক্যও আছে এবং আকৃতির পার্থক্য নয়নের পৃথক পৃথক ভাব প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই মূর্ত্তি গঠনে, চিত্র রচনায় ভিন্ন ভিন্ন আকারের নয়নের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

১০ নং চিত্র, শ্রবণ বা কর্ণ—"গ্রস্থলকারবৎ"—কর্ণের আকৃতি ল'কারের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে। যদিও ল'কারের সহিত কর্ণের সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু তথাপি মনে হয় কর্ণের গঠনটা ভাল করিয়া বুঝাইতে শিল্পাচার্য্যগণ অধিক মনোযোগী হয়েন নাই, ইহার একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে দেবীমূর্ত্তির কর্ণ

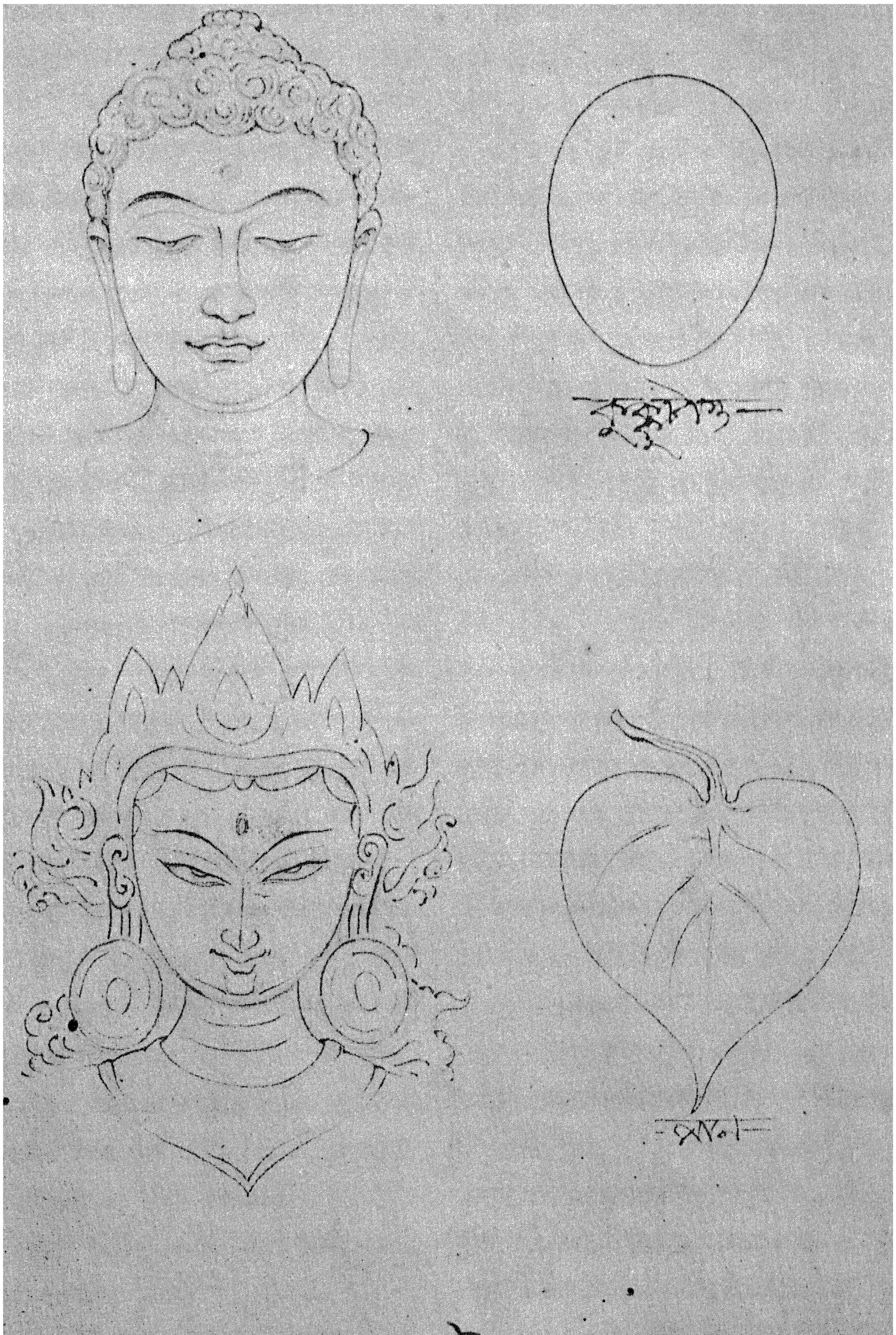

৭

Fig 7

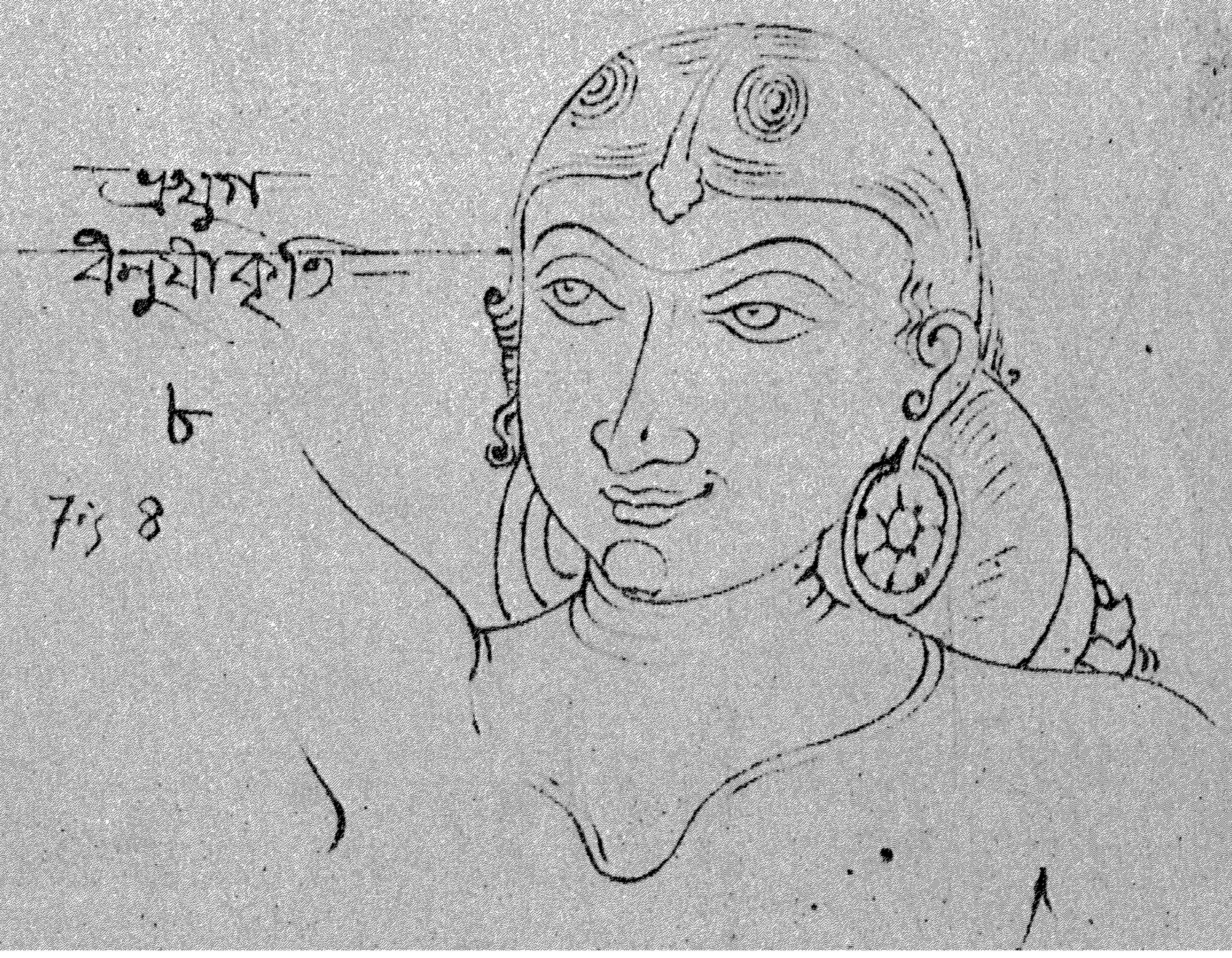

৮

Fig 8

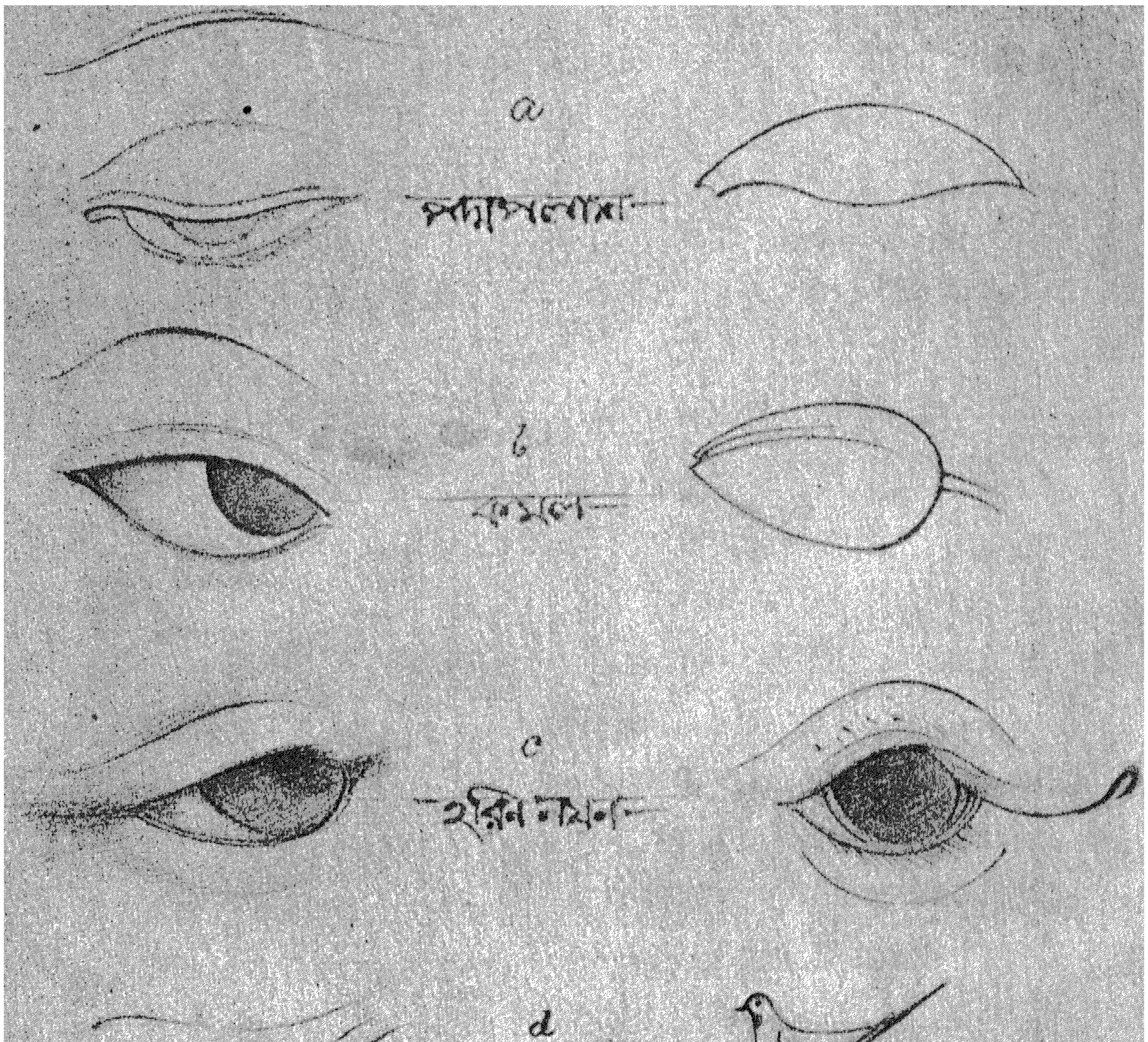
a
পদ্মপলাশ
b
কমল
c
হরিণ নয়ন
d
খঞ্জন
e
পটলচেরা
f
সফরী
৬

কুণ্ডলাদি নানা অলঙ্কারে ও দেবমূর্ত্তির কর্ণ মুকুটাদির দ্বারায় আচ্ছাদিত থাকিত বলিয়া কর্ণের আভাস মাত্র দিয়াই শিল্পাচার্য্যগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে গৃধিনীর সহিত কর্ণের তুলনা সুপ্রচলিত; কর্ণের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি গৃধিনীর চিত্র দিয়া যেমন স্পষ্ট বোঝান যায় এমন ল'কার দিয়া নয়।

১১নং চিত্র, নাসা ও নাসাপুট—"তিল পুষ্পাকৃতির্ণাস পুটম্ নিষ্পাববীজবৎ"—নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায় এবং নাসাপুট দুইটি নিষ্পাব-বীজ অর্থাৎ বরবটীর বীজের ন্যায় গঠন করিবে।

তিল ন্যায় নাসা সচরাচর দেবীমূর্ত্তিতে ও নারীগণের চিত্র রচনায় প্রয়োগ করা হয়। এইরূপ গঠনে নাসা ভ্রূমধ্য হইতে নিটোল ভাবে লম্বমান রহে এবং দুই নাসাপুট কুসুম-দলের মত কিঞ্চিৎ স্ফুরিত দেখা যায়। **শুকচঞ্চু-নাসা** প্রধানতঃ দেবতা ও পুরুষমূর্ত্তিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ গঠনে ভ্রূমধ্য হইতে নাসা ক্রমোন্নত হইয়া নাসাগ্রের দিকে গড়াইয়া পড়ে এবং নাসাগ্র সূক্ষ্ম ও দুই নাসাপুট দুই নেত্র-কোণের দিকে উন্নত বা টানা দেখা যায়। শক্তিমান ও মহাত্মা পুরুষের নাসা মাত্রেই শুকচঞ্চুর আকারে গঠিত করা বিধেয়। স্ত্রীমূর্ত্তিতে শুকচঞ্চু-নাসা একমাত্র শক্তিমূর্ত্তি-সকলেই দৃষ্ট হয়।

১২নং চিত্র, ওষ্ঠাধর—"অধরম্ বিম্বফলম্" —অধরের প্রকৃতি সরস ও রক্তবর্ণ, সেই জন্য বিম্ব (তেলাকুচা) ফলের তুলনা আকৃতিটা যত না হউক প্রকৃতিটা—অধরের মসৃণতা সরসতা ইত্যাদি—বুঝাইবার সহায়তা করে এবং বন্ধুজীব বা বান্ধুলী ফুল (হলুদি বসন্ত, গলঘোষের ফুল) অধর এবং ওষ্ঠ দুয়েরই আকৃতিটা সুন্দর রূপে ব্যক্ত করে।

১৩নং চিত্র, চিবুক—"চিবুকম্ আম্রবীজম্" —কেবল গঠনসাদৃশ্যের জন্যই যে আম্রবীজের (আমের কসি) সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়। মুখের আর-সকল অংশ অপেক্ষা তুলনায় চিবুকের প্রকৃতি জড়, অর্থাৎ ভ্রূ, নাসাপুট, নেত্র এবং ওষ্ঠাধর নানা ভাব-বশে যেমন সজীব হইয়া উঠে, চিবুক সেরূপ হয় না, সেই জন্য জড়পদার্থের সহিত চিবুকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, এবং নাসা, নেত্র, ও ওষ্ঠাধরের তুলনা পুষ্প পত্র মৎস্য ইত্যাদি সজীব বস্তুর সহিত দেওয়া হইয়াছে। মুখের মধ্যে কর্ণও জড়, সুতরাং তাহার উপমা লকারের সহিত দেওয়া সুসঙ্গত।

১৪নং চিত্র, কণ্ঠ—"কণ্ঠম্ শঙ্খসমাবৃতম্"— ত্রিবলী-চিহ্নিত শঙ্খের ঊর্দ্ধ ভাগের সহিত মানব-কণ্ঠের সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে; ইহা ছাড়া শঙ্খের স্থান যখন কণ্ঠ তখন শঙ্খের সহিত তাহার আকৃতি প্রকৃতির তুলনা সুসঙ্গত।

১৫নং চিত্র, শরীর বা কাণ্ড— "গোমুখাকারম্"—কণ্ঠের নিম্নভাগ হইতে জঠরের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত দেহাংশ গোমুখের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে; ইহাতে বক্ষস্থলের দৃঢ়তা, কটিদেশের কৃশতা ও জঠরের লোল বিলম্বিত ভাব ও গঠন সুন্দর সূচিত হয়। শরীরের মধ্যভাগের সহিত ডমরুর ও সিংহের মধ্যভাগের তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে এবং দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য রুদ্ধ কবাটের সহিত পুরুষের বক্ষের তুলনা দেওয়া হয়, কিন্তু শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই গোমুখ দিয়া যেমন সুচারুরূপে বুঝান যায় সেরূপ অন্য কিছু দিয়া নয়।

১৬নং চিত্র, স্কন্ধ,—"গজতুণ্ডাকৃতিঃ"—বাহু "করিকরাকৃতিঃ"। গজস্কন্ধ আমাদের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গজমুণ্ডের সহিত মানব-স্কন্ধের সৌসাদৃশ্যটা অস্বীকার করা চলে না। বাহু এবং স্কন্ধ শিল্পীরা শুণ্ড-সমেত গজমুণ্ডের মত করিয়া চিরদিন গড়িয়া আসিতেছেন। কবি কালিদাস মানবস্কন্ধের উপমা বৃষস্কন্ধের সহিত দিয়াছেন সত্য, কিন্তু গজমুণ্ড যে বৃষস্কন্ধ অপেক্ষা আকৃতি প্রকৃতিতে মানবস্কন্ধের সমতুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করীশুণ্ডের সহিত বাহুর যে কেবল আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তাহা নয়, দুয়েরই প্রকৃতিতে একটা মিল বেশ অনুভব করা যায়। পঞ্চশীর্ষ সর্প এবং লতার সহিত কবিগণ যে বাহুর উপমা দেন তাহাতে বাহুর প্রকৃতি যে জড়াইয়া ধরা, বন্ধন করা, সেইটুকু মাত্র প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকের বাহু ও তাহার উপমাদ্বয়ের

স্বধর্ম্ম যে নির্ভরশীলতা তাহাই সূচনা করে, কিন্তু করীকরের সহিত তুলনা দিলে বাহুর প্রকৃতি আক্ষেপ বিক্ষেপ বেষ্টন বন্ধন ইত্যাদি ও সঙ্গে সঙ্গে বাহুর আকৃতিটাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

১৭ নং চিত্র, প্রকোষ্ঠ,—"বালকদলীকাণ্ডম্" —কফোণি (কনুই) হইতে পাণিতলের আরম্ভ পর্য্যন্ত ছোট কলাগাছের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে। ইহাতে প্রকোষ্ঠের সুগঠন এবং নিটোল অথচ সুদৃঢ় ভাব দুয়েরই দিকে শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

১৮ নং চিত্র, অঙ্গুলী—"শিম্বীফলম্"—শিম্ ও মটরসুঁটির সহিত অঙ্গুলীর তুলনা কবি-সমাজে আদর লাভ না করিলেও অঙ্গুলীর গঠনের পক্ষে চাঁপার কলি অপেক্ষা শিম্বীফল অধিক প্রয়োজনে আসিয়া থাকে।

১৯ নং চিত্র, উরু,—"কদলীকাণ্ডম্"—কলাগাছের ন্যায় উরু, কি স্ত্রীমূর্ত্তি কি পুরুষমূর্ত্তি উভয়েতেই শিল্পীরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া করভোরু অর্থাৎ করীশিশুর শুণ্ডের ন্যায় উরু বহু দেবীমূর্ত্তিতে দেখা যায়। কিন্তু উরু-যুগলের দৃঢ়তা ও নিটোল গঠনের সাদৃশ্য কদলীকাণ্ডেই সমধিক পরিস্ফুট। বাহুদ্বয় করীশুণ্ডের মত নানাদিকে কার্য্যবশে প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কারণেই কদলীকাণ্ড অপেক্ষা কোমল ও দোদুল্যমান করীশুণ্ডের সহিত বাহুর তুলনা দেওয়া আকৃতি প্রকৃতি উভয় হিসাবে সুসঙ্গত হয়। উরুযুগল শরীরের সমস্ত ভার বহন করে বলিয়াই তাহার আকৃতি প্রকৃতি উভয় দিকটাই বুঝাইতে হইলে শুণ্ড অপেক্ষা কঠিনতর যে কদলীকাণ্ড তাহারই উপমা সুসঙ্গত।

২০ নং চিত্র, জানু,—"কর্কটাকৃতিঃ"—কর্কটের পৃষ্ঠের সহিত জানুর অস্থিটির তুলনা দেওয়া হয়।

২১ নং চিত্র, জঙ্ঘা,—"মৎস্যাকৃতিঃ"—আসন্নপ্রসবা বৃহৎ মৎস্যের আকৃতির সহিত মানবজঙ্ঘার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

২২ নং চিত্র, কর ও পদ,—"করপল্লবম্ পদপল্লবম্"—কমলের সহিত ও পল্লবের সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অজন্তাচিত্রাবলীতে ও ভারতীয় মূর্ত্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোন দেশের কোন মূর্ত্তিতে নয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আভ্যুদয়িক *

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের "নোবেল্-প্রাইজ্" প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য-পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরী!
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে কবির পূজা সব দেশে।

* * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত-লহর স্নিগ্ধবাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন করে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী আরোরায়।

* * *

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রবীণ মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গ-সাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে!"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে!

* * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল!...হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া!
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চ্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে!
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

* ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে বোলপুরে "রবীন্দ্র-সঙ্গমে" পঠিত।

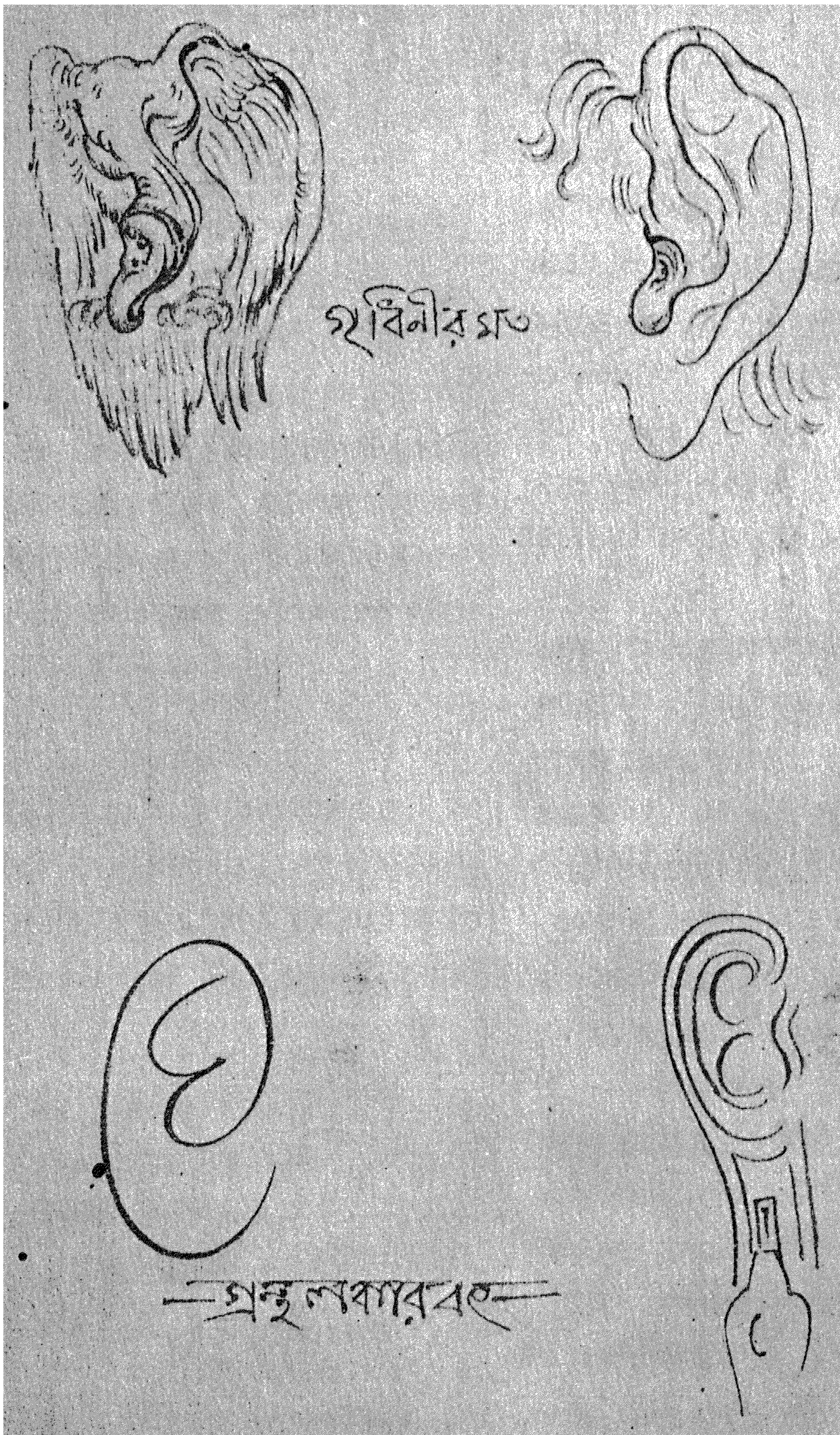
গৃধিনীর মত
শষ্কুলাকারবৎ

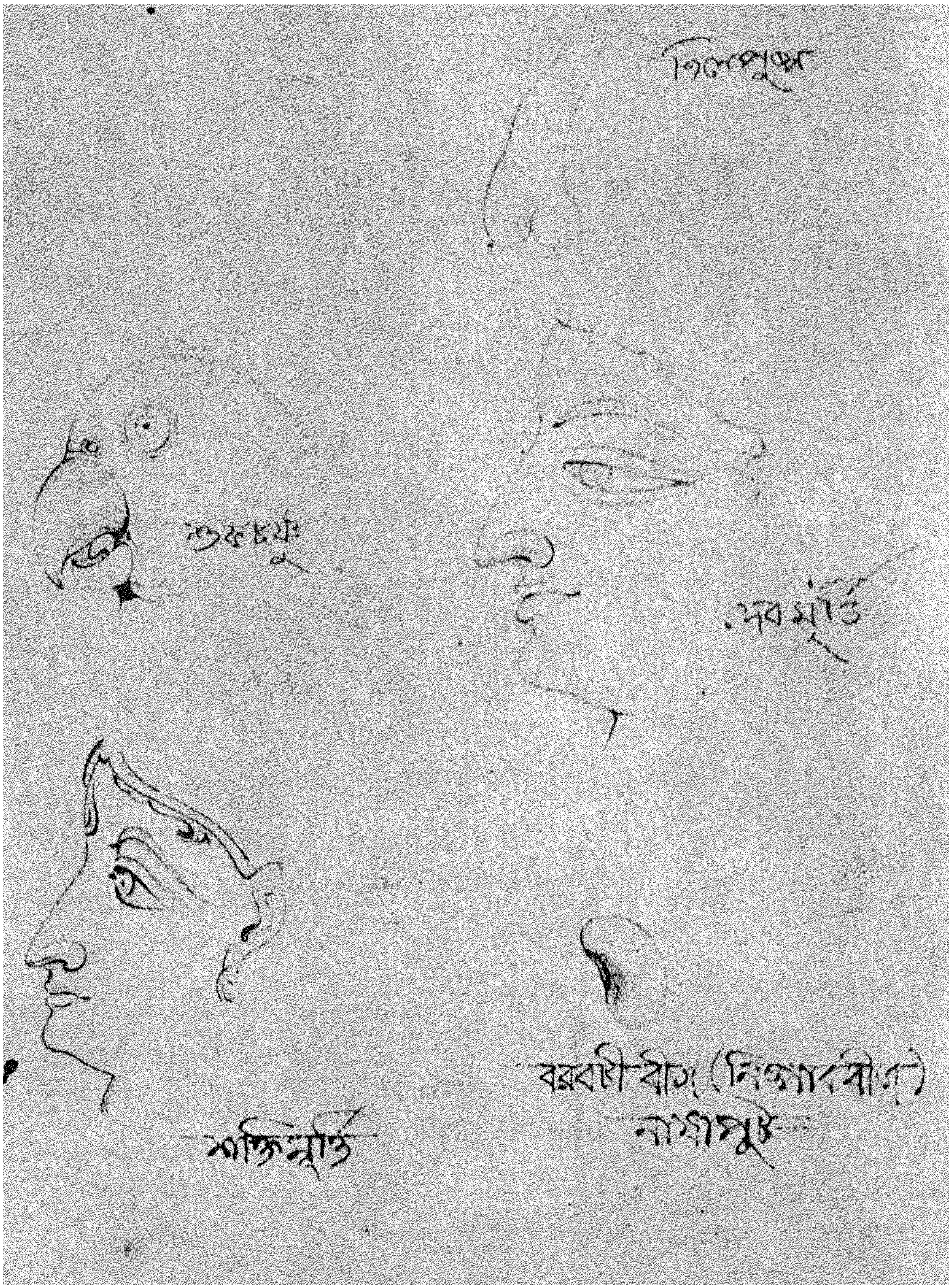
তিলপুষ্প
শুকচঞ্চু
দেবমূর্তি
শক্তিমূর্তি
বরবটী বীজ (নিষ্পাব বীজ)
নাসাপুট

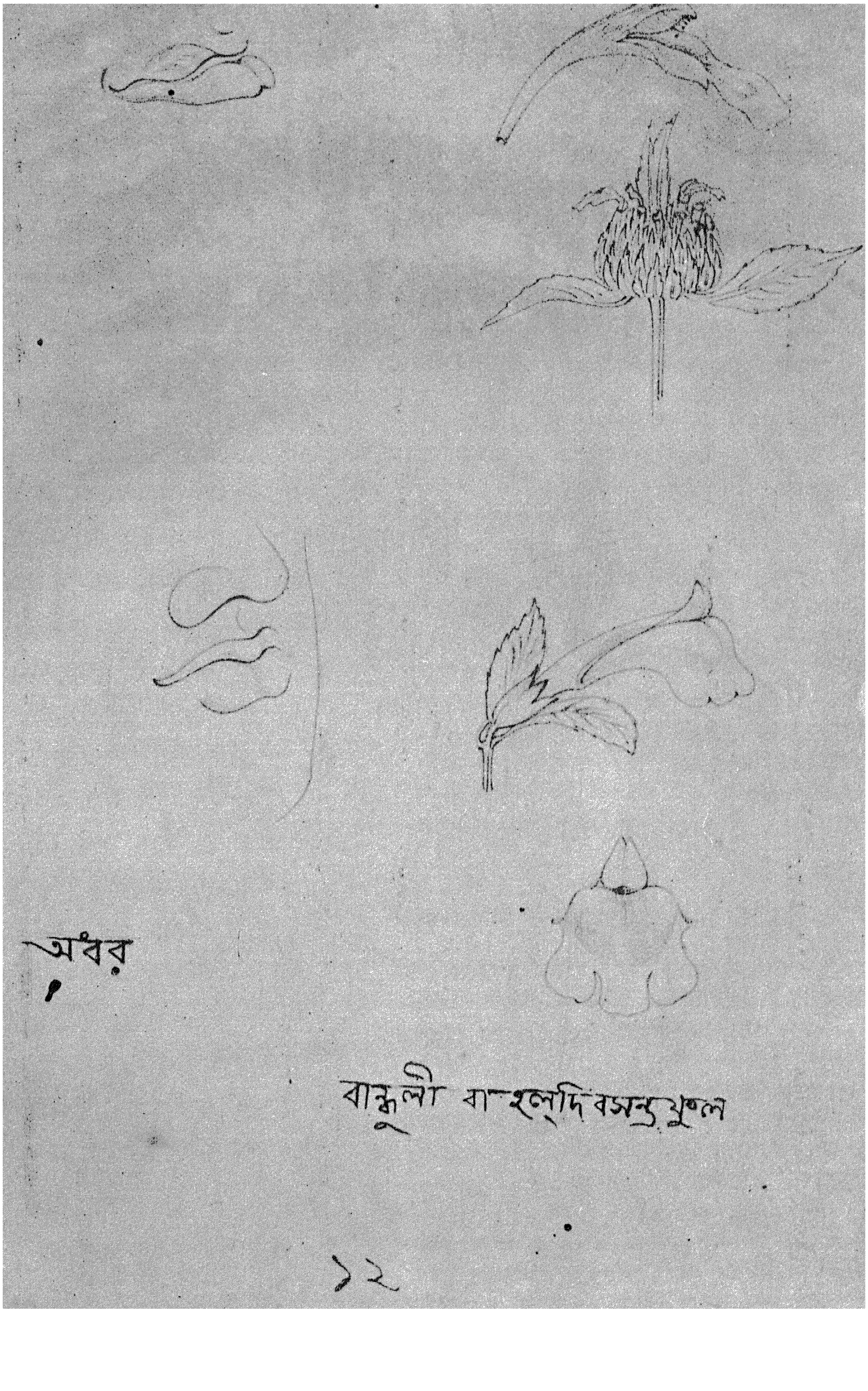
অধর
বান্ধুলী বা হলদি বসন্ত ফুল
১২

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান আছে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজ্‌কে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

* * *

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য পারিজাতের কলি !
"বঙ্গভূমি ! রম্য তুমি" বল্‌ছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুব তারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয়।

* * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ-রবির মুলুক থেকে ;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ্-ঝুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

* * *

ধন্য কবি ! কাব্য-লোকের ছত্রপতি ! ধন্য তুমি ;
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে, কবি !
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি-সভায় ওগো ! বাজাও বীণা হাজার-তারা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চশস্য

মোসলেম ধর্ম্মে সাধুসন্ত পূজা (The Moslem World):—

সাধুসন্ত পূজাকে মুসলমানেরা "মারাবুৎ" বলে। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী হইলেও, তাহারা বহু সাধুসন্ত মহাপুরুষের পূজা করিয়া থাকে, এবং তাঁহাদিগকে ভগবানের কাছে পূজকের কল্যাণের জন্য ওকালতি করিতে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই যে নরপূজা ও কুসংস্কার, ইহা বোধ হয় অনুন্নত জাতির সাহচর্য্য হইতে মুসলমানী বিশ্বাসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অথবা প্রত্যেক দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বের স্থানীয় ধর্ম্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের অবশেষ থাকিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের দেশ খৃষ্টান কর্ত্তৃক জিত হইলে মুসলমানেরা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ফলেও এইরূপ বীরপূজা ও সাধুপূজা প্রসার লাভ করিয়াছিল। গোঁড়া ধর্ম্মপাগল লোকেরা এখনো সাধারণ লোকের কাছে মহাপুরুষ বলিয়া সহজেই পূজা পাইয়া আসিতেছে। গোঁড়ামির পাগলামি সাধারণে সহজেই ধার্ম্মিকতা বলিয়া ভুল করে। পূজা আদায় করিবার আর-একটা সহজ পন্থা সন্ন্যাস-গ্রহণ। মানুষ বাহ্যত সংসার ত্যাগ করিয়া সহজেই সংসারের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া কায়েমি আসন দখল করিতে পারে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুসলমান ধর্ম্মের তুল্য একেশ্বরবাদী আবর্জ্জনাশূন্য পবিত্র ধর্ম্মমত জগতে অত্যন্ত বিরল। মুসলমানের প্রধান ধর্ম্মমত এই যে "লা-ইলাহা-ইল্লিল্লা"—পরমেশ্বর ভিন্ন আর কোনো ঈশ্বর নাই, অথচ তাহারা এই মন্ত্র আওড়াইয়াই পীর প্রভৃতির দরগায় পূজা করিয়া থাকে। সিদি-ল-আরবী-উদ্-দরগাওনি এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য তাঁহার অনুচরদিগকে "শাহাদা" মন্ত্রের (লা-ইলাহা ইল্লিল্লা, মুর মহম্মদ রসলুল্লা) প্রথমাংশ মাত্র উচ্চস্বরে বলিতে দিতেন, মহম্মদের স্তুতিবাদটুকু মনে মনে বলাইতেন, পাছে লোকে মহম্মদকেই পরমেশ্বরের আসনে বসাইয়া ফেলে ; কিন্তু সাধারণ লোকে অসাধারণ লোককে দেবতার আসন দিতেই এত ব্যস্ত যে "দরগাওনা" সম্প্রদায়ের মুসলমানদের কাছে স্বয়ং দরগাওনি দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যেক দেশের জেলায় জেলায় গাঁয়ে গাঁয়ে কত যে পীর দরবেশ প্রভৃতি পূজা পাইতেছেন তাহার সংখ্যা নাই ; কিন্তু ইঁহাদের খ্যাতি সেই স্থানেই আবদ্ধ, হয় ত পাশের জেলাতেও তাঁহার পরিচয় লোকের অপরিজ্ঞাত।

ইসলাম ধর্ম্মে জপমালা (The Moslem World)—

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে দুই সম্প্রদায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত না হইয়াও, সম্পূর্ণ পৃথক্ দেশে ও অবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াও, এমন অনুষ্ঠান অবলম্বন করে যাহা প্রায় একই রকমের। এইরূপ একটি জিনিস জপমালা। জপমালার ব্যবহার জগতের শ্রেষ্ঠ সকল ধর্ম্মেই দেখা যায়—হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, য়িহুদি, মুসলমান, সকলেই জপমালা ব্যবহার করে। কিন্তু এই-সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং একের প্রভাবে অপর প্রভাবান্বিত। সুতরাং এই জপমালা সম্ভবত এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথমে গৃহীত হইয়া অপর সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জপমালা খুব সম্ভব ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল ; হিন্দুধর্ম্মের এই অঙ্গ পারসিক ধর্ম্মে, এবং তথা হইতে খৃষ্টধর্ম্মে সম্প্রসারিত হয় ; তৎপরে ইসলাম ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের সংস্রবে আসিয়া খৃষ্টধর্ম্মের অপর অনেক অনুষ্ঠানের সহিত জপমালাও গ্রহণ করে। প্রবাদ আছে যে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার আসবাবের মধ্যে একখানি কোরান ও দুগাছি জপমালা পাওয়া গিয়াছিল। এ প্রবাদ যে মিথ্যা তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেননা আবু বকরের

সমকালে কোরান সংগৃহীত হইয়াছিল, মহম্মদের সময় কোরানের অস্তিত্ব ছিল না। আর একটি প্রবাদ এই যে, একদিন মহম্মদ দেখিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক কাঁকর গণিয়া জপের সংখ্যা রাখিতেছে; মহম্মদ তাহাদিগকে কাঁকরে জপসংখ্যা রাখিতে নিষেধ করিয়া অঙ্গুলিপর্ব্বে জপসংখ্যা করিতে উপদেশ দেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অনুষ্ঠানবহুল ইসলামধর্ম্ম আল্লা ও মহম্মদের নামজপের সংখ্যা রাখিবার জন্য সহজেই জপমালা উদ্ভাবন করিয়াছিল বা প্রতিবাসী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। কিম্বদন্তী যে মহম্মদ বলিয়াছিলেন যে অঙ্গুলিপর্ব্বে আল্লার নামজপের সংখ্যা রাখিবে, আল্লার কাছে পরকালে তাহারা সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু খলিফা ওমারের পুত্র আবদাল্লা জপসংখ্যা রাখার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—"ওরূপ করিয়ো না, উহা সয়তানের বুদ্ধি।" অনেক কুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছবুদ্ধি মুসলমান মালাজপের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন; মানস জপই জপ—পরমেশ্বরের নামরস পান করিব, তাহার আবার মাপ বা সংখ্যা কি? কিন্তু মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিদের সাবধানবাণী সত্ত্বেও হেজিরার তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জপমালা কায়েমি হইয়া প্রচলিত হইয়া গেল। জপমালা বা তসবীতে ৯৯টি দানা বা গুটি থাকে। জপমালা প্রথমে অজ্ঞ ও ইতর শ্রেণীর মধ্যেই প্রসার লাভ করে; তদনন্তর স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমান মুসলমানেরা এই প্রথাকে পবিত্র-ইসলাম-বিরোধী বলিয়া এখনো জপমালার নিন্দা করিতেছেন। কায়রো হইতে প্রকাশিত অল-মানার নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, জপমালা আল্লার নামজপ সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া রাখে, তাহাতে চিত্ত তন্ময় হইবার অবসর পায় না; অহংকার করিয়া আল্লার নামজপে পাপের ভরাই ভারি হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অন্তরের ভাতি আচ্ছন্ন হয়।

ভারতের ভিক্ষুক (East and West)—

জগতের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের ভিক্ষুকই জ্যেষ্ঠ। এবং জ্যেষ্ঠাধিকারে তাহার দারিদ্র্যদুঃখও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের ভিক্ষুক যেন মনুষ্যসমাজের ভাঙন—রসাতলের পথে সর্ব্বনাশের আশায় হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাও আনন্দে ব্যগ্রতায় ত্বরিতগতিতে। ভারতের ভিক্ষুকের মনের বল ও সাহস তাহার বিদেশী জাতিগোষ্ঠীদের চেয়ে ঢের বেশি, তাহার ফন্দি অসীম, তাহার উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ও অসংখ্য। কিন্তু তবুও সে পাপচারী দলের শেষ যাত্রী।

হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ভিক্ষুকেরা সম্প্রদায়ের সর্দ্দার, সম্প্রদায়ের অলঙ্কার। সে আতুর পঙ্গু প্রজাদের উপর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে। এই ভিক্ষুকরাজসম্প্রদায় আবার ব্যবসায় অনুসারে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত—

১। বানর ও রামছাগলের নাচওয়ালা।—সে বানর ও ছাগলকে দিয়া ভাঁড়ামি করিয়া লোককে হাসাইয়া খুসি করিয়া সহজেই পয়সা আদায় করিয়া ফিরে। তাহার আগমনে পাড়ার শিশুপাল উল্লসিত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে; সে শিশু ভেলাইয়া মা-বাপের কষ্টার্জ্জিত পয়সা খুব সহজেই পকেট হইতে বাহির করিয়া আনে। সুবিধামত জায়গায় একা পাইলে সে বানর লেলাইয়া পথিককে সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া অতি সহজে পকেটও মারে। সে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা নয়; পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই মতো ভবঘুরে কোনো রমণীকে হয় ত জীবনসঙ্গিনী করে; তার পর একদিন খেয়াল হইলে গভীর রাত্রে বানর ও ছাগলগুলিকে লইয়া সঙ্গিনীর সঙ্গ চিরজন্মের মত ত্যাগ করিয়া নূতনের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে।

২। ভালুকনাচওয়ালা—বানরনাচওয়ালার কনিষ্ঠ। সে ভালুকের নাচ দেখাইয়া, ভালুকস্বরের ঔষধ—ভালুকের লোম বেচিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে।

৩। সাপুড়ে—তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইয়া, সাপ ধরিয়া, অসম্ভব স্থান হইতে সাপ বাহির করিয়া, ভেল্কি লাগাইয়া, সাপের বিষের জড়িভুটি বিক্রয় করিয়া কোনো রকমে দিন গুজরান করে।

৪। গাইয়ে—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কোরান গাহিয়া গাহিয়া বাড়ীর দ্বারে দ্বারে, দোকানে দোকানে ইহারা ভিক্ষা করিয়া ফিরে। ইহাদের গান কেহ শুনে, কেহ বা শুনে না; কেহ বা শ্রদ্ধায়, কেহ বা অশ্রদ্ধায় এক আধটা পয়সা ফেলিয়া দেয়; তাহাই কুড়াইয়া ইহাদের নিজের ও বহুমীটির ভরণপোষণ চলে। ইহারা ভিক্ষুক হইলেও চেহারায় বেশ ভদ্র রকমের, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তেলচুকচুকে স্নানমার্জ্জিত গায়ে একখানি ফরসা চাদর জড়ানো, লম্বা টিকিটি গুচ্ছ করিয়া পরিপাটী বাঁধা, তিলককোঁটায় প্রচুর যত্নপরিশ্রমের পরিচয়; কাহারো হাতে বেহালা, কাহারো খঞ্জনী, কাহারো গোপীযন্ত্র, কাহারো বা সম্বল দুখণ্ড কাঠ—তাহাই ঠুকিয়া বাজখেঞে গলায় গানের তাল রাখে। সে গান গাহে—কিন্তু গানের পদ ও ভাবের সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, গান তাহার মন স্পর্শ করে না, তাহার মুখে কোনো চিহ্ন আঁকে না, সে পয়সা পাইলেই সমের অপেক্ষা না করিয়াই গান থামাইয়া অন্য মক্কেল পাকড়াইবার জন্য সরিয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের মুখে মুখে কত পল্লীকবির কবিত্বচেষ্টা, কত সাধকের সাধনার ইতিহাস যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা তাহারাও জানে না, লোকেও তাহার খোঁজ রাখে না।

৫। ভবঘুরে বেদে—ইহারা স্বামী পুত্র সঙ্গে লইয়া, আঁতুড়ের শিশুকে ঝোলায় ঝুলাইয়া পথে পথে এক করুণ সুরে নিজেদের দৈন্য জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরে; সুবিধা পাইলে চুরি করে, কিন্তু তাহাদের সম্বল কিছু জমে না। যাহা পায় তাহাই এক বেলার উৎসবে ফুঁকিয়া দেয়, তার পর নিজেদের নগ্নতা ও শীর্ণতা দেখাইয়া লোকের দয়া আকর্ষণ করিয়া ফিরে।

৬। গণৎকার—ইহারা একখানা আঁকজোঁককাটা জরাজীর্ণ বই, একজোড়া পাশ্‌টি, একটুকরা খড়ী, এবং এমনি আরো টুকিটাকি জিনিস লইয়া লোকের হাত দেখিয়া মুখ দেখিয়া ভাগ্য গণিয়া ফিরে। ইহারা সুদূর গ্রহের প্রভাবের ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রতিবেশীর-কাছে-শোনা দুচারটা খবর ও নিজেদের ধূর্ত্ততার উপরই নির্ভর করিয়া অদৃষ্ট গণনা করে। প্রথম দর্শনেই সে তাহার মক্কেলকে ভাগ্যবান বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু কিছুদিন পরে যে তাহার একটা ফাঁড়া আছে এ কথা বলিতেও সে বিস্মৃত হয় না। ইহারা মনস্তত্ত্ব বেশ জানে; ভাগ্যবান বলিয়া খুসি করিয়া ও ফাঁড়ার ভয় দেখাইয়া ক্রমে বেশ আসর জাঁকাইয়া বসে; এবং মাটিতে হিজিবিজি আঁক কাটিয়া পাশা ফেলিয়া ফুলফলের নাম বলাইয়া অনর্গল বক্তৃতায় ও নানা প্রক্রিয়ায় মক্কেলের মন একেবারে অভিভূত করিয়া নিজের পারিশ্রমিক ও গ্রহশান্তির জন্য আটা ঘিউ চিনি ও সওয়া পাঁচ আনা পয়সা অতি স্বচ্ছন্দেই আদায় করিয়া চম্পট দেয়।

৭। বদ্যিনাথের-গরু-ওয়ালা—এরা নানা ছলে ভিক্ষা আদায় করে। অস্বাভাবিক-অঙ্গযুক্ত একটা গরু জোগাড় করিয়া ইহারা নানাবিধ কৌশল ও ইঙ্গিত শিক্ষা দেয়, ইঙ্গিত-অনুসারে এই গরু পা তোলে, মাথা নাড়ে। এই গরুর পিঠে একখানি বিচিত্র-বর্ণের-কারুকার্য্য-করা কাঁথা ঢাকা দিয়া, কড়ি-গাঁথা দড়ি ও ঘণ্টা দিয়া

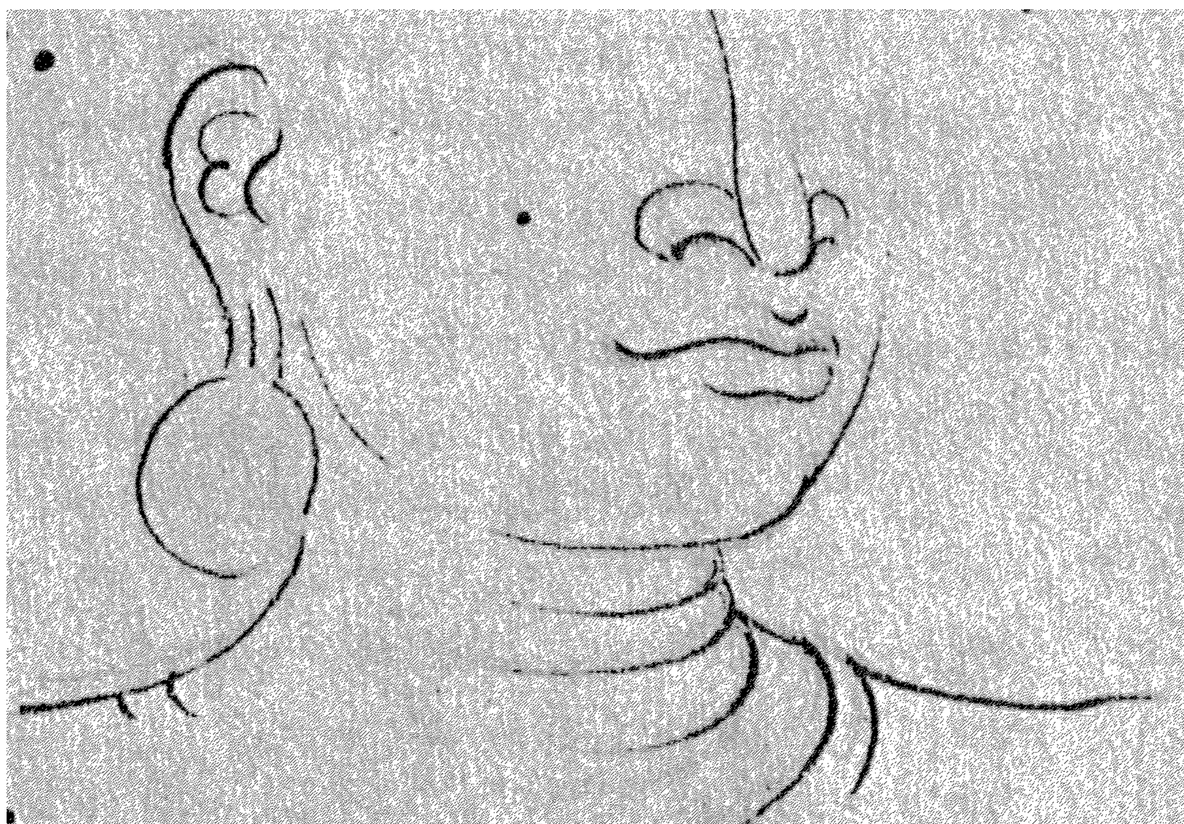

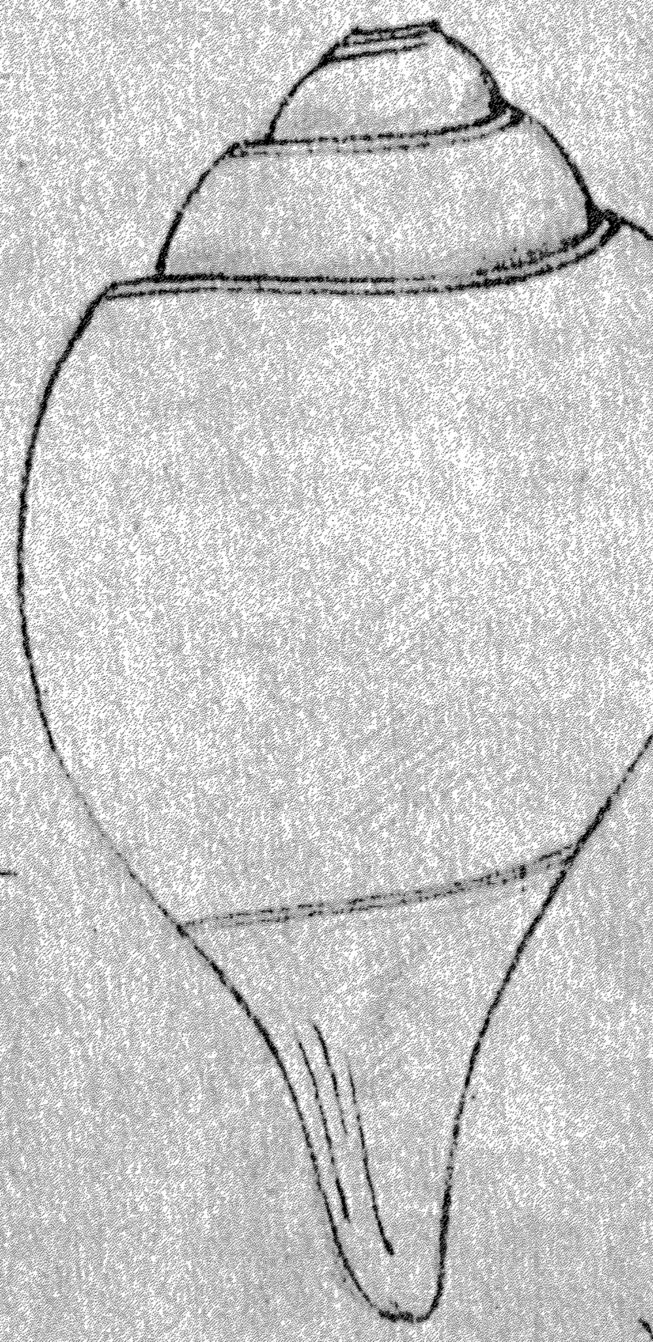

কণ্ঠম্- শঙ্খ সমাযুক্তম্

১৪

Fig 14

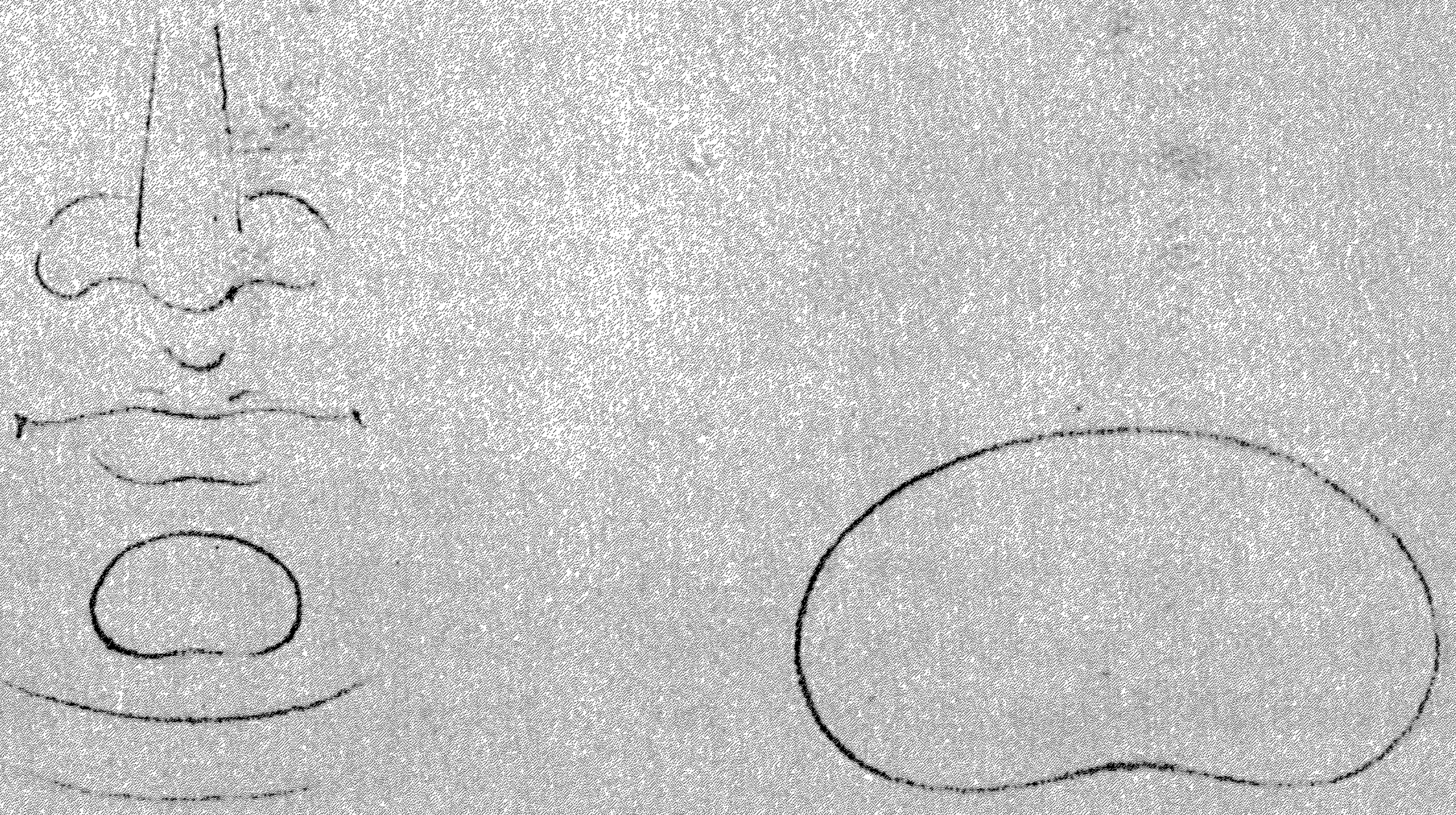

চিবুকম্ আম্রবীজকম্

১৩

১৫

Fig 15

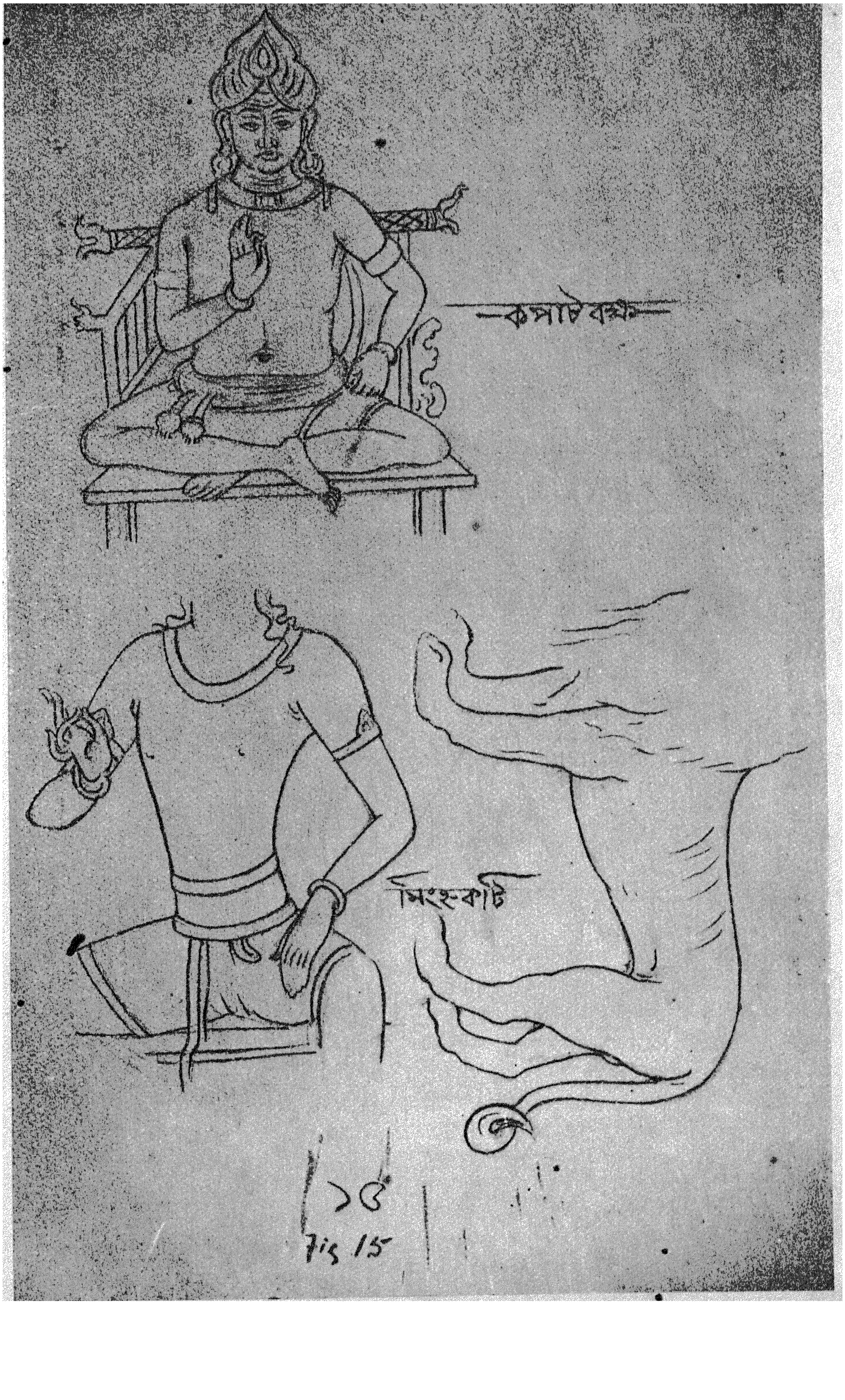

১৫
Fig 15

সাজাইয়া ইহারা লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরে, এবং সহজে বিশ্বাসশীল নরনারীকে গঙ্গুকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করাইয়া, ভবিষ্যৎ গণাইয়া, যাজ্ঞা করাইয়া পয়সা কাপড় ইত্যাদি আদায় করে।

৮। **পূজারী ভিখারী**—ইহারা একটা সাজিতে গুটিকয়েক ফুল ও একটু গঙ্গাজল লইয়া, একগোছা পৈতা ও বিচিত্র ফোঁটার জোরে লোকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অজ্ঞাত দেবতার পূজার ভান করিয়া জলফুল ছিটাইয়া খুব সহজেই দক্ষিণা আদায় করে। এই শ্রেণীতে শীতলা-ওয়ালা, ওলাদেবীর পূজারী প্রভৃতিকেও ধরা যাইতে পারে। এই-সব ভীষণ রোগদেবতার রোষের ভয়ে গৃহস্থ অতি সহজেই চাল ডাল, কলামূলা, পয়সা কাপড় দিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হয়।

৯। **মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ভিখারী**—ইহারা সততার ভান করিয়া, নিত্য নব নব বিপদ্জালের বর্ণনা সৃষ্টি করিয়া, সত্যের অবভাসে দয়ার্দ্র করিয়া প্রচুর রকম ভিক্ষা আদায় করে। ইহাদের কেহ দশটাকা মাহিনার চাকরী করে, কিন্তু বহুপরিবার, দশটাকায় চলে না, তাই ভিক্ষা করিতেছে, না হয় ত ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড় দেখাইয়া বলে যে বেচিতে আসিয়াছে, এগুলির পরিবর্ত্তে সের-খানেক চাল পাইলে সেদিনকার মতন কতকগুলি প্রাণীর আহার হয়। কোন্ পাষণ্ড কাপড় রাখিয়া তাহাকে চাল দিবে?—সে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাল ডাল খাদ্য ও টাকাটা সিকেটা অমনিই রোজগার করিয়া বাড়ী ফিরে। কাহারও বাঁধিগৎ, তাহার ভাই পণ্টনমে নোক্‌রী করে, সে দেশ হইতে আসিয়া দেখিতেছে সেই পণ্টন রেঙ্গুনমে বদলি হইয়া গিয়াছে, এখন সে আথান্তরে পড়িয়াছে, কিছু অর্থ হইলেই সে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে, এবং আজ দু দিন সে ভুখা আছে, অন্তত একপয়সার ছাতু কি চানা খাওয়াইয়া দিলে বাবুজির বহুৎ পুণ্য হইতে পারে।

সমর্থ ভিক্ষুকদের আট প্রকার শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া হইল। ইহাই যে সম্পূর্ণ তালিকা তাহা নহে, তবু ইহা হইতেই অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষাবৃত্তি যতই হেয় হোক, ইহার দ্বারা দাতার অন্তরের মহৎ ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহা মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। ভিক্ষুক সহৃদয়ের শান ও নিকষ প্রস্তর উভয়ই।

জনন-সমস্যা (Les Documents du Progres):-

অনেকের দৃঢ় ধারণা আছে যে প্রথমজাত জ্যেষ্ঠসন্তান কনিষ্ঠদিগের অপেক্ষা বলবান ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। ইহারই ফলস্বরূপ অনেক স্থলে জ্যেষ্ঠের দায়াদাধিকার প্রবল ও অধিক, এবং কনিষ্ঠদিগের উপর তাহার কর্তৃত্ব ও শাসন করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

অনেক পণ্ডিত বা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মত এই যে অনিয়ন্ত্রিত সন্তান-জনন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, এবং তাহার দ্বারা সামাজিক ক্ষতি হইবার যদিই বা কিছু সম্ভাবনা থাকে, তবে গুণোৎকর্ষ দ্বারা সংখ্যাহীনতার ক্ষতি সম্পূরণ হইতে পারিবে। তাঁহাদের মতে প্রতি দম্পতির দুইটির বেশি সন্তান হওয়া উচিত নয়। ইহাতে দম্পতির স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি এবং সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই ভালো হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ শারীরতত্ত্ববিৎ মেচনিকফ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে জনন অব্যাহত না থাকিলে জাত সন্তানের গুণোৎকর্ষের সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে জ্যেষ্ঠ সন্তান কনিষ্ঠদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী বা অধিকতর বুদ্ধিমান হয় না। প্রকৃতির নিয়মই হইতেছে ক্রমোন্নতি; সুতরাং প্রথমজাত সন্তান আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম না হইবারই কথা। বহুর জন্ম হয় বলিয়াই প্রকৃতি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি করিবার অবসর পায়। সুতরাং কেবলমাত্র প্রথমজাত সন্তানগুলিকে বাছিয়া লইলে সে বাছাই সরেস বাছাই কখনই হইবে না।

মেচনিকফের বহুপূর্ব্বে অপর এক পণ্ডিত ওয়েষ্টারগার্ড বলিয়া গিয়াছেন যে প্রথমজাত সন্তান সব চেয়ে কম মজবুত। তিনি গণনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

কোপেনহেগেনের ডাক্তার হান্সেন গণনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শেষোক্ত মতই সমর্থন করিতেছেন। তিনি ৪০০ লোকের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ২৩৪ জন জ্যেষ্ঠ ও ১৬৬ জন কনিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠেরাই অধিকতর সৎ, সুস্থ ও বুদ্ধিমান।

ডাক্তার বুর্গে বলেন যে প্রথম প্রসব অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় বলিয়া প্রথমজাত সন্তানেরা মরে বেশি। প্রথম গর্ভ যদি ১২৬টা নষ্ট হয়, ত দ্বিতীয় তৃতীয় নষ্ট হয় ৮৮, এবং চতুর্থ পঞ্চম নষ্ট হয় ৮৯।

অতএব নানা প্রকারে আজকাল ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে প্রথমজাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু অধিক হয়।

দুর্ব্বল ব্যক্তির সন্তান দুর্ব্বলতর হয়, এবং বুদ্ধি ও প্রতিভাবান প্রায় হয়ই না। র‍্যাঁসার ও রাবেলে জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন না; পাস্কালের এক বড় দিদি ছিলেন; রুসো ও ভল্টেয়ার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন; বোমার্শে সপ্তম গর্ভের সন্তান; শাতোব্রিয়াঁ দশম; ভিক্তর হ্যুগো ও শেক্সপীয়র তৃতীয়।

অনেক সংখ্যাগ্রাহী পণ্ডিতের মতে যুবা দম্পতির তৃতীয় সন্তানই সর্ব্বাপেক্ষা ভালো হয়।

অতএব প্রত্যেক দম্পতির অন্ততপক্ষে তিনটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যক।

বাঁচবে যদি বিয়ে কর (The Literary Digest)—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সেন্সস হইতে দেখা গিয়াছে যে চিরকুমার ও চিরকুমারী অপেক্ষা বিবাহিত নরনারী দীর্ঘজীবী হয়। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের বিবাহিত পুরুষের মৃত্যুর হার ৪·২, চিরকুমারের মৃত্যুর হার ৬·৬; ৩০ হইতে ৪০ বয়সের বিবাহিত মরে শতকরা ৬, চিরকুমার মরে প্রায় ১৩; ৪০ হইতে ৫০ বয়সে মৃত্যুহারের তারতম্য আরো বেশী, বিবাহিত ৯·৫, অবিবাহিত ১৯·৫; ৫০ হইতে ৬০ বয়সে তারতম্য অধিক না হইলেও, অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত হাজারকরা ১১ জন কম মরে; ৬০ হইতে ৭০ বয়সে বিবাহিত মরে ৩২, অবিবাহিত ৫১।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলকক্স ইহার কারণ স্বরূপ বলেন—(১) রুগ্ন ও অসমর্থ লোকেরা অনেক সময় বিবাহ করে না; চিরকুমারের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা সেইজন্য বেশি হয়; (২) বিবাহিত লোকেরা নিয়ম ও ধরাবাঁধার মধ্যে থাকে, অবিবাহিত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী বেপরোয়া আবাজ হয়, এজন্য মরে বেশি; দেখা যায় যে বিপত্নীক বা পত্নীত্যাগীদের মধ্যে এই কারণেই মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হয়; এমন কি ২০—৩০ বৎসরের বিপত্নীক ও পত্নীত্যাগীর মৃত্যুহার

অবিবাহিতের মৃত্যুহারের প্রায় ডবল; অপর বয়সেও অধিক, এবং কখন কখন ডবল।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুহারে বিবাহ বা কৌমার্য্য বিশেষ তারতম্য ঘটায় না। বরং ২০—৩০ বৎসরের বিবাহিত মেয়েরা কুমারীর চেয়ে ৫ ও ৪ অনুপাতে বেশি মরে; ইহার কারণ সন্তানপ্রসব। কিন্তু ৩০এর পর হইতে বিবাহিতার মৃত্যু অপেক্ষা অবিবাহিতার মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখা যায়। বিধবা বা পতিপরিত্যক্তা নারীর মৃত্যু বিপত্নীক বা পত্নীত্যাগী পুরুষের অপেক্ষা ঢের কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিবাহ পুরুষের যেমন, নারীর পক্ষে তেমন জীবনবর্দ্ধক নয়।

বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্রের জন্যই কর্ত্তব্য—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতেও (জীববিদ্যা ও উদ্বাহবিদ্যা) সন্তান দেখিয়া বিবাহ ভালো বা মন্দ হইয়াছে বিচার করা উচিত। পিতা পুত্ররূপে পুনঃ পুনঃ নব নব জীবন লাভ করেন, এজন্য স্ত্রীর নাম সংস্কৃতে জায়া। অনেক পণ্ডিত বলেন যে ঘোড়া গরু হাঁস মুরগী ফল ফুল প্রভৃতির বংশ যাহাতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এজন্য আমরা ক্ষেত্র ও বীজ কত রকমে বাছাই করিয়া সাবধান হইয়া চলি, কেবল মনুষ্যবংশের বেলা আমরা উদাসীন ও অসাবধান—ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের কথা। প্রাচীন ভারতে সবর্ণ বিবাহের মূলে এই বংশোৎকর্ষবিধান একটা কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কালে মিশ্রণের ফলে যখন সকল বর্ণ এক হইয়া উঠিল তখন আর সবর্ণ বিবাহের কোনো অর্থ থাকিল না, তখন একদল পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—স্ত্রীরত্নো দুষ্কুলাদপি। কিন্তু আধুনিক যুগে বিবাহে উৎকৃষ্টতম বর বা কন্যা বাছাই করা প্রায়ই হয় না—এখন রূপ, অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি, বিচারের মধ্যেই ধরা হয় না। ইহার প্রতিকারের জন্য আধুনিক উদ্বাহবিদ্যাবিদেরা বলেন যে যুবক যুবতীর অবাধ মিলন হওয়া আবশ্যক, তাহাতে বিস্তৃত ও বহু লোকের সহিত পরিচয় দ্বারা কন্যা স্বীয় মনোমত সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এজন্য স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ের একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত; ছেলে মেয়ে বাল্যাবধি অবাধে মিশিতে পাইলে যৌনমোহ অনেকটা হ্রাস হইয়া আসে, এবং তাহার ফলে তাহারা জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচনে ধীরতা ও বিচারের সহিত কার্য্য করিতে পারে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু স্কুল কলেজে এক্ষণে ছেলে মেয়ের একত্র শিক্ষা হইতেছে; আমাদের দেশেও মেডিক্যাল কলেজ, প্রাচীন ডভটন কলেজ ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কলেজেও ছেলেদের সহিত মেয়েরা পড়িয়া থাকে; ইহাতে এ পর্য্যন্ত ফল ভালো ছাড়া মন্দ হয় নাই।

আমেরিকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাদ্রী শিকাগোর পাদ্রী ডীন সামারের প্ররোচনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন যে চারিত্রগত সার্টিফিকেটের সহিত বিশ্বস্ত ডাক্তারের দেওয়া স্বাস্থ্যগত সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে তাঁহারা কোনো যুবক যুবতীর বিবাহ দিবেন না। রুগ্ন, নেশাখোর, নির্বুদ্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি লোকের বিবাহ দিয়া পরিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ঘটাইবার অধিকার কাহারো নাই; পুরোহিতেরা ধর্ম্মের প্রহরী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; অতএব তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পাপের প্রশ্রয় আর দিবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। অতএব এখন উভয় পক্ষের ইচ্ছা হইলেই বিবাহ হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত সুখ বলি দিবার আহ্বান সভ্য সমাজে নিনাদিত হইতেছে। নিজেরা অক্ষম, অপটু, রুগ্ন, দুষ্ক্রিয় ও দুশ্চরিত্র হইয়া সন্তানে সেই-সমস্ত দোষ সংক্রামিত করিয়া সমাজ ও সংসারকে জ্বালাতন করার অধিকার কাহারো নাই; সেরূপ সন্তানের পিতা মাতা অভিভাবকেরা যদি এই সোজা কথাটা না বুঝে তবে জোর করিয়া আইন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। আমেরিকার বহু ষ্টেটে আইনের খসড়া পেশ হইয়াছে। কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় আপত্তি করিতেছেন এই বলিয়া যে, অনাগত ও অ-সম্ভব সন্তানের জন্য মানুষ নিজে কেন কষ্ট করিতে যাইবে; বিবাহ করিলে সন্তান হইবেই, সন্তান হইলে সে বাঁচিবেই, এমন নিশ্চয়তা যখন নাই, তখন মানুষ নিজের জীবনকে বঞ্চিত করিবে কোন্ যুক্তিতে এবং কাহার মমতায়? জগতে মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন মৃত্যুর অনুচর রোগ প্রভৃতিও কেন না থাকিবে? সংসারে অপটু রুগ্ন আছে বলিয়াই দয়া, সহ্য, সেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণেরও বিকাশ লাভের অবকাশ আছে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে শ্রেষ্ঠ ও শুভবুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে অপটু শরীরেই—কোনো কুস্তিগির পালোয়ান এ পর্য্যন্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার বা প্রতিভার ত পরিচয় দেয় নাই।

আকাশের সহিত অপরিচয় (Popular Astronomy)

আমরা নিত্য আমাদের মাথার উপর নক্ষত্রখচিত আকাশের বিচিত্র ছবি দেখি, কিন্তু কোনো দিন তাহার পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা হয় না। অত বড় সুন্দর জ্যোতিষ্কসভার সম্বন্ধে এমন বিরাট উদাসীনতা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। শিক্ষিত লোকেরাও রাশিচক্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই চিনে না; খণ্ডশশী দেখিয়া তাহারা বলিতে পারে না উহা শুক্ল না কৃষ্ণপক্ষের, উদীয়মান না অস্তগামী চন্দ্রকলা; সূর্য্য যে প্রতিদিন আকাশে পথ বদলাইয়া চলিয়া চলিয়া এক সময়ে উত্তরে ও এক সময়ে দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে, এবং ইহার সহিত যে ষড়ঋতুপর্য্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এ খবর অনেকেই রাখে না। প্রত্যেককেই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে হইবে এমন কথা বলি না, কিন্তু খালি চোখে নিত্য যাহাদের আমরা দেখি, তাহাদের পরিচয় জানিবার ঔৎসুক্যহীনতা আমাদের মস্তিষ্কের ও মনের জড়তারই নামান্তর; সেই কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্যই জ্যোতিষ্কের পরিচয় লাভ করা উচিত। অনেকের বিশ্বাস যে দূরবীন ব্যতীত জ্যোতিষ্কপরিচয় হয় না; কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের মূলপত্তন হইয়াছিল দূরবীন আবিষ্কারের পূর্ব্বেই। অনেকে মনে করে দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিলে আকাশের ছবি আরো চমৎকার জমকালো দেখায়; ইহাও ভুল—দূরবীন বিশেষ জ্যোতিষ্ককে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারই বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে। অতএব শুধু চোখেই আকাশের সহিত বেশ মোটামুটি পরিচয় হইয়া যাইতে পারে। জ্যোতিষ্কপরিচয়ে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই আছে; যে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী জড়িত হইয়া সেগুলিকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছে, তাহাদের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ে কাহার না আনন্দ হইবে? সেই আনন্দ সজ্ঞানে উপভোগ করার ফলে মন আনন্দময়ের আরতির প্রদীপের থালা আকাশটিকে বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গনে জ্বলিতে দেখিয়া মুগ্ধ ও ভক্তিসন্নত হইতে শিখিবে।

চারু।

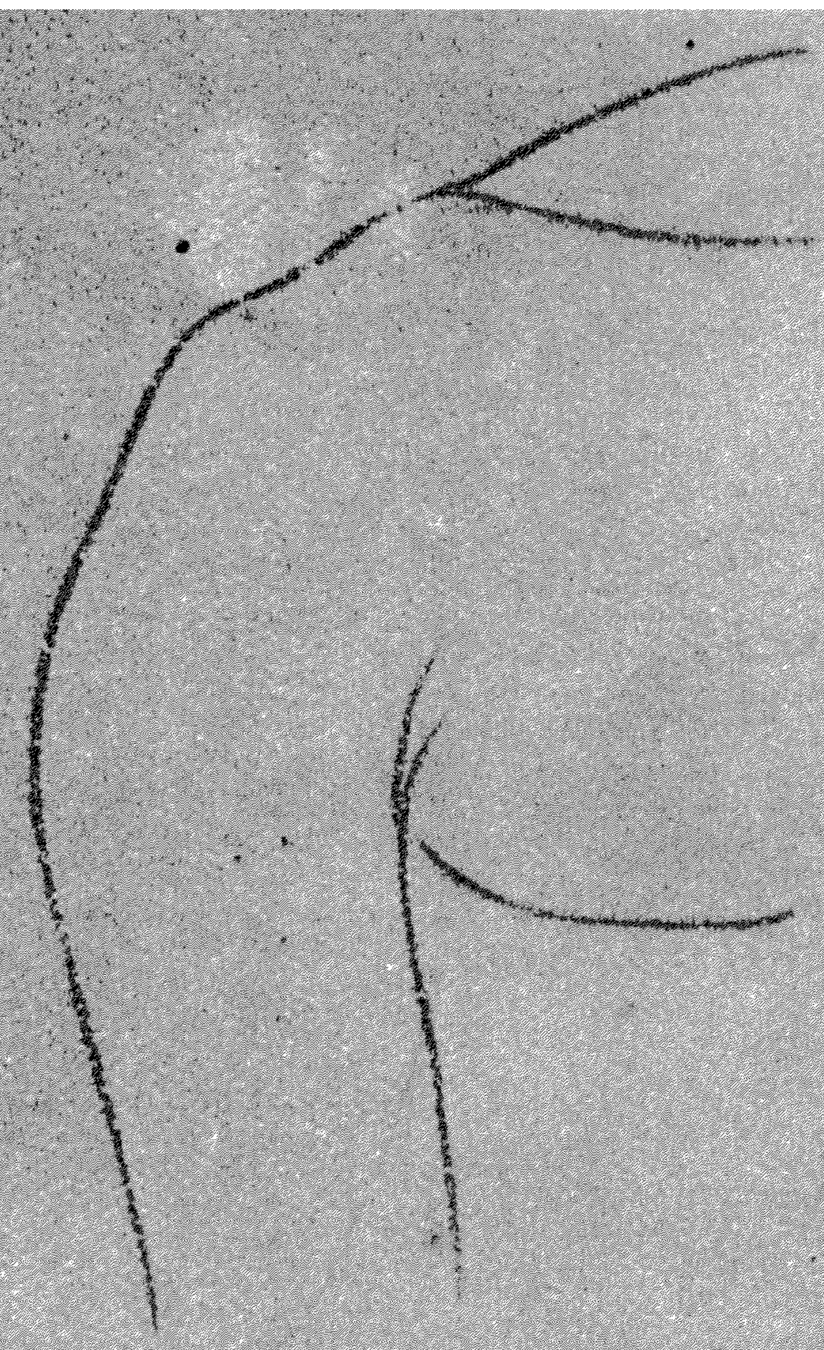

স্কন্ধ গজশুণ্ডা কৃতি:

১৬

Fig 16

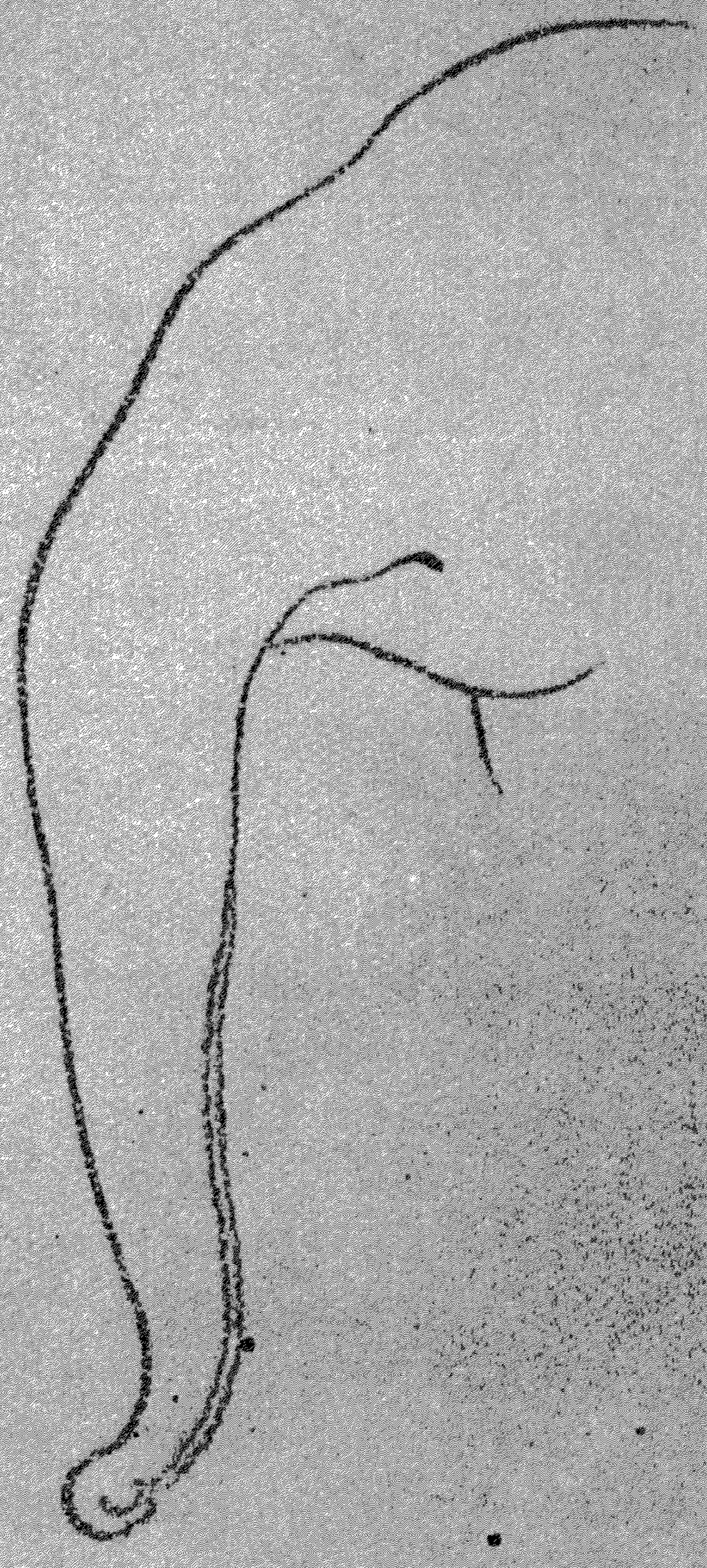

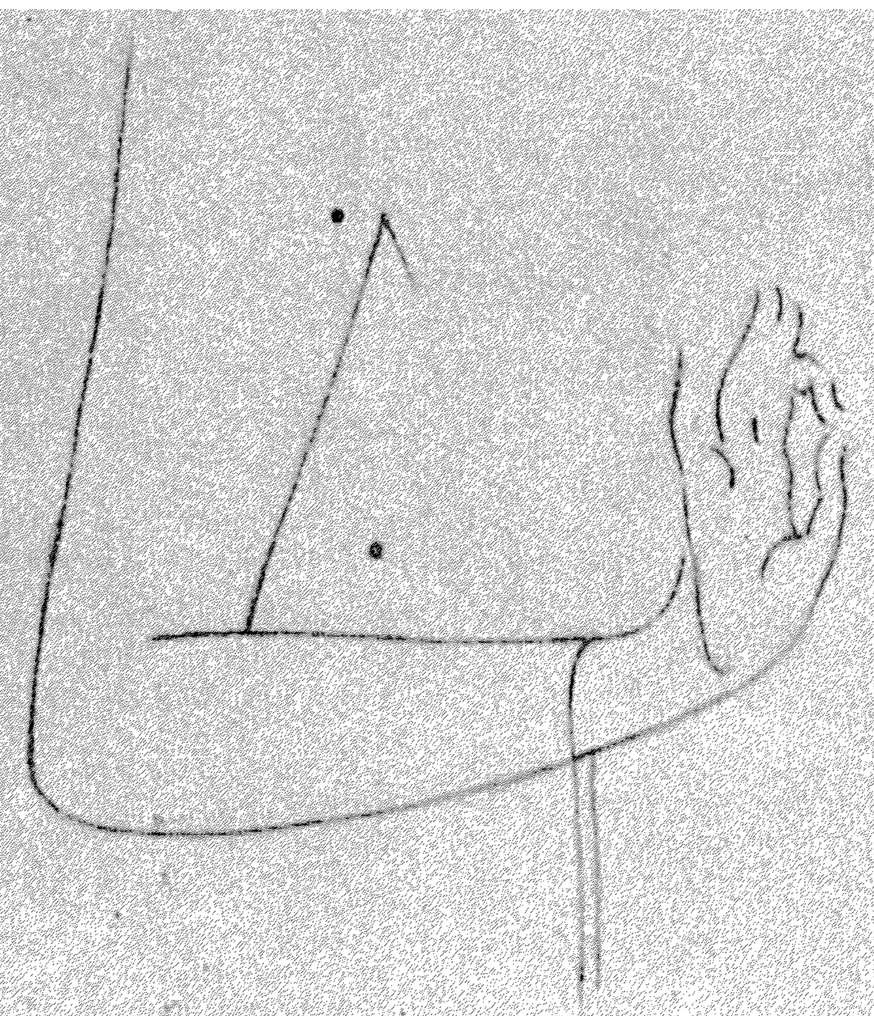

—বাল-কদলীকাণ্ডম্—

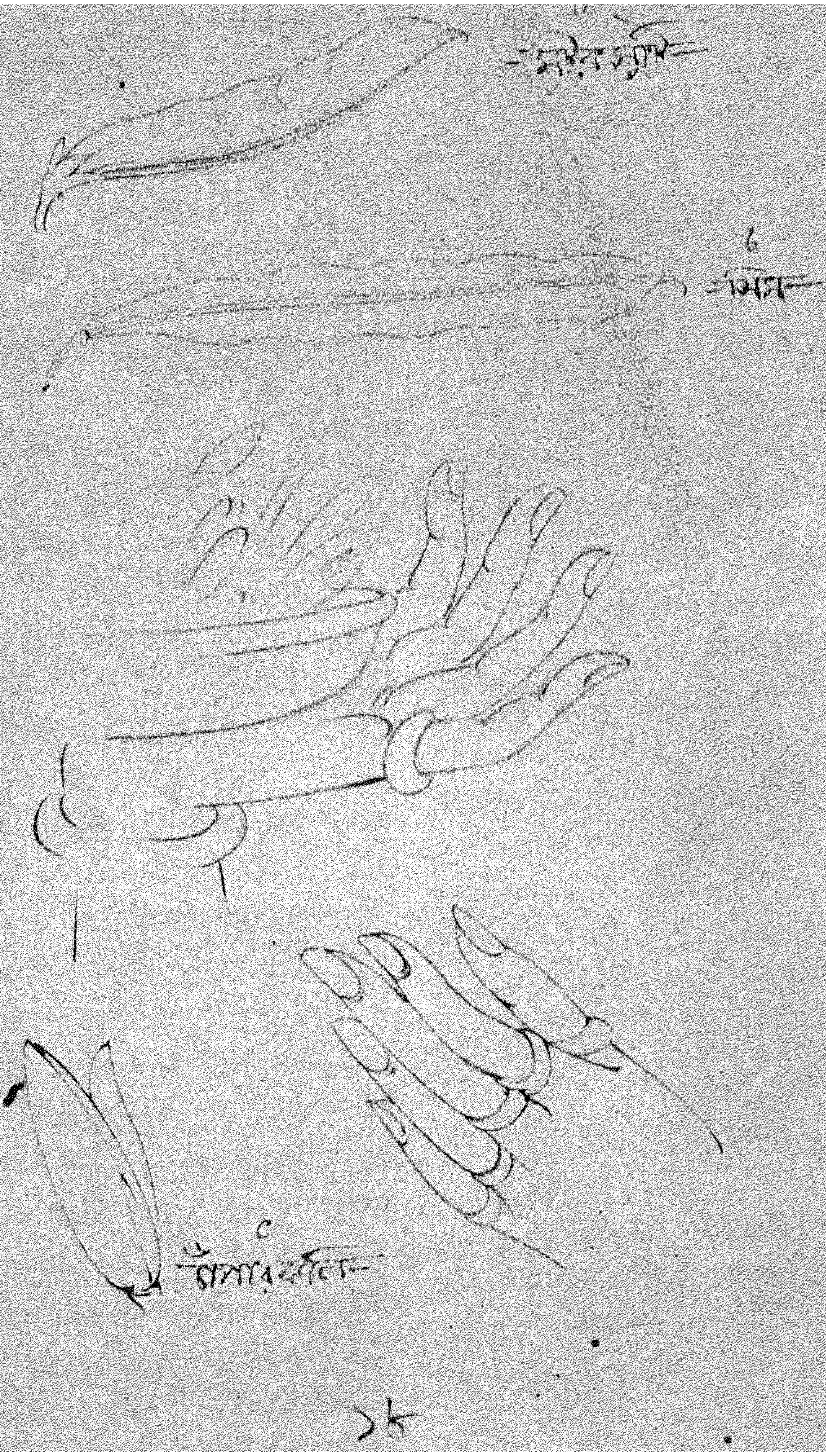
a
= মটরশুটি
b
= শিম
c

দানতত্ত্ব

আরোগ্যদান।

বিশুদ্ধ জলের অভাবে, স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মের অজ্ঞানতাবশতঃ, এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্য ও বিলাসের দরুণ, বঙ্গদেশে এখন রোগীর অসদ্ভাব নাই। রোগ যাহাতে আদৌ না জন্মিতে পারে প্রথমে তাহাই কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পানীয় জল ও বিদ্যা দান করিলে লোকের পীড়া কম হইবে। কিন্তু যাঁহাদের রোগ জন্মিয়াছে, তাঁহাদের জন্য দেশে বহুতর আরোগ্যশালা স্থাপিত হওয়া উচিত।

রোগীপরিচর্য্যা।

শাস্ত্রে রোগীপরিচর্য্যার বিশেষ প্রশংসা আছে (আপস্তম্ব ৬; যাজ্ঞবল্ক্য ১।২০৯)।

ঔষধ পথ্যদান ও আরোগ্যশালা স্থাপন।

সংবর্ত্ত বলিয়াছেন

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্।
যঃ প্রযচ্ছতি রোগিভ্যঃ স ভবেদ্ব্যাধিবর্জ্জিতঃ॥ ৮৯

আনন্দাশ্রমের স্মৃতিসমুচ্চয় ৪১৬—৪১৭ পৃ।

যিনি রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য খাদ্য তৈল ঘৃত ও আশ্রয় স্থান দান করেন, তাঁহার ব্যারাম হয় না।

কূর্ম্মপুরাণে (২.২৬।৫০) ও সংবর্ত্তস্মৃতিতে (৫৮) আছে

ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিনাং রোগশান্তয়ে।
দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ॥

রোগীদের আরোগ্যের জন্য যিনি ঔষধ, পথ্য, তৈল, ঘৃতাদি দান করেন, তিনি নীরোগ, সুখী হইয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকেন।

পরাশর বলিয়াছেন (বৃহৎ পরাশর জীবা ৮ অধ্যায়, বোম্বাই ১০ অধ্যায়)

রোগার্ত্তস্যৌষধং পথ্যং যো দদাতি নরস্তু তু।
অন্যস্যাপি চ কস্যাপি প্রাণদঃ স তু মানবঃ॥
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো চতুর্ভুজঃ।
যো দদ্যান্মধুরাং বাচং আশ্বাসনকরীমৃতাম্।
রোগক্ষুধাদিনার্ত্তস্য স গোমেধফলং লভেৎ॥

যিনি মানুষ বা অন্য কোন জন্তুর রোগপ্রতীকারের জন্য ঔষধ পথ্য দান করেন, তিনি প্রাণদাতা, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি রোগার্ত্ত বা ক্ষুধিতকে মধুর আশ্বাস বাক্য বলেন, তিনি গোমেধের ফল লাভ করেন।

নন্দিপুরাণে আছে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং সাধনং যতঃ।
অতস্ত্বারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥
আরোগ্যশালাং কুর্ব্বীত মহৌষধি পরিচ্ছদাম্।
বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ঘৃতান্নমধুসংযুতাম্॥
বৈদ্যস্তু শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো দৃষ্টৌষধিপরম্পরঃ।
ওষধিমূলপর্ণজ্ঞঃ সমুদ্ধরণকালবিৎ॥

* * *

আরোগ্যশালামেবং তু কুর্য্যাদ্ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
স পুমান্ ধার্ম্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্॥
সম্যগারোগ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্নেহপাচনৈঃ।
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাযুতঃ।
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ॥

অপরার্ক ১।৩৬৫—৩৬৬ পৃ।

আরোগ্য, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপায়। অতএব আরোগ্যদান করিলে, সর্ব্বদানের ফল হয়। আরোগ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে ভাল ভাল ঔষধ এবং ঘৃত, অন্ন ও মধুর ব্যবস্থা করিবে। ঐ আরোগ্যশালায় সুপণ্ডিত বৈদ্য নিযুক্ত করিবে। বৈদ্য বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং ঔষধগুলির সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিবে। ওষধি, মূল ও পাতার বিষয় অবগত থাকিবেন এবং কোন্ ঔষধি কিরূপে সংগ্রহ করিতে হয় তাহাও তাঁহার জানা থাকিবে। [এই স্থানে ভাল চিকিৎসকের গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উদ্ধার ও অনুবাদ করিলাম না।] যিনি ধর্ম্মবুদ্ধিতে * এইরূপ আরোগ্যশালা স্থাপন করেন, তিনিই এই পৃথিবীতে ধার্ম্মিক, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই কৃতকৃত্য। দয়ালু ব্যক্তি * আরোগ্যশালাতে ঔষধ পাচন তৈল প্রভৃতির সাহায্যে একটী রোগীকেও সম্যক্ রোগমুক্ত করিতে পারিলে, তাহার ফলে সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

* ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং দয়াবশতঃ আরোগ্যশালা স্থাপন করিলে এই মহাপুণ্য হয়। অন্য নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে আরোগ্যশালা স্থাপন করিলে, এত বেশী পুণ্য হয় না সত্য কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট পুণ্য ও নাম আছে।

দেশীয় ধনীরা রাজপুরুষদিগের কৃপালাভের আশায় এলোপাথিক আরোগ্যশালার জন্যই দান করেন।

আজকাল অনেকে আরোগ্যশালা স্থাপনের জন্য টাকা দিতেছেন। সমাজে যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা যে নির্ধনদের চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়েও একটু বক্তব্য আছে। বহুলোকে এলোপাথিক আরোগ্যশালা স্থাপনের জন্য দান করেন, কিন্তু কেহই কবিরাজী আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট নহেন।

কবিরাজীর উপযোগিতা।

কেবল কলিকাতায় সুগৃহীতনামা ৺দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে একটী কবিরাজী দাতব্য ঔষধালয় ও একজন ব্যবস্থাপক চিকিৎসক আছেন মাত্র। * লোকে যদি কবিরাজী চিকিৎসায় বিশ্বাস না করিতেন, যদি ডাক্তারীকে কবিরাজী হইতে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ইহা কোনও পরিতাপের কারণ হইত না। ধনীরা এখনও কবিরাজীর আদর করেন, এবং নিজেদের পীড়া হইলে, এখনও কবিরাজের খুবই ডাক হয়। কলিকাতায় চারি পাঁচজন এল্-এম্-এস্ ও এম্-বি-পাশ ডাক্তার কবিরাজী করিতেছেন। ইহাও কবিরাজীর উপযোগিতার অন্যতম প্রমাণ। কলিকাতার কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় চিকিৎসার্থ নেপালে নীত হইয়াছেন। তদীয় পিতা সুপণ্ডিত ও প্রবীণ ৺মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহোদয়কে ভারতের বহু করদ মিত্র রাজারা নিজেদের চিকিৎসার জন্য স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিতেন। এই সে দিন ৺ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্নের কাশ্মীরে ডাক হইয়াছিল। আজ এক বৎসর হইল বাঙ্গালী কবিরাজ ধীমান্ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এল্-এম্-এস্ এলাহাবাদে এক কবিরাজী-সভার সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় কৃতী কবিরাজের অভাব নাই। তবে বাঙ্গালায় কবিরাজী আরোগ্যশালা স্থাপিত হয় না কেন? ইহার কারণ খুব সোজা। রাজপুরুষেরা অনেকেই এলোপাথিক চিকিৎসার ভক্ত। তাঁহারা এ বিষয়েও স্বদেশী। কাজেই এলোপাথিক আরোগ্যশালার জন্য দান করিলে, তাঁহাদের প্রিয় হওয়া যায়, সরকারি গেজেটে নাম ছাপা হয়, আর অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয়, তবে একটা 'রায় বাহাদুর' বা 'রায় সাহেব'ও বক্‌সিস্ মিলিতে পারে।

কবিরাজী বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা স্থাপন বাঙ্গালীর অবশ্যকর্তব্য।

আরোগ্যদানের মধ্যে লুক্কায়িত সাহেব-প্রীণনের চেষ্টা বাঙ্গালীর আরোগ্যদানকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালায় যতদিন কবিরাজী বিদ্যালয় ও কবিরাজী আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর আরোগ্যদান পূর্ণাঙ্গ হইবে না। এ বিষয়ে আরও দুইটী গুরুতর কথা আছে।

অধুনা কবিরাজী বাঙ্গালীর নিজস্ব।

১। কবিরাজীটা আজকাল বাঙ্গালীর নিজস্ব বিদ্যা। বাঙ্গালীর নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি যাইতে বসিয়াছে, হয়ত তাহাতে দেশের তত ক্ষতি হইবে না। কিন্তু কবিরাজী গেলে, বাঙ্গালার প্রভূত অনিষ্ট হইবে। বাঙ্গালী যে-সকলের জন্য সমগ্র ভারতে বিখ্যাত, কবিরাজী বিদ্যা তাহাদের অন্যতম। ইহার দুর্দশায় বাঙ্গালীর গৌরবের হানি হইবে। বাঙ্গালার গৌরবের জন্য, ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য, স্বদেশীয়তার জন্য কবিরাজীর রক্ষা ও বর্দ্ধন অত্যাবশ্যক।

কবিরাজীর হ্রাসে স্বদেশী ব্যবসায়ের হ্রাস।

(২) কবিরাজী চিকিৎসাপ্রণালী দেশ হইতে উঠিয়া গেলে, দেশের স্বাস্থ্য ও গৌরবের হানি তো হইবেই, তা ছাড়া দেশের অর্থেরও হানি হইবে। কবিরাজী চিকিৎসার ঔষধাদি যাবতীয় উপকরণ স্বদেশীয় উপাদানে, স্বদেশীয় পরিশ্রমে, স্বদেশীয় অর্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কবিরাজীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের আর একটী মস্ত লাভজনক কারবার উঠিয়া যাইবে। তখন আমরা হাহাকার করিব! কিন্তু এখনও সময় আছে। একবার কোনও ব্যবসা উঠিয়া গেলে, উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠানে প্রাণান্ত হয়। বঙ্গের বস্ত্রনির্ম্মাণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রদ্ধা বা ভালবাসার সহিত দান করিবে।

মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন—

* ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চুঁচুড়ার বাড়ীতেও কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।—সম্পাদক।

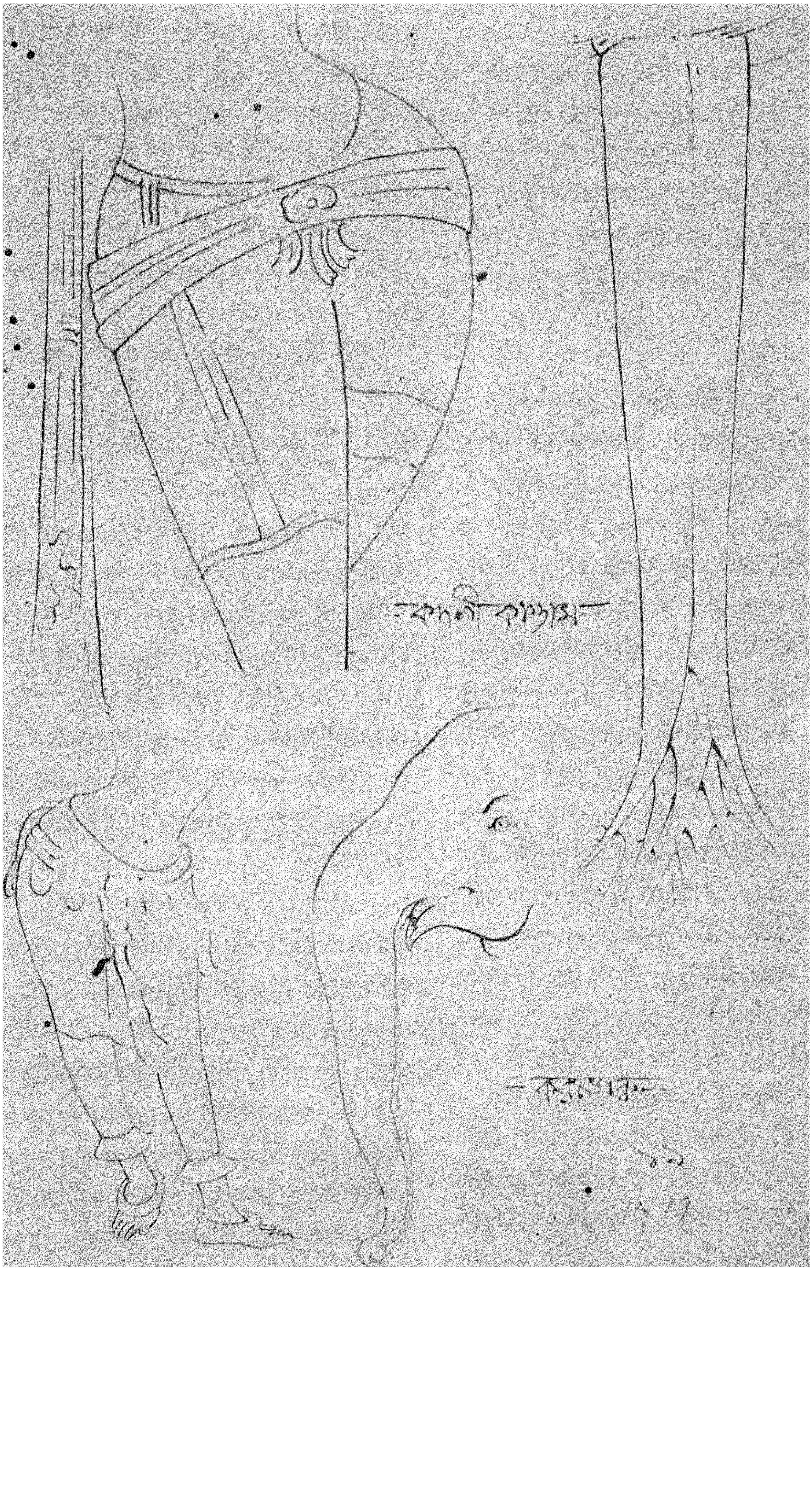
কদলী কাণ্ডম

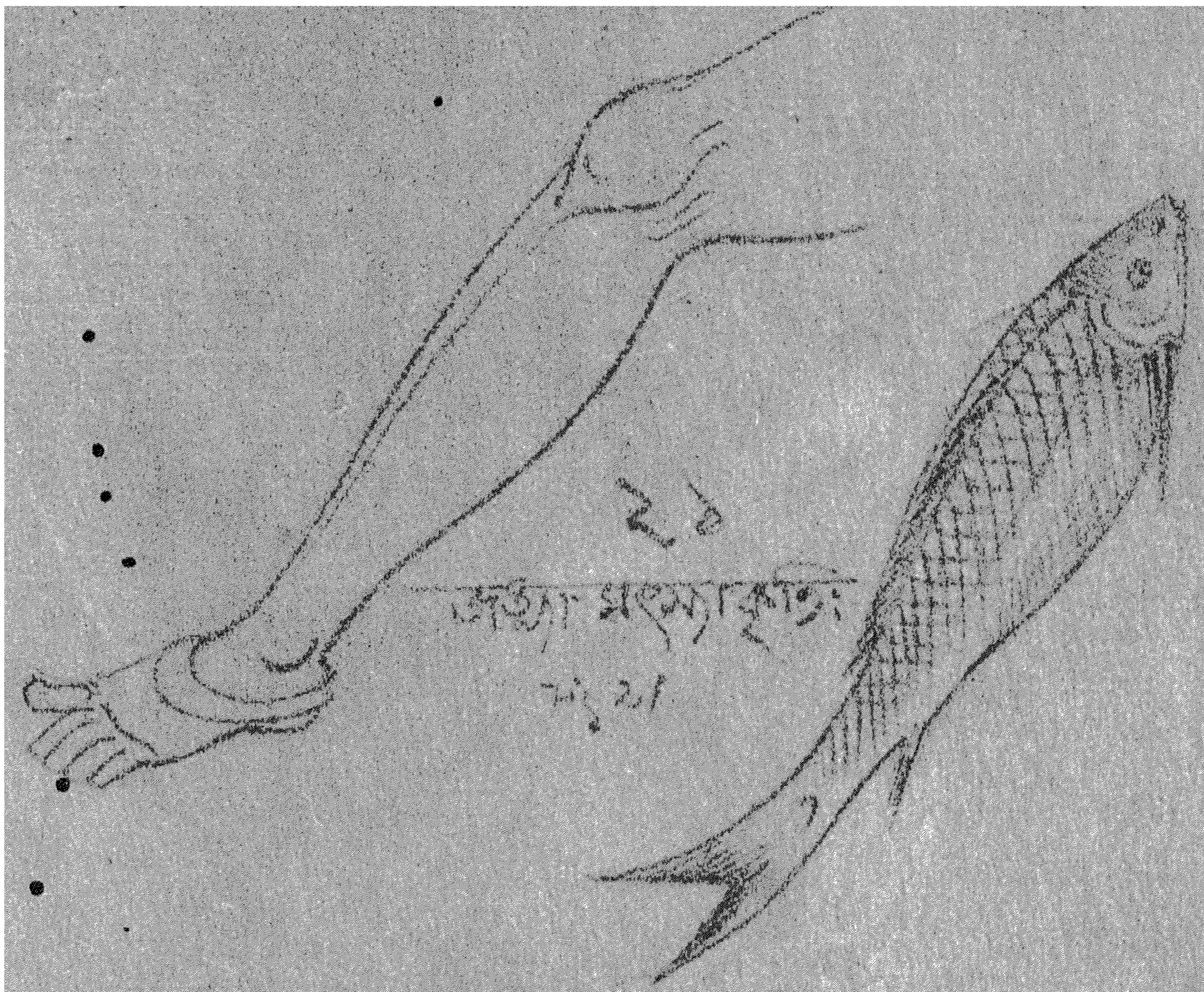

২৮

অষ্টম মৎস্যাকৃতিঃ

নং ১।

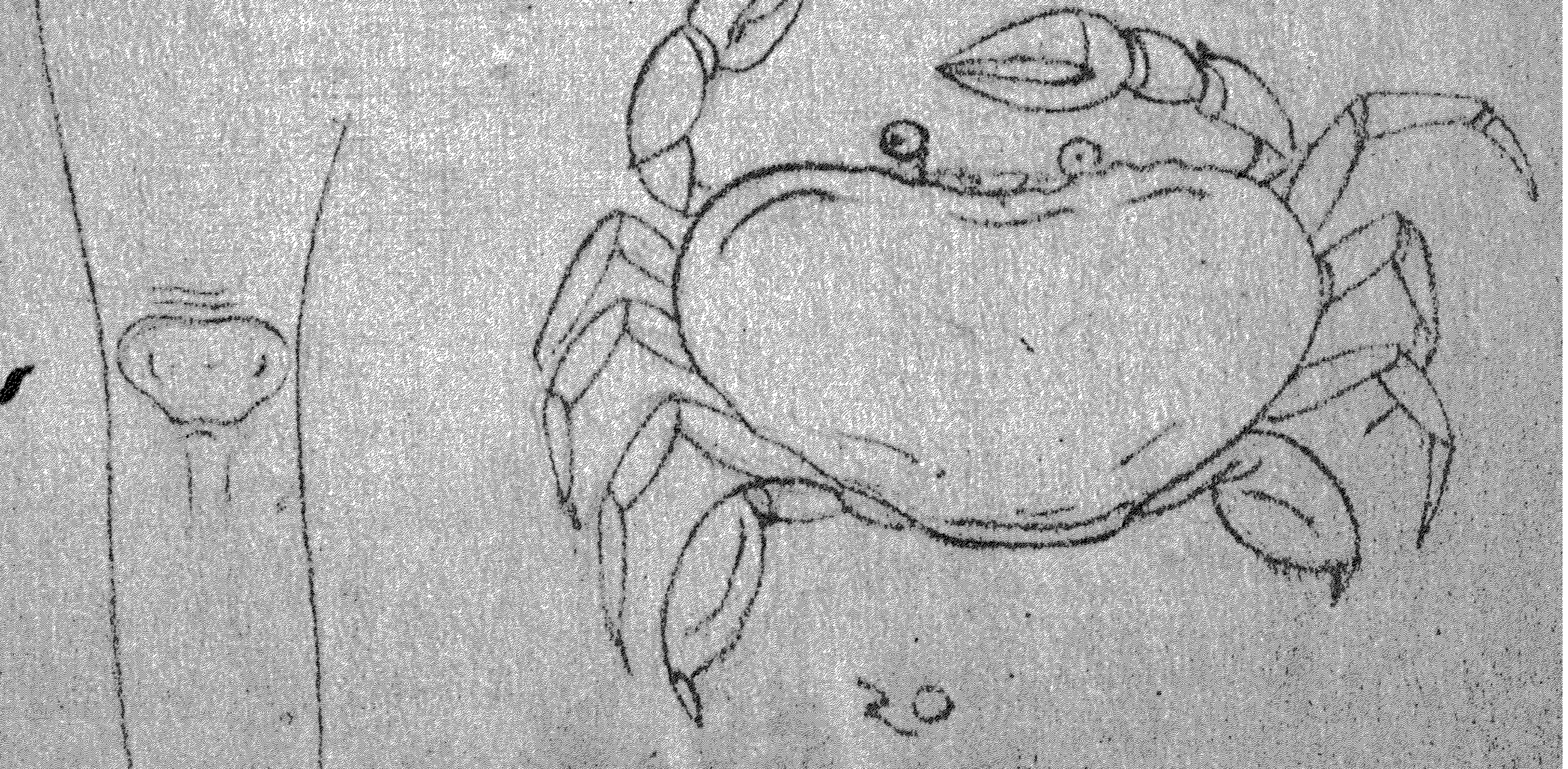

২০

দশম — কর্কটাকৃতিঃ

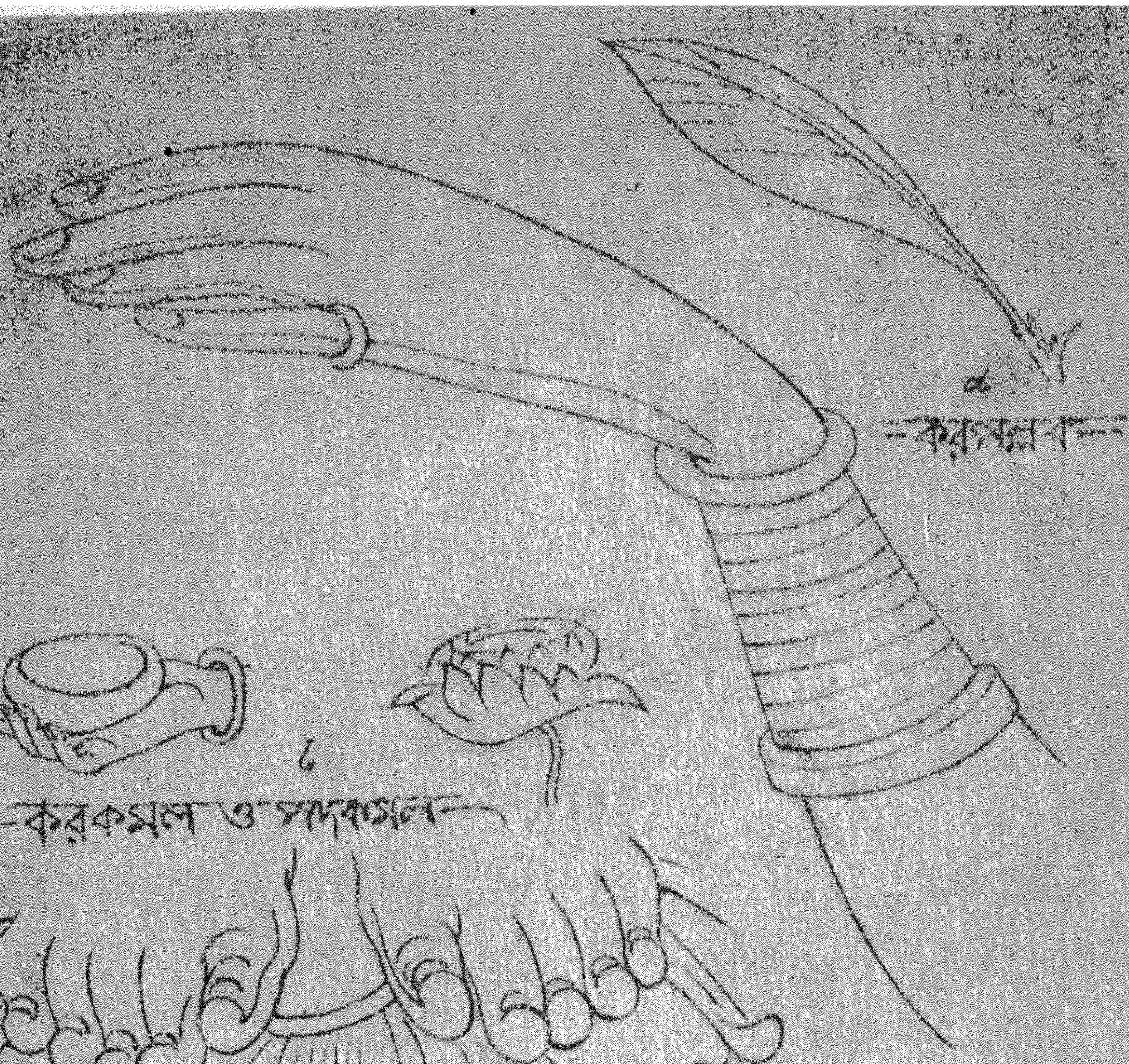

৪

-করপল্লব-

৬

-করকমল ও পাদকমল-

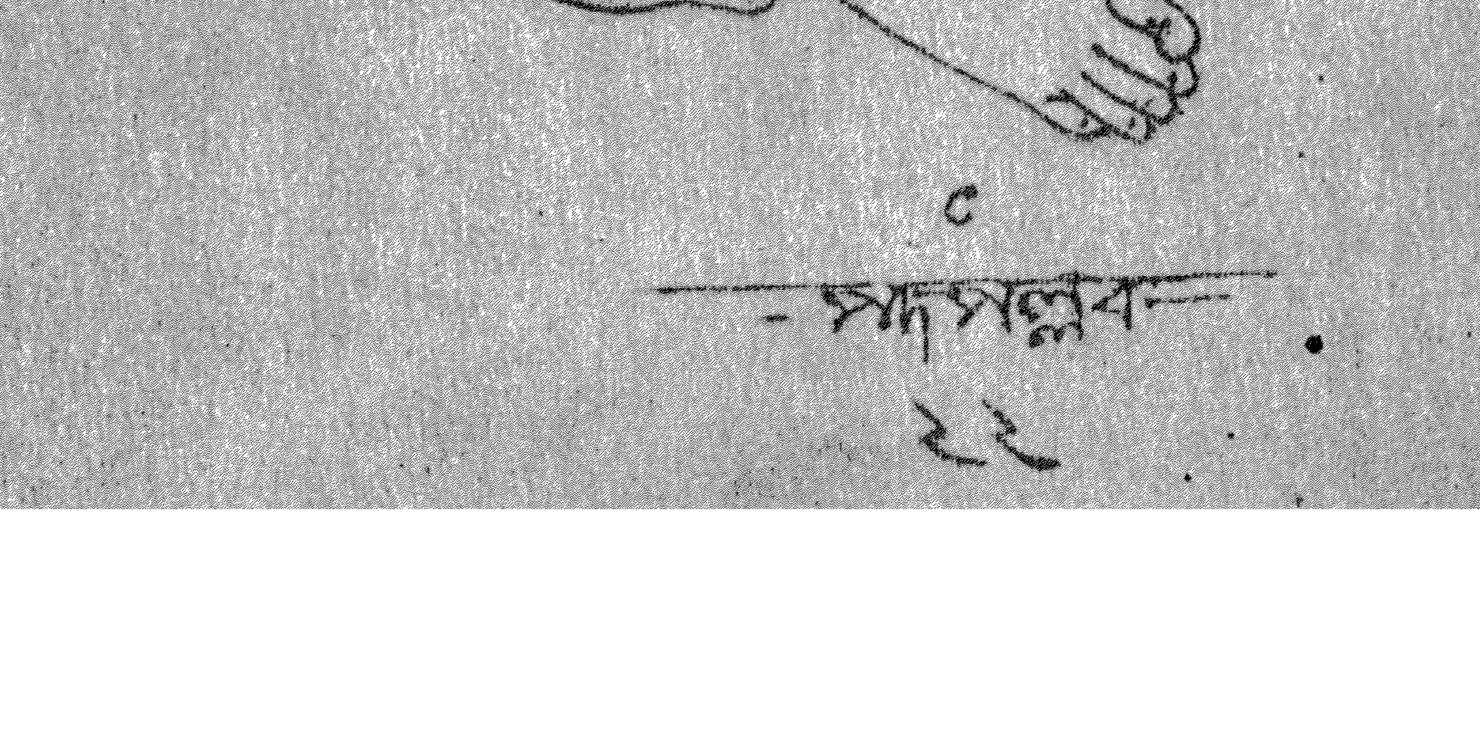

৫

-পাদপল্লব-

নাল্পত্বং বা বহুত্বং বা দানস্যাভ্যুদয়াবহম্।
শ্রদ্ধাশক্তিশ্চ দানানাং বৃদ্ধিক্ষয়করে হি তে ॥

অপরার্ক ১।২৮৭, পরাশরভাষ্য ১।১৭৯।

অল্পমূল্যের জিনিস দানেই অল্প পুণ্য হয়, আর বহুমূল্যের জিনিস দানেই বহু পুণ্য হয়, এরূপ নহে। ভালবাসা ও শক্তির পরিমাণ দ্বারাই দানপুণ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ভাল বাসিয়া, অন্যের কষ্টকে নিজের মনে করিয়া, যে দান করা যায়, তাহাই প্রকৃত দান। আমাদের শাস্ত্রের প্রধান শিক্ষা

কর্ত্তব্যা "সর্ব্বভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী"।

বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৯।

লজ্জায় ভয়ে বা লোভে দান করিলেও পুণ্য হয়।

সর্ব্বভূতে অব্যভিচারী ভক্তি বা অবিচলিত ভালবাসা করিবে। এই ভক্তিপূত দানই শ্রেষ্ঠ দান। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে, লজ্জায় বা বক্‌সিসের আশায় যে দান করা যায়, তাহাতেও পুণ্য হয়, কিন্তু তত না। শাস্ত্রে আছে—

সংসদি ব্রীড়য়াশ্রুত্য যোঽর্থোঽর্থিভ্যঃ প্রযাচিতঃ।
প্রদীয়তে চেত্তদানং ব্রীড়াদানমিতি স্মৃতম্॥
আক্রোশানর্থহিংসানাং প্রতীকারায় যত্তয়াৎ।
দীয়তে তাপকর্ত্তৃভ্যো ভয়দানং তদুচ্যতে॥

অপরার্ক ১।২৮৮; পরাশরভাষ্য ১।১৮০।

সভার মধ্যে লজ্জার খাতিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে দান দেওয়া যায়, তাহার নাম ব্রীড়া- বা লজ্জা-দান। নিন্দা, সাংসারিক ক্ষতি বা হিংসার প্রতীকারের জন্য, তাপকারীদিগকে যা দেওয়া যায়, তাহা ভয়-দান। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ধর্ম্মদান, অর্থদান, কামদান, ভয়দান ও কারুণ্যদান, এই পাঁচ প্রকার দানের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

ইতি পঞ্চবিধং দানং পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যমেবমাহ প্রজাপতিঃ॥

মহা ১৩।১৩৮।১১ বা ২০।১১।

এই পাঁচ রকম দানে পুণ্য ও কীর্ত্তি বাড়ে। প্রজাপতি বলিয়াছেন যথাশক্তি এই পাঁচ রকম দানই করিবে। অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে বা উপাধি-লিপ্‌সায় যে দান হইতেছে, তাহাতেও পুণ্য আছে এবং যাঁহারা নিকৃষ্ট অধিকারী, তাঁহাদের অগত্যা এইরূপ দানই কর্ত্তব্য। আর যে-সকল রাজকর্ম্মচারী উপাধির লোভ দেখাইয়া বা ভয়-প্রদর্শন করিয়া কৃপণ ধনীদিগের টাকা সৎকাজে লাগাইতেছেন, শাস্ত্রে তাঁহাদেরও প্রশংসা আছে।

যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ॥

মনু ১১।১৯; মহাভারত ১২।১৩২।৪।

যিনি অসাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া সাধুদিগকে দেন, তিনি উঁহাদের উভয়েরই উপকারক, (কেন না একের পুণ্য, অন্যের জীবন রক্ষা হয়)।

শাস্ত্রে অন্নদান, ভূমিদান, গোদান, বস্ত্রদান প্রভৃতিরও ভূরি প্রশংসা আছে। এ-সকল কথা আমাদের দেশের আপামর সকলেই জানেন, কাজেই উহাদের বিশেষ আলোচনা করা গেল না। ধ্রুব জলদান, ধ্রুব বিদ্যাদান ও ধ্রুব আরোগ্যদানের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের বিধি বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

দানের উদ্দেশ্য।

দানের প্রধান উদ্দেশ্য ভূতহিত। দাতা ভূতহিতে রতঃ। প্রতিগ্রহদানে সমাজের শিক্ষক ও যাজকদিগের পালনের উত্তম ব্যবস্থা আছে। ভরণ-দানের উদ্দেশ্য নির্ধনদিগের জীবিকার ব্যবস্থা। আরোগ্যশালাস্থাপন, উপাধ্যায়-নিয়োগ, জলাশয়খনন প্রভৃতি সকলই প্রধানত ভরণ-দান; উহাদের দ্বারা সমাজের, বিশেষত গরীবের, উপকার হইয়া থাকে। দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ নিবারণই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশে যাহাতে দরিদ্র না থাকে সর্ব্বাগ্রে তাহাই কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজে প্রকৃত দরিদ্র সেকালে প্রায় ছিল না। লোকের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অপ্রতুল হইত না। লোকে সন্তুষ্ট ছিল; বিলাসের উপকরণ তখন জীবনের আবশ্যক জিনিস বলিয়া গণ্য হইত না। এখন সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন দরিদ্রের সংখ্যাও বাড়িয়াছে, ধনীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এই দারিদ্র্যের ও বৈষম্যের সমূল উচ্ছেদ আমাদের আদর্শ। উৎপন্ন দুঃখের প্রতীকার দ্বারা পুণ্য উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া, দুঃখ যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যাহাতে লোকের রোগ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য শত বন্দোবস্ত করিলেও রোগের নিরবশেষ বিনাশ বর্ত্তমান সময়ে হইবে না। হয় ত ভবিষ্যৎ সত্যযুগে তাহাও হইবে। কিন্তু রোগোৎপত্তি কমান এখনও খুবই সম্ভব। পুষ্টিকর আহার, মুক্ত বায়ু ও বিশুদ্ধ জল যদি সুলভ হয় এবং শারীরিক পরিশ্রম, এবং সাধারণ সংযম যদি সমাজে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে যে রোগের উৎপত্তি কম হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই-সকল পূর্ব্বে সেদিনও অনেকটা ছিল। য়ুরোপীয়েরা ক্রমে ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতেছেন, তাই তাঁহাদের দেশে রোগ কমিয়া আসিতেছে, এবং সাধারণের পরমায়ু বাড়িয়া যাইতেছে। তথায় লোকেরা শয়ান হইয়া থাকে না, তথায় কলি নাই। শাস্ত্রে বলে কলিঃ শয়ানো ভবতি। আমরা শুইয়া আছি, এবং কলির প্রভাবে আমাদের আয়ু বিত্ত বুদ্ধি উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের উঠিতে হইবে, উঠিয়া বেড়াইতে হইবে। তবেই সত্য ফিরিবে। শাস্ত্রে বলে সত্যং সম্পদ্যতে চরন্। অতএব যাহাতে সমাজে দারিদ্র্য দুঃখ না থাকে, তজ্জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ভিক্ষাবৃত্তি তুলিয়া দেওয়া আমাদের আদর্শ।

ভিক্ষুক আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু সমাজে ভিক্ষাজীবী লোক থাকিবেন কেন? লোকে কেন চুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়েন? নিদানের উচ্ছেদই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা। ভিক্ষাজীবী আসিলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এবং পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চোর ধরা পড়িলেন, তাঁহাকে জেলে দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এইরূপ উদাসীনতা মহাপাপ। কোন্ সত্বে আমার গাড়ী ঘোড়া আছে, আর আমার প্রতিবেশীর উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই? আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ভিক্ষাজীবী যাহাতে না থাকে, এমন করিয়া দান করিবে। ভিক্ষাজীবীরা নিজে কত কষ্ট পান, এবং অপরের কষ্টের কারণ হইয়া থাকেন। মহাভারতে আছে—

উদ্বেজয়ন্তি যাচন্তি সদা ভূতানি দস্যুবৎ।
অনুশাসনপর্ব্ব ৬০।৪।

যাঁহারা সর্ব্বদা ভিক্ষা চান, তাঁহারা দস্যুর মত লোকের উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকেন।

কূর্ম্মপুরাণে আছে (২।২৬।৭১)—

যস্তু স্যাদ্ যাচকো নিত্যং ন স স্বর্গস্য ভাজনম্।
উদ্বেজয়তি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ॥

যিনি রোজ ভিক্ষা করেন তিনি স্বর্গভাগী হন না। তিনি চোরেরই মতন প্রাণীদের উদ্বেগকারণ হইয়া থাকেন।

এ কথা অতি সত্য। পৃথিবীর দুঃখভারের লাঘব করাই দানের উদ্দেশ্য, আত্মপ্রসাদ তাহার আনুষঙ্গিক ফল। অবশ্য বৃত্তিকৃশ ভিক্ষুক আসিলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিতেই হইবে, কিন্তু যাহাতে লোকের ভিক্ষাকেই বৃত্তি বলিয়া অবলম্বন করিতে না হয়, তজ্জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। "যাচিতেনাপি দাতব্যম্"—এই সূত্রাংশের উপরিতন ব্যাখ্যা দেখুন।

গরীবেরও দান কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে বলে দান সকলেরই কর্ত্তব্য, ধনীরও কর্ত্তব্য, নির্ধনেরও কর্ত্তব্য, শূদ্রেরও কর্ত্তব্য।

সর্ব্বেষাং সত্যম্ অক্রোধো দানম্ অহিংসা প্রজননম্ চ।
বসিষ্ঠস্মৃতি ৪।৪।

সত্য, অক্রোধ, দান, অহিংসা ও সুতোৎপত্তি—ইহারা সকলেরই কর্ত্তব্য।

গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি॥
বেদব্যাসস্মৃতি ৪।২৪।

তোমার একগ্রাস থাকিলে, তাহার আধগ্রাস যাচককে দেও না কেন? ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি হইলে দান করিব এই মনে করিয়া দানধর্ম্ম বন্ধ রাখিও না, কেননা আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। যিনি পরদুঃখে দুঃখী তিনি একগ্রাস হইতেও আধগ্রাস বিলাইয়া দেন, আর যাঁহারা ধনকামী, তাঁহারা কুবেরের ভাণ্ডার লাভ করিলেও কৃপণই থাকিয়া যান। টাকা জমানই যে নিন্দনীয় তাহা নহে, কিন্তু নিজের পারিবারিক উন্নতির জন্য সঞ্চয় করা শ্রেয়স্কর নহে। টাকা জমাইয়া ভূদেব বা তারকনাথের মতন দান করিলে, তবেই উহা সার্থক হয়। অতএব এখন যাঁহার যাহা আছে, তাহা হইতেই কিছু কিছু রোজ দান করা বিধেয়। শাস্ত্রে বলে—

দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি ১।২০৩।

প্রত্যহ উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে। বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ দান করিবে। কেহ যাচ্ঞা করিলে, তাঁহাকে দান করিবে। যথাশক্তি দান করিবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। এটী দানসূত্র। ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রত্যহ দান করিবে।

(১) দাতব্যং প্রত্যহম্—প্রত্যহ দান করিবে। দানের অভ্যাস করিবে। পুণ্যের অভ্যাস করিতে করিতে লোক পুণ্যাত্মা, এবং পাপের অভ্যাস করিতে করিতে লোক পাপাত্মা হইয়া যায়। একটী পুণ্যকাজ ভবিষ্যতে আর একটী পুণ্যকাজকে সহজ করিয়া দেয়। ইহাই বুঝিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।

বড় কাজ ভবিষ্যতে করিবার আশায় রাখিয়া দিলে চলিবে না। রোজ কিছু কিছু ভাল কাজ করিতে হইবে। শেষে এমন সময় আসিবে যখন মন্দ কাজ করার শক্তিই কমিয়া যাইবে—শত প্রলোভনে, শত নিষ্পীড়নেও মন ভাল হইতে বিচলিত হইবে না, অভ্যাস আমাদিগকে জোর করিয়া ভাল কাজ করাইবে। অত্রিসংহিতায় (৪০ শ্লোক) উক্ত হইয়াছে

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥

রোজ রোজ প্রসন্নমনে যত্নপূর্ব্বক কিছু-না-কিছু—যতই অল্প হউক না কেন - দান করিবে।

পাত্রে দান করিবে। অপাত্রে দান নিষেধ। দানের পাত্র কাহারা?

(২) দাতব্যং পাত্রে—পাত্রে দান করিবে। অপাত্রে দানে পাপ আছে। হাত পাতিলেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বিধি হিন্দুশাস্ত্রে নাই অন্নবস্ত্রহীনকে অন্নবস্ত্র অবশ্য দিবে; সে পাপী হইলেও দিবে। কিন্তু বিলাসের বা পাপের উপকরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা যাচ্ঞা করেন; তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ দান দিলে ঘোর পাপ হয়। ভরণ-দানের পাত্রও তাঁহারা নহেন। প্রকৃত গরীব এবং পঙ্গু অন্ধ বধির প্রভৃতিই ভরণ-দানের পাত্র। অতএব যাঁহাদের অন্নবস্ত্রের কষ্ট নাই, যাঁহারা মাত্র বিলাসের জন্য ভিক্ষুক, তাঁহাদিগকে মোটেই ভিক্ষা দিবে না। পূর্ব্বে এ বিষয়ে অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন প্রতিগ্রহ-দান ও ভরণ-দান এই উভয়ের উপযুক্ত কতকগুলি পাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

দস্যুর উপদ্রবে ও দেশবিপ্লবে দান।

কৃতসর্ব্বস্বহরণা নির্দ্দোষাঃ প্রভবিষ্ণুভিঃ।
স্পৃহয়ন্তি সুগুপ্তানাং তেষু দত্তং মহাফলম্॥

মহাভারত ১৩।২৩।৫৭।

হতস্বা হৃতদারাশ্চ যে বিপ্রা দেশবিপ্লবে।
অর্থার্থমুপগচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্॥

মহাভারত ১৩।২৩।৫৪, অপরার্ক ১।৩৮৩ পৃষ্ঠা।

বলবান্ ব্যক্তিরা যদি নির্দোষ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, তবে তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাপুণ্য হয়। দেশ-বিপ্লবে যাঁহাদের অর্থদারাদি অপহৃত হয়, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল হয়।

প্রকৃত গরীব ও বিপন্নকে দান।

দক্ষ বলিয়াছেন (৩।৩০)

ব্যসনাপদ্বৃণার্থঞ্চ কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতব্যং সর্ব্বদানেষ্বয়ং বিধিঃ॥

অপরার্ক ১।২৮৪ পৃঃ।

যাঁহারা আকস্মিক বিপদে পড়িয়াছেন, যমদণ্ডে যাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যাঁহারা ঋণপীড়িত, বা যাঁহারা অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবার পালনে অক্ষম, এমনতর লোক খুঁজিয়া দান করিবে। যজ্ঞাদিতেও ইঁহাদিগকে দান করিবে, ভরণ-দানও ইঁহাদিগকে দিবে

দুর্ভিক্ষে দান।

মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—

দুর্ভিক্ষে চান্নদাতাচ...স্বর্গলোকে মহীয়তে।

যিনি দুর্ভিক্ষে অন্নদান করেন, তিনি স্বর্গে পূজিত হন

কূর্ম্ম পুরাণে আছে (২।২৬।৫৯—৬০)

যস্ত দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি।
ম্রিয়মাণেষু সত্ত্বেষু ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ॥

তস্মান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন বৈ দেয়ঞ্চ তস্য হি।
অঙ্কয়িত্বা স্বকাদ্রাষ্ট্রাত্তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ॥

যখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপে জীবগণ মরিতে থাকে, তখন যিনি অন্নপ্রভৃতি দান করেন না তিনি ঘৃণার পাত্র, তিনি ব্রহ্মঘাতী। এমন লোকের নিকট হইতে পরিগ্রহ করিতে নাই; এমন লোককে কিছু দিতে নাই। রাজা তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

মাতাপিতৃহীনের শিক্ষাদান ও অন্নসংস্থান।

মাতাপিতৃবিহীনং তু সংস্কারোদ্বাহনাদিভিঃ॥
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে।

অপরার্ক ১৩৬৮ পৃঃ।

মাতাপিতারহিত গরীবকে যিনি লেখাপড়া শিখাইয়া, বিবাহ দিয়া, গৃহাদি দান পূর্ব্বক সংস্থাপিত করেন, তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা নাই।

নিমিত্তে দান।

(৩) দাতব্যং নিমিত্তেষু বিশেষতঃ—বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে দান করা বিধেয়। যেমন জন্মাষ্টমী, রামনবমী বা মাতাপিতার শ্রাদ্ধের দিন। যে তিথিতে সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা যে তিথিতে সাক্ষাৎ দেবতা মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই তিথিতে যে প্রত্যেক হিন্দুর দানাদি কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাচককে দান।

(৪) যাচিতেনাপি দাতব্যম্—যাচিত হইলেও দিবে অর্থাৎ সাধারণত অযাচিত ভাবে সমাজের শিক্ষক ও যাজকগণের এবং অন্যান্য গরীবের দুঃখ কমাইবার জন্য দান করিবে। কিন্তু এইরূপ দানে, বর্ত্তমান অবস্থায়, সমাজের দারিদ্র্য-দুঃখের সম্পূর্ণ প্রতীকার হয় না। কাজেই প্রকৃত দুস্থিকুশ কেহ ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। এইরূপ অন্নদান বা মুষ্টি-ভিক্ষা দানে আমাদের একটা বড় উপকার হইয়া থাকে। দয়া আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়। প্রত্যহ মুষ্টিভিক্ষা দিয়া অকিঞ্চন গৃহস্থ যতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন, ক্রোড়-পতি একদিনে ব্যাঙ্ক হইতে দশলক্ষ টাকা দিয়া আত্মার ততটা উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন না।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।

(৫) শ্রদ্ধাপূতং দাতব্যম্—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। যেরূপ দানই কর না কেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত করিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

শ্রদ্ধা * বা ভালবাসার সহিত দান করিবে।' অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। নিজের ধনসম্পত্তির আধিক্য দেখিয়া, লজ্জার খাতিরে, ভয়ের দরুণ ও বন্ধুতার জন্য দান করিবে। অর্থাৎ যে জন্যই দান কর না কেন, উহা শ্রদ্ধার সহিত করিবে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধয়ৈব হি দাতব্য মশ্রদ্ধাভাজনেষ্বপি।

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র নহেন, তাঁহাদিগকেও শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। একজন মহাপাপী স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলে অন্নাভাবে শীর্ণ হইতেছে, বস্ত্রাভাবে শীতে কষ্ট পাইতেছে; এমন লোককে ভালবাসা কঠিন। কিন্তু ইহাকেও ভালবাসিয়া অন্নদান করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম। এই জন্যই শাস্ত্রে "সর্ব্বভূতেষু অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ" (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৯) বিহিত হইয়াছে। যিনি তোমার অনিষ্টাচরণকে জীবনের ব্রতে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাকেও ভালবাসিবে, তাঁহাতেও যেন তোমার প্রেমের ভক্তির শ্রদ্ধার কখনও ব্যভিচার না হয়।

* শ্রদ্ধা শব্দ প্রাচীন কালে ভালবাসা বা ভক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত। শ্রৎ শব্দ বর্ত্তমান ইংরাজি heart, রুশীয় serdise, আইরিশ্ cridhe, গ্রীক্ kardia প্রভৃতির রূপান্তর মাত্র। শ্রৎ-ধা= placing of the heart. বাঙ্গালায় আজও শ্রদ্ধা শব্দ ভালবাসা অর্থে লোকমুখে খুব প্রচলিত আছে; তিনি তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন (বাৎসল্য অর্থে)। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতে শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাস করা ও ভালবাসা একশ্রেণীর ভাব। ইংরাজি credo বা creed আর এই দ্বিতীয় শ্রদ্ধা একই। ওয়েবষ্টারের অভিধানে creed শব্দ দেখুন। Hindu Realism প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা চিন্তাশীল পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের মতেও শ্রদ্ধা অর্থ love. তিনি এ বিষয়ে বহুতর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা প্রয়োগ দ্বারা যে অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রাচীন বৈদিক অর্থ নির্ণীত হইতে পারে, তাহা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সুচিন্তিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ "আমাদের ভাষা ও সাহিত্য" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) প্রবন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

শ্রদ্ধার পরিচয়।

শ্রদ্ধার লক্ষণ কি তাহা দেবল বলিয়াছেন—

সৌমুখ্যাদ্যভিসম্প্রীতিরর্থিনাং দর্শনে সদা।
সৎকৃতিশ্চানসূয়া চ দানে শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা॥

অপরার্ক ১।২৮৮, পরাশরভাষ্য ১।১৮১।

যাচক দেখিয়া তাঁহার উপরে সম্প্রীতি বা সম্যক্ ভালবাসার উদয় হইবে, এবং উহা মুখের প্রসন্নতায় ব্যক্ত হইবে। যাচককে আদর করিবে। যাচকের দোষ চিন্তা করিবে না। ইহাই শ্রদ্ধার সহিত দান করার অর্থ। গরীবের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রেম থাকিলে, প্রসন্নচিত্তে দান করিতে পারা যায়। মনু বলিয়াছেন (৪।২২৭)

দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিক পৌর্ত্তিকম্।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ॥

উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া লইয়া, * প্রত্যহ সন্তুষ্টান্তঃকরণে, যথাশক্তি ঐষ্টিক ও পৌর্ত্তিক এই উভয়বিধ দান করিবে। * অত্রি (৪০) বলিয়াছেন—

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।

রোজ প্রসন্নচিত্তে † দান করিবে। দান করিয়া পশ্চাত্তাপ † করিবে না। অর্থ হস্তচ্যুত হইল বলিয়া যেন চিত্ত দীন বা কাতর না হইয়া পড়ে। এই চিত্তের অদীনতা শ্রদ্ধাবানের পক্ষেই সম্ভব। তাই শাস্ত্রে আছে—

মহদপ্যফলং দানং শ্রদ্ধয়া পরিবর্জ্জিতম্।

শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির সহিত দান না করিলে, মহাদানও নিষ্ফল হইয়া যায়। ঐষ্টিক বা প্রতিগ্রহ দানের বেলা, শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস। যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদিতে যে দান করা হয়, তাহাতে বিশ্বাস থাকা চাই, faith থাকা চাই।

যথাশক্তি দান করিবে।

(৬) শক্তিতঃ দাতব্যম্। শক্তি অনুসারে দান করিবে। যাঁহার যেমন আছে, তিনি তেমন দিবেন। আমার সম্পত্তি নাই, অতএব আমি দানধর্ম্মে বঞ্চিত, এইরূপ মনে করিবে না।

শ্রদ্ধা বা প্রেমের তারতম্যে দানপুণ্যের তারতম্য।

শ্রদ্ধা বা ভালবাসার তারতম্য অনুসারে অল্পমূল্যের জিনিস দিয়াও বহুফল এবং বহুমূল্যের জিনিস দিয়াও অল্পফল হয়। লক্ষপতি নিজ সুখের বাধা না করিয়া দশহাজার টাকা দিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, গরীব নিজের গায়ের একটী সামান্য পুরাতন জামা দিয়া তদপেক্ষা সমধিক পুণ্য অর্জ্জন করেন। মহাভারতে আছে—

সহস্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ।
দদ্যাদাপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ব্বে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ॥

অশ্বমেধ পর্ব্ব ৯০।৯৬।

যাঁহার সহস্র আছে তিনি শত, যাঁহার শত আছে তিনি দশ, দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করেন, যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া মাত্র জলদানেও সেই পুণ্যই হইয়া থাকে। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম। উঞ্ছবৃত্তি কুরুক্ষেত্রনিবাসী ব্রাহ্মণ দুই সের মাত্র ছাতু দান করিয়া যে পুণ্যের সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে তত পুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই মহাভারতে আছে—

শক্তুপ্রস্থেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যঃ নরাধিপাঃ।
উঞ্ছবৃত্তের্বদান্যস্য কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ॥

অশ্বমেধ পর্ব্ব ৯০।৭।

হে রাজগণ, আপনাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী বদান্য ব্রাহ্মণের শক্তুপ্রস্থের সমান নহে। আবার মহামতি রন্তিদেব জীবনের শেষভাগে একদিন যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ও জল দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোজনে ও যজ্ঞে সে পুণ্য লাভ করেন নাই। অই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

রন্তিদেবো হি নৃপতিরপঃ প্রাদাদকিঞ্চনঃ।
শুদ্ধেন মনসা বিপ্র নাকপৃষ্ঠং ততো গতঃ॥

মহাভারত ১৪।৯০।৯৭—৯৮।

* ঐষ্টিক দান=যাজ্ঞিক দান=প্রতিগ্রহ দান?। পৌর্ত্তিক দান=পৌষ্টিক দান=ভরণ দান? ইষ্ট=যজ্ঞ। পূর্ত্ত=পূরণ=পোষণ=ভরণ। ইহার পোষক বচন দেখিয়াছি মনে হইতেছে, কিন্তু এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। সাধারণত বাপী কূপ তড়াগ দেবতায়তন অন্নপ্রদান ও আরামকে পূর্ত্ত বলে। ঐষ্টিক বা বৈদিক কাজে একমাত্র দ্বিজদিগের অধিকার ছিল। পৌর্ত্তিক কাজে সকলেরই অধিকার আছে। ইষ্টের ফল স্বর্গ: পূর্ত্তের ফল মোক্ষ। ইষ্টেন স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ (অত্রি ৪৩-৪৬; লিখিত ১-৬)।

† শ্রদ্ধা চেতসঃ প্রসাদঃ (ব্যাসভাষ্য)। অ-পশ্চাত্তাপ সম্বন্ধে অপরার্ক ১ খণ্ড ২৮১ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিঃস্ব রাজা রন্তিদেব শুদ্ধমনে (শ্রদ্ধার সহিত) জল দান করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। রন্তিদেবের পাবনী আখ্যায়িকা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে আছে। রন্তিদেব পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও, স্বকীয় পানীয় জল একজন অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য পুরুষকে দিতে দিতে বলিতেছেন,—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।১২।

আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টসিদ্ধি বা মোক্ষ চাহি না। ভগবৎসমীপে আমার ইহাই কামনা যেন যাবতীয় প্রাণীর দুঃখ আমি ভোগ করি এবং তাহারা যেন দুঃখ পায় না।

এই পরদুঃখাসহিষ্ণুতাই সত্যতনধর্ম্মানুমোদিত দানের প্রাণ। ইহার তারতম্যেই দানপুণ্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

শক্তি থাকিতে দান না করিলে, পাপ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রত্যহ দান করা কর্ত্তব্য। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে আছে—

সমর্থাশ্চাপ্যদাতারস্তে বৈ নরকগামিনঃ (২৩।৮০)

সামর্থ্য থাকিতে যাঁহারা দান না করেন, তাঁহাদের পাপ হয়। এই সামর্থ্য কি তাহা শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দানশক্তি কি?

যাঁহাদের পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের অতিরিক্ত কিছু আছে, তাঁহাদেরই দানের সামর্থ্য আছে। তাঁহাদেরই দান অবশ্যকর্ত্তব্য।

পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের জোগাড় করিয়া যাহা বাঁচে, তাহাই দান করিতে পারা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৭৫) বলিয়াছেন

স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ম্।

অর্থাৎ অবশ্যপ্রতিপালনীয় বৃদ্ধ মাতাপিতা সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু পুত্রকন্যা প্রভৃতির ভরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই দান করিবে। মনু বলিয়াছেন (১১।১০)

ভৃত্যানামুপরোধেন যঃ করত্যৌর্দ্ধদেহিকম্।
তদ্ ভবত্যশুভোদর্কং জীবতোঽস্য মৃতস্য চ॥

অবশ্য-ভর্ত্তব্যদিগের পীড়া জন্মাইয়া, পারলৌকিক ফললাভের জন্য, যে দানাদি করা হয়, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। নিজ পরিবারের বিলাসের, পোষাকের বা কল্পিত মানের হানি হইলে, তাহা ভর্ত্তব্যদিগের পীড়া (ভৃত্যানাম্ উপরোধঃ) বলিয়া গণ্য হইবে না। কাজেই বিলাসাদির লাঘব করিয়া দান অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা না হইলে সাধারণের দান করাই দুর্ঘট হইবে। শাস্ত্রের আদেশ এই যে, নিজ পরিবারের ভাত কাপড়ের অভাব বারণ না করিয়া আগে অন্যের অভাব মোচন করিতে নাই।

কুটুম্বভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।
অন্যথা দীয়তে যদ্ধি ন তদ্দানং ফলপ্রদম্॥
কূর্ম্মপুরাণ ২।২৬।১০।

কুটুম্বভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।
মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাদ্দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথাভবেৎ॥
বৃহস্পতি (অপরার্ক ২।৭৮০ পৃষ্ঠা)।

পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের যোগাড় করিয়া যাহা উবরিয়া থাকে, তাহা দান করিবে। গৃহস্বামীর দানের ফলে যদি তাঁহার পোষ্যবর্গের ভাত কাপড়ের কষ্ট হয়, তবে তাহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই।

ঘুষ লইয়া, চুরি করিয়া, বা উৎপীড়ন করিয়া, টাকা রোজগার করিলে তাহার দানে পুণ্য নাই।

দান করিয়া পুণ্য বা খ্যাতি লাভ করিবার লোভে, অসদুপায়ে টাকা রোজগার করিতে নাই। এখন এমন দুঃসময় দাঁড়াইয়াছে যে, হয় ত যে-কেহ একটা স্বদেশী কোম্পানি খুলিয়া সরল দরিদ্র লোকের অর্থ আত্মসাৎ করেন অথচ সমাজ তাঁহাকে মহাপাপী বলিয়া কুষ্ঠীর ন্যায় পরিহার করেন না। এই মিথ্যা কোম্পানি খোলাটা বিলাতি রোগ। সরকারি আফিসে, রেল ষ্টীমারের ষ্টেশনে বা পুলিশ থানায়, যেখানেই যাও ঘুষ ভিন্ন কথাটী বলিবার যো নাই। উৎকোচগ্রাহীদিগকে তাঁহাদের পাপের কথা বলিলে, তাঁহারা উত্তর করেন যে, ঘুষ না লইলে পেট চলে না এবং বাড়ীর দোল দুর্গোৎসব বন্ধ হয়। উৎকোচ না হইলে যাঁহাদের ভাত কাপড় চলে না, তাহাদের সংখ্যা কম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন লোকও আছে। অধিকাংশ

লোকই ঘুষ লইয়া গহনা ও পোষাক বাড়ান, পাকা বাড়ী ও বিষয় করেন এবং নিতান্ত সৎপ্রবৃত্তি হইলে পূজা অর্চ্চনা করেন। সমাজের এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। যাঁহারা অন্যায্য উপায়ে রোজগার করেন, তাঁহাদিগকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিলে, তবেই সমাজের মঙ্গল। শাস্ত্রে (মহাভারত ১২।১২৯।১৫) বলে—

ন ধর্ম্মার্থী নৃশংসেন কর্ম্মণা ধনমর্জ্জয়েৎ।

যিনি ধর্ম্ম কামনা করেন, তিনি পরপীড়াজনক কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবেন না।

শ্রদ্ধয়েষ্টং চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥
মনু ৪।২২৬।

ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট ও পূর্ত্ত করিলে অনন্ত ফল হয়।

ন ধর্ম্মঃ প্রীয়তে তাত দানৈর্দত্তৈ র্মহাফলৈঃ।
মহাভারত ১৪।৯০।৯৮-৯৯।

শ্রদ্ধাসহকারে ন্যায়লব্ধ অল্পমূল্য জিনিস দান করিলেও মহাপুণ্য হয়। কেবল বেশী মূল্যের জিনিস দান করিলে তত পুণ্য হয় না।

বিশেষস্ত্বত্র বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ॥
অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥
মহাভারত ৩।২৫৮।৩২—৩৩।

ন্যায্য উপায়ে উপার্জ্জিত ধন দেশ কাল পাত্র দেখিয়া দান করিবে। অন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত ধনের দ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে দাতার মহাভয় দূর হয় না। ভূতহিতই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব একের পীড়া জন্মাইয়া অন্যকে দিলে পুণ্য হইবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়।

দান করিয়া তাহা পরকে জানাইবে না।

দান করিয়া উহা পরকে বলিতে নাই। মনু বলিয়াছেন (৪।২৩৬) ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ।

দেবল বলিয়াছেন (অপরার্ক)
ইষ্টং দত্তমধীতং বা প্রণশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
শ্লাঘানুশোচনাভ্যাং বা ভগ্নতেজো বিপদ্যতে॥
তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যং মৃতিমান্ন প্রকাশয়েৎ।

যজ্ঞ দান এবং শাস্ত্রপাঠ করিয়া উহার জন্য নিজে নিজে শ্লাঘা করিলে, অনুতাপ করিলে বা অন্যের নিকট উহার কীর্ত্তন করিলে, উহাদের ফলহানি হয়। অতএব আত্মকৃত পুণ্যের বৃথা বিজ্ঞাপন দিতে নাই। একটা দান করিয়া অনেকে খবরের কাগজে তাহার প্রশংসা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। ছাপায় নাম না উঠিলে, তাঁহাদের স্বস্তি হয় না। এটা বিলাতি রোগ, এবং সনাতন ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেকের আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ মাসিক দান করা উচিত।

প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের একটা অংশ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। ইচ্ছা করিলে, শত টানাটানির মধ্যেও দান করা সম্ভব। যাঁহারা মাসিক শতাধিক টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেক মাসে শতকরা দশ টাকা ধর্ম্মার্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তবে অচিরাৎ একটা মহৎ কার্য্য হইতে পারে। আমরা গরীব, কিন্তু বড় কাজ আমাদের করিতেই হইবে। এইরূপে ভিন্ন, আর কোন্ উপায়ে উহা সিদ্ধ হইতে পারে ? শাস্ত্রে (মহাভারত ১৩।১৪১।) বলে—

ধর্ম্মেণার্থঃ সমাহার্য্যো ধর্ম্মলব্ধং ত্রিধা ধনম্।
কর্ত্তব্যং ধর্ম্মপরমং মানবেন প্রযত্নতঃ॥
একেনাংশেন ধর্ম্মার্থশ্চর্ত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা।

সাধু উপায়ে টাকা রোজগার করিবে। ঐ ধন তিনভাগে বিভক্ত করিবে এবং উহার একভাগ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিবে। নারদ বলিয়াছেন—

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তম্ ইহামুত্র চ মোদতে॥

যিনি স্বীয় আয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার একভাগ যশের জন্য, একভাগ অর্থের জন্য, একভাগ কামের জন্য, এক আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন।

এইজন্য বিলাস ছাড়িতে হইবে।

মোট কথা এই যে, আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দানাদির জন্য ধরিয়া রাখিতে হইবে। এ দুর্দ্দিনেও আয়ের দশভাগের একভাগ বা তাহারও কম অংশ নিয়মিতরূপে

মাসে মাসে ধর্ম্মের নামে ব্যয় করা অসম্ভব নহে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে; বিলাস ছাড়িতে হইবে। তবেই আমরা মানুষ হইব।

সমবেত দানসমিতি ও গরীবের ধ্রুবদান।

গরীবে একলা একলা ধ্রুব দান করিতে পারে না। আজকাল দেশে বহুতর সমবেত ঋণসমিতি (Co-operative Credit Society) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা লোকের উপকারও হইতেছে। সরকার বাহাদুর উহার প্রবর্ত্তক। দেশের সাধারণ লোকেরা সমবেত হইয়া একটা সমবেত দানসমিতি (Co-operative Charity Society) গঠন করুন। উহাতে উদ্যোগীরা ধন্য হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে, গরীবেরা উহাতে দান করিয়া ধ্রুবদানের মহাপুণ্যের অধিকারী হইবে। উহার অর্থের দ্বারা কবিরাজী আরোগ্যশালা ও টোল প্রতিষ্ঠিত হউক।

টোল করিতে হইবে।

জাতীয় বিদ্যালয় বলিলাম না, কেননা উহাতে টুল টেবিল বাড়ী ঘর লাইব্রেরী পরীক্ষা প্রভৃতির কম ধূমধাম বুঝায় না। টোল করুন। ঐ টোলে বঙ্গভাষায় অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি পড়ান হউক। ইংরাজি ও সংস্কৃত দ্বিতীয় ভাষা থাকুক। গ্রামে গ্রামে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার পুনঃপ্রচলন হউক। সহরে বিজলীর আলোকে আলোকিত বোর্ডিং করিয়া ব্রহ্মচারীদিগের বিলাস বাড়ানোর জন্য আমাদের আয়োজন নিরর্থক।

ছাত্রেরা দরিদ্র হইতে শিখিবে।

ছেলেরা হাতে কাজ করিতে, দরিদ্রমত থাকিতে অভ্যাস করুক। ক্রিকেট্ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য বিলাতি খেলার আমদানি সরকার-বাহাদুর-পরিচালিত বিদ্যালয়ে যথেষ্ট হইতেছে। উহার জন্য গ্রামে গ্রামে অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন। ছেলেরা পরিশ্রম করিয়া কৃষি করিতে শিখুক, গৃহস্থালি করিতে শিখুক। একত্র ব্যায়াম ও উপার্জ্জন হইবে। মানুষ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাহা না করিয়া আমরা শরীররক্ষার জন্য ডাম্বেল করি।

ডাম্বেল করা হাস্যজনক।

ইহা যে কিরূপ হাস্যকর, অভ্যাসের দোষে তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না। এম্ এ বা তর্কতীর্থ হইয়া কি কাঠফাড়া, মাটি কোদলান, নৌকা বাওয়া, চাল ছাওয়া যায় না? অবশ্য যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে এম্-এ বা তর্কতীর্থ প্রভৃতি লোভনীয় উপাধিতে রঞ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই-সকল উপকারী সাধু কাজ অসম্ভব। তাঁহারা জোর ডাণ্ডা করিতে পারেন। ইহার কারণ অভ্যাস-দোষ। আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়-দিগের জন্য নূতন ধর্ম্মানুমোদিত অভ্যাসের সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্য নূতন টোল চাই। তজ্জন্য অর্থ চাই। তজ্জন্য সমবেত দানসমিতি চাই। তজ্জন্য প্রত্যেকের মাসে মাসে কিছু দান চাই। ইহা সনাতন ধর্ম্মের আদেশ, ইহা সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ। ইহার অনুষ্ঠান কর। ইহার অনুষ্ঠান কর॥*

শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ।

মণিহার

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে,
পরতে গেলে লাগে
এরে ছিঁড়্‌তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুর নাহি যে সরে,
ওরি পরে মন দিতে যাই মন লাগে না কাজে॥
তাই ত ব'সে আছি
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি!
ফুলের মালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে,
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* অগ্রহায়ণে ও পৌষে প্রকাশিত দানতত্ত্ব প্রবন্ধটী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গৌহাটি শাখায় পঠিত হইয়াছিল।

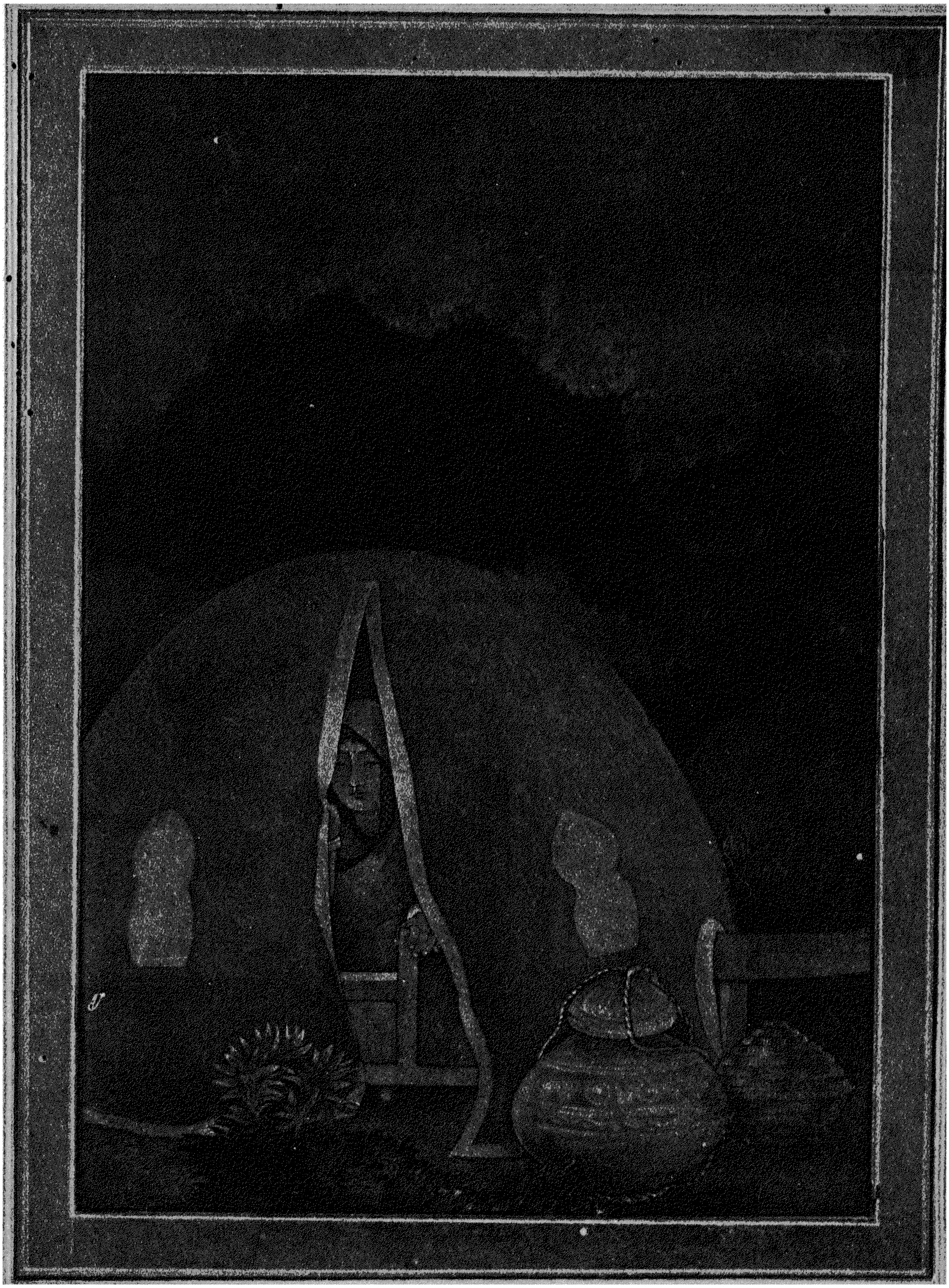

কালীদীঘীর পাড়ে ইন্দিরা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

একতার প্রাকৃতিক ভিত্তি

এক পরিবারের লোকের মধ্যে যদি প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব হয়, পুত্রেরা যদি পিতার অবাধ্য হয়, পুত্রদিগের মধ্যে যদি বিবাদ-বিসংবাদ চলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কথায় কথায় কলহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, ঐ পরিবারের লোকগুলি এক পরিবারের লোক নহে। যাঁহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী, যাঁহারা এই দেশের অতীত ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে একটি জনসঙ্ঘ বা Nation তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। প্রাদেশিকতার ফলে হউক, ধর্ম্মের বিবাদে হউক, বংশের পার্থক্যে হউক, যদি প্রদেশে প্রদেশে মিলন না থাকে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকে, জাতিতে জাতিতে প্রীতির অভাব থাকে, তবে একটি পরিবারের শোচনীয় অবস্থার মত এই জনসঙ্ঘের দুর্দ্দশার কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই ভারতগৃহের সন্তানদিগকে বিভিন্ন জনসঙ্ঘের লোক বলিতে পারি না। যে কারণেই হউক, কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই তর্ক তুলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ, প্রদেশভেদ প্রভৃতি কারণে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরা এক জনসঙ্ঘ নহেন, এবং কদাচ এই বিভিন্নতা-সত্ত্বে এক জনসঙ্ঘ সৃষ্ট হইতে পারে না। অনেকে এই উক্তিতে বিচলিত হইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন, যদি আমরা এক জনসঙ্ঘ নহি, এবং ভারতের অধিবাসীগণ যদি কদাচ এক জনসঙ্ঘে পরিণত হইতে না পারে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। কাকে কান লইয়া গিয়াছে কি না, তাহা কানে হাত দিয়া না দেখিয়া অনেকেই কেবল কাকের পিছু পিছু ছুটিয়া থাকেন।

সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের কথা এই যে, যাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে, একইরূপ সুখ-দুঃখ, অপরিত্যাজ্য প্রতিবেশীরূপে পুরুষানুক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং একই প্রকার রাজনৈতিক শাসনে শাসিত হইতেছে, তাহারা এক জনসঙ্ঘ, এক Nation। যেখানে এক অপরিহার্য্য ও অপরিত্যাজ্য অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেই হইবে, যেখানে একপ্রকারের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সকলকে শাসন করিবেই করিবে, সেখানে যে ভাষা ধর্ম্ম প্রভৃতির মিল না থাকিলেও লোকে বাধ্য হইয়া একটি জনসঙ্ঘরূপে অবস্থিত থাকে তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কল্কি-অবতার যখন ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু কি না, তখন ভূতনাথ হাস্যোদ্দীপক জবাব দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি হিন্দু বই কি? দেখুন, আমি দেখ্‌তে ঠিক্ হিন্দুর মত নই কি?" ভূতনাথ যে চেহারা, রঙ্ এবং ভুঁড়ির নজির পেশ করিয়াছিলেন, কল্কিদেব হয়ত তাহা নেহাইত অগ্রাহ্য করেন নাই। ভূতনাথের হাঁদামির মধ্যেও একটুখানি গ্রহণীয় সত্য রহিয়াছে। এমন অনেক সময় ঘটে যে, ঠিক যুক্তিতর্ক দিয়া একটি যথার্থ অনুভূত সত্যও বুঝাইয়া উঠিতে পারা যায় না; কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি যে সত্য, তাহা খুব প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করা যায়। কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

ধরুন যে সুদূর লণ্ডন সহরের একটি গৃহে একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, একজন বিহারের মুসলমান, একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, একজন পোর্টুগীজ-অধিকৃত গোয়ানিবাসী সাতপুরুষে খৃষ্টান এবং একজন সিংহলবাসী বৌদ্ধ একসঙ্গে মিলিলেন; সেখানে কি সকলেই আপন আপন ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ এবং আচারভেদের কথা ভুলিয়া পরস্পরকে একদেশবাসী বলিয়া মনে করিবেন না? এরূপ অবস্থায় আমার নিজের মনে যে-প্রকার অনুভূতি হইয়াছিল, ঠিক্ তাহাই লিখিয়াছি। যদি ঐ লণ্ডনসহরে সিংহলবাসীর পরিবর্ত্তে ব্রহ্মদেশবাসীকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে হয় না। একজন বাঙ্গালীর চক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক আপনার লোক বলিয়া প্রতীত হয়; অথচ নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত সিংহলদেশের লোকের মতই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মদেশবাসীকে বিদেশী বলিয়া মনে হয়। আমার এরূপ ধারণার মূল কি, তাহা অনুসন্ধান করিলেই জাতীয়ত্বের মূলভিত্তির সন্ধান পাইতে পারিব।

অতি প্রাচীনকালেও বৈদিক ঋষিগণ ত্যাজ্য এবং অস্পৃশ্য অনার্য্যদিগকে নিজেদের দেশের অধিবাসী বলিয়াই ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে যুগে দক্ষিণাপথে অগ্রসর হওয়াও পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত, সে যুগেও আর্য্যনিবাস হইতে বহুদূর দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত অস্পৃশ্য শত্রুগণ স্বদেশী শত্রু বলিয়া কল্পিত হইত; অথচ অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে অবস্থিত হইয়া নিঃসম্পর্কিত বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইত। দাস হউক, দস্যু হউক, ত্যাজ্য হউক, অস্পৃশ্য হউক, ভারতবাসী আর্য্যেতর জাতিরা আর্য্যদিগের স্বদেশবাসী শত্রুই ছিল।

মানুষ যখন একটা সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করে, তখন শত্রু হউক, মিত্র হউক, সকলকেই এক দেশের লোক বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইতে হয়। ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিলেও একজন আর একজনের প্রতিবেশী; দূরে থাকিলেও একজন আর এক জনের প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ সহজভাবে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যাইতে পারে, অথবা যাইতে পারিবে বলিয়া শঙ্কা এবং সন্দেহ থাকে। বিন্ধ্য প্রদেশের পাহাড় এবং অরণ্য এক সময়ে কথঞ্চিৎ দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়াই মনে হইত; কিন্তু তবুও সিন্ধু এবং হিমালয়ের বাধার সহিত সে বাধার তুলনা করা চলে না। বিন্ধ্য দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও উহার পাহাড়ে পাহাড়ে এবং বনে বনে আর্য্যশত্রু লুকাইয়া থাকিত, এবং সেই শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা না করিলে আর্য্যের চলিত না। বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষ দেশটিকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, উহার যে-কোন ভাগেই যে-কোন জাতি বা লোক বাস করুক না কেন, তাহাকে অন্য সকল বিভাগের লোককেই একটি সুনির্দ্দিষ্ট দেশের লোক বলিয়া ভাবিতে হয়।

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে একটি দেশের ভৌগোলিক স্থিতিতে একটা নির্দ্দিষ্ট একতা আছে, সেখানকার সকল অধিবাসীর পক্ষেই একজাতীয়ত্ব লাভ করিবার পথ প্রশস্ত থাকে। কোন কারণে এক জাতীয়ত্ব লাভ যদি ঘটিয়া নাও উঠে, তবুও কেবল মাত্র দেশের ভৌগোলিক স্থিতির বিশেষত্বে দেশবাসীদিগকে পরস্পরের বিশেষ প্রতিবেশী হইয়া উঠিতে হয়। এইটুকু না থাকিলে একজাতীয়ত্ব জন্মিতেই পারে না।

আমরা এই ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ গণনাতীত এবং স্মরণাতীত কাল হইতে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করিয়া হউক, মিত্রতা করিয়া হউক, এই একই দেশের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিবেশী হইয়া বাস করিয়া আসিতেছি। কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, পরস্পরকে চিনিতে বাধ্য হইয়াছি; এবং অনেক স্থলে দায়ে ঠেকিয়াও সুখশান্তির খাতিরে পরস্পরের সহিত সন্ধি করিয়া খানিকটা কৃত্রিম সখ্য স্থাপন করিতেও বাধ্য হইয়াছি। প্রচলিত প্রবচনে যাহাই থাকুক, রূপের চমকের জন্য যে বিলক্ষণ "ঘষামাজা" চাই, এ কথা অতিবড় সুন্দরীকেও স্বীকার করিতে হইবে; "ধরা বাঁধা"র ফলেও যে অনেক সময়ে পাকা রকমের প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, এ দেশের অনেক দম্পতিই তাহার সাক্ষী।

অতি প্রাচীন যুগে—যখন সমগ্র দক্ষিণাপথ আর্য্যেতর জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, এবং আর্য্যাবর্ত্তেরও কিয়দংশমাত্র আর্য্যজাতির আবাস ছিল, তখনও আর্য্যেরা সমগ্র ভারতবর্ষটিকে এক জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন, এবং উহার কোন অংশকেই জম্বুদ্বীপের বহির্ভুক্ত মনে করিতেন না। অবন্তী, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে বিশুদ্ধ আর্য্যকে পতিত হইতে হইত; তবুও কিন্তু ঐ দেশগুলি আপনাদের বাসভূমি ভারতবর্ষেরই অংশবিশেষ ছিল। দেববিরোধী অনার্য্য দস্যুগণ আপনাদের ঘরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; কিন্তু ভাষায়, ধর্ম্মে এবং আচারে অত্যন্ত অধিক মিল সত্ত্বেও ইরাণের লোকেরা সিন্ধুর পরপারে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত বিদেশী বলিয়া বিবেচিত হইত। অন্যদিকে আবার দেখুন যে, ব্রহ্ম, শ্যাম, অনাম প্রভৃতি বহির্ভারতের রাজ্যগুলি যখন ভারতের রাজাদিগের শাসনাধীনে আসিয়া আর্য্যসভ্যতায় উদ্ভাসিত হইতেছিল, তখনও ভারতের পুরাণ বা ইতিহাসে ঐ দেশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দ্রবিড়েরা ভিন্নভাষায় কথা কহে, ভিন্ন আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বাস করে, তবুও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের লোকদিগের মত তাহারা জম্বুদ্বীপের

বহির্ভূক্ত অন্য কোন দ্বীপের অধিবাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। পুরাণে যেখানে ভারতবর্ষকে কূর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করা হইয়াছে, সেখানে অনুন্নত এবং আর্য্যেতর জাতির প্রদেশগুলি কূর্ম্মশরীরের তুচ্ছ তুচ্ছ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আবৃত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু কূর্ম্মপাদের একটি নখরেখাও ব্রহ্মদেশ অথবা ইরাণকে স্পর্শ করে নাই। সিংহল দেশ এক হিসাবে চিরদিনই ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন; তবুও ঐ দেশ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। যখন আর্য্যেতর রাজা সিংহলের অধিপতি, তখনও আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি সিংহলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের লোক যে সম্পূর্ণরূপে এক দেশের অধিবাসী, এ জ্ঞান ও অনুভূতি বৈদিকযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা সিংহলে যাই, কিংবা মাদ্রাজে যাই, পঞ্জাবে যাই কিংবা গুজরাটে যাই, সর্ব্বত্রই মনে হয় যে, আমরা এক দেশের লোক। পরিচ্ছদে পার্থক্য থাকিলেও উহার মধ্যে একটা মিল লক্ষ্য করিয়া থাকি। আর্য্যাবর্ত্তের লেঙ্গটধারী দরিদ্র এবং দূর দক্ষিণাপথের অধিবাসী একই রকমের জাতীয় পোষাক পরিয়াছে মনে হয়। ব্রহ্মদেশের অতি দীন দরিদ্র যেভাবে কৌপীন পরিধান করে, সে যেন ধাঁচা এবং প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। কোন যুক্তিতর্ক দিতে না পারিলে আমরা সকলে কল্কি অবতারের ভূতনাথের মত আমাদের চেহারা এবং পরিচ্ছদ দেখাইয়া বলিব যে, আমরা সকলেই হিন্দু নই কি?

সিংহলের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এবং তাহাদের ভাষা ভারতের ভাষা হইতে ভিন্ন; তবুও তাহারা ব্রহ্মদেশের লোকের মত বিদেশী নহে। ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ একই সম্রাট্‌-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে; কিন্তু সিংহলের রাজকীয় শাসন সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। তবুও সিংহলবাসীরা আমাদের আপনার এবং ব্রহ্মবাসীরা পর। যিনি সিংহলদেশ দেখিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিবেন যে, সে দেশের লোকজনের আকৃতি প্রকৃতি, ধরণ ধারণ দেখিয়া কোনরূপে তাহাদিগকে আপনার বলিয়া না ভাবিয়া পারা যায় না। অতি প্রাচীনকালের জাতিমিশ্রণতত্ত্ব হইতে এমন অনেক কথা জানিতে পারা যায়, যাহাতে ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যদিগের কোন কোন মিল এবং সাদৃশ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। এখানে সে ইতিহাসের কথা বলিব না।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিলেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট দেশের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এক প্রদেশের উৎপন্ন সামগ্রী অন্য প্রদেশে না গেলে লোকের অনেক সময়ে পেট ভরে না; ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলেও এক দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেই তাহার সুবিধা অধিক, একই রকম প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে প্রায় যুগপৎ অনেক প্রদেশেই দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয়, এবং সে দুর্ভিক্ষে অন্যান্য প্রদেশকেও অল্পাধিক পরিমাণে পীড়িত হইতেই হয়। এই-সকল কারণে শত্রুতাই করুক, আর মিত্রতাই করুক, সকল প্রদেশের লোককেই এক সঙ্গে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে বাড়িয়া উঠিতে হয়, এবং পরস্পরে পরস্পরের ভাব দ্বারা অজ্ঞাতসারেও পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ভারতের সকল প্রদেশের অরণ্যচারীদিগের মধ্যেও আর্য্যদিগের শুদ্ধি এবং সুনীতি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিতে ভুলেন নাই। ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র আর্য্যনিবাস স্থাপিত হওয়াতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনার্য্যেরা আর্য্যের অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছে। আর্য্যেরাও যে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সামাজিক আচারে এবং ক্রীড়া কৌতুকাদিতে অনার্য্যের অনেক উপকরণ আত্মস্থ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের সামাজিক ইতিহাসে অলোপ্য অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বহুবিধ কারণেই বহুবিধ রীতি প্রকৃতি, দাঁড়া দস্তুর প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে এক আশ্চর্য্য মিল লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ জাতির তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত বা সমালোচিত হয় নাই বলিয়া এ-সকল কথা বুঝা অনেকের পক্ষে কথঞ্চিৎ কষ্টকর হইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে একটা অচ্ছেদ্য

মিলন রহিয়াছে,' তাহা একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। যে দৃষ্টান্তটি দিতেছি, তাহা কদাচ ঘটিবার নহে; তবুও পাঠকদিগকে একটু কল্পনার আশ্রয় লইতে অনুরোধ করিতেছি। মনে করুন যে, প্রাচীন অনুন্নত যুগের অধিকারের মত অধিকার থাকার ফলে আমাদের ভারতসম্রাট্ ভারত-রাজ্যটিকে দান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে বিলি করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার গবর্ণর বাঙ্গলা পাইলেন, আসামের চীফ কমিশনার আসাম পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের এই দান এবং বিলি বাটোয়ারার পর যদি রাশিয়ার সম্রাট্ অপরিমিত বল লইয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন, এবং পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বঙ্গ প্রভৃতি ঐ প্রদেশ রক্ষা করিতে সহায়তা না করেন, তবে সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারকে নিশ্চয়ই রাজ্য হারাইতে হইবে। রাশিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে এক রাজ্যের পর অন্য রাজ্য অনায়াসেই দখল করিয়া ফেলিয়া সমগ্র দেশটিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। এই কাল্পনিক ঘটনা যে অনায়াসেই ঘটিতে পারে, তাহা এ দেশের পরিচিত ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত করিতে পারা যাইত; কিন্তু প্রয়োজন নাই। অন্যদিকে আবার ভারতবর্ষ যদি একতার বলে বলিষ্ঠ থাকে, তবে ব্রহ্মদেশে কিংবা আফ্‌গানিস্তানে কোন জাতি প্রবল হইয়া উঠিলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ থাকে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে পাঠকেরা এ কথার সকল প্রমাণ এক সঙ্গে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, একপ্রদেশ অন্য প্রদেশকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা এবং গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। উন্নতি লাভ করিতে হইলে সকল প্রদেশকেই হাত ধরাধরি করিয়া উঠিতে হইবে। নহিলে কিছুতেই চলিবে না, অর্থাৎ আবার লর্ড হার্ডিঞ্জকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া সম্রাটের চরণতলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একদিকে যেমন প্রদেশে প্রদেশে একতা চাই, অন্যদিকে তেমনি আবার অরণ্যচারী কোল, কন্ধ, কল্লন্ প্রভৃতি জাতির লোকদিগকে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে রক্ষা করা চাই; না করিলে চলিবে না। তাহা হইলেই ভারতবর্ষের অবস্থা এই হইল যে, উচ্চনীচ সকল জাতির লোকদিগকে একত্র না রাখিলে এবং সকল প্রদেশের মধ্যেই একতার বন্ধন না থাকিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। ইহাই যখন স্বাভাবিক অবস্থা, তখন আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি আর নাই করি, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসী লইয়াই আমরা একটি জনসঙ্ঘ হইয়া রহিয়াছি।

কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান কিরূপভাবে উদ্বুদ্ধ হইলে এক পরিবারের লোকের মধ্যে মিলন স্থাপিত হইবে, একটি জনসঙ্ঘের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে, সে কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

এ পর্য্যন্ত আমরা যদি এইটুকু বুঝিয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট যে সমগ্র ভারতবর্ষ বিধাতা কর্ত্তৃক এমন ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, খণ্ডিত হইলে ইহার খণ্ডিত অংশ হউক আর মূল অংশ হউক, সতেজ এবং সজীব থাকিতে পারে না; বংশগত, ধর্ম্মগত এবং ভাষাগত প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও ভারতের সকল প্রদেশের সকল অধিবাসীর মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য নৈসর্গিক মিল রহিয়াছে; আমরা যত বিচ্ছিন্ন, যত স্বার্থপর এবং যত কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হই না কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি লইয়া আমরা একটি Nation—একটি জনসঙ্ঘ,—এবং সেই জনসঙ্ঘের নাম, দেশের হিন্দুস্থান নাম অনুসারে, "হিন্দু জনসঙ্ঘ।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গের বিবাহসংখ্যা

বিবাহ এতদ্দেশে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে, জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে বিবাহ কেবল সংসারকর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ নহে, বিবাহকে পরকালেরও ধর্ম্মবন্ধন স্বরূপ জ্ঞান করা হয়। তাই এদেশে পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বিবাহিতের সংখ্যা

অত্যন্ত অধিক। প্রায় পাঁচকোটী অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৬৭৮৭ জন কৌমার্য্যজীবন সম্ভোগ করিতেছে। একমাত্র ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যায়, তথায় হাজার পুরুষে ৩৫৭ জন এবং হাজার স্ত্রীলোকে ৩৪০ জন মাত্র বিবাহজীবন ভোগ করিতেছে; অথচ বঙ্গে সেই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫৪ ও ৪৬৩ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, ভারতের অপরাপর স্থানেও বিবাহিতের সংখ্যা এইরূপ অধিক, যথা—মান্দ্রাজে ৪২৭ ও ৪৩৯, বোম্বাইতে ৪৭৪ ও ৫১১, পঞ্জাবে ৩৮৮ ও ৪৮০, মধ্যপ্রদেশে ৫১৯ ও ৫২৯ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ৫০৪ ও ৫০৫ জন বিবাহিত। সমগ্র ভারতেই ইহার গড় যথাক্রমে ৪৫৬ ও ৪৮১। ইহাতে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আরও কিছু লক্ষ্য করিবার আছে। দেখা যাইতেছে ভারতের সর্ব্বাংশেই বিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিতার সংখ্যা অধিক। বহুস্ত্রী-প্রথাতেও এই সংখ্যা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পাত্রস্থ করার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় অভিভাবকমাত্রেরই উৎকট তৎপরতাই ইহার প্রধান কারণ। তাহার ফলে ১৫ বৎসর বয়সের শতকরা ২½ জন মাত্র স্ত্রীলোক ও ২২ জন পুরুষ অবিবাহিত থাকে। বিংশতি বৎসর বয়সের পর অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৩ জনের মধ্যে একজন করিয়া মাত্র। এইরূপে সমগ্র বঙ্গে যদিও বিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক অবিবাহিতার সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার তথাপি তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রমণীরই অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার আশা আছে, তাহাদের অধিকাংশই দুষ্টরোগগ্রস্তা, দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্তা, বারবনিতা, কি কুলিনাদি যে-সকল সম্প্রদায়ে বর একান্ত দুর্লভ তাহাদেরই আইবড় কন্যা। পক্ষান্তরে পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুরুষের দলেও শতকরা ২২ জন করিয়া মাত্র অবিবাহিত থাকে। অর্থাৎ এই বঙ্গদেশে দশ হইতে পনর বৎসর বয়সের প্রত্যেক অবিবাহিত যুবকের মধ্যে একজন মাত্র করিয়া ঐ বয়সের অনূঢ়া পাওয়া যায়।

অন্ততঃ বঙ্গে বিপত্নীকের সংখ্যা ইংলণ্ডেরই সমান। উভয় দেশেই হাজারকরা ৩৫ করিয়া মাত্র, কিন্তু মান্দ্রাজে ৩৯, মধ্য প্রদেশে ৪৬, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫২, বোম্বাইতে ৫৭, এবং পঞ্জাবে সেই সংখ্যা ৮৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অথচ হাজারকরা বিধবার সংখ্যা বঙ্গে ২০১, মান্দ্রাজে ১৮২, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৭৮, বোম্বাইতে ১৭৫, মধ্যপ্রদেশে ১৫৮, পঞ্জাবে ১৪৩ এবং ইংলণ্ডে ৭৪ জন মাত্র। এতদ্দ্বারা অবশ্য ইহা বুঝিলে চলিবে না যে, বঙ্গভূমিতে স্ত্রী কমই মরে, এবং স্বামীর মৃত্যুসংখ্যাই অধিক। পরন্তু সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীজাতির কতিপয় কালান্তক ব্যাধি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বঙ্গেই অত্যন্ত বেশী, তাহাতে প্রতিদিনই বহু রমণী কালগ্রাসে আত্মবলি প্রদান করিতেছে। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এতদ্দেশে অনেকে পুনরায় দাম্পত্যবন্ধনে সম্মিলিত হইয়া যায়, তাহাতে বঙ্গের সেন্সাসের গণনাকারীরা বিপত্নীকের সংখ্যা এত অধিক পাইতে পারে নাই। তাহাদের উপর বিবাহিতদিগেরই কাহার কয়টি করিয়া বিবাহ হইয়াছে, এবং সেই-সকল মৃত ও জীবিত পত্নীর সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ থাকিলে, হতভাগিনী বঙ্গীয় ললনাদিগের মৃত্যুসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। পক্ষান্তরে পুনর্ব্বিবাহ প্রথা যে দেশে যত অধিক অব্যাহত, তত্তৎদেশে বিধবার সংখ্যাও তত কম পাওয়া যায়; বঙ্গভূমি ইহাতে তত উদার নহে বলিয়া এদেশে এত অধিক মহিলা বৈধব্য যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতেছে। বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা অধিক না থাকিলে এদেশে বিধবার সংখ্যা বোধ হয় আরও অধিক হইত। কেননা দেখা যায়, ১৫ হইতে ২০ বৎসরের হাজারকরা বিধবার সংখ্যা খৃষ্টানসমাজে ২১, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে ২৮, বৌদ্ধ ২৮, মুসলমান ৩৫, আর হিন্দু ৯১; এবং ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সেরই হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা হিন্দুসমাজে ২৬৬, মুসলমান সম্প্রদায়ে ১৩৯, ব্রাহ্ম ১২৮, খৃষ্টান ৯৬ এবং বৌদ্ধসমাজে ৯২ জন করিয়া মাত্র। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায়, খৃষ্টান, এবং ততোধিক বৌদ্ধ সমাজে প্রৌঢ়া বিধবারও যত অধিক পুনর্ব্বিবাহ হয়, ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান সমাজেও তত হয় না। যাহা হউক এক্ষণে ১৯১১ সালের গণনালব্ধ বঙ্গের বিবাহিত প্রভৃতির প্রকৃত সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

বয়স		বঙ্গের মোট পুরুষ	বঙ্গের মোট স্ত্রী	অনূঢ়	অনূঢ়া	বিবাহিত	বিবাহিতা	বিপত্নীক	বিধবা
০—১	বৎসর	৭২৯৬৮৫	৭৩৪২২৬	৭২১৬২০	৭৩৪০৯২	৬১	১২৬	৪	৮
১—২	„	৩৪০১৭৩	৩৬৫৭৭৮	৩৪০০৭০	৩৬৫২৪৩	১০১	৪১৪	২	২১
২—৩	„	৭০৮১৮০	৭৬৭০২২	৭০৭৫৪৫	৭৬৪৮৫৭	৬২৩	২০৪২	১২	১২৩
৩—৪	„	৭৩৪৬২৪	৮০৬৮৪১	৭৩৩৩০৮	৮০১৯৬১	১২৮৮	৪৫৩৩	২৮	৩৪৭
৪—৫	„	৬৯২০৬১	৭০৮৬৯৮	৬৮৯৬৩৮	৬৯৮২৪৩	২৬৩৮	৮৫০৭	৮৫	১৩৪৮
০—৫	„	৬৫৭৮৮৮৮	৩১৯৭০২৩	৩১৯২১৮১	৩৩১৪৩৯৬	৪৭১১	১৫৬২২	১৩১	১৮৪৭
৫—১০	„	৩৬৫৬৮৮২	৩৫৩৮৯০০	৩৬১০৯২৫	৩১৭৩১৩৯	৪১৫৪৬	৩৪৯৬৬২	১৪১১	১৬০৯৯
১০—১৫	„	২৮১৬৬২০	২২০৬৭৫১	২৬৪৬৯৬৯	৮৩১০৫৯	১৬৫১৯২	১৩২২৫১৪	৪৪৫৯	৫৩১৭৮
১৫—২০	„	২০৬৩৮৮১	২২৭৫৮৮২	১৪৮৬৩৫১	৯৭০৫০	৫৬৪৮৭০	২০৩৯৬৪২	২৬৬০	১৩৯১৯০
২০—২৫	„	১৮৬৮০২৪	২১৩২০১৪	৬৭৪১০০	৩৬৪০৬	১১৬৩৪৩২	১৮৮৭৭৫৯	৩৯৪৯২	২০৭৮৪৯
২৫—৩০	„	২২২৩৯৫২	২১১০৯৭২	৩১৯৭৪২	২২৭০২	১৮৪১৯৭১	১৭৬০৪৩৩	৬২২৩৯	৩২৭৮৩৭
৩০—৩৫	„	১৮৮৩০৮০	১৬১৭৬৩০	১০০২৯০	১৩০৩৩	১৭১০৬৩৩	১১৯৩৩২৮	৭২২৩৭	৪১১২৬৯
৩৫—৪০	„	১৫৮৯০৭৫	১১৬০৭৬৭	৪৭০৮০	৬৯৮৬	১৪৬৫৩৭৮	৭১৯৪০৩	৭৬৬১৭	৪৩৪৩৭৮
৪০—৪৫	„	১৩৫৯৯৮০	১১৫২৫৭৫	৩৪৭২৩	৬১২০	১২৩০৪৩৮	৫৪৪৬৫০	৯৪৮১৯	৬০১৮০৫
৪৫—৫০	„	৮৭৯৭৪৭	৬৭৮৭৬০	১৭৩৪৩	২৪৫২	৭৮২৫০২	২৩৮৬৭০	৭৯৯০২	৪৩৭৯৩৮
৫০—৫৫	„	৮৪৫২৩৩	৮১৭৮২৫	১৫৮৫৯	২৬৪৮	৭২৫২৬৪	১৯১৯১৬	১০৪১০১	৬২৩২৬১
৫৫—৬০	„	৩৯৮০১৭	৩৪৭৫৬১	৬৭৩৮	১০১৯	৩২৯৭৮৩	৬০১০৫	৬১৩৯৬	২৮৬৪৩৭
৬০—৬৫	„	৫১৭০১৭	৫৬৩১৬২	৯০৭২	১৭৫৬	৪০৮৮০৯	৬১১০৭	৯৯১৩৬	৫০০২৯৯
৬৫—৭০	„	১৬০০৫৩	১৫৮৬২০	২৭৫১	৫৪৮	১২১০১৬	১৬১৬২	৩৬২৮৬	১৪১৯১০
৭০ হইতে তদুর্দ্ধ		৩৪৮০০৯	৩৫৮৭৬৫	৬২৭৬	১৫১১	২৪১৬২১	২৩৩৪৯	১০০১১২	৩৩৩৯০৫
০—৭০এর ঊর্দ্ধ		২৩৮০৩৫৯৩	২২৫০২০৪৯	১২১৭০৩২০	৭৫৬০৮২৫	১০৭৯৭১৬৬	১০৪২৪৩২২	৮৩৬১০৭	৪৫১৬৯০২

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেরই ১৩১ জন বিপত্নীক, ও ১৮৪৭ জন বিধবাও রহিয়াছে এবং ৫ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিপত্নীক ও বিধবার সংখ্যাও যথাক্রমে ১৪১১ ও ১৬০৯৯। বলা বাহুল্য এই বয়সের মধ্যে অনেক বিপত্নীক ও বিধবা হয়ত বিবাহিতের তালিকাতেও আশ্রয় পাইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায় এই বাল্যবিবাহ প্রথা বহুল প্রচলিত। এই যে বঙ্গের তালিকায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ২০৩৩৩ জন বিবাহিত এবং ১৯৭৮ জন বিপত্নীক ও বিধবা বালকবালিকার সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, বিহার ও উড়িষ্যার তালিকায় ইহার সংখ্যা যথাক্রমে ১২৭৯৮৪ ও ৮০৬৪; অথচ উক্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা বঙ্গদেশ হইতে অনেক কম। তথায় এমন কি এক বৎসর বয়সেরই ২০৩০ শিশু বিবাহিত এবং ঐরূপ দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরই মধ্যে ৫৫৩ জন বিপত্নীক ও বিধবা রহিয়াছে। শুনিয়াছি এই-সকল বিবাহ নাকি থালাতে করিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে! পুতুল-খেলা আর কাহাকে বলে! উত্তরবিহারে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের প্রতি দশ বালিকার তিন জনই নাকি বিবাহিতা, দ্বারভাঙ্গায় ঐ বয়সের দুই-পঞ্চমাংশ হিন্দু বালিকাই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও ঐ বয়সের শতকরা ২২ জন বালিকা বিবাহিতা। উত্তর বিহারের পরেই দক্ষিণ বিহার (তথায় মাইল প্রতি ঐ বয়সের বিবাহিতার গড় ২১৭), তৎপর ক্রমে মধ্যবঙ্গ (১৫১), পশ্চিম বঙ্গ (১৪০), ছোটনাগপুর (১০৬), উত্তরবঙ্গ (৯৮), পূর্ব্ববঙ্গ (৬৮), অথচ উড়িষ্যায় এমন কি ৩৩ জন মাত্র।

জাতি		লোকসংখ্যা ০—৫ বৎসরের	লোকসংখ্যা ৫—১০ বৎসরের	লোকসংখ্যা সর্ব্বমোট	অবিবাহিত ০—৫ বৎসরের	অবিবাহিত ৫—১০ বৎসরের	অবিবাহিত সর্ব্বমোট	বিবাহিত ০—৫ বৎসরের	বিবাহিত ৫—১০ বৎসরের	বিবাহিত সর্ব্বমোট	বিপত্নীক ও বিধবা ০—৫ বৎসরের	বিপত্নীক ও বিধবা ৫—১০ বৎসরের	বিপত্নীক ও বিধবা সর্ব্বমোট
হিন্দু	পুরুষ	১২৮৭৭৩৬	১৪৭১২৪৯	১০৮৪৮২১৭	১২৮৫৫০৭	১৪৫৪৭১২	৫২৮৫৬৬৪	২১৫৩	১৫৮৬৫	৫০৩৬৮৬৭	৭৬	৬৭২	৫২৫৬৮৬
	স্ত্রী	১৩৬০৮০৩	১৪২৪২৮৮	১০০৯৭১৬২	১৩৫২৭০৩	১২৪৪৫৭৩	২৯৫১২৪০	৭১৩৯	১৭১০৩৪	৪৫৫৪৭১৮	৯৬২	৮৬৮১	২৫৯১২০৪
মুসলমান	পুরুষ	১৮২৬৪৮০	২০৯১৪৮৬	১২৩৭৭২১৫	১৮২৪২৫৪	২০৬৫৭৫০	৬৫৭০৬৮২	২১৭১	২৫০২৫	৫৫১৩৭৫৩	৫৫	৭০৪	২০২৮২০
	স্ত্রী	১৯৩৪৬৬৬	২০২৫৩২৩	১১৮৬০০১৩	১৯২৫৫০১	১৮৪০৯৩৯	৪৩৬২১২৩	৮২৯৪	১৭৭০৯৬	৫৬৩৪৭০৯	৮৭১	৭২৮৮	১৮৬৩১৮১
বৌদ্ধ	পুরুষ	১৭৩৯৮	১৯৩৫১	১২৫৩৮৮	১৭৩৮১	১৯২৭২	৭১৪৪৪	১৭	৭৭	৪৯৯৬১	—	২	৩৯৮৩
	স্ত্রী	১৭০৩৪	১৮৬২৫	১২১৪৭৮	১৭০১১	১৮৪৮২	৫৫৭৮৮	২৩	১৩৩	৫১১৮২	—	১০	১৪৫০৮
ব্রাহ্ম	পুরুষ	১৯০	১৬০	১৫২০	১৯০	১৫৯	৯৩৫	—	১	৫২৪	—	—	৬১
	স্ত্রী	১৫৩	২১৫	১৪৩৮	১৫২	২১৩	৭৮৯	১	২	৪৮৪	—	—	১৬৫
খৃষ্টান	পুরুষ	৮২২৫	৮৩৬৯	৭০২৬০	৮২০৭	৮৩৩২	৪১৫৭১	১৮	৩৪	২৬৬৪৪	—	৩	২০৪৪
	স্ত্রী	৮২৭৫	৮০১০	৫৯৪৮৬	৮২৫৮	৭৯৩৭	২৮১০১	১৭	৬৭	২৪০২১	—	৬	৭৩৬৪

এক্ষণে এই বিবাহিত প্রভৃতির সংখ্যাটি বঙ্গের কয়েকটী প্রধান জাতিতে ভাগ করিয়া দেখাইলে, দেখা যাইতেছে শিশুবিবাহে মুসলমান সমাজও কম অনুরক্ত নহে। এমন কি তাহাদের মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়সেরই ৮৭১ জন বিধবা রহিয়াছে। কেবল বৌদ্ধ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজই বাল্যবিবাহের প্রতি সবিশেষ খড়্গহস্ত। আবার এই তিন সমাজের মধ্যে খৃষ্টানেরা তবুও অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বৌদ্ধেরাও তাহার প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি তাঁহাদের দৃঢ়ব্রত ছাড়িতে আরম্ভ করেন নাই। প্রত্যুত বাল্যবিবাহে অপর হাজার উপকার থাকুক বা না থাকুক বর্ত্তমানে শিশুমৃত্যুসংখ্যা বহু বাড়াইতেছে। অন্ততঃ বিধবা সংখ্যাই হিন্দুধর্ম্মী জাতি-নিচয়ের মধ্যে ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা হাজারকরা মহিলার বৈদ্যসম্প্রদায়ে ৯১, ব্রাহ্মণে ২৫৮, কায়স্থে ২৭৬, রাজপুত সম্প্রদায়ে ২৮৩, গোয়ালাদের মধ্যে ৩২৩, চাষী কৈবর্ত্তে ৩০ , কুমারে ৩০৭, নমশূদ্রদলে ৩০৪, সৎগোপে ৩২৬, সূত্রধরে ২৮৫, এবং তেলী সমাজে ৩১৩; আবার চামার সম্প্রদায়ে ১২০, ডোমদলে ১৯৭ এবং মুচিদের মধ্যে ১৮১ মাত্র, কেননা ইহাদের মধ্যে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রথাও রহিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

গবেষণা

সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমরা অনেক শব্দ এমন অর্থে ব্যবহার করিতেছি, যাহা প্রাচীন কালে সে অর্থেই ব্যবহৃত হইত না। "গবেষণা" শব্দটী ইহার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কোন কোন বৈয়াকরণ (যেমন বোপদেব) এই শব্দকে 'গবেষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এই 'গবেষ' ধাতু বোপদেবের নূতন সৃষ্টি। 'গবেষণা'র প্রচলিত অর্থ "কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ নিমিত্ত অন্বেষণ।" কিন্তু ইহার মৌলিক অর্থ "গোরু খোঁজা।" গবেষণা = গো + এষণা। 'এষণা' শব্দ 'এষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন—এই ধাতুর অর্থ 'পাইবার ইচ্ছা করা' কিম্বা 'খোঁজা'। সাহিত্যে 'গবেষণা' শব্দের অনুরূপ অনেক কথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। 'পুত্রলাভের ইচ্ছা' এই অর্থে পুত্রৈষণা (= পুত্র + এষণা), 'বিত্ত লাভের ইচ্ছা' এই অর্থে বিত্তৈষণা (= বিত্ত + এষণা), 'বিশেষ বিশেষ লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের ইচ্ছা' এই অর্থে লোকৈষণা (= লোক + এষণা) (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।৫।১); 'হিতের অর্থাৎ কল্যাণের ইচ্ছা' এই অর্থে 'হিতৈষণা' (= হিত + এষণা), 'ধন লাভের ইচ্ছা' এই অর্থে 'ধনৈষণা' (= ধন + এষণা), ইত্যাদি।

এইরূপ 'গোরু লাভের ইচ্ছা' কিম্বা 'গোরু অনুসন্ধান করা' এই অর্থেই প্রাচীন কালে 'গবেষণা' শব্দ ব্যবহৃত

হইত। আমরা 'গোত্র' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি অতি প্রাচীন কালে পশুই ধন বলিয়া বিবেচিত হইত,—ইংরাজী Pecuniary শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। Pecuniary শব্দ লাটিন Pecus হইতে উৎপন্ন এবং ইহার অর্থ পশু। Pecuniary শব্দের ধাত্বর্থ 'পশু সম্বন্ধীয়'; বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ "অর্থ সম্বন্ধীয়।" এই অর্থের কি প্রকারে পরিবর্ত্তন হইল তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বে পশুই ছিল ধন। এই পশুর মধ্যে গোরুই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং গোরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন। এই গোধন লাভ কিংবা এই গোধন অন্বেষণকেই পূর্ব্বে 'গবেষণা' বলা হইত। ঋগ্বেদেও এই অর্থেই 'গবেষণা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

স ঘাবিদে অম্বিন্দ্রো গবেষণো বন্ধুক্ষিদ্‌ভ্যো গবেষণঃ (১।১৩২)। ইহার পদপাঠ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—সঃ ঘ বিদে অনু ইন্দ্রঃ গো এষণঃ বন্ধুক্ষিৎভ্যঃ গো এষণঃ। ইন্দ্র বন্ধুদিগের (অর্থাৎ নিজের উপাসকদিগের) জন্য গো অন্বেষণ করেন, এই জন্য এখানে ইন্দ্রকে গবেষণঃ (গো+এষণঃ) বলা হইয়াছে।

গবেষণঃ স ধৃষ্ণুঃ (৭।২০।৫)। পদপাঠ এইরূপ—গো এষণঃ সঃ ধৃষ্ণুঃ—ইন্দ্র গো অন্বেষণ করেন এবং তিনি শত্রু-ধর্ষক। সায়ণও লিখিয়াছেন—গবেষণঃ=গবান্ অন্বেষ্টা।

যুঙ্গে রথম্ গবেষণম্ হরিভ্যাম্ (৭।২৩।৩)=গো-অন্বেষক রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করি। এখানে গবেষণম্= গো+এষণম্। গো লাভের জন্য কিংবা গো অন্বেষণের জন্য অনেক সময় রথে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, এই জন্য রথকে 'গবেষণ' বলা হইয়াছে।

ইমম্ চ নঃ গবেষণম্ (গো+এষণম্) সাতয়ে সীসধঃ (৬।৫৬।৫)। এস্থলে গো-অন্বেষণকারী লোককে 'গবেষণম্' বলা হইয়াছে।

গো লাভের জন্য অনেক সময় যুদ্ধ করিতে হয় এবং যুদ্ধে দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য অথর্ব্ব বেদে (৫।২০।১১) দুন্দুভিকে 'গবেষণঃ' বলা হইয়াছে।

'ইষ' শব্দ এবং 'এষণ' শব্দ একই ধাতু (ইষ=ইচ্ছা করা) হইতে নিষ্পন্ন। গো শব্দের সহিত কেবল যে এষণ শব্দেরই সংযোগ হইয়া থাকে তাহা নহে, 'ইষ' শব্দও ইহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। গো+ইষ=গবিষ; যাহারা গো কামনা করে তাহাদিগকে 'গবিষ' বলা হয়। ঋগ্বেদে এই অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৪।৪১।৭, ৪। ৩১২ ; ৮।২৪।২০ ইত্যাদি)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এক সময়ে গো লাভের ইচ্ছা, গো অন্বেষণ,—একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। 'গবেষণ' 'গবিষ' ইত্যাদি কথাও সদা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে 'গবেষণঃ' শব্দের অর্থ "যে গো অন্বেষণ করে"। সুতরাং 'গবেষণা' শব্দের অর্থ গো অন্বেষণ কিংবা গো লাভের ইচ্ছা। এই মৌলিক অর্থ হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত অর্থ আসিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন নহে। প্রাচীন কালে গো-ই প্রধান ধন ছিল, সুতরাং 'গো অন্বেষণ' অর্থ 'ধন অন্বেষণ'; ক্রমে ধনের অর্থ প্রসারিত হইতে লাগিল, অপর আবশ্যক বস্তুও ধন বলিয়া গৃহীত হইল। যাহা মূল্যবান তাহাই ধন, সুতরাং এখন দাঁড়াইল 'গো অন্বেষণ' অর্থ 'মূল্যবান বস্তু অন্বেষণ।' কালে মানব যখন 'জড়' হইতে 'অ-জড়ে' পৌঁছিল তখন 'তত্ত্বজ্ঞান'কেও মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহার অর্থ ছিল 'গোধন অন্বেষণ' এখন সেই শব্দের অর্থ হইল 'তত্ত্ব অন্বেষণ'। সর্ব্ব ভাষাতেই অর্থের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

পতিতজাতি উদ্ধার সমিতি

(পালঘাট।)

বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে একটী নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই মহামিলনের যাত্রার দিনে লোক আর সমাজকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে দিতে চাহিতেছে না। তাই আজ তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতিদিগকে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের কোনও এক উচ্চতর প্রদেশে স্থান দিবার জন্য কয়েকজন মহাপ্রাণের প্রাণে বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারা চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। দেশের এই নবউষার প্রারম্ভ কালে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব

পালঘাটের পতিত জাতির স্কুল স্থাপন। মধ্যস্থলে মাননীয় বিচারপতি সার শঙ্করন্ নায়ার উপবিষ্ট।

হইয়াছিল ও এই নবযুগের অন্যতম হোতাস্বরূপ তাঁহার মেঘমন্দ্র বাণী সমাজের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন মানবজীবনের স্বার্থশূন্য দুইটী উদ্দেশ্য—একটী ধর্ম্মজগতে উন্নতিলাভ ও অপরটী সমাজসেবা। মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণমিশনের অপর একজন স্বামী ব্রহ্মবাদিনেরই চেষ্টায় পালঘাটে বেদান্ত-সভার সৃষ্টি হইয়াছে ও সভা স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণদের সঙ্কীর্ণতার জন্য হিন্দুসমাজকে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিষ্ঠিতে হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণরাই এখানে পতিতের উদ্ধারের জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া অতীতের পাপকে নবীন সহৃদয়তার জালে ঢাকিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। অন্যান্য জাতিরা যখন দেখিল ব্রাহ্মণেরাই এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী তখন তাহারাও আসিয়া যোগ দিতে লাগিল ও মিশনের চেষ্টাক্রম ফলবান্ হইবার আশা অতি নিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু স্বার্থলিপ্ত, স্বার্থশূন্য যাহাই হউক না কেন সকল কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই-সকল কার্য্যে অর্থ বিনা অগ্রসর হইবার যো নাই। এমন কি একবার অর্থাভাবে মিশনের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল।

প্রথমে পতিত জাতিদিগের জন্য একটী অবৈতনিক শিল্প-শিক্ষার-ব্যবস্থা-সমন্বিত প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। কিন্তু "চেষ্টা করে যে ভগবান তাঁহার সহায় হন।" মিশনের সম্পাদক শেষার্য্যের অক্লান্ত চেষ্টায়, অদম্য উৎসাহে চেষ্টা অবশেষে ফলবতী হইয়া উঠিল। শেষার্য্য নিজে ব্রাহ্মণ, পরদুঃখকাতর। তাঁহার নিজেরই এত কাজ যে অন্য কাজ করার সময় পাওয়া কঠিন। কিন্তু বিপুল এই গুরুতর ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া কার্য্যস্তূপের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে নিষ্ঠার সহিত পতিতজাতির উদ্ধার কার্য্যে নিরত হইয়াছেন। জীবনে ইহাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়া লইয়াছেন ও যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহা শত কার্য্যের মধ্যেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া করিয়া যাইতেছেন। এইটুকু তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। প্রত্যহ সকালেই তাঁহাকে গাড়ী চড়িয়া হয় স্কুলের কার্য্য পরিদর্শন, নয় চাঁদা আদায়, বা অন্ত্যজ পঞ্চমদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কার্য্য করিতে বহির্গত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

পালঘাট পতিত জাতির স্কুলের প্রথম ছাত্রদল। মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শেষার্য্য মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

কুকুরটীও প্রভুর অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে ফিরে। শেষার্য্যের সহকারী শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরাম সেখানকার একজন পদস্থ ব্যক্তি। তিনি পঞ্চম নামে অভিহিত অন্ত্যজদিগকে বয়নকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ছয়টী হস্তচালিত তাঁত ও মিশনের পুস্তকাগারে বেদান্ত ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন। ইনিও একজন বেশ উদ্যোগী পুরুষসিংহ।

বেঙ্কটরাম তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আর অধিক আশা করা অন্যায়; কিন্তু ইহাতেও মিশনের কার্য্য অর্থাভাবে মন্দা পড়িয়া গিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে শেষার্য্য মহাশয় স্বামী সারদানন্দকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন, স্বামীজীও স্বীকৃত হইয়া পালঘাটে যান। এই সময়ই মিশনের অর্থাভাবের সময়; কিন্তু স্বামী সারদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন ও বিগত ২১শে এপ্রিল জষ্টিস্ স্যর শঙ্করন্ নায়ার মহাশয় পালঘাটে পতিত জাতির জন্য একটী রীতিমত প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন।

প্রথম প্রথম স্কুলটী কেবল দিনেই হইত; স্কুল খোলার সময় মাত্র ১৬ জন বালক ও একজন বালিকা ছিল। এরূপ আরম্ভ যাহার, তাহার ভবিষ্যৎ যে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল তাহা সুনিশ্চিত। এক মাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ দাঁড়াইয়াছে কিন্তু বালিকা সেই একটীই আছে। মিশন শুধু অবৈতনিক শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, এমন কি ছেলেদিগকে শ্লেট, পেনসিল, ইত্যাদি ও বই বিনামূল্যে দিয়া থাকেন ও যাহারা অতি গরীব তাহাদিগকে কাপড় ও পোষাকও বিনামূল্যে দেন। মালাবারের পঞ্চমরা সাধারণতঃ সকলেই গরীব। কোনও রকমে দিন খাটিয়া দিন আনিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের পক্ষে স্কুলে ছেলে পড়ান কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। উক্ত স্কুল খোলার এক সপ্তাহ পরে মালাবারের কালেক্টার মিঃ ইন্‌স্ আর একটী নৈশবিদ্যালয় খুলিয়া গিয়াছেন। মিশ্র পঞ্চমরা এই বিদ্যালয়ে পড়ে। স্থানীয় থিওজফিক্যাল সভার গৃহে এই স্কুলটী হইয়া থাকে। এই নৈশবিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইয়াছে যে, স্থান সঙ্কুলান হয় না। সেইজন্য বর্ত্তমানে একটী খড়ের ঘর নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠিয়াছে। উপযুক্ত অর্থলাভ ঘটিলেই স্থায়ী স্কুলভবন নির্ম্মিত হইবে। খৃষ্টান মিশনারীদের মত বেদান্ত-সভার অনেক স্বামী পঞ্চমদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া স্বাস্থ্যসম্বন্ধে, পান-প্রথার কুফল সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় পঞ্চমদের মধ্যে পান-

প্রথার ভারী প্রচলন; খুব কম লোকই আছে যে এই কদর্য্য প্রথার বশীভূত নহে। তাঁহারা অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও সাহায্য করিয়া থাকেন। কার্য্যকরী সভার আর একটী উদ্দেশ্য আছে যে পঞ্চমদের সুবিধার জন্য একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। এই দারিদ্র্যনিপীড়িত পঞ্চমদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সারাদিন গাধার মত খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারাই কোনও রকমে সংসার নির্ব্বাহ হয়। সেই হেতু কার্য্যকাল দিবাভাগে তাহারা স্কুলে যাইতে পারে না। স্কুলে একজন বালক আছে। সে প্রতিবেশীর গরু চরায়, তাহার মাহিনা মাত্র ১৲ টাকা। কিন্তু তাহার অবস্থা এত খারাপ যে, সে এই এক টাকা উপার্জ্জন ত্যাগ করিয়া স্কুলে দিনে আসিতে পারে না। সেইজন্য সে নৈশবিদ্যালয়ে পড়ে। এই উপার্জ্জন ত্যাগ করিলে তাহাকে অনেক নিরন্ন দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই ছেলেটি বেশ চালাক চতুর। স্কুলে ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হয়। ছেলেদের অর্থহীন নাম বদলাইয়া হিন্দুদেবতা রাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ইত্যাদি নূতন নামকরণ হইয়াছে। স্থানীয় হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মিঃ কৃষ্ণ ও অন্যান্য কয়েক-জন ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন।

সমাজে ধোপা নাপিতেরও যে অধিকার আছে পঞ্চমরা সে অধিকারটুকু হইতেও বঞ্চিত। এমন কি যে-সকল পুকুর উচ্চবর্ণের লোকেরা নোঙরা কার্য্যে ব্যবহার করে, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও পুকুর হইতে তাহাদিগকে পানীয় জল পর্য্যন্ত লইতে দেওয়া হয় না। মিশনের আয় সামান্য; এই সামান্য আয় হইতেই কিছু টাকা ভাগ করিয়া লইয়া ইহাদের জন্য কূপ খনন করা হইতেছে।

কিন্তু এইরূপ বিরাট মহৎকার্য্য একজনের চেষ্টায় হওয়া একরূপ অসম্ভব। দেশের ও সমাজের অধিকাংশই এইরূপ পতিত জাতি। হিন্দুসমাজ এতদিন ইহাদিগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের এই উদ্ধারের প্রচেষ্টায় দানবীরগণ মুক্তহস্ত হউন, দেশের কর্ম্মশক্তির জাগরণের সাহায্য করুন। *

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

* Modern Review, July, 1913.

"সমাজ বা দেশাচার" *

(সমালোচনা)

"দেশ হিতৈষীরা দেশের উন্নতির চেষ্টা করছেন; কিন্তু সে দেশের কি কখনও উন্নতি হতে পারে, যে-দেশের স্ত্রীলোকের চোখের জল শুখায় না; কমলার মত রমণী, যার আদর্শ লোকের চরিত্র গঠন কত্তে পারে, এমন সব রমণী যেখানে অনাদরে অবজ্ঞায় কেঁদে জীবন শেষ কচ্চে; যে দেশে জননীর জীবনের, জননীর স্বাস্থ্যের মূল্য নেই; যে-দেশের রীতি দেশের লোক যাতে দুর্ব্বল হয়ে জন্মায় তার চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজ, এর প্রতিকার দূরে থাক, এই অনিষ্টকর রীতির পোষকতা করে; সমাজহিতৈষী দেশহিতৈষীরা কখনও এদিকে চেয়েও দেখেন না। কন্যার পিতারা—যাঁরা এর ফল মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করছেন, তাঁরাও এর প্রতিকার কত্তে ভয় পান। চোখের সামনে নিজ সন্তানের মৃত্যু দেখতে পারেন, যন্ত্রণা দেখতে পারেন, তবু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। ধিক! আজ যদি সমস্ত কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা করেন যে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেব না, তা হলে সমাজ কি করতে পারে? কেবল যদি তাঁরা এই ভীরুতা এই হৃদয়হীনতা ত্যাগ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেন 'ছোট বেলায় মেয়ের বিবাহ দিব না' আর আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা দেশের, সমাজের ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন 'বালিকা বিবাহ করব না' তা হলেই এই প্রতিদিনের নারীহত্যা শিশুহত্যা বালিকাহত্যা নিবারণ হয়। কিন্তু তাঁরা তা না করে Self-Government ও Nationalism এর উপর কংগ্রেসে লম্বা লম্বা Speech দেন, আর প্রতিদিনের এই যে মনুষ্যহত্যা—যার প্রতিকার তাঁদের নিজেদের হাতে, তার কথা কখনও ভাবেন না। এই তাঁরাই আবার তাঁদের শিক্ষার গর্ব্ব করেন। তাঁদের শিক্ষায় ধিক! তাঁদের সমাজে ধিক!"

শিক্ষার গর্ব্ব করি নাই, সমাজকেও দোষহীন বলি না। তবে কংগ্রেসে বক্তৃতা করিয়াছি, Self-Government ও Nationalism-এর কথাও বলিয়াছি। বালিকা বিবাহ করিয়াছি, বালিকা বিবাহ দিয়াছিও। কাজেই "হেমলতা"-রচয়িত্রীর এই তীব্র ভর্ৎসনা পড়িয়া যে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি না। আমাদের সমাজের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা অস্বীকার বোধ হয় অনেকেই করেন না। যদি কাহারও এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে তাঁহাকে আমি এই "সমাজ বা দেশাচার" নাটিকা পড়িতে অনুরোধ করি। এইরূপ সামাজিক নক্সা যে আমাদের একটি গৃহলক্ষ্মী, একটি হিন্দুকুলবধূ, শেষটা মুখ ফুটিয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়ভেদী প্রমাণ আর কি হইতে পারে। কারণ যিনি লিখিয়াছেন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন, যিনি পড়িবেন তিনিও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবেন। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ক্রন্দন এরকম শুনিতে পাওয়া যায় না। লেখিকা যথেষ্ট গবেষণার পর, নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া ও পড়িয়া, নিজের মত স্থির করিয়াছেন এবং সাহসের সহিত বিনা সঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। লেখিকা ধন্যা। আমি অন্তরের সহিত তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি।

* নাটক, "হেমলতা" রচয়িত্রী প্রণীত। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, মূল্য ছয় আনা।

নক্সা নাটিকা আকারে অঙ্কিত হইয়াছে, পাঠকবর্গের ও পাঠিকা-মণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হইবে। আলোচ্য বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর। আমি তাহারই সম্বন্ধে দুইটি একটি কথা বলিব মাত্র।

লেখিকা দেখাইয়াছেন বাল্যবিবাহের ফল বিষময়। প্রথম, দুগ্ধপোষ্য বালিকার সহিত হৃদয় বিনিময় হয় না, ফল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা হয় না, স্বামীর চরিত্রে দোষ আসে, স্ত্রীর অনন্ত দুঃখ হয়, পতির-প্রেম-অপ্রাপ্ত শূন্যজীবনে যদি পরপুরুষের অনুরাগের ছায়া পড়ে তাহাতে সুখ নাই, বরং পরিণাম অতৃপ্তি ও আত্মহত্যা। স্বামীও আবার চরিত্র হারাইয়া জঘন্য অত্যাচার করিয়া অকালে প্রাণ হারায়, বালিকা স্ত্রী হয়ত এত অল্প বয়সে বালিকা বিধবা হইয়া পড়ে যে সে বুঝিতেই পারে না তার কি সর্ব্বনাশ হইল। দ্বিতীয়, বালিকা স্ত্রী শীঘ্র বালিকা জননী হইয়া পড়ে, ফল, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ অথবা অকালমৃত্যু। যদি বা না মরিল, বালিকা অবস্থায়, গৃহিণীর কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে, গৃহিণীপদ পাইয়া গৌরবে ধরাখানিকে সরা দেখিয়া অকারণ অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বাক্য বলে, আর সেই অভ্যাস চিরদিন থাকিয়া যায়, পরিণাম সংসারে ঘোর অশান্তি। এইরূপে আমাদের দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে।

আমি "সমাজ" পড়িবার পূর্ব্বে আমাদের সমাজ নৈতিক হিসাবে যে নরক হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনে করিতাম না। বাল্য-বিবাহ আমাদের দেশে কিছু নূতন নহে, তবে আমার কেমন একটা ধারণা ছিল যে, সাধারণতঃ দাম্পত্যজীবন আমাদের দেশে সুখময়। পাপ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই আছে, তবে পাপ কিম্বা কলঙ্ক সংমিশ্রিত না হইলে যে যথার্থ প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা কখনও মনে করি নাই। শুনিয়াছি বঙ্গদেশে আধুনিক উপন্যাসের উপাদানের মধ্যে অপবিত্র এবং আইনবিরুদ্ধ প্রণয় একটি প্রধান হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ওরূপ উপন্যাস পড়িবার আমার রুচিও নাই সময়ও নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম,—

Who is the happy husband? He
Who, scanning his new wedded life,
Thanks Heaven, with a conscience free,
'Twas faithful to his future wife.

বিবাহের পর এ কথার যে কোন প্রতিবাদ হইতে পারে তাহাত স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু "সমাজ"-রচয়িত্রী আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী, তিনি বলিয়াছেন তাঁহার চিত্র অতি-রঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আমি নতমস্তকে স্বীকার করিলাম, আজ বুঝিলাম যে, যেমন যকৃৎপীড়াগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তি সকল বস্তুকেই পীতবর্ণ দেখে, তেমনি আমিও নিজের সংসারে সুখ দেখিয়া মনে করিয়াছি বঙ্গসমাজটা কীটদষ্ট নহে। যাহা পূর্ব্বে কলুষিত কল্পনার বিভীষিকা বলিয়া প্রত্যয় হয় নাই, আজ জানিলাম তাহার অভ্যন্তরে সকলই অসত্য নহে।

তবে পঁচিশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে একটা দশ বৎসরের মেয়ের বিবাহের অনুমোদন করিতে আমি কখনই প্রস্তুত ছিলাম না। "সমাজ"-রচয়িত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "বিবাহ কি খেলা? স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী—সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী। সে আমাদের দেশে আজ হাঁড়ী বেড়ীর মত জিনিষ মাত্র, কিম্বা টেবিল চেয়ারের মত গৃহসজ্জার জিনিষের সমান। এতে যে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করা হচ্ছে।" বড়ই দুঃখের বিষয় যে যে-দেশে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মাতৃরূপে পূজা করা হয়, সে দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্যক্ ও সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

কিন্তু বহুদিন গত হয় নাই অন্ততঃ কিছু লোকের এরূপ ধারণা ছিল যে বাল্যবিবাহের দরুণ পুরুষজাতিই বেশী অসুখী হয়। কবি বলিয়াছেন, বিবাহিতা নারী সখের খেলনা, সে প্রণয় কেমন, পতি নারীর কিবা ধন, তা, জানে না ও ভাবে না। পুরুষেরা নারীর অন্তরের কথা জানিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ভ্রম করা বিচিত্র নহে। "সমাজ"-রচয়িত্রী সুন্দররূপে এই ভ্রম দেখাইয়াছেন। তাঁহার আদর্শরমণী কমলা বলিতেছে, "আমি মানুষ, আমার হৃদয় আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ-দুঃখ-বোধ আছে। কেবল গহনা কাপড় আর সাজান ঘর পেয়ে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না, বিশেষতঃ মেয়ে মানুষ। কিন্তু সেজন্য কাকে দোষ দেব? নয় বৎসরের বালিকাকে ছাব্বিশ বৎসরের যুবক তা ছাড়া আর কি দিতে পারে? জোর অবজ্ঞামিশ্রিত একটু স্নেহ বা আদর। নয় বৎসরের বালিকাও তখন তার দুঃখ অভাব বুঝল না; তারপর যখন বুঝল, তখন স্বামীর হৃদয় অধিকার করবার জন্য ব্যাকুল হ'ল; কিন্তু তখন স্বামীর হৃদয় কোথায়? বিভিন্ন প্রকৃতির নিষ্পীড়নে তখন সে শুষ্ক কঠোর হয়ে গেছে। তখন স্ত্রী গৃহে সজ্জিত গৃহিণী হয়ে রইলেন। আর স্বামী বাহিরে অর্থোপার্জ্জন আর আমোদে ব্যস্ত রইলেন। স্ত্রীকে প্রথম দর্শনে স্বামীর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেই ভাবই রয়ে গেল, স্বামীর চোখে স্ত্রী সেই নির্ব্বোধ বালিকাই রইল, কিন্তু স্ত্রী অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল যে, আর সে বালিকা নয়। লজ্জা তখন তার ভার বোধ হতে লাগল যখন দেখলে তার পরণে ছেঁড়া কাপড় কি বারাণসী কাপড় স্বামীর দৃষ্টিতে পড়ে না, গৃহকর্ত্রী মনে ক'রে সে আর তখন গৌরব বোধ করল না, যখন দেখল গৃহকর্ত্তা তার প্রতি উদাসীন। হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে তার হৃদয়টা তখন হাহাকার কত্তে লাগল। এতটা ভালবাসা কেবল অবজ্ঞাত হল!" এ কাতর আর্ত্তনাদ মর্ম্মস্থলের নিভৃততম কন্দর সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে, পুরুষ লেখকের কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নাই; বাইরন বলিয়া গিয়াছেন প্রেম পুরুষের জীবনের অংশমাত্র, স্ত্রীলোকের সমগ্রজীবন। তবে এইরূপে নারী-হৃদয়ের আবরণ তুলিয়া, হৃদয়টাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া ভিতরের ভাগটা বাহিরে আনিয়া, তাহার অসীম অতৃপ্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাহার দুর্দ্দম নিষ্ঠুর জ্বালা ও যন্ত্রণা, সহৃদয়া স্ত্রীলেখিকা ব্যতিরেকে আর কেহ দেখাইতে পারিত না।

আমি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নহি, বাল্যবিবাহে যে দেশের অশেষ অকল্যাণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তর্কের বাহির, মনে করি। ইহাও জানি যে বাল্যবিবাহ আমাদের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। এই বাল্যবিবাহের জন্য জাতীয় তেজ ও বল সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সহস্র সহস্র বহুমূল্য জীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, ফুল ফুটিবার আগে ঝরিয়া যাইতেছে, আমরা কোন রকমে কোন দিকেই মাথা তুলিতে পারিতেছি না। বিবাহ যে স্ত্রীপুরুষ দুই জনের জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার, তাহা লোকে বিস্মৃত হইতেছে, বেদের বিবাহমন্ত্র-সকল বুঝিবার চেষ্টা নাই। যখন পুতুল খেলিবার বয়স তখন বালিকারা সন্তানের জননী হইয়া পড়ে, লেখাপড়া শেষ হইবার পূর্ব্বে বালকেরা সংসারের ভারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এ রকম অবস্থায় জাতীয় মঙ্গল কিম্বা জাতীয় উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে? এ রোগের কি প্রতিকার নাই? "সমাজ"-রচয়িত্রী বলিয়াছেন প্রতিকার আমাদের হাতেই। এ কথার আমি পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা সকলেই স্বদেশী, দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী। আমরা যদি একমতহই, আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, বালিকার বিবাহ দিব না, বালিকাকে বিবাহ করিব না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অচিরে জাতি ও

সমাজের সর্ব্বাশুভমূলক এই দেশাচার লুপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে যত অল্পবয়সে পুরুষের বিবাহ হইত, আজকাল আর তেমন হয় না, অনেকে কিছু উপার্জ্জনের আশায় দুই তিনটা "পাস" না করিলে পুত্রের বিবাহ দেন না, অনেকে ভাল উদ্দেশ্যে বালকের পরিণয় স্থগিত রাখেন। কিন্তু যদি চ গৌরীদান এখন আর অধিক হয় না, তথাপি বালিকাবিবাহ ত প্রত্যহই হইতেছে। "হেমলতা"-রচয়িত্রী এই দারুণ দুষ্ট দেশাচারের প্রতিকারের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন; সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত "সমাজ" পাঠ করা উচিত।

এলাহাবাদ। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাল্য ও নির্ম্মাল্য

(সমালোচনা)

'আলো ও ছায়া'-প্রণেত্রী নূতন পুষ্প চয়ন পূর্ব্বক এক 'মালা' রচনা করিয়াছেন। নিবেদন করিয়াছেন বিধাতার শ্রীচরণে।

এক সূত্রে জন্মমৃত্যু,
আনন্দ বেদন,
মালা গাঁথি শ্রীচরণে দাও॥

ইহার সঙ্গে 'নির্ম্মাল্য'ও মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় 'আলো ও ছায়া'র স্থান অতুলনীয়। এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহা ইহার অভাব পূর্ণ করিতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন—"নিতান্তই অতিশয়োক্তি। যেদেশে রবীন্দ্রনাথ রহিয়াছেন, সেদেশে কি একথা শোভা পায়?" এ প্রকার সন্দেহ কিন্তু ঠিক নহে। যে দেশে আমের জন্ম, সে দেশে কি আঙ্গুরের অভাব হইতে পারে না? 'আলো ও ছায়া'র কবি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, অন্য কেহ তাহা দিতে পারেন নাই। 'পঙ্ক' 'সে কি?' প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। স্বীকার করি গ্রন্থে আলো অপেক্ষা ছায়াই অধিক। কিন্তু এই দুঃখের গীতিই গ্রন্থকে প্রিয়তর করিয়াছে।

"Our sweetest songs are those that speak of saddest thoughts".

মাল্য ও নির্ম্মাল্যেও সেই পরিচিত স্বর, এখানেও সেই 'মধুর স্বপন', সেই 'আশার কথা', এখানেও

নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা॥

উভয় গ্রন্থের ভাষাই অতি সরল ও প্রাঞ্জল, অথচ গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী। পাঠকগণ এই নূতন গ্রন্থে অনেক নূতন ভাবের আবেশ দেখিবেন—আবার প্রাচীন ভাবেরও নূতন বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আলো ও ছায়ার ভাব মাল্য ও নির্ম্মাল্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এক অপরের প্রপূর্তি। আলো ও ছায়ার কবি 'নবীন', মাল্য ও নির্ম্মাল্যের কবি 'প্রবীণ'। আলো ও ছায়ার ভাব উদ্দাম, শক্তি উন্মাদিনী—মাল্য ও নির্ম্মাল্যের কবিও ভাবে আবিষ্ট, তবে অধিকাংশ স্থলে অপেক্ষাকৃত সংযত ও প্রশান্ত। যাঁহারা আলো ও ছায়া পড়েন নাই, তাঁহারা ইহা পড়ুন। আর যাঁহারা পড়িয়াছেন,—তাঁহাদিগকে মাল্য ও নির্ম্মাল্য পড়িতে অনুরোধ করি। পড়িলেই বুঝিবেন—কি প্রকার সরল ও সরস ভাষায় কত উচ্চ ও গভীর ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ১১০টী কবিতা আছে, ইহার মধ্যে ৪৯টী নির্ম্মাল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। আমরা কেবল দুই একটা কবিতা লইয়া আলোচনা করিব।

(১)

প্রথম কবিতার নাম 'মাঙ্গলিক'। নিদারুণ শীত চলিয়া গেল, মধুমাস আসিয়া উপস্থিত; বসন্তের সুমঙ্গল গীত শুনিয়া কবি বলিতেছেন :—

"যে দেশে আছিস্ তোরা সৌন্দর্য্যের শেষ নাই,
জরা যথা শিশু যৌবন,
পুরাতন নাহি সেথা, নূতনের চিরলীলা
জীবনের জনক মরণ।

এক দেশে সূর্য্য অস্তমিত হয়, কিন্তু অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই শৈশবাবস্থা, কিংবা প্রথম যৌবন। একদেশে সূর্য্যের মৃত্যু, অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই জন্ম। উদ্ভিদ্‌জগতেও ইহা সত্য। উদ্ভিদ্ জরাগ্রস্ত হইল, রহিয়া গেল বীজ, এই বীজই নূতন উদ্ভিদের শৈশব অবস্থা। এক উদ্ভিদ্ মরিয়া গেল, তাহার স্থলে উৎপন্ন হইল নূতন বৃক্ষ। মৃত্যু জীবনের জনক হইল। কবি যে-রাজ্যের কথা বলিতেছেন—সে রাজ্যে জরাই যৌবনের শৈশবাবস্থা এবং মরণই জীবনের জনক।

(২)

জীবনের আদর্শ বিষয়ে এই গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। 'আশীর্ব্বাদ' নামক কবিতাতে কবি নবযুগের নব সাধনার দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কবিতা রচিত হইয়াছে "অক্টোবর ১৮৯১"। কবির জন্ম ১২ই অক্টোবর। তাই মনে হয় নিজ জন্মদিন উপলক্ষেই কবি জীবনের আদর্শ বিষয়ে, যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহাই এই কবিতাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কেবল ভাবে 'আমি কিছু নই', 'আমি কিছু নই', কালে তাহার জীবনও তদ্রূপই হইয়া যায়। সেই জন্য কবি বলিতেছেন—

আপনার অযোগ্যতা আজিকার দিনে আর কর'না স্মরণ,
ভক্তিভরে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত দেবতারে করগো বরণ।
আছে শক্তি তোমা মাঝে, করিও না অবহেলা দেবের সে দান,
তোমারি ভিতর দিয়া তোমার বাহিরে তাহা সাধিবে কল্যাণ।

বর্ত্তমান যুগে আমরা কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারিতেছি না, জগতের কল্যাণ এবং আমাদের প্রত্যেকের কল্যাণ এক সূত্রে বাঁধা। জগতের সেবা আত্মার উন্নতিরই একটী অঙ্গ। তাই 'আশীর্ব্বাদ' এই—

দিব্য দৃষ্টি, দিব্য কণ্ঠ, অক্ষয় জীবন লয়ে, মন্দাকিনী সম
বহাও নির্ম্মল ধারা আতপ্ত-ধরণী-বক্ষে, স্নিগ্ধ নিরুপম
করিয়া উভয় কূল, হরিয়া মালিন্যভার; নিজে চলে যাও
অনন্ত জলধি পানে, সকল পিয়াসা তব সেথায় মিটাও।
গাহি যাও প্রীতিগীতি, বেগবতি, ভোগবতি, বিষ্ণুপদ-ভবে,
তোমা হতে ভস্মসার কত সগরের বংশ সমুদ্ধার হবে।

'কবির কামনা'তেও এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবি মাতা ও পিতার আদর্শে জীবন গঠন করিতে চাহিতেছেন :—

মায়ের বুকের শুভ্র ক্ষীরধারা
যেই কণ্ঠে করিয়াছি পান,
সেই কণ্ঠে যেন গেয়ে যেতে পারি
অনিন্দ্য মধুর গান।

পরসেবা-রত মায়ের হাতের
পরশ রয়েছে শিরে,
জনকের শত পুণ্য-অভিলাষ
মোরে রেখেছিল ঘিরে।
সদা মোর গীতে হউক ধ্বনিত
সেবার বাসনা মার,
পিতার জ্বলন্ত দুর্নীতির ঘৃণা
অটলতা প্রতিজ্ঞার।
শুনে যেন কহে পরিচিত জন—
"তাঁদেরি তো সন্তান।"
সুধায় অপরে, "কোন প্রস্রবণে
এ করেছে সুধাপান?"

জগতের সেবার দিকে কবির দৃষ্টি জাগ্রৎ। সেই পরম দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

হে সুন্দর, তব অনুরাগে
দিব ঢেলে, যদি কাজে লাগে,
বিন্দু বিন্দু জীবনের লোহ।

Browning বলিয়াছেন—

All service ranks the same with God,
... ... there is no last, nor first.

এ কাজ ছোট, এ কাজ বড়—এভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্যই। আমাদের কবির 'আকাঙ্ক্ষা'তে এই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

যাই করি, কিছু যেন করি,
স্বপন না ভাল লাগে আর,
সাধিয়া একটী ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক্ জীবন আমার।

মানব! তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ কিছু করিবার জন্য—বৃথা কল্পনায় সময় যাপন করিবার জন্য নহে। তাই কবি আবার বলিতেছেন:—

শুধু আয়োজন, কাজ হ'ল কই?
নাহি প্রবাসের দিন দুই বই, জাগ না!
আশে পাশে চেয়ে ভেবনাকো আর,
কাজের মাঝারে লাগ এইবার, লাগ না!
ভাবনা গণনা দূর করে ফেল,
তুলিতে মাপিতে সব চলে গেল ক্ষমতা।
তীরে সন্তরণ শেখা নাহি হয়,
ছাড় আপনার প্রতি অতিশয় মমতা।
ঝাঁপ দিয়া পড়, ঠিক মধ্যস্রোতে
পাইবে নিস্তার বাধা বিঘ্ন হ'তে ভাসিবে।
পাছে মারা যাই বুঝি এই ভয়?
মারা তো যাবেই, না গেলেই নয়,
নূতন জীবন, শকতি অক্ষয়
তা' না হলে কেন আসিবে।

(৩)

কবি 'আধঘুমে' যাহা বলিয়াছেন, তাহা আধঘুমের কথা নহে,—তাহা অধ্যাত্মজগতের গভীর তত্ত্ব।

"একবার আমি যেন শুনেছিনু কার
আহ্বান সঙ্গীত—'এস'। খুলি গৃহদ্বার
দাঁড়ানু সোপানে যেই, জনকোলাহলে
ডুবে গেল ধ্বনি, তুলি হৃদয়ের তলে।
'যাই যাই'—ব্যাকুলতা, তাই পাতি কান,
বসে আছি, যদি ফিরে শুনি সেই গান,
তার দিক লক্ষ্য করি চিনে যাব পথ
তবেই সার্থক হবে সর্ব্ব মনোরথ।"

তাঁহারই বাণী শ্রবণ করিবার জন্য, তাঁহারই দর্শন লাভের জন্য কবি বসিয়া আছেন।

"বহুদিন গেল, কত কেহ এল,
অচেনা, অপরিচিত,
তোমার লাগিয়া, রয়েছি জাগিয়া
ওহে চিরপ্রত্যাশিত।
তুমি কত দূরে, কোন্ সৌরপুরে,
কোন্ দীর্ঘ পথ ধরি
আসিছ একেলা শূন্য সিন্ধুবেলা
আলোক-তরঙ্গে ভরি?"

যাঁহারা সত্যানুসন্ধায়ী, সত্য তাঁহাদিগের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন। প্রথম প্রথম বিজলীর ন্যায় দেখা দিয়া দূরে পলায়ন করিতে পারেন, কিন্তু কালে ধরা দিতেই হয়। কবি তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার জন্য আত্মা ব্যাকুল।

সেই অজানারে হবে জানিতে,
যে পলায় দূরে, তারে বিশ্ব ঘুরে
নিজপুরে হবে আনিতে।
দেখা দিয়া যায়, নাহি দেয় ধরা
বিজলির মত কভু সে প্রখরা।
স্বপনের মত বিহ্বলতা-ভরা,
খেলে এ হৃদয়খানিতে,
তারে ভাল ক'রে হবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া কেহ বলে 'তোমার দেখিবার ভুল হইয়াছে,' কেহ বলে 'তুমি পাগল হইয়াছ'—কিন্তু কবি এসব কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন—

নারি কা'রো কথা মানিতে
অজানারে হবে জানিতে।

তিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন, কিন্তু আবার কোথায় চলিয়া যান। তখন জগৎ অন্ধকার।

ঘনীভূত অন্ধকারে ফেলে
ওগো তুমি কোথা চলে গেলে,
আজ আমি কার পানে চাই?
প্রতিপদে পতনের ভয়
প্রতিক্ষণে জাগিছে সংশয়
কোথা যাই, কোথায় দাঁড়াই?

হেথা পথ অতীব বন্ধুর
বন্ধু মোর থাকিওনা দূর,
হস্ত তব দুর্ব্বলে বাড়াও,
যতক্ষণ থাকে অন্ধকার
থামায়ো'না তব গীতধার,
প্রীতি আন ভীতিরে তাড়াও।

মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় না; যাহা পায়, তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটে না।

যাহা পেতে চাই, যাহা হাতে পাই
সদা ভিন্ন এ উভয়,
বাঞ্ছিত প্রকৃত, স্বপ্ন জাগরণ
কোথা গেলে এক হয় ?

মানুষ অপূর্ণ ; এই অপূর্ণ 'আমি' লইয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু এই অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

"আমি এ অতৃপ্ত অপূর্ণ আমি
আমার সম্পূর্ণ আমারে চাই,
দেবের প্রসাদে যাহা হতে পারি
আজিও যে আমি আমাতে নাই।
অথবা রয়েছে আধ বর্ত্তমান
আলোক-অস্পৃষ্ট ছবির সমান,
বীজে যথা করে অঙ্কুর বাস
অঙ্কুরে নিদ্রিত পুষ্পের হাস।

জড়ের মাঝারে শকতি যেমন
দেহের মাঝারে প্রাণ,
তেমনি এ মোর মাঝারে তাহারে
নেহারি বর্ত্তমান।

যিনি এই প্রকার অনুভব করেন, তিনি নির্জ্জনে থাকিয়া স্বপ্ন-মূর্ত্তি আঁকিতে পারেন না। জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে করিতেই তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

"এই চির ব্যাকুল হৃদয়
এই নিত্য মিলনের সাধ,
যবে একীভূত হয় হয়,
ঈপ্সিত ও প্রকৃতে বিবাদ
তবে থাক্। তবে চল যাই।
এ জীবন মিথ্যা কভু নয়,
মাঝে মাঝে যদি দেখা পাই
থেকে থেকে ধরি ধরি হয়।
যতদিন চোখে দৃষ্টি থাকে,
যতদিন চলে এ চরণ,
অনুসরি চলিব তাঁহাকে
আত্মা যারে করেছে বরণ।"

কবি যাঁহাকে বরণ করিয়াছেন, আজ তাঁহার আহ্বান শুনা যাইতেছে।

আসিতে বলিলে যদি
এই আমি আসিতেছি তবে,
বল দেখি কোন্ দেশে
কতদুর যাইবার হবে ?

কবি সংসারের পরপারে যাইবার জন্যও প্রস্তুত। তাই বলিতেছেন

তোমার নিদেশ যাহা
তাহাই আমার মনোরথ ॥

সখা আজ প্রাণে উপস্থিত ; হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সে ভাষা কোথায়, যাহা দ্বারা সমুদয় হৃদয়খানা বুঝান যাইতে পারে ?

বুঝাইব কোন কথা দিয়া
এ আমার সমুদয় হিয়া
তোমারে যে করিয়াছি দান,
কেমনে গাহিব আমি গান ?

কোন্ ভাষা করিবে প্রকাশ
এ আমার আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
মিলন-মিলিত ব্যবধান,
কেমনে গাহিব আমি গান ?
এ জগতে আছে কোন লয়
ধ্বনিতে এ ব্যথা মধুময়
এই হাসি অশ্রুর সমান
কেমনে গাহিব আমি গান ?

মহাকবি সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন

The lunatic, the lover, the poet
Are of imagination all compact.

যাহারা পাগল, তাহারা একটী ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা কবি, তাঁহারাও ভাবাবিষ্ট ; কিন্তু এ ভাব উন্মার্গগামী নহে—ইহা সত্যসম্পর্কজনিত। এই দেহ-ভাণ্ড এত ভাব ধারণ করিতে পারে না। ভাবের তরঙ্গে দেহ বিচলিত হইয়া উঠে। লোকে বলে এ যে একটা পাগল। আমাদের কবিও মাঝে মাঝে এইরূপ পাগল হন।

"আমার কি হ'ল ভাই,
তোমাদের এমন কি হয় ?
জনতার প্রবাহ মাঝারে
ছেড়ে যদি দিই আপনারে,
তীরে কে সে দাঁড়াইয়া রয়
শঙ্কিত নয়নে ফিরে চাই।
* * * *
কেমন যে রীতি তার
সদা মোর সাথে সাথে ফিরে
আমি যেন নহি আপনার
প্রাণে মোর অশান্তি সদাই।"

আমরা চাই নিজের সুখ, সত্যস্বরূপ আমাদিগকে নিজের করিয়া লইতে চাহেন। অনেক সময় ইহা আমাদিগের প্রীতিকর হয়না, তাঁহার উপস্থিতি অসহ্য বলিয়া মনে হয়।

তার উপস্থিতি ভাই,
নিতান্ত অসহ্য হয় কভু,
বলি, তুমি কেন হে এমন
সাথে থাকি কর উৎপীড়ন ?
আমি মোর আপনার প্রভু
তোমার কি কাজ মোর ঠাঁই ?

অনেক সময় আমরা ইহা হইতে দূরে থাকিতে চাই কিন্তু

কি আমি বলিব ভাই,
সাধ্য নাহি যাই তারে ফেলে,
সেই তার আঁখি নির্নিমেষ
হৃদয়ে বিঁধায় তীক্ষ্ণ ক্লেশ,
আলিঙ্গিতে যাই বাহু মেলি
পড়ি তার চরণে লুটাই।

বুঝিয়া না বুঝি ভাই,
সে আমারে কি করিতে চায়,
একা পেলে আকাশের তলে
কানে প্রাণে কি যে কথা বলে
কি চেতনা প্রাণ মন ছায়—

অনুভবি কেবল জীবন,
অতীত সে হয় অন্তর্ধান,
নেহারি অনন্ত বর্ত্তমান,
অমৃতপূরিত ত্রিভুবন।

যখন সেই অন্তরাত্মা আমাদিগের প্রাণ অধিকার করিয়া বসেন, তখন অতীত ভবিষ্যতের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। আমরা সমুদয়ই তাঁহাতে বর্ত্তমান দেখি।

সে শুভ মুহূর্ত্তে ভাই,
আপনারে যাই আমি ভুলে,
স্বর্গপানে দুটি আঁখি তুলে
বিধাতার যেন দেখা পাই।

ইনি এত কাছে, অথচ সম্পূর্ণ মিলিতই বা হন না কেন, তিনি কেন ব্যবধান রাখেন?

কে মোরে বলিবে ভাই
কে সে জন সাথে ফিরে হেন,
সম্মুখে কি পার্শ্বে কেন রয়,
ছায়াহীন কায়া জ্যোতির্ম্ময়,
আমাতে মিলিত নহে কেন?

কবি ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

তুমি কহ, তোমারে সুধাই
ওহে মম নিত্য সহচর,
ওহে মোর ভৃত্য কিম্বা স্বামী
কেন মাঝে রাখ এ অন্তর,
ওগো মোর আমা-হতে-আমি।"

প্রকৃতপক্ষে সেই অন্তরাত্মাকেই বলিতে পারি—

ওগো মোর আমা-হতে-আমি।

আমি নিজে আমার তত আপনার নই, তিনি আমার যত আপনার।

(৪)

Browning (ব্রাউনিং) The Statue and the Bust নামক একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। একজন রমণী নববিবাহিতা হইলেন, কিন্তু তিনি অনুরক্তা হইলেন Great Duke Ferdinand-এর প্রতি; Ferdinandও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। উভয়েরই ইচ্ছা পলায়ন করিয়া পরস্পর মিলিত হন। ইঁহারা কাল-প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন, আজ না কাল, কাল না পরশু, এই ভাবে সময় চলিয়া গেল। ফল হইল এই—যে, ইঁহাদিগের প্রেমাগ্নি অল্পে অল্পে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। উভয়েই ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগের সে প্রেম কি স্বপ্ন?—কবি এজন্য ইঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। কবির এই ভাব অনেকে পছন্দ করেন না, তাই তিনি বলিতেছেন—

I hear your reproach—"But delay was best,
For their end was a Crime !—Oh, a crime wi.l do
As well, I reply, to serve for a test.
* * *
The true has no value beyond the sham.
Stake your counter as boldly every whit,
Venture as truly, use the same skill,
Do your best, whether winning or losing it,
If you chose to play,—is my principle
Let a man contend to the uttermost
For his life's set prize, be what it will

উদ্দেশ্য ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, যদি সঙ্কল্প করিয়া থাক তবে সেই পথে অগ্রসর হও।

আমাদিগের কবি ঠিক ইহার বিপরীত শিক্ষা দিতেছেন। দুইটী আত্মা প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একজন অপরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর বুঝিতে পারিলেন বড়ই ভুল হইয়াছে। একদিকে প্রেমের আকর্ষণ—অপর দিকে নীতির বন্ধন,—এখন যান কোন্ দিকে?

রীতির বন্ধন জীর্ণ ছিঁড়িতে কতক্ষণ?
তবুও ছিঁড়িতে সরেনা কেন মন।
কি জানি নীতির ডর কাহার ছুটে যায়
কর্ত্তব্য-কঠিন-বন্ধ কাহার টুটে যায়।

সুতরাং সংসারে মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু

যদি জগতের গ্রন্থে লেখাজোখা না থাকে,
ভুলায়ে বিপথে যদি কাহারেও না ডাকে,
এ সুখ না কাড়ে যদি কাহারো সুখভাগ,
এ প্রেম হৃদয়ে কারো না রেখে যায় দাগ,
ধরণীর রীতি নীতি অক্ষত রাখি যায়,
তবে গো মিলনসুখ চাহি এ ধরায়।

কিন্তু ইহা ত সম্ভব নয়, সংসারে মিলিত হইলে ত কুফল ফলিবেই, তাই ইনি এক দিনের ছুটী চাহিতেছেন—

যদি একদিন শুধু জীবনে ছুটী পাই,
জগতের সীমাশেষে দু'জনে মিলে যাই;
বিধাতার আঁখি ছাড়া দ্বিতীয় নাহি কেহ,
সন্ধ্যারূপে ঘিরে রবে দুজনে তাঁর স্নেহ;
জানিব দুজনে দোঁহে, জগৎ কিছু নয়,
কিসের বা অভিমান সন্দেহ লাজ ভয়?
মাঝখানে কিছু নাই, মিলিত হিয়া দুটি,
যত আবরণ বাঁধ সহসা গেছে টুটি;
সেথায় দু'জনে দোঁহে খুলিয়া দিব প্রাণ
চিরতরে ভুলভ্রান্তি করিতে অবসান।

কিন্তু হায়! হায়! এযে কল্পনা।

সে দিন হবে না হায়; জীবনে নাই ছুটী
নিতান্তই পর হেথা আত্মীয় মোরা দুটি।

কর্ত্তব্য এবং লোকশিক্ষার দিকে আমাদিগের কবির দৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগ্রৎ। 'আলো ও ছায়া'তেও ঐ ভাব। শ্বেতকেতু পুণ্ডরীককে বলিতেছেন:—

যতনে সর্ব্ববিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভাবলে অতি অল্পকালে
সকলি শিখিলি; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে,
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহে রে দুষ্কর;
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতি ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রতিকর্ম্মে, প্রতিবাক্যে, প্রতিপাদক্ষেপে
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন
সর্ব্বলোক। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

প্রেম যদি কর্ত্তব্যের অন্তরায় হয়, তবে সে প্রেমের বন্ধনও ছিন্ন করিতে হইবে। 'কর্ত্তব্যের অন্তরায়' নামক কবিতাতে কবি এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

কে তুমি দাঁড়ায়ে কর্ত্তব্যের পথে,
সময় হরিছ মোর,
কে তুমি আমার জীবন ঘিরিয়া
জড়ালে স্নেহের ডোর,
চির বিশ্রামহীন নয়নে আমার
আনিছ ঘুমের ঘোর?

দুনয়ন হ'তে দূরস্থ আলোক
কেন কর অন্তরাল?
আমার রয়েছে কঠোর সাধনা,
ফেলনা মায়ার জাল।

তোমারে দেখিলে গত অনাগত
যাই একেবারে ভুলে,
মুগ্ধ হিয়া মম চাহে লুটাইতে
তোমার চরণমূলে।

প্রেম যখন কর্ত্তব্যের অন্তরায় হইতেছে, তখন প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য শেষ কথা এই :—

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী
তোমার প্রণয় ক্রূর,
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,
লয়ে যাবে কত দূর?
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,
চলে যাও হে নিঠুর!"

জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইতে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে এবং এজন্য আবার নূতন কর্ত্তব্যের ভারও বহন করিতে হয়। এই সময়ে অনেকে ইতস্ততঃ করেন—মনে ভাবেন এপথে থাকি, না ফিরিয়া যাই। কবি বলিতেছেন :—

"যে দিকে চলিয়াছিলে, চল সেই দিক,
ইতস্ততঃ ক'র'না আবার,
ভুল যদি করে থাক, ভুলে থাকা ঠিক,
ভুল হতে ভুলেতে যাবার
নাহি কাজ। * *
* * ভুলে একে একে
কত বর্ষ হয়েছে তো পার,
এ যাত্রার আর যত ভুলচুক থেকে
এক ভুল করুক উদ্ধার॥

'পরীক্ষা' নামক কবিতাতে কবি একজন পতিব্রতা নারীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

কহিছে কোবিদ—ভুজঙ্গী রমণী
প্রত্যয় কর'না তায়,
সুলভ প্রণয় বস্ত্র অলঙ্কারে
তার কাছে কেনা যায়।

ইহা শুনিয়া রাজকুমার ভাবিতে লাগিলেন—

আভরণহীনা বাসে না কি ভাল
দরিদ্র পতিরে তার?
দরিদ্র হইয়া আপনি হেরিব
রমণীর ব্যবহার।"

রাজপুত্র কৃষক সাজিলেন, কৃষকের কন্যা বিবাহ করিলেন। একদিন পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কহে একদিন—"কত ভালবাস,
বল, প্রিয়ে, সত্য করে"—
"কত ভালবাসি?" উত্তরিল বালা,
"যতখানি হৃদে ধরে।"

"রতন কাঞ্চন, মাণিক মুক্তা
ইহাদের কার সম?"
"এদের অভাব বুঝি নাই কভু,
মাণিক মৃত্তিকা মম।"

"আমার অভাব বলতো কেমন?"
"ওকথা সুধাও কেন?
তোমার অভাব, সুখের অভাব,
প্রাণের অভাব যেন।"

"বিধবা হইলে কি করিবে ধনি?
ক্ষীণ-আয়ুঃ তব স্বামী—"
"ওকি কথা প্রিয়?"—"অতি সত্য কথা।"
"হোক,—সাথী হব আমি।"

পরদিন রাজকুমার স্ত্রীর নিকট দশদিনের ছুটী লইয়া পিতা-মাতাকে দেখিবার জন্য রাজধানীতে গমন করিলেন। দশ মাস পর সেই নারী এক চিঠি পাইলেন। ইহাতে লেখা ছিল

"মরেছে কৃষক, যুবরাজ-প্রিয়া
তুমি এবে।"

রমণী এচিঠির মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাজকুমারের দাসদাসীগণ তাহাকে লইতে আসিয়াছে। তাহারা তাহাকে রাজকুলবধূ বলিয়াই জানিত। রমণী কৃষক স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিল—তাহারা কিছুই বুঝিল না।

রাজকুলবধূ তুমি বরাননে,
আজ বাদে রাণী হবে,
কৃষকের কথা কি কহিছ, ধনি?
বিস্ময়ে কহিল সবে।

কি কথার পথে দাঁড়াইল ক্রোধ
রাঙ্গিয়া উঠিল মুখ,
চাহি চারিদিক্ অমনি আবার
কাঁপিতে লাগিল বুক।

"মরেছে কৃষক? নিদ্রিত কি আমি?
নহে কি এ দুঃস্বপন?
পীড়িত মনের বিকৃত কল্পনা?
বিকল হইল মন?"

................."এ নহে স্বপন,
যুবরাজ দুরাচার
বধিয়া কৃষকে, অভিলাষী এবে
লভিতে বনিতা তার।

পাপিষ্ঠের তোরা দাস দাসী যত
ফিরে যা প্রভুর কাছে,
অসহায়া যারে ভেবেছিস্ তার
মরণ সহায় আছে।

অই দেখ চেয়ে কাহার পাদুকা
রেখেছি যতন করে',
পতির উদ্দেশে উঠিব চিতায়
ও পাদুকা বুকে ধরে।"

বাক্য কার্য্যেই পরিণত হইল। (Mrs. Browning) মিসেস্ ব্রাউনিংএর Rhyme of the Duchess May নামক একটি অতি সুন্দর কবিতা আছে। 'পরীক্ষা' ইহার অনুরূপ না হইলেও উভয়েরই আদর্শ এক। উভয়েরই বর্ণনার বিষয়—পাতিব্রত্য—স্বামীর প্রতি অনুরাগ।

Lady May (লেডি মে) Lord Leighকে বিবাহ না করিয়া (Sir Guy) সার গাইকে বিবাহ করিয়াছেন। লেডি মেকে লাভ করিবার জন্য লর্ড লে সার গাইয়ের দুর্গ অবরোধ করিলেন। যখন দেখিলেন রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গের উচ্চতম স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে পতিত হইবেন। লেডি মে ইহা জানিতে পারিয়া স্থির করিলেন তিনিও সহমৃতা হইবেন। এই সংকল্প করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামী বলিলেন

"Get thee in, thou soft ladie !
here is never a place for thee !"
Braid thy hair and clasp thy gown,
that thy beauty in its moan
May find grace with Leigh of Leigh."

নিষ্ঠুর আঘাতে লেডি মে মর্ম্মাহত হইলেন কিন্তু তিনি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বামীকে কি গভীর প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। তিনি প্রেম দ্বারা স্বামীকে পরাস্ত করিলেন, সহমৃতা হইলেন।

স্ত্রী স্বামীকে কি প্রকার ভালবাসিতে পারে, উভয় কবিতাতেই তাহা অঙ্কিত হইয়াছে। উভয় কবিতাই স্বাভাবিক। মিসেস্ ব্রাউনিং যাহা চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের বেশ উপযোগী, আর আমাদের কবি যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা খাঁটী স্বদেশী।

'প্রতিভার প্রতি প্রেম' নামক কবিতাতেও নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত। পত্নী প্রতিভাশালী স্বামীকে বলিতেছেন :—

"তুমি আলোকের মালা, তুমি সকলের তরে ;
আমি ক্ষুদ্র শুধু আপনার,
সকলে পশ্চাতে রাখি, দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব
ধন্য হব, ভুল নাই তার ;
তুমি তো পড়িবে ধরা, দীর্ঘ তব করজাল,
লোকচক্ষু চেয়ে রবে যত,
আমি যে উঠিব জাগি নির্ম্মল হৃদয়ে তব
এক খণ্ড আঁধারের মত।
সমুজ্জ্বল মধ্য তব আমি রাহু হেয়ে রব
আমি ক্ষুদ্র, ভূমা ধরাতল,
সকলের আলোভাগ এতখানি আগুলিয়া
জন্ম তব করিব বিফল ?
তার চেয়ে দূরে যাই, সকলের চেয়ে দূর,
মুক্ত হোক্ তব রশ্মিজাল,
তোমার আমার মাঝে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হোক্
দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ভেদ্য অন্তরাল।
কাছ থেকে দূরে গিয়া বাড়িবে আঁধার মোর,
তুমি তত হইবে উজ্জ্বল,
সবার পশ্চাতে থাকি শুনিব তোমার জয়
সম্মুখের হর্ষ-কোলাহল।

'নিরুপায়' নামক আর একটী কবিতা। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, কার্য্যে ও বাক্যে ব্যবহার বড়ই রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ। কিন্তু স্ত্রী বলিতেছেন—

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে, মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি, তুমি প্রভু ; মন, মান মম
সকলি তোমার হাতে ; দল যদি হায়
এই রমণীর মন, তাহা প্রিয়তম,
তোমারি চরণপ্রান্তে লুটাবে ধরায়।
করি যদি অপরাধ, তার যথোচিত
বিধান তোমার কাছে ; তোমার উপরে
কেহ নাই, যার দ্বারে হব উপনীত
তব অবিচার হতে বিচারের তরে।

অবোধ নারী জানে না প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে মানুষ কতকি বলিয়া থাকে। সেই প্রেমের আজ কত পরিবর্ত্তন। এই-সব কথা মনে করিয়া স্ত্রী আজ দুঃখ করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রেম অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। তাই সে বলিতেছে—

আমি বারমাস
তোমার পিঞ্জরে পাখী, ওহে মহাভাগ।

'পঙ্ক ও পঙ্কজ' নামক কবিতাও অতি সুন্দর। পঙ্ক হইতে পঙ্কজের জন্ম, পঙ্কেই ইহার মূল ; উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ—পার্থক্যও কত। উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়া জননী বলিতেছেন—

জীবনের তব প্রথম অঙ্কুর উঠেছে আমারি দেহে,
যতদিন আছ, জীবনের মূল গুপ্ত এ আঁধার গেহে।
যত দূরে যাও আলোক-সন্ধানে, বঞ্চিত হবেনা স্নেহে।
তোমার সৌন্দর্য্য যবে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে থরে থর,
তোমার সৌরভ ছুটিছে বাতাসে, দূর হতে দূরতর
শিকড় ক'খানি বুকে ধরে আমি পুলকিত কলেবর।
তোমারি গৌরব, আঁধার ভেদিয়া উঠেছে আলোর দেশ,
মাটীতে জনমি, বিমল শরীরে রাখনি মাটীর লেশ,—
তোমার গৌরব, আমার গৌরব ভাবি আমি নির্ব্বিশেষ।

'হিসাব' নামক কবিতাতে প্রেমের লাভ লোকসানের হিসাব। প্রেমিক যুবক দরিদ্রের সন্তান, আর কুমারী ধনীর পুত্রী। 'প্রেমের লাগিয়া কেহ প্রেম লয়না'—একথা সে যুবক জানিত না। কুমারী সেই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিল। যুবক সেই সমুদয় কথার উল্লেখ করিতেছেন—

তুমি বুঝাইলে আমার হয়েছে হিসাবে দারুণ ভ্রম,
প্রাচীন প্রাচীর উল্লঙ্ঘিতে নাহি প্রণয়ের পরাক্রম।
কুসুম-কাননে লতার মণ্ডপ চন্দ্রালোকে শোভা ধরে,
দুদণ্ড সেথায় বসি ঘরে যায়, কে সেথা বসতি করে ?
কুসুমের মধু মধু বটে, নহে জীবনের অন্ন পান,
নিতান্ত বিস্বাদ অমিশ্র লবণ, করে অন্যে স্বাদ-দান ;
তুমি বুঝাইলে, প্রণয় তেমন, দিতে শোভা, দিতে স্বাদ,
শুধু প্রেম লাগি করা ভাল নয় এত বাদ বিসম্বাদ।

যত তৃষ্ণা ক্ষুধা আছে মানবের এক প্রেমে নাহি যায়,
কোথা রবে সুখ, স্বজনেরা যদি মুখ তুলে নাহি চায়?
নব পরিবার গঠনে উপায়, প্রেম ত উদ্দেশ্য নয়,
নূতন যৌবনে, কবিত্বে, স্বপনে একে আর মনে হয়।
যৌবন হারালে, কভু না ফুরাতে, মায়া মোহ ভেঙ্গে যায়,
বুভুক্ষু মানব কহে—"এই ভুল না যদি হইত হায়!"
কত অঙ্ক কসি, ভাবিয়া গণিয়া, হৃদয় করিয়া রোধ,
আমারে তাড়ালে লুব্ধ ভিক্ষু সম, তাড়ালে জন্মের শোধ।

যুবকের নিকট এখন সংসার শ্মশানস্বরূপ। তাই সে বলিতেছে :—

আমার শুকাল কুসুম-কানন, ফুরাল সকল সুধা।
জীবনের স্বাদ কিসে ধুয়ে গেল, কর্ম্মের আনন্দসুধা।
সে দিন হইতে বিদেশে প্রবাসে করি আয়ু অতিপাত,
ধনের আকর চরণের তলে, চলিতে চাহে না হাত।

কিন্তু সেই রমণীর দিনও কি সুখে কাটিয়াছে? অনেকেই ত ধন কুলমান তাহার চরণে সমর্পণ করিয়াছে, তবে কেন কাহাকেও পাণিদান সে করে নাই?

জীবনের ভোজে লবণ নির্ম্মল, লয়ে সুমধুর মধু
আসেনি কি তবে তাহাদের কেহ তোমারে করিতে বধূ?
এত দিনে তবে বুঝেছ কি মনে, আমি যা বুঝেছি আগে,
এ লবণ বিনা বিস্বাদ জীবন, কোন কাজে নাহি লাগে?
বুঝেছ কি মনে এ নহে সুলভ, অমাশুল না বিকায়,
যাহারে তাহারে যে সে বেচিবারে অধিকার নাহি পায়?
বুঝেছ, লবণ কারো গৃহে যদি থাকে শত মণ ভার
অতিরিক্ত পড়ি দৈনিক ব্যঞ্জন করে না বিস্বাদ তার?
বেশী ফুল ফোটে বাগানে তোমার, তাহাতে কাহার ক্ষতি,
অতিশয় ধন পারে না বহিতে, বিতরিতে ধনপতি?
বেশী প্রেম হ'লে তাতে নাহি ভয়, না থাকিলে বৃথা সব,
সুখের লাগিয়া অন্ত আয়োজন, ধন মান বৈভব।
ধন ল'য়ে যবে আসে ধনেশ্বর, কুলীন কুলের মান,
তাই অনাদরে কর প্রত্যাখ্যান জীবনের অন্নপান।
প্রেম চাহি সাথে লবণের মাপে, তাহাদের নাহি তাও,
আশ্চর্য্য ব্যাপার, সেথা তাহা চাও, যেথা যাহা নাহি পাও!

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যুবক বলিতেছেন :—

তুমি লক্ষ্মীরূপা গৃহে দাঁড়াইলে, চরণ-পরশ-ভরে
ধরণী ফাটিয়া ফুটিয়া উঠিত ঐশ্বর্য্য দীনের ঘরে;
কুলীন না হই, আমা হ'তে হত প্রতিষ্ঠিত মহাকুল,
আপনি ভুলিয়া হায়রে আমারে হিসাবে করালে ভুল।

তবে কি সে আবার পাণিপ্রার্থী হইবে? শুভক্ষণ বহিয়া গিয়াছে, যৌবনের বল আর নাই, প্রেমের উচ্ছ্বাস আছে কি? না, তাহারও স্থিরতা নাই। তাই সে স্থির করিল "আর নয়, আর নয়।"

'হিসাব' পাঠ করিলে স্বভাবতঃই Barret Browningএর Courtship of Lady Geraldineএর কথা মনে পড়ে। Bertram একজন কবি। উচ্চবংশে তাহার জন্ম নয় এবং সে নিজে দরিদ্র। তবুও সে Lady Geraldineকে ভালবাসিত। কিন্তু সে কখন মনেও স্থান দেয় নাই যে তাঁহাকে লাভ করিবে। একদিন একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে হইল

"Whom I marry, shall be noble,
Ay, and wealthy. I shall never
blush to think how he was born"

Bertram এই কথা শুনিতে পাইল। সে পাগল হইয়া উঠিল! সে যাহা বলিল তাহা তাহার প্রেমেরই উপযুক্ত। তাহার মধ্যে একটী কথা এই —

If my spirit were less earthy
If its instruments were gifted with more vibrant
silver strings
I would kneel down where I stand,
and say—"Behold me! I am worthy
Of thy loving, for I love thee
I am worthy as a king".

সংসারে সব সময়ে মিলন সম্ভব নয়, হিসাবের কবিও এই প্রকার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু Lady Geraldine কবি Bertramএর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। Bertramকে সম্বোধন করিয়া Lady বলিতেছেন

"It shall be as I have sworn!
Very rich he is in virtues,—
very noble—noble, certes;
And I shall not blush in knowing,
that men call him lowly born!"

হিসাবে এখানেও প্রথমে ভুল হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে নরনারীর প্রেম সংক্রান্ত কয়েকটী অতি সুন্দর কবিতা আছে। লুব্ধা, শৃঙ্খলিতা, বিস্মিতা ভিখারিণী, ক'রনা জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি কবিতা মনোমোহকর ও হৃদয়স্পর্শী। হৃতাভিজ্ঞান, পদধ্বনি ইত্যাদি কবিতাতে বিশেষ বিশেষত্ব আছে।

আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলেই নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' পাঠ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। কাব্যরসগ্রাহী পাঠকগণও যে পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুস্তকের* ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। বড়ই দুঃখের বিষয় এই প্রকার গ্রন্থে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বর্দ্ধিপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে

* মাল্য ও নির্ম্মাল্য—'আলো ও ছায়া'-প্রণেতৃ-প্রণীত। পৃঃ ১৬০ মূল্য ১৷৷০। প্রাপ্তির স্থল :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়।]

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রনাথ শয্যাত্যাগ করিয়াই গৃহসংলগ্ন উদ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং কপি, লাউ, শাক, বেগুন, কুমড়ো, প্রভৃতি বহুবিধ আনাজ ও শাকসব্জী তুলিয়া একজন ভৃত্য দ্বারা তৎসমুদায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। বেলা দশটার পর এগারটার মধ্যে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে প্রস্তুত হইবার জন্য ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথায় কেবল বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "ক্ষেত্তর, তুমি যে বড় জ্বালাতন করলে! আমি দেখ্‌ছি, তোমার এখানে এসে আমি ভারি অন্যায় করেছি। ওসব আশীর্ব্বাদ টাশীর্ব্বাদে আমি নাই। আমি তোমার ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী যাব না। তুমি যা হয়, করগে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে হ'বে না। তুমি সেখানে খেতে যাবে তো? কাল যে বড় সর্‌ফরাজী ক'রে ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে? আজ পেছ-পা হ'লে চল্‌বে কেন? ওঠ, ওঠ, স্নান করবে চল।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ীতে খেতে যাবার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আশীর্ব্বাদের কথা আমায় ব'লো না। মেয়ে আমি দেখেছি। আশীর্ব্বাদের কাজটা অপরকে দিয়ে সেরে নাও। বুঝ্‌লে?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বুঝ্‌লাম। আচ্ছা, তাই হ'বে। তুমি তো এখন স্নান ক'রে নাও; বেলা হ'য়ে এল যে!"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা ঠেলিতে না পারিয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে বাহিরে আসিয়া দেখেন, ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ্দারকে দিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ভাল সন্দেশ ও মিষ্টান্ন, মাধব দত্ত মহাশয়ের পুষ্করিণী হইতে দুইটা বড় রোহিত মৎস্য এবং নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে চমৎকার দধি আনাইয়াছেন। সতীশ এই সমস্ত দেখিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, এসব কি হে? তুমি তো ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি। তুমি ও তোমার গৃহিণীটি একদিনের মধ্যেই ভালমানুষকেও পাগল ক'রে তুল্‌তে পার, দেখ্‌ছি!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি আর এ-সমস্ত দেখ্‌ছ কেন? চোখ বুজে থাক। শুভকার্য্যের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু করা যেতে পারে, তা করা উচিত। শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ করতে যেতে নাই।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সেই-সমস্ত দ্রব্য সহ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। মনোরমা অল্পক্ষণ মধ্যেই তৎসমুদায় সাজাইয়া গোছাইয়া দাসীদের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মনোরমা তাঁহার নিজের একখানি নূতন রেশমী সাড়ীও পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা সাড়ে নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ অনিচ্ছুক সতীশচন্দ্রকে কষ্টে গৃহ হইতে বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, গত পরশু আমি তোমার এখানে না এলে খুব ভালই হ'ত। এ যে কি হচ্ছে, আর আমি কি যে করছি, তা ঠিক্ যেন বুঝ্‌তে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যবিধাতার হাতে আমি যেন একটা ক্রীড়ার পুতুলের মত হয়েছি। কেন, ভাই, তোমরা আমাকে ফ্যাসাদে ফেল্‌ছ। আমি বেশ আছি। আচ্ছা, আমি যদি ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী না যাই, তো কি হয়?" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র পথের মাঝে স্থাণুবৎ সহসা অচল হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আবার তুমি পাগ্‌লামী আরম্ভ করলে? ভদ্রলোক তোমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন। তুমি তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছ। তাঁর একটী অনূঢ়া কন্যা আছে! কন্যাটি বয়ঃস্থা ও পরমসুন্দরী, তা তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ। তুমি অবিবাহিত এবং কন্যাটিও সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্যা। কিন্তু সে

দরিদ্র-কন্যা। সে যে তোমার সহধর্ম্মিণী হবে, এ দুরাশা তার বা তার পিতার নাই। তুমি যদি দয়া ক'রে তা'কে পত্নীত্বে গ্রহণ কর, তা হ'লে, তার ও তার পিতার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হ'বে। কিন্তু তোমার যদি আপত্তি থাকে, তা হ'লে জোর ক'রে কি কেউ তোমার বিয়ে দিতে পারে?"

ক্ষেত্রনাথের কণ্ঠস্বর কিছু গম্ভীর দেখিয়া সতীশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "চল, চল, আর অত বক্তৃতায় কাজ নাই। 'দরিদ্র-কন্যা' আর 'দয়া'র অত ছড়াছড়িতে প্রয়োজন নাই! কিন্তু তুমি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। যে কখনও ঘাড়ে জোয়াল নেয় নাই, তার ঘাড়ে প্রথম জোয়াল চাপাবার সময় সে যদি একটু অসহিষ্ণু হয়, তা'তে কি তার দোষ দাও!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমি যে তোমার অবস্থা না বুঝেছি, তা নয়। কিন্তু সকলেরই ঐ দশা। কালক্রমে সকলেরই ঘাড়ে জোয়াল স'য়ে যায়।"

উভয় বন্ধুর মধ্যে আর অধিক কথা হইল না। সতীশচন্দ্র কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনের পূর্ব্ব স্বাভাবিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মন হইতে সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব অনেকটা তিরোহিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রজারা উভয়কে দেখিয়া ঘাড় নোয়াইয়া করজোড়ে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের নিকটে আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে সতীশচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ইনি আমার বন্ধু; পুরুলিয়ার ডেপুটী বাবু; এখানে বেড়াতে এসেছেন। এখন ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের বাড়ী যাচ্ছি।" "ডেপুটী বাবু"র নাম শুনিয়াই সকলে তফাৎ হইতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, দেখ, ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করায় কোনও বাধা হ'বে না, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি;—বিশেষতঃ যখন তাঁদের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমাদের আদান প্রদান হ'য়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে; আমাদের জ্ঞাতিরা আছেন, আর পিশ্‌তুতো ভাইও কল্‌কাতায় আছেন। তাঁদের একটা কথা না জানিয়ে হঠাৎ আশীর্ব্বাদ করাটা কি ভাল হচ্ছে? এত তাড়াতাড়ি না ক'রে, দু'দিন পরে এই কাজটি কর্‌লে ভাল হ'ত না কি? তুমি কি বল? আমার মনে যা হচ্ছে, তাই তোমায় বল্‌ছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক্। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ। তোমার জ্ঞাতিরা বা তোমার পিশ্‌তুতো ভাই কি এত দূরে তোমার জন্য মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বেন? সকলেই আপনার আপনার কাজে ব্যস্ত। নিকট হ'লেও, না হয়, এক দিনের জন্য তাঁরা সময় ক'রে আস্‌তেন। কিন্তু এত দূরে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তার পর, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তুমি মোটে বিয়েই কর্‌বে না। এখন তোমার বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে। এই কথা তাঁরা যদি শোনেন, তাহ'লে এখনই বল্‌বেন 'যদি বিয়ে কর্‌বে, তো দেশে কর; কত ভাল ঘরের ভাল মেয়ে পাবে। সাঁওতাল-কুড়্মীর দেশে বিয়ে কর্‌বে কেন?' এইরূপ নানা আপত্তি তুলে একটা গোল বাঁধাবেন। আমার কথা হচ্ছে এই যে, ভটাচার্য্য মশাই-য়ের ঘর যদি তোমাদের করণীয় ঘর হয়, আর সৌদামিনীকে দেখে যদি তোমার মনে হয়ে থাকে যে, তাকে তোমার সহধর্ম্মিণী ক'রে তুমি সুখী হবে, তা হ'লে, এখন তোমার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে কোনও কথা না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি আজ আশীর্ব্বাদ করে যাও, তার পর, ভট্টাচার্য্য মশাইদের পরিচয় জানিয়ে সকল কথা তাঁদের বল। তা হ'লে, আর কেউ কোনও আপত্তি কর্‌বেন না। বিবাহের সময় তাঁদের যে এখানে আস্‌তে হ'বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর কোনও কথা জানাবার প্রয়োজন দেখি না। আমার বুদ্ধিতে যা আস্‌ছে, তা তোমাকে বল্‌লাম। এখন তুমি যেমন বুঝ, তেমনই কর।"

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তোমার কথাই ঠিক্। আজ আশীর্ব্বাদটা হ'য়ে যাক্, পরে সব কথা তাঁদের জানাব। তবে আমি নিজে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো না। অপরকে দিয়ে সে কাজটা সেরে ফেল।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রদ্বয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আনন্দাশ্রুনয়নে ও বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামবাসী আরও কতিপয় বয়স্ক ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিত সতীশচন্দ্র পরিচিত হইলেন। উপস্থিত সকলেই সতীশচন্দ্রের রূপ, গুণ, বিদ্যা ও উচ্চপদের কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের মুখে বাবাজীবনের পরিচয় পেয়ে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হয়েছি, তা আমি মুখে প্রকাশ ক'রে বল্‌তে অক্ষম। আমরা দেশ ছেড়ে এই কুস্থানে প'ড়ে আছি। এখানে আপনাদের মতন মহৎ লোকের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আজ বাবাজীবনের দর্শন লাভ ক'রে আমরা আপনাদিগকে যথার্থই সৌভাগ্যবান্ মনে করছি। তার পর, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাবাজীবনের সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের সম্বন্ধ যদি স্থাপিত হয়, তা হ'লে, শুধু ভট্টাচার্য্য মশাই কেন, আমাদের সকলেরই যে পরম সৌভাগ্য হ'বে, তার আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের কন্যা যেমন সুন্দরী, সুশীলা ও গুণবতী, আপনিও তেমনি তা'র যোগ্য পাত্র। সৌভাগ্যের কথা আমি একমুখে আর কি বল্‌ব? বিধাতার সমস্ত বিধানই অপূর্ব্ব, এবং মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিকে ক্ষেত্রনাথ একান্তে লইয়া গিয়া সতীশচন্দ্রের মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা অবগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন "আমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ কর্‌বো; সতীশ বাবুও সৌদামিনীকে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। তা'তে তাঁর আপত্তি কি হ'তে পারে?"

সৌদামিনী অন্তঃপুরে তাহাদের মাটি-কোঠার "পিঁড়া" বা বারাণ্ডায় শুদ্ধস্নাতা হইয়া এবং নববস্ত্র পরিধান ও নবমাল্য ধারণ করিয়া একটী মাদুরের উপর সসঙ্কোচে বসিয়া ছিল। পার্শ্বে প্রতিবেশিনী কতিপয় ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং মহিলা দণ্ডায়মান ছিলেন। এমন সময়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বহির্ব্বাটী হইতে সকলে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সতীশচন্দ্র এবং ক্ষেত্রনাথও তথায় উপস্থিত হইলেন। সতীশকে দেখিয়া মহিলারা ও বালিকারা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কন্যার মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তৎপরে, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রদ্বয় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে সকলের অনুরোধে সতীশচন্দ্রকেও অগ্রসর হইতে হইল। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ সকলের অলক্ষিতে তাঁহার হস্তে দুইটী গিনি দিয়া তাহা সৌদামিনীর হস্তে প্রদান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। সতীশচন্দ্র লজ্জাবনতমুখী সৌদামিনীর মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সৌদামিনী যেরূপ অন্যান্য গুরুজনকে, সেইরূপ তাঁহাকেও প্রণাম করিল। তৎপরে সতীশচন্দ্র তাহার হস্তে দুইটী গিনি প্রদান করিলেন। ইহার পর, ব্রাহ্মণ মহিলারা একে একে আসিয়া ধান্যদূর্ব্বা দ্বারা সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, পুরুষেরা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত একত্র বসিয়া সতীশচন্দ্র আহার করিলেন। ক্ষেত্রনাথ এবং তাঁহার পুত্রেরাও মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ যাইবার সময় একবার সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "সদু, তোমার বর আমাদের বাটীতে আছেন ব'লে যেন আমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক'র না। তা' হ'লে তোমার দিদি ভয়ানক রাগ কর্‌বেন, তা যেন মনে থাকে।"

সৌদামিনী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিল।

সৌদামিনীর পিসীমাতা একবার সতীশচন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। যখন তিনি উত্তরপাড়া হইতে চলিয়া আসেন, তখন সতীশ বালক ছিলেন। সতীশ তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও, তিনি সকলের কথা সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতৃহীনা সৌদামিনীর কথা পাড়িয়া, তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার রক্ষা ও পালনের ভার সতীশকে অর্পণ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কাছারী-বাড়ী"-অভিমুখে যাইতে যাইতে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, ক্ষেত্তর, আশীর্ব্বাদটা আমি কি ক'রে করব, এই চিন্তায় প্রথমে সত্য সত্যই বড় বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু যা হোক্, কাজটা কোনও রকমে সেরে ফেলা গেল। আমি মনে করেছিলাম, এসব অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেরই একটা সার্থকতা আছে। আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে সৌদামিনীকে আমি যতটা আপনার মনে করি নাই, এখন তা'র চেয়ে ঢের বেশী আপনার মনে হ'চ্ছে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি বলিলেন "তুমি যে আশীর্ব্বাদ করার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করেছ, তা'তে আমি সুখী হলাম। আজ সকালে তোমায় নিয়ে আমিও কি কম ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম? আশীর্ব্বাদ-তত্ত্বটি আমি যে রকম বুঝেছি, তোমায় তার একটু আভাস দিচ্ছি। তুমিই কাল বল্‌ছিলে, আমাদের দেশে পূর্ব্বরাগের স্থান নাই; তোমার কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। যুবক যুবতীর পূর্ব্বরাগ আমাদের বিবাহের মূল ভিত্তি নয়। দাম্পত্যজীবনের সুখ ও সফলতা যে প্রেমেরই উপর নির্ভর করে, তা সত্য বটে; কিন্তু এই প্রেমটিকে সংযম ও ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তবে তাহা পবিত্র হয়। আমাদের বিবাহ, আমাদের প্রেম, আমাদের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বাগ্‌দান, বিবাহ, দ্বিরাগমন, ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই ধর্ম্মকে বর্জ্জন করা চলে না। আমাদের ভালবাসায় সংযম, আমাদের আহারে ও বিহারে সংযম। সংযম ছাড়া আমাদের কোনও ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নাই। আমাদের সমাজে পূর্ব্বরাগের অবসর নাই বটে; কিন্তু কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে মানবের স্বাভাবিক প্রেমকে স্ফুরিত, প্রবাহিত, মার্জ্জিত ও সংযত করা হয়। আশীর্ব্বাদের ব্যাপারে বরকন্যার পরস্পরে মিলিত হবার প্রথা নাই। তার কারণ এই যে, যে পরিবারের সহিত যার সম্বন্ধ হ'চ্ছে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে সেই পরিবারের প্রতি তার একটা অনুরাগের সঞ্চার করা হয়। আগে পারিবারিক মিলন, তার পর ব্যক্তিত্বের—অর্থাৎ বরকন্যার মিলন; কেননা বরকন্যা স্ব স্ব পরিবারের অঙ্গীভূত, এবং পারিবারিক অস্তিত্ব ব্যতীত তখন তা'দের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। আশীর্ব্বাদ বা বাগ্‌দানের পর বরকন্যার পরস্পরের প্রতি যে একটা অনুরাগ হয়, সে অনুরাগে কোনও বস্তুতন্ত্রতা থাকে না; সেটা অনেকটা তাদের কল্পনার খেলা। বিবাহের সময় বরকন্যা যখন মিলিত হয়, তখন তা'দের অনুরাগে বস্তুতন্ত্রতা আসে। সেই সময়ে, যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তদ্দ্বারা সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পুষ্ট হয়। দ্বিরাগমন, প্রভৃতি ব্যাপারে সেই বস্তুতন্ত্রতা আরও পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে, এবং দাম্পত্য প্রেমও সংযত ও পবিত্র হয়। আজ সৌদামিনীর আশীর্ব্বাদ ব্যাপারে তোমার উপস্থিত থাকবার কথা নয়; তোমাদের পারিবারিক কর্ত্তারই উপস্থিত থাক্‌বার কথা। তুমি যে তাঁর অনুপস্থিতির ওজর ক'রে আজ আশীর্ব্বাদ বন্ধ রাখ্‌বার প্রস্তাব করেছিলে, সে প্রস্তাব উচিতই হয়েছিল। কিন্তু বিশিষ্ট অবস্থায় বিশিষ্ট বিধি অবলম্বনীয়। আজ তুমি সৌদামিনীর বররূপে তাকে দেখা দাও নাই; তোমাদের বংশের প্রতিনিধিরূপে তুমি আজ তার সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলে। কিন্তু তা হ'লেও, তোমাতেই বরত্ব ও তোমাদের বংশের প্রতিনিধিত্ব একাধারে বিদ্যমান থাকায়, সৌদামিনীর আশীর্ব্বাদের পর তুমি তা'কে আপনার লোক ব'লে মনে কর্‌তে সমর্থ হয়েছ।

আশীর্ব্বাদ বিবাহের একটী অঙ্গ। বিবাহের দিনে যখন তোমাদের দুই হাত এক হ'য়ে যাবে, তখন বুঝ্‌তে পারবে, সৌদামিনী তোমার কত আপনার লোক!"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা নীরবে শুনিতেছিলেন ও তাহা শুনিতে শুনিতে অতিশয় আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। ক্ষেত্রনাথের বক্তব্য শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "জীবনের এই কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও, দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি তোমার পাঠ্যাবস্থার সেই দার্শনিক ভাব ও চিন্তা ত্যাগ কর নাই। জীবনসংগ্রামের মধ্যেও দার্শনিক ভাব ও চিন্তা বজায় রাখা হিন্দুর বিশিষ্টতা বটে। আমি তোমার মতন অত বিশ্লেষণ কর্‌বার অবসর না পেলেও, মোটামুটী ভাবে সব কথাই বুঝ্‌তে পারি। আমি তোমার সহিত প্রায় একমত। ... হাঁ একটা কথা ভাল মনে হ'ল। দেখ্‌ছি, তুমি আমাদের শাস্ত্র টাস্ত্রেরও আলোচনা কর। আচ্ছা, তুমি আমায় বল্‌তে পার, মনু পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় বার বছরের আগেই মেয়েদের বিবাহ দেবার বিধি আছে; না দিলে পাপ হয়, আর পিতৃপুরুষেরা নরকস্থ হ'ন একথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের কুলীনের ঘরে যে যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীদেরও বিবাহ হয়, এটা কি অশাস্ত্রীয় নয়? আর এইরূপ বিবাহে কি পাপ হয় না? অবশ্য তুমি একথা মনে করো না যে, কন্যার যৌবন-বিবাহে আমার কোনও আপত্তি আছে। আমি কুলীনের ছেলে—আমাদের কুলীন কন্যাদের প্রায়ই কন্যাবস্থায় বিবাহ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধির সহিত কি এইরূপ বিবাহবিধি অসঙ্গত নয়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপাতদৃষ্টিতে তা অসঙ্গত বোধ হয় বটে; কিন্তু বেদ যদি হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি হয়, তা হ'লে কন্যার যৌবন-বিবাহে কোনও দোষ হয় না; বরং যৌবন-বিবাহই ধর্ম্মসম্মত। বেদপাঠ কর্‌বার বিদ্যা, অধিকার বা সামর্থ্য আমার নাই; কিন্তু আমাদের দেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (দ্রাবিড়ে এই রকম পণ্ডিত অনেক আছেন)—যাঁরা বেদ পড়েছেন, তাঁদের রচিত পুস্তক প'ড়ে বুঝেছি যে, পূর্ব্বকালে প্রাপ্তযৌবনা না হ'লে কন্যাদের বিবাহ হ'ত না। এখনও বিবাহে যে-সমস্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা'তেও যৌবন-বিবাহেরই আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যৌবনবিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সবিতৃকন্যা সূর্য্যা যৌবন প্রাপ্তির পর বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের একটী সূক্তের ঋষি ঘোষা নাম্নী জনৈক মহিলা। তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হয়েছিলেন; কাজেই তাঁর বিয়ে হয় নাই। পরে ভগবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় নীরোগ হ'য়ে অনেক বয়সে বিবাহ করেছিলেন। প্রাচীনকালে বিবাহ করা বা না করা স্ত্রীলোকের ইচ্ছাধীন ছিল। অনেকে আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌তেন ও তপস্যা কর্‌তেন। "বৃদ্ধ-কন্যা", মূল সংস্কৃতে এই কথাটি আছে। সুভ্রূ আজীবন তপস্যা ক'রে মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবাহ করেছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। পুরাণাদিতেও স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে নানা কারণে শাস্ত্রকার ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে যৌবন-বিবাহের বিধি তুলে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে বালিকাদের বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন। ঋষিগণ বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের পর কন্যার দ্বিরাগমন, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধিও প্রবর্ত্তিত কর্‌লেন। এ সব নিয়ম এখন এক বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুমাত্রেই মেনে চলেন। মানেন না কেবল শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী! যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বে বালিকাদের যে বিবাহ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহই নয়,-বাগ্দানমাত্র। যদি অপ্রাপ্ত-যৌবনা বালিকার বিবাহ হয়, এবং দ্বিরাগমন সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালিত হয়, তা হ'লে বালিকাদের বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা নিবারিত হ'তে পারে। সমাজসংস্কারকগণ এই দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ কর্‌লে প্রভূত উপকার হ'তে পারে। মোসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের পর থেকেই বালিকাদের বাল্য-বিবাহটি এদেশে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত হ'য়ে পড়ে। তার একটী কারণ আছে। বিজয়ী মোসলমান সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কর্‌ত। কিন্তু সধবা নারীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা মোসলমান শাস্ত্রে

নিষিদ্ধ; সেই কারণে, সেই সময়ে কুমারী ও বিধবা রমণীগণই অতিশয় বিপন্না হতেন। কুমারীদের রক্ষার জন্য পিতামাতারা অতি অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং বিধবারা প্রায়ই সহমরণ দ্বারা দেহত্যাগ কর্‌তেন। কিন্তু যারা বৈদিক ধর্ম্ম মেনে চল্‌তেন, তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া অশাস্ত্রীয় মনে কর্‌লেন। ব্রাহ্মণগণের কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্ম্মে অতিশয় আস্থাবান্ ছিলেন; এই জন্য তাঁরা যৌবন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যাদের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন না: পরন্তু যুবতী অবিবাহিত কন্যাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাও ন্যায়সঙ্গত মনে কর্‌লেন। সেই অবধি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা সমরকুশল, এবং এখনও ইঁহারা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন। তার পর, দক্ষিণাপথে নম্বুদিরি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁদের দেশে মোসলমানদের আধিপত্য হয় নাই, সেই কারণে, কন্যাদের রক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের ন্যায় অস্ত্র ধারণ কর্‌তে হয় নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যাদের বিবাহ হয় না। তাঁরা বীরের জাতি, অনায়াসেই কন্যাদের রক্ষণে সমর্থ হতেন। একে পূর্ব্ব থেকেই গোভিলপ্রমুখ সামবেদী মহর্ষিগণ কন্যাদের যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁদের অনুসরণ করে পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরাও কন্যাদের বাল্যবিবাহ সমর্থন ও প্রচলন ক'রেছিলেন, তা'র উপর মোসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে কালক্রমে সেই প্রথা সমাজ-মধ্যে দৃঢ়ীভূত হ'য়ে গেল। বর্ত্তমান সময়ে মোসলমানগণের অত্যাচারের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন রয়েছে। সেই অনুশাসন লঙ্ঘন করা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কালক্রমে লোকশিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাদের বাল্যবিবাহ-প্রথাও তিরোহিত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু এদেশে লোকশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায়, বাল্য-বিবাহ-প্রথার তিরোধানের সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বালকই নিরক্ষর, তখন বালিকাদের শিক্ষার কথা না তুল্‌লেও চলে। যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে, আর কুমারীরা প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা না পেলে, তারা সৎপথে ও ধর্ম্মপথে থাক্‌তে পারবে কি না সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। যাই হোক, কন্যাদের যৌবন-বিবাহটা যে অশাস্ত্রীয় নয়, এবং তুমিও একটী যুবতীকে বিবাহ কর্‌তে উদ্যত হ'য়ে যে শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছ না। তা আমি মনে করি। সেই কথাটি বল্‌তে গিয়ে তোমাকে আজ অনেক কথা ব'লে ফেল্‌লাম।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, তুমি শাস্ত্র টাস্ত্র পড়্‌বার এত সময় পাও কখন? আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, শাস্ত্রে আমারই অধিকার হবার কথা; আর তুমি বৈশ্য, কৃষিকার্য্যে তোমারই দক্ষতা হবার কথা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকাল সবই উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি হলাম কৃষকের সর্দ্দার; আর তুমি আমাকে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিচ্ছ! কলিযুগে সবই উল্টো হ'য়ে পড়্‌ল দেখ্‌তে পাচ্ছি।" সতীশের স্বরে বিদ্রূপ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "ওটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। কৃষিশাস্ত্র বল, বাণিজ্যনীতি বল, শিল্পশাস্ত্র বল, সমস্তই ঋষিরা প্রণয়ন ক'রে গেছেন। মহর্ষি পরাশর কৃষিশাস্ত্র প্রণয়ন করে গেছেন। পাকা কৃষক না হ'লে কেউ ওরূপ শাস্ত্র লিখ্‌তে পারেন না। মহর্ষি মনুর সংহিতায় সুন্দর বাণিজ্যনীতি দেখতে পাবে। মহর্ষি ভরত নাট্যকলা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। বিদুর শূদ্র হ'লেও, ধর্ম্মতত্ত্বে ও শাস্ত্রের মর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হয়েও মহাভরতের শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন পর্ব্বে যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ক'রে গেছেন, তা কয়জন ব্রাহ্মণে পারেন? আজকাল লোকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে যেমন আবদ্ধ করে, পূর্ব্বকালে লোকে তেমন কর্‌ত না। তাই সেকালে হিন্দুরা উন্নতির উচ্চ মঞ্চে আরোহণ কর্‌তে পেরেছিলেন। যে বিষয়ে যাঁর অধিকার জন্মে, তিনি সেই বিষয়ের আলোচনা কর্‌তেন এবং আপনার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও উন্নতি সাধন কর্‌তেন। এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয়।"

ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে কাছারী-বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত। ক্ষেত্রনাথ কথা বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র ভ্রমণে বহির্গত হইলে, মনোরমা সৌদামিনীকে তাঁহাদের বাড়ীতে আনিবার জন্য যমুনাকে পাঠাইলেন। সৌদামিনী কিছুতেই "কাছারী-বাড়ী" যাইবে না; কিন্তু যমুনা তাহাকে বলিল যে, বাবুরা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন, এখন কেহ বাড়ীতে নাই, সেই কারণে গৃহিণী তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন।

তথাপি কাছারী-বাড়ী যাইতে সৌদামিনীর লজ্জা হইতে লাগিল। গ্রামের কেহ কেহ গতকল্য তাহার আশীর্ব্বাদের কথা শুনিলেও, অধিকাংশ লোকেই তাহা শুনে নাই। কিন্তু সৌদামিনীর মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তাহা শুনিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে সকলের সম্মুখ দিয়া কিরূপে কাছারী-বাড়ী যাইবে—বিশেষতঃ যখন একটী নূতন লোক সেখানে রহিয়াছেন? লোকে কি মনে করিবে? বাবা কি মনে করিবেন? পিসীমা কি মনে করিবেন? বৌদিদি কি মনে করিবেন? না,—সৌদামিনী এখন কাছারী-বাড়ী যাইবে না। সে স্পষ্টই যমুনাকে বলিল "যমুনি, তুই যা; আমি যাব না।"

যমুনা গালে হাত দিয়া বলিল "ওমা, তুমি নাই যাবে, কি বল্‌ছ গো? গিন্নী রাগ কর্‌বেক্ যে! গিন্নী তুমাকে লিয়ে যাত্যে এখাতে আমাকে পাঠাল্যেক্, আর তুমি সেখাতে নাই যাবে, বল্‌ছ? ঘরে এখন কেউ নাই আছে—আমাদের বাবু আর তুমার বাবুটোও পাহাড়ে বুল্‌তে গেল্‌ছে"—

যমুনার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই সৌদামিনী রাগিয়া বলিল "যমুনি, পোড়ারমুখি, চুপ্ কর্ বল্‌ছি। আ মর্, কথা বল্‌বার ধরণ দেখ?"

যমুনা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "লয়া বাবুটো কি তুমার বাবু নাই আছে? তুমার বাবু লয় তো উটো কার বাবু বটে? বাবুটো তুমাকে বিহা কর্‌ব্যেক। তুমি অমন বাবু কুথায় পাবে গো, সৌদাদিদি? আচ্ছা, আগে বিহা তো হোক্, তার পর উটো তুমার বাবু বটে, ন কার বাবু বটে, তা দেখা যাব্যেক্।"

সৌদামিনী যমুনার কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বৌদিদি রন্ধনশালা হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "কি, যমুনা, তোমাদের লয়া বাবুটা কি আমার ঠাকুরঝিকে দেখ্‌বার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে? বেশ তো; নিয়ে যাও না।"

যমুনা হাসিয়া বলিল "তুমি অমন কইলে তো সৌদা দিদি ওখাতে আর নাই যাব্যেক্। আমাদের বাবু আর লয়া বাবুটো পাহাড়ে এখন বুল্‌তে গেল্‌ছে। গিন্নী আমাকে কহে দিল্যেক্, সৌদাকে ডেকে লিয়ে আয়, তার সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে।"

বৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যাও না, ঠাকুরঝি; তোমার বর ওখানে আছে তো কি হ'বে? একবার যদি দেখাও হ'য়ে যায়, তাতেই বা দোষ কি? যমুনা বল্‌ছে, তারা এখন বাড়ীতে নেই। যাও না, নলিনের মা কি বলে, শুনে এস। না গেলে সে রাগ কর্‌বে, বুঝ্‌লে?"

পিসীমা সেই সময়ে সেখানে আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। তিনিও সৌদামিনীকে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী কি করে, সকলের কথায় যাইতে সম্মত হইল। সেই সময়ে গাঙ্গুলীদের দশবর্ষবয়স্কা নীরদা সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, সৌদামিনী তাহাকে বলিল "নীরু, আমার সঙ্গে কাছারী-বাড়ী যাবি তো আয়।" এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইল।

কাছারী-বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র, মনোরমা হাসিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন "এস, এস, সদু, এস। তুমি খুব কপির ডাল্‌না রাঁধ্‌তে শিখেছিলে, যা হোক্। একজনকে কেবল কপির ডাল্‌না খাইয়েই বশ ক'রে ফেল্‌লে। তোমার খুব বাহাদুরী বটে!"

সৌদামিনী লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল "তুমি কি জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?"

"কি জন্যে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি? তোমার বরের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে! এটাও কি আর বুঝ্‌তে পার

নি ?" সতুকে লজ্জায় অধোবদন দেখিয়া মনোরমা বলিল "না, না, অত ভয় করছ কেন ? তোমার বরের সঙ্গে এখন দেখা হ'বে না। তাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। তুমি বস। সেই যে সেদিন তুমি গেছ, তার পর থেকে তোমার আর দেখাটি নাই। তোমার সঙ্গে দেখা কর্বার জন্য আমি ছট্‌ফট্ করছিলাম।"

এমন সময়ে নরু আসিয়া মাসীমার ক্রোড়ে আরোহণ করিল। নরু বলিল "মাসীমা, কাল আমরা তোমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। আচ্ছা, মাসীমা, কাকাবাবু তোমার হাতে দুটো সোনার টাকা দিলে কেন ? বল না ?"

সৌদামিনী তিরস্কারসূচক অনুচ্চকণ্ঠে নরুকে বলিল "চুপ্ কর্, দুষ্ট ছেলে।"

নরু বলিল "আমি দুষ্ট হ'ব কেন ? কাকাবাবু সেদিন বলেছে, তুমিই দুষ্টু। হ্যাঁ,—তুমি শোন নাই বুঝি ?"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "ওরে নরু, তোর কাকাবাবু এখন তোর মেশোমশাই হয়েছে। তাঁকে এখন মেশোমশাই বলে ডাকিস্।"

সৌদামিনী নরুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া লজ্জা ও অভিমানসূচক স্বরে মনোরমাকে বলিল "তুমি কি যে বল, দিদি, তার ঠিক্ নাই। নরু এখনি কি বলতে কি বলে বস্‌বে। নরু, তুই যদি ঐ কথা বলিস্, তা হ'লে তোকে আর কোলে নেবো না, ফুল এনে দেবো না, আর গল্প বলবো না। বুঝেছিস্ ?"

নরু মাসীমার শাসনে ভীত হইয়া বলিল "না, মাসীমা, আমি বলবো না। তুমি আমায় গল্প শোনাবে ?"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "শোনাব ; তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোমায় আবার গল্প শোনাবো না ?" এই বলিয়া তাহাকে আবার ক্রোড়ে লইল।

মাসীমার কথা শুনিয়া নরুর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

মনোরমা সৌদামিনীকে বলিলেন "কাল যে সপ্তমী ; দত্তদের বাড়ীতে পূজো ; আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ী আসবে। তুমি যাবে না ?"

সৌদামিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "তুমি যাবে তো ? তুমি যদি যাও, তা হ'লে আমিও যাব।"

মনোরমা বলিলেন "আমরা যাব, ঠিক করেছি। বাবু বলছিলেন, দত্তগিন্নী নিজে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন ; না গেলে, ভাল দেখাবে না। সতীশ বাবুর বামুন রয়েছে। সেই এখন রেঁধে তাঁদের খাওয়াবে। কাল আর পরশু, দুটী দিন ওদের বাড়ীতে থেকে নবমীর দিন সকাল বেলায় আমরা চ'লে আসবো, কেমন ?"

সৌদামিনী বলিল "তা বেশ। আমি পিসীমাকে বলছি। বাবা আর দাদা আজ সকালেই দত্তদের বাড়ী গেছেন।"

মনোরমা প্রভৃতি যখন কলিকাতা হইতে চলিয়া আসেন, তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বন্ধকী গহনাগুলিও মহাজনের নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। মনোরমা এক্ষণে সৌদামিনীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া গহনার বাক্স বাহির করিলেন, এবং সোনার চুড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া সৌদামিনীকে পরিতে বলিলেন।

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন, চুড়ী পর্‌ব কেন ?"

মনোরমা বলিলেন "কেন, তা পরে বুঝতে পারবে। বলি, এই সোজা কথাটাও বুঝতে পারছ না ? সতীশ বাবু তোমার জন্য যে গহনা গড়াবেন, তা তোমার হাতের মাপ না পেলে কি ক'রে গড়াবেন ? বুঝলে এতক্ষণে ?"

সৌদামিনীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে মনোরমার সোনার চুড়ী পরিতে চাহিল না। মনোরমা অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। তখন মনোরমা নিরুপায় হইয়া সৌদামিনীর হাত হইতে একটী কাচের চুড়ী খুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন "বেশ, তোমার বরকে এই কাচের চুড়ীখানাই দেব। কে বলে, তোমার বুদ্ধি নাই ? তুমি কাচের বদলে কাঞ্চন পাবে, আর তিনি হীরের বদলে কেবল জীরে পাবেন। দেখ্‌ছি, তোমারই জিত।"

মনোরমার সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠা শক্ত ভাবিয়া সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া নীরব রহিল। সৌদামিনী সর্ব্বক্ষণই ক্ষেত্রবাবু ও সতীশবাবুর প্রত্যাগমনের আশঙ্কা করিতেছিল। এইজন্য সে বলিল "দিদি, তুমি বস ; আমি আর বেশীক্ষণ থাকব না, বাড়ী যাই। বৌদিদি একলা আছে। কাল কখন যাবে ?"

মনোরমা বলিলেন "খাওয়া দাওয়ার পর।"

সৌদামিনী বলিল "বেশ, আমিও যাব।" এই বলিয়া নীরদা ও যমুনার সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইল।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

কেরৌলী রাজ্যে বাঙ্গালী

বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গণাগণের জন্মভূমি, বীরপ্রসূ রাজোবারার অন্তর্গত কেরৌলীরাজ্যে বাঙ্গালীর উপনিবেশের কাহিনী অদ্য আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিব। সে আজ কয়েক বৎসরের কথা। একদিন কেরৌলীরাজ্যের শাসনবিবরণী পাঠ করিতে করিতে ১৮৯৭-৯৮ অব্দের রিপোর্টে রাজপুত সর্দ্দারগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম এবং পর পর বৎসরের বিবরণীতে আরও দুই তিন জন বাঙ্গালীর নাম দেখিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন অর্থাৎ ১৮৯৪—৯৫ অব্দের রিপোর্ট খুলিলাম। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে, যে, ভোলানাথবাবু মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট, এবং মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। যখন প্রথম এই ছত্রগুলি পাঠ করি তখন বিস্ময় ও আনন্দে আমাদের হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। কৌতূহলী মনের মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল, এই সুদূর মরুস্থলীতে যদুবংশীয় বীরগণের স্বায়ত্তশাসনবিভাগে একজন বাঙ্গালী এরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, ইনি কে? পরে জানিতে পারিলাম ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের আত্মীয়। কেরৌলীরাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশের অনুসন্ধানকালে রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের বন্ধু, রসায়নবিৎ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া কয়েক বৎসর হইল আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমায় অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধ সেই-সকল উপকরণ অবলম্বনেই লিখিত।

রাজপুতানার মধ্যে কেরৌলী একটী ক্ষুদ্রায়তন রাজ্য। ইহার বিস্তার ১২৪২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সার্দ্ধলক্ষাধিক, এবং ইহার প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১২৬ জন লোকের বাস। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে জয়পুর এবং ভরতপুরের স্বল্লাংশ। পূর্ব্বে ধোলপুর এবং দক্ষিণে চম্বল—পৌরাণিক চর্ম্মণ্বতী নদী। এই নদী কেরৌলীরাজ্যকে গোয়ালিয়র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। রাজ্যটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের আভিজাত্য গণনায় ও সম্মানে গুরু। বহুদিন হইতে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুবিগ্রহচূর্ণকারী মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক মথুরার মন্দির ধ্বংস ও বৈষ্ণব নিগ্রহ আরম্ভ হইলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গোস্বামীরা জয়পুরের মহারাজার শরণাপন্ন হন। সেই সূত্রে বৃন্দাবন হইতে আনীত বহু বিগ্রহের মধ্যে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী এবং মদনমোহনজীর মূর্ত্তির সহিত বাঙ্গালী গোস্বামীগণ জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে কোন সময় জয়পুরের মহারাজাকে সাহায্য করায় কেরৌলীর মহারাজা বন্ধুত্বের পুরস্কারস্বরূপ মদনমোহনজীর বিগ্রহ লাভ করেন। মদনমোহনজীর সহিত বাঙ্গালী গোস্বামীগণ তদবধি কেরৌলীরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। উপস্থিত যে ১৬।১৭ ঘর গোস্বামী এখানে বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা মদনমোহনজীর উক্ত পূজারীদিগেরই বংশধর।

কেরৌলীরাজ্যে মদনমোহনজীর এতদূর প্রভাব যে, রাজার শীলমোহরে মদনমোহনের নাম অঙ্কিত থাকে এবং কেরৌলীকে মদনমোহনের কেরৌলী বলা হয়। মহারাজা এই বিগ্রহের প্রতিনিধিস্বরূপ মাত্র রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। মদনমোহনজীই মহারাজার ইষ্টদেবতা। রাজ্যেশ্বরের ইষ্টদেবতার প্রসাদে এখানে বাঙ্গালী গোস্বামীগণের অপ্রতিহত প্রভাব। রাজদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত গোস্বামীগণ রাণীদিগের নিকট হইতে প্রভূত ধন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক রাজা ও রাণী মৃত্যুকালে স্ব স্ব বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি মদনমোহনজীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাণীরা সহস্র সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি সহ ৬টী সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোস্বামীদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ কেরৌলীর সীমার ভিতর

তাঁহাদের ১৬০০০্ টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি আছে। কিন্তু এসকল থাকিলে কি হইবে? কেরৌলীর বর্ত্তমান গোস্বামীকুলে তাঁহাদের কুলপ্রবর্ত্তক পূজ্যপাদ গোস্বামী শ্রীরূপের চরিত্র এবং সনাতনের পাণ্ডিত্যের চিহ্নও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠশালায় সামান্য হিন্দী ও পাটোয়ারী হিসাব শিক্ষা করিয়াই ইহাঁদের পাঠ সমাপ্ত হয়। ইহাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার বাঙ্গালা-অক্ষর-পরিচয়ও নাই। জয়পুরী মাড়-বারী পোষাক পরিচ্ছদে ইহাঁদের অঙ্গ শোভিত হয়, মদনমোহনজীর "পর্‌সাদ" (প্রসাদ)—"খীরসা" *, "মিঠরী" †, "গুঁঝা" ‡, এবং "বিনা পানির রুটী" § ইহাঁদের রসনা পরিতৃপ্ত করে এবং বাজরার রুটীতে ইহাঁদের ভোজনব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহাঁদের পর-স্পরের মধ্যে নিত্য কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, বাক্‌কলহ, এমন কি প্রণয়ালাপ পর্য্যন্ত মাড়বারী ভাষাতেই হয় এবং ইহাঁদের বাহিরে, মাড়বারী পাগড়ী, অঙ্গরাখা, জয়পুরী ধুতী ও দুপাট্টা এবং নাগরা, আর অন্তঃপুরে "লাহঙ্গা" (ঘাঘরা), "ওঢ়না" এবং "আঙ্গিয়া (কাঁচুলী) ভূরি ভূরি ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপে ইহাঁরা বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া এক্ষণে "কেরৌলীর গোস্বামী"তে পরিণত হইয়াছেন। ইহাঁরা আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই রাখেন নাই এবং সম্পূর্ণরূপে মাড়বারী সমাজে বিলীন হইয়া যাইতেও পারেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে প্রধান গোস্বামীর নাম মোহনকিশোর। শুনিয়াছি তিনি নাকি বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে, বলিতে এবং পড়িতেও পারেন না। তিনি অপুত্রক! তাঁহার বিমাতা "মাজী" বা "মাইজী" নামে প্রসিদ্ধা। ইনিই কেরৌলী এবং বৃন্দাবনস্থ সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী। প্রধান গোস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতা ৺ গোবিন্দলাল গোস্বামী, গুসাঁই গোবিন্দ লালা নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এবং মন্দিরাধিকারী গোস্বামী প্রতাপ শিরোমণি কেরৌলীর "পর্‌তাপ শিরোমণ্ গুসাঁই।" বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দকিশোরের লীলাভূমিতে বাঙ্গালী গোস্বামীগণ স্ব স্ব নামের সহিত "কিশোর" যুক্ত করিবার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। তাই

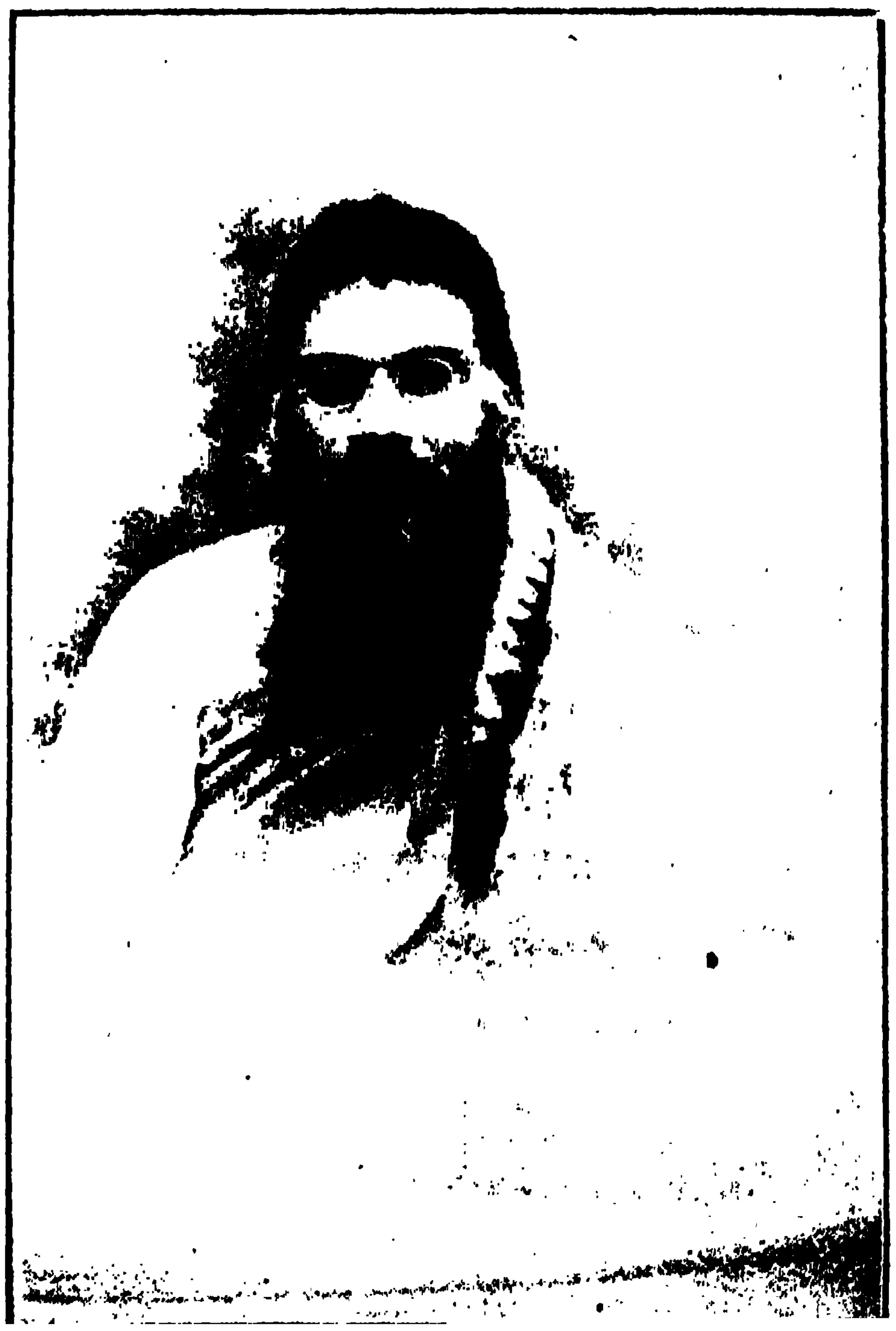

রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

মোহনকিশোর, বংশীকিশোর, মধুসূদনকিশোর প্রভৃতি নাম প্রায়ই ইহাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিন এক বিবাহের মজলিসে গোস্বামী মধুসূদনকিশোর * ঔপ-নিবেশিক বাঙ্গালীদিগের অতি ভয়াবহ পরিণামের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি কোন ভদ্রলোক তাঁহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন "হমার

* মোচার আকৃতি ক্ষীরের মিঠাই।

† উপরে চিনি মাখান ঘৃতপক্ক আটার মিঠাই।

‡ আটার পুর দেওয়া, ঘিয়ে ভাজা ও চিনির রসে পাক করা, আটা, ক্ষীর ও চিনির লাড়ু।

§ বিনা জলে মাখা আটার মিঠারুটী; জলের পরিবর্ত্তে ঘৃতে চিনি মিশ্রিত ময়দা মাখিতে হয়; সেই ময়দায় থালার পৃষ্ঠে রুটী বেলিয়া থালা সুদ্ধ আগুনে সেকিতে হয়। রুটীর গায়ে নানা রকমের ফুল পাতা কাটিয়া তাহাতে নানা বর্ণে রঞ্জিত খরমুজার বীজ মধ্যস্থলে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিন্দুমাত্র জলের সংস্রব নাই বলিয়া এই নাম।

* শুনিয়াছি ইনি এলাহাবাদপ্রবাসী ৺ তারকনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন।

নাম মকুসুঁদর কিশোর।" প্রশ্ন হয়, "আপনার পদবী?" মধুসুদন গোস্বামী উত্তর দেন, "কেরৌলীর মুখুর্জ্যা আছি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "আপনাদের গাঁই? উত্তরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "হামাদের দুইটী গাই আছে!"

তাঁহারা জাতীয়ত্ব ও নিজস্ব শক্তি অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া একদিকে যেমন বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত হইয়া আছেন, অপরদিকে এ দেশীয়দিগের চক্ষেও অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বসম্ভ্রম, সমাদর আর তদ্রূপ নাই। পূর্ব্বের ন্যায় রাজারা আর এখন তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন না। গোস্বামীদিগের বংশধরগণের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজা ভ্রমরপাল ইহাঁদের সম্পত্তির বন্দোবস্তের ভার প্রায় সমস্তই ষ্টেটের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তবে পূজার অধিকার হইতে এখনও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহাঁদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া গোস্বামী রাধিকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেরৌলী ত্যাগ করিয়া অধিকাংশকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকেন। কেরৌলীর গোস্বামীগণের মধ্যে ইনি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। মদনমোহনজীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রে উপাধিপ্রাপ্ত জাতীয়ত্বরক্ষাপ্রয়াসী গোস্বামী গিরিবরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখানকার ভাব গতিক দেখিয়া, স্থানত্যাগ করত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। তবে কি কেরৌলীর "মুখুর্জ্যা" এবং "গুঁসাইগণ" এইরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাদের উপনিবেশ এইরূপে পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইবে? না, তাঁহাদের সমুন্নতির সুযোগ আছে। তাঁহারা বিবাহের আদানপ্রদান বাঙ্গালীর গৃহেই করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীগৃহে, দ্বিতীয়তঃ পঞ্চকোটী ব্রাহ্মণকন্যা ক্রয় করিয়া এবং অভাবে কৌশলেও বিবাহটা বঙ্গগৃহেই হয়। কেরৌলীর ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশার কথা এই যে বহুবর্ষ হইতে এখানে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাস করিতেছেন। কেরৌলীর শাসন-বিবরণী হইতে যে সংবাদ আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তদুল্লিখিত ভোলানাথ বাবুর কথাই বলিতেছি। ইনি কেরৌলির মহারাজার মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য, রাজ্যের উন্নতি-ও-মঙ্গলবিধায়ক এবং মহারাজার হিতচিন্তকগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ। ইহাঁরই প্রভাবে গোস্বামীদিগের বাঙ্গালীত্ব ফিরিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষায় কথোপকথনের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে থান কাপড় ও মাড়বারী ঘাঘরার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া শাড়ীর ব্যবহার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীপছন্দ খাদ্যের প্রচলন হইতেছে। ভোলানাথ বাবু কেরৌলী রাজ্যের "সার-ওয়াণ্টার র‍্যালে।" ইনি এই মরুভূমিতে কপি ও আলুর চাষ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। পরে মটরসুঁটীও লইয়া যান! কপি ও আলু এখানে জনসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে পুরাতন প্রথা ও বিধিব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া ঐ দুই সুখাদ্য এক্ষণে মদনমোহনজীর ভোগেও চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া সুখরীয়া গ্রামে। তিনি ফতেপুর জেলায় জজের আদালতে কর্ম্ম করিতেন। এখান হইতে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীবাসী হন। বারাণসীতেই তাঁহার পৈতৃক বাটীতে ভোলানাথ বাবুর জন্ম হয়। তিনি প্রথমে Bengaleetolah Preparatory School নামক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া বারাণসী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ অব্দে এই কলেজ হইতে বি,এ পাশ করিয়া ভোলানাথ বাবু কিছুদিন মির্জ্জাপুর মিশন স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতে থাকেন। এখানে উন্নতির পথ বড় নাই দেখিয়া দুই বৎসর পরে কর্ম্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা করেন। প্রথমাবধি তাঁহার গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগে কর্ম্ম করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুরুব্বির জোর না থাকায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পরে কোন দেশীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার তাঁহার ঝোঁক হয়। ইতিমধ্যে

"পাইয়োনিয়র" পত্রে কেরৌলীর মহারাজার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন আছে দেখিয়া তিনি ঐ পদের জন্য আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় এবং তিনি মাসিক ৬০ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি মির্জ্জাপুর মিশনরী স্কুলের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২৬ জুন নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কেরৌলী রাজ্যে তখন ভাল ইংরাজী-জানা কর্ম্মচারী কেহই ছিলেন না, সুতরাং অনেক সময় চিঠি পত্রাদিতে অর্থবিভ্রাট ঘটিত। ভোলানাথ বাবু চাকরীতে বাহাল হইবার পূর্ব্বেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজার সেক্রেটারী তাঁহাকে যে মঞ্জুরী-পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কেরৌলীর রাজধানী রেল ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ষ্টেশনে নামিয়া তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে তিনগুণ অধিক অর্থাৎ ৫২ মাইল! একে জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ উত্তাপ, তাহাতে আবার মরুপর্ব্বতময় প্রদেশের অজানা পথ; তাহাতে অজ্ঞাতপ্রকৃতি ভিন্নভাষাভাষী পল্লীবাসীদিগের মধ্য দিয়া যাইতে প্রথমে তাঁহাকে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে যাইতে হইবে জয়পুর রাজ্যের ভিতর দিয়া। তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া একাশ্ববাহিত দ্বিচক্ররথ "একায়" আরোহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার বাহিরে যাঁহারা পদার্পণ করেন নাই তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। এই ৫২ মাইল পথ অশ্বযানে যাইতে ভোলানাথ বাবুকে মাত্র তিনটী রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। পথে মহুয়া নামক গ্রামে তিনি রাত্রিবাস করিয়া পরদিন যথাস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে না পাইয়া, উদয়াস্ত হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে প্রথম প্রথম এখানে কোন ক্রমেই মন টিকাইতে পারেন নাই। জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং স্কুলের সেক্রেটারী জনৈক উদারপ্রকৃতি রাজপুত তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ছিলেন তাঁহার কথাবার্ত্তার লোক।

ভোলানাথ বাবুর আগমনকালে কেরৌলীর মহারাজার বয়স ছিল ৬০ বৎসর। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। কালোচিত শিক্ষার অভাবে তাঁহার সময়ে নানা গোলযোগ উৎপন্ন হওয়ায় রাজ্যের বন্দোবস্ত পলিটিক্যাল এজেণ্টের হস্তে যায়। তখন এজেণ্ট ছিলেন সার ইভান স্মিথ (Sir Evan Smith)। গুণীর নিকট চিরদিনই গুণের আদর হইয়া থাকে। এজেণ্ট মহোদয় এই প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা ও সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। তিনি ইংরাজি স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্কুল তখন পাঠশালা বলিলেই হয়, ভোলানাথ বাবু এই পাঠশালাটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এজেণ্ট মহোদয়েরও বিদ্যালয়টির উন্নতি দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে ভোলানাথ বাবুর কোন প্রস্তাবই তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হয় নাই। এজেণ্ট সাহেবের সহায়তা ও নির্দ্দেশে তিনি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং সমূহ উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাঠশালাটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে উন্নীত হইল, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, সাধারণের মনে সন্তানগণকে উন্নত শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি জাগিল এবং ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।

ভোলানাথ বাবুর পরও শিক্ষার ভার বাঙ্গালীরই উপর ন্যস্ত হয়। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে বাবু গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায় স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গোবর্দ্ধন বাবু রামগোপাল বাবুর সহোদর। শিক্ষা বিভাগে আমরা বাবু সাতকড়ি চট্টোপোধ্যায়ের নামও প্রাপ্ত হই। কেরৌলীতে ছাত্রগণ ইংরাজি, হিন্দী, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং রাজপুতানার ন্যায় এখানেও ছাত্রগণকে বেতন দিতে হয় না।

ভোলানাথ বাবু কেরৌলীর শিক্ষাবিভাগের সুবন্দোবস্ত লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। প্রথমাবধিই তাঁহাকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহেও হস্তক্ষেপ করিতে

হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে সকল কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এখানে বহু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রবল প্রতিপক্ষগণের কূটমন্ত্রণা ভেদ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি- ও চরিত্র-বলে ভোলানাথ বাবুকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ মহারাজার রাজত্বকালে যুবরাজের সহিত নানা কারণে মন্ত্রীসভার সভ্যগণের মনোমালিন্য হয়। ভোলানাথ বাবু কেরৌলীতে আসিয়া এইরূপ অবস্থাই লক্ষ্য করেন। তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে আগমন করেন, শ্রাবণ মাসে বৃদ্ধ মহারাজার স্বর্গ লাভ হয় এবং উক্ত যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। নবীন রাজার প্রতিপক্ষ কৌন্সিলের মেম্বরগণ তখন অতিশয় ভীত হন। তাঁহারা নানারূপ চক্রান্ত করিয়া নবীন মহারাজকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই শত্রুসঙ্কুল পিতৃরাজ্যে একমাত্র ভোলানাথ বাবু, কাশ্মীরী পণ্ডিত নন্দলাল এবং স্কুলের সেক্রেটরী জনৈক রাজপুত সর্দ্দার মহারাজার সৎপরামর্শদাতা ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই সময় একজন ইংরাজী-জানা কর্ম্মচারী আবশ্যক হওয়ায় ভোলানাথ বাবুই তৎপদে মনোনীত হন এবং সেই সূত্রে নবীন রাজার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় স্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর হিন্দী ভাষায় কথোপকথন ও উদয়াস্ত "জনাব, জনাব" করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে।

তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনটী কর্ম্ম জুটাইয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল অন্যত্র সরিয়া পড়েন। শেষবারে যখন আজমীর মেয়ো কলেজে ১৩০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করিয়া তাৎকালীন পলিটিক্যাল এজেণ্টের যত্নে মনোনীত হন, ভোলানাথবাবু কেরৌলীতে তখন ৮০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেছিলেন; কিন্তু ভোলানাথ বাবু যে তখনও উভয় ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা আজমীর কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ণেল লক সাহেবকে মেজর মার্টেলী কর্ত্তৃক লিখিত সুপারিসপত্র * হইতেই জানা যায়। কিন্তু ভোলানাথ বাবু চলিয়া গেলে হঠাৎ এরূপ বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ ইংরাজীশিক্ষিত কর্ম্মচারী পাওয়া সুকঠিন বুঝিয়া অন্য দুইবারের মত এবারও মহারাজা তাঁহাকে কেরৌলী ত্যাগ করিতে দেন নাই। ইহার কয়েক মাস পরেই রাজ্যের নূতন বৎসরের আয়ব্যয়-তালিকা (Budget) প্রস্তুত হয়। সেই সময় আজমীর যাইতে না দেওয়ায় ভোলানাথ বাবুর যে ক্ষতি হয়, তাহা তিনি মহারাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন, তাহাতে মাত্র ১২০৲ টাকা তাঁহার জন্য মঞ্জুর হয়। কিন্তু সেই বৎসরই মহারাজা গভর্মেণ্ট হইতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের পদবৃদ্ধি ও নূতন কর্ম্মচারীর নিয়োগ উপলক্ষে ভোলানাথ বাবু ১৫০৲ টাকা বেতনে স্থায়ী প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত এবং পর বৎসর ১৫০০৲ টাকার জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্বোক্ত কাশ্মীরী পণ্ডিত দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। কিন্তু পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহিত মহারাজার যাবতীয় চিঠিপত্রের আদান-প্রদান-কার্য্য ভোলানাথ বাবুর দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, সাহেবের দরবারে ডাক পড়িলে তাঁহাকেই যাইতে হয়, এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কোন কূটপ্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকেই মীমাংসা করিতে হয়। মন্ত্রীসভার কোন কোন দায়িত্বহীন দুর্ব্বুদ্ধি কর্ম্মচারীর দোষে যখনই যখনই রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিষ্টের সম্ভাবনা হইয়াছে তখনই ভোলানাথ বাবু রাজ্যের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া উভয় ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ও মহারাজার নিকট অধিক বিশ্বাস- ও প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতে, এমন কি তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিতে, বিপুল আয়োজন ও উদ্যম সহকারে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু ভোলানাথ বাবুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভায় সকল কুমন্ত্রণা ও কূটকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে। একবার কেরৌলীতে একটী সঙ্গীন মকদ্দমা উপস্থিত হয়। রাজধানী হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে জনৈকা রাজপুত মহিলা সতী হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মৃত

* "Babu Bholanath Chatterji, Headmaster of the Kerowlee State School, is a man who has done first-rate work in Kerowlee, and whom both the Maharajah and I shall be sorry to lose. I have the highest opinion of him."

পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ঘটনাস্থলে প্রায় বিংশতি সহস্র লোকের জনতা হয়। পুলিশও দলবল লইয়া উপস্থিত ছিল। কেহই সতীকে আত্মবিসর্জ্জনে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এদিকে রাষ্ট্র হয়, যে, স্ত্রীলোকটী চিতা হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া তাহাকে দগ্ধ করা হয়। ইহাই মকদ্দমার বিষয়। রাজ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এমন সময় ভোলানাথ বাবুর ডাক পড়িল। মহারাজা তাঁহার হস্তে সকল দিক রক্ষার ভার দিলেন। এই সময় এজেণ্ট সাহেব ৩ মাসের ছুটী লইলে ইন্দোরের দিক হইতে অন্য একজন এজেণ্ট আগমন করেন। সুযোগ পাইয়া ভোলানাথ বাবুর প্রতিপক্ষ অথচ তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী এজেণ্ট সাহেবের আদালতে থাকিয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু নূতন সাহেব ভোলানাথ বাবুর অপক্ষপাত তদন্তে এবং দক্ষতার সহিত লিখিত মকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার প্রতি বরং সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মন্তব্য সহ ভোলানাথ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার রিপোর্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। তাহার পরিণামে পুলিশ নিষ্কৃতি লাভ করে এবং শাসনসংক্রান্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

এই সতী-মকদ্দমার কিছুদিন পরেই পুরাতন এজেণ্ট সাহেব প্রত্যাগত হইলে ১৮৯৭ অব্দে কেরৌলী রাজ্য পরিদর্শন করেন। সেই সময় ভোলানাথ বাবু মহারাজার অগোচরে তাঁহাকে জি, সি, এস, আই, বা জি, সি, আই, ই, উপাধি দানের জন্য একখানি অনুরোধপত্র এজেণ্ট সাহেবকে প্রদান করেন। পত্রের উত্তরে এজেণ্ট মহোদয় উপাধির জন্য চেষ্টা করিতে প্রতি-শ্রুত হন এবং ঠিক সেই সময় বড়লাটের ভরতপুর আসিবার কথা ছিল বলিয়া মহারাজাকে ভরতপুর যাইবার পরামর্শ দান করেন। তদনুসারে ভোলা-নাথবাবুকে লইয়া মহারাজা ভরতপুর গমন করেন। তাহার ফলে ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞীর হীরক জুবিলির সময় কেরৌলীর মহারাজা জি, সি, আই, ই, উপাধিভূষিত হন। ইহার কিছুদিন পরে ভোলানাথবাবু কেরৌলী কৌন্সিলের মেম্বর পদে উন্নীত হন। তিনি কেরৌলী রাজ্যের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং এখনও যাহা করিতেছেন তজ্জন্য কেরৌলী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি যখন পূর্ব্বে কয়েকবার কেরৌলী ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন তখন কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন, যিনি পূর্ব্বে কেরৌলীর শাসনভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, এবং এখানকার ভূতপূর্ব্ব ও পরে বিকানীরের পলিটিকাল এজেণ্ট, কর্ণেল ষ্ট্রাটন (Col. Stratton) প্রমুখ রাজ্যের হিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনেকে তাঁহাকে কেরৌলী রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই কর্ম্মত্যাগে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন—

"To continue to discharge the duties entrusted to him * * * in the interest of the State **".

কর্ণেল হার্ব্বার্ট কেরৌলী হইতে গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্ট হইয়া যাইবার কালে ভোলানাথ বাবুর সম্বন্ধে লিখিয়া যান,

"It gives me much pleasure to write these few lines to testify to the satisfactory manner in which Babu Bholanath Chatterjee, member of Council, Karauli State, performed his duties during the 3½ years I was Political Agent, Eastern States, Rajputana. Practically all the English correspondence between my office and the Karauli Durbar passed through his hands and I always found all references, no matter how trouble-some or technical, intelligently received and properly answered rendering my dealing with the Durbar pleasant and free from all trouble. In this gentleman the Durbar has I think a loyal and excellent servant and it is a source of satisfaction to me to think that it was in my time when acting as Political Agent in, I think, 1886 that Bholanath Chatterjee first came to the State as Headmaster of H. H. the Maharaja's School. I feel sure, he will always retain the good will of his master and deserve the esteem of the Political authorities.—Sd. C. Herbert, Lt Col., Gwalior Residency."

ভোলানাথবাবু যখন কেরৌলী মিউনিসিপালিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তখনকার শাসনবিবরণীতে রাজ্যের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসাজনক মন্তব্য দৃষ্ট হয়। ১৮৯৭—৯৮ অব্দের শাসন-বিবরণীতে আছে—

"Kerowlee is one of the cleanest cities in Rajputana. The conservancy arrangements of the city are all that can be desired. * * * The above is the opinion

of successive administrative medical officers of Rajputana."

এইরূপে সকল দিকেই ভোলানাথবাবুর কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া কেরৌলী রাজ্যের শিক্ষাবিস্তার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে কি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে, কি মিউনিসিপালিটির সভাপতিরূপে, কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে, কিম্বা তাঁহার মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রীরূপে ইংরাজ গভর্মেণ্টের সহিত মহারাজার একযোগে রাজ্যশাসন-বিষয়ে মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া এবং উভয় পক্ষের হিত বজায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য পরিচালনা দ্বারা যেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন এবং বিদেশে বাঙ্গালীর যেরূপ মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গজননী তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতে পারেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া ১৯০৫ অব্দের ৬ই মে তারিখে ইংরাজ গভর্মেণ্ট কেরৌলীতে একটী প্রকাশ্য দরবার করিয়া স্বয়ং মহারাজা ও রাজ্যের বহু সর্দ্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে রাজমন্ত্রী ভোলানাথবাবুকে রাওসাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সভায় রাজপুতানার পূর্ব্বাঞ্চলস্থ রাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেণ্ট লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল সি, জি, এফ, ফ্যাগ্যান, আই, এ, মহোদয় ভোলানাথ বাবুর হস্তে রাজকীয় সনন্দ অর্পণ করিবার কালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল ;—

"Your Highness and Sirdars,

I have asked you here this evening to witness a formality which it is my pleasing duty to perform, namely to place in the hands of my friend Babu Bholanath Chatterjee, member of the Karauli State Council, the Sanad conferring upon him the title of Rao Sahib, a distinction which was conferred by his Excellency the Viceroy on my friend, in January last in acknowledgment of many years' loyal service rendered by him to the State. Loyalty to a Chief or a State means loyalty to the British Government—the two cannot be disassociated since the interests of both are identical. Good government in a Native State means good government in an integral portion of the British Empire in India and it is for this reason that His Excellency the Viceroy is always ready and willing to show his appreciation of services rendered by the officials of Native States as well as of those serving in British India.

Babu Bholanath Chatterjee has served in this State for 20 years, first as school master, then as Private Secretary to H. H. the Maharaja and lastly as member of council.

The loyal manner in which he has performed his duties in this latter office has earned for him the approbation of the Government of India.

Rao Sahib Babu Bholanath Chatterjee, in handing to you this Sanad which I now do, I have been asked by the Honourable the Agent to the Governor General in Rajputana to convey to you an expression of his congratulations to which I would at the same time add my own upon the distinction conferred upon you by the Government of India and I feel sure that the honour of which you have been the recepient will urge you on to further exertions on behalf of the chief of the State you serve."

ভোলানাথবাবুর এই উপাধি লাভে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, ভরতপুর রাজ্যের পলিটিকাল এজেণ্ট এবং যোধপুর রাজ্যের রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট—(Sir Arthur Martindale) স্যার আর্থার মার্টিন্‌ডেলও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ভোলানাথবাবুর কেরৌলীরাজ্য-শাসন-কার্য্যে ইংরাজ গভর্মেণ্টের সহিত রাজভক্তিপূর্ণ সুদক্ষ সহযোগিতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মেজর ষ্ট্র্যাটন লিখিয়াছিলেন,

"I take the opportunity of congratulating you on the honour which has been recently bestowed on you by the Government of India. It is evident that your good work in Karauli has been appreciated and I trust that the fact will have given you satisfaction * * * With all best wishes for 1905."

রাওসাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি দিনলিপি রক্ষা করিয়াছেন। সে সমুদয় প্রকাশিত হইলে দেশীয় রাজ্যের বহু কৌতূহলপূর্ণ ঘটনার কথা জানা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ঝড়ো হাওয়া

(গল্প)

রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাপ কহিলেন, "না সইতে পারিস্ ত আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। অত গোরা-মেজাজ আমি বরদাস্ত কর্‌ব না।"

মা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুরে সুর মিশাইয়া বলিলেন, "এমন ঘরের মেয়েও এনেছিলুম! সলা-পরামর্শে ছেলেকে আমার একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। যে ছেলের মুখে কথা ফুট্‌ত না, সে আজ বৌয়ের হয়ে কথা বল্‌তে এসেছে! ঘোর কলি দেখ্‌ছি!"

শশী নত শিরে প্রস্থান করিল। রুগ্না স্ত্রীর কানে কথাটা পাছে প্রবেশ করে, ইহা ভাবিয়াই সে অস্থির হইয়া উঠিল।

ঘরে আসিয়া শশী দেখে, কিরণ বিছানা ছাড়িয়া জান্‌লার পাশে বসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর পদ-শব্দ শুনিয়া চকিতে সে মুখ ফিরাইল। শশী কহিল, "বিছানা ছেড়ে জানালার ধারে এসে বস্‌লে কেন, কিরণ? ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে!"

কোনমতে অন্তরের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া মুখে-চোখে সস্মিত ভাব দেখাইয়া কিরণ কহিল, "অসুখ ত সেরে গেছে—মিছিমিছি আর কত শুয়ে থাকব, বাপু?"

শশীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে কিরণের কানে কথার সবটুকুই গিয়াছে। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "ডাক্তার কি বলে গেল, শুন্‌লে ত?"

হাসিয়া কিরণ কহিল, "ডাক্তারদের কথা আগাগোড়া শুন্‌তে গেলে আর বাঁচা যায় না। সব-তাতেই ওদের বাড়াবাড়ি—গেরস্তর ঘরে অত পোষায় কখনো?"

কিরণের মুখে এ সময়েও হাসি দেখিয়া শশীর বুক ফাটিয়া গেল। সে বুঝিল, এ হাসি শুধু তাহাকে ভুলাইবার জন্য! সহসা তাহার মুখে আর-কোন কথা জোগাইল না—স্থির দৃষ্টিতে কিরণের পানে চাহিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বামীর ভাব দেখিয়া কিরণের অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতেছিল। দম্‌কা বাতাসে জমাট মেঘের রাশি যেমন উড়িয়া ছিঁড়িয়া ভাসিয়া যায়, তেমনি করিয়া স্বামীর মনের ভিতরকার রুদ্ধ অন্ধকারটাকে লঘু কৌতুকে উড়াইয়া দিবার বাসনায় সে আবার হাসিয়া কহিল, "কি ভাব্‌তে বস্‌লে—পাছে আমি মরে যাই—না?"

তাহার পানে চাহিয়া সত্যই শশী সেই কথা ভাবিতেছিল। রোগে ভুগিয়া কিরণের শরীর যাহা হইয়াছে, যে, চোখে দেখিলে, কে এমন নিষ্ঠুর আছে, শিহরিয়া একটা 'আহা' না বলিবে! জীবনটুকু নিতান্তই যেন পল্‌কা সুতার বাঁধনে কোনমতে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে—একটু জোরে বাতাস লাগিলেই নিমেষে ছিঁড়িয়া যাইবে। যেন বাসি-ফুলের দলগুলা কোনমতে আপনাদের আঁটিয়া রাখিয়াছে, হাতের এতটুকু স্পর্শ লাগিলেই ঝরিয়া পড়িবে। তাহার উপর ডাক্তার বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে, এতটুকু কাজ-কর্ম্মের পরিশ্রম হইলে ঔষধ-চাপা রোগটুকু আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারে, এবং এই দুর্ব্বল শরীরে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তিই যখন রোগীর নাই, তখন তাহাকে বাঁচানো দুর্ঘট হইতে পারে। রোগীর এখন যেমন অবস্থা, তাহাতে যদি সত্বর তাহাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে কোথাও না যাওয়া হয়, তবে যক্ষ্মা হইবার পক্ষেও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

কথাটা শুনিয়া অবধি শশীর গা থাকিয়া-থাকিয়া ছম্-ছম্ করিয়া উঠিতেছিল। কিরণের দিকে চাহিতেই মন তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়ে। হায়, সেই কিরণ, বিবাহের রাত্রে মোমের পুতুলটির মতই যাহাকে কোমল সুন্দর দেখাইতেছিল! হতভাগিনী বিধবার সে একমাত্র সন্তান। স্বামী ও চার-পাঁচটি পুত্র-কন্যা হারাইয়া কিরণের মাতা কিরণকে লইয়াই যে কোনমতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। বিবাহের পরদিন কন্যা-বিদায়ের সময় বিধবা মাতা কন্যাকে জামাতার হাতে সঁপিয়া দিতে গিয়া কাঁদিয়া বহু কষ্টে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন আজ নূতন করিয়াই শশীর মনে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল! তিনি বলিয়াছিলেন, 'সবগুলিকেই যমের হাতে তুলে দিয়েছি—এই আমার এক-রত্তি গুঁড়োটুকু—এইই আমার সর্ব্বস্ব—তোমার হাতে দিচ্ছি—যত্ন করো

বাবা, যত্নে রেখো—বাছার মুখের দিকে চাইতে আর কেউ নেই!'

সেই কিরণ—সে যদি তাহাকে ছাড়িয়া যায়? সে কথা মনে করিতেও শশীর সারা দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাই সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতার কাছে স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাইবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। শুনিয়া পিতা চটিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন, "বড় আমার পয়সা দেখেছ, না?" মা বলিলেন, "রোগ হয়েছে, সেরে যাবে, তার আবার অত ভড়ং কেন? আমাদেরই কি কখনো রোগ হয় নি, না সেরে উঠিনি? তা বলে' এত হাওয়া খাবার ঢঙ্‌ত কখনো তুল্‌তে হয়নি। বড়মানুষের মেয়ে বলে' কি সব-তাতেই বড়মানুষি দেখানো চাই! দেখে আর বাঁচিনে যে!"

স্নেহশীল পিতা-মাতার মুখে স্নেহহীন এমন পরুষ ভাষা শুনিয়া শশীর মন পুড়িয়া যাইতেছিল! তাঁহাদের মুখ দিয়া যে কথাগুলা বাহির হইয়াছিল, সেগুলা শুধু কঠিন হইলেও শশী কতক আশ্বস্ত হইত; কিন্তু সেগুলা শুধু কঠিন নয়, অনেকখানি শ্লেষও তাহাতে মাখানো ছিল। তাই কিরণের কথা শুনিয়া শশী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, তাহার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল।

কিরণ কাছে আসিয়া শশীর দুই চোখে হাত বুলাইয়া কহিল, "দেখ দেখি, কোথায় কি, আর তুমি কাঁদতে বসলে!"

"কিরণ—"

"কেন! ওগো, সত্যিই কি আমি মরব? তা নয়। এই ত কেমন সেরে উঠলুম। এ প্রাণ সহজে যাবার নয়—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।" স্বামীর চোখে জল দেখিয়া কিরণের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তবু সে অধীর মনটাকে দুষ্ট ঘোড়ার মতই অনেক কষ্টে দমন করিয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া সে কহিল, "আমি এখন বেশ সেরে উঠেছি। এ যা কাহিল দেখ্‌ছ, নাইতে-খেতেই এ সেরে যাবে। দেখো দেখি। তুমি আর এ-সব ভেবে শুধু-শুধু মন খারাপ করো না। তোমার পড়ার কত ক্ষতি হয়ে গেল। বেশ করে' এবার পড়াশুনা কর, এম-এটা পাশ করতে হবে ত।"

শশীর চোখের সেই চিত্র-করা নিস্পন্দ ভাব কিরণের এত কথাতেও ঘুচিয়া গেল না। সে ভাবিতেছিল, যদি তেমন বিপদ ঘটে! কিরণের কিছু হয়!—তাহা হইলে—? তাহা হইলে আর যাহার যে কোন ক্ষতিই হোক না, কিরণের মাতাকে সে কি বলিবে, কি বলিয়া প্রবোধ দিবে! বলিবে কি,—হায়, বিধবা উপায়-হীনা নারী, তুমি তোমার যে ধনটিকে আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, সেটিকে আমি নিরাপদ রাখিতে পারি নাই? মৃত্যু-তস্কর আসিয়া সেটিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? আমি যদি অবহেলা না করিতাম, তাহা হইলে বুঝি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতাম! কিন্তু হায়, অবহেলা করিয়াই শুধু তস্করের হরণের সুবিধা করিয়া দিয়াছি!

তাহার অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সাড়া দিয়া উঠিতেছিল।

২

বঁটি লইয়া শাশুড়ী আলু কুটিতেছিলেন, কোনমতে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া কিরণ আসিয়া তথায় বসিল, ডাকিল, "মা—" শাশুড়ী মুখ তুলিলেন। মুখখানার ভাব অত্যন্ত কঠিন, বিরক্তি-পূর্ণ। কোন কথা না বলিয়া আলুই তিনি কুটিতে লাগিলেন।

মুখের সে ভাব দেখিয়া কিরণ বুঝিল, ঝড় একেবারে আসন্ন হইয়া রহিয়াছে! তবু সে ছোট বঁটিখানা টানিয়া লইয়া কুটিবার জন্য সম্মুখস্থ চ্যাঙারি হইতে তরকারী বাছিতে লাগিল। কথায় বিদ্যুৎ হানিয়া শাশুড়ী কহিলেন, "থাক্‌, থাক্‌, তুমি রোগা মানুষ, তোমার আবার এ-সবে হাত দেওয়া কেন?"

কিরণের বুক দুর-দুর করিয়া উঠিল। সে কহিল, "হাত আমি ধুয়ে এসেছি, মা।"

"তা হোক্‌। যাও, উঠে যাও, শোওগে। আবার ফের অসুখ করবে কি?"

"অসুখ করবে না।"

"আবার কথা-কাটাকাটি করে! যাও, যাও,—শশী দেখলে রাগ কর্‌বে।" কিরণ বুঝিল, এ ত স্নেহের নিষেধ নয়। পুত্রের প্রতি এ দারুণ অভিমানের জ্বালা—

শ্লেষ ও বিদ্রূপের অভিব্যক্তিমাত্র! সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

শাশুড়ীর অঙ্গ বেড়িয়া কিসের একটা জ্বালা তখনও ছুটিয়া বহিতেছিল। তিনি কহিলেন, "যাও না গা, ঠাণ্ডায় এসে বসলে কেন? নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকগে না—"

করুণ স্বরে কিরণ কহিল, "বসি না মা, একটু—কোন অসুখ করবে না। একলাটি চুপ করে আর শুয়ে থাকতে পাচ্ছি না—"

শাশুড়ী কহিলেন, "কেন? শশী কোথায় গেল? বৌকে সে একটু আগ্‌লে বসে থাকৃতে পারলে না?"

কথার বিষে যদি মানুষের মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে শাশুড়ীর এই কথায় কিরণ আর এক দণ্ডও বাঁচিত না। তাহার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। চারিধারে সমস্ত পৃথিবীটা আগুনের গোলার মতই ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে, বোধ হইল। স্বামীর উপর দারুণ অভিমানও জন্মিল। কেন তিনি অষ্ট প্রহর এমন করিয়া তাহার কাছে-কাছে থাকেন? রোগ কি কাহারো স্ত্রীর হয় না? তবে উঁহার কেন এত বাড়াবাড়ি? সময়ে স্নান নাই, আহার নাই,—লেখাপড়া সব বিসর্জ্জন দিয়া চিন্তা-মলিন ক্লিষ্ট মনে প্রত্যেক খুঁটিনাটি লইয়া চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকা! কি এ নির্লজ্জতা! সকলের কাছে তাহার যে এখন মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিয়াছে! রোগের চেয়ে এ শ্লেষের বেদনা যে আরও অধিক, আরও রূঢ়!

কিন্তু এমন কথার পর আর সেখানে বসিয়া থাকাও চলে না। বসিয়া থাকিলে আরও কি শুনিতে হইবে! তাই কিরণ কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার দেওয়ালে ভর দিয়া আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কান তাহার ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল, মাথার দপ্‌দপানিটা বিষম বাড়িয়া উঠিয়াছিল, দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝা বুকের মধ্যটাকে অত্যন্ত ভারী করিয়া তুলিয়াছিল শুইয়া পড়িয়া সে অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল।

এত লোক মরে, সে কেন মরিল না? কিন্তু তখনই স্বামীর কথা মনে পড়িল। আহা, এত যত্ন, এত সেবা, এমন ভালবাসা,—কোন্ নারী তাহার স্বামীর কাছে পাইয়াছে? মানুষের মন স্বার্থ একেবারে ছাড়িতে পারে না। স্বামীর ভালবাসার কথা মনে পড়াতে তাহার যে এতটুকু গর্ব্বও না বোধ হইল, এমন নহে। হায়, এমন স্বামীর মনে কষ্ট দিয়া সে মরিবে! না, স্বামী তাহা হইলে উন্মাদ হইয়া যাইবেন। কিন্তু তবু পাশ-বদ্ধা হরিণীর মত, এ কঠিন কথা, মুখ-ভার ও শ্লেষ-বিদ্রূপে রচা জালে পড়িয়াও যে দিন আর কাটানো যায় না! পোড়া শরীরও কি সারিতে জানে না? কিরণের চোখ ফাটিয়া ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুর নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় ঘরে কাহার পদ-শব্দ শুনা গেল। কিরণ বুঝিল, স্বামী আসিয়াছেন। বালিশে মুখ ঘষিয়া চোখের জল মুছিয়া সে স্বামীর পানে চাহিল। শশী তখন কাগজের মোড়া খুলিয়া আঙ্গুর, বেদানা ও নাশপাতিগুলা বাহির করিয়া আর্শির টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিতেছিল। কয়দিনে স্বামীর চেহারা এ কি হইয়া গিয়াছে! গৌর কান্তি মলিন হইয়াছে, চোখের নীচে কে যেন কালির মোটা রেখা টানিয়া দিয়াছে!

কাজ শেষ করিয়া শশী একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "আটটা বেজে গেছে—কিরণ, তোমার ওষুধ খাওয়া হয়নি যে—"

"থাকৃগে—আর খায় না—" চোখের জল মুছিলেও কিরণ স্বরটাকে পরিষ্কার করিতে পারে নাই।

ছোট গ্লাশে ঔষধ ঢালিয়া শশী আসিয়া বিছানায় কিরণের পাশে বসিল। তাহার ললাটের উপর হইতে বিস্রস্ত চুল কয়গাছা সরাইয়া দিয়া কহিল, "নাও—ছি, লক্ষীটি, ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।"

কিরণ স্বামীর পানে চাহিল। স্বামীর মুখে এখনও তেমনি উৎকণ্ঠার ভাব! সে কহিল, "তুমি বাবু পাগল করলে। সেরে উঠেছি ত, এখনো ঘড়ি ধরে ধরে ওষুধ খাওয়ানো—কি এ?"

"না খেলে নয় যে, কিরণ!"

"তা বেশ ত! তোমারি দেবার দরকার কি, বাবু? আমি কি নিজে নিতে পারি না, এখন—" স্বামীর মুখের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া এমন কাতর পাণ্ডু শ্রী ধারণ

করিল যে, কিরণ থামিয়া গেল, এবং ঔষধটুকু পান করিতে আর এতটুকু আপত্তি বা বিলম্ব করিল না।

৩

পরদিন ডাক্তার আসিয়া কিরণের জন্য নূতন একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া শশীকে কহিলেন, "পশ্চিমে যাওয়ার কি ঠিক করলেন? বলছি আপনাকে, এ শুধু ওষুধের কাজ নয়। ঠাঁইনাড়াটা ভারী দরকার। অনর্থক দেরী করবেন না।" শশীর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। পশ্চিমে পাঠাইতে তাহারই কি অসাধ? কিন্তু কি করিবে সে? বাড়ীতে কেহই যে সে কথাটা বুঝিতে চাহে না! তাহার হাতেও পয়সা নাই, কিছু নাই,—সে যে একান্তই দুর্ভাগা, লক্ষ্মীছাড়া!

তবু এমন নিতান্ত উপায়হীন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। যেমন করিয়া, যে করিয়া হৌক, ব্যবস্থা চাইই—নহিলে বিলম্ব হইলে কি জানি, অদৃষ্টে কি ঘটিতে পারে! কিন্তু কি উপায় সে করিবে? কি উপায়?

কোনমতে নিয়ম রক্ষা করিয়া দুই-চারিটা ভাত উদরে পুরিয়া বই হাতে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় কিরণের পানে একবার চাহিয়া দেখিল। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কালো চুলের রাশিতে কে যেন তামার কষ্ লাগাইয়া দিয়াছে, চুলগুলা একান্তই শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শীর্ণ দেহখানি রৌদ্রতপ্ত লতার মতই শুকাইয়া উঠিয়াছে! জল চাই, জল চাই,—নহিলে এ লতাটিকে কিছুতেই বাঁচানো যাইবে না। কিন্তু কোথায় জল? মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য নিতান্ত নির্ম্মম তেজে অকরুণ তপ্ত অনল-ধারা বর্ষণ করিতেছে! সে তাপে সারা বিশ্ব বুঝি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়! শশীর সমস্ত অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল।

কিরণ কিন্তু ঠিক ঘুমাইতেছিল না। অত্যন্ত দুর্ব্বলতার জন্য তাহার ইন্দ্রিয়গুলা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুইটা আপনা হইতেই কখন যে মুদিয়া যায়, আবার আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে, কিরণের তাহা সকল সময়ে খেয়ালও থাকে না। আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। তবু শশী কাছে থাকিলে, কোথা হইতে যেন সারা দেহে একটা শক্তি আসে। মুখে কথা ও হাসির রেখা জোয়ারের জলের মতই ফুটিয়া ছুটিয়া চলে।

শ্বশুর বাহিরের দালানে খাইতে বসিয়াছিলেন। শাশুড়ী নিকটে বসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছিলেন, "আজ বোধ হয় একবার বেরুল। লেখা গেল, পড়া গেল, চব্বিশ ঘণ্টা বৌকে আগলে বসে আছে! বৌ ওর স্বর্গে বাতি দেবে!"

শ্বশুর বলিলেন, "তা থাক্, মোদ্দা এমন হরঘড়ি ডাক্তার ডাকা কেন? এত পয়সা জোগায় কে? নবাবদের ঘরেও যে এমন হয় না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "তখনই বলেছিলুম, দেখে-শুনে একটা পুঁয়ে-রোগা বৌ নিয়ে এসেছ! যেমন আমার বরাত! ছেলের বিয়ে দিয়ে পরের মেয়ে ঘরে আনব, তাতেও উৎপাত। ঘরের মেয়ে হলেও নয় বুঝতুম—"

কথাগুলা কিরণ স্পষ্ট শুনিতে পাইল। আপনা হইতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। অঞ্চল টানিয়া চোখের জল মুছিয়া সে ভাবিল, পোড়া চোখে এত জলও ছিল! লেপখানা টানিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহাতে আবৃত করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বিধাতার নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিল, "কি পাপ করেছি ভগবান্, যে এত দুঃখ দিচ্ছ! এ রোগের জ্বালা যে আর সহ্য হয় না। সবাইকে জ্বালাতন করে তুলেছি। হয় সারিয়ে দাও, নয় মেরে ফেল। আর ভুগতে পারি না গো—"

অপরাহ্নে স্বামী আসিয়া কিরণের মাথায় হাত রাখিয়া ঈষৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিল, "কিরণ—"

লেপের আবরণ সে টানিয়া ফেলিল। কিরণের চোখের কোণ দুইটা তখনও সিক্ত ছিল। কিরণ চোখ খুলিলে শশী দেখিল, তাহার চোখ দুইটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে হাত রাখিয়া দেখে, কপাল তপ্ত নহে। সে আশ্বস্ত হইল। কহিল, "এ ওষুধটা নতুন

বেরিয়েছে—কত ঘুরে তবে একটি দোকানে পেলুম। খুব ভাল ওষুধ! নাও, খাও দেখি।"

কিরণ অচপল স্থির দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া রহিল। শশী আবার কহিল, "খেয়ে ফেল, কিরণ।"

কিরণ সহসা পাশ ফিরিল। শশী কহিল, "পাশ ফিরলে যে! খাবে না?"

কিরণ কহিল, "না।" তাহার স্বর গাঢ়।

শশী কহিল, "কেন খাবে না, বল! রাগ করেছ?"

"না।"

"তবে?"

কিরণ আবার স্বামীর দিকে ফিরিল। স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল, "কেন বাবু, তোমার এত বাড়াবাড়ি? তোমায় বলছি, আমি সেরেছি, তবু তুমি শুনবে না? কেবল ডাক্তার আর ওষুধ, ডাক্তার আর ওষুধ—পয়সার ছড়াছড়ি! সত্যি বলছি, দিবা-রাত্তির এমন জ্বালাতন করলে—" কথাটা কিরণ শেষ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

শশী তখন বিছানায় বসিয়া কিরণের মাথা আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইল। সস্নেহে মুখের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল, "কিরণ"—

কিরণ পাশবালিসটাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া দেওয়ালের পানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আমি শুনবো না, তোমার কোন কথা আমি শুনবো না। এত করে বলি তোমায়—"

কম্পিত স্বরে শশী কহিল, "কি বল?"

কিরণ কহিল, "চব্বিশ ঘণ্টা তোমায় আমার কাছে এমন করে থাকতে হবে না। তুমি যাও—তোমার কি কাজ নেই? লেখাপড়া কি বিসর্জ্জন দিয়েছ? কলেজে ত কখনও যেতে দেখি না।"

অনুমানে শশী ব্যাপারটা কতক বুঝিল। সে বুঝিল, কয়দিন ধরিয়া বাড়ীতে যে একটা বিশ্রী ঝড়ো হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে, তাহারই একটা আঘাত আসিয়া কিরণকে সদ্য নাড়া দিয়া গিয়াছে! সেই ডাক্তার, পয়সা ও লেখাপড়ার অনুযোগ! ক্রোধের একটা রক্ত-শিখা বিদ্যুতের মত ছুটিয়া তাহার অন্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধ! এ ক্রোধে কাহারও কেশাগ্র কম্পিত হইবে না! নিজেই সে শুধু জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইবে।

ক্রোধটাকে চাপা দিয়া সহজ ভাব দেখাইয়া শশী আবার কহিল, "বেশ ত! আমি পড়তে যাচ্ছি—হামেশাও আর এখানে থাকব না। তুমি আগে ওষুধটুকু খেয়ে ফেল, তার পর দেখ, আমি তোমার কথা রাখি কি না।"

"না, আমি বলেছি ত ওষুধ আর খাব না।"

"খাবে না?" শশীর স্বর স্থির, কঠিন।

কিরণও তেমনই স্বরে কহিল, "না, কখনও খাব না।"

সমস্ত জ্ঞান যেন শশীর নিমেষে উবিয়া গেল। কোল হইতে কিরণের মাথা বালিশে নামাইয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "খাবে না? বেশ, খেয়ো না। কিন্তু আমিও তা হলে কি করব, জানো? বিষ খাবো,—তা হলেই ত তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

কিরণ দেখিল, শশীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা পাগলের চোখের মতই জ্বলিতেছে! শশীকে সে ভাল করিয়াই চিনে। এমন অবস্থায় বিষ খাওয়াটা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভবও নয়!

ব্যাপারটা রীতিমত সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক নয়। তাই সে চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ফেলিল; হাসিয়াই কহিল, "নিশ্চয় সন্তুষ্ট হব। তুমি বিষ খেলে আমি সন্তুষ্ট হই, এটা তুমি এতদিন কেন বুঝতে পারনি, বল দেখি? আমাকে মিছে খালি কষ্ট দিচ্ছ?" শশী কোন উত্তর দিল না, কিরণের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরণ কহিল, "ওগো, খাও না বিষ—আমায় সন্তুষ্ট কর।"

শশী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। একে স্ত্রীর এই দুর্ব্বল শরীর—রূঢ় কথাটা এ সময় বলা ঠিক হয় নাই। সে বলিল, "ওষুধটা খেয়ে ফেল।"

কিরণ ঔষধ পান করিল; পানান্তে কহিল, "এটা ত খেতে বেশ! সেটা এত মিষ্টি ছিল যে খেলে গলা জ্বালা করত। এ মোটে একটি দোকানে পেলে? সাহেবদের দোকানে বুঝি?"

শশী সস্মিতভাবে কহিল, "হ্যাঁ।"

কিরণ দেখিল, শশীকে সে দুইটা সহজ কথায় বেশ ভুলাইয়া ফেলিয়াছে। আহা, এমন সরল, সহজ মানুষ, শুধু দুইটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশীমাত্র! তাহারও মনে সে কষ্ট দেয়! স্বামী! কোথায় তাহাকে সেবা করিবে, কর্ম্মে তাহার সঙ্গিনী হইয়া সহানুভূতি ও শক্তি দিবে, তাহা না করিয়া নিজের রুগ্ন শরীর লইয়া তাহাকে কষ্ট দিয়া শুধু সেবা আদায়ই করিতেছে! নারী হইয়া স্বামীকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে, তাঁহার নিকট হইতে সেবা যে আদায় করে, কি সে দুর্ভাগিনী! তাহারই জন্য স্বামী আজ গৃহে অহরহ রূঢ় কথা শুনিয়া বেড়াইতেছে, অনাদরে দিন কাটাইতেছে! এ পাপের কি আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে?

শশী কহিল, "কি ভাবছ, কিরণ?"

কিরণ কহিল, "আচ্ছা, মিছিমিছি পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকো কেন? এখন ত শুধু খবর দিলেই চলে।"

শশী কহিল, "মাঝে মাঝে দেখা চাই বই কি।"

কিরণ কহিল, "বাবার চেয়ে মার চেয়ে তুমি অবশ্য বেশী কিছু বোঝ না। তুমি হলে গে ওঁদের ছেলে। দরকার হলে ওঁরাই ডাকবেন—তুমি কেন কর্ত্তামি কর? তাই আমি ওষুধ খাব না, বল্‌ছিলুম।"

এতক্ষণে, শশীর কাছে সমস্তটা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, সে চলিয়া যাইবার পর, সকালে ডাক্তার-আনার ব্যাপার লইয়া নিশ্চয় গৃহে কোন কথা উঠিয়াছিল। ডাক্তারকে দেখিয়া পিতার মুখ আজ বেশই রুদ্র কঠিন ভাব ধারণ করিয়াছিল! ডাক্তারকে ডাকিয়া একটা কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। ঠিক!

সে কহিল, "আমি চলে যাবার পর বাবা কি মা কিছু বলেছিলেন বুঝি?"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনই ভাব দেখাইয়া কিরণ কহিল, "কি বল্‌বেন?"

"এই ডাক্তারের কথা—টাকাকড়ির কথা?"

কিরণের বুকের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একটা দ্বন্দ্ব বাধিল। কে যেন শপাৎ করিয়া সজোরে তাহার মুখের উপর চাবুক মারিল। এ সব কি কথা? তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল।

একটা ঢোক গিলিয়া কিরণ কহিল, "না, তা কেন?"

"তবে তুমি ও কথা তুললে যে?"

"আমার নিজের মনে হচ্ছিল, তাই।"

"বটে! দুষ্টু—"বলিয়া শশী কিরণের পাশে বসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার শীর্ণ কচি ঠোঁট দুইখানি রাঙাইয়া তুলিল।

৪

সেদিন দুপুরবেলায় শশী বাড়ী ছিল না। কিরণ বিছানায় শুইয়া একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়িতেছিল। বই-পড়ায় ডাক্তারের নিষেধ ছিল। কিন্তু সারাদিন চুপ করিয়া আর বিছানায় পড়িয়া থাকা যায় না, গল্প করিতেও কেহ নাই,—তাই সে কাঁদিয়া-কাটিয়া শশীর কাছ হইতে একটু-আধটু-পড়িবার অনুমতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। তবে সর্ত্ত ছিল, দুই পৃষ্ঠা করিয়া পড়িয়া দশ মিনিট বিশ্রাম লইতে হইবে। আপনার মাথার দিব্য দিয়া শশী বলিয়া গিয়াছে, এ সর্ত্তের এক তিল যেন ব্যতিক্রম না হয়!

বাহিরে প্রতিবেশিনীর দল জটলা বাঁধিয়া মজলিস পাকাইয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতার বাজার-দর, পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া, দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে ও-পাড়ার নীপুর মার ঠেকার-দেমাক, গাঙ্গুলি-বৌয়ের বেহায়াপনা ও বিন্দুর বোন্ সিন্ধুর স্বামীর দৌরাত্ম্যের আলোচনা, কিছুই সে মজলিসের মন্তব্য এড়াইবার সুযোগ পায় নাই। সহসা ও-পাড়ার গদার পিসী দুই আঙুলে টিপিয়া গুল লইয়া কতক ঠোঁটের আড়ে ঢালিয়া কতক বা ঝাড়িয়া উড়াইয়া বাটীর গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার বৌয়ের কি আজও অসুখ সারল না, বাছা? হামেশাই ত দেখি, ডাক্তার আস্‌ছে! ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে যে চড়া পড়ে গেল! কেমন অসুখ এ?" কথাটা বলিয়া কিরণের ঘরের দ্বারে আসিয়া ভিতরে একবার উঁকি পাড়িতেও তিনি ভুল করিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন, "আর বলো না খুড়ী, বৌয়ের রোগ নিয়ে হাড় আমার কালি হয়ে গেল! ছেলে অবধি পর হতে চলল।"

গদার পিসী কহিলেন, "পর, কি রকম ?"

গৃহিণী কহিলেন, "কি রকম কি আবার! বৌকে নিয়ে ছেলে পশ্চিম যেতে চায়। তা বললুম, এত লোকের অসুখ হচ্ছে—এখানে কি সারছে'না ? তা ছেলে নুটিশ দিয়ে গেছে, পশ্চিমে সে যাবেই। মত না দাও ত চাই না মত! আমি নিয়ে যাব!"

ক্ষান্ত ঠাকুরাণী আর তিনটি সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া তাস খেলিতে বসিয়াছিলেন। পড়তা নিতান্তই খারাপ দাঁড়াইয়াছিল। ইস্কাবনের দশের উপর রঙের সাতাখানি তুরুপ করিয়া তিনি কহিলেন, "ওমা, বলিস কি দিদি ? তিন-তিন্‌টে পাশ করিয়ে ছেলেকে মানুষ করে তুললি, আর সেই ছেলে পর হতে চায়!"

ঘোষ-গৃহিণী পিট্ কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল, "তা আজকালকার পাশ-করা ছেলের দল কি মা-বাপকে মানে, না, তাদের কথা শোনে ?—ও কি গো, ছোট বৌয়ের খেলা যে—বৌই হলগে ওদের সর্ব্বস্ব!"

গদার পিসী প্রকাণ্ড শরীরখানি কোথায় রাখিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এক্ষণে 'আত্তি' জানাইয়া গৃহিণীর পাশে বসিয়া কহিলেন, "বেশ! ছেলে যে নিয়ে যাবে, তা পয়সা পাবে কোথা ?"

গৃহিণী কহিল, "কে জানে, কোথায় পাবে! ইনি বারণ করলেন, কত বোঝালেন—তা ছেলে কি কিছু কানে করলে। বৌ-বৌ করে' একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে!"

ক্ষান্ত ঠাকুরাণী কহিলেন, "তা পাগল বৈ কি, দিদি। বৌয়ের জন্যে বাপ-মার কথা ঠেলবে! তাদের চোখে জল ফেলাবে! অমন লেখা-পড়ার মুখে আগুন!"

মোহিনীর মা এতক্ষণ বসিয়া চুপ করিয়া তাস খেলা দেখিতেছিল। সে বলিল, "তবু ত ঐ বৌ—বারো মাসই রোগ লেগে আছে!"

ও পাড়ার বিরাজ এতক্ষণ একটা পানের উমেদারী করিয়া ফিরিতেছিল। গৃহিণী কথাটা কানে তুলিয়াও তুলেন নাই। তাই তাঁহার কানটাকে সচেতন করিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ বুঝিয়া সহানুভূতি জানাইয়া সে কহিল, "আহা, তোমার বরাত, মামী। এই বয়সে কোথায় দু'দিন জিরুবে, বৌয়ের সেবা খাবে, তা না এই শরীরে সংসার সামলে আবার সেই বৌয়েরই সেবা করে সারা হলে!"

গৃহিণী কহিলেন, "আর বলিসনে বিরাজ। ওমা, তুই একটা পান চেয়েছিলি না ? আমার মনেও ছিল না। মনের ত ঠিক নেই, শশীর আচরণে—"

এমনই ভাবে বিস্তারিত আলোচনাদির পর প্রতিবেশিনী জুরীর দল সেদিন সর্ব্ববাদীভাবে যে মতটি প্রকাশ করিয়া গেলেন, তাহার সার মর্ম্ম ইহাই দাঁড়ায় যে, শশী ছেলেটি লেখাপড়ায় যেমন ভালো, স্বভাবেও তেমনই নিরীহ ছিল। বাপ-মার প্রতি ভক্তি-বাধ্যতারও তাহার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কোথা হইতে এক সর্ব্বনাশিনী চিররুগ্না বৌ আসিয়া তাহার সে-সব গুণ টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘোমটা-ঢাকা মুখে কথাটি নাই বটে! কিন্তু এমন ভালমানুষ সাজিয়া থাকিলে কি হয় ? কিরণের মনের মধ্যে দুরভিসন্ধির জাল মাকড়সার জালের মতই অহরহ দীর্ঘ বিস্তীর্ণ হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং সেই জালে পড়িয়াই বেচারা শশী আজ এতখানি নির্জীব অপদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিছানায় পড়িয়া কিরণ বইখানার উপর চোখ মেলিয়া রাখিলেও কান তাহার এই বচন-সুধার সবটুকুই নিঃশেষে পান করিতেছিল। শুনিবে না বলিয়া কান দুইটাকে চাপা দিলেও কথাগুলা সবলে সে লেপের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কানের মধ্যে হু-হু করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছিল।

৫

সন্ধ্যার পর শশী আসিয়া বলিল, "সমস্ত জোগাড় করেছি, কিরণ। খুব সুবিধে হয়েছে। আমার এক বন্ধু—কর্ম্মাটারে তাদের বাড়ী আছে। লোকজনের বন্দোবস্তও ঠিক আছে। সে বাড়ী তারা আমাদের ছেড়ে দেবে। ভাড়া লাগবে'না। থাকবার খরচের জন্য ঘড়ি, ঘড়ির চেন আর হীরের আংটি, যা তোমাদের বাড়ী থেকে বিয়ের সময় পেয়েছিলুম, তাই বেচব, মনে করচি। বেচে পাঁচশ' টাকা হতে পারে। তাতে দু-তিন মাসের খরচের জন্য ভাবতে হবে না। কাল-পরশুই তাহলে কথাটা ঠিক করে ফেলি,—কি বল ?"

কিরণ জোর করিয়া মনকে আজ বশ করিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ সে কিছুতেই অভিমান বা রাগ করিবে না. বেশ সহজভাবেই স্বামীকে সব বুঝাইবে। যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আপনার দুর্ব্বল শরীর মনের সকল শক্তি দিয়া সে তাহা রোধ করিবে। তাই সে প্রথমেই ধীর কণ্ঠে কহিল, "বাবাকে মাকে বলেছ? তাঁদের মত নিয়েছ?"

শশী কহিল, "তাঁদের মত নেবার কোন দরকার নেই। তাঁরা সে মত দেবেনও না। আর আমি যখন এ ব্যাপারে ওঁদের কাছ থেকে একটা পাই-পয়সার জন্যেও হাত পাতছি না, তখন মিছিমিছি আবার গণ্ডগোল তোলবার দরকার কি?"

প্রতিবেশিনীদের দুপুরবেলাকার কথাগুলা কিরণের কেবলই মনে পড়িতেছিল। কিন্তু সে কথাগুলা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত! তাহার মন নীচ নয় যে, সেই-সকল বুদ্ধি-ও-হৃদয়হীনা নারীগুলার অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বচনের জন্য দুঃখ বা রাগ করিবে! 'তবু ত ঐ বৌ'—এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। কিন্তু তখনই সে মনকে চাবুক মারিল। এ কথা এখনও সে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে! একটা নিতান্ত কোমল তৃণকে কাঁটা হইয়া তাহার বুকে ফুটিতে দিবে? না, কখনও না। টানিয়া সে তৃণটাকে মন হইতে পূর্ব্বেই সে ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কথা ত সে-সকলের আলোচনা লইয়া নহে; কথা তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীকে লইয়া। তাহার জন্য তাঁহাদের ছেলে আজ পাগল হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহাদের কথা সে ঠেলিয়া চলিতে চায়! না, তাহা হইবে না। কিরণ কিছুতেই তাহা হইতে দিবে না। তুচ্ছ একটা স্ত্রীর জন্য স্বামী আপনার মা-বাপের মনে কষ্ট দিবে!

কিরণ কহিল, "দেখ, বাপ-মার মত না নিয়ে কোন কাজ করলে, কখনই তাতে ভাল হয় না। তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন, আর তুমি—"

বাধা দিয়া শশী কহিল, "কিন্তু তাঁরা যদি অবুঝ হন?"

কিরণ বলিল, "ও কথা মনেও তুমি স্থান দিয়ো না। বাপ মা অবুঝ, এ কথা মনে করলেও পাপ। তাঁরা যদি বোঝেন, পশ্চিমে গিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না, এখানে থাকলেও যদি আমি না সারি ত সেখানে নিয়ে গেলেও আমাকে বাঁচানো যাবে না—তা হলে—?"

কথাটা শুনিয়া শশীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোখের পিছনে অশ্রুর একটা তরঙ্গ আসিয়া ঠেলা দিল। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া সে বলিল, "তবু লোকে তার প্রাণপণ চেষ্টা ত একবার করে! তাতে যদি বিপদও ঘটে, তাহলেও একটা সান্ত্বনা এই থাকে যে সে তার যথাসাধ্য করেছে—তার পর ভবিতব্য!" অশ্রু বাধা মানিল না। শশীর চোখের উপর ধীরে ধীরে সে একখানি অভ্রের পাৎলা পরদা বসাইয়া দিল।

কিরণ হাসিয়া কহিল, "খারাপটাই তুমি ধরছ কেন? ওঁরা যদি বোঝেন, এখানে থেকে ক্রমে ক্রমে আমি সেরে উঠব, তাহলে হাঙ্গাম করে মিথ্যে পশ্চিম যাবার দরকার কি? মা-বাপের মত গুরু নেই। ওঁদের কথার উপর তোমার বিশ্বাস হয় না? আমার ত হয়।"

পাগল! পাগল! শশী ভাবিল, কিরণ পাগল হইয়াছে। নহিলে এই-সব নিতান্ত লঘু তর্কে এত বড় সমস্যার সে মীমাংসা করিতে চায়? সে কহিল, "না কিরণ, এ সব পাগলামির কথা নয়। তুমি বাধা দিয়ো না। আমার কথা শোন—চল, সেরে উঠবে। তুমি সেরে উঠলে যে শুধু তোমারই লাভ, তা নয়, আমিও সারব, মানুষ হব। না হলে ভেবে-ভেবে আমিই এখানে মারা যাব।"

কিরণের মনটা অধীর বেদনায় হু-হু করিতেছিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া শশীর পানে চাহিয়া সে কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো। আমার কাছে বসো। বেশ করে শোন, বোঝ সব।"

শশী কহিল, "ও আমায় তুমি বোঝাতে পারবে না, কিরণ। ডাক্তার বিশেষ করে' বলে দিয়েছে—না বুঝলে সে-ই বা বলবে কেন?"

কিরণ কহিল, "ডাক্তারকে তুমি ব্রহ্মা বলে' মানো, দেখছি। তার কথা একেবারে বেদ-বাক্য বলেই ধরেছ।"

কিরণ দেখিল, এ সব কথায় স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা হইবে। আসল কথা খুলিয়া বলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু কি করিয়া সে সে কথা বলিবে? মাতা ও পিতার

বিরুদ্ধে কি করিয়া সে তাঁহাদের সন্তানের কাছে নালিশ রুজু করিবে যে, ওগো, আমাকে লইয়া চিকিৎসা ও বায়ু-পরিবর্ত্তনের এতখানি ঘটা করিলে তাঁহারা বিষম চটিয়া যাইবেন। তোমায় তাঁহারা ত্যাগ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের কথা ঠেলিয়া চলিলে তুমিও তাঁহাদিগকে বৃদ্ধ বয়সে নিতান্তই অবাধ্য লক্ষীছাড়া কুপুত্রের মত ত্যাগ করিয়াছ, বুঝিবেন!

তবু কোন উপায়ে ইহার আভাষ একটু দিতেই হইবে, নহিলে এ সমস্যার যে কিছুতেই খণ্ডন হয় না! চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। সে কহিল, "দেখ, এ রকম করে গেলে কিন্তু পাড়ার লোকে তোমার নিন্দে করবে। বলবে, বৌকে মাথায় করে বুড়ো বাপ-মার কথা ঠেলে চলে গেল। লোকে তোমাকেই দুষবে, ছি-ছি করবে।"

শশী কহিল, "করুক ছি-ছি! লোকের কথা অত শুনে চললে কেউ কখনও কর্ত্তব্য করতে পারে না। আমি সে ছি-ছির ভয় করি না মোটে, কিরণ, তা কি তুমি আজও বুঝতে পার নি?"

কিরণ দেখিল, প্রতিজ্ঞা তাহার থাকে না। কঠিন তাহাকে হইতেই হইবে! তাই সে একেবারেই কঠিন স্বরে কহিল, "তবু তুমি নিয়ে যাবে? মা-বাপের কথা ঠেলে নিয়ে যাবে! এই তোমার ইচ্ছে! বেশ, তবে চল, কিন্তু আমিও বলছি, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমায় তুমি রাখতে পারবে না। সারা ত দূরের কথা! সেখানে গেলে এ-রাত্তিরও আমি কাটতে দেব না। যেমন করে পারি, মরবোই।"

শশী দেখিল, কিরণের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—মুখ অস্বাভাবিক রাঙা হইয়াছে, চোখ দুইটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে, এমনই ভাব! নিশ্বাসও সজোরে বহিতেছে!

এ সে কি করিতেছে! সে পাগল, না দস্যু? তাড়াতাড়ি সে কিরণের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, "কিরণ, আমায় মাপ কর। আমি আর কিছু বলব না।"

কিরণ ফুঁপাইতেছিল; কথা কহিতে পারিল না। স্বামীর মুখের উপর মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বাতি নিবিয়া গিয়াছে। অন্ধকার ঘর। শশী নিদ্রা যাইতেছে। সহসা কিরণ তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল, "ওগো—"

ধড়মড়িয়া শশী উঠিয়া বসিল, কহিল, "কেন, কিরণ?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিরণ কহিল, "জানলাটা খুলে দাও,—আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে! বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শশী উঠিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল! কিরণ কহিল, "ওটা কেন? মাথার শিওরেরটা।"

"ঠাণ্ডা লাগবে যে, কিরণ!"

"না, না—ওগো, দাও খুলে।"

শশী মাথার দিকের জানালাটাও খুলিয়া দিল। বাহির হইতে উষার সোনালি কিরণের একটা রশ্মি বায়ু-তরঙ্গে গা ঢালিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিরণ কহিল, "আঃ!"

মশারিটা টানিয়া তুলিয়া শশী কিরণের পানে চাহিল। এ কি! মুখে তাহার কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে! ঘামে চুলগুলা একেবারে ভিজিয়া উঠিয়াছে! সমস্ত দেহেও যেন কে জল ঢালিয়া দিয়াছে!

শশী কহিল, "রাত্রে ঘুম হয় নি?"

কিরণ কহিল, "না, না,—সারা রাত্তির শুধু ছট্-ফট্ করেছি। বুকের মধ্যে কেবলি হাঁপ ধরেছে।"

"আমায় ডাকোনি কেন, কিরণ?" বলিয়া কোঁচা দিয়া তাহার দেহ ও মুখের ঘাম মুছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া শশী ঘরের দ্বার খুলিবার উপক্রম করিল।

দেখিয়া কিরণ কহিল, "কোথা যাচ্ছ?"

"ডাক্তারের কাছে।"

"ওগো, না, না, যেয়ো না। দরকার নেই। যেয়ো না।"

সে কথা কানে না তুলিয়াই শশী ক্ষিপ্র বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে তখন দুই-চারিটা কাক ডাকিতে সুরু করিয়াছে। ঝাড়ুদার পথ ঝাঁট দিতেছিল। পথের ধারে

দূরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। শশী ছুটিয়া সেই গাড়ী ধরিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে চলিল। কায়মনে সে ভগবানকে ডাকিতেছিল, "হে হরি, ভালো করে দাও, কিরণকে আমার ভালো করে দাও। হে মা কালী—"

* * * * *

ডাক্তারকে লইয়া শশী যখন ফিরিল, বাড়ীর দাসী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রাঙ্গণে দ্বারে ছড়া-গঙ্গাজল দিতেছে। আর কাহারও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই।

উপরে উঠিতেই শশীর গা কাঁপিয়া উঠিল। পা অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছিল—কিছুতে যেন সে চলিতে চাহে না!

তাহার ঘরের দ্বার সে যেমন ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনই তাহা ভেজানো রহিয়াছে। দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার অগ্রে চলিলেন, শশী ঠিক তাঁহার পিছনে আসিতেছিল।

শয্যার সম্মুখে আসিয়া ডাক্তার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার পিছন হইতে মুখ বাড়াইয়া শশী দেখিল, বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কিরণ কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে! বালিশের নীচে মাথাটা হেলিয়া রহিয়াছে। হাত দুইটা খাটের ধারে লতার মতই ঝুলিয়া পড়িয়াছে! কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই! কিছুই নাই! যেন ফুটন্ত পদ্মটি মানুষের হাতের স্পর্শে শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে!

"কিরণ—"বলিয়া চীৎকার করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, কিরণের প্রাণহীন দেহখানি জড়াইয়া শশী বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

(গৃহস্থ—কার্ত্তিক)

বাউল-সম্প্রদায়—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

উপক্রমণিকা।

বাউল বাঙ্গালার একটি উপধর্ম্ম-সম্প্রদায়। অনেকে ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ধর্ম্মের বিপ্লব চলিয়াছিল; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া নানা সময়ে বঙ্গদেশে যে-সকল নব নব ধর্ম্মমত প্রচলিত হয়, বাউল তাহাদের অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহুদিন হইতে লক্ষিত হইলেও, ইহাদের রহস্য ও ইতিহাসানুসন্ধানে কাহাকেও বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় নাই। ইহার এক৹মাত্র কারণ, বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে, এই সম্প্রদায়ের বিবরণ ও রহস্য জানিবার কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। আর, যে দুই একজন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি বাউলদিগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্ত গ্রন্থাদিতে লিখিত শব্দসমূহের রহস্যাবৃত গূঢ় অর্থাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্যক্ সমর্থ হন নাই। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখারূপে এই বাউল-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রথম প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। * * ইহাদের মতানুসারে পরম-দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে মানব-দেহের মধ্যেই বিরাজমান আছেন; অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। * * ফলতঃ কেবল ঐ পরম-দেবতা কেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মনুষ্যের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহ-তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। * * প্রকৃতি-সাধনই ইহাদিগের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনেতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য ব্যাপার। * * ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে থাকে। * * ঐ প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত 'চারি চন্দ্রভেদ' নামে একটী ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল মহাশয়েরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারিটি চন্দ্রকে অর্থাৎ শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটি দেহ-নির্গত পদার্থকে, পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ঘৃণা-প্রবৃত্তি পরাভবের অন্য অন্য লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। * * ইহাদের মতে, বিগ্রহ-সেবা ও উপবাসাদি করা আবশ্যক নহে। * * ব্রজ-উপাসনাতত্ত্ব, নায়িকা-সিদ্ধি, রাগময়ী-কণা ও তোষিণী প্রভৃতি ইহাদের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। ঐ-সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। * * ইহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধ্যে দেহ-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-সাধন-সংক্রান্ত অনেকানেক নিগূঢ় ভাব সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে, এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। হইলেও প্রকাশ করিতে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে।"

তারপর রিজলে সাহেব (H. H. Ris'ey) তাঁহার The Tribes and Castes of Bengal নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে, এই বাউল সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

Baola (Sansk. Vayula, crazed or inspired), a gen-

eric term including a number of disreputable mendicant orders which have separated from the main body of Vaishnavas, and are recruited mainly from among the lower castes. They call themselves Nitay, Chaitanya, and Hari Das Baolas, after the great Vaishnava teachers. Differing from each other in minute points of ceremonial and social observance, the Baola sects agree in regarding pilgrimage to Vaishnava shrines as a sacred duty, and reverence the Gosains as their spiritual leaders. Flesh and strong drink are forbidden, but fish is deemed lawful food, and Ganja is freely indulged in. Baolas never shave or cut their hair, and filthiness of person ranks as a virtue among them. Ladu-Gopal, or the child Krishna, is the favourite object of worship; but in most akharas the charan or wooden pattens of the founder are also worshipped. Baolas as a class are believed to be grossly immoral, and are held in very low estimation by respectable Hindus.—page 347

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের মধ্যে কেহই বাউলের বিস্তৃত ইতিহাস বা বিবরণী প্রকাশ করেন নাই।

প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাস আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বাস্তবিকই বাউল-সম্প্রদায়ের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। যে গ্রন্থের সাহায্যে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, সেরূপ কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের বহু আখড়ায় এবং বহু প্রাচীন বাউলের কাছে অনেক হস্তলিখিত কড়চা ও পুঁথি আছে। এই সকল গ্রন্থে বাউলদিগের সাধন-ভজন ও রীতি-নীতির কথা সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায়-বহিভূ্ত কোন ব্যক্তির ঐ গ্রন্থগুলি দেখিবার কোন সুবিধা বা সুযোগ নাই। যখন বাউলগণ তাহাদের পুঁথি পাঠ করে, তখন যদি কোন অসাম্প্রদায়িক লোক সেই স্থানে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রন্থের 'ডোর' বন্ধ করিয়া আগমনকারীকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত বহু চেষ্টায় কোন ক্রমে ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোন গ্রন্থ সংগৃহীত হইলেও, গ্রন্থ-লিখিত বহু হেঁয়ালীপূর্ণ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এমন কি, তাহাদের তত্ত্বকথাপূর্ণ সঙ্গীতগুলিও এরূপ দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী-পূর্ণ যে, সেগুলির অর্থও সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না। আর এই-সকল গানের ও গ্রন্থনিহিত অংশের আধ্যাত্মিক অর্থ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির দ্বারা বুঝাইয়া লইলেও, তাহা এত অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট যে, সাধারণ্যে প্রকাশের অযোগ্য।

আমি নিম্নলিখিত অমুদ্রিত পুঁথিগুলি আলোচনা করিয়াছি :—

(১) স্বরূপ দামোদরের কড়চা (২) স্বর্ণটীকা, (৩) চন্দ্রকলিকা বা চম্পককলিকা, (৪) শ্রীলবঙ্গচরিত্র, (৫) মীরাবাইয়ের কড়চা, (৬) দিলকিতাব, (৭) ভাবামৃত, (৮) পঞ্চতত্ত্ব, (৯) আত্মতত্ত্ব, (১০) রসসার।

তদ্ভিন্ন এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলিও আলোচনা করিয়াছি :—

(১) বিবর্ত্ত-বিলাস, (২) স্বরূপ দামোদরের কড়চা, (৩) মীরাবাইয়ের কড়চা, (৪) আত্মতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব, (৫) শ্রীরসকদম্ব-কলিকা (৬) রসতত্ত্বসার।

বাউল-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় সংগৃহীত বিষয় ও তথ্য নিম্নলিখিত বিষয়-বিভাগে আলোচিত হইবে।

বিষয়-বিভাগ।

১। বাউল শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি। ২। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে ইহার উল্লেখ। ৩। ধর্ম্মবিপ্লব ও বাউল-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ৪। এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব। ৫। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য প্রবর্ত্তকগণ। ৬। বাউল-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি ও তাহাদের পরিচয়। ৭। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, ধর্ম্মাচরণপদ্ধতি ও সাধন-প্রণালী। ৮। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিচালনার্থ বিধি-নিষেধ। ৯। বাউলগণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি। ১০। ইহাদিগের বেশ-ভূষা। ১১। নেড়ানেড়ী, কিশোরী-ভজক, সহজিয়া দরবেশী প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত বাউল-সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্য। ১২। বিভিন্ন স্থানের বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয়। ১৩। প্রাচীন সময়ে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি এবং বর্ত্তমানকালে ইহাদের স্থিতি ও অবস্থান। ১৪। বর্ত্তমানকালে বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও অবস্থা। ১৫। সখের বাউল-সঙ্গীত-সম্প্রদায়। ১৬। বাউল-সঙ্গীত-সংগ্রহ।

১। বাউল-শব্দের অর্থ।

"বাউল" এই শব্দটীর অর্থ লইয়া বিশেষ গোল আছে। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "বাতুল" শব্দের প্রাকৃত রূপ "বাউল" হয়। কেরী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন অভিধানকারগণ "বাতুল" অর্থে বাউল লিখিয়াছেন।* হিন্দী ভাষায় এই শব্দটি "বায়ালো," "বাওল," "বাওলী" প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অশিক্ষিত লোকেরা "বাভলে," "বাউরা," "বাউরী" ইত্যাদি রূপেও ব্যবহার করিয়া থাকে।

অভিধান প্রভৃতি হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা এই—উন্মত্ত, বাতবিকারপ্রাপ্ত, পাগল, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ ইত্যাদি।

সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের পাগলের ন্যায় অপূর্ব্ব বেশভূষা, হাবভাব, চালচলন এবং নৃত্য-গীতের ভঙ্গী প্রভৃতি, ইহাদিগের "বাউল" নামকরণে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহাদিগের ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত উন্মাদলক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে বাউল নামে অভিহিত করিত। এইরূপে সাধারণ লোকে ইহাদিগের বেশভূষাদি বাহ্য লক্ষণাদি লক্ষ্য করিয়া, এবং ভগবদ্ভক্ত লোকে ইহাদিগের বাতুলবৎ প্রকৃত হৃদগত প্রেমোন্মত্ততা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগের "বাউল" নামকরণ করিয়াছেন। [শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাকুল হইতে বাউল নিষ্পন্ন মনে

---

* (ক) বাউল (from বাতুল mad)—mad, insane. A person who shouts or proclaims the name of a God.—A Dictionary of Bengalee Language by W. Carey, D. D., 1825.

(খ) বাউল—(বাতুল-শব্দজ)—বঙ্গদেশের গৌরাঙ্গভক্ত ভিক্ষুক-বিশেষ। ইহারা গান করিয়া ভিক্ষা করে।—Barat's Pronouncing Dictionary.

করেন ; আকুল হইতে আউলিয়া সম্প্রদায়ের নাম যদি হইয়া থাকে তবে ব্যাকুল হইতে বাউল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়]।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন, এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রাচীন নাম "বায়ুর"। এই বায়ুর শব্দ হইতে ক্রমে "বাউল" শব্দের উৎপত্তি। ভক্ত যখন বায়ুর মত ভগবানে মিশিয়া যাইতে পারে, তখনই তিনি প্রকৃত বায়ুর বা বাউল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। বায়ু যেমন নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া, সকল স্থানে সর্ব্বাবস্থায় যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, লোকে যখন আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া তেমনই ভাবে ভগবানে বিলীন হইতে পারে, তখনই সে প্রকৃত বাউল-পদবাচ্য হইবে।

বাউল এই শব্দটি অল্প রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলায় "বেড়ী" অর্থে "বাউলী" এবং ময়মনসিংহ জেলায় "ঘরবাড়ীশূন্য" এই অর্থে "বাউল্লিয়া" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত "বাউল্লিয়া" শব্দের অর্থ হইতে আমরা আর একটি নূতন কথা জানিতে পারিতেছি। বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা কেহই গৃহী নহেন, সকলেই ঘরবাড়ীশূন্য ত্যাগী পুরুষ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘরবাড়ীশূন্য বলিয়াও বোধ হয় ইহাদিগকে "বাউল্লিয়া" বলিয়া অভিহিত করিত।

বাউল শব্দ "বাতুল" এবং বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই উভয় অর্থেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। প্রাচীন সাহিত্যাদিতে বাউল শব্দের উল্লেখ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি প্রাচীন গ্রন্থসকল আজিও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং যে দুই চারিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বাউল শব্দ আছে কি না জানি না তবে যতগুলি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলীর পূর্ব্বে লিখিত কোন গ্রন্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ পাই নাই। বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর মধ্যে বাউল শব্দ নাই। তবে

"তোমার বিরহ-বেদনে বাউর সুন্দর মাধব মোর।"

এই পদে বাউর শব্দ বাতুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীর মধ্যে তিন স্থানে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

(১) "প্রেম-ঢল-ঢল যেমন বাউল বনের হরিণী তারা।"

(২) "বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা শুনি সে মুরলী-গীত।"

(৩) "শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।"

এই উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে প্রথম স্থলে বাউল শব্দের অর্থে "বায়ুগ্রস্ত" বুঝায়। দ্বিতীয় স্থলে "পাগল" এবং তৃতীয় স্থলে ক্ষিপ্ত বা ব্যাকুল অর্থে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

চৈতন্য-চরিতামৃতে "পাগল" অর্থে বহু স্থানে "বাউল" শব্দের উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম :—

(১) দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি।

(২) আমি ত বাউল এক কহিতে আন কহি,
কৃষ্ণের তরঙ্গে আমি সদা যাই বহি।

(৩) তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস,
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ।

মাধব দেব কৃত অসমিয়া রামায়ণের আদিকাণ্ডেও "পাগল" অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

সেহি সূর্য্যবংশে তুমি নৃপতি প্রধান,
স্ত্রীতে ভৈলাহা বাউল চিন্তা নাহি আন।

কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ক্ষিপ্ত অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ আছে :—

কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান,
বাউল হইল কিম্বা করি অনুমান।

এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাগল বা ক্ষিপ্ত অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রদায়বোধার্থক বাউল শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। তবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জ হইতে "শূন্যসংহিতা" নামে একখানি উৎকলীয় পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথির দুই স্থলে বাউল সম্প্রদায় অর্থে "বাউলী" শব্দের উল্লেখ আছে।

"গোরক্ষনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা,
মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা।"
"ঋষি তপী সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ,
রোহিদাস বাউলী কপিল যেতে সঙ্গ।"

অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে, এই পুঁথি ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে বাউল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। (ক্রমশ)

ভারতী (অগ্রহায়ণ)।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুনীলাল বসু —

সংক্রামতা প্রতিষেধের বিশেষ বিধি।

কলেরা (Cholera)—১। কলেরা মহামারীরূপে আবির্ভূত হইলে পেটের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। একবার মাত্র পাতলা দাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ জলমিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এসিড্ (Diluted Sulphuric acid) ১০ ফোঁটা এবং ক্লোরোডাইন্ (Chlorodyne) বা টিংচার ওপিয়ম্ (Tincture of Opium) ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাত্রা। বালকদিগকে বয়সের প্রতি বৎসর হিসাবে আধ ফোঁটা করিয়া উক্ত দুইটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তবে এক বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালককে অহিফেন সেবন করিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে অগ্রে ঔষধ সেবন করাইয়া পরে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। ২। বিকৃত বা দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্য (যেমন ফলমূলাদি) কাঁচা অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। তরকারি, মাছ, যাহা কিছু বাজার হইতে আসিবে, পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরে উহাদিগকে কুটিতে দিবে। সকল দ্রব্যই রন্ধন করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে ভক্ষণ করিবে। বাজারের মিষ্টান্ন এ সময়ে ব্যবহার না করাই মঙ্গল। সকল খাদ্য-সামগ্রী এরূপে রাখিবে যে তাহাদিগের উপর মাছি বসিতে না পারে। ৩। পানীয় জল ও দুগ্ধ ১৫ মিনিট কাল উত্তম রূপে ফুটাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে যাহাতে তন্মধ্যে কোনমতে ধূলি পড়িতে বা মাছি বসিতে না পারে। যে জলে মুখ ধুইবে, তাহাও যেন ফুটাইয়া লওয়া হয়। ফিল্টারের উপর এ সময়ে বিশ্বাস করিবে না। তৈজসপত্র সংস্কৃত হইবার পর উহাদিগকে ফুটন্ত জলে পুনরায় ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। কলেরা-রোগীকে স্পর্শ করিলে বা উহার সেবা করিলে কলেরা রোগ হয় না। রোগীর বমি ও মলের মধ্যে ঐ রোগের বীজ অবস্থিতি করে; উহারা কোন-

রূপে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই রোগে মল ও বমির সহিত তৎক্ষণাৎ কোনরূপ বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহা শুষ্ক খড় বা করাতের গুঁড়ার উপর ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য বিশোধক ঔষধের অভাবে উহার সহিত চূন মিশ্রিত করিয়া কলিকাতা সহরের ন্যায় যে-সকল স্থানে বদ্ধ ড্রেন্ আছে, তন্মধ্যে উহা ফেলিয়া দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তবে খোলা ড্রেন্, কাঁচা নর্দ্দমা বা জমির উপর ফেলিয়া দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। রোগীর মলস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি একদিন বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া একঘণ্টা কাল জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহারা নির্দ্দোষ হইয়া যায়। বিশোধক ঔষধে ভিজাইবার পর সাবান-জলে কাচিয়া লইলেও উহার সংক্রামকতা-দোষ নষ্ট হইয়া যায়, তবে জলে ফুটাইয়া লইলেই এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। এই-সকল বস্ত্রাদি কোন পুষ্করিণীর জলে কাচা উচিত নহে। পল্লীগ্রামে বাটী হইতে বহুদূরে মাঠের মধ্যে গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে সংক্রামক রোগের মলমূত্রাদি প্রোথিত করা যাইতে পারে। তবে নিকটে কোন জলাশয় থাকিলে এরূপ ব্যবস্থায় অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বে খড়ের উপর মলমূত্রাদি ঢালিয়া পুড়াইবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সহজ-সাধ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্। ৫। যাঁহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিবেন অথবা সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যেন বিশোধক ঔষধ ও সাবান-জলে হাত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ বা স্পর্শ করেন। রোগীর গৃহের মধ্যে কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। যাঁহারা রোগীর পরিবার-ভুক্ত নহেন, তাঁহাদিগের, রোগীর বাটীতে কোনমতেই জল পান বা কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। যাঁহারা পরিবারভুক্ত, তাঁহারা রোগীর গৃহ হইতে দূরে, হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কৃত স্থানে অত্যুষ্ণ জলে ধৌত বাসনে পক্কখাদ্যাদি গ্রহণ করিবেন। ৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় "খালি পেটে" থাকা উচিত নহে। আমাদের পাকস্থলীতে (Stomach) যে গ্যাষ্ট্রিক্ যুস্ (Gastric Juice) নামক অম্লগুণ-সম্পন্ন পাচক রস নির্গত হয়, কলেরার বীজ উহার সংস্পর্শে আসিলে শীঘ্র মরিয়া যায়। "খালি পেটে" থাকিলে এই রস নিঃসৃত হয় না, কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিলেই ঐ রস নিঃসারিত হইতে থাকে। সুতরাং তখন ঘটনাক্রমে দুই দশটা কলেরার বীজ উদরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও অম্লরস-সংযোগে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পেট খালি থাকিলে ঐ-সকল বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) মধ্যে গমন করে এবং তথায় অনুকূল-কারণ-সংযোগে উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়। ৭। বাটীর মধ্যে বা চতুঃপার্শ্বে কোনরূপ আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দিবে না। ইহাতে মাছির উপদ্রব হয় এবং মাছি দ্বারা কলেরার বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত ও খাদ্য-দ্রব্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকে। ৮। পয়ঃপ্রণালী, পাইখানা প্রভৃতি স্থান সর্ব্বদা ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবে। ৯। শরীর ও মন সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে। কলেরা-রোগীর সেবা করিবার প্রয়োজন হইলে কলেরা রোগকে কখন ভয় করিবে না। রোগ নিবারণের জন্য যে স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরে নিহিত আছে, শরীর ও মনের অবসন্নতা হেতু তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ১০। অনেক সময় সোডা ওয়াটার্, লেমনেড প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য দূষিত জলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই-সকল পানীয় গ্রহণ করিয়া সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হইলে এই-সকল পানীয় গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই—তাহা না হইলে এ সময়ে এই শ্রেণীর পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক সময়ে অপরিষ্কৃত জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময়ে বরফ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। ১১। কলেরার "টিকা" (Inoculation) লইলে কিছু দিনের জন্য ঐ রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। ইহাতে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না।

টাইফয়েড জ্বর (Typhoid fever)—১। কলেরার ন্যায় টাইফয়েড জ্বরেও মল এবং মূত্রের সহিত রোগের বীজ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। সংক্রামকতা-দুষ্ট জল বা দুগ্ধ পান করিয়াই এই রোগের বিস্তার সংঘটিত হয়। দুই তিন সপ্তাহ অবিরাম জ্বর হইলেই উহাকে টাইফয়েড জ্বর মনে করিয়া উহার সংক্রামকতা দোষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বর ভাল হইয়া গেলেও কিছুদিন রোগীর মল মূত্রের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আরোগ্য হইবার পরেও উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ নিবারণ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নহে।

রক্ত-আমাশয় (Dysentery)—১। এই রোগের বীজ মলের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং অধিকাংশ স্থলেই দূষিত পানীয় জলের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে।

যক্ষ্মা (Phthisis)—১। রোগীকে সর্ব্বদা খোলা জায়গায় রাখিবে। দেহ গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া খোলা বারাণ্ডায় বা দালানে রাত্রিকালে শয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং দিবাভাগে বাটীর বাহিরে ছায়াযুক্ত মুক্ত স্থানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিবে। যদি ঘরের মধ্যে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। ২। যক্ষ্মার বীজ রোগীর পরিত্যক্ত কফের সহিত নির্গত হয়। রোগী যথা-তথা কফ ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধূলির সহিত মিশ্রিত হয় এবং রোগ-বীজ-মিশ্রিত ধূলি উড়িয়া নিশ্বাসের সহিত অপরের ফুস্‌ফুসে অথবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত অপরের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বিশোধক ঔষধ রাখিয়া তন্মধ্যে কফ পরিত্যাগ করা উচিত এবং উহা ভূমিতে না ফেলিয়া ড্রেনের মধ্যে অথবা গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পুতিয়া ফেলিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। কফ মুছিবার জন্য যেসকল বস্ত্রখণ্ড রোগী ব্যবহার করিবে, তাহা বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। খবরের কাগজের উপর কফ ফেলিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তি কখনই এক বিছানায় শয়ন করিবে না। রোগীর সহিত এক ঘরেও রাত্রি যাপন করিবে না। ৪। মানুষের ন্যায় গোরুরও যক্ষ্মা হইয়া থাকে। যক্ষ্মাগ্রস্ত গোরুর দুগ্ধ পান করিয়া মানুষের যক্ষ্মা হইতে পারে। দুধ একবার উথলিয়া উঠিলেই উহাকে নামাইবে না, কিছুক্ষণ উহাকে ফুটিতে দিলে উহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে। ৫। অনেক সময় মাছি দ্বারা এই রোগের বীজ খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে; সুতরাং খাদ্যসামগ্রীতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ৬। যক্ষ্মা-রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক স্থানে এক সঙ্গে বা ব্যবহৃত

পাত্রে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ। ৭। যক্ষ্মা-পীড়িতা মাতা শিশু-সন্তানকে স্তনপান করাইবেন না। ৮। পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যাহার যক্ষ্মার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ব্যাধিযুক্তা কন্যার বিবাহ দিলে যে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diptheria)—১। যাঁহারা ঐ রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের মুখ বা চোখের মধ্যে রোগীর থুতু বা কফ যাহাতে না প্রবেশ করে তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ কাশিবার সময় রোগীর গলা হইতে কফের সহিত নিঃসৃত হয়। ২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ লাগাইবার সময়ে রোগী অত্যন্ত কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি যেন একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নিজ নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া গলায় ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন। ৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার সন্নিকটে ছোট ছেলেমেয়েদের কখনই আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সুস্থ বালকবালিকাগণকে বাটী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। ৪। গৃহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। ৫। ড্রেনের গ্যাস্ যাহাতে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ৫। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্লেগ্ (Plague)—১। বাটীর সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবে। ২। মানুষের প্লেগ্ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ্ হইতে দেখা যায়। যখন দেখিবে যে বিনা-কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে যে উহারা প্লেগ্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে এবং সমস্ত বাসগৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া ও চুন ফিরাইয়া সমস্ত দরজা জানালা কিছুদিনের জন্য খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য হইবে। ৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। পুড়াইয়া ফেলিবে। যে স্থানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফেনাইল্ দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ৪। প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যে-সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ্ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মনুষ্য-শরীরে প্লেগ্ সংক্রামিত হইয়া থাকে; প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে প্লেগ্-রোগীকে স্পর্শ না করাই উচিত এবং প্লেগ্-রোগীর চিকিৎসা বা সুশ্রূষার সময়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা আঁচড় না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। প্লেগ্-রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে উহার থুতু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। ৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ এক মাস কাল তাহার পৃথক গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, রোগারোগ্যের পর ১০ দিন তাঁহাদের পৃথক হইয়া থাকিলে ভাল হয়। ৬। যে-সকল স্থানে প্লেগ হইতেছে, তথা হইতে আনীত বস্ত্র, শয্যা পুস্তক বা শস্য রাখিবার থলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। ৭। প্লেগের সময় পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে অনেক সময়ে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে। ৮। যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ-রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা প্লেগের "টিকা" লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে এক প্রকার নিরাপদ্ থাকিতে পারিবেন।

হাম, বসন্ত ইত্যাদি—১। এই-সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, অথবা বস্ত্র শয্যা বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। বাটীতে এই-সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাঁহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান-জলে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত নহে। ২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবে, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই-সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারো কোন স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়। ৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালকবালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ৪। যে বাটীতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (Vaccination) লওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত টিকা লইলে রোগের পরিব্যাপ্তি সবিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে। ৫। এই-সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে থাকে, তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ প্রবল ও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। রোগীর গৃহের জানালা দরজায় কার্ব্বলিক্ এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা কার্ব্বলিক তৈল (১ ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ও ৯ ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ব্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রোগবীজও নষ্ট হয়, 'ছাল' দেহ হইতে পৃথক হইয়া বায়ুসাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং ঘায়ে মাছি বসিতে পারে না, সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। ৫। রোগ আরোগ্য হইলে যতদিন না সমস্ত "ছাল" উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থব্যক্তির সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েক দিন স্নান করিবার পর সুস্থব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ৭। বস্ত্র শয্যাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia)—ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশন

কালে উহা ক্ষতমধ্যে সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মৃদুগতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্পাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া ভীষণ রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু সুনিশ্চয়—এই রোগ কখন নীরোগ হইতে দেখা যায় নাই। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয়; তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুকুরে কামড়াইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না; কুকুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। ক্ষিপ্ত কুকুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে ঝরিয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রথমদষ্ট, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দেহ বস্ত্রাদিতে আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়, দংশন-জনিত ক্ষত-মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র সুচিকিৎসা স্বনামখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর্ (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলা শৈলের নিকট কসৌলি নামক স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কন্নর নামক নগরে গভর্ণমেণ্ট্-সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই চিকিৎসাধীনে থাকিলে ক্ষিপ্ত কুকুর-দংশন-জনিত দেহ-প্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জলাতঙ্ক রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না।

গবর্ণমেণ্ট্ বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ গভর্ণমেণ্ট হীনাবস্থ লোকের জন্য কসৌলি যাতায়াতের রেলভাড়া পর্য্যন্ত দিবার এবং তথায় বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন।

১। কুক্কুরে দংশন করিলে উষ্ণ জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক্ এসিড্ (Strong Nitric বা Carbolic Acid) সরু তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩।৪ বার প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই-সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেননা ইহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ২। কিন্তু শুদ্ধ এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা দষ্ট স্থানে যতদূর পর্য্যন্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, ততখানি মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। অস্ত্রজনিত ঘা শুকাইতে দেরী হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্ট স্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংস তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যায়। ৩। যে কুকুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর যদি ঐ কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে উহা ক্ষিপ্ত নহে। তবে দংশিত স্থান নাইট্রিক্ বা কার্ব্বলিক্ এসিড্ প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। মস্তক হইতে ক্ষত স্থান যত দূরে অবস্থিত হইবে, ততই রোগের তীব্রতার হ্রাস এবং প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। ৪। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইবে, তাহার নিকট ঐ রোগ-সংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। অনেক স্থলে শুদ্ধ ভয় পাইয়া রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে, চিকিৎসক পর্য্যন্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের মিথ্যা লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

মহারাষ্ট্রীয় আহারপ্রণালী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

এদেশের ব্রাহ্মণমাত্রেই নিরামিষ-ভোজী। সামান্যতঃ বলতে গেলে বোম্বাইবাসীরা রুটিখোর, বাঙ্গালীদের মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বর্ষার প্রাচুর্য্য বশতঃ প্রচুর ধান জন্মে ভাতই সেখানকার লোকদের প্রধান আহার। তদ্ব্যতীত, বাজরী, জোয়ারী, গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে এটা মানতে হবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ভদ্র লোকদের ভাত ও 'বরণ' (ডাল) ভিন্ন চলে না। রান্না অনেকটা আমাদের ধরণে, কেবল তরকারিগুলি ঝালপ্রধান, আর আমাদের মত ওদের কোন মিশ্র তরকারী রান্না হয় না। আহারের সময় কার পর কি খেতে হয় এমন বিশেষ কোন নিয়ম নেই। আমাদের যেমন তিক্ত হতে আরম্ভ করে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদেশে মিষ্টি ঝাল লোন্তা যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টে অরুচি হলে টক ঝাল, ঝালে অরুচি হলে আবার মিষ্ট, ঝালের মুখ মিষ্ট করে আবার লোন্তায় এসে পড়া যায়। কোন মারাঠী কিম্বা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলে কখন্ কোন্ জিনিস খেতে হবে কোথা হতে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে তরকারী আর নানা রকম চাটনী, অম্বলের জায়গায় 'পঞ্চামৃত' (এক রকম পাঁচ মেশালো অম্লমধুর ঝোল), আর 'কড়ি' (একরকম মশলামাখা টক দধির পাক)। মিষ্টান্নের মধ্যে 'শ্রীখণ্ড' মারাঠীদের পরম উপাদেয় সামগ্রী, জাফরাণ-যুক্ত মিষ্ট দধি দিয়ে প্রস্তুত। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল ওদেশে ছানার চলন নেই, সুতরাং ওরা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল মিষ্টান্ন হতে বঞ্চিত। কোন বাঙ্গালী ময়রা ও-অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান খুললে বোধ করি বিলক্ষণ এক হাত লাভ করতে পারে। আহারের সময় মারাঠী গৃহস্থ রেশমের পট্টবস্ত্র (সোলা) পরিধান করেন। আহারান্তে ইংরাজী ভোজের After Dinner Speech-এর ধরণে কিছু বলা একটা মারাঠী রীতি আছে সেটা আমার খুব ভাল লাগত। বক্তৃতা না হোক্ কোন সংস্কৃত বা মারাঠী শ্লোক কিম্বা গীতের একচরণ—এইরূপ যাঁর যা ইচ্ছা আবৃত্ত করেন, তাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতমণ্ডলীর বেশ আমোদ হয়। ডাক্তারে বলে যে আহারের সময় হাসিখুসি মিষ্টালাপে পরিপাকের সাহায্য হয়; অতএব উক্ত নিয়ম বৈদ্যশাস্ত্রসম্মত বলতে হবে।

বিবাহ ও ভোজনবিচার, হিন্দুয়ানীর এই দুই দুর্গপাল। বাঙ্গালা-দেশে ভোজনবিচারের নিয়ম অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে মনে হয়—অন্ততঃ কলকাতায়। কিন্তু বোম্বাইয়ে দেখতে পাই এই অন্তর্জাতিক ভোজনের সবে মাত্র সূত্রপাত হয়েছে। "আর্য্যসঙ্ঘ" (Aryan Brotherhood) নামে ওদেশে মাননীয় জষ্টিস্ চন্দাবারকরের নেতৃত্বে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা জাতভাঙ্গ পঙ্‌ক্তি কার্য্যারম্ভ করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঐরূপ একটি

মিশ্রভোজ দেওয়া হয়—"প্রীতিভোজন"। কিন্তু এই প্রীতিভোজন তাদের জাতভাইদের অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। মজা এই যে, দুজন মাহার জাতীয় ভদ্রলোক এই ভোজনে যোগ দিয়েছিল, শুনছি নাকি তাদের নিজের জাত থেকে বহিষ্কৃত করবার হুকুম জারী হয়েছে, অথচ মাহার জাত অন্ত্যজ বলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য। যা হোক্ মারাঠীদের মধ্যে এই জাতিভেদের বাধা অতিক্রম করবার এক সহজ উপায় আছে। বিভিন্ন জাতের মিশ্রভোজনে তাদের কোন আপত্তি নেই, কেবল স্বতন্ত্র পংক্তিতে আসন দেওয়া চাই। এই নিয়মে কোন মুসলমানও হিন্দুভোজে যোগ দিতে পারেন, খালি পংক্তিভেদের ব্যবস্থা করলেই হ'ল। এই নিয়ম আমাদের orthodox হিন্দুসমাজে প্রচলিত হলে মন্দ হয় না। এই সামান্য রাস্তাটুকু খুলে গেলেও যথালাভ মনে করা যায়। মিশ্রভোজন থেকে স্ত্রীপুরুষের একত্র-ভোজন মনে পড়ল। আমরা ইংরাজদের ভোজনগৃহে নরনারীর মেলা দেখতে পাই। য়ুরোপীয় সভ্যজগতের এই সাধারণ রীতি। পারসী বিদ্বন্মণ্ডলী এই রীতি অবলম্বন করেছেন। মারাঠীসমাজ এখনো অতদূর এগোতে পারে নি, তবে পরিবেশনের বেলায় গৃহিণীর আগমনেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করা যায়। আমাদের মতো নয় যে, কোন গৃহস্থের গৃহে নিমন্ত্রণে গেলে গৃহকর্ত্রী পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাঁর হাতের বালাগাছটি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পড়ে না।

মহারাষ্ট্রীয় উৎসব—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মহারাষ্ট্র দেশে পূজাপার্ব্বণ উৎসবাদি আমাদেরই মত, কেবল উৎসব-বিশেষের মাহাত্ম্য গণনায় তারতম্য দেখা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশে নাই। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দুগৃহে দুর্গাপূজা হয়, তথাপি বোম্বাইবাসীদের মধ্যে ইহার তেমন মাহাত্ম্য নাই। বিজয়াদশমীই (দশারা) শারদোৎসবের বিশেষ দিন। সে দিন হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের আদান প্রদান হয়। কথিত আছে পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ-কালে এই দিনে শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রেখে শমীপূজা করেছিলেন। তা থেকে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমীপূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধু দেশেও এই প্রথা দেখেছি। মারাঠি দেশে দশারার বিশেষ মাহাত্ম্য, কেন-না এই সময়ে বর্গীরা শস্ত্রার্চ্চনা করে' মহাসমারোহে যুদ্ধযাত্রায় বেরতো। দশারায় অশ্বসকল চিত্রবিচিত্র ফুলের মালায় সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মেতে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে পশুবলি হয় না, কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলতে পারে? কারওয়ারে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়েছিল। উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসনে সোপর্দ্দ হয়। বিচারস্থানে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করে' দেবীর কাছে নরবলি মানৎ করেছিলেন, সেই মানৎরক্ষা মানসে ভৃত্যকে দিয়ে এই কাণ্ড করানো হয়।

দশারার পর দেওয়ালী। ইহাই বোম্বাইবাসীদের প্রধান উৎসব। সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এতে যোগ দিয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহে রোসনাই দিয়ে উৎসবে মত্ত হয়। ধনত্রয়োদশী হতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বাঙ্গালাদেশে এ সময় কালীপূজা হয়, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা লক্ষ্মী। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। সেই দিনই চারিদিকে রোসনাইয়ের ঘটা। সেই দিন বণিকদের বহিপূজনের দিন। তারা তাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটিয়ে দান-ধ্যান দেবার্চ্চনায় উৎসব সম্পাদন করে ও নবোৎসাহে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভক্ত-চূড়ামণি পবননন্দনের পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু মারাঠিদের মধ্যে খুবই চলিত; এমন কি, মারুতি-মন্দির মারাঠি পল্লীচিত্রের এক প্রধান অঙ্গ। গণেশ ঠাকুরেরও মানমর্য্যাদা সামান্য নহে। আমাদের দেশে গণেশ ঠাকুরের জন্যে স্বতন্ত্র উৎসব নাই, ওদিকে গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা ও বিসর্জ্জন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দোলযাত্রার সময় (হোলী) আবীর খেলা আমোদ প্রমোদ সর্ব্বত্রই সমান। মহ্লাররাও গাইকওয়াড় এই খেলায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার এক হাতীর উপর ক্ষুদ্র কামান বসিয়ে সেখান থেকে একদল নর্ত্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করেছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর স্রোতে এক বেচারী প্রাণসঙ্কটে পড়েছিল!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে বোম্বাইয়ে যমদ্বিতীয়া কহে। ভাই বোনের মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ভাই ভগিনী-গৃহে ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়। ভগ্নী ভাইয়ের কপালে তিলক দিয়ে তাকে বরণ করে, অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর স্নেহের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করতে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় গানবাজনা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙ্গালীরা যেমন গানবাজনাভক্ত আমি যতদূর দেখেছি মারাঠীরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় সৌখীন জাতি, মারাঠীদের প্রকৃতি অন্যতর। তারা ব্যবসায়ী Practical লোক; কলাবিদ্যার প্রতি তাদের ততটা অনুরাগ নাই। আমার একজন মারাঠী বন্ধু বলেছিলেন—তিনি কলিকাতায় গিয়ে দেখলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক-ও-সঙ্গীত-প্রিয়, যে বাড়ীতে যাও একটি হুকা ও তানপুরা। তাই ব'লে ওদেশে গীতবাদ্যের চর্চ্চা বা আদর যে নেই তা নয়। তবে আমার মনে হয় যে, সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদার লোকেদের মধ্যে বদ্ধ, ভদ্রলোকের মধ্যে গীতবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্প লোকই দেখা যায়। সামান্যত বলা যেতে পারে এ দেশের গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম, স্থানে স্থানে রূপান্তরও দৃষ্ট হয়। মারাঠিদের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি দেশী ছন্দে নূতন ধরণের গান ও তান শুনা যায়, আর 'লাউনী' নামক একপ্রকার টপ্পা আছে তাহাই খাঁটী প্রাদেশিক জিনিষ। আমাদের দেশের খোল কর্তাল সমেত সঙ্কীর্ত্তনের মত ধর্ম্মসঙ্গীত ওদেশে শুনি নাই। ওদেশের 'কথা' কতকটা আমাদের কথকতার অনুরূপ। কিন্তু এ দুয়ে একটু প্রভেদও আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হতে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস বিস্তৃত করে' বলা বাঙ্গলা দেশের কথকতা; আর এদেশের কথা আদ্যোপান্ত একটি ভাবসূত্রে গাঁথা, সেইটি বিস্তার করে' শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করা কথার উদ্দেশ্য। একটি নীতিসূত্র অবলম্বন করে গান ও উপন্যাসচ্ছলে তার ব্যাখ্যা করার নামই কথা। এই প্রসঙ্গে যে-সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তা তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের কাব্যখনি হতে সংগৃহীত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে উপন্যাস ও গান থাকে, ধুয়ায় শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেয়; অতঃপর কথকঠাকুরের বন্দনাদির পর সভাভঙ্গ হয়। মারাঠি দেশে কথা ও কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারের

সঙ্গীন অঙ্গ। কীর্ত্তন-সভায় আমোদ ও শিক্ষা দুইই একত্রে সংসাধিত হয়। সাধু তুকারাম স্বয়ং কীর্ত্তনকলায় পরিপক্ক ছিলেন। তাঁর মাধুরীময় সঙ্কীর্ত্তন শুনতে লোকেরা দেশ দেশান্তর হতে আসত। শিবাজী রাজাও অবসরক্রমে সেই সভায় উপস্থিত হতেন। এক্ষণকার কালে রুচির পরিবর্ত্তন যেমন বাঙ্গালাদেশে দেখা যায় ওদিকেও তেমনি। এখন সর্ব্বত্র নাটকের পালা পড়েছে, যাত্রা কথা কীর্ত্তন এসব কারো ভাল লাগে না। মারাঠিদের মধ্যেও ভাল ভাল নাটকমণ্ডলী আছে, তারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটী, নারায়ণরাও পেশওয়া বধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে। ওদেশে সে-সব নাট্যকারদের পেশার ভারী। এই-সকল নাট্যে গণপতি সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হবার পর রীতিমত কথারম্ভ হয়। অভিনয়ের প্রারম্ভে ময়ূরবাহনা বীণাপাণি নৃত্য করতে করতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। ওদেশে সরস্বতীর বাহন—ময়ূর।

•বিজয়া দশমী—শ্রীসরলা দেবী—

এ কোন্ দশমীর তিথি? ইহা বিজয়া দশমী। বার মাসে চব্বিশটি দশমী আসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে তেইশটি নির্ব্বিশেষণ —একটি দশমী মাত্র জয়সঙ্কেতে পূর্ণ। পুষ্পবিকাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরোদ্গম হয়, বসন্তানিল বহে; বৃষ্টিবর্ষণের পূর্ব্বে মেঘরাশি আকাশে পুঞ্জীভূত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়; ধূমোদ্গমের পূর্ব্বে অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয়। এইরূপে কার্য্যকারণ প্রায়শঃ ঘটনাপারম্পর্য্যে আত্মবিকাশ করে। বিজয়াদশমী-উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন্ জাতীয় অনুষ্ঠান দেখা যায়? কাহার পশ্চাতে এই জয়দায়িনী দশমীর অভ্যুদয়—তাহার দিকে ফিরিয়া দেখ। মহালয়া—অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণই বিজয়ার পূর্ব্বগামী মহানুষ্ঠান।

হে হিন্দু, এ তথ্যের গভীরতা ও সার্থকতা বিষয়ে ধ্যানশূন্য হইও না। যদি বিজয় চাও, যদি তেইশবার নিষ্ফল হইয়াও চব্বিশ বারের বারও অন্ততঃ সফলতা কামনা কর, তবে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তির ধ্যানে অবগাহিত হও, সে-সকল মহৎকার্য্য-কলাপের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হও, বিশ্বাস কর যে সে-সকল তোমার আমার মতো রক্তমাংসের শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আবার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণের দ্বারা তাঁহাদের তর্পণ কর। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, কেবলমাত্র ভৌতিক পিণ্ড ও জলদান করিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিও না। তদপেক্ষা কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনা গ্রহণ কর। প্রথমতঃ জান তাঁহাদের কীর্ত্তিমার্গ কোন্ কোন্ দিশায় রেখা কাটিয়া গিয়াছে, জাতীয় ইতিহাসের অনুশীলন, অনুসন্ধান ও গঠন কর। তারপর সেই ঐতিহাসিক অতীতকে বর্ত্তমানে সত্য করিয়া তোল। তেমনি সাহসিক, তেমনি বাণিজ্যদক্ষ, তেমনি সুনাবিক, তেমনি দিগ্বিজয়ী, তেমনি সহিষ্ণু, জ্ঞানী, তেমনি কর্ম্মী হও। তাঁহাদের মার্গানুসরণ—তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহাদের প্রকৃত উপাসনা, তাঁহাদের প্রতি প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের পন্থা।

আগুনের ফুল্‌কি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদ্‌লিন পিয়েত্রী অর্সোর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সোর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অর্সো তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার খাতাপত্র ও অন্য সাক্ষপ্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দ্দোষী নয়। তখন উত্তেজিত হইয়া অর্সো বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়াতে অর্লান্দিক্‌-সিয়ো হঠাৎ ছোরা খুলিয়া অর্সোর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভ্যাসান্তেলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিমেষ মধ্যে ছোরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিতাড়িত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে

দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অর্সোকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অর্সো যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে।]

(১৭)

পরদিন নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। উভয় পক্ষই সাবধান হইয়া রহিল। অর্সো বাড়ী হইতে বাহির হইল না, এবং বারিসিনিদেরও বাড়ীর দরজা সমস্ত দিন বন্ধই থাকিল। কেবল থানার পাঁচজন চৌকিদার সমস্ত দিন গ্রামের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোঁদ দিয়া গ্রাম্য কলহের কথা লোকের মনে জাগরুক করিয়া রাখিতেছিল। জমাদার তাহার বন্দুক তাগ করিয়া ধরিয়াই বেড়াইতেছিল; কিন্তু উভয় বিবাদী বাড়ীতে গোলন্দাজীর আয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছিল না। তবে একজন কর্সিক গ্রামের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে একটা অন্তর্গূঢ় বিপ্লব আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, কারণ সেই ঝাঁপালো ওক গাছের তলায় কয়েক জন স্ত্রীলোক ব্যতীত সেদিন আর পুরুষদের মেলা বসে নাই।

রাত্রে আহারের সময় কলোঁবা প্রসন্ন মুখে তাহার দাদাকে লিডিয়ার একখানি চিঠি দেখিতে দিল। লিডিয়া লিখিয়াছে—

প্রিয় কলোঁবা, আপনার দাদার চিঠিতে জানিলাম যে আপনাদের গ্রাম্য বিবাদ মিটমাট হইয়া গিয়াছে; ইহাতে অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। আমার বাবার আজাকৃসিয়ো আর মোটেই ভালো লাগিতেছে না, এখানে ত আর আপনার দাদা নাই, যুদ্ধবিগ্রহ শিকার প্রভৃতির গল্প করেন কাহার সঙ্গে, পান না। তাই আজ আমরা এখান থেকে রওনা হইতেছি, এবং আপনাদের সেই আত্মীয়ের বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য বাস করিতে যাইতেছি—আমাদের সঙ্গে একখানা পরিচয়পত্রও আছে। আগামী পরশ্ব, বেলা এগারটার কাছাকাছি, আমি আপনাদের পাহাড়ে হাওয়া সেবন করিতে উপস্থিত হইব। আপনার মতে পাহাড়ে হাওয়া শহরে হাওয়ার চেয়ে ঢের ভালো—এইবার পরীক্ষা করা যাইবে। আজ তবে এই পর্য্যন্ত। আপনার বন্ধু

লিডিয়া নেভিল।"

অর্সো চিঠি পড়িয়াই বলিয়া উঠিল—"তবে আমার দ্বিতীয় চিঠিখানা পায়নি দেখছি!"

—চিঠির তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তোমার চিঠি পৌঁছবার আগেই ওরা রওনা হয়ে পড়েছে। তুমি কি ওকে আসতে বারণ করে' চিঠি লিখেছিলে দাদা?

—আমি লিখেছিলাম যে আমরা এখন যুদ্ধের জোগাড়ে আছি, এ অবস্থায় কোনো অতিথির পরিচর্য্যা করা সম্ভব হবে না।

—বাঃ তা কেন? ইংরেজ জাতটা ভারি অদ্ভুত। শেষ যে-রাত্রিতে আমি তার সঙ্গে একত্র ছিলাম, ও, আমাকে বলেছিল যে কর্সিকায় এসে একটা প্রতিহিংসার ব্যাপার না দেখে গেলে ওর মনে বড় দুঃখ থেকে যাবে। দাদা, তুমি যদি মত কর, তা হলে শত্রুর বাড়ী আক্রমণ করে' ওদের একটু যুদ্ধের খেলা দেখিয়ে দেওয়া যায়।

—কলোঁবা, তোকে মেয়ে করে' ভগবান কী ভুলই করেছেন, তা কি তুই বুঝতে পারিস? তুই একজন জবরদস্ত যোদ্ধা সৈনিক হতে পারতিস!

—খুব সম্ভব! কিন্তু সম্প্রতি আমাকে গিন্নি সেজে অতিথি-সংকারের আয়োজন করতে হবে।

—কিছু দরকার নেই। আমি এখনি একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওদের রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

—সত্যি? এই বিষম দুর্য্যোগে কাকে পাঠাবে, সে তোমার চিঠি নিয়ে বৃষ্টিবানে একেবারে ভেসে যাবে যে? ......এই দুর্য্যোগে ফেরারীদের জন্যে সত্যি আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। ভাগ্যিস তারা খানকতক তেরপাল জোগাড় করে রেখেছে। দাদা তোমার এখন কি করা উচিত জান? ঝড় বাদল যদি থেমে যায়, তা হলে কাল ভোরে তুমি নিজেই রওনা হয়ে গিয়ে আমাদের সেই কুটুম্বটির বাড়ী যাও, পথে লিডিয়ারা সেখানে থাকবে, লিখেছে; ভোর ভোর গেলে তুমি তাদের সেখানেই ধরতে পারবে, লিডিয়া খুব বেলায় ওঠে। আমাদের এখানে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তুমিই তাদের গিয়ে নিজে বলবে; সব শুনেও যদি তারা আসতে চায়, সে ত আমাদের বিশেষ আনন্দের কথাই হবে।

অর্সো এই প্রস্তাবে অনায়াসে সম্মত হইল। কয়েক

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কলোঁবা বলিল—দাদা, আমি যখন তোমাকে শত্রুদের বাড়ী আক্রমণ ও অবরোধ করবার কথা বলছিলাম, তুমি হয়ত ভাবছিলে যে আমি ঠাট্টা করছি। কিন্তু তুমি কি জান না যে আমাদেরই লোকবল বেশি, অন্তত ওদের ডবল? ম্যাজিষ্ট্রেট দারোগাকে সসপেণ্ড করাতে গাঁয়ের সকল লোকই এখন নির্ভয়ে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। আমরা এখন ওদের কুচিকুচি করে' খুড়ে ফেলতে পারি, তা জান? ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা এখন ত খুব সহজ কথা। তোমার যদি মত হয়, তা হলে আমি ঝরনায় গিয়ে ওদের বাড়ীর মেয়েদের ঠাট্টা করব; পুরুষরা তা শুনে অমনি দৌড়ে আসবে··· খুব সম্ভব আসবে, কারণ ওরা এমনি কাপুরুষ যে মেয়েমানুষেরও অধম! খুব সম্ভব ওরা ওদের পাইকদের শড়কী চালাতে হুকুম দেবে; কিন্তু আমি ঠিক আপনাকে বাঁচিয়ে চলে আসব। তা হ'লে আর কি, ওরাই প্রথমে আমাদের যখন আক্রমণ করলে তখন আমাদের আর কোনো দায় দোষ থাকবে না। ঝগড়া ঝাঁটিতে আবার ভালোমানুষটি কে কোথায় করে' থাকে? দাদা, তোমার বোনটির কথা শোন; আদালতে কালো-গাউন-পরা উকিলেরা খানিকক্ষণ বকবক করবে, শাদা কাগজে অনেক কালির আঁচড় পাড়বে, কিন্তু ফল হবে অষ্টরম্ভা। ঐ বুড়ো শেয়াল ধূর্ত্ত তখন চোখে সর্ষেফুল দেখবেন; দিন দুপুরে চোখের সামনে নক্ষত্রসভা বসে' যাবে। আঃ কি বলব, ম্যাজিষ্ট্রেটটা তখন যদি ভ্যাঁসা-ন্তেলোটার সামনে আড়াল করে' না দাঁড়াত তা হলে একটা শত্রু কম হ'ত।

এই-সমস্ত কথা কলোঁবা এমন শান্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে বলিয়া গেল যেন সে অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনেরই পরামর্শ করিতেছে।

অর্সো বিস্ময়, প্রশংসা ও ভয়ে বিমূঢ়ের মতো হইয়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। তার পর টেবিল হইতে উঠিয়া বলিল—কলোঁবা, আমার মনে হচ্ছে তুই যেন সাক্ষাৎ সয়তানী। লক্ষীটি, তুই ক্ষান্ত দে। আমি যদি বারিসিনিদের মোকদ্দমায় কাবু করতে না পারি, তা হ'লে আমি অন্য উপায় দেখব। গরম গুলি কিংবা ঠাণ্ডা ছুরি! তুই দেখ্‌ছিস্ ত, আমি কর্সিকার প্রবচন একেবারে ভুলে যাইনি।

কলোঁবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুভ কার্য্য চটপট সেরে ফেলাই ভালো। দাদা, কাল ভোরে তুমি কোন্ ঘোড়াটায় চড়ে' যাবে?

—কালো ঘোড়ায়। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছিস যে?

—তাকে দানাপানি খাইয়ে ঠিক করে' রাখতে হবে কিনা।

অর্সো নিজের ঘরে চলিয়া গেলে কলোঁবা সাভেরিয়া ও পাইক বরকন্দাজদের শুইতে পাঠাইয়া দিয়া একাই রান্নাঘরে রহিল। থাকিয়া থাকিয়া সে অধৈর্য্য হইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল তাহার দাদার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে কি না। যখন তাহার মনে হইল যে সে ঘুমাইতেছে, তখন কলোঁবা একখানা ছোরা লইয়া পরখ করিয়া দেখিল যে তাহাতে বেশ ধার আছে কিনা; তারপর তাহার ছোট্ট পা দুখানি একজোড়া প্রকাণ্ড জুতার মধ্যে ভরিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বাগানে প্রবেশ করিল।

বাগানটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা; বাগানের পরেই বেড়া-ঘেরা একটা প্রশস্ত স্থান, সেখানে ঘোড়া ছাড়া থাকিয়া চরিয়া বেড়ায়, কারণ কর্সিকায় ঘোড়ার আস্তাবলও নাই, ঘোড়া কেহ বাঁধিয়াও রাখে না। সাধারণতঃ সকলে নিজের ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া রাখিয়া দেয়, এবং দানাপানি খাওয়াইবার দরকার হইলে বা বৃষ্টিবাদল হইতে রক্ষা করিতে হইলে সকলে নিজের নিজের ঘোড়াকে ডাকিয়া লইয়া আসে।

কলোঁবা সন্তর্পণে বাগানের দরজা খুলিয়া ঘেরা-জায়গায় প্রবেশ করিল; এবং শিশ দিয়া ঘোড়াগুলিকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিল; সে প্রায়ই এমনি করিয়া ডাকিয়া ঘোড়াদের রুটি আর নুন খাওয়াইত। কালো ঘোড়াটা তাহার কাছে আসিবা মাত্র কলোঁবা তাহার কেশর ধরিয়া ছুরির এক চোপে তাহার একটা কান কাটিয়া ফেলিল। ঘোড়াটা চার পায়ে লাফাইয়া উঠিয়া করুণ কাতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে

ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কলোঁবা মনে মনে খুসি হইয়া পুনরায় বাগানে ফিরিয়া আসিল, এবং তখন অর্সো তাহার ঘরের জানলা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ও? ও কে যায়?" কলোঁবা শুনিতে পাইল, অর্সো তাহার বন্দুকের ঘোড়া চড়াইল। কলোঁবার সৌভাগ্যক্রমে বাগানের দরজাটা এক টেরে অন্ধকারের মধ্যে ছিল, এবং একটা ডুমুর গাছের ঝোপ সেখানটা প্রায় আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর, তাহার দাদার ঘরে, থাকিয়া থাকিয়া আলোর আভাস প্রকাশ পাইতে দেখিয়া কলোঁবা বুঝিল যে অর্সো আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি বাগানের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রাচীরের ধারে ধারে গাছের ছায়ায় তাহার কালো পোষাক একেবারে মিশাইয়া দিয়া অর্সো আসিয়া উপস্থিত হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র আগে রান্নাঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কলোঁবা অর্সোকে রান্নাঘরে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, কি?

অর্সো বলিল—আমার যেন মনে হ'ল কেউ বাগানের দরজা খুলছিল।

—অসম্ভব। তাহ'লে ত কুকুর ডাকত। যাই হোক, চল দেখি গে।

অর্সো বাগানের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, বাগানের বাহিরের দরজা বেশ বন্ধই আছে; তখন মিথ্যা ভয়ের জন্য মনে মনে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অর্সো নিজের ঘরে ফিরিয়া চলিল।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তুমি যে এমন সাবধান হয়েছ, এ দেখে আমার মন ভারি খুসি হয়ে উঠেছে। তোমার এমনি হওয়াই ত চাই।

অর্সো বলিল—তুইই ত আমাকে সংশোধন করে' তুলছিস! আচ্ছা, এখন তবে যাই। শুভরাত্রি হোক

উষার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া অর্সো যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার সাজসজ্জায় প্রেয়সী-মিলন-প্রয়াসীর বাবুয়ানা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ বীরের সাবধানতা একসঙ্গেই প্রকাশ পাইতেছিল। নীলরঙের একটা ওভারকোটের উপর কশা কোমরবন্ধে রেশমী দড়িতে ঝুলানো ছিল একটা কার্ত্তুজভরা টিনের বাক্স; পাশ-পকেটে তাহার ছোরা এবং হাতে তাহার সেই ম্যান্টনের তৈরী বন্দুক, দোনালে গুলিভরা, একেবারে প্রস্তুত। কলোঁবার হাতের তৈরী কাফি একটা পিরিচে ঢালিয়া অর্সো তাড়াতাড়ি যখন খাইয়া লইতেছিল, তখন একটা পাইক ঘোড়ায় জিনসাজ পরাইতে গেল। অর্সো ও কলোঁবা দুজনেই তাহার পিছে পিছে ঘেরা-জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল। পাইকটা ঘোড়া ধরিতে গিয়া হাত হইতে জিনসাজ ফেলিয়া দিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইল, এবং ঘোড়াটার মনে গত রাত্রির ব্যাপারটা এখনো বেশ টাটকা ও বেদনাদায়ক হইয়াই ছিল, তাই সে অপর কানটার বিনাশ-আশঙ্কায় লোক দেখিয়া দৌড় ঝাঁপ লম্ফ চীৎকার প্রভৃতি বিবিধ কসরৎ করিয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

অর্সো পাইককে ডাকিয়া বলিল—এই জল্‌দি কর।

পাইকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বলিতেছিল—হায় হায়! বাপরে বাপ! হুজুর! আজ্ঞে হুজুর! এঁ! ক্যা তাজ্জব! ......

তাহার বিস্ময় ও হাহুতাশ অসম্বদ্ধ ও অনর্গল ভাবে চলিতেই লাগিল।

কলোঁবা জিজ্ঞাসা করিল—ওরে কি হয়েছে?

সকলেই ঘোড়ার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার কানকাটা ও রক্তাক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়- ও বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া উঠিল। কর্সিকায় শত্রুর ঘোড়াকে বিকলাঙ্গ করা মানে এক কথায় প্রতিহিংসা লওয়া, শত্রুকে অগ্রাহ্য করা, এবং খুন করিবার ভয় দেখানো। সকলেই বলিয়া উঠিল "এই অন্যায়ের প্রতিকারের একমাত্র উপায় বন্দুকের গুলি; তা ছাড়া আর উপায় নাই।" অর্সো বহুকাল কর্সিকা ছাড়িয়া য়ুরোপে বাস করিয়া আসিয়াছে; সে এই ব্যাপারটার উগ্রতা সকলকার অপেক্ষা অল্পই অনুভব করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তথাপি সেখানে যদি বারিসিনিদের গোষ্ঠীর কেহ উপস্থিত থাকিত তবে তাহাকে প্রাণ দিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ করিয়া যাইতে হইত; কারণ সকলেই স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই কা'ণ্ডটা বারিসিনিদেরই শত্রুতা সাধনের ফল

অর্সো গর্জ্জন করিয়া উঠিল—নীচ কাপুরুষ কোথাকার! আমার সামনে আসতে সাহস নেই, শত্রুতা সাধা হয়েছে একটা নীরিহ অবোলা জন্তুর ওপর!

কলোঁবা আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল—দাদা, এখনো আমাদের বিলম্ব? তারা পদে পদে আমাদের উত্যক্ত করছে, ঘোড়াটাকে জখম করে' ছেড়েছে, তবু আমরা তাদের কিছু বলব না? দাদা, তোমার গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই, তুমি কি পুরুষ মানুষ নও?

পাইকেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! আমরা ঘোড়াটাকে গাঁয়ে নিয়ে যাই, গাঁ সুদ্ধ ক্ষেপিয়ে ওদের বাড়ী চড়াও হই গিয়ে!

বুড়ো পোলো গ্রিফো বলিল—ওদের বাড়ীতে যে খড়ের গাদা আছে সেটা ওদের ঘরের চালের সঙ্গে ঠেকে আছে, আমি খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবো।

অমনি একজন গির্জ্জার ঘড়ীতে উঠিবার বড় মইখানা আনিতে ছুটিতে চায়, একজন বারিসিনির বাড়ীর সদর দরজা ঢেঁকির বাড়িতে ভাঙিতে উদ্যত। এই-সমস্ত উদ্ধত ও ক্রুদ্ধ গণ্ডগোলের মধ্যে কলোঁবার তীব্র কণ্ঠ সকল শব্দের উপর উঠিয়া তাহার অনুচরদিগকে বলিল—ওরে, তোরা যে যার কাজে যাবার আগে এক এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে যা।

দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা সৌভাগ্যক্রমে ঘোড়া বেচারির উপর কলোঁবার নিষ্ঠুরতা অর্সোর কাছে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। যদিও অর্সোর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই নিষ্ঠুর আচরণ বারিসিনিদের শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং অর্লান্দিক্‌সিয়োকেই ইহার কর্ত্তা বলিয়া বিশেষ সন্দেহ হইতেছিল, তথাপি সে মনে করিতেছিল যে সে বেচারা তাহার কাছে চড়টা ঘুষিটা খাইয়া উত্তেজিত হইয়া তাহার কিছু না করিতে পারিয়া শেষে ঘোড়ার কান কাটিয়াই নিজের লজ্জা ভুলিয়াছে। এই নীচ ও হাস্যজনক প্রতিহিংসাপ্রণালী দেখিয়া তাহার শত্রুর প্রতি অর্সোর ঘৃণা ও করুণারই উদ্রেক হইতেছিল, ক্রোধ হইতেছিল না; এবং এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কথাই তাহার কাছে ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছিল যে এ রকম মেক্‌দারের লোকের সহিত তাহার যুদ্ধ করা উপযুক্তও নয়, আর তাহার মানায়ও না।

সকলের গণ্ডগোল থামাইয়া যখন সে নিজের কথা সকলকে শোনাইবার মতো অবসর পাইল, তখন অর্সো বলিল—তোমাদের কারো লড়াইয়ের উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে না; আইন আদালত ঘোড়ার কানের জন্যে উচিত-মত খেসারত আদায় করে' তবে ছাড়বে।

এই কথা শুনিয়া সকল লোক একেবারে হতভম্ব হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অর্সো কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল দেখ, এখানকার মালিক আমি, আমি চাই যে তোমরা আমারই হুকুম মান্‌বে। যে খুনখারাপি কি ঘরজ্বালানীর কথা বলবে, সে জেনে রাখে যেন যে আমি তাকেই খুনখারাপি করে' জ্বালিয়ে দেবো। ... শোন! একজন শাদা ঘোড়াটায় জিন কষে দাও।

কলোঁবা অর্সোকে টানিয়া একান্তে লইয়া গিয়া বলিল—দাদা, তোমার রকম কি? এই এতবড় অপমান-টাও হজম করে' ফেলবে? বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে বারিসিনিদের কি সাধ্য হ'ত যে আমা-দের কোনো জন্তুর গায়ে হাত তোলে?

অর্সো বলিল—আমি ত তোকে প্রতিজ্ঞা করেই বলেছি যে এর জন্যে ওদের অনুতাপ করিয়ে তবে ছাড়ব। কিন্তু যে কাপুরুষদের অবোলা জন্তু ভিন্ন মানুষের সঙ্গে লড়াই করবার সাহস নেই, তাদের শাস্তি দেবার উপযুক্ত লোক পুলিশ আর জেলচৌকীদার। আদালতে এর বিচার হবে...আর যদিই সেখানে সুবিচার না হয়, তবে তখন আমাকে তোর স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে আমি ব্যাটাছেলে...

কলোঁবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উদাস মনে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল—উঃ কী ধৈর্য্য!

অর্সো বলিতে লাগিল—দেখ্‌ কলোঁবা, তোকে বলে রাখছি, আমি ফিরে এসে যদি দেখি যে তুই বারি-সিনিদের বিরুদ্ধে কোনোরকম কাজ করেছিস, তা হ'লে আমি কক্‌খনো তোকে ক্ষমা করব না।

তারপর একটু নরম সুরে অর্সো বলিল—আমি

কর্নেল নেভিল আর তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়েই হয়ত ফিরব; দেখিস, তাদের ঘর যেন ঠিক সাজানো থাকে, খাবার দাবারের যেন বেশ জোগাড় হয়, আর আমাদের গৃহকর্ত্রী যেন মেজাজটা একটু মোলায়েম না হোক কম চড়া করে' রাখেন। দেখ্ কলোঁবা, সাহসী হওয়া খুব ভালো, কিন্তু মেয়েদের ঘরকন্নার কাজও একটু জানা দরকার। আচ্ছা, এখন তবে চল্লাম; শান্তশিষ্ট হয়ে থাকিস, লক্ষ্মীটি; শাদা ঘোড়াটায় জিন কষা হয়ে গেছে।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তোমার একলা যাওয়া হবে না।

—না না, আমার সঙ্গে কোনো লোক যাবার দরকার নেই; তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমার কান কাটতে কেউ সাহস করবে না।

—না না, এই বিষম শত্রুতার সময় আমি তোমায় কখনই একলা ছেড়ে দেবো না। এই গ্রিফো, ব্রাঁসে, মেমো, ওরে তোদের বন্দুক নিয়ে আয়; তোরা দাদার সঙ্গে যা।

খুব খানিক বাক্‌বিতণ্ডার পর ক্লান্ত হইয়া অর্সো অগত্যা বাধ্য হইয়া লোক সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইল; পাইক বরকন্দাজের মধ্যে যাহারা উচ্চরোলে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিল, অর্সো বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকেই দূরে রাখিবার জন্য সঙ্গে লইয়া চলিল; এবং পুনরায় তাহার ভগিনী ও অপরাপর পাইকদিগকে শান্ত হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া ঘুরপথে বারিসিনিদের বাড়ী এড়াইয়া অর্সো রওনা হইয়া গেল।

পিয়েত্রানেরা হইতে কিছু দূরে একটা সোঁতা পার হইবার সময় গ্রিফো দেখিল কতকগুলো শূওর কাদা মাখিয়া জলে হুটাপুটি করিয়া খেলা করিতেছে। গ্রিফো দলের সেরা বড় শূওরটাকে টিক করিয়া এক গুলিতেই মারিয়া ফেলিল। শূওরটার সঙ্গীরা নিতান্ত কাপুরুষের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কেহই আর সঙ্গীর দিকে না তাকাইয়া যে যার প্রাণ লইয়া চোঁচা দৌড় দিল; এবং অপর পাইক তাহার বন্দুক যখন ছুড়িল তখন তাহারা ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দিব্য নিরাপদ হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

অর্সো বলিয়া উঠিল—গাধারা! ওগুলো কি হরিণ? ও যে শূওর!

গ্রিফো বলিল—হাঁ হজুর, শূওরই ত। ওগুলো দারোগার পোষা—আমাদের ঘোড়ার কানকাটার একটু শোধ নিলাম।

অর্সো রাগে পাগলের মতো হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—পাজি কাঁহাকা! তোরাও শেষে শত্রুর কাপুরুষতার নকল করলি! বেরো পাজিরা, বেরো আমার সামনে থেকে, দূর হ দূর হ! তোদের নিয়ে আমার কিচ্ছু দরকার নেই। তোরা শূওরের সঙ্গেই যুদ্ধ করবার যোগ্য। খবরদার বলছি, তোরা যদি আমার পেছনে' এক পা আসবি ত আমি তোদের মাথা ভেঙে দেব—না দিই ত আমার অতিবড় দিব্যি!

পাইক দুজন অপ্রতিভ হইয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। অর্সো ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো লাগাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গ্রিফো বলিল—ভ্যালা এ এক মজা দেখছি! যারা তোমার এমন সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরছে, তাদের জন্যে এত দরদ!...আঃ! অমন মোটাসোটা শূওরটা, গুলি না করে' কি থাকা যায়? আবার শাসানো হ'ল যে মাথা ভেঙে দেবেন, মাথাটা খালি ফুকো শিশি আর কি! মেমো, য়ুরোপে এই রকমই শিক্ষে হয়।

—তাই বটে! যদি ওরা জানে যে তুমি শূওর মেরেছ, তা হ'লে ওরা মকদ্দমা করবে, আর ঐ অর্সো মিঞা জজের কাছে দেবে সাক্ষী, আর খেসারত! ভাগ্যিস্ কেউ দেখেনি, দেবতা পীরের আশীর্ব্বাদে বড় বেঁচে যাওয়া গেছে।

তারপর অল্প যুক্তি পরামর্শ করিয়া পাইক দুজন ঠিক করিল যে শূওরটাকে একটা খানায় ফেলিয়া দেওয়াই নিরাপদ। সঙ্কল্প যেই করা অমনি তামিল। রেবিয়া ও বারিসিনির বিবাদের মধ্যে পড়িয়া নিরীহ শূওর বেচারার প্রাণের উপর দিয়াই সমস্ত চোটটা কাটিয়া গেল।

(৮)

অর্সো তাহার বেয়াদব অনুচরদের তাড়াইয়া দিয়া আপন মনে লিডিয়ার দর্শন লাভের সম্ভাবনার আনন্দে

মশ্‌গুল হইয়া পথ চলিতে লাগিল ; পথে যে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এ সম্ভাবনার চিন্তার লেশ মাত্রও তাহার মনে ছিল না। সে আপন মনে ভাবিতে-ছিল—"বারিসিনির নামে নালিশ করিবার জন্য আমায় ত বাস্তিয়া মহকুমায় যাইতেই হইবে, তবে লিডিয়ার সঙ্গেই কেন না যাই ? বাস্তিয়া হইতে আমরা দুজনে একসঙ্গে ওরেজ্জার সমুদ্রটাই বা না দেখিয়া আসিব কেন ?" অর্সোর শৈশবস্মৃতি মনে পড়িয়া গেল, ছেলে-বেলায় ওরেজ্জার সমুদ্রতীর কী সুন্দরই না লাগিয়াছিল ! সে কল্পনা করিতে লাগিল, এক সার বাদাম গাছের তলায় তলায় একখানি যেন সবুজ ঘাসের বনাত বিছানো, তাহার উপর লিডিয়ার হাসিভরা নীল চোখের মতো সুন্দর-নীল নীল ফুলের বুটি—তাহার মধ্যে সে লিডি-য়াকে সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। লিডিয়া তাহার টুপি খুলিয়া-ফেলাতে তাহার রেশমের গুচ্ছের মতো চিকণ ও উজ্জ্বল, কাকের ডানার মতো কালো চুলের রাশ, তাহার পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং বাদাম-গাছের পত্রাবকাশ দিয়া কুচি কুচি রৌদ্র আসিয়া চুলের উপর চুমা খাইয়া চিক চিক করিতেছে ; আর, পাতার ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ নীল আকাশের খণ্ডগুলির চেয়েও লিডিয়ার চোখ দুটি তাহার কাছে বেশী স্বচ্ছ ও নীল মনে হইতেছে। লিডিয়া এক হাতের উপর গাল রাখিয়া প্রসন্ন তন্ময়তার সহিত অর্সোর ভাবকম্পিত কণ্ঠের প্রণয়প্রলাপ শুনিতেছে। আজাক্‌সিয়োতে শেষ দিন লিডিয়া যে মসলিনের পোষাকটি পরিয়াছিল, তাহাই আজও তাহার পরণে ; তাহার সেই শুভ্র লঘু কুঞ্চিত বস্ত্র-জালের ভিতর হইতে দুখানি অতুল কোমল পদতল কালো মকমলের হাল্কা জুতার বুকের উপর লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অর্সোর মনে হইতে লাগিল সে এই পদতলে পড়িয়া একবার সেই চরণটিকে চুম্বন করিতে পারিলে বর্তিয়া যায়। অর্সো যেন একটি ফুল তুলিয়া লিডিয়াকে দিতে গেল, লিডিয়া সেই ফুলটি লইতে হাত বাড়াইল, এবং অর্সো ফুলের বদলে ফুলের মতন সেই হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া আবেগভরে চুম্বন করিল, তাহাতে লিডিয়া কিছুমাত্র বিরাগ প্রকাশ করিল না।

এই-সমস্ত সুখকল্পনায় সে তন্ময় হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতেছিল, পথের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে কল্পনায় দ্বিতীয়বার লিডিয়ার শুভ্র সুন্দর হাতখানিকে চুম্বন করিবে এমন সময় সে সত্যসত্যই ঘোড়ার মাথা চুম্বন করিল,—ঘোড়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, আর অর্সো ঘোড়ার ঘাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। খুকি শিলিনা ঘোড়ার পথ আগুলিয়া লাগাম ধরিয়া ঘোড়া থামাইয়াছে।

শিলিনা বলিল—দাদাঠাকুর, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? আপনার শত্রুরা এই কাছাকাছি ঘুরছে, সে খবর কি রাখেন না ?

অর্সো অমন সুখের মুহূর্তে বাধা পাইয়া রাগে গসগস করিতে করিতে বলিল—আমার শত্রু ! কোথায় তারা ?

—অর্লান্দিকৃসিয়ো এই কাছেই কোথায় আছে ; সে আপনার অপেক্ষাই করছে। ফিরে যান, ফিরে যান।

—আ ! আমার অপেক্ষা করছে ? তুমি তাকে দেখেছ ?

—হাঁ দাদাঠাকুর, আমি শ্যাওলার ওপর শুয়ে ছিলাম, ও এদিক দিয়েই দূরবীন কষে চারিদিক দেখতে দেখতে গেল।

—কোন দিকে গেল সে ?

—ঐ দিকে, যেদিক পানে আপনি যাচ্ছিলেন।

—আচ্ছা বেশ।

—দাদাঠাকুর, কাকার জন্যে একটু অপেক্ষা করে' গেলে হ'ত না ? তার আসতে দেরি হবে না, সে সঙ্গে থাকলে আর কোনো বিপদের ভয় থাকবে না।

—ভয় কি শিলি ? তোমার কাকার আর সঙ্গে যেতে হবে না।

—তা হলে আমি আপনার আগে আগে যাই চলুন।

—না না, তোর আর কষ্ট করতে হবে না, থাক থাক।

অর্সো ঘোড়া ছুটাইয়া শিলিনার নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়া গেল। প্রথমেই তাহার মন অন্ধ উন্মত্ততায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং তাহার মনে হইল দৈব তাহাকে সুযোগ জুটাইয়া দিয়াছে, যে কাপুরুষ একটা

ঘোড়াকে অঙ্গহীন করিয়াছিল তাহার অঙ্গহানি করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই তাহার মনে হইল যে সে ইচ্ছা করিয়া কোনো রূপ শত্রুতা সাধন করিবে না, স্বীকার করিয়াছে; অধিকন্তু লিডিয়ার সহিত সাক্ষাতে বিলম্ব হইবার বা বাধা পড়িবার ভয় হইল; তখন তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, এবং তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে অর্লান্দিকৃসিয়োর সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই ভালো হয়। কিন্তু আবার পরক্ষণেই তাহার পিতার স্মৃতি, তাহার ঘোড়াকে অপমান, বুড়া বারিসিনির ভয় দেখানো মনে পড়াতে তাহার রক্ত আবার গরম হইয়া উঠিল এবং সে শত্রুকে সন্ধান করিয়া যুদ্ধে বাধ্য করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। এই রকম বিরুদ্ধ ভাবে উত্তেজিত হইয়া সে সম্মুখেই অগ্রসর হইয়া চলিল বটে, কিন্তু খুব সাবধানে, প্রতি ঝোপ ঝাড়, বেড়া আড়াল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া দেখিয়া এবং সামান্য শব্দেও দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিয়া শুনিয়া চলিতে লাগিল। শিলিনার নিকট হইতে দশ মিনিটের পথ অগ্রসর হইয়া, বেলা প্রায় নটার সময়, সে একটা একদম খাড়া পাহাড়ের ধারে আসিয়া পড়িল; যে পথ দিয়া যাইতেছিল তাহা কোনো বাঁধা পথ নয়, লোকের পায়ে পায়ে মাঠের বুকের উপর একটা ক্ষীণ রেখার আভাস মাত্র; সেই পথটা সদ্য-পোড়ানো একটা বনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই জায়গাটার উপর ছাই কয়লা ছড়ানো, এখানে সেখানে আধপোড়া ঝোপঝাড়, পাতাশূন্য আধপোড়া গাছ, কোনোটা মরিয়া গিয়াছে, কোনোটা আমলিয়া পড়িয়াছে। এ রকম পোড়া বনের মধ্যে আসিলে উত্তর দেশের শীতের ছবি মনে পড়ে, সেও এমনি রিক্ত, এমনি শ্রীহীন ছন্নছাড়া; কিন্তু আগুনের জিহ্বালেহনে স্থানের ও উদ্ভিজ্জশ্রীর যে দুর্দ্দশা ঘটে তা যেন অধিকতর চক্ষুপীড়াদায়ক। কিন্তু অর্সো তাহা দেখিয়া বরং খুসিই হইল, এখানে কাহারো লুকাইয়া ছিপাইয়া থাকা সম্ভব নয়। এবং যাহার প্রতি-পদে আশঙ্কা হইতেছে কোন্ অতর্কিত স্থান হইতে অলক্ষিতে বন্দুকের নল মাথা উঁচাইয়া তাহার বুকের দিকে তাগ করিবে, তাহার কাছে উদ্ভিজ্জশোভা অপেক্ষা অবাধদৃষ্টি মরু প্রান্তর অধিক মনোরম মনে হওয়া নেহাৎ অস্বাভাবিক নয়। এই পোড়া বনটার পরে কয়েকখানা চষা ক্ষেত, বুক-সমান উঁচু পাথরের বেড়া দিয়া ঘেরা। দুধারি ক্ষেতের বেড়ার মাঝখান দিয়া পথ; পথের ধারে ধারে বাদামের গাছ এলোমেলো জন্মিয়াছে, দূর হইতে দেখিলে একটা নিবিড় জঙ্গলের মতোই দেখায়।

সেই জায়গাটা চড়াই বলিয়া অর্সো ঘোড়ার গলার উপর লাগাম ফেলিয়া দিয়া লাফাইয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল; বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ডান হাতি মোড় ফিরিয়া কুড়ি কদম যাইতে না যাইতে সে দেখিল ঠিক তাহার সামনে বেড়ার পাশ হইতে একটা বন্দুকের নল ও একটা মাথা উঁচু হইয়া উঠিল। অর্সো চিনিল, অর্লান্দিকৃসিয়ো তাহাকে গুলি করিবার জন্য তাগ করিতেছে। অর্সো চট করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, এবং উভয়েই কয়েক মুহূর্ত্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃত্যু দান বা গ্রহণের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে লাগিল।

অর্সো গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—হতভাগা কাপুরুষ কোথাকার!

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্সো অর্লান্দিক্‌-সিয়োর বন্দুকের মুখে আগুনের ঝলক দেখিতে পাইল, এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাঁ হাতি বেড়ার আড়াল হইতে আর একটা বন্দুক আওয়াজ হইল, কিন্তু কে যে আওয়াজ করিল তাহা বুঝা গেল না, লোকটা ধোঁয়ার আড়ালে লুকাইয়া ছিল। দুটো গুলিই আসিয়া অর্সোকে লাগিল; অর্লান্দিকৃসিয়োর গুলিটা তাহার বাঁ হাত এপার ওপার ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, অপর গুলিটা বুকে আসিয়া লাগিয়া জামা ছিঁড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে তাহার ছোরার ফলার উপর গিয়া লাগাতে গুলিটা পিছলাইয়া তেরছা হইয়া বাহির হইয়া গেল, তাহাতে খানিকটা চামড়া আঁচড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু সাংঘাতিক আঘাত করিতে পারিল না। অর্সোর বাঁ হাতটা অসাড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বন্দুকের নলটাও নীচু মুখে ঝুঁকিয়া গেল; কিন্তু সে এক হাতেই তাহার প্রকাণ্ড বন্দুকটা আবার টাগাইয়া অর্লান্দিকৃসিয়োকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। অর্লা-ন্দিকৃসিয়োর মাত্র চোখ দুটি পর্য্যন্ত বেড়ার উপরে জাগিয়া

ছিল, বন্দুকের আওয়াজ হইতেই তাহাও বেড়ার আড়ালে ডুবিয়া গেল। তখন অর্সো বাঁ দিকে ফিরিয়া বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় গুলি আওয়াজ করিল; অমনি বন্দুকের ধোঁয়ার আড়ালে আবছায়া একজন লোক বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। এই চারটি বন্দুকের আওয়াজ এমন উপরা-উপরি হইয়াছিল যে কাওয়াজের সময় হুকুম পাওয়া মাত্র সৈন্যশ্রেণীর বন্দুকও এমন যুগপৎ আওয়াজ হয় কিনা সন্দেহ। অর্সোর দ্বিতীয় আওয়াজের পরে সব চুপচাপ। অর্সোর বন্দুকের ধোঁয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শূন্যে উঠিয়া যাইতেছিল; বেড়ার পাশে কোনো সাড়া শব্দের লেশ মাত্র নাই। তাহার হাতের বেদনাটা নিতান্ত রূঢ় সত্য বলিয়া মনে না হইলে অর্সো হয়ত ভাবিতে পারিত যে ইহা স্বপ্ন, ইহা তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা, অথবা ইহা মায়া—নতুবা তাহার শত্রুরা অকস্মাৎ কোথায় নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিল?

আবার যদি বন্দুক ছোড়ার দরকার হয়, এজন্য অর্সো তাড়াতাড়ি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা পোড়া গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে বন্দুক ধরিয়া এক হাতেই চটপট বন্দুকে আবার টোটা ভরিয়া ফেলিল। তাহার বাঁ হাতটায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, এবং মনে হইতেছিল যেন সেই হাতখানা বিষম ভারি বোঝা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার শত্রুরা সব গেল কোথায়? তাহা সে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না। যদি তাহারা পলায়নই করিত, বা তাহারা আহত হইয়াও পড়িত তাহা হইলে কোথাও ত একটুও শব্দ শোনা যাইত? এ যে একেবারে চুপচাপ! তবে কি তাহারা মরিয়াছে? না, তাহারা আবার গুলি করিবার প্রতীক্ষায় বেড়ার আড়ালে ঘুপটি মারিয়া চুপটি করিয়া আছে! এইরূপ সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া অর্সো যাইতেও পারিতেছিল না, থাকিতেও পারিতেছিল না; অথচ তাহার বোধ হইতেছিল যে সে রক্তস্রাব দ্বারা ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; তখন সে মাটিতে ডাহিন হাঁটু গাড়িয়া বাঁ হাঁটু উঁচু করিয়া বসিল, এবং বাঁ হাঁটুর উপর আহত বাঁ হাতখানা শোয়াইয়া দিয়া একটা গাছের কেঁকড়ি ডালের সন্ধির উপর বন্দুকটা ঠেক্‌নো দিয়া বসাইয়া, বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল, বেড়ার উপর দৃষ্টি, সামান্য শব্দের দিকে কান সতর্ক করিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া কয়েক মিনিট রহিল—কিন্তু তাহাতেই তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে শত শতাব্দী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় তাহার পশ্চাতে কাহার উচ্চ ডাক শোনা গেল, এবং একটা কুকুর খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া তীরের বেগে নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। এ ব্রিস্কো, ফেরারীদের সাকরেদ ও সঙ্গী। সে তাহার প্রভুর আগমনেরই অগ্রদূত। অর্সো উৎসুক হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এমন ঔৎসুক্য আর কখনো কোনো লোকের জন্য কাহারো হইয়াছে কি না সন্দেহ। কুকুরটা পাশের বেড়ার দিকে ফিরিয়া খুঁতি উঁচু করিয়া ব্যস্ত ভাবে বাতাস শুঁকিতে লাগিল। অকস্মাৎ সে গুমরাইয়া ডাকিতে ডাকিতে এক লাফে দেয়ালের মাথায় উঠিল, এবং সেখান হইতে তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটাতে বিস্ময় ভরিয়া অর্সোর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; অল্পক্ষণ পরেই সে নাক আকাশে তুলিয়া অপর দিকের দেয়ালের মাথায় লাফাইয়া গিয়া কিসের গন্ধ যেন শুঁকিতে লাগিল। তারপর সে বিস্ময় ও অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টিতে অর্সোর দিকে তাকাইতে তাকাইতে দুই পায়ের মধ্যে ল্যাজ গুটাইয়া পিছু হটিয়া হটিয়া গুটি গুটি অর্সোর নিকট হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিছু দূরে গিয়াই যেমন বেগে নামিয়া আসিয়াছিল তেমনি বেগে এক ছুটে খাড়া পাহাড়ে উঠিয়া যে একজন লোক খাড়া পাহাড় বাহিয়া নামিয়া আসিতেছিল তাহার কাছে গিয়া জুটিল।

সেই ব্যক্তি একটু নিকট হইলে অর্সো যখন বুঝিল যে সে তাহার কথা শুনিতে পাইবে, তখন অর্সো তাহাকে ডাকিয়া বলিল—ব্রান্দো, এই যে আমি এখানে!

ব্রান্দো বেদম হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল—আহা হা অর্সো আন্তো! আপনি জখম হয়েছ! গায়ে, না হাত পায়ে?......

—হাতে।

—হাতে? ও তবে কিছু নয়। আর কোথাও?

—বোধ হয় সে একটু ছুঁয়ে গেছে মাত্র।

ব্রান্দো তাহার কুকুরের অনুসরণ করিয়া পাশের বেড়ার ধারে দৌড়িয়া গিয়া ওপারে নীচের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল, এবং মাথার টুপি খুলিয়া স্নেহের স্বরে বলিয়া উঠিল—অর্লান্দিকুসিয়ো সাহেব, সেলাম সেলাম।

তারপর অর্সোর দিকে ঘুরিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—একেই ত বলে মরদ-বাচ্চা!

অর্সো কষ্টে নিশ্বাস লইয়া বলিল—কি রে, ওটা কি এখনো বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ বেঁচে থাকবে বৈ কি? জীবনকে সে আর এজন্মে কাছে ভিড়তে দেবে না! যে গুলি ওকে ঠুকেছ, একেবারে কানপট্টিতে! তাতে ও মনে মনে ভারি খাপ্পা হয়ে আছে। বাপ! কী গর্ত্তই হয়ে গেছে! আচ্ছা বন্দুক যা হোক তোমার! ক্যায়সা জোর! একেবারে মাথার ঘিলু বা'র করে' দিয়ে ছেড়েছে! সত্যি, প্রথমে যখন আমি শুনলাম বন্দুকের আওয়াজ—পট! পট! আমি মনে করলাম ওরা আমার লেফ্‌টেনাণ্টকে খুন করলে বুঝি! তারপর শুনলাম দুড়ুম! দুড়ুম! ভাবলাম, যাক্, আমার লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবের ইংরেজ-তৈরী বন্দুক জবর রকমের জবাব দিয়েছে।......আচ্ছা ব্রিস্কো, এখন আর কি করতে হবে?

কুকুর তাহাকে অপর ক্ষেতের বেড়ার ধারে লইয়া গেল।

ব্রান্দো হতভম্ব হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! দু-গুলি আর ব্যস সব খতম! বারুদ বড় মাগ্‌গী জিনিস, তাই আপনি অল্পেই কাজ সেরেছ দেখছি!

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—ওরে ব্যাপার কি?

—লেফ্‌টেনাণ্ট, তোমার ঠাট্টা মস্করা রাখ! যেন কিছুই জানেন না! শিকার মাটিতে পেড়েছ আর কি? এখন কুড়িয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাবার ওয়াস্তা। ...আহা, আজকে তোমার ভাগ্যে এমন শিকার জুটল, যার বুড়ো বারিসিনি বেচারা কসাইয়ের দোকানের মাংস খেয়েই পেট ভরাবে! আহা বেচারাকেও নেমন্তন্ন কোরো! আমি ভাবছি এখন কোন্ সয়তান ওর বিষয় খাবে আর বুড়োকে পিণ্ডি খাওয়াবে?

—কি! ভ্যাঁসান্তেলোও মরেছে?

—একদম! আপনার দয়া খুব, ওদের আর মরতে বেশি কষ্ট পেতে হয়নি। দেখ'সে অর্সো আন্তো দেখ'সে ভ্যাঁসান্তেলো ছোঁড়ার রকম! এখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, যেন ঘুমানো হচ্ছে! সীসের গুলির নিঁদুটি মন্তর! মহানিদ্রা এনে দিয়েছে! আহা বেচারা!

অর্সো ভয়ে মুখ ফিরাইয়া বলিল—সত্যিই কি ও-ও মরেছে?

—আপনি যেন ঠিক সাম্পিরো কর্সো, একগুলির বেশি খরচ কর না। ঐ যে বাঁ দিকে বুকের ওপর গুলিটা দেখছ, ও কলিজা থেকে বেশি দূর দিয়ে যায় নি; ওয়াটার্লু যুদ্ধে আমাদের ভ্যাঁসিলিওন অমনি করেই কাবু হয়েছিল। দু-গুলি! ব্যস, দু-গুলিতে দুজন কাত! এক এক ভাই এক এক গুলি! তেনলা বন্দুক হ'লে বুড়ো বাপটাও এই সঙ্গে সাবাড় হয়ে যেত! পরে হবে!... অর্সো আন্তো, আচ্ছা লাগান লাগিয়েছ!...এমন ভাগ্য কি আমার হবে, দুই গুলিতে দু দুটো দুষমন শিকার করব?

ব্রান্দো অর্সোর হাত পরীক্ষা করিয়া তাহার ছোরা দিয়া তাহাকে একটা লাঠি কাটিয়া দিয়া বলিল—ও কিছু নয়! এই জামাটা কলোঁবা ঠাকরুণের একটু কাজ বাড়াবে, তাঁকে খানিকটা রিফুকর্ম্ম করতে হবে। ...আহা! এ কি? বুকের ওপর জখম হয়েছ? কিছু ঢোকেনি ত ওখানে? নাঃ, তোমার এমন হাসিখুসি ভাব আমার ভালো লাগছে না। দেখি দেখি, তোমার আঙুল দেখি, আমি কামড়াচ্ছি,লাগছে?...বেশি লাগছে না? না না, ও বেশি কিছু নয়। তোমার রুমাল আর গলাবন্দ খুলে আমায় দাও। জামাটা ত একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।..আচ্ছা, এমন বাবু সেজে যাওয়া হচ্ছিল কোথায়? বিয়ে করতে?...এস, এক চুমুক মদ খাও দেখি।...সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে বেড়াও না কেন? কর্সিক কখনো বোতল ছাড়া চলে?

ব্রান্দো অর্সোর ঘায়ে পটি বাঁধিয়া দিতে দিতে আবার হঠাৎ বলিয়া উঠিল—ডবল গুলি! ডবল শিকার

একেবারে মরে' আকাট !...আঃ পণ্ডিতজী কী হাসিটাই হাসবে !...ডবল গুলি ! হাঁ, হাসবার আর-একজনও আছে, শিলিনাও খুব হাসবে !

অর্সো এ কথার কোনো জবাব দিল না। সে শবের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ব্রান্দো বলিল—শিলি, বেড়ার ওপারে দেখত রে। কি ? অ্যাঁ ?

বালিকা হাতে পায়ে দেয়াল ধরিয়া আঁচড়াইয়া আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া উঠিয়া অর্লান্দিক্সিয়োর শব দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল।

ব্রান্দো বলিল—শুধু ঐই নয়, এ বেড়াটার পাশেও দেখ্।

বালিকা পুনরায় আঁৎকাইয়া উঠিল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কাকা, এ কি তোমার কাজ ?

—আমি ! কেন আমি বুড়ো হয়েছি বলে' কি আর ওকাজ আমি করতে পারি নে ? শিলি, ও এঁর কাজ। তুই এঁকে ধন্যবাদ দে।

শিলিনা বলিল—কলোঁবা দিদি খুব খুসি হবেন ; কিন্তু আপনি জখম হয়েছেন দেখে ভারি কষ্টও হবে তাঁর।

ব্রান্দো অর্সোর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করিয়া বলিল—চল অর্সো আন্তো, শিলিনা তোমার ঘোড়া ধরে' এনেছে। চড়ে' বস ; আমার সঙ্গে স্তাজোনার জঙ্গলে এখন আস্তানা গাড়বে চল। সেখান থেকে তোমায় যে খুঁজে বা'র কর্‌তে পারবে সে কম ধড়িবাজ নয়। আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তোমার সেবা করব। সেন্ট-ক্রিষ্টিনের ক্রশের কাছ থেকে হেঁটে যেতে হবে, তখন শিলিনার হাতে ঘোড়াটা দিয়ো, ও কলোঁবা ঠাকরুণের কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাবে, আর তোমার যদি কোনো খবর দেবার থাকে তাও দিয়ে আসবে, তুমি ওকে সব কথাই বিশ্বাস করে' বলতে পার, ওকে কুচি কুচি করে' কেটে থুড়ে ফেললেও ও বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্‌বে না।

[illegible] স্নেহকোমল স্বরে শিলিনাকে বলিল—দুষ্ট মেয়ে, যাবি, কিন্তু দেখিস নিমকহারাম হবি, সয়তানী হবি, সর্ব্বনাশ করবি, বুঝলি ?

ব্রান্দোর মনেও সাধারণ ফেরারীদের মতো কুসংস্কার ছিল যে কোনো শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে বা প্রশংসা করিতে হইলে যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহার উল্টা বলিতে হয় ; তাহা হইলে দৈব তাহা সু-কানে শোনেন, মনের মানে বোঝেন ; কিন্তু সয়তান যদি শোনে ত কথার অর্থই মনের কামনা বলিয়া ভুল করিয়া পাছে উহাতেই লোকের ভালো হয় তাই উহার উল্টাটাই হইবার পক্ষে সাহায্য করে।

অর্সো অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—ব্রান্দো, আমি এখন কোথায় যাব ?

—হ্যা দ্যাখ ! তা আমি কেমন করে জানব ? সে তোমার যেমন ইচ্ছে - জেলে, নয় জঙ্গলে। কিন্তু রেবিয়া-বংশের কেউ ত জেলের পথ চেনে না। তবে আর কোথায় যাবে, জঙ্গলেই যেতে হয়।

অর্সো হতাশাকাতর ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—তবে বিদায় আমার সকল আশা ভরসা, সুখের স্বপ্ন, আনন্দ উল্লাস, তোমাদের কাছে এই আজ চিরবিদায় !

—আপনার আশা ভরসা, সুখ আনন্দ ? আ আমার পোড়া কপাল ! দোনলা বন্দুকের দুই গুলিতে যা করেছ তার চেয়েও আরও বেশি কিছু আনন্দের আশা রাখ নাকি ?...আর ওরা ! তোমার গা একটু ছুঁয়ে গেছে মাত্র ! ওরা ভারি মজার মানুষ ছিল, কিন্তু বেরাল-ছানার চেয়ে ওদের প্রাণগুলো আর একটু টন্‌কো হলে বেশ হ'ত।

অর্সো বলিল—ওরাই আমাকে প্রথমে গুলি করেছিল।

—হাঁ হাঁ, আমি বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছি।...আগে, পট ! পট ! তারপর, দুড়ুম ! দুড়ুম ! ডবল গুলি এক হাতে !... এর চেয়ে কেরামৎ যদি কেউ দেখাতে পারে ত আমি আমার প্রাণ বাজি রাখতে রাজি আছি। এস, এখন চড়ে পড়··· ; যাবার আগে একবার তোমার নিজের হাতের কাণ্ডখানা দেখে নাও। ওদের একলাটি তেপান্তর মাঠে ফেলে রেখে যাচ্ছ, বিদায় না নিয়ে যাওয়া কি ভদ্রতাসঙ্গত হবে ?

অর্সো ঘোড়ার পেটে পায়ের গুঁতো লাগাইয়া ছুটাইয়া দিল; যে হতভাগাদের সে নিজের হাতে বধ করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী পাইলেও সে তাহাদের দিকে তাকাইতে পারিত না।

ব্রান্দো ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—আরে থাম থাম, তোমাকে কি আবার খোলসা করে' বলতে হবে? তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি নে, কিছু মন্দ ভেবেও বলছি নে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এই ছেলে দুটোর জন্যে আমার ভারি দুঃখু হচ্ছে। আমায় মাপ কোরো...কিন্তু অমন সুপুরুষ,... অমন জোয়ান...অমন ছোকরা বয়েস!...কত বার অর্লান্দিকৃসিয়োর সঙ্গে আমি শিকার খেলেছি।...এই সবে চার দিন হ'ল ও আমাকে এক বাণ্ডিল চুরুট দিয়েছিল। ...ভ্যাঁসান্তেলো ছোঁড়াও তোফা খোসমেজাজের লোক ছিল!...তোমার যা করা উচিত ছিল তুমি তাই করেছ, আর তাগ এমন মক্‌খম করেছ যে কারো আপশোষ করবারও কারণ নেই;...কিন্তু তবু আমার সঙ্গে ত তাদের কোনো বিবাদ ছিল না!..আমি জানি তোমার রাগের কারণ আছে; শত্রু যদি থাকে তবে শত্রু নিপাতই করতে হয়। কিন্তু বারিসিনিবংশ পুরোণো বনিয়াদি বংশ।..সে বংশটা একেবারে লোপ পেয়ে গেল...আর, মাত্র দু গুলিতে! এটা বড় আপশোষের বিষয়!

ব্রান্দো এই কথায় বারিসিনিবংশের তর্পণ শেষ করিয়া অর্সো শিলিনা ও কুকুর ব্রিস্কোকে লইয়া দ্রুতপদে স্তাজোনার জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনিয়ন্ত্রিত রাজশাসনতন্ত্র। রাজার ক্ষমতা এই ক্ষমতা হইতে বিপদের সম্ভাবনা। বিদ্রোহ। অপরাধ। প্রথম-সম্রাটদিগের চরিত্র। —প্রাসাদ—শিবির।—রাজার জীবনযাপন-পদ্ধতি।—অন্দর-মহল। —সম্রাটের অধীনস্থ জায়গীরদার।—উৎসবাদি।

সাম্রাজ্যের কল্যাণসাধন ও শাসনের সুব্যবস্থা—সমস্তই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিত। সমস্তই সম্রাটের ক্ষমতাধীন, সমস্তই তাঁহার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত। হিন্দু ও মুসলমান জায়গীরদার, এবং যে-সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহের জন্য উদ্যত—সকলেই একমাত্র সম্রাটকেই মানিয়া চলিত। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি তিনিই কেবল নিবারণ করিতেন। চতুর্দ্দশ লুইর রাজদরবার অপেক্ষাও মোগল-বাদ্‌শার রাজদরবার রাষ্ট্রের প্রকৃত কেন্দ্র ছিল। আরংজেবের আমলে দুই শত কোটি মুদ্রার অধিক রাজস্ব রাজকোষভুক্ত হইত এবং কোন উপঢৌকন না লইয়া কেহ সম্রাটের সমীপে গমন করিতে পারিত না। একটিবার মাত্র সম্রাটের দর্শনলাভ করিতে Travernierএর ১২,১১৯ ফরাসী পৌণ্ড-মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া বলেন,—সম্রাটের সাম্বৎসরিক উৎসবে উপঢৌকনের মূল্য তিন কোটি পৌণ্ড পর্য্যন্ত উঠিত (প্রায় আজিকার ৬২, ৫০০, ০০০ ফ্র্যাঙ্ক)। এত অধিক রাজস্বেও সম্রাটের খরচ কুলান ভার হইত। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত খরচ, দরবারের খরচ, সৈন্যের খরচ—সমস্তই সম্রাটকেই দিতে হইত। আমীরদিগের অভ্যর্থনার ব্যয়ভারও তাঁহাকে বহন করিতে হইত। অবসর-বৃত্তি লাভে যাঁহাদের ন্যায্য অধিকার এরূপ অসংখ্য লোক ছিল। আইন-ই-আকবরী এইরূপ চারি শ্রেণীর উল্লেখ করেন; বিদ্বজ্জন, ফকীর, দরিদ্র, ভূসম্পত্তিহীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। Catrou ঠিকই বলিয়াছেন, এই উপকথা-সুলভ বিপুল অর্থ রাজকোষ দিয়া পার হইত মাত্র—উহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারিত না। সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সম্রাটের অর্থেই জীবন ধারণ করিত—রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক, সমস্ত কৃষক। ভূমি সম্রাটের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। উহারা সম্রাটের জন্যই খাটিত এবং উহাদের ভরণ পোষণের ভার ছিল সম্রাটের উপর। এইরূপ সমস্ত নগরের কারিগরেরা:—ইহারা সকলেই কাজে ব্যাপৃত থাকিত, আর সরকার হইতে বেতন পাইত। আরংজেবের মৃত্যুকালে, রাজকোষে ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

সম্রাট সর্ব্বশক্তিমান হইলেও, কল্য কি ঘটিবে সে

বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেন না।' রাজপ্রাসাদে অবিরাম ষড়যন্ত্র, প্রদেশে প্রদেশে বিদ্রোহ। জেহাঙ্গির পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র শাজেহানের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শাজেহান গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিজ ভ্রাতাকে বধ করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। শাজেহান বৃদ্ধ হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখনই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা প্রাসাদের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন; পক্ষান্তরে অন্য পুত্রগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। আরংজেব সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইলেন। তিনি দারার শিরশ্ছেদ করিলেন, পিতাকে বন্দী করিলেন, আর দুই ভাইকে হত্যা করিলেন, এবং তাঁহার পরিবারের আর সকলেই হয় বিষপ্রয়োগে নিহত হইল, নয় নির্ব্বাসিত হইল।

যথেচ্ছাচারী অনিয়ন্ত্রিত অধিপতি—এই মোগল সম্রাটেরা নিজ নিজ চরিত্রের অনুরূপ, স্বকীয় দরবার ও শাসনতন্ত্র গঠন করিতেন। আকবরের আমলে, জেহাঙ্গির গোঁড়া মুসলমানদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যেমন কঠোর-প্রকৃতি সৈনিক তেমনি নিপুণ সেনাপতি—আরংজেব বিশ বৎসর কাল শিবিরে-শিবিরে কাটাইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান ছিলেন। যৌবনে দরবেশ, সিংহাসনে সন্ন্যাসী;—কেবল নেমাজ পড়িতেছেন—আর ধ্যান করিতেছেন। মদ্য মাংস কখন স্পর্শ করিতেন না; কত মাস উপবাস করিয়া কাটাইতেন; কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন, এবং এরূপ কঠোরভাবে আত্মনিগ্রহ করিতেন যে কতবার তিনি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ধৈর্য্যাবলম্বী ও কপটাচারী ছিলেন। তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতাদিগকে তিনি বলিতেন,—ইহ-জগতের ধন ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। পরে, যাহাকে তিনি বিধর্ম্মী বলিতেন সেই দারার অধর্ম্মাচরণে তিনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্তরালে লোক প্রচ্ছন্ন রাখিয়া হত করেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সিংহাসন দখল করিয়া বসেন, একজন বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা দারাকে আত্মসমর্পন করান, এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের গুপ্তঘাতকদিগকে তিনি ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত বৈরনির্য্যাতক বলিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন। অবশেষে যে দিন দারার জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করেন, ঠিক্ সেই দিনই তাঁহার নিকট জল্লাদকে পাঠাইয়া দেন।

***

সম্রাটদিগের চরিত্র যতই বিভিন্ন হউক না, তাঁহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য ছিল। ভারতীয় রাজার প্রধান জিনিস—একটি জাঁকাল রাজসভা। মোগল-সম্রাটদিগের প্রাসাদগুলি যার-পর-নাই সুন্দর। আকবর ফতেপুর ও লাহোরে, জাহাঙ্গির ও শাজেহান আগ্রার কেল্লায়, এবং আরংজেব জেহানাবাদে অবস্থান করিতেন। শাজেহান পুরাতন দিল্লির সন্নিকটে এই জেহানাবাদ নির্ম্মাণ করেন, পরে এই নগরই আধুনিক দিল্লি হইয়া দাঁড়ায়।

জেহানাবাদের বর্ণনা পাঠ করিলেই পাঠক মোগল প্রাসাদসমূহের নক্সা এবং সম্রাটদিগের বিভব ঐশ্বর্য্যের একটু আভাস পাইবেন।

দুইটা সিধা রাস্তা, ত্রিশ ফুট চওড়া—তাহার ধারে ধারে খিলান-পথ (arcade) ও বিপণিসমূহ। তাহার শেষ-প্রান্তে, একটি বৃহৎ প্রাসাদ, লোহিতবর্ণ প্রাকার-বিশিষ্ট দুর্গ—দুর্গের পার্শ্বভাগে কতকগুলি বুরুজ এবং এই দুর্গ পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণে ও বামে রাজপুতদিগের তাঁবু। এই রাজপুতেরা নিজ অধিস্বামী সম্রাটের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিবে, কিন্তু কোন মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করিতে সম্মত হইবে না।

তাঁবু ও বাজার—এই দুয়ের মাঝখানে,—পশুপ্রদর্শক, বাজিকর ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি। জনতার মধ্য দিয়া নির্দ্দয়-ভাবে পথ করিয়া, অনুচরবর্গের সহিত আমীরেরা অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে; গোলাকার পাগড়ী অথবা পারস্যদেশীয় শিরস্ত্রাণ, কানের উপর সাঁজোয়া, নমনীয় বর্ম্ম, গোলাকার স্বর্ণরেখাঙ্কিত ঢাল; তাহাদের জব্বা-কবচ ও তলোয়ার,—বর্ম্মের উপর অথবা অশ্ব-সজ্জার উপর আঘাত করিতেছে। তাহার পর, পাল্কীতে শুইয়া হিন্দু রাজারা চলিয়াছে—

শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত, প্যাঁচাল পাগ্‌ড়ী, কানে কান-বালা, নাকে নথ, পাগ্‌ড়ীর উপর শির্‌পচ্‌-কল্কা, মুদ্রার কণ্ঠহার, হাতে বলয়, পায়ে মল। পান খাইয়া উহাদের দাঁত লাল হইয়া গিয়াছে এবং রূপার পিক্‌দানীতে সর্ব্বদা পিক্‌ ফেলিতেছে। ভৃত্যেরা ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজন করিতেছে।

প্রাসাদের বহির্বেষ্টন হইতে বাহির হইবার জন্য খিড়কী-দ্বার; তাহার দুই পার্শ্বে দুই প্রস্তরময় হস্তী, হস্তীর উপর বিজিত রাজাদিগের প্রতিমূর্ত্তি। দুর্গপ্রাসাদ:—রাজপথ-সমন্বিত একটি নগর, কতকগুলি উদ্যান, খাল, একটি বাজার, সম্রাটের কারখানা—সেখানে অস্ত্রাদি, গালার জিনিস, সোনার সামগ্রী, অলঙ্কারাদি, ছবি, চিকণের কাজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যে পাহাড়ের নীচে যমুনা প্রবাহিত, সেই পাহাড়ের উপর রাজপ্রাসাদ; বড় বড় প্রাঙ্গন, তাহার চতুর্দ্দিকে চাঁদ্‌নি, খোলা-দালান, মণ্ডপ-গৃহ, রত্ন-খচিত সাদা মর্ম্মর-প্রস্তরের চতুষ্ক। নিদাঘ-যামিনীতে বিশ্রাম করিবার জন্য বারান্দা-ছাদ-ওয়ালা কতকগুলি বাস-গৃহ।

লাল পাথরের বৃহৎ দরবার-শালা—দিওয়ান-ই-আম; সাদা পাথরের ক্ষুদ্র দরবার-শালা—দিওয়ান-ই-খাস;—এই দরবার-শালায় প্রসিদ্ধ রত্নখচিত ময়ূর-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল। এই দুই দরবার-শালায় সম্রাট প্রতিদিন স্বীয় হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন। তুরী নিনাদিত হইত, ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিত, সেলামী-তোপ ধ্বনিত হইত। উৎসবের সময়, একটা সমস্ত অঙ্গন জুড়িয়া একটা মণ্ডপ-গৃহ খাড়া করা হইত, গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইত। রেশমী কাপড়ে ও কিংখাপে দেয়াল ও থাম অদৃশ্য হইয়া পড়িত। সিংহাসনের উপর সম্রাট উপবিষ্ট, জরির-পাড়-ওয়ালা সাদা সাটিনের পরিচ্ছদ; আঁটসাট্‌ ফতুয়া ও পায়জামা। ঝুলো জামা জোড়া হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বমান। রত্নখচিত একটি কোমর-বন্দ, মুক্তার কণ্ঠহার, জরীর পাগ্‌ড়ী, তাহার উপর শিরো-ভূষণস্বরূপ হীরক-বেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড পোখ্‌রাজ। সিংহাসনের পাদদেশে, একটা স্বর্ণময় মঞ্চের উপর, জাঁকাল পোষাক পরিয়া আমীর ও রাজারা উপবিষ্ট। আরও নীচে মুন্‌সবদার ও রাজকর্ম্মচারীগণ। প্রতি বৎসর সম্রাটের জন্মদিনে, মহাগম্ভীরভাবে সম্রাটকে তৌলদণ্ডে ওজন করা হইত। ওজন বৃদ্ধি হইলে, সেই উপলক্ষে খুব আমোদ আহ্লাদ হইত।

পশুর লড়াই আমোদের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে, কৃষ্ণসার মৃগ, ভারুই, ও তিতির পক্ষী রক্ষিত হইত। যমুনার সৈকত-তটে হস্তীর যুদ্ধ হইত। সম্রাট্‌, সভাসদ্‌গণ, ও বেগমেরা প্রাসাদের ছাদ হইতে নিরীক্ষণ করিতেন। ইতরসাধারণ দর্শকের অত্যন্ত ভীড় হইত। মধ্যস্থলে একটা মৃত্তিকাস্তূপ থাকিত। দুইটা হাতী পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইত। প্রত্যেক হাতীর উপর তিন জন করিয়া মাহুত। মধুর স্বরে আহূত হইয়া, অঙ্কুশের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া, উহারা পরস্পরের প্রতি দন্তপ্রহার করিতে থাকে, শুঁড়ের দ্বারা প্রতিপক্ষের মাহুতকে ধরিবার চেষ্টা করে। মাহুত ভূতলে পতিত হইলে তাহাকে পদদলিত করে। ইহারই মধ্যে হস্তীগণ সেই মাটির ঢিবিটাকে উল্টাইয়া ফেলিয়াছে, পরস্পরের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিতেছে, দন্তের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। অবশেষে একটা হস্তী পলায়ন করিল, অপর হস্তীটা প্রমত্তভাবে তাহার অনুধাবন করিতে করিতে যেখানে অশ্বারোহী, রথ ও পদাতিকেরা অধিষ্ঠিত—সেখান পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল। তখন সেই সব লোকেরা ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পলাইতে লাগিল এবং কত লোক ভূতলে পতিত হইয়া একেবারে নিষ্পেষিত হইল। (১) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) Travernierএর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং আইন-ই-আক্‌বরীর হস্তী সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

পুস্তক-পরিচয়

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম-এ, বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য পরিষদের সদস্যের পক্ষে ১৲ টাকা; সাধারণের পক্ষে ১৷৹ টাকা। রয়াল অষ্টাংশিত আকার ২৬৫ হইতে ৫২৮ পৃষ্ঠা।

বোলপুরে রবীন্দ্র-সঙ্গমে গত ৭ই অগ্রহায়ণে-উপস্থিত জনমণ্ডলী।

এই খণ্ডে 'চন্দ্রমণ' শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পট' শব্দ পর্য্যন্ত আছে। ইহার প্রথম খণ্ড দেখিবার সুযোগ আমাদের এখনো হয় নাই। যেখানির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকারকে আমাদের অসামান্য আনন্দ ও পাঠকসাধারণকে বাংলা ভাষার প্রকৃত অভিধানের অভাব মোচনের শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাস্তবিকই বিদ্যানিধি ; তিনি বহুভাষাভিজ্ঞ ; এবং জ্যোতিষ, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন, জড়বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি বহুবিদ্যায় পারদর্শী। অতএব এক ব্যক্তির কোষসঙ্কলনের গুরুভার গ্রহণ করিতে হইলে তিনিই কোষসঙ্কলনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। বাংলা ভাষায় অনেক অভিধান আছে, কিন্তু বাংলা অভিধান নাই বলিলেই হয়। প্রথম বাংলা অভিধান প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন বোধ হয় কেরী ও হটন সাহেব—তাঁহাদের বাংলা-ইংরেজী অভিধান দুইখানি বহুকাল পূর্ব্বে রচিত হইলেও প্রায় পূর্ণাঙ্গ এবং চমৎকার ; তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (বি-ব্যানার্জি কোম্পানী) নিছক বাংলা শব্দের অভিধান। সুবোলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধান ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান, আশুতোষ দেবের প্রকৃতিবোধ অভিধান এবং বি-ব্যানার্জি কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নূতন সংস্করণের প্রকৃতিবাদ অভিধান সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অল্প স্বল্প বাংলা কথাও গ্রহণ করিয়াছে। একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাংলা কোষ গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল। যোগেশ বাবু সেই গুরুভার গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য, অন্বেষণ ও যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ দিয়াছেন। বহু শব্দের সংস্কৃত, ওড়িয়া, মারাঠী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার তুল্যরূপ দেওয়াতে শব্দের মূল ও ব্যুৎপত্তি ধরা সহজ হইয়াছে ; কিন্তু অধিকাংশ দেশজ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও মূলের ইতিহাস দিতেছেন ; সেগুলি বিচার করিয়া দেখিয়া পরিশিষ্টে সেগুলি সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় য়ুরোপীয় ও আরবী ফারসী বহু শব্দের বাংলা রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ; সেগুলিরও বিচার আবশ্যক। যোগেশ বাবু আরবী বা ফারসী শব্দের আদিমরূপ অধিকাংশ স্থলেই নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল মূল ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আদিম রূপ দেওয়া থাকিলে বুঝা যাইত বাংলায় শব্দবিকার কিরূপে এবং কতখানি পরিমাণে ঘটিয়াছে।

একজনের চেষ্টায় কোষ সঙ্কলন কখনো সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এজন্য গ্রন্থকার সূচনায় লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা শব্দকোষ চারি খণ্ডে প্রচার করা যাইতেছে। ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে, এবং সমালোচক মহাশয়ের অনুগ্রহে কোষপরিশিষ্টে দোষ-প্রতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে। শব্দসংগ্রহ, অর্থান্তর প্রকাশ, কিংবা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় একজনের পক্ষে দুরূহ। আশা আছে দশজনের ভার স্কন্ধে লইয়া কোষকার সমাপ্তিস্থানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা আনুকূল্য দানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।"

তাঁহার এই আহ্বানে সাহসী হইয়া এবং যোগ্যতর ব্যক্তিকে একার্য্যে উদ্বোধিত করিবার জন্য আমি কতকগুলি নূতন শব্দ, অর্থান্তর ও ব্যুৎপত্তি তাঁহার বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি। একেবারে

সমস্ত অক্ষর পর্য্যায়ের শব্দ যাচাই, বাছাই ও প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি ক্রমশ প্রতি মাসে মাসে এই কার্য্য করিব। এবারে মাত্র 'চন্দরস' শব্দ হইতে 'চ'-আদি শব্দগুলির মধ্যেই আমার চেষ্টা আবদ্ধ রাখিলাম।

চাঁদা—হিন্দি চন্দা—ফারসী চন্দ্। চন্দ্ অর্থ 'অল্প'; অনেকের নিকট অল্প অল্প করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই চাঁদা।

চিক্কণ—সরু, ক্ষীণ। সুন্দর; বিজয় বাবুর মতে তেলেগু চক্কনি শব্দজ।

চুমু—চুম্বন।

চ্যাটাং, চেট্যাং—চওড়া, কড়া বা কঠিন, বড়; যথা—কাল যে বড় শুনিয়েছিলে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

চাড়—তলায় বলপ্রয়োগ দ্বারা উপরে উৎক্ষেপ।

চুটকী—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর টিপে যতটুকু বস্তু ধরে।

চেক—চৌখুপী ডুরি-কাটা; যথা—চেক র‍্যাপার।

চপ্—মাংস ও আলু দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক।

চোপ—আঘাত, চোট; যথা—এক চোপে পাঁঠা কাটা।

চাঁচ, চাঁদ জো } —পাতলা গালার চাকতি।

চেপ্টালি খাওয়া—আসনপীড়ি হইয়া বসা।

চোঁচা—দ্রুত ও সোজা দৌড়।

চৌকস—চৌকা-সহি, square; যাহার চারিদিককার জ্ঞান আছে।

চুপটি—স্থির, অচঞ্চল, চুপচাপ।

চাপান—কবি বা তর্জ্জা গানে এক পক্ষের দ্বারা অপর পক্ষের প্রতি দুরূহ প্রশ্ন, বা সমস্যা মীমাংসার আহ্বান। যোগেশ বাবুর শব্দকোষে 'আক্রমণ' অর্থে এই ভাব অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে।

চেটালো—প্রস্থযুক্ত, চওড়া; বিস্তৃত অথচ অগভীর।

চুমুরী—নারিকেলের মোচ বা পুষ্পস্তবক।

চিতা, চিতী } —চিত্রিত; যথা চিতা বাঘ, চিতী কড়ি বা সাপ। ইহার মূল, সংস্কৃত 'চিত্রক', না ফারসী 'চীৎ' শব্দ হওয়া অধিক সম্ভব?

চানা—ছোলা, চনক।

চানাচুর—থেঁতো করিয়া ঝাল মাখিয়া ভাজা ছোলা।

চুড়িওয়ালা—যে চুড়ি বেচে।

চারা—মাছ ধরিবার টোপ করিবার জন্য সংগৃহীত কেঁচো।

চাঁচ দা, চাঁদ দা } —বকের ন্যায় বা অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্রাকার ধারালো দা, খেজুর গাছের রস বাহির করিবার জন্য গাছ চাঁছিতে ব্যবহার হয়।

চানকানো, চমকানো } —ঈষৎ ভাজা। যথা, পোলাওএর চাল ঘিয়ে চমকে লওয়া।

চুনট—শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে বস্ত্রভঙ্গ, উর্মিকা। কাপড় কোঁচানো অপেক্ষাকৃত সহজ।

চিংড়ি—মাছ।

চিংড়ি-পোড়া—পুড়িয়া চিংড়িমাছের মতো বক্রাকার প্রাপ্ত।

চমচম—খাদ্য মিষ্টান্ন বিশেষ, দুপাশ সুচালো, পেট মোটা।

চিতেন—গানের চড়া সুর, যাহা গাহিবার সময় গায়ককে চিতাইয়া পড়িতে হয়।

চাট—পশুর লাথি।

চালশে—চল্লিশ বৎসর বয়সের

চেলা—লম্বা বিছা।

চিজ—সামগ্রী, বস্তু।

চাহিদা—কোন জিনিসের প্রাপ্তির জন্য বহু লোকের আগ্রহ, টান, কাটতি, demand।

চক্‌রা কাণা—যে কাণা দিশা হারাইয়া চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া মরে।

চাইতে—চেয়ে, অপেক্ষা, তুলনার্থক; যথা—স্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো বলে সর্ব্বশাস্ত্রী (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

চষানি—চাষ করার মজুরী।

চাটিম—মর্ত্তমান কলা।

চাদর—উত্তরীয়, গাত্রবস্ত্র।

চাপচাপ—ঘন, ঘনীভূত। চাপ শব্দের অর্থান্তর ঘন।

চারখানা—চেক ডুরে; চৌখুপী ডুরে, বস্ত্রের টানা ও পড়েন উভয় দিকেই ডুরি টানিয়া চতুষ্ক-সমাকীর্ণ বস্ত্র। চারি খণ্ড। ব্যুৎপত্তি—ফারসী চার+খানা (ঘর)।

চৌখুপী, চৌখুপ্পী—চেক-কাটা ডুরে। চারিখোপ বিশিষ্ট।

চারকোণা—চারি কোণ বিশিষ্ট।

চারগুণো—চতুর্গুণ।

চারপেয়ে, চারঠেঙ্গে } —চতুষ্পদ। চার পা বা ঠ্যাং আছে যাহার।

চৌআড়ী—চারিটি আড়া অর্থাৎ চাল সংযুক্ত খড়ে-ছাওয়া ঘর।

চাল—চালা; খড়ো ঘরের ছাদ।

চাষামী—চাষার ন্যায় ব্যবহার। চাষা+মী (প্রকৃতি বোধক প্রত্যয়)।

চাষাটে—ঈষৎ চাষার ন্যায়। চাষা+টে (অল্পার্থক প্রত্যয়)।

চিয়ন কোটাল—spring tide.

চিক্কুর—বজ্র, বা বজ্রনাদ। শব্দকোষে চিকুর শব্দ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চারণ হয় চিক্কুর।

চিড়বিড়—অকস্মাৎ জ্বালা বোধ হওয়া, হঠাৎ অধিক ঝাল লাগা।

চুড়িদার—মুখের কাছে চুড়ির ন্যায় ফাঁদ কম হইয়া আসিয়াছে এমন জামার হাতা বা পাজামার পা। চুড়ি+দার (ফারসী দাস্তন্=রাখা, থাকা)।

চেটো—সোমথ, যুবতী, নবযৌবনা।

চেতানো—উদ্বোধিত করা, বুদ্ধি বা জ্ঞান দান করা, জাগ্রত করা। চিত্ত শব্দজ?

চোখানো—চোখা করা, ধার করা, তীক্ষ্ণ করা। চোখ ধাতু।

চোটানো—উপর্য্যুপরি চোট লাগানো বা আঘাত করা। চোট ধাতু।

চৌচাপটে ধরা—ছেঁকাবেঁকা করিয়া ধরা, ঘিরিয়া ধরা, যুগপৎ সকল দিকে আক্রমণ করা, চারিদিকে চাপিয়া ধরা।

চৌচাপটে পড়া—হঠাৎ দড়াম করিয়া লম্বা ও চিৎপাত হইয়া পড়া, চারিদিক চাপিয়া পড়া।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্দী—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ অংশিত ১৪৬ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ অত্যুত্তম। মূল্য আট আনা।

"ফ্রান্সের অমর লেখক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগো প্রণীত ফরাসী উপন্যাসের [Le Dernier Jour d'un Condamne] ইংরাজী অনুবাদ Sentenced to Death অবলম্বনে বন্দী রচিত হইয়াছে।"

ফাঁসির-হুকুম-প্রাপ্ত একজন কয়েদীর মনের বিচিত্র ভাবতরঙ্গ একের পিছনে আর একটি অতি নিপুণতার সহিত বহানো হইয়াছে; তাহাতে পাঠকের মনে দোলা লাগে যথেষ্ট, কিন্তু তাহার অবাধে ভাসিয়া চলিবার পক্ষে এতটুকু বাধা হয় না।

"রচনাটির বিশেষত্ব এই যে একটি অন্তরবাসী প্রাণীর করুণতম মর্ম্মকথা তাহারই মুখ দিয়া কবি মনোজ্ঞ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানবচিত্তের গূঢ়তম, গভীরতম প্রদেশে কবি অবাধে যাতায়াত করিয়াছেন। আবার শুধু তাঁহার নায়কের হৃদয়টিতেই নহে, চারিদিকের অবিরাম জনস্রোতের প্রতি-ক্ষুদ্রতম তরঙ্গাঘাতটি অবধি তাঁহার বিশাল চিত্ততটে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

"বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনা নূতন।" এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সৌরীন্দ্র বাবু বঙ্গসাহিত্যকে নূতন সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার জন্য সাহিত্যামোদী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অনুবাদ সুন্দর সরস ও সহজ হইয়াছে। সৌরীন্দ্র বাবুর মার্জ্জিত স্বচ্ছ লঘুগতি ভাষার পরিচ্ছদে বিদেশী শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ভাবমধুর রচনা আমাদের নিজস্ব সামগ্রী হইয়া গিয়াছে।

এই উপন্যাসে ঘটনাসংঘাত নাই, কিন্তু বিচিত্র ভাবসংঘাতে রচনা এত নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ যে পড়িতে একঘেয়ে লাগে না, ক্লান্তি আসে না। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেম, করুণা, মৈত্রী, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছায়াবাজীর ছবির মতো মনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যে ফাঁসীর আসামী তাহার জীবনের সুখ দুঃখ পুণ্য পাপ আজ সে অকপটে প্রকাশ করিতেছে। মৃত্যু অবধারিত আমরা সকলেই জানি, কেবল জানি না তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়টি; কিন্তু যে তাহাও জানিয়াছে তাহার মনের মধ্যে যে কী তোলাপাড়া হয় তাহা জানিতে যাহার কৌতূহল আছে তাহাকে এই বন্দী পড়িতে হইবে।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড প্রণীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল শাখা হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৫২ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ ভালো নয়। মূল্য এক টাকা, ছাত্রদের জন্য অর্দ্ধমূল্য।

চন্দ্রদ্বীপ বা আধুনিক বাখরগঞ্জ ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার কিয়দংশ বঙ্গের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজ্য। এই রাজ্যের উৎপত্তি-বিবরণ, আদি রাজা দনুজমর্দ্দন দেব হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ স্বাধীন ও পরে করদ রাজ্যের বিবরণ, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা, সামাজিক বিধান, বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্বকাহিনী, দুর্গ, গড়, কামান, ভাষা, লোক-সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ, মুদ্রা, সুপ্রসিদ্ধ বারভুঞার পরিচয় প্রভৃতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন গৌরব-কাহিনী আমাদের ভবিষ্যৎকে গৌরবান্বিত করিতে উদ্বুদ্ধ করে। যাঁহারা সেই উদ্যমে ইন্ধন স্বরূপ দেশের ইতিহাস উদ্ধার করেন তাঁহারা দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যপ্রেমিকের ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার বিষয়সংস্থান সুবিন্যস্ত, তথ্যসংগ্রহ বহুল ও বিচিত্র; এজন্য এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, এবং প্রাচীন বঙ্গের বিবিধ চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকে বলিয়া প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা। ইঁহাদের চরিত্র লইয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন সে বহুকালের কথা; তখন রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। তাঁহার কল্পনায় ঐতিহাসিক চিত্র বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা নিন্দা করেন; বক্ষ্যমাণ গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন "সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই।" প্রথম কথা "বৌঠাকুরাণীর হাট" রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ ছিলেন না, দ্বিতীয় কথা প্রবীণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঐ উপন্যাসকে তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না; তৃতীয় কথা উপন্যাসকে উপন্যাসের মানদণ্ডেই বিচার করা কর্ত্তব্য ইতিহাসের মানদণ্ডে নহে।

মুদ্রারাক্ষস।

আলোচনা

রঙের লুকোচুরি

আশ্বিনের প্রবাসীতে কার্ত্তিক বাবুর 'রঙের লুকোচুরি' নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে। রঙের লুকোচুরি দেখাইতে গিয়া তিনি কীট (Insecta) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমি কেবল সেই বিষয়েই দুই একটী কথা বলিব। প্রবন্ধে "পাতাপোকার কীড়ার" যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত পাতাপোকার (Phyllium scythe—Family, Phasmidae—Natural order, Orthoptera) কোন সম্বন্ধ নাই। প্রজাপতির (Natural order,—Lepidoptera) ন্যায় পাতাপোকার কীড়া অবস্থা (Caterpillar stage) নাই; ইহাদেরও ডিম হইতে যে ছানা (nymph) বাহির হয় তাহা অবিকল পাতা-পোকার ন্যায়, কেবল আকার ক্ষুদ্র ও ডানা থাকে না। যে কীড়াটীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে উহা এক প্রকার প্রজাপতির (Hawk moth—Family, Sphingidae—N. O. Lepidoptera) কীড়া। "গোলাপ গাছের কাঠি পোকার কীড়ার" চিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই প্রকার ভুল হইয়াছে। পাতাপোকার ন্যায় "কাঠি পোকারও" (Stick insect —Family, Phasmidae—N. O. Orthoptera) কীড়া অবস্থা (Caterpillar Stage) নাই। চিত্রে যাহাকে "কাঠি পোকার কীড়া" বলা হইয়াছে উহা প্রকৃত পক্ষে একজাতীয় প্রজাপতির কীড়া (Stick caterpillar—Family, Geometridae—N. O. Lepidoptera)। কার্ত্তিক বাবু একস্থানে পাতাপোকার বিষয় লিখিয়াছেন, "পুং পতঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রী পতঙ্গের আকার অধিক পত্রসদৃশ, কারণ স্ত্রীকীটকে ডিম প্রসব ও সন্তান পালনের জন্য অনেক দিন এক স্থানে নিশ্চল হইয়া থাকিতে হয়"—স্ত্রী পাতাপোকা কখন সন্তান পালন করে না, উহারা মাটির উপর কঠিন-আবরণ-যুক্ত ডিম পাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সাধারণতঃ বোলতা, পিপীলিকা ও মৌমাছি জাতীয় কীট (N. O. Hymenoptera) ব্যতীত অন্য কোন কীটই সন্তান পালন করে না এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে স্ত্রীকীটের (Queen) পরিবর্ত্তে কার্য্যকারী কীটগণই (Workers) সন্তান পালনের ভার গ্রহণ করে। উক্ত জাতীয় কীট ব্যতীত কেবলমাত্র কানকোটারী নামক কীটকেই (Earwigs—Family, Forficulidae —N. O. Orthoptera) মুরগীর ন্যায় সন্তান পালন করিতে দেখা গিয়াছে। "প্রজাপতির কীড়া সাপের মাথার অনুকরণ করিয়া আত্মগোপন করিতেছে" বলিয়া যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে উহা আদৌ কীড়া (caterpillar) নহে। কীড়া বলিলেই আমরা Larva বুঝি। চিত্রটী কোন প্রজাপতির পুত্তলি (chrysalis); কীড়া

(Larva) যখন পুত্তলিতে (Pupa) পরিবর্ত্তিত হয় (Transformed) তখন আর উহাকে কীড়া বলা যায় না। হক্ মথ্ (Hawk Moth —family, Sphingidae—N. O. Lepidoptera) নামক প্রজাপতির কীড়া সাপের মাথার আকার ধারণ করিয়া শত্রুকে ভয় দেখায় বটে কিন্তু সাপের মাথার ন্যায় পুত্তলি (Pupa) বড় একটা দেখা যায় না। প্রবন্ধের একস্থানে আছে "এই জাতীয় প্রজাপতির তলদেশ.........উপযোগী"—প্রজাপতির ডানা বা পাখা আছে বলিয়াই জানি, পালকওয়ালা প্রজাপতি কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। "মাকড়শা, গন্ধপোকা, গুবরে পোকা প্রভৃতি কীটের রূপ অনুকরণ করিয়াছে" বলিয়া যে চিত্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে উহার একটীও গন্ধপোকা (Bug) নহে এবং যে কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ (Beetle) দু'টী চিত্রে দেখান হইয়াছে উহারাও গুবরে পোকা নহে। বামপার্শ্বের চিত্র দু'টী মাকড়শা ও দক্ষিণ পার্শ্বের চিত্র দু'টী কাঁঠালে পোকা (Ladybird Beetle—family, Coccinellidae—N. O. Coleoptera), ইহাদের সহিত গোবরের কোনও সম্বন্ধ নাই,—ইহারা Coccinellinae ও Epilachninae নামক দুই শাখায় বিভক্ত, প্রথমটী কীট ও দ্বিতীয়টী পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। ক্যালাইমা ইনাকিস্ (Kallima inachis) নামক প্রজাপতির (ইংরাজীতে ইহাকে Oak Leaf Butterfly বলে) বর্ণনা করিতে লেখক বলিয়াছেন, "উভয় পাখার সূক্ষ্মাংশ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সে স্থানের মধ্যদেশ হইতে একটী শিরা বক্রাকারে এমন ভাবে বাহির হইয়াছে যে.........দৃষ্ট হয়"—লেখক মহাশয় যাহাকে শিরা (Veins) বলিয়াছেন উহা প্রকৃত পক্ষে শিরা নহে এবং ওরূপ স্থানে শিরা হইতেও পারে না—উহা একটী রেখা মাত্র। কার্ত্তিক বাবু লিখিয়াছেন এই প্রজাপতির পাখার উপর "ব্যাঙের ছাতার ন্যায়" এক প্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়,—ব্যাঙের ছাতা যদিও এক প্রকার Fungus তথাপি 'ব্যাঙের ছাতা' বলিলে লোকে mushroomই (Agaricus—a particular kind of fungus) বুঝে; এখানে "ছাতাধরার ন্যায়" কথাটা ব্যবহার করিলেই ঠিক হইত।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিতে হইলে প্রাণীতত্ত্ব (Zoology), উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা বিদেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক বা প্রবন্ধের অনুবাদ করিতে গেলে এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কৃষি কলেজ, সাবোর। } শ্রীকিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত।
১০ই আশ্বিন, ১৩২০

উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ।

গত আশ্বিন মাসে আমরা "উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রয়োজনীয় ২।১টির উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা সাধারণ ভাবে ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে মাসিক পত্রিকায় কোনও কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপিবার প্রধান উদ্দেশ্য কৌতূহল উদ্দীপন এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের বিবৃতি। প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে মাসিক পত্রের প্রবন্ধে সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

বিপিন বাবু জানিতে চাহিয়াছেন যে (১) উদ্ভিদে যে স্নায়ু আছে, তাহার প্রমাণ কি? (২) অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারে নূতনত্ব কি? আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধের পাদটীকায় অধ্যাপক বসুর যে-সকল পুস্তকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই এই-সকল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

বিপিন বাবু লিখিয়াছেন:—"ডাক্তার বসু—তাঁহার পরীক্ষা সমূহের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে লজ্জাবতীর শরীরের এক স্থানে কোন উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে উহা পরিচালিত হইয়া অন্যত্র যায়, কিন্তু কি উপায়ে পরিচালিত হয় তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। প্রমাণ করা গেল—উদ্ভিদ-দেহের একস্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে উহা অন্যত্র প্রবাহিত হয়, প্রাণীদেহেরও একস্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে উহা অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়, এই উত্তেজনা প্রাণীদেহে স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা প্রবাহিত হয়, সুতরাং উদ্ভিদদেহও স্নায়ুজালে আচ্ছাদিত, এরূপ সিদ্ধান্ত কষ্টকল্পনা নহে কি? মনে করুন দুইজন লোক কলিকাতা হইতে কাশী রওনা হইল, তাহার মধ্যে একজন রেলপথ অবলম্বন করিল, অপর ব্যক্তি নৌকারোহণে গঙ্গাপ্রবাহ অবলম্বন করিল এবং পরিশেষে ক্রমশঃ উভয়েই কাশীতে উপনীত হওয়ায় বলিতে পারি কি উভয়েই একই উপায়ে কলিকাতা হইতে কাশী আগমন করিয়াছে? প্রাণীদেহে যে উপায়ে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, উদ্ভিদ-দেহেও ঠিক সেই উপায়ে অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা প্রবাহিত হয়, ইহার স্বতন্ত্র পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আবশ্যক। ডাক্তার বসু দেখাইয়াছেন উদ্ভিদ-দেহে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোন পথে প্রবাহিত হয় তাহা দেখান নাই। একটি ক্রিয়া চলিতেছে প্রমাণ করা এক কথা, আর অমুক উপায়ে উক্ত ক্রিয়া চলিতেছে আর এক কথা। গ্রীন্ সাহেব (J. Reynolds Green) লিখিত উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে (Manual of Botany) দেখিতে পাই উদ্ভিদের শরীরের মধ্যস্থিত (protoplasm) প্রোটোপ্লাজম্ কোষে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে, এই কারণে যাবতীয় কোষের প্রোটোপ্লাজম্ সংযুক্ত থাকে, এই-সকল যুক্ত প্রোটোপ্লাজম্-সূত্র দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

উত্তেজনা সান্নিধ্যনিবন্ধন নিকটস্থ স্থানে পৌঁছিতে পারে। যেমন মাংসপেশীর এক অংশে আঘাত করিলে নিকটস্থ অন্য অংশ সঙ্কুচিত হয়। বিপিন বাবু গ্রীন্ সাহেবের উল্লিখিত যে-সব উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই প্রকারের।

স্নায়ুর বিশেষ প্রকৃতি এই যে উহা দ্বারা উত্তেজনা (১) বিশেষ পথে (২) দূরে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে প্রেরিত হয়। আর (৩) স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে যাহা দ্বারা তাহা অন্যরূপ প্রবাহ হইতে পৃথক।

(১) উদ্ভিদে স্নায়ুসূত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রমাণ অধ্যাপক বসুর Comparative Electro-physiology পুস্তকের On Isolated Vegetal Nerve অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

(২) লজ্জাবতী লতার আঘাতজনিত উত্তেজনা বহুদূরে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে ইহা স্নায়বীয় প্রবাহ। এ সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডে হয় নাই, জর্ম্মানীতে হইয়াছে। গ্রীন্‌সাহেব এ সম্বন্ধে সঙ্কলনকারী পুস্তক-প্রণেতামাত্র, আবিষ্কারক নহেন। Vegetable Physiology সম্বন্ধে যে-সব মৌলিক ও প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, তাহা জার্ম্মান পুস্তকের অনুবাদ মাত্র;—যেমন Pfeffer's *Physiology of Plants* (1907) অথবা Josts' *Plant Physiology* (1907)। লজ্জাবতী লতার স্নায়বীয় প্রবাহ আছে কিনা এ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত পুস্তকে ৩য় ভল্যুমের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

"Pfeffer showed that the stimulus was able to travel

over chloroformed parts of the stem. We are therefore fully justified in ascribing the transmission of stimulus to the movements of water."

According to Haberlandt, we have in *Mimosa* "a genuine instance of transmission of stimulus and not of excitation."

Jost তাঁহার পুস্তকের ৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"One must not compare the transmission of stimuli in the animal nerve with transmission in *Mimosa*, seeing that in the former conduction is effected by living protoplasm which is not the case with the latter. As a matter of fact the stimulus in *Mimosa* may travel by way of tissues which have been killed by narcotics. *Hence the conception of a transmission by living cells and especially by intercellular protoplasmic strands is excluded from consideration.*"

প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা যে প্রাণীর স্নায়বীয় উত্তেজনার ন্যায় দূরে প্রবাহিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অধ্যাপক বসুর রয়্যাল সোসাইটির Philosophical Transactions Series B, Vol. 204এ প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহা দেখিতে পাইবেন।

বৈজ্ঞানিক-উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ অবগত আছেন যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু রয়্যাল সোসাইটি প্রকাশ করেন না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রয়াল সোসাইটির সভ্যগণের নিকট প্রুফ প্রেরিত হয়। যদি নূতনত্ব কিম্বা সম্পূর্ণ প্রমাণের কোন অভাব থাকে, তাহা হইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। রয়্যাল সোসাইটির Proceedings সম্বন্ধেই এই কথা। Transactionsএ কিছু প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আরও কঠিন বিচার করা হয়। সুতরাং রয়্যাল সোসাইটির Transactionsএ প্রকাশিত অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধের শেষ অংশে যে চুম্বক দেওয়া হইয়াছে, তাহা উক্ত সভা সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রমাণিত বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। সেই চুম্বকের কয়েকটি প্যারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

The various characteristic polar effects of electric current in excitation and the arrest of excitatory impulse by various physiological blocks afford crucial tests of the physiological character of the transmitted effect.

The physiological character of the excitation of the plant by constant current is further demonstrated by the respective reactions of Anode and Kathode which are antithetic. The excitability of animal nerve to the stimulus of constant current is enhanced by cooling and depressed by warming. Precisely similar effect is shown to take place in the conducting tissue of *Mimosa.*

The excitatory impulse may be arrested by electrotonic block. This arrest persists during the continuation of the blocking current, the conductivity being restored on its cessation.

The conductivity of a selected portion of a petiole is abolished by the local application of poison.

These results prove conclusively that the transmission of excitation in the plant is a process fundamentally similar to that which takes place in the animal.

এই বিষয়ে সপক্ষে বিপক্ষে পূর্ব্বে অনেক অনুমান ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক বসু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা অবিসংবাদিত রূপে উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকেই এই তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাসে ঐন্দ্রজালিক ঘোটকে চড়িয়া বা গালিচার উপর বসিয়া আকাশপথে সঞ্চরণের কথা আছে। তাহাতে ব্যোমযান, আকাশতরী (airship), ইত্যাদির নূতনত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কল্পনা ও অনুমান, এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত তথ্যের পার্থক্য বুঝিবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিলে অনেক সন্দেহ মনের মধ্যে আসিতে পারে না।

সম্পাদক।

প্রকৃতিতে বর্ণ বৈচিত্র্য।

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য' নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখকের কএকটি প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব দিতে চেষ্টা করিব।

লেখক কএকটি বৈজ্ঞানিক মতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি করে, ইহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবে কে? কাহার নিকট হইতে আমরা ইহার যথাযথ উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি? বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না।" তিনি ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বিজ্ঞান নিজের বিচার নিজেই করে ও সকল সমস্যার উত্তর দিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞান সকলের নিকট হইতে ও সকলের চেষ্টা হইতে পুষ্টিলাভ করে। বিজ্ঞান 'আপ্ত'বাক্য নহে। ইহা বিশেষ যুগে, বিশেষ ঋষি দ্বারা লোকসমাজে প্রকাশ পায় না। সকলেই ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞানের পুষ্টি করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক সকল মতই অভ্রান্ত নহে। ভুল প্রকাশ পাইলেই তাহা স্বীকার করিয়া লয়। বিজ্ঞান কোথাও এমন কথা বলে নাই ইহাই চূড়ান্ত মীমাংসা, ইহা ভিন্ন আর সকলই ভুল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক মত সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বর্ণবৈচিত্র্যকে একমাত্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের সহায়রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহাদের মত, বর্ণ-বৈচিত্র্য জীবজগতে অনেক স্থলে সহায় রূপে কার্য্য করিয়াছে। জীবের বংশরক্ষা ইত্যাদ করিবার জন্যই যে কেবল প্রকৃতিতে বর্ণ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ডারউইন কোথাও তাহা বলেন নাই। তাঁহার মতে কোন কারণে জীবজগতে (ও উদ্ভিদ্‌জগতে) মধ্যে মধ্যে হঠাৎ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। অনেক স্থলে সেই-সকল পরিবর্ত্তন জীবের উপকারে লাগে, সুতরাং তাহারা রহিয়া যায়, অর্থাৎ বংশগত হয়। আর যে পরিবর্ত্তনগুলি জীবনসংগ্রামের অন্তরায় হয়, হয় ক্রমে তাহারা লোপ পায়, নয় সে জাতিকে লোপ করে। যেমন জিরাফ্ লম্বগ্রীব হইয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে পরিবর্ত্তন টিকিয়া গেল আবার কত জাতি প্রতিকূল পরিবর্ত্তনের ফলে একেবারে লোপ পাইয়াছে, জীব-অভিব্যক্তির ইতিহাসে তাহাদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

আর যদি কোন পরিবর্ত্তনের ফলে জীবের কোন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তনের সাহায্য না লইয়াও বাঁচিয়া থাকে। মানব আপন উপকারের জন্য কত জীবকে কতরূপেই পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র জীবের সহায় হয় না।

মনে করুন কোন কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীর কোন কারণে কতকগুলি কৃষ্ণ-

বর্ণ শাবকের সহিত দুই একটি শাদা ছানা ও দুইএকটি লোহিত ছানা হইল। যদি শাদা ছানাগুলি বরফের মধ্যে বা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া কৃষ্ণকায় ছানা অপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় পড়ে, তাহা হইলে ক্রমে সেই সাদা ছানার বংশ এই আকস্মিক পরিবর্তনের সাহায্য পাইয়া অবস্থার উন্নতি করিবে। অপরদিকে যদি লাল জীবগুলি শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই হউক বা অন্য কারণে এই পরিবর্তনে প্রতিকূল ফল লাভ করে, তাহা হইলে হয় সে লোহিত বর্ণ ক্রমে লোপ পাইবে অথবা তাহাদের বংশই লোপ পাইবে। কিন্তু মনে করুন লোহিত বর্ণ শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, বা সেখানে কোন শত্রুর সম্ভব নাই। সেখানে লোহিত জীব সম্পূর্ণ জীবন ধারণ করিতে লাগিল, চারিদিকে বরফই থাকুক বা মরুভূমিই থাকুক। মেরু প্রদেশে বর্ণ-বৈচিত্র্যের উদ্ভব এইরূপেও হইতে পারে। বর্ণ-বৈচিত্র্য আগে হয়, লাভালাভ পরে দেখা যায়।

আর সর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য যে জীবের সহায়তার জন্য হয় নাই, তাহার একটি উদাহরণ জীবদেহের উষ্ণরক্তের বর্ণ। এরূপ সুন্দর বর্ণ প্রকৃতিতে অল্পই দেখা যায়। কিন্তু ইহার বর্ণ জীবের কি সহায়তা করে বুঝা যায় না। এইরূপে কত বর্ণের কত অজ্ঞাত কারণে প্রথমে আবির্ভাব হয়, পরে কোথাও জীবের কাজে লাগে, কোথাও বা বিফলে যায়।

"সূর্য্যকিরণই প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ ইহা মানিয়া লইয়াও আমাদের নিষ্কৃতি পাইবার জো নাই।" কেন বুঝিতে পারিলাম না। সকল পদার্থই সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা-অভ্যন্তরে কোন বর্ণে রঞ্জিত না দেখাইলেও সূর্য্য-আলোকে আনিলেই কোন-না-কোন রংএর দেখাইবেই। যদি সূর্য্য-কিরণের সকল রশ্মিগুলি সে পদার্থ গ্রহণ করে, তবে তাহা গাঢ় কাল বর্ণের দেখাইবেই। আর দুই চারিটি রশ্মি 'ফিরাইয়া দিলে' সেই বর্ণের দেখাইবে, আলো না লাগিলে কোন বর্ণ দেখা যাইবে না, সুতরাং সূর্য্য-কিরণই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়াই বোধ হয়।

লেখক লিখিয়াছেন "বিশেষ বিশেষ ঋতুতে পুষ্পমধ্যে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের আধিক্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।......যেমন আমাদের দেশে বর্ষায় ও শরতে, বনে ও বাগানে শাদা ফুলেরই বাহার বেশী।"

দেখা যায় যে অন্ধকারে যে-সকল ফুল ফুটে প্রায় তাহারা শাদা হয় অথবা উগ্র-গন্ধবিশিষ্ট হয়। কারণ অন্ধকারে কীট পতঙ্গ শাদা বর্ণ দেখিতে পায়, অথবা উগ্রগন্ধে তাহাদের খুঁজিয়া পায়। সকলেই জানেন কুসুমের বর্ণ ও গন্ধ কীটকে মুগ্ধ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। দিনের পুষ্পের বর্ণ প্রায় নানাবর্ণের হয় আর নিশীথ-কুসুম প্রায় শুক্ল বর্ণের। লেখক উদাহরণ স্বরূপ জুঁই, মালতী মল্লিকা, টগর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, শিউলি, প্রভৃতি ফুলের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা অধিকাংশ নিশীথ-পুষ্প, সেই জন্য শুভ্র। আর বর্ষাকালে আকাশ মেঘে আবৃত থাকে বলিয়া দিনেও অন্ধকার থাকে। সুতরাং শাদা ফুলের আধিক্য। বসন্তে দিবা-পুষ্পের আধিক্য হেতু এত বর্ণের বিচিত্রতা দেখা যায়। বসন্তে তাই স্থাবর জঙ্গমের মহোৎসব।

প্রকৃতিতে অধিকাংশ পুষ্প নীল বা বেগুনি রঙের, হলদে নহে। একটু ভাল করিয়া দেখিলেই এ সত্য উপলব্ধি হইবে।

ফুলের বর্ণ সম্পর্কে আর একটু বলিবার আছে। লেখক লিখিয়াছেন 'এক এক জাতীয় ফুলকে কোন দুই একটি বিশেষ বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ ফুলের বর্ণ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, একটি অম্লাত্মক আর একটি ক্ষারাত্মক। অম্ল শ্রেণীর ফুল হরিদ্রা-প্রধান ও ক্ষার শ্রেণীর ফুল নীল-প্রধান। লোহিত দুই শ্রেণীতেই বিদ্যমান। সেইজন্য হরিদ্রা-শ্রেণীতে নীলের ও নীল-শ্রেণীতে হরিদ্রার কচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গোলাপ, হরিদ্রা বা অম্ল শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই হরিদ্রা গোলাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু নীল কদাচ নহে। দোপাটি নীল শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই হরিদ্রা বর্ণের হয় না। মানব কিন্তু অঘটন সংঘটন করিতেছে। প্রকৃতিতে না পাওয়া যাইলেও মানব সকল বর্ণের সৃষ্টি করিতেছে। 'চন্দ্রমল্লিকা' এখন সকল বর্ণের পাওয়া যায়। সেদিন কোথায় পড়িলাম 'নীল গোলাপ' জন্মিয়াছে।

প্রাণীজগতে লেখক লিখিয়াছেন যে "মাংসাশী জানোয়ারদের অধিকাংশেরই গায়ে ডোরা ডোরা দাগ অথবা গোল গোল চক্র আঁকা।" এ বিষয়ে আমি বিশেষ আলোচনা করি নাই। তবে সিংহশিশুর গায়ের দাগ ডারউইন বলেন, ব্যাঘ্র জাতীয় কোন জন্তু হইতে সিংহ উদ্ভূত বলিয়া। অবশ্য উভয়ই মাংসাশী। কিন্তু "তৃণভোজী জন্তুদের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত" কেন বুঝিতে পারিলাম না। ডারউইন দেখাইয়াছেন অশ্ব, গর্দভ প্রভৃতি আদতে ঐ ডোরাকাটা জন্তু হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। পাখীদের মধ্যে বোধ হয় ইহা সত্য। কিন্তু মৎস্যের বেলাও কি ডোরাকাটা মৎস্যই মাংসাশী, আর রোহিতাদি নিরামিষাশী?—বোধ হয় না। লেখকের মতে "পশুদের সমস্ত শরীর ভিন্ন ভিন্ন লোমে আবৃত হইলেও মেরুদণ্ডের উপরিভাগ সাধারণতঃ ঈষৎ শুভ্র হইতে দেখা যায়। মৎস্যের বেলায় কিন্তু ইহার বিপরীত"—তাহা ত দেখিতে পাই না, মৎস্যের পক্ষেও ঐ নিয়ম খাটে।

লেখকের মতে গৃহপালিত জন্তু এত চিত্রবিচিত্র হইবার কারণ চিত্র-বিচিত্র জন্তুর সংযোগে সন্তান উৎপাদন। আমি যতদূর দেখিয়াছি ইহার বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। কোন বিশেষ 'চিত্রের' জন্তুকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অন্য কোনও 'চিত্রের' সহিত সংযোগ করিতে না দিয়াই বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়। বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায় ইহাই। কারণ বিশেষ চিত্রিত লক্কা পায়রা অন্য বিশেষ চিত্রিত মুখ্‌খি পায়রার সহিত সংযোগ করিলে আদি সনাতন গোলা পায়রাই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে লেখক এক স্থানে 'গাংশালিকে'র উল্লেখ করিয়াছেন। গাংশালিক শাদা নহে। লেখক বোধ হয় Sea-gullকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। রবি বাবুর 'সিন্ধু-শকুন' মন্দ নহে ত।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

ইজ্জতের জন্য

"ইজ্জৎ কী ভেদ্ মুলুক্ কা খিদ্‌মৎ মে হ্যায় ছিপা।"—হালি।

অপমানের মৌন দাহে চিত্ত দহে তুষানলে;
জাতীয় এই প্রায়শ্চিত্ত না জানি কোন্ পাপের ফলে!
ক্ষুব্ধ সাগর আন্‌ল খবর হাল্ আইনে আফ্রিকাতে
রঙের দায়ে ভারতপ্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে!
ফুটপাথে তার উঠতে মানা, জরিমানা উঠলে ভুলে,
নাই অধিকার কিছুতে তার কেনা বেচার লাভে...মূলে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যায়বিরোধী বীর ভারতনারী যাঁহারা প্রথমেই ২১শে অক্টোবর তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

মাথার উপর মাথট আছে আঘাত দিতে অসম্মানে,
'জিজিয়া' কর দিচ্ছে আজি হিন্দু এবং মুসলমানে !

* * *

কাজের বেলা ছিল কাজী অল্পে-খুসী ভারতবাসী,
অল্পে-খুসী বলেই আবার সবাই তাড়া দিচ্ছে আসি' !
"মজুর ভাল অল্পে তুষ্ট" ভাব্‌ছে ওরা সুনিশ্চয়,
"খনির কাজে আখের চাষে ইষ্ট তাহে প্রচুর হয়।
কিন্তু যখন সেই কুলি হয় প্রতিযোগী দোকানদার
অল্পলাভে ব্যবসা জমায়,...তখন তোমার টে কা ভার।"
মুদী মাকাল উঠল ক্ষেপে ; অম্‌নি হল রাতারাতি
স্বার্থে-গোঁয়ার গোরা-বোয়ার বর্ণ ভেদের পক্ষপাতী !

* * *

অম্‌নি গেল সুরু হ'য়ে নূতন নূতন আইন জারি
"ভারতবাসী কৃষ্ণ অতি," "ভারতবাসী দুষ্ট ভারি,"
"অসাব্যস্ত বিবাহ তার, পত্নী তাহার পত্নী নয়,
কারণ বহুনারীর ভর্ত্তা দুশ্চরিত্র সুনিশ্চয়।
খনির তলে খাটুক কুলি, অবসরে চিবাক্ চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আন্‌তে মানা।"
এম্‌নি ধারা ফন্দি ফিকির নিত্য তারা বার করেগো,
বোয়ার মুদী মনু এবং মহম্মদের ভুল ধরে গো।
ভারত এবং হাব্‌সী মুলুক এক রাজারই অধীন জানে,
তবুও ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি' সাম্রাজ্যে সে তুচ্ছ মানে !

অথচ এই ভারতবাসী সব সঁপে সাম্রাজ্যটাকে,—
আফ্রিকায় সে ফসল ফলায়, হংকংএ সে শান্তি রাখে ;
অর্থে তাহার রক্তে তাহার ব্রিটিশ-প্রতাপ বর্দ্ধমান,
তিব্বতে সে দৌত্য করে, শ্রেষ্ঠ কবি তাহার দান।
সিংহলে যে সভ্য করে, আরব-কূলে সুখত্রায়,
ব্রহ্মে, শ্যামে যবদ্বীপে উপনিবেশ যাদের, হায়,
তাদের ছেলে স্কুল পেলে না কূল পেলে না আজ কোথাও,
গর্‌-বনেদি বন্য বোয়ার ভিন্ন তাদের সভ্যতাও।

* * *

এক রাজারই আমরা প্রজা বোয়ার এবং ভারতবাসী,
মোদের বেলা কান্না শুধু তাদের বেলা শুধুই হাসি।
রাজা শুধু বিরাজ করেন, রাজ্য করে কিঙ্করে,
দশের উচিৎ শুধ্‌রে দেওয়া ভৃত্য যদি ভুল করে,—
রাজার ভৃত্য ভুল করেছে, আমরা সে ভুল কাটুতে চাই,
বোয়ার-বিধির বর্ব্বরতা আমরা ঈষৎ ছাঁটতে চাই।
দশের মুখে ধর্ম্ম যেমন আইন্ তেম্‌নি দশের মতে,
কেমন করে টিঁকবে মানুষ বে-আইনীতে বে-ইজ্জতে ?
তাই প্রবাসী ভারতবাসী বেঁধেছে বুক আজকে সবে,
পণ করেছে বে-আইনী এই আইনটাকে ভাঙ্‌তে হবে।

* * *

দলে দলে ফিরছে তারা সইছে শত লাঞ্ছনা,
ভগবানের রাজ্যে তারা গণ্ডী কোথাও মান্‌ছে না।

ধর্ম্ম-আচার করছে তারা যাচ্ছে জেলে সস্ত্রীকই,
বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ রুখ্‌বে তাদের অস্ত্রে কি ?
নেতা তাদের তরুর মত স্তব্ধ, দৃঢ়, দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধরেন, বিজয় তাঁহার সুনিশ্চিত !
লড়ছে এদের ইষ্টবুদ্ধি যুঝ্‌ছে এদের মনের বল,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে এদের মশাল সমুজ্জ্বল।

শ্রীমতী শেখ- মহতাব-পত্নী, দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যায়বিরোধী বীর ভারতনারীদিগের মধ্যে কারাবরুদ্ধা সর্ব্ব প্রথম বীর মুসলমান মহিলা।

ইজ্জতে আজ হাত পড়েছে ঠেকেছে দেশ দশের দায়ে,
পরবাসে দেশের মানুষ তোমার আনুকূল্য চাহে ;
পেটের জন্যে চায়না তারা, 'হক্' সীমানার ভাঙ্‌ছে তট
তোমার আমার রাখ্‌তে ভরম্ করেছে তাই ধরম্-ঘট ;
স্বজাতির হক্ রাখ্‌তে বজায় সইছে তারা নির্য্যাতন,
চাবুক্ খেয়ে মরছে প্রাণে বুক্-ফাটা এই আবেদন !
ইজ্জতে হাত পড়ল জাতির 'জোৎ' বেচে সে রাখ্‌তে হবে—
সাহায্য দাও সাহায্য দাও সাহায্য আজ দাও গো সবে !

দাও সাহায্য দেশের পুরুষ ! পৌরুষের আজ জন্মতিথি
দশের সঙ্গে যোগ যে তোমার মনে তাহা জাগুক নিতি।
দাও গো কিছু ভারতনারী ! ভারতনারীর অমর্য্যাদায়
নিজের অমর্য্যাদা তোমার ; ঘুচাও নারী ! নারীর এ দায় !
দাও জমীদার ! দাও অফিসার ! লাট সাহেবের হুকুম আছে ;
দাও কিছু দাও স্কুলের বালক ! কিছুও যদি থাকে কাছে।
দাও গো আমীর ! দাও গো ফকীর ! মুক্ত তোমার রিক্ত হাতে,
দাও মহাজন ! দাও দোকানী ! দাও কিছু ইজ্জতের খাতে!

* * *

নির্ব্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে
স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবাসী আজ সাগর-পারে,
কেউ বা করে দিন-মজুরী, কেউ বা ক্ষুদ্র দোকানদার,
তাদের শ্রমে শ্যামল আজি মরুস্থলী আফ্রিকার।
রবার গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের হয় জনতা,
বো-বাব্ গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের কথকতা।
মৃদং বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে, মন্দিরা,
ভারত-স্বপন জাগায় সেথা পরবাসের বন্দীরা।

* * *

আজ্‌কে তাদের বন্ধ সারং মাদল মৃদং মৌন হায় !
সবাই যদি মন কর তো আবার তারা সাহস পায়,
সবাই যদি মন কর তো চেষ্টা তাদের হয় সফল,
দেশের সুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলি-বেনের দল।
অপমানের ঐক্যে আজি এক হয়েছে ভারত-প্রজা
হিন্দু-মুসলমানের মিলন্ অসম্মানে হচ্ছে সোজা।
সুরু হ'ল নূতন নাট্য সূত্রধরের নূতন নাট,
সাগর-পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী-পাঠ।
ইজ্জতেরি দায় আজিকে, ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্রবীণা
উঠ্‌ছে কেঁপে, সহায় হওগো যুঝ্‌ছে তারা অস্ত্র বিনা।

* * *

সহায় হও গো সাহায্য দাও, স্মরণ কর কে খ্রীষ্টান—
সংগোপনে যত্নে মোদের দিয়েছে সর্ব্বস্ব দান ;
হিন্দু তুমি হার মানিবে ? হার মানিবে মুসলমান ?
কর্ণ-শিবি রাজার জাতি !…হাতেম্ তাইয়ের হে খান্দান !
হওগো সহায় তোমরা সবাই বিভেদ বুদ্ধি উচ্ছেদে,
ধর্ম্ম তোমার পক্ষে আছেন দাঁড়াও বন্ধু বুক বেঁধে ;
সহায় হওগো সাহায্য দাও নষ্ট হউক্ সব ঘৃণা
বিশ্বে আসুক্ নূতন ঐক্য তোমার দানের দক্ষিণা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সায়ংসন্ধ্যা।

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতিক্রমে।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২০

৪র্থ সংখ্যা

মূর্ত্তি

(৩)

ভাব ও ভঙ্গি।

ভারতীয় মূর্ত্তিগুলিতে সচরাচর চারিপ্রকারের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দৃষ্ট হয়, যথা—সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ।

১ নং চিত্র, সমভঙ্গ বা সমপাদ।

এইরূপ মূর্ত্তিতে মানসূত্র দেহকে বাম ও দক্ষিণ সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তির শিরোদেশ হইতে নাভি, নাভি হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত সরল ভাবে লম্বিত হয় অর্থাৎ মূর্ত্তিটি দুই পায়ের উপরে সোজা ভাবে, দেহ ও মস্তক বামে বা দক্ষিণে কিঞ্চিৎ মাত্র না হেলাইয়া, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহে। বুদ্ধ সূর্য্য এবং বিষ্ণুমূর্ত্তির অধিকাংশ সমভঙ্গঠামে সমপাদ-সূত্রনিপাতে গঠিত হয়। সমভঙ্গ মূর্ত্তিতে দেহের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বের ভঙ্গি বা ভঙ্গ সমান রহে, কেবল হস্তের মুদ্রা পৃথক হয়।

২ নং চিত্র, আভঙ্গ।

এইরূপ মূর্ত্তিতে মানসূত্র ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নাসার ও নাভির বাম কিম্বা দক্ষিণ পার্শ্ব বহিয়া বাম কিম্বা দক্ষিণ পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্ত্তির ঊর্দ্ধদেহ মূর্ত্তি-রচয়িতার বামে, মূর্ত্তির নিজের দক্ষিণে, কিম্বা মূর্ত্তি-রচয়িতার দক্ষিণে, মূর্ত্তির নিজের বামে হেলিয়া রহে। বোধিসত্ত্ব ও অধিকাংশ সাধুপুরুষগণের মূর্ত্তি আভঙ্গঠামে গঠিত হইয়া থাকে। আভঙ্গঠামে মূর্ত্তির কটীদেশ মানসূত্র হইতে এক অংশ মাত্র বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

৩ নং চিত্র, ত্রিভঙ্গ।

এইরূপ মূর্ত্তিতে মানসূত্র বাম অথবা দক্ষিণ চক্ষু-তারকার মধ্যভাগ, বক্ষস্থলের মধ্যভাগ, নাভির বাম অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হয়, অর্থাৎ মূর্ত্তিটি মৃণালদণ্ডের মত বা অগ্নি-শিখার মত পদতল হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত নিজের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে), কটী হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিজের বামে, এবং কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত নিজের দক্ষিণে হেলিয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকে। এই ত্রিভঙ্গ ঠামে রচিত দেবীমূর্ত্তিগুলির মস্তক মূর্ত্তির দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) ও দেবমূর্ত্তিগুলির মস্তক নিজের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) হেলিয়া থাকে, অর্থাৎ দেবতা দেবীর দিকে, দেবী দেবতার দিকে ঝুঁকিয়া রহেন। অতএব ত্রিভঙ্গঠামে পুরুষমূর্ত্তিকে নিজের বামে (শিল্পীর দক্ষিণে) ও স্ত্রীমূর্ত্তিকে নিজের দক্ষিণে (শিল্পীর বামে) হেলাইয়া গঠন করা বিধেয়, যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হইবে যেন মৃণালদণ্ডের উপরে প্রফুল্ল পদ্মের মত উভয়ের মুখ উভয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল যুগল-মূর্ত্তির বা দেবদম্পতির গঠনরীতি। মূর্ত্তিতে অভিমান খেদ ইত্যাদি ভাব দেখাইতে হইলে পুরুষে নারী-ত্রিভঙ্গ এবং নারীতে পুরুষ-ত্রিভঙ্গ রচনা প্রয়োগ

করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের বিপরীত মুখে হেলিয়া রহিবে। বিষ্ণু সূর্য্য প্রভৃতি যে-সকল মূর্ত্তি দুইপার্শ্ব-দেবতা বা শক্তির সহিত গঠন করা হয়, তাহাতে সমভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ দুই প্রকারের ভঙ্গ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা সমভঙ্গঠামে কোন এক পার্শ্ব-দেবতার দিকে কিঞ্চিৎমাত্র না হেলিয়া একেবারে সোজাভাবে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট রহেন, আর তাঁহার দুই পার্শ্বে যে দুই দেবতা বা শক্তি—যিনি দক্ষিণে আছেন তিনি, যিনি বামে আছেন তিনিও—ত্রিভঙ্গঠামে উভয়েই প্রধান দেবতার দিকে নিজের নিজের মাথা হেলাইয়া দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকেন। ইহাতে দুই পার্শ্বমূর্ত্তি দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা করিতে হয়, যথা—শিল্পীর বামে ও প্রধান মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর দক্ষিণ দিকে ও নিজের বাম দিকে, এবং শিল্পীর দক্ষিণে ও প্রধান মূর্ত্তির বামে যিনি তাঁহার মস্তক শিল্পীর বাম দিকে ও নিজের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া রহে। দুই পার্শ্বদেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গ ঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্শ্বদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন। ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে মধ্যসূত্র বা মানসূত্র হইতে মস্তক এক অংশ ও কটীদেশ এক অংশ বামে বা দক্ষিণে সরিয়া পড়ে।

৪ নং চিত্র, অতিভঙ্গ।

এইরূপ মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই অধিকতর বঙ্কিমতা দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মূর্ত্তির কটীদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেহ কিম্বা কটী হইতে পদতল পর্য্যন্ত অংশ বামে দক্ষিণে পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গ ঠাম শিবতাণ্ডব, দেবাসুর যুদ্ধ প্রভৃতি মূর্ত্তিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূর্ত্তিতে গতিবেগ নর্ত্তনশক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গঠামে গঠন করা বিধেয়।

শুক্রনীতিসার বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মূর্ত্তির মান পরিমাণ আকৃতি প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেওয়া আছে। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে শিল্পাচার্য্যগণের কয়েকটি উপদেশ প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

"সেব্য-সেবক-ভাবেষু প্রতিমালক্ষণম্ স্মৃতম্"

মূর্ত্তি ও প্রতিমার যে-সকল লক্ষণ মান পরিমাণ ইত্যাদি দেওয়া হইল তাহা যে-সকল প্রতিমার সহিত শিল্পীর পূজকের বা প্রতিষ্ঠাতার সেব্য ও সেবক, প্রভু ও দাস, অর্চ্চিত ও অর্চ্চক সম্বন্ধ কেবল তাহাদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং কেবল সেইরূপ মূর্ত্তিই যথাশাস্ত্র সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন করিয়া গঠন করিতে হয়। অন্য-সকল মূর্ত্তি, যাহার পূজা কেহ করিবে না তাহাদের, শিল্পী যথা-অভিরুচি গঠন করিতে পারে।

"লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃণ্ময়ী পৈষ্টিকী তথা
এতেষাং লক্ষণাভাবেন ন কৈশ্চিদ্দোষ ঈরিতঃ॥"

কিন্তু চিত্র এবং আল্পনা, বালি মাটি ও পিটুলি দ্বারা রচিত মূর্ত্তি বা প্রতিমা লক্ষণহীন হইলেও দোষের হয়না, অর্থাৎ এগুলি যথাশাস্ত্র গঠন করিতেও পার, নাও করিতে পার, কারণ এই-সকল প্রতিমা ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মিত হয় এবং নদীতে সেগুলিকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার মূর্ত্তি সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা নিজের হাতে রচনা করিয়া থাকেন—পূজা, আমোদ প্রমোদ অথবা সময়ে সময়ে শিশুসন্তানগণের ক্রীড়ার জন্য, সুতরাং সেগুলি যে যথাশাস্ত্র সর্ব্বলক্ষণযুক্ত হইয়া গঠিত হইবে না, তাহা ধরা কথা, এই জন্যই চিত্র আলিম্পন ইত্যাদি রচনাতে রচয়িতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন।

"তিষ্ঠন্তীং সুখোপবিষ্টাং বা স্বাসনে বাহনস্থিতাম্
প্রতিমামিষ্টদেবস্য কারয়েদ্ যুক্তলক্ষণাম্।
হীনশ্মশ্রুনিমেষাং চ সদা ষোড়শবার্ষিকীম্
দিব্যাভরণবস্ত্রাঢ্যাং দিব্যবর্ণক্রিয়াং সদা
বস্ত্রৈরাপাদগূঢ়া চ দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্॥"

নিজ নিজ আসনে দণ্ডায়মান অথবা সুখে উপবিষ্ট কিম্বা বাহনাদির উপরে স্থিত, শ্মশ্রুহীন, নির্নিমেষ দৃষ্টি, সদা ষোড়শবর্ষবয়স্ক, দিব্য আভরণ ও বস্ত্র পরিহিত, দিব্যবর্ণ, দিব্যকার্য্যরত অর্থাৎ বরাভয় ইত্যাদি দানরত এবং কটীদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত ও নূপুর মেখলা ইত্যাদি ভূষিত করিয়া ইষ্টদেবমূর্ত্তি গঠন করা বিধেয়।

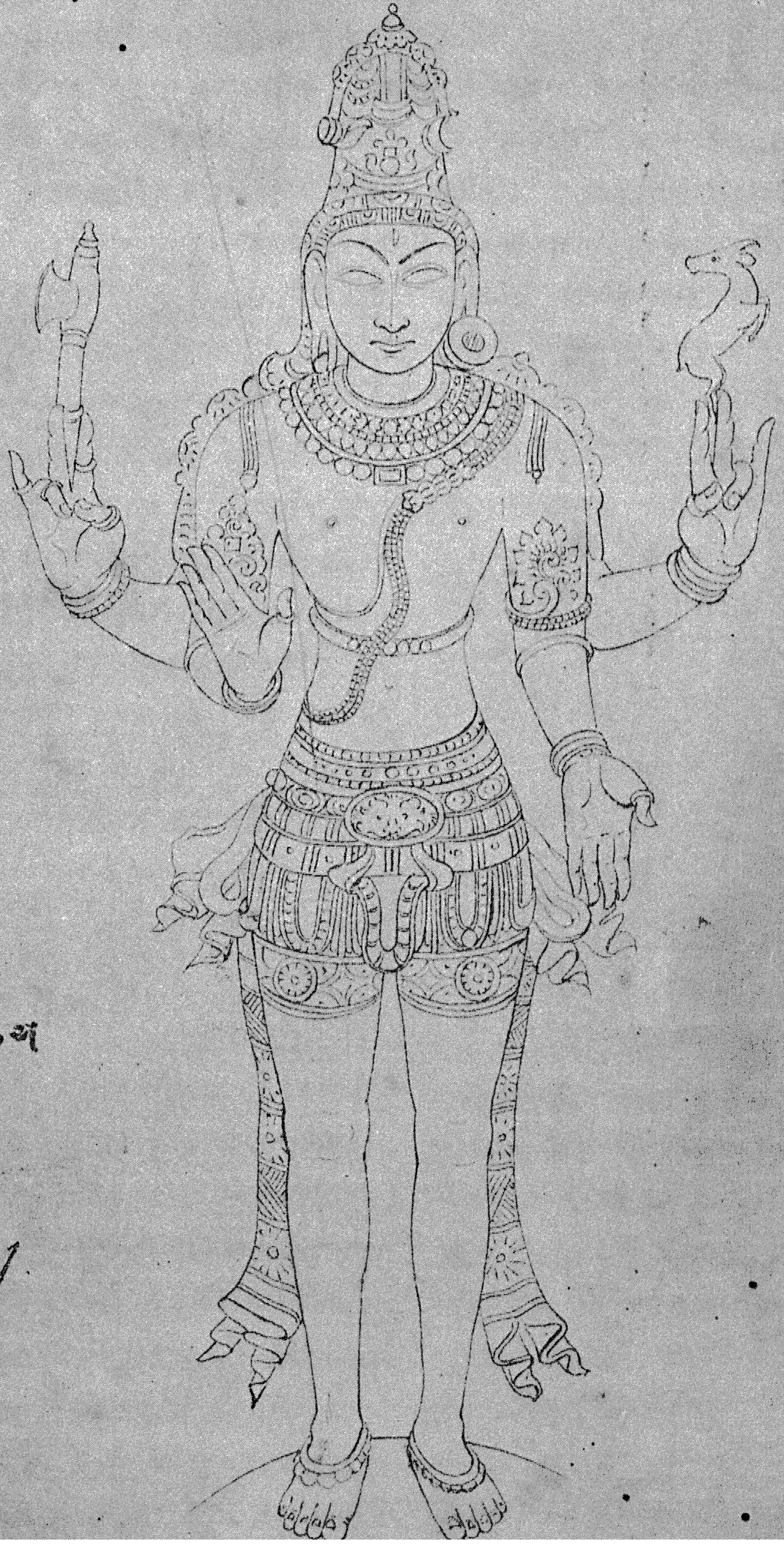

Fig 1.

२ आंड़ग Fig 2

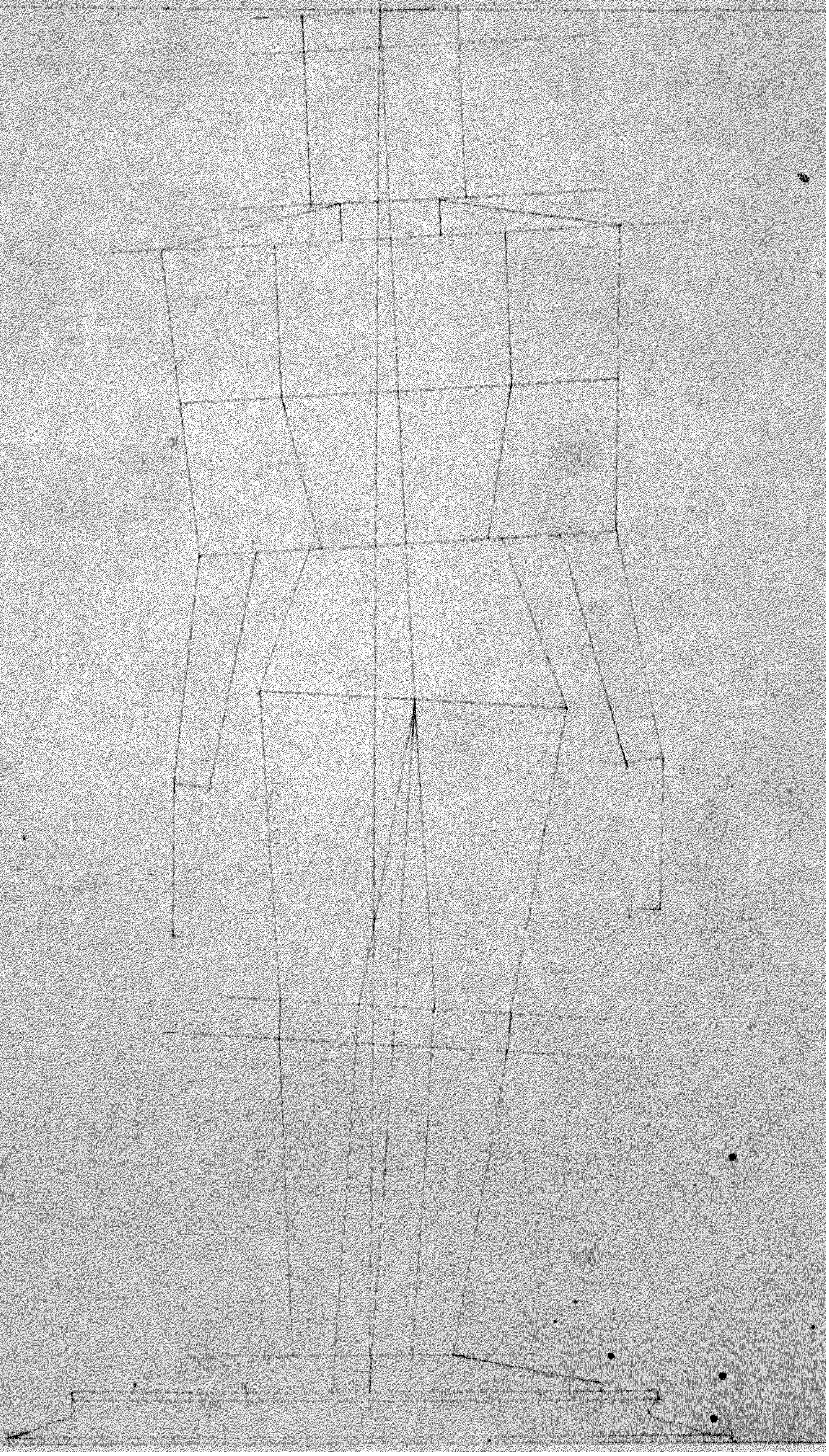

আভরণ
২
Fig 2

"কৃশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থূলা রোগপ্রদা সদা।
গূঢ় সন্ধ্যস্থিধমনী সর্ব্বদা সৌখ্যবর্দ্ধিনী" ॥

প্রতিমার হস্তপদাদি কৃশ করিয়া গঠন করিলে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে, অতি স্থূল করিয়া গঠন করিলে রোগ আনয়ন করে এবং অপ্রকাশিত-অস্থি-শিরা সুঠাম হস্ত-পদাদিযুক্ত মূর্ত্তি সুখ সৌভাগ্য আনয়ন করে।

"মুখানাং যত্র বাহুল্যং তত্র পংক্ত্যো নিবেশনম্।
তৎ পৃথক্ গ্রীবামুকুটং সুমুখং সাক্ষিকর্ণযুক্" ॥

যে মূর্ত্তিতে তিন বা ততোধিক মুখ রচনা করিতে হয় তাহাতে মুণ্ডগুলি এক শ্রেণীর উপরে আর এক শ্রেণী করিয়া সাজাইয়া সকল মুখেরই পৃথক গ্রীবা কর্ণ নাসা চক্ষু ইত্যাদি দিয়া গঠন করা বিধেয়, যথা পঞ্চমুখ মূর্ত্তিতে সারি সারি পাঁচটি মুখ এক শ্রেণীতে না সাজাইয়া চারিদিকে চার ও উপরে এক, ষড়মুখ মূর্ত্তিতে প্রথম থাকে চার দ্বিতীয় থাকে দুই, দশমুখ মূর্ত্তিতে প্রথম চার তদুপরি তিন তদুপরি দুই ও সর্ব্বোপরি এক এইরূপভাবে সাজাইতে হইবে এবং সকল মুণ্ডগুলির পৃথক পৃথক গ্রীবা মুকুট চক্ষু কর্ণাদি থাকিবে। ৪নং চিত্র দেখ।

"ভুজানাং যত্র বাহুল্যং ন তত্র স্কন্ধভেদনম্।"

মূর্ত্তিতে চার বা ততোধিক বাহু রচনা করিবার সময় এক এক বাহুর এক এক স্কন্ধ দিতে হইবে না কিন্তু একই স্কন্ধ হইতে বাহুগুলি ময়ূরপিচ্ছের মত ছত্রাকারে রচনা করিতে হইবে। ৪নং চিত্র দেখ।

"ক্বচিৎ বালসদৃশং, সদৈব তরুণং বপুঃ।
মূর্ত্তিনাং কল্পয়েচ্ছিল্পী ন বৃদ্ধসদৃশং ক্বচিৎ ॥"

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সর্ব্বদা তরুণবয়স্কের ন্যায়, কখন কখন বালকের ন্যায় করিয়াও গঠন করিবে, কিন্তু কদাচিৎ বৃদ্ধের ন্যায় করিয়া গঠন করিবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটী বৈজ্ঞানিক কারণ

প্রথম অধ্যায়।

(প্রচলিত কারণসমূহ)

বঙ্গীয় পাঠকসমূহের স্মৃতিশক্তিকে ভারতবর্ষের অধঃপতন সংক্রান্ত এত অধিক সংখ্যক কারণ বহন করিতে হয় যে, তদুপরি আমার এই 'শাকের আঁটিটীর' ভার অত্যন্ত অধিক হইবে না বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে এই নূতন ভারটীকেও অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলাম।

তবে প্রথমতঃ প্রচলিত কারণগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। (১) ব্রাহ্মণদিগের বর্ব্বরতা (২) জাতিভেদ (৩) বিধবা বিবাহের অপ্রচলন ও বাল্য-বিবাহের প্রচলন (৪) স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার (৫) পৌত্তলিকতা (৬) মন্ত্রাদি বিবিধ কুসংস্কারের প্রভাব (৭) মাংস না খাওয়া, ইত্যাদি ভারতবর্ষের অধঃপতনের বিবিধ কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেহ উহাদের কোন একটীকেই ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। কেহ কেহ আবার দুই তিনটীর ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া থাকেন।

অবশ্য সকলেই যে ঐগুলিকে ভারতবর্ষের অধঃ-পতনের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, এমন নহে; অনেকে ঐ কারণগুলির অস্তিত্বই একবারে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজীবহিতৈষী অপূর্ব্ব মানব ছিলেন। ইউরোপের খৃষ্টীয় পুরোহিত (Priest) এবং ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণে অনেক প্রভেদ। ইউরোপের পুরো-হিতের মত ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বিলাসবিভ্রম এবং বিপুল সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। অতি হীন চামারের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামগ্রী অধিক ছিল না। (১) তবে যে তাঁহারা শূদ্রদের নিকট হইতে নিজেদের অনেকটা দূরে দূরে রাখিয়া চলিতেন এবং তজ্জন্য কতকগুলা কর্কশ ব্যবস্থাও প্রণয়ন

(১) পিয়ার লোটীর ভারত-ভ্রমণ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত ও ভূদেবের স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন, সে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। তাৎকালীন শূদ্রদিগের সহিত অবাধ মেলামেশা করিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব হইত।

ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের উপর যে কোনও অত্যাচার হইত ইঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ চিরদিনই স্ত্রীজাতিকে বিশেষ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে (২)

তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষের মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা নহে। মূর্ত্তি সাধকের দেবতা ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। লোকে শুধু পুতুলের পূজা করে না। (৩)

মন্ত্রাদিরও তাঁহারা বিবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। মন্ত্রাদি Hypnotistদিগের মধ্যে Auto-suggestion মাত্র। (৪)

তাঁহারা বলেন নিরামিষ আহারই মানুষের স্বাভাবিক আহার। নিরামিষ আহারে শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়। গ্রীক জাতিও অল্প মাংসই আহার করিত। জাপানীরাও তদ্রূপ। এমন কি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশেও সভ্যতার প্রাক্‌কালে বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অতি সামান্য মাত্র মাংসই ব্যবহৃত হইত।

কেহ কেহ ভারতবর্ষে জাতিভেদ, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণের অস্তিত্ব তর্কের খাতিরে দেশমধ্যে স্বীকার করিয়াও সেগুলি যে এ দেশের অধঃপতনের পর্য্যাপ্ত কারণ তাহা স্বীকার করেন না।

প্রাচীন গ্রীক্‌জাতির বিবিধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার ছিল। তাহাদের হেলটদিগের প্রতি ব্যবহার কিম্বা আমেরিকার নিগ্রোদিগের উপর ব্যবহারের তীব্রতা ভারতবর্ষের জাতিভেদের অপেক্ষা অন্ততঃ কম ছিল না। স্পার্টান্‌দিগের দুর্ব্বল-শিশুসন্তান-হত্যাপ্রণালী, ইউরোপীয়দিগের ডাইনী (Witch) পোড়াইবার প্রণালী যে যথেষ্ট নৃশংস ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকানেরা নিগ্রোদিগের উপর যে নিদারুণ অত্যাচার করিত (এবং এখনও অনেক পরিমাণে করে) তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। অথচ আমেরিকা এখন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমওয়েলের সময়ে ইংলণ্ডের বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট ছিল এবং তাৎকালীন ইংরাজদিগের আইরিস্‌দিগের প্রতি ব্যবহার বিশেষ মোলায়েম হয় নাই। অথচ তখন ইংরাজদিগের উঠ্‌তির মুখ। মুরগণ স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত ও বিবাহবন্ধন যখন ইচ্ছা উচ্ছেদ করিতে পারিত; অথচ তাহারা বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল এবং মুরদিগের জ্ঞানচর্চ্চার উপরই বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপিত। ইউরোপীয় বিবিধ সামরিক জাতিসমূহের মধ্যে বিবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেক আছে। নেপোলিয়নের নিয়তির উপর অগাধ বিশ্বাস সর্ব্বজনবিদিত। ফ্রেডারিক দি গ্রেট সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন কালে সৈন্যাধ্যক্ষের পয় আছে কি না প্রথম জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রসিদ্ধ রুস-সেনাপতি স্কবেলস্কের একটী মাদুলী ছিল—তাঁহার বিশ্বাস তিনি সেই মাদুলীর বলেই জয়লাভ করিতেন। বর্ত্তমান কালে চৌরঙ্গীর অনেক জ্যোতির্ব্বিদ ইংরাজী কুসংস্কারের উপর নির্ভর করিয়াই বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করে। আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার একজন বিখ্যাত সার্জ্জন বিশেষ মাদুলীভক্ত, কিন্তু মাদুলীর নিতান্ত অভক্ত সার্জ্জনগণও তাঁহাকে অস্ত্রচিকিৎসার নৈপুণ্যে পরাভব করিতে পারেন নাই। মনুপ্রচলিত বাল্যবিবাহব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর বহুকাল পর্য্যন্তও যে হিন্দুদিগের শারীরিক অবনতি ঘটে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। প্রাচীনগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং নিজেরাও যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, শারীরিক গঠনের প্রকাণ্ডত্বে, স্বাস্থ্যে ও দীর্ঘজীবিতায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইউরোপীয়দিগের

(২) চন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব দ্রষ্টব্য। The wives of the Greeks lived in almost absolute seclusion. They were usually married when very young.—Lecky's History of European Morals, p. 121, R. P. A. Series.

(৩) মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তথা ॥১১৭।১৪ উঃ
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
অজ্ঞা যজন্তি বিশেশং পাষাণাদিষু সর্ব্বদা
সর্ব্বত্র সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণম্। ৪৮।২।

(৪) See Meyer's Human Personality.

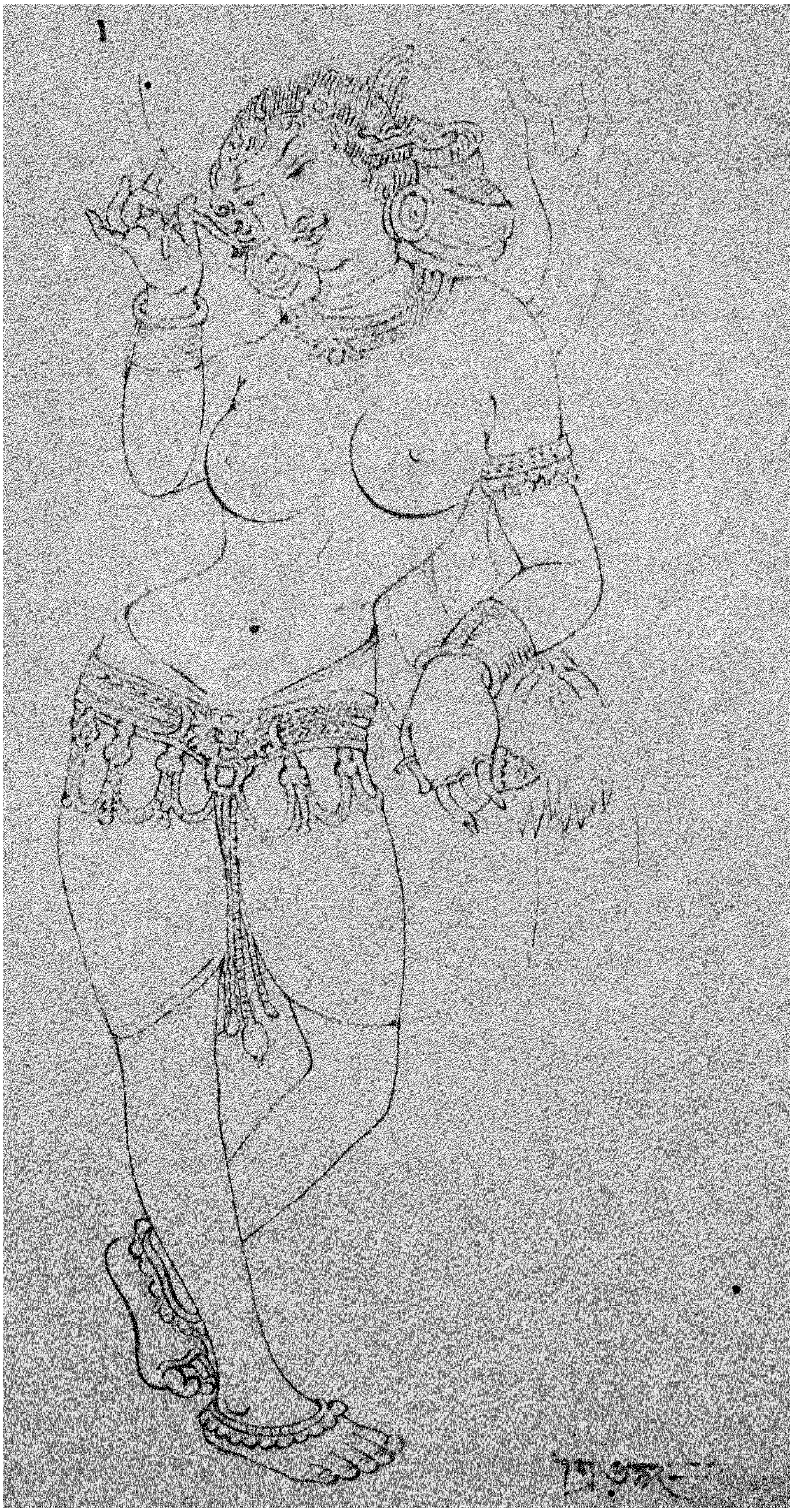

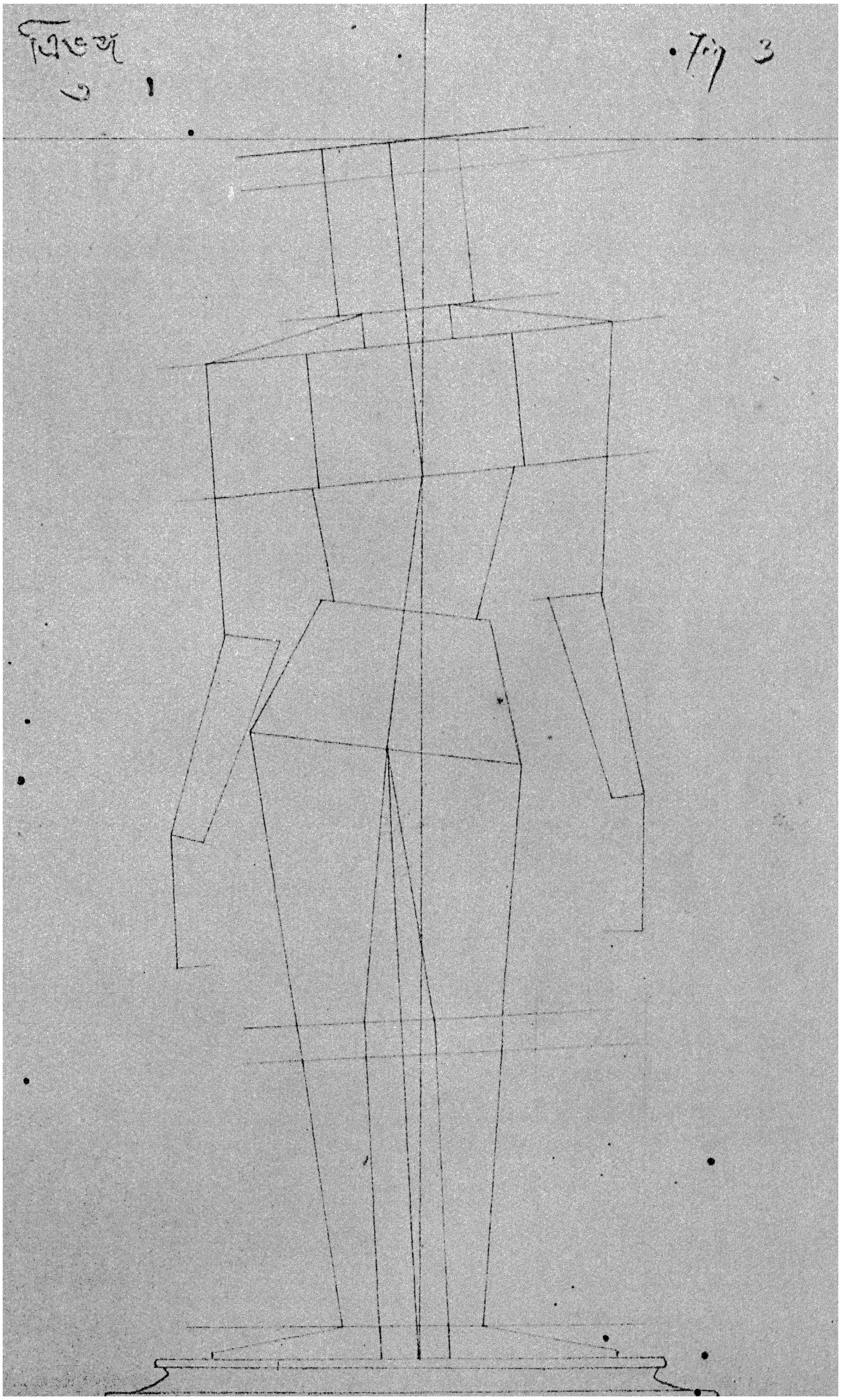
Fig 3

অতি-ভঙ্গ

৪

অপেক্ষা কোনক্রমে ন্যূন ছিলেন না। * বিগত পঞ্চাশ বৎসর হইতে বঙ্গদেশবাসীগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে ইউরোপীয় সমাজসমূহেও অনেকাংশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাৎকালীন আমেরিকান্ বালকেরা ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বিবাহ করিত এবং তাহাদের বহুসংখ্যক সন্তান জন্মিত। বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে যে-সকল বালক অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত—হিন্দুসমাজভুক্ত বালকগণ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি কোন গুণেই যে মুসলমান, ক্রিষ্টিয়ান্ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি বাল্যবিবাহহীন সমাজভুক্ত বালকগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, তাহা শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়। †

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের যাহাতে কোনও ভুল ধারণা না হয় তজ্জন্য এইখানে কয়েকটী কথা বলিয়া রাখি। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রচলিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রথাসমূহের অস্তিত্ব থাকা উচিত কি না, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। রাজনৈতিক, নীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক বা সমাজরক্ষক এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। বর্ত্তমান লেখক ঐ সকল উচ্চ উপাধিলাভের জন্য সচেষ্ট নহেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সত্য অবধারণ করাই তাঁহার উচ্চাশার বিষয়। সত্য তিক্ত বা মিষ্ট হইল বলিয়া তাহার কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে বৈজ্ঞানিকের অধিকার নাই। তাঁহাকে জাগতিক ঘটনাবলী স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য ও কারণ নিরূপণ করিয়া তাহাকে যথাযথরূপ মর্য্যাদা দিয়া তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এবং এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিজের ভাব ও ভাষাকে যথাসম্ভব রাগশূন্য করিতে হইবে

কেহ কেহ কোনও আকস্মিক কারণের উপর ভারতবর্ষের অধঃপতনের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। পাণিপথের যুদ্ধে যদি মারহাট্টাগণ পরাজিত না হইত, পৃথ্বীরায় যদি মহম্মদঘোরীর প্রতারণা-বাক্যে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া যাইত। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালার মুসলমানগণের, ও লালসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা শিখগণের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল; ইঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। একটু ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে, ঐগুলিই পরাজয়ের একমাত্র কারণ নহে; জাতীয় অধঃপতনের কারণ আরও পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ যাঁহারা পাঠ করিয়া-

---

* লেখক বোধ হয় বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের প্রভেদ ভুলিয়া যাইতেছেন। বাল্যমাতৃত্ব না ঘটিলে বাল্যবিবাহে মাতার বা সন্তানের শারীরিক অবনতি না হইতেও পারে। পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ ছিল, কিন্তু দ্বিরাগমন সম্বন্ধে কঠিন শাস্ত্রীয় নিয়ম পালিত হওয়ায় বাল্যমাতৃত্ব, এখনকার মত বয়সে, ঘটিত না। ইহার প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান জাটসমাজের অবস্থা দেখুন। তথায় বাল্যবিবাহ থাকিলেও বাল্যমাতৃত্ব না থাকায় জাটেরা হীনবল নহে। যথা—

"Wherever infant marriage is the custom, the bride and bridegroom do not come together till a second ceremony called *muklawa* has been performed, till when the bride lives as a virgin in her father's house. This second ceremony is separated from the actual wedding by an interval of three, five, seven, nine, or eleven years, and the girl's parents fix the time for it. &c."—Census of India, 1901, Vol. I. Part I. p. 433.

† লেখক নিজের ধারণাটি "শিক্ষকমাত্রেরই নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়" বলিয়াছেন। ঐ ধারণা সত্য হইতে পারে, কিন্তু "নিত্যপ্রত্যক্ষগোচর হয়" বলিলে ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া হইল না। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই। সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা ও তন্মধ্যে বলবান্ নীতিমান্ মনস্বী ছাত্রের সংখ্যা, এবং সমগ্র ব্রাহ্ম আদির সংখ্যা ও তন্মধ্যে বলবান্ নীতিমান্ মনস্বী ছাত্রের সংখ্যা, ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া যদি কেহ তুলনা করেন, তবে তাঁহার উক্তি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। নতুবা উহা ব্যক্তিবিশেষের অনুমান বা কথার কথা মাত্র। তদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ অল্প দিনের জিনিষ, তাহাতে এখনও উহা ৩।৪ পুরুষের বেশী কালের নয়। তাহার মধ্যে আবার এখনও অনেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক ব্রাহ্ম বাল্যবিবাহের সন্তান। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বাল্যবিবাহের ফলাফল বিচার করিবার এখনও সময় আসে নাই। তা ছাড়া, কেবল যথাযোগ্য বয়সে বিবাহ হইলেই ত বংশের উন্নতি হয় না। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য দিবার এবং রোগে চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা, ভাল শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিয়া, ভাল গৃহশিক্ষক রাখিয়া, প্রয়োজনীয় পুস্তক যন্ত্রাদি কিনিয়া, শিক্ষা দিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি সুবিধা কাহার কি পরিমাণে আছে, তাহাও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধেয়।

সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে বঙ্গের সর্ব্বত্র হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বংশবৃদ্ধি অনেক বেশী পরিমাণে হইতেছে। ইহাতে মুসলমানদের জীবনীশক্তির আধিক্য প্রমাণিত হইতেছে। ইহা কি তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষের একটা প্রমাণ নয়? মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন কম।

—সম্পাদক।

ছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন.সেই বিপুল মহারাষ্ট্র বাহিনীর পরিচালকবর্গের কি বিপুল অযোগ্যতাই না ছিল। যে কারণ বা কারণপরম্পরা সেই বিপুল বাহিনীকে সুপরিচালিত করিবার উপযুক্ত একজন নেতা উৎপন্ন করিতে পারিল না, অথবা কোন উৎপন্ন উপযুক্ত নেতাকে স্বস্থানে স্থাপন করিতে পারিল না তাহার বিষয় কি কেহ ভাবিয়াছেন? মহাভারতে কণিক প্রভৃতি রাজনীতিকগণের বক্তৃতা পাঠে ও চাণক্যনীতি পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণের কূটরণনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনভিজ্ঞতা ছিল না; অথচ যে শত্রু পূর্ব্বে একবার সন্ধিসর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার বাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুবীরগণের সুনিদ্রাকে তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিব, না তাঁহাদের অপূর্ব্ব সারল্যের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিব? জাতির মধ্যে এই যে সব নিদারুণ নির্ব্বুদ্ধিতা জন্মিতেছিল তাহার কারণ কি? সমাজের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাতেই সমাজমধ্যে বিশ্বাসঘাতকের উদয় হয়। লালসিংহ ও মীরজাফর তাৎকালীন মুসলমান ও শিখসমাজের অধোগত অবস্থার পরিস্ফুট ফলমাত্র। সমাজ কি প্রকারে নিজের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা বীরের উৎপত্তির পক্ষে সহায়তা করে তাহা ইংরাজসমাজ হইতে গৃহীত একটী উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইবে। ইংরাজজাতির অভ্যুদয়কাল হইতে ঐ সমাজে কোনও নামজাদা বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব শুনা যায় না। ইংরাজসমাজের এমনই সুস্থ অবস্থা যে, ঐ সমাজে বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব হওয়াই প্রায় অসম্ভব। ইংরাজজাতির সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে ঐরূপ সুস্থাবস্থার কারণের পরিচয় পাওয়া যায়। Channings, Mrs. Henry Wood প্রণীত একখানি বালকপাঠ্য উপন্যাস। উহাতে বিদ্যালয়ের বালকদিগের আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ যেরূপ, বিদ্যালয়ে অনেক দুষ্টু (দুষ্ট অর্থাৎ বদমাইস নহে) ছেলে থাকে এবং তাহারা অনেক অপকার্য্যও করিয়া থাকে। ভাল ছেলেরা তাহাদের সেই অপকার্য্য নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনরূপে কোনও এক বা কতিপয় বালক কোনও অপকার্য্য করিয়া ফেলে এবং কর্তৃপক্ষ দুষ্কৃতকারীর নাম জানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাহা হইলেও স্কুলের ভালই হউক আর মন্দই হউক কোন বালকই কিছুতেই দুষ্কৃতকারীর নাম বলিয়া দিবে না। এমন হইয়াছে কত নিরীহ বালক সন্দেহবশে প্রহারজর্জ্জরিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি সে কিছুতেই তাহার সঙ্গীদের নাম করিয়া দেয় না। যদি কেহ কোনও রূপে নিজের সঙ্গীদের বা অপরাধীর নাম বলিয়া দেয় তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। স্কুলের সমস্ত ছেলে তাহাকে নানা প্রকারে নিগৃহীত করিতে থাকে; শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজের বাপ ভাইও তাহাকে ঘৃণার ও দয়ার পাত্র বিবেচনা করিতে থাকে। সে সমাজে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের এমনই লাঞ্ছনা, যে, সেখানকার অতি বড় কাপুরুষও সমাজে কাপুরুষ ও Sneak বলিয়া অভিহিত হইতে ভয় পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(জাতীয় উন্নতি কাহাকে বলে)

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, যেগুলিকে সাধারণতঃ ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় যুক্তির দ্বারা দেখিলে সেগুলিকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না!

কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রথমেই "জাতীয় উন্নতি জিনিসটা কি?" তাহার একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যক। যে জাতির সুখের পরিমাণ বেশী সেই জাতিরই যে জাতীয় উন্নতি অধিক এরূপ কোনও ব্যাখ্যা করা সুবিধাসঙ্গত হইবে না। কারণ কি প্রকারে কোন জাতির সুখ হয় তাহা ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই সোজাসুজি জাতীয় উন্নতির যে অর্থ নিরূপিত আছে, সেই অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী উন্নত দেশের আদর্শ, এবং ভারতবর্ষ ও পারস্য অধঃপতিত দেশের আদর্শ; এই উভয় দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের জাতীয় অবনতি ও উন্নতি এই দুটী কথার সংজ্ঞা বাহির করা যাউক। যে দেশ উন্নত সে দেশ স্বাধীন, সে দেশ নিজেই নিজ প্রয়োজনানুরূপ রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, পণ্ডিত,

দার্শনিক, শাসক, শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারে; আর যে দেশ অমুন্নত, তাহা নিজের প্রয়োজনানুরূপ ঐসকল সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পরদেশীয় যোদ্ধার বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহারা নিজেরা শাসনশৃঙ্খলা করিতে জানে না, রাজস্বের ব্যবস্থা করিতে জানে না, তাহারা নিজেদের দেশের কোথায় কি আছে তাহা জানে না, এবং কিরূপেই বা সেই-সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় তাহাও জানে না, তাহারা চিকিৎসাতত্ত্ব, সুকুমার কলা প্রভৃতি সকল বিষয়েই নিজেরা কিছুই করিতে পারে না; তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। এবং কোনও উন্নত দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রতিভাবান্ ব্যক্তির এতই প্রাচুর্য্য হয় যে, তাহারা নিজেদের দেশের অভাব পূরণ করিয়াও অমুন্নত পরদেশ জয় করিয়া সেখানকার সর্ব্ববিধ প্রতিভার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা অবনত দেশের লোকদের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে, শৃঙ্খলা করিয়া থাকে, চিকিৎসা করিয়া থাকে, শাসন করিয়া থাকে এবং অন্যান্য যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অতএব আমাদের উন্নত ও অমুন্নত দেশ এই দুই কথার অর্থ অনেকটা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই দেশ উন্নত যে-দেশে পর্য্যাপ্তসংখ্যক সর্ব্ববিষয়িণী-প্রতিভাশালী লোকের সদ্ভাব, এবং অমুন্নত সেই দেশ যেখানে তাদৃশ লোকের অভাব।

কেহ কেহ বলিতে পারেন কোনও দেশে অন্য সব বিষয়ে প্রতিভাশালী লোকের সদ্ভাব আছে, কেবল সামরিক প্রতিভাশালীর অভাব, এ কারণে সে দেশের অধঃপতন হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখা যায়। উন্নতি প্রায়শঃ * সর্ব্ববিষয়িণী হইয়া থাকে। যে সময়ে জার্ম্মানীতে মল্‌ট্‌কে, বিসমার্ক প্রভৃতি সামরিক পুরুষ জন্মিয়াছে, সেই সময়ের জার্ম্মানী জ্ঞান বিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ; যে সময়ে ফ্রান্স দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জন্মিয়াছিল সে সময়ে সেখানে বিবিধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বহু প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মিয়াছিল; এইরূপ ইংরাজদেরও উন্নতি সর্ব্ববিষয়িণী হইয়াছে; আরবদিগেরও তাহাই।

তুর্কদিগের কথা লইয়া কেহ বলিতে পারেন—এই জাতি ত জ্ঞান বিজ্ঞানে কোনও উন্নতি দেখাইতে পারে নাই, তবে ইহারা এতকাল বুলগেরীয়ান্ প্রভৃতি জাতিকে কেমন করিয়া পদানত রাখিয়াছিল? যখন উন্নত অমুন্নত জাতিতে সংঘর্ষ হয় তখন উন্নত জাতিই বিজয় লাভ করে। কিন্তু যখন অমুন্নতে অমুন্নতে সংঘর্ষ বাধে তখন উভয়ের মধ্যে যে উন্নততর সেই বিজয়ী হয়। তুর্কদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান না থাকিলেও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বুলগেরিয়ান্‌দিগের মধ্যে উহাদের চর্চ্চার কোনও প্রমাণ নাই। অতএব সামরিক বলে বলীয়ান্ তুর্কী বুলগেরিয়াকে পদানত রাখিয়াছিল। বুলগেরিয়ান্‌দিগের যখন উন্নতি হইল তখন আবার তুর্কী পরাভূত হইল।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি:—"কোন জাতির উন্নতি সেই জাতির বিবিধ-বিষয়িণী-প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা ও তাহাদের ঔৎকর্ষের উপর নির্ভর করে।"

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। এমার্সনের একটী উপমা এ বিষয়ে আমাদের সুন্দর সাহায্য করিতেছে; তিনি বলেন নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে জন্মিয়াছিলেন, তখন সেখানে ছোট ছোট নেপোলিয়নও বহুসংখ্যক জন্মিয়াছিল; নচেৎ নেপোলিয়নের কৃতকার্য্যতা সম্ভবপর হইত না। ফরাসী সৈন্যগণের মধ্যে এই সকল ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন না থাকিয়া যদি সেখানে তৎপরিবর্ত্তে একদল কাপুরুষ থাকিত তাহা হইলে নেপোলিয়নের যুদ্ধবিদ্যার জারিজুরী কিছুই খাটিত না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও দুএকটী ঘটনা দেখা যাউক। রাণা সঙ্গ মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া এক বিরাট হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেন। তাঁহার সে বাসনা ফলবতী হয় নাই। কারণ দুইটী হইতে পারে। প্রথম রাণা সঙ্গের প্রতিভা

* কিন্তু সব সময়ে নহে। রোমানেরা যখন গ্রীস্ জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা সাহিত্যদর্শনাদি বিষয়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়া ঐসকল বিষয়ে তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সভ্যতায় নিকৃষ্ট হুন, গথ প্রভৃতি জাতি সভ্য রোমকে পরাজিত করিয়াছিল। এইরূপ অনেক অসভ্য অনার্য্যজাতি ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল।—সম্পাদক।

সেই মহৎকার্য্যের উপযোগী ছিল না। তিনি স্বীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় পরাভূত হইয়াছিলেন বলিলে চলিবে না। বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি পরাভূত করিতে পারেন নাই কেন? আরঙ্গজীবের পুত্র যখন বিদ্রোহী হইয়া রাজপুতদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল তখন তিনি যে কৌশলে রাজপুতগণ ও নিজ পুত্রের মধ্যে অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছিলেন রাণা সঙ্গ সেরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই কেন? অথবা ইহাও হইতে পারে রাণা সঙ্গের প্রতিভার অভাব ছিল না কিন্তু তিনি যে-জাতির মধ্যে জন্মিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সাধারণ প্রতিভার এতই অভাব ছিল যে, তিনি তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক পান নাই। মানুষের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দোষ চিরকালই আছে কিন্তু বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞগণ মানুষের বিবিধ দোষ সত্বেও এবং তাহার সেই-সকল দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াও কিরূপে তাহার দ্বারা নিজ প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে চাণক্য ও ইউরোপে বিসমার্ক। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, যদি দুই একজন বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেশমধ্যে জন্মে তাহা হইলেও দেশের উন্নতি হইতে পারে, কিম্বা যদি বহুসংখ্যক অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে তাহা হইলেও দেশের উন্নতি হয়।

ইহাও দেখা যায় যে, কোনও জাতি যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সেই জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং কোনও জাতি যখন অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন সেই জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির অভাব ঘটিতে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটীতে অনায়াসেই উপনীত হওয়া যায়;—

(১) যে-সকল কারণ জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়তা করে সেই-সকলই জাতীয় উন্নতির প্রকৃত কারণ।

(২) এবং যে-সকল কারণ জাতির মধ্যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিবার পক্ষে সহায়তা করে সেই-সকলই জাতির অবনতির প্রকৃত কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

(প্রতিভা-বিজ্ঞান)

অতএব যে-সকল কারণ ভারতবর্ষের প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা কমাইয়া দিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে সেই-সকলই ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। আমাদিগকে সেইগুলিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কাউণ্ট টলষ্টয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর কার্য্যে দোষ দিয়াছেন। এই পৃথিবী যখন মানুষের দুঃখকষ্টে এখনও পূর্ণ, তখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অধিকাংশ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া গগনের গ্রহতারাগণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা তদনুরূপ দুরূহ অথচ লোকহিতচেষ্টাশূন্য গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। টলষ্টয়ের মত যদি কোনও লোক ডারউইনের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে যে, ডারউইন যে Origin of Species প্রভৃতি প্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তদ্দারা মানবজাতির কি উপকার হইয়াছে? ঐসকল পুস্তক কি মানবজাতির অলস জিজ্ঞাসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে বা অন্য কোনও মহত্তর উপকার করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে? এই-সকল প্রশ্নের উত্তরে ডারউইন-শিষ্যগণ সহসা কিছু গোলযোগে পতিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ডারউইন স্বীয় Descent of Man নামক গ্রন্থে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

যখন পৃথিবীতে কোনও প্রতিভার কাজ হয় তখন আমরা সকলেই সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে প্রশংসা করিয়া থাকি। যখন কোন রাজনীতিক কোন নূতন বুদ্ধির পরিচয় দিয়া কোন দেশের উপকার সাধন করেন, কিম্বা কোন যোদ্ধা নূতন সমর-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া বিপক্ষগণকে পরাভূত করেন, কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন বা কোন শিল্পী নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তখন আমরা সকলেই

তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করি, তাঁহারা স্ব স্ব দেশকে উন্নত করিয়াছেন. বলিয়া থাকি। যদি কোনও পণ্ডিত এমন কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহার ফলে দেশমধ্যে অজস্র প্রতিভার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ঐরূপ নিয়মের দ্রষ্টাও যে দেশের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডারউইন লিখিয়াছেন,—

"মানুষে নিজের ঘোটকের বংশরক্ষা করিবার সময় উহার পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কোন দুর্ব্বল ও মৃদুগামী জাতীয় ঘোটক ছিল কি না সে বিষয় সম্যক্ আলোচনা করে; কারণ তাহার জানা আছে যে, আপাততঃ যে ঘোটকটী খুব দৌড়াইতে পারে তাহার শরীরে যদি কোনও ক্ষীণ জাতীয় ঘোটকের রক্ত থাকে তবে তাহার সন্তানগণের মধ্যে কতকগুলি ক্ষীণজাতীয় হইবার সম্ভাবনা। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অথচ উচ্চজাতীয় ঘোটক লইয়া তাহার বংশবৃদ্ধি করিলে উৎকৃষ্ট ঘোটক পাইবার জন্য পূর্ব্বের মত দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয় না। যদিও মানুষে ঘোটকের বংশবৃদ্ধি করিবার সময় ঐরূপ বিবেচনা করিয়া কাজ করে তথাপি সে নিজের বংশবৃদ্ধি করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত রূপ কোনওপ্রকার অতীত ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। ইহার কারণ এই যে এখনও লোকসমাজে, পূর্ব্বপুরুষের গুণসমূহ * কি প্রকারে ও কি নিয়মে অপত্যে সংক্রামিত হয় এবং চারি পার্শ্বের অবস্থাই † বা মানুষকে কতটা গড়িয়া তুলে অর্থাৎ প্রত্যেক মানব তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য কতটাই বা পূর্ব্বপুরুষের কাছে ঋণী, কতটাই বা চারিদিকের শিক্ষার কাছে ঋণী—এই-সকল বিষয়ক জ্ঞান সম্যক্‌রূপে সংস্থাপিত হয় নাই। অতএব প্রতিভা কি নিয়মে জন্মে তদ্বিষয় আবিষ্কারের পূর্ব্বে বংশের বীজ, Heredity ও চতুষ্পার্শ্বের অবস্থাসমূহ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের চর্চাই সর্ব্বপ্রথম হওয়া আবশ্যক।"

ডারউইন Descent of Man নামক গ্রন্থে যে কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের চেষ্টায় তাহা এক্ষণে অনেকটা সফল হইয়া উঠিতেছে। তিনি নিজের আজীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে যে তরুর বীজকে অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন সেই তরু এক্ষণে মুকুলিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। ডারউইনের পরে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত বাইসমান বংশক্রম (Heredity) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় Germplasm theory ব্যাখ্যা করিয়া বংশগত গুণের (Heredity) প্রভাবকে ডারউইনের অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়তর স্থান দিয়াছেন।

পরে গ্যাল্টন Hereditary Genius নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির কুলুজী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করেন যে, "প্রতিভা বংশগত।" গ্যাল্টনই প্রকৃত পক্ষে Eugenics * বা প্রতিভাবিজ্ঞান নামক নূতন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমান কালে আচার্য্য পিয়ার্সন এই বিদ্যার চর্চ্চায় বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত। স্যালিবী প্রমুখ পণ্ডিতগণ Eugenicsএর তত্ত্বসমূহকে জনসমাজে প্রচার করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত গ্যাল্টনের পূর্ব্বেও মেণ্ডেল প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত উদ্ভিদ ও ইতর জন্তুদিগের মধ্যে বংশক্রমের (Heredity) প্রভাব সম্বন্ধে অনেক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতিপয় নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে সেই-সকলের কোনও আদর হয় নাই; এক্ষণে কিন্তু উহাদের বিশেষ আদর হইয়াছে এবং Mendelism সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিবার জন্য অনেক পত্রিকা ও সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ-সকল পুস্তকের সমালোচনা করা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে, তবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্যক্ বোধের জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যে-সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া "প্রতিভা বংশগত" গ্যাল্টনের এই মতবাদ সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

(প্রতিভা বংশগত)

উদ্ভিদ ও জীবগণের মধ্যে বংশপ্রভাবের শক্তি বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কে না দেখিয়াছেন যে, দুইটী বীজ—একটী বটের ও অপর একটী নটিয়া শাকের, যাহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে একই প্রকার বোধ হয়, কি বিভিন্ন শক্তি লইয়াই জন্মিয়াছে। একটীকে

* Heredity. † Surrounding Circumstances.

* আমাদের এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে Eugenics নামক তথাকথিত নূতন বিজ্ঞান, এখনও রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার মত অবিসংবাদিত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। ইহার অনেক তত্ত্বই এখনও অনুমানের অবস্থায় আছে। প্রমাণ, যথা—এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নূতন সংস্করণে Eugenics প্রবন্ধে আছে—

"It can hardly be said that the science has advanced beyond the stage of disseminating a knowledge of the laws of heredity, so far as they are surely known, and endeavouring to promote their further study."

—সম্পাদক।

অযত্নে লালিত করিলেও তাহা হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, আর অপরটীকে পরম যত্ন করিলেও তাহা হইতে তিন হাতের বেশী উচ্চ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না। ঐ উভয় বীজের অন্তরে যে শক্তি নিহিত আছে, চারিপার্শ্বের (Environments) অবস্থা ও ঘটনার যে-কোনও রূপ সংযোগ ও বিয়োগের ফলে উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব নহে। গর্দ্দভ হইতে গর্দ্দভ জন্মে এবং ঘোটকের বংশে ঘোটকই জন্মে। গর্দ্দভ হইতে কখনও ঘোটক এবং ঘোটক হইতে কখনও গর্দ্দভ জন্মে না। ঘোটকের পুত্র আহারাভাবে দুর্ব্বল হইয়া গতি-শক্তিতে সুপুষ্টকলেবর গর্দ্দভনন্দনের নিকট পরাভূত হইতে পারে, কিন্তু সেই দুর্ব্বল ঘোটকের পুত্র যদি খাইতে পায় তাহা হইলে সে ঘোটকেরই মত হইবে, গর্দ্দভের মত হইবে না। বংশক্রম সম্বন্ধীয় ঐ-সকল তত্ত্ব অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু ও গ্রীক প্রভৃতি জাতিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই তাহাদের শ্রেণীবিভাগ ও জাতিবিভাগের কারণ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইউরোপেও যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের মত অপরিবর্ত্তনীয় জাতিবিভাগ না থাকিলেও বিবাহ আদি ব্যাপারে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহারও কারণ "বংশ-ক্রমের অনেকটা শক্তি থাকা সম্ভব" জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের Eugenics বা প্রতিভাবিজ্ঞান এখনও যে সুসংস্থাপিত হয় নাই তাহার দুইটী কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ উহা অপেক্ষাকৃত নূতন বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ যে-সকল বিজ্ঞান পশু বা জড়পদার্থ অধ্যয়নে ব্যাপৃত তাহাদের যেরূপ সহজে মীমাংসা হয়, মানুষ যে-সকল বিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয় তাহাদের সেরূপ সহজে মীমাংসা হয় না। মানব সম্বন্ধীয় কোনও সিদ্ধান্ত মানবসমাজের অধিকাংশ বা কিয়দংশ লোকের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে। সেরূপ স্থলে, স্বভাবতই সমাজের কতক লোকে স্বার্থ বা মনোবেগের বশে সেই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ও কতক লোকে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাহাদিগের বংশ ভাল তাহাদিগের প্রতিভাবিজ্ঞানের সপক্ষে মত দিবার একটা স্বত ইচ্ছা আছে; সেইরূপ যাহাদিগের তাদৃশ বংশগৌরব নাই তাহাদিগের উহার বিপক্ষে মত দিবার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা হয়।

এই-সকল বাধা সত্ত্বেও প্রতিভা-বিজ্ঞান (Eugenics) যে দিন দিন উন্নতি করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাণিবিদ্যা (Biology) সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট প্রতিভা-বিজ্ঞানের কথাগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়। বংশক্রমের প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা নিয়তই বিস্মিত হইতে থাকেন। মানুষ ও কুকুরের ভ্রূণের উৎপত্তির এক এক কালে তাহাদের গঠনগত অসাধারণ সাদৃশ্য থাকে; অথচ এমন এক এক অদ্ভুত শক্তি ঐ দুই ভ্রূণের মধ্যে নিহিত আছে, যাহার ফলে একটী মানুষ হইবে এবং একটী কুকুর হইবে, ইহার কোনও অন্যথা হইবে না। যে নিয়ম সমগ্র জীব ও উদ্ভিজ্জ-জগতে খাটে তাহা মানুষের বেলায় খাটিবে না, ইহা হইতেই পারে না। মানবশারীর-বিধানবিদ্যা (Human Physiology) বলিয়া যে শাস্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষাই প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের উপর হইয়াছে; উহার অধিকাংশ পরীক্ষাই ইতর জন্তুদিগের উপর নির্ব্বাহিত হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষার ফল হইতে মানব-সংক্রান্ত বিধানসমূহ অনুমানের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ-সকল জ্ঞানের যাথার্থ্য প্রতিনিয়তই চিকিৎসকগণের চিকিৎসার সাফল্য হইতে প্রমাণ হইতেছে।

কেহ কেহ মানবশিশু শারীরিক গঠনে পিতামাতার অনুরূপ হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেও মানসিক ও নৈতিক গুণে যে তাহারা উহাদের অনুরূপ হইবে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু শারীরবিধান-শাস্ত্র যতই উন্নত হইতেছে ততই প্রমাণ হইতেছে যে, মানসিক ও নৈতিক গুণগুলি মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির গঠনের বিশেষত্বের উপর ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ও নৈতিক গুণগুলিরও বিশেষত্ব নির্ভর করে। আর ইহা সকলেই জানে যে, বানরের মস্তিষ্ক বানরের অনুরূপ, কুকুরের মস্তিষ্ক কুকুরের অনুরূপ এবং মানুষের মস্তিষ্ক মানুষের

অনুরূপ। শুধু তাহাই নহে, এক পণ্ডিত সুম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে, এক বংশের ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনে যথেষ্ট ঐক্য থাকে এবং অপর বংশের ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কের গঠনের সহিত যথেষ্ট অনৈক্য থাকে।

মেণ্ডেল ও তদনুগামীগণের পরীক্ষাসমূহও প্রতিভাতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। মেণ্ডেলের একটী পরীক্ষা বড়ই কৌতূহলজনক। যদি একটী কাল খরগোসের সহিত একটী সাদা খরগোসের মিলন হইয়া বংশবৃদ্ধি হয় তবে শাবকদিগের কতকগুলি সাদা ও কতকগুলি কাল হইতে পারে। ঐরূপে উৎপন্ন দুইটী কাল খরগোস মিলিত হইলে তাহাদের বংশে যে শুধু কাল খরগোসই জন্মিবে এমন নহে, কতকগুলি সাদা ও কতকগুলি কাল জন্মিবে। এ স্থলে সাদা শাবকগুলি দেখিতে পিতামাতা কাহারও মত নহে, কিন্তু পিতামহ বা প্রপিতামহীর মত। মেণ্ডেলের নিয়ম মানুষের উপর প্রয়োগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—সন্তান পিতার অনুরূপ হইতে পারে, মাতার অনুরূপ হইতে পারে, পিতামাতা উভয়ের গুণের মিশ্রণ পাইতে পারে; অথবা এ সকল না হইয়া অন্য কোনও পূর্ব্বপুরুষের মত হইতে পারে, বা তাহাদের গুণের মিশ্রণ পাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে-সকল পর্য্যবেক্ষণের উপর প্রতিভাবিজ্ঞান (Eugenics) নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আমরা উক্ত বিজ্ঞানের সপক্ষে একটী নূতন প্রমাণ দিব। আমরা দেখিব যে, যদি আমরা প্রতিভা-বিজ্ঞানের প্রধান সূত্র—"প্রতিভা বংশগত" এই কথাটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সুন্দর রূপ কারণ নির্ণয় করা যায়। ঐ সূত্রটী সত্য না হইলে ঐরূপ কখনই সম্ভবপর হইবে না। এরূপ Deductive তর্কপ্রণালী সত্য নির্ণয়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা অসঙ্গত নহে। আডাম স্মিথ স্বীয় Wealth of Nation নামক গ্রন্থে ঐরূপ তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বাক্‌ল্ এ বিষয়ের আরও উদাহরণ দিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(প্রতিভাশালীর সংখ্যাহ্রাসের কারণসমূহ)

আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি যে, জাতির মধ্যে প্রতিভাশালীর সংখ্যা ও তাহাদের উৎকর্ষের উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

আমরা এক্ষণে বলিতেছি যে, প্রতিভা বংশগত; অর্থাৎ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে। *

এই দুই প্রতিজ্ঞা হইতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটী সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে :—

সামাজিক বা চারিপার্শ্বের যে-সকল কারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবর্গের বংশবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে, সেই-সকল কারণের দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, আর যে-সকল কারণের দ্বারা প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশের হ্রাস হয় সেগুলি জাতীয় অবনতির কারণ।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের বংশ হ্রাস হইবার বা সম্যক্ বৃদ্ধি না পাইবার নিম্নলিখিতগুলি কারণ হইতে পারে :—

(১) সন্ন্যাস।
(২) সভ্যতা ও বিলাসের বৃদ্ধি।
(৩) বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি।
(৪) যুদ্ধ।
(৫) ব্যাধি।

এক্ষণে আমরা ঐ গুলির আলোচনা করিব।

(ক্রমশ)

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* "প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের বংশেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জন্মে," এরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত যথেষ্ট প্রমাণ লেখক দেন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিভা বলিতে কি পরিমাণ বুদ্ধি, উদ্ভাবনীশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা বুঝিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা দরকার; অথচ তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। কিন্তু তাহা না করিলে কোনও প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষরা প্রতিভাশালী ছিল কি-না, তাহা কেমন করিয়া স্থিরীকৃত হইবে? আমরা একবার পাঠদ্দশায় এক ফ্রেনলজিষ্টের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া ও নানাস্থান টিপিয়া বলিলেন, "তুমি বেশ গণিত জান।" তাহাতে আমার সহপাঠীরা হাসিয়া উঠিল; কারণ অঙ্কে আমি বরাবর কাঁচা। ফ্রেনলজিষ্ট মহাশয় বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেন বাপু, হাস কেন? বল ত আট নয় কত?" আমি বলিলাম "৭২।"

একতাবিধানের উপায়

কথা কহিবার রীতিটা গদ্য বলিয়া বুঝিলেই কেহ গদ্য-রচয়িতা সাহিত্যিক হয় না। আমরা না হয় সমাজ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে বুঝিলাম যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীর সমষ্টি একটি nation বা জনসঙ্ঘ; কিন্তু উহাতেই জাতীয় অভীপ্সিত ফললাভ করা যায় না। এ কথা সত্য যে, গোড়ায় এই জ্ঞানটি পরিস্ফুটরূপে থাকা চাই যে, আমরা সকল প্রদেশের সকল লোক মিলিয়া সত্য সত্যই একটি জনসঙ্ঘ হইয়া রহিয়াছি; তাহা না হইলে জনসঙ্ঘটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার দিকে দৃষ্টিই পড়ে না। আমরা সকলে মিলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে একটি জনসঙ্ঘের বিভিন্ন অংশরূপে সৃষ্ট রহিয়াছি; সকলে এক সঙ্গে মিলিত না হইলে কোন বিভক্ত অংশই কার্য্যকর হইতে পারিবে না, আমরা সকলে হাত-ধরাধরি করিয়া না উঠিলে কেহই উন্নতিলাভ করিতে পারিব না, এই-সকল কথা মনের উপর মুদ্রিত না হইলে যথার্থ স্বদেশপ্রীতি জন্মিতে পারে না, কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ আশায় বুক বাঁধিয়া রাষ্ট্রীয় মিলন সম্পাদনে ব্রতী হইতে পারে না।

যাঁহারা দুই একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া আত্মহারা হয়েন নাই, এবং সুস্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, শত প্রভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসীগণ একটি জনসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারাও এ দেশে নানা প্রকারের ধর্ম্মমত এবং ভাষাজনিত প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন যে, সকল জাতির ভাষা ও ধর্ম্ম এক করিতে না পারিলে এই জনসঙ্ঘকে রাষ্ট্রীয় মিলন ও রাষ্ট্রোন্নয়ন কার্য্যে চালিত করা অসম্ভব। ভাষা এবং ধর্ম্মের একতা না থাকিলেও যে জনসঙ্ঘের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধা যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ দিতেছি। ভূমিকা স্বরূপে মিলন সম্বন্ধে দুই একটি ভ্রান্ত ধারণার আলোচনা করিব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ব্বর সমাজে যে প্রকারের একতা বা বৈচিত্র্যহীনতা লক্ষ্য করা যায় উন্নত সমাজে সে শ্রেণীর একতা প্রার্থনীয় নহে এবং জন্মিতেও পারে না। বর্ব্বরতার চিহ্নই এই যে সকলেই প্রায় পশুপক্ষীর মত আপনাদের কাজ করিয়া যাইতেছে; এবং বংশপরম্পরায় সেই-সকল কার্য্যে বড় প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। সামাজিক নিয়ম, ধর্ম্মের মত প্রভৃতি এমন ভাবে বাঁধা পড়িয়া আছে, যে, এক সমাজের সকল বর্ব্বরকেই নীতি এবং ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একরূপ আচার এবং বিশ্বাস-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মুণ্ডাই সমান বিশ্বাসে তাহাদের বোঙ্গাগুলিকে মানিয়া থাকে. এবং সকলেই সমান দৃঢ়তার সহিত অন্য জাতির অন্নাদি পরিহার করে। আমরা এই বর্ব্বরের একতা চাহি না; এবং জনসঙ্ঘের মধ্যে যাহারা বর্ব্বর, অথবা উপযুক্ত উন্নতিলাভে আংশিকরূপে একভাবাপন্ন, তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিদ্যুৎ চালাইয়া চিন্তা এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা উৎপাদন করিতে চাই; জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া সমাজশরীরে জীবনসঞ্চার করিতে চাই।

ভাষাভেদ এবং ধর্ম্মভেদের বাধাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্য এই দুইটি বাধার সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। জনসঙ্ঘের ভাষা যদি এক হইত, তাহা হইলে যে বড়ই কাজ দেখিত, ইহা নিশ্চিত। যাঁহারা এ দেশের ভাষাভেদের প্রসার এবং গভীরতা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এ প্রভেদ তিরোহিত হওয়া অসম্ভব। ভারতের যে-কোন ক্ষুদ্র প্রদেশ হইতেও সুইট্জরল্যাণ্ড আয়তনে ক্ষুদ্র; অথচ ঐ উন্নত দেশের সুসংবদ্ধ জন-

---

তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে এই ত তুমি গণিত জান।" আমার গণিতজ্ঞতা যেরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল, অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিভা যদি সেই ভাবে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ত চলিবে না। কোন বিখ্যাত গণিতজ্ঞের পূর্ব্বপুরুষ বাজার-সরকার বা গোমস্তা ছিলেন ও হিসাব রাখিতেন বলিলে উক্ত পূর্ব্বপুরুষের গণিতবিষয়িণী প্রতিভা প্রমাণিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কেহ বলিতে পারেন কি, কালিদাস, বুদ্ধ, কবীর, হাইদার আলী, শিবাজী, কৃষ্ণদাস পাল, মহেন্দ্রলাল সরকার, সমর্থ রামদাস স্বামী, রাণাডে, প্রভৃতির বংশে প্রতিভা কোথায় ছিল? উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের মাতৃপিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদের সকলের বৃত্তান্ত ত জানা নাই; জানা থাকিলে বলা যাইত। কিন্তু ইহা একটা আনুমানিক কথামাত্র, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নহে। অজ্ঞাতকুলশীলের পুত্র প্রতিভাশালী, আবার প্রতিভাশালীর বংশধরেরা অকালকুষ্মাণ্ড, এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। —সম্পাদক।

সঙ্ঘের মধ্যে চারিটি বিভিন্ন ভাষা প্রবল রহিয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া রাষ্ট্রীয় মিলন, সে উদ্দেশ্য এই ভাষার প্রভেদে পরাভূত হইতে পারিতেছে না। একবার যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ উদ্বুদ্ধ হয়, তবে এ বাধার কথা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইবেন না। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বিকাশ যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে, তখন হয়ত বা অনেকগুলি নিকটসম্পর্কিত ভাষার মধ্যে একটি ভাষা জাতীয় ইচ্ছার প্রেরণায় অধিক প্রবলতা লাভ করিবে এবং এইরূপে এই বিপুল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র চারি পাঁচটি ভাষা প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া অধিকাংশ শিক্ষিত লোক দ্বারাই অধীত হইবে; কিন্তু জোর করিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে কেহই ভাষার একতা বিধান করিতে পারেন না।

সংস্কৃত গ্রন্থ অধিক পরিমাণে যুক্তপ্রদেশে পাওয়া যায় বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞেরা যুক্তপ্রদেশে ব্যবহৃত নাগরী অক্ষরের সহিত অল্পাধিক পরিচিত। এই অজুহাতে কোন কোন একতাপ্রার্থী ব্যক্তি ভারতবর্ষময় কেবলমাত্র নাগরী অক্ষর চালাইতে চাহেন। কৌলীন্যে এবং বয়সে যখন নাগরী অক্ষর অন্যান্য প্রাদেশিক অক্ষরের উপরে আসন পাইতে পারে না, তখন কি কোন প্রদেশেই ব্যবহৃত অক্ষরের পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর প্রচলিত হইতে পারে? অক্ষরপরিচয় হইলেই যে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিবে, ইহার প্রমাণও নাই, সম্ভাবনাও নাই। আসামের অক্ষর আমাদের অক্ষর হইতে অভিন্ন; এই সুবিধায় ক জন বাঙ্গালী আসামীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন? মহারাষ্ট্রে নাগরী বালবোধ অক্ষর প্রচলিত আছে; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা ঐ অক্ষরকে আপনার বলিয়া ভাবিতেই পারেন; বঙ্গের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও নাগরী অক্ষরের সহিত পরিচিত। জিজ্ঞাসা করি, এই সুবিধা অবলম্বনে ক জন বাঙ্গালী এবং ক জন যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী মহারাষ্ট্র ভাষা শিখিয়াছেন? আন্ধ্র দেশের তেলেগু অক্ষর এবং কানাড়ার অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অল্প; অথচ এই উভয় প্রদেশের মধ্যে কেহই কাহারও ভাষা জানে না বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। গ্রীক্ অক্ষর স্বতন্ত্র বলিয়া, অথবা ফরাসী ইটালীয় অক্ষর এক বলিয়া ক জন ইংরাজের পক্ষে গ্রীক শিখিবার বাধা অথবা ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিখিবার সুবিধা ঘটিয়াছে? অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াও ইউরোপের এক দেশের লোক অন্য দেশের ভাষা কিছুমাত্র জানে না। যে আকর্ষণের ফলে পরস্পরকে জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে, সে আকর্ষণ যেখানে জন্মিয়াছে বা জন্মিবে, সেখানে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে সহজ হইয়া উঠে। এই প্রাকৃতিক মনের টান কিসে হয়, তাহাই হইল আসল কথা,—তাহাই হইল একমাত্র কথা। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের সহিত পরিচয় লাভ করিতে কোন ব্যক্তিরই এক মাসের অধিক সময় লাগিতে পারে না; এ কথা আমি কিয়ৎ পরিমাণে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া জোর করিয়া বলিতে পারি। অক্ষরের বাধায় কখন কোন গোল উপস্থিত হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

ধর্ম্ম এখন যে ভাবে পালিত হয়, এবং ধর্ম্মের সহিত অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান যে ভাবে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মের প্রভেদ এ দেশে জাতীয় মিলনের পক্ষে একটা বিষম বাধা বটে। ঈশ্বর এবং পরলোক সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বিভিন্নরূপে অনুভূত অথবা কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু সে মতপ্রভেদে মানুষে মানুষে বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন? যে দেশে জাতি-ভেদাদির সংস্কারের সহিত ধর্ম্মমত জড়াইয়া নাই, সেখানেও ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটি মানসিক মতবাদ লইয়া বিলক্ষণ ঝগড়া এবং দলাদলি উপস্থিত হয়। এ প্রকারের বিবাদ-বিসংবাদ যে-রকমের গোঁড়ামির ফলে জন্মে, সে গোঁড়ামি ইউরোপ্ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে মনে হয়। শিক্ষার সুবিস্তার হইলে এ শ্রেণীর গোঁড়ামি ও তজ্জনিত বিবাদ এ দেশেও মন্দীভূত হইয়া আসিবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম প্রথমে যে-দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল, কৃত্রিমভাবে তাঁহারা সেই দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া, দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস হইতে আপনাদিগকে

বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই অসম্ভব কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহারা যে আপনাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহা সমাজবিজ্ঞানের ক, খ, গ, ঘ, পড়িলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। ইউরোপের লোকেরা এক সময়ে heathen ছিল বলিয়া তাহাদের ভাষা এবং ভাবের মধ্যে heathen যুগের অনেক জিনিস রহিয়া গিয়াছে। ভাষা প্রভৃতি সমূলে ধ্বংস করা চলে না, এবং প্রাচীন ঐতিহ্য পরিহাস করা চলে না বলিয়া "থর্" "ওডিন্" প্রভৃতির রাজত্ব-কালের চিহ্ন পরিত্যক্ত হয় নাই। Heathen যুগের সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য বলিয়া খৃষ্টানেরা উহা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে, কিংবা হজরত মোহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিলে বেদ, মহাভারত কিম্বা কালিদাসের কাব্য অপাঠ্য হয় না; ভারতবর্ষীয় ধাঁচায় নামকরণ ধর্ম্মবিশ্বাসকে মলিন করে না, কিম্বা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতির মাহাত্ম্যের স্মৃতি অগৌরবের বিষয় হয় না। এ দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্য সত্যই আরব কিংবা পারস্য হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশেও যখন ভারতবর্ষের রক্তসংমিশ্রণ অস্বীকৃত নহে, তখন তাঁহারা এখন ভারতবর্ষের না বিদেশের লোক? বিজ্ঞানের খাঁটি প্রমাণে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সন্তানের শরীর সমান ভাগে পিতা ও মাতার অংশ হইতে উৎপন্ন। এ অবস্থায় যে তিন পুরুষের মধ্যেই বিদেশের রক্ত অত্যন্ত অল্প হইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ স্থলে ভাষা, পরিচ্ছদ, নামকরণ প্রভৃতি বিদেশের ধাঁচায় করিতে হইবে কেন? হজরত মোহম্মদের জন্ম যদি আরবে না হইয়া ভারতবর্ষে হইত, তবে কি তিনি এ দেশের ভাষায় কথা কহিতেন না? কাহারও নাম যদি "রহিম" না রাখিয়া "করুণাপ্রসাদ" রাখা যায়, তাহা হইলে কোন প্রভেদ হয় কি?

বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে আমরা একটি সহরে একটি খৃষ্টান পরিবারের প্রতিবেশী ছিলাম। কার্ত্তিক মাসে দেওয়ালির দিন আমাদের ঘর প্রদীপ দিয়া সাজাইয়াছিলাম দেখিয়া খৃষ্টান বাড়ীর বালকবালিকারা আপনাদের গৃহে প্রদীপদান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সহসা সেই বালক-বালিকাদিগের মাতা যখন গৃহে আসিয়া এই দীপাবলী দেখিলেন, তখন তিনি বালকদিগের আনন্দে আনন্দলাভ না করিয়া যে ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, সেই হাস্যকর ভাষা কখনই ভুলিতে পারিব না। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কাণ ধরিয়া বলিলেন,—"আদমের ঘরে পাপ আনিয়াছিল সয়তান, আর আমার ঘরে আজ পাপ আনিয়াছিস্ তুই!" বিদেশী ঐতিহ্য-ইতিহাস টানিয়া আনিয়া মানুষ এমন করিয়া কৃত্রিমভাবে ভাষা গড়িতে পারে, তাহা সেই প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম। গ্রীক্ পুরাণ অবলম্বন করিয়া ইউরোপের কবিরা কাব্য রচনা করেন, এবং উহার দৃষ্টান্ত ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; মাইকেল মধুসূদন দেশের পুরাণ-ইতিহাস লইয়াই কবিতা লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে কোন প্রকার বিকৃত বিজাতীয়ত্ব এবং অযৌক্তিক অনুষ্ঠান ও আচরণ যখন সুশিক্ষার ফলে এবং সুবুদ্ধির উদয়ে দূরীভূত হইবে, তখন কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা জাতীয় একতার অন্তরায় হইতে পারিবে না।

ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এ দেশের জাতিভেদের মূল অত্যন্ত দৃঢ়। যে-সকল জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্বীকার করে না, কিংবা কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ্যশাসনে শাসিত নহে, তাহাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যাহার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া সম্প্রদায়নিষ্ঠ বা বংশনিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁধন একটুখানি শিথিল হইলেই এই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া কেহ কাহারও অন্নজল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না! এই জাতিভেদের ইতিহাস, প্রকৃতি, এবং সুফল-কুফলের আলোচনা এ প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে করা অসম্ভব। এখানে কেবল এই একটি কথারই বিচার করিব যে, এই জাতিভেদপ্রথা ভারতীয় জনসঙ্ঘের একতার পথে বাধা কি না।

এ দেশে এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়,

যাঁহারা জনসঙ্ঘের একতা প্রার্থনীয় বলিয়াই মনে করেন না। ইঁহাদের অভিমতি এই যে, ইঁহারা স্নান করিয়া, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, মানুষ নামক ঘৃণ্যজীবের স্পর্শে অশুচি না হইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন করিবেন, এবং ঐ সাধনার ফলে স্বর্গে যাইবেন অথবা ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন; অন্যান্য লোকেরা বিবাদ করুক বা একতা করুক, মরুক বা বাঁচুক, তাহাতে (অর্থাৎ এই মায়ার খেলাতে) তাঁহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা এই সাধক-দলের ব্রহ্মপরিণতি কামনা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের মতবাদ লইয়া তর্ক করাটা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করি। যাঁহারা জনসঙ্ঘের মিলনকামনা করেন, অথচ জাতিভেদ বজায় রাখিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছি। এই শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন রকমের তর্কযুক্তি ক, খ প্রভৃতির দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করিতেছি।

(ক) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যে-সকল জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং মতবাদ দ্বারা শাসিত, তাহারা বিশ্বাস করে, যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে মানুষেরা বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কাজেই এক জাতি যদি অন্য জাতিকে স্পর্শ না করে, কিংবা অন্য জাতির জলগ্রহণ করা পর্য্যন্তই যথেষ্ট মনে করে, তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে বিবাদ বা বিরোধ উপস্থিত হইবার কোনই কারণ থাকে না। ইঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে ইউরোপের নিম্নস্তরের লোকেরা এই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মানে না বলিয়াই আপনাদের ভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, এবং উচ্চ হইবার প্রত্যাশায় ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করে। আমরা এই পূর্ব্বজন্ম এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল প্রভৃতি অত্যন্ত ভ্রান্ত-সংস্কার বলিয়া মনে করিয়া থাকি বটে; কিন্তু এ কথা স্বীকার করি যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে মানুষ আপনার অত্যন্ত হীনভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে; এবং কোন প্রকার উন্নতিলাভের জন্য উৎসাহী বা উদ্যোগী হয় না। যাঁহারা রাষ্ট্রোন্নয়ন কামনা করেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর সন্তোষ এবং উদ্যোগহীনতা অশুভ বলিয়াই বিচার করিবেন। সে যাহাই হউক, আমরা কখনই আশা করিতে পারি না যে, বর্ব্বর সমাজে ধর্ম্মের মতবাদ প্রভৃতিতে যে-প্রকার একতা এবং অটলতা দেখা যায়, এ কালের শিক্ষাবিস্তারের যুগে সেই প্রকার ভাব কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে। বঙ্গদেশে যাহারা চণ্ডাল আখ্যায় অতি হেয় পদবী পাইয়াছিল, এখন তাহারা দলে দলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং শুনিয়াছি যে, কোন কোন স্থলে ঐ জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিচারকের আসনে বসিয়া অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উকিল কর্ত্তৃক "হুজুর" বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। সুবিধা পাইলে সর্ব্বত্রই যখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ পদবী লাভ করিতে ছাড়ে না, এবং উচ্চ পদ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর লোকের উপর প্রভুতাবিস্তার করিতে পারিলে সুখী হয়, তখন আর এ কথা বলা চলে না যে, কর্ম্মফলের কথা কল্পনা করিয়া যে যাহার আপনার ভাগ্য লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। আমরা যাহাদিগকে নীচ বলিয়া মনে করি, তাহারা যদি নীচত্বকে অগৌরব মনে করে, তবে কি উচ্চ-নীচের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিবে না, বিবাদ বাড়িবে না? জাতিভেদ যে আমাদের একতাবিধানের পথে বিষম অন্তরায়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

(খ) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখন যখন জাতিভেদটি আংশিকরূপে আহারাদির সম্পর্কে এবং সম্পূর্ণরূপে কেবল বিবাহে প্রতিপালিত এবং রক্ষিত হইয়া থাকে, তখন জাতিতে জাতিতে বিরোধ হইবে কেন? স্বীকার করি যে, ভারতবর্ষ হইতে বর্ণভেদ উঠিয়া গিয়াছে; এখন 'কাল বামুণ এবং কটা শূদ্র' একটা আকস্মিক বিষয়-মাত্র নয়। এ কথাও স্বীকার করি যে, এ কালের বিধি-ব্যবস্থার ফলে উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপে যে যে-পন্থা পাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিতেছে বলিয়া কর্ম্ম-ভেদের জাতিভেদও উঠিয়া যাইতেছে। বংশনিষ্ঠ প্রকৃতি বজায় রাখিবার সংকল্পে বিবাহ বিষয়ে জাতিভেদ রক্ষিত হওয়া উচিত কি না, এবং উচিত হইলেও উহা কত দূর পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে, এবং কত দূর পর্য্যন্ত প্রাচীন বাঁধন ছিঁড়িয়া দিতে হইবে, এ-সকল কথার স্বতন্ত্র বিচার করিয়া পূর্ব্বেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছি। যদি কেহ বিবাহ

এবং আহার বিষয়ে জাতিভেদ রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তাঁহাকেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহার যুক্তিসঙ্গত কার্য্য জনসঙ্ঘের একতাবিধানের পথে বাধা কি না, এবং ঐ প্রকার জাতিভেদ থাকিলে জাতিতে জাতিতে এবং প্রদেশে প্রদেশে মিলন এবং প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে কি না। প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্বজন-পরিচিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রশ্নটির আলোচনা করিতেছি।

আয়র্লণ্ডের লোক হউক, স্কটল্যাণ্ডের লোক হউক বা ইংলণ্ডের লোক হউক, তাহারা ঐ প্রদেশত্রয়ের যে-কোন স্থানে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের চিরস্থায়ী আবাস রচনা করিতে পারে, এবং ঐ আবাস-স্থানের প্রদেশটিকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে। জন্মে আইরিশ হইলেও সে ব্যক্তি অনায়াসে ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করিতে পারে, সে অনায়াসেই ইংলণ্ডে বাস করিয়া প্রাদেশিক বিভিন্নতা বিস্মৃত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীকে যদি বঙ্গের বহির্ভাগে বাস করিতে হয়, তবে কি সে এই নূতন বাসের প্রদেশটিকে অথবা ঐ নূতন প্রদেশের লোকদিগকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে? যদি আমি আমার সন্তানদিগের বিবাহের জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ খুঁজিতে বাধ্য হই, এবং ঐ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে আমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হয়, কিংবা প্রবাসবাসের সময়ে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয় যে, আমার পরিবারের কেহ প্রবাসে দেহত্যাগ করিলে মৃতের সৎকারের জন্য খাঁটি নিজের জাতির লোক কোথায় পাইব, তাহা হইলে কি কদাচ কোন প্রদেশ আমার আপনার হইতে পারে? কেহ মরিলে মড়া ফেলিবার লোক মিলিবে না বলিয়া আশঙ্কা করিয়া অনেক সরকারী কর্ম্মচারী যে উৎকল ও বিহার হইতে বঙ্গদেশে যাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। জাতিভেদের অতি দৃঢ় বাঁধনের কথা দূরে থাকুক, যদি একজন বঙ্গের ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি তিনি কর্ম্মক্ষেত্রের প্রদেশটিকে আপনার বলিয়া ভাবিতেন না? বিহারী এবং ওড়িয়া আমাদের কেহ নহে বলিয়া মনে করিয়া থাকি; এবং সেই জন্যই ঐ সকল প্রদেশের সহিত কদাচ আমাদের সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে না। অসার দম্ভপ্রিয় বাঙ্গালী বলিতে পারেন যে, আমরা উন্নততর বলিয়াই বহিঃপ্রদেশের লোকদিগকে তুচ্ছ করিয়া থাকি, এবং সেই জন্যই মনের জ্বালায় ঐ প্রদেশের লোকদিগের মনে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ জন্মে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কি অনুন্নত অশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ঐরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন? অনুন্নত ব্রাহ্মণবংশের সহিতও কি উন্নত ব্রাহ্মণেরা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কিংবা সৌজন্যের সহিত আচার-ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন? সকল সুশিক্ষিত কিংবা পাস-করা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই কি উৎকলের সুশিক্ষিত অথবা পাস-করা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উন্নততর? পরীক্ষা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না, যাহাদের সহিত আহারাদিতে একত্রে মিলিত হইয়া সামাজিকতা করা চলে না, তাহাদের প্রতি কদাচ প্রাণের টান জন্মিতে পারে না। জাতিভেদ জিনিসটি স্বর্গলাভ এবং ব্রহ্মত্বলাভের যতই উপযোগী হউক, উহা যে সামাজিক উন্নতির পথের কণ্টক, জাতীয় মঙ্গল অনুষ্ঠানের মস্তকে অভিসম্পাত, এবং জনসঙ্ঘের মিলন স্থাপনের পক্ষে ঘৃণিত অন্তরায়, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

(গ) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কোন-না-কোন রূপে মানব-সমাজে জাতিভেদ থাকিবেই; ইউরোপে ধনী দরিদ্র লইয়া জাতিভেদ আছে, এবং ঐ জাতিভেদ এ দেশের জাতিভেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদার্থ। এ কথার উত্তরে প্রথমে বলিতে পারি যে, যদি জাতিভেদ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যে-কোন প্রকারে উহা থাকিবে স্বীকার করিলেও উহা রক্ষা করিবার অনুকূলে কোন কথা বলা চলে না। সমাজের অনেক পাপই মানবের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী বলিয়া সন্দেহ হয়; তাই বলিয়া কেহ পাপের প্রশ্রয় দিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, যখন প্রাকৃতিক নিয়মে ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ হইবেই হইবে, তখন সে জাতিভেদ কেবল ইউরোপেই আছে, না ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি

জাতিভেদের দেশেও উহা সত্যযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে? "ধনী দরিদ্রকে উপেক্ষা করে ও পীড়ন করে," "অর্থ থাকিলেই মানুষের অহঙ্কার জন্মে," "অর্থ থাকিলেই দুর্ব্বল বলবান্ হয় এবং মূর্খ পণ্ডিত বলিয়া গণিত হয়," এ-সকল প্রবচন কি ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া চাণক্যের নীতিগ্রন্থ পর্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই না? এমন কোন্ যুগ ছিল, যখন রাজার দ্বারে গুণবান্ পণ্ডিতেরা প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেন না, এবং রাজার অজস্র স্তুতিবাদ গাহিতেন না? বৈদিক যুগের গৃহ্যসূত্রের ব্যবস্থায় কি নাই যে ব্রাহ্মণের গৃহেও রাজা অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে নিজে জল লইয়া রাজার পা ধোয়াইয়া দিতে হইবে? সুরশ্রেষ্ঠদিগের অংশে রাজার উৎপত্তি বলিয়া কোন্ ব্রাহ্মণ না রাজাকে পূজ্য বিবেচনা করিতেন? ধন অর্থ যখন ক্ষমতা, তখন কোন সমাজেই কোন যুগেই ধনীর প্রভাব অল্প বলিয়া লক্ষিত হয় না। যাহারা সুশিক্ষাসত্ত্বেও কাপুরুষ, তাঁহারা সেকালে-একালে, স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বত্রই নীচ লোভের খাতিরে ধনীর গোলাম হইয়াছিল, এবং হইয়া থাকে; তাহা না হইলে ইউরোপেই হউক, আর ভারতেই হউক, যথার্থ মাহাত্ম্যের কাছে ধনীকে মাথা নোয়াইতেই হয়। সুশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনী নহেন, তাঁহারা যদি নির্ব্বোধ না হয়েন, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা ধনীদিগের সহিত অনেক বিষয়ে সংস্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন। যে-সকল ভোগের বা লোভের সামগ্রী অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ক্রীত হয়, হয়-ত বা সে-সকল পদার্থের ব্যবহার ধনীর পক্ষে কথঞ্চিৎ স্বাভাবিকভাবেই দোষযুক্ত নয়। কিন্তু দরিদ্রেরা যদি সামাজিক সম্মিলনে ধনীর দলের সহিত মিশেন, তাহা হইলে অলক্ষ্যে তাঁহাদিগের নিজের বা তাঁহাদের সন্তানদিগের মন ঐ ভোগবিলাসের পদার্থাদির দ্বারা চালিত বা উদ্বিগ্ন হইতে পারে। তাহা হইলেই অলক্ষ্যে দরিদ্রের ভাগ্যে অনেক নৈতিক অধোগতি ঘটিতে পারে। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক দরিদ্রকেই মাথা উঁচু করিয়া ধনীকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রে প্রভেদের সকল দেশেই এ নৈতিক সুশিক্ষার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় কথা এই যে, যে দেশে আমাদের মত বিভাগ নাই, কিন্তু ধনী-দরিদ্রে জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা উল্লেখ করি, সে দেশে কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের জাতিভেদ সত্ত্বেও জনসঙ্ঘের একতা পূর্ণরূপে রহিয়াছে। ঐ প্রভেদ অপ্রার্থনীয় বলিয়া বিচারিত হইলেও প্রমাণিত হইল না যে জাতীয় একতাবিধানের পক্ষে ঐ প্রভেদ একটা বিষম রকমের বাধা। ধনলাভ করিয়া সকলের পক্ষে ধনী বলিয়া স্বীকৃত হইবার পথ যে উন্মুক্ত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু গুণে বড় হইলে মানুষে সভাসমিতি করিয়া গুণীকে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নীত করিয়া দিবে, এবং গুণহীনতার জন্য উচ্চজাতির লোককে নীচজাতির মধ্যে বসাইয়া দিবে, ইহা কেহ কোন প্রকারে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে না। জাতির সহস্র সহস্র লোকের দোষ গুণের এই পরীক্ষা কে লইবে, এবং এই পরীক্ষায় পাস বা ফেল হওয়া কে কে মাথা পাতিয়া লইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? মনকে চোখ ঠারিবার জন্য যাঁহারা এই-সকল অসম্ভব কথা কল্পনার বলে রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তার্কিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে থাকুন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় কাহারও কিছুমাত্র উপকার হইবে না।

জাতিভেদ অনুসারে ব্যবসায়-ভেদ হইয়া এক সময়ে যদি উহা দ্বারা শিল্পাদির উন্নতি হইয়াছিল, এখন আবার তেমনি ব্যবসায়-ভেদের নূতন বিধিবিধান সৃষ্ট হইবার দিনে উহা তেমনি আমাদের সকল উন্নতির বাধা হইয়া রহিয়াছে। আমরা যদি নীচ স্বার্থপরতার অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া জ্ঞানের শুভ্র আলোকে বসিয়া রাষ্ট্রোন্নয়ন সংকল্পে প্রীতির মন্ত্র জপ করিতে পারি, তাহা হইলেই এ কণ্টক, এ বাধা, এ অভিসম্পাত দূরীভূত হইতে পারিবে, নচেৎ নহে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পল্লীচর্য্যা-বিধান

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসীরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ এবং হীনবল হইয়া

পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্প সমুদয়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসীগণের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্যই আমরা ক্রমশঃ দীন হীন হইয়া পড়িতেছি; কারণ—(ক) সকল দেশেই পল্লীবাসীগণ সমাজের প্রধান বল ও অবলম্বন স্বরূপ; (খ) আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী; সুতরাং নগর অপেক্ষা গ্রামগুলিরই লোকসংখ্যা এবং সমাজ-শক্তি অধিক; (গ) অতীত কালে পল্লীগ্রামগুলিতেই আমাদের সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল; ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মত নগরগুলিকে অবলম্বন না করিয়া পল্লীগ্রাম সমূহেই পরিপুষ্ট হইবে, তাহা না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের পল্লীবাসীগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই; সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। দরিদ্র এবং দুর্ব্বল কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী একক হইয়া কাজ করিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। এই মূল সূত্র মনে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(ক) **কৃষিবিষয়ক**—একে একে স্বতন্ত্রভাবে মহাজনের নিকট অধিক সুদে কর্জ্জ না লইয়া গ্রামের সকল কৃষক মিলিত হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্জ্জের দায়িত্ব লইয়া যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী গঠন করিবে। এই উপায়ে তাহারা অল্পসুদেই মহাজনের নিকট কর্জ্জ পাইবে; সকল কৃষকগণের অর্থসাহায্যে পাইকারী দরে শস্যের বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা, এবং গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন, চিকিৎসা ও সুস্থ সবলকায় বৎস উৎপাদনের উপায় বিধান করিতে হইবে; সাধারণ গো-শালা স্থাপন করিয়া গোপগণকে সমবেত ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধের বিশুদ্ধি রক্ষা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) **শিল্প বিষয়ক**—শিল্পীগণ ব্যক্তিগত ভাবে পাইকারদিগের নিকট দাদন না লইয়া মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করিবে, এবং পরস্পরের কর্জ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পসুদে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা করিবে; পরস্পরের অর্থসহায়তায় তাহারা অধিক মূল্যের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) **বাণিজ্য বিষয়ক**—কৃষকগণ ব্যক্তিগত ভাবে দালাল ও পাইকারগণের নিকট শস্যাদি বিক্রয় করিয়া আপনাদের ন্যায্য লাভ হইতে প্রায়ই বঞ্চিত হয়, ইহার প্রতিকার স্বরূপ সকলে মিলিয়া পাইকারী দরে সমবেত-প্রণালীতে শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; শস্যের অবাধ রপ্তানি সংযত করিতে হইবে; খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বাণিজ্যোপযোগী শস্যের আবাদ হ্রাস করিতে হইবে; সাধারণ শস্য-গোলা স্থাপন করিয়া শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সাধারণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীগণের নিত্য-আবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া লাভ না রাখিয়া পাইকারী দরেই পল্লীগ্রামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামজাত শিল্পদ্রব্যাদির ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কগণ কর্ত্তৃক বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাবৎকাল বিক্রয় না হয় তাবৎকাল শিল্পীগণকে আহার্য্য ও বস্ত্রাদি কর্জ্জ দিতে হইবে; মেলা ও হাটে গ্রাম্য কৃষি- এবং শিল্প-জাত দ্রব্যসামগ্রীর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) **শিক্ষা বিষয়ক**—গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবহারিক বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে আপনার দৈনিক হিসাব লিখিতে এবং সংবাদপত্র পাঠ করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কৃষিক্ষেত্রে

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে; কারখানায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্যপ্রণালী প্রচার করিতে হইবে; ব্যয়সাপেক্ষ কৃষিযন্ত্র, সার ইত্যাদি অথবা শিল্পকার্য্যের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ-দ্রব্য-সামগ্রী সমবেত ভাবে ক্রয় করিবার সুযোগ বিধান করিতে হইবে; রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি লোকশিক্ষার অমূল্য গ্রন্থগুলির চিত্রশোভিত, সুখপাঠ্য আধুনিক সংস্করণ সমুদয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে; স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপন করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ পুস্তক রাখিয়া জনসমাজে ঐগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার দেশীয় অনুষ্ঠানগুলিকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে; পল্লীগ্রামে ফকির, ভিক্ষুক এবং বৈরাগীর গান ও ছড়াগুলি যাহাতে নূতন সমাজ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) **স্বাস্থ্য বিষয়ক**—পল্লীবাসীগণের সমবেত উদ্যোগ ও উদ্যমে গ্রামের বন-জঙ্গল পরিস্কার, নদী, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার সাধন, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী কূপাদি খনন ও সেইগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারিভয়ের সময়ে রোগিচর্য্যা এবং রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; দেশের গাছ-গাছড়া ইত্যাদির গুণাভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহজ এবং সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে; পল্লীগ্রামবাসীগণের শ্রম-ময় জীবনকে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য পল্লী-ক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতির উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

এই সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুল বিস্তৃত হইয়া আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠ কল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগ বিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত, ধনী এবং জমিদারবর্গকে মুক্ত-হস্ত ও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

গাঁদাফুলের আত্মকাহিনী

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে সময়োপযোগী করিবার জন্য—সংস্কৃত করিবার জন্য—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে সমাজের সর্ব্বত্র জাগরণের চিহ্ন ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। বাঙ্গালার নানাস্থানে বহুবর্ণের সভাসমিতি স্থাপিত হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ও সাধারণে প্রচার করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সদ্গোপ, সাহা, সুবর্ণ-বণিক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনেকেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই উন্নতির মূল। চিরকাল লোকে পরপদানত রহিবে কেন? এই জন্যই আপনাপন সম্প্রদায়কে উন্নত করিয়া সমাজমধ্যে উচ্চতর স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। ইহা অবশ্য শুভলক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমরা অবশ্য উদ্ভিদ-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের মধ্যেও উচ্চ নীচ ভেদ না আছে তাহা নহে। সুতরাং মহাজনদিগের পথ অনুসরণে আমাদিগেরই বা দোষ হইবে কেন? আমরাও ত অনেককাল ধরিয়া এই বাঙ্গলাদেশেই লালিত পালিত হইতেছি। অতএব আমি যদি নিজ সম্প্রদায়ের গৌরবকাহিনী অল্পবিস্তর কিছু বর্ণনা করি তাহা হইলে লোকে আমাদের এই অপূর্ব্ব-কাহিনী না শুনিবে কেন?

জাতিতে উদ্ভিদ্ হইলেও অশ্বত্থ, বট, শাল প্রভৃতির ন্যায় আমরা উচ্চ নহি, একথা স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও হস্তী অপেক্ষা গোজাতির আদর ও প্রতিপত্তি কম হয় নাই। গুণ থাকিলেই লোকের নিকটে সম্মান লাভ করা যায়। আমরাই বা বঞ্চিত হইব কেন?

বেদ ও জেন্দাবেস্তাদি প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে

আর্য্যজাতির আদি-নিবাস ছিল মধ্য এসিয়ায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমাদিগের আদি বাস-ভূমির সন্ধান করিতে পারি নাই। কেহ বলেন আমরা চীন হইতে এদেশে আসিয়াছি। আদি-নিবাস সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে আমরা এখন আর্য্য-দিগের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি। কুসুমফুল নামক আমাদিগেরই এক সম্প্রদায় জাতি আদি-নিবাস এই ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে এসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। * সৌখীন ফরাসীদেশেও উহার রংএর বিন্দুমাত্র আদর কমে নাই।

পূর্ব্বকালে এই বাঙ্গালাদেশেইআমাদিগের কত আদর ছিল। লোকে আদর করিয়া আমাদিগকে চয়ন এবং দেবপূজার জন্য ব্যবহার করিত। তখন এত সব নার্সারি ছিল না। কাজেই গোলাপের কলম টবে চড়িয়া গৃহ-স্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিত না। আশ্রয়প্রার্থী উপযাচককে প্রত্যাখ্যান করাও ত অভদ্রতা। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এখন একটু স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এই আশ্রয়দানই আমা-দিগের কালস্বরূপ হইয়া পড়ে। রূপের মোহিনী মায়ায় গৃহস্থ মুগ্ধ হইয়া যায়। গৃহে কোন কোন কুটুম্বের স্থান হইতে একবার আরম্ভ হইলে যেমন ভ্রাতুষ্পুত্রাদি পরি-জনবর্গকে ক্রমে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়, আমরাও সেইরূপ গোলাপ, এমন কি কাঠগোলাপদিগকেও ক্রমে পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই। রূপেগুণে আমরা এই-সকল কাঠগোলাপ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি, কিন্তু পোড়া অদৃষ্টের দোষে গৃহে স্থান পাই না। আমরা বেল, জুঁই, প্রভৃতির ন্যায় দুগ্ধফেননিভ শুভ্র নহি, কিন্তু আমাদিগের অনেক জাতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বটে। আমাদিগেরই এক সম্প্রদায় গোলাপের বর্ণ অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদিগের অধিকাংশেরই বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য। পূর্ব্বে লোকে মালা গাঁথিয়া আমাদিগকে গলদেশে ধারণ করিত; এখন কিন্তু উৎসব উপলক্ষে সদর দরজায় ও বিবাহ বাটীতে ছাদনা-তলায় কদলী বৃক্ষের উপরে আমাদিগকে স্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার বারান্দায় দেবদারু ও নারিকেল পত্রের উপরে আমাদিগকে রক্ষা করে। আমাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায়। গোলাপের কথা দূরে থাকুক জবাফুলও এরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে সম্মত হয় কি না সন্দেহ।

এ পোড়া দেশে ত গুণের আদর নাই; লোকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। এই বাঙ্গলাদেশে বহুকাল ধরিয়া বস-বাস করিলেও আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি যে—

অল্পানামপি বস্তুনাম্ সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

তাই আমরা বহুসংখ্যক একত্র বসবাস করিয়া থাকি। আমরা পুরুষানুক্রমে জগতে এই সত্য—একতার উপকার—প্রচার করিয়া আসিতেছি, কিন্তু বাঙ্গালীরা এতদূর দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা অসার সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আবশ্যক বিবেচনা করে না। যাঁহারা আমাদিগকে প্রত্যহ দেখিয়া থাকেন, এমন কি যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দেবপূজার জন্য আমাদিগকে নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনেকেই জানেন না যে আমরা একটিমাত্র ফুল নহি। সাধারণ অবুঝ লোকে যাহাকে একটিমাত্র গাঁদাফুল বলিয়া মনে করে উহা যে বহুসংখ্যক ফুলের সমষ্টি—একএকটি পুষ্পগুচ্ছ (inflorescence) তাহা কি কেহ লক্ষ্য করেন?

মনুষ্যসমাজে যেমন উন্নত অবনত দুই সম্প্রদায় থাকে, আমাদিগের মধ্যেও সেইরূপ আছে। যাহারা অযত্ন-সম্ভূত, স্বভাবজাত, তাহারাই "ফকিরে বা টিরে" নামে কথিত হইয়া থাকে; আর যাহারা গৃহস্বামীর যত্নে প্রতি-পালিত হয়, কলম হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি তাহারাই "চাপ" গাঁদা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

আমরা অতি নিরীহ জাতি, হিংসাকরা কাহাকে বলে তাহা আদৌ জানি না। গোলাপফুল তুলিবার সময় একটু অসাবধান হইলেই কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়,

* Safflower (কুসুমফুল) (originally from India) furnished a dye soluble in alcohol but is now cultivated in Asia, America and nearly over the whole of Rurope."—History of the Vegetable Kingdom by Rhind.

কিন্তু আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি, আমাদিগের কেহ কখন কাহারও সহিত এরূপ অভদ্রব্যবহার করে নাই। আমরা নিষ্কণ্টক বলিয়া শিশুরা পর্য্যন্ত আমাদিগের ঘাড় মোচড়াইয়া পিতামাতার ক্রোড় হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে। আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ যে, মার কোল জুড়িয়া আজীবন একস্থানে বাস করিব পোড়া অদৃষ্টে সে সুখ লেখে নাই। আমরা যখন আনন্দে ভ্রাতাভগিনীগণ মিলিয়া মাতার কোল আলো করিয়া থাকি, পোড়া লোকের সে দৃশ্য চক্ষুশূল হইয়া উঠে। কেহবা মালা গাঁথিবার জন্য, কেহবা গেট অর্থাৎ ফটক সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে, আবার কেহবা বিনা কারণে আমাদিগকে বৃন্তচ্যুত করে। দুঃখের কথা বলিব কি, মধ্যে মধ্যে বেড়া ভাঙ্গিয়া গরুবাছুরেরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হয়। গৃহস্থ তাড়া না করিলে হয়তঃ একদিনেই আমাদিগের কোন কোন সম্প্রদায়কে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে হইত।

এরূপস্থলে আমাদিগের বাঁচিবার একটা উপায় ত চাই; বংশরক্ষা করা ত আমাদিগের পক্ষেও আবশ্যক বটে। গোলাপের ন্যায় আমাদিগের আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র নাই। আকন্দ, করবী, কল্কে ফুল প্রভৃতির ন্যায় যদি বিষাক্ত আঠা থাকিত তাহা হইলেও পশুর গ্রাস হইতে আমাদিগের অনেকেই সহজে রক্ষা পাইত। ভগবান তাহারও একটা সুব্যবস্থা করেন নাই। রামতুলসীর ন্যায় একটা তীব্রগন্ধ আমাদিগের আছে বটে, কিন্তু উহা প্রশস্ত অস্ত্র নহে। গন্ধভাদালের ত অতি উৎকট গন্ধ আছে, কিন্তু তাহাতে গবাদি পশুর গ্রাস হইতে উহা মুক্তি পায় কি?

ভীষণ জীবন-সংগ্রামে যে আমরা এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছি সে কেবল আমাদের বাপ-মার বুদ্ধির জোরে। স্ত্রী-ইলিশ যে একেবারে লক্ষ লক্ষ অণ্ড প্রসব করে তাহা ত সকলেই জানেন। বহু শত্রুর কবল হইতে বংশরক্ষা করার একমাত্র উপায়—অসংখ্য সন্তান প্রসব করা। আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ যে এ সত্য না জানে তাহা নহে। এইজন্যই ঝড়বৃষ্টি কোয়াসা প্রভৃতিতে অনেক সন্তান অকালে গতাসু হইলেও অবশিষ্টেরা আপন আপন কুল রক্ষা করিতে পারে। আমরাও অনেকগুলি ভ্রাতাভগিনী একত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। মা আমাদিগকে শিশুকালে একটা আবরণের মধ্যে (involucre of bracts) লুকাইয়া রাখেন। ক্রমে আমরা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকি ততই ঐ আবরণের আড়াল আমাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। কাজেই একদিন উহাকে বিদীর্ণ করিয়া আমাদিগকে উন্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হইতে হয়। স্ত্রীজাতি যে অল্পবয়সেই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়, একথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদিগের ভগিনীগণও রূপের ছটায় সকলকে শীঘ্র মোহিত করিয়া থাকেন। আপনারা ত আমাদিগের কোন খবর রাখেন না, নতুবা সহজেই আমাদিগকে চিনিতে পারিতেন। আপনাদেরই বাঙ্গালী বাবুরা যাহাদিগকে একএকটি হরিদ্রাবর্ণ পাপ্‌ড়ি মনে করেন উঁহারা আমাদিগের এক-একটি ভগিনীর ওড়না মাত্র। ভগিনীর সংখ্যা অগণ্য শুনিয়া অবাক্ হইবেন না; এরূপ না হইলে আমাদের বংশ রক্ষা হইত কি? কারণ আমার ভগিনীগণ কাকবন্ধ্যা। অর্থবোধ হইল না বুঝি? উঁহারা জীবনে একের অধিক সন্তান প্রসব করেন না। শশা, লাউ প্রভৃতির ফুলে গর্ভকোষটি (ovary) ফুলের নীচে থাকে, তাহা ত অবশ্য দেখিয়াছেন? আমার ভগিনীগণও সেইরূপ বীজ-কোষ ধারণ করেন। হায়রে ছোটলোকের ঘরেই বেশী ছেলে হয়? উচ্চ বংশে রাজারাজড়াদের ঘরে একটি জন্মিলেই যথেষ্ট।

"বরমেকো গুণী পুত্রঃ ন চ মূর্খঃ শতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি" ॥

আমাদিগের বংশেরও এই নিয়ম। একটি ফুল হইতে একটিমাত্র ফজ্‌লী আম জন্মিয়া থাকে।

সভ্যসমাজে ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত নহে। আমরাও ত অসভ্য নহি, যে, ভগিনী হইয়া আপন ভ্রাতাকে বিবাহ করিব। এরূপ কদর্য্য বিবাহের ফলে যে পরিপুষ্ট দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মিতে পারে না তাহা আমাদিগেরও অবিদিত নাই। আমরা কুলীনকন্যা; সেইজন্য স্বামীগৃহে গমন করা আমাদিগের ভাগ্যে ঘটে না—এই পর্য্যন্ত। আমাদিগের বিবাহের

জন্য অনেক ভ্রমর ঘটক ও কীট দূতীকে সময়কালে আমাদের গৃহে আসিতে হয়। প্রত্যেক ভগিনী পৃথক পৃথক থাকিলে দূতী ও ঘটকের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বুদ্ধি করিয়া আমরা সকল ভগিনী একত্র থাকি। কাজেই উহারা দূর হইতে আমাদিগের সোনার-বরণ ওড়নাগুলি দেখিতে পায় ও চিনিতে পারিয়া নিকটে আসে। স্বামীর দান আমরা উহাদিগের নিকট হইতে রেণু আকারে গ্রহণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করি। এই সময় হইতেই আমরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে গমনের চেষ্টা করিয়া থাকি। বিবাহের পর কোন্ কুল-স্ত্রী পরপুরুষের সংস্রবে আসে? আমাদিগের কোমলকান্ত দেহ মুশড়িয়া যায়, আর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ থাকে না। পিপীলিকারাও ত বিবাহের পর স্ব-ইচ্ছায় পক্ষছেদন করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়া থাকে। আমরাও সেইরূপ বিবর্ণ হইতে থাকি। আমাদের জননী প্রথমে অনেকগুলি কন্যা প্রসব করিয়া শেষে বহুসংখ্যক যমজ-সন্তান (hermaphrodite flowers) প্রসব করিয়া থাকেন। সেই-সকল যমজ-সন্তানের প্রত্যেকের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা থাকে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে প্রথমবার কন্যার ন্যায় এক-একটি পৃথক পৃথক পুত্র সন্তান (male flower) প্রসব করা আমাদের মাতার ভাগ্যে ঘটে না।

আমরা শরৎ ও হেমন্তকালেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদিগের জাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা একত্রে পৃথিবীর সমুদায় উদ্ভিদসংখ্যার দশভাগের একভাগ হইবে।* ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারেন আমাদের বংশ কিরূপ বিস্তৃত। সুসভ্য আর্য্যগণের বংশও এরূপ বিশাল কি না সন্দেহ। আমাদের এই বংশে কত কত মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। জিনিয়া, গাঁদা, সূর্য্যমুখী আমাদিগেরই নিকট-জ্ঞাতি। আমরা বহুসংখ্যক ফুল একত্র মিলিয়া বাস করি; এইজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের জাতীয় নাম রাখিয়াছেন মিলিতপুষ্প বা Compositae. এই গুণ আম, জাম প্রভৃতি উচ্চজাতীয় বৃক্ষসমাজেও দেখা যায় না, এমন কি পুষ্পশ্রেষ্ঠ গোলাপ, ম্যাগ্নোলিয়া, চম্পক, বেল, জুঁই প্রভৃতি উচ্চতম সমাজেও এ গুণ কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না। ইহা ভিন্ন পরোপকারের জন্যও আমরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবলমাত্র শেফালিকা পুষ্প হইতেই যে লোকে জরদ রং পায় তাহা নহে, আমাদিগের নিকট-জ্ঞাতি কুসুমফুল হইতেও উহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ফ্রান্সদেশে এ রংয়ের বিশেষ আদর। আমরা সংসারের আরো অনেক উপকার করিয়া থাকি। সর্দ্দি ও কাশি রোগে আমাদের কেহ কেহ (Tussilago) প্রায়ই লোকের উপকার করিয়া থাকে। আহতস্থানের উপকার করিতে আমাদের আর্ণিকার (Arnica) মত কেহ নাই। কাটা ঘা (cuts) আরোগ্য করিতে আমাদের বহু জ্ঞাতিভ্রাতাকে (Calendula) যে দধীচি মুনির ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিতে হয় তাহা কে না জানে! লোকে যে "কলের তেল" নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহার অভাব হইলে বাঙ্গালীদিগের স্নান ও আহারের একান্ত অসুবিধা ঘটে, সেই তৈল উৎপাদনেও আমাদের অনেককে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়। আমাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা সোরগোঁজা ঘানিগাছে ও কলে নিষ্পেষিত হইয়াও পরোপকার করিতে বিমুখ হন না। এই জন্যই সস্তা "সরিষাতৈল" বাজারে দেখা দিতে পারে। এত করিয়াও আমরা লোকের মন পাই না। এই বড় দুঃখ। অন্ধকার রাত্রিতে আমাদিগের দেহ হইতে যে জ্যোৎস্না পোকার ন্যায় একপ্রকার আলোক নির্গত হয় তাহাও কম আশ্চর্য্য নহে। এ গুণ উচ্চশ্রেণীর পুষ্পে আছে কি? এখন আপনারা সকলে স্থির করুন উদ্ভিদসমাজে আমাদের স্থান কত নিম্নে হওয়া উচিত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

* "It is the largest of all natural orders, containing one-tenth of the known plants of the world."—Elementary Botany by Edmonds.

আমেরিকার প্রজাতন্ত্র *

(James Bryceএর 'American Commonwealth' অবলম্বনে লিখিত)

বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্রের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। এরূপ মতাবলম্বীদিগের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্ত্তমান কালে আমেরিকাতে যেরূপ প্রকৃষ্ট ও বিশাল আয়োজনের সহিত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, প্রাচীন, মধ্য, ও বর্ত্তমান সময়ে কখনও, কোথাও এরূপ হয় নাই। এই সমস্ত দার্শনিকগণের মনে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়—"যে দেশ এত অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির এত উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে সে জাতির উন্নতির কারণ কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের শাসনপ্রণালীতে আরোপ করা যায়।"

বাস্তবিক আমেরিকার উন্নতি অবনতির কারণ কতটা আমেরিকার বর্ত্তমান শাসনপ্রথার ঘাড়ে চাপান যায় এ একটী জটিল সমস্যা। ইহার মীমাংসা করিতে গেলে বোধ হয় নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্রসর হইলে কতকটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক সাধারণতঃ প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীতে কি কি দোষ আরোপিত হইয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ সেই দোষগুলি কি পরিমাণে আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে বর্ত্তমান; এবং তৃতীয়তঃ দেখা প্রয়োজন আমেরিকার শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা কোথায়।

প্রথম কথা—সাধারণতঃ—প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর কি দোষ :—

প্লেটো (Plato) হইতে হেনরী মেন (Henry Maine) ও রবার্ট লো (Robert Lowe) পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাশীল শাসনবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর নিম্নলিখিত কয়েকটী দোষ বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) আকস্মিক বিপদে অদৃঢ়তা—অর্থাৎ রাজ্যে কোন গুরুতর বিপদ সহসা উপস্থিত হইলে, রাজতন্ত্র অথবা যথেচ্ছাচার-শাসনপ্রণালীর ন্যায় প্রজাতন্ত্র তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতে অশক্ত।

(২) প্রজাতন্ত্রের চঞ্চলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা—ক্রমাগত মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কার্য্য-পরিচালন-নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বিশেষতঃ যে দেশে শাসনপদ্ধতিতে এরূপ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটে বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট সে দেশের মান ও প্রতিপত্তি কিছু হ্রাস হইতেই হইবে।

(৩) স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং অবাধ্যতার ভাব জনসাধারণের মনে প্রবেশলাভ করে। এই প্রকার বশ্যতা স্বীকারে অনিচ্ছা ক্রমশঃ অন্তর্বিবাদের সূচনা করে এবং কালে কালে এই আত্মকলহ এরূপ বিকটভাব ধারণ করে যে তখন সমগ্র-দেশের কল্যাণের জন্য দেশশাসনের ভার একজন প্রভুত্ব-পরিচালক প্রতিভা-সম্পন্ন সেনানায়কের হস্তে ন্যস্ত হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারি ফলে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান।

(৪) ঐ শাসনপ্রণালীতে সকলকে সমপদস্থ অর্থাৎ তুল্যরূপ মর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার স্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে জন্মে। এই স্পৃহাই পরশ্রীকাতরতার মূল। এরূপ প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তিষ্ঠিতে পারে না।

(৫) একদল অন্যদলের চেয়ে সংখ্যায় কিঞ্চিন্মাত্র অধিকতর এই অজুহাতে প্রজাতন্ত্রের স্থানে সেই দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে, এবং যে দলে অল্পতর সংখ্যা সেই দলের উপর যথেচ্ছাচার করিতে ত্রুটী করে না।

(৬) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা। এরূপ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর লোকদিগকে কোন জনপ্রিয় বিদ্রোহোদ্দীপক নেতা অনায়াসেই মাতাইয়া তুলিতে পারে। এই শ্রেণীর লোকের অভাব ও দুঃখ অনেক, কিন্তু তাহাদের অভাবের কথা তাহারাই সকলের চেয়ে কম জানে। তাহাদের এই দৈন্যের কথা বুঝাইয়া সহজেই তাহাদিগকে উন্মত্ত করা যায়।

* গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

এখন দেখা যাক্ এই দোষগুলি কি পরিমাণে আমেরিকার শাসনপ্রণালীতে বর্ত্তমান।

প্রথম অভিযোগ—আকস্মিক বিপদে অদৃঢ়তা। আমেরিকা স্বাধীন হইবার পরে এরূপ আকস্মিক বিপদের কথা প্রধানতঃ দুইবার ইতিহাসে পড়িয়াছি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে কয়েক-বৎসরকাল রাজনীতি-কৌশলঘটিত গোলমালের পর যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার লড়াই বাধিল সেই যুদ্ধের ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে এ বিপদে আমেরিকার রাজনীতিবিশারদগণ সময়োচিত দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার চেয়েও ঘোরতর বিপদ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের যুক্ততাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আমেরিকার উত্তর প্রদেশসমূহ এবং দক্ষিণপ্রদেশসমূহের মধ্যে ক্রীতদাসপ্রথা বজায় রাখা বা উঠাইয়া দেওয়া লইয়া যে দারুণ অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই সাংঘাতিক অন্তর্বিবাদ চলিয়াছিল। এ সময় ইংলণ্ডে পামার্স-টন গ্লাডষ্টোন প্রমুখ মনীষীগণ সকলেই যেন দিব্যচক্ষে যুক্তরাজ্যের ধ্বংসের প্রারম্ভ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইল। সমর যখন তুমুলভাবে বাধিয়া উঠিল এবং বাস্তবিকই যখন ওয়াশিংটন-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ধ্বংসোন্মুখ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন উত্তরদেশসমূহ যুক্তরাজ্যের সম্মিলিত অবস্থা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যে প্রকার ক্ষিপ্রতা ও স্থিরসংকল্পের সহিত বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব অবাক্ হইয়া আমেরিকার দিকে তাকাইয়াছিল। এই সংগ্রামে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টপ্রমুখ শাসন-বিভাগ যে প্রকার সেনাদলের পর সেনাদল সজ্জিত করিয়া এবং অজস্র প্রাণক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়া সমগ্র দেশের একত্ব বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর ঘাড়ে আকস্মিক বিপদে যে অদৃঢ়তারূপ দোষ সচরাচর আরোপিত হয়, সে দোষ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রে প্রযোজ্য নহে। জাতীয় চরিত্র সম্যক্‌ভাবে গঠন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একাগ্রতা এই দুইটী উপকরণ বর্ত্তমান থাকিলে এরূপ বিপৎকালে শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্রদেশ উন্মত্ত হইয়া উঠে। এটী জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভর করে—কোন্ জাতি কি প্রকার শাসনপ্রণালীর অধীন তাহার উপর ততটা নির্ভর করে না। Charles the Bold অর্থাৎ সাহসী চার্লসের বিরুদ্ধে সুইসদিগের সংগ্রাম; ফ্লোরেন্সবাসীগণ যে ভাবে পঞ্চম চার্লসের কবল হইতে নিজেদের ছোট্ট গণতন্ত্র Republic-টীকে রক্ষা করিয়াছিল; এ দুইটী ঘটনাই আমার মতের সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এ ত গেল মধ্যযুগের কথা। বর্ত্তমান যুগেও মস্কোবাসীগণ যেরূপ ঐকান্তিক স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া নিজেদের ঘর বাড়ী যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের দেশবৈরী নেপোলিয়নকে ব্যর্থ-মনোরথ এবং চিরকালের জন্য প্রায় শক্তিহীন করিয়াছিল—এ ব্যাপারটী যদিও দৃষ্টান্তরূপে সম্পূর্ণভাবে এস্থলে প্রযোজ্য নহে, তথাপি তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে জাতীয় শক্তির উত্থানের সঙ্গে জাতীয় শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সম্বন্ধ ততটা ঘনিষ্ঠ নহে।

অতএব প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র দাঁড় করাইয়াছি, দেখা গেল আমেরিকার প্রজাতন্ত্র তাহার প্রথম অপরাধে অপরাধী নয়। এখন দেখাইব যে দ্বিতীয় অভিযোগও উহার বিরুদ্ধে টেকে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ—প্রজাতন্ত্রের চঞ্চলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জনসাধারণ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় যুক্তিবিরুদ্ধ আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়াস পায়। এরূপ অবস্থা আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফর্ণিয়া হইতে চীনদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল উহা এই প্রকার সাময়িক উত্তেজনার ফল বলিয়া উল্লেখযোগ্য। আমেরিকাতে যাহাকে Lynch law বলে উহাও এই প্রকার উত্তেজনার ফল। প্রদেশসমূহকে বিভিন্নভাবে

দেখিতে গেলে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমগ্র মার্কিন জাতির চরিত্রে এ চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ দেখা যায় যে মোটের উপর অন্যান্য জাতির ন্যায় আমেরিকার জাতীয় চরিত্রও স্বভাবতঃ অত্যধিক পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং পরিবর্ত্তনবিরোধী। আমেরিকার পশ্চিমদেশীয় কৃষকেরা জানিত যে তাহাদের পরিধানের বস্ত্রাদি শুল্ক বিবর্জ্জিত হইলে সস্তা হয়। কিন্তু তাহারা এ কথাও জানিত যে পণ্যশুল্কপ্রথা সমগ্র দেশের বাণিজ্যের মঙ্গলবিধায়ক। সুতরাং তাহারা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দেশের কল্যাণের জন্য ঐ আইনের বিরুদ্ধে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন প্রকার আন্দোলন করিতে বিরত থাকিল। প্রেসিডেণ্ট গ্রাণ্টের সময় তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যে-সমস্ত দেশের অহিতকর কার্য্য করিয়া জনসাধারণের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছিল, সে-সমস্ত কার্য্যের জন্য জনসাধারণ গ্রাণ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে নাই এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও কমে নাই, কারণ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তুমুল অন্তর্বিগ্রহের সময় গ্রাণ্ট যে প্রকার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন দেশবাসী তাঁহার নিকট সেই জন্যই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল। এই উভয় দৃষ্টান্তই আমেরিকার জাতীয় চরিত্র যে রক্ষণশীল তাহারই পরিচায়ক। যে চরিত্রে রক্ষণশীলতা এরূপ মাত্রায় বর্ত্তমান, সে চরিত্রে পরিবর্ত্তনশীলতা ও চঞ্চলতা মজ্জাগত হইতে পারে না। আমেরিকার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ অন্যান্য দেশের ন্যায় স্থায়ী হয় না সত্য, কিন্তু ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আমেরিকাবাসীগণ একটী মূল কার্য্যনীতির অনুসরণে ঐ পরিবর্ত্তনের পোষকতা করে, জাতীয়চরিত্রগত চঞ্চলতাহেতু ঐ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—বশ্যতা স্বীকারে অনিচ্ছা এবং অবজ্ঞাসহকারে বৈধপ্রভুত্বের বিরুদ্ধাচরণেচ্ছা। এ অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং ইহার হাত হইতে আমেরিকার প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। অনেক প্রদেশ ও সহর আছে, যেখানে অনেক আইন কার্য্যে পরিণত করা হয় না এবং হইলেও অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার কোন কোন স্থানে নরহত্যা গুরুতর অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয় না। এরূপ অপরাধীকে অনেক সময় গ্রেপ্তার করা হয় না, হইলেও নরহত্যাকারীর ফাঁসী কদাচিৎ কখনও হইয়া থাকে। তবে যুক্তপ্রদেশসমূহের সর্ব্বত্রই এরূপ অবাধ্যতার ভাব লক্ষিত হয় না। যে কয়েকটী প্রদেশে সভ্যতার আলোক অতি অল্পদিন হইল প্রবেশলাভ করিয়াছে সেই-সমস্ত প্রদেশেই এরূপ আইন প্রয়োগে শৈথিল্য দেখা যায়। নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি প্রদেশে যখন জাতীয় চরিত্রের এরূপ কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার অন্যান্য ভাগেও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ইচ্ছা এবং বৈধপ্রভুত্বের প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনের ইচ্ছা ফিরিয়া আসিবে।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ—সকলকে সমপদস্থ করিবার স্পৃহা। এ আপত্তির কথা প্রথমে তকেভিল্ (Tocqueville) উত্থাপন করেন এবং তাহার পরে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল উহা সমর্থন করেন। আমেরিকার ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ অভিযোগ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যাইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নানাকারণে এ ভাব অপসারিত হইয়াছে। যত দিন আমেরিকাপ্রবাসী ইংরেজ, জর্ম্মান, আইরিশ, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় লোক আপনাদিগকে আমেরিকান মনে না করিয়া, ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসী ও আইরিশ বলিয়া বিবেচনা করিত, ততদিন এ ভাবের পোষকতা করে এরূপ লোক বিরল ছিল না। কিন্তু আজকাল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশসমূহ একপ্রাণে অনুপ্রাণিত। এই জাতীয়-জীবনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জাতি নিজেদের মধ্যে যাহারা দানশীল, ধনী ও প্রতিভাশালী তাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিতে শিখিয়াছে। এমার্সন, লংফেলো, ও আর্ভিঙের নাম করিয়া আজ সমগ্র মার্কিন জাতি সভ্যজগতের সম্মুখে নিজেদের জাতীয় গৌরব প্রতিপন্ন করিতে চায়। মনীষার ক্ষেত্রে যেরূপ, ধনবানদিগের প্রতি মার্কিন

জাতির ব্যবহারেও এই ভাব পরিলক্ষিত হয়। দানবীর কার্নেগী ও রকফেলারের নাম করিয়া গৌরব অনুভব না করে এমন মার্কিন বোধ হয় কেহ নাই।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটী অভিযোগ—প্রজাতন্ত্রের স্থানে দলতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Tyranny of the Majority বলে। এই অভিযোগটী অল্পবিস্তর ইউরোপীয় সমস্ত শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবকালীন অরাজকতার ইতিহাসে ও ইংলণ্ডে গণতন্ত্র বা Commonwealthএর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমেরিকার প্রধান দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দল কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ধর্ম্মের পার্থক্য কিম্বা সামাজিক বিভিন্নতা আমেরিকার রাষ্ট্রনৈতিক দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করে নাই, কেবলমাত্র দুইটী মূলনীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই দুইটী দলের অভ্যুত্থান হইয়াছে। আরও বিশেষতঃ যদিও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা ও পথ আছে তবুও আমেরিকায় সর্ব্বোপরি (Federal Government) সমবেত রাষ্ট্রতন্ত্র থাকায় বিভিন্ন প্রদেশসমূহের পক্ষে ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহারের পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযোগ—জনসাধারণের অজ্ঞতাহেতু বিদ্রোহোদ্দীপক জননায়কের অভ্যুত্থান। এক কথায় ইহাকে Fault of demagogism বলা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত দোষের ন্যায় এ দোষটীও পৃথিবীর অন্যান্য শাসনপ্রণালীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নানাকারণে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীর মধ্যে এ দোষ সহজেই সৃষ্টি হয় এবং অতি স্বল্পচেষ্টায় সংক্রামক আকার ধারণ করে। ইউরোপে শ্রমজীবী এবং মূলধন (Labour and Capital) সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সমাজধ্বংসকারী যে Syndicalism এর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এখানে উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু মার্কিন রাজ্যের সুবৃহৎ আয়তন, প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার হেতু বর্ত্তমান থাকায় আমেরিকাতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অজ্ঞ কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত উত্তেজনাপ্রবণ জনমণ্ডলীকে সহজে মাতাইয়া তুলিবার সুযোগ আমেরিকা হইতে ইউরোপখণ্ডে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এ দোষটীও আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের ঘাড়ে চাপান যায় না।

প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালীর কি কি দোষ তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সেই দোষগুলি মার্কিন প্রজাতন্ত্রে কতদূর প্রযোজ্য তাহা দেখাইলাম। এখন আমেরিকার শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

(১) উহার প্রথম বিশিষ্টতা—আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের স্থিরতা অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিতভাবে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব। আপনারা সকলেই জানেন, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরান্তে ওয়াশিংটন, হ্যামিল্টন, ও জেফারসন প্রমুখ আমেরিকার মনীষীগণ যে শাসনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন সমগ্র মার্কিনজাতি অদ্যাবধি সেই বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। যে দেশে স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে সেই দেশে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত কোটি কোটি নরনারী আজ প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ একই শাসননীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে—কেবল তাহাই নয়, এই শাসনপ্রণালীর প্রভাবে থাকিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যেমন নাকি, যদি কেহ জানিতে চাহেন একটী লোকের জীবদ্দশায় তাহার শারীরিক সুস্থতা কিরূপ ছিল তবে প্রথম জানিতে হইবে তিনি কতদিন বাঁচিয়াছিলেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ শাসনপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে ঐ শাসনপদ্ধতি কতদিন পর্য্যন্ত মৌলিকভাবে পরিবর্ত্তিত না হইয়া টিকিয়া আছে। আজ দেড়শত বৎসরের মধ্যে আমেরিকার শাসননীতির যে কোন প্রকার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এইটীই ইহার প্রধান বিশিষ্টতা। ইউরোপের সর্ব্বত্রই রাজনীতিসংক্রান্ত আমূল পরিবর্ত্তনের কথা সচরাচর শুনা যায়—গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ফরাসীদেশের শাসনপ্রণালীর ছয়বার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। জার্ম্মানী ও ইটালীতে ২।৩ বার এরূপ সর্ব্বব্যাপী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে আজ কেহই ভরসা করিয়া

বলিতে পারেন না দশবৎসরের পর House of Lords-এর অবস্থা কিরূপ হইবে, অথবা আয়রল্যাণ্ড ও উপনিবেশসমূহের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াইবে। আজ অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালী ফরাসী-দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কিন্তু এখনও সেখানে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী-অনুরাগী এক দল অত্যন্ত প্রবল। ইটালী ও স্পেন যদিও বহুকালযাবৎ রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে তথাপি ঐ দুইটী দেশে সাধারণতন্ত্রশাসন-প্রণালীর অনুরাগী দল বিদ্যমান আছে এবং কখন কখন আধিপত্যও করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার যে আদৌ হয় না তাহা নহে, তবে সে সংস্কারে কোন প্রকার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে না। আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে বিধান বিধি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মোটের উপর ঐ বিধান বজায় রাখিয়া ঐ বিধানের কোন একটী স্বল্পভাগ খণ্ডভাবে সংস্কার করাই আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি-সংস্কারকদিগের কার্য্য। ইংলণ্ডে কেয়ার হার্ডি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসী—ফ্রান্সে অনেকে এখনও রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোর পক্ষপাতী—জার্ম্মানিতে সমাজপন্থী বা Socialist দলের প্রবলপ্রতাপের কথা আপনাদের অবিদিত নাই। আমেরিকায় যত প্রকার দলাদলি থাকুক না কেন—মতভেদ যতই থাকুক না কেন—পূর্ব্বাপর যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতির মূলনীতির বিরোধী ব্যক্তি আমেরিকাতে একটীও নাই। এই গেল প্রথম কথা।

আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা—আইনের বশ্যতা স্বীকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যুক্তরাজ্যের কোন কোন প্রদেশে এই বশ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছি যে শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব দিন দিন অপসারিত হইতেছে। মার্কিন জাতিকে খণ্ডভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, আইনকানুন মানিয়া চলার ভাবটী উহাদের জাতীয় চরিত্রে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ কারণও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন—প্রত্যেকেই যখন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে, কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে নিজের অংশ উপলব্ধি করিতে পারে—প্রত্যেকেই যখন জানে যে দেশশাসনের জন্য যে-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে সে আইন তাহারই অথবা তাহার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সৃষ্টি, তখন আইন মানিয়া চলিবার স্পৃহা লোকের মনে স্বতঃই জন্মিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি।

মার্কিন প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় বিশিষ্টতা এই যে—মার্কিন জাতি রাষ্ট্রনৈতিক ভাবগুলি বেশ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা দৈনিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে না। ২।১ টী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেই এ কথাটী সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। আমেরিকাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যেরূপ সীমা-বিহীন সেরূপ পৃথিবীতে আর কোন দেশেই নাই। এরূপ অসংযত স্বাধীনতা হেতু অনেক বিষময় ফল ফলিয়া থাকে সত্য কিন্তু আমেরিকার লোকে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, কারণ তাহারা বণিকের জাত এবং বেশ জানে যে সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারই এরূপ ভালমন্দে মিশ্রিত—তাহারা জানে সমস্ত আইন, সমস্ত বিধিপ্রথারই অপব্যবহার সম্ভব। সময় সময় অপব্যবহার হইবে বলিয়া তাহারা একটি সুপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতে ইতস্তত করে না।

আজ কয়েকবৎসর হইল আমেরিকাতে সমস্ত শ্রমজীবী লইয়া যে বিপুল সম্মিলনী গঠিত হইয়াছিল সেই সম্মিলনী অনেক কারবারের ক্ষতি করে এবং অনেক শ্রমজীবীকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের দলভুক্ত করিতে আরম্ভ করায় সমস্ত দেশ তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেজন্য দেশে কোন প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই বা ঐ সম্মিলনীর যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার জন্য কোন বিশেষ আইনের প্রয়োজন হয় নাই। প্রকৃত স্বাধীনতার অপব্যবহার অসম্ভব ইহা জানিয়াই লোকে নিশ্চিন্ত ছিল এবং ফলতঃ ইহাই হইল। ঐ সম্মিলনীর যথেচ্ছাচার আপনা হইতেই ক্ষান্ত হইল। কোন বিশেষ আইনের দ্বারা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিবার প্রবৃত্তি আমেরিকাতে নাই, কারণ যদিও তাহারা

জানে যে স্বাধীনতাকে অসংযতভাবে প্রশ্রয় দিলে কুফল ফলিতে পারে, কিন্তু তাহারা ইহাও জানে যে স্বাধীন চিন্তাকে, স্বাধীন কার্য্যকরী শক্তিকে, ঘন ঘন বিশেষ আইনের দ্বারা সংযত করিতে থাকিলে দেশের প্রচলিত শাসননীতির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে।

আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ বিশেষ গুণ এই যে এ শাসনতন্ত্রে জাতিভেদ একেবারেই নাই। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সভ্যদেশেই এরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক জাতিভেদ আছে—যদিও কেবলমাত্র হতভাগ্য ভারতবাসীর নামেই এ কলঙ্ক সর্ব্বদা আরোপিত হইয়া থাকে। আপনারা সকলেই জানেন, আজ তিন বৎসর হইল বিলাতে গণসভায় যে বজেট তৈয়ারী হইয়াছিল সে বজেট অভিজাত-সভায় গৃহীত হয় নাই, কারণ সে বজেটে ইংলণ্ডের ধনীদিগের কর দিবার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল এবং সেই অনুপাতে গরীবদিগের করের হার হ্রাস করা হইয়াছিল; বিলাতে বর্ত্তমান মন্ত্রাসভা Insurance Bill নামক যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন সে আইন দরিদ্রশ্রমজীবী ব্যবসায়ীদিগের উপকারের জন্যই প্রণয়ন করা হইয়াছে। জার্ম্মানিতে সমাজপন্থী বা Socialist দলের অভ্যুত্থানে ধনী ব্যক্তিদিগের কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। রুশিয়ার ডুমা (Duma) প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই Czar প্রমুখ রুশিয়ার জমিদারশ্রেণী প্রাণপণ করিয়া ডুমার অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ ডুমা প্রজাশক্তির কেন্দ্রস্থল এবং প্রজাশক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধনীগণের মর্য্যাদা হ্রাস হইবে এবং এযাবৎকাল তাহারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অবিসংবাদিতভাবে পরিচালন করিয়া আসিয়াছে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিবে। এই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের কথা বিলাতে এখনও শুনা যায়। এখনও শুনা যায় যে পার্লামেণ্টের অমুক আইনটী একশ্রেণীর লোকের সমূহ উপকার করিবে, কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থে আঘাত করিবে। জার্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যে এখনও কোন আইন কোন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক আর অন্য এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া থাকে। এরূপ জাতিভেদ আমেরিকায় কোথাও নাই—এরূপ সম্প্রদায়-ভেদের হাত হইতে মার্কিন যুক্তরাজ্য একেবারেই অব্যাহতি পাইয়াছে।

ইউরোপে সর্ব্বত্রই গরীবেরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পার্থক্য দেখাইয়া হাহাকার করিতেছে এবং ধনীব্যক্তিদিগের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত, ঈর্ষাপরবশ ও ঘৃণাযুক্ত হইয়া আছে। আমেরিকায় দরিদ্রেরা যাহা কিছু পাইবে বলিয়া আশা করিতে পারে তাহা সমস্তই পাইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ধনী, নির্ধন সকলেরই অধিকার সমান, আইনের চক্ষে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, সকলেই সমান, রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্য্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ধনীদিগের জন্য একটী ও গরীবদিগের জন্য অপরটী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই—Well-to-do Class বা ধনী সম্প্রদায়ের জন্য কোন স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মার্কিন প্রজাতন্ত্রের পঞ্চম বিশেষ গুণ এই যে সমগ্র প্রজাশক্তির মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন তেজ নিহিত আছে। এই প্রচ্ছন্নশক্তির প্রভাব আমেরিকাবাসীর দৈনিক জীবনে আদৌ অনুভূত হয় না, কারণ উহার প্রয়োজন হয় না; কোন জাতীয় সঙ্কটের সময় এই জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকায় যখন প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমেরিকাবাসীগণ তাহাদের দেশীয় শাসন-বিভাগের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতন্ত্রেই শাসন-বিভাগের (Executive Department) অধিকার ও ক্ষমতা সংযত করিবার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় এবং তদুপরি আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইল তখন আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধারণা এই ছিল যে ইংলণ্ডে লর্ড নর্থ প্রমুখ শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার অপব্যবহারেই এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে। তাহাতে শাসনবিভাগের ক্ষমতা সংযত করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইল যে অবশেষে ইহাই ধার্য্য হইল যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, যিনি

শাসন-বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী, তিনিও আমেরিকার কংগ্রেসের অর্থাৎ আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি-সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। যে শাসন-বিভাগকে মার্কিন জাতি এরূপ বিরাট আয়োজন করিয়া খর্ব্ব করিয়াছে, মার্কিন প্রজাতন্ত্র কোন জাতীয় সঙ্কটের সময় সেই শাসন-বিভাগের হস্তে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা করে না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের তুমুল অন্তর্বিপ্লবের সময় আমেরিকাবাসীগণ আব্রাহাম লিনকল্‌নকে Roman Dictator অথবা Russian Czar হইতেও অধিক ক্ষমতাশালী করিয়াছিল। আমেরিকার দৈনিক জীবনে প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার মন্ত্রীগণকে একটী প্রকাণ্ড কেরাণীর দল বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত কংগ্রেসের হুকুম তামিল করিবার জন্যই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় যে-সমস্ত কর্ম্মচারী এরূপ ক্ষমতাহীন বোধ হয়—সমগ্রজাতির বিপৎকালে সেই কর্ম্মচারীগণের হস্তে দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার শক্তিকেই আমেরিকার প্রজাশক্তির প্রচ্ছন্ন তেজ বলিয়া আমি অভিহিত করিয়াছি।

আর একটী গুণের কথা বলিলেই আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা-পত্র সমাপ্ত হইল। কোন বিখ্যাত ইংরেজ আমেরিকার প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া এ গুণটীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"Democracy has not only taught the Americans how to use liberty without abusing it. It has also taught them fraternity." অর্থাৎ আমেরিকার শাসন-প্রণালীই মার্কিন জাতিকে ভ্রাতৃভাব শিখাইয়াছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 'ভ্রাতৃভাব' কথাটী বিশেষ আমল পায় না। তাহার কারণও আছে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ভ্রাতৃভাবের নামে ও সাম্যের দোহাই দিয়া কি লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন—সেই জন্যই ইউরোপে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ভ্রাতৃভাব অর্থ অনেকটা চোরে চোরে মাসতুত ভাই গোছের ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন রাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সকলকে এমন নিক্তির ওজনে সমানভাবে প্রদান হইয়াছে যে সাম্যের ভাবটি সে দেশে শিখাইতে বা শিখিতে হয় না। মার্কিন জাতি ফরাসীদিগের ন্যায় ঢাক পিটাইয়া সাম্য রাজ্য সংস্থাপন করিতে গিয়া একজন যথেচ্ছাচারী নরপতির পরিবর্ত্তে শত শত যথেচ্ছাচারী জননায়কের অভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কার করে নাই, কিন্তু এমন অভিনব অত্যাশ্চর্য্য শাসনপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে যে যদিও অহরহ সাম্যের দুন্দুভি নিনাদিত হয় না—যদিও সাম্যের মহত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় না—যদিও পথে ঘাটে সাম্যবিধায়িনী সভা ও সাম্যপ্রচারক সাহিত্যের ছড়াছড়ি দেখা যায় না, তবুও কি জানি কোন্ যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবে সাম্যের ভাব, ভ্রাতৃভাব মার্কিন জাতীয় চরিত্রে মজ্জাগত হইয়াছে, এ যেন প্রত্যেক মার্কিনের পূর্ব্বসংস্কার। আমেরিকাবাসী প্রত্যেকেই সাম্য ভাবটিকে এরূপভাবে উপলব্ধি করে যে কোন অতুল-ধনসম্পত্তির অধিকারী বা প্রবলপ্রতাপশালী ব্যক্তি রাস্তায় যাইতে যাইতে ভদ্র বা ইতর সর্ব্বপ্রকার লোকের জনতা ঠেলিয়া যাইতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। লণ্ডন সহরের West End ও East Endএ পার্থক্য—ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য; আর আমেরিকাতে যেখানে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই—সে দেশের রাজধানী ওয়াশিংটনে এরূপ বিশেষভাবে চিহ্নিত কোন স্থান নাই; সে সহরের উদ্যানে যে ফুল ফোটে সে ফুলের গন্ধ ধনী ও দরিদ্রের নিকট সমভাবে প্রীতিকর, সে সহরের সরকারী অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে যে স্বাস্থ্যকর বায়ু বহিয়া যায় সে বায়ু সেবনে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই।

আরও একটী বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকায় আমেরিকাতে এই সাম্যের ভাব বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইউরোপে সর্ব্বত্রই State Religion বলিয়া একটি পদার্থ আছে; আমেরিকাতে শাসনপ্রণালীর সঙ্গে কোন ধর্ম্মবিশেষের সংস্রব নাই। ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালী এই দুইটী একেবারেই স্বতন্ত্র। জর্ম্মান পার্লামেণ্টে Catholic Party বলিয়া একটী দল আছে, ইটালীতে ঐ দলেরই নাম Clerical Party, বিলাতেও House of Lordsএ Bishops দলের ক্ষমতা নিতান্ত নগণ্য

নয়। ইউরোপে যেরূপ ধর্ম্মের পার্থক্য অনুযায়ী রাজনৈতিক জীবনে পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি আবার সামাজিক বিভিন্নতা অনুসারেও ঐ পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। জার্ম্মানিতে Bundesrath, হাঙ্গেরীতে Table of Magnets ও বিলাতে House of Lords তাহার প্রমাণ।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে ধর্ম্মের পার্থক্য কিম্বা সামাজিক বিভিন্নতা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করে নাই। মধ্যযুগের প্রভাব ইউরোপে এখনও প্রবল। এই প্রভাব দিন দিন বিলীন হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানযুগে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মত যে প্রজাশক্তির ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশেই ধর্ম্ম- ও শাসন-প্রণালীর যে সংস্রব আছে উহার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এই সাম্য-ভাবের আরও একটী সুফল এই যে সাম্যের ভাব যে-দেশে এত প্রবল সে-দেশে বিদেশীয় রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের লিপ্সা বলবতী হইতে পারে না, কারণ যাহারা ভ্রাতৃভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মান করিতে ও ভালবাসিতে শিখে, তাহাদের চরিত্রে বিশ্বপ্রেম জিনিষটীও অন্যান্য দেশের জাতীয় চরিত্রের চেয়ে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। গত দেড়শত বৎসরের পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া অথবা জার্ম্মানি যতবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অজস্র অর্থব্যয় ও প্রাণক্ষয় করিয়াছে, আমেরিকা সেরূপ করে নাই—অথচ ইতিহাসে ইহাও স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ দেশসমূহের কোনটীর চেয়ে আমেরিকার জাতীয় সমৃদ্ধি কম নয়। সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ ও চিরশান্তিস্থাপন করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা হইতেছে—এই চেষ্টা ও যত্ন সফল করিবার মানসে কার্নেগী ও রকফেলার প্রমুখ আমেরিকার ধনশালী ব্যক্তিগণ যেরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন ও করিতেছেন সেরূপ অন্য কোনও দেশের ধনী ব্যক্তিরা করেন নাই। বিশ্বব্যাপী শান্তিস্থাপনের জন্য এরূপ অজস্র দান বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত না হইলে সম্ভবে না। এবং আমেরিকাবাসীর এই বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তিমূল কোথায়? —তাহাদের দেশব্যাপী সাম্যভাবে ও ভ্রাতৃভাবে।

এক এক করিয়া আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের বিশেষ গুণ কয়েকটীর কথা বলিলাম। জাতীয় চরিত্রের এই বিশিষ্টতার কারণ কতটা জাতীয় শাসনপ্রণালীতে আরোপিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মার্কিন জাতীয় চরিত্র ও শাসনপ্রণালীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য রকম সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই ফরাসীদেশের শাসনপ্রণালীতে এত ঘন ঘন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে—এই সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ইটালী, ইংলণ্ড হইতে Parliamentary Party Government অনুকরণ করিতে গিয়া বিলাতের শাসনপ্রণালীর একটী বিকৃতমূর্ত্তি উৎপাদন করিয়াছে। আমেরিকার জাতীয় চরিত্র ঠিক আমেরিকার শাসনপ্রণালীরই উপযুক্ত। উপরোল্লিখিত গুণাবলী বর্ত্তমান থাকা সত্বেও—মার্কিন প্রজাতন্ত্রে অনেক-গুলি দোষও আছে, তবে এত সুবৃহৎ ও এত দীর্ঘকালস্থায়ী অনুষ্ঠান নির্দ্দোষ হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। যে শাসনতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত শক্তিসমূহের উৎকর্ষ-সাধনে সর্ব্বপ্রকারের সুযোগ বিদ্যমান আছে, যে শাসন-পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মমতের জন্য বা সামাজিক অবস্থানিবন্ধন কোন প্রকার অধিকারে বঞ্চিত হয় না, যে শাসনতন্ত্রে ৭০ লক্ষ নিগ্রোকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দান করা হইয়াছে, যাহারা পরের দেশ জয় করে তাহাদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া স্বাধীনতায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, শত দোষ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের এক অভিনব, অপূর্ব্ব অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। এ জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির উপর সমগ্র বিশ্বের উন্নতি নির্ভর করে।

শ্রীভুবনমোহন সেন।

দরিদ্র ডিউক্

(The Bottom Up গ্রন্থ হইতে)

(সত্য ঘটনা)

আমরা যাঁহার বিষয় বলিতে যাইতেছি তিনি ষাট বৎসরের একটি স্থূলাকার বৃদ্ধ। পরিধানে তাঁহার খলখলে জীর্ণ

মলিন বেশ। চোখ দুইটি নীল, লাল বর্ণ চুল এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ রক্তিম। সঙ্গে তিনটি বড় বাক্স লইয়া তিনি আমাদের দরিদ্র-আবাসে এক দিন দেখা দিলেন। সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এতগুলি বাক্সের মধ্যে তাঁহার আছে কি। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বাসায় যে লোকটিকে সকলে 'এক-চোখো ডাচি' বলিয়া ডাকে তাহাকে তিনি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। দশ আনা ভাড়ার ঘরে যে বাস করে সেই ভাড়াটিয়ার আবার ভৃত্য! আশ্চর্য্য বটে!

তিনি অত্যন্ত কুণো ছিলেন। তাঁহার কোন বন্ধু ছিল না বা কাহাকেও তিনি নিজের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিতেন না। তাঁহার ভৃত্য এক দিন তাহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট গল্প করিয়াছিল যে তিন মাস অন্তর জর্ম্মানি হইতে তাহার মনিবের নামে একখানি করিয়া চেক আসে। যত দিন না সেই টাকা খরচ হইয়া যায় তত দিন হিসাব রাখা, দোকানদারের নিকট জিনিষ ফরমাস দেওয়া, পাওনাদারদিগের পাওনা চুকানো ইত্যাদির ভার সেই 'এক-চোখো ডাচি'র উপর থাকে।

এই গল্প শুনিয়া অবধি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য আমি বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কোনো শিষ্ট বাক্য মাত্র না বলিয়া নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কয়েক মাসের মধ্যে এই রহস্যময় বিদেশীর টাকার পুঁজি ফুরাইয়া গেল এবং 'এক-চোখো ডাচি'কে তিনি বিদায় দিলেন। এই সময় বরফবর্ষণের একটি ঝড়ে বৃদ্ধকে কাবু করিয়া ফেলিল। তখন তিনি দশ আনায় যে খাট ভাড়া পাইয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া সাত আনায় একটি মাচা আশ্রয় করিলেন। যখন তিনি পুনরায় হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন তখন এক দিন তাঁহাকে কাঁচি শানাইবার একটি জাঁতা টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে দেখা গেল। অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিল কিন্তু তিনি অবজ্ঞার সহিত সকলের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া যেমন করিয়া পারেন নিজেই সেটিকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন।

আবার একটি বরফবর্ষণে পুনরায় তাঁহার বাত দেখা দিল। তিনি ঘরের ভিতর বসিবার অনুমতি পাইলেন। পুরাতন জাঁতাটি অকর্ম্মণ্য হইয়া এক কোণে পড়িয়া রহিল। অনশনে তাঁহার দিন কাটিতেছিল, এক দিন এক রাত্রি ধরিয়া তাঁহার তামাকের পাইপটি শূন্য পড়িয়া ছিল, তথাপি তিনি দারিদ্র্য রাক্ষসীর সম্মুখে অসহ্যবেদনায় একাকী খাড়া হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার উপবাসের তৃতীয় দিনে তিনি একটি পত্র পাইলেন। তাহার মধ্যে এক ডলারের একটি নোট ছিল। যিনি নোটটি পাঠাইয়াছিলেন তিনি দূর হইতে দেখিতেছিলেন। তিনি বলেন যে বৃদ্ধের বিস্মিত ভাব ক্রমে একটু ঈষৎহাস্যে পরিণত হইল। তাহার পর তিনি কোন ক্রমে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিকটের একটি জার্ম্মান মদের দোকানে গেলেন। চতুর্থ দিনে তাঁহার একটু নম্রভাব দেখা গেল। আদমসুমারিতে তিনি সেই বাড়ীর লোকসংখ্যা গণিবার কার্য্যভার লইলেন।

বাতের জন্য তিনি কাঁচি শানাইবার জাঁতার গাড়ীটি রাস্তায় রাস্তায় ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইতে পারিতেন না। কাজেই তখন তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ হইল। আমি একটি তালাচাবিওয়ালার দোকানের এক পার্শ্বে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। সেখানে কয়েক সপ্তাহ বাস করিয়াই তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন। চাবিওয়ালা গল্প করিল যে বৃদ্ধ না কি তাঁহার জাঁতাটি বেচিয়া যাহা পাইয়াছিলেন তাহা একটি বৃদ্ধাকে তাঁহার কন্যার সৎকারের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

কয়েক মাস পরে দরিদ্রনিবাসের কেরাণীর নিকট ডাচি এক পোষ্টকার্ড লিখিল যে সে এবং তাহার মনিব জেল খাটিতেছে।

আমি তাহাদের ছাড়াইয়া আনিলাম।

তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন সকলেই তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। তিনি আর কুণো হইয়া থাকিতেন না। এক দিন রাত্রে যখন বৃদ্ধেরা মিলিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি আলোচনা করিতেছিলেন তখন আমাদের বৃদ্ধটি তাঁহার জীবন-কাহিনী বলিতে

স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার গল্প দশ বৎসর গোপন রাখিবার জন্য তিনি আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই দলের মধ্যে এক মাত্র আমিই জীবিত আছি।

"১৮৪৯ সালে দাদা ও আমি ছাত্ররূপে হাইডেলবুর্গে বাস করিতাম। তখন জার্মানীতে রাষ্ট্রবিপ্লব জাগিয়া উঠিল। আমি দাদার দুই বৎসরের কনিষ্ঠ—পিতার খেতাব ও সম্পত্তি দাদারই পাইবার কথা।

"আমরা পাঁচজন ছাত্র বলিলাম 'এই রাষ্ট্রবিপ্লব জিনিষটা কি? আমরা ত সে বিষয় কিছুই জানি না। অতএব আমরা ওটা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব।' আমরা যতই আলোচনা করিলাম ততই রাজা ও মাতৃভূমির প্রতি আমাদের ভক্তি জাগিয়া উঠিল, কিন্তু দাদার তাহা হইল না।

"দাদা বলিলেন 'আমি বিদ্রোহী।' তাঁহাকে আমাদের দলে আনিবার জন্য আমরা ক্ষেপিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন 'রাজা একজন মাত্র, প্রজা অনেক এবং তাহারা নিপীড়িত।'

"দাদার প্রতি ঘৃণায় আমার মন ভরিয়া উঠিল, তাঁহাকে ধিক্কার দিলাম, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তবু আমি তাঁহাকে অভিশাপ দিতে লাগিলাম। অবশেষে দাদা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

"ক্রমে তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়া রাজার বিপক্ষে লড়িলেন। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে হারিয়া গেল, দাদা পলায়ন করিলেন। অনেকে দোষী সাব্যস্ত হইল এবং তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল।

"মা আমার মন জানিতেন না, তাই তিনি আমাকে চিঠিতে লিখিলেন যে দাদা দেশে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমি বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেম এবং লর্ড পদবী পাইবার ইচ্ছা—এই তিনটি চিন্তা আমার মনে ঘুরিতে লাগিল।

"আমি রাজসরকারে খবর দিলাম। দাদা ধৃত হইলেন এবং গুলি করিয়া মারিবার অপেক্ষায় তাঁহাকে দুর্গের মধ্যে রাখা হইল।

"আমরা চারিজন রাজভক্ত ছাত্র তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। দাদাকে এমন গৌরবর্ণ ও নির্ভীক দেখাইতেছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া আমার বুক দমিয়া গেল। আগুনের ন্যায় তাঁহার চোখ জ্বলিতেছিল এবং তিনি অবিচলিত দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন 'প্রেম ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই। যাহা সত্য এবং ন্যায় আমি তাহাই ভালবাসি। আমাকে বধ করিলে সত্যকে বধ করা হইবে এমন কথা মনেও করিও না। জল পাইলে ফুল যেমন ফোটে তেমনি আমার রক্ত যেখানে পড়িবে সেইখানে বিদ্রোহ বিকশিত হইয়া উঠিবে। আমি সকলকেই ক্ষমা করিলাম।' তাহার পর তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, 'হান্স্, হান্স্।' দাদা আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি আমার ভ্রাতাকে একবার চুম্বন করিব।' সেনাপতি বলিলেন 'আচ্ছা।' আমি বলিলাম, 'না, আমি রাজাকে ভালবাসি, আমার কোন ভাই নাই। আমি রাজদ্রোহীকে চুম্বন করিব না।'"

"বাস্ রে! শুনিয়া দাদা কিরকম হইয়া গেলেন। তখনই যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল—এত বেদনা তাঁহাকে বাজিল।

"গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম—বন্দুকের শব্দ হইল। আমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল, দাদার মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল।

"আমি আনন্দের ভান করিয়া চলিয়া গেলাম কিন্তু মনের ভিতর আমার নরকের আগুন জ্বলিতে লাগিল। পুত্রশোকে আমার পিতামাতা এক বৎসরের মধ্যেই পরলোকে গমন করিলেন। আমি লর্ড হইলাম। আমি লোকসমাজে মিশিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সমাজ আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। আমার ভোজন-টেবিলে কোন অতিথি আসে না। আমার কাছে কোন ভৃত্য থাকিতে চায় না। তাহারা বলে রাত্রে আমার পিতামাতার বিলাপধ্বনি শোনা যায়। শুনিয়া আমি হাসিতাম, কিন্তু মনে মনে জানিতাম যে উহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য। আমি যখন গ্রামে যাইতাম কৃষকেরা আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত।

"দিন দিন আমার মনে আরো অবসাদ ঘনাইতে লাগিল। প্রতিদিন রাত্রে আমি সেই বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাই—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। যাহারা কিছুরই পরোয়া রাখে না এমন সকল সৈনিক পুরুষ আনিয়া আমার নিকট রাখিতাম, কিন্তু তাহারা একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, বলিত যে তাহারা ফৌজের পদশব্দ শুনিতে পায়।

"এক দিন রাত্রে সৈনিকদিগের সহিত আমি এমন করিয়া মদ খাইলাম যাহাতে রাত্রে আর বন্দুকের শব্দ না শোনা যায়।

"আমার প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় আমরা মদ্যপান করিতে লাগিলাম। মোটা মোটা দরজা জানলাগুলি চারিদিকে বন্ধ, পর্দাগুলি টানা, বড় বড় সেজ জ্বলিতেছে, আর আমরা পান করিতেছি, গান করিতেছি, আর ঈশ্বরকে গালি দিতেছি—মত্ত হইয়া বলিতেছি 'আমরা নিজেরাই ঈশ্বর।'

"বন্দুকের শব্দের সময় নিকট হইয়া আসিল। আমার জিভ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, রক্ত হিম হইয়া আসিল।

"গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম—সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, গৃহের মধ্যে বিদ্যুতের আলো খেলিয়া গেল—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

"তাহার পর আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? বলিতে পারি না। আমার অতীত জীবন ছবির মত আমার চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল—আগুনের ফ্রেমে আলোর ছবি। প্রথম দৃশ্যে দাদা ও আমি বাল্যাবস্থায় খেলা করিতেছি। দ্বিতীয় দৃশ্যে শোকে অধীর হইয়া মা কাঁদিতেছেন। তাহার পর দেখিলাম সেই দুর্গের প্রাচীর—দাদা হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আবার আমার রক্ত হিম হইয়া আসিল—আমি বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, দাদাকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলাম। আমার বুকের উপর ভয় চাপিয়া ধরিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া উঠিলাম 'আমি রাজাকে ভালবাসি', কিন্তু কে যেন বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল 'মিথ্যুক'। তখন একটি ছোট বালিকা—তার মাথার চুলগুলি সোনালী—আমার কাছে আসিয়া কপাল হইতে রক্ত মুছাইয়া দিল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। জাগিয়া দেখি আমি একলা রহিয়াছি। বাতি নিভিয়া গিয়াছে। আমার মুখে রক্তের দাগ। ভয়ে আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়াছি। যখন চলিতে পারিলাম তখন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। আমি ভাবিলাম হয় ত শুধু জার্ম্মানিতেই বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাই।

"কুড়ি বৎসর স্পেনে বাস করিলাম তবুও সেই শব্দ শুনিতে পাই।

"ফ্রান্সে গেলাম সেখানেও প্রতি রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার রক্ত জল হইয়া আসিত আর বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইতাম। যে এমেরিকাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম সেই এমেরিকায় আসিলাম, তবু সেই শব্দের আর বিরাম নাই। ক্রমে আমার সম্পত্তি হারাইলাম, টাকা নাই। চোরা বালিতে মানুষের যেমন দশা হয় আমিও সেইরূপ ক্রমেই তলাইতে লাগিলাম। আমি তোমাদের এইখানে আসিলাম, ইহা অপেক্ষা নীচে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব।

"একদিন মোড়ের কাছে আমি যেন সেই স্বপ্নের মেয়েটিকে দেখিলাম—বায়ু সোনালী চুল, যে আমার রক্ত মুছাইয়া দিয়াছিল।

"বালিকা মৃত। কিন্তু এ মুখ যে সেই মুখ এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বালিকাটিকে আবার কেন দেখিলাম। এই দেখার ভিতর কি অর্থ নিহিত আছে কিছুই বুঝিলাম না। অজ্ঞান হইয়া গেলাম।

"জগতে আমার সবে একটি মাত্র জিনিষ অবশিষ্ট ছিল—সেই পুরাতন কাঁচি শানাইবার জাঁতাটি। সেটি বেচিয়া যাহা কিছু পাইলাম বালিকার সৎকারার্থ দান করিলাম। এই আমার প্রথম সৎকার্য্য। জীবনে আমি এই একটি মাত্র মঙ্গল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি। তাহার পর নির্ম্মম জগতে বাহির হইয়া পড়িলাম—সেখানে দয়া করিবার কেহ নাই। আমি একটি অন্ধকার গলিতে বসিয়া পড়িলাম, আমার হৃদয়ে এক নূতন চেতনার স্পর্শ অনুভব করিলাম।

"বন্দুকের শব্দের সময় হইয়া আসিল—আশ্চর্য্য যে তবু আমার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসিল না। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—শব্দ হইল না। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

"এ কি সত্য হইতে পারে? এক, দুই, তিন মিনিট অপেক্ষা করিলাম—শব্দ হইল না। আনন্দে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। একটি বজ্রহস্ত আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমাকে জেলে লইয়া গেল। তবু আমার কাছে সেই কারাগার যেন আলোকময় স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখন বন্দুকের শব্দ নীরব হইয়াছে।"

শ্রীঅতসী দেবী।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়।]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মনোরমা তাঁহার সন্তানগণকে এবং সৌদামিনী ও যমুনাকে সঙ্গে লইয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র বৈকালে পর্ব্বতে ও প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র নানাস্থানে অভ্র, লৌহগর্ভ প্রস্তর ও নানাবিধ মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ দেখিতে পাইয়া ক্ষেত্রনাথকে তাহাদের ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ উত্তোলন ও সংগ্রহ করিতে যে বিশেষ জ্ঞান এবং প্রভূত অর্থেরও প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। বল্লভপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রকৃতি দেবী সযত্নে যে অতুল ধনরত্ন সঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্রের আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

মহাষ্টমীর প্রভাতেও দুই বন্ধুতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, মাধবদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিধন দুইটী গোযান লইয়া উপস্থিত। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র হরিধন বিনীত বচনে বলিলেন "বাবা আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আপনাকে ও আপনার বন্ধু সতীশবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আজ পায়ের ধূলা দিতে হ'বে। আমি আপনাদের নিতে এসেছি। আমি সাহস ক'রে সতীশ বাবুকে অনুরোধ করতে পারছি না। আপনি আমার হয়ে তাঁকে অনুরোধ করুন।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে যাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি বলিলেন "বেশ তো; বিকেল বেলায় যাওয়া যাবে। যখন এ অঞ্চলে বেড়াতে এসেছি, তখন এঁদের গ্রামটিও দেখে আসা যাক্।" এই বলিয়া তিনি হরিধনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের গ্রাম এখান থেকে

কত দূর? সন্ধ্যার সময় তো ফিরে আস্‌তে পারব?"

হরিধন বলিলেন "বেশী দূর নয়; এক ক্রোশ হবে। আর আজ আপনারা ফিরে নাই বা এলেন? সেখানে আজ আপনারা অবস্থিতি কর্‌বেন। বেলা পাঁচটার সময় সন্ধিপূজা শেষ হবে। তার পর ছৈ-নাচ আর যাত্রা হবে, তা দেখ্‌বেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "না ভাই, রাত্রি জেগে যাত্রা শুন্‌তে পার্‌ব না।"

হরিধন বলিলেন "আচ্ছা, আপনাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, তাই কর্‌বেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র স্নান করিয়া হরিধনকে তাঁহাদের সহিত আহার করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হরিধন বলিলেন যে, তিনি মহাষ্টমীর উপবাস করিয়াছেন; সন্ধিপূজা শেষ না হইলে, জলগ্রহণ করিবেন না।

অগত্যা উভয়ে আহারাদি শেষ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর হরিধনের সহিত গোযানে আরোহণ করিয়া মাধবপুর গ্রামে উপনীত হইলেন।

মাধবপুরের মধ্যে মাধব দত্তই সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি; তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম হইয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানা বাটীর সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইবামাত্র, মাধব দত্ত মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং সতীশবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য। আপনার ন্যায় মহাত্মার পদার্পণে আজ আমার বাটী পবিত্র হ'ল, আর আমরাও ধন্য হলাম। আপনাকে আমার বাটীতে আনবার দুরাশা আমি কখনও করতে পার্‌তাম না, যদি আপনি ক্ষেত্রবাবুর বন্ধু না হতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে আপনার পরিচয় অবগত হয়েছি। আমার কি পরম সৌভাগ্য যে আপনার দর্শনলাভ কর্‌লাম। আসুন, আসুন ভেতরে আসুন।" এই বলিয়া মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদিগকে লইয়া বৈঠকখানা বাটীতে বসাইলেন।

সন্ধিপূজায় বসিতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। এই জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহারাও সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। তাঁহাদের সহিত সকলের আলাপ পরিচয় হইল। আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহারা উভয়ে উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমাদর্শন করিতে গেলেন। সুগঠিত প্রতিমা ও প্রতিমার সাজসজ্জা দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত হইলেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া সতীশবাবু মাধবদত্ত মহাশয়কে বলিলেন "আপনাদের এখানে প্রতিমার চমৎকার গড়ন হয় তো! বাঃ! এ দেশেও এমন কারিগর আছে?"

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন "এখান্‌কার কারিগরে এ প্রতিমা গড়ে নাই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে কারিগর এসে এই প্রতিমা গড়ে যায়।"

চণ্ডীমণ্ডপের বৃহৎ উঠানটি হরিদ্বর্ণ শালপত্রাচ্ছাদিত একটী উচ্চ ছান্‌লার দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। তাহাই চন্দ্রাতপের কার্য্য করিতেছিল। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। মাধবদত্ত মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন "এ অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ ছান্‌লা চাঁদোয়ার কার্য্য করে। এরই নীচে ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালীভোজন, যাত্রা নাচ প্রভৃতি হয়। আমরা মোটামুটী ধরণের লোক; আর আমাদের চালচলনও মোটামুটী রকমের।"

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "মোটামুটী হোক্; কিন্তু এটি ভারি চমৎকার হয়েছে। কাঁচা শালপাতার আচ্ছাদন হওয়ায়, আপনার উঠানের চমৎকার শোভা হয়েছে। এর নিম্নভাগটি ছায়াযুক্ত ও শীতল হয়েছে, আর এই ছান্‌লার জন্যই আপনার দেবীমন্দিরটিও সুন্দর ঘোরালো দেখাচ্ছে।"

সন্ধিপূজায় বসিতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। অগত্যা সকলেই তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেই সময়ে ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র গ্রামটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পূজাবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ের অনেক নিমন্ত্রিত কুটুম্বও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন যে, তিনি তিনক্রোশ দূরে একটী গ্রামে বাস করেন। এই প্রদেশের প্রায় সকল গ্রামেই পূর্ব্বদেশীয় গন্ধবণিকেরা আসিয়া বাস করিয়াছেন। পূর্ব্বদেশীয় বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতি এই অঞ্চলে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকের সংখ্যাই অধিক, আর অনেক গন্ধবণিক্ পূর্ব্বদেশ হইতে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণও আনাইয়া এই প্রদেশে বাস করাইয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেত্তর, যেখানে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা ও অন্নবস্ত্রের সুখ, সেইখানেই বৈশ্যেরা উপস্থিত হ'য়ে বাস করেন। প্রাচীনকালেও তাঁরা এইরূপ কর্‌তেন ব'লে, তাঁদের নাম "বিশঃ" অর্থাৎ Pioneers হয়েছিল। এই ছোটনাগপুরটি একটী অনার্য্যপ্রধান দেশ; কিন্তু এই ভদ্রলোকের মুখে শুন্‌তে পাচ্ছি, এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গন্ধবণিকেরা এসে বাস করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে, তোমরা এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে Pioneers বা বৈশ্যই আছ। তোমাদের সেই পুরাকালের রীতি ও ব্যবহার এখনও তোমাদের ত্যাগ করে নাই। তোমাদের সঙ্গে বা পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরাও এ দেশে এসেছেন; কেন না, ব্রাহ্মণ না হ'লে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় না। তার পর, তোমাদের দেখাদেখি অপর জাতীয় লোকেরাও এ দেশে আস্‌বেন। তোমরা এ দেশে এসে বাস করাতে তোমাদের আচার ব্যবহার দেখে এ দেশবাসীদেরও আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। তোমাদের দ্বারাই বোধ হয় প্রাচীনকালেও হিন্দুসভ্যতা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়েছিল।"

সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ও সেই ভদ্রলোকটি উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তোমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা না হ'তে পারে। বোর্ণিও (অর্থাৎ সুবর্ণদ্বীপ), যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, ক্যাম্বোদিয়া প্রভৃতি দেশে ও দ্বীপে আর্য্য বৈশ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা সাংযাত্রিক অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রী বণিক্ ছিলেন। গন্ধবণিক্‌জাতীয় ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, চন্দ্রবণিক্ বা চাঁদবেণে সদাগর—এঁরা সকলেই সমুদ্রযাত্রা কর্‌তেন, তার বিবরণ প্রাচীন পুঁথিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গন্ধবণিকেরা যে পূর্ব্বোক্ত দেশে ও দ্বীপসমূহেও বাস করেন নাই, তা কে বল্‌তে পারে?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী হইতে ঢাক ঢোলের শব্দ শ্রুত হওয়ায়, তাঁহারা বুঝিলেন যে, সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। এই কারণে তাঁহারা ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন দেবীর আরত্রিক হইতেছিল। আরত্রিক দেখিবার জন্য পূজার দালানের সম্মুখে সেই বৃহৎ উঠানটি লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। আরত্রিকের পর লোকসংখ্যা কমিয়া গেলে, সতীশবাবু ও ক্ষেত্রবাবু মাধবদত্ত মহাশয়ের অনুরোধক্রমে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন এবং তৎপরেই বল্লভপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে পড়িয়া তাঁহারা ছৈ-নাচ দেখিয়া যাইবেন, স্থির হইল।

তখনই ছৈ-নাচের উদ্যোগ হইল। স্থানীয় ভূমিজেরা এই নাচ দেখাইয়া থাকে। তাহারা দুই তিনটী দুন্দুভি বা নাগ্‌রা লইয়া আসিল। ছান্‌লা তলার চারিদিকে উজ্জ্বল মশাল প্রজ্বলিত হইল। দণ্ড দ্বারা দুন্দুভি আহত হইবামাত্র গম্ভীর শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। আবার দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। বৈঠকখানাগৃহের ভিতর দিকের বারাণ্ডায় সতীশবাবু প্রভৃতির বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নাচ দেখিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে সুরেন, নরু প্রভৃতিও আসিয়া তাঁহাদের নিকট বসিল। পার্শ্বস্থ এক সজ্জাগৃহ হইতে মুখোশ পরিয়া ও বিচিত্র বেশ করিয়া দুইটী লোক বাহির হইল; তন্মধ্যে এক ব্যক্তি রাম, ও অপর ব্যক্তি রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়েরই হস্তে ধনুর্ব্বাণ। দুন্দুভির তালে তালে তাহারা পাদবিক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ধনুষ্টঙ্কার করিয়া বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাবণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তার পর, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ, ভীম-দুর্য্যোধনের গদা-

যুদ্ধ, কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ, এইরূপ নানা যুদ্ধ প্রদর্শিত হইল। তার পর, সামাজিক নক্সা প্রদর্শিত হইল। কলিকাতার বাবু, পল্লীগ্রামের জমীদার, সাহেব হাকিম, ডিপটি বাবু প্রভৃতির নক্সা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সর্ব্বশেষে দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির বীভৎস নৃত্য প্রদর্শিত হইল। ছৈ-নাচ শেষ হইলে, সতীশচন্দ্র ও ক্ষেত্রনাথ, মাধবদত্ত ও উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গো-যানে "কাছারী-বাড়ীতে" প্রত্যাগত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমীর রাত্রিতে সতীশচন্দ্র বল্লভপুর ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় গমন করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সতীশবাবুকে পূজার ছুটীর অবশিষ্ট কয়েকটি দিন বল্লভপুরেই থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহাকে একবার কলিকাতায় গিয়া তাঁহার পিস্তুতো ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ আর কোনও আপত্তি করিলেন না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রের ধান্য পাকিয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ তাহা কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। খামারবাড়ীর ঘাস ইত্যাদি কোদালি দ্বারা ছুলাইয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহা মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা লেপিত করাইলেন। সেই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন খামারবাড়ীতে কর্ত্তিত ধান্যসমূহ রক্ষিত হইতে লাগিল। ধান্যের "পালুই"গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই সময়ে লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি মুনিষগণের বিশ্রামের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। ক্ষেত্রে ধান্য কাটা, কাটা ধান্যের গোছাগুলিকে আঁটি আঁটি করিয়া বাঁধা, আঁটিগুলিকে আবার বোঝা করিয়া বাঁধা, তৎপরে সেগুলিকে গাড়ীতে করিয়া খামারবাটীতে বহন করিয়া আনা, আবার তৎসমুদায় পালা দিয়া স্তূপীকৃত করা—এই সমস্ত কার্য্যে তাহারা প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিত। ধান্যসমূহ কর্ত্তিত ও খামারে আনীত হইলে, তাহারা একএকটী আঁটী আছাড়িয়া তাহা হইতে ধান্য ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কামীনেরা সেই ধান্যগুলি কুলো দ্বারা ঝাড়িয়া তাহা হইতে আগ্ড়া বাহির করিতে লাগিল। এই পরিষ্কৃত ধান্যগুলির ওজন হইলে, তৎসমুদায় মরাইয়ে বা গোলাতে উত্তোলিত হইতে লাগিল। ধান্যের যে শীষগুলিকে আছড়াইবার উপায় ছিল না, গরু দ্বারা তাহা মাড়াইবার জন্য মুনিষেরা মাড়া জুড়িতে লাগিল। এই সমস্ত কার্য্যে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, ও মুনিষ কামীন্ কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার যেন অবসর ছিল না। ধান্য মরাইয়ে উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, প্রায় ছয়শত মণ ধান্য সঞ্চিত হইয়াছে। এই ছয়শত মণ ধান্যের তিনটি মরাই বা গোলা হইল। খড় বা বিচালীগুলিকে স্তূপীকৃত করিয়া পালুই দেওয়া হইল। ধান্য সঞ্চিত হইলে, ক্ষেত্রনাথ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইলেন এবং আসানসোল হইতে দুই গাড়ী কয়লা আনাইয়া তাহা পোড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। এখানে উই পোকার অত্যন্ত উপদ্রব বলিয়া ক্ষেত্রনাথের গৃহের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী কাষ্ঠের প্রাচীরগুলি জীর্ণ হইয়াছিল। ইষ্টক পোড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ চারিদিকে পাকা প্রাচীর গাঁথাইবার অভিপ্রায় করিলেন।

এ দিকে অড়হর, বিরি (কলাই) এবং মুগও পাকিয়া উঠিল। এই সমস্ত ফসল কর্ত্তিত ও উৎপাটিত হইয়া খামারে আনীত হইল, এবং যথাসময়ে মাড়াই ঝাড়াই হইয়া গৃহমধ্যে রক্ষিত হইল। ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ওজন করিয়া দেখিলেন, কলাই পঁচাত্তর মণ, অড়হর ত্রিশ মণ ও মুগ বাইশ মণ হইয়াছে। লখাই সর্দ্দার ধান্যাদি প্রত্যেক শস্যের বীজ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিল এবং তৎসমুদায় বোরা বা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া তাহাদের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া দিল।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে গোল আলু উঠাইবার সময় উপস্থিত হওয়ায়, সকলে গোল আলু উঠাইতে নিযুক্ত হইল। সেই সময়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশচন্দ্রের সহিত মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিয়া বল্লভপুর অঞ্চলে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ পূর্ব্বেই সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি কতকগুলি,

বাঁধাকপি, শালগম, ওলকপি, ফুলকপি, মটরসুঁটি, টমেটো বা বিলাতী বেগুন ও বড় বড় গোল আলুর দ্বারা একটী বৃহৎ ডালি সাজাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ডাক-বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন এবং সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমুদায় উপঢৌকন প্রদান করিলেন। বল্লভপুরে এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনিয়া ডেপুটী কমিশনার সাহেব যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে সতীশবাবুর সহিত বল্লভপুরে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে সাহেব ও সতীশবাবু বল্লভপুরে উপনীত হইয়া ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার শস্যক্ষেত্রসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে আলুর ক্ষেত্রে আলু উত্তোলিত হইতেছিল; আলুর ফসল দেখিয়া সাহেব অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথ যে উপায়ে নন্দাজোড় বাঁধাইয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি কার্পাস ক্ষেত্রে গিয়া কার্পাসের গাছ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। হরিণ ও হাতীর উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার জন্য ক্ষেত্রনাথ প্রজাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও সাহেব অতিশয় আমোদ অনুভব করিলেন ও ক্ষেত্রনাথের বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সতীশচন্দ্র কৌশলক্রমে সাহেবকে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করাইয়া গভর্ণমেণ্টের খাশমহাল নন্দনপুর মৌজাটি দেখাইলেন এবং তাহার মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিলেন। এই বিস্তৃত ভূভাগটি আবাদ করিতে পারিলে তাহাতে যে বহুপ্রকারের শস্য এবং প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও তাঁহাকে বুঝাইলেন।

সাহেব সতীশবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। কিন্তু এ দেশের অধিবাসীরা অতিশয় অলস ও অকর্ম্মণ্য। খাশমহালের ডেপুটি কলেক্টার অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনও প্রজা বসাইতে পারেন নাই। তবে তোমার বন্ধু ক্ষেত্রবাবুর মত উদ্যোগী, উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকেরা যদি ইহা আবাদ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, ইহা নিশ্চিত আবাদ হইতে পারে।" তৎপরে তিনি ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, আপনি কি ইহা গভর্ণমেণ্টের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আবাদ করিতে ও ইহাতে প্রজা বসাইতে পারেন না?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি থাকিলে নিশ্চয়ই পারি; তবে ইহা বহুব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

সাহেব বলিলেন "আচ্ছা, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আপনি মার্চ্চ মাসে পুরুলিয়ায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আর সেই সময়ে আপনার কার্পাস ফসল কি রকম হয়, তাহাও আমাকে জানাইবেন। আর একটী কথা আপনাকে আমার বলিবার আছে। তাহা এই—আলু ও কার্পাসের চাষ আপনি আপনার প্রজাদিগকে শিখাইবেন ও তাহাদিগকেও তাহা আবাদ করিতে উৎসাহিত করিবেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তাহাই করিতেছি। প্রজারা আলুর চাষ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে এবং আগামী বৎসর অনেকেই আলুর চাষ করিবে। আপনি আগামী বৎসর এই সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে আসিলে, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন। কার্পাস যদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহারা তাহাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আবাদ করিবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সাহেব বল্লভপুর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হাসিয়া সতীশবাবুকে বলিলেন "সতীশবাবু, আপনি বোধ করি অদ্য আপনার বন্ধুর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিবেন। আচ্ছা, কাল প্রাতঃকালে আমার সহিত ডাক-বাঙ্গালায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সৌদামিনীর পিসীমাতা আসিয়া স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন। সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে কাছারীবাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার সমাপন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারের পর দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বল্লভপুরে অদ্য ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আগমনের উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন "ক্ষেতুর, সাহেব আজ তোমার কৃষিকাজ দেখে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছেন। নন্দনপুর মৌজাটি বন্দোবস্ত করে নেবার জন্য তিনি নিজেই তোমাকে অনুরোধ করলেন। এ ভালই হ'ল। তুমি ঐ মৌজাটি বন্দোবস্ত ক'রে নিতে ইতস্ততঃ ক'রো না। যা'তে সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা আমিও করব। ঐ মৌজাটি হস্তগত হ'লে, তোমার আর ভাবনা কি? তুমি যদি কালক্রমে ক্রোড়পতি হও, তাও বিচিত্র নয়। মার্চ্চমাসে তুমি পুরুলিয়াতে নিশ্চয় যেও। এমন মাহেন্দ্রযোগ আর পাবে না। এ সুযোগ কিছুতেই ছেড়ো না।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মার্চ্চ মাসটি হচ্ছে চৈত্রমাস। ফাল্গুন মাসে তোমার বিয়ে হ'বে। সেই সময়ে তো তুমি ছুটীতে থাকবে। তুমি না থাকলে, বন্দোবস্ত করে নেবার তেমন সুবিধা হ'বে কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আরে, ভাই, ছুটী নিলেও আমি ফাল্গুন মাসেই নেবো। চৈত্র মাসে আমি এসে পড়ব। তার জন্য ভাবনা কি? কথা হ'চ্ছে যে, তুমি এই মাহেন্দ্রযোগ ছেড়ো না। সাহেব তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা বেশ; তাই করা যাবে। তুমি তো বড় জোর এক মাসের ছুটী নেবে। তুমি আমার পত্র পেয়েছ, বোধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে তোমার বিয়ের দিন অবধারিত হয়েছে। তুমি বিয়ে করে বৌ নিয়ে পুরুলিয়ায় যাবে, না দেশে যাবে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "দেশেই যাব, স্থির করেছি। আমার পিস্তুতো ভাই, রজনী দাদারও মত তাই। দেশেই পাকস্পর্শ—না, বৌ-ভাত—তোমরা কি বল?—তাই করতে হ'বে। জ্ঞাতিদের সন্তুষ্ট করতে হ'বে। নতুবা তাঁরা একটা ছল ধ'রে নানারূপ গোল বাধাতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদেরই পাল্টীঘর বটে; কিন্তু দেশের সঙ্গে তাঁরা অনেক দিন সম্পর্ক ছেড়েছেন। এই জন্য, এখানে বিয়ে করা সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি। আর তুমি ঠিকই বলেছিলে—সকলেই বলেন 'বিয়ে করবে তো দেশে কর; অত দূরে বিয়ে করবে কেন?, তবে আমি নিজে মেয়ে দেখে, পছন্দ করেছি' বলে, আর বেশী কথা কেউ বললেন না। কিন্তু পাকস্পর্শ দেশেই করতে হবে। আমি আমাদের বাড়ীখানা মেরামত করবার বন্দোবস্ত করে এসেছি। অলঙ্কারপত্রও গড়াতে দিয়ে এসেছি। সাদা সাফ্‌টা রকমেরই অলঙ্কার। ছোট ক'নে হ'লে অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হ'ত। রজনী দাদা নিজেই অলঙ্কারের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেছেন।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ফর্দ্দে কি কি অলঙ্কার ধরা হয়েছে?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আমার সব মনে নেই। তবে যতদূর স্মরণ হয়, তোমায় বলছি:—বালা, অনন্ত, চুড়ী, ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ, হার, চিক্, এয়ারিং, মাথার কাঁটা, ফুল, চিরুণী, নেক্‌লেস্ (সেটিকে আবার টায়েরাও করা যেতে পারে)—এই সব আর কি।"

সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগের জানালাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়াই ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কে রে? ভেতরে কে রয়েছে?"

জানালাতে আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। ক্ষেত্রনাথ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কে ঠক্ ঠক্ শব্দ করছিস্, বল্ না?"

কোনও উত্তর নাই। তৎপরিবর্ত্তে আবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ!

ক্ষেত্রনাথ এইবার ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে উঠিয়া গিয়া বলিলেন "ওঃ! তুমি? আমি মনে করেছিলাম, আর কেউ বুঝি?" তার পর ঈষৎ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "কি বলছ?"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "কি আর বলব, সতীশবাবুকে বল, যে-সব গয়না গড়াতে দেওয়া হয়েছে তা বেশ হয়েছে। কিন্তু কোমরের জন্য একছড়া সোনার গোট, নাকের জন্য ভাল দামী মুক্তোর একটী ছোট নথ, আর পায়ের ভারী মল চার গাছা চাই।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আরে ছেঃ! ধেড়ে মেয়ের পায়ে আবার চারগাছা মল!"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "ধেড়ে মেয়ে হ'ল তো

কি হ'বে ? বিয়ের ক'নে তো ? এখন মল পরবে না তো আর কখন পরবে ? সতীশবাবুকে বল, মল দিতেই হ'বে।"

ক্ষেত্রনাথ একটু হাসিয়া বিদ্রূপসূচক স্বরে বলিলেন "কেন ? পায়ে বেড়ী না পড়লে তোমারা বুঝি পোষ মান না ?"

মনোরমা ক্ষেত্রনাথের কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আ মরি ! কথার কি ছিরি, দেখ ! যা হয়, তোমরা কর গে। আমি আর কিছু বলব না।" এই বলিয়া মনোরমা অভিমানভরে সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ওগো, থাম, থাম ; রাগ করছ কেন ? মল দেবার জন্য আমি সতীশকে বলছি।"

কিন্তু সতীশকে বলিবার পূর্ব্বেই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ক্ষেত্তর, নগিনের মাকে চটাও কেন ? আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি ; চার গাছা মলেরও বরাত দেওয়া হয়েছে। তবে নথ আর গোট গড়াতে দেওয়া হয় নাই। তা গড়াবার জন্য আমি কালই পত্র লিখে দেব।"

সতীশচন্দ্র অন্তরাল হইতে এইরূপে মাঝখানে পড়িয়া দম্পতিকলহ মিটাইলেন। মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "শুনলে ?" এই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তোমারই জিত।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের নিকটে আসিলে, সতীশচন্দ্র বলিলেন "কি হে ভায়া, গৃহিণীর সঙ্গে তো খুব ঝগড়া লাগিয়েছিলে ?"

ক্ষেত্রনাথ যেন একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলিলেন "ঝগড়া তো লাগিয়েছিলাম ; কিন্তু ঝগড়ায় যেমন চিরকাল হেরে থাকি, আজও সেইরূপ হার হ'ল।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বললেন "তোমার জন্য বাস্তবিক আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আমার জন্য আর দুঃখ ক'রে কাজ নাই। এর পর নিজের জন্য ঐ জিনিষটা সঞ্চয় ক'রে রাখ। বুঝলে, ভায়া, ওদের না হ'লেও সংসার চলে না ; আর ওদের পেরে উঠবারও যো নাই। এমনি চিজ ! যেটি ধরবে, তা ছাড়বে না। আর যা মনে করবে, তা হবেই হ'বে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "থাম, থাম। গৃহিণীর উপর বড় অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করা হ'চ্ছে।—মা কালীর পদতলে শিবঠাকুরকে প'ড়ে থাকতে দেখেছ তো ? আমি সেদিন তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ছিলাম। লেখক বলেছেন, শিব পুরুষ আর কালী প্রকৃতি। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেই এই বিচিত্র বিশ্বলীলা। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। পুরুষের নিষ্ক্রিয়ত্ব দেখাবার জন্যই শিব ধরাতলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ; আর প্রকৃতির ক্রিয়াশীলত্ব দেখাইবার জন্য কালী রণ-রঙ্গিণী। বুঝলে ভায়া ?"

ক্ষেত্রনাথ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন "বুঝলাম। তোমার ঐ শিবঠাকুরটি আর আমাদের স্বয়ং কৃষ্ণঠাকুরটি পুরুষগুলাকে চিরকালের জন্য মাটী ক'রে গেছেন। একজন তো পদতলে প'ড়েই রইলেন ; আর একজন বললেন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' শুধু তাই নয়, আরও বললেন :—

'যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।'

ব্যাপার বোঝ ! ঠাকুরেরা যখন এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন, তখন ক্ষুদ্র মানুষের কথা ছেড়ে দাও।"

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "যখন এমন নজীর রয়েছে, তখন আর দুঃখ করা কেন ? আচ্ছা, এখন থাক্ এ সব কথা—বেশ কথা আমার মনে হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের এই নূতন সেশন্ আরম্ভ হয়েছে। তোমার সুরেনকে এই সময়ে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি তো শীঘ্রই ছুটী নেবে। সুরেন থাকবে কোথায় ?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "কোথায় থাকবে ?—আমার বাসায় হে। বাসায় বামুন চাকর সবই থাকবে। একটী নূতন সবডেপুটী এখন আমার বাসায় আছেন। তিনিও থাকবেন। তুমি সুরেনকে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেশ কথা। আমি একটা ভাল দিন দেখে তাকে নিয়ে যাব। আর অমনি একবার আসানশোল পর্য্যন্ত গিয়ে কয়লার হিসাবও মিটিয়ে আসব।"

সেই সময়ে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন "১৫ই ফাল্গুনেই বিবাহ হ'বে। সতীশের কোনও অমত নাই।" তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

বৈকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া সাইকেলে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে গমন করিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

উৎসাহের জয়

কোন একটা আদর্শের সন্ধানে যে যাত্রা করেছে তার কি অসীম শক্তি! কোনো-কিছু পাবার জন্যে, কোনো কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে, যে পণ ক'রে বসেছে, সে রোগ শোক কষ্ট নীরবে সহ্য করে, কুৎসা অপমান বিদ্রূপ মাথা পেতে নেয়, শত অত্যাচার তাকে দমন করতে পারে না।

* * *

পারীর এক চিত্রশালায় একটি সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি যে কল্পনা করেছিল সে দীনহীন দরিদ্র, সামান্য এক কুটীরের মধ্যে বাস করত। অনশন অনাহার তার নিত্য সহচর হলেও তার অন্তরের সৌন্দর্য্যপিপাসাকে রোধ করতে পারে নি। হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য সাড়া দিত, তাকে রূপদান করাই ছিল তার কাজ, তার সাধনা। মাটির মূর্ত্তিটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন ভয়ানক তুষারপাত হ'ল। সর্ব্বনাশ! মূর্ত্তিটি তখনো কাঁচা; কাদার মধ্যেকার জল যদি জমে যায় তবে ত মূর্ত্তিটি নষ্ট হয়ে যাবে! তার এতদিনকার সাধনা, যার জন্যে সে এত দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিয়েছে তা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সে তাড়াতাড়ি সামান্য যা-কিছু বিছানা ছিল তা দিয়ে মূর্ত্তিটিকে মুড়ে ফেলে জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে রইল। শীতে হাত পা জমে যেতে লাগল, হাড়গুলো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল, মৃত্যুর শীতল হস্ত যেন তাকে একেবারে বেষ্টন করে ফেলেছে। প্রভাতে দেখা গেল সে মরে গেছে। কিন্তু অন্য ভাস্করেরা সেই মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠন ক'রে তুলে মৃত শিল্পীর কীর্ত্তিকে অমর করেছে!

* * *

আন্তরিক অনুরাগ ও উৎসাহ ব্যতিরেকে কেনো বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায় না। যা অতি কুৎসিত তাও যেমন তরুণ প্রেমিকের চোখে স্বর্গসুষমায় ভ'রে ওঠে, তেমনি উৎসাহ থাকলে লোকে শুষ্ক নীরস বিষয়েরও একটা নূতন অর্থ দেখতে পায়। তরুণ প্রেমিকের প্রেমের আগ্রহে যেমন অনুভব করবার শক্তি ও দেখবার শক্তি বেড়ে যায়, সে প্রেমপাত্রীতে এমন কত গুণ কত সৌন্দর্য্য দেখে যা অন্যের দেখা অসম্ভব; তেমনি উৎসাহী পুরুষেরও উৎসাহের ব্যগ্রতায় চোখ খুলে যায়, সে এমন সব নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের সংবাদ পায় যা উপভোগ করতে করতে কঠোর শ্রম দুঃখ দৈন্য নির্য্যাতন সবই সে উপেক্ষা করতে পারে।

ডিকেন্স্ বলতেন যে তাঁর গল্পের বিষয় ও পাত্রপাত্রীগুলো তাঁকে যেন পেয়ে বসত, ভূতের মত সদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরত, সেগুলোকে লিখে ফেলতে না পারলে তাঁর আর বিশ্রাম বা নিদ্রা উপভোগ করবার জো ছিল না। এক একটি চিত্র সৃজন করতে তিনি মাসখানেক ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতেন, যখন বার হতেন চেহারা দেখে বোধ হ'ত যেন তিনি খুন করেছেন!

ভিক্তর হ্যুগোর লেখার ঝোঁক চাপলে তিনি তাঁর বাইরে যাবার পোষাক পরিচ্ছদ বন্ধ করে রেখে ঘরে খিল দিয়ে লিখতে লেগে যেতেন—যা লিখতে চাই তা সম্পন্ন করে তবে উঠতে হবে—না হোক আহার, না হোক নিদ্রা, না হোক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

গ্ল্যাডষ্টোন্ বলতেন, প্রত্যেক বার্দ্ধক্যের নিজস্ব

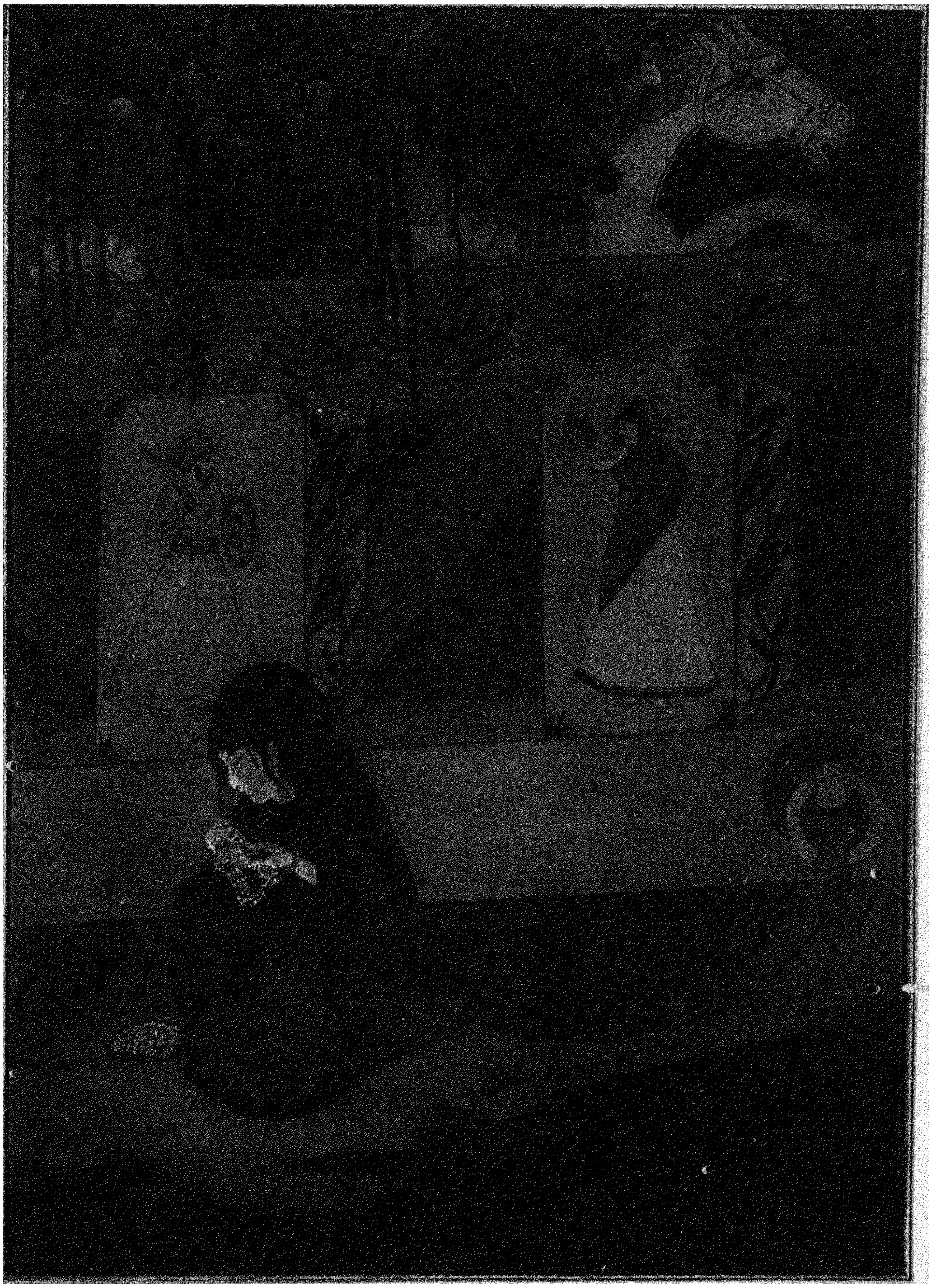

রথের পাশে রাধারাণীর মালা গাথা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

তাঁদের গাছের শিকড় আর জল,—সব সহ্য করছেন তাঁরা স্বাধীনতা লাভের জন্যে! এই সব লোকের সঙ্গে কি আমাদের যুদ্ধ করা পোষায়?

* * *

ঔদাসীন্য কখনো কোনো সেনাদলকে জয়ী করেনি, পাষাণের গায়ে মৃত্যুহীন মূর্ত্তি রচনা করেনি, স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতির শক্তি আয়ত্তাধীন করেনি, নয়নমোহন নিকেতন নির্ম্মাণ করেনি, কবিতা দিয়ে কারো চিত্ত আর্দ্র করেনি, অসামান্য বদান্যতায়ও জগৎ স্তম্ভিত করেনি। কিন্তু উৎসাহ, সে করেনি কি? সে যেমন নাবিকের দিকনিরূপণের সদাচঞ্চল সূক্ষ্ম কাঁটাটিকে বসিয়েছে তেমনি আবার মুদ্রাযন্ত্রের প্রকাণ্ড লৌহদণ্ডকেও চালিত করেছে। সে-ই গ্যালিলিওর চোখের সামনে শত শত অজানা জগতের ছবি উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছিল, মৃত্যুর বিভীষিকাও তা ম্লান করতে পারে নি; সে-ই কলম্বাসের তরণীর পালে হাওয়া লাগিয়েছিল। শাণিত কৃপাণ-হস্তে সে স্বাধীনতার সকল সংগ্রামে যোগ দিয়েছে, নির্ভীক মানব যখন জঙ্গল কেটে সভ্যতা বিস্তারের প্রয়াস পেয়েছিল তখন তার কুঠারে অধিষ্ঠান করেছে, অখিল বিশ্বের সকল মহাকবির লেখনীমুখে সে প্রকাশিত হয়েছে।

অসামান্য প্রতিভাবান্ সঙ্গীতের ওস্তাদ বীথোভেনের জীবনীকার লিখেছেন—শীতকালে এক জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যায় আমরা দুজনে বনের একটি অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম, হঠাৎ একটি নগণ্য বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি বল্লেন 'চুপ! ও কি শব্দ। আমারই বাজনা যে! শোন শোন কি সুন্দর বাজাচ্ছে!' বাজনার শেষের দিকটায় সহসা বাজনা থেমে গেল, শোনা গেল কে যেন করুণকণ্ঠে আক্ষেপ করছে, 'আর আমি বাজাতে পারব না। এখানটা এত সুন্দর, আমার সাধ্য নয় বাজানো। আহা একবার যদি কলোনের কন্সার্ট শুন্তে যেতে পারতুম!' তখন আর একজন বল্লে 'না দিদি, দুঃখ কোরো না, উপায় যখন নেই তখন আর দুঃখ ক'রে কি হবে বল? আমরা ত বাড়ীভাড়াই দিতে পারি না!' তখন প্রথম ব্যক্তি বল্লে 'তোমার কথাই ঠিক! কিন্তু তবুও জীবনে অন্ততঃ একটিবার ভালো বাজনা শুন্তে ইচ্ছে করে। কিন্তু ইচ্ছে করেও ত কোনো ফল নেই!'

বীথোভেন বল্লেন, 'চল ভিতরে যাওয়া যাক।' 'ভিতরে? ভিতরে গিয়ে কি কর্বেন?' তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন, 'আমি ওকে বাজিয়ে শোনাব। এই ত এখানে শক্তি আছে প্রতিভা আছে হৃদয় আছে!" দ্বার ঠেলে দেখলেন, একটা টেবিলের ধারে ব'সে এক যুবক জুতা মেরামত করছে ও একটী পুরাণো পিয়ানোর উপর একটি তরুণী বালিকা বিষণ্ণমুখে নত হয়ে আছে। বীথোভেন বল্লেন, 'মাপ করবেন আমাকে। বাজনা শুনে এখানে আসবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। আমিও বাজাতে পারি। আপনাদের কথাবার্ত্তা আমি কিছু কিছু শুনেছি। আপনারা শুনতে চান—মানে আপনারা ইচ্ছে করেন—মানে—এই আমি কি বাজিয়ে শোনাব?'

মুচি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বল্লে—'কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা জঘন্য, স্বরলিপিও কিছু নেই।' 'স্বরলিপি নেই! তবে উনি কেমন ক'রে—আমায় মাপ করবেন,' বীথোভেন দেখলেন মেয়েটি অন্ধ, 'দেখতে পাইনি। তা হ'লে আপনি শুনে বাজান! কিন্তু শোনেনই বা কোথা? আপনি ত কনসার্টে জান না!' 'আমরা ব্রুলে বছর দুই ছিলুম। আমাদের বাড়ীর কাছেই একটী মহিলা থাক্তেন। তিনি বাজাতেন আমি শুন্তুম। গ্রীষ্মের সময় সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ীর জানলা প্রায়ই খোলা থাকত, আমি বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শুন্তুম।'

বীথোভেন পিয়ানোয় বসলেন। সেই অন্ধ মেয়েটী ও তার ভায়ের কাছে তিনি যেমন বাজালেন তেমন আর তাঁকে কখনো বাজাতে শুনিনি। পুরাণো যন্ত্রটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। ভাইবোনে তন্ময় হয়ে শুন্তে লাগল, বাজনা একবার ওঠে একবার নামে, তালে তালে বাহিরের বাতাসে ভেসে চলে। হঠাৎ বাতির আলো দপ দপ ক'রে উঠল, ম্লান হয়ে এল, তারপর একবার কেঁপে উঠে নিবে গেল। তখন জানলা খুলে দেওয়া হ'ল, চাঁদের আলোয় ঘর ভেসে গেল। যেন কি ভাবে বিভোর হয়ে তিনি বাজনা থামালেন।

মুচি মৃদুস্বরে বল্লেন—'অদ্ভুত লোক! কে আপনি? কি করেন আপনি?'

তিনি 'শোন' ব'লে অন্ধ মেয়েটি যে গৎটি বাজিয়েছিল, তাঁর স্বরচিত সেই গৎটি আরম্ভ করলেন। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না ভাইবোনে আবেগপূর্ণকণ্ঠে ব'লে উঠল—'তা হ'লে আপনিই বীথোভেন!' তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন; তারা বল্লে 'আর একবার বাজান, আর একটিবার।'

নির্মেঘ শীতের আকাশে তারাগুলি স্নিগ্ধ আলো জ্বেলে রেখেছিল, তিনি চিন্তান্বিতভাবে সেদিকে চেয়ে চেয়ে বল্লেন—আমি একটি জ্যোৎস্নার সুর রচনা করব। তারপর তিনি একটা করুণ সুর বাজাতে লাগলেন। কি সুন্দর সে সুর! জ্যোৎস্না যেমন নিঃশব্দ-চরণে ধরণীর ওপর নেমে আসে এ সুরটিও তেমনি ধীরে ধীরে যন্ত্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে; তারপর ক্রমে সুরটি উদ্দাম হয়ে উঠল, পরীরা যেন তৃণভূমির ওপর নৃত্য জুড়ে দিয়েছে; সুরের শেষটা যেন তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি উদ্বেগে পূর্ণ,—কে-যেন কি-এক-অজানা ভয়ে ভীত হয়ে ত্বরিতগতিতে পালিয়ে যাচ্ছে! বাজনা থামলে আমরা অবাক হয়ে রইলুম। আমরাও সুরের সঙ্গে কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিলুম!

তিনি দ্বারের দিকে এগিয়ে বল্লেন—'বিদায়।' ভাই-বোন্ সমস্বরে ব'লে উঠল—'আবার আসবেন ত?' বীথোভেন তাড়াতাড়ি বল্লেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ আবার আসব। মেয়েটিকে বাজাতে শেখাব। বিদায়!' আমাকে বল্লেন—'শীগ্‌গির ফিরে চল্, মনে থাকতে থাকতে সুরটা লিখে ফেলতে হবে।'

তাড়াতাড়ি ফিরে গেলুম। পরদিন যখন তিনি সুবিখ্যাত 'মুনলাইট সোনাটা'র সমস্ত সুরটি কাগজে লিখে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠলেন তখন অনেক বেলা।

* * *

গিলবর্ট বেকেট নামক একজন ইংরাজ ক্রুসেডের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এক মুসলমান রাজপুত্রের দাস হয়েছিলেন। ক্রমে তিনি প্রভুর বিশ্বাস ও প্রভুকন্যার প্রেম-লাভে সমর্থ হয়ে একদিন সুযোগ বুঝে স্বদেশে পলায়ন করলেন। মেয়েটিও প্রেমাস্পদের সন্ধানে বাহির হবার জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি মাত্র দুটি ইংরাজি কথা শিখেছিলেন—লণ্ডন ও গিলবার্ট। প্রথমটি বলে তিনি একখানি জাহাজে ক'রে লণ্ডন সহরে উপস্থিত হলেন। তারপর পথে পথে দ্বিতীয় কথাটি জপমন্ত্রের মত বার বার উচ্চারণ ক'রে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে সত্যসত্যই যে পথের উপর গিলবার্টের বাড়ী সেখানে এসে পৌঁছলেন। তার পিছনে বহুলোকের ভিড়, তারা এই রূপসী বিদেশিনীর কার্য্য-কলাপে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। গিলবার্ট ভিড় দেখে জানালার নিকট উঠে গেলেন, তারপর—দূরাগত প্রিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে ঘরে এলেন।

দূরত্বের বাধা প্রেমিকার উৎসাহের নিকট পরাজিত হ'ল।

* * *

উৎসাহের বলে পনের বৎসর বয়সে ভিক্তর হ্যুগো একখানি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছিলেন, সাঁইত্রিশ-বর্ষব্যাপী জীবনের মধ্যে র‍্যাফেল ও বাইরণ জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে গেছেন, আর আলেকজাণ্ডার তরুণ বয়সে এসিয়ার বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন!

উৎসাহ যদি থাকে ত "কেশে পাক ধরলেও" অন্তরের তারুণ্য তার ঘোচে না। উর্ব্বশীর মতই তার যৌবন অনন্ত!

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere-র ফরাশী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ, সুদীর্ঘ ভ্রমণ, ও মৃগয়ায় আসক্তি বশতঃ, মোগল সম্রাটেরা পুরাপুরি কয়েক মাস শিবিরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইতেন।

আরংজেবের কাশ্মীরভ্রমণসম্বন্ধে Bernier বর্ণনা করিয়াছেন:—এই ভ্রমণে দেড়বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। তাঁহার অন্দরমহলের বেগমদিগকে, প্রধান প্রধান

আমীর ও রাজাদিগকে, এবং ৩৫ হাজার অশ্বারোহী, ১০ হাজার পদাতিক, বৃষ-বাহিত বা হস্তী-বাহিত ৭০টা ভারী-ভারী কামান, উষ্ট্র-বাহিত ৬০টা মেঠো কামান তাঁহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত জম্‌কাল একটি তান্‌জামে চড়িয়া গিয়াছিলেন। রাজারা ও আমীরেরা, অশ্বপৃষ্ঠে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে; তাহাদের পশ্চাতে মুন্‌সবদারগণ। আসা-সোটাধারী চোপ্‌দারেরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, এবং কুতূহলী লোকদিগকে তফাতে সরাইয়া দিতেছে। সৈনিকেরা ধ্বজাপতাকা ও ছত্রচামরাদি রাজ-চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে। (১)

কিঞ্চিৎ দূরে, অন্দর-মহল,—অশ্বারোহী-খোজা ও পদাতিক-খোজার দ্বারা সুরক্ষিত। এক-পাল হস্তী; তন্মধ্যে প্রধান হস্তীটি প্রকাণ্ড আকারের;—রত্নখচিত জমকাল সাজে সজ্জিত। তাহার পিঠের উপর বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত হাওদা; এই হাওদায় সম্রাজ্ঞী উপবেশন করেন। মাছি তাড়াইবার জন্য ও ধূলা অপসারিত করিবার জন্য বাঁদীরা ময়ূরপুচ্ছের হাত-পাখা ধারণ করিয়া থাকে।

দুইটি শিবির প্রস্তুত থাকে; সম্রাটের আগমনে এই দুইটি শিবির যথাবিহিত সুসজ্জিত হয়। শিবিরের যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সেইখানে সম্রাটের মহল—দুই metre অন্তর খোঁটা-পোঁতা একটা চতুষ্কোণ বেষ্টনে বেষ্টিত। এই খোঁটাগুলা খুব টক্‌-টকে লাল ফুল-কাটা ছিট্‌-কাপড়ে আবৃত। দুই প্রশস্ত মৃত্তিকাস্তূপের উপর দরবারের দুই বৃহৎ মণ্ডপ;—একটি খাস-দরবারের ও একটি আম-দরবারের মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দুটি খুব উচ্চ ও লাল কাপড়ে মণ্ডিত; লাল রংই, বাদ্‌শার খাস রং। অভ্যন্তরে নানারকমের কাপড়; মখ্‌মল; সোনার জরির ও রূপার জরির কিংখাপ; চিকনের কাজ-করা রেশ্‌মি কাপড়; মধ্য-এসিয়া ও কারামনিয়ার গালিচা। এই দুই মণ্ডপের পশ্চাদ্‌ভাগে মোগলের স্নানাগার, সম্রাটের অন্তঃপুর, ও বেগম-মহল। একটা প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া সম্রাটের মহলে প্রবেশ করিতে হয়। সম্রাটের যানের পুরোগামী শরীররক্ষী অশ্বারোহীগণ এইখানে কতকগুলি অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই দ্বারের সম্মুখে মেঠো কামান হইতে সেলামি-তোপ ধ্বনিত হয়। সম্রাট-অঞ্চলের অনুকরণে রাজা ও আমীরদিগের অঞ্চল; কিন্তু উহাদের মণ্ডপগুলি ততটা জাঁকাল নহে। প্রত্যেক আমীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক-একটি বিশেষ রকমের রং। এই-সমস্ত অঞ্চলেই বাজার বসে এবং এই-সকল বাজারে খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র বিক্রীত হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে শিবির বলা যায়, উহা পূর্ব্বোক্ত স্থানের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে সন্নিবেশিত অশ্বশালা, মুন্‌সবদার ও সৈনিকদিগের তাঁবু, দোকানদার ও কুলি-মজুরদিগের জনতা। আমীর ও মুনসবদারগণ স্বীয় পত্নীদিগকে সঙ্গে আনিয়া থাকে; খুব নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীও অনেক দাসদাসী সঙ্গে আনে; সামান্য একজন ডাক্তার ব্যার্ণিয়ে—ইঁহার সঙ্গে ছিল দুইটী ঘোড়া, একজন সইস্‌; একটা উট্‌ ও উটের একজন চালক, একজন পাচক ও একজন ভৃত্য; এই ভৃত্য আর্দ্রবস্ত্রাবৃত একটা জলের কুঁজা হাতে করিয়া আগে-আগে চলিয়াছে। জল হইতে ভাপ ওঠায় জল বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বলিতে গেলে, এই নগরের লোকদিগের স্থানচ্যুতি সর্ব্বদাই ঘটে।

গরম পড়িবার পূর্ব্বেই খুব ভোরে যাত্রা আরম্ভ করা হয়। সম্রাট ও আমীরগণ পূর্ব্ব-হইতে-প্রস্তুত নিজ নিজ শিবির-বিভাগে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলে পর—শিবির তাড়াতাড়ি খাড়া করিয়া তোলায়, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে—হাঁকাহাঁকি চ্যাঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি,—এবং ধূলারাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন। দিবাবসানে, সৈনিক ও কুলিরা রন্ধনের জন্য ঘুঁটের আগুন জ্বালায়। ইহার ধোঁয়ায় সমস্ত শিবির আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

তাহার পর রাত্রিসমাগমে, যখন ঐ ধূমরাশি অপসারিত হয়, তখন সম্রাটের অঞ্চলে, সারি সারি মসালের আলো দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারা আমীরদিগের মশালধারী রক্ষীগণ, রাত্রিতে সেলাম দিবার জন্য আসিয়াছে। এই মশালের আলোকে উহাদের জরির পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র

(১) ইহা তারকা-চিহ্নিত ভারতীয় নিশান; সূর্য্যের সম্মুখ দিয়া সিংহ চলিয়া যাইতেছে—এইরূপ চিহ্নাঙ্কিত মোগল-নিশান; ও বল্লমের মাথায় ধাতবমূর্ত্তি-বিশিষ্ট কৌকব ও কুব নামক দুই বিভিন্ন ধ্বজা। লালদণ্ডের রাজছত্র, ব্যজনের জন্য একপ্রকার চামর (সাইবান্‌)।—আইন-ই-আকবরীর ফলক-চিত্র দ্রষ্টব্য।

ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। তারপর সমস্ত আলোক নিবাইয়া দেওয়া হয়। পথহারা পথিকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য একটা উচ্চ মাস্তলের উপর হইতে শুধু একটিমাত্র দীপ জ্বলে। কখন কখন চন্দ্রোদয় হইলে, সমস্ত তাঁবুর উপর; ঘুমন্ত মানুষদিগের উপর, ঘোড়াদের উপর, উটদিগের উপর, বৃষদিগের উপর, হাতীদিগের উপর, সেই চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়ে।

প্রধান আমোদ ছিল শীকার। চিতাবাঘ হরিণকে দংষ্ট্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। বাজপাখী বকের উপর ছোঁ মারিতেছে; বুনো হাঁস, দাঁড়-কাক দল বাঁধিয়া বাজপাখীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, বাজপাখীকে চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, কিন্তু পক্ষের গুরুতাবশত তেমন দ্রুতভাবে উড়িতে না পারায়, এবং বাজপক্ষীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায়, উহারা অবশেষে বাজপক্ষীর কবলে পতিত হইতেছে। তারপর মহিষ শীকার এবং নিকট হইতে জালে-বদ্ধ সিংহ-শীকার, তারপর বড় বাঘ ও বড় জাতের চিতা। সেই মৃগয়াভূমির তৃণ এত উচ্চ যে অশ্ব ও অশ্বারোহী তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

* *

সর্ব্বশক্তিমান হইলেও আততায়ীর আক্রমণভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক,—মোগল-সম্রাট সামন্তবর্গের নিকট ও সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট আত্মপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেন: সে বিষয়ে অবহেলা করিলে, লোকে তাঁহার মৃত্যু রটাইয়া দিত; তাঁহার পুত্রগণ ও তাঁহার সেনাপতিগণ বিদ্রোহ করিত। পীড়িত হওয়ায়, সাজাহান নিজ অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন; অমনি তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, শোকচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অরঙ্গজেব এই যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা কখন ভুলেন নাই। তিনি জ্বররোগে মুমূর্ষু হইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে দুইবার করিয়া বাহক-সাহায্যে দরবারে গিয়া প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন।

জীবিত আছেন ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সম্রাট যেমন সামন্তদিগের নিকট আত্মপ্রদর্শন করিতেন, সামন্তেরাও তেমনি স্বকীয় প্রভুভক্তির প্রমাণ দিবার জন্য দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইত। কি রাজপুত রাজা, কি কোন দলের দলপতি, কি সেই-সব ভাগ্য-অন্বেষীর দল যারা বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাচরণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কি সেই-সব মোগল ও তুর্ক যাহারা তখনও অসভ্য-অবস্থায় অবস্থিত, কি যুদ্ধপ্রিয় আফগান ও বেলুচি, কি "মুখে মধু হৃদে ক্ষুর" ভারতীয় মুসলমান—বিশেষত পারসীকগণ—ইহাদের কাহাকেই বিশ্বাস করিবার জো ছিল না। রাজকার্য্য পরিচালনে, আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধানে, যুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতিত্বের ভারগ্রহণে, একমাত্র এই পারসীকেরাই সমর্থ ছিল। সকলেই অর্থ পাইলে আত্মবিক্রয় করিত; এবং অপেক্ষাকৃত যুবা ও সাহসী প্রভু পাইলে, জরাগ্রস্ত ও রুগ্ন প্রভুকে উহারা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হইত।

এইজন্য রাজা ও আমীরেরা বৎসরের একাংশকাল দিল্লিতেই অবস্থান করিতেন। প্রত্যেক আমীরের জন্য এক-এক বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই দিন শুধু সেই আমীরের সৈনিকেরাই সম্রাটের প্রাসাদ রক্ষা করিত। কিন্তু বিদ্রোহস্থলে সম্রাট অন্য রক্ষী নিযুক্ত করিতেন—প্রাসাদ-ঘেরের বাহিরে রাজপুতেরা পাহারা দিত।

প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে,—শিবিরেই থাকুন বা দিল্লিতেই থাকুন—সকল আমীরেরাই সম্রাটকে সেলাম জানাইতে আসিতেন।

শুক্রবারে সম্রাট হাতিতে চড়িয়া বা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া মস্‌জিদে আসিতেন। সমস্ত পথটা বন্দুকধারীরা গুল্মবেড়ার মত সারীবন্দী হইয়া দাঁড়াইত। মিছিলের আগে আগে সোয়ারেরা ঘোড়া ছুটাইয়া যাইত; মিছিলের পশ্চাতে-পশ্চাতে আমীরেরা চলিতেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখমৃত্যু

তোমারি চিন্তার মাঝে বেঁচে আছি আমি,
তোমারি ভাবনা আরে মরিব এবার,
চন্দ্র যথা সূর্য্যকরে জীয়ে দীর্ঘ যামি,
তারি দীপ্তালোকে মরে প্রভাতে আবার!

পঞ্চশস্য

প্রাচীন রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ (The Current Opinion):—

বাইবেলে বর্ণিত ব্যাবেল টাওয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে,—এই সংবাদে প্রাচীনতত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিতেরা একেবারে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। পম্পিআই নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর আর কোনো আবিষ্কার পণ্ডিতসমাজে এমন কৌতূহল জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর হইতে ব্যাবিলনের খননকার্য্য চলিতেছিল। তাহাতে ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ রাজা নেবুকাডনেজার ও তাঁহার রাজধানীর অনেক গোপন ইতিহাস প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সঙ্গে ব্যাবিলোনীয়ার প্রাচীনতম রাজধানী কিস নগরেরও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত অঙ্গনে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার নাম "স্বর্গমর্ত্ত্যের ভিত্তি, জাতীয় দেবতা জমামার মন্দির।" এই ভগ্নাংশের মধ্যে মূর্ত্তি ও পাত্র পাওয়া গিয়াছে,—সেগুলি ৪০০০ বৎসরেরও পুরাতন।

বোগদাদ ও নিনেভের মধ্যবর্ত্তী অসুর নগরের খনন হইতে প্রাচীন আসিরীয় জাতির একটি সুগঠিত সভ্যতার ইতিহাস আবিষ্কারের পন্থা সুগম হইয়া আসিয়াছে। কাল্‌ডীয়ার যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির উপর এখন আসিরীয় শিল্পকলার ছাপ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; সুতরাং শিল্পোন্নতির জন্য কালডীয়া আসিরীয়ার নিকট ঋণী প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। আসিরীয়ার শিল্পসাধনার কেন্দ্র ছিল নিনেভে রাজধানীতে।

কালডীয় ও আসিরীয় জাতির সমস্ত বাড়ী ঘর ইটের তৈরী; এবং এক প্রাচীন সহর ছাড়িয়া নূতন সহর গঠন করিবার যখনই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই প্রাচীন সহরের বাড়ী ঘর ভাঙিয়া নূতন সহর গঠিত হইয়াছে; ইহাতে কোনো সহরেরই একটি পূর্ণ মূর্ত্তি পাইবার জো রাখে নাই। যে-সমস্ত বাড়ী লোকের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল সেগুলিও কালের আক্রমণ এড়াইতে পারে নাই। যে একটি মাত্র অখণ্ড বাড়ী পাওয়া গিয়াছে সেটি সাততলা, এবং প্রত্যেক তলার দেয়ালের বাহির দিক সাতটি গ্রহের নামে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও আকারের ইট দিয়া গাঁথা। এই-সমস্ত বাড়ীর বিরাট পত্তন দেখিয়াই বোঝা যায় যে তাহাদের আয়তন ও আয়োজনটা বড় সামান্য ছিল না।

নিনেভে সহরে অসুর-বনি-পাল রাজার প্রাসাদে একটি লাইব্রেরী আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেই লাইব্রেরীতে হাজার হাজার ফলক-লিপি সংরক্ষিত আছে। এই-সমস্ত লিপি পাঠে জানা যায় যে এগুলি অন্য লিপির নকল; ব্যাবিলোনীয়াতেও অনুরূপ নকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই-সকল ফলক-লিপির মধ্যে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ভাষার সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, পশু পক্ষী ও উদ্ভিজ্জের নাম-তালিকা, ভূগোল-বৃত্তান্ত, কাব্য ও পুরাণপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি দেশের যুবকদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই-সমস্ত ফলকলিপির মধ্যে কতকগুলিতে কাব্যে প্রসিদ্ধ কালডীয় বীর গিজ্‌ধুবর সম্বন্ধে কাহিনী বিবৃত আছে। তাহার একাদশ ফলকে বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্লাবনের অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। এখানেও পাপের আতিশয্যই মহাপ্লাবনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি নৌকা (আর্ক) গঠন করিয়াছিল তাহার নাম সমস্-নপিস্তি বা সূর্য্য; নৌকা প্রথম স্থল পায় নিজির পাহাড়ে; এবং বৃষ্টি হইয়াছিল সাত দিন। এই অমিল হইতে বুঝা যায় যে হিব্রু ও কালডীয় জাতির প্রত্যেকেই অপর কোনো প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া স্থানীয় অবস্থানের সহিত মিলাইয়া মহাপ্লাবনের কাহিনী রচনা করিয়াছিল।

আসিরীয় রাজাদের প্রথম রাজধানী ছিল অসুর। সেই সহরের ডবল দেওয়াল ও পরিখা এবং তোরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীর একেবারে অটুট অভগ্ন অবস্থায় আছে; প্রাচীর-গাত্রে তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপের ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত। বহু প্রাসাদ, মন্দির, জল সরবরাহের এবং জল নিকাশের পয়োনালী, বাজারের মধ্যকার মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত পথের দুধারি দোকানের শ্রেণী, গরিব লোকদের বস্তি, ধনীদিগের খিলানকরা সমাধিমন্দির ও তাহাতে পাথরের কব্জায়

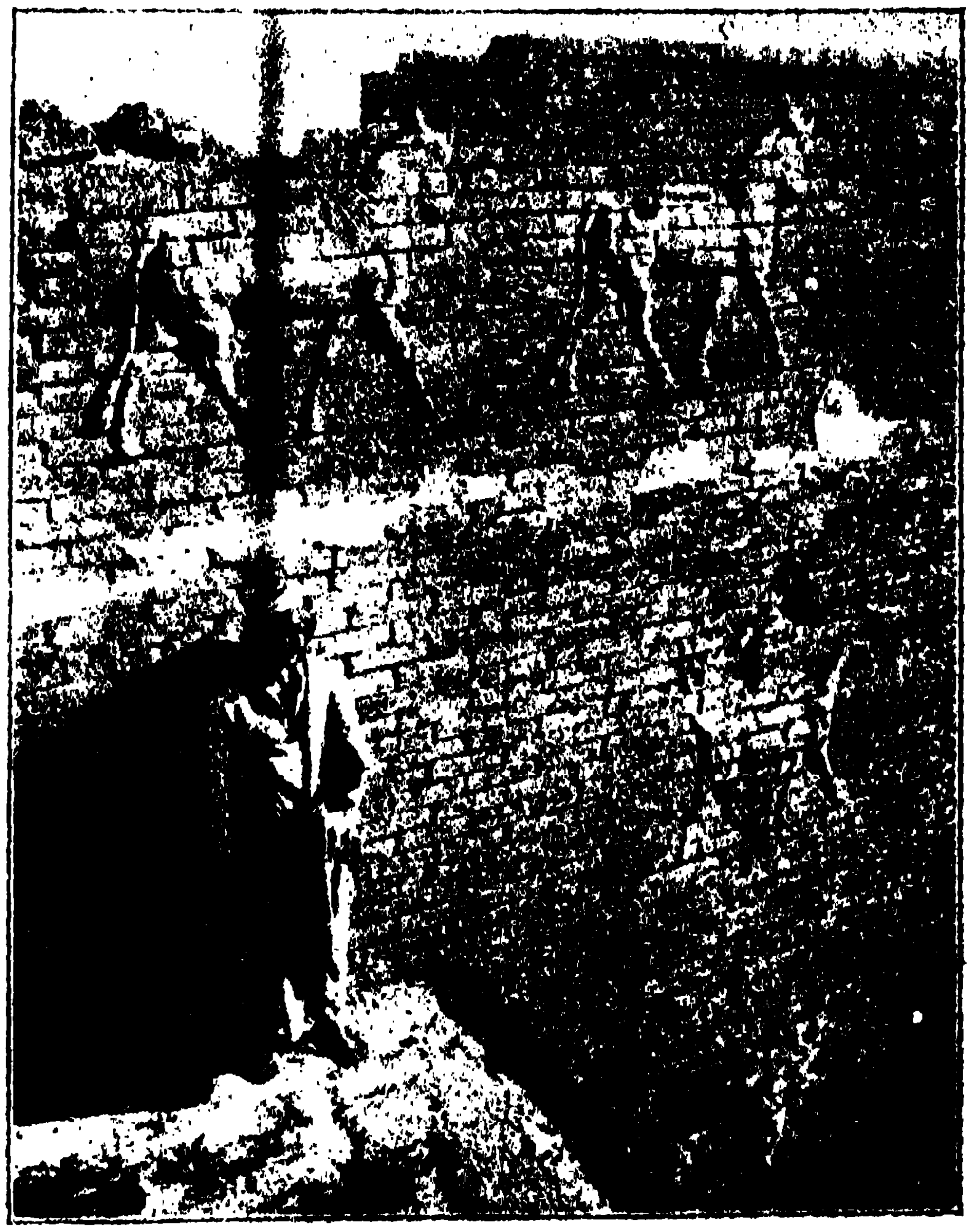

ব্যাবিলনের প্রাচীন প্রাসাদ-প্রাচীরে ইটে গাঁথা ঘোটকমূর্ত্তি।

ঝুলানো অখণ্ড প্রস্তরের দরজা, অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণ প্রস্তর প্রভৃতির অলঙ্কার ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগরের দক্ষিণাংশে, নগর-প্রাচীরের নিকটে একটা ফাঁকা জায়গায় প্রস্তর-স্তম্ভের যেন অরণ্য; এগুলি ৩ হইতে ৮ ফুট উচ্চ অখণ্ড প্রস্তরের; মাথার দিকে আসিরীয় ভাষায় যাহার স্মরণার্থ যে স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে তাহার পরিচয় উৎকীর্ণ আছে। ইহাদের মধ্যে একটিতে শামুরামাত বা পৌরাণিক রাণী শেমিরামিসের নাম পাওয়া গিয়াছে; সকল আবিষ্কারের মধ্যে এই আবিষ্কারটি ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য।

ব্যাবিলোনিয়ার ওয়ারকা নামক স্থানে গিলগমিশ কাব্যের নায়কের বাসস্থান ছিল; ঐস্থানের প্রাচীন নাম এরেক, বাইবেলে উল্লিখিত দেখা যায়। এই স্থানেরও খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ইউফ্রেটিস নদীর বাম কূলে বোগ্‌দাদ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে। নেবুকাডনেজারের কস্‌র্‌ বা কেল্লা-প্রাসাদ সেই অতি পুরাকালের স্থপতিবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটা দেয়ালের গায়ে আশ্চর্য্য কৌশল ও কারিগরীতে ইঁদারা প্রস্তুত। সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তি চৌকা পোড়া ইটে গাঁথা; প্রত্যেক ইটে বিশ্ববিশ্রুত রাজা নেবুকাডনেজারের নাম ও উপাধি ছাপা। প্রাসাদে হাজার খানেক কুঠরি, কিন্তু ছোট ছোট; যে একটি ঘর সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার এক পার্শ্বে একটা ইষ্টক-বেদী আছে—ইহাই বোধ হয় সিংহাসন-পীঠ ছিল।

ব্যাবিলন নগরের মধ্যে একটি পথ দিয়া দেবমূর্ত্তির মিছিল বাহির হইয়া মন্দির হইতে রাজপ্রাসাদে কোনো এক উৎসব-দিনে যাইত; সেইজন্য এই পথটি লোকে পবিত্র মনে করিত। এই পথের

ব্যাবিলোনিয়ায় ভূগর্ভোত্থিত প্রস্তরের সিংহমূর্ত্তি।

মোহড়ায় যে তোরণ আছে, তাহার নাম ইশ্‌তর তোরণ; ইহা বিরাট ও জমকাল রকমের। ইহা এখনো প্রায় অটুট আছে; ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৪০ ফুট; ইহার গায়ে ছয়টি চৌকা গুম্বজ আছে, সেগুলিও পোড়া ইটের গাঁথা, ১২ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চৌড়া, এবং দেয়ালের গায়ে উপরাউপরি সাজানো দেয়ালের গা হইতে উঁচু করিয়া ষণ্ড, সিংহ, ড্রাগন ও কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর মূর্ত্তি গাঁথা আছে। এই মূর্ত্তিগুলির ইটের উপর চকচকে নীল, হলদে ও শাদা পালিশ লাগানো, এবং এখনো নূতনের ন্যায় ঝকঝক করিতেছে। গাঁথনির প্রত্যেকখানি ইট পৃথক পৃথক করিয়া গড়া ও রং করা; কিন্তু এমন কৌশল ও মাপে তৈয়ারী যে সকলগুলি মিলিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট আকারের সৃষ্টি করিয়াছে। অখণ্ড প্রস্তর কুঁদিয়া নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; সে মূর্ত্তিতে পশুরাজের স্বাভাবিক মূর্ত্তির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু পশুরাজের ভাব সেই বৈলক্ষণ্য দ্বারাই সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য কলাবিচারকেরা এই মূর্ত্তির সঙ্গে রোঁদার মূর্ত্তিনির্ম্মাণরীতির সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তাঁহারা প্রাচ্য মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্পের মূলসূত্র আকারের উপর ভাবের প্রাধান্যের সংবাদ রাখিলে বিস্মিত হইতেন না।

আমরান নামক স্থানে ৪০ ফুট মাটির নীচে, আরব হিব্রু পার্থীয় ও পারসিক জাতির বাসচিহ্নের ধ্বংসের তলে ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ এসাগিল মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাবিলনে কতকগুলি মৃৎফলক, মুদ্রা, মৃৎপাত্র, ওজনসামগ্রী, প্রস্তরাস্ত্র, মূর্ত্তি, ও অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। মৃৎফলক হইতে জানা যায় যে ব্যাবিলনের দালালী ব্যবসায় বহু পুরুষ ধরিয়া হিব্রু জেকব বা য়াকুব পরিবারে আবদ্ধ ছিল। একটা ঢোলের আকারের মৃৎপিণ্ডের গায়ে পারস্যরাজ সাইরাস কর্ত্তৃক ব্যাবিলন বিজয়ের সংবাদ লিখিত আছে।

লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইমারতের খিলান রোমানদের উদ্ভাবন। কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বাস্তুবিদ্যা আশ্চর্য্য রকম উন্নত হইয়াছিল দেখা যায়। একটি সুগঠিত খিলান পাঁউরুটির ন্যায় কুব্জপৃষ্ঠ-সমতল পোড়া লাল ইটে গাঁথা। এখানে ইটের ইমারতের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য।

ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ তিনটি বড় ও কতকগুলি ছোট ঢিবিতে পরিণত হইয়াছে। এইগুলিকে বেষ্টন করিয়া অত্যুচ্চ ধূলিস্তূপ নগরপ্রাচীরের স্থান অধিকার করিয়া আছে। হেরোডোটাস বলেন যে এই প্রাচীর ৩৩৫ ফুট উঁচু ও ৮৫ ফুট চৌড়া এবং ৪২ হইতে ৫৬ মাইল ঘিরিয়া ছিল; ইহার চতুর্দ্দিকে ২৫০টি গম্বুজ, ১০০টি পিতলের কপাটওয়ালা তোরণ ছিল। এই স্থলে ব্যাবেল টাওয়ার ও ব্যাবিলনের শূন্যসংস্থিত উদ্যানের অস্তিত্বের প্রমাণ ও অবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

স্থলচর জন্তুর পূর্ব্বপুরুষ (The American Museum Journal):—

বিবর্ত্তনবাদীদের অভিমত যে জলচর মাছই ক্রমশ উন্নত হইয়া স্থলচর জীবে পরিণত হইয়াছে; মাছের ডানা পরিবর্ত্তিত হইলে পাখী, পাখীর ডানা পরিণত হইলে চতুষ্পদ, চতুষ্পদের সম্মুখ পদ পরিণত হইলে বানরের হাত, এবং বানরের হাত পরিণত হইলে পরে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত সমর্থনের উপযুক্ত প্রমাণ এত দিন পাওয়া যায় নাই; অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তের মাঝে মাঝে প্রমাণের অসদ্ভাব থাকিয়া গিয়াছে—সেইগুলিকে লুপ্তসূত্র বলা হয়। এতদিনে একটি লুপ্তসূত্রের খেই ধরা পড়িয়াছে। আফ্রিকায় এক রকম মাছ দেখা গিয়াছে যাহারা জলে থাকিলে কানকো দিয়া নিশ্বাস লয়, আবার ডাঙায় উঠিলে ফুসফুসের কার্য্য আরম্ভ করে; ইহারা ডাঙায় বছর খানেক অনায়াসেই বাস করিতে সমর্থ। এই মাছের জ্ঞাতিরা জগতের বহু পুরাতন অতীত যুগে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; দুই একটি এখনো যে কেমন করিয়া থাকিয়া গিয়াছে তাহাই আশ্চর্য্য। ইহাদেরই বংশধর—উভচর জন্তু, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের চামড়া, পেশী, অস্থি, মস্তিষ্ক, পাখনা সমস্তই মাছ ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝামাঝি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়।

তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন শিশুমূর্ত্তি।

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার শিশুমূর্ত্তি (The Literary Digest) :—

লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি কর্ত্তৃক অঙ্কিত মোনা লিসা বা লা গিয়োকন্দা নামক যে প্রসিদ্ধ চিত্রখানি ফ্রান্সের চিত্রশালা হইতে চুরি গিয়াছিল তাহা ইটালীতে ধরা পড়িয়াছে। এই প্রসিদ্ধ চিত্র চুরি যাওয়া ও ফিরিয়া পাওয়া লইয়া বেশ একটু আন্দোলন হইয়া গেল। এইরূপ অপর একটি আন্দোলন এথেন্সের উপর দিয়া চলিয়া গেছে। এথেন্সের জাতীয় মুাজিয়ম হইতে পনর বৎসর পূর্ব্বে একটি তিন হাজার বৎসরের পুরাতন শিশুমূর্ত্তি চুরি যায়। সেটি সম্প্রতি আমেরিকায় ধরা পড়িয়াছে। এই অমূল্য পুরা-নিদর্শনটি উদ্ধার করিবার জন্য গ্রীস-গভর্ণমেণ্ট দেশে দেশে ছদ্ম পুলিশ প্রেরণ করিয়া বহু পরিশ্রমে এটি উদ্ধার করিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি বালিকার, মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার গলাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

জৃম্ভকাস্ত্র (Technical World Magazine):—

পিট্‌স্‌বার্গের অধিবাসী আলেকজাণ্ডার হাফ্‌ এক রকম বন্দুকের গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আহত প্রাণী তৎক্ষণাৎ গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িবে, কোনো রূপ জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করিবে না। এই গুলি ব্যবহার করিলে যে শুধু শত্রুর প্রতিই দয়া প্রকাশ করা হইবে তাহা নয়, নিজেরও সুবিধা যথেষ্ট—চোরকে একেবারে না মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া ধরা চলিবে, হিংস্র জন্তুগুলি খাইয়া শিকারীকে পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিবে না, যুদ্ধে যমের তাণ্ডব নৃত্য থামিয়া যাইবে, আর ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আদর করিয়া ঘুম পাড়াইয়া কাজ হাসিল করিবে।

এই জৃম্ভক গুটিকার মুখের কাছে ছোট একটি ছিদ্রের মধ্যে একটু আফিংসার বা মর্ফিয়া ভরিয়া তাহার উপর ঢাকনি আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই গুলিতে আহত হইলে হাড় ভাঙিবার সম্ভাবনা থাকে না; ক্ষত গভীর বা মারাত্মক হয় না; এবং আফিংসার শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে শারীরিক কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না। এই গুলির মধ্যে হাসির গ্যাস ভরিয়াও চালানো যায়। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, এমন সময় উহাদের উপর এই গুলিবৃষ্টি

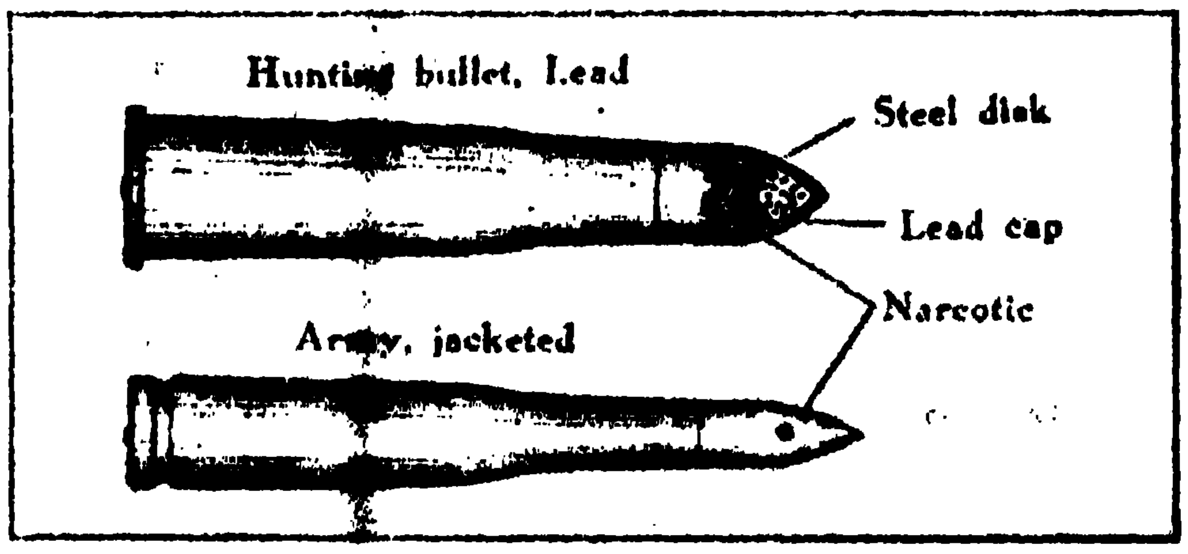

ঘুম-পাড়ানো বন্দুকের গুলি।

করিলে শত্রুসৈন্য হাসিয়া হাসিয়া পাগল হইয়া উঠিবে বা ঘুমে ঢুলিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকিবে, যুদ্ধ করার সাধ্য তাহাদের আর থাকিবে না। যদি কাহারও আঘাত গুরুতর হয়, তবে সে ঘুমের ভিতর দিয়া মহাঘুমে অচেতন হইবে, মৃত্যুর যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে না।

এইবার আমাদের দেশের একদল লোকের বৃথা গর্ব্বের আস্ফালন করিবার সুবিধা হইবে, যে, আমাদের পুরাণের জৃম্ভকাস্ত্র বা সম্মোহন বাণ ফাঁকা কবিকল্পনা নহে, আমাদের দেশে না ছিল কি? আমরা যখন সব আগেই করিয়া চুকিয়াছি, তখন এখন স্বচ্ছন্দে ঘুম দিবার অধিকার আমাদের আছে।

ভূমিকম্পে গৃহ ভূমিসাৎ হওয়ার প্রতিকার (Knowledge, London) :—

জাপানে হপ্তায় অন্ততঃ একবার ভূমিকম্প হয়। জাপানীরা সেইজন্য উহাতে ভ্রূক্ষেপই করে না। ছোট খাটো কম্প ত গ্রাহ্যই করে না; যে কম্পে আমরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া প্রাণের ভয়ে কাতর হই, সে রকম কম্পও তাহাদের কাছে আমাদের এক পশলা মুষলধারের বৃষ্টির মতো এক-আধবারের আলোচনার বিষয়। ইহার কারণ এই যে জাপানীরা ভূকম্পন-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া এমন কায়দায় বাড়ী তৈরী করে যে ভূমিকম্পে তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

সকলেই জানেন যে আগ্নেয় গিরির সন্নিহিত স্থানে ভূমিকম্প হয়; ভূজঠরের জ্বালাবেগ উদ্গিরণ করিবার চেষ্টা ভূমিকম্প হইয়া প্রকাশ পায়, এবং সেই জ্বালা শেষে বাহির হয় আগ্নেয় গিরির মুখ দিয়া। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে জাপান, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অতি ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলিয়া ঐ স্থানগুলি এখনো টিকিয়া আছে; নতুবা আগ্নেয় গিরির বিদীর্ণ মুখ দিয়া ভূজঠরের জ্বালা উদ্গত হইয়া দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত।

ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব থাকাতে জাপানীরা ভূকম্পন-তত্ত্ব (seismology) বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও অনুসন্ধান করিয়া

জাপানের ভূমিকম্প-প্রতিষেধক মন্দির।

থাকে। তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে ভূকম্পনতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক ও বীক্ষণাগার নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং দেশের সমস্ত আবহপরীক্ষাগারে ভূমিকম্প পরিমাপ করিবার যন্ত্র ও ব্যবস্থা আছে।

ভূমিকম্পতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ওমোরী ভারতবর্ষে ইংরেজী পদ্ধতিতে নির্ম্মিত ইমারতের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—যে-সকল ইমারতের মধ্যে বহু কেরাণী, ছাত্র, কয়েদী, সৈন্য প্রভৃতি থাকে সেইসব আপিস, স্কুল, জেলখানা, বারাক প্রভৃতি পক্কা মালমসলায় এবং ভূমিকম্পের নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে তৈরী করা গভর্মেণ্টের পক্ষে অপরাধ বলিয়া মনে করি। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারেরা মনে করে যে কলিকাতার মাটি নরম, ভূমিকম্প সেই নরম তল্‌তলে মাটিতে নাড়া দিলে সে নাড়ায় মাটিই সংহত ও চাপ হইয়া যায়, উপরের ইমারতে সে কম্প সংক্রামিত হয় না। কিন্তু ইহা ভুল ঃ নরম মাটিতে নাড়া পড়িলেই জলের ঢেউয়ের মতো সে নাড়া দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে ; ইহা পরীক্ষিত সত্য।

ভূমিকম্পের অত্যাচার নিবারণের জন্য সমস্ত ইমারতটিকে অখণ্ড সংহত স্তূপ করিয়া গঠন করা উচিত ; সমস্ত বাড়ীর মাপে পুষ্করিণীর ন্যায় গর্ত্ত কাটিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড পীঠ বা বেদির আকারে বনিয়াদ কংক্রীট করিয়া তাহার উপরে দেয়াল থাম প্রভৃতি গাঁথিলে ভূমিকম্পে তলা হইতে উপর পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীটা একই দিকে দোল খাইতে থাকে, তাহাতে বাড়ীর দেয়ালে চিড় খায় না, থাম বা ছাদ খসিয়া যায় না ; কিন্তু কেবল দেয়ালের নীচে নীচে মাত্র বনিয়াদ থাকিলে সমস্ত দেয়াল পৃথক পৃথক থাকে, ভূমিকম্পে বিপরীত দিকের দেয়াল বিপরীত মুখে দোল খায়, এবং তাহাতে দেয়াল ফাটে, থাম পড়ে, ছাদ বসে।

জাপানের বাড়ীর বনিয়াদ হইতে ছাদ পর্য্যন্ত অখণ্ড ভাবে গঠিত হয় বলিয়া অতিবড় ভূমিকম্পেও পড়িয়া যায় না। জাপানের অতি প্রাচীন মন্দিরগুলিও এই পদ্ধতিতে নির্ম্মিত, এবং ভূমিকম্পে দোল খাইবার সময় দীর্ঘ উচ্চ মন্দিরগুলির ভারকেন্দ্র বিচ্যুত হইয়া উল্‌টাইয়া পড়িবার খুব সম্ভাবনা বলিয়া মন্দিরের ভিতরে একএকটি বড় ও ভারি কাঠের চকর ছাদ হইতে মাটির প্রায় কাছাকাছি ঝুলাইয়া দোলক বা পেণ্ডুলামের ন্যায় টাঙানো থাকে, তাহা ভূমিকম্পের দোলায় দোল খাইয়া মন্দিরটির ভারকেন্দ্র বজায় রাখে। ইহাতে ভূমিকম্পে মন্দিরগুলি ঘুরপাক খাইতে পারে, এক স্থান

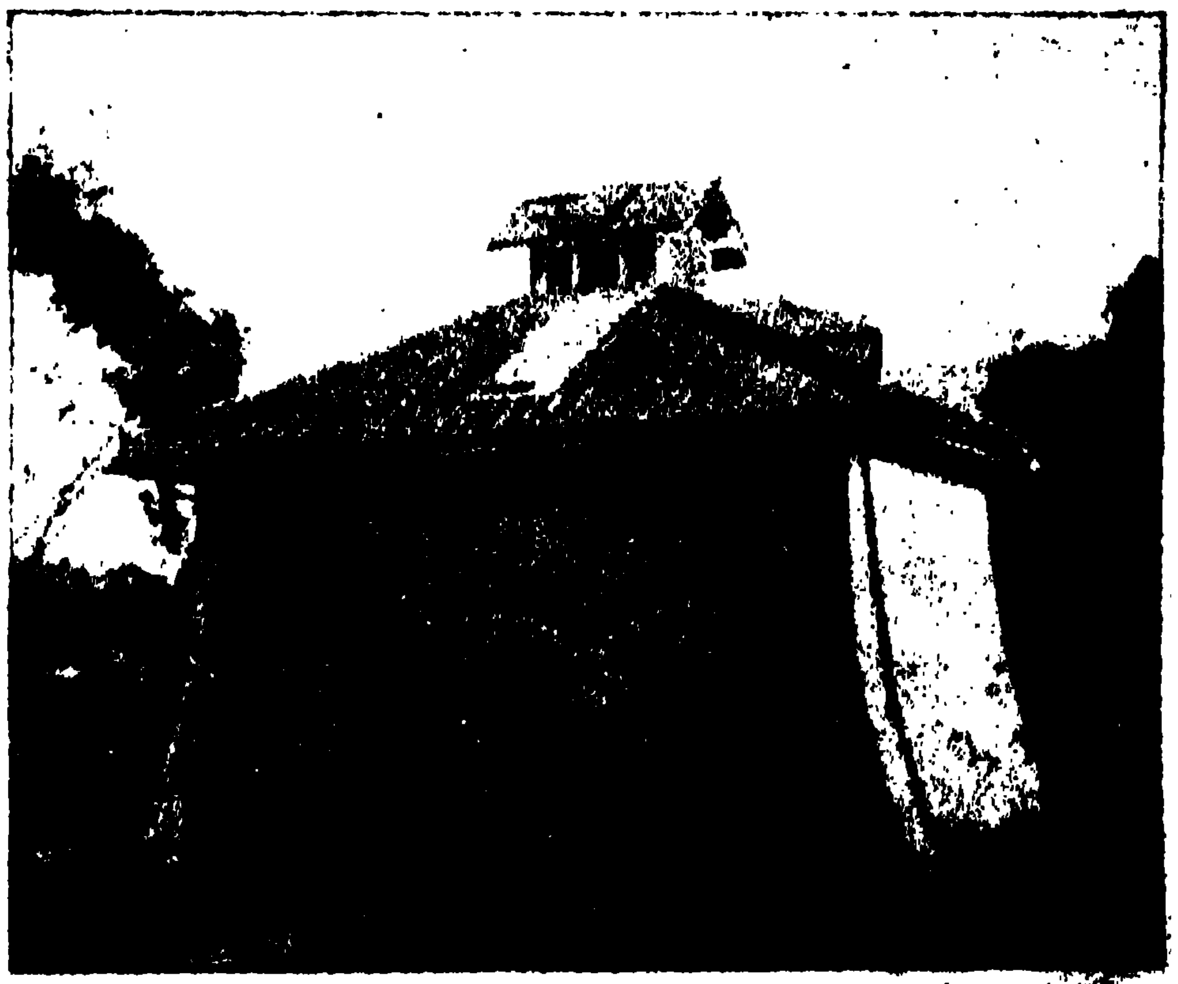

তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প-প্রতিষেধক ভূমিকম্প-বীক্ষণ

হইতে অন্য স্থানে সরিয়া বসিতে পারে, কিন্তু উল্‌টাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে না ; মন্দিরটি একদিকে হেলিয়া পড়িতে গেলেই দোলকটি দুলিয়া অপর দিকে আসিয়া মন্দিরটিকে টানিয়া আবার খাড়া করিয়া তোলে।

ছাগলের দুধই দুধের সেরা (The Literary Digest) :—

সকলের পক্ষে বাড়ীতে গরু রাখিয়া দুধ খাওয়া সম্ভব হয় না, বিশেষত শহরের লোকের। কেনা দুধের মধ্যে কত কি ভেজাল থাকে, অনেক সময় যক্ষ্মা- বা ক্ষয়রোগ- বা বসন্তরোগগ্রস্ত গরুর দুধ গয়লারা অনায়াসেই চালাইয়া দেয় এবং রুগ্ন গরুর দুধ খাইয়া লোকেরও সেই সেই রোগ হয়। এই দুগ্ধসমস্যা মিটাইবার জন্য সমাজহিতৈষী পণ্ডিতেরা ব্যস্ত আছেন ; কেহবা কৃত্রিম দুগ্ধের কল উদ্ভাবন করিতেছেন, কেহ বা গরুকে সুস্থ নীরোগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহবা নীরোগ অপর জন্তুর দুধ গরুর দুধের পরিবর্ত্তে চালানো যায় কি না তাহার সন্ধান করিতেছেন।

আমেরিকার বাফেলো (মহিষ) শহরের ডাক্তার বুল (বৃষ) বলেন যে দুধাল জন্তুদের মধ্যে ছাগলই একমাত্র জন্তু যাহার ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগ হয় না, ছাগলের দুধের পুষ্টিকরতাও [illegible] সহজে ছাগল পোষার সুবিধাও খুব বেশী। লোকে কথায় বলে—ছাগলে কি না খায় ? পাগলে কি না বলে ? বাড়ীর কুটনো-কোটা ওচলা ফেন খাওয়াইয়াই একটা ছাগল পোষা চলে। ছাগল খুঁটিয়া খাইয়া ছাড়া চরিয়া বেড়াইতে পাইলে ত কথাই নাই। ছাগল

ঐক বিয়ানে অনেকগুলি বাচ্চা বিয়ায়, তাহাতেও লাভ যথেষ্ট। হিসাব করিয়া দেখিলে গরু পোষার চেয়ে ছাগল পোষায় লাভ ঢের বেশী হয়— (১) ছাগলের আকার ও আহারের অনুপাতে ভালো জাতের ছাগল গরুর চেয়ে বেশী দুধ দেয়; (২) ছাগলের দুধ গরুর দুধ অপেক্ষা পুষ্টিকর, পোষ্টাই পদার্থে পূর্ণ, অথচ শীঘ্র হজম হয়। গরুর দুধ আর ছাগলের দুধের স্বাদে বিশেষ পার্থক্য নাই। সব চেয়ে বেশী বাঁচোয়া যে ছাগলের যক্ষ্মা রোগ হয় না। তারপর সু-প্রজনন বিদ্যার নিয়মানুসারে বাছাই-করা ছাগলের সন্তান উৎপাদন করিতে থাকিলে কালে আকারে বৃহৎ, প্রচুর দুগ্ধবতী ছাগী লাভ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

চারু।

ছাতা *

(গল্প)

মিসেস ওরিলী কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। আধলাটীর অবধি তিনি বিলক্ষণ মূল্য জানিতেন। জীবনে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল অর্থসঞ্চয়! বাটীর চাকর দাসী কখনও তাঁহার নিকট হইতে পাইপয়সাটী অবধি ভোগা দিয়া লইতে পারে নাই; মিঃ ওরিলীও হাতখরচ কিছু পাইতেন না। সৌভাগ্যক্রমে ওরিলী-দম্পতির কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই; মিসেস ওরিলী এজন্য একটুও দুঃখিত ছিলেন না, বরং সে বাজে খরচের হাত এড়াইয়া সুখীই হইয়াছিলেন। তাঁহার হাত দিয়া যেদিন বাজারের দেনা মিটিত বা কোন অনিবার্য্য কারণে একটী মোটা রকমের টাকা বাহির হইয়া যাইত, সেদিন তিনি সে শোক বহুকষ্টেও সম্বরণ করিতে পারিতেন না; বুকে বাঁশ দিয়া দলিলে যেমন যন্ত্রণা হয় তিনিও তেমনি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকিতেন। সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না এবং পরদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইত।

মিঃ ওরিলী মধ্যে মধ্যে বলিতেন,—"দেখ, আর একটু হাত ছেড়ে খরচ কর; আমাদের যেমন আয় সেই মত না থাকলে লোকের কাছে নিন্দে শুনতে হয়।"

"হয় ত বুড়ো বয়েই গেল। কাল কি হবে কে বলতে পারে? তখনকার জন্যে একটা মোটা রকম সঞ্চয় ক'রে রাখাই ত বুদ্ধিমানের কাজ!"

মিসেস ওরিলীর বয়স হইয়াছিল প্রায় চল্লিশের হেরাফেরি; ঝরঝরে তরতরে বেঁটে খাট মানুষটী। মেজাজটী ছিল একটু উগ্র!

পত্নীর শাসনদণ্ডে বেচারা ওরিলী একেবারে মুশড়াইয়া পড়িতেছিলেন; তাঁহার আত্মসম্মানও সে শাসনে অনাহত থাকিত না।

মিঃ ওরিলী যুদ্ধ বিভাগের হেডক্লার্ক ছিলেন। সেখানেও তিনি যে-কিছু কর্ম্ম করিতেন সকলই তাঁহার পত্নীর নির্দ্দেশ অনুসারে; মাসের শেষে আবশ্যকের অধিক বেতন আনিয়া পত্নীর শ্রীকরকমলে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন; তাহা হইতে পত্নীর বিনানুমতিতে এক কপর্দ্দকও তাঁহার খরচ করিবার অধিকার ছিল না।

আজ প্রায় দুইবৎসর হইল তিনি এই আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন; সেই যে প্রথমে পত্নী তাঁহাকে একটী শত-তালিযুক্ত ছাতা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন সেটী আজিও বদলান হয় নাই। আফিসের সামান্য লোক হইতে ম্যানেজার অবধি সকলে তাঁহাকে সেই ছাতা লইয়া তামাসা করিত; নিরীহ বেচারা নীরবে সকলের কথা সহ্য করিয়া যাইতেন, কোন কথা কহিতেন না। ক্রমে যখন সে ঘটনা উত্তরোত্তর বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি পত্নীর নিকট একটী নূতন ছাতা চাহিয়া ফেলিলেন। সেদিন মিসেস ওরিলী ছয়শিলিং আট পেন্স খরচ করিয়া স্বামীকে একটী নূতন ছাতা কিনিয়া দিলেন। বেচারা ওরিলী কিন্তু লোকের তামাসার হাত এড়াইতে পারিলেন না। সহকর্ম্মীরা তাঁহার ন্যায় একজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে এরূপ খেলো জিনিষ কিনিতে দেখিয়া নূতন করিয়া শ্লেষ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ছাতাটাও ভাল উৎরাইল না; তিনমাস যাইতে না যাইতেই সেটা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তীব্র বিদ্রূপ-হাস্যে বিশাল অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত হইল। স্বভাব নীরস কেরাণীকুলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি এই বিষয় লইয়া একটা ছড়াও বাঁধিয়া ফেলিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি সেই ছড়া শুনিতে শুনিতে মিঃ ওরিলীর কান ঝালাপালা হইয়া উঠিত।

* Guy de Maupassantর ফরাসী গল্পের অনুবাদক Mrs. Ada Galsworthyর অনুমতি অনুসারে অনূদিত। অনুবাদকর্ত্রী অনুমতি দান করিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

—লেখক।

ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি পত্নীকে একটী নূতন ছাতার জন্য বলিলেন। এবার যেন ষোল শিলিংএর কম না হয় পুনঃ পুনঃ সে কথা বলিয়া দিতেও ভুলিলেন না এবং ছাতাটী যে সত্যই ষোল-শিলিং মূল্যের তাহার প্রমাণ স্বরূপ দোকানের রসিদ আনিয়া দেখাইতে বলিলেন। মিসেস্ ওরিলী আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একটী চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্সের ছাতা আনিয়া স্বামীকে দিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে জানাইলেন,—"এবার দামী ছাতা কিনে দিয়েছি, অন্ততঃ পাঁচবছর এটা চলা চাই !"

সে দিন আফিসে আর কেহ মিঃ ওরিলীকে তামাসা করিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় ছাতা হাতে লইয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিতেই মিসেস ওরিলী চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন,—"ওইত না, অমন ক'রে বেঁধে রাখলে সিল্কের ছাতা ক-দিন টে'কবে ? অমনি করেই ত ছে'ড়ে ! এবার আর তা ব'লে শীগ্‌গির ছাতা কিনে দিচ্ছি না।"

তিনি ক্ষিপ্রহস্তে স্বামীর নিকট হইতে ছাতাটী লইয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। সযত্নে ভাঁজগুলি সোজা করিয়া দিতে গিয়া তিনি ভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ছাতার মধ্যে একটী আধলার মত ছেঁদা দেখা যাইতেছিল। নিশ্চয়ই এ সিগারেটের আগুনে পুড়িয়াছে !

ক্রোধরুদ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —"বলি, এ হয়েছে কি ?"

মিঃ ওরিলী এবিষয় কিছুই জানিতেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলছ ? হবে আবার কি ?"

"হবে আবার কি ?—হবে আবার কি ?—" রাগে তাঁহার কথা যোগাইতেছিল না—"এটা—ওর নেই এ করেছে,—এই ছাতাটা—তোমার ছাতাটা এর মধ্যেই এ করেছ—পুড়িয়ে ফেলেছ ! পাগল নাকি ? কি হাড়হাবাতে ! আমাদের তুমি পথে বসাতে চাও ?"

মিঃ ওরিলী ভয়ে কতকটা বিবর্ণ হইয়া গেলেন ; স্ত্রীর দৃষ্টি হইতে এই পরিবর্ত্তন গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি বলছ তুমি ?"

"বলছি—এর মধ্যেই ছাতাটা পুড়িয়ে বসেছ ? এই দেখ না, চোখের মাথা ত খাও নি !"

প্রহারোদ্যতার মত প্রচণ্ড বেগে তিনি ছাতার ফুটাটী লইয়া একেবারে স্বামীর নাকের নিকট ধরিলেন।

মিঃ ওরিলী হতবুদ্ধির মত একটু হটিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ওটা—ওটা—আঁা, ও-আবার কি ক'রে হ'ল। কই আমি—আমি ত' তা জানিনা ! সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না, কিছু করিনি। বল ত' তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

"এটা নিয়ে বুঝি তুমি আফিসময় দেখিয়ে বেড়িয়েছ ? —যেন কি একটা রাজত্বি লাভ হয়েছে ! নিশ্চয়ই তাই, আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

"না না, আমি কেবল জিনিষটা কেমন দেখাবার জন্যে একবার খুলেছিলুম, ব্যস্ ! মাইরি বলছি, আর একবারও খুলিনি।"

সে কথা তখন গৃহিণীর কানেই পৌঁছিল না। তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিতে লাগিলেন। শান্তিময় গৃহকক্ষ রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইল।

পুরাতন ছাতা হইতে কাপড়ের একটা টুকরা কাটিয়া লইয়া তিনি সেই ছিন্ন অংশে একটী তালি দিয়া দিলেন ; পরদিন মিঃ ওরিলী সেই বিবর্ণ তালিযুক্ত ছাতাটী লইয়াই আফিস চলিয়া গেলেন। আফিসে পৌঁছিয়া প্রথমে ছাতাটীকে চাবির মধ্যে গোপনে রাখিয়া পরে আপনার কর্ম্মে মন দিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাটীতে পদার্পণ করিতেই গৃহিণী ছাতাটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া অন্য কোন নূতন ক্ষতি হইয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলেন। ছাতাটা খুলিতেই একস্থানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঠিক জ্বলন্ত পাইপের ছাই ঢালিয়া দিলে কাপড় যেমন পুড়িয়া যায় সে স্থানটী তেমনি ভাবে ঝাঁঝরা হইয়া পুড়িয়া গিয়াছিল ! সত্য বলিতে হইলে জিনিষটা একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। সে আর সারিয়া লইবার উপায় ছিল না।

তিনি নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; ক্রোধাধিক্যে কথা কহিতে পারিলেন না। মিঃ ওরিলীও সে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন ; ঝড় উঠিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত বুঝিয়া কম্পিত কলেবরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন; দৃষ্টি বিনিময় হইতেই মিঃ ওরিলী সভয়ে দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটা আসিয়া তাঁহার মুখে লাগিল।

"যত সব লক্ষীছাড়া, হাড়হাবাতে! সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে! জিনিষটা একেবারে শেষ ক'রে এনেছ! আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি,—আর ত ককৃখন কিনে দেবো না"—

আবার দুইজনে যুদ্ধ চলিল। প্রায় একঘণ্টা পরে মিঃ ওরিলী পত্নীকে শান্ত করিয়া জানাইলেন যে তিনি সত্যই এবিষয়ে কিছু জানেন না, কেহ বোধ হয় ঈর্ষাবশে এ কাজ করিয়া থাকিবে।

সেদিন একজন বন্ধুর তাঁহাদের সহিত ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিলে বেচারা ওরিলী নিষ্কৃতি পাইলেন।

তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইয়া গৃহিণী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। ঘটনাটী বুঝাইয়া তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন এখন আর নূতন ছাতা কেনা কোন মতেই সম্ভবপর নহে, এখন উপায়?

নবাগত ভদ্রলোকটী সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,— "এক্ষেত্রে দেখছি তা হ'লে মিঃ ওরিলীকে বিনা ছাতায় আফিস যেতে হয়, কিন্তু তা হ'লে ত' ওরিলীর জামাজোড়া খারাপ হ'য়ে যাবে; আর তাতে ক্ষতিটা বেশী বই কম হবে না।"

মিসেস্ ওরিলীর রাগটা তখনও সব পড়ে নাই; তিনি বলিলেন,—"বেশ, তা হ'লে ও ওই রান্নাঘরের ছাতাটা নিয়ে আফিস যাবে।"

মিঃ ওরিলী মহা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন,—"সে কিছুতেই হ'তে পারে না, আমি তা পারব না; তা হ'লে কালই আমি চাকরীতে জবাব দেব।"

নবাগত বন্ধু কহিলেন,—"আচ্ছা, ছাতার কাপড়টা ত' বদলে নিলেই চুকে যায়, তাতে ত' আর তেমন খরচ পড়বে না।"

মহাক্রুদ্ধস্বরে মিসেস ওরিলী বলিলেন,—"খরচ পড়বে না! বল কি?—অন্ততঃ সাড়ে-ছ' শিলিং খরচ পড়বে। তবেই হ'ল, হিসেব কর না, চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স, আর গিয়ে ছ'শিলিং ছ'পেন্স, কত হ'ল দেখ না, এক পাউণ্ড এক শিলিং এক পেনী! বাবাঃ! একটা ছাতার পেছনে একুশ শিলিং খরচ ক'রতে হ'লেই ত হয়েছে আর কি!"

নবাগত বন্ধুটী একজন বিচক্ষণ হিসাবী লোক; তিনি অনতিবিলম্বে বলিয়া উঠিলেন,—"তা গিয়ে, এক কাজ কর না; তোমাদের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ কর। তোমার বাড়ীর যে-কোন জিনিষ পুড়লে তারা খেসারৎ দিতে বাধ্য।"

গরম লোহা জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলে যেমন প্রথমটা ছ্যাঁক করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেটা শীতল হইয়া যায়, নবাগত বন্ধুর এই উপদেশ লাভে মিসেস ওরিলীও তেমনি মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া মিঃ ওরিলীকে বলিলেন,—"দেখ, কাল আফিস যাবার আগে একবার 'মেটারনিলি অফিসে' যেও; ছাতার অবস্থা দেখিয়ে দামটা আদায় ক'রে আনবে।"

কথাটা শুনিয়া মিঃ ওরিলী চমকিয়া উঠিলেন।— "নাও, নাও, এ ক্ষতিতে ম'রে যাব না। ভারী ত চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স ক্ষতি হয়েছে—তার জন্যে আমি এ কাজ করতে যাব,—তা আমি পারব না।"

পরদিন মিঃ ওরিলী একটা ছড়ি লইয়া আফিস চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেটা নিতান্ত খেলো জিনিষ নহে। মিসেস ওরিলী একাকী ঘরে বসিয়া সেই ক্ষতির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। সেকথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। ভোজন-টেবিলের উপর ছাতাটী রাখিয়া তিনি অস্থির চিত্তে টেবিলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথাটা ক্রমাগতই তাঁহার মনে আসিতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট গিয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবেন তাহা আর কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। সাধারণের সম্মুখে কখনই তিনি ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না, কে-জানে-কেন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেন; নিজের স্বামীর কাছে ছাড়া অপরের সম্মুখে তিনি স্বভাবতঃই একটু ভীরু, একটু লাজুক!

কিন্তু সে কথা ভাবিতে গেলে এদিকে চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্সের মায়া ত্যাগ করিতে হয়। তিনি আর ভাবিবেন না স্থির করিলেন, কিন্তু সেই ক্ষতির স্মৃতি ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। আচ্ছা বিপদেই পড়া গেছে! করা যায় কি? ক্রমেই সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তিনি তখনও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে জোর করিয়া মন হইতে লজ্জা সঙ্কোচ ভয় দূর করিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন,—"আমি যাব-ই! দেখিনা কি হয়!"

কিন্তু তাহা হইলে ত' ছাতাটা আগে ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। এমনটা হওয়া চাই যাহা দেখিয়া লোকে 'ও কিছুনা' বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিতে পারে! পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া ছাতার একটা অংশ ভাল করিয়া পুড়াইয়া লইলেন। সে স্থানের ছিদ্রটা এতবড় হইল যে হাতের মুঠা তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। অতঃপর ছাতাটীকে সযত্নে গুটাইয়া লইয়া সংলগ্ন ফিতার দ্বারা বাঁধিলেন। আপনার টুপীশাল লইয়া ছাতা হস্তে দ্রুতপদে রু-ডি-রিভোলিতে ইনসিওরেন্স অফিসের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি ক্রমাগত বাটীর নম্বর দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। আর আটাশখান বাড়ীর পরই আফিস। তা ভালই হইয়াছে, ততক্ষণ ভাবিবার সময় পাওয়া যাইবে। যতই অফিসের নিকট আসিতেছিলেন তাঁহার চরণের গতি ততই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ঐ যে দ্বার দেখা যাইতেছে। দ্বারের উপর উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

"লা মেটারনিলি!—
ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানী।"

এই ত আসিয়া পড়া গিয়াছে, এখন! একবার তিনি কয়েক সেকেণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া আর একটু আগে চলিয়া গেলেন, তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন, আবার গেলেন, আবার আসিলেন।

অবশেষে ভাবিলেন,—"এতটা এসেছি যখন ভেতরে একবার যাবই, তবে আর দেরী ক'রে ফল কি, যত শীগ্‌গির হ'য়ে যায় ততই ভাল।"

বাড়ীর দ্বারে প্রবেশ করিতেই তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিল। স্পন্দিত বক্ষে অগ্রসর হইয়া তিনি এক সুবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সে ঘরটার সম্মুখভাগ ক্রিকেট খেলিবার ব্যাটের রাশিতে পূর্ণ; তাহার পশ্চাতে কয়েকটী নরমুণ্ড দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ব্যাটের জন্য দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাইতেছিল না।

কতক্ষণ পরে একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া একজন ভদ্রলোক বাহির হইলেন।

মিসেস ওরিলী শঙ্কাকম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাপ করবেন মশাই, ক্ষতিপূরণের দাবী দেওয়া হয় কোনখানটায় বলতে পারেন?"

ভদ্রলোকটী একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিলেন,—"উপর তলে গিয়ে বাঁহাতি; সেখানে "ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা" বিভাগে আপনার বক্তব্য বলবেন।"

কথাগুলি শুনিয়া মিসেস ওরিলীর মন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল, মনে হইতেছিল ইহার অপেক্ষা চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স ক্ষতি সহ্য করা বুঝি শতগুণে ভাল ছিল। উঃ চৌদ্দ শিলিং সাত পেন্স! টাকাও ত বড় অল্প নহে! টাকার পরিমাণ মনে হইতেই তাঁহার হৃত সাহসের কিয়দংশ ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপর তলে উঠিতে লাগিলেন; লজ্জা ভয় ও শ্রমে তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, শ্বাসগ্রহণের জন্য বার বার দাঁড়াইতে হইতেছিল।

উপরে উঠিয়া সম্মুখেই একটা দ্বার দেখিতে পাইলেন; দ্বারের কড়া ধরিয়া নাড়িতেই ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"ভিতরে আসুন।"

ঘরটী দীর্ঘে প্রস্থে খুব বড়; এতবড় গৃহের মধ্যে মাত্র তিনটী সুবেশধারী ভদ্রলোক কথা কহিতেছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"আপনার এখানে কোন দরকার আছে কি?"

মিসেস ওরিলী উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাইলেন

না; তিনি বল্লিলেন,—"আমি—আমি—আমি একটা দুর্ঘটনার কথা—একটা ক্ষতির কথা বলতে এসেছি।"

ভদ্রলোকটী অত্যন্ত নম্রতা জানাইয়া বলিলেন,—"অনুগ্রহ ক'রে এই একখানা চেয়ারে বসুন, এখুনি আপনার কথা শুনছি।"

তাহার পর তিনি অপর ভদ্রলোক দুইটীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তা দেখুন মশাই, কোম্পানী এ জন্যে আপনাদের ষোল হাজার পাউণ্ডের বেশী দিতে পারেন না; এর ওপর আর চারহাজার পাউণ্ড দেওয়া যেতে পারে না। আমরা হিসেবে"—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন,—"আজ্ঞে, তা হলে আমরা আইনের আশ্রয় নেব; আচ্ছা তবে আমরা আসি।"

তাঁহারা সভ্যতা অনুমোদিত অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিসেস্ ওরিলীর মনে হইতেছিল এই সঙ্গে তিনি যাইতে পারিলে বাঁচিতেন। কিন্তু এখন আর তাহার উপায় নাই। এখন পলাইতে পারিলে তিনি চৌদ্দ শিলিংএর মমতা ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এতটা অগ্রসর হইয়া তিনি এখন ফিরিবেন কোন মুখে?

ভদ্রলোকটী এইবার মিসেস ওরিলীর দিকে ফিরিয়া সসম্মান অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"এইবার আপনার দরকারটা বলুন।"

অতিকষ্টে মিসেস ওরিলী বলিলেন,—"আমি—আমি এসেছি—এই—এইটার জন্যে"—

ডিরেকটার মহাশয় আকুলবিস্ময়ে মিসেস্ ওরিলী-প্রদর্শিত জিনিষটীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

মিসেস ওরিলী ছাতার বাঁধন খুলিতে চেষ্টা করিলেন, দুই তিন বার ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে ছাতাটা খুলিয়া ফেলিলেন।

ভদ্রলোকটী সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"তাইত! ছাতাটা যে একেবারে মাটি হয়ে গেছে দেখছি!"

—"এটা কিনতে আমার ষোল শিলিং খরচ পড়েছে!"

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! —"এঁ, এত প'ড়েছে?"

—"আজ্ঞে; জিনিষটাও বেশ ভাল ছিল, এই দেখুন না!"

—"থাক থাক, আর দেখবার দরকার নেই, জিনিষটা যে খেলো তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা নিয়ে আপনার এখানে আসবার কারণটা বুঝতে পারলুম না।"

মিসেস ওরিলীর মনের মধ্যে একটা কষ্টের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তবে বুঝি কোম্পানী এমন ছোট খাট ক্ষতিপূরণ করেন না!

—"কারণ,—কারণ এটা পুড়ে গেছে!"

—"তা' ত দেখছি।"

আপনাআপনি তাঁহার মুখ বুজিয়া গেল। ডিরেক্টারকে ইহার পর যে কি বলিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল এখনও লোকটাকে সকল কথা খুলিয়া বলা হয় নাই।

—"আমার নাম হচ্ছে মিসেস ওরিলী। এই কোম্পানীর কাছে আমরা ফায়ার ইনসিওর করেছি; সেই জন্যে আজ এই ক্ষতিপূরণের দাবী করতে এসেছি।"—পাছে লোকটা ছাতার দাম দিতে অস্বীকৃত হয় এই ভাবিয়া তখনই আবার বলিলেন,—"আমি আর কিছু চাইনা, ছাতাটা আপনারা সারিয়ে দেবেন, তা হ'লেই হবে।"

ডিরেক্টার মিসেস্ ওরিলীর দাবী শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু—কিন্তু আমাদের ত' ছাতার দোকান নয়। এরকম সারার কাজই বা আমরা হাতে নি কি ক'রে?"

রমণীর স্বাভাবিক কলহস্পৃহা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন সহজে কার্য্যোদ্ধার না হইলে তিনি কলহ করিবেন—নিশ্চয়ই কলহ করিবেন! তখন তাঁহার মনের ভয় কাটিয়া গিয়াছিল।

—"বেশ ত'; তা এটা সারাতে যে খরচ পড়বে সেইটে দিয়ে দিলেই ত চুকে যায়; তা না হয় আমিই কষ্ট ক'রে ছাতার দোকানে নিয়ে যাব।"

অতঃপর ডিরেক্টার কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

—"তা,—কিন্তু—এ একটা ভারি নতুন রকমের। এ রকমের দাবী ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কখনও পূরণ করিনি। এই ধরুন না, রুমাল, দস্তানা, ঝাড়ন, চটি জুতো বা এই গোছের জিনিষ যা দিনের মধ্যে দশ বিশটা পুড়ে যেতে পারে সে রকমের জিনিষ পোড়ার দাবী দিতে গেলে আমরা পেরে উঠি কই?"

রমণীর ক্রোধ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

—"আপনারা কি রকম লোক মশাই, গত ডিসেম্বরে আমাদের একটা চিম্‌নী আগুনে পোড়ে, সে প্রায় বিশ পাউণ্ডে ঘা পড়েছিল, কিন্তু মিঃ ওরিলী এমনি ভদ্দর লোক যে তার জন্যে আপনাদের কাছে এক পয়সাও দাবী করলে না, আর আপনারা কিনা আজ তাঁর এই সামান্য চৌদ্দ শিলিং দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করছেন?"

ডিরেক্‌টার বুঝিতে পারিলেন রমণী মিথ্যা কথা বলিতেছেন। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তা আপনাকে একটা কথা বলি, আচ্ছা যে লোক বিশ পাউণ্ড ক্ষতির এক পয়সা দাবী করলে না সেই লোক আজ চার পাঁচ শিলিং খরচের একটা ছাতা সারাবার দাবী করছে, কথাটা শুনতে একটু কেমন কেমন হচ্ছে না?"

"এতে আর কেমন কেমন কি? সে ছিল মিঃ ওরিলীর নিজের জিনিষ, আর এ হচ্ছে মিসেস্ ওরিলীর! দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক।"

ডিরেক্‌টার বুঝিলেন রমণীর কবল হইতে তাঁহার মুক্তি লাভের আশা নাই, কেবল কথায় কথায় সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র। কাজেই তিনি তর্ক ছাড়িয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বলুন, আপনার ছাতাটা পুড়ল কি ক'রে!"

—"এই বলি শুনুন। আমাদের হল ঘরে ছাতা লাঠি ইত্যাদি রাখবার দেয়ালের গায়ে একটা তাক আছে। কাল বেড়িয়ে এসে আমি ছাতাটা সেইখানেই রেখেছিলুম। হ্যাঁ; সেই তাকের ঠিক ওপরেই বাতি দেশলাই রাখবার একটা কুলুঙ্গী মতন আছে। সন্ধ্যা হ'য়ে গিছল তখন, আলোটা জ্বালব ব'লে দেশলাই জ্বাল্‌লুম। তাই কি ছাই সব জ্বলেগা। প্রথম কাঠিটা ত ঘ'সে ঘ'সে হায়রান, কিছুতেই জ্বল্‌ল না, দ্বিতীয় কাঠিটা যদিবা জ্বলল ত' অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল, তার পরের টাও তাই। চতুর্থটা জ্বেলে তবে আলো জ্বাল্‌লুম।"

ডিরেক্‌টার বলিলেন,—"সেটা বুঝি স্বদেশী দেশলাই।"

মিসেস ওরিলী ডিরেক্‌টারের শ্লেষ বুঝিতে পারিলেন না, আপনার কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"তা হ'বে বা। যাই হোক চতুর্থ কাঠিটা ঠিক জ্বল্‌ল; আমি ত আলো জ্বেলে ঘরে গিয়ে একটু শুলুম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে মনে হ'ল যেন কাপড় পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। চিরকালটা আমি আগুনকে বড় ভয় করি। কখনও যদি আগুন লাগে—অবশ্য ভগবান না করুন, তা যেন না হয়—সে কিন্তু আমার দোষে কখনই হবে না জানবেন। সেই যে চিমনীতে আগুন লাগার কথা বল্লুম সেই থেকে বরাবর আমার প্রাণে একটা আতঙ্ক জেগে আছে। কাজেই ঐ কাপড় পোড়া গন্ধ পাবা মাত্রই আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বেরালের মত চারিদিক শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগলুম। শেষে দেখিনা আমার ছাতাটা পুড়ছে। বোধ হয় সেই পোড়া কাঠিই আমার এই সর্ব্বনাশটা করেছিল। দেখুন ছাতার অবস্থাটা, আহা অমন জিনিষটা গা!

ডিরেকটার মত স্মিত করিয়া ফেলিলেন।

—"তা আপনি এর জন্যে কত দাবী করেন?"

মিসেস ওরিলী সহসা কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে আপন সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"তা আপনার কাছেই এটা থাক না, আপনি সারিয়ে পাঠিয়ে দেবেন আপনার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।"

এ প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন,—"না না, তা আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি কত পড়বে বলুন।"

—"তা—দেখুন—না, আচ্ছা তার চেয়ে এক কাজ করলেই সব চুকে যায়। আমি ছাতা নিয়ে কোন দোকান থেকে মজবুত ভাল সিল্ক বসিয়ে নেব, তারপর তারা যে বিল করবে সেইটে আপনাকে এনে দেব। কেমন, তা হ'লেই বেশ হবে না?"

—"হ্যাঁ সেই বেশ হবে। তা আচ্ছা তবে ঐ কথা

রইল। এই আমি কেসিয়ারকে লিখে দিচ্ছি আপনার যা খরচ পড়বে সে দিয়ে দেবে।"

ডিরেকটারের হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মিসেস ওরিলী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন। তখন তিনি যত শীঘ্র সম্ভব সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ বিলম্বে যদি ডিরেক্‌টারের মতের পরিবর্ত্তন হয় এই ভাবিয়া তিনি কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এবার মিসেস ওরিলী বেশ ফুল্ল মনে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ভাল ছাতার দোকানের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; বেশ একটা বড় রকমের দোকানে পৌঁছিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"এই ছাতাটায় একটা ভাল সিল্কের কাপড় বসাতে হবে। তোমাদের কাছে সব চেয়ে যে সেরা কাপড় আছে বের কর। দামের জন্যে কিছু এসে যাবে না!"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগুনের ফুল্‌কি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা বুড় কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদ্‌লিন পিয়েত্রী অর্সোর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সোর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অর্সো তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার খাতাপত্র ও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দ্দোষী নয়। তখন উত্তেজিত হইয়া অর্সো বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়াতে অর্লান্দিক্‌সিয়ো হঠাৎ ছোরা খুলিয়া অর্সোর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভ্যাঁসান্তেলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিমেষ মধ্যে ছোরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিতাড়িত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অর্সোকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অর্সো যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে।

কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা লিডিয়া অর্সোর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেছেন। অর্সোর ইচ্ছা যে এই গণ্ডগোলের সময় তাঁহারা না আসেন; সে স্থির করিল লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু কলোঁবা বলিল অর্সোর নিজে গিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অর্সো রাজি হইল। যে ঘোড়ায় চড়িয়া অর্সো সকালে রওনা হইবে কলোঁবা রাত্রে গোপনে সেই ঘোড়ার কান কাটিয়া দিল। সকালে তাহা দেখিয়া অর্সো মনে করিল কাপুরুষ বারিসিনিরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া ঘোড়ার উপর ঝাল ঝাড়িয়াছে। অর্সো ক্রুদ্ধ মনে রওনা হইল। পথে বারিসিনিপুত্রদ্বয় লুকাইয়া ছিল; অর্সোকে একা পাইয়া সম্মুখ ও পিছন হইতে একসঙ্গে গুলি করিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে আঘাত মারাত্মক হইল না। অর্সোর একটা হাত ভাঙিয়া গেল। তখন অর্সো এক হাতে দুই গুলিতে দুজনকে বধ করিতে বাধ্য হইল, এবং ব্রান্দোর সঙ্গে পলাইয়া বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।]

(১৯)

অর্সো রওনা হইয়া যাইবার পর কলোঁবা তাহার দূতেদের মুখে শুনিল যে ব্যরিসিনিরা গ্রাম হইতে বাহিরে গিয়াছে; শুনিয়া অবধি সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল,—একবার রান্নাঘরে, একবার শোবার ঘরে, একবার ভিতরে, একবার বাহিরে সে ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, যেন অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজন লইয়া সে কতই ব্যস্ত, কিন্তু সে একটুও কিছু কাজ করিতেছিল না; ছুটাছুটির মধ্যে বার বার সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল গাঁয়ে কোনো নূতন সংবাদ কোনো নূতন রকম গণ্ডগোল শোনা যাইতেছে কি না। বেলা এগারটার কাছাকাছি, গ্রামে একদল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল—ইহারা কর্ণেল নেভিল, তাঁহার কন্যা লিডিয়া এবং তাঁহাদের চাকর-বাকর লোকলস্কর। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়াই কলোঁবার মুখ হইতে প্রথম কথা বাহির হইল—"আপনাদের সঙ্গে দাদার দেখা হয়েছে?" তার পরে সে তাঁহাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল তাহারা কোন পথে আসিয়াছে, ক'টার সময় তাহারা রওনা হইয়াছিল; এবং সে যাহা নাও বলিতে পারিল তাহার উত্তর হইতে কলোঁবা তাহা আন্দাজ করিয়া লইতে লাগিল।

পথপ্রদর্শক লোকটি বলিল—হয়ত আপনার দাদা ওপর পথে গেছেন; আমরা নাবাল পথ দিয়ে এসেছি।

কিন্তু কলোঁবা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক দৃঢ়তা এবং অপরিচিত অতিথিদের কাছে কোনোরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশের লজ্জা সত্ত্বেও নিজের উদ্বেগ ও ব্যস্ততা চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল; এবং শীঘ্রই তাহার উদ্বেগ-চঞ্চলতা কর্ণেল নেভিল এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যা লিডিয়ার মনেও সংক্রমিত হইল। লিডিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিল যে চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিয়া সন্ধান করা যাক; এবং তাহার পিতা স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া পথপ্রদর্শক লোকটিকে সঙ্গে লইয়া অর্সোকে খুঁজিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতিথিদের ভয় ও ভাবনা দেখিয়া কলোঁবার মনে গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া নির্ভাবনার হাসি হাসিতে চেষ্টা করিয়া কর্ণেলকে খাইতে বসিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল এবং বিশ রকম সম্ভব অসম্ভব কারণ দেখাইয়া ভ্রাতার বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে নিজের উদ্বেগে একটা কারণ দেখাইয়া পরক্ষণেই আবার তাহার উল্টা রকম কথা বলিয়া ফেলিতেছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে আশ্বস্ত করা পুরুষের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কর্ণেল একটা কৈফিয়ৎ দিবার জন্য বলিলেন—নিশ্চয় রেবিয়া পথে শিকার দেখেছে; আর যাবে কোথায়, সে সব ভুলে গিয়ে সেই শিকারের পেছনেই ছুটোছুটি করছে; দেখে নিয়ো সে ঝোলা-বোঝাই শিকার নিয়ে এসে হাজির হ'ল বলে'। আমরা পথে আসতে আসতে চারবার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি; আগের দুটো আওয়াজের চেয়ে শেষের দুটো খুব চড়া; তাই না শুনে আমি লিডিয়াকে বল্লাম—নিশ্চয় এ রেবিয়া শিকার করছে, আমার বন্দুক ছাড়া এমন জবর শব্দ আর কোন্ বন্দুকের হ'তে পারে?

কলোঁবা পাংশু হইয়া উঠিল, এবং লিডিয়া তাহা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিল যে তাহার পিতার আন্দাজ হইতে কলোঁবার মনে কিসের সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া ভাবিয়া কলোঁবা বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে বড় আওয়াজ দুটো ছোট আওয়াজ দুটোর আগে না পরে হইয়াছিল। কিন্তু না কর্ণেল, না লিডিয়া, না তাঁহাদের লোকলস্করেরা ইহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল।

একঘণ্টার মধ্যেও কলোঁবার প্রেরিত চরেরা যখন শুভ অশুভ কোনো খবরই লইয়া ফিরিল না, তখন সে সাহসে বুক বাঁধিয়া অতিথিদিগকে পীড়াপীড়ি করিয়া খাইতে বসাইল। কিন্তু এক কর্ণেল ছাড়া আর কাহারো মুখে খাবার রুচিল না। একটু সামান্য শব্দ শুনিলেই কলোঁবা ছুটিয়া জানালায় গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল

এবং কিছু নয় দেখিয়া আরো বিমর্ষ হইয়া স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিতেছিল; তাহার কষ্ট কঠিনতর বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, তাহাকে এইরূপ মনের অবস্থা লইয়াও হাসিখুসি প্রফুল্ল মুখে তুচ্ছ যা-তা বিষয় লইয়া অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিতে হইতেছিল; কিন্তু অতিথিদের কেহই তাহার কথা মন দিয়া শুনিতেছিল না, এবং অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেহ এক আধটা কথা বলিতেছিল মাত্র।

হঠাৎ একটা ঘোড়া ছুটিয়া আসার শব্দ শোনা গেল। কলোঁবা লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—ঐ আমার দাদা আসছে।

কিন্তু অর্সোর ঘোড়ার উপর দুদিকে পা দিয়া শিলিনাকে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া কলোঁবা বুকফাটা দুঃখের স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, আমার দাদা আর নেই গো!

কর্ণেলের হাত হইতে গেলাস ঝনঝন করিয়া পড়িয়া গেল, লিডিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর সকলে সদর দরজার দিকে ছুটিয়া গেল।

শিলিনা ঘোড়া থামাইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই কলোঁবা তাহাকে এক টুকরা সোলার মতো আলূটপ্‌কা তুলিয়া লইয়া এমন জোরে এক ঝাঁকানি দিল যে বেচারার নিশ্বাস আটকাইয়া যাইবার উপক্রম। কলোঁবার ক্ষিপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বালিকা তাহার মনের ভাব আঁচিয়া লইয়া বলিল—দাদাবাবু বেঁচে আছেন!

কলোঁবা তাহাকে ছাড়িয়া দিল, এবং ছোট্ট বিড়াল-ছানার মতো শিলিনা মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। কলোঁবা কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আর ওরা?

শিলিনা নীরবে একবার বুকের উপর হাত দুটিকে আড় করিয়া রাখিল। অমনি কলোঁবার পাঙাশ মুখে রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল; সে তীব্র দৃষ্টিতে একবার বারিসিনিদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া লইয়া হাসিমুখে তাহার অতিথিদিগকে বলিল—চলুন, চা-টুকু জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নেবেন।

ফেরারীদের পরীটির সমস্ত ঘটনাটা বলিয়া শুনাইতে অনেকক্ষণ লাগিল। তাহার গেঁয়ো ভাষা কলোঁবা জো-সো করিয়া ইটালিয়ানে তর্জ্জমা করিয়া লিডিয়াকে, এবং লিডিয়া আবার ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়া নিজের পিতাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া কর্ণেল বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন, লিডিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল, কিন্তু কলোঁবা প্রশান্ত স্তব্ধ, কেবল সে অন্যমনস্ক হইয়া তাহার সৌখীন চা-সেটটিকে মাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিল। কলোঁবা বালিকাকে দিয়া পাঁচ ছয় বার বলাইয়া শুনিল যে ব্রান্দো বলিয়াছে অর্সোর জখম মারাত্মক বা সাংঘাতিক হয় নাই, এবং ওর চেয়েও সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াও মানুষকে বাঁচিতে সে দেখিয়াছে।

বর্ণনা শেষ করিয়া শিলিনা বলিল—দাদাঠাকুর চিঠি লিখবার জন্যে খানিকটা কাগজ নিয়ে যেতে বিশেষ করে' বলে' দিয়েছেন; আরো বলেছেন যে, তোর দিদিঠাকরুণকে বলিস, আজ আমাদের বাড়ীতে যে মেয়েটি আসবেন, হয়ত এতক্ষণ এসেছেন, তাঁকে যেন দিদিঠাকরুণ দাদাঠাকুরের হ'য়ে মিনতি করে' বলেন যে তাঁর চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন এই বাড়ীতে অনুগ্রহ করে' থাকেন। তাঁর বন্দুকের গুলির ঘায়ের চেয়ে এই মেয়েটির জন্যেই তিনি বেশী কাতর হয়েছেন দেখছি; আমি রাস্তায় রওনা হয়ে আসছি, আর আমায় ডেকে ডেকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে তিন তিন বার শুধু এই কথাই বলে দিলেন।

দাদার এই কথা শুনিয়া কলোঁবা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া লিডিয়ার হাত ধরিয়া খুব জোরে ঝাঁকড়াইয়া দিল; লিডিয়া কলোঁবার কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এবং শিলিনার কথার এই অংশটা সে তাহার পিতাকে তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতে পারিল না।

কলোঁবা লিডিয়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হাঁ, তোমাকে ত আমার কাছে থাকতেই হবে, তুমি আমাদের এই বিপদে সাহায্য করবে।

তার পর কলোঁবা একটা আলমারি খুলিয়া কতকগুলো পুরাণো কাপড় বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ব্যাণ্ডেজ তৈরীর জন্য ফালি করিতে লাগিল। তাহার

উজ্জ্বল চক্ষু, দীপ্ত মুখশ্রী ও প্রশান্ত স্থিরতা দেখিয়া ঠাহর করা দুষ্কর হইতেছিল যে সে তাহার ভাইয়ের আঘাতের জন্য বেশী দুঃখিত হইয়াছে, না শত্রুনিপাতের জন্য বেশী আনন্দিত হইয়াছে। তারপর এই সে কাফি তৈরী করিয়া কর্ণেলকে ঢালিয়া দিতে দিতে তাঁহাকে বেশ একটু গর্ব্ব করিয়া শুনাইয়া দিল যে সে খুব ভালো কাফি তৈরী করিতে পারে; পরক্ষণেই ন্যাকড়ার ফালিগুলি লিডিয়া ও শিলিনার কাছে দিয়া লম্বা করিয়া সেলাই করিতে ও পাকাইয়া গুটাইতে পরামর্শ দিল; তার পরেই আবার শিলিনাকে বিশ দফা জিজ্ঞাসা করিল যে তাহার দাদা আঘাতে কি খুব বেশী কষ্ট পাইতেছে? এবং এইরূপ বিবিধ কাজের ব্যস্ততার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া সে কর্ণেলকে বলিতেছিল—দু-দুজন অমন দুঁদে লোক! অমন জোয়ান মজবুত!...আর সে একা, জখম, মোটে এক হাত...তবু সে একাই দুজনকে মেরেছে! কর্ণেল সাহেব, একি কম সাহস! একি কম বীরত্ব! হায় মিস নেভিল, আপনাদের মতন শান্তির রাজ্যে যারা বাস করে তারা কত সুখী!...আমি জানি, আপনি আমার দাদাকে এখনো ভালো রকম চিন্‌তে পারেন নি!...আমি ত বলেইছিলাম যে বাজপাখী একদিন না একদিন তার পাখা মেলবে!...তার অমন ঠাণ্ডা মূর্ত্তি দেখে আপনাদের ভুল ত হতেই পারে।..কিন্তু বাস্তবিক যা, তা ত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, মিস নেভিল!...আহা আজ দাদা যদি স্বচক্ষে দেখত যে আপনি তার জন্যে কাজ করছেন!...আহা বেচারা!

লিডিয়া না একটি কথা বলিতে পারিতেছিল, না কাজই করিতে পারিতেছিল। তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে একজন কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া কেন নালিশ রুজু করিতেছে না। তিনি করোনারের তদারক ও এমনি আরো সব কর্সিকদের একেবারে অজানা উদ্ভট রকম বিষয় প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। এবং অবশেষে জানিতে চাহিলেন, ব্রান্দো নামে যে ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে আহত অর্সোকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সেই বাসগ্রাম কি পিয়েত্রানরা হইতে অনেক দূরে? সেখানে তিনি, তাঁহার বন্ধুকে কি দেখিতে যাইতে পারেন না?

কলোঁবা তাহার অভ্যস্ত শান্ত ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে অর্সো এখন বনবাসী এবং ফেরারী আসামী, তাহার শুশ্রূষাকারী; ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের মনের ভাব জানার আগে সে লোকালয়ে দেখা দিলে তাহার বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে; যাহাই হোক কলোঁবা গোপনে একজন দক্ষ ডাক্তারকে সেখানে পাঠাইয়া দিবে ঠিক করিয়াছে

অবশেষে কলোঁবা বলিল—দেখুন কর্ণেল সাহেব, এটা আপনি বেশ করে' মনে করে' রাখবেন যে আপনি চারবার বন্দুক আওয়াজ শুনেছেন, আর আপনি আমাকে বলেছেন যে দু আওয়াজের পরের দু আওয়াজ অর্সো করেছে।

কর্ণেল এ কথার কোনই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার কন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার চোখ মুছিল।

যখন বেলা অনেকখানি চড়িয়াছে, তখন একটা হৃদয়-বিদারক দৃশ্য গ্রামে দেখা গেল। ক্ষেতের চাষারা দলবদ্ধ হইয়া বারিসিনি-পুত্রদের দুটি লাস দুটি ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্য দিয়া বুড়া দারোগা বারিসিনির নিকট লইয়া যাইতেছিল। বুড়ার মক্কেল, আত্মীয়, ও অন্যান্য অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক সেই দলের পিছু লইয়া একটি বেশ ভারী রকম সমারোহ-যাত্রা গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মন্থরগামী দলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও ছিল, যদিও দস্তর মাফিক তাহারা সকলের পরে বিলম্ব করিয়াই আসিয়া দলে যোগ দিয়াছিল। পুলিশের জমাদার থাকিয়া থাকিয়া ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতেছিল—"হায় হায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি বলবে!" কতকগুলি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অর্লান্দিকসিয়োর দুধমা কাঁদিয়া আপ্‌সাইয়া আসিয়া পড়িল এবং ঘোড়া থামাইয়া মাথাকপাল চাপড়াইয়া, বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এই সরব বিলাপ আর এক জনের নীরব শোকের কাছে একেবারে ম্লান ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে এই মৃত পুত্রদের

শোকার্ত্ত পিতা—সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুত্রদের কাদামাখা লুণ্ঠিত মাথা দুটি একে একে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের নীল মুখে ওষ্ঠে অধরে চুম্বন করিল; পথ চলিবার সময় তাহাদের আড়ষ্ট হাত-পা নড় নড় করিয়া ঝুলিতেছিল, তাহা সে তুলিয়া তুলিয়া ধরিতে লাগিল। তারপর সকলে দেখিল সে মুখ খুলিল যেন কিছু বলিবে, কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে বিলাপ বা কথা কিছুই বাহির হইল না। সে তাহার দৃষ্টি পুত্রদের মৃতদেহের উপরই স্থির নিবদ্ধ করিয়া পথ হাঁটিতেছিল, পথের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, সে একবার পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িতেছিল, একবার গাছের গায়ে গিয়া ধাক্কা খাইতেছিল, একবার বা বেড়ার উপর গিয়া

যখন দূর হইতে অর্সোর বাড়ী নজরে পড়িল, তখন স্ত্রীলোকদের বিলাপ ও সমবেত জনতার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার উপর যখন রেবিয়ার দলের কতকগুলি লোক নিজেদের জয়ে উল্লাসের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল তখন বিপক্ষ দলের আক্রোশ অদম্য হইয়া উঠিল। কতকগুলি লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—"এর শোধ তুলতে হবে! প্রতিহিংসা নিতে হবে!" ক্রুদ্ধ জনতা হইতে ইট পাটকেল ছুটিতে লাগিল, এবং জানালার ভিতর দিয়া কলোঁবা ও তাহার অতিথিদের দেখিতে পাইয়া দুইটা বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিয়া জানলার শার্সী ফুঁড়িয়া যে টেবিলের পাশে কলোঁবা ও লিডিয়া বসিয়া ছিল সেই টেবিলের চটা উঠাইয়া চলিয়া গেল। লিডিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, কর্ণেল একটা বন্দুক তুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাধা দিয়া নিবারণ করিবার পূর্ব্বেই কলোঁবা একেবারে ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গিয়া জোরে দরজা খুলিয়া ফেলিল। দরজার চৌকাঠের উপর সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া শত্রুদের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—কাপুরুষ কোথাকার! মেয়েমানুষদের দিকে, বিদেশী অতিথির দিকে, গুলি ছুড়তে লজ্জা করে না! তোরা কি কর্সিক? তোরা কি পুরুষ মানুষ? হতভাগা সব, তোরা শুধু জানিস পেছন থেকে গুপ্তী মারতে! আয় দেখি একবার এগিয়ে, আমি তোদের ডাকছি আয়, আমার সঙ্গে লড়ে যা! আমি মেয়েমানুষ, আমি একলা, আমার দাদা এখানে নেই, আয়, দেখি তোদের মুরোদখানা আর মর্দ্দানী! আয় মেরে যা আমাকে, মেরে যা নির্দ্দোষী বিদেশী অতিথিদের; আয়! এতে তোদের খুব পৌরুষ হবে, গৌরব হবে! ..নড়ছিস না যে বড়, ওরে কাপুরুষ ভীরু কোথাকার! মনে জানছিস কিনা যে আমরা শুধু মরি না, মরার শোধও নিতে পারি! 'যা যা, মেয়েমানুষের মতো কাঁদগে যা, আর আমাদের ধন্যবাদ দিগে যা, যে, আমরা আরো বেশী রক্তপাত না করে' এত অল্পে অল্পে তোদের ছেড়ে দিয়েছি!

কলোঁবার ভাব ভঙ্গি চেহারায় এমন একটা মহিমান্বিত ভয়ঙ্কর ভীষণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাহার সম্মুখে সমস্ত জনতা যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল,—যেন কর্সিকার শীতের সন্ধ্যায় আবির্ভূত যে-সব ভূতপ্রেতের ভয়ঙ্কর গল্প শোনা যায় তাহাদেরই একটা কাহারও সম্মুখে তাহারা পড়িয়া গিয়াছে। এই ভয়ের সুযোগে পুলিশের জমাদার, কয়েকজন কনেষ্টবল, ও কতকগুলি স্ত্রীলোক উভয় বিপক্ষদলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কারণ রেবিয়ার দলের পাইক বরকন্দাজেরা তাহাদের ঢাল শড়কী লাঠি সোঁটা বাগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং একটা রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার এক মুহূর্ত্তের মাত্র বিলম্ব ছিল। কিন্তু উভয় দলেরই আজ সর্দ্দারের অভাব। কর্সিকেরা তাহাদের ক্রোধের দ্বারা চালিত হইলেও তাহাদের ঘরোয়া বিবাদে একজন নেতা না থাকিলে তাহাদের চলে না। অধিকন্তু সদ্য সফলতার দ্বারা সাবধান হইয়া কলোঁবা তাহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে নিবারণ করিয়া বলিল—ছেড়ে দে, বেচারাদের কাঁদতে যেতে দে, বুড়োটাকে গায়ের চামড়া নিয়ে যেতে দে। ঐ বুড়ো শেয়ালটাকে ছেড়ে দে, ওর বিষদাঁত ভাঙা হয়ে গেছে, আর ও কামড়াতে পারবে না। বারিসিনি সাহেব! সেই ২রা আগষ্টের কথা মনে কর! মনে কর সেই রক্তমাখা খাতাখানির কথা যার পাতায় তুমি নিজের হাতে খুনীর নাম জাল করেছিলে। আমার বাবা সেই খাতার পাতায় তোমার ঋণের অঙ্ক নিজের রক্ত দিয়ে এঁকে রেখে' গিয়েছিলেন;

তোমার ছেলেরা সেই ঋণ শোধ দিলেও বুড়ো মানুষ তুমি, তোমায় আমি মাপ করলাম, রেহাই দিলাম!

কর্লোবা বুকের উপর হাত জড়াইয়া দাঁড়াইয়া, মুখের উপর ক্রুর হাসি খেলাইয়া দেখিতে লাগিল যে তাহার শত্রুর বাড়ীতে মৃত দেহ দুটি সকলে ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে বহন করিয়া লইয়া গেল, এবং জনতা আস্তে আস্তে বিদায় হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। তখন সে দরজা বন্ধ করিয়া খাবার-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কর্ণেলকে বলিল—আমি আমার পড়শীদের ব্যবহারের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, মাপ করবেন মশায়। আমি কখনো ভাবি নি যে যে-বাড়ীতে বিদেশী অতিথি আছে সে-বাড়ীতে কোনো কর্সিক গুলি চালাতে পারে; আমি আমার স্বদেশের ব্যবহারে লজ্জিত হয়েছি।

সন্ধ্যাকালে লিডিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুইতে গেলে তাহার পিছনে পিছনে কর্ণেলও সেই ঘরে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে গ্রামে প্রতি মুহূর্ত্তে মাথার মধ্য দিয়া বন্দুকের গুলি ফুঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে এবং যেখানে খুনজখম ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া দুষ্কর, সেই গ্রাম ছাড়িয়া কাল সকালেই প্রস্থান করা উচিত কি না।

লিডিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল; তাহার ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে তাহার পিতার প্রস্তাব তাহাকে সামান্য বিপদে ফেলে নাই। অবশেষে সে বলিল—এই বিপদের সময় যখন সান্ত্বনা ও সাহায্যের দরকার তখন এই মেয়েটিকে একলা ফেলে চলে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে? বাবা, আমাদের এ রকম ব্যবহারটা কি নিষ্ঠুরতা করা হবে না?

কর্ণেল বলিলেন—তোমার জন্যেই আমি বলছি, মা। যদি আমি জানতাম যে তুমি আজাক্সিয়োর হোটেলে নিরাপদে আছ, তা হলে তুমি নিশ্চয় জেনো সেই বীর-পুরুষ দেলা রেবিয়াকে আলিঙ্গন না করে এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে আমার ভারি দুঃখ হ'ত।

—বেশ বাবা, তা হলে আমরা একটু অপেক্ষাই করি, যাবার আগে জানা যাক আমরা এদের কোনো উপকার যদি করতে পারি।

কর্ণেল কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—বেশ মা বেশ! পরের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে তোমার নিজের এমন স্বার্থত্যাগ আমার বড় ভালো লাগছে। এখন ঘুমাও। ভালো কাজ করে কাউকে কখনো পস্তাতে হয়নি।

লিডিয়ার কিছুতেই আর ঘুম আসে না, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ ছটফট করিতে লাগিল। কোথাও একটু খুট করিয়া শব্দ হইলে মনে হয় বুঝি শত্রুরা বাড়ী চড়াও হইয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে; পরমুহূর্ত্তে যেই নিজের বিপদের ভয় অমূলক প্রতিপন্ন হইতেছে, অমনি তাহার মনে পড়িতেছে সেই আহত লোকটির কথা—হয়ত সে এই দারুণ শীতে ঠাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া আছে, ফেরারীদের দয়া ছাড়া সেখানে তাহার অন্য আশ্রয় অন্য সাহায্য হয়ত আর কিছু নাই। লিডিয়ার মনে পড়িল সেই লোকটির এখনকার ছবি—রক্তে মাখামাখি হইয়া দারুণ বেদনায় সে যেন লুণ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু যতবারই তাহার ছবি মনে আসে ততবারই সেই মূর্ত্তি মনে হয় যে চেহারা সে শেষ বিদায়ের দিন দেখিয়াছিল—সে যেন লিডিয়ার-দেওয়া কবচটিকে সেইদিনকারই মতন নত হইয়া চুম্বন করিতেছে। ....তারপর মনে পড়িতে লাগিল তাহার বীরত্বের কথা। যে ভয়ানক বিপদের কবল হইতে সে প্রাণে প্রাণে কোনো রকমে বাঁচিয়া গিয়াছে তাহার সে বিপদ ত লিডিয়ারই জন্য!—তাহাকে কয়েক ঘণ্টা আগে দেখিতে পাইবার লোভে সে নিজের প্রাণ মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল! এমন কি লিডিয়া মনে মনে স্থির বিশ্বাস করিয়া তুলিল যে তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য অর্সো নিজের গা পাতিয়া গুলি খাইয়াছে। লিডিয়া অর্সোর আঘাতের জন্য নিজেকে নিপীড়িত লাঞ্ছিত করিতে লাগিল, অর্সো আহত হইয়াছে বলিয়া উহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল; এবং যদিও অর্সোর ডবল গুলির বাহাদুরি ও মাহাত্ম্য কর্লোবা ও ব্রান্দোর চোখে যেমন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার চোখে তেমন ভাবে লাগে নাই, তথাপি সে ভাবিতেছিল যে এমন বিষম বিপদের মধ্যে এমন ঠাণ্ডা মেজাজ ও এমন ধীরতা উপন্যাসের খুব অল্প নায়কই এ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারিয়াছে।

যে ঘরে লিডিয়া শুইয়াছিল তাহা কলোঁবার ঘর। একখানি ওক কাঠের উপাসনা-চৌকীর মাথাব উপর একটা প্রসাদী তালপত্রের নির্ম্মাল্যের পাশে অর্সোর একখানি ছোট ছবি দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছিল। লিডিয়া সেই ছবিখানি পাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিল, তারপর সেখানিকে স্বস্থানে টাঙাইয়া না দিয়া আপনার শয্যার শিয়রে রাখিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া সূর্য্য প্রায় মাথার কাছে উঠিয়াছে।

কলোঁবা আসিয়া তাহাকে বলিল—আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে তোমার বোধহয় খুব কষ্ট হয়েছে? আমার ভয় হচ্ছে তুমি বোধ হয় ভালো করে ঘুমুতে পার নি।

লিডিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভাই, তাঁর কোনো খবর পেয়েছ?

বলিতে বলিতে তাহার নজর অর্সোর ছবিখানার উপর পড়াতে লিডিয়া তাড়াতাড়ি একখানা রুমাল লইয়া ছবিখানি ঢাকিতে গেল।

কলোঁবা হাসিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। এই ছবিখানি ঠিক কি হুবহু দাদার মতন? দাদা এর চেয়েও সুন্দর!

লিডিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—তোমার দিব্যি ভাই......আমি......এই......অন্যমনস্ক হয়ে......নামিয়ে নিয়েছিলাম...ঐ...ঐ ছবিখানা।...আমি তোমার সব জিনিস-পত্তর ঘাঁটকেছি, কিন্তু আবার ঠিক করে রাখিনি... আমার ভারী অন্যায় হয়েছে।... তোমার দাদা কেমন আছেন?

—ভালো আছেন। গিয়োকান্তো রাত চারটার সময় এখানে এসেছিল; দাদার একখানা চিঠি এনেছিল—তোমার নামে। দাদা আমাকে এক ছত্রও কিছু লেখে নি। শিরোনামায় অবশ্য বড় বড় করে লেখা ছিল—শ্রীমতী কলোঁবা, কিন্তু তার নীচেই ছোট ছোট অক্ষরে লেখা ছিল—শ্রীমতী ন-কে দিয়ো।...ভাগ্যিস্ বোনেরা হিংসুটে হয় না। গিয়োকান্তো বললে যে লিখতে দাদার ভারি কষ্ট হয়েছিল। গিয়োকান্তো খুব খোসখৎ লিখিয়ে, সে বললে যে তুমি বলে যাও আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি; কিন্তু দাদা কিছুতেই রাজি হ'ল না। দাদা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে, ব্রান্দো কাগজ ধরে' ছিল। এক একটা কথা লেখে আর উঠে বসতে চেষ্টা করে, আর অল্প নড়াচড়াতেই হাতে ভয়ানক ব্যাথা লাগে। গিয়োকান্তো বলছিল যে, সে অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, বুক ফেটে যায়। এই সেই চিঠি।

লিডিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি ইংরেজিতেই লেখা; বোধ হয় চিঠির কথা গোপন রাখিবার জন্য সাবধানতা। চিঠিতে লেখা ছিল—

আমার দুরদৃষ্ট আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আমার শত্রুরা কি বলছে বা কি নিন্দা করছে তা আমি গ্রাহ্য করি না, তাদের কথায় কিছু এসে যায় না, যদি আপনি তাদের কথা বিশ্বাস না করেন। যবে আপনায় আমায় শেষ দেখা, সেই দিন থেকে আমি পাগলামির খেয়ালে দোল খেয়েছি। এই যে দুর্দ্দৈব, এ শুধু আপনাকে আমার নির্বুদ্ধিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে এসেছে; এখন আমার হুঁস হয়েছে। আমি এখন জানি আমার অদৃষ্টলিপি কি, এবং তার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। সেই যে আংটিটি আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, সেটিকে রক্ষাকবচ মনে করে ধারণ করেছিলাম, এখন সেটি ধারণ করার যোগ্যতা আমি খুইয়েছি। আমার মনে হচ্ছে যে আপনার দান এমন অপাত্রে ন্যস্ত করার জন্যে এখন আপনার আপশোষ হচ্ছে; অধিকন্তু সেই আংটি আমাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে যে আমি কি রকম পাগল হয়েছিলাম। কলোঁবা সেটি আপনাকে ফিরিয়ে দেবে।...তবে বিদায়, ওগো জন্মের মতো বিদায়। আপনি কর্সিকা থেকে চলে যাবেন, আমি আপনাকে একবার দেখতেও পাব না; কিন্তু আমার বোনকে অনুগ্রহ করে বলে যাবেন যে আপনি এখনো আমাকে শ্রদ্ধা করেন,—আমি জোর করে' বলতে পারি আমি চিরকাল তার যোগ্য থাকব। অ-দে-রে।"

লিডিয়া এই চিঠি পড়িবার জন্য পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। কলোঁবা তবু মনোযোগ দিয়া তাহাকে দেখিতেছিল; চিঠি পড়া শেষ হইয়াছে বুঝিয়াই সে সেই মিশরী

আংটিটি লিডিয়ার হাতে দিল এবং দৃষ্টির ভিতর দিয়াই চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল—এর মানে কি ? কিন্তু লিডিয়া মাথা না তুলিয়া বিমর্ষ দৃষ্টিতে সেই আংটিটি দেখিতে দেখিতে একবার আঙুলে পরিতেছিল এবং একবার খুলিতেছিল।

কর্লোবা বলিল—লিডিয়া, আমার দাদা তোমাকে কি লিখেছেন তা কি আমি জানতে পারি না ? কেমন আছেন কিছু লিখেছেন ?

লিডিয়া লাল হইয়া উঠিয়া বলিল—কৈ...কিছু ত লেখেন নি।...চিঠিখানা ইংরেজিতে লেখা।...বাবাকে বলতে বলেছেন।...ওঁর আশা হচ্ছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়ত একটা মীমাংসা করে দিতে পারবেন...

কর্লোবা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বিছানার উপর বসিল এবং দুই হাতে লিডিয়ার দুখানি হাত ধরিয়া তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল—আমার একটা উপকার করবে ভাই ? তুমি দাদার চিঠির জবাব দেবে না ? তোমার জবাব পেলে দাদা বর্ত্তে যাবে, বেঁচে যাবে ! যেই দাদার চিঠি এল তখনি তোমায় জাগাবার জন্যে একবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু শেষে ভেবে চিন্তে জাগালাম না।

লিডিয়া বলিল—তুমি ভারী অন্যায় করেছ। যদি আমার একটা কথা তাঁর...

—কিন্তু আমি ত তাঁকে চিঠি পাঠাতে পারব না। ম্যাজিষ্ট্রেট এসে পৌঁছেছেন, গাঁ-ময় তাঁর চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরং আমরা নিজেরাই যাই চল। ভাই লিডিয়া, তুমি যদি আমার দাদাকে চিনতে তা হলে তুমিও তাকে আমারই মতন ভালো বাসতে !...আহা, সে যেমন সৎ, তেমনি সাহসী ! ভেবে দেখ একবার সে কি করেছে ! একা, জখম হয়েও, দু-দুজনকে ঘাল করেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুলিশের জমাদারের রিপোর্ট পাওয়া মাত্র কনেষ্টবল চৌকীদার, পুলিশ কমিশনার, জজ, সেরেস্তাদার, নাজির, পেশকার প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত সকলকেই সঙ্গে লইয়া এই নূতনতর ভয়ঙ্কর ও জটিল বিবাদের শেষ মীমাংসা করিবার জন্য তিনি ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন। আসিয়াই তিনি কর্নেল নেভিল ও তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং ব্যাপার যে খুব খারাপ ও বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে তাহাও তিনি তাঁহাদের নিকট গোপন করেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আপনি ত বুঝতেই পারছেন যে অকুস্থলে কোন সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত ছিল না। অধিকন্তু সেই হতভাগ্য যুবক দুটির সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি এমন প্রসিদ্ধ, যে, কেউ বিশ্বাসই করছে না যে দেলা রেবিয়া ফেরারীদের সাহায্য বিনা একাই তাদের মারতে পেরেছে—শুনছিও ত যে উনি ফেরারীদের আশ্রয়েই এখন আছেন।

কর্ণেল বলিয়া উঠিলেন—এ একেবারে অসম্ভব, আমি জানি অর্সো দেলা রেবিয়া যতদূর সাঁচ্চা খাঁটি ছেলে হতে হয়। আমি তার সততার জামিন হচ্ছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আমিও ত তাঁকে জানি, কিন্তু পুলিশ কমিশনার সাহেব, যাঁদের সন্দেহ করাই স্বভাব, আমার মনে হচ্ছে, তত অনুকূল নন। তাঁর হাতে আপনার বন্ধুর দুঃখভোগের অস্ত্রও একটু গিয়ে জুটেছে। সে একখানা চিঠি—তিনি অর্লান্দিকসিয়োকে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে লিখেছিলেন।...এই যুদ্ধে আহ্বান, পুলিশ সাহেব মনে করেন, গুপ্ত গুণ্ডা দিয়ে আক্রমণের সুযোগ করে' নেওয়া।

কর্ণেল বলিলেন—সে ত অর্লান্দিকসিয়োই, যে পুরুষের মতে সম্মুখ যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছিল।

—সম্মুখযুদ্ধ করা ত এখানকার রেওয়াজ নয়। এরা লুকিয়ে থাকে, পেছন থেকে আক্রমণ করে, এই এদের দেশের ধারা। একটা সাক্ষী কেবল সুবিধে মনে হচ্ছে ; সে একটি ছোট মেয়ে ; সে বলছে যে সে চারবার বন্দুক আওয়াজ শুনেছিল, আগের দুটো আস্তে, পরের দুটো জোরে—দেলা রেবিয়ার বন্দুকের মতো বড় বন্দুকের আওয়াজেরই মতন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটি, যে-ফেরারীদের এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সন্দেহ হচ্ছে তাদেরই একজনের ভাইঝি। হয়ত তারা মেয়েটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম করে রেখেছে।

লিডিয়া লজ্জায় লাল হইয়া কথার মাঝখানে কথা পাড়িয়া বলিল—মশায়, আমরা তখন পথে আসছিলাম, আমরাও বন্দুকের আওয়াজ ঐ রকমই শুনেছিলাম।—লিডিয়ার চোখের শাদা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

—সত্যি? আপনার এই সাক্ষী খুব কাজে লাগবে। আচ্ছা কর্ণেল, আপনিও নিশ্চয় তা হলে শুনেছিলেন?

লিডিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—হাঁ, শুনেছিলেন বৈ কি। আমার বাবার বন্দুক ছোড়া ত নেশা; যেমন বন্দুকের আওয়াজ শুনলেন আর বললেন—ঐ দেলা রেবিয়া আমার বন্দুক ছুঁড়ছে।

—আচ্ছা, যে আওয়াজ আপনারা দেলা রেবিয়ার বন্দুকের বলে চিনেছিলেন, সে আওয়াজ কি পরে হয়েছিল?

—পরেরই দুটো, নয় বাবা?

কর্ণেলের স্মরণশক্তি তত প্রখর ছিল না; এবং তাঁহার কন্যার কথার প্রতিবাদ করিতেও তিনি জানিতেন না।

—কর্ণেল, তা হলে পুলিস সাহেবকে শিগ্‌গীর এ কথা বলা দরকার। তারপর আজ সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার দিয়ে লাস পরীক্ষা করা হবে, যে, যে বন্দুকের কথা হচ্ছে বাস্তবিক সেই বন্দুকের গুলিতেই খুন হয়েছে কি না; তখন আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে।

কর্ণেল বলিলেন—ও বন্দুকটা আমিই অর্সোকে দিয়েছিলাম, সমুদ্রের ওপার থেকে দেখলেও আমি সেটাকে চিনতে পারি!...আমার বন্দুকে না হ'লে কি অমন আওয়াজ হয়!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

ভারতী (পৌষ)।

শিবাজীর রাজ্যশাসনপ্রণালী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

শিবাজী রাজার অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাঁহার রাজ্যের আয়তন সামান্য ছিল, অল্পকালের মধ্যে সেই রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। শিবাজীর শেষাবস্থায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার প্রতাপ অতুলন, তাপ্তীনদী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল রাজার রাজেশ্বররূপে তিনি একবাক্যে গৃহীত হইলেন।

শিবাজী রাজার রাজ্যলাভে যেমন চাতুর্য্য, রাজ্যসংগঠন ও শাসনকার্য্যেও তেমনি তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অর্জন ও রক্ষণ-ক্ষমতা যাঁহার একাধারে এইরূপ যোগক্ষেমসম্পন্ন মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শিবাজীকে সেই মহাপুরুষদের আসনে স্থান দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী বিচার-যোগ্য, অধুনাতন সভ্যজগতের মাপদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিলেও তাহাকে হেয় জ্ঞান করা যায় না। সংক্ষেপে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

প্রথম। এক একটি গিরিদুর্গ এক এক প্রদেশের কেন্দ্রস্থল। মারাঠী ইতিহাস (বখর)-লেখকেরা বলেন শিবাজী রাজা ক্রমশঃ ২৮০ সংখ্যক গিরিদুর্গ হস্তগত করেন। এই-সকল দুর্গ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে শিবাজী তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুর্গরক্ষণে একজন মারাঠা হাওয়ালদার ও তাহার কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত ছিল। তাহার দেওয়ানী ও রাজস্ব কার্য্যভার একজন ব্রাহ্মণ সুবেদারের হাতে—দুর্গের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কার্য্য তাহার অন্তর্গত। আর একজন প্রভুজাতীয় কর্ম্মচারী ধান্য ও রসদ যোগাইবার ও জীর্ণসংস্কারের কাজে নিযুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন তিন বর্ণের লোক এক কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য চলিত। নীচে রামোসী প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতীয় লোকেরা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। দুর্গের আয়তন ও উপকারিতা অনুসারে দুর্গপালের সংখ্যা। এক একজন নায়কের অধীনে নয় জন সিপাই; বন্দুক, তলবার, বর্শা, পট্টা—প্রভৃতি অস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত থাকিত। ইহারা সকলে আপন আপন পদ ও কর্ম্মানুসারে বেতনভোগ করিত। গিরিদুর্গ হইতে নীচে সমান জমিতে আসিলে তাহার অন্য প্রকার ব্যবস্থা।

শিবাজীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিকদের সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল উল্লিখিত নিয়মাবলী তাহার নকল মাত্র। পদাতিক সৈন্যদলের নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়ম এই—একজন নায়কের অধীনে ১০ জন সিপাই—নায়কের উপর হাওয়ালদার, তার উপর জুমালেদার—একসহস্র সিপাইয়ের অধিনায়ক একজন 'হাজারী'—৭০০০ সেনার নায়ক যিনি তাঁহার নাম সর্ণোবৎ। এই গেল মাওলী পদাতিক। ঘোড়সোওয়ার দলের নিম্নশ্রেণীর নায়ক সিলেদার, ২৫ সিলেদারের উপর একজন হাওয়ালদার, হাওয়ালদারের উপর জুমালেদার, দশ জুমালায় এক হাজারী, ৫ হাজারীর অধিনায়ক একজন সর্ণোবৎ। উচ্চশ্রেণীর মারাঠা সৈনিকের অধীনে এক-একজন ব্রাহ্মণ সুবেদার ও অন্য জাতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। সৈনিকের উচ্চনীচ সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন জায়গীর বা জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের ভোগে আসিত না—ধান্য অথবা নগদ টাকাই তাহাদের বেতন। এই-সকল কড়াকড় নিয়ম সত্ত্বেও শিবাজীর সৈন্যসংগ্রহে কোন বাধা ছিল না। আর আর সকল কাজের মধ্যে সৈনিকের কাজে লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। দশারার দিনে মাওলী, হেতকরী, সিলেদার প্রভৃতি লোকেরা দলে দলে জাতীয় পতাকা-তলে মিলিত হইয়া শিবাজীর সৈন্যদলভুক্ত হইত। দশারার উৎসব সৈন্যসংগ্রহের কাল,—শিবাজী রাজা ঐ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

দ্বিতীয়। অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা। সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী অষ্টপ্রধান মন্ত্রীসভা সংগঠন করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আটজন কর্ম্মচারী সেই সভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ১। পেশওয়া

—প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)। রাজ্যের মুৎসুদ্দী, দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যভার তাঁহার হাতে। রাজার নীচেই তাঁহার আসন। ২। সেনাপতি (সর্ণোবৎ Commnader-in-chief) সেনা বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষ। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন স্বতন্ত্র ছিল। ৩। অমাত্য (মজুমদার Finance Minister)। ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহাকে রাজ্যের সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইঁহার কার্য্যভার গুরুতর। চৌথ ও সরদেশমুখ নামে দুইপ্রকার কর আদায় হইত। ৪। সুর্ণীস (Minister of public records and correspondence) রাজ্যের পত্রব্যবহার বিভাগের কর্ত্তা। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে-সমস্ত মঞ্জুর হইত। ৫। বাক্কানিস (Private Secretary)। ইঁহাকে শিবাজীর নিজস্ব দৈনন্দিন হিসাব ও কাগজপত্র রাখিতে হইত। রাজার গৃহরক্ষক সৈন্যদলের, তথা গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর। ৬। সুমন্ত (ডবীর Foreign Minister) বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও অপরাপর বিদেশীয় রাজকার্য্য ইনি নির্ব্বাহ করিতেন। ৭। পণ্ডিতরাও (Minister of Education) স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। ধর্ম্ম-দণ্ড-বিজ্ঞান-বিভাগ ও রাজ্য-সম্বন্ধীয় ফলফিল গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল। ৮। ন্যায়াধীশ (Chief Justice, অন্য হিসাবে Law Member)।

পণ্ডিতরাও এবং ন্যায়াধীশ ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক সভাসদকেই সেনানায়কতা করিতে হইত। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে যথোচিত সময় দিতে পারিতেন না। এই হেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। আবার প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত—যথা, (১) দেওয়ান অথবা কারবারী (২) মজুমদার, হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষক (৩) ফর্ণবীস, সহকারী হিসাব পরীক্ষক (৪) সরনিস্ দফতরদার (৫) কর্কনিস (Commissary) (৬) চিটনিস্ (Secretary) (৭) জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সমস্ত মূল্যবান্ সামগ্রী ইহার হাতে থাকিত (৮) পোটনিস, খাতাঞ্চি।

এই অষ্টপ্রধান সভা, শিবাজীর উদ্ভাবনী শক্তির ফল; এই শাসন-প্রণালী পেশওয়ার আমলে রক্ষিত হয় নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যভার পেশওয়ার হস্তেই গিয়া পড়িল। পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার পদ বংশানুগামী হইল। সেনাপতি সচিব সুমন্ত, পেশওয়া নিজেই সকলি একাধারে, সে-সকল পদ নামমাত্র। প্রণালীবদ্ধ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয়। বড় বড় পদ বংশগত করা শিবাজীর মনঃপূত ছিল না—স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম্মযোগ্যতা অনুসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা এই তাঁহার রাজনীতি ছিল।

চতুর্থ। বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা। রাজকীয় কর্ম্মচারী-দের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদের হাতে জায়গীর জমিদারী সঁপিয়া দেওয়া, শিবাজীর মতবিরুদ্ধ ছিল। শিবাজীর বিধানে পেশওয়া সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাই কারকুন পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাজকোষ কিম্বা ধান্যভাণ্ডার হইতে বেতন পাইত। নির্দ্দিষ্ট বেতন নিয়মিত সময়ে দেওয়া হইত। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী জায়গীরদার জমিদার সৃষ্টি করা রাজ্যের হিতকর নহে, শিবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদের দেশে কেন্দ্র-বর্জ্জনী শক্তি কেন্দ্রমুখী শক্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া উঠে—শিবাজী এই গতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কার্য্য করিতেন। শিবাজী যাহা কিছু ভূমিদানের নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রে—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দান ধর্ম্মের কার্য্যে নিয়োজিত হইত। বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজনার জন্য দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। শিবাজীর রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চা বড় একটা ছিল না কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত দক্ষিণাদি দানব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ কাশী হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া আসিত। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ক্রমে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার হইল। পেশওয়ারাও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পঞ্চম। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা। রাজা-প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জমিদারের মধ্যবর্ত্তিতা নাই, শিবাজীর এই নিয়ম ছিল। তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে, খাজনা আদায়ের কাজে মধ্যবর্ত্তী জমিদার নিয়োগ করা যত অনর্থের মূল। তাহার ফল এই হয় যে, জমিদার প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া বেশীর ভাগ খাজনা আত্মসাৎ করে, সরকারী তহবিলে অল্পই আসে। এই হেতু, তিনি জমিদারী-প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তিনি যোগ্য বেতন দিয়া কমাবিসদার, মহলকারী, সুবেদার প্রভৃতি রাজস্ব কর্ম্মচারী রাখিতেন—রায়তদের যাহার যাহা দেয় তাহার জন্য কবুলিয়ৎ লওয়া হইত। ফসলের দ্বিতীয়-পঞ্চম অংশ সরকারী খাজনার হার; অবশিষ্ট রায়তের নিজস্ব থাকিত। তখন আদালতের কাজ বেশী ছিল না—সুবেদার দেওয়ানী ফৌজদারী দুই কাজই করিতেন। তেমন কিছু বড় মকদ্দমা উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তের হাতে সমর্পিত হইত।

ষষ্ঠ। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট বা ইজারা দেওয়া রহিত করা। রাজস্বের কণ্ট্রাক্ট দিয়া জমিদার বা ইজারাদার নিয়োগ শিবাজীর নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। পেশওয়াই আমলেও এই নিয়ম অনেককাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল।

সপ্তম। সিবিল বিভাগের অধীনে সেনা বিভাগ রক্ষা করা। এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত, নহিলে সৈন্যপ্রতাপ রাজশক্তিকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়ে।

অষ্টম। জাতিনির্ব্বিশেষে কর্ম্মবিভাগ। ব্রাহ্মণ, প্রভু, মারাঠা, উচ্চনীচ বর্ণের সম্মিশ্রণে রাজকার্য্য পরিচালন করা শিবাজীর নিয়ম ছিল; যাহাতে কোন এক বিশেষ জাতির প্রাধান্য নিবারিত হয়, স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধ হয়, পরস্পরের একটা শাসন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাই উদ্দেশ্য। শিবাজীর পরে এই নিয়মটী রক্ষিত হয় নাই। পেশওয়াই আমলে ব্রাহ্মণেরই আধিপত্য দেখা যায়।

শিবাজীর যে শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইল ব্রিটিশ রাজ্য-শাসন-প্রণালী তাহার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের পার্থক্য সাধন, সৈনিকের উপর দেওয়ানীর প্রভুত্ব স্থাপন, নির্দ্দিষ্ট বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ, বড় বড় পদ বংশগত না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যে নিয়োগ, রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, সভাপতির মন্ত্রণায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা, এই-সমস্ত সুশাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মুষ্টিমেয় ইংরাজজাতি ভারতবর্ষে একছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিবাজী-নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালীর অন্যথাচরণ করিয়াই পেশওয়া রাজ্য স্বীয় অধঃপতনের সোপান প্রস্তুত করিল।

গৃহস্থ (অগ্রহায়ণ)।

শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

যিনি যত অধিক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। তিনি এক দিকে যেমন জনগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে

পারেন, অপর দিকে তেমনই বিষম অনিষ্টও উৎপাদন করিতে পারেন। কারণ, শ্রেষ্ঠেরা যাহা আচরণ করেন, অন্যেরা তাহাই অনুবর্ত্তন করে।

শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যদি সম পরিপুষ্ট হয়, তবেই তাহা সুস্থ, এবং তাহাতেই শরীরী আনন্দ অনুভব করিতে পারে। প্রত্যেক মানবও সেইরূপ একাকী নিজে সম্পূর্ণ নহে, তাহার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ হয়। সে অনুভব করুক বা না করুক, প্রত্যেকের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। বিরাট সমাজ-দেহের আমি যেমন একটি অঙ্গ, আমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও অন্যান্য অঙ্গ। অতএব যতদিন এই সমস্ত অঙ্গই সুপরিপুষ্ট হইয়া না উঠে ততদিন সমাজের স্বাস্থ্যসুখ কোথায়? সুতরাং ব্যক্তিগত শিক্ষা বা সফলতা বস্তুত থাকা না-থাকা তুল্য।

যতদিন আমাদের চতুর্দ্দিকের প্রত্যেকটি লোক শিক্ষিত হইয়া না উঠিতেছে, যতদিন আমরা তাহার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস করিতে প্রবৃত্ত না হইতেছি, এবং যতদিন আমাদের এই কার্য্য যথোচিত ভাবে পরিচালিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের যথার্থ সফলতা লাভ হয় নাই, ততদিন আমরা অন্ধ ও পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি।

শিক্ষার প্রসারের সম্বন্ধে ভারত-ইতিবৃত্তের কয়েকটি পংক্তি এখানে আপনাদের স্মরণপথে আনয়ন করিব। একজন রাজা (কৈকেয় অশ্বপতি) বলিতেছেন (ছান্দোগ্য, ৫-১১-৫)—

ন মে স্তেনো জনপদে, ন কদর্য্যো, ন মদ্যপো, নানাহিতাগ্নিঃ, ন অবিদ্বান্, ন স্বৈরী, ন স্বৈরিণী।"

"আমার রাজ্যে চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, স্বেচ্ছাচারিণী—ব্যভিচারিণী নাই।" দেশের অধিপতি বলিতেছেন তাঁহার রাজ্যে একটিও অবিদ্বান্ নাই, এবং বিদ্যালাভের যাহা ফল, তাহা তাঁহার রাজ্যে বিরাজমান।

আরও কয়েকটি পংক্তির দিকে লক্ষ্য করুন (রামায়ণ, অযোধ্যা, বাল, ৬)। সেখানেও ঐ একই কথা উক্ত হইয়াছে—

কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংস পুরুষঃ কচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ॥ ৮
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ॥ ৯
নানাহিতাগ্নির্ণাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ॥ ১২
নাস্তিকো নানৃতী বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে কচিৎ॥ ১৪

যদি কেহ মনে করেন অশ্বপতি নামে বা দশরথ নামে বস্তুত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাহা হইলে আমরা বলিব, না থাকুন, ক্ষতি নাই। ধরিয়া লইলাম অশ্বপতি ও দশরথের রাজ্য সেরূপ ছিল না। কিন্তু উপনিষৎকার ও রামায়ণকার দেশের ঐ যে আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য নহে। যাঁহারা দেশের বস্তুত মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের ত শিক্ষা সম্বন্ধে উহা ভিন্ন আদর্শই হইতে পারে না, এই আদর্শকে পরিত্যাগ বা অবজ্ঞা করিলে কোন দেশই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না, পারে নাই, এবং পারিবেও না। ভারতের এই যে 'ন অবিদ্বান্'—কেহই অবিদ্বান্ নহে—এই পুরাতনী বাণী বর্ত্তমান সভ্যদেশসমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিতেছে। নিয়ত (compulsory) শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানের মৃত সম্রাট মিকাডো বলিয়াছিলেন—এখন হইতে এরূপভাবে শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে যাহাতে কোন গ্রামে অশিক্ষিত পরিবার না থাকে, বা কোন পরিবারের মধ্যে কেহ অশিক্ষিত না থাকে। 'ন অবিদ্বান্'—কেহই অবিদ্বান্ নহে, ইহাই যদি শিক্ষাপ্রচারের সনাতন মঙ্গল আদর্শ হয়,—তাহা হইলে ইহাই লক্ষ্য রাখিয়া যে আমাদিগকে চলিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু আমাদের যাহা যথার্থ কল্যাণ, তাহার আলোচনায়, তাহার সিদ্ধির প্রয়াসে আমাদিগকে প্রবৃত্ত দেখিয়া বৃদ্ধেরা যদি উপহাস করেন, করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে আমরা তাহা ভুলিয়া থাকিব? যাহা না হইলে আমাদের চলিবে না, যতই কেন আমরা ক্ষীণ হই, দুর্ব্বল হই, চেষ্টা ত করিতেই হইবে। আমরা চাঁদ ধরিতে চাহিতেছি না; লোকে যাহা ধরিতে পারে,—সর্ব্বত্র ধরিতেছে, আমরাও তাহাই ধরিতে চাহিতেছি। যদি আমরা ধরিতে চাই, সত্যসত্যই যদি তাহা ধরিবার জন্য আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন বা দশ বৎসর পরে হউক আমরা তাহা নিশ্চয়ই ধরিব। কিন্তু আমরা যে অল্প লোকেই ধরিতে চাহিতেছি। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে"—সহস্র-সহস্র মানবের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমরা যদি সনাতন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া এরূপ শিক্ষাপ্রচার চাহি, তাহা হইলে সিদ্ধি আমাদের অদূরবর্ত্তিনী না হইলেও, দূরবর্ত্তিনী থাকিয়াও, একদিন শুভমুহূর্ত্তে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"—রত্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না, তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কেবল অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, মঙ্গল তাহার দুর্লভ। শৈশবে আহার-বিহার-শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই জননীকে অবলম্বন করিতে হয়, উহা ভিন্ন গতি থাকে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সন্তান যদি পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। শিক্ষাসম্বন্ধেও এইরূপ। আমাদের জননীস্থানীয়া রাজশক্তির উপর কেবল নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। দেশের সমস্ত শিক্ষার ভার রাজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, এবং কোন স্থানেও তাহা হয় না, হইতে পারেও না। রাজা যতদূর পারেন করেন এবং দেশের লোককে দিগ্‌দর্শন প্রদান করেন, তাহার পর দেশবাসীরাও তাহার যত্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

লোকশিক্ষার ভার প্রধানত লোককেই লইতে হইবে। ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছে, এবং সেই জন্যই 'ন অবিদ্বান্' এই মহাবাণী এখানে অসম্ভব হয় নাই। ভারতের বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত "আচার্য্যকুল" * বা "গুরুকুল"গুলি † দেশের রাজার স্থাপিত নহে, বা রাজকোষের অর্থেও তৎসমুদয় পরিচালিত হইত না। জনগণ বা সমাজের ব্যবস্থাতেই সেই সমুদয় স্থাপিত হইত, এবং ব্রহ্মচারীর দ্বারা গৃহস্থ-পরিবার হইতে ভিক্ষাহৃত তণ্ডুলমুষ্টিতেই তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, বিদ্যা তখন দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না; এবং শিক্ষাও তখন নিয়ত (com-

* গোপথব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব ২-৪; ছান্দোগ্য ৪-৯-১; আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ১-১৩-১৯।

† মুণ্ডক, ১-২-১২; বৌধায়নধর্ম্মসূত্র, ২-১-২২, ১-২-৩০, বিষ্ণু, ২৮-১৩৯; যাজ্ঞ, ১-২-৩৪-৩৫।

pulsory) ছিল। জনগণ নিজহস্তে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই আর্য্যসভ্যতা ততদূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল।

শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠিলেই স্কুল-কলেজের কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে; আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ঘর-দালান, টেবিল-চেয়ার, বেঞ্চ-ডেস্ক ইত্যাদি উপকরণরাজি আসিয়া জুটে। এগুলি না হইলে স্কুলই হইবে না, আর স্কুল না হইলে পড়া শুনাও হইতে পারে না। যাঁহারা সব সময় কোটপ্যাণ্টালুন পরেন, সেই সাহেব-সুবাদের জন্য চেয়ার-বেঞ্চের আবশ্যকতা থাকিতে পারে; তাহা বলিয়া আমাদের শিশুগণের জন্য তাহার কি প্রয়োজন আছে জানি না, বরং অপকারই হয়। অথচ এই আসবাবপত্র না হইলে মনে করি বিদ্যালয় আমাদের হইল না। অথচ সামান্য মাদুরেই এই কাজ চলিতে পারে। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত পরীক্ষায় তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বালক দৃষ্ট হইয়াছিল! এই সমস্ত সংস্কৃত-বিদ্যার্থী বেঞ্চ-ডেস্কের সাহায্যে অধ্যয়ন করে নাই, বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহেও শিক্ষা পায় নাই; অথচ ইহারা পড়িয়াছে, জ্ঞানও উপার্জ্জন করিয়াছে, উপাধি-লাভও ইহাদের ঘটিয়াছে। স্বাস্থ্যও যে ইহাদের তাহাদের অপেক্ষা খারাপ তাহার প্রমাণ নাই। যে দেশ বিদ্যাকে যত সুলভ করিতে পারিবে, সে দেশ ততই অভ্যুদয় লাভ করিবে। ভারতবর্ষ ইহা যেমন করিয়াছিল, আমি জানি না, অন্য কোথাও আর এরূপ হইয়াছে কি না। আচার্য্যকুল বা গুরুকুলগুলিতে বালকেরা শীতাতপ-বর্ষা-অনুসারে কখনো বা সাধারণ অনাড়ম্বর গৃহের মধ্যে, কখনো বা স্নিগ্ধচ্ছায় তরুমূলে, কখনো কখনো বা রমণীয় বেদিতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন পাতিয়া মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিত। উন্মুক্ত প্রকৃতির সংসর্গে চিত্তের ন্যায় শরীরেও তাহারা সমুন্নত হইয়া উঠিত। তাহারা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, সেই দীন অথচ শান্তোজ্জ্বল আশ্রমে অধ্যয়ন করিত; তাহারা গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি তাৎকালিক সমস্তই সেই স্থানেই শিক্ষা করিত। বিদ্যা সেই সময়ে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ততদূর তাহারা আয়ত্ত করিত, ততদূর শিক্ষা তাহাদের সম্পূর্ণ হইত। বিদ্যার উৎকর্ষ সে সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল না। Residential বিদ্যালয় বিষয়ক বর্ত্তমান উচ্চ-চীৎকারের সমাধানও এই স্থানেই হইয়াছিল। সেই কুটীরের শিক্ষা, তরুতলের শিক্ষা, বন-আশ্রমের শিক্ষা পাইয়া দেশে আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা হইত; আদর্শ মন্ত্রী, আদর্শ শিল্পী, আদর্শ শিক্ষক দেখা দিত। শিক্ষার দ্বারা দেশের যাহা যাহা হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাতেই তৎসমুদয় সুসিদ্ধ হইত। এখনও এই প্রণালীতেই নব-নব চতুষ্পাঠীতে আমাদের বালকেরা ইংরাজী, বাঙ্গালা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা করিবে। এক-একটি চতুষ্পাঠীতে যেমন একাধিক অধ্যাপক থাকিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে। যে অধ্যাপক যে বিষয় যতটা শিক্ষা দিতে পারেন, বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট ততটাই সেই বিষয় শিখিয়া আবার অপর টোলে গিয়া অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করিবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ যেমন এক একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া যিনি যাহা জানেন তিনি সেই বিদ্যাই প্রচার করিতেছেন, ইংরাজীশিক্ষিতগণও সেইরূপ করিবেন।

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য থাকিলেও এক-একটি ইন্দ্রিয় যেমন এক-একটি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিয়া দেহীর উপকার করে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন-বিভিন্ন কার্য্যের জন্য কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত থাকিতে হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপন ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। তাঁহাদিগকে পড়িতেও হইবে পড়াইতেও হইবে। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এখনও তাহা করেন। সংস্কৃত শিখিলেই তাঁহারা স্বভাবতই অধ্যাপনে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ইহা না করিয়া থাকিতেই পারেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবক আর কোন্ দেশে আছে? ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের এই আদর্শেই আমাদের মধ্যে বিদ্যাব্রতী লোক-সেবকগণের প্রয়োজন। ইঁহারা তাঁহাদেরই মত পড়িবেন ও পড়াইবেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যদি গভীর তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিবার যোগ্যতা থাকে, সকলেই যদি যথার্থ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সুখের সীমা থাকে না, সে সমাজে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় না। সমাজে অভিজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ লোকও থাকে, পণ্ডিতের ন্যায় মূর্খ লোকেরও তাহাতে স্থান হয়, যোগ্য-অযোগ্য পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কে লইয়াই সমাজ। অতএব যাঁহারা সমাজের পরিচালক, যাঁহারা লোকহিতের নিয়ন্তা, তাঁহাদিগকে উভয় শ্রেণীরই লোকের কুশল চিন্তা করিতে হয়, বরং অভিজ্ঞ-শ্রেণী স্বয়ং স্বকীয় মঙ্গলসাধনে সমর্থ বলিয়া তাঁহাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহারা অজ্ঞ-অযোগ্যগণেরই মঙ্গলের জন্য সবিশেষ প্রয়াস করিয়া থাকেন। ভারতের মুনি-ঋষিগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণ আরণ্যক-উপনিষদ্ প্রভৃতিতে যে-সকল গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে, তৎসমুদয় সাধারণ-জনের বোধগম্য নহে, ঐ-সকল দুরূহ গ্রন্থে প্রবেশ করিয়া সাধারণ-লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারে না, অথচ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকা কোনরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি সহজভাষায় নানা কথা-আখ্যায়িকায়, নানা দৃষ্টান্ত-উপমায় ব্যাখ্যা করিয়া এবং উপযুক্ত নানাবিধ নব-নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া তৎসমুদয়কে পুরাণ নামে প্রচার করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব প্রভৃতি যে-সকল বিষয় পূর্ব্বে সাধারণ-লোকের নিকট অতি দুর্জ্ঞেয় ছিল, পুরাণের প্রচারে তাহাদিগের নিকট সেই সমুদয় সহজ হইয়া উঠিল। লোক ধর্ম্মভাবে, দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখ হইয়া উঠিল। আজিও ভারতের জনপদ নগর-প্রান্ত-পল্লীতে যে ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বেদ-বেদান্ত-আরণ্যক-উপনিষদের জন্য নহে, তাহার একমাত্র কারণ পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারতেরই অমৃত কথা ভারতের অতি নিকৃষ্ট সমাজেরও লোককে বন্য-বর্ব্বর অসভ্য হইতে দেয় নাই, পুরাণসমূহের মধুর কথালহরীই তাহাদের হৃদয়কে এখনো পুণ্যানুভাবে সরস করিয়া রাখিয়াছে। সু-কু, ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিকে পুরাণেরই সাহায্যে ভারতের সাধারণজনগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাণেরই কল্যাণে গ্রামে বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইত, পথে পথে ফলচ্ছায়াপ্রদ পাদপ-শ্রেণী রোপিত হইত, পান্থশালা স্থাপিত হইত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইত। ক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে জলের আগম-নির্গমের জন্য উপযুক্ত সেতুসমূহ বদ্ধ হইত, আরোগ্যশালা স্থাপিত হইত, আতুর ব্যক্তি ঔষধ পাইত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইত, পবিত্র দেবায়তন-সমূহের উন্নত শৃঙ্গাবলী মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিত, প্রভাত-প্রদোষে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের মঙ্গলধ্বনি দিগন্ত কম্পিত করিয়া উত্থিত হইত; অধিক কি, কোন উন্নত সমাজের লোকেরা যাহাতে

কিছু কল্যাণ উপভোগ করিতে পারে, ভারতের জনগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, প্রত্যুত দেবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচুরভাবে তৎসমুহ অধিকার করিয়াছিল। কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের কথা নহে, কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য নহে, লৌকিক বিষয়সমূহকেও সাধারণ জনসমাজে পুরাণ-পাঠের সাহায্যে প্রচার করা হইত। ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞাতব্য তাৎকালিক সমস্ত তত্ত্বই কোন স্থানে সংক্ষেপে কোন স্থানে বা বিস্তৃতভাবে পুরাণে সঙ্কলিত হইয়াছে। যাহারা স্বয়ং বা গুরুর নিকটে অধ্যয়নের অবসর পাইত না, তাহারা পুরাণকথা শুনিয়া শুনিয়াই সেই-সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিত। বাহ্য ও অধ্যাত্ম উভয়দিকেই পুরাণশ্রবণে ভারতের জনগণ এইরূপে শিক্ষালাভের অতি রমণীয় সুযোগ পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানের পুরাণ-পাঠের অবস্থা শোচনীয়। পুরাণ-পাঠ দেখিতে দেখিতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, আর অতি অল্প দিনেরই মধ্যে হয় ত তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবে। বিচক্ষণ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রায়ই পুরাণকথক হইতে দেখা যায় না। মনে হয় বর্ত্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মহোদয়গণ পুরাণ-কথকতায় স্বকীয় মর্য্যাদা-হানি আশঙ্কা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, একদিন ব্যাস-বশিষ্ঠের ন্যায় মহর্ষিরাই পুরাণকথকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তিগণ ঐ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পুরাণপাঠ-শ্রবণের যাহা ফল, ভারত তাহা লাভ করিয়াছিল। আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরাই যথার্থভাবে করিতে পারেন, মূর্খের তাহা কার্য্য নহে। আজকাল যে-সকল পুরাণকথক দৃষ্টিগোচর হন তাঁহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানহীন ইঁহাদের হাতে পড়িয়া পুরাণকথা দুর্গতির চরমসীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর কথক মহাশয়েরা মূলপুরাণে যাহা নাই তাহা কল্পিত করেন, যাহা আছে তাহা বলেন না, অথবা বিকৃত করিয়া বলেন। মূর্খমোহনের জন্য ইঁহারা সময়ে সময়ে মিথ্যাকথার ত সৃষ্টি করেনই, তাহা ছাড়া অনেক স্থলে অতিবিরুদ্ধ অতি-অশ্লীল কথার অবতারণা করিতেও নিবৃত্ত হন না।

পুরাণের কথকতা সময়োপযোগী করিয়া আমাদিগকে ইহার সংস্কার করিতে হইবে। পুরাণের রচনার সময় পর্য্যন্ত ভারতে যে-যে বিষয় যেরূপ আলোচিত বা পরিজ্ঞাত ছিল, পুরাণকারেরা তাহা তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আরও কত নব-নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এক-একটি বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আমাদিগকে এগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। আমরা যখন "লবণেক্ষুসুরাসর্পিঃ"—প্রভৃতি সমুদ্র-সমূহের কথা বলিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতিরও নামোল্লেখ করিব; যখন বিন্ধ্য-হিমালয়ের কথা আসিবে, সেই সময়ে আল্‌প্‌স-ককেসসেরও নাম করিব; যখন গঙ্গা,যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতীর নাম করিতে হইবে, সেই সময়ে ভল্‌গা-নাইলেরও উল্লেখ করিতে হইবে; যখন নবগ্রহের কথা উঠিবে, তখন নব্যতন্ত্রের মতে রাহু-কেতুর লোপ করিয়া ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের উল্লেখও করিতে হইবে; যখন দর্শনপ্রসঙ্গ হইবে, তখন সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসার ন্যায় প্লেটো-ক্যাণ্ট-হিগেলের কথাও কহিতে হইবে। যেমন একই বিষয়কে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি, নব্য আবিষ্কার ও মতবাদগুলিকেও সেইরূপ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এমন কোন বিষয় থাকে যাহার সহিত পৌরাণিক বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, তাহা না হয় ধর্ম্মপুরাণের কথকতার সময় নাই বলিলাম, কিন্তু তাহারই আদর্শে নবীন পুরাণে তাহা শুনাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য-অধ্যাত্ম উভয়দিকেই কতক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এবং ইহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। অতএব বিদ্যাব্রতীগণ পুরাণকথকের আসনে অধিষ্ঠিত হউন। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে মধুময় পুরাণ-কথার লহরীমালা উত্থিত হইয়া গ্রামবাসীর পল্লীবাসীর হৃদয়কে অভিষিক্ত করুক, এবং পুনর্ব্বার পবিত্র সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়া উঠুক। গ্রামের মন্দির ও মসজিদ-গুলি জীর্ণ হইয়া স্খলিত-পতিত হইতেছে। এগুলিকে সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে। পল্লীর বটতরুর মূল শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। মুক্তশ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্ররূপ আসন পাতিয়া প্রকৃতি দেবী আহ্বান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া পুরাণ কোরাণ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহারই কথকতা আরম্ভ করুন। শ্রোতার অভাব হইবে না। পুরনারীগণ কথক ঠাকুরকে পরিবৃত করিয়া রাখিবে। যথাশক্তি ভোজ্য-দক্ষিণা দিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না, স্বতই তাহাদের সে প্রবৃত্তি আছে।

আত্মনির্ভরতা না থাকিলে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীরা ক্রমশই ইহা হারাইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, হস্ত থাকিতেও তাহারা কার্য্য করিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি আছে, অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহারা এক-একটি বৃহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে ভাব তাহাদের উদ্বুদ্ধ নাই। পানায় পানায় পুকুরের জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই জল পান করিয়া তাহারা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগিতেছে, কত অসুবিধাতেই তাহাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে; কিন্তু প্রতিদিন হয় ত পাঁচ শত লোক সেই পুকুরে স্নানাদি করে, তথাপি তাহার পানা উঠে না। প্রত্যেকে প্রতিদিন স্নানের সময় পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে কয়দিনই বা এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে লাগে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ-বিধবা একাকিনী দুইটি পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন স্নানের সময় নীরবে কিছুক্ষণ এই কার্য্য করিতেন। বর্ষায় পল্লীগ্রামে জলকাদায় মানুষের ত দূরের কথা, গ্রাম্য পশুগুলিও কত কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে দুই-চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, দুই-একটা নালা কাটিয়া দিলে গ্রামের জল বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও সহ্য করিবে, প্রতি বৎসরই জ্বরে জ্বরে জীর্ণ হইয়া পড়িবে, অথচ নিজেদের এই সামান্য কাজটি তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা ইহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলার বোর্ডের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই যে এই কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তাহা তাহাদের জানা নাই। ইহাদের এই শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে; যতদূর সম্ভব তাহারা নিজের প্রয়োজন নিজেই যাহাতে সম্পন্ন করিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতি বৎসরই হয় বানের জলের আধিক্যে, অথবা একেবারে তাহার অভাবে কত স্থানের কৃষকদের ধান নষ্ট হইয়া যায়। দুই চারি দশ গ্রামের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ২।৪ দিন কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া

কাজ করিলে হয় ত একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তাহারা দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে এ শক্তি আছে, তাহা তাহারা ভাবিতেই পারে না। এতই তাহাদের নিজের প্রতি অবিশ্বাস। "নাত্মানমবমানয়েৎ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।" দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে নিজেকে অবমানিত করিতে হয় না। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে নিজের প্রতি অবজ্ঞার ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়া সকলকে জড়-জীর্ণ করিয়া দিতেছে ইহার অপনয়ন করিতে হইবে, এবং ইহা খুব শক্ত নহে। যিনি কখনও এই শ্রমজীবী ও কৃষকদলকে লইয়া কোন নির্ম্মল রজনীতে উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে কথাবার্ত্তা বা আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, শিক্ষার কথা, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন ভদ্রনামধারী ব্যক্তিগণের অপেক্ষা তাহাদের হৃদয় কোনরূপেই শিক্ষাগ্রহণের এবং পরিচালনের অযোগ্য নহে; তাহাদেরও যথেষ্ট বোধশক্তি আছে, এবং কার্য্য করিতেও তাহারা পটু। গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকগণের সহিত ইহাদের কেমন একটা বিচ্ছেদ আছে। উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে ধাবিত, কেহই কাহারও দিকে দেখে না, একের সুখ-দুঃখ অন্যের নিকটে পৌঁছায় না। এই দূর-ব্যবধানের উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং এক শিক্ষাপ্রচারেই ইহা সম্ভব। দেশের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই শ্রমজীবী ও কৃষকগণকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের বস্তুত উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নানা উপায়ে, যিনি যেরূপে পারেন, তিনি সেইরূপেই ইহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। ইহাদের জন্য নৈশ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় এবং ইহা দুষ্করও নহে। ইচ্ছা হইলেই অনেকেই ইহা নিজ নিজ গ্রামে করিতে পারেন। গ্রামের যিনি যাহা জানেন, অবসর-মত এক-এক দিন তিনি তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই-সকল পাঠশালায় আলোচনা করিবেন। মুখে মুখে তাহারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যাদির কত কথা শিখিয়া ফেলিতে পারিবে, দেশবিদেশের কত কত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিবে, ভূগোল-ইতিহাসের কথা শুনিয়া বিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিবে।

উপনিষদের এক স্থানে আছে—"প্রজাপতিরাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্"—প্রজাপতি নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহাতে পতি ও পত্নী হয়। আরো আছে—"অর্দ্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়েতি"—স্ত্রী নিজের অর্দ্ধেক অংশ। ইহাই যদি পতি-পত্নীর সম্বন্ধ হয়, গৃহপতি যদি নিজের অপরার্দ্ধ গৃহপত্নীকেই লইয়া সম্পূর্ণ হন, তবে বলা বাহুল্য গৃহপত্নী অশিক্ষিত থাকিলে গৃহপতিরও শিক্ষা বস্তুত সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। শিক্ষার যদি আদৌ প্রয়োজন থাকে তবে তাহা যেমন পুরুষজাতির, সেইরূপ স্ত্রীজাতিরও। জল যদি তৃষ্ণাকে নিবারণ করিতে পারে, তবে তাহা পুরুষেরও করিবে, স্ত্রীরও করিবে; দীপ যদি অন্ধকার নাশ করিয়া গৃহকে উদ্ভাসিত করে, তবে তাহা, হে বন্ধু, তোমারও করিবে, আর ঐ যে সীমন্তিনী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহারও করিবে। এই একটা মোটা কথা লইয়া যখন এখনও কোন স্থানে বাদানুবাদ দেখিতে পাই, তখন অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বালকদের শিক্ষার জন্য আমরা যেরূপ প্রয়াস করি, বালিকাদের ও অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য আমরা তাহার একাংশও করি না। আমাদের যে, এ কোন্ মোহ জমাট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। হে পুরুষ, হয় তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে তোমার মত শিক্ষিত করিয়া তোল, না হয় তুমিও যাহা কিছু শিখিয়াছ সমস্ত গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তোমার সহধর্ম্মিণীরই মত অশিক্ষিত সাজিয়া বস। আমার বিশ্বাস, বন্ধু, তুমি কিছুতেই দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। যদি তাহাই হয়, যদি নিজে তুমি অশিক্ষিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা না কর, তবে কি নিমিত্ত, কোন্ অধিকারে তুমি তোমার স্ত্রীকে অশিক্ষিত রাখিবে? কেন আমরা আমাদের গৃহিণী, ভগিনী, জননীকে শিক্ষিত দেখিব না?

মাতৃভাষার সাহায্যে কোন বিষয়ের শিক্ষা সুলভ ও সুগম হয়। ভাষান্তর শিক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা কিছু শিখিতে গেলে তাহাতে অনেক অসুবিধা আছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগকে মাতৃভাষারই সাহায্যে শিক্ষালাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে। বঙ্গভাষাকে এজন্য পরিপুষ্ট করিতে হইবে, এবং এই পরিপুষ্টি দুই উপায়ে হইতে পারে; প্রথম, বঙ্গভাষায় নব-নব মৌলিক পুস্তকের প্রণয়ন; দ্বিতীয়, ভাষান্তরের অত্যাবশ্যক পুস্তকসমূহের বঙ্গভাষায় অনুবাদ। অনুবাদকার্য্য কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ হইলেও অনুরূপ বা আবশ্যকমত এখনো হয় নাই। এদিকে দ্রুতগতি না হইলে চলিবে না। পাশ্চাত্যভাষায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর অভাব নাই, য়ুরোপীয় দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত বাঙ্গালীও অনেক আছেন, কিন্তু কয়খানি পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানাদির পুস্তক অনূদিত হইয়াছে; কয়জন বাঙ্গালী এজন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে কত এম্-এ বাহির হইতেছেন, তাঁহারা অধ্যাপকও হইতেছেন, তাঁহাদের ছাত্রেরাও আবার উত্তীর্ণ হইতেছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত একখানিও য়ুরোপীয়-দর্শন-বিষয়ক পুস্তক বাঙ্গালায় বাহির হইল না। মাসিক পত্রিকা-গুলিতেও কচিৎকদাচিৎ এক-আধটা দার্শনিক প্রবন্ধ দেখা যায়, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। ঐ য়ুরোপীয় দর্শন যদি আমাদের সংস্কৃতদার্শনিকগণের নিকট উপস্থিত হয়, তবে কত উপকার হয়। কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধকতাই সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক আজ গল্প লিখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন! এক-এক জন এক-একটি বিষয় লইয়া সংগ্রহ করিতে থাকিলে অল্প দিনেই ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আমরা কোন কাজ আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল দেখিবার জন্য উৎসুক হই, নাম জাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। কার্য্যের দিকে যাঁহার লক্ষ্য নাই,—তিনি প্রধানত নামের দিকে লক্ষ্য করেন, তাঁহার কার্য্য ত ভাল হয়ই না, নামও হয় না। কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যত্নের সহিত যদি কোন কাজ করা যায়, তবে কাজটাও ভাল হয়, আর নামও হয়।

সংস্কৃতভাষা—সংস্কৃতসাহিত্য জগতের সর্ব্বত্র নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষার—বঙ্গভাষার নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা অনেক লইয়াছে, আরও তাহাকে অনেক লইতে হইবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ইহার পরিপুষ্টি অসম্ভব। বঙ্গভাষার অভ্যুদয়ের জন্য সংস্কৃতেরও প্রচার অত্যাবশ্যক। জেলায় জেলায় সংস্কৃতভাষার যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তাহা আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর দুইটি ভাষার প্রচার করিতে পারি, এবং করা উচিত। পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য কোন মতেই আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের সম্পূর্ণতাবিধানে পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যই সমর্থ। ভারতের মধ্য-যুগের ধর্ম্মে ও সমাজে ত্রিধারার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক দিকে

বৌদ্ধ, আর এক দিকে জৈন, এবং মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধারা। পালিসাহিত্যের এক-আধটু আলোচনা দেখা গেলেও প্রাকৃত সাহিত্য, বিশেষত প্রাকৃতনিবদ্ধ জৈন সাহিত্য এখনও আমাদের আলোচনার পথে উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃতের সহিত পালি ও প্রাকৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনায়াসে তাহার সহিত ইহাদের আলোচনা চলিতে পারে।

কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে গান্ধর্ব্ব বা সঙ্গীত-বিদ্যা অতি-উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে; যে-যে স্থানে ইহা আলোচিত হয়, প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা একটি বিলাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; ইহা যে একটি বিদ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না। আমাদের পৌরাণিক আচার্য্যগণ সঙ্গীতকে অষ্টাদশবিধ বিদ্যার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে বেদের ন্যায় সম্মান করিতেন, এবং সেই জন্যই গান্ধর্ব্ববেদ বলিয়া ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সঙ্গীতের কোন স্থান নাই, যে-সমস্ত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা-জল্পনা, আন্দোলন-আলোচনা শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদেরও মধ্যে সঙ্গীতের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশান্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের স্থান আছে, এবং তাহা অতি-সঙ্গত। ভারতের সঙ্গীতবিষয়ে নিজের বিশেষত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, শিক্ষিতগণ এদিকে প্রায় উদাসীন, ভারতের নিজের চিন্তিত, নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের দর্শন পাওয়া দূরের কথা, নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি আসিয়া ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লোকে একটু চেষ্টা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল রস অনুভব করিবার ইচ্ছা করে না, কেবল উপরের ভাসা-ভাসা যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অভিনয়গুলি ত পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণ, যাত্রার দলও ক্রমশ সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রায়ই বহিষ্কৃত হইয়াছে। আতোদ্য বা ঐকতানিক বাদ্যে বৈদেশিক যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত যখন ব্যসনরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহা অনর্থ প্রসব করে, সংযতভাবে তাহার অনুশীলন কখনই অকল্যাণের কারণ নহে।

সঙ্গীতের দ্বারা সাহিত্যের রসপুষ্টি হয়। কাব্যার্থ গীত হইলে তাহা শ্রোতার মর্ম্ম অধিকতর ভাবে স্পর্শ করে। সাহিত্য সমাজে যাহা করিতে চাহে, সঙ্গীত সংযোগ হইলে তাহা আরও সুচারুভাবে করিতে পারে। ভারতের আদি মহাকাব্য এখনও নানারূপে গীত হইয়া শ্রবণবিবরে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। সঙ্গীত সাহিত্যেরই অঙ্গ। ইহাকে বর্জ্জন করিলে সাহিত্য বিকল বলিয়া গণনীয়। অতএব সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ে নেত্র নিমীলন করিয়া অবস্থান করা কোনরূপেই উচিত নহে। কেবলমাত্র বিলাসের উপকরণ মনে না করিয়া, বিদ্যাহিসাবে যাহাতে ইহা সকলে অনুশীলন করেন, এবং ভারতীয় সঙ্গীতকলা রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গীতপ্রিয়গণ এজন্য চেষ্টিত হউন।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষত্ব থাকে এবং তাহারই প্রয়োজন। যিনি যেরূপে পারেন তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিপুষ্টির জন্য সেইরূপেই তাহা করিবেন। যিনি ধনবান্ তিনি ধন দিয়া সাহায্য করুন, যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি বুদ্ধি প্রদান করুন বিদ্বান্ বিদ্যা প্রদান করিবেন, শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্রের কথা উপদেশ করিবেন, ধার্ম্মিক ধর্ম্মপ্রচার করিবেন; এইরূপে যাঁহার যাহা শক্তিতে কুলায়, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। যাঁহার যাহা আছে তিনি তাহাই দিয়া আত্মাকে প্রকাশিত করুন। দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই কেবল বিশ্বের নিকট নিজকে সমর্পণ করিতেছে। তাহাতেই তাহার সার্থকতা। গোলাপ ফুলটি নিজের অন্তরের ভিতরে যে সৌরভসম্ভার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই ত কেবল প্রকাশ করিয়া বিশ্বের মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, গোলাপের গোলাপত্ব তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। সে নিজের জন্য এক কণাও রাখিয়া দিতেছে না। যখনই তাহা সেই সৌরভ-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, তখন তাহার বস্তুত আত্মপ্রকাশ হয় না, তাহার সার্থকতা লাভ হয় না। সূর্য্য নিত্যই এইরূপে বিশ্বের নিকটে নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ করিতেছে। বর্ষার মেঘ এইরূপেই জলরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিশ্বের নিকটে সমর্পণ করিতেছে। জগতের সমস্ত ভূতই এইরূপে নিজেকে প্রকাশ ও উৎসর্গ করিতেছে। প্রকাশ ও উৎসর্গ ইহাই জগতের নিয়ম। অতএব বন্ধুগণ, প্রকৃতির নিয়মে এই ভাবেই পরিচালিত হওয়া আমাদের স্বভাব, আমরা যেন এই স্বভাব হইতে স্খলিত না হই। আমরা যে যাহা পারি তাহাই করিব, এমন কি একটি কথাও উচ্চারণ করিয়া যেন সাহিত্যসেবা করিতে পারি, এবং এই সাহিত্য-সেবা দ্বারা বিশ্বসাহিত্যের সেবা করিয়া এই সমগ্র বিশ্বের সেবায় সমর্থ হইতে পারি।

তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা (পৌষ)।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে;
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে!
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা;
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে!
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে;
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে!
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন!
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার
কূল সে নাহি জানে!

দেশের অশান্তি ও আশঙ্কার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের উপর দিয়া যেন এক ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। চারিদিকে উপর্য্যুপরি নানা অশান্তি, উদ্বেগ, আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস যেন নিত্য নূতন বিকট-মূর্ত্তিতে দেশের রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারীকে আতঙ্কিত ও বুদ্ধিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করি-

তেছে। অনেকেই মনে ভাবিতেছেন—ভারতবর্ষের বস্তুতঃ অতি দুঃসময় উপস্থিত। বিধাতা কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কি ব্যাপার সংঘটিত করিতেছেন, তাহা সকল সময় অবধারণ করা আমাদের স্যায় ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত। কিন্তু তিনি মঙ্গলময়,—আপাততঃ যাহা আমাদের নিকট দুঃখ ও বিভীষিকাপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয় তাহার মধ্যেও তাঁহার মহামঙ্গলময় মহদুদ্দেশ্য-সাধন-বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভয় বিভীষিকার দুর্দ্দিনে, স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও বিচারবুদ্ধিকে সুস্থির রাখিয়া, ধীর-নিশ্চিত-গতিতে, সত্য-প্রেম-মঙ্গল-পূর্ণ অভীষ্ট পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াও যে অত্যন্ত কঠিন, তাহারও সন্দেহ নাই। রাজা প্রজা সকলেরই সকল সমস্যার সমাধানও যে সুকঠিন, তাহারও সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় বিধাতা সকলকেই সুমতি ও সদ্বুদ্ধি দিয়া, সুপথে পরিচালিত করিবার শক্তি ও সুযোগ দিয়া দেশের সর্ব্ববিধ সুখ শান্তি স্বস্তি ও শুদ্ধি প্রবর্দ্ধিত করুন, এই আমাদের প্রাণের কামনা ও কাতর প্রার্থনা। সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই অদ্য আমরা এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বিষয়টি যেমন অত্যন্ত গুরু, সে বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করিয়া—সমালোচনা করিয়া সত্য প্রকাশ করাও সেইরূপ সুকঠিন। কারণ আমাদের কোন্ কথা আজকাল কে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কারণ রাজা প্রজা—সকলের চিত্তই এখন অল্লাধিক পরিমাণে আলোড়িত, সংক্ষুব্ধ, সঙ্কুচিত। তাই বলিতেছি, এসময়ে এ ক্ষুরধার পথে পদার্পণ করাও সহজসাধ্য নহে। কিন্তু রাজা ও প্রজা—জনসাধারণের সাধ্যানুসারে সেবা করাই যখন পত্র-পত্রিকা-পরিচালকবর্গের ও দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ শিক্ষিত নাগরিক মাত্রের মুখ্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম, তখন এ সময়ে নীরব নিষ্ক্রিয় থাকাও আমরা একান্ত অসঙ্গত মনে করি। তাই সময় সময় নানা সুযোগে নানাভাবে সত্য কথা, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অপ্রিয় হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা থাকিলেও, প্রকাশ করিয়া আমরা আমাদের দায়িত্বপ্রতিপালন করি। "পাইওনিয়র", "ইংলিশম্যান" প্রভৃতির সহিত সকল সময়ে সুর মিলাইয়া আমরা সর্ব্ববিধ শান্তি-শাসন-তন্ত্র-মন্ত্রের সমর্থন করিতে পারি না বলিয়া, আমরা তাঁহাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট নিন্দিত, এমন কি সাম্রাজ্যধ্বংসকামী বিপ্লববাদী বলিয়াও অভিহিত হই; আবার অপরদিকে, আমরা "যুগান্তরের" সহিত সুর মিলাইয়া, অদ্য এই মুহূর্ত্তেই ইংরাজ জাতির সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও সহায়তা করিতে পারিনা বলিয়া, এ দেশের কোন কোন ব্যক্তির নিকট কাপুরুষ ও দেশের মহাশত্রু বলিয়া নিন্দিত ও ধিকৃত হই। কিন্তু বিধাতার কৃপায় আমরা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে আপন কর্ত্তব্য যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করিতে পারিলেই পরম কৃতার্থ বোধ করি।

এদেশে এখন অশান্তি, আতঙ্ক, উদ্বেগ ও অবিশ্বাস ক্রমেই যে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত সাধুপ্রকৃতির লোককেও এখন অবিশ্বাসের চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহার অনেকক্ষেত্রে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে এমন কোন কোন দেবচরিত্র মহাশয় ব্যক্তির পশ্চাৎ এমন অযোগ্য অকৃতি গুপ্তপুলিশ নিত্যসহচররূপে সর্ব্বত্র অনুসরণ করে, যে, তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইলে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুগপৎ লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না। নবগঠিত ডিষ্ট্রিক্ট এড্‌মিনিষ্ট্রেশন কমিটির সদস্য মহোদয়েরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নানা সম্ভ্রান্ত দেশীয় ব্যক্তির ও স্থানীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষবর্গের নিকট স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, —এ দেশের জনসাধারণের ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি মনের ভাব এখন কিরূপ, প্রজাসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ লোকে আজকাল এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব অথবা উচ্ছেদ-কামনা করিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্ট অধিকতর লোকপ্রিয় হইতে পারেন, কি উপায়ে দেশের এনার্কিষ্টদল নির্ম্মূল হইতে পারে, এনার্কিষ্টদলের প্রতি প্রজাদের সহানুভূতি কিংবা কোন

প্রকার সংস্রব থাকিলে তাহার পরিমাণ কত, ইত্যাদি।

সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হইলেও এদেশে আজ কয়েক-বৎসর যাবৎ যে একদল বিপ্লববাদীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের জন্য দেশের রাজপুরুষ এবং জনসাধারণ—সকলেই এখন নিয়ত উদ্বিগ্নভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তাহাদের দুঃসাহসের কথা মনে ভাবিয়া, রাজপুরুষগণ প্রজাবর্গের ধন মান প্রাণ সুখ শান্তি কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারিবেন সে চিন্তায় যেমন সতত চিন্তিত, নিজেদের ধন মান প্রাণ কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারিবেন সে চিন্তায়ও তেমনি ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। দেশের লোকও এখন উভয়সঙ্কটে পড়িয়া অতি ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতেছে। একদিকে বিপ্লববাদীদের হস্তে কাহার কখন্ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, কে কখন কোথায় দস্যুর বোমা রিভলভারের আঘাতে অকালে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি নানা ভয় বিভীষিকা। অপর দিকে গুপ্তপুলিশ আপন ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় কখন কোন্ নিরপরাধকে বিপজ্জালে জড়াইতে চেষ্টা করে, কখন্ কাহার বাড়ী খানাতল্লাস হয়, কোন্ দিন কে কোন্ মোকদ্দমায় পড়ে, কাহার পুত্র ভাগিনেয় কিম্বা ভ্রাতার লেখাপড়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া কোন্ ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সে আসামী বলিয়া ধৃত হয়, অথবা কে কখন কোন্ রাজপুরুষের সন্দেহ, বিদ্বেষ বা কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়, কাহার কখন চাকরী যায়, ইত্যাদি নানা প্রকারের আশঙ্কা।

আবার অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে গুর্খা, গোলন্দাজ, শিখ, মারহাট্টী, পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোরা সৈন্যের বহু সমাবেশের কথায় দেশের সকল শ্রেণীর নরনারী অত্যধিক ভীত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা দেশের বর্ত্তমান অশান্তি ও উদ্বেগের এখানে কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। ভয় ও অবিশ্বাসের বিকট মূর্ত্তিসমূহ নানা জল্পনা কল্পনার সাহায্যে কিরূপ বীভৎস-লীলা করিতেছে, আমরা এখন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পূর্ব্ববঙ্গে এবার এত বিভিন্ন শ্রেণীর ও এত অধিক-সংখ্যক বৃটিশ বাহিনীর আগমন-সংবাদ শুনিয়া কেহ কেহ এরূপও মনে ভাবিতেছে যে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বোধ হয় বিপ্লববাদীদের গুপ্ত অস্ত্রাগার কেল্লা প্রভৃতির গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান পাইয়াছেন। কেহ কেহ এমনও মনে ভাবিতেছে যে হয়ত পূর্ব্ববঙ্গে বিপ্লববাদীদের এতই সংখ্যাধিক্য হইয়া থাকিতে পারে যে তাহারা সুযোগ পাইলে বৃটিশ সৈন্যসমূহের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিতে পারে, এই সম্ভাবনায় বিপ্লববাদীগণ প্রকাশ্যযুদ্ধ ঘোষণা করে কিনা পরীক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিতেছে যে বিপ্লববাদীদিগকে নির্মূল করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাসাধারণ গভর্ণমেণ্টের সহিত মনে প্রাণে যোগ দিবার পরিচায়ক উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত করে নাই; সৈন্যেরা নানা স্থানে লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার ভয়ে গভর্ণমেণ্টের ভবিষ্যতে মফঃস্বলে আর কোথাও যেন সৈন্য প্রেরণ করিবার কারণ উপস্থিত না হয়, সেজন্য প্রজাসাধারণ বিপ্লববাদীদিগকে শাসিত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিবে, এইরূপ অভিপ্রায়েই গভর্ণমেণ্ট এবার এক সময়ে এতগুলি সৈন্য আনয়ন করিতেছেন। এইরূপ ভাবের নানা লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কে কত বিভিন্ন বিচিত্র কল্পনার উদ্ভব হইতেছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা সুকঠিন।

কোন কোন ইংরাজ যেমন ভারতবাসীদিগের স্বাভাবিক রাজভক্তিতে সন্দিহান হইয়াছেন, কোন কোন ভারতবাসীও আবার সেইরূপ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের স্বাভাবিক প্রজাহিতৈষণা বুদ্ধিতে একেবারে সন্দিহান। গভর্ণমেণ্ট ভারতের কৃষিবল গোজাতির সংখ্যা ও অবস্থা অবগত হইবার জন্য ভারতবাসীর গৃহস্থিত গবাদি পশু সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কোন কোন ভারতীয় কৃষক মনে ভাবিল, গভর্ণমেণ্ট হয়ত গবাদি পশুর সংখ্যার উপর নূতন কোন কর ধার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছেন। দেশে সেটেলমেণ্ট জরিপকালে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কয়খান ইটকালয়, কয়খান খড় বা উলুতৃণের ঘর আছে তাহা যখনই জিজ্ঞা-

সিত হয়, কোন কোন প্রজা মনে করে, হয়ত ইষ্টকালয় ও ঘরের সংখ্যার উপর গৃহস্থের সাংসারিক অবস্থার স্বচ্ছলতা অনুমান করিয়া গভর্ণমেণ্ট নূতন কোন টেক্‌স্ স্থাপন করিবেন। বঙ্গীয় কৃষকেরা কে কি পরিমাণ ভূমিতে কোন্ বৎসর পাট বপন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ বার্ষিক ভাবী পাট আবাদের পরিমাণ অবধারণ করিতে অনেকটা সাহায্য পাইবার কথা। সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় চৌকীদার পুলিশের সাহায্যে পাটচাষে কোন্ প্রজার কত জমী রহিয়াছে জানিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি কোন কোন অশিক্ষিত অবস্থানভিজ্ঞ কৃষক সমালোচনা করিতে লাগিল যে অতঃপর নিশ্চয় সরকার বাহাদুর পাটের উপর একটা টেক্‌স্ ধার্য্য করিবেন। এই প্রকার নানা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সরকারী অনুষ্ঠানেও আজকাল লোকে গভর্ণমেণ্টকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষে দেখিতেছে। জমীদার ও তালুকদার শ্রেণীর লোকের অনেকের মনের এখন এই ধারণা যে গভর্ণমেণ্ট এদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করিতেছেন না—এজন্যও কেহ কেহ উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও দেশে শিক্ষার বহুল বিস্তারের প্রতি গভর্ণমেণ্টের মনের ভাব অনুকূল নহে বলিয়াও এদেশের বহুলোকের এখন ধারণা। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দিন দিন অন্নচিন্তা-সমস্যার সমাধানে অক্ষম হইয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় প্রমাদ গণিতেছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষার বিস্তার জন্য অন্যান্য সভ্য স্বাধীন দেশের গভর্ণমেণ্টের ন্যায় সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেছেন না, এরূপ ধারণাও ক্রমে বহুলোকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। দেশবাসী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিধানের ন্যায় অকস্মাৎ এমন এক একটা আইন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রচলিত করিতেছেন যে তদ্দ্বারা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে নূতন স্বত্বাধিকার লাভ ত দূরের কথা, পূর্ব্বে প্রাপ্ত ও প্রশংসার সহিত পরিচালিত অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া দেশবাসীর তাহা পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত সুদীর্ঘকালব্যাপী স্বরভঙ্গকারী ও শক্তিক্ষয়কারী ভীষণ আর্ত্তনাদেও তাহা আবার লাভ করিবার আশা অতি অল্প। সুদূর ভবিষ্যতেও কোন কালে ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত করা ইংরাজজাতির পক্ষে সঙ্গত কিংবা সম্ভবপর হইবে না, লর্ড মর্লি একথা স্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করিয়া দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করেন নাই, পরন্তু বহু ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত ব্যক্তির অগাধ বিশ্বাস বিনষ্ট ও ভক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের অধীন ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ, সেই-সকল দেশের প্রবাসী ভারতবর্ষীয় নরনারীর প্রতি এই যে নিত্য নূতন ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, নীচ স্বার্থবুদ্ধিতে আইনের চক্র ঘুরাইয়া ভারত-সন্তানসন্ততিদিগকে নির্য্যাতিত নিষ্পেষিত করিতেছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আধুনিক ভারতবাসী মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতেছে যে এ যুগের ইংরাজেরাও ক্লার্ক্‌সন, বাক্সটন ও উইল্‌বারফোর্স প্রভৃতি মহাত্মাদিগেরই বংশধর।

পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশনের সমক্ষে এ দেশের যে-সকল শ্বেতাঙ্গপুরুষ সাক্ষ্য দিতেছেন তাঁহাদের অনেকে এই ভাবে কথা বলিতেছেন যে সরকারী কার্য্যে প্রায় সকল বিভাগেই ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনায় ভারতবাসীদিগের যোগ্যতা যথেষ্ট নহে। মিত্র রমেশচন্দ্র, দত্ত রমেশচন্দ্র, সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সংসারচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র, রাসবিহারী, নীলাম্বর, আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বর, প্রভৃতি—এক বঙ্গদেশের শত শত সুসন্তানের বিমল কর্ম্মজ্যোতি-ছটাতে দিঙ্মণ্ডল আজও অত্যধিক আলোকিত রহিয়াছে। অধিকতর সুযোগ পাইলে এই-সকল ভারতবাসীই আরও কত বিস্ময়কর কর্ম্ম-সাফল্য প্রদর্শন করিয়া জননী জন্মভূমির ও স্বজাতির মলিন মুখ উজ্জ্বলতর করিতে পারিতেন, কে তাহা অবধারণ করিতে পারে? কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন কোন স্বার্থান্ধ শ্বেতপুরুষ, কোন যুক্তি কারণ প্রদর্শন করিতে সক্ষম না হইয়াও, শুধু গায়ের জোরে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের অপকৃষ্টতা প্রতিপাদিত করিয়া

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদিগের অভিমত এদেশীয় লোকদিগের প্রতিকূলে প্রকাশিত করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইতেছেন! যে দেশে এযুগেও রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হরিনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, লালমোহন, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, শিশিরকুমার, অশ্বিনীকুমার, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহা মনীষী পুরুষেরা একে একে, এক এক অদ্বিতীয় অতুলন প্রতিভা কর্ম্মকুশলতা ও চরিত্রগৌরব প্রদর্শন করিয়া, বলিতে গেলে একরূপ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত বিমুগ্ধ করিয়া গেলেন, সে দেশের লোক কর্ম্মকুশলতায় ইউরোপীয়ানদিগের সমকক্ষ নহে, এরূপ উক্তি করা কি নিতান্তই সহজ না সঙ্গত?

সে যাহা হউক, ভারতবাসীর মহা সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এ সময়ে, ভারত-গৌরব কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিক্ষা-সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জগতের আজ আবার অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গিবার নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সুক্ষ্মদর্শী সহৃদয় বড় লাট লর্ড হার্ডিং গীতাঞ্জলির অনুবাদ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া সে দিন যাঁহাকে "Poet Laureate of Asia" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আজ বিশ্বসাহিত্য-সমাজের শিরোমণিরা তাঁহাকেই Poet Laureate of the World রূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। আমাদের এখন আশা হইতেছে ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি আরও কোন কোন মনীষী অচিরে আবার এই নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভারতজননীর মলিন মুখ জগতে আরও উজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার কথা এই যে, আজও যে জাতির অন্ততঃ একজনও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার জাতি-গোষ্ঠী-স্বজন-বংশের অপর সকলে কি একবারেই জুলু কিম্বা এস্কুইমোর সমশ্রেণীর জীব? ভারতবর্ষীয় "সার্ভিসের" সহিত যাঁহাদের স্বার্থ-সংশ্রব নাই, সভ্য জগতের সেই-সমস্ত দেশ ও জাতির লোক এখন অবশ্যই উপলব্ধি করিতেছেন যে ভারতবর্ষের লোক অসভ্য, অক্ষম কিংবা নির্ব্বোধ নহে। শুধু কতিপয় স্বার্থান্ধ ইংরাজ তাহা স্বীকার না করিলে ভারতবাসী তাহাতে প্রীত সন্তুষ্ট হইতে পারিবে কেন? ভারতবর্ষীয়েরা যে শারীরিক সামর্থ্যে, বুদ্ধিপ্রখরতায় এবং চরিত্র-গৌরবে পৃথিবীর যে-কোন সভ্য ও স্বাধীন জাতির সমতুল, তাহা কোন কোন সহৃদয় সত্যবাদী ইংরাজও স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতবাসীর চক্ষে রাজা "মহতী দেবতাহেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" ভারতবাসীর রাজভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ, যে রাজভক্তির জগতে অন্যত্র তুলনা নাই; Loyalty শব্দ ভারতের সেই "রাজভক্তি" শব্দের প্রতিশব্দও নহে, সমার্থবাচকও নহে। ভারতের রাজভক্তি স্বর্গের জিনিস। সেদিন মহামহিমান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তি কিরূপ অতুলন ও অমূল্য তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আহ্লাদিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনেক ইংরাজ মনে ভাবেন না যে ভারতবর্ষের রাজার আদর্শও শ্রীরামচন্দ্র। রাজ্যাভিষেক-কালে ভারতের রাজা রামচন্দ্রই প্রজাবর্গকে বলিয়াছিলেন—প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে, নিজ ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক যাবতীয় দ্রব্যসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে, তৃতীয়তঃ আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিতে, এমন কি প্রজাদিগের হিতসাধিত হইবে বুঝিতে পারিলে পরিশেষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা এবং জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ও অপরিত্যাজ্যা স্বীয় ধর্ম্মপত্নী জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধাবোধ করিবেন না কিংবা পশ্চাৎপদ হইবেন না। পৃথিবীর অপর কোন্ দেশে, কোন্ কালের কোন্ রাজা স্বীয় অভিষেক-কালে এভাবে প্রজাগণ-সমক্ষে এরূপ ভাষায় স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছেন? জগতের ইতিহাস বোধ হয় এখানে নীরবে পরাভব স্বীকার করিয়া মস্তক অবনত করিবে। কিন্তু বিস্ময় ও আহ্লাদের বিষয় এই যে মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি তদীয় জীবনে বর্ণে বর্ণে আচরিত সত্যে পরিণত হইয়াছিল। জগতের নীতিশাস্ত্রবিদেরা মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত এই কঠোর

রাজধর্ম্মাচরণকে অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু প্রজারঞ্জক আদর্শ রাজার ইহা যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের অত্যুজ্জ্বল ও অদ্বিতীয় মহদ্দৃষ্টান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজার স্বজাতীয় বলিয়া যে-সকল ইংরাজ বা ইউরোপীয়, ভারতবাসীদিগের নিকট রাজবৎ সম্মাননার চক্ষে অবলোকিত হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের নিজ দায়িত্ব কিরূপ গুরু, সে বিষয়টাও একবার স্থির ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে এদেশের দুঃখ দুর্গতি অশান্তি. অসন্তোষ উদ্বেগ অবিশ্বাস, রাজপুরুষ ও প্রজাপুঞ্জ—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। যে-সকল শ্বেতাঙ্গ সবুট লাথি মারিয়া গরিব ভারতবাসীর প্রাণবধ করেন এবং যে-সকল শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ রাজা রামচন্দ্রের বিচারাসনে বসিয়াও স্বজাতিপ্রীতিতে অন্ধ হইয়া ভারতবাসীর বিবর্দ্ধিত প্লীহার দোহাই দিয়া বিচারে বিভ্রাট ঘটাইয়া নরহত্যার অপরাধ অস্বীকার করেন, উড়াইয়া দেন, এ দেশের অসন্তোষ অবিশ্বাসের অগ্নিতে তাঁহারা সামান্য ইন্ধন প্রদান করিতেছেন না। দস্যু, তস্কর, লম্পট সকল দেশেই আছে, তাহারা নিশ্চয়ই দেশের কলঙ্ক ও পাপ। পথে ঘাটে রেল ষ্টীমারে কোন শ্বেতাঙ্গ কোন ভারতীয় মহিলার ধর্ম্মনষ্ট করিলে তাহার অপরাধে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে নিন্দা করা নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু সেই অপরাধী, শ্বেতচর্ম্মী বলিয়া, যদি ইউরোপীয় বিচারকের নিকট বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করে কিংবা অসঙ্গত লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে সেই বিচারক ভারতবর্ষের বিচারাসনে বসিবার অযোগ্য এবং দেশের অশান্তি ও অসন্তোষ বৃদ্ধির তিনিও একজন সহায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যুগের ভারতীয় মোসলমান রাজপুরুষগণ এ যুগের ইউরোপীয় রাজপুরুষগণ অপেক্ষা বুদ্ধি, বিবেচনা, রাজনীতিজ্ঞতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে অনেকটা হীন ছিলেন বলিয়া এখনকার অনেকের ধারণা। শ্রীবৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি হিন্দুর কোন কোন পুণ্য তীর্থে সে যুগের মোসলমান রাজপুরুষেরাও গোবধ, এমন কি কোন কোন স্থানে কোনও প্রকারের জীবহিংসা এবং বৃক্ষচ্ছেদও অকর্ত্তব্য মর্ম্মপীড়াকর ভাবিয়া, যাহাতে কোন মোসলমানও এরূপ কোন গর্হিত কার্য্য না করিতে পারে সেজন্য, সুস্পষ্ট নিষেধ ঘোষণা করিয়া সকলকেই সেই বিধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিতেন। এখনকার সকল রাজপুরুষ সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত প্রজার মনোবেদনা যাহাতে না জন্মিতে পারে এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিলে অযোধ্যায় গোবধের ন্যায় ব্যাপার এ যুগে সংঘটিত হইতে পারিত না। শ্রীশ্রীব্রজধামের নিষিদ্ধ ভূখণ্ডে সে দিন এক নিরীহ প্রকৃতির ব্রজবাসী বৈষ্ণবের সযত্নপালিত হরিণ বধ করিয়া এবং অবশেষে সেই বৈষ্ণবেরও প্রাণবধ করিয়া যে ইংরাজ সৈনিক বৃটিশ বাহিনীর উপর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিল তাহার কাহিনী এবং তাহার বিচার-কাহিনী—উভয়ই ভারতবাসীর মনে অশান্তি, উদ্বেগ, আশঙ্কা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে ভিন্ন বিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই। কানপুরের মছলি-বাজারের মস্‌জিদ্‌ সম্পর্কিত শোচনীয় ব্যাপারের পরিশেষে দূরদর্শী ও সহৃদয় বড়লাট লর্ড হার্ডিং বাহাদুর যে সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদভাজন হইলেন ঐ ব্যাপারের আদিতে কিংবা মধ্যভাগে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, এমন কি ছোট লাট মেষ্টন বাহাদুর তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলে এই দেশব্যাপী মর্ম্মবেদনার কদাচ উদ্ভব হইত না।

প্রজাবর্গের সন্তোষ যে শতকোটী সৈন্যের শারীরিক বল ও শতকোটী আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও অধিকতর আবশ্যক সকলে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইংরাজ রাজত্বের কর্ণধারকুলের কেহই যদি তাহা উপলব্ধি না করেন, তবে তাহা নিতান্তই পরিতাপ ও অনিষ্টের কারণ বলিতে হইবে। এদেশের শিক্ষা-সংস্কারে রাজপুরুষদিগকে সৈন্য-সংস্কার অপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইতে দেখিলে, সকলেই সমস্বরে রাজপুরুষদের প্রশংসা করিবে। দেশে পুলিশ এবং গোয়েন্দা-পুলিশের সংখ্যা এবং পোষণব্যয় দিন দিন অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষাবিস্তার-কল্পে সেই টাকাগুলা ব্যয় করিলে দেশ প্রকৃত লাভবান হইতে পারিত। গুপ্তপুলিশ এবং পিউনিটিভ পুলিশ রাখিয়া

গবর্ণমেণ্টের কিছু লাভ হইয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা দেশের অপকারও কম হইতেছে না।

মোসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশের মনের ভাব ও বিশ্বাস অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও অনুরূপ ছিল। তাঁহাদের আশা ও বিশ্বাসে যদি কোন কারণে কেহ নিদারুণ প্রচণ্ড আঘাত করেন, তবে তাঁহাকে আমরা দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও সাম্রাজ্যের সুহৃদ বলিতে পারিব না। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ডাঃ সুহ্রাবর্দ্দী ও আবদুল রসুল সাহেবদের অধ্যাপকপদে নিয়োগে গভর্মেণ্ট আপত্তি করিয়াছেন এবং বিলাতে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মহম্মদআলী ও শ্রীযুক্ত ওয়াজির হোসেন সাহেব যেরূপ অপ্রত্যাশিত রুক্ষ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহাতেও দেশের শিক্ষিত হিন্দু মোসলমান খৃষ্টান—জনসাধারণের আশা বিশ্বাস অনেকটা লাঘব হইয়াছে, কেহ কেহ উদ্বিগ্ন হইয়াছে। বিলাতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী এবং প্রধান মন্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশাল মোসলমান-সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নানা দুঃখ ও অভাবের কথা নিবেদন করিতে পারিতেন। বৈধ আন্দোলনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। অভিযোগের প্রতিকার করা সরকার বাহাদুরের পক্ষে সম্ভবপর কিনা তাহা তাঁহাদেরই বিবেচনা ও ইচ্ছাধীন। কিন্তু ব্যথিত-হৃদয়ে প্রজাদের কোন পদস্থ প্রতিনিধি যদি রাজপুরুষগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিবারও অধিকার প্রাপ্ত না হয়, তবে সে মর্ম্মবেদনা এ সংসারে আর কে দূর করিতে পারে?

বৈধ আন্দোলনের সফলতায় শিক্ষিত প্রজা-সাধারণের আশা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলা ও কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। শাসন ও বিচারবিভাগের পার্থক্য-সাধন, মুদ্রাযন্ত্রবিধানের কঠোরতা হ্রাস, দেশের ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সদস্যগণের প্রকৃত কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া প্রকৃতরূপে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ, প্রভৃতি বিষয়ে এদেশের হিন্দু মোসলমান, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত-সমাজ-শিরোমণিদের প্রায় সকলেরই এক মত। এ-সকল বিষয়ে কংগ্রেস ও মোস্‌লেমদিগের মত এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের এরূপ বিরাট, বিশাল বৈধ আন্দোলন ফলপ্রদ না হওয়ায় দেশবাসীর মনে শান্তি ও আশা বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে কি প্রকারে? ইংরাজ রাজপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞদিগের এ-সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রতিকারযোগ্য বিষয়সমূহের সত্বর সংস্কার ও সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত দেশের বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিবর্গের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকা অসম্ভব বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারিলে দেশবাসী সুখে শান্তিতে নিরুদ্বেগে দিনযাপন করিতে পারিবে, এ কথাও সকলে বিশ্বাস করে। দেশের লোক সাধ্যানুসারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক। কিন্তু তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে এত চেষ্টা করিয়াও গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারী-বর্গ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। তথাপি যাঁহারা, দেশবাসী যথোপযুক্তরূপে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেছে না, এরূপ মনে ভাবেন, আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ কিংবা নিরপেক্ষ, এরূপ বলিতে পারি না। প্রকৃত দোষীকে নিরাকরণ করিতে অক্ষম হইয়া নিরপরাধ প্রজাসাধারণকে সৈন্যসমাবেশের ভয়ে আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন করাও আমরা সঙ্গত মনে করি না। এ যেন ছোট ডাকাতের বদলে বড় ডাকাত লেলাইয়া দেওয়া। ডাকাতেরা বন্দুক রিভলভার প্রভৃতি ভীষণ প্রাণনাশক আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া নিরস্ত্র নিরীহ-প্রকৃতির গ্রাম্যলোকগুলিকে মেষশাবকের ন্যায় অক্ষম পাইয়া অত্যাচার করিতেছে। তাহার উপর সৈন্য সমাবেশে আতঙ্ক বৃদ্ধি না করিয়া যাহাতে প্রতি সমৃদ্ধ পল্লীতে অন্ততঃ ২।১জন লোকের বাড়ীতে রিভলভার ও কার্ত্তুজ বন্দুক রক্ষিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় করুন। অস্ত্র-আইনের কঠোর বিধানগুলি পরিবর্জ্জিত হউক। বিপৎকালে গ্রামের যে-কোন সাহসী সুদক্ষ-

ব্যক্তি যাহাতে গ্রামের অন্যকীয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে এরূপ নির্ভয় প্রাপ্ত না হইলে এবং গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সহজে বন্দুক রিভল্‌ভারের লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইলে, ডাকাইতদিগকে প্রতিরোধ করা ত দূরের কথা, তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাদের দলের দুই এক জনকে আহত করিতেই বা কে সাহসী বা সক্ষম হইতে পারে? অস্ত্র-আইনের কঠোরতা বৃদ্ধি করায় দেশে বন্দুকাদির লাইসেন্স ও সংখ্যা ক্রমে অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে কোন কোন স্থলে হিংস্র পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং কোথাও কোথাও মনুষ্যও হিংস্র জন্তুর দ্বারা নিহত হইতেছে, অপর দিকে দস্যু ডাকাতদিগেরও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে।

দেশের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এরূপও বলিতেছেন যে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র পরিবারের বালকেরা ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে অক্ষম হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী কার্য্যকরী কোনশিল্প বাণিজ্যের শিক্ষাও কেহ সহজে প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহার ফলে দেশের দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের অন্নসংস্থান-সমস্যা দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। এ কারণেও কোন কোন অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রসন্তান জীবনে নিরাশ হইয়া ডাকাতের দলে যোগ দিতেছে। তাঁহাদের এ অনুমানও যে একেবারে মিথ্যা, তাহাই বা কে কি প্রকারে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন। ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে ইউরোপ আমেরিকা এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, সফরেজিষ্ট প্রভৃতির সংখ্যাধিক্যে ও তাহাদের ভীষণ লোমহর্ষণকর নানা অনুষ্ঠানে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে-সকল দেশের সমাজ ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শুনিতে পাই সে-সকল দেশের অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব যুবক যুবতীও এখন অপরাধ-ব্যবসায়ীদের দলবৃদ্ধি করিতেছে—অনেক বি-এ, এম-এও নাকি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা ভয় মনে করিতেছে না। এ দেশে জাতীয় প্রথায় জাতীয় ভাব রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার প্রচারের জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে প্রীতি ও বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিতে পারেন নাই। তাই মফঃস্বলের অধিকাংশ নেশনেল স্কুল অকালে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া গেল—কলিকাতাস্থ নেশনেল স্কুল ও তৎসংসৃষ্ট শিল্প-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের অবস্থাও উৎকৃষ্ট কিংবা আশাজনক নহে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়ও বহুদিন গবর্ণমেণ্টের নিকট সন্দেহের চক্ষে অবলোকিত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "মোসলমান বিশ্ববিদ্যালয়" গবর্ণমেণ্টের নিকট যথোপযুক্ত উৎসাহ ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেছে না ও পারিবে না বলিয়া, দেশের শিক্ষাসংস্কার-প্রয়াসী বহু হিন্দু ও মোসলমানের এখন ধারণা। এ দেশের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট তেমন কিছু করিতেছেন না বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, মহামতি তাতার প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ধীর-মন্থর-গতি দেখিয়াও তাঁহারা সামান্য দুঃখিত নহেন। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কত শত বি-এস্ সি, এম্-এস সি, কত শত এল্-সি-ই, বি-সি-ই উপাধি পাইল, কিন্তু শিল্প বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে তাঁহারা ঠিক্ যেন হস্তপদবিহীন অক্ষম পদার্থ - শ্রীক্ষেত্রের "নুলো জগন্নাথ"। অঙ্ক কসিয়া তাঁহারা দিনে শতবার এই পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র টাইমপিস ঘড়ীর স্ক্রু বদলাইয়া দিবারও তাঁহাদের কোন শক্তি নাই। দেশের শিল্প বাণিজ্যকে এ ভাবে পঙ্গু করিয়া রাখায় দেশ দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইতেছে, শিক্ষিত প্রজাসাধারণের মনে ততই নিরাশা বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমাদের দেশের সকল ছাত্রকেই এখন রাজপুরুষেরা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে স্কুলের ইন্সপেক্টর হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষকদিগকে পর্য্যন্ত গোয়েন্দার কার্য্য করিতে হইতেছে। ইহাতে ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিবার অবকাশ ঘটিতেছে না এবং শিক্ষা-কার্য্যেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই সেদিন ঢাকার

কমিশনর মাদারীপুর স্কুলের ছাত্রদের প্রদত্ত মালা গ্রহণ করিলেন না—ইহাতে কোমলমতি ছাত্রদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে যদি তাহাদের মনে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হয় তবে তাহার জন্য দায়ী তাহারা বা তাহাদের শিক্ষকেরা বা অভিভাবকেরা নহে, দোষী অপরিণামদর্শী সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি রাজপুরুষেরাই। ছাত্র নামাই যে দুর্বৃত্ত এ সংস্কার দেখিতেছি আজকালকার অনেক রাজপুরুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা যে কেবলমাত্র অপকর্ম্ম করিতেই পটু এ বিশ্বাস ছাত্র, ছাত্রদের অভিভাবক ও রাজশক্তি কাহারই পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও পুণ্যকর্ম্মের প্রেরণা কতখানি আছে তাহা বিগত বন্যাপীড়িতদের সেবার সময়ে দেখা গিয়াছে—এবং স্বয়ং বড়লাট হইতে সামান্য ইংরেজ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের সেবা-পটুতা ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক ইংরেজ আমাদের ছাত্রদের দেশসেবার ইচ্ছাকে রাজ-দ্রোহিতা মনে করিয়া ভুল করেন, এবং সেই ভুলের বশে সকলকেই এনার্কিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া অবিশ্বাস করেন। ইহাতে নির্দ্দোষী উৎপীড়িত হইয়া অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ভাগ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকাল কি সুখেই কাটিয়াছে! ইংরাজ জাতির প্রজাহিতৈষণা-বুদ্ধিতে তখন এ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। মহারাণীর "ভারতসম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ কালে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ-কালে, আমাদের মহীয়সী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, মাতৃজাতির স্বাভাবিক স্নেহদয়া-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া স্বহস্তে যে অভয়-ঘোষণা ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া এ দেশের সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশান্বিত আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় যে-সকল রাজপুরুষ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহনীয় বাণীর অর্থসংকোচ করিতে চেষ্টা করিয়া ভারতবাসীর ভ্রম অপনোদন করিতেছি বলিয়া মনে মনে বাহাদুরী করিতেছেন, এ দেশের অশান্তি, অবিশ্বাসের জন্য তাঁহারা সামান্য দোষী নহেন। ভারত-বাসী জানিত,—এবং এখনও অনেকে জানে যে, ইংরাজ "হাকিম নড়িলেও হুকুম নড়ে না।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয়, ইংরাজ রাজপুরুষ-প্রধানদের—এমন কি স্বয়ং সম্রাটের শ্রীমুখবিনিঃসৃত ঘোষণাবাক্যও যে সর্ব্বথা পালনীয় অলঙ্ঘনীয় সত্য নহে, তাহা কেহ কেহ সযত্নে সজোরে প্রচার করিতে ও তাহাতে ভারত-বাসীদিগকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন। সেদিন সহৃদয় প্রজারঞ্জক সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় এ দেশে আসিয়া যে-সকল সুধাসিক্ত শান্তিবাচন দ্বারা ভারত-বাসীদের হৃদয়ক্ষত সুশীতল করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবিভাগ রহিত-কালে সহৃদয় দূরদর্শী বড়লাট লর্ড হার্ডিং বাহাদুরের গবর্ণমেণ্ট, ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট ডেস্‌প্যাচে এ দেশের "অটোনমাস্" বা স্ব-তন্ত্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যেরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করিলেন, তাহার অন্যথাচরণ করিয়া—নানা সংকীর্ণ ব্যাখ্যা ও কদর্থ করিয়া এখনকার কোন কোন রাজপুরুষ ও রাজজাতীয় ব্যক্তি ভারতবাসীর ভয় ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিতেছেন। ইংরাজ জাতির উদার অন্তঃকরণ, ন্যায়বিচারবোধ প্রভৃতিতে বিশেষ আস্থা থাকাতেই ভারতের শিক্ষিত সমাজে "ইণ্ডিয়ান নেশনেল কংগ্রেসের" উৎপত্তি ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। সেই কংগ্রেসের জীবনী ও শক্তি যদি ক্রমশঃ সতেজ না হইয়া ম্রিয়মাণ হয়, তাহা কি এ দেশের শুভ লক্ষণ? না তাহা ইংরাজ ও ভারতবাসীর মঙ্গলের কারণ?

উপসংহারে আমরা আবার বলিতেছি, এ দেশের বহু লোক আজও ভারতে ইংরাজ রাজত্বকে বিধাতার মঙ্গলময়-বিধান-প্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারত-বাসী ইংরাজ-শাসনাধীনে থাকিয়া ক্রমে উন্নততর হইয়া প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতে পারিবে, এ কথা অনেক শিক্ষিত ভারতসন্তান বিশ্বাস করেন। যাহাতে সেই আশা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া রাজা রাজপুরুষ ও প্রজাসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশের সকল শ্রেণীর নরনারীর সুখ শান্তি ও সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে পারে, দেশের রাজপুরুষ ও প্রজা সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টাই

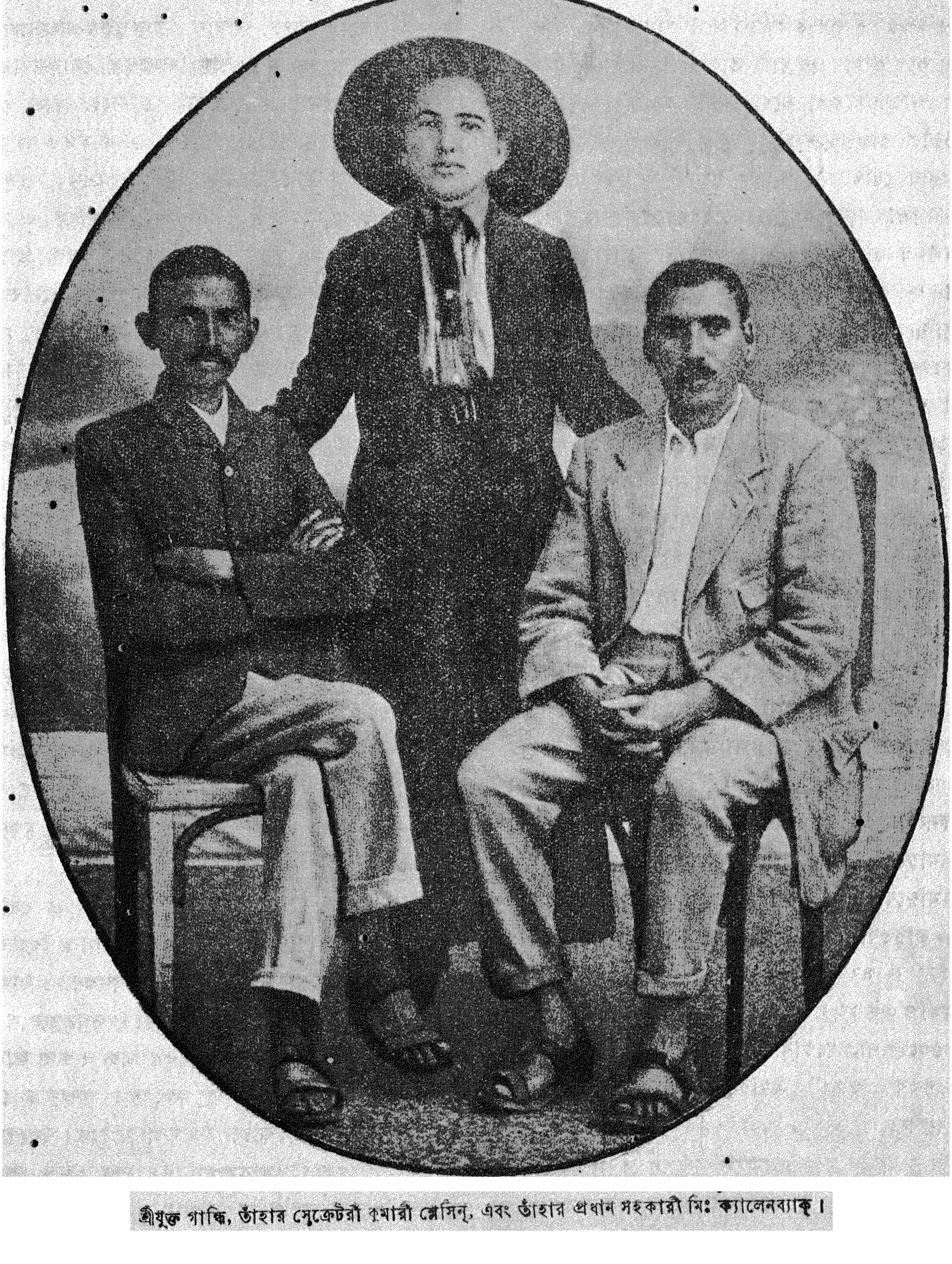

শ্রীযুক্ত গান্ধি, তাঁহার সেক্রেটরী কুমারী শ্লেসিন্, এবং তাঁহার প্রধান সহকারী মিঃ ক্যালেনব্যাক্।

করুন। ভগবান্ কৃপা করিয়া সকলকে সুমতি দিয়া দেশের সুখ শান্তি স্বস্তি ও শুদ্ধি অচিরে প্রবর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কোন দেশ বড় কি ছোট তাহা দেশের বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব দ্বারাই নিরূপিত হয় না। শক্তির দ্বারাই মহত্ত্বের বিচার। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়ারলণ্ড ও ওয়েলস্ লইয়া সম্মিলিত রাজ্য (United Kingdom)। ইহার আয়তন ১২১৩৯১ বর্গ মাইল। কিন্তু এই ক্ষুদ্রদেশগুলির দ্বারা শাসিত বা উপনিবিষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ১১৪৯৮৮২৫ বর্গ মাইল। বিলাতের লোকসংখ্যা ৪৫৬৫২৭৪১; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২১১৭৮৯৬৫। অর্থাৎ সাড়ে চারি কোটি লোকের দ্বারা স্থাপিত সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২ কোটির উপর। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের আয়তন ১৭৭৩০৮৮ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা সাড়ে একত্রিশ কোটির উপর। যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অপমান নির্য্যাতনের কথা কাগজে পড়িয়া আমাদের হৃদয় মুহ্যমান ও মাথা হেঁট হইতেছে, সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রের (South African Union) বিস্তৃতি ৪৭৩১৮৪ এবং লোকসংখ্যা ৫৯৭৩৩৯৪ মাত্র। তাহার মধ্যে আবার শ্বেত মানুষের সংখ্যা ১২৭৬২৪২ মাত্র। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ শ্বেত মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিকার সাড়ে একত্রিশ কোটি ভারতবাসীর দ্বারা হইতেছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪২ কোটির উপর। এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও এই ১৩ লক্ষ মানুষকে জোর করিয়া বলিতে পারিতেছে না, "তোমাদের বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আচরণ বন্ধ কর।" ইহার কারণ কি? উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক।

—

এ সব বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্রতর ঘরের কথাতেও দেখিতে পাই, লোকসংখ্যায় দেশকে বড় করে না,

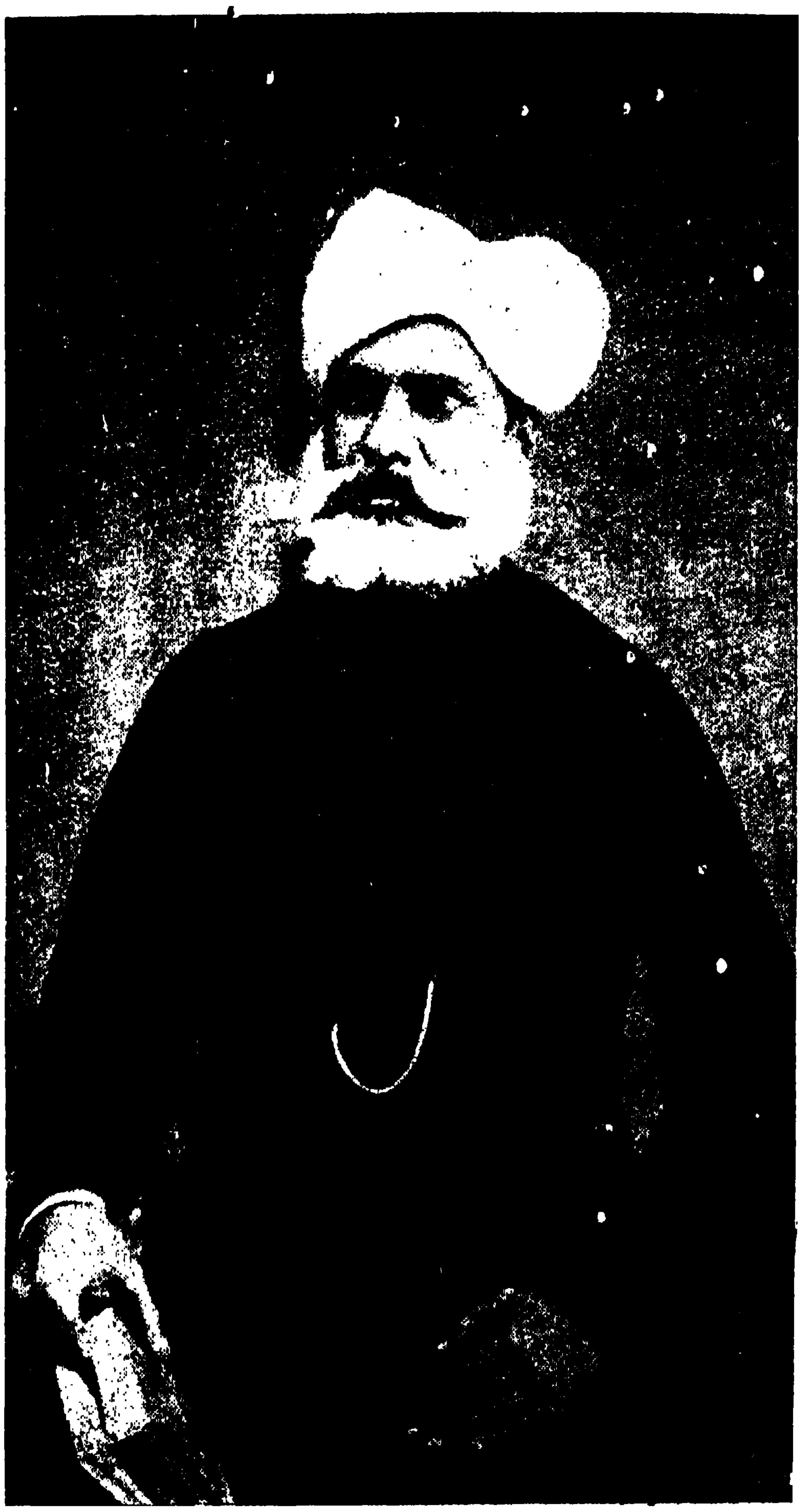

রাও বাহাদুর দেওয়ান কৌরামল চন্দনমল,
ভারতীয় সমাজসংস্কারসমিতির সভাপতি।

অনুরাগ, উৎসাহ ও শক্তিতে বড় করে। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত বড় প্রদেশগুলিতেই হইয়াছে। এবার হইয়া গেল সিন্ধুদেশে। এই দেশটির লোকসংখ্যা মোটে ৩৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৩৫। এই সংখ্যাটি যে কত কম, তাহা বঙ্গের একটি জেলার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। বঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৪২২। সিন্ধুদেশের প্রধান নগর করাচী। তাহাও যে খুব বড় তা নয়। তাহার লোকসংখ্যা ১৫১৯০৩।

গোলাম আলি চাগলা,
করাচী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।

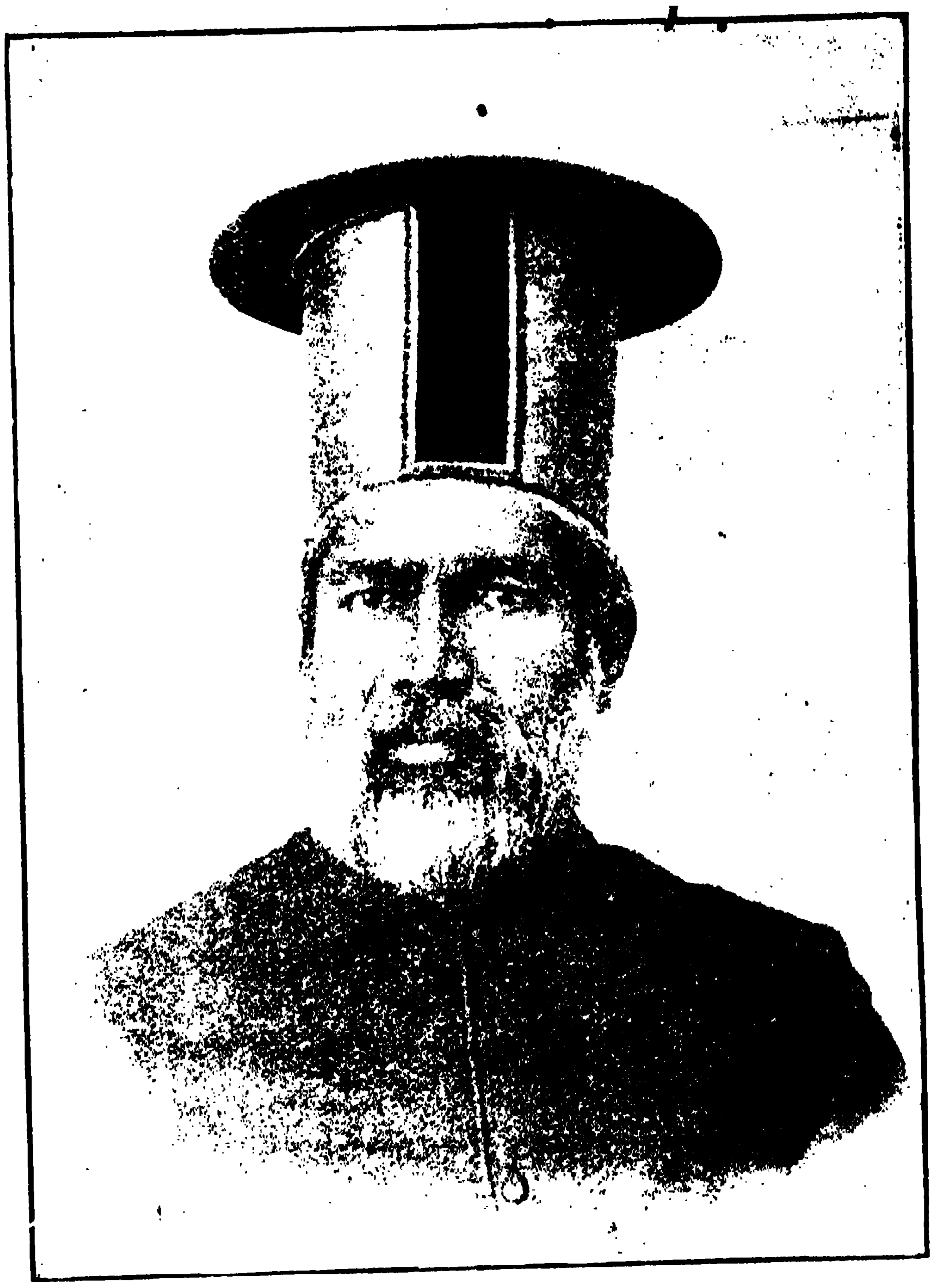

রাও বাহাদুর দেওয়ান তারাচাঁদ শৌকিরাম,
একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সাভপতি।

লোকসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষের সহরগুলির মধ্যে উহা সপ্তদশ স্থানীয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, আহমেদাবাদ, কাশী, বাঙ্গালোর, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, পুনা এবং অমৃতসর উহা অপেক্ষা বড়। সত্য, করাঁচীর বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কেবল কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের নীচে। তাহা হইলেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে এবার দেশী ব্যাঙ্ক অনেকগুলি ফেল্ হওয়ায় করাচী এবং সমগ্র সিন্ধুদেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু দেশ ক্ষুদ্র হইলে বা লোকসংখ্যা কম হইলে কি হয়? যদি মানুষের মত মানুষ থাকে, যদি দেশহিতকর কার্য্যে অনুরাগ ও উৎসাহ থাকে, ভিতরে শক্তি থাকে, তাহা হইলে অল্পসংখ্যক লোকেও দুঃসাধ্যকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। সিন্ধুদেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। কংগ্রেস, সমাজ-সংস্কার-সমিতি, শিল্পোন্নতি-সমিতি, মাদক-ব্যবহার-নিবারণ-সমিতি, একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন, শুদ্ধিসভা, অবনত জাতিদিগের উন্নতিবিধায়ক প্রচেষ্টা, ইত্যাদি নানাবিধ সভাসমিতির অধিবেশন গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে করাচীতে হইয়া গেল। মুষ্টিমেয় উৎসাহী এবং দলবন্ধন-ও-সুশৃঙ্খলকার্য্যনির্ব্বাহ-শক্তিসম্পন্ন নেতার অধীনে অল্পসংখ্যক লোকের চেষ্টায় সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

করাচী কংগ্রেসে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাঁকিপুর ও কলিকাতা কংগ্রেস অপেক্ষা প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। অথচ গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালবীয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতার মত বাগ্মীদের আকর্ষণে যে লোক গিয়াছিল, তাহা নয়; কারণ ইঁহার

মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর, করাচী কংগ্রেসের সভাপতি।

সকলেই অনুপস্থিত ছিলেন। আর একটি আশার কথা এই যে এবার মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা শতাধিক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতি ততদিন দুর্ঘট থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুমুসলমানের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ঐক্য না ঘটিবে, এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক ঝগড়া না মিটিবে। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের লোক যত প্রকারে একজোট হইয়া কাজ করেন, ততই মঙ্গল।

কংগ্রেসের বিরোধী দুদল লোক দেখা যায়; একদল ভারতপ্রবাসী শ্বেতকায়েরা, অন্যদল ভারতবাসী সমালোচকবর্গ। শ্বেত মনুষ্যেরা কখনও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উপহাস বিদ্রূপ করিয়া কংগ্রেসকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন; কখনও বা তাহা অসম্ভব দেখিয়া শত্রুতা করিয়াছেন ও উহার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছেন। এখন আর এক সুর ধরিয়াছেন যে ভারতসাম্রাজ্যের বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি বড় করা হইয়াছে; তাহাতে দেশের প্রতিনিধিরা দেশের কথা বলিতে পারে, অভাব অভিযোগ জানাইতে পারে; অতএব এখন আর কংগ্রেসের দরকার কি? এবং এই দরকার নাই বলিয়াই এবার বড় বড় নেতারা কংগ্রেসে যান নাই। বাস্তবিক কিন্তু গোখলে যান নাই কঠিন পীড়া বশতঃ। অন্যেরা কেন যান নাই জানি না। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদিই বা তাহা সত্য হইত, তাহাতেও বেশী আসিয়া যাইত না। কারণ দুচার জন নেতার মতামত সুবিধা অসুবিধার সহিত কংগ্রেসের

হাসারাম বিষিণদাস, করাচী কংগ্রেস কমিটির স্থায়ী সম্পাদক, ভারতীয়, সমাজ-সংস্কার-সমিতির এবং একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের সম্পাদক।

ভাগ্য জড়িত নহে। এখন, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বড় হওয়ায় কংগ্রেস অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে কি না দেখা যাক্। কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের; সুতরাং সমস্ত ভারতের জন্য যে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভা, তৎসম্পর্কেই বিষয়টির আলোচনা করা যাক।

রাও বাহাদুর দেওয়ান হীরানন্দ ক্ষেম সিং,
শিল্পোন্নতিবিষয়ক সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।

মাননীয় লালুভাই শামলদাস,
শিল্পোন্নতিবিষয়ক সমিতির সভাপতি।

গ্রেটব্রিটেন আয়ারলণ্ডের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চারি কোটি। এই সাড়ে চারি কোটি লোকের ব্যবস্থাপক সভার নাম পার্লেমেণ্ট। তাহার যে অংশ পৌর ও জানপদবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত, তাহার নাম হাউস্ অব্ কমন্স্। এই হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যসংখ্যা ৬৭০। ইঁহারা সকলেই নির্ব্বাচিত। ভারতের বড়লাটের সভার সভ্যসংখ্যা লাটসাহেবকে লইয়া ৬৮ জন। তন্মধ্যে ৩৬ জন সরকারী, ৩২ জন বেসরকারী লোক। এই ৩২ জনও আবার সকলে নির্ব্বাচিত নহে। যদি এই ৩২ জনের প্রত্যেককেই প্রজাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও তুলনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতী সাড়ে চারি কোটি লোকের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার চালাইবার জন্য ৬৭০ জন প্রতিনিধির দরকার, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইবার জন্য ৩২ জন প্রতিনিধির দরকার। সুতরাং কেহ যদি বলে যে বড়লাটের সভায় কতকটা পার্লেমেণ্টের কাজ চলিতেছে, আর কংগ্রেস আদি করিয়া আন্দোলনের প্রয়োজন কি, তবে তাহার কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়।* দ্বিতীয়তঃ, আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধিদের এবং বিলাতের লোকদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতার কথাটা ভাবুন। হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যদের আইন করিবার বা রদ্ করিবার, ট্যাক্স বসাইবার বাড়াইবার কমাইবার তুলিয়া দিবার, রাষ্ট্রীয় কার্য্যের জন্য টাকা মঞ্জুর নামঞ্জুর করিবার, এক-দলের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য দলের মন্ত্রি-সভাকে শাসনক্ষমতা দিবার, রাজমন্ত্রীদের সর্ব্ববিধ

* যদি একথা উঠে যে ৬৭০ জন হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্য ৪২ কোটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীর প্রতিনিধি তাহা হইলেও আমাদের ৩১ কোটির প্রতিনিধি ৩২ না হইয়া প্রায় ৫০০ হওয়া উচিত।

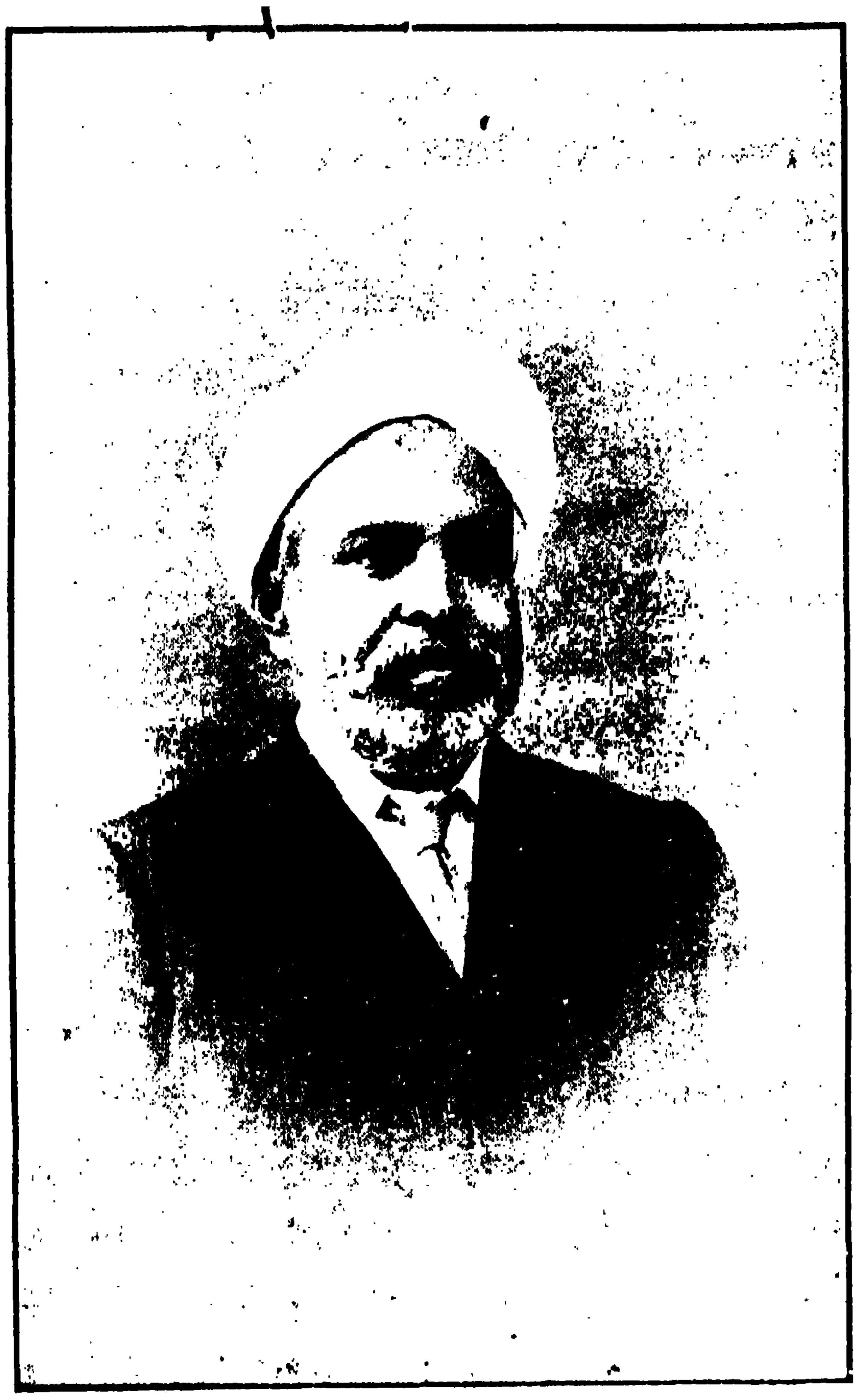

রাও বাহাদুর বলচাঁদ দয়ারাম,
সমাজ-সংস্কার-সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি।

কার্য্যের সমালোচনা করিবার, সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিবার, অধিকার আছে। আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধিদের প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই নাই। তাঁহারা যদি সকলে সম্পূর্ণ একমত হন, তাহা হইলেও কোন নূতন আইন করিতে পারেন না, কোন পুরাতন আইন রদ করা দূরে থাক, ঘুণাক্ষরেও তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, কোন ট্যাক্স কমাইতে পারেন না, আমরা যে ট্যাক্স দি তাহার একটি পয়সাও কেমন করিয়া খরচ হইবে বা না হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন করিতে পারেন না, অনুমতি অনুসারে যে প্রশ্ন করেন তাহারও উত্তর দেওয়া না-দেওয়া গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন বটে; কিন্তু ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। কারণ সরকারী সভ্যসংখ্যা ৩৬, বেসরকারী ৩২। যদিই বা ঘটনাক্রমে সরকারী সভ্য অনেকে অনুপস্থিত থাকায় বেসরকারীদের জিত হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রস্তাব অনু-

মাননীয় হরচন্দ্ রায় বিষিণ দাস,
কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

সারে কাজ করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য নহেন। এহেন দিল্লী-কা-লাড্ডু আমাদিগকে দিয়া শ্বেতকায়েরা বলিতে চান যে "আর কংগ্রেসে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে? তোমাদের সব কথাই ত এখন বড় লাটের সভায় হইতে পারে।" * এই লোকগুলির বোকা বুঝাইবার প্রয়াসের তারিফ্ বেশী করিব, না

* বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা যে দেশের লোকের কিরূপ প্রতিনিধির কাজ করে, তাহার একটি খুব আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনে সামান্য কিছু

যে-সব হিন্দু মুসলমান এহেন ব্যবস্থাপক* সভার সভ্যত্ব লইয়া প্রতিবেশিজনোচিত সদ্ভাব ভুলিয়া যান, তাঁহাদের কাহার বোকামির প্রশংসা অধিক করিব, বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশের লোকের মত কথায় ভুলিতে এমন জাতি আর দুনিয়ায় আছে কি? জিনিষটা আসলে কি তাহা তলাইয়া বুঝিলাম না, কিন্তু ভারতময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক-জন "অনারেব্‌ল্‌" হইবেন, তাহা লইয়া বিদ্বেষের ঈর্ষ্যার গরল ছড়াইয়া পড়িল।

বিলাতের অধিবাসিবর্গের ষষ্ঠাংশ নির্ব্বাচক। তথায় কি পরিমাণ ট্যাক্স দিলে, কত সম্পত্তির অধিকারী হইলে ও কতদিনের বাসিন্দা হইলে, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়া যায়, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। এ দেশে কেহ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বা ধনিশ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার নির্ব্বাচনাধিকার না থাকিতে পারে। মুসলমানদের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে;—কেন, তাহার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কংগ্রেসকে যে নিষ্প্রয়োজন বলা হইতেছে, কংগ্রেস যে-সকল দাবী করিয়া আসিতেছেন, তাহার সমস্তই বা অধিকাংশই কি পাওয়া গিয়াছে? জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বা বহুবৎসরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে? রাজকার্য্যে জাতি ও রঙের ভেদ উঠিয়া গিয়া কেবল কার্য্যক্ষমতার আদর কি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? সৈনিকবিভাগে দেশীয় লোক কি উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছে? সিবিল সার্ব্বিস্ আদি পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ গৃহীত হইতেছে কি? দেশমধ্যে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইয়াছে কি? বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করা হইয়াছে কি? সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে কি? দেশে প্লেগ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে কি? দেশীয় শিল্পসকলের বিনাশে দেশের দারিদ্র্য বাড়িতেছে। সর্ব্বত্র শিল্পশিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে কি? দেশজাত কার্পাসবস্ত্রের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি? এইরূপ আরও কত প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

দেশীয় সমালোচকেরা বলেন যে একটি বার্ষিক তিন দিনের তামাসা করিয়া কি লাভ? প্রথম উত্তর এই, যে, কংগ্রেস ত বলে না যে তোমরা কেবল তিন দিনই রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিবে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করিতে কংগ্রেস নিষেধ করে না, বরং করিতেই বলে। সম্বৎসর যে, কাজ হয় না, সে দোষ দেশের লোকের; কংগ্রেসের নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে বর্ষান্তে কেবলমাত্র একবারও সমস্ত দেশের লোকদের কি অভাব ও দাবী তাহা একপ্রাণে অনুভব করা এবং বলার মূল্য আছে ও আবশ্যক আছে। তদ্ভিন্ন, এই যে সমগ্র ভারতের নানা ভাষাভাষী বিচিত্রপরিচ্ছদধারী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বহুজাতীয় মনুষ্যের তিন দিনের জন্যও একত্র সমাবেশ, একত্র বাস, একত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, পরস্পর কথোপকথন ও বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হওয়া, ইহা কি একজাতিত্ব-বোধ বৃদ্ধি করে না? নিশ্চয়ই করে। কংগ্রেস আর কিছু না করিয়া থাকিলেও যে দূরের মানুষকে নিকট এবং পরকে আপন করিবার সাহায্য করিয়াছে, ইহাতেই তাহার জন্ম ও অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

দেশীয় সমালোচকদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে কংগ্রেস কেবল আবেদন প্রার্থনাই করেন, স্বাবলম্বন করেন না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে কংগ্রেস এমন অনেক বিষয়ে আবেদন করেন, যাহাতে আবেদন ভিন্ন আর কিছু করা যাইতে পারে না। আমরা খুব স্বাবলম্বী হইলেও নিজেই জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারি না, সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ চালাইতে পারি না, কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে পারি না, বিচার ও শাসনবিভাগ স্বতন্ত্র করিতে পারি না। সত্য বটে, দেশমধ্যে শিক্ষাবিস্তার আমরা নিজেই অনেকদূর করিতে পারি, নানা শিল্পেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারি,

---

পরিবর্ত্তন করা হউক। কিন্তু তাহার প্রস্তাবের বিপক্ষে হইল ৪০ জন, সপক্ষে কেবল ১১ জন। অথচ কংগ্রেস এবং মোস্‌লেম লীগ উভয়েরই গত অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ঐ আইন একেবারে উঠিয়া যাক। দেশের লোক চায় যে আইনটা উঠিয়া যাক, ব্যবস্থাপক সভায় কিন্তু সামান্য একটু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবও গ্রাহ্য হইল না। আমাদের তথাকথিত প্রতিনিধি বেসরকারী সভ্যেরাও সকলে সুরেন্দ্র বাবুর সপক্ষে ভোট দেন নাই।

দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাও অল্পস্বল্প করিতে পারি। এরূপ চেষ্টা দেশে যে একেবারে হইতেছে না, তাহা নয়; কংগ্রেস যে এরূপ চেষ্টার বিরোধী, তাহাও নয়। স্বাবলম্বন-সমর্থক প্রস্তাব কংগ্রেসে ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে এই-সকল বিষয়েও সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা প্রায় নাই বলিলেও হয়। যতদূর দেশভক্তি, উৎসাহ, ঐক্য, একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং কার্য্যশক্তি থাকিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও এই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, সে পরিমাণে ঐ-সকল গুণ আমাদের থাকিলে দেশ পরাধীন হইত না; যখন ঐ-সকল গুণ আমরা সাধনা দ্বারা লাভ করিব, তখন আর অধীনতাও থাকিবে না।

আর এক কথা এই যে স্বাধীন দেশের লোকেরাও তাহাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত আবেদন করে; প্রভেদ এই যে তাহাদের ভাষাটা আমাদের চেয়ে পুরুষোচিত। ইহার উত্তরে দেশীয় সমালোচকেরা বলিবেন, স্বজাতীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করায় হীনতা নাই, এবং এরূপ আবেদন বাস্তবিকই দাবী। ইহা সত্য কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পরাধীন হইলেই মানুষকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হইবে, বা মানুষের জন্মগত অধিকারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এমন কোন স্বাভাবিক নিয়ম নাই। আমাদের আবেদনসমূহকে ভিক্ষা বলিয়া মনে করি কেন? তাহাও বাস্তবিক দাবী। সত্য বটে, প্রার্থনাই বলুন আর দাবীই বলুন, সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিলে আমরা জোর করিয়া সরকারের নিকট হইতে আমাদের অভীষ্ট আদায় করিতে পারি না। কিন্তু স্বাধীন দেশের লোকদের দাবীও অগ্রাহ্য হইলেই কি তাহারা কথায় কথায় বিদ্রোহ করে? তাহারাও ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকে। তাহারা ধর্ম্মঘট আদি নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ (passive resistance) দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করে বটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের কথা বলিতে গিয়া বর্ত্তমান বড়লাট তদ্রূপ উপায়কে প্রকারান্তরে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং প্রয়োজন হইলে ইহাও ভারতবাসীর পক্ষেও অবৈধ বিবেচিত না হইতে পারে।

তাহার পর যাঁহারা আপনাদিগকে ন্যাশন্যালিষ্ট বলেন, তাঁহাদের এই এক আপত্তি আছে যে সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আর প্রকৃত "জাতীয়" কংগ্রেস্ নাই, উহা একটা দলের জিনিষ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে। ন্যাশন্যালিষ্ট্‌গণ যাঁহাদিগকে নিজ দলের নেতা মনে করিতেন, তন্মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত লাজপৎ রায় এবার কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং, শুনা যায়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা তাঁহারই হইয়াছিল। আর যদি আজকাল কংগ্রেস একটা দলেরই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা একটা অবান্তর আপত্তি মাত্র। সকলে পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী বদলাইয়া লওয়া অসম্ভব নহে।

কোন চিন্তাশীল লোকেই এরূপ মনে করিতে পারেন না যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারাই দেশের উন্নতি হইতে পারে। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাদের মন দেওয়া দরকার। আমরা যেমন বায়ুসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছি, বায়ু ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারি না, অথচ সকল সময়ে একথা মনে থাকে না; তেমনি আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিচেষ্টার মূলে একটি বিশ্বাস আছে যাহা আমরা চিন্তা করিলে ধরিতে পারি, কিন্তু অন্য সময়ে তাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া থাকি। চেষ্টা করিলে উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়; সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, বারম্বার অকৃতকার্য্য হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই,—মানুষের যে এবম্বিধ নানা ধারণা আছে, তাহার ভিত্তি কি? ভাবিলেই বুঝা যাইবে যে ইহার ভিত্তি এই যে বিশ্ববিধাতা মঙ্গলবিধাতা, মঙ্গল প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং মঙ্গলই জয়যুক্ত হইবে। বিশ্বব্যাপারের গতি পূর্ণ মঙ্গলের দিকে। এইজন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সংস্কারকার্য্যে মানুষ যখন প্রাণ দিয়া লাগে, তখন কোন বাধা, উৎপীড়ন, অকৃতকার্য্যতাই গ্রাহ্য করে না। তখন মানুষ জানে যে বিফল প্রয়াসই সাফল্যের সোপান, আপাতপরাজয় শেষ জয়ের পথপ্রদর্শক। যাহা হইতে মানুষের চেষ্টার ফল আসে, তাহার নাম মানুষের দর্শনশাস্ত্রে নানা রকম রাখা

হইয়াছে; কিন্তু ফলদাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই;—তাহাকে পুরুষই বলুন বা শক্তিই বলুন। ফল কখন কি আকারে পাইব, জানি না, কিন্তু ফল পাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে কেহই কোন চেষ্টা করিত না।

এইহেতু যাঁহারা মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ় ও উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বাস্তবিক সর্ব্ববিধ সংস্কার-প্রয়াসের মূলে জল সেচন করেন। ইহা হইতে অন্যান্য বার্ষিক সভার সঙ্গে সঙ্গে একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

———

করাচীতে যেমন কংগ্রেস্ আদির অধিবেশন হইয়াছিল, তেমনই আগ্রাতে মুসলমান-শিক্ষা-সভা এবং মোস্‌লেম লীগের অধিবেশন হইয়াছিল। এবার মোস্‌লেম লীগ্ এবং কংগ্রেস উভয়েরই সভাপতি মুসলমান। মোস্‌লেম লীগের সভাপতির বক্তৃতা অধিকতর তেজোগর্ভ স্পষ্ট কথায় পূর্ণ ছিল। কেবল একটি ছাড়া আর সব বিষয়ে উহা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের মতানুযায়ী হইয়াছিল। সে বিষয়টি এই যে ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিরা কেবলমাত্র মুসলমানদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচিত হইবে। এ বিষয়ে ঝগড়া বা তর্কের ভাব হইতে কিছু বলা মোটেই আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিছুদিন হইতে মুসলমানদের নেতারা "একীভূত ভারতবর্ষের" (United India) আবশ্যকতা প্রচার করিতেছেন। আমাদের ধারণা এই যে এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উহারই দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে নির্ব্বাচনের প্রথা, এবং "একীভূত ভারতবর্ষ," এ দুটা জিনিস পরস্পরবিরোধী। এক মানে এক, দুই নহে। দেশের সেবা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। মুসলমানেরাও যে স্বদেশের সেবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু হিন্দু প্রতিনিধি যেমন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান আদি সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন হইয়া নির্ব্বাচিত হন, ইহাই বাঞ্ছনীয়, মুসলমান প্রতিনিধিরও তেমনিভাবে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব ও পক্ষপাতিত্ববশতঃ হিন্দুরা অধিকাংশ স্থলে প্রতিনিধিত্বপ্রার্থী মুসলমানকে ভোট দিবেন না। কিন্তু মুসলমান যোগ্যতা ও দেশহিতৈষণার পরিচয় দিলেও হিন্দু তাঁহাকে কখনও ভোট দিবেন না, বিরুদ্ধভাব চিরস্থায়ীই হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতেও যে আমরা একজাতি হইব, এ আশা ত্যাগ করিতে হয়। হিন্দু যোগ্য পারসীকে ভোট দেয়, যোগ্য খৃষ্টিয়ানকে ভোট দেয়, আর যোগ্য মুসলমানকে ভোট কখনই দিবে না, ইহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। তজ্জন্য আমাদের ধারণা এই যে কিছুকাল যদি যোগ্য মুসলমানও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, এবং তজ্জন্য মুসলমানেরা অসুবিধা ভোগ করেন, বরং তাহা ভাল, কিন্তু, মুসলমানদের পক্ষে অধিকতর রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বা অন্য কোন ওজুহাতে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট চাওয়া উচিত নহে। লর্ড মিণ্টো হিন্দুমুসলমানে ভেদ জন্মাইবার জন্য এই ব্যাপারের সূত্রপাত করেন, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই জানে ও বুঝে।

আমি যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের লোক হই যাহাকে লোকে অন্যায়রূপেও অবিশ্বাস করে, তাহা হইলেও আমি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার চাহিব না, আমার ব্যবহার দ্বারা জীবন দ্বারা এই অবিশ্বাসকে বিনষ্ট করিব, দূর করিব, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইবে।

সুখের বিষয় আগা খাঁ, মোহামেদ আলি, প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ এবার মোস্‌লেম লীগের অধিবেশনে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার বিষয়ক প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে বলেন। তাঁহাদের মত অধিকাংশের মতে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু আশা আছে যে উহাই কালে অধিকাংশের মত হইবে।

মুসলমানগণ এইরূপ একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন, যে, "গোবলিদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যেন হস্তক্ষেপ না করেন; হিন্দু মুসলমান আপোষে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বিবাদ নিবারণের ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কি হইতে পারে? কারণ, মানুষকে আইনের জোরে যাহা করান যায়, বা যাহা

হইতে নিবৃত্ত রাখা হয়, তাহা মনের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ রাখিয়া দেয়। সুযোগ পাইলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যাহা হয়, তাহাতে এ প্রকারের কুফল জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। মুসলমানেরা এই বিষয়টিতে যেমন পরস্পরসম্মতিসাপেক্ষ বন্দোবস্তের মূল্য বুঝিয়াছেন, নির্ব্বাচন বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিলে সকলের বাঞ্ছিত সুফল ফলিবে। আপোষে গো-বলিদানের মত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা যদি হইতে পারে, তাহা হইলে নির্ব্বাচনাধিকারের মত সামান্য ব্যাপারের মীমাংসাও হইতে পারে।

যদি ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সভ্যই মুসলমান হন, তাহাতেও আমরা তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিব না; আমাদের ঈর্ষ্যাও হইবে না। কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের বা সমস্ত জাতির মঙ্গল হইবে, বা তদ্দারা ভারতবর্ষের একীভবন নিকটতর হইবে। আমরা ব্যবস্থাপক সভাগুলির মূল্য জানি। ইহা বুঝি যে ইংরাজ কোন শক্তি আমাদিগকে হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। দেশের সেবা করিবার অধিকার ও ক্ষমতা মানুষে দিতে পারে কি? উহা অনেক তপস্যা করিলে সাধনা করিলে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিলে ভগবানের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত পোলাকের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাইয়াছেন :—

"Mrs. Gandhi has come from the prison almost irrecognisably altered owing to the refusal of special diet. In the early stages, imprisonment reduced her to a skeleton, in appearance a tottering old woman : heart-breaking sight."

"জেলের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ খাদ্য দিতে অস্বীকার করায় শ্রীমতী গান্ধিজায়া জেল হইতে এরূপ চেহারা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, যে, তাঁহাকে প্রায় চেনা যায় না। কারাদণ্ডভোগের প্রথম অবস্থাতেই তিনি শীর্ণ হইয়া কঙ্কালসার হইয়াছিলেন। তাঁহাকে চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধার মত দেখাইতেছে;—হৃদয়বিদারক দৃশ্য।"

শ্রীযুক্ত গান্ধি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র; ব্যারিষ্টারী করিয়া বৎসরে প্রায় একলক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আর এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীর কন্যা। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে লালিতপালিতা এই মন্ত্রিকন্যা মন্ত্রিস্নুষা ভারতীয় জাতির ও ভারতনারীর অধিকার ও সম্মান রক্ষার্থ স্বেচ্ছায় জেলে গিয়াছিলেন। তথায় কাফ্রির পাক-করা অনভ্যস্ত কদর্য্য খাদ্য খাইতে না পারিয়া, জেলের কাফ্রি রক্ষীদের অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়া, অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া, তিনি কঙ্কালসার হইয়া কারাগার হইতে বাহির হইয়াছেন।

ভবিষ্যৎ-ভারতীয়-জাতির জননি, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার শীর্ণ দেহ হইতে যে রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে আমাদের মোহকুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাক, আমাদের জড়তা দূর হউক। তোমার দিব্য তেজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক; তদ্দারা আমাদের ভীরুতা ও স্বার্থের বন্ধনরজ্জু ভস্মীভূত হউক।

বঙ্গের জননী ও কন্যাগণ, যাঁহাদের অশন বসনের কোন ক্লেশ নাই, যাঁহারা সৌভাগ্যবতী, তাঁহারা তাঁহাদের এই পূজনীয়া ভগিনীর কথা, নিত্য, আহার আমোদ-প্রমোদের সময়, স্মরণ করুন। যাঁহারা দরিদ্র, যাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে নির্ব্বাহিত হয় না, তাঁহারাও তাঁহাদের এই আরাধ্যা ভগিনীকে ভুলিবেন না। তাঁহাদের ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু স্বদেশের জন্য তপস্যার কৃচ্ছ্র সাধন তাঁহারাও ত এমন করিয়া করিতেছেন না।

বঙ্গের পিতা ও পুত্রগণ, আপনারাও স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবার সময় ব্রতধারিণী তপঃক্লিষ্টা গান্ধিজায়ার শীর্ণমূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন না।

পুরুষদের ভোগবিলাসের আয়োজন, নারীর বসন-ভূষণের আড়ম্বর, গান্ধি-জায়ার শীর্ণমূর্ত্তির সম্মুখে কি অকিঞ্চিৎকর, কি শ্রীহীন, কিরূপ তুচ্ছ।

বঙ্গদেশ হইতে এখনও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার উৎপীড়িত ভারতবাসীদিগের সাহায্যার্থ অল্প টাকাই গিয়াছে। বাঙ্গালী যে দাতা নহেন, তাহা ত নয়। তবে এমন কেন হইতেছে? অনেকে মনে করেন, কেবল ধনীদেরই দান করা উচিত। ইহা বড়

ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ ধারণা অনেক সময় স্বার্থপরতা-প্রসূত। এক আধ পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি যত পারেন, এবং যতবার পারেন, দান করুন। অর্থের পরিমাণে কিছু আসিয়া যায় না; প্রাণের টানই আসল জিনিষ। প্রাণ কাঁদে বলিয়া যিনি যাহা দেন, তাহাই অমূল্য।

কেবল যে রাজধানীর বা প্রধান প্রধান সহরের লোকদেরই দান করা কর্ত্তব্য তাহা নয়; ক্ষুদ্রতম গ্রামের ক্ষুদ্রতম কুটীরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের কাহিনী পৌঁছুক। তথা হইতেও সাহায্য আসুক। সর্ব্বত্র দান সংগৃহীত হউক।

যাঁহাদের অন্য কোথাও সাহায্য পাঠাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা আমাদের কার্য্যালয়ে টাকাকড়ি পাঠাইলে আমরা তাহা প্রবাসীতে স্বীকার করিব, এবং নিজব্যয়ে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিব।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি কিরূপ অত্যাচার হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তথাকার গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশনের তিনজন সভ্যের মধ্যে দুজন পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে ভারতবাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় শ্রীযুক্ত গান্ধি প্রভৃতি তত্রত্য গবর্ণমেণ্টকে জানান কমিশনে নিরপেক্ষ আরও দুজন সভ্য নিযুক্ত না হইলে তাঁহারা উহার নিকট সাক্ষ্য দিবেন না। গবর্ণমেণ্ট এই দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাদেরও মত এই যে এরূপ কমিশনের নিকট সাক্ষ্য না দেওয়াই উচিত। কমিশনের ভারতবাসীর শত্রু সভ্য দুজন কিরূপ লোক, তৎসম্বন্ধে গান্ধি মহাশয় শ্রীযুক্ত গোখলেকে টেলিগ্রাফ দ্বারা জানাইয়াছেন :—

"মিঃ এসেলেন ও কর্ণেল ওয়াইলি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর ঘোরতর বিরোধী বলিয়া সুপরিচিত। মিঃ এসেলেন প্রকাশ্য সভায় অনেকবার এসিয়াবাসীদের যতদূর সম্ভব বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে তাঁহাকে সকলে মন্ত্রিদলের একজন বেসরকারী সভ্য বলিয়া গণনা করে। এই সেদিন তিনি পার্লেমেণ্টের মেয়ার নামক একজন সভ্যের সহিত কথাবার্ত্তায় ভারতবাসীদের খুব বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তজ্জন্য মিঃ মেয়ার কমিশনে এসেলেনের নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া কর্ণেল ওয়াইলি নেটালে আমাদের দারুণতম শত্রু। ১৮৯৬ সালেও, এত দিন পূর্ব্বেও, দুটা জাহাজে করিয়া ভারতবাসীরা ডার্বান বন্দরে আসিয়া পৌঁছায়, তাহারা যাহাতে জাহাজ হইতে নামিতে না পারে তজ্জন্য তিনি অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া বন্দরে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য সভায়, ভারতবাসী যাত্রী সহ ঐ দুটা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়ার সমর্থন করেন। আর একজন বক্তা বলে যে কেহ যদি একবারও ভারতবাসীদের উপর গুলি চালায়, তাহা হইলে সে নিজের একমাসের মাহিনা দিবে। কর্ণেল ওয়াইলি এই বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে "আর কে কে, ভারতবাসীর উপর এক এক গুলি ছোড়ার জন্য, এক এক মাসের বেতন দিতে রাজি আছ।" তিনি বরাবর আমাদের শত্রুতা করিয়া আসিতেছেন। যে 'দেশরক্ষী ফৌজে'র (Defence Force) অত্যাচারের অনুসন্ধান কমিশনের অন্যতম কার্য্য, ওয়াইলি তাহারই কর্ণেল পদবীধারী নায়ক, যে-সকল চা বা ইক্ষুক্ষেত্রে অত্যাচরিত ভারতীয় কুলিরা খাটে, তাহাদের মালিকদের অনেকের আইনবিষয়ে পরামর্শদাতাও এই কর্ণেল, এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের সময় তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে নেটালের চুক্তিতে অনাবদ্ধ প্রত্যেক ভারতবাসীর উপর যে বার্ষিক ৪৫৲ টাকা ট্যাক্স আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়।"

অতএব গান্ধি মহাশয় যে বলিয়াছেন যে "কমিশন ন্যায় বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত হয় নাই, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে," ইহা অতি সত্য কথা।

আলোচনা

বাঙ্গালা শব্দ-কোষ।

পৌষের প্রবাসীতে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রণীত বাঙ্গালা শব্দ-কোষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্তি করেন নাই। সে তিন বিষয় এই,—১) "অধিকাংশ দেশজ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হয় নাই।" (২) "আরবী বা ফারসী শব্দের আদিম রূপ অধিকাংশ স্থলেই নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল মূল ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আদিম রূপ দেওয়া থাকিলে বুঝা যাইত বাংলায় শব্দবিকার কিরূপে এবং কতখানি পরিমাণে ঘটিয়াছে।" (৩) শেষে চারুবাবু কতকগুলি "নূতন শব্দ" দিয়াছেন, যেগুলি তিনি কোষে পান নাই।

বহুদিন হইতে বহু লোকের মুখে ও লেখায় এবং যাবতীয় বাঙ্গালা অভিধানে 'দেশজ' শব্দ শুনিয়া পড়িয়া আসিতেছি। আমার কোষের যদি কিছু বিশেষ থাকে, তাহা এই 'দেশজ' ব্যুৎপত্তির উচ্ছেদ। এবিষয় আমি গত বৎসরের প্রবাসীতে সবিস্তরে লিখিয়াছিলাম। একটু চিন্তা করিলে যে-সকল বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সে-সকল শব্দ, 'দেশজ' নামে নির্দ্দেশ করিয়া আভিধানিকগণ পাঠককে বৃথা সন্দেহে ফেলিয়াছেন। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকার সে ভাষার শব্দের ত্রিবিধ মূল পাইয়াছিলেন। স্পষ্ট সংস্কৃত ও অপভ্রষ্ট সংস্কৃত ব্যতিরিক্ত যে-সকল শব্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষায় ছিল, সে সকলের নাম দেশজ। অর্থাৎ সে-সকল শব্দ

সংস্কৃত ভাষা হইতে আসে নাই, এই দেশে উৎপন্ন। হয় ত প্রাচীন অধিবাসীর রচিত, হয় ত প্রতিবাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

ইহার পর মুসলমান রাজত্বের সময়ে বহু যাবনিক শব্দ ভারতের সকল ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে ইংরেজ রাজত্বে বহু ম্লেচ্ছ শব্দ প্রবেশ করিতেছে। যাহার মূল সংস্কৃত নহে, যাবনিক নহে, ম্লেচ্ছ নহে, এক্ষণে তাহার নাম দেশজ বলা যাইতে পারে। আমার কোষে একটা শব্দেরও মূল 'দেশজ' লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই বলিয়া কি বাঙ্গালা ভাষায় দেশজ শব্দ নাই? কে জানে। কিংবা নিশ্চয় আছে; কিন্তু কে চেনাইয়া দিবে? প্রাচীন বঙ্গীয়েরা, আর্য্যেতর বঙ্গীয়েরা, কি ভাষা কি শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা কে জানে? কে জানে প্রাচীন বঙ্গীয় জন কোন্ ভাষা হইতে কোন্ শব্দ লইয়াছিল, কোন্ শব্দ নিজেরা রচনা করিয়াছিল, কোন্ শব্দ সংস্কৃতভাষী আর্য্যের নিকট শিখিয়াছিল? ইতিহাসের কথা নয়, যে ইতিহাসে বলে আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া বাঙ্গালী, যে বলে আর্য্য ও দ্রবিড় জাতি কিংবা আর্য্য ও মঙ্গোলীয় জাতি মিশিয়া বাঙ্গালী। সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও নয় যে বলে আদিম কোন জাতির পরিণামে বাঙ্গালী জাতির, আদিম কোন ভাষার পরিণামে ও অন্য আগন্তুক জাতির ভাষার মিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের অনুমান, সৃষ্টির পরম্পরা স্বীকার এক, আর এই শব্দ অনার্য্য প্রাচীন বঙ্গীয়ের শব্দ, এই শব্দ দ্রবিড় জাতির শব্দ, এই শব্দ কোল জাতির শব্দ, ইত্যাদি নির্দ্ধারণ অপর। যাহা আছে তাহা ধরিয়া অনুমান চলে; যাহা নাই তাহা ধরা চলে না। যেহেতু তিনি, যিনি এতগুলা সংস্কৃত পুথী পাঠ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি এই শব্দ তাঁহার অধীত পুথীতে পান নাই, অতএব শব্দটা দেশজ অর্থাৎ আর্য্যেতর জাতির সৃষ্ট, এ তর্ক শুনিয়া আসিতেছি। এই তর্ক বরং বুঝিতে পারি; অন্য তর্ক যাহাতে অধিকাংশ বাঙ্গালা অভিধানে অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দেশজ লেখা হইয়াছে, সে তর্ক উচ্ছেদে অশক্ত। আমার কোষে এই-সকল তর্কের স্থান নাই।

আবার বলি, বাঙ্গালা ভাষায় 'দেশজ' অর্থাৎ ভারতবাসী আর্য্যেতর জাতির রচিত শব্দ আছে। বঙ্গদেশজ, প্রতিবেশী প্রদেশজ, ভারতপ্রান্তজ শব্দ নিশ্চয় আছে; কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না। এক জাতি স্বতন্ত্র হইয়া অন্য জাতির সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তিতে পারে না। এইরূপ থাকিতে ইচ্ছা করিলেও অন্য জাতি থাকিতে দেয় না। বাণিজ্যে হউক, রাজত্বে হউক, সামাজিকতায় হউক, এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্ক ঘটে; সম্পর্ক ঘটিলেই শব্দের আদান-প্রদানও ঘটে।

কিন্তু কোষকার সর্ব্বজ্ঞ নহেন। ব্যুৎপত্তিনিরূপণে ভুল হইতেই পারে। কারণ অতীতের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে গেলে দিশা-হারা হইতে হয়। অর্থের ব্যাখ্যানে ভুল হয়, প্রয়োগ প্রদর্শনে ভুল হয়। এমন কি, একটা দেখিয়া আরটা লিখিতে লিখিতে ভুল হয়। ইহাদের উপর ছাপাখানার ভুল অনিবার্য্য হইয়া আছে।

এ সব সত্ত্বেও কোষ রচনায় সবজান্তা হইতে হইবে। নচেৎ কোষ রচনা অসম্ভব। সংসারের দশ কাজে আমরা যেমন অনুমানে ভর করি, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশেও অনুমানই এক প্রমাণ। সং ধামন্ শব্দ হইতে বাং ঠাম আসিয়াছে, কারণ বহু শব্দে ধ স্থানে ঠ হইয়াছে, কারণ ধাম শব্দের অর্থ ঠাম শব্দে আছে, কারণ যাঁহারা ধাম বলিতেন তাঁহাদের অশিক্ষিত প্রতিবেশীরও সেই শব্দ প্রয়োগ অভ্যাস হইবার কথা। কেবল শ্রবণ ও বাগ্‌যন্ত্রের গুণে বা দোষে ধাম স্থানে ঠাম হইয়া পড়িত। বাং ঠাওর শব্দ সং দৃষ্টিগোচর শব্দ হইতে আসিয়াছে, কারণ শব্দবিকারের সূত্রে এই পরিবর্ত্তন বাধিত হইতেছে না। সং নখরঞ্জনী হইতে বাং নরুন শব্দ আসিয়াছে, কারণ শব্দবিকারের সূত্রে পরিবর্ত্তনটা স্বাভাবিক, কারণ পড়শের ভাষায় এমন রূপ পাইতেছি যাহাতে নখরঞ্জনী শব্দের অধিক চিহ্ন আছে। এইরূপ নানা উপায় প্রয়োগ সত্ত্বেও কতক শব্দের মূল-নির্ণয় হইতে পারে নাই। হয়ত কালে অন্য সূত্র আবিষ্কৃত হইবে, একের কল্পনায় যাহা আসিতেছে না, অন্যের কল্পনায় তাহা আসিতে পারিবে। তথাপি কতক শব্দের মূল চিরদিন অজ্ঞাত থাকিবে।

বাঙ্গালা ভাষায় ভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দের দুই রূপ আছে। (১) সংস্কৃত শব্দ অপভ্রষ্ট বিকৃত সংক্ষিপ্ত হইয়া কতক শব্দ হইয়াছে। (২) সংস্কৃত ধাতু ধরিয়া বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইয়াছে। বোধ হয় বহুকাল সংস্কৃত ভাষা বঙ্গদেশের লোকের মজ্জাগত হইয়াছিল। সং চতুষ্ক হইতে চউক—চউকস—চৌকস; আর সং চক্ষুষ্মান হইতে চউক্ষম চৌকষ—চৌকস (লোক); সং চূড়া হইতে চুটী—চুটকী, আর সেই চূড়া হইতে অর্বাচীন সং চূল আসিয়াছে। সং চণক হইতে চনা, ছোলা; চণক-চূর্ণ হইতে চনা-চুর, স্থানবিশেষে গ্রাম্য চানাচুর। সং চূর্ণিত হইতে বাং চুনট, আর সং কুঞ্চিত হইতে বাং কোঁচানা। কাপড় কোঁচানা যেমন, কাপড়ের পাড়িতে চুনট করা তেমন নয়। বস্ত্রের ঊর্ম্মি বা তরঙ্গের নাম চুনট। এইরূপ, বহু বহু শব্দে সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ধাতু হইতেও বাঙ্গালাতে বহু শব্দ রচিত হইয়াছে। সং চিৎ ধাতু হইতে বাং চিতানা, চিয়ানা (চিআনা)। সেই চিৎ ধাতু হইতে বাং চিতান, স্থানবিশেষে (গানের) চিতেন হইয়াছে। সং চন ধাতু গতি শব্দ হইতে বাং চঁ-চোঁ দৌড়। সং ছম ধাতু ভক্ষণ হইতে বাং গা ছম্-ছম করে, সং সৃ ধাতু হইতে বাং ছর-ছর করিয়া জল পড়ে, সং ছুপ ধাতু হইতে বাং ছুঁ ধাতু। এই ছুঁ হইতে ছোঁয়াছুঁয়ি, ছোঁয়া ছুঁইয়া—ছোঁয়াছিয়া (রোগ) আসিয়াছে।

সংস্কৃত কোষে যে শব্দ পাইতেছি, তাহা সংস্কৃত বিবেচনা করিতেছি। তাহা প্রাচীন কি অর্বাচীন, তাহা বেদ-রচনা সময়ের শব্দ কি তাহা 'পালি' ভাষার কিংবা "প্রাকৃত" ভাষার প্রচলনের সময়ের শব্দ, তাহা দেশজ শব্দের সংস্কৃত-করা রূপ কি দক্ষিণাপথ-বাসী আর্য্যের বিকৃত রূপ, ইত্যাদি বিচারের যোগ্যতা আমার নাই। উপস্থিত কোষে আবশ্যকতাও নাই। অধিকাংশ স্থলে শব্দের সংস্কৃত ধাতু কিংবা সে ধাতুর স্বাভাবিক ভ্রংশ পাইলেই তুষ্ট হইতেছি।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন, দ্রবিড় ভাষার কয়েকটা শব্দ বাঙ্গালাতে চলিত আছে, এমন কি সংস্কৃতেও চলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কিন্তু সে শব্দ কোনগুলা, তাহার প্রমাণ তিনি দেন নাই। যে অনুমানে ভর করিয়াছেন, সেটাকে নির্ভর সাক্ষ্য মানিতে শঙ্কা হয়। তেলেগু নীচ জাতীয়া নারীর মুখে উদকমু শুনিয়াছি। নীর-লু শব্দও শুনিয়াছি। মনে হইতেছে বিজয় বাবু বলিয়াছেন সং নীর শব্দ দ্রবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছিল। হয় ত আসিয়াছিল, হয় ত সং নীর শব্দ সং নার শব্দের রূপান্তর। কোন্ দ্রবিড় শব্দ, দেশজ শব্দ, সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সংস্কৃত কোষকারের বিবেচ্য, বাঙ্গালা কোষকারের নহে। এইরূপ বাঙ্গালা কোষকার বাং চাঁদা ফারসী চন্দা চাপরাস চাবুক চামচ চালাক প্রভৃতি শব্দের মূল ফারসী শব্দ তুলিয়া দেখাইলেই তাঁহার কাজ শেষ মনে করি। সে-সকল ফারসী বা আরবী শব্দের মূলার্থ কি, কিংবা ব্যাকরণ কি, তাহা সে সে ভাষার কোষকারের বিবেচ্য, বাঙ্গালা কোষকারের নহে। অন্ততঃ আমি এইখানে

সীমারেখা টানিয়াছি। অধিকাংশ শব্দ ফ্যালোন সাহেব কৃত হিন্দুস্থানী কোষ হইতে লইতেছি। শব্দবিকারের ক্রম জানিবার ইচ্ছা হইলে এই গোটা গোটা শব্দ আবশ্যক। আমার রচিত বাঙ্গালা-ভাষা গ্রন্থের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শব্দবিকারের সূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোষ সমাপ্ত হইলে ভূমিকায় শব্দবিকারের সূত্রের পুনরালোচনা ও বিস্তর করিবার সংকল্পও আছে।

এখন চারু বাবুর উদ্ধৃত নূতন শব্দ দেখি। দুই পাঁচটা ছাড়া সমুদয় আমার কোষে আছে। চারুবাবু কেন দেখিতে পান নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে শব্দ যেখানে বসাইলে তাহা সহজে চোখে পড়িত, হয় ত সকল স্থলে সেখানে বিন্যস্ত হয় নাই। গ্রন্থ-কলেবর হ্রস্ব করিবার চেষ্টায় এই অসুবিধা হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক শব্দ যথাস্থানে বসাইয়া গেলে গ্রন্থকলেবর বিপুল হয়, না বসাইলে পাঠকের অসুবিধা হয়। হয় ত এই দুইএর মধ্যপথ নিরূপণ করিতে পারি নাই। প্রথমে শব্দগুলা একত্র হউক, পরে সাজানা গোছানা যাইবে; প্রথমে এক একটা মূল ধরা যাউক, পরে বিশেষ বিচার চলিবে।

চারুবাবু চাট চাড় চারপেয়ে চিংড়ি চিত্তেন চেটালো চেতানো চোটানো প্রভৃতি শব্দ লিখিয়াছেন। আমার কোষে এই সকল শব্দ চাটি চাড়া চারিপেয়ে চিঙ্গড়ী চিতান চটাল চেতানা চোটানা আকারে আছে। আমি শব্দের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-সঙ্গত আকারের পক্ষপাতী। ভাষা ও ভাখার * প্রভেদ যথাসাধ্য রক্ষা করিতে না পারিলে বাঙ্গালাশব্দ-কোষ সঙ্কলন বৃথা হইবে। ভাখার কোষ আবশ্যক বটে, কিন্তু সে কোষ সঙ্কলন আমার উদ্দেশ্য নহে। সকল স্থলে ভাষা ও ভাখার শব্দের প্রভেদ রক্ষা করিতে পারিতেছি কি না, তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

চারুবাবু কয়েকটা নূতন শব্দ দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে অনেকে এইরূপে কোষের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করিতে পারেন। নূতন শব্দ দিবার পূর্ব্বে একবার আমার কোষের এক এক বর্গের যাবতীয় শব্দ পড়িয়া গেলে পরিশ্রম অল্প হইবে। কোন্ স্থানের শব্দ, এবং ভদ্রপরিবারে সে শব্দ চলিত কি না, এই দুই বিষয় জানা আমার আবশ্যক। কলা ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শব্দের বেলা ভদ্রাভদ্র বিচার আবশ্যক হইবে না। দেশের সৌভাগ্য যে ভাখা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইতেছে। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

অলক্ষ্যে

না জানি সে কোথা হ'তে, জানিনা কেমনে
তোমারি কামনা মোরে পরশি গোপনে
সঙ্গীতে ভরিয়া দেয় অণু পরমাণু
আঁধার পরাণ-পথে পরকাশে ভানু!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* অনেকে এই ভাখা শব্দ জানেন না। একারণে 'প্রাদেশিক' শব্দ বলেন। কিন্তু ভাষা শব্দ হইতে ভাখা শব্দের উৎপত্তি হইলেও ভাখা শব্দের অর্থ যোজনান্তে ভাখা এই প্রবাদে স্পষ্ট আছে। এখানে যোজনান্তে ভাষা বলা চলে না।

পুস্তক-পরিচয়

উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্রদর্শন—

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ১৮৩ ও ৪২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ছাপা কাগজ পরিষ্কার, মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকে হরিদ্বার, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি উত্তর-ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত, স্থানীয় ইতিহাস ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের বর্ণনা এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও কুতুবদিয়া দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ ব্যক্তিগত যাত্রাবিবরণের সহিত বেশ সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পর্য্যটক ও দেশপরিচয়লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের ইহা মনোরঞ্জক হইবে।

পুস্তকে একটি সূচীপত্রের, ও চিত্রের অভাব আছে। প্রসিদ্ধ স্থান ও দর্শনীয় দৃশ্যের চিত্র দিলে বর্ণনা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

সেবা—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকে সাহিত্যপরিষৎ-বরিশাল-শাখার ভিন্ন ভিন্ন অধি-বেশনে পঠিত প্রবন্ধ হইতে বাছিয়া সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে যথা—

১। পরলোক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত। ২। দার্শনিক পরলোকবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব—ঐ। ৩। আত্মদর্শন—শ্রীগণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। ৪। আর্য্যসভ্যতার প্রাচীনতা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৫। অসমীয়া ভাষা—শ্রীপরেশনাথ সেন। ৬। জন্মান্তর ও কর্ম্ম—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ। ৭। কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। সমস্তগুলিই সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

ত্রিস্রোতা—

কবিতা-রেণু-রচয়িত্রী-রচিত কবিতাপুস্তক। দিনাজপুর, গণেশ-তলা হইতে শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৬৪ পৃষ্ঠা এণ্টিক কাগজে ছাপা। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকর্ত্রীর ছন্দের উপর অধিকার আছে, ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতি আছে, ভাব ও কবিত্বেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই। অধিকাংশ কবিতাই তত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবমূলক, অথচ তাহা বিষাদের ছায়াপাতে সকরুণ।

কমলকুমার—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র সামাজিক উপন্যাস। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এই উপন্যাস-খানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

গৈরিক—

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও পুত্রগণ। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৩৬ পৃষ্ঠা। মোটা বোর্ডে রেশমী কাপড়ে বাঁধা, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই পুস্তকের একটি ছাড়া সমস্ত কবিতাই গিরিশৃঙ্গে বসিয়া রচিত, এজন্য ইহার নাম গৈরিক রাখা হইয়াছে। ইহাতে এগারটি দীর্ঘ কবিতা আছে। কবিতাগুলি সমস্তই প্রায় সুখপাঠ্য, কেবল অতি-দীর্ঘতা হেতু রস জমাট বাঁধিতে পারে নাই, স্থানে স্থানে গদ্য-ঘেঁষিয়া গিয়াছে। কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠাবান কবির কাব্যে বহু স্থানেই ছন্দপতন লক্ষিত হইল।

শান্তিজল—

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১৯ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য বারো আনা।

করুণানিধান মিষ্ট কথায় ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত বলিয়াই জানিতাম, এবার তাঁহার রঙিন ভাবসম্পদেরও পরিচয় পাইলাম। এমন সুমিষ্ট কবিতাপুস্তক আজকাল খুব অল্পই চোখে পড়ে। শান্তিজলের কবিতাগুলি শান্তিজলের ন্যায় পবিত্র, স্নিগ্ধশীতল; বিচিত্র মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত। এক একটি কবিতায় এক একটি ভাবকে উপমার পর উপমা সাজাইয়া অত্যন্ত জমকালো করিয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সমগ্রের রসটি নষ্ট হইয়াছে। উপমার বাহার ও বাহাদুরী দেখিয়া মন অভিভূত হইয়া উঠে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভাবধারা অক্ষুণ্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। অধিক মসলায় তরকারী যেমন গুরুপাক হয়, অধিক মিষ্ট প্রয়োগে সন্দেশ যেমন তীব্র মিষ্ট হইয়া উঠে, শান্তিজলের অনেক কবিতাই সেইরূপ গুণাধিক্যে পীড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য মনে হয় কবিতার বচনবিন্যাস যেন কবির মনের মধ্যে স্বতই উৎসারিত হইয়া উঠে নাই, কবি সজ্ঞানে চেষ্টা করিয়া সুন্দর সুন্দর কথা, মনোমুগ্ধকর উপমা, চমৎকার ভাব চুনিয়া চুনিয়া সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে মোহিনী মালিকা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে মালার স্তবকে স্তবকে বেমালুম জোড় লাগে নাই; প্রত্যেক স্তবকটি সুন্দর, কিন্তু জোড়ের মুখে কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। বহু কবিতা অতিদীর্ঘ বলিয়াও এই দোষ ঘটিবার অবসর ঘটিয়াছে। কবির সংহত ও সংযত হওয়ার সুযোগ কারুকার্য্যের প্রলোভনে বহু স্থানে অগ্রাহ্য ও বিফল হইয়াছে। মোমের ফুলের মালার মতো ইহাতে সৌন্দর্য্য ও কৃতিত্ব যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, যিনি পড়িবেন তিনিই কবির শক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন; কিন্তু ফুলের মালার সজীবতা ইহার মধ্যে দুর্লভ। ছন্দের বৈচিত্র্য ও ঝঙ্কার, শব্দের মাধুর্য্য ও সঙ্গীত, উপমার চমৎকারিত্ব ও অনবদ্যতা, প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা এই গ্রন্থখানিকে পাঠকালে পাঠকের মনের সম্মুখে রত্নখনির ন্যায় প্রতিভাত করে, কিন্তু সজীবতা ও গতিবেগ না থাকাতে তাহা মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় না; বই বন্ধ করিলেই তাহার কিছুই আর আমার নয়, আমার মনের সঙ্গে আমার ভাবের ও চিন্তার প্রতিধ্বনিরূপে কোনো পংক্তিই জুড়িয়া যায় না। একদিকে ইহা যেমন অসাধারণ সুন্দর, অপর দিকে ইহা তেমনি অসাধারণ ব্যর্থ। এ কবিতা যেন পটের সুন্দরী, ঘর সাজানো চলে, ঘর করা চলে না। অবসর-মত চোখ পড়িলে বাঃ। বলিতে হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে নিত্যকার জীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আদানপ্রদান চলে না। করুণানিধানের কাছে আমরা ইহার চেয়েও প্রকৃত কবিতা আশা করি, যাহাতে বিশ্বনিখিলের নরনারীর মনের ভাব সাড়া পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ হইতেছে—

"লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।"

মানবজীবনের শাশ্বত ভাবলীলা করুণানিধানের মধুসঙ্গীতে প্রকাশ পাইবার অপেক্ষায় আছে।

সদ্ভাবকুসুম—

৺ রজনীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক এস, কে, লাহিড়ী কোম্পানি, কলিকাতা। ডুঃ ক্যাঃ ৮ অং ৪১ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

কান্ত কবির অপ্রকাশিত রচনা। বালকবালিকাদিগের উপযোগী উপদেশমূলক। অধিকাংশ কবিতাই পয়ার ছন্দে রচিত। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবির পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইবে। অতএব সকলেরই এই পুস্তক এক একখানি ক্রয় করা উচিত।

স্নেহ-উপহার—

কুমারী স্নেহলতার শুভপরিণয়ে শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। ৪৩ পৃষ্ঠা।

বিবাহে যে রকম কবিতা সচরাচর রচিত হয় এই পুস্তকখানি তাহা অপেক্ষা ঢের ভালো। ইহাতে কবিত্ব, ছন্দ, ও শুদ্ধ, সবল ভাষা আছে। কন্যার বিবাহের পরে বিদায়ের করুণ বেদনা প্রকাশ করা বাঙালী কবির নিজস্ব বিশেষত্ব; উমা মেনকা ও গিরিরাজের যে শাশ্বত চিত্র, তাহা খাঁটি বাংলার জিনিস। কালিদাসের শকুন্তলাকে বিদায় দিবার চিত্রটি ছাড়া আর কোনো প্রাচীন কাব্যে নাটকে কন্যাবিদায়ের চিত্র আছে কি না জানি না; আজকাল ত কালিদাসকে বাঙালীরা স্বদেশী বলিয়া দাবি করিতেছে। কালিদাসের বাঙালীত্বের যদি আর কিছু প্রমাণ না থাকে তবে কন্যাবিদায়ের ছবি একটি প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করিতে পারা যায়। সেই শাশ্বত কন্যাবিদায়ের বেদনা এই স্নেহ-উপহারে ব্যক্তিগত ভাবে কবিত্বময় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস।

গোপালন—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। আমরা গো-রক্ষা লইয়া এত ব্যস্ত যে গোপালন বিষয়ে মন দিবার আমাদের অবসর নাই। পরের মাথায় নারিকেল ভাঙিয়া কেবলমাত্র মৌখিক চীৎকার দ্বারাই গোরক্ষাব্রত পালন করা যায়। কিন্তু গোপালন পরিশ্রম- এবং ব্যয়সাধ্য। সত্যেন্দ্রবাবু গোপালন বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া গোজাতির এবং দেশের বিশেষ উপকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে অতি সংক্ষেপে গোপালন বিষয়ক অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহা প্রত্যেক গৃহস্থের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে প্রসবের সময়ে গরুর সেবা, এবং রুগ্ন গরুর সামান্য সামান্য ঔষধের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গরুর খাদ্যাদি বিষয়ে সত্যেন্দ্রবাবুর ব্যবস্থা তত মূল্যবান্ বিবেচিত না হইতে পারে। তবে সে দোষ তাঁহার নয়। অন্যান্য দেশে যেরূপ, এদেশে গরুর খাদ্যবিষয়ে সেরূপ কোন রাসায়নিক পরীক্ষার সূত্রপাতও আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কাঁচা ঘাস গরুর আদর্শ খাদ্য। কিন্তু আমরা দেশের গোগ্রাস ভূমি-সকল আত্মসাৎ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গোরক্ষিণী সভার প্রসার বৃদ্ধি লইয়াই ব্যস্ত আছি।

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

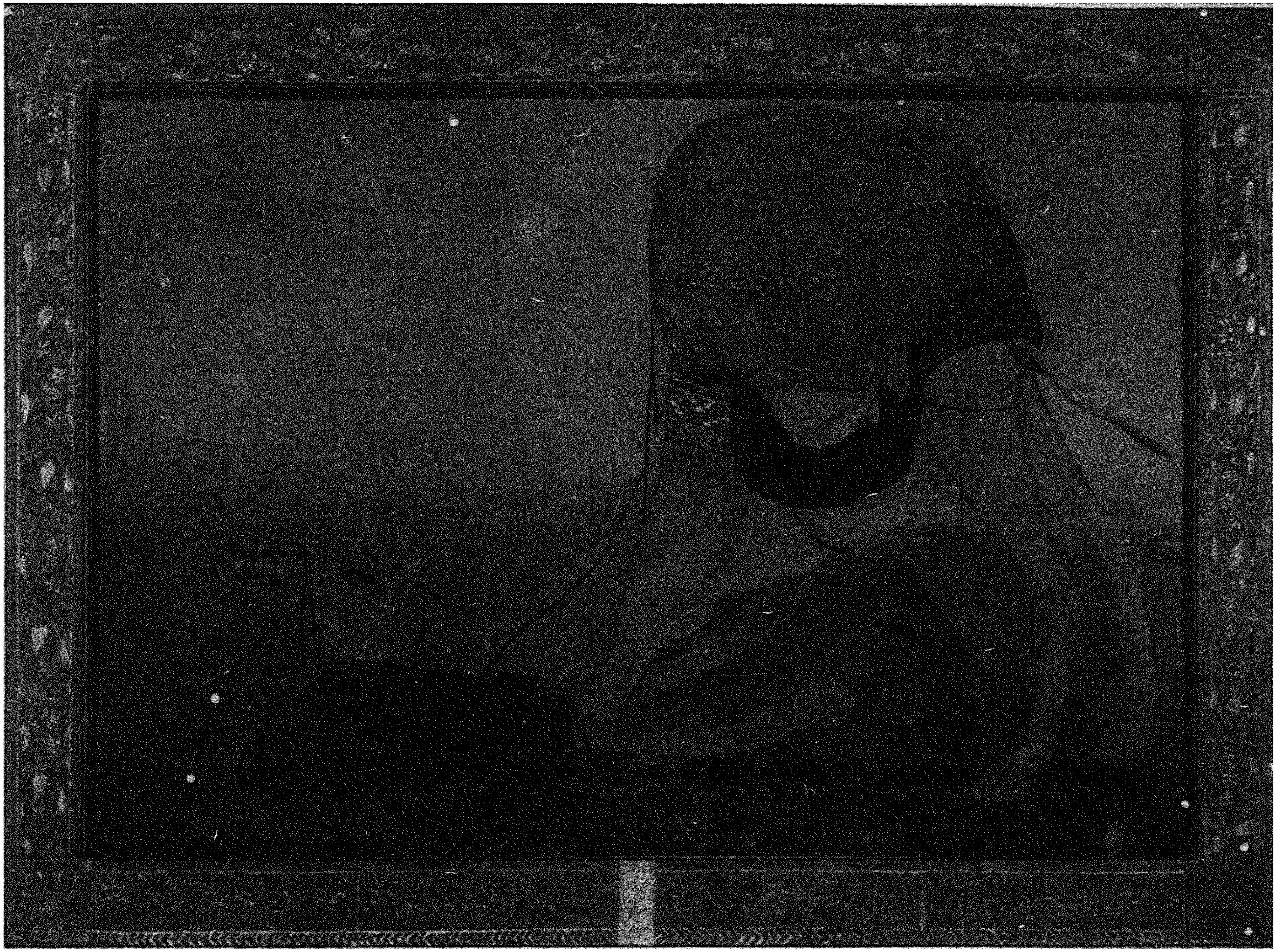

শেষ বোঝা।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

Engraved & Printed by U. RAY & SONS.

প্রবাসী

"সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২০

৫ম সংখ্যা

যাওয়া আসা

"সব্‌জ্‌ হোতেহি পাঁওকি তলে রউন্দে গয়ে হম্‌।
ইস্‌ গর্দিসে আফ্‌লাক্‌-সে ফুলে না ফলে হম্‌॥"

মনটুকুতে সবেমাত্র যখন রং ধরিতেছিল; তখন তাহাকে ঘর্ষণ ও ধর্ষণ হইতে রক্ষার জন্য বেড়া দিতে হইয়াছে, লোক খেদাইতে হইয়াছে। পাছে তোমার নূতন বাগানে শ্যামলতার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে, ফুলের ও ফলের আশ্বাস টুকু লোপ পায় আমি সেই ভয়েই দিন কাটাইয়াছি, চোখের জলে তাহাকে সরস রাখিতে বুক পাতিয়া তাহাকে ছায়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। তোমার বাগানে মালীর কায করিতে আমি অনেক সহিয়াছি, এখন আমার সহার পালা সাঙ্গ হইয়াছে। তুমি এখন তোমার নিজের ফুল নিজেই ফুটাইয়া তুলিয়া নিজের ডালা নিজেই ভরিয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের হাটে আপন পসরার মূল্য বুঝিয়া লও। আমি আমার জীর্ণ তরীখান লইয়া সকলের শেষে পড়িয়া থাকি, আর নূতন বাতাসে ভরা পালে তোমার নূতন তরী ওকূলে পাড়ি দিক।

একূলের নূতন পসারী তোমার ডালার ফুল মালার মূল ওকূলের বিকিকিনির হাটে হয়তো কেহ দিবে, হয়তো কেহ দিবে না, হয়তো দেখিবে এপারের মতই ওপারে ভাল বা মন্দ, চেনা ও না-চেনা, কিন্তু তা বলিয়া বলিতে পারি না যে তোমার তরী চিরদিনই একূলে বাঁধিয়া রাখ। নদী তুষারের কূলে বাঁধা রহিলে নিজেকে নিজেই চেনে না। কূলের বাধা ভাঙ্গিয়া না দিলে তুমি সে অকূলের পার চিনিয়া লইবে কেমন করিয়া?

কেবল একটিবার তোমাকে বাহিরে আনিতে আমি তোমায় কত ভুলানই ভুলাইয়াছি, তোমার সঙ্গে কত ছলনাই করিয়াছি! বাতাস যখন তপ্ত ছিল তখন ছায়ার মায়া দিয়া তোমাকে ঘিরিয়াছি, আকাশ যখন শুষ্ক ছিল তখন অকালে বাদলের সৃষ্টি করিয়াছি কেবল তোমাকে সত্তা রক্ষার ধস্তাধস্তির মাঝখানে একটিবার নামাইয়া দিব বলিয়া। আমাকে আজ নির্ম্মম বলিয়া লজ্জা দিও না; লজ্জা দিতে পারিতে যদি আমার সমস্ত শক্তিটুকু তোমার এ তুষারকারার কঠিন প্রাচীর গলাইয়া দিতে নিযুক্ত না রাখিতাম। তোমাকে বাহিরে আনিয়া বহাইয়া দেওয়াই আমার কায ছিল, কামনা ছিল, সে কায সে-সাধ আমার পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর আমাকে তোমার আগে শঙ্খ বাজাইয়া ধ্বজা উড়াইয়া চলিতে বলিও না। আমাকে একা ফেলিয়া যাও; পিছে রহিতে দাও, আর আমায় তোমার ভার সহাও কেন? রথ তো তোমার চলিয়াছে, দড়ি টানিতে এখনো কি আমায় চাই?

নদী! ও নূতন নদী!—"সত্ত দাবা গহো, আপ নির্ভয় রহো, আপকো চীনহ..." তোমার যে সত্য দাবী আছে গ্রহণ কর, নির্ভয় হও, আপনাকে চিনিয়া লও।

আমাকে আর কেন?

"মৈঁ আপনে সাহব-সঙ্গ চলী—
নদী-কিনারে সাঁই মিলে হো।"

ও আমার ভরা নদী! তোমার কিনারায় আসিয়া আমি আমার স্বামীকে পাইয়াছি, আমায় ছাড়, আমি আমার স্বামীর সঙ্গেই চলি, "দোনোঁ কূল অবতার চলী" একূল ওকূল দুকূলেরই পারে চলি।

কি করি "মেরে সারগুরু পকড়ী বাঁহ
নাঁহি তো মৈঁ বহি যাতা।"

আমার পরমগুরু যে আশার হাতে ধরিয়াছেন নহিলে মনে ছিল আমার মানস-ধারা তোমারি সাথে বহিয়া যেতে, ভাসিয়া যেতে! "হম অট্‌কে হৈঁ উন্‌হি অট্‌কে হৈঁ" আমার স্বামী আমায় আট্‌কাইয়াছেন, আর তো এখান হইতে নড়িবার সাধ্য নাই, তোমার সাথে সাথে ভাসিবার মন নাই। ও আমার স্রোতস্বিনী, এখন "তেরে গবনকা দিন নগিচানা, সোহাগিন্ চেত করোরী"—ও সোহাগিনী, প্রিয়তমের ঘরে যাইবার দিন তো তোর এল, আপনাকে সচেতন কর, বহিয়া যা, চলিয়া যা, ভাসিয়া যা রঙ্গভরে ও বিচিত্রবরণী নবরঙ্গিণী!

"মো পৈ সাঁঈ রঙ্গ ডারা
সুরকি চোট লাগি মেরে মনমেঁ
বেধ গয়া তন সারা।"

আমার স্বামী আমার উপরে যে রং ঢালিয়াছেন তাহারি সুরের আঘাত আমার প্রাণে বাজিয়াছে, দেহে বিঁধিয়াছে, আমি সেই স্বামীর সঙ্গে চলি যিনি—

"সর্ব্ব রঙ্গ রঙ্গিয়া
সব রঙ্গ সে রঙ্গন্যারা"

সকল রঙ্গের রঙ্গী অথচ সকল রং হইতে স্বতন্ত্র!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগুনের ফুল্‌কি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে-সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

যে মাদ্‌লিন পিয়েত্রী অর্সোর পিতা খুন হওয়ার পর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সে বিধবা হইলে মৌতের গান করিতে কলোঁবাকে ডাকিয়াছিল। কলোঁবা অনেক করিয়া অর্সোর মত করিয়া তাহার সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে গেল। সে যখন গান করিতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

গানের পর ম্যাজিষ্ট্রেট অর্সোর বাড়ীতে গিয়া অর্সোকে বুঝাইয়া দিল যে বারিসিনিদের সহিত তাহার পিতার খুনের কোনো সম্পর্ক নাই; অর্সো তাহাই বুঝিয়া বারিসিনিদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত। কলোঁবা অনেক অনুরোধ করিয়া ভাইকে আর এক দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া বারিসিনিদের দোষের নূতন প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কলোঁবা তাহার পিতার খাতাপত্র ও অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিল যে বারিসিনিরা নির্দ্দোষী নয়। তখন উত্তেজিত হইয়া অর্সো বারিসিনিদের কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়াতে অর্লান্দিক্‌সিয়ো হঠাৎ ছোরা খুলিয়া অর্সোর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার পিছে পিছে ভ্যাঁসান্তেলোও ছুটিয়া গেল। কিন্তু কলোঁবা নিমেষ মধ্যে ছোরা কাড়িয়া বন্দুক দেখাইয়া উহাদের বিতাড়িত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বারিসিনিদের উপর বিরক্ত হইয়া বারিসিনিকে দারোগার পদ হইতে অপসৃত করিলেন এবং অর্সোকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন যে অর্সো যেন যাচিয়া বিবাদ না করে, উহাদের শাস্তি আইন-আদালতে আপনি হইবে।

কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা লিডিয়া অর্সোর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেছেন। অর্সোর ইচ্ছা যে এই গণ্ডগোলের সময়

তাহারা না আসেন; সে স্থির করিল লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু কলোঁবা বলিল অর্সোর নিজে গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অর্সো রাজি হইল। যে ঘোড়ায় চড়িয়া অর্সো সকালে রওনা হইবে কলোঁবা রাত্রে গোপনে সেই ঘোড়ার কান কাটিয়া দিল। সকালে তাহা দেখিয়া অর্সো মনে করিল কাপুরুষ বারিসিনিরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস না করিয়া ঘোড়ার উপর ঝাল ঝাড়িয়াছে। অর্সো ক্রুদ্ধ মনে রওনা হইল। পথে বারিসিনিপুত্রদ্বয় লুকাইয়া ছিল; অর্সোকে একা পাইয়া সম্মুখ ও পিছন হইতে একসঙ্গে গুলি করিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে আঘাত মারাত্মক হইল না। অর্সোর একটা হাত ভাঙিয়া গেল। তখন অর্সো এক হাতে দুই গুলিতে দুজনকে বধ করিতে বাধ্য হইল, এবং ব্রান্দোর সঙ্গে পলাইয়া বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।

অর্সোর খবর পাইবার জন্য কলোঁবা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল; কর্ণেল নেভিল ও লিডিয়া আসিয়াও ব্যস্ত হইলেন; পরে শিলিনা আসিয়া অর্সোর খবর ও গিয়োকান্তো লিডিয়াকে অর্সোর চিঠি দিয়া গেল। বারিসিনি-পুত্রদের লাস আনিবার সময় তাহাদের দলের লোকেরা দাঙ্গা বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; কলোঁবার সাহস ও ভর্ৎসনায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল নেভিলের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারিলেন যে অর্সো আগে আক্রান্ত হইয়া পরে বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ইহাতে অর্সোর মকদ্দমা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল।]

(২০)

ডাক্তার একটু বিলম্ব করিয়া আসিল। পথে তাহার এক অসম্ভাবিত ঘটনা ঘটিয়াছিল। পথে তাহার গিয়োকান্তো শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা; সে বিনয় সহকারে ডাক্তারকে এক-জন আহত লোককে দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাহাকে অর্সোর কাছে লইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাহার ক্ষতস্থানে ঔষধ পটি বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছে। সেই ফেরারী পণ্ডিতটি ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেছে; গিয়োকান্তো পিজা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের শিক্ষাপ্রদ গল্পে গল্পে ডাক্তারের পথটা বেশ সুখেই কাটাইয়াছে; ঐ-সমস্ত প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নাকি গিয়োকান্তোর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

ডাক্তারের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতজী বলিল—ডাক্তার মশায়, আপনার ব্যবহারে আপনার ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছে, কারণ আপনাকে বলাই বাহুল্য যে শিষ্যের সমস্ত-পাপ-পরিজ্ঞাত গুরুর মতো চিকিৎসকেরও খুব মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতা থাকা আবশ্যক: আপনি অনুগ্রহ করে' ভুলে যাবেন যে এই জায়গায় এসেছিলেন বা আমাদের সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন, সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি পরম আপ্যায়িত হলাম।

কলোঁবা কর্ণেল নেভিলকে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যেন তিনি ডাক্তারের মৃত্যুত্তর পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকেন। সে বলিল—আপনি দাদার বন্দুকটিকে যেমন চেনেন তেমন ত আর কেউ চেনে না, আপনি সেখানে উপস্থিত থাকলে অনেক সুবিধা হবে। অধিকন্তু সেখানে এমন সব মিথ্যাবাদী লোক জড়ো হবে যে আমাদের হয়ে দুটো কথা বলে এমন এক-জন লোক না থাকলে আমাদের বিষম বিপদে পড়তে হবে।

কলোঁবা একাকী লিডিয়ার সহিত বাড়ীতে রহিল। তাহার বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সে লিডিয়াকে তাহার সহিত গাঁয়ের মধ্যে একটু বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া বলিল—হাওয়া লাগলে মাথাটা একটু ছাড়বে। উঃ! কতকাল যে খোলা হাওয়ায় বেড়াই নি!

বেড়াইতে বেড়াইতে কলোঁবা লিডিয়াকে কেবল তাহার দাদার কথাই বলিতে লাগিল; লিডিয়ারও সেই প্রসঙ্গ এমনই ভালো লাগিতেছিল যে সে তাহাতেই তন্ময় হইয়া গিয়া লক্ষ্যই করিতেছিল না যে কলোঁবা তাহাকে কথায় কথায় ভুলাইয়া গ্রাম হইতে কত দূরে লইয়া চলিয়াছে। সূর্য্য যখন অস্ত গেল তখন লিডিয়ার হুঁস হইল; সে কলোঁবাকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কলোঁবা বলিল যে সে একটা সোজা পথের সন্ধান জানে, সেই পথে গেলে যতটা ঘুরিয়া আসিয়াছে ততটা আর ঘুরিতে হইবে না। এই বলিয়া কলোঁবা পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। শীঘ্রই সে এমন একটা খাড়া ও বন্ধুর পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল যে এক হাতে গাছের ডাল ধরিয়া ধরিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া ও অপর হাতে বনজঙ্গল সরাইয়া সরাইয়া পথ করিয়া করিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে হইতেছিল। আধ ঘণ্টা পনর মিনিট এমনি সঙ্কট ও কষ্টকর খাড়াই চড়িয়া তাহারা একটা সমতল স্থানে গিয়া পৌঁছিল; সে জায়গাটার স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

শিলাখণ্ড মাটি ফুঁড়িয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত জমিটা পুদিনা, বনতুলসী আর শ্যাকুলের ঝোপে ঢাকা। লিডিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, গ্রামের চিহ্নও দেখা যাইতেছিল না, রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

লিডিয়া বলিল—ভাই কলোঁবা, তুমি ঠিক জান ত যে আমরা পথ হারাই নি ?

কলোঁবা বলিল—কিচ্ছু ভয় নেই। এই পৌঁছলাম বলে। আমার সঙ্গে এস।

—কিন্তু নিশ্চয় তোমার পথ ভুল হয়েছে ; গাঁ ত এ দিক্ পানে নয়। আমার মনে হচ্ছে যে আমরা গাঁয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়েই চলেছি। ঐ দেখ, ঐ যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে, ঐ খানেই নিশ্চয় পিয়েত্রানরা গ্রাম।

কলোঁবা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাঁ ভাই, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এখান থেকে একশ কদম আগে...এই বনের মধ্যে...

—কি আছে ?

—দাদা। আমি তাঁকে একবার দেখতে চাই, একবার তাঁকে প্রণাম করতে চাই—যদি তোমার মত হয়।

লিডিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল।

কলোঁবা বলিতে লাগিল—আমি গাঁ থেকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি তুমি আমার সঙ্গে ছিলে বলে···নইলে পুলিশ আমার পিছু নিত। ... তাঁর এত কাছে এসে তাঁকে একবার দেখে যাব না! ...আমার দাদা বেচারাকে তুমিই বা দেখতে যাবে না কেন ? তুমি তাঁকে কি আনন্দই না দেবে!

—কিন্তু কলোঁবা... আমার পক্ষে সেটা উচিত হবে না।

—আমি বুঝেছি। তোমরা সব শহুরে মেয়ে, তোমরা সর্ব্বদাই আদব কায়দার উচিত অনুচিতের নিক্তি নিয়েই ফের। আমরা সব পাড়াগেঁয়ে মেয়ে অত শত ভালো মন্দর খুঁটিনাটির ধার ধারি নে।

—কিন্তু এত রাত্তিরে! তোমার দাদাই আমাকে কি ভাববেন ?

—সে ভাববে যে তার বন্ধুরা তাকে ত্যাগ করে নি এতে তার সুখ বাড়বে, কষ্ট সইবার শক্তি ও সাহস বাড়বে!

—আর আমার বাবা ? তিনি যে ভয়ানক ব্যস্ত হবেন।...

—তিনি জানেন যে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, ...যাই হোক, এখন যা হয় একটা স্থির করে' ফেল।... আজ সকালেই না তুমি তার ছবি দেখছিলে ?—কলোঁবা একটুখানি বিদ্রূপের ক্রূর বক্র হাসি হাসিল।

—না... সত্যি ভাই কলোঁবা ·· আমি যাব না... সেই ডাকাতগুলো সেখানে আছে...

—তাতে কি ? ফেরারীরা ত তোমাকে চেনে না, আর চিনলেই বা ? অধিকন্তু তুমি যে ফেরারী দেখতে চেয়েছিলে।

—বাবা রে!

—শোনো ঠাকরুণ, বিচার করে দেখ। তোমাকে এখানে একলা রেখে যাওয়া সে আমার দ্বারা হবে না ; বলা ত যায় না কি ঘটবে না-ঘটবে। হয় চল দাদার সঙ্গে দেখা করি গে, নয় চল গাঁয়ে ফিরে যাই—যা বল দুজনের একসঙ্গেই তা করতে হবে।...ভগবান জানেন কবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে··· হয় ত এ জন্মে আর না।

—কলোঁবা, ও কি তোমার কথা ? আচ্ছা, চল! কিন্তু বলে রাখছি এক মিনিট সেখানে থেকেই খাড়া-খাড়াই আমরা ফিরব।

কলোঁবা লিডিয়ার হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া আর কোনো কথা না বলিয়া এমন জোরে চলিতে আরম্ভ করিল যে লিডিয়ার তাহার সহিত চলিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই কলোঁবা থামিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল—ওদের আগে হ'তে জানান না দিয়ে অগ্রসর হওয়া আমাদের ঠিক হবে না, চাই কি একটা বন্দুকের গুলি খেতে হ'তেও পারে।

কলোঁবা মুখে আঙুল দিয়া শিশ দিল। অমনি একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল এবং ফেরারীদের মোহড়া ঘাটীর পাহারাদারের উপস্থিত হইতেও বিলম্ব হইল না। সে আমাদের পুরাতন পরিচিত ব্রিস্কো কুকুর। সে আসি-

াই কর্লোঁবাকে চিনিল এবং তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বনের মধ্য দিয়া দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছুদূর যাইতেই তাহাদের সম্মুখে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

কর্লোঁবা বলিয়া উঠিল—ব্রান্দো নাকি রে? দাদা কোথায়?

—ঐ হোঁথা। কিন্তু আস্তে আস্তে চল; জখম হওয়ার পর আজ এই প্রথম তার একটু তন্দ্রা এসেছে।

রমণীদ্বয় সাবধানে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল কতকগুলি পাতলা পাতলা পাথর গোল করিয়া উপরা-উপরি সাজাইয়া একটা অগ্নিকুণ্ড তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে—তাহাতে বাহিরের বাতাস আগুনে লাগিতেছে না বা আগুনের আলো বাহিরের আসিতেছে না; সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে একখানা চেটাইয়ের উপর তেরপাল ঢাকা দিয়া অর্সো শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার মুখ বিবর্ণ ও পাণ্ডাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার ব্যথিত নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে। কর্লোঁবা আস্তে আস্তে গিয়া তাহার পাশে বসিয়া নীরবে হাত দুখানি জোড় করিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল, যেন প্রার্থনা করিতেছে। লিডিয়া তাহার ওড়না দিয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া কর্লোঁবার পিছনে পিঠ-ঘেঁসিয়া বসিল; এবং মাঝে মাঝে কর্লোঁ-বার কাঁধের উপর দিয়া মুখ তুলিয়া তুলিয়া আহত অর্সোকে দেখিতে লাগিল। পনর মিনিট কেহ একটু টুঁ শব্দও করিল না। পণ্ডিতজী ইসারা করিয়া ব্রান্দোকে ডাকিয়া লইয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল; ইহাতে লিডিয়া আরাম অনুভব করিল এবং সে এই প্রথম বুঝিতে পারিল যে ফেরারীদের প্রকাণ্ড দাড়ি ও সাজসরঞ্জামে, ভারী একটি সেই দেশী বিশেষত্ব আছে।

অর্সো একটু নড়িল। অমনি কর্লোঁবা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল এবং তাহার আঘাত, তাহার বেদনা ও তাহার কি চাই না-চাই সম্বন্ধে শতেক প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। অর্সো, এ অবস্থায় যতটা ভালো থাকা সম্ভব তাহা সে আছে, জানাইয়া কর্লোঁবাকে পাল্টা প্রশ্নবর্ষণ করিতে লাগিল, যে, লিডিয়া এখনো পিয়েত্রান-রায় আছে কি না, সে তাহাকে কোনো চিঠি দিয়াছে কি না, ইত্যাদি, কেবল লিডিয়ারই কথা।

কর্লোঁবা দাদার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ছিল বলিয়া তাহার দাদা তাহার সঙ্গিনীকে দেখিতে পাইতেছিল না; আর দেখিতে পাইলেও সেই অন্ধকারে তাহাকে চেনাও সহজ হইত না। কর্লোঁবা এক হাতে লিডিয়ার একখানি হাত ধরিয়া অপর হাত দিয়া আস্তে ও সন্তর্পণে দাদার মাথাটি একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল—না দাদা, লিডিয়া ত কৈ কোনো চিঠি তোমাকে দেয় নি। তুমি সর্ব্বক্ষণ শুধু তার কথাই ভাব দেখছি, তবে কি তুমি তাকে ভালো-বাস?

—কর্লোঁবা, হয় ত আমি বাসি।.. কিন্তু সে··· সে হয়ত আমাকে এখন ঘৃণা করে!

লিডিয়া কর্লোঁবার হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কর্লোঁবার মুঠির ভিতর হইতে হাত ছাড়াইয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়; তাহার ছোট ছোট সুন্দর সুগঠিত হাত দুখানির বলের পরিচয় ত আগেই আমরা পাইয়াছি।

কর্লোঁবা বলিল—দাদা, তোমাকে ঘৃণা করবে! তুমি যা করেছ এর পর!.. বরং উল্টো, সে তোমাকে খুব প্রশংসাই করে।... হ্যাঁ দাদা, তোমাকে তার অনেক মনের কথা বলবার আছে।

লিডিয়ার হাত ক্রমাগত মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কর্লোঁবা ক্রমশ টানিয়া টানিয়া অর্সোর নিকটেই লইয়া যাইতেছিল।

অর্সো বলিল—কিন্তু তাই যদি, তবে সে আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?... তার হাতের একটি লাইন লেখা পেলেই ত আমি খুসী হতাম।

লিডিয়া এবার জোরে হাত ছাড়াইতে গেল; কর্লোঁবা অমনি টানিয়া সেই হাতখানি অর্সোর হাতের উপর দিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া উজ্জ্বল হইয়া বলিল—দাদা, খবরদার! শ্রীমতী লিডিয়ার নিন্দে বুঝে সুঝে করো, সে তোমার কর্সিক ভাষা বেশ বোঝে।

লিডিয়া হাত টানিয়া লইয়া অস্পষ্ট কি দুই একটা কথা বলিল। অর্সোর মনে হইল স্বপ্ন!

—মিস নেভিল, আপনি এখানে! আপনি কেমন করে' এলেন? আপনি আমাকে কি খুসীই করলেন!

কষ্টে একটু উঠিয়া সে লিডিয়ার কাছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

লিডিয়া বলিল—আপনার বোনের সঙ্গে আমি এসেছিলাম যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে যে ও কোথায় যাচ্ছে... তার পর আমারও ইচ্ছে হ'ল... জেনে যেতে... আপনি কেমন আছেন।... আহা! আপনি কি রোগাই হয়ে গেছেন!

কলোঁবা অর্সোর পিছনে গিয়া বসিয়াছিল। সে অর্সোকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপনার হাঁটুর উপর তাহার মাথা রাখিল এবং ইসারা করিয়া লিডিয়াকে কাছে সরিয়া আসিতে বলিল।

—আরো কাছে! আরো কাছে এস! জখমী রোগীর চেঁচিয়ে কথা বলা ত ঠিক নয়।

লিডিয়া ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কলোঁবা তাহার হাত ধরিয়া এমন জোরে টানিল যে লিডিয়া একেবারে অর্সোর কোলের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার কাপড় অর্সোর গায়ে ঠেকিতে লাগিল, এবং তাহার যে-হাতখানা কলোঁবা ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা অর্সোর কাঁধের উপর থাকিল।

কলোঁবা প্রফুল্ল মুখে বলিল—এই বেশ হয়েছে! দাদা, খোলা আকাশের তলে বনবাসের এমন মধুর রাত্রি কেমন লাগে?

অর্সো ভাবনিমীলিত নেত্রে বলিল—সত্যি রে সত্যি! বড় মধুর রাত্রি! জীবনে কখন ভুলব না!

লিডিয়া বলিল—আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে!

—কষ্ট! আমার আর কষ্ট নেই! এই রকম করে' এখন যদি আমি মরতে পেতাম!

কলোঁবা লিডিয়ার যে হাতখানিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল অর্সো ধীরে ধীরে আপনার ডাহিন হাত তুলিয়া সেই হাতের উপর দিল।

লিডিয়া বলিল—আপনাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার হয়েছে, নইলে আপনার শুশ্রূষা হবে কেমন করে'? আজ আপনাকে যে রকম কদর্য্য বিছানায় খোলা জায়গায় শুয়ে থাকতে দেখলাম, এর পর আমি আর বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারব না।...

—মিস নেভিল, যদি আপনার সঙ্গে দেখা হবার ভয় না থাকত, তা হলে আমি পিয়েত্রানরায় ফিরে যেতাম আর পুলিশের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম। কেবল কি করে' আপনার কাছে মুখ দেখাব বলেই যেতে পারি নি।

কলোঁবা জিজ্ঞাসা করিল—দাদা, ওঁর সঙ্গে দেখা হবে তাতে আর ভয়টা কি?

—মিস নেভিল, আমি আপনার হুকুম অমান্য করেছি, আমার কথা রাখতে পারিনি।......এমন অবস্থায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি!

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—দেখছ ত ভাই লিডিয়া, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে! পিয়েত্রানরায় তুমি আসাতে দাদার কত উপকার হয়েছে! আমি আর তোমাকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতে দেবো না।

লিডিয়া অর্সোকে বলিল—আমার মনে হচ্ছে এই শোচনীয় বিপদ শীঘ্রই কেটে যাবে, তখন আপনার আর কাউকে ভয় করতে হবে না।.........আমরা চলে যাবার আগে যদি জেনে যেতে পারি যে আপনার প্রতি সুবিচার করা হয়েছে, আর, সকলে আপনার সাহসের মতন আপনার কর্ত্তব্য- ও ন্যায়নিষ্ঠারও পরিচয় পেয়েছে, তা হলে ভারী সুখের হবে।

—মিস নেভিল, আপনি চলে যাবেন! ও কথাটা আমার কাছে এখনি বলবেন না।

—আপনার ইচ্ছেটা কি?......আমার বাবা ত কেবল শীকার খেলেই বেড়াতে পারেন না, তাঁকে বাড়ী ত ফিরে যেতেই হবে।

অর্সোর যে-হাতখানি লিডিয়ার হাতের উপর রক্ষিত ছিল, তাহা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল; সে খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

কলোঁবা বলিল—বাঃ! অমনি গেলেই হ'ল। আমরা এত শিগগীর যেতে দিলে ত! পিয়েত্রানরায়

তোমাদের অনেক সব ভালো ভালো জিনিস দেখতে এখনো বাকী আছে।......অধিকন্তু তুমি আমার ছবি এঁকে দেবে স্বীকার করেছিলে, সে ত এখনো আরম্ভই কর নি।......আর তুমি আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলে যে তোমায় পঁচাত্তর শ্লোকে একটা গাথা তৈরী করে শোনাতে হবে।...ত্রিস্কো ডাকছে কেন? ঐ যে ওর পিছনে পিছনে ব্রান্দো দৌড়ে আসছে!...ব্যাপার কি!

কলোঁবা অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া লিডিয়ার কোলে অর্সোর মাথা শোয়াইয়া দিয়া সে ফেরারীদের কাছে দৌড়িয়া গেল।

লিডিয়া কলোঁবার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে সে বিজন বনের মধ্যে একজন যুবাপুরুষের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পাছে সরিয়া গেলে আহত ব্যক্তির বেদনা লাগে এই ভয়ে সে সরিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। কিন্তু অর্সো নিজেই তাহার ভগিনীর-দেওয়া এমন সুখকর উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া ডান হাতের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া বলিল—মিস লিডিয়া, আপনি এত শিগ্‌গীর চলে যাবেন? এই হতভাগা দেশে আপনার বেশী দিন থাকা উচিত, তা আমি মনে করি না,... কিন্তু··· যখন থেকে আপনি এখানে এসেছেন তখন থেকে আপনাকে বিদায়বাণী বলতে হবে মনে করে আমি শতেকবার দারুণ বেদনা বোধ করেছি। ...আমি একজন গরিব লেফটেনাণ্ট...ভবিষ্যৎ বলে' কিছু আশা নেই...এখন ত ফেরারী মিস লিডিয়া, এখন কি বলা সাজে যে আমি তোমায় ভালবাসি।.. কিন্তু তোমাকে সে কথা শুনিয়ে দেবার অবসর আমার এইই। আমি আমার হৃদয়ভার তোমার কাছে লাঘব করে' এখন আমার সকল দুঃখ লঘু মনে করছি

লিডিয়া তাহার মুখ ফিরাইয়া লইল, যেন ঘন অন্ধকারও তাহার লজ্জার অরুণিমা ঢাকিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে কম্পিত গদ্গদ ভাবে বলিল—দেখুন রেবিয়া মশায়, আমি কি এখানে আসতাম যদি......

অসমাপ্তবাণী লিডিয়া অর্সোর হাতে সেই মিশরী আংটিটি আস্তে আস্তে ফিরাইয়া দিল।' তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার স্বাভাবিক উপহাস-রসিকতার স্বর ফিরাইয়া আনিয়া সে বলিল—দেখুন, এমনতর কথা বলা আপনার ভারী অন্যায়'।...বিজন বনে, ডাকাতের দলের মধ্যে, আপনি জানেন কিনা যে আমার রাগ করার সাধ্য নেই!

যে হাতখানি আংটি ফিরাইয়া দিতেছিল অর্সো তাহাতে চুম্বন করিতে গেল। লিডিয়া চট করিয়া হাত সরাইয়া লওয়াতে অর্সো তাহার আহত হাতের ভরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। অর্সো বেদনা পাইয়া কাতরধ্বনি প্রকাশ না করিয়া পারিল না।

লিডিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিল—বন্ধু, বন্ধু আমার, তোমার কি লাগল? আমার দোষেই লাগল, আমায় ক্ষমা কর।...

উহারা পরস্পরে নিজের ঘাড়ে দোষ লইবার জন্য চাপা গলায় খানিকক্ষণ তর্ক করিতেছিল। কলোঁবা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, সে উহাদিগকে যেমন অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল উহারা ঠিক তেমনি আছে। সে বলিয়া উঠিল—পুলিশ! পুলিশ! দাদা, তুমি একটু চেষ্টা করে উঠে হেঁটে চল, আমি তোমাকে ধরছি।

অর্সো বলিল—আমাকে ছেড়ে দাও। ফেরারীদের পালাতে বল। আমায় যদি ধরে তাতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু মিস্ লিডিয়াকে এখান থেকে নিয়ে যাও। দোহাই ভগবানের, ওরা যেন ওঁকে এখানে না দেখে!

ব্রান্দো কলোঁবার পিছনে পিছনেই আসিয়াছিল, বলিল—আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। পুলিশের সার্জ্জেণ্ট বারিসিনি উকিলের ধর্ম্মবেটা; সে ত তোমায় গ্রেপ্তার করবে না, খুন করবে, তারপর বলবে যে আসামীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি

অর্সো কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কয়েক পা চলিল, তারপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি চলতে পারছি না। তোমরা সব পালাও। মিস্ নেভিল, বিদায়! তোমার হাতখানি একবার আমায় দাও, বিদায় বিদায়!

রমণীদ্বয় বলিয়া উঠিল—আমরা তোমাকে ছেড়ে যাব না।

ব্রান্দো বলিল—যদি তুমি হাঁটতে না পার তবে

আমাকেই তোমায় বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এস, লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব, একটু হুঁস কর। ঐ পিছনের খদের ভিতর দিয়ে আমরা ঠিক পালিয়ে যাব খন। পণ্ডিতজী ততক্ষণ ওদের একটু কাজ দিয়ে ব্যস্ত করে' রাখবে।

অর্সো মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বলিল—না, আমাকে ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের দোহাই তোকে কলোঁবা, তুই মিস্ নেভিলকে এখান থেকে নিয়ে পালা।

ব্রান্দো বলিল—কলোঁবা ঠাকরুণ, তোমার গায়ে ত বেশ জোর আছে; তুমি ওর বগলের কাছটায় ধর, আমি পা ধরি; ঠিক! চলে চল সোজা!

অর্সোর নিষেধ ও ভৎর্সনা অগ্রাহ্য করিয়া উহারা দুজনে তাহাকে বহিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। অত্যন্ত ভয়ে কাতর হইয়া লিডিয়াও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইতেছিল। একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল, অমনি পাঁচ ছয়টা বন্দুক জবাব দিয়া উঠিল। লিডিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্রান্দো গালি দিল কিন্তু দ্বিগুণ জোরে পা চালাইয়া দিল. কলোঁবাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিতে লাগিল—গাছের ডাল তাহার মুখে শপ-শপ করিয়া চাবুকের মতো পড়িতেছিল, কাঁটায় তাহার পোষাক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে তাহার সঙ্গিনীকে বলিল—বোনটি আমার, নীচু হও নীচু হও, পেছন থেকে গুলি এসে লাগতে পারে।

উহারা প্রায় পাঁচ শ কদম চলিয়া গিয়াছে, ঠিক করিয়া বলিতে গেলে দৌড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় ব্রান্দো বলিল, আর সে পারিতেছে না, এবং কলোঁবার অনুরোধ ও ভৎর্সনা সত্ত্বেও সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—মিস্ নেভিল কোথায়?

লিডিয়া বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়া এবং প্রতিপদে বনের গহনতায় গতিরুদ্ধ হইয়া একাকী পিছাইয়া পড়াতে পলাতকদিগের চিহ্ন পর্য্যন্ত হারাইয়া দারুণ উদ্বেগ ও আতঙ্কে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রান্দো বলিল—তিনি ত পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি হারাবে না, মেয়ে লোকরা কখনো হারায় না। শোনো শোনো, অর্সো আন্তো, পণ্ডিতজী তোমার বন্দুক নিয়ে ক্যায়সা ধুমধড়াক্কা বাধিয়ে দিয়েছে। আপশোষের কথা যে আঁধার রাত্রে কিছু চোখে সোঝে না; রাতের ব্যাপারে কোনো পক্ষেরই বেশী কিছু ক্ষতি হয় না।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—চুপ! আমি একটা ঘোড়ার আওয়াজ পাচ্ছি! আর আমাদের মারে কে!

বাস্তবিক একটা ঘোড়া বনের মধ্যে চরিতে আসিয়া বন্দুকের আওয়াজে ভয় পাইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল।

ব্রান্দোও বলিয়া উঠিল—আর আমাদের পায় কে!

দৌড়িয়া গিয়া ঘোড়াটার কেশর ধরা এবং কলোঁবার সাহায্যে একগাছা দড়ী লাগামের মতো করিয়া ঘোড়ার মুখে পরাইয়া দেওয়া ব্রান্দোর এক নিমেষের ব্যাপার। সে বলিল—এখন পণ্ডিতজীকে মানা করে দেওয়া যাক।

সে দুইবার শিশ দিল; দূর হইতে একটা শিশে তাহার জবাব আসিল; এবং ম্যাণ্টনের বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জন থামিয়া গেল। ব্রান্দো ঘোড়ার উপর এক লাফে চড়িয়া বসিল। কলোঁবা তাহার দাদাকে তুলিয়া ব্রান্দোর সম্মুখে বসাইয়া দিল; ব্রান্দো এক হাতে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অপর হাতে ঘোড়া চালাইতে লাগিল। ডবল বোঝা ঘাড়ে লইয়াও ঘোড়াটা পেটে ব্রান্দোর পায়ের দুই গুঁতা খাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া এমন একটা খাড়া পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিল যে কর্সিকা ছাড়া আর অন্য যে-কোনো দেশের ঘোড়া হইলে সেখানে শতেক বার ঘাড়মুড় মুচড়াইয়া ডিগবাজি খাইয়া পড়িত ও শতেকবার মরিত।

কলোঁবা চলিতে চলিতে প্রাণপণ জোরে লিডিয়ার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথার জবাব দিল না।...কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে করিতে সে একটা পথের উপর দুজন সিপাহীর সামনে গিয়া পড়িল। সিপাহীরা তাহার সাড়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—হু কুম দার!

কলোঁবা মস্করার স্বরে বলিল—ভ্যালা! গুলির নেশাটা জমেছিল কেমন! কজন কাত হ'ল?

একজন সিপাহী বলিল—তুমি ফেরারী আসামীদের সঙ্গে ছিলে। আমাদের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।

—খুসীর সঙ্গে।' কিন্তু আমার একজন বন্ধু এখানে কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে আগে খুঁজে নি এসো।

—তোমার বন্ধু আগেই ধরা পড়েছে। চল তার সঙ্গে হাজতখানায় মুলাকাত হবে।

—হাজতখানায়? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে 'খন। এখন আপাতত আমাকে তার কাছে নিয়ে চল ত।

সিপাহীরা তাহাকে ফেরারী আসামীদের আড্ডায় লইয়া আসিল; সেখানে তাহারা তাহাদের বিজয়লব্ধ সামগ্রী জড়ো করিয়া রাখিয়াছিল—অর্থাৎ কিনা, অর্সোর গায়ের সেই তেরপালখানা, একটা পুরাতন মাল্‌সা, আর একটা জলভরা কুঁজো। সেইখানে লিডিয়া ছিল; সিপাহীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, ভয়ে আধমরা হইয়া, ফেরারীরা সংখ্যায় ক জন এবং কোন দিকে পলাইয়াছে প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু চোখের জল ঢালিতেছিল।

কলোঁবা তাহার বুকে ঝাপাইয়া গিয়া পড়িয়া চুপি চুপি কানে কানে বলিল—ওরা বেঁচে গেছে।

তারপর সিপাহীদের সার্জ্জেণ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মশায়, আপনি যে-সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করছেন ইনি তার বিন্দুবিসর্গও যে জানেন না তা আপনি বেশ জানেন। আমাদের গাঁয়ে ফিরে যেতে দিন, সেখানে সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

সার্জ্জেণ্ট বলিল—হাঁগো পিয়ারী হাঁ! আপনাদের খুব করে' আদব কায়দার সঙ্গে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু হয়ত আপনাদের সেটা বিশেষ মনঃপূত হবে না। এমন রাত্রিকালে পলাতক খুনী ডাকাতদের সঙ্গে কি করা হচ্ছিল তার জবাবদিহি করতে হবে চাঁদ, মনে থাকে যেন!

কলোঁবা বলিল—সার্জ্জেণ্ট সাহেব, খবরদার! মুখ সামলে কথা কয়ো! এই মেয়েটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটুম, ওর সঙ্গে ঠাট্টা করা চালাকি না!

একজন সিপাহী তাহাদের দলপতির কানে কানে বলিল—হ্যাঁ, হতেও পারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুটুম! দেখছেন না ওর মাথায় টুপী রয়েছে।*

সার্জ্জেণ্ট বলিল—আরে রেখে দে তোর টুপী! এমন ঢের ঢের টুপী দেখেছি! ওরা দুজনেই দেশের দুষমন দুঁদে পণ্ডিতজীটার সঙ্গে ছিল; ওদের গ্রেপ্তার করে' নিয়ে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। যাক, এখন আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। সেই পাজি ফরাশী মাতাল হাবিলদার তোপ্যাঁ না থাকাতে বেশ সুবিধেই হয়েছে, আমি জঙ্গল ঘেরাও করে সব ক'টাকে একেবারে হালি গেঁথে গ্রেপ্তার করে ফেলব।

কলোঁবা বলিল—আপনারা ত সাত জন আছেন? জানেন কি মশায়রা যে যদি কোন ক্রমে গাম্বিনি, সারোথী আর থিয়োডোর পোলী তিন ভাই, ব্রান্দো আর পণ্ডিতজীর সঙ্গে জুটে যায়, তা হলে ওরা আপনাদের বেশ বেগ দিতে পারে? যদি আপনাদের জঙ্গলী রাজা থিয়োডোর পোলীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের মতলব থাকে তবে তার মধ্যে থাকাটা আমার পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রাতকাণা গুলিগুলো আবার শত্রুমিত্র চিনতে পারে না।

কলোঁবা যে-সব দুঁদে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদের নাম করিল তাহাদের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনাটা সিপাহীদের মনটা বেশ একটু নাড়িয়া দমাইয়া দিয়া গেল। ফরাশী কুকুর হাবিলদার তোপ্যাঁকে অনর্গল গালি দিতে দিতে সার্জ্জেণ্ট সাহেব সিপাহীদের সরিয়া পড়িতে হুকুম দিল; এবং সেই ক্ষুদ্র বাহিনীটি পিয়েত্রানরার পথ ধরিয়া তেরপাল ও কুঁজো জয়চিহ্ন স্বরূপ বহিয়া লইয়া চলিল। আর সেই মাল্‌সাখানার বিচার এক লাথির চোটে ঠাণ্ডা করিয়া দিল। একটা সিপাহীর ভারী সাধ হইল, সে লিডিয়ার হাত ধরিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু কলোঁবা তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল—খবরদার! কেউ গায়ে হাত দিতে পাবে না। তোরা কি মনে করিস যে আমরা তোদের মতন কাপুরুষ, পালিয়ে যাব? এস ভাই লিডিয়া, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। নেও ভাই আর খুকির মতন

* ফরাসী ও ইটালিয়ান রীতি অনুসারে লেডি ছাড়া অপর সাধারণ স্ত্রীলোকের বনেট টুপী পরিবার অধিকার থাকে না।

কাঁদতে হবে না, লক্ষ্মীটি! এ একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল; কিন্তু এতে কিছু ক্ষতি হবে না; আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা খেতে বসতে পারব গিয়ে। সত্যি আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি!

লিডিয়া চাপা গলায় বলিল—সবাই আমাকে কি মনে করবে?

—মনে করবে, তুমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে গিয়েছিলে, আবার কি।

—ম্যাজিষ্ট্রেট কি বলবে?......আমার বাবাই বা কি বলবেন?

—ম্যাজিষ্ট্রেট? ... তাকে তুমি বলে দিয়ো, যাও যাও তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও, আসামীদের কাছে ম্যাজিষ্ট্রটগিরি ফলিয়ো। আর তোমার বাবা? ... তুমি যে রকম করে দাদার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তাতে ত আমার মনে হয়েছিল যে তোমার বাবাকে বলবার মতো কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে!

লিডিয়া কিছু না বলিয়া কলোঁবার হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

কলোঁবা লিডিয়ার কানের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিতে লাগিল—আমার দাদা কি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নয়? তাকে কি তুমি একটুও ভালোবাস না?

লিডিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আ মরি! তুমি ভাই আমার সব কথা ফাঁস করে ফেলছ, তোমার ওপরে আমার ভাই, এত বিশ্বাস ছিল!

কলোঁবা একখানি হাত দিয়া লিডিয়ার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিল। তারপর কানে কানে বলিল—ছোট বোনটি আমার, আমাকে ভাই ক্ষমা করবে?

লিডিয়া কলোঁবাকে চুম্বন ফিরাইয়া দিয়া বলিল—ভয়ঙ্করী ভগিনী আমার, তোমাকে ক্ষমা না করে' আর উপায় কি!

ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব পিয়েত্রানেরার দারোগার বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলেন। কর্ণেল নেভিল কন্যার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; তিনি বিশ দফা তাঁহাদের কাছে আসিয়া সন্ধান লইতেছিলেন যে কোনো খবর পাওয়া গিয়াছে কি না; এমন সময় সার্জ্জেণ্ট কর্তৃক অগ্রদূত রূপে প্রেরিত একজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বর্ণনা করিতে লাগিল ফেরারী দস্যুদের সহিত কিরূপ ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক যুদ্ধ হইয়াছে, বাস্তবিক উভয় পক্ষের কেহ হত বা আহত না হইলেও সেই মারাত্মক যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে অনেক—একটা তেরপাল, একটা জলভরা কুঁজো, আর দুজন স্ত্রীলোক,—এরা বোধহয় ডাকাতদের উপপত্নী অথবা তাহাদের গোয়েন্দা চর। এইরূপ সংবাদ শুনিতে শুনিতেই সশস্ত্র সিপাহীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্ত্রীলোক দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইল। কলোঁবার মুখ লাল হইয়া উঠিল, লিডিয়ার লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্চর্য্য, এবং কর্ণেল নেভিল বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। পুলিশ সাহেব লিডিয়াকে জেরা করিয়া এক প্রকার নীচ ও ক্রূর আনন্দ সম্ভোগ করিতেছিল, এবং লিডিয়া একেবারে লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও নীরব না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর থামিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিল—আমার মনে হচ্ছে বিচারে সকলেই খালাস পাবে। দৈবক্রমে এই মহিলা দুজন যে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন এর চেয়ে সু-যোগ আর কি হতে পারে। ওঁরা বেড়াতে গিয়ে একজন যুবককে আহত দেখে তার কাছে যদি গিয়েই থাকেন তবে ত সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তারপর কলোঁবার দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি আপনার ভাইকে খবর পাঠিয়ে দিতে পারেন যে তাঁর মকদ্দমা এমন সুরাহা ধরেছে যে আমি এমন আশাই করতে পারি নি। লাস পরীক্ষার ফল, ও কর্ণেল সাহেবের জবানবন্দী হ'তে জানা যাচ্ছে যে আপনার দাদা আগে আক্রান্ত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন মাত্র। এবং উনি লড়াইয়ের সময় একলাই ছিলেন। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু ওঁর শীঘ্র বন ছেড়ে এসে গ্রেপ্তার হওয়া দরকার।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া কর্ণেল নেভিল, কন্যা ও কলোঁবাকে লইয়া জুড়াইয়া-হিম খাবার খাইতে বসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও সিপাহীদিগকে ঠাট্টা করিতে করিতে কলোঁবা বেশ

জোর ক্ষুধার পরিচয় দিতে লাগিল। কর্ণেলও একটি কথাও না বলিয়া একদৃষ্টে কন্যার দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বেশ ভালো রকমই আহার করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার কন্যা তাহার থালা হইতে একবারও চোখ তুলিতেছিল না। অবশেষে কর্ণেল গম্ভীর অথচ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ইংরেজি ভাষায় বলিলেন—লিডিয়া, তুমি তা হলে দেলা রেবিয়ার সঙ্গে বাগ্‌দান করেছ ?

লিডিয়া লজ্জায় লাল হইয়াও দৃঢ় স্বরেই বলিল—হাঁ বাবা, আজকে।

তারপর সে ধীরে ধীরে তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ-ভয়-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া পিতার দিকে চাহিল এবং যখন দেখিল যে তাঁহার মুখভাবে বিরক্তির লেশমাত্র নাই, তখন সে পিতার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আদরিণী সোহাগিনী কন্যার মতো তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কর্ণেল বলিলেন—বেশ করেছ মা, সে বড় ভালো ছেলে। কিন্তু ভগবান সাক্ষী তোমাদের এই সর্ব্বনেশে দেশে আর থাকতে দেবো না ; যদি রাজি না হও তবে আমিও রাজি হব না জেনে রেখ।

কলোঁবা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত তাহাদের রকম দেখিয়া দেখিয়া বলিল—আমি ত ইংরেজি জানি নে ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন আপনারা যা বলছেন তা আমি কতকটা আন্দাজ করতে পারছি।

কর্ণেল উত্তর করিলেন—আমরা বলছিলাম কি, তোমাকে একবার আমাদের দেশে আয়ারলণ্ডে বেড়াতে নিয়ে যাব

কলোঁবা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—সত্যি ! নিশ্চয় যাব, আমি যে লিডিয়ার কলোঁবা ঠাকুরঝি হব ! কর্ণেল সাহেব, ঠিক কি না ? তবে আমার বৌদিদির হাতে ধরে সম্পর্ক পাতিয়ে নি !

কর্ণেল বলিলেন—চুম্বন আলিঙ্গন দিয়ে বরণ করাই রীতি ! (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ভিদের অনুভব শক্তি

উদ্ভিদগণের যে প্রাণ আছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তবে ইহাদের যে আমাদের মত অনুভবশক্তি আছে এবং ইহারা যে ক্ষেত্র বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকে সে কথা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ব্যতীত অতি অল্পলোকেই জানেন। জীবনধারণ করিবার জন্য, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার জন্য, আত্মরক্ষা করিবার জন্য, বংশরক্ষার জন্য ইহারাও যে প্রাণীদিগের ন্যায় কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা আলোচনা করিলে বাস্তবিকই মোহিত হইতে হয়। এইরূপ কৌশল অবলম্বন যে জীবদিগের একচেটিয়া নহে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব থাকে না।

জীবের যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বলিয়া পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে উদ্ভিদের ঠিক সেইরূপ কিছু আছে কিনা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্ভিদ-শরীরের কোন কোন অংশের তুলনা করিতে পারি। কিন্তু জীবে যেমন ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত, উদ্ভিদে সেরূপ কিছুই নাই। কার্য্য দেখিয়া একএকটি উদ্ভিদ-শরীরাংশকে ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে মাত্র। জীবের পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সকল তথ্য মস্তিষ্কে নীত হইতেছে এবং তথা হইতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়া জীবকে ঠিক পথে চালিত করিবার উপায় আছে, উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে আমরা ঠিক অবগত নহি। তবে উদ্ভিদের অনুভব-শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

উদ্ভিদের অনুভবশক্তি (Sensitiveness) সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডারউইন প্রথমে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করেন। সান-ডিউ (Sundew) নামক কীটাশী (Insectivorous) বৃক্ষই প্রথমে এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিলেন যে উক্ত বৃক্ষের পাতায় কতগুলি গ্রন্থিযুক্ত শুঁয়া (Glandular hair) আছে। মক্ষিকা বা অন্য কোনও কীট আসিয়া পাতার উপর বসিলে এই শুঁয়াগুলি উত্তেজিত হয় ; তাহার ফলে

গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইতে থাকে, পাতাটি ক্রমে একটি পাত্রের আকার ধারণ করে এবং এই গ্রন্থিগুলি হইতে পাচক রসের ন্যায় একপ্রকার আঠাল রস নিঃসৃত হইয়া দুর্ভাগ্য জীবের ইহলীলা শেষ করিয়া দেয়

এই ব্যাপার দেখিয়া ডারউইন উদ্ভিদের অনুভবশক্তি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি আরও দেখান যে এই শুঁয়াগুলিকে অনৈসর্গিক উপায়ে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, তাহাতে কিন্তু পাচকরস নিঃসৃত হয় না।

ডারউইন এই তথ্য প্রচার করিলে (Wiesner) উইজনার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারে কিনা তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিলেন যে উদ্ভিদের সমস্ত অংশ সমভাবে অনুভব করিতে পারে না।

(১) প্রথমে তাঁহারা (Passiflora) পাসীফ্লোরা নামক উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই লতার শুণ্ডের (Tendril) উপর $\frac{1}{৫০}$ গ্রেন পরিমিত সূতার টুকরা চাপাইলে সমস্ত লতাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত লতার অন্য কোন স্থান এইরূপ অল্প উত্তেজনায় এত অধিক উত্তেজিত হয় না।

(২) (Dionea) ডায়োনিয়া-পত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক শুঁয়া (Sensitive hair) অতি অল্প উত্তেজনায় সমস্ত পত্রটিকে স্পন্দিত করিতে থাকে।

(৩) বিছুটীর (Deadnettle) পত্রের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই উহার উপরে যে বালুকাত্মক (Silicous) পদার্থ থাকে তাহা খসিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ কাঁটাটি আক্রমণকারীর শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয়।

(৪) দুপাটীর বীজাধারের বা ফলের উপর অতি সামান্য আঘাত লাগিলেই বীজাধারটি ফাটিয়া এমন হঠাৎ গুটাইয়া যায় যে বীজগুলি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

(৫) Venus's Flytrap, Sundew প্রভৃতি কীটাশী বৃক্ষ ও লতার শুঁয়াগুলি অতি অল্পেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ কতকগুলি পরীক্ষার পর ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি সকল স্থানে সমভাবে নাই। জীবশরীরে যেমন স্পর্শানুভূতিস্থান, শৈত্যানুভূতিস্থান (Touchspots, coldspots) প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, উদ্ভিদ-শরীরেও ঠিক সেইরূপ কতকগুলি অনুভবকেন্দ্র (Sensory areas) আছে। সেই স্থানগুলি অতি অল্প উত্তেজনায় স্পন্দিত হইতে থাকে, অন্য স্থানে সেরূপ উত্তেজনায় কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

যখন প্রমাণিত হইল যে উদ্ভিদের সকল স্থান সমভাবে অনুভব করিতে পারে না, তখন কোন্ কোন্ অংশ অনুভব করিতে পারে তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল। ডারউইন প্রথমে এই পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে নবজাত উদ্ভিদের শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগের বা ডগের (tip) অনুভবশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি এইকথা প্রচার করিলে (Cisielski) সিজিল্স্কী কতকগুলি উদ্ভিদের সূক্ষ্মাগ্রভাগ (tip) কাটিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপ বহু পরীক্ষার পর নির্দ্ধারণ করিলেন যে যতদিন এইগুলি আঘাতমুক্ত না হয় অর্থাৎ সুস্থ না হইয়া উঠে ততদিন ইহাদের অনুভবশক্তি থাকে না। সম্প্রতি (Pfeffer) পেফারও নানা প্রকার পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বাহ্যতঃ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহাদের যে অনুভব করিবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আর নাই। ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রগুলিকে আমরা "অনুভব-কেন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করিব।

জীবজগতের স্নায়বিক স্পন্দনের বিশেষত্ব এই যে উত্তেজনা ও স্পন্দনের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। একটি স্নায়ুকে যখনই একভাবে উত্তেজিত করা যাইবে তখনই সে একইপ্রকারে স্পন্দিত হইবে। তাড়িৎ বা অন্য কোন প্রকার উত্তেজকের সাহায্যে একটি স্নায়ু উত্তেজিত হইলে তাহা চিরকালই একই প্রকারে স্পন্দিত হয়। উদ্ভিদজগতেও আমরা সেই সম্বন্ধ দেখিতে পাই। অনুভবকেন্দ্রগুলি বিভিন্নপ্রকারে উত্তেজিত হইলে বিভিন্ন প্রকারে

স্পন্দিত হইতে থাকে। কোনবার আমরা একরূপ ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) পাইয়া থাকি; কোনবার অন্যরূপ অভাবাত্মক সাড়া (Negative curve) পাইয়া থাকি। তবে যে প্রকারে উত্তেজিত হইলে ভাবাত্মক (Positive curve) পাই, সেই প্রকারে যখনই পরীক্ষা করি-না চিরকালই সেইরূপই ভাবাত্মক সাড়া পাইব। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, অন্য অন্য সমস্ত সর্ত্ত পরীক্ষাকালে ঠিক থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে অবশ্য অন্য প্রকার ঘটিতে পারে।

এক্ষণে আমরা এক সময়ে যদি দুইটি ঠিক বিপরীত ভাবের উত্তেজক দিয়া পরীক্ষা করি তাহা হইলে কি ফল হইবে? বিপরীতভাবের উত্তেজক অর্থে একটিতে ভাবাত্মক সাড়া (Positive curve) এবং অপরটিতে (Negative curve) অভাবাত্মক সাড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন উত্তেজকের কথা বলা যাইতেছে। যদি দুইটি উত্তেজকের শক্তি তুল্য হয় তাহা হইলে আমরা কোন প্রকার স্পন্দনের লক্ষণ দেখিতে পাইব না। বাস্তবিক অতিসূক্ষ্ম তাড়িৎমান যন্ত্রের (delicate galvanometer) সাহায্যেও এই স্পন্দনের কোন লক্ষণই ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি দুইটি উত্তেজক তুল্য না হয় অর্থাৎ একটি অপরটির অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে যেটি প্রবল হইবে সেটির অনুসারেই বৃক্ষটি স্পন্দিত হইবে।

উপরে যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা গেল উহা সাধারণ লোকের দ্বারা সাধিত হওয়া দুষ্কর। উত্তেজনা অনুসারেই যে স্পন্দন ঘটিয়া থাকে তাহার গুটিকতক সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাউক। এইগুলি সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

(১) শিকড় মাটির নিম্নে নামিতে নামিতে যখন কোন বাধা পায় তখন যাহাতে সহজে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে এমনিভাবে বাঁকিতে আরম্ভ করে।

(২) আবার যদি কখন এমন কোন স্থানের উপর আসিয়া পড়ে যাহা আর ভেদ করিয়া যাইবার উপায় থাকে না তখন ইহা সেই বাধাপ্রাপ্ত জমির উপর দিয়া সমান্তর (parallel) ভাবে চলিতে থাকে। পরীক্ষা করিবার জন্য ফুলের টবের মধ্যে একটা কাচের টুকরা রাখিয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া দিয়া একটি গাছ পুঁতিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মাখমসীমের ও তেঁতুলের বীজ হইতে অতি শীঘ্র গাছ হয় এবং শিকড়ও দ্রুতভাবে মাটির নিম্নে নামিতে থাকে। ছোলা সরিষা প্রভৃতির দ্বারাও এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(৩) উদ্ভিদের জল-শোষণকারী শক্তির (hydrotropism) কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাটি হইতে রস পাইবার জন্য উদ্ভিদের শিকড় চিরকালই মাটির নীচে গিয়া থাকে।

(৪) যে দিকে আলোক পায় সেই দিকেই গাছ বাঁকিতে থাকে, ইহা হইতেও উত্তেজনা ও স্পন্দনের নিয়ম অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। একটি মাখমসীম বা কুমড়ার বীজ একটি টবে পুঁতিয়া একটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলে এবং সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র একটি আলোকপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত রাখিলে দেখা যাইবে যে গাছটি জন্মাইয়া এই আলোকপ্রবেশের পথের দিকে আসিতেছে। কিছুদিন পরে এই পথটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই পথের বিপরীত দিকে অপর একটি পথ করিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গাছটি আবার সেইধারে বাঁকিয়া চলিয়াছে। সীম, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গাছে এই পরীক্ষা করা সুবিধা, কেননা ইহারা অতি শীঘ্র বাড়িতে থাকে। সমস্ত গাছেই এইরূপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, তবে উহা সময়-সাপেক্ষ।

এতক্ষণ উদ্ভিদের কার্য্যকরী ও অনুভব-শক্তির কথা বলা হইল। সকল ক্ষেত্রেই কার্য্যের পর অবসাদ লক্ষিত হয়। কোন মাংসপেশীকে আমরা যদি ক্রমাগতই তাড়িৎ দিয়া (electrically) উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে ইহা আর স্পন্দিত হয় না। তখন ইহার বিশ্রাম আবশ্যক। কিছুক্ষণ ইহাকে উত্তেজিত না করিলে ইহার স্পন্দনশক্তি ফিরিয়া আসে। জীবজগতের ন্যায় উদ্ভিদজগতেও "অবসাদ" (fatigue) লক্ষ্য করা যাইতে পারে

ডাইয়োনিয়ার সূক্ষ্ম কৈশিক গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করিলে সমস্ত পত্রটি মুড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু

যদি কোন কৌশলে আমরা পত্রটিকে মুড়িতে না দিয়া একটি গ্রন্থিকে বারবার উত্তেজিত করি তবে কিছুক্ষণ পরে এই গ্রন্থির অনুভবশক্তি লোপ পায়, তখন পাতাটি ছাড়িয়া দিলেও আর মুড়ে না। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের Response in Living and Nonliving নামক পুস্তকে এইরূপ অনেকগুলি পরীক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

ক্লোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি বিষাক্ত অসাড়-করিবার-শক্তিসম্পন্ন বাষ্পগুলি যেমন জীবজগতে স্নায়ুমণ্ডলীর উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া অবসাদ ও অসাড়ভাব আনয়ন করে, উদ্ভিদজগতেও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। আচার্য্য বসু গাজর, মূলা, ফুলকপির ডাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। এই-সমস্ত উদ্ভিদের অবসাদ সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু ক্লোরোফরম বা ঈথারের বাষ্প লাগিবামাত্র ইহাদের অনুভবশক্তির হ্রাস হয়। তখন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও ইহারা স্পন্দিত হয় না। তবে এই বাষ্পের প্রভাব হইতে সরাইয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরেই ইহাদের এই অবসাদ দূর হয় এবং পুনরায় যথানিয়মে স্পন্দিত হইতে থাকে।

জীবজগতে যেমন (narcotic) অবসাদক বিষের সাহায্যে একেবারে স্পন্দন লোপ করা যাইতে পারে উদ্ভিদজগতেও তাহাই হয়।

স্নায়ুমণ্ডলীকে আমরা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। কতকগুলির সাহায্যে বহির্জগতের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত অনুভূত হয়। অপরগুলির দ্বারা স্পন্দন-কার্য্য সমাধা হয়। তৃতীয়টির কার্য্য এই যে বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাত বুঝিয়া কিরূপ স্পন্দিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহারই নির্দ্ধারণ করা। মোটের উপর এই তিনটিকে অন্তর্মুখ প্রবাহ, বহির্মুখ প্রবাহ, ও মস্তিষ্ক বলিতে পারি।

স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। সাধারণের বোধগম্য একটি উদাহরণ লইয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝিলে ইহা অতি সহজেই বুঝা যাইবে।

মনে করুন রাজ্যের কোন একস্থানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে পারেন না, তাঁহাদের রাজ্যেই থাকিতে হয়, কিন্তু সমস্ত রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধের সমস্ত সংবাদাদি জ্ঞাত হওয়া চাই। একারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দিবারাত্রিই তাড়িৎবার্ত্তার সাহায্যে যুদ্ধের সকল সংবাদই মন্ত্রীগণের নিকট পৌঁছিতেছে। তাঁহারা পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া সেক্ষেত্রে কি করা আবশ্যক তাহার উপদেশ দিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ পাঠাইতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রেরিত তাড়িৎ-বার্ত্তা যেমন মন্ত্রীগণকে যুদ্ধের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত করায়, অন্তর্মুখ স্নায়বিক প্রবাহও তেমনি বহির্জগতের সকল তথ্যই মস্তিষ্ককে জ্ঞাত করায়। মন্ত্রীগণের পরামর্শানুযায়ী যেমন যুদ্ধ চলিতে থাকে তেমনি মস্তিষ্কের (nerve cell) স্নায়ুকোষের নির্দ্দেশানুযায়ী স্পন্দনকার্য্য ঘটিয়া থাকে।

জীবজগতের উচ্চস্তরে এই তিনটি বিশদ বিভাগ স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া থাকি, কিন্তু উদ্ভিদজগতে ঠিক এইরূপ তিন প্রকার স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীবে ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মোটামুটি-ভাবে অনুভবকেন্দ্রগুলির (Sensory areas) তুলনা করিতে পারি। জীবজগতের উচ্চস্তরে চক্ষুর আলোক অনুভব করিবার শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু যতই নিম্নস্তরে নামিতে থাকি ততই দৃষ্টির প্রাখর্য্য কমিতে থাকে, ক্রমে এমন ক্ষীণ হয় যে নিম্নস্তরের অনেক জীবকে কেবল আলোক অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হয়। উদ্ভিদজগতে চারা গাছগুলিরও আলোক অনুভব করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। জীবগণ যেমন ত্বকের দ্বারা স্পর্শন অনুভব করিয়া থাকে, উদ্ভিদগণ সেইরূপ লতাতন্তু (tendril) ও শিকড়ের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ (root-tip) দ্বারা অনুভব করিয়া থাকে; কাজেই ত্বকের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। জীবের ভারবোধশক্তির সহিত উদ্ভিদের ভূকেন্দ্রাভিমুখে (force of gravity) গমনের তুলনা করা যাইতে পারে। ক্লোরোফরম, ঈথার প্রভৃতি নানাপ্রকার উত্তেজক নানা প্রকার স্পন্দন দেখাইয়া থাকে; তাহা হইতে ইহাদের স্বাদগ্রহণের ও ঘ্রাণের শক্তির পরিচয় পাই।

মোটের উপর উদ্ভিদ ও জীবজগতে স্নায়বিক প্রবাহের

যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহার স্থূল কারণ এই যে উদ্ভিদগণ অজড়জগতের নিম্নস্তরে অবস্থিত। আমরা যতই উচ্চস্তরে উঠিতে থাকি স্নায়বিক স্পন্দনের ক্রমবিকাশ ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের যেরূপ অনুভবশক্তি আছে তাহা জীবজগতেও দুষ্প্রাপ্য। পাসীফ্লোরা (Passiflora) এত অল্প আঘাতে স্পন্দিত হয় যে জীবের সর্ব্বাপেক্ষা স্পর্শানুভবক্ষম ইন্দ্রিয় জিহ্বাও তাহা অনুভব করিতে অক্ষম। আমাদের চক্ষু যে-সমস্ত সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি অনুভব করিতে পারে না (Phalaris) ফালারিসের ক্ষুদ্র চারাগুলি তাহাও অতি সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উদ্ভিদের অনুভবশক্তি অনেকস্থলে অধিক হইলেও জীবের তুলনায় তাহাদের স্পন্দনশক্তি অতি অল্প। উদ্ভিদের স্পন্দিত হইতে অনেক সময় লাগে এবং একবার স্পন্দন আরম্ভ হইলে উত্তেজনার অভাবেও অনেকক্ষণ স্পন্দিত হইতে থাকে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাশী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মোগল-সম্রাট্ প্রায়ই অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেন। এমন কি স্বয়ং আকবরও অন্তঃপুরে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহার দরুণ তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হয়।

আইন্-ই-আক্‌বরিতে আমরা দেখিতে পাই :—

"সম্রাট্-বাহাদুর সকল বিষয়েই সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য ভালবাসেন...বেগমদিগের সংখ্যাধিক্য বড় বড় রাজনীতিকদিগকেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলে; কিন্তু এইরূপ সমস্যাস্থলে, সম্রাট-বাহাদুর তাঁহার বিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্যই যেন একটা নূতন উপলক্ষ্য প্রাপ্ত হন। তিনি একটা বৃহৎ ঘেরের মধ্যে পাঁচটি ইমারৎ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পাঁচ হাজার রমণী থাকা সত্ত্বেও সেই অন্তঃপুরে তিনি বেশ শান্তিতে অবস্থান করেন; প্রত্যেক বেগমের জন্য তিনি একএকটি মহল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই-সকল রমণীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাহারা আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে তৎপ্রতি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি আছে। কতকগুলি অনিন্দ্য নির্ম্মল-চরিত্র রমণী বিভিন্ন বিভাগের পরিদর্শকরূপে নিয়োজিত হয়, এবং তন্মধ্যে একজন মুন্সির কাজ করে।...তাহাদের বেতন বেশ উচ্চ-হারের। সম্রাট-বাহাদুর মুক্তহস্তে তাহাদিগকে যে বক্‌শিস্ দিয়া থাকেন—তা ছাড়া উচ্চপদস্থ রমণীরা ১০২৮ টাকা হইতে ১৬১০ টাকা পর্য্যন্ত এবং পরিচারিকারা ২০ টাকা হইতে ৫১ টাকা অথবা ২ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। অন্তঃপুরের জন্য একজন নিপুণ ও উৎসাহী হিসাব-নবিস্ নিযুক্ত আছে। সেই ব্যক্তি অন্তঃপুরের সমস্ত খরচপত্র পরিদর্শন করে, বাক্‌স-গত তহবিলের হিসাব ও ভাণ্ডারের দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবও রাখে। স্বীয় বেতনের মোট অঙ্ক ছাড়াইয়া না যায় এরূপ মূল্যের কোন জিনিস যদি কোন রমণী ক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে সে অন্তঃপুরের একজন স্ত্রী-তহসিলদারকে জানায়। তহসিলদার একটা রোকা লিখিয়া অন্তঃপুরের হিসাব-নবিসের নিকট পাঠাইয়া দেয়; হিসাব-নবিস তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, খাজাঞ্চি সেই পত্রলিখিত টাকা দাখিল করে। কারণ, এইরূপ খরচের টাকা চেকের দ্বারা দাখিল হয় না। অন্তঃপুরের অভ্যন্তর প্রদেশ, সংযতচিত্ত ও উদ্যমশীলা রমণীদিগের দ্বারা রক্ষিত হয়। যে-সকল রমণী সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ত তাহারাই সম্রাটের মহলে পাহারা দেয়। প্রাচীর-ঘেরের বাহিরে খোজারা থাকে। আরও দূরে, বিশ্বাসী রাজপুতগণ; সর্ব্বশেষে, দ্বারদেশের রক্ষিগণ। তা ছাড়া, ইমারতের চারি মুখভাগের উপর আমীরেরা, "অহদি"রা ও অন্য সৈনিকেরা পাহারা দেয়" (১)।

অন্তঃপুরের এইরূপ জীবনযাত্রা-প্রণালী একঘেয়ে হইবারই কথা। তাই, সম্রাট্ অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য চিত্তবিনোদনের কতকগুলি উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। উহারা সাক্ষাৎকারীদিগকে অন্তঃপুরে গ্রহণ করিত, কখন কখন উহারা অন্যগৃহে সাক্ষাৎ করিতেও যাইতে পারিত। আক্‌বর সাময়িক বাজারের প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন; শাহজাদীরা দ্রব্য বিক্রয় করিত; আমীরদিগের পত্নী ও কন্যারা উহা ক্রয় করিত। সম্রাট্ এই-সকল উৎসবে উপস্থিত হইতেন; খুব ছোটখাট জিনিসও ক্রয় করিবার সময় তিনি রূঢ়ভাবে উহার দর-কসাকসি করিতেন। বিক্রেত্রীগণ সম্রাটের সহিত রসিকতা করিয়া, ঠাট্টা করিয়া, এমন কি সম্রাটকে গালি পর্য্যন্ত দিয়া বেশ লাগ্‌সই জবাব উত্তর প্রত্যুত্তর করিত।' সম্রাট প্রথমে রুষ্ট হইতেন, পরে অধিক পরিমাণে ক্রীত পণ্যের মূল্য প্রদান করিতেন; তখন হাস্যের রোল উঠিত ও বিবাদ মিটিয়া যাইত।

সমস্ত প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ন্যায়, ভারতবর্ষেও, রাজ-অন্তঃপুরই জটিল ষড়যন্ত্রজালের লীলাভূমি ছিল। অন্তঃপুরের

(১) আইন-ই-আকবরী।

সংবাদ জানিবার জন্য, আমীরেরা, রাজারা, ভাগ্যান্বেষীরা, সেই সব সাময়িক বাজারে স্বকীয় কন্যাদিগকে প্রেরণ করিত। সম্রাট তাহাদের রূপে মুগ্ধ হইবেন, তাহাদের বাক্-চাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন, এইরূপ আশা তাহারা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিত। সম্রাটের একজন সামান্য উপপত্নীরও এইরূপ বাসনা হইত যে, তাহার গর্ভে সম্রাটের একটি পুত্র জন্মে। কেননা, মুসলমান-আইন, উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান ও ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। একজন বাঁদীর গর্ভজাত পুত্রও সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে। তাই অন্তঃসত্বা বেগমদিগের মধ্যে কতই ঈর্ষ্যা, কতই কলহ!

সকল সম্রাটই স্বকীয় পত্নীর বশীভূত ছিলেন। আক্বরের হিন্দু পত্নীগণ, আক্বরকে মুসলমান-ধর্ম্ম হইতে বিমুখ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর একজন পারস্যদেশীয় রমণীর হস্তে—সম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের হস্তে, রাজ্যশাসনের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শা-জাহান প্রথমে তাজ-মহলকে ভাল বাসিয়াছিলেন (২)—তাহারই নিকটে স্বকীয় দুহিতা বেগম-সাহেবের সমাধি স্থাপন করেন। তাজমহল ও বেগম-সাহেব—উভয়ই সম্রাটের সর্ব্বপ্রকার বদ্-খেয়াল চরিতার্থ করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেন, আরংজেবও রোশোনারাবেগমের বশীভূত ছিলেন। শিবজির প্রতি তাঁহার বেগমদিগের বিদ্বেষ থাকায়, ঐ প্রসিদ্ধ মরাট্টা সর্দ্দার তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

***

অতএব, অনিয়ন্ত্রিত রাজাদিগের ও এসিয়িক রাজ্যতন্ত্রের যত কিছু দোষ সমস্তই মোগলদিগের আমলে পরিলক্ষিত হয়। তবে,—এই সময়কার ভারতে অন্যপ্রকার শাসনতন্ত্র স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল। যতদিন তৈমুর লংএর বংশধরেরা স্বকীয় বংশগতগুণ আপনাদের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিল, ততদিন উহারা সকলের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। যখন ভোগসুখ, আব্-হাওয়া, এবং হিন্দুদিগের সহিত বিবাহ-বন্ধন উহাদিগকে হীনবীর্য্য করিয়া তুলিল, তখনই উহারা ভাগ্যান্বেষীদিগের ক্রীড়নক হইয়া পড়িল এবং মোগলসাম্রাজ্যের কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) এই বাদ্শাজাদীর নাম (১৫৯২-১৬৩১) অর্জুমন্দ-বনো-বেগম। বেগমের পিতা উজীর আসফ-খান্—সাম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের ভ্রাতা,—ইনি ইঁহার জামাতা শা-জাহানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। বেগম- (প্রাসাদের বরেণ্যা), "মমতাজ মহল"—এই উপাধি প্রাপ্ত হন। লোকেরা এই নামের অপভ্রংশ করিয়া তাজমহল বলিত—পরে সাম্রাজ্ঞীর সমাধি-মন্দির এই নামে অভিহিত হয়।

বর্ণাশ্রম

আজকাল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য চারিদিকে একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। এ আর কিছুই নয়, ইহা বর্ণাশ্রমের "বল হরি হরিবোল।" শবের চারিদিকে যেমন ক্রন্দনের রোল উঠে, বর্ণাশ্রমের চারিধারেও তেমনই রোল উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ শ্রীমতী বেশান্ত তাঁহার বোল ফিরাইয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"Now in 1913, it is time to say, that while the caste system has a glorious past, its work is over, and it must pass away. The new form of the Indian Nation is ready to be born; the hour of travail is upon us. Let the old form, which is dead, the corpse from which the spirit of Dharma has departed, be carried to the ghat and burnt." (The Indian Review—October, 1913). জাতিভেদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, ইহাকে এখন শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত কর। নবজীবন প্রসবের অপেক্ষা করিতেছে।

এ কথা তো বহুপূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতকাল শ্রীমতী বেশান্ত সে কথাটা স্বীকার করেন নাই, তাই অন্ধের ন্যায় নবালোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জোরে পুরাতনকেই খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃতদেহ সাজাইয়া গুছাইয়া ঘরে রাখিয়া দিলে তাহাতে যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হয় সে কথা এতদিন না বুঝিলেও তিনি আজ সে কথা স্বীকার করিতে

বাধ্য হইতেছেন। যদি কেহ এই নবজীবনের প্রসব-বেদনার কালকে সুদীর্ঘতর করিয়া থাকেন--যদি সে জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে-- তবে তিনি শ্রীমতী বেশান্ত। তিনি নবালোক লইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের হাটে তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

কৃষ্ণমূর্ত্তি মোকর্দ্দমায় মিসেস্ বেশান্ত আপনার হারান আমিকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন। তাই, জাতিভেদের শবের জন্য যাহা সুষ্ঠু ব্যবস্থা তাহা আজ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। অন্যদিকে আবার দেখি, একদল লোক রাজা রামমোহন রায়কে বর্ণাশ্রমী হিন্দু বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে বর্ণাশ্রমের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে মিসেস্ বেশান্ত তাহার শব এতকাল লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ জাঁকজমকের সঙ্গে তাহা শ্মশান-ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। এই যে সোরগোল ইহার মধ্যে নবজীবনের প্রসববেদনার ক্রন্দনরোল ও মৃতের জন্য "হরিবোল" উভয়ই মিশিয়া গিয়াছে। যিনি বর্ণাশ্রমের ধারও ধারেন না, বরং আচার-ব্যবহারে স্বতঃপরতঃ উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছেন, তিনিও বর্ণাশ্রমের নাম করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। ইহা স্বাভাবিক। অতি বড় শত্রুর শব দর্শনেও মানুষ অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারে না। তাহাতে আবার মিসেস্ বেশান্ত শবদাহের যাহাতে অঙ্গহানি না হয় তাহার উপদেশ দিয়াছেন—শবদাহ করিতে হইবে "with the reverence and tenderness due to the services rendered in the past."

বর্ণাশ্রম একবস্তু নহে, দুই তত্ত্বের সংমিশ্রণ, বর্ণ ও আশ্রম। তবে বর্ণও চারিটি, আশ্রমও চারিটি।

বর্ণ বিভাগ করিবার সময় শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যে, পঞ্চমের স্থান নাই—"নাস্তি পঞ্চমঃ।" কিন্তু পাঁচ কেন, আজ আমরা শত সহস্র দেখিতেছি,—কানে শুনিতেছি, চোখে দেখিতেছি না; কেননা, অন্ধকারে সব বর্ণ এক হইয়া গিয়াছে,—ঘোর কলির অন্ধকার তবুও তাহা বর্ণ। তাঁহারা "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"ই বর্ণমালা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যদিও তাহার সব পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া কেবলমাত্র বিবাহের মেলবন্ধনে আনিয়া ফেলিয়াছি, তবুও শাস্ত্রকারদিগের মহিমাকীর্ত্তনে আমাদিগকে কে কবে পশ্চাৎপদ দেখিয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু কেন হইয়াছিলেন ? ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইত না বলিয়া। সত্যকাম গৌতমের নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিলে গুরু তাহার পিতার নাম জানিতে চাহিলেন। মাতা জবালার নিকট হইতে জানিয়া আসিয়া সত্যকাম গৌতমকে বলিলেন যে এতকাল পরে পিতার ঠিকানা হওয়া দুঃসাধ্য। গুরু ধীরভাবে বলিলেন, "নৈতদ ব্রাহ্মণঃ বিবক্তু মর্হতি" (ছান্দোগ্য)। "ন সত্যাদসাঃ"—তুমি যখন সত্য হইতে বিচলিত হও নাই, তখন তুমি ব্রাহ্মণ। সেই দিন হইতে মাতার নাম লইয়া জাবালি যে ব্রাহ্মণ-গোত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণের নহে, কিন্তু সত্যবাদীর ব্রাহ্মণত্বলাভের গোত্র। এ বর্ণ আর সে বর্ণ কি এক ? যদি শ্বেত ও কৃষ্ণ এক হয়, তবে এক। যখন গৌতমবংশজ আরুণি সমিৎহস্তে ব্রহ্মদীক্ষার জন্য চিত্ররাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, "ব্রহ্মার্ঘোঽসি গৌতম যো ন মানমুপাগাঃ" (কৌষিতকী) তুমি যখন অহঙ্কার করিলে না তখন তোমাকে ব্রাহ্মণের সম্মানই দিতেছি। স্থানান্তরে বলিয়াছিলাম যে "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যায়। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা আমার গায়ের জোরের কথা নয়। উপনিষদ্ সেই কথা সমর্থন করিতেছেন—তুমি ব্রাহ্মণত্বের অভিমান করিলে না তাই তুমি ব্রাহ্মণ। বর্ণব্রাহ্মণ এই দোষে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তাই তো চেনা যায় না। আর এখন কোন বর্ণ তো নাই, সব শূদ্র (বঙ্গদেশের কথাই হইতেছে)।

আশ্রমের অবস্থাও বড় আশাজনক নহে। চতুরাশ্রমের তিন আশ্রম তো বহুদিনই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। আছেন যিনি তিনিও কেরাণীগিরি আশ্রয় করিয়া দাসাশ্রমে পরিণত হইয়াছেন। এই আশ্রমে মুখুটি গাঙ্গুটি আর দাস-মণ্ডল সব এক পদবী লাভ করিয়াছেন। আশ্রমের কথা ভাবিলে বেশ বুঝা যায় যে আমাদের চারি আশ্রম ও

চারি বর্ণ মিলিয়া এক বিরাট্ একত্বে পরিণত হইয়াছে—সে একত্বের নামকরণ করাও দুঃসাধ্য নহে—তাহাকে দাসত্বও বলা যায়, শূদ্রত্বও বলা যায়, আবার কেরাণী-গিরিও বলা চলে। আমরা বর্ণাশ্রম বলিতে কেন যে এক অদ্বৈত অখণ্ড বস্তু বুঝি তাহার স্পষ্টপ্রমাণ এইখানে রহিয়াছে! আমরণ অর্থ উপার্জ্জন কর আর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। ইহাই বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এখানে যে বর্ণ ও যে আশ্রম পাইতেছি তাহারা উভয়ে একার্থবোধক।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নামে হৈ চৈ করিতেছেন, তাঁহারা একটা প্রহসনের অভিনয় করিতেছেন মাত্র। বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই, অথচ এই দুইএর রাসায়নিক সংযোগে ইহাঁরা কি বস্তুর আবির্ভাব কল্পনা করিতেছেন যাহার রক্ষার জন্য এই বিপুল আয়োজন? উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্যম প্রশংসনীয় এবং চেষ্টা সাধু। নলচে ও খোল্ বদ্‌লাইয়া এই বর্ণাশ্রমরূপ হুঁকোটিকে টিঁকাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা তাহা বেদে ও পুরাণে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। একদিন একজন লোক কেন যেন হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বেলা দুটোই হৌক আর তিনটাই হৌক প্রাতঃস্নান করিতেই হইবে। তাহার পাশে যে বসিয়াছিল, সে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, তা ভাই, ঠিকই, অভ্যাস হয়ে গেলে না করে পারা যায় না। আমার কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে রোজ স্নান করে সন্দেশ দিয়ে জল না খেলে চলে না। তা থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই। না থাকলেও কি করিয়া খাওয়া চলে, এবিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ (সন্দেহ প্রকাশ চলে না—এ যেখানকার কথা সেখানে সন্দেহের স্থান নাই) করিলে সে বলিল,—তা, ভাই, কি করি, অভ্যাসদোষ ছাড়াতে পারি না। সেইরূপ শেষকালে বর্ণাশ্রম রক্ষাটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমালোচনা

কালিদাস*

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যারোপ ও অপবাদ আজকাল প্রত্নতত্ত্বের উপর এতদূর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ইহাতে সাধারণের স্থির থাকা শক্ত। অনেক স্থলে 'নূতন কিছু করিতে হইবে' এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কোন-কোন লেখক শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, এবং বস্তুত যাহা যাহাতে নাই তাঁহাতে তাহা আরোপ করিয়া ফেলেন। স্থলবিশেষে এই অধ্যারোপের অপবাদ হয়, আবার অনেক স্থলে তাহা হয় না, এবং কিছুদিন অতীত হইয়া গেলেই ঐ অধ্যারোপই একটি সিদ্ধান্ত বলিয়া চলিতে থাকে। সাধারণ পাঠক তখন এই তথা-কথিত মতবাদসমূহের মধ্যে দিগ্মোহে নিপতিত হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে।

কয়েক দিন হইতে একটি 'ভেরীঝঙ্কার' শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কালিদাসের কাব্যে গুপ্তসাম্রাজ্যের কথা ও ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বিজয় বাবু কালিদাসের আবির্ভাবকাল আলোচনা করিতে গিয়া এই কথাটাই নানারকমে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (১৪পৃঃ)—"সমগ্র প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি যে, কবি কালিদাসের সাহিত্যলীলা-কাল সম্ভবতঃ ৪৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।" (এখানে সমগ্র শব্দটির প্রয়োগ অধিক হইয়াছে)। সম্ভবতঃ থাকে থাকুক, ঐ সময়ের সম্বন্ধেও আমরা কিছু বলিতেছি না; তিনি যে মেঘদূত বা রঘুবংশের বর্ণনায় গুপ্তরাজ্যের ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই আমরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রধান কথা দুইটি; প্রথম, তিনি বলেন, রঘুবংশে সমুদ্রগুপ্ত-প্রভৃতি গুপ্তরাজগণের ও তাঁহাদের রাজধানীর পুষ্পপুরের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়, মেঘদূত ও রঘুবংশে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ঘটনার নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। পুষ্পপুরের উল্লেখ আছে, সত্য, কিন্তু তাহা যে, গুপ্তরাজগণের রাজধানী রঘুবংশকার তাহা বলেন নাই। গুপ্তরাজগণের "বংশাবলী নিম্নলিখিত নামক্রমে পাওয়া যায়, যথা—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য এবং স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।" ৭ম পৃঃ। বিজয় বাবু দেখাইয়াছেন কিরূপে এই নামগুলি রঘুবংশে পাওয়া যায় (৯-১০ পৃঃ)। তিনি বলেন—"আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্" এই পদে সমুদ্রগুপ্তকে সূচনা করা হইয়াছে। "ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব" এখানে ইন্দু ও চন্দ্র একই বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত সূচিত হইতেছে। তারপর দিলীপের পুত্র রঘুর নামের পূর্ব্বে কুমার শব্দ পুনঃ পুনঃ যোজিত হওয়ায় এখানে কুমারগুপ্ত লক্ষিত হইতেছে। ইত্যাদি।

এখানে আমাদের প্রশ্ন—কালিদাস গুপ্তরাজগণকে জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা অজ্ঞানপূর্ব্বক উল্লেখ করিয়াছেন। অজ্ঞানপূর্ব্বক করিয়াছেন বলিতে পারা যায় না, তাহা হইলে ধারাবাহিক এতগুলি নাম পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব তিনি জ্ঞানপূর্ব্বকই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে বিচার করিয়া দেখা উচিত, কালিদাসের যদি সত্য-সত্যই গুপ্তরাজবংশের নাম বা কীর্ত্তিকলাপ প্রসঙ্গক্রমেও বলিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহা অনুরূপ ভাবে করিতে পারিতেন না? তাঁহার লেখনী কি এতই দুর্ব্বল ছিল? সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দভাণ্ডার কি তাঁহার নিকট বন্ধ ছিল? যে সংস্কৃতের বিচিত্র শব্দমালায় রাঘব-

* শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, ১৩১৮, ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশ ৬২ পৃঃ।

পাণ্ডবীয়-প্রভৃতির ন্যায় কাব্যে আমূলাগ্র দুইটি রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে, যে সংস্কৃতের শ্লেষের ঝঙ্কার অনির্ব্বচনীয়, কালিদাস সেই ভাষায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও কি প্রসঙ্গাগত দুই-চারিটি শ্লোকে রঘু ও গুপ্ত উভয় রাজবংশ বর্ণনা করিতে পারিতেন না? "আসমুদ্র ক্ষিতীশানাম্ আনাকরথবর্ত্মনাম্" ইহাতে সমুদ্রগুপ্তের কি বলা হইয়াছে? ধরিলাম সমুদ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্তরাজেরা "রাজাধিরাজ" (৯পৃঃ) হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমগ্র পদটির এ পক্ষে অর্থ দাঁড়ায়—সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত হইতে ভূপতিগণের। ক্ষি তী শ বলিতে রা জা ধি রা জ অর্থ ধরিতে যাইব কেন, এবং কিরূপেই বা বুঝা যাইতেছে যে, সমুদ্রগুপ্ত হইতে গুপ্তেরা রাজাধিরাজ হইয়াছেন? কালিদাস এত শব্দদরিদ্র কোন কালেই ছিলেন না যে, এই একটা অতিসহজ ভাব প্রকাশ করিবার যোগ্য শব্দ তাঁহার ছিল না। আচ্ছা, ধরাই গেল, ঐ পদের অর্থ হইল—সমুদ্রগুপ্ত হইতে যাঁহারা রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কি? কালিদাসের কি এ টুকুও ভঙ্গীতে বলিবার শক্তি ছিল না? মেঘদূতের "অদ্রেঃ শৃঙ্গং" ইত্যাদি শ্লোকে মল্লিনাথ যে দিঙ্‌নাগের কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন অসঙ্গতি নাই, সমগ্র শ্লোকটিতেই বাচ্য অর্থ ছাড়া আর একটি অর্থ ব্যক্ত হয়। বিজয় বাবু কি এখানে বলিতে পারেন, কালিদাসের এখানে "আসমুদ্রক্ষিতীশ" লিখিবার উদ্দেশ্য কি?—তিনি কেন এখানে স মু দ্র শব্দ প্রয়োগ করিলেন? কাব্যে শব্দপ্রয়োগ-সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম আছে। কাব্যে এমন শব্দ প্রয়োগ করা উচিত যাহা পরিবৃত্তিসহ নহে,—অর্থাৎ যে শব্দটির পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্টতর শব্দ দিতে পারা যায় না। যে কাব্যে এইরূপ অপরিবৃত্তিসহ পদসমূহ থাকে তাহাই উৎকৃষ্ট। কালিদাসের কাব্যে পরিবৃত্তিসহ পদ দুর্লভ। ঐ "আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্" এই পদটির পরিবর্ত্তে ঠিক ঐ ভাব অব্যাহত রাখিতে পারে, এরূপ অপর কোন উৎকৃষ্টতর পদ পাওয়া যাইবে না; যদি যায়, তবে এ স্থলে কালিদাসের অশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজয় বাবু সমাসের সরলতা উল্লেখ করিয়া ঐ স্থলে "আসমুদ্ররাজ্য" পদের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল রা জা বলিলে চলিবে না, রা জ্যে শ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেও, ইহা "আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্" এই পদের কাছেও আসিতে পারে না।

বিজয় বাবু বলেন "দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব" এই শ্লোকে ক্ষীরনিধি বা সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত হইতে ইন্দু বা চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের উৎপত্তি জানা যায়। তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটিকেই কথঞ্চিৎ সঙ্গত মনে করিতে পারা যায়; এবং অপর দৃঢ়তর প্রমাণ থাকিলে ইহাকে সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু এখানেও বিচার করিবার আছে। কালিদাসের যদি অভিপ্রায় থাকিত যে, সমুদ্রগুপ্ত হইতে চন্দ্রগুপ্ত যেমন উৎপন্ন হইয়াছিলেন, দিলীপও সেইরূপ মনুবংশে (তদীয় জনক হইতে) উৎপত্তিলাভ করিলেন, তাহা হইলে, তিনি "ইন্দুঃ ক্ষীর-নিধেরিব" এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি দিয়া লিখিতেন, "ক্ষীরনিধাবিব" এইরূপ সপ্তমী দিতেন না। তাঁহার স্পষ্টভাব হইতেছে—ক্ষীরসমুদ্রে ইন্দুর ন্যায় মনুর বিশুদ্ধ বংশে রাজেন্দু দিলীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আর কোন ভাবের ব্যঞ্জনা বা সূচনা হয় না।

বিজয় বাবুর তৃতীয় কথা হইতেছে—রঘুর নামে পুনঃ পুনঃ "কুমার" শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাঁহার এ যুক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজপুত্রকে বুঝাইতে যে-সকল শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে কু মা র শব্দটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কবিগণের নিতান্ত প্রিয়। যাহাতে রাজপুত্রের কথা থাকিতে পারে, এরূপ যে-কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিজয় বাবু অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে আলোচ্য গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, (পৃঃ ১৬-১৯), সেগুলিরও দিকে লক্ষ্য করিলে তিনি ইহা জানিতে পারিতেন। দ্রষ্টব্য—"ততঃ কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি" (৩-১৩); "তস্মিন্ কুমার পথি বীক্ষমাণাঃ" (৩-২২)। অশ্বঘোষ ১ম হইতে ৪র্থ সর্গের মধ্যে স্বকাব্যে রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে বুঝাইবার জন্য অনূ্যন ১৯ বার কু মা র শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।* বিজয় বাবু কি এখানেও কুমারগুপ্তের উল্লেখ দেখিবেন? দশকুমার-চরিতের পৃষ্ঠাগুলির দিকে একটু অবহিত দৃষ্টিপাত করিলেও তিনি এইরূপ ভূরি-ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন।†

বিজয় বাবু এই প্রসঙ্গে "কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ" (রঘু ৩-৫৫) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা-রীতির সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের শান্ত-সদয় প্রকৃতি বর্ণনার জন্য যেখানে "সনৎকুমারপ্রতিমঃ কুমারঃ" (২-২৭) ও "কুমারঃ সুকুমারচিত্তঃ" (৩-৪) বলিবেন, কালিদাস সেখানে রঘুর বীরত্ববর্ণনায় "কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ" ইহা না বলিয়া অপর শব্দ প্রয়োগ করিতেই পারেন না, তাঁহাকে "কুমার-বিক্রমঃ" বলিতেই হইবে। বীরত্ববর্ণনায় কুমার বা কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ। ঐ দশকুমারচরিতেও বিজয় বাবু দেখিয়াছেন—"সাহসোপহসিতকুমারেণ সুকুমারেণ ......কুমারনিকরেণ" (৩০-৩১ পৃঃ)। বালকের জন্মবর্ণনাতেও সংস্কৃত কবিগণ কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ করেন (বুদ্ধচরিত, ১-৯৪; রঘু-২-৭৫)। কালিদাসও এইরূপ প্রসঙ্গক্রমে ঐ দেবসেনাপতিকে কখন কুমার, কখন সেনানী, কখন বা স্কন্দ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয় বাবু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে রঘুবংশে কুমারগুপ্তের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়া বলিতেছেন (১০ পৃঃ)—"পুনশ্চ যখন অজের কথা বলা হইল তখন অনেক সময়েই স্কন্দ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দুমতীর সহিত অজের মিলনের কথায় "স্কন্দেন সাক্ষাদিব দেবসেনাম্" লিখিত হইয়াছে।" ইহা দ্বারা তিনি স্কন্দ-গুপ্তকে দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার এই নবচিন্তিত বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। উহা অনুসরণ করিয়া কেহ বলিতে পারে কুমারগুপ্তের পূর্ব্বে গুপ্তরাজবংশে আর এক জন স্কন্দগুপ্ত-নামে রাজা ছিলেন, কেননা, কালিদাস তাহার সূচনা করিয়া দিয়াছেন। যথা—"স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ" (রঘু, ২-৩৬)। আবার ঐ কবি কালিদাসেরই উক্তিতে জানা যায় গুপ্তবংশে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তও ছিলেন, কারণ "ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব" এখানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সূচিত হইয়াছেন। আবার ইহার পরেও কবি স্পষ্টত চন্দ্রশব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন—"চন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্ম্মিরিবোর্ম্মিমালী" (৫-৬১)। অতএব ইহা দ্বারা তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে!

"ইতিহাসে ঠিক স্কন্দের পরেই পুরগুপ্ত" (১২ পৃঃ)। বিজয় বাবু রঘুতে এই পুরগুপ্তকেও দেখিতে পাইয়াছেন। কোথায় কোন শ্লোকে? ষোড়শ সর্গের প্রথম শ্লোকে। যথা—

"অথেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীরা জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং সৌভ্রাত্রমেষাংহি কুলানুসারি॥"

* বুদ্ধচরিত, ১-৫৭, ৬৫, ৭০; ২-১৯, ২০, ২১; ৩-৪, ৬, ১৩, ২২, ২৫, ২৭, ৩৮, ৪৪, ৫৩, ৫৪; ৪-২৪, ২৬, ২৭, ৫৩, ১০০।

† দশকুমারচরিত (জীবানন্দ সংস্করণ), পৃঃ ১৮, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ইত্যাদি।

গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ষোড়শ সর্গের প্রথম শ্লোকেই পাই যে, যিনি রাজা হইলেন তিনি "পুরোজন্মতয়া" রাজা হইলেন। ইচ্ছা করিয়া যে কালিদাস "পুর" শব্দটি দিয়াছেন তাহাই মনে হয়, কারণ ঠিক স্কন্দের পরেই পুরগুপ্ত।" তিনি "পুরোজন্মতয়া" শব্দের অর্থ কি বুঝিয়াছেন, তিনিই জানেন। আর ঐ সমস্ত পদটির মধ্যে "পুর" শব্দ কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাও তিনি ভিন্ন কেহ জানেন না। আমরা দেখিতেছি এখানে তিনি "পুরস্" শব্দকে "পুর" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। যদি বা "পুর" শব্দই থাকিত, তাহা হইলেও, পুরগুপ্তকে আমরা কিরূপে জানিব তাহা জানি না।

গ্রন্থকারের এই প্রসঙ্গের অন্যান্য কথাগুলিও এইরূপ। মেঘদূতের কথাও অকিঞ্চিৎকর। সময়াভাব হেতু কেবলমাত্র আর একটি কথা-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। তিনি বলিতেছেন (৭ পৃঃ), রঘুবংশে তিনি দেখিতে পান যে, ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে "সমবেত রাজাদিগের মধ্যে "পুষ্পপুর"-নিবাসী মগধেশ্বরই ভারতবর্ষে রাজাধিরাজ ছিলেন।" এ বর্ণনা রঘুকুলের সময়কার নহে, কবির নিজ সময়ের, এবং ইহা দ্বারা গুপ্তরাজ্যেরই কথা জানিতে পারা যায়।

ভাবে বোধ হয় "রাজাধিরাজ" শব্দে বিজয় বাবু এখানে রাজচক্রবর্ত্তী, "সম্রাট্" বুঝাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু রঘুবংশের বর্ণনায় এরূপ কিছু বুঝা যায় না। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য মগধেশ্বর-সম্বন্ধে রঘুবংশের নিম্নলিখিত কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

"ততো নৃপাণাং শ্রুতবংশবৃত্তা পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী।
প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ৬-২০

সুনন্দা প্রথমে মগধেশ্বরের নিকট কুমারী ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া বলিলেন—

"অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানাম্ অগাধসত্ত্বো মগধপ্রতিষ্ঠঃ।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ পরন্তপো নাম যথার্থনামা ॥" ৬-২১

কালিদাস বলিতেছেন তাঁহার মগধেশ্বরের নাম পরন্তপ। গুপ্তরাজবংশে এই নামে কেহ ছিলেন কি? মগধেশ্বর যে রাজাধিরাজ ছিলেন, * ইহা সমর্থনের জন্য বিজয় বাবু এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"

"কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ।" ৬-২২।

"সুরাজ্ঞি দেশে রাজন্বান্ স্যাৎ ততোঽন্যত্র রাজবান্" ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে আমরা ত এই শ্লোক হইতে এইমাত্র বুঝিতেছি যে, তাৎকালিক অন্যান্য রাজাদের মধ্যে মগধেশ্বর ভাল ছিলেন। "রাজন্বতীম্ শোভনরাজবতীম্"—ইতি মল্লিনাথ। তিনি যে, রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ বা রাজাধিরাজ ছিলেন, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় না। সুনন্দা ইন্দুমতীকে প্রথমে ইঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতেও তাহা বুঝা যায় না। সমবেত রাজগণকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে আসন প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও, সুনন্দা যে, ঠিক সেই ক্রমেই ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। সুনন্দা ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিতে পারিত যে, ইনি সম্রাট্, এবং আর সমস্ত রাজারা সামন্ত। কৈ, সুনন্দার মুখে ত এরূপ কিছু শুনা যায় নাই। বিজয় বাবু বলিতেছেন, "সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে স্বয়ংবরসভায় লইয়া গেলেন তখন প্রথমেই রাজাধিরাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনন্দা ইন্দুমতীকে "প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য" করিলেন।" (এখানে দ্বিতীয় সুনন্দা শব্দস্থানে সর্ব্বনাম তিনি প্রয়োগ করা উচিত ছিল। সুনন্দা ইন্দুমতীকে "প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য" করিলেন। ইহার মানে কি হইল? বরং এখানে করাইলেন লিখিলে কতকটা ঠিক হইত। বস্তুত লইয়া গেলেন লেখাই উচিত ছিল)। ইন্দুমতী মগধেশ্বরকে বরণ করিলেন না, অথচ "প্রণাম ক্রিয়া" দ্বারা রাজাধিরাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।" বিজয় বাবু কিরূপে জানিলেন যে, রাজাধিরাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনন্দা প্রথমে ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং ইন্দুমতীও সেই জন্য নমস্কার করিয়াছিলেন? রাজাধিরাজ না হইলে যে, কাহাকেও নমস্কার করিতে হয় না, সম্মান করিতে হয় না, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? বিশেষত বিজয় বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কালিদাস স্বয়ংবরসভায় সমবেত রাজগণের মধ্যে রঘুপুত্র অজকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"তেষাং মহার্হাসনসংস্থিতানাম্ উদারনেপথ্যভৃতাং স মধ্যে।
বরাজ ধাম্না রঘুসূনুরেব কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ ॥৬-৬

আবার শেষেও উক্ত হইয়াছে—

"গুর্ব্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা,
ধুর্য্যেণ দম্যঃ-সদৃশং বিভর্ত্তি ॥ ৬-৭৮

অজ এখানে ভুবনভার বহন করিতেছেন, অতএব যদি রাজাধিরাজ কাহাকেও বলিতে হয়, তবে ইঁহাকেই বলিতে হইবে। অথচ, বিজয় বাবু লক্ষ্য করিবেন, ইন্দুমতী সর্ব্বশেষে ইঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রথমে আসেন নাই। এবং কালিদাস মনে করেন নাই যে, ইহাতে ইন্দুমতীর অজের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই।

বিজয় বাবু এক পাদটীকায় (১২পৃঃ) লিখিয়াছেন—"রঘুবংশ-কাহিনী কালিদাস রামায়ণ এবং পুরাণাদিতে পড়িয়াছিলেন। উহা কদাচ তাঁহার কেবলমাত্র শুনিবার বিষয় ছিল না। অথচ তিনি কাব্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে, "তৎগুণৈঃ (তদ্‌গুণৈঃ, হইবে) কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ('প্রচোদিতঃ' হইবে)।" গুপ্তদিগের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার শুনিবার বিষয় ছিল, কেননা তাঁহাদের কীর্ত্তির কোন ইতিহাস তখন সর্ব্বত্র পঠিত হইত এ কথা বলিতে পারা যায় না। উজ্জয়িনীবাসী কবি দূর হইতে কীর্ত্তিকথা শুনিয়াছিলেন।" বিজয় বাবুর যুক্তিপটুতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, ঐ "তদ্‌গুণৈঃ" ইত্যাদির পরেই যে, কালিদাস লিখিয়াছেন "তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ" (১-১০), এখানে শ্রোতুম্ না লিখিয়া পঠিতুম্ লেখাই গ্রন্থকারের উচিত ছিল, কেননা গ্রন্থ লোকে পাঠ করিয়া থাকে, শ্রবণ করে না। সাহিত্য-দর্পণ হইতে বিজয়বাবুকে বহু স্থলে নানা কথা উদ্ধৃত করিতে আমরা দেখিয়াছি, সেই গ্রন্থে কাব্যকে দৃশ্য- ও শ্রব্য-ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেখানে শ্রব্য স্থলে পাঠ্য করা উচিত ছিল। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় যে, তিনি এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজেরই বিশ্বাস নাই। রামায়ণ-সম্বন্ধে (৩৬পৃঃ) তিনি লিখিয়াছেন—"নিত্য নিত্য শুনিতেছি, অথচ পুরাতন হয় না, অথচ আবার শুনিতে ইচ্ছা করে।" কালিদাস এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবে না?

কালিদাসের গ্রন্থাবলী-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখিতে

* এখানে ইহা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকারের এইরূপ দৃঢ় নির্বন্ধ, কিন্তু বস্তুত তিনিও সন্দিগ্ধ, ইহা পরে সূচিত হইয়াছে :—"একচ্ছত্র রাজত্ব না থাকিলেও" (৪৯ পৃঃ)।

পাইলাম না। সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া দেখিবারও আমাদের স্থান ও সময় উভয়ই নাই, অ'ত সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে আমরা বহুবিধ কাব্যের নাম শুনিয়াছি। আজ বিজয় বাবুও আমাদিগকে আর একটি নূতন নাম শুনাইয়াছেন (১৫পৃঃ) "অলঙ্কৃত কাব্য।"

কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও গ্রন্থকার মালবিকাগ্নিমিত্রের
"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নব মত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাহার অনুবাদও দিয়াছেন—

যাহা কিছু পুরাতন, নহে ভাল কদাচন,
নব্য বলি কাব্য কিছু দোষযুত হয় না।
হলে কাব্য পরীক্ষিত, হয় সুধী-সমাদৃত,
মূঢ়জন পরবুদ্ধি করে অনুধাবনা।

'হলে কাব্য পরীক্ষিত, হয় সুধী-সমাদৃত' ইহা, শ্লোকের কোন অংশের অনুবাদ? বলা বাহুল্য "সন্তঃ পরীক্ষ্য" ইত্যাদি তৃতীয় চরণের অর্থ অনুবাদকের নিকট স্পষ্ট হয় নাই।

বিজয় বাবু পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যে উদয়নকথাবিষয়ক শ্লোকের প্রতীক দেখিয়া (২৪পৃঃ) বলিতেছেন, পূর্ব্বমেঘের "৩১ শ্লোকের" ('৩১ শ শ্লোকের' লেখা উচিত) পর "প্রদ্যোতস্য" ইত্যাদি শ্লোক বসিবে। "প্রদ্যোতস্য" ইত্যাদি শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। একটু বিশেষ ভাবেই দেখা যাউক। বিজয় বাবুর ৩১শ (বিদ্যাসাগর সংস্করণের ৩০শ) শ্লোকটি এই—

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥"

এখানে যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—তুমি উদয়নকথাকোবিদ-গ্রামবৃদ্ধগণযুক্ত অবন্তি জনপদে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিশালা-নামক নগরে গমন করিবে। ইহার পর বিজয় বাবু কালিদাসের বলিয়া যে শ্লোকটি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা এই—

"প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎস রাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তাল-' ('বাল' নহে) দ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্‌ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পা-
দিত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ॥"

এখানে বৎসরাজ বা উদয়নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও স্পষ্টরূপেই দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটীতেও উদয়নকথার উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় শ্লোকই যদি কালিদাসের হয়, তাহা হইলে তাহার পুনরুক্তি করা হইয়াছে বলিতে হইবে। বিশেষতঃ কবি পূর্ব্বশ্লোকে উদয়ন-কথার উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সেই কথার কেবলমাত্র তিনটী ঘটনা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এমন কি সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন আমরা জানি না। আবার এই ঘটনাত্রয়ের সবগুলিই প্রধান নহে। কালিদাসের কাব্যে আমরা এরূপ ব্যর্থ বর্ণনার অবতারণা সম্ভবপর মনে করিতে পারি না। এই স্থানে "হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্" ইত্যাদি ও "পত্রশ্যামা দিনকর" ইত্যাদি শ্লোকও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই মত। মল্লিনাথ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারেরা এই শ্লোকদ্বয় ধরেন নাই। রচনারীতি, বিশেষতঃ শেষোক্তটির, কালিদাসের বলিয়া বোধ হয় না। বিজয় বাবু ইহাদিগকেও কালিদাসের বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যে ইহাদের উল্লেখ থাকিলেই যে, ইহারা কালিদাসের হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। এই মাত্র বলা যায় যে, পার্শ্বাভ্যুদয়ের সময় ঐ শ্লোকগুলি ছিল। যাহাই হউক, "পত্রশ্যামা" প্রভৃতি শ্লোকটিকে বিজয় বাবু এখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উত্তরমেঘে কি জন্য টানিয়া লইয়া গেলেন তাহা তাঁহার বলা উচিত ছিল।

গ্রন্থকার বলিতেছেন (২৭পৃঃ)—"পূর্ব্ব কবিদের নামে বাণভট্ট যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন,, সকলগুলিতেই কৌশলমূলক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের নাম শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে সূচিত হইয়াছে।" সর্ব্বত্র তাহা করা হয় নাই। "ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদাবন্ধো নৃপয়াতে" (১৩ শ্লোক), এখানে গ্রন্থের নাম অথবা লক্ষিত গ্রন্থের সূচক গদ্যবন্ধ শব্দ অপর কোন অর্থ প্রকাশ করে না। দশম শ্লোকে ভারতী কথা ও অষ্টাদশ শ্লোকে বৃহৎ কথা শব্দেরও অপর কোন অর্থ নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বাণভট্ট সর্ব্বত্র গ্রন্থবাচক শব্দে শ্লেষ প্রয়োগ করেন নাই। বিজয় বাবু কিন্তু ইহা লক্ষ্য না করিয়া

"নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিবজায়তে॥"

এই শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক বলিতেছেন "কিন্তু 'সূক্তি' 'মঞ্জরী' প্রভৃতি নামে কবির কোন রচনা পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।" আমরা বলি সে রচনা কস্মিন্ কালেও পাওয়া যাইবে না, এবং আকাশকুসুমের ন্যায় তাহার জন্য অনুসন্ধান করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। বিজয় বাবু এ-সব কি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া সাধারণ পাঠকবর্গকে মোহান্ধকারে ডুবাইতেছেন, বুঝি না। সূক্তি ও মঞ্জরী এখানে কবির কোন রচনাবিশেষের নাম নহে। কালিদাসের কাব্যরূপ সুভাষিত-সমূহকেই সূক্তি বলা গিয়াছে, এবং মঞ্জরী শব্দও নিজের প্রসিদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আচ্ছা, না হয় ধরা গেল কালিদাসের রচনাবিশেষের নাম সূক্তি ও মঞ্জরী। কিন্তু আবার বহুবচন কেন? বোধ হয় কালিদাসের ঐ দুই নামে অনেকগুলি গ্রন্থ (১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ইত্যাদি) আছে? বিজয় বাবু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। ইহাদের পর আবার "প্রভৃতি" যোগ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার রঘুবংশের "অনুধাবন" করিয়াছেন। ঐ শব্দটির এ স্থলে কি অর্থ তাহা তিনি পাঠকবর্গকে বলিয়া না দিলে জানিবার উপায় ছিল না। তিনি বলিয়াছেন (৩১পৃঃ)—"মহাকাব্যের অনুধাবন—তত্ত্বনিশ্চয়ের অনুসরণ।" এই অর্থটি তিনি কোথা হইতে পাইয়াছেন উল্লেখ করিলে আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিতাম। এই প্রসঙ্গে তিনি নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন। যতদূর পারা যায় সংক্ষেপে ইহার দুই এক স্থান আমরা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। তিনি নান্দীতে নাটকীয় কথাবার্ত্তার আভাসের কথা বলিয়াছেন। নান্দীতে ইহা থাকিলে খুব ভাল হয়, সন্দেহ নাই! কিন্তু সমস্ত নাটকে এই রীতি অবলম্বিত হয় নাই। উত্তরচরিতের নান্দীতে কিরূপে নাটকীয় কথার আভাস পাওয়া যায় বিজয়বাবু বিশ্লেষণ করিয়া দিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম। তিনি দৃষ্টান্তরূপে নাগানন্দের "ধ্যানব্যাজম্" ইত্যাদি নান্দী উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি পাঠকবর্গের প্রতি এতদূর নির্দ্দয় যে, একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে পারেন নাই।

দিলীপ, রঘু, অজ, ও কুশের কথা বলিতে গিয়া বিজয়বাবু যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

বিজয় বাবুর গ্রন্থের ভাষায় নানাস্থলে ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটি ও অসংযম দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রসঙ্গত দিয়াছি। তিনি রঘুবংশ লইয়া এতটা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু হূ ণ স্থলে ("তত্র হূণা বরোধানাম্"—৪-৬৮) অসকৃৎ হু ন লিখিয়াছেন। না হয় ণকার-স্থানে দন্ত্য নকার গ্রহণ করিলাম; কিন্তু হূ-স্থানে হু কিছুতেই হইতে পারে না। এইরূপ পা র সী ক না লিখিয়া ("পারসীকাং-স্ততো জেতুম্"—৪-৬০) তিনি লিখিয়াছেন পা র সি ক (৪ পৃঃ)। তাঁহার স ম্ব ৎ স র, স ম্ব ৎ, ও স্ব য় ম্ব র (৬-৭ ইত্যাদি) যথাক্রমে সং ব ৎ স র, সং ব ৎ ও স্ব য়ং ব র হইবে। রা জা গ ণ (৯পৃঃ ইত্যাদি) লেখা তাঁহার উচিত হয় নাই। বা হ্লি ক (৩২ পৃঃ) না বলিয়া বা হ্ল লেখা উচিত। যৌ ব না তী তে (৩৩ পৃঃ) না লিখিয়া যৌ ব না ত্য য়ে লেখা ভাল। "দশপুরের রাজারা অ ধী ন স্ব সে না প তি রাজা ছিলেন" (৭ পৃঃ); এখানে অ ধী ন সা ম ন্ত রাজা লিখিতে হইত। "এই পুরাতন পা ঠ যে মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অধিক প্রা মা ণ্য" (২৪ পৃঃ), এখানে প্র মা ণ লেখা উচিত। ইনিও প ত্নী ব ৎ স ল লেখেন (৫০ পৃঃ), এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য "কালিদাসের সীতা"-সমালোচনায় বলিয়াছি।

গ্রন্থকারের আর একটি বিচিত্র বাক্য এই (৩৬ পৃঃ)—"পাঠশালার বালকশিক্ষার জন্য রচিত শিশুরামায়ণ পর্য্যন্ত রা ম ক থা স ম্ব লি ত মা ত্র স ক ল গ্র ন্থ ই এদেশে আদৃত।" বোধ হয় এখানে তাঁহার বিবক্ষিত ভাব—রা ম ক থা স ম্ব লি ত গ্রন্থ মাত্রই।

তাঁহার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় একটি পঙ্‌ক্তিতে যুবতী সম্পর্কে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহা কিরূপ রসিকতা? ইহাই তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট আদৃত দেখিতে চাহেন (মুখবন্ধ)? দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথমেই ইহা কাটিয়া দিলে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য করা হইবে। কারণ ইহা সত্য নহে, সুনীতিসঙ্গতও নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অভিধানপ্পদীপিকা বা পালি শব্দকোষ *

সংস্কৃতে অমরকোষের যে স্থান পালিতে অভিধানপ্পদীপিকারও সেই স্থান। অভিধানপ্পদীপিকা সম্পূর্ণরূপে অমরকোষের অনুকরণে লিখিত; কতকগুলি সংস্কৃতে অপ্রচলিত বিশেষ-বিশেষ শব্দ না থাকিলে ইহাকে অমরকোষের পালি অনুবাদ বলা যাইত। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহুর রাজত্ব সময়ে (১১৫৩ খ্রীঃ) তত্রত্য জেতবন-বিহারবাসী স্থবির মোগ্গল্লায়ন (মোগ্‌গল্লান) ইহার রচয়িতা। পালিভাষায় লিখিত ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্ট অভিধান নাই। Childers তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পালি-অভিধানে ইহার সমস্ত শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয় বা সিংহলীয় অক্ষরের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ এতদিন আলোচনা করিবার সুবিধা ছিল না, স্বামী জ্ঞানানন্দ বঙ্গাক্ষরে ইহা প্রকাশিত করায় অদ্য সে অসুবিধা কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। তাঁহার এ প্রয়াস সাধুবাদার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের অবশ্য বক্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতে পালির আলোচনা এই সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় পুস্তকের অভাব। পাশ্চাত্য অঞ্চলে রোমীয় অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ এত দুর্ম্মূল্য যে, সাধারণ ব্যক্তির তৎসমুদয় সংগ্রহ করা অতিকষ্ট। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের অক্ষর এত জটিল যে, সকলের পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। যদি বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সমগ্র ভারতের পালিপাঠার্থীকে সুবিধা প্রদান করিতে পারা যায়, পালিগ্রন্থপ্রকাশকগণকে সে কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা যদি এই-সকল গ্রন্থ দেবনাগরে প্রকাশ করি, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীরই উপকার হইতে পারে। পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ও গাথা আলোচনা করিতে হইলে দেবনাগর না জানিলে চলে না, ইহা সকলকেই জানিতে হইবে। বিশেষত বঙ্গবাসিগণের নিকট ইহা শিক্ষা করা মোটেই কষ্টকর নহে। যদি একই অর্থ ও পরিশ্রমে সমগ্র ভারতকে উপকৃত করিতে পারা যায়, অথচ নিজ প্রদেশের তেমন কোন ক্ষতির কারণ না থাকে, তবে কি তাহাই করা আমাদের উচিত নহে? যদি প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ থাকে, তবে তাহা প্রাদেশিক অক্ষরেই মুদ্রিত হইবে, কিন্তু এতাদৃশ স্থলেও মূল অংশ দেবনাগরে করাই উচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রোমীয় অক্ষরে ক্রমে-ক্রমে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সবই প্রকাশ করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের নিকট ইহা সুখপাঠ্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর নিকট তাহা সেরূপ হয় না। এবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে দৃষ্টান্তস্বরূপ Cowell ও Nailএর রোমীয় অক্ষরে প্রকাশিত দিব্যাবদানের দুই এক পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝা যাইবে। ছোট-ছোট পদ পড়িতে কষ্ট হয় না, কিন্তু দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ পড়িতে খুবই অসুবিধা হয়। পাশ্চাত্যেরা নিজের সুবিধা দেখিয়া চলিতেছেন। দুঃখের বিষয় আমরা নিজের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাণ্ডিত্য মনে করিয়া সেই দিকেই গা ঢালিয়া দিতেছি। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যগণের জন্য নহে, কিন্তু তাহাতেও পালিভাষায় রোমীয় অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে।

বিগত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলোম্বো নগরে স্থবির সুভূতি প্রতিপত্রে মধ্যে মূল অংশ ও তাহার দুই পার্শ্বের একদিকে সিংহলীয় ও আর একদিকে ইংরাজী শব্দার্থ, এবং শেষে সূচীপত্রাদি যোগ করিয়া অভিধানপ্পদীপিকার এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করেন। আমরা ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর সংস্করণের কথা জানি না। স্বামী জ্ঞানানন্দ যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইনি সর্ব্বতোভাবে সুভূতির সংস্করণকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি তাঁহার অনুকরণ-প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন, গ্রন্থের কলেবরও অনর্থক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। সুভূতিকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

গাথার সন্ধিবদ্ধ পদগুলিকে যাহাতে অনায়াসে সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তজ্জন্য স্থবির সুভূতি সন্ধিস্থানসমূহে ১, ২, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া গ্রন্থের শেষে একটি পরিশিষ্টে ঐ চিহ্ন-অনুসারে সমস্ত সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ

* সদ্ধর্ম্মবিশারদ শ্রীজ্ঞানানন্দ স্বামী, চৈতন্যপ্রসাদ বিহার, শিলক, চট্টগ্রাম, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্, ২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বুদ্ধাব্দ ২৪৫৭, মূল্য ২ টাকা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশ, ৩১১+৷৹ পৃষ্ঠা।

সেরূপ কোন পরিশিষ্ট দেন নাই, কিন্তু সন্ধিস্থলসমূহে তাহার সূচনার জন্য (') চিহ্ন দিয়াছেন। সংস্কারকের ইহা নূতন উদ্ভাবন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু-বহু স্থলে তিনি তাহাও দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যথা, ৫ পৃঃ—"ভুত্তপত্তো (পি), বিড়োজো *] (খ) সুজাত (সুস ভরিয়াথ পুরন্তবে)।" স্বামীজী সহসা এখানে এক নক্ষত্রচিহ্ন দিয়া পাদটীকায় 'বিড়জস্' লিখিয়া পাঠকগণকে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা দুর্জ্ঞেয়। পালির 'বিড়োজো' শব্দের সংস্কৃত 'বিড়ৌজস্।'

গ্রন্থের সংস্কার বা সম্পাদন বিষয়ে প্রমাদ, স্খলন, ত্রুটি পদে-পদে লক্ষিত হয়। "অকাপরথং" (পৃঃ ॥/০, গাথা ১) এস্থলে "অকা পরথং" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া লেখা উচিত ছিল। এ দোষ অতি প্রচুর দেখা যায়। স্থানে-স্থানে গাথার পাদবিভাগে ভ্রম হইয়াছে, যথা, ১৭ সংখ্যক গাথা। বর্গীয় ব যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই। ঙ (অথবা /) বর্ণের দিকেও সম্পাদকের লক্ষ্য দৃষ্ট হইল না। অশুদ্ধির ত কথাই নাই, প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ভুরি-ভুরি রহিয়াছে। অথচ সম্পাদক লিখিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে প্রুফ শোধনে সাহায্য করিয়াছেন।

১ম পৃষ্ঠা—'চক্ষুমা' (গাথা ১) স্থানে 'চক্‌খুমা,' 'মহেসী' (২) স্থানে 'মহেসি,' 'মারজী' স্থানে 'মারজি' হইবে। ২য় পৃষ্ঠা—'নিব্বাণং' (গাথা ৫) 'নিব্বানং' (দন্ত্য ন) হইবে। ৩য় পৃষ্ঠা—'পারম্পি' (গাথা, ৮) নহে, 'পারমপি' পাঠ হইবে, তাহাই সিংহল-সংস্করণে আছে, স্বামীজীর পাঠে ছন্দোভঙ্গ হয়; 'বিমুত্ত্যাসংখতা' (গাথা ৮) 'বিমুত্ত্যসংখত' হইবে। এতাদৃশ ভুলে সমস্ত গ্রন্থখানি কলুষিত হইয়াছে। আবার, ৩৯ সংখ্যক গাথাটি আলোচ্য সংস্করণে রহিয়াছে—

"বেগো জবো রয়ো
(তু) খিপ্পং তুরিতং লহু
আসু তুন্নমরং (চ) 'বি
লম্বিতং তুবটং (পি চ)।"

কিন্তু ইহা হইবে—

বেগো জবো রয়ো খিপ্পং তু সীঘং তুরিতং লহু।
আসু তুন্নমরং বাবিলম্বিতং তুবটং পি চ ॥

১১ পৃষ্ঠা—'নবরত' (গাথা, ৪০) স্থানে 'নারত' হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সম্পাদক ৮২ পৃষ্ঠায় (গাথা ৩১৬) 'কন্দুক' শব্দের বাঙ্‌লা অর্থ দিয়াছেন 'লাটিম বা লাট্টু'। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, ইহা গেঁদ বা গেঁডু নামে প্রসিদ্ধ, ইংরাজী 'বল' (ball) শব্দে ইহাকে নির্দেশ করা যায়। হস্ত দ্বারা আঘাত করিলে ইহা লাফাইয়া উঠে, এবং এইরূপে বিলাসিনীরা ইহার দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। "করাভিঘাতোত্থিত-কন্দুকেয়ম্"—রঘু, ১৬, ৮৩। এই গাথাতেই 'অদাসদপ্পণ' স্থলে 'আদাসদপ্পন' হইবে, পরবর্ত্তী (৩১৭) গাথায় 'পম্পুটো' স্থলে 'সম্পুটো' হইবে। আমরা এইরূপ অশুদ্ধি দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। একটি শুদ্ধিপত্রও দেওয়া হয় নাই, হইলেও প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে পুস্তকখানি উপযোগী হইত না

ছাপা চলনসই, বাঁধান মন্দ নহে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গে

অনুশীলনের অভাবে পল্লীগ্রামে প্রাপ্ত শিলাময়ী মূর্ত্তিগুলির স্বরূপ নির্ণয় হইতে পারে নাই। ইহার ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' পড়িতেছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিন্ননাসা পাষাণময়ী মূর্ত্তি মাত্রই "নাককাটা বাসুদেব" নামে খ্যাত, পক্ষান্তরে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেছে। অনেক সূর্য্য ও নৃসিংহ মূর্ত্তি সুবচনী ষষ্ঠী দেবী রূপে তৈল সিন্দূরে লিপ্ত হইতেছে। যাহা হইতেছে তাহা চিরকালই হইবে। সরলবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ পল্লীবাসী হিন্দুগণ কিছুতেই তাঁহাদের পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে বুদ্ধমূর্ত্তিখানির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি, ইহা অদ্যাপি দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত, নলতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে, হিন্দু-দেবতারূপে পূজিত হইতেছে। অনুমান শতবর্ষ পূর্ব্বে এক দিবস জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এই মূর্ত্তি সহ উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রপিতামহ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করেন যে—"আমি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় পাথেয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছি; মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই মূর্ত্তিটী প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া আমাকে ৫টী মুদ্রা প্রদান করুন, আমি তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়া মূর্ত্তি ফেরত লইব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৫টী মুদ্রা সন্ন্যাসীকে প্রদান করিয়া মূর্ত্তিখানি গ্রহণ করিলেন। বহুকাল পরেও সন্ন্যাসী আর প্রত্যাবর্ত্তন না করাতে, তিনি উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন; তদবধি মূর্ত্তিটী নিয়মিত রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

সাধারণের নিকট মূর্ত্তিটী "চিন্তামণি ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে চিন্তামণি শব্দের অন্যান্য অর্থ ব্যতীত "বুদ্ধ-বিশেষ" এইরূপ এক অর্থ লিখিত আছে। কিন্তু মূর্ত্তিটী পূজিত হইতেছে অর্দ্ধ-নারীশ্বর বা হর-গৌরীর ধ্যানে। আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যে ধ্যানটী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

চিন্তামণি ঠাকুর।

নীল-প্রবাল-রুচিরং বিলসত্ত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥

তন্ত্রসার গ্রন্থেও অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যান ঠিক্ এইরূপ দেখিতে পাইলাম।

প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিটী ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদপীঠে অতি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "লোকনাথ সাত্ম্যম" এই লিপিটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই লিপিটী মূর্ত্তির নাম এবং অবস্থা পরিজ্ঞাপক। লোকনাথ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সাত্ম্যম শব্দটী বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিত রূপ অর্থপরিগ্রহ হইতে পারে—আত্মনো হিতং কর্ম্ম—আত্ম্যম্ (আত্মন্+হিতার্থে যৎ) আত্ম্যেন সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সাত্ম্যম্। অর্থাৎ আত্মহিত কর্ম্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব। মূর্ত্তিখানির প্রতিলিপির প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ লিপির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিকশিত শতদলোপরি ধ্যানমগ্ন তথাগত উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে যোগানন্দজনিত পবিত্র হাস্য উছলিয়া উঠিয়াছে। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর দিয়া যাইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, ইহাই ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা নামে খ্যাত। বাম হস্তখানি ক্রোড়ের উপর বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। ঐ হস্তের মণিবন্ধে বলয় এবং তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর অবকাশস্থলে একটী কিশলয় শোভা পাইতেছে, বক্ষস্থলে যজ্ঞোপবীত, বাম স্কন্ধে বিচিত্র উত্তরীয়, মস্তকে প্যাগোডার আকৃতি মনোরম মুকুট।* কর্ণভূষণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ললাটে উন্নত টীকা। মূর্ত্তির চালচিত্রের উপরিভাগে বিভিন্ন-মুদ্রাযুক্ত পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধ। দুই পার্শ্বে দুইটী দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি। ১৪″×৮″ ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথরের ফলকে মূর্ত্তিটী তক্ষিত হইয়াছে।†

বুদ্ধদেব উরুবেলায় বোধিদ্রুমমূলে যখন সম্বোধি লাভ করিতেছিলেন, তখন মার বিবিধ প্রকারে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বোধিমার্গ হইতে স্খলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন মার গৌতমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি যে সম্বুদ্ধ হইলে, তাহার ত' কেহ সাক্ষী রহিল না। পরে কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে? তথাগত তদুত্তরে মেদিনী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বা সাক্ষী মুদ্রা। মহাবোধিতে

* বহুদিন পূর্ব্বে কোন একখানি বিখ্যাত মাসিকপত্রে জনৈক লেখক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জাতির ব্যবহৃত টুপী তত্তৎ জাতির দেবমন্দিরের সদৃশ হইয়া থাকে।

† যে কষ্টিপাথরের ফলকে আঘাত করিলে ধাতুর ন্যায় ঠন্ ঠন্ শব্দ হয় উহাই ব্রাহ্মণ জাতীয় কষ্টিপাথর।

এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির সাধনা বা ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত ফুসে নেপালে আবিষ্কৃত "সাধনমালা তন্ত্র" "সাধন সমুচ্চয়" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বজ্রাসন-সাধন নামক ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির ধ্যান আবিষ্কার করিয়াছেন।—

শ্রীমদ্বজ্রাসন-বুদ্ধ-ভট্টারকং আত্মানং ঝটিতি নিষ্পাদয়েৎ; দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্ম্মার-সঙ্ঘটিত-মহা-সিংহাসন-বরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্ক-সংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিত-বামকরং, ভূস্পর্শমুদ্রা-দক্ষিণকরং, বন্ধুক-রাগারুণ-বস্ত্রাবগুণ্ঠিত-তনু সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনক বিগ্রহং বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্ম ধাতু স্বভাবাত্মকোহং ইত্যদ্বয়াহং-কারং কুর্য্যাৎ।" (বজ্রাসন-সাধন) Etude sur L' Iconographie Boudhique de L' Inde, P. 16.

যে পদ্মের উপর বুদ্ধদেব সমাসীন তাহার নাম 'বিশ্ব-পদ্ম,' যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়াছেন তাহার নাম 'বজ্র-পর্য্যঙ্ক-সংস্থান।' *

মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটীতে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত তাম্রশাসন পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-যুগের (খ্রীঃ দশম—একাদশ শতাব্দীর) বঙ্গলিপি বলিয়া অনুমান করেন। † তাঁহার অনুমান সত্য হইলে এই মূর্ত্তিটী প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইবে।

উল্লিখিত বঙ্গাক্ষরযুক্ত লিপি সন্নিবিষ্ট থাকাতে মূর্ত্তিটী যে বঙ্গীয় শিলাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। মূর্ত্তিটী এমন মসৃণ যে দেখিলে বোধ হয় ভাস্কর এইমাত্র উহার তক্ষণকার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন বঙ্গের বাহিরে বুদ্ধগয়া ও সারনাথে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু এমন কমনীয় মুখশ্রী এবং লাবণ্যে ঢলঢল মূর্ত্তি-শিল্প, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। প্রাচীন শিলা-শিল্পের কীর্ত্তি-কোহিনূর অজন্তা গুহার উপলময়ী মূর্ত্তি সমূহের প্রতিলিপি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলাময়ী রচনার সবিশেষ পারিপাট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পের বদন-মণ্ডলের কমনীয়তার নিকট ঐ-সকল মূর্ত্তির মুখশ্রী মলিন ও কদর্য্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বঙ্গীয় শ্রীমূর্ত্তির ঈদৃশ শিল্পমাধুরী বঙ্গীয় শিলা-শিল্পাচার্য্য "ধীমান" ও "বীত-পালের" শিক্ষাপদ্ধতির অনন্যকরণীয় স্বাতন্ত্র্য জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ।

* ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে-সব তথ্য লিখিত হইল তাহা ১৩২০ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "একটী বুদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

† "সাহিত্য"—১৩২০—১ম সংখ্যা—২৮ পৃষ্ঠা।

ধানের উফরা রোগ

এই রোগটী প্রথমতঃ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাতেই দেখা যায় এবং ইহার স্থানীয় নাম 'উফরা' বা 'উপরা'। ত্রিশ বৎসর হইতে এই রোগের অস্তিত্ব জানা আছে, বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার সংক্রামণ অধিক হইয়াছে, দেশীয় লোকদিগের মতে গত ৬।৭ বৎসর হইতেই ইহার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। বাট্‌লার সাহেব উফরা রোগ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া রোগের কারণ ও সম্প্রতি ইহার কতকটা প্রতিকার স্থির করিয়াছেন। উফরা আমন ও আউস ধানেই দেখা গিয়াছে, বোরো ধানে ইহার আক্রমণ এখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই রোগের দ্বারা শস্যের কতটা ক্ষতি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই, তবে নোয়াখালি জেলায় সুধারাম, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানায় অনিষ্ট খুবই বেশী হইয়াছে। ১৯১০ সালে কেবল বেগমগঞ্জ থানায় ২০,০০০ মণ ধান নষ্ট হইয়াছে, চৌহুমানিতে প্রায় অর্দ্ধেক ফসল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাট্‌লার সাহেব মনে করেন ক্ষতির পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী।

নোয়াখালিতে জুন মাসের শেষে যখন আউস ধানে শীষ বাহির হইতে আরম্ভ হয় তখনই এই রোগের প্রথম

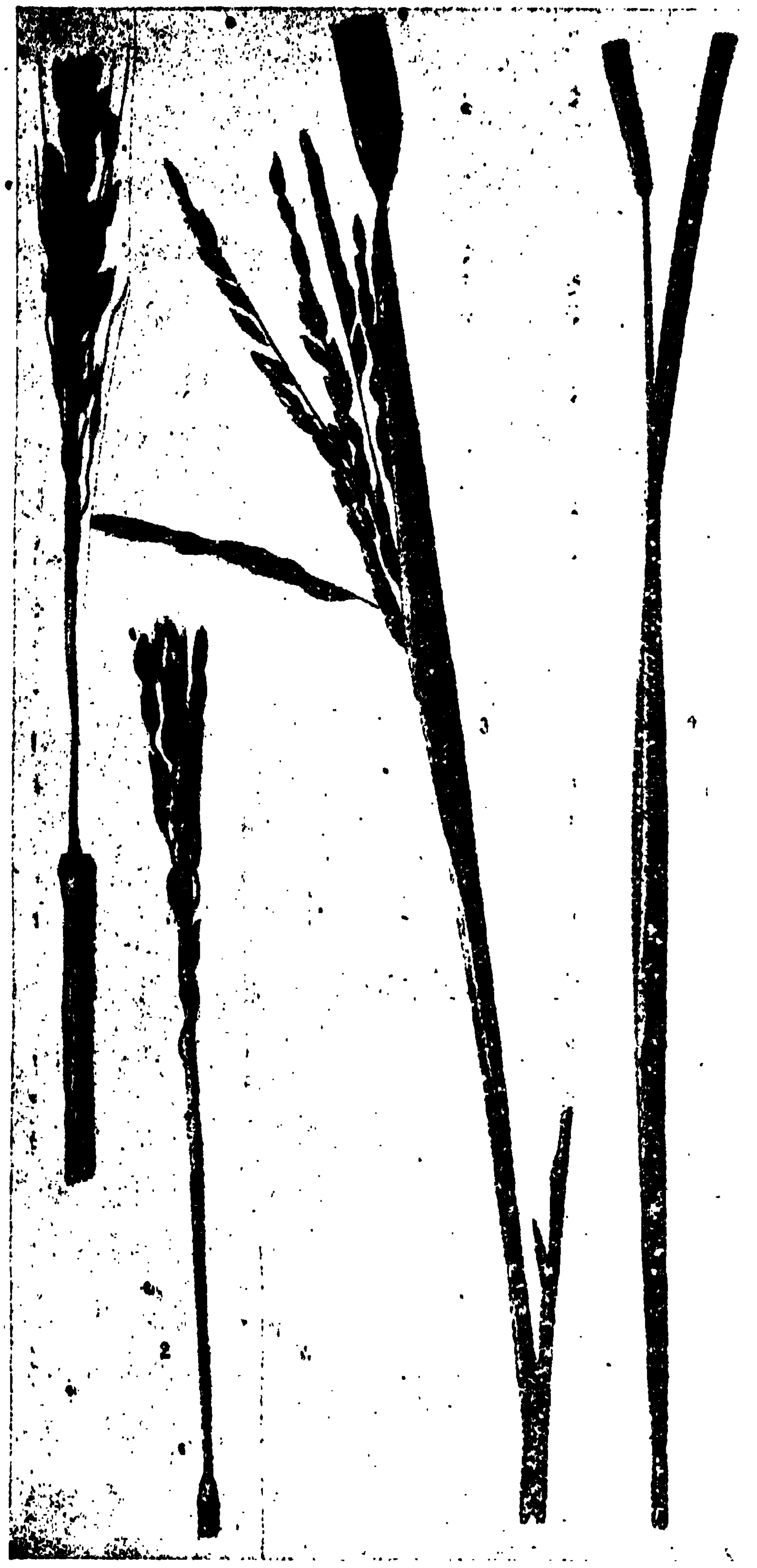

ধানের উফরা রোগ।

১—পাকা উফরার পরিণত অবস্থা; ডাঁটা সরু হইয়া গিয়াছে ও শীষের নিম্নাংশে রংএর বিকৃতি হইয়াছে। ২—এই স্থলে ডাঁটার ক্ষত স্পষ্ট নহে, শীষের নিম্নাংশে আক্রমণ হয় নাই। ৩—পাকা উফরার স্বভাব-পরিচায়ক লক্ষণ। ৪—থোড় উফরার আক্রমণ।

আক্রমণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমে ইহা ক্ষেতের এক এক খণ্ডে মাত্র আবদ্ধ থাকে এবং প্রথম হইতেই ইহা সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে না। যদিও যে খণ্ডে এই রোগ ধরে সে খণ্ডের সমস্ত ধানই নষ্ট হইতে পারে তথাপি আউস ধানের সমগ্র অনিষ্টের পরিমাণ অধিক নহে; কারণ এই রোগ বহুবিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই আউস ধান মাঠ হইতে উঠান হয়।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই, যখন আউসে উফরার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র, তখন আমন ধানের জীবনের অর্দ্ধকালও পূর্ণ হয় না এবং তখনও ইহাতে ইহার শীষ বাহির হইবার সময় হয় না। এই অবস্থাতেও আমন ধানে উফরা রোগের প্রথম লক্ষণগুলি পাওয়া গিয়াছে। জুন মাসের পূর্ব্বেই এই রোগের সূত্রপাত আউসে হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থার লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ছিটান আমন ধান ও মিশ্রিত আমন ও আউস ধান আগষ্ট মাসের শেষে কিম্বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ আউস ও আমন ধানের রোগপ্রবণতায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু রোগের কারণগুলি যত দিন যায় ততই ক্রমিক বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; তবে আউস ধানের স্থিতি অল্পকাল বলিয়া উহার বড় বেশী ক্ষতি করিতে পারে না; আমন ফলিতে অনেক সময় লাগে, সুতরাং তাহার অনিষ্ট অধিক হয়। জুলাই মাসের শেষে কেবল ছিটান আমন ধানে এই রোগের প্রথম অবস্থা দেখা গিয়াছে; তখন দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'পাতা' উফরা কহে। এই সময়ে সুস্থ ও আক্রান্ত গাছের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না, কেবল পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়া আসে, কতকগুলি প্রশাখার উপরিভাগ মলিন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পাতায় ও পত্রকোষে মধ্যে মধ্যে বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়। কুঁড়ির ভিতরের পরদা কুঞ্চিত হইয়া পড়ে ও কখন কখন তাহার উপর অস্পষ্ট বাদামী রংএর দাগ থাকে। গাছের ডাঁটার নিম্নাংশের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু উপরের অংশে কতকগুলি বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়।

মাঠ হইতে ফসল উঠাইবার এক মাস পূর্ব্বে উফরার শেষ লক্ষণগুলি দেখা যায়, তখন গাছ প্রায়ই বাড়ে না, বাহিরের পাতাগুলি কখন কখন শুকাইয়া যায়, আবার সময়ে সময়ে ইহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, পত্রকোষের উপর বাদামী রংএর দাগ থাকে ও ডাঁটার এক বা ততোধিক গাঁটের ঠিক উপরে এক প্রকার ক্ষত দেখা

যায়; এই ক্ষতগুলি রোগ চিনাইয়া দেয় এবং প্রায়ই পাতাযুক্ত গাঁটের উপরে কিম্বা নীচে অর্দ্ধ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে। ডাঁটার এই অংশের রং খুব গাঢ় বাদামী কিম্বা কাল হয় এবং ইহা দুর্ব্বল ও কুঞ্চিত হইয়া যায় ও কখন কখন অত্যন্ত সরু হইয়া পড়ে। যে স্থলে রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে রংএর বিকৃতি ডাঁটার কেবল এক দিকেই দেখা যায় কিন্তু ইহা সচরাচর চারি দিকেই বিস্তৃত হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে ডাঁটার অন্যান্য অংশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগগুলি বর্ত্তমান থাকে, ফুলের ডাঁটার রংও কখন কখন বদলাইয়া যায়। এবং সময়ে সময়ে ইহা কুঞ্চিত হইয়াও পড়ে, শীষ উপরের পত্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিম্বা উহার বাহিরেও আসিয়া পড়ে। শীষের এই প্রথম অবস্থার রোগকে চাষীরা 'থোড়' ও শেষোক্ত প্রকারকে 'পাকা' উফরা কহে। 'থোড়' উফরাতে ডাঁটার উপরের অংশ মাকুর ন্যায় ফুলিয়া উঠে, এবং উহার মধ্যেই ধানের শীষ সম্পূর্ণ ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই স্ফীত অংশ ও পাতা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থাতে পত্রকোষের দুই ধার মাত্র শুকাইয়া যায়; কখনও নিম্নদিক হইতে, কখনও উপর দিক হইতে শুকাইতে আরম্ভ করে। পত্রকোষের মধ্য অংশ কিছুকাল সবুজই থাকে কিন্তু শীঘ্রই ইহাতে বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়; এই-সকল দাগই উফরা রোগের বিশেষ লক্ষণ। এই-সকল দাগ কখন কখন বিস্তৃত হইয়া পড়ে কিম্বা এক সঙ্গে ডাঁটার অনেকটা অংশ আবৃত করিয়া থাকে; প্রায়ই এই দাগগুলি পাতলা কিম্বা গাঢ় রংএর হয়; শেষ গাঁটের উপরে যেখানে পত্রকোষ ডাঁটার ক্ষত ঢাকিয়া থাকে তাহার নিম্নভাগে একই প্রকারের দাগ দৃষ্ট হয়। পত্রকোষের ভিতরের শীষে যে-সকল ফুল থাকে তাহাতে প্রায়ই পরাগসঙ্গম হয় না ও ফলগুলি কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং সমস্ত শীষে ছাতা পড়ে। 'পাকা' উফরাতে কোষ হইতে হয় সম্পূর্ণ শীষ কিম্বা উহার কিয়দংশ বাহিরে আসিয়া পড়ে। ফুলের ডাঁটাতে ইহার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; উপরের পত্রকোষ প্রায়ই বাদামী ও শুষ্ক হইয়া যায় ও ইহা শীষের উপরিভাগ আবদ্ধ করিয়া রাখে ও নীচের অংশ বিকৃত হইয়া পড়ে। বীজকোষের নীচের অংশে ফল প্রায়ই থাকে না এবং উপরের অংশ কখন কখন শূন্য থাকে, আবার সময়ে সময়ে ইহাতে পরিপক্ক বা অপরিপক্ক ফলও থাকে। আমন ধান অধিক দিনের ফসল বলিয়া ইহাকে এই রোগ দ্বারা গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

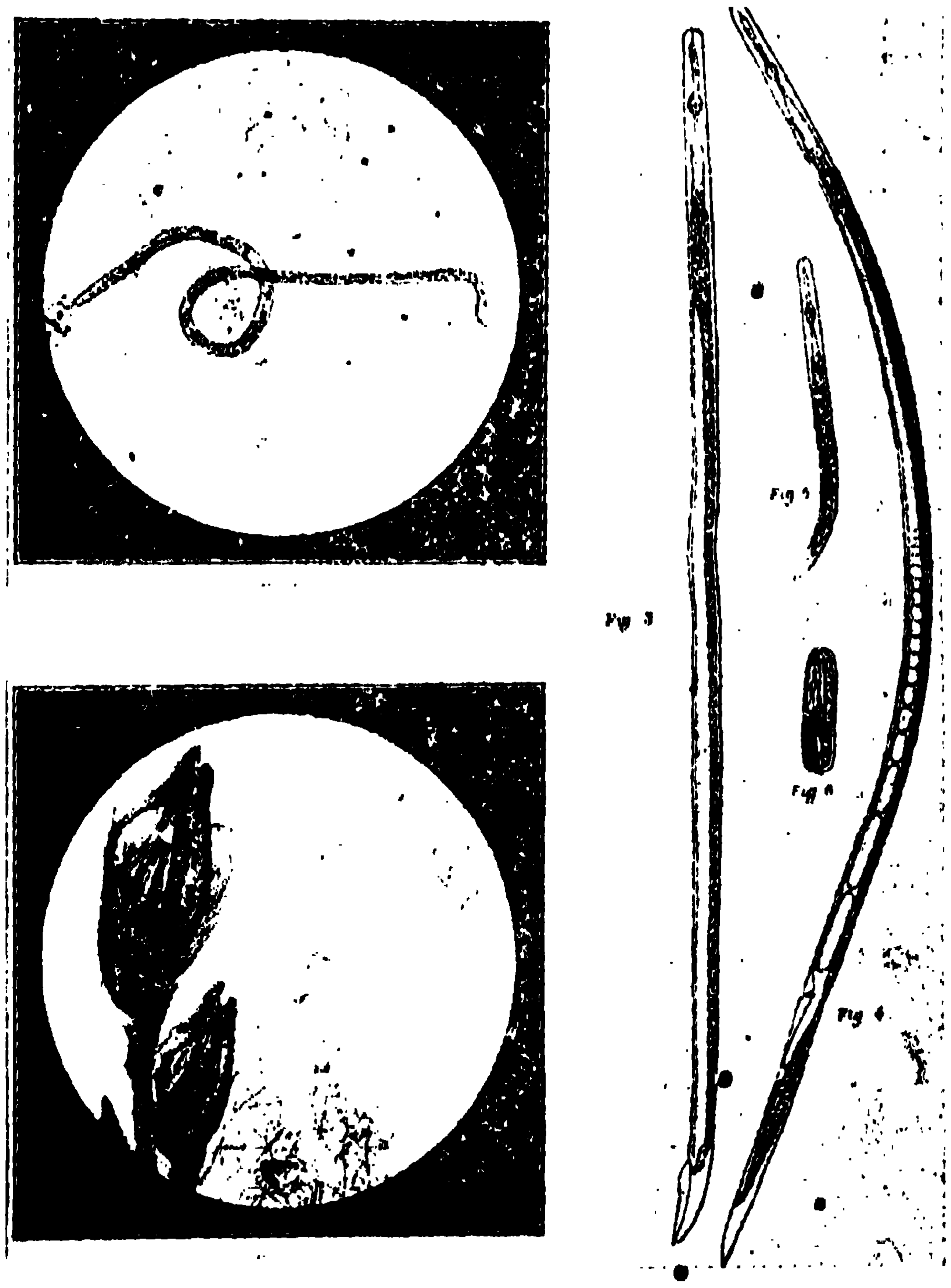

ধানের উফরা পোকা।
১—পরিণত-বয়স্ক পুরুষ পোকা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ২—বহুসংখ্যক পোকার সমবেত অবস্থা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ৩—পুরুষ পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত) ৪—স্ত্রী পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত) ৫—অপরিণত পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত) ৬—ডিম্বস্থিত ছোট পোকা (বহুগুণ বর্দ্ধিত)।

অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কীট (insect) কিম্বা কোনও জীবাণু (Bacteria) দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি নহে। (Nematode) বা Eelworm জাতীয় এক প্রকার পোকার (Worm) আক্রমণই এই রোগের কারণ। এই জাতীয় অনেক পোকা বৃক্ষ বা প্রাণীদেহের উপর থাকিয়া জীবন ধারণ করে। উফরা রোগ যে শ্রেণী

হইতে উৎপন্ন তাহা Tylenchus জাতিভুক্ত। এবং ইহার নাম Tylenchus Angustus। এই পোকা গাছের পেশীর উপরই থাকে ও ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। রোগের প্রথম অবস্থাতে পাতার কুঁড়ির ভিতরের পর্দার মধ্যেই পোকাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। 'থোড়' উফরাতে ডাঁটার কুঞ্চিত, কাল অংশে শীষের নীচে পোকাগুলি একত্র সমবেত হইয়া থাকে; 'পাকা' উফরাতেও ডাঁটার পূর্ব্বোক্ত অংশে ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু শীষেই ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলের বাহিরে থাকে। এক একটী পোকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, $\frac{1}{२৫}$ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{1}{১৫০০}$ ইঞ্চি চওড়া—শুধু-চোখে দেখা একেবারেই অসম্ভব; যখন এক স্থানে বহুসংখ্যক সমবেত হইয়া থাকে তখন সাদা সূত্রসমষ্টির ন্যায় দেখায়। ছোট, বড়, সকল রকম পোকা, ও তাহাদের ডিম, সব একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকার মুখে একটী ছোট কাঁটা থাকে, শুষিয়া খাইবার সময় ইহারা এই কাঁটা বাহির করে। প্রত্যেক স্ত্রীপোকা ৫০ হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি ১০০টী ডিম ফুটিয়া ৫০টি পুরুষ ও ৫০টি স্ত্রীপোকা বাহির হয় তাহা হইলে তিনবার বংশ পর্য্যায়ে এক জোড়া পোকা হইতে ২৫০০০০ পোকা উৎপন্ন হইবে—ইহা হইতেই এই পোকার বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এযাবৎকাল এই পোকা কেবলমাত্র ধানেই পাওয়া গিয়াছে এবং ধানের যে অংশ মাটীর উপরে থাকে তাহাতেই দেখা গিয়াছে; শিকড়ে, মাটীতে বা জমির আগাছাতে ইহা দেখা যায় নাই। যে-সকল গাছে এই রোগ ধরে শস্য উঠাইবার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে শুষ্ক হইয়াও এই পোকা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন কি ১৫ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তবে জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকিলে এই পোকা চারি মাসের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত পোকাগুলি অধিক সজীবতা প্রাপ্ত হয় ও চারিদিকে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়। ডিসেম্বর মাসে তাহাদের নড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা আর থাকে না ও তাহারা শীষের ভিতর ও শস্য উঠাইবার পর পরিত্যক্ত অংশের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে। বর্ষার আরম্ভে মাঠে যখন জল আসে তখন ইহারা পুনরায় কার্য্যতৎপর হয়। সজীব গাছ হইতেই ইহারা আহার গ্রহণ করে ও গাছের উপরেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, ধান পাকিলে ইহারা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগের সংক্রামণের সময় পোকারা জলের উপর দিয়া এক গাছ হইতে অপর গাছে যায়, এমন কি জলের নীচে থাকিলেও জলের উপর উঠিয়া গাছের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পোকার মুখে ছোট, সরু কাঁটা থাকে, ইহা বিদ্ধ করিয়া ইহারা গাছের রস টানিয়া লয়। এই সরু কাঁটা গাছের কঠিন অংশে প্রবেশ করাইতে পারে না, সেই জন্য গাছের কোমল স্থানেই এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়; ডাঁটার প্রত্যেক গাঁটের ঠিক উপরের অংশ খুব কোমল ও সরু, সুতরাং এই স্থানেই উফরার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এই রোগনিবারক কোন সঠিক উপায় নির্দ্ধারণ বহু সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ; তবে দুই প্রকার উপায়ে উহা নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ রোগ-উৎপাদক পোকার বংশ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ধানগাছের এই রোগপ্রবণতা যাহাতে অল্প হয় তাহার উপায় স্থির করা। প্রথমেই মনে হইতে পারে যে গাছে কোনও বিষাক্ত পদার্থ ছিটাইলে কিম্বা জমির জলের সহিত উক্ত বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকার বংশ খর্ব্ব করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব, কারণ পোকাগুলি গাছের কুঁড়ির অভ্যন্তরেই থাকে, উক্ত বিষাক্ত পদার্থ উহাদের সংস্পর্শে আসিতে পায় না।

ধান উঠাইয়া লইবার পর মাঠে পরিত্যক্ত অংশগুলি জ্বালাইয়া দিলে পোকা বিনষ্ট হইতে পারে; রোগাক্রান্ত বীজ পরবৎসর বপন করা উচিত নহে, কারণ যে-সকল গাছে 'পাকা' উফরা ধরে সেই-সকল গাছের বীজে পোকা থাকে, এই সময়ে ইহারা জীবিত থাকে কি না তাহা জানা যায় নাই। যদি এই রোগ বীজ হইতে আসিত তাহা হইলে এই ব্যাধির ব্যাপ্তি আরও বেশী হইত, কারণ বীজ বিনিময় সর্ব্বত্রই অতি অধিক পরিমাণে হইয়া

থাকে ; যদি মাটী হইতে এই রোগ বিস্তৃত হইত তাহা হইলে যে-সকল জমিতে ধান নাড়িয়া রোপণ করা হইয়াছে সেই-সকল জমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়া পড়িত, কেননা শীতের শেষে নীচু জমি হইতে মাটী কাটিয়া পাটের জমিতে দেওয়া হয় ও ইহা হইতে হৈমন্তিক ধানের দ্বিতীয় ফসলও লওয়া হয়। আক্রান্ত গাছের সহিত সুস্থ গাছ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে এই পোকা আসিলেই গাছ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বীজ-জমি হইতে গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময় এই রোগ বর্ত্তমান থাকে না।

গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়াইয়া ফেলিলে খুব উপকার হয় এবং ইহা কৃষিকার্য্যের একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করা উচিত। ধান উঠাইবার পর জমিতে লাঙ্গল দিলে গাছের গোড়া মাটীর সহিত মিশিয়া অতি শীঘ্র পচিয়া যায় এবং পোকাও মরিয়া যাইতে পারে, কেননা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ভিজা জমিতে এই পোকা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল জমি খুব শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়, এক পশলা বৃষ্টির পর তাহা খুবই নরম হইয়া পড়ে, তখন ইহার উপর লাঙ্গল দেওয়া সহজ হইয়া উঠে। রোগ নিবারণের জন্য গাছের সুস্থতার দিকেও মনোযোগ রাখা বিশেষ দরকার। দেখা গিয়াছে যে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া যে-সকল ধান রোপণ করা হয় তাহাতে উফরার আক্রমণ হয় না, সুতরাং যাহাতে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া ধান রোপণ করিবার প্রণালী বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের উপদেশানুসারে এই রোগ নিবারণের জন্য জমিতে চূর্ণ ছিটান হইয়াছিল, ইহাতে রোগের আক্রমণ বিলম্বে হইয়াছিল বটে কিন্তু ফসল রক্ষা পায় নাই, অধিকন্তু ইহাতে ব্যয় অধিক পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে-সকল ধানি-জমির মৃত্তিকায় বায়ুর চলাচল বহুদিন ধরিয়া বাধা পায় সেই-সকল জমিতেই উফরা রোগ দেখা দিবার বেশী সম্ভাবনা। যাহাতে জমি হইতে অত্যধিক জল স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

উপস্থিত রোগনিবারক যে-সকল উপায় আলোচনা করা হইল তাহা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরে রোগনিবারক পরীক্ষার জন্য এগার হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কৃষিবিদ্যালয়,
সাবোর।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

উদ্বোধন *

প্রভাতে যখন সকল ধরণী আনন্দে জাগিয়া ওঠে সেই সময় সকল প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে, নব পবন-মর্ম্মরের সঙ্গে সঙ্গে, সকল কুসুম-কুলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সকল বিহঙ্গের কলসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে, সহজেই আমাদের চিত্ত জাগিয়া উঠিতে চাহে। কিন্তু সকল কর্ম্ম-কোলাহলের সমস্তদিনব্যাপী বিচিত্র উন্মত্ততার অসাড়তা হইতে কে আমাদিগকে এই সন্ধ্যার আনন্দ-উৎসবে জাগ্রত করিবে? সকল দিবস নানা ক্ষেত্রে উত্তপ্ত হইয়া, নানা ভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া, যে হৃদয় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, এখন সন্ধ্যার গভীরতার শুভক্ষণে শান্তিময়ী জননীর সকলসন্তাপহারী বক্ষে ফিরিবার সময় কে তাহাকে সমগ্র পরিপূর্ণ করিবে? কে তাহাকে জননীর গহন গম্ভীর পরশের জন্য ব্যাকুল করিয়া লইবে?

চরণ কমলকে লাল পরশ পর
সব সুর সুরভি খোলৈ।
পৌন কাঁপত কাঁপত কঁমলবা
মৌন কোইল সব বোলৈ।
(জ্ঞানদাস)

"হে প্রিয়তম, তোমার চরণকমলের অরুণ-রক্ত পরশমাত্র প্রকৃতির সীমাহীন মন্দিরে সকল সুর সকল সুরভি বিকশিত হইয়া উঠে। সেই প্রাণময় পরশ লাগিয়া পবন নব জাগরণের আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, কমলদল জাগরণের নব আনন্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, মৌন বিহগকণ্ঠে সুর নব আনন্দে জাগিয়া উঠে।"

* আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

কিন্তু সন্ধ্যার এই অচল জড়তার ভারে যখন মন অবসন্ন, নানা কোলাহলের ও উন্মত্ততার বিক্ষেপে যখন হৃদয় সংক্ষুব্ধ, তখন পরমদেবতার চরণতলে শান্ত হইয়া বসিতে হইলে তাঁহারই শ্রীচরণকমলের আরো গভীরতর পরশ চাই।

এই যে সন্ধ্যার প্রশান্ত লগ্নে তাঁহার অসীম অতল হৃদয়, সকল চরাচরকে গভীর অন্তরের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে, এও একটি গভীরতর প্রভাত। প্রভাতের ন্যায়ই তিনি প্রেমারুণ হস্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় নিঃশব্দগম্ভীর বক্ষে টানিয়া লইতেছেন। কি গভীর সেই তিমির-ঘন আলিঙ্গন, যে, তাহার পরশে এই অপরূপ প্রভাতে গগনময় গ্রহতারকার কুসুমদল ফুটিয়া চলিয়াছে।

অথাহ হিরদকে তিরিঁর পরস পর
সব তার সিতার জাগৈ।
বেলি চমেলিকে মহক ফিরি ফিরি
সব উর পরবেস মাগৈ।
(জ্ঞানদাস)

"তোমার অতল হৃদয়ের তিমির-পরশে সব নক্ষত্র তারা গগনে জাগিয়া উঠিল। বেলী চামেলীর গন্ধ ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সকলের হৃদয়ে প্রবেশ ভিক্ষা করিতে লাগিল।"

সেই প্রিয়তমের যে পরশখানি ধরণীতলকে বক্ষের গভীর আলিঙ্গনে গ্রহণ করিবা মাত্রই জগতের সকল ধূলিজাল অপসৃত হইল, সকল কোলাহল শান্ত হইয়া গেল, সকল পক্ষী নীড়ে ফিরিয়া আসিল; সেই পরশমণির দ্বারা তিনি আমাদের হৃদয় মন প্রাণকে স্পর্শ করুন। আমাদের হৃদয়ের সমুদয় ধূলি এই পুণ্য উৎসব-লগ্নে অপগত হউক, সকল মুখরতা স্তব্ধ হইয়া যাউক, হৃদয়ের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়েই ফিরিয়া আসুক।

তাঁহার তিমির-পরশের এই যে একটি পবিত্র লগ্ন, দিবসের অবসানে নিখিল চরাচরে অপার শান্তি আনিয়া দেয়, সেই লগ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সেই গভীরতর প্রভাতের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে চাই। এই শুভমিলন-মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়কে জাগাইয়া তুলিতেই হইবে। প্রেমময় তাঁহার তিমির-প্রেমধারায় আমাদের হৃদয়ের সকল জড়তা, অবসাদ, দৈন্য, দাহ ধৌত করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিউন। রজনীগন্ধার ন্যায় আমাদের হৃদয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আপন নির্ম্মলতার আনন্দটি বিকীর্ণ করিয়া দিউক। এই শুভ লগ্নকে আশ্রয় করিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় আমরা মহা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি! সেই উৎসবের আহ্বান সকল মানবকে নানা সুখভোগ, দৈন্য জড়তা শোক দুঃখ, বিলাস অবসাদ, কর্ম্ম ও ব্যস্ততা, হইতে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।

এই যে উৎসব-যজ্ঞের দীক্ষা তাহাতেও তাঁহার নিকটেই দীক্ষিত হইয়াছি। সেই জগদ্‌গুরুর নিকটেই ইহার শিক্ষা পাইয়াছি। অন্তরের সহিত অন্তরের মিলন, জগতে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, সে শিক্ষাও পাইয়াছি তাঁহারই কাছে। কোন্ অনাদি কাল হইতে তিনি আমার হৃদয়ের সহিত মিলনপ্রয়াসী। তাহার জন্য সেই অনাদি কাল হইতেই তিনি গ্রহচন্দ্রতারায় উৎসব-সভা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কি বিরাট নীল চন্দ্রাতপ মাথার উপর ধরিয়া, কিবা শ্যামল নানা-কুসুমবিচিত্র মিলনের আসনখানি বিছাইয়া রাখিয়াছেন। কত পুষ্পসৌরভে আমোদিত, কত পবন-বীজনে বীজিত এই উৎসব-মন্দির। আমার হৃদয় যে আজও জাগিয়া উঠে নাই, তাহাকেই বা কত আঘাত দিয়া তিনি উৎসবের জন্য জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

কি মধুর তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি, দিবসে রজনীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! কত সৌন্দর্য্যে সৌকুমার্য্যে আমার ইন্দ্রিয়-বাতায়নে বাতায়নে তাঁহার অনুনয়-বাণীর করুণ রাগিণী কত কত যুগ ধরিয়া তিনি বৃথাই শুনাইয়া গিয়াছেন। কত দুঃখদুর্গতির দুঃসহ কঠিন আঘাত দিয়াছেন। কত শোকতাপের বজ্র-আঘাতে আমাকে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। নিদ্রিত হৃদয় তথাপি জাগিয়া উঠে নাই। হৃদয় সুখের মধ্যে ভোগের মধ্যে পলাইয়া পলাইয়া ফিরিয়াছে, বিলাস-বৈভবের মধ্যে আপন মর্ম্মগত দারিদ্র্য লুকাইতে গিয়া কেবল তাঁহার আহ্বান এড়াইয়া এড়াইয়া চলিয়াছে। তথাপি তাঁহার উৎসবসভার সমারোহ একদিনের জন্যও নিষ্প্রভ করিতে, এক দিবসের

জন্যও এই আয়োজনকে সংযত করিতে তিনি সাহস পান নাই, কারণ কোন্ মুহূর্ত্তে যে আমার হৃদয় হঠাৎ জাগিয়া উঠিবে তাহার তো কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাই তাঁহার বিশ্বসভা আমার অনিশ্চিত লগ্নের জাগরণের জন্য এমনি অসীম এমনি গভীর ভাবে নিত্য-নিত্য কাল প্রস্তুত রহিয়াছে।

বরং তাঁহার উৎসবের সাজসজ্জার আড়ম্বরেই আমার হৃদয় হৃদয়েশ্বরকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার মিলন-মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের দিকেই নয়ন চাহিয়া রহিয়াছে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে হৃদয় অবসর পায় নাই। তাঁহার মিলন-সভাই তাঁহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তথাপি তো তিনি আমার জন্য এই উৎসব-সমারোহকে সঙ্কুচিত করিতে পারেন নাই।

এই বিশ্বশোভা যে তাঁহারই দূত। এই দূতকেই যখন আমার সম্মুখে দেখিয়াছি তখন আমার মহারাজের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়া এই দূতের দিকেই, তাহার সাজসজ্জার দিকেই, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। বিমুগ্ধ মানবের বঞ্চিত হৃদয় দূতকে এইজন্য বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে

ফজর মে জব আয়া য়লচী পুশাক সুনহলী তেরী।
গমক ভর জব শ্বাঁস লগায়া চিত জাগায়া মেরী॥
ধূপমেঁ হমকো কিয়া উদাস৷ ক্যা পীড় দূর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মগরবী মরণসা রৈণ আয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজালা ক্যা ভারী খত পায়া।
ইত্তী রৌনক কোঁওরে য়লচী তুহি য়াদ ভুলায়া॥
(জ্ঞানদাস)

"হে দূত, প্রভাতে যখন তুমি আসিলে কি স্বর্ণবর্ণ ছিল তোমার পোষাক! সুরভিতে পরিপূর্ণ বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস যখন আমার অঙ্গে লাগাইলে তখন আমার চিত্ত যেন জাগিয়া উঠিল। রৌদ্রে দূরে দূরান্তরে কি বেদনা তুমি ভরিয়া দিয়া আমার হৃদয় উদাস করিয়া তুলিলে! তুমি সন্ধ্যায় কি গেরুয়া রঙের পশ্চিমা সুর গাহিলে! তার পর মৃত্যুর ন্যায় গভীর রাত্রি আসিল। তখন তোমার কি বিরাট পত্র পাইলাম। গগনের কৃষ্ণ পত্রে গ্রহতারকার অগ্নিময় উজ্জ্বল অক্ষরে অক্ষরে তোমার কি বিরাট বাণী জ্বলিয়া উঠিল! এত আড়ম্বর কেন তোর ওরে দূত, তুই ত আমার চিত্তকে ভুলাইয়া দিলি।"

ভক্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতা যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তখন আবার মহারাজের বিশ্বদূতই তাহার ব্যথিত হৃদয়ের কানে কানে এই কথাটি বলিয়া দেয়

ভারী জলসা আজম দারত তুহি ইক মেহমান।
খল্ক্ খল্ক্ মেঁ খত হৈ ফৈলী মঘ্রুর হম ফরমান॥

"হে অতিথি, মহতী সেই সভা, বিরাট সেই উৎসব, তুমিই তাহাতে একমাত্র নিমন্ত্রিত। লোকে লোকে তাই তোমার জন্য লিপি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি ছাড়া আর ত কেহ সে গম্ভীর সভাতে নিমন্ত্রিত নাই। তোমার নয়নে তাঁহার লিপিখানি পাছে না পড়ে তাই সকল লোকে লোকে সেই অগ্নিময়ী লিপি। ঋতুতে ঋতুতে সেই লিপি নব নব বর্ণে উদ্ভাসিত। সকল কালে, সকল স্থানে, যুগে যুগে, লোকে লোকে, তোমারই জন্য এই অপরূপ আয়োজন চলিয়াছে। আর এমন উৎসবের একমাত্র নিমন্ত্রিতের নিকট প্রেরিত যে দূত সে কেন না গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিবে। তাই আমার দিকে দিকে নব নব নেপথ্য-বিধান, ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিচিত্র বিলাস।"

হৃদয়েশ্বরের সহিত মিলনের এই যে উৎসব তাহা ত তবে আমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত ছিল, যে স্থানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন সে স্থান ত নিভৃত হওয়াই উচিত ছিল। সকলে একত্র হইয়া কেন এক সম্মিলিত মহা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলাম।

তিনি ত কেবল একমাত্র হৃদয়েরই দেবতা নহেন, তিনি যে বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের পিতা, তাই তাঁহার সকল সন্তান—অমৃতের সন্তান, তাঁহার উৎসবে সমবেত হইয়াছে। মানবমাত্রই যে অমৃতের পুত্র সেই মহাসত্য আজ সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠুক। সেই প্রাচীন ঋষিবাণী আজ যুগ যুগান্তের বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্ণে বজ্রের ন্যায় গম্ভীর শব্দে বাজিয়া উঠুক,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর। ধনের পুত্র সুখের পুত্র নহ, পাপের তাপের দুঃখ-দারিদ্র্যের পুত্র নহ, তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র। তোমার জন্য নিখিল বিশ্ব যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাহার সমস্ত

বাণী লইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে—আজ সেই পরিপূর্ণ বাণীর মধ্যে উদ্বোধিত হও, আজ সমস্ত ধরিত্রী আকাশ মহাছন্দে বিদীর্ণ হইয়া তোমাদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করুক। আমরা কি ক্ষুদ্র দীন ভাষাতে মানবকে আহ্বান করিতে পারি! নিজের সত্য নাম কে জানে, তোমরা কি নিজের নাম জান? নিজেকে কেহ বা জ্ঞানী বলিয়া, কেহ বা মানী বলিয়া, কেহ বা ধনী বলিয়া, কেহ বা দুঃখী দরিদ্র বলিয়া, কেহ বা কর্ম্মী বলিয়া জান; কিন্তু সেই সব নাম মিথ্যা। তোমাদের সত্য নাম একমাত্র জানেন তিনি, যিনি নিখিল জীবনের অন্তর্য্যামী। "নিজ তত্ত্বনাম নিশ্চৈ নহি জানৈ সবৈ ভরম মে খপসী" নিজের তত্ত্বনাম না জানাতেই যে সব ভ্রমে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই যে বিরাট বিশ্ব তাহা মহেশ্বরেরই মহাবাণী—তাহা বিরাট ছন্দে ছন্দে গ্রহ চন্দ্র তারকায়, কোটি চন্দ্র তপনে, শৈল সাগর কান্তারে উদ্ভাসিত। সেই-সব যুগ যুগান্ত ধরিয়া অহর্নিশি তোমাকে ডাকিতেছে—তোমাকেই ডাকিতেছে। শ্রবণ কর, শ্রবণ কর। নিজেকে জ্ঞানী, ধর্ম্মী, ধনী, মানী, যোগী, সংসারী প্রভৃতি নানা মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার বাণীকে এড়াইও না। "শৃণ্বন্তু"—শোন শোন নিত্যকালে উদ্ভাসিত সেই বাণী। তোমরা সেই আহ্বান এড়াইলে কি হইবে? তিনি তোমাকে কোনো ক্ষুদ্র নামে ডাকিবেন না। আজ তাঁহার সন্ধ্যা-মহোৎসবে উদীরিত সেই আবাহন-ধ্বনি "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তোমরা সকলে হৃদয় পাতিয়া শুনিয়া তবে আজিকার মহামহোৎসবে যোগদান কর। তিনি যেমন নিখিল বিশ্বে আপনাকে লুটাইয়া দিয়াছেন তেমনি আপনাকে আজ নিখিল চরাচরে লুটাইয়া দাও। কোনো দৈন্য নাই—আজ উৎসবের দিন এবং তোমরা অমৃতের পুত্র। তাই তো আমাদের দূত এত বিরাট, বাণী এত বিপুল, প্রতীক্ষা এত অসীম। তার মধ্যে কি নিরুপম অনুনয় অতুলন অপার সৌন্দর্য্যে ও অপরূপ সৌকুমার্য্যে ও বেদনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই জগতে এই উৎসবের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে।

হে দেবতা, আমার অনিশ্চিত লগ্নের আকস্মিক জাগরণের জন্য যদি তোমার এমন বৃহৎ অসীম লোকলোকান্তরকে অনন্তকাল হইতে এরূপ উৎসব-সাজে সাজাইয়া রাখিতে পারিয়া থাক, তবে আজ যখন তোমার সন্তানগণ তোমার আহ্বানে সমবেত হইয়াছেন তখন মিলন-সভাকে তাঁহারা আলোকে সঙ্গীতে সৌরভে বিচিত্রতায় সুন্দর উৎসবময় করিতে কেন না চাহিবেন? আজিকার এই সন্ধ্যায়ও তোমার গগনে কি বিরাট উৎসবের উজ্জ্বল সমারোহ, পবনে কি মনোহর পরশ চলিয়াছে। তোমার শ্রীচরণ-পরশ-আশাতে যখন সকল হৃদয় আজ সম্মিলিত, তখন এই প্রাঙ্গনে যদি একটু উৎসব লাগিয়া গিয়া থাকে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু হে জীবননাথ, আজ বাহিরের সাজ সজ্জাতেই যেন এই উৎসবের পরিসমাপ্তি না হয়। আজ যেন উৎসবের অবসানে অবমানে নতমুখে আমরা এখান হইতে ফিরিয়া না যাই। তোমার চরণধূলি যেন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তোমায় আত্মদান-ব্রতের পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করিয়া তোমার প্রসাদ-সুধায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আমরা আজ আনন্দে এখান হইতে যাত্রা করি। তোমার দিকে চাহিবার মত দৃষ্টি আজ দান কর, তোমার ব্রতে অটল থাকিবার মত বিরাট বীর্য্য দাও, সকল মধুর সঙ্গীতে ও সকল কঠিন আঘাতে তোমার বাণী শুনিবার মত শ্রবণ আজ দাও। সকল বচনে তোমার ধ্বনি যেন বাজিতে থাকে। সকল হৃদয়ে হৃদয়ে যেন তোমার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

হে নারায়ণ, আমাদের আজিকার এই যে উৎসব তাহা আমাদের গৃহকোণে বসিয়া তোমাকে একেলা সম্ভোগ করিবার জন্য নহে। আজি যে পিতা বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিবার উৎসব। আজ যদি হৃদয়ের কোথাও এতটুকুও সঙ্কীর্ণতা থাকে তবে এই পিতৃনামের উৎসবে, তোমার প্রসাদ নহে, তোমার বজ্র অবতীর্ণ হইবে।

"কিতী থাহ হৈ তেরে অঙ্গন মে কিতী থাহ হিয় বীচ" পিতা বলিয়া যে তাঁহাকে সম্বোধন করিবে—কত দূর ঠাঁই আছে তোমার উৎসব-ভবনে, কত দূর ঠাঁই আছে তোমার হৃদয়ে? যদি তুমি আজ আপনার ও পরের দল বলিয়া বিচার করিতে বসিয়া থাক, তবে ভাঙ্গিয়া দাও এই উৎ-

সব-সভা। যদি তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, তবে সকল চরাচরকে গ্রহণ করিবার মত বিস্তীর্ণ কর তোমার হৃদয়; নহিলে গৃহকোণে বসিয়া কোণকে পূজা কর—পিতার নাম মুখে উচ্চারণ করিও না।

তিনি পিতা। পুত্র হইবার অধিকার যদি চাও তবে আজ পিতার ঐশ্বর্য্যের অধিকার লইতে হইবে। সেই যে তাঁহার আপনাকে নিঃশেষে দান করার ঐশ্বর্য্য, সকলের সেবায় আপনাকে রিক্ত করিয়া দিবার অমৃত—তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের উপরে তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য এই, যে, তিনি সকলের পায়ের ধূলার তলে অটল হইয়া বসিতে পারেন। সেই ঐশ্বর্য্যের বিপুল ভার গ্রহণ করার মত বল চাই। আজ সকলের মধ্যে বসিয়া সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার সকল আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে সমস্বরে আহ্বান করিতে চাই।

হে সকল লোকপিতা, তোমাকে এই সভাতে উৎসবে যোগ দিতে হইবে। তোমাকে যখন প্রিয়তম বলি তখন বাসরগৃহখানি তোমার মন্দির, যখন বন্ধু বলি তখন গৃহে ও পথে তোমাকে লইয়া একেলা চলিতে পারি, যখন প্রভু বলি তখন সকল কর্ম্মে তোমাকে স্বীকার করিতে হয়। যখন বলি জীবনের অধীশ্বর, তোমাকে আমাদের জীবনে অধিষ্ঠিত করিবার যে সাধনা তাহা তখন আমাদের একেলার।

পীতম বাসর-মন্দির হৈ য়ার ঘর রাহ।
সব কর্ম্ম ধর্ম্ম মেঁ রহু মেরে নাহ॥
পিতা জব কহন লাগ্যোঁ আরো আঁগন হমার।
দিরালা দিহরা নহি দেব নহি করতার॥
(নির্ভয় দাস)

"প্রিয়তম, বাসর তোমার মন্দির ছিল; বন্ধু, গৃহে পথে মিলন তো হইয়াছে; প্রভু, সকল কর্ম্মে ধর্ম্মে তুমি থাক। কিন্তু আজ তুমি পিতা। আজ তোমাকে দেবতা বলিব না। তবে আমাকে তোমার মন্দিরে যাইতে হইবে। আজ দেবতা নও, মহারাজ নও, আজ মন্দিরে আমরা যাইব না, সভায় আমরা যাইব না। আজ আমাদের সকলের মধ্যে, তোমার সকল সন্তানের মিলনের প্রাঙ্গনে তোমাকে আসিতে হইবে।"

আসিতেই হইবে, তুমি যে পিতা, তুমি মাতা। তোমার যে-সব সন্তান সারা বর্ষ ধরিয়া তোমার মন্দির খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেহ মনে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকেই বিস্মৃত হইয়া নানা শোক দুঃখের রোগ-ভোগের দারুণ আঘাতে যাহারা মাটিতে লুইয়া পড়িয়াছে, দৈন্য দুর্গতির বিষম আঘাতে যাহারা শুষ্ক প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে, পাপ তাপের নীচতার অপমানের অপরাধের দাহে যাহাদের হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই-সব সন্তান আজ তোমার উৎসবের সন্ধান পাইয়াছে। হতভাগ্য যে-সব সন্তান তোমার কথাও বিস্মৃত হইয়া বিলাসে ভোগে, বৈভবে ঐশ্বর্য্যে, আপনার অন্তরাত্মাকে দিন দিন বিশুষ্ক ও মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে তাহারা আজ এখানে সমবেত। শোকের দারুণ আঘাত, দুঃখের তীব্র দাহ পাইয়া যাহারা অন্ধকারে তোমার শান্তিময় শ্রীচরণ খুঁজিয়া পায় নাই তাহারা আজ সমাগত, অগতির গতি এই পিতার মন্ত্র সকলে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি পিতা, তুমি মাতা, আমরা যে তোমার পুত্র; যে সন্তান তোমার সন্ধান করিতে পারিল না সে আজ সর্ব্বজনের উদার প্রাঙ্গনে বসিয়া পড়িল, যে পাপে তাপে দগ্ধ সে আজ এখানে আশ্রয় লইল, সারা বৎসর যাহার হৃদয় অনশনে দিন কাটাইয়াছে সে আজ এই প্রাঙ্গনে আসিয়া মিলিল। এইবার জননী তোমাকে আসতে হইবে। মলিনতা থাকে ধৌত করিতে হইবে, কারণ "পিতা নো হসি" আমরা যে তোমারই পুত্র। তুমি যে আমাদের পিতা মাতা। তুমি আমার একেলার পিতা নহ। তুমি যে সকলের পিতা। এই মন্ত্র যখন উচ্চারণ করিয়াছি—তখন আর আমাদের হৃদয়ের দ্বার—উৎসবের দ্বার সঙ্কুচিত করিলে চলিবে না। "আমাদের পিতা" তুমি—তোমার সকল সন্তানের স্থান আজ আমার ঘরে আমার হৃদয়ে আছে। আজ সকল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। আজ ধনী নাই, দরিদ্র নাই, পাপী নাই, ধার্ম্মিক নাই, পূজ্য নাই, অপবিত্র নাই—আজ কেবল আছে তোমার পূজার অঞ্জলি; সকল জীবন দুই হাতে তুলিয়া তোমার চরণতলে নিবেদন করিয়া দিবার অঞ্জলি; আছে পীঠস্থান আমাদের উৎসব। আর আছে নিখিল মানবের স্বাগত অর্ঘ্য, উদার আবাহন-

ধ্বনি। যদি অপবিত্র হই তবে পবিত্র কর, যদি অজ্ঞান হই তবে জ্ঞান দাও।

হে পিতা, এতদিন যাহারা পথের সন্ধান পায় নাই তাহারা আজ পথের সন্ধান পাইয়াছে। তুমি যে পিতা এই সন্ধান তাহারা পাইয়াছে। তোমার সন্তানগণের সমবেত আহ্বানে তোমাকে যে আসিতে হইবে সে নিগূঢ় সন্ধান সকলে লাভ করিয়াছে, তাই আজ সকলে উৎসবে প্রবৃত্ত।

আজ সকলের উৎসব, মুক্তির উৎসব। প্রতিদিন সকলে যে একই অভ্যাসের ক্ষুণ্ণ পথে কুলাল-চক্রের ন্যায় চলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার উৎসব। আপনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্ধ হইয়া আসিয়াছে আমাদের যে নয়নমণি, আজ তাহা পিতার দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল হউক মুক্ত হউক। আর সংসারের চক্রে ঘুরিয়া মারিতে যে পারি না। ঋষিরা সত্যবাণী বলিয়াছেন—"যিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন—ন স পুনরাবর্ত্ততে—ন স পুনরাবর্ত্ততে।" তিনি আর ঘূর্ণীজলে ঘুরিয়া মরেন না। তিনি যে আর জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণীপাকে পড়েন না তাহা নহে। তাঁহার কর্ম্ম, বাক্য, সেবা আর প্রাণহীন জড়চক্রে ঘুরিয়া মরে না। এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের পশ্চাতে পশ্চাতে পর পর দিন লইয়া ঘুরিয়া মরা, সেই বাক্য, সেই চিন্তা, সেই কষ্ট, এই দৈন্য হইতে একেবারে তাঁহার মুক্তি হয়। এই উৎসবে আজ আমাদিগকে পরমা মুক্তিতে উপনীত কর। "উল্টা ফের লাগাও"—এই মৃত্যুচক্র হইতে স্বতন্ত্র গতি দান কর—উল্টা পথ ধরাও। তোমার কাছে বিনয় নহে, দাবী আছে। আমাকেও তুমি অনুনয় করিও না—আমাকে মুক্ত করিয়া ছাড়। তোমার সন্তান হইয়া কতকাল আর এই দুর্গতি এই দারুণ অপমান সহ্য করিয়া চলিতে হইবে?

তুমি ত কেবল দেবতা নহ, তুমি কেবল রাজা নহ, তুমি যে পিতা মাতা। এস পিতা, এই সভায় এস, আমাদের সকলের মধ্যে বস। তোমার গভীর প্রেমের তিমির-পরশে আমাদের হৃদয়কে বিকশিত করিয়া দাও, আমাদিগকে বৃহৎ করিয়া দাও হে ব্রহ্ম। প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি শক্তি দাও, শান্তি দাও, বীর্য্য দাও, ধৈর্য্য দাও, আশা দাও, বিশ্বাস দাও, প্রেম দাও। হে উৎসব-জননী, আমরা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ধন্য হই। সকল হৃদয়ে আজ তুমি অবতীর্ণ হও, সকলের হৃদয় আজ তোমার চরণে প্রণত হউক, এই উৎসব-প্রাঙ্গন আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

আলোচনা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে 'পুরাতন প্রসঙ্গের' সমালোচনায় সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ভিন্ন বাঙ্গলাতে ইতিপূর্ব্বে ঐ ধরণের কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই। সমালোচক মহাশয় ও পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের ঐরূপ ধারণা তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" যাহা উদ্বোধন পত্রিকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছিল, 'পুরাতন প্রসঙ্গের' পূর্ব্বে ও কথামৃতের পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে শরৎ বাবুর সহিত স্বামীজীর বিভিন্ন দিনে ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, ভারতের ইতিহাস, লক্ষ্য, সাধনা, কর্ত্তব্য, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল শরৎবাবু তাহা নিজ ডায়েরী হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রী।

ব্যুৎপত্তি-রহস্য

বা

বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যুৎপত্তিনিরূপণ-চেষ্টা।

শব্দের ব্যুৎপত্তি না জানিলে কোন ভাষাজ্ঞান সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেক শব্দেরই ব্যুৎপত্তি স্থির করা হইয়াছে এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে যে-কোন অভিধান হইতে শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় সে সুবিধা নাই। বাঙ্গলায় যে-সমস্ত অভিধান আছে, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। প্রায়ই ঐরূপ শব্দ অভিধানে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। যাহারা ভাগ্যক্রমে স্থান পায়, তাহাদের পর "দেশজ" বা "যাবনিক" এইমাত্র লিখিত থাকে। কিন্তু তাহাতে মনের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। কোন্ শব্দ কোন্ যাবনিক ভাষার কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা কোন্ দেশজ শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই মনে একটা ঔৎসুক্য হয়। কিন্তু সে কৌতূহল পরিতৃপ্তির কোন উপায় নাই। কাজেই বাঙ্গালী হইয়াও আমাদের বাঙ্গলা ভাষার জ্ঞান খুব অসম্পূর্ণ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে অনেকের পতিত হইয়াছে। শুনিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ একখানি অভিধান

প্রস্তুত করিতেছেন। যোগেশ বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ও সুপণ্ডিত। তাঁহার প্রস্তুত অভিধান উপাদেয় হইবারই সম্ভাবনা এবং উহা সম্পূর্ণ হইলে উহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার একটী গুরুতর অভাব মোচন হইবে সন্দেহ নাই। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার অভিধানের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই। কিন্তু যে অভাব অনুভব করিয়া যোগেশ বাবু এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমিও সেই অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি এবং সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিতে পারা যায় কি না তাহার চেষ্টাও কিছু দিন হইতে করিতেছি। তাহার ফলে কিঞ্চদধিক ১৫০০ শব্দ সংগৃহীত ও যথাশক্তি তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। এগুলি সমস্তই ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত। ইহাদের মধ্যে যেগুলি অধিক প্রচলিত এবং যেগুলিকে প্রায় সকলেই ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া জানেন, সেগুলির আলোচনা এখন করিব না। যেগুলি আপাততঃ খাঁটি বাঙ্গলা বলিয়া মনে হয় এবং যেগুলির ব্যুৎপত্তি সহসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ কতকগুলি শব্দের অদ্য আলোচনা করিব। এই ব্যাপার অতিশয় কঠিন এবং আমার ন্যায় সামান্য লোকের ইহাতে হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি এই গুরুতর ব্যাপার এক-জনের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন এবং সকলেরই ইহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টার সামান্য ফল সাধারণের গোচর করিতে সাহসী হইলাম। যদি ইহাতে বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্য অভিধান প্রণয়নে কিছুমাত্রও সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল মনে করিব।*

অবরে সবরে—"সময়ে, অসময়ে" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী "অবেরে সবেরে" হইতে গৃহীত। অবের অর্থে অবেলা, অসময়। সবের অর্থ 'সকাল'।

আলগোছে—"দূর হইতে", "স্পর্শ না করিয়া", এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা;—আলগোছে জল খাওয়া। হিন্দী "অলগ্‌সে" এই শব্দ হইতে উৎপন্ন। "অলগ্‌সে" হইতে "অলগছে", তাহা হইতে "অলগোছে", তাহা হইতে "আলগোছে"। "স" "ছ" হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা—হিন্দী "ঐসন" বাঙ্গালা "ঐছন", হইয়া গিয়াছে, "কৈসন" বাঙ্গলা "কৈছন" হইয়া গিয়াছে, বসি, অছি হইয়াছে।

আঙ্গিনা—স্পষ্টই হিন্দী হইতে। প্রাচীন কাব্যে এবং সম্ভবতঃ চলিত কথাতেও "উঠান"এর পরিবর্ত্তে "আঙ্গিনা" ব্যবহৃত হইত। [সং অঙ্গন হইতে নহে কেন?—প্র. স.]

কুঞ্চি—অবিকল ফারসী—"কমচি" শব্দ।

কাঁচি—ফারসী "কৈঁচি" শব্দ।

কেঁদো—"মোটা" অর্থে ব্যবহৃত; যথা—"কেঁদো" বাঘ। সম্ভবতঃ ফারসী "কুন্দ" মোটা শব্দ হইতে গৃহীত। "কুন্দ" হইতে "কুঁদো," তাহা হইতে "কেঁদো" হওয়ার সম্ভাবনা।

* লেখক মহাশয়ের তালিকায় প্রদত্ত যে-সমস্ত শব্দ যোগেশ বাবুর শব্দকোষে আছে তাহা বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল। যেগুলি একেবারে নূতন বা যেগুলির ব্যুৎপত্তিতে সামান্যও নূতনত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেগুলি রক্ষিত হইল। অতঃপর যিনি এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন তিনি যেন যোগেশ বাবুর শব্দকোষ দেখিয়া তবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যোগেশ বাবুর শব্দকোষ 'প' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে; এজন্য 'প'য়ের পরের শব্দ সমস্তই দেওয়া হইল। —প্রবাসীর সম্পাদক।

কিরীচ—Malay "Crease" শব্দ হইতে।

কচে বারো—হিন্দী "কচ্চে বারহ" হইতে গৃহীত। পাশা খেলায় ছয়, পাঁচ ও এক লইয়া যে বারো হয়, তাহাকে হিন্দীতে "কচ্চে বারহ" অর্থাৎ কাঁচা বারো বলে। এখানে আমরা একেবারে বিভক্তি সমেত বহুবচনান্ত "কচ্চে" শব্দ লইয়া উহাকে বাঙ্গলায় "কচে" করিয়া লইয়াছি, "কচ্চে"র অনুবাদ "কাচা" করিয়া লই নাই। এইরূপে বিভক্তিসমেত হিন্দী শব্দ গ্রহণ করার প্রমাণ আরও দেওয়া হইবে।

কামান—হয় ইংরাজী Cannon বা ফরাসী Canon শব্দ হইতে উৎপন্ন, নতুবা ফারসী 'কমান' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফারসী 'কমান' অর্থে ধনুক। সুতরাং ইংরাজী বা ফরাসী হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

কুদা—যেমন "নেচে কুদে বেড়াচ্চে"। হিন্দী "কুদনা" লাফান।

কুলী—ফারসী ও তুরকী "কুলী" শব্দ। [কুলী মানে শ্রেষ্ঠ; তুলনীয় মুর্শীদ কুলী খাঁ, হোসেন কুলী খাঁ। নীচ কর্ম্মকেও সম্মানিত করিবার Dignity of Labour চেষ্টা প্রাচ্যদেশে অনেক দেখা যায়; যেমন, মেহতর=শ্রেষ্ঠ।—প্র. স.]

খোরা—ফারসী "খোরা" শব্দ। [অর্থ—ভোজনপাত্র—প্র. স.]

খানকা বা খামকা বা খামখা—ফারসী "খানখা" শব্দের অপভ্রংশ।

খাড়ি—"আস্ত", "গোটা" অর্থে ব্যবহৃত; যেমন খাড়ি মসুর। হিন্দী "খড়া" শব্দ। এখানেও বিভক্তি-সমেত হিন্দী শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দীতে "দাল" বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং তাহার বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গের বিভক্তি দিতে হয়। যেমন খড়ী মসূর, হরী মুংগ ইত্যাদি। খড়া মসূর বা হরা মুংগ বলিলে ভুল হইবে। বাঙ্গলায় ওরূপ লিঙ্গের ভেদাভেদ নাই, সুতরাং বাঙ্গলায় খাড়ী মসূর বলার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু হিন্দীর প্রভাব বশতঃ স্ত্রীলিঙ্গ "খাড়ি"ই রহিয়া গিয়াছে—কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

খেয়া—হিন্দী "খেবা" শব্দের অপভ্রংশ। "খেনা" অর্থে দাঁড় টানা।

খুঞ্চাপোষ—ফারসী "খাঞ্চাপোষ" হইতে গৃহীত।

গুনোগার—ফারসী (গুনহ্‌গারী) শব্দ হইতে। [যোগেশ বাবুর শব্দকোষে 'গুনকার' আছে; কিন্তু গুনকার বলিতে শুনা যায় না, গুনোগারই বলে।—প্র. স.]

চড়ক—সম্ভবতঃ ফারসী চরখ চক্র শব্দ হইতে উৎপন্ন।

চাচনি—ফারসী চাশনি শব্দর অপভ্রংশ। [অর্থ—স্বাদ পরীক্ষার্থ নমুনা। এই শব্দ হইতে চাটনি শব্দেরও উৎপত্তি।—প্র. স]

চোট—হিন্দী শব্দ।

চাই—হিন্দী চাহি শব্দ, চাহনা ইচ্ছা করা হইতে। ঐরূপ চাও=চাহো, চায়=চাহে।

চওলা—যথা, কাদা চওলা। হিন্দী চহলা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ছবি—আরবী "সবীহ্‌" শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ছাঁচি—যথা, ছাঁচি পান। হিন্দী স্ত্রীলিঙ্গ সচ্চী শব্দের অপভ্রংশ।

ঝুরো, ঝুরী—হিন্দী ঝুরা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ঝকমারি—হিন্দী ঝক্ মার্‌না হইতে উৎপন্ন।

ঝুমকো—হিন্দী ঝুমকা শব্দ; ঝুমনা—ঝুলিয়া থাকা।

ঝুঁকি—যেমন উঁকি ঝুঁকি মারা। হিন্দী ঝাঁক্‌না=উঁকি মারা।

ঝাঁপি, ঝাঁপিল—হিন্দী ঝাঁপ্‌না=ঢাকা।

টহল—যেমন টহল দেওয়া। হিন্দী টহল=বেড়ান।

টেড়ী—সম্ভবতঃ হিন্দী টেড়ী(বাঁকা) শব্দ হইতে উৎপন্ন। মাথার একপাশে বাঁকা করিয়া চুল ভাগ করার নাম টেড়ী। মাথার মধ্যস্থলে ঐরূপ ভাগ করাকে সিঁথি বলে। এই সিঁথি শব্দ

হিন্দী সীধী=সোজা শব্দের অপভ্রংশ। [সংস্কৃত সীমন্ত হইতে নহে?—প্র. স.]

টুপি—হিন্দী টোপী শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী টোপনার অর্থ ঢাকা। যাহা দ্বারা (মস্তক) ঢাকা যায় তাহাই টুপী।

টোপর—সম্ভবতঃ টোপনা হইতে উৎপন্ন।

টেড়া—যথা—টেড়া বাঁকা। হিন্দী টেঢ়া শব্দ হইতে উৎপন্ন।

ডোকরা—যেমন বুড়ো ডোকরা। হিন্দী ডোকরা=বৃদ্ধ।

ডগর—রাস্তা; সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে গরু যাইবার রাস্তাকে ডগর বলে। হিন্দী ডুগর (রাস্তা) শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

দো-আঁসলা—ফারসী দোনস্‌লা শব্দের অপভ্রংশ। [আরবী নস্‌ল্‌=বংশ, কুল।—প্র. স.]

দাদখানি—সম্ভবতঃ দাউদ খান্‌ (=খাঁ) নামক কোন ব্যক্তির নাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

ধুপ—রৌদ্র অর্থে, যেমন ধুপছায়া। হিন্দী ধুপ শব্দ।

নীম—অর্দ্ধ অর্থে; যেমন নীমরাজি। ফারসী শব্দ। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মতে সংস্কৃত নেম=অর্দ্ধ শব্দও পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন।

নোলক—হিন্দী লোলক শব্দ; লোলনা=দোলা।

নৈচা—ফারসী নৈচা শব্দ। হুকার নলচে।

পানি—যেমন পানিফল। হিন্দী পানী শব্দ।

পান্‌সে—হিন্দী পানী সা (অর্থাৎ জলের মত) শব্দের অপভ্রংশ।

পলিতা—ফারসী পলীতা শব্দ।

পিয়ারী—যেমন রাজার নন্দিনী প্যারী, অথবা পিয়ারী লাল। হিন্দী পিয়ারী=প্রিয়।

পয়মাল—ফারসী পায়েমাল=পদদলিত, নষ্ট।

পিরান—ফারসী পৈরাহন্‌ শব্দ।

পৈঠা—হিন্দী পৈঠাও শব্দ। পৈঠনা=প্রবেশ করা। যাহা দ্বারা প্রবেশ করা যায় তাহা পৈঠা।

বেড়ে—ভাল অর্থে; হিন্দী বঢ়িয়া।

বোঁচকা—ফারসী বুক্‌চা শব্দের অপভ্রংশ।

বাউল—পাগল অর্থ; হিন্দী বউলানা=পাগল হওয়া। [সং বাতুল বা ব্যাকুল শব্দের অপভ্রংশ নহে কেন?—প্র. স.]

বাহুড়ি—যেমন বাহুড়ি আইল=ফিরিয়া আসিল; হিন্দী বহুড়না=ফিরিয়া আসা।

বালিশ—ফারসী বালীশ শব্দ।

ব্যারাম বা বেয়ারাম—ফারসী বে-আরাম শব্দ।

বাস্‌—যেমন "বাস্‌, আর চাই না।" অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে। ফারসী বস্‌—যথেষ্ট।

ভুনী—যেমন ভুনী খিচুড়ী। হিন্দী ভুনী=ভাজা; ভুন্‌না=ভাজা।

ভাগ, ভাগিয়ে দেওয়া—যেমন মেরে ভূত ভাগিয়ে দেব। হিন্দী ভাগ্‌না=পালান।

ভঁয়সা—যেমন ভঁয়সা ঘি; হিন্দী ভৈঁসা; ভৈঁস=মহিষ।

ভেক্‌—যেমন "ভেক না হইলে ভিক্ষা মেলে না"। হিন্দী ভেখ শব্দ। বেশ হইতে ভেষ, যাহা হিন্দী উচ্চারণ অনুসারে ভেখ হইয়াছে।

ভেজিয়ে দেওয়া—যেমন "দোরটা ভেজিয়ে দাও"; হিন্দী ভেজ দেনা=পাঠিয়ে দেওয়া।

ভাটকা—যেমন ভুল ভাটকা; হিন্দী ভটকনা=ঘুরে ঘুরে বেড়ান; পথ ভুলে যাওয়া।

মামা—আরবী মনহ্‌ শব্দ।

মজা—ফারসী মুজ্‌হ শব্দ।

মাফ—ফারসী মাফ্‌ শব্দ।

মেম—ইংরাজী Madamএর সংক্ষেপ ma'am হইতে।

মাইরী—সম্ভবতঃ Mary হইতে।

রাখাল—সম্ভবতঃ হিন্দী রখবাল শব্দ হইতে উৎপন্ন।

লাল—"বালক" অর্থ। যেমন লালগোপাল=বালগোপাল। লালমাধব=শিশুমাধব, বালমাধব। পেয়ারীলাল=প্রিয়বালক। হিন্দী লাল=বালক, ছেলে। কিন্তু পান্নালাল, চুনীলাল ইত্যাদির লাল শব্দ বালক অর্থবাচক নহে, কিন্তু উহা ফারসী লা'ল, যাহার অর্থ পদ্মরাগ মণি।

লেন দেন—হিন্দী লেনা দেনা হইতে উৎপন্ন।

লেবু—আরবী লীমু শব্দের অপভ্রংশ।

লুচি—হিন্দী লুচই শব্দ। সম্ভবতঃ লচনা—নত হওয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা "নচ নচ" শব্দও এই লচনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

লেঙ্গড়া—হিন্দী লঙ্গড়া (=খোঁড়া) শব্দ। যেমন লেঙ্গড়া আম্‌। শুনা যায় যে, কাশী অঞ্চলে কোন একটা ভাল আম গাছ বায়ুবেগে হেলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে উহাকে লঙ্গড়া=খোঁড়া বলা হইত। সেই আম্র হইতে যত আম্রের উৎপত্তি হইয়াছে, সকলেই 'লঙ্গড়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বালাই—ফারসী বালা'এ শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ আপদ্‌সমূহ।

সিন্নি—ফারসী শিরিনী শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সুরকি—ফারসী সুর্‌খী শব্দ; অর্থ লাল। ইঁটের গুঁড়া লাল বলিয়া ইহাকে সুর্‌খী বা সুরকি বলা হইয়াছে।

সাঁচ্চা—হিন্দী সাচ্চা শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সাবান—ফরাসী Savon শব্দ।

সখ, সৌখীন—ফারসী শৌক শব্দ হইতে উৎপন্ন।

সাউকোড়—হিন্দী সাহুকার (মহাজন) শব্দের অপভ্রংশ।

সাদ বা সাধ—ফারসী শাদ=আহ্লাদ, আনন্দ শব্দ।

হালি—যেমন 'হালি মুগ'। হিন্দী 'হরী' শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দীতে মুগ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কাযেই উহার বিশেষণ হরী হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলাতে 'মুগ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নহে অথচ আমরা হালি মুগ বলিয়া থাকি। ইহার কারণ আমরা হিন্দী 'হরী' শব্দ গ্রহণ করিয়া উহাকে 'হালি' করিয়া লইয়াছি।

শ্রীকালীপদ মৈত্র।

প্রতিহিংসার মুল্লুক

পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আগুনের ফুলকী" নামক উপন্যাস পাঠে কর্সিকানদিগের অদ্ভুত প্রতিহিংসা সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছেন; এক্ষণে আমি এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম।

ইতালীর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে, ফ্রান্সের একশ' মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপশ্রেষ্ঠ কর্সিকা ইউরোপীয়

দেবশিশু ।

সার যশুয়া রেনল্ড্‌স্‌ কর্ত্তৃক অঙ্কিত

COLOUR-BLOCKS AND PRINTING BY
U. RAY & SONS, CALCUTTA.

সভ্যতার কয়েকটী কেন্দ্রের নিকটে থাকিয়াও মহাতাপসের ন্যায় বহির্জগত হইতে সর্ব্বপ্রকার সংস্রবশূন্য। অজ্ঞানতা হইতে উন্নতি লাভে নিশ্চেষ্ট কর্সিকানগণ এরূপ আদিম অসভ্যতায় নিমগ্ন যে তদ্দর্শনে সভ্য জাতিগণ বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সভ্য জাতিগণের উন্নতি ও সভ্যতা, কোন-কিছুরই উপর কর্সিকানগণ লক্ষ্য রাখে না এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষে যতদূর অজ্ঞান হওয়া সম্ভবে, কর্সিকানগণ ততদূর অজ্ঞান।

কিন্তু কর্সিকার ইহা অপেক্ষাও একটী অত্যন্ত কলঙ্কের কথা আছে। ইহার প্রত্যেক পর্ব্বত উপত্যকা প্রতিহিংসা নিবৃত্তির জন্য পাতিত নররক্তে রঞ্জিত। যাঁহারা কর্সিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি এবং অধিবাসীদিগের মহত্ব এবং গর্ব্বহীনতার জন্য কর্সিকার পক্ষপাতী, তাঁহারাও কর্সিকানদিগের অদ্ভুত প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা ভাবিতেও লজ্জিত হন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কর্সিকার অধিবাসীগণের প্রতিহিংসার জন্য নরহত্যা এখন অতীত কাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও একজন কর্সিকান ঐতিহাসিক বলেন যে ১৫৩৯ হইতে ১৭২৯ অব্দ ১৯০ বর্ষ মধ্যে, তিন লক্ষ এবং ১৮২১ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে—৩১ বর্ষে ৪৩০০জন মনুষ্য প্রতিহিংসাবশে নিহত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জিকোভা নামক গ্রামে দুই দলে এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে উভয় পক্ষে চারিজন লোক যোগদান করে, কিন্তু প্রতিপক্ষের অব্যর্থ-লক্ষ্য গুলির নিকটে কেহই অব্যাহতি পায় নাই এবং সকলেই প্রাণত্যাগ করে। এই চারি ব্যক্তির প্রকাশ্য স্থানে সংগ্রামের ন্যায় বিস্ময়কর কোন কিছু এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। কিন্তু কর্সিকায় প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাহার সেই-সব প্রজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, যাহাদের নিকট গোমেষাদি পশুর এবং মানবের জীবন সমান? ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এরূপ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং আইন করিয়াছেন, যে-ব্যক্তি লুকাইয়া পিস্তল বা ছোরা সঙ্গে লইয়া বেড়াইবে ধরা পড়িলে তাহার জেল হইবে। কিন্তু কর্সিকানরা এ আইনের প্রতি লক্ষ্যও রাখে না এবং পুলিশও চক্ষু মুদিয়া থাকে। যাঁহারা কর্সিক রীতিনীতি অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে আইন দ্বারা এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ নরহন্তা পলাতকদিগের আশ্রয়স্বরূপ থাকিবে, যে পর্য্যন্ত গ্রামবাসীগণ উক্তরূপ মনুষ্যদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে এবং পুলিশের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইবে না। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় এবং অতর্কিতভাবে আক্রমণের জন্য অনেকে দুই তিন প্রকার অস্ত্র না লইয়া ঘরের বাহির হয় না। বন্দুক, পিস্তল ও এক জোড়া ছোরা সঙ্গে আছে এরূপ লোকও রাস্তায় দেখা যায়। এবং বার বৎসর ও তাহার ঊর্দ্ধবয়স্ক প্রায় সকল বালকই বন্দুক বা ছোরার ব্যবহারে সুদক্ষ।

বাহিরের কোন লোকের পক্ষে কোন কর্সিকানের নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন কথা বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন কর্সিকানকে প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরে বিশ্বাস করেন, তিনি প্রায়ই ভ্রমে পতিত হন। তিনি ইহাও মনে করিতে পারেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্সিকান প্রতিহিংসা কাহিনী মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতা এবং বোধশক্তি দ্বারা প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিবেন তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইবে।

বন্দুক, পিস্তল এবং "Vendica l'honore," "Vendetta corse", "Morte al nemico" প্রভৃতি মটো-অঙ্কিত ছোরা খুনীদিগের অত্যন্ত প্রিয়। বর্ত্তমান কালে সংখ্যায় কম হইলেও পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলাতক হত্যাকারী এখনও আছে। জনৈক কর্সিকাপ্রবাসী বলেন যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় শত শত, অপর পক্ষে একজন ফরাসী সৈনিকপুরুষ—অবশ্য কর্সিকা তাঁহার কর্ম্মস্থল—বলেন যে, এরূপ ব্যক্তি বর্ত্তমানে মাত্র তিন চার জন হইবে।

ইহার মধ্যে কাহার কথা ঠিক তাহা বলা যায় না। তবে এরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব যে এখনও আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, প্রতিহিংসার বশে খুন করিয়া

পলাতক ব্যক্তির সন্ধানে অশ্বারোহী পুলিশদিগকে প্রায়ই নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীগণের গৃহ খানাতল্লাস করিতে দেখা যায়।

এরূপ ব্যক্তি যে আছে তাহার আরও এক প্রমাণ যে, পিটকেরন নোয়েলস্ নামক জনৈক কর্সিকাভ্রমণকারী বলেন "এরূপ ব্যক্তি যে বিংশ শতাব্দীতে আছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি কর্সিকা হইতে দুইটী ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। গভর্ণমেণ্ট জনৈক খুনীর গতিবিধির সংবাদ তাহার এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর নিকট পাইয়া এবং কোন্ সময়ে ও কোথায় তাহার সহিত খুনী দেখা করিবে জানিতে পারিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে চারজন সৈন্য পাঠাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে খুনীকে জীবিত অথবা মৃত যে প্রকারে হউক আনিবার আদেশ দেওয়া হয়।

"আমার ফটোগ্রাফার আবার একজন সৈনিকের নিকট হইতে এই বিষয় জানিতে পারিয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় গিয়া ঝোপের মধ্যে ক্যামেরা সমেত এরূপ স্থানে লুকাইয়া থাকেন, যেখান হইতে তিনি আশ পাশে চারিদিকেই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হত্যাকারী তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। পরে আক্রমণকারীদিগের সুবিধাজনক স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারা গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক অ-সমান যুদ্ধও আরম্ভ হইল, কারণ তাহারা জানিত যে প্রাণ থাকিতে খুনী ধরা দিবে না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং বক্ষে আহত দস্যু ভূপতিত হইল। ফটোগ্রাফারও ক্ষিপ্রহস্ততার গুণে যুদ্ধের দুইটী ফটো লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"

যাহা হউক বর্ত্তমানে উক্ত শ্রেণীর লোক অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দেশ আরও উন্নতি লাভ না করিলে তাহারা একেবারে লোপ পাইবে না। কর্সিকার রীতিনীতি হইতেই জানা যায় যে কর্সিকানরা বাল্যকাল হইতেই অসমসাহসিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সার্টন নামক জেলায় নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদের প্রথা এইরূপ—"আহা! ঈশ্বর করুন তুমি যেন বন্দুকের গুলিতে মর"। যে সকল ব্যক্তি গৃহে মরে বা অপর কোন দেশে গিয়া বাস করে তাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে এবং তাহাদের পরলোকগত পিতামাতারাও সহজে নিষ্কৃতি পান না। অপর পক্ষে যাহারা এইরূপে খুন হয় বা শত্রুকে খুন করে তাহারা "জাতীয় বীর" নামে অভিহিত হয়।

যে স্থলে নিহত ব্যক্তির শরীর পাওয়া যায় তথায় বা তাহার যতদূর সম্ভব নিকটে ক্রুশ কাষ্ঠ স্থাপন করাও এক প্রথা। হত ব্যক্তির সহিত মৌখিক আলাপ পরিচয় ছিল এরূপ ব্যক্তিগণ সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় মস্তক হইতে টুপী উত্তোলন করে এবং আত্মীয়গণ ও যাঁহারা বিশেষ বন্ধু ছিলেন তাঁহারা রাস্তা হইতে এক খণ্ড কাষ্ঠ ও মাটীর ঢেলা তুলিয়া ক্রুশের তলদেশে রাখিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রার্থনাও গাওয়া হয় এবং প্রার্থনার শেষে খুনীর উপর প্রতিশোধ লওয়ার একটা প্রতিজ্ঞাও জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তর বা কাষ্ঠখণ্ড সঞ্চিত হইতে হইতে স্তূপের আকার ধারণ করে। হত্যার সাম্বৎসরিক শোক প্রকাশের দিন অগ্নি-সংযোগে কাষ্ঠখণ্ড সমূহ ভস্মীভূত করা হয়।

হত্যাকারী পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে এবং তাহার অনুচর ও বন্ধুবর্গের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই হত্যাকারীদিগকে পলায়নপটুতার বলে দশ বিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পলাতকগণ বন্ধুবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাতের জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করে। তাহারা প্রায়ই মুড়িসুড়ি দিয়া মুখস পরিয়া কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মিছিলে যোগদান করে এবং পুলিসের চক্ষুর সম্মুখেই নিরাপদে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও আবার খুনীও হত হয়। এরূপও দেখা গিয়াছে যে স্বামী- অথবা পুত্রহারা স্ত্রীলোক প্রতিহিংসা লইবার জন্য পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া বন্দুক হস্তে দিবানিশি হত্যাকারীর সন্ধানে ফিরিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে।

পলাতক খুনী আজীবন গভর্ণমেণ্ট ও শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় এবং যতদিন না সে বন্দুকের গুলিতে ভূতলশায়ী হয় ততদিন বিরুদ্ধ পক্ষের যথাসাধ্য ক্ষতি করিতে থাকে।

পলাতক খুনীদিগের মধ্যে অনেকে গভর্ণমেণ্ট ও শত্রুপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া এত খ্যাতিলাভ করিয়াছে যে তাহাদের নাম 'প্রায় প্রতি-গৃহেই উচ্চারিত এবং উপমাস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে খ্যাত লোকের মধ্যে "বেলাকোসকিয়স" ভ্রাতৃদ্বয় সমধিক প্রসিদ্ধ। অ্যাণ্টয়েন ও জ্যাকুয়েস বেলাকোসকিয়স চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল—১৮৪৮ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—গভর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া লুকাইয়া ছিল। তাহারা একটা কলহের বশে একজন সরকারী পুলিসের কর্ম্মচারীকে খুন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য মিলিটারী পুলিসের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং এতদুপলক্ষে যে-সকল দাঙ্গা হয় তাহাতে পুলিশপক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। গ্রামবাসীগণ বিস্ময়হেতু এবং কতকটা তাহাদের ভয়ে খুনীদ্বয়ের সহিত যোগ দান করে। এইজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে একটা বেশ বড় রকমের সামরিক অভিযানও কোন কার্য্যের হয় নাই।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ঐ দুই ভাই শত্রুপক্ষীয়দিগকে হত্যা এবং গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে কর আদায় —সংক্ষেপে বলিতে সমগ্র অঞ্চলে প্রচুর ক্ষমতাভোগ— করিতে থাকে; অবশেষে ২০ বৎসর পূর্ব্বে শেষ বেলাকোসকিয়স অ্যাণ্টয়েনকে ক্ষমা করা হয় এবং সে গ্রামবাসীদের সহিত শান্তিতে বাস করিতে থাকে। এখনও অ্যাজাকসিওর দোকানে, বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে এবং পোষ্টকার্ডেও বেলাকোসকিয়সের ছবি দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস কর্সিকবীরদিগের মধ্যে নেপোলিয়নের পরেই বেলাকোসকিয়সের স্থান

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্াওলী নামক একজন খুনী অ্যাজাকসিয়োয় ধৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ধরাইয়া দেয় এবং সে দশ বৎসরের জন্য নিউক্যালিডোনিয়া দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়। তাহার কিছুদিন পরেই যে-ব্যক্তি তাহাকে ধরাইয়া দেয় সে খুন হয় এবং আরোপিত হত্যাপরাধে পাওলীর দুই ভাইয়ের জেল হয়। কয়েক দিন পরে কর্সিকার শাসনকর্ত্তা পাওলীর হস্তে পতিত হন এবং সে তাহাকে বলে যে তাহার ভাইদের মুক্তি না দিলে সে তাঁহাকে হত্যা করিবে। পাওলী আরও বলে যে সে ক্যালিডোনিয়া হইতে পলায়ন করিয়া তাহার শত্রুকে খুন করিয়াছে, যাহাদের জেল হইয়াছে তাহারা নির্দ্দোষ। তাহাকে পুনরায় ধরিবার জন্য চেষ্টা হইতে থাকে। অবশেষে একজন স্ত্রীলোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দেয়।

"ভসেরো" নামক কর্সিকার অন্ত্যেষ্টি-গীত এখনও কোন কোন অঞ্চলে শুনা যায়। কোনও নিহত ব্যক্তির সমাধিকালের "ভসেরো" অত্যন্ত শোকোদ্দীপক দৃশ্য। হতব্যক্তির পরিবারভুক্তা স্ত্রীলোকগণ কফিনের নিকটে মুক্তকেশে দাঁড়াইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হতব্যক্তির গুণগান এবং হত্যাকারীকে অভিসম্পাত প্রদান করিতে থাকে। এমন স্ত্রীলোকও দেখা যায় যাহারা শোকের আবেগে মুখের চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শোকচিহ্নস্বরূপ ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে।

এইরূপ নানা কারণে ভ্রমণকারীগণ, মধ্যযুগের সভ্যতার ন্যায় অর্দ্ধ সভ্যতার সীমারূঢ় দেশ—কর্সিকা ভ্রমণ করিতে চান না। কিন্তু যাঁহারা আগে হইতেই এরূপ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যপূর্ণ দেশ ভ্রমণ করা নিরর্থক বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন তাঁহারা প্রায়ই ভ্রমে পতিত হন। কর্সিকায় আগত বিদেশী লোক স্বদেশের অনেক স্থল অপেক্ষা কর্সিকায় নিরাপদ। কর্সিকাবাসীদিগের কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের সহিত সংস্রব না রাখিলে বিদেশীর পক্ষে তাহাদিগকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ইহাও সম্ভব যে ভ্রমণকারী কোন পর্ব্বতাদি দেখিতে গেলে তথায় লুক্কায়িত কোন খুনীর সহিত তাহার দেখা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ পলাতক খুনী অনর্থক খুন অথবা লুট করে না এবং অপরিচিতের অপকারের চিন্তা তাহাদের মনে কখনও উদিত হয় না। পলাতক খুনী অদ্ভুত উত্তেজনাপূর্ণ মনুষ্য মাত্র। এবং তাহার বংশের প্রতি কৃত কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহার-জানা একমাত্র উপায়ে সে লইয়াছে, এইমাত্র তাহার দোষ। নতুবা সে চোর ডাকাত বা অসাধু ব্যক্তি নহে; তাহাদের হৃদয় বীরত্বের ঔদার্য্যে পূর্ণ থাকিতেই দেখা যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে যখন "জোর যার মুলুক তার" এই নীতি সার ছিল এবং যখন "যে আমার অপকার করিয়াছে আমিও তাহার অপকার করিব" ইহাই অন্যায়াচরণের একমাত্র প্রতিকার ছিল, যখন কর্সিকা জেনোয়ার অধীনে ছিল, তখন হইতে জেনোয়া গভর্ণমেণ্টের অসীম অত্যাচারের ফলে কর্সিকানরা এইরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কর্সিকানরা মিথ্যা কথা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং চৌর্য্যকে ঘৃণা করে। কিন্তু শত্রু এবং তাহার নিরপরাধ আত্মীয় স্বজনকে বধ করাকে তাহারা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

শ্রীঅমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বৰ্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হন। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন।]

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিবসে একটী শুভদিন দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ সুরেন্দ্রকে লইয়া পুরুলিয়ায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সুরেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া, মনোরমার মুখখানি সমস্ত দিন ভার-ভার ও বিমর্ষ রহিল। মধ্যে মধ্যে তিনি গোপনে অশ্রুমোচন করিয়া অঞ্চলে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রের জন্মাবধি তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই। আজ তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মনোরমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একবার হাত-পা ছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারিলে, তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার লঘু হয়। কিন্তু কাঁদিলে অমঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়েই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

মনোরমা স্বহস্তে সুরেনের তোরঙ্গ সাজাইয়া ও বিছানা গোছাইয়া দিলেন, এবং স্নানাহার সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। বল্লভপুরে আসিয়া অবধি, সুরেনের লেখাপড়ার সুবিধা ছিল না, এই জন্য তাহার মনে স্ফূর্ত্তির একান্ত অভাব ছিল। এক্ষণে সে স্কুলে পড়িতে যাইতেছে, এই চিন্তায় তাহার মনে বিলক্ষণ আহ্লাদ হইতে লাগিল। কিন্তু যাত্রা করিবার সময়, তাহার কোমল হৃদয়টি প্রিয়জনগণের সহিত আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কনিষ্ঠা ভগিনী বিভাকে কোলে করিয়া কতবার তাহার মুখচুম্বন করিল; নরুকে সঙ্গে করিয়া একবার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে গেল ও তাহাকে দুই চারিটি পুষ্প তুলিয়া দিল। সে নরুকে বলিল "নরু, তুমি আমার জন্য কেঁদ না। আমি তোমার জন্য কলের গাড়ী, ছোট বন্দুক, আর কত-কি নিয়ে আস্‌ব। বুঝ্‌লে?"

নরু বলিল "দাদা, তুমি কোথায় যাবে?"

সুরেন বলিল "আমি স্কুলে পড়্‌বার জন্য পুরুলিয়া যাব।"

নরু বলিল "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সুরেন বলিল "নরু, তুমি যখন আমার মতন বড় হ'বে, তখন যাবে। এখন বাড়ীতে মার কাছে থাক।"

নরু কাঁদিয়া উঠিল ও বলিল "না, আমি মার কাছে থাক্‌ব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" নরু পুষ্পোদ্যান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর আসিয়া

জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল "মা, আমি তোমার কাছে থাকৃব না; আমি দাদার সঙ্গে যাব।" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জননী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইতে গেলেন। কিন্তু নরু ক্রোড়ে না উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা জননীকে আঘাত করিতে করিতে বলিল "না, আমি তোমার কাছে থাকৃব না, আমি দাদার সঙ্গে যাব।" জননী ও নরুকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র বিভাও কাঁদিয়া উঠিল; এবং জননীর ক্রোড়ে উঠিবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুটী বাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে সৌদামিনী সেখানে আসিয়া এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। সৌদামিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল "নরু, তোমার মার কাছে তোমায় থাকৃতে হ'বে না। তুমি আমার কাছে থাকৃবে। তোমার দাদা শীগ্‌গীর্ তোমার জন্য কলের ঘোড়া, কলের গাড়ী, কলের হাতী, কত কি নিয়ে আস্‌বে। বুঝলে?"

নরু অল্প শান্ত হইয়া বলিল "দাদা আর কি আন্‌বে?"

"তুমি যা বল্‌বে, তাই নিয়ে আস্‌বে।"

নরু বলিল "কাকাবাবুর মত একটা গাড়ী?"

সৌদামিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, তাই আন্‌বে।" এই বলিয়া তাহাকে পুষ্পোদ্যানে লইয়া গেল।

যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখাইয়া ক্ষেত্রনাথ সকলকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। মনোরমা চক্ষুর জল মুছিয়া সুরেনকে কিছু খাওয়াইলেন। ইত্যবসরে গাড়ীতে জিনিষপত্র উত্তোলিত হইল। সুরেন্দ্র পিতাকে, জননীকে, মাসীমাকে, ও নগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া এবং নরুর জন্য একটা সাইকেল গাড়ী আনিবার অঙ্গীকার করিয়া পিতার সহিত যানে আরোহণ করিল।

সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় ক্ষেত্রনাথ সুরেনের সহিত পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন।

সুরেন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহাদের স্কুল হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্ লইয়া আসিয়াছিল। তাহা দেখাইয়া সে শুভমুহূর্ত্তে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইল।

সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়ায় রাখিয়া, ক্ষেত্রনাথ আসানশোলে গেলেন এবং সেখানে কয়লার হিসাব মিটাইয়া পুরুলিয়ায় আসিবার জন্য গাড়ীর প্রতীক্ষায় প্লাট্‌ফর্ম্মে পদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তাহার বেশ-ভূষায় দৈন্য সূচিত হইতেছিল। গায়ে একটী ছিন্ন কোট, র‍্যাপারখানিও ছিন্ন ও মলিন; পরিধেয় বস্ত্রও মলিন; পায়ের জুতা জোড়াটি জীর্ণ ও হস্তে একটী ছোট পুঁটুলি। মাথার কেশ অনেক দিন কর্ত্তিত হয় নাই। মুখে সামান্য গোঁপের রেখা; বদনমণ্ডল বিশুষ্ক; কিন্তু চক্ষুদুটী উজ্জ্বল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

যুবক ক্ষেত্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি চাও?"

যুবক উত্তরে কি বলিবে, তাহা যেন প্রথমে স্থির করিতে পারিল না; পরে বলিল "মশাই, আমি বিপদে পড়েছি।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম বিপদ?"

যুবক বলিল "মশাই, আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমি আর অধিক পড়তে পারি নাই। পিতার মৃত্যুর পর আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য কর্‌তে পারেন এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ্‌তে না পেয়ে, একটী চাকরীর চেষ্টায় আমি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মা আছেন, আর একটী ছোট ভাই আছে। আমি কোনও স্কুলে মাষ্টারী, কোনও আফিসে কেরাণীগিরি, কিম্বা যে-কোনও কাজ হোক্, কিছু একটা কর্‌বার জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি ও কত দরখাস্ত করেছি। কিন্তু কোথাও চাকরী পাই নাই। আসানশোলের কাছে অনেক কয়লাকুঠী আছে শুনে এখানে চাক্‌রীর চেষ্টায় এসেছিলাম; কিন্তু এখানেও কোনও চাকরী পেলাম না। সঙ্গে যা পাথেয় ছিল, তা ফুরিয়ে গেছে। আপনাকে বল্‌তে লজ্জা হয়, কিন্তু না ব'লেও থাক্‌তে পারছি না—আজ সমস্ত দিন আমি কিছু খাই নাই। আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। কোথায় যাব, কেমন ক'রে যাব, আর কি যে কর্‌ব, তা ঠিক্ কর্‌তে পার্‌ছি না। আপনাকে

দেখে সাহস ক'রে আপনার কাছে এলাম। আপনি দয়া ক'রে কোথাও আমার একটা উপায় ক'রে দিতে পারেন? আমি বেশী বেতন চাই না। খেয়ে প'রে যদি আপাততঃ পাঁচটি টাকাও পাই, তা হ'লেই যথেষ্ট হবে। আমার মা এক জ্ঞাতির বাড়ীতে কাজকর্ম্ম ক'রে কোনও-রূপে জীবন ধারণ কর্‌ছেন। আমি যদি মাসে মাসে তাঁকে পাঁচটি টাকা পাঠাতে পারি, তা হ'লে তাঁর ও আমার ছোট ভাইটির কোনওরূপে প্রাণরক্ষা হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে যুবকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল এবং সে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেত্রনাথ যুবকের কাহিনী শুনিয়া কিছু বিচলিত হইলেন। তিনিও একদিন দারিদ্র্যের তাড়নায় উন্মত্তের ন্যায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। সহসা সেই স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরিত হইল। যুবকটি যে বাস্তবিক বিপন্ন হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবক বলিল "আমার নাম শ্রীঅমরনাথ দাস। আমরা জাতিতে তন্তুবায়। আমার নিবাস নদে জেলার চণ্ডীপুর গ্রামে।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পিতার কি কোনও কাজকর্ম্ম ছিল না?"

যুবক বলিল "না; তিনি কৃষ্ণনগরে একটী কাপড়ের কানে চাকরী কর্‌তেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা, অমরনাথ, তুমি চাকরীর চেষ্টায় নদে জেলা থেকে এতদূর এসে পড়েছ কোথাও একটা চাকরীর যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে না?"

যুবক বলিল "মশাই, কল্‌কাতার অনেক আফিসে চাকরীর চেষ্টা করেছি। অনেক আপিসেরই বড় বাবু হয় ব্রাহ্মণ, নয় কায়স্থ, নয় বৈদ্য, আমার জাতির পরিচয় শুন্‌লে, অনেকে চুপ ক'রে থাকেন; অনেকে তখনই ব'লে দেন, এখানে কোনও চাকরী নাই; আবার কেউ কেউ আমার জাতির উল্লেখ ক'রে বলেন, যাও, যাও, চাকরী কর্‌তে হবে না; তাঁতে কাপড় বোন।"

ক্ষেত্রনাথ অমরের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, অমরনাথ, তাঁরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ ক'রে তোমাকে ওরকম কথা বল্‌লেও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তুমি কিছু লেখাপড়া শিখেছ, তা ভালই করেছ। সকলেরই কিছু লেখাপড়া শেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু লেখা-পড়া শিখ্‌লেই যে চাকরী কর্‌তে হ'বে, তার কোনও মানে নাই। আপনার জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন কর্‌লে কারও কথা সইতে হয় না। আর অনায়াসে সংসার প্রতিপালনও কর্‌তে পারা যায়।

অমরনাথ বলিল "মশাই, আপনার কথা ঠিক্। কিন্তু জাতীয়বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে গেলেও বাল্যকাল থেকে সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য। আমার সেরূপ শিক্ষা হয় নাই। অতি যৎসামান্য যা লেখাপড়া শিখেছি, তা'তে চাকরী করা ভিন্ন আর উপায় নাই। যদি স্কুলে না প'ড়ে, তাঁত বুন্‌তেই শিখতাম, তা হ'লে আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার ক'রে আমায় দেশ-বিদেশে বেড়াতে হ'ত না। চাকরী না কর্‌লে, আর ডেপুটী, মুন্‌সেব্, উকীল না হ'লে, আজকাল কোনও লোকই সম্ভ্রান্ত ব'লে পরিচিত হন না। পিতামাতা সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ছেলেকে সম্ভ্রান্ত কর্‌বার জন্য স্কুলে পড়ান। ছেলেরও জীবনের লক্ষ্য কোন একটা ভাল চাকরী করা। এইজন্য সকলেই জাতীয় বৃত্তিকে ঘৃণা করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা ও পৌরোহিত্য কর্‌তে লজ্জা বোধ করেন। বৈদ্য চিকিৎসা-বিদ্যায় মন দেন না; কৃষক লাঙ্গল ধরে না; তাঁতী কাপড় বোনে না; আর কামার, কুমার, ছুতার—সকলেই অল্পবিস্তর লেখা পড়া শিখে চাকরীর জন্যই লালায়িত হয়। আমি যে এসব কথা না ভেবেছি, তা নয়; কিন্তু দেশের হাওয়া বদ্‌লে না গেলে,—প্রত্যেক জাতীয় বৃত্তিকে গৌরবের চক্ষে না দেখ্‌লে,—আমার মতন হতভাগ্যের সংখ্যা দেশে দিন দিন বাড়্‌বে বই কম্‌বে না।"

অমরনাথ অল্পবয়স্ক হইলেও, তাহার মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইলেন। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন যে তাহাকে চিন্তাশীল করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন্ ডিভিজানে এণ্ট্রান্স্ পাশ করেছিলে?"

অমর বলিল "সেকেণ্ড ডিভিজানে; এই আমার সার্টিফিকেট্ দেখুন।" এই বলিয়া পুঁটুলি হইতে তাহার সার্টিফিকেট্ বাহির করিয়া ক্ষেত্রবাবুকে দেখাইল।

ক্ষেত্রনাথ সার্টিফিকেট্ দেখিয়া বলিলেন "দেখ, অমর, আমি তোমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না। তবে, তুমি খাওয়া পরা ব্যতীত এখন যদি পাঁচটি টাকা পেলেই সন্তুষ্ট হও, তা হ'লে তোমাকে একটী কাজ দিতে পারি। তুমি আমার একটী ছেলেকে পড়াবে, আর যখন যা কাজ হয়, তাই কর্‌বে। এতে কি তুমি সম্মত আছ?"

অমরনাথ অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া বলিল "মশাই, এতেই আমি সম্মত আছি। আপনি দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

খাবারওয়ালার নিকট খাবার কিনিয়া খাইবার জন্য ক্ষেত্রনাথ তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া তাহার জন্য একখানা টিকিট্ কিনিলেন এবং প্লাটফর্ম্মে গাড়ী লাগিবামাত্র উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুর গ্রামে কোনও পাঠশালা, স্কুল বা পোষ্ট আফিস ছিল না। ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া অবধি একটী পাঠশালা ও একটী ডাকঘরের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই দুইটী স্থাপন করিবার কোনও সুযোগ করিতে পারেন নাই। আসানশোল ষ্টেশনে অমরনাথের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পাঠশালা ও পোষ্টআফিস স্থাপনের আশা তাঁহার মনে জাগরিত হইল। নরু এতদ্দিন সুরেন্দ্রের কাছেই ছিল; কিন্তু সুরেন্দ্র পুরুলিয়ায় আসাতে নরু একেবারে সঙ্গীহীন হইয়াছে। তাহাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতে ও অল্প অল্প লেখাপড়া শিখাইতে একটী লোকের প্রয়োজন। এই-সমস্ত কথা ভাবিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইলেন।

পুরুলিয়ায় সতীশচন্দ্রের বাসায় আসিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে অমরের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং নিজ মনোগত ভাব ও আশা ব্যক্ত করিলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন "চমৎকার হয়েছে। তুমি আপাততঃ একটী পাঠশালা স্থাপন কর। যাতে পাঠশালাতে মাসে মাসে কিছু সরকারী সাহায্য হয়, তার জন্য আমি স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার এবং ডেপুটী কমিশনার সাহেবকেও বলব। পাঠশালাটি স্থায়ী হ'লেই, তার সংলগ্ন একটী ডাকঘরও স্থাপিত হবে। তারও ভার আমার উপর রইল। আমি পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেবকে ব'লে তার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা করি।"

পরদিন পুরুলিয়ার মনোহারী দোকান হইতে নরু ও বিভার জন্য দুই চারিটি ক্রীড়নক ও পুতুল ক্রয় করিয়া ক্ষেত্রনাথ অমরকে সঙ্গে লইয়া বল্লভপুর যাত্রা করিলেন। বল্লভপুরে উপনীত হইয়া তিনি মনোরমাকে অমরনাথের পরিচয় দিলেন। অমর ও নরেন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে শীঘ্র সদ্ভাব স্থাপিত হইল। মনোরমারও তাহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ হইল। নরুও তাহার সহিত অনতিবিলম্বে আলাপ করিয়া লইল।

কাছারীবাড়ীর সম্মুখে সাহেবদের আস্তাবল, গুদাম, বাবুর্চ্চিখানা, খানসামাদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি কয়েকটি ঘর ছিল। কিন্তু সেগুলি সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, এই ঘরগুলির সংস্কার হইলে, ইহাদের মধ্যে একটীকে পাঠশালাগৃহে, আর একটীকে ডাকঘরে ও অপর ঘরগুলিকে গুদামে পরিণত করা যাইতে পারে। ঘরগুলির সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, আপাততঃ তাঁহার বৈঠকখানার বারাণ্ডাতেই পাঠশালা স্থাপন করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদিন গ্রামের মণ্ডল ও বিশিষ্ট লোকদিগকে কাছারীবাড়ীতে আহ্বান করিলেন ও তাহাদিগকে তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। গ্রামে একটী পাঠশালা ও একটী ডাকঘরের যে অভাব আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। পাঠশালায় পড়িবার যোগ্য বালকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন অবধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও দশ পনর জন বালক আসিতে পারে। ডাকঘর স্থাপিত হইলে, বল্লভপুর, মাধবপুর, কালপাথর, সোনাডাঙ্গা

প্রভৃতি পনর ষোলটি গ্রামের লোকের সবিশেষ সুবিধা হইবে। কিন্তু প্রজাগণ নিবেদন করিল যে, পাঠশালা স্থাপিত হইলে, তাহারা মাসে মাসে ছেলেদের বেতন দিতে পারিবে না; তবে যখন ধান্য হইবে, তখন তাহারা অবস্থানুসারে কেহ এক মণ, কেহ দুই মণ, এবং কেহ বা অর্দ্ধমণ ধান্য দিতে পারিবে। কে কত ধান্য দিবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে গ্রাম হইতে শিক্ষকের বেতন স্বরূপ প্রায় পঞ্চাশ মণ ধান্য আদায় হইবে। সকলেই নিজ নিজ অংশের ধান্য সেই বৎসর হইতেই দিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে ফাল্গুন মাসে সরস্বতী পূজার দিনে পাঠশালা স্থাপনের সঙ্কল্প হইল।

এদিকে পাথর ও ঘুটিম পোড়াইয়া প্রচুর চুন এবং ভগ্ন ইষ্টক চূর্ণ করাইয়া প্রচুর সুরকী সংগৃহীত হইলে, ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়া হইতে ছয়জন রাজমিস্ত্রী আনাইলেন, এবং এক এক দিকের খুঁটির প্রাচীর উঠাইয়া, সেই দিকে ইষ্টকের পাকা প্রাচীর গাঁথাইতে লাগিলেন। সেই দিকের প্রাচীর সম্পূর্ণ হইলে, আবার অপর দিকের প্রাচীর গাঁথাইলেন। এইরূপে ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুর ও খামার-বাটীর চারিদিকেই উচ্চ পাকা প্রাচীর হইল। রান্নাঘরটি কাঁচাঘর ছিল; তাহাও তিনি পাকা করিয়া লইলেন। পুষ্পোদ্যানের দুই পার্শ্বে দুইটী পাকা পায়খানাও প্রস্তুত করাইলেন। এই সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি আস্তাবল ও বাবুর্চ্চিখানা প্রভৃতির সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বাবুর্চ্চিখানার গাঁথুনি পাকা ছিল; ছাদও মজবুৎ ছিল। কেবল দুই এক স্থানে দুই একটী জানালা ফুটাইতে হইল মাত্র। এই ঘরগুলির সংস্কার সম্পূর্ণ হইলে, সেগুলি দেখিতে সুন্দর হইল। বলাবাহুল্য, এই-সমস্ত কার্য্যে নগেন্দ্র, অমরনাথ ও লখাই সর্দ্দার ক্ষেত্রনাথকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে ও গৃহসংস্কার সম্পূর্ণ করিতে ক্ষেত্রনাথের প্রায় চারিশত টাকা খরচ হইল। এদেশে সকল দ্রব্যই সুলভ এবং জনমজুরের বেতনও সামান্য বলিয়া এত অল্প খরচে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই-সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে সমগ্র মাঘ মাস এবং ফাল্গুন মাসেরও এক সপ্তাহ লাগিল।

ইতিমধ্যে, ৩রা ফাল্গুন তারিখে বসন্তপঞ্চমী ও শ্রীশ্রী৺সরস্বতীপূজা উপস্থিত হইল। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামের কারিগর দ্বারা সরস্বতীদেবীর একটী প্রতিমা গঠিত হইয়া বল্লভপুরে আনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ গ্রামের বালকগণকে সরস্বতীপূজা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবদের অধ্যুষিত গৃহে হিন্দুদেবতার পূজানুষ্ঠান করা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায়, কাছারীবাড়ী ও বাবুর্চ্চিখানার মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ মাঠে একটী কাঁচাঘর ও তাহার সম্মুখে একটী ছান্‌লা প্রস্তুত করা হইল, এবং সেই গৃহের মধ্যে দেবী-প্রতিমা স্থাপিত হইল। মাধবপুর হইতে মাধবদত্ত মহাশয় ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা নিমন্ত্রিত হইয়া পূজা দেখিতে আসিলেন।

বসন্তপঞ্চমীর প্রত্যূষে কাছারীবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিবামাত্র, গ্রামের বালকেরা স্নান করিয়া ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইতে লাগিল। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী অরণ্য হইতে রাশি রাশি আরণ্যপুষ্প লইয়া আসিল। কেহ কেহ সবিস্ময়ে প্রতিমা দেখিতে লাগিল; কেহ কেহ লম্ফন ও কুর্দ্দন, কেহ কেহ ঢাকের তালে তালে নৃত্য, এবং কেহ কেহ বা উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া দেবীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী সেই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া দেবীর পূজা করিলেন; তৎপরে বালকেরা দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল; সর্ব্বশেষে তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা হইল। লুচি তরকারী ও দধি সন্দেশ খাইয়া বালকদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। গ্রামের লোকেরা, এবং মাধবদত্ত মহাশয়, দত্তগৃহিণী, সৌদামিনী, মনোরমা প্রভৃতি মহিলারা বালকভোজনের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কেবলমাত্র প্রবাসী সুরেন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়া মনোরমা এই আনন্দের দিনেও মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতেছিলেন।

বালকভোজন শেষ হইলে, ক্ষেত্রনাথ বালকদিগকে একত্র বসাইয়া তাহাদিগকে সরল ভাষায় বলিলেন যে, সেই দিন হইতে সেই স্থানে তাহাদের পাঠশালা স্থাপিত হইল। তাহারা যেন প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পাঠশালায়

পড়িতে আসে; তারপর জলখাবারের ছুটী হইবে। জলখাবার খাইয়া আবার পাঠশালায় আসিবে। মধ্যাহ্নে স্নান করিবার ও ভাত খাইবার ছুটী হইবে। তার পর বিকালে একবার আসিয়া নামতা পড়িয়া ও খেলা করিয়া বাড়ী যাইবে। ক্ষেত্রনাথ পঞ্চাশটি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ আনাইয়াছিলেন; তাহা তিনি বিদ্যার্থী বালকগণকে একে একে ডাকাইয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন যে, তাহারা যদি ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে আগামী বৎসর সরস্বতী পূজার সময়ে তিনি তাহাদিগকে আরও ভাল ভাল বই পুরস্কার দিবেন। এইরূপ বক্তৃতার পর, ক্ষেত্রনাথ অমরনাথকে দেখাইয়া বলিলেন "ইনি তোমাদের গুরুমহাশয় হইলেন। তোমাদের আর একটী গুরুমহাশয় আসিবেন। তোমরা ইহাঁদিগকে খুব ভক্তি করিবে। এখনই তোমরা ইহাঁকে প্রণাম কর।" বালকেরা ক্ষেত্রনাথের উপদেশানুসারে স্ব স্ব স্থানে বসিয়াই করজোড়ে মাথা নোওয়াইয়া তাহাদের নবীন গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিল।

সভাভঙ্গের পর বালকেরা তাহাদের দেশীয় ক্রীড়া ও কুস্তী দেখাইল। সন্ধ্যার সময় দেবীর আরত্রিক দেখিয়া তাহারা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতীপূজা ও পাঠশালা স্থাপনের উৎসবে ক্ষেত্রনাথের প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়া গেল। হউক, কিন্তু তজ্জন্য ক্ষেত্রনাথ দুঃখিত হইলেন না। তিনি মনোরমাকে বলিলেন "আমরা এই দেশে এসে বাস করেছি। এদেশের লোকের অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও দূষিত রীতিনীতি দেখে সময়ে সময়ে আমার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়। জ্ঞানালোকের অভাবে এদেশের লোকেরা কোনও উন্নতিলাভ করতে পারে নাই। এই-সব অসভ্যদের মধ্যে বাস করলে আমাদের ছেলে মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে অসভ্য হ'য়ে পড়বে। সকলে যদি ভাল থাকে, আমরাও ভাল থাকতে পারব। এইজন্য এখানে একটী পাঠশালা স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক মনে করলাম। অমরকেই এখন পাঠশালার পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ'ল। খাওয়া পরা ব্যতীত অমরকে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা দিতে আমি স্বীকৃত হয়েছি; কিন্তু তাতে তার বেশী দিন চলবে না। সে হয়ত আর কোথাও একটী ভাল কাজ পেলে চ'লে যাবে। তখন নরুকে পড়াবার জন্য আবার একটী লোক নিযুক্ত করতে হ'বে। কিন্তু অমর খাওয়া পরা ব্যতীত যদি আমার কাছে মাসে মাসে পাঁচটি টাকা পায়, আর পাঠশালা থেকেও কিছু পায়, আর এখানে একটী ডাকঘর খুললে যদি তার থেকেও কিছু পায়, তা হ'লে হয়ত সে এখানে কিছু দিন থাকতে পারে। তা না হ'লে, সে নিশ্চয়ই চ'লে যাবে। এই কারণে, একটী পাঠশালা স্থাপন করবার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রতে ইতস্ততঃ করলাম না।"

মনোরমা বলিলেন "এখানে একটী পাঠশালা খুলে তুমি ভাল কাজই করেছ। কিন্তু এ বৎসর তো তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল। গাই, গরু, মোষ কেনা, ধান চাল—কলাই কেনা, চাষের খরচ, ইট পোড়ানো, প্রাচীর দেওয়া, রান্নাঘর পায়খানা তৈয়ের করা, বন্দুক কেনা, চাকর মুনিষের বেতন, এই সরস্বতী পূজা, তারপর বাড়ীর খরচপত্র এই সকলে তোমার অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "এই সকল বিষয়ে প্রায় চৌদ্দ-শ টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। কিন্তু যেমন খরচ হয়েছে, তেমনই আয়ও হয়েছে। তিনটি মরাইয়ে প্রায় ছয়-শ মণ ধান মজুত আছে। তার দাম বার-শ টাকা। পঁচাত্তর মন কলাইয়ের দাম দেড়-শ টাকা, ত্রিশমণ অড়হরের দাম ষাইট্ টাকা, বাইশ মণ মুগের দাম প্রায় ষাইট্ টাকা, দেড়-শ মণ আলুর দাম প্রায় তিন-শ টাকা। এই মোট সতের আঠার-শ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হয়েছে। এসব ছাড়া মাঠে এখনও গম, যব, ছোলা, সরষে, গুঞ্জা ও কাপাস রয়েছে। এই সকলেও চার পাঁচ-শ টাকা হ'তে পারে। তা হ'লে আমাদের প্রায় বাইশ শ টাকার ফসল হবে। এছাড়া প্রজাদের নিকট খাজনাও প্রায় তিন-শ টাকা আদায় হবে। তা হ'লে এবছর আমাদের আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা হবে।"

মনোরমা বলিলেন "যদি আড়াই হাজার টাকা হয়, তা হ'তে তোমার খরচ চৌদ্দ-শ টাকা।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "প্রথম দৃষ্টিতে দেখ্‌লে তাই মনে হয় বটে; কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। এবৎসর এগার-শ টাকার অধিক মুনাফা থাকবে না সত্য; কিন্তু আগামী বৎসরে, এ বৎসরের মতন তো খরচ হ'বে না। আমাদের গরু-মোষ আছে, তা কিন্‌তে হবে না; ধান-চা'ল কলাইও কিন্‌তে হবে না, বন্দুক কিন্‌তে হবে না, আর বাড়ী মেরামতও কর্‌তে হবে না। এই সকলেই যে এবৎসর প্রায় হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে। এই টাকাটা আগামী বৎসরে বাঁচ্‌তে পারে—অবশ্য যদি ফশল ভাল হয়। কেননা, ভাল ফশল হওয়ার উপরেই সব নির্ভর কর্‌ছে। তোমার সংসারের জন্য প্রায় কিছুই কিন্‌তে হবে না। ঘরে ধান, চা'ল, কলাই, অড়হর, মুগ আছে। তেলের জন্য সর্‌ষে গুঞ্জা আছে। বাড়ীতে তোমার ছয় সাত সের দুধ হয়। দুধও কিন্‌তে হবে না। দুধের সর থেকে, আর দই জমিয়ে তুমি তো প্রত্যহই মাখন ও ঘী তৈয়ের কর। তাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর। জ্বালানী কাঠ কিন্‌তে হবে না; তা জঙ্গল থেকে কেটে আন্‌লেই হবে। তোমার তরকারী-বাগানে যথেষ্ট তরকারীও হয়। আলুও এ বৎসর অনেক হয়েছে। কিন্তু আমরা ঘর-খরচের মতন আলু রেখে অবশিষ্ট আলু বেচে ফেল্‌ব। কেননা, আলু শীঘ্র নষ্ট হ'য়ে যায়। এবৎসর ক্ষেত্রে গম হয়েছে। সুতরাং গমও কিন্‌তে হবে না। তোমার মোষ-গরুর জন্য খড় আর বিচালী যথেষ্ট রয়েছে। তার পর কলাই গম ছোলার ভূষা আছে। আর সর্‌ষে গুঞ্জা থেকে খইলও যথেষ্ট হবে; তা গরু-মোষে খাবে। আমাদের চাষ থেকে প্রায় সবই উৎপন্ন হয়েছে। হয় নাই কেবল আক। তাও লখাই এবৎসর আবাদ কর্‌বে বলেছে। আমাদের কেবল গুড়, চিনি, নুন, মশলা কিন্‌তে হবে। আর কাপড়-চোপড়ও অবশ্য কিন্‌তে হবে। তা'তে আর খরচ কত? বছরে বড় জোর একশ টাকা। তার উপর চাকর কামীনদের বেতন, অমরের বেতন, আর পূজা ইত্যাদিতে খরচ—এই সকলে বড় জোর চারশ টাকা খরচ হবে। আগামী বৎসর সর্ব্বসমেত যদি আড়াই হাজার টাকা আয় হয়, তা হ'লেও চারশ টাকা বাদ দিলে তোমার একুশ শ টাকা লাভ থাক্‌বে।"

মনোরমা বলিলেন "এবৎসর যে এত ধান কলাই অড়হর হয়েছে, তা সমস্তই কি রাখ্‌বে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি চমৎকার গৃহিণী তো? অত রেখে কি হবে? কিন্তু ধান সমস্ত রাখ্‌ব; ধান এখন হাত-ছাড়া করা হবে না। ধানই লক্ষ্মী। ধান আগামী বৎসরে কি রকম হবে, তা তো জানি না। যদি অজন্মা হয়, তা হ'লে ঘরে লক্ষ্মী থাক্‌লে অন্নের কষ্ট হবে না। ধান ছাড়া, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুগ, গম, যব—এই-সকল কেবল বাড়ীর খরচের মতন রেখে বাকী সব বেচে ফেল্‌ব। আমি ঠিক্ করেছি, কলাই পঞ্চাশ মণ, অড়হর বিশ মণ, মুগ পনর মণ, আলু সোয়া শ মণ, আর খরচের মতন গম, যব, সরষে, গুঞ্জা রেখে অবশিষ্ট সব বেচে ফেল্‌ব। কাপাসও বেচে ফেল্‌ব। এখন জিনিষের দর কিছু নরম আছে। দর একটু চড়্‌লেই বেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌ব। ঐ যে গুদাম-ঘর মেরামত কর্‌লাম, তা কি জন্য? এই সব জিনিষ ধ'রে রেখে দেবো ব'লে। বুঝ্‌লে?"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সমস্ত বেচে যা টাকা পাবে, তা কি কর্‌বে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না? আগামী বৎসর যে বার শ টাকা খরচ হবে, সেই টাকাটি রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবো।"

মনোরমা বলিলেন "ব্যাঙ্কে তোমার আর কত টাকা জমা আছে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা এখন জেনে কাজ নাই। যা আছে, তোমাদেরই আছে।"

উত্তর শুনিয়া মনোরমা অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন। তিনি ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন "এই জন্যই তো তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। আমাদের জন্য টাকা! টাকা কি তোমার নয়, আর তোমার জন্য নয়?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদে-

টাকা। তুমি টাকার কথা যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ তখন নিশ্চয়ই তোমার একটা মতলব আছে। কি মতলব বল, দেখি ?"

মনোরমা যেন একটু রাগিয়া বলিলেন "আমার আর মতলব কি ? তোমার ছেলে নলিনের জন্যই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। সে একটা কিছু কাজ কর্‌তে চায়। সেই জন্য রোজই আমাকে বলে। আমি তোমাকে এত দিন কোন কথা বল্‌তে সাহস করি নি। তুমি ওকে কিছু পুঁজি দিয়ে একটা কাজকর্ম্ম করে দাও— এই আমার কথা !"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "ও গো, আমি যে সে কথা ভাবি নাই, তা নয়। আরও দিন কতক যাক্, তার পর তোমাকে বল্‌ব। আগে এখানকার অবস্থা ভাল ক'রে বুঝি, তার পর তাকে একটা কাজ ক'রে দেব।"

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

শুশুনিয়া

বর্দ্ধমান হইতে রেলপথে আসানসোল যাইবার সময়ে বামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়, দুর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ হস্তী বসিয়া আছে। এই শুশুনিয়া দর্শনের লোভে আমরা পাঁচজনে গত বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম যে শুশুনিয়া বাঙ্গালার একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান, এই পর্ব্বতগাত্রে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রাচীন খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে। বহুপূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শুশুনিয়ার খোদিতলিপির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে যখন শুশুনিয়ার নাম দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন বাঙ্গালার একজন বিশালকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। সেইজন্য খোদিতলিপি স্বচক্ষে দেখিবার উদ্দেশ্যে অভিযান।

গাড়ীতে চড়িয়াই আহারের মহোৎসব আরম্ভ হইল। একটু অবকাশ হইলে বাহিরে চাহিয়া দেখি, যে-বাঙ্গলা-দেশে আমরা বাস করি তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি, কাল মাটি, নীল জল, শ্যামল তৃণক্ষেত্রের দেশ পরিত্যাগ করিয়া লাল মাটির দেশে আসিয়াছি। দুর্ব্বলতাবশতঃ এই কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলায় আমাদের অন্যতম সঙ্গী ব—বাবু আমাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। তিনি বলেন এই প্রকৃত বাঙ্গালাদেশ, আমরা যেস্থানে বাস করি, সেস্থানটি সমুদ্রগর্ভ ; ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে লালমাটির দেশটাই প্রাচীন, এবং কালমাটির দেশটা তাহার তুলনায় অতি শিশু। আমি আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

গাড়ী যখন মেদিনীপুর ছাড়াইয়া বিষ্ণুপুরের দিকে চলিয়াছে তখন বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, স্বপ্নে দেখিলাম রথে চড়িয়া শুশুনিয়া আক্রমণ করিতে চলিয়াছি, একসঙ্গে পাঁচখানি পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইতেছে, কুলবধূগণ আমাদিগের উদ্দেশ্যে লাজ নিক্ষেপ করিতেছে, আর মহারথী-পঞ্চককে দেখিয়াই শুশুনিয়া দৈত্য ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমার ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি বাকী চারিটি নাসিকার গর্জ্জনে বাষ্পীয় দৈত্য ভীত হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বিষ্ণুপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছি, বাঁকুড়ার আর অধিক বিলম্ব নাই। সকলকে ডাকিয়া উঠাইলাম, কারণ কোথায় নামিব তখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থির হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে শুশুনিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু বাঁকুড়ার পরের ষ্টেশন ছাত্‌না শুশুনিয়ার আরও নিকট। বাঁকুড়ায় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু ছাত্‌নায় গোযান ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সকলেই স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী প্রথা অনুসারে বুদ্ধির মূলে তাম্রকূট ধূমসেক করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে বাঁকুড়া বড়ই নিকটে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখনও কিছু স্থির হয় নাই। দলপতির নিকট কথাটি পাড়িতেই ফয়সালা হইয়া গেল, স্থির হইল বাঁকুড়াতে নামিতে হইবে।

বাঁকুড়ায় যখন পৌঁছিলাম তখন শীতকালের বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক ব—বাবু পূর্ব্বে তাঁহার

এক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারা গেল যে সেদিন শুশুনিয়া যাত্রা করিবার কোনই উপায় নাই, শুশুনিয়া অনেক দূর, রাস্তাও তেমন সুবিধার নহে, পথে দুইটি নদী পার হইতে হইবে, তাহার একটির উপরেও সেতু নাই। পথপ্রদর্শক মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে আমাদিগকে তাঁহার আত্মীয়ের গৃহে লইয়া যান, কিন্তু দলপতি অসম্মত হওয়ায় স্থির হইল যে ডাক-বাঙ্গলায় আশ্রয় লওয়া হইবে।

বাঁকুড়া ষ্টেশনটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি অভিযোগ আছে,—আমাদিগের দলপতির ন্যায় গুরুভার আরোহী-দিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি বেঙ্গল-নাগপুর রেলের কর্ত্তৃপক্ষের মোটেই মনোযোগ নাই। প্রথম অভিযোগ এই যে ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমটি উচ্চ নহে, দলপতি মহাশয়ের আকারের আরোহীগণকে কুলি ডাকাইয়া নামাইতে হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে ষ্টেশন হইতে নগরে যাইতে হইলে যে "ওভারব্রিজ" পার হইতে হয় তাহাও তেমন ভারসহ নহে। কোনও বিশেষ দুর্ঘটনা না হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণের চৈতন্যোদয় হইবে না। যাহা হউক, নির্ব্বিঘ্নে দলপতি মহাশয়কে লইয়া সেতু পার হইলাম, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। অকাল-বার্দ্ধক্যে জরজর দুইখানি রথ, তাহাতে চারিটি ছাগশিশু যোজিত, দলপতি যে তাঁহাতে আরোহণ করিয়া কিরূপে গমন করিবেন ইহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইলাম। ব—বাবুর পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে এক-খানি গাড়ীতে বোঝাই করিয়া অপর গাড়ীখানিতে ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য সমেত আমরা ছয়জন আরোহণ করিলাম।

সন্ধ্যার সময় ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। শেষ রাত্রিতে শুশুনিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

দিব্য আরামে লেপ মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময়ে গাড়োয়ান আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল, তখনও সকলে নিদ্রিত। ব—বাবুর আত্মীয় বাঁকুড়া কালেক্টরীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহার অনুগ্রহে দুইখানি ভাল গাড়ী মিলিয়াছিল। সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া লইতে লইতে প্রভাতের আলোক দেখা দিল। পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, পথপ্রদর্শক ব—বাবু বলিলেন যে এই রাস্তাই পুরাতন পল্টনের রাস্তা, বাঁকুড়া ও মানভূম স্বতন্ত্র জেলা হইবার পূর্ব্বে, ছোটনাগপুর যখন কোম্পানীর রাজত্বের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ছিল, তখন পল্টনের যাতায়াতের জন্য এই রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেলের লাইন পার হইয়া ছাত্‌না নগরের অভিমুখে চলিলাম। চারিদিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র, স্থানে স্থানে বৃক্ষরাজির মধ্যে দুই একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।

ক্রমে গাড়ী দুইখানি ছাত্‌না নগরে প্রবেশ করিল। প্রাচীন ছাত্‌না নগর এখন একখানি বৃহৎ গ্রাম। এখানে এখন পুলিসের থানা, স্কুল ইত্যাদি আছে। ছাত্‌না গ্রামে বাশুলী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ একমাত্র দর্শনযোগ্য স্থান। পথের পার্শ্বেই প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মন্দিরের চূড়া বহুপূর্ব্বে পড়িয়া গিয়াছে, তবে তিন পার্শ্বের দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতের দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গিতে একটি দেবীমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া ফেলিলে এখনও মন্দিরের অবশিষ্টাংশ রক্ষা হইতে পারে। বাশুলী মন্দিরের পূর্ব্বদিকে আর একটি বৃহদাকার ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির বা গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যেক ইষ্টকখানি খোদিতলিপিযুক্ত। দলপতি ও ব—বাবু খনন করিয়া দুইখানি সুন্দর খোদিতলিপিযুক্ত ইষ্টক বাহির করিলেন। "বিশ্বকোষের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বহুপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ছাতনার ইষ্টকলিপির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহার খোদিতলিপি পাঠের পিপাসা অসহ্য হইবে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দেখিয়া লইবেন।

বেলা যখন দশটা তখন শুশুনিয়া গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। পর্ব্বতের পাদমূলে একটি প্রাচীন "বাঙ্গলা", ইহাই বেঙ্গল ষ্টোন্ কোম্পানীর আপিস ছিল, বহুপূর্ব্বে বেঙ্গল

শুশুনিয়া পর্ব্বতের বিষ্ণুচক্র।

ষ্টোন্ কোম্পানীর পাথরের মূল্য ছিল, তখন ইহার নাম ছিল "বর্দ্ধমান ষ্টোন।" এখন চারিদিকে রেল খোলাতে পাথর সস্তা হইয়া পড়িয়াছে, রেল হইতে অনেক দূরে বলিয়া বেঙ্গল ষ্টোন্ কোম্পানী অল্প মূল্যে পাথর বিক্রয় করিতে পারেন না, কোম্পানীর কার্য্য এখন বন্ধ আছে। ব—বাবুর আত্মীয় "বাঙ্গালার" কর্ম্মচারীর নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন, তিনি "বাঙ্গালায়" আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "বাঙ্গালা"টি বহু পুরাতন, সম্মুখের বারান্দার ছাদ নাই, আসবাবপত্রও বার্দ্ধক্যহেতু অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামান হইতে লাগিল, আমরা কর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম একজন বাঙ্গালী বেঙ্গল ষ্টোন্ কোম্পানীর সিকি অংশীদার। পূর্ব্বে একজন সাহেব এই "বাঙ্গালায়" থাকিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শুশুনিয়ার "বাঙ্গালায়" পিত্তলফলকে একটি স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। তিনিই তাঁহার অংশ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং জর্জ্জ হেণ্ডারসন্ কোম্পানীর অংশীদার। "বাঙ্গালার' সম্মুখে পিত্তলফলকে জর্ম্মান বা ওলন্দাজ ভাষায় নিম্নলিখিত কয়টি কথা উৎকীর্ণ আছে—

Lum Audenke
an meine lieben elteın
Carl B. Reuss and Amalie Reuss
1874
Susunia Hill
Johann Leonhard Reuss.

শূন্যগর্ভ হইয়া দলপতি কোন কাজ করিতে পারেন না, তিনি যখন শুনিলেন যে খোদিতলিপি "বাঙ্গালা" হইতে দেড়ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত, তখন তিনি একাগ্রচিত্তে আহারে মনোনিবেশ করিলেন। বন্ধুবর রা— বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক, তিনি যথাসাধ্য দলপতির সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন, লজ্জায় পড়িয়া ম—বাবুও অগ্রসর হইলেন, বাকী রহিলাম আমি ও ব—বাবু, আমরা একপেয়ালা "চা"র প্রয়াসী, সম্মুখ দিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ লুচি, বাঁকুড়ার কাৎলা মাছ, কলিকাতার মিষ্টান্ন ও কমলানেবু "এক্সপ্রেস স্পিডে" চলিয়া যাইতেছে, আমরা সেদিকে চাহিয়াও দেখিলাম না। এই জন্যই বাঙ্গালী জাতির উন্নতি হয় না, বাঙ্গালাদেশে মুড়ি মিছরির সমান দর, আমাদের এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, আমাদের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব, দেশের লোকে এখনও শুনিতে পাইল না! সেই জন্যই দুঃখে, ক্ষোভে, মর্ম্মপীড়ার কষাঘাতে আহত হইয়া এই ভ্রমণকাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে সার টমাস লিপ্টন্ আমার মার্ব্বেলের মূর্ত্তি গড়াইয়া ফেলিত, কমন্স মহাসভা আমার জন্য বিশেষ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিত। হায়, দ্বিজেন্দ্রলাল!

অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলা পুরাতন কাগজ বাহির করিলাম। তাহা জ্বালাইয়া ব্রাহ্মণঠাকুর জল গরম করিতে না করিতে অন্য সকলে যাত্রার জন্য ডাকিতে আরম্ভ করিল। জল অল্প অল্প গরম হইয়াছে, ফুটিয়া উঠে নাই, কি করি, তাহাতেই চা এবং টিনের দুধ ঢালিয়া দিলাম! আমি এবং ব—বাবু চায়ের এক একটি পেয়ালা লইয়া বসিবামাত্র ডাক বন্ধ হইল, তখন দেখি রা— একটি ঘটী লইয়া এবং ম—বাবু ফটোগ্রাফ ডেভেলপ করিবার একখানি ডিস্ লইয়া উপস্থিত। বন্ধুবর রা— বড় উদরনৈতিক লোক, তিনি অনেক সময় আমাকে বলিয়াছেন যে চা পান বাঙ্গালাদেশে অত্যন্ত আবশ্যক, তবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শর্করা থাকিলে গরম জল ও শুষ্ক চা-পত্রের কোনই আবশ্যক থাকে না। চায়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, যথা বিস্কুট, রুটী, মাখন, চিনি, জ্যাম, জেলী, মার্ম্মলেড্ অভাবে সন্দেশ বা রসগোল্লা, চায়ের পূর্ব্বেও চলিতে পারে, পরেও চলিতে পারে; আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে পাওয়া গেলে চায়ের বাটী মুখে না তুলিয়া দেখিতে দেখিতে সেগুলি পার করা উচিত। এ বিষয়ে বন্ধুবর বিশেষ বিশেষজ্ঞ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি কখনও এ বিষয়ের পরিভাষা সংগ্রহে লিপ্ত হন তাহা হইলে ভরসা করি আমার বন্ধুবরকে বিস্মৃত হইবেন না।

ধীর মন্থরগতিতে "বাঙ্গালা" ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। পর্ব্বতের উপরে ও চারিপার্শ্বে নিবিড় বন, এই

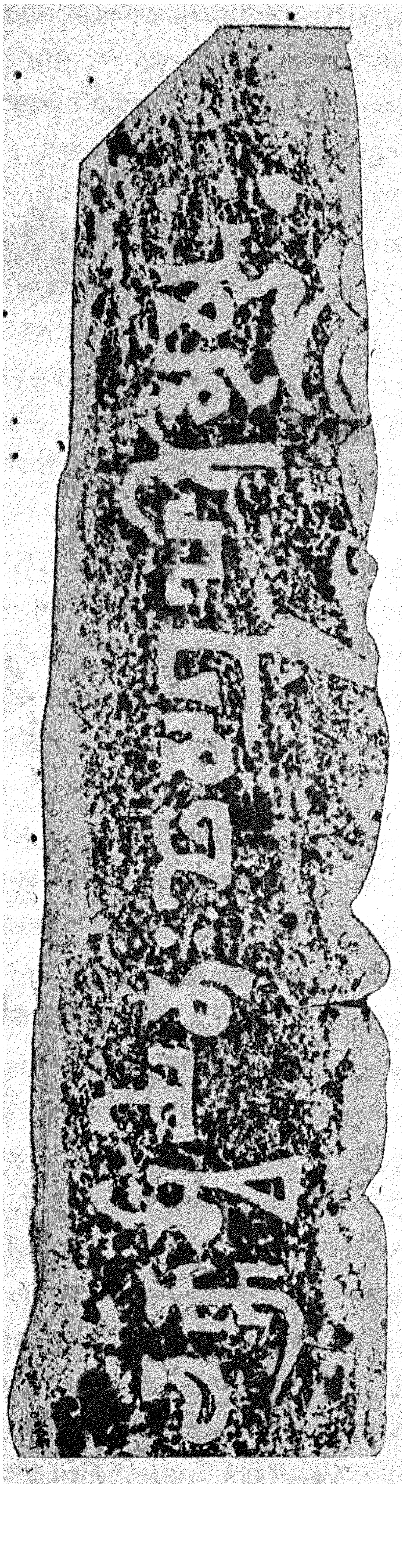

বিষ্ণুচক্রের বামপার্শ্বের খোদিত লিপি—শুশুনিয়া পর্বত, বাঁকুড়া।

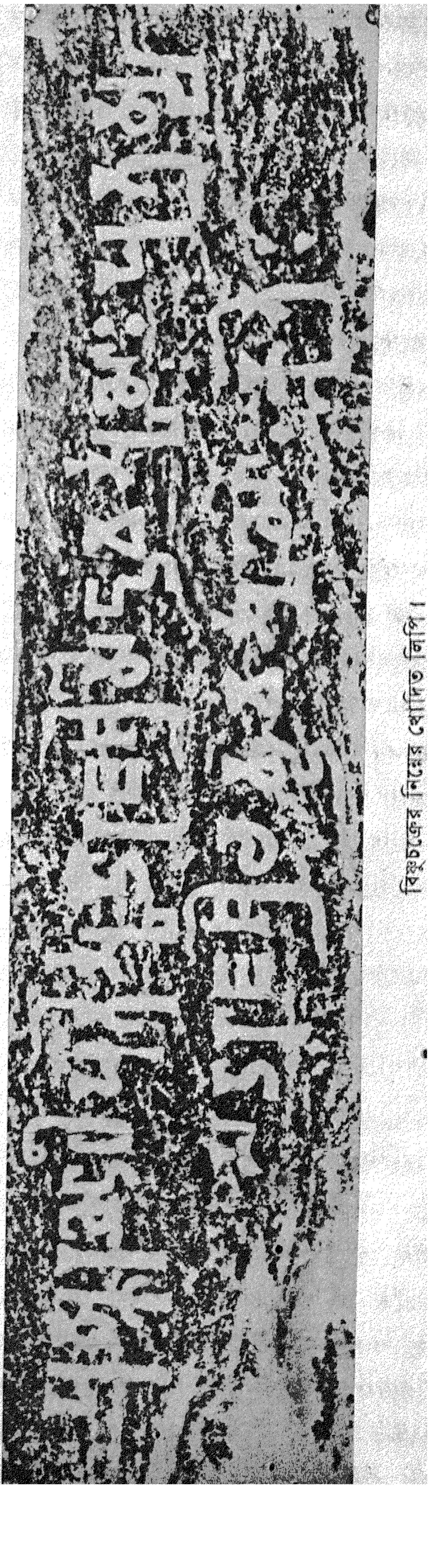

বিষ্ণুচক্রের নিম্নের খোদিত লিপি।

বনের ভিতর দিয়া পূর্ব্বে পথ ছিল; যখন বেঙ্গল ষ্টোন্ কোম্পানীর কাজ চলিত তখন এই পথে পাহাড়ের উপর হইতে পাথর লইয়া গোযান নীচে নামিত। পথ দেখিয়া বোধ হইল বহুকাল গোযান আসে নাই, পথে ঘাস জন্মিয়াছে, স্থানে স্থানে দুই একটা গাছও দেখা দিয়াছে। বনের মধ্যে বহু ঘণ্টার শব্দ হইতেছে, ব—বাবু বলিলেন যে উহা মহিষের গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ। এই পথে এক ক্রোশ চলিয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। বেঙ্গল ষ্টোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী মহাশয় আমাদিগের সহিত পথ দেখাইবার জন্য দুইজন লোক দিয়াছিলেন, তাহারা কুঠারহস্তে পথ দেখাইয়া চলিল। পথপ্রদর্শক লোক দুইজন বলিয়া উঠিল যে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, "চন্দ্রসূর্য্য" খুঁজিয়া পাইতেছে না। অনেকক্ষণ জেরা করিয়া বুঝিলাম পর্ব্বতের যে স্থানে খোদিতলিপি আছে তাহার উপরে চন্দ্র ও সূর্য্যের মূর্ত্তি খোদিত আছে। আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া তাহারা "চন্দ্রসূর্য্যের" অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এক দণ্ড পরে মাথার উপরে কে "বাবু," "বাবু," করিয়া দুইবার ডাকিল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম একজন পথপ্রদর্শক আমাদিগকে ডাকিতেছে। তাহাদিগের একজন নামিয়া আসিল ও আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পর্ব্বতের গায়ে অনেকগুলি ঝরণা ছিল। শীতকালে তাহার কোনটিতে জল ছিল না, একটি ঝরণার পথ ধরিয়া আমরা পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। অনেক-দূর উঠিয়া দেখিলাম যে দ্বিতীয় পথপ্রদর্শক একখানি পাথরের উপর বসিয়া আছে, সেই স্থানে পর্ব্বত কাটিয়া অনেকটা স্থান সমান করা হইয়াছে, তাহা দূর হইতে প্রাচীরের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই স্থানে অতীতযুগে কে পাথরে দুইখানি চক্র খুদিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহার একখানি বড়, আর একখানি ছোট। ইহারাই গ্রাম্য লোকের "চন্দ্রসূর্য্য"। বড়খানি সূর্য্য এবং ছোটখানি চন্দ্র। বড়খানির নীচে দুই ছত্র এবং দক্ষিণ পার্শ্বে এক ছত্র লেখা আছে। ছোটখানির নীচেও এক ছত্র লেখা ছিল, কিন্তু তাহা আর পড়িতে পারা যায় না, কে যেন তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছে

পথপ্রদর্শক দুইজনের কার্য্য শেষ হইল, তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল, তখন আমার কার্য্য আরম্ভ হইল। বাঙ্গলার প্রত্নতত্ত্বে আমি "চিনির বলদ," পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি বটে, কিন্তু নাম হইয়াছে অপর লোকের। আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ছাপা তুলিয়া দিয়াছি, নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়াছি, দলপতি মহাশয় আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বাজারে নাম কিনিয়াছেন, ইহাই বাঙ্গালা দেশের রীতি। যখন "চন্দ্রসূর্য্যের" নিকট পৌঁছিলাম তখন বেলা বারটা, আর কার্য্য যখন শেষ হইল তখন বেলা তিনটা। দলপতি মহাশয় পাচক ব্রাহ্মণকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে আমরা বারটার মধ্যে ফিরিব এবং একটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ছাত্না যাত্রা করিব। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে আজ রাত্রিতেই ছাত্না হইতে পুরুলিয়া যাত্রা করিব। খোদিতলিপির ছাপ তুলিতে তুলিতে ভাবিতেছিলাম যে অন্ন আবার তণ্ডুলে পরিণত হইতেছে, উনানের আগুন অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, সুতরাং ফিরিয়াই যে এক পেয়ালা গরম চা পাইব তাহারও কোনই ভরসা নাই। ছাপা তোলা শেষ হইল, দলপতি ফটোগ্রাফ্ তুলিতে গিয়া দেখিলেন যে ক্যামেরার স্ক্রুটি বাঙ্গালায় ফেলিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ফটোগ্রাফ্ তোলা আর হইল না। দলপতি দেখাইয়া দিলেন যে এইস্থানে একটি বৃহৎ গুহা ছিল, তাহার পশ্চাৎদিকের প্রাচীরে সর্ব্ব প্রথমে ক্ষুদ্র চক্র ও তাহার নিম্নের খোদিত-লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার পরে সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা দিগ্বিজয়ে আসিয়া বৃহৎ চক্রটি ও তাহার দুই পার্শ্বের খোদিতলিপিগুলি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ঝরণাটি নিকটে থাকায় গুহা ধ্বংস হইয়াছে, ঝরণার জলের বেগে উহার পার্শ্বের ছাদ ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ছাপা লইয়া বিরসবদনে বেলা চারিটার সময় বাঙ্গা-লায় পৌঁছিলাম, স্নানাহার শেষ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে যাত্রা করিলাম। যখন বাঁকুড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি দুইটা। "ওয়েটিং রুমে" বেঞ্চির উপরে বসিবামাত্র পাঁচটা বাজিয়া গেল, পুরুলিয়ার গাড়ীর

বার্তা দিল। ট্রেন আসিলে বোঝাই হইয়া পুরুলিয়া যাত্রা করিলাম।

শ্রী—।

শুশুনিয়ার পর্ব্বতলিপি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শুশুনিয়ার পর্ব্বতলিপির আবিষ্কার-বার্ত্তা প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরের বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে শুশুনিয়ার খোদিত লিপির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের বন্ধু বাবু গোপীচন্দ্র কর্ম্মকার তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে শুশুনিয়া পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি খোদিতলিপি আছে। স্থানীয় লোকে বলিয়া থাকে যে উহা দেবাক্ষরে লিখিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গোপীচন্দ্র বাবুকে খোদিতলিপির প্রতিলিপি আনয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি যে নকল (Hand copy) আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় খোদিতলিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন ঃ—

১। চকৃক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

২। পুষ্করাম্বুধিপতেম্মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ *

তাহার পরে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ৩য় ভাগে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি শুশুনিয়া খোদিতলিপির সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করেন ঃ—

চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ

পুষ্করস্যাধিপতের্ম্মহারাজ শ্রীসিদ্ধবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ †

এই প্রবন্ধের সহিত খোদিতলিপির একটি প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত ডাক্তার ডিওডোর ব্লকের নিকট শুশুনিয়ার খোদিতলিপির একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখিলাম যে উদ্ধৃত পাঠের সহিত কতক মিলিলেও কোন অক্ষরের আকারের সহিত ফটো-গ্রাফের অক্ষরের আকারের মিল হয় না। সেই অবধি শুশুনিয়া পর্ব্বতে গিয়া খোদিতলিপিটির ছাপা উঠাইবার বড় ইচ্ছা ছিল। "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে একবার শুশুনিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত বৎসরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত "গৌড়রাজমালার" সমালোচনা-কালে অনুযোগ করিয়াছিলাম যে শুশুনিয়ার প্রতিলিপি বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। সেই লিপি দেখিবার জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে শুশুনিয়া পর্ব্বতে গিয়াছিলাম।

শুশুনিয়া পর্ব্বত বাঁকুড়া হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রাচীন কালে একটা গুহা ছিল। তাহার পার্শ্বে একটি প্রস্রবণ থাকায় গুহার ছাদ ও পার্শ্বের প্রাচীরগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পশ্চাতের প্রাচীরে একখানি চক্র খোদিত আছে, চক্রের নিম্নে দুই পংক্তি ও বামপার্শ্বে এক পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহার বামপার্শ্বে আর একখানি ক্ষুদ্রতর চক্র আছে। পূর্ব্বে তাহার নিম্নে এক পংক্তি খোদিতলিপি ছিল, কিন্তু কোন সময়ে কেহ তাহা ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিয়াছে। এই খোদিতলিপির প্রারম্ভে একটি "স্বস্তির" চিহ্ন ছিল। আমরা যখন শুশুনিয়া পর্ব্বতে গিয়াছিলাম তখন বিশেষ কারণে খোদিতলিপির আলোক-চিত্র গৃহীত হয় নাই। তবে যে প্রতিলিপি প্রকা-শিত হইতেছে তাহাও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিলিপি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "চিত্রখানি ঠিক অনুরূপ হয় নাই, খোদকের দোষে অতি সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে।" * পাঠকবর্গ উভয় প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে অত্যন্ত অধিক রূপান্তর ঘটায় পরিষদ-পত্রিকার প্রতিলিপিখানি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শুশুনিয়া পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1895, P. 180.

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২১০।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২০৮ পাদটীকা।

একদিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাই যে তিনি মন্দশোরে অর্থাৎ প্রাচীন দশপুরে একখানি নূতন খোদিতলিপি অবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত শুশুনিয়া খোদিতলিপির সিদ্ধবর্ম্মার নাম আছে। শুশুনিয়ার খোদিতলিপিতে সিদ্ধবর্ম্মার নাম নাই শুনিয়া তিনি প্রতিলিপি দেখিতে চাহেন। উভয় প্রতিলিপি দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন খোদিতলিপিতেই সিদ্ধবর্ম্মার নাম নাই, সিংহবর্ম্মার নাম আছে। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় শুশুনিয়ার খোদিতলিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

১। চক্রস্বামিনঃ দাস [া] [ে] গ্রণ [া] তি সৃষ্টঃ

২। পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ

"চক্রস্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত, পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহ বর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্ম্মার অনুষ্ঠান।"

উত্তম প্রতিলিপির অভাবে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় খোদিতলিপির দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম কথাটি একবার "পুষ্করাম্বুধি" ও দ্বিতীয়বার "পুষ্করস্বাধি" পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে আমারও বিশেষ সন্দেহ ছিল।

পুষ্করণ বা পুষ্করণা নামক কোনও দেশের নাম ইহার পূর্ব্বে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভট্ট ও চারণগণের গ্রন্থে দেখিয়াছেন যে বর্ত্তমান মাড়োয়াড় রাজ্যের কিয়দংশের প্রাচীন নাম পোকরণা বা পুষ্করণা। দুই বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালব দেশের প্রাচীন দশপুর নগরে (বর্ত্তমান নাম মন্দশোর) একখানি খোদিতলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহারই সাহায্যে শুশুনিয়ার খোদিতলিপির রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি এই নূতন খোদিতলিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

(১) সিদ্ধম্ সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়ামিতাত্মনে
চতুস্সমুদ্র-পর্য্যঙ্ক-তোয়-নিদ্রালবে নমঃ
শ্রীর্ম্মালবগণাম্নাতে প্রশস্তে কৃতসজ্ঞিতে

(২) একষষ্ঠ্যধিকে প্রাপ্তে সমাশত চতুষ্ট [ে] য়
প্রাবৃক্কালে শুভে প্রাপ্তে মনস্তুষ্টিকরে নৃণাম্
ময়ে প্রবৃত্তে শক্রস্য কৃষ্ণস্যানুমতে তটে,

(৩) নিষ্পন্ন ব্রীহি-যবসা কাশ পুষ্পৈরলঙ্কৃতা
ত্যাভিরভ্যধিকং ভাতি মেদিনী সস্যমালিনী
দিনে আশ্বোজ-শুক্লস্য পঞ্চম্যামথ সৎকৃতে

(৪) ঈদৃক্কালবরে রম্যে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্
প্রাক্ পুণ্যোপচয়াভ্যাসাৎ সম্বর্ধিত মনোরথে
জয় বর্ম্ম নরেন্দ্রস্য পৌত্রে দেবেন্দ্র বিক্রমে

(৫) ক্ষিতীশ সিংহ বর্ম্মণস্ সিংহবিক্রান্ত-গামিনি
সৎপুত্রে শ্রীর্ম্মহারাজ নর বর্ম্মণি পার্থিবে
তৎপালন গুণোদ্দেশাদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থ বিস্তরঃ

(৬) পূর্ব্ব জন্মান্তরাভ্যাসাৎ বলাদাক্ষিপ্তমানসঃ
স্বযশঃ পুণ্যসংভার বিবর্দ্ধিত-কৃতোদ্যমঃ
মৃগতৃষ্ণা-জল-স্বপ্ন বিদ্যুদ্দীপ শিখাচলম্

(৭) জীবলোকমিমং জ্ঞাত্বা শরণ্যং শরণঙ্গতঃ
ত্রিদশোদার ফলদং স্বর্গ স্ত্রী চারুপল্লবম্
বিমানানেক বিটপং তোয়দাংবু মধুস্রাবম্

(৮) বাসুদেবং জগদ্বাসমপ্রমেয়মজং বিভুম্
মিত্র ভৃত্য [া] র্ত্ত সৎকর্ত্তা স্বকুলস্য [া] থ চন্দ্রমাঃ
যস্য বিত্তংচ প্রাণাশ্চ দেব ব্রাহ্মণ সাগতা [সাৎকৃতা]

(৯) মহাকারুণিকঃ সত্যোধর্ম্মার্জ্জিত মহাধনঃ
সৎপুত্রো বর্ণ বৃদ্ধেস্ত সৎপৌত্রোথ জয়স্যবৈ
দুহিতু পুল শূরায়া সৎপুত্রো জয় মিত্রয়া

এই খোদিতলিপি হইতে তিনটি বিষয় জানা যাইতেছে :—

(১) ৪৬১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৪০৪ খৃঃ অব্দে দশপুরে নরবর্ম্মা নামক একজন রাজা বর্ত্তমান ছিলেন।

(২) তাঁহার পিতার নাম সিংহ বর্ম্মা ও পিতামহের নাম জয় বর্ম্মা।

(৩) গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা মালবাধিপতি বন্ধুবর্ম্মা, নর বর্ম্মার বংশসম্ভূত।

এতদ্ব্যতীত শুশুনিয়ার খোদিতলিপি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে চন্দ্র বর্ম্মার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা এবং তিনি পুষ্করণা দেশের অধিপতি ছিলেন, অতএব ইহা প্রায় নিশ্চিত যে চন্দ্রবর্ম্মা মালবরাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র।

মালবের বর্ম্মরাজবংশ

জয়বর্ম্মা
|
সিংহবর্ম্মা
|
চন্দ্রবর্ম্মা — নরবর্ম্মা
|
বিশ্ববর্ম্মা [গঙ্গধরের প্রস্তরলিপি মালবাব্দ ৪৮০ = ৪২৩ খৃঃ অঃ]
|
বন্ধুবর্ম্মা [মন্দশোরের প্রস্তরলিপি, মালবাব্দ ৪৯৩ = ৪৩৭ খৃঃ অঃ]

চন্দ্রবর্ম্মার কাল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়-কালে চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অশোকের এলাহাবাদ স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে তাহাতে আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের মধ্যে চন্দ্রবর্ম্মার নাম দেখিতে পাওয়া যায়-- রুদ্রদেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম্ম গণপতিনাগ নাগসেনাচ্যুত নন্দিবলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজপ্রসভোদ্ধরণোদ্বৃত্তপ্রভাবমহতঃ (২১শ পঙ্ক্তি)।

দিল্লিতে বিখ্যাত মস্জিদ্ কুতব-উল্-ইস্লামের প্রাঙ্গণে একটি লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে, ইহাতে প্রাচীন অক্ষরে চন্দ্র নামক একজন রাজার বিজয়কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়ঃ—

(১) চন্দ্র বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে এই লৌহনির্ম্মিত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) তিনি সমবেত বঙ্গবাসীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এবং

(৩) সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহিসকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

অন্য উপায় না দেখিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ, জে, পি, ভোগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছিলেন যে "চন্দ্র" ও গুপ্তবংশীয় সম্রাট "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত" একই ব্যক্তি। শুশুনিয়া ও মন্দশোরের নবাবিষ্কৃত খোদিত লিপিদ্বয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে "চন্দ্র" ও "দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত" এক ব্যক্তি নহেন। কারণ—

(১) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপির অক্ষর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপিসমূহের অক্ষর অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

(২) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপির অক্ষর ও শুশুনিয়ার খোদিতলিপির অক্ষর একই প্রকারের।

(৩) লৌহস্তম্ভের খোদিতলিপিতে বঙ্গবিজয়ের উল্লেখ আছে এবং রাঢ়ে (পশ্চিম বঙ্গে) চন্দ্রবর্ম্মার দ্বিতীয় খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব "চন্দ্র" ও "চন্দ্রবর্ম্মা" একই ব্যক্তি।

(৪) চন্দ্রবর্ম্মার পিতার নাম সিংহ বর্ম্মা, সুতরাং তাঁহার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়ারী নামক পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সকল মতগুলিই গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে শুশুনিয়া ও মন্দশোরের খোদিতলিপি হইতে কয়েকটি নূতন কথা জানা যাইতেছে—

(১) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দ্র বর্ম্মা আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিয়াছিলেন।

(২) সেই সময়ে—গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

(৩) বঙ্গবাসীগণ সমবেত হইয়া চন্দ্রবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মালবের ইতিহাস-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নূতন তথ্য কয়টি আবিষ্কৃত হইয়াছে—

(১) জয়বর্ম্মা, সিংহবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মা স্বাধীন রাজা ছিলেন।

(২) সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নর বর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩) নর বর্ম্মা ও বিশ্ব বর্ম্মা গুপ্তসাম্রাজ্যের করদ রাজা ছিলেন।

(৪) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার জে, এফ্, ফ্লিট্ বলিয়াছেন যে বন্ধু বর্ম্মা কুমার গুপ্তের সময়ে দশপুরে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন (under him the Governor at Dasapura was Bandhuvarman, the son of Visvavarman—Fleets Corpus incriptionum

Indicarum, Vol III, page 80)। ইহা সত্য নহে। নরবর্ম্মা ও বিশ্ববর্ম্মার ন্যায় বন্ধুবর্ম্মাও করদ নৃপতি ছিলেন :—

তস্যাত্মজঃ স্থৈর্য্যনয়োপপন্নো বন্ধুপ্রিয়ো বন্ধুরিব প্রজানাং
বংধ্বার্ত্তিহর্ত্তা নৃপ বন্ধুবর্ম্মা দ্বিড় দৃপ্ত পক্ষ ক্ষপণৈকদক্ষঃ॥

মন্দশোরের প্রস্তরলিপি ১৪ ১৫শ পংক্তি।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোট ও বড় *

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উদ্যম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করচে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে; তবু সমস্ত মত্ততা, অহঙ্কার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে যে আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়।

সেই জন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসার-বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বল্লেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেই প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এই জন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তকে মধুময় করে বিকশিত করচেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে' তুলচেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে' আমরা বল্লুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ বিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটচে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অন্তরের বিশ্বাস, এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েছে, বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এ যে মর্ম্মের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্ব্বচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই ত ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সঙ্গীত বেজে উঠত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠচে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে' জুড়ে বসে, আমাদের চলবার পথটি রোধ করে' দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের

---

* আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভদিন—তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে, সে মরবে তখনি যখন আমরা মরব; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মীর খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃত-লোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত বেজে উঠচে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে' মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দ্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করচে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটী চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্চে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করচে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করচে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করচে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই ত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে; সেই দিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই দিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই জন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করল

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্ম্মজাল বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরম কল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত উর্দ্ধমুখ হয়ে উঠ্‌চে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্ম্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয় ত আসেনি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি;—কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা এ ত আমাদের কারো একলার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসঙ্গীত উঠ্‌বে সে ত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে, আমরা সেই সকল-মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি—কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে—যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকৃতে শিখেছি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌" আমরা সেই মহান্‌ পুরুষকে জেনেছি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করচি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়েই বলেছে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্‌ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। মনুষ্যত্বের

তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চল্‌তে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে, মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা ত সহজ দেখা নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে, তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সম্মিলন।

কিন্তু বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি—অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্ত্তন হতে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাইত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করিনে, তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুট্‌তে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত; কিন্তু যে সূর্য্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে, ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে' পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে' এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে' অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেছে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ, আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হল না—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত কোনো কথা বলা চলে না। "সীমা" শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—তাইত তাঁকে ওঁ বলে' ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে—সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিষটি যেমন-কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি-মুহূর্ত্তেই তার ধ্বংস হচ্চে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি-মুহূর্ত্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না। মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্চে "হাঁ"।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্চেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায়—সমস্ত চলে যাচ্চে, সমস্ত স্খলিত হয়ে যাচ্চে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্চে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানচি; নিরন্তর সমস্ত চলে যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করচে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখচি; কখনো আজ, কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায়, কখনো অন্য ঘটনায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন

বোধের উদয় হয়েছে, তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে; যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল অনাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন কি মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে—কিন্তু সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ, কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন, তাঁরাই বলেছেন, এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমাসম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ;—তিনি একদিকে যেমন গতি, আরএকদিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর-একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করচি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকৃত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ,—তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও ত আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করেচেন। যখনি তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করচেন তখনি তিনি, আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাৎ তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা ত আমারই, বনের শ্যামল শোভা ত আমারই, ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে, ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে সে সঙ্গীত কার জন্যে? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধরা, এই ত ঘরে বাহিরে যাদের ভালবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্চে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর আলপনা-আঁকা বরণ-বেদীটির উপরে, আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে, সেই সত্যংজ্ঞান-মনন্তংব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করচেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝ-খানে আমাদের হৃদয় যদি জাগ্‌ল না, আমরা তাঁকে যদি ভালবাস্‌তে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুম্‌কি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বল্‌তে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্চেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বল্‌তে হয় যেখানে

তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাতেই তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্ব্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চল্‌বে না এবং দূরে বসে বসে বল্‌বে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেছে, তার থেকে তুমি কি বুঝ্‌লে? সে বল্লে, সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে, যে, কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝ্‌তে হয়, মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, "সুশীতল" শব্দের জায়গায় "সুস্নিগ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি; এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি, তুমি কখনো কি দেখেছ? সে বল্লে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি, যে-নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না, যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখ্‌তে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি? এই যে এষঃ, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠ্‌ছে; এই যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করচেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠ্‌চে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠ্‌ছে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তংশিবমদ্বৈতং, সেই কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে-এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করচেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতা মাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি; তখন টুক্‌রো কেবলি হাজার টুক্‌রো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর

...তে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মত স্বাধীন-বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়; থামার সীমাই হচ্চে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্চে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়; সেই দিক নিয়ত সাধনার দিক—সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে' আপনার দুর্ব্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে যেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতেই পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায়, যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোট করলেও যেমন তাকে মিথ্যা করা হয়, তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড়, এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থিমোচন করচেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করচেন, আমাদের কথা শুনচেন এবং শোনাচ্চেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে, তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি—যখনি এ কথা সত্য হয়েছে, তখনি এ কথাও সত্য—অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-একদিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-একদিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক্ এবং নিকটের দিক্ দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যেই মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্চে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্য্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্ম্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে

ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্ম্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মনুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে' আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে, তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে—এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌চে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে' কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করচে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদসাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা, অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলি রসে মজে থাক্‌তে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্ম্মে পেতে হবে; তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে, তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন, আবার আর-একদিকে বলেছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যা দ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন। এ দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করচেন, তিনি তপস্যা দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে!" সে আরো গেয়েছিল "আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?" তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাচ্চে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠচে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন, স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক্, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই ত মানুষকে তৈরি করে তুল্‌চেন, সেই জন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কা'কে অনুভব করচে। সেই জন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে—"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়!" আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারচি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরণ ও সর্ব্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করচে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌তে হচ্চে, "আমার মনের মানুষ কে রে, আমি কোথায় পাব তারে?" সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূলরকম করে ভুলিয়ে রাখলে জান্‌তে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে?" কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে, কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই ত আপনার মনের মানুষের সন্ধান করচে—এমনি করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠচে; যতই তাকে পাচ্চে, ততই বল্‌চে, "আমি কোথায় পাব তারে?" সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না; জ্ঞানে কর্ম্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে-দিকেই মানুষ বলেছে আমি চিরকালের মত পৌঁচেছি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে সেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই যে তার চিরকালের গান, "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে?" এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন—"মনের মানুষ যেখানে, বল কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?" কেননা সন্ধান এবং পেতে থাকা একসঙ্গে; যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আরএক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কেনো অনন্ততত্ত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল। এতে কি কোনো অপরাধ হল? এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল? কিছুমাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-একভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে, আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জন্যেই আমার ঘর, সেই জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, সেই জন্যেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে "পিতা নোঽসি" তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই

বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবল মাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না—যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফললাভ করতে চাই, অন্যায় করে' তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্ব্বলতাকে লালন করবার জন্যে তাঁকে পিতা বলা নয়। সেই জন্যেই বলা হয়েছে পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে, সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে, পিতা,—সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু, পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, দেশের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুইধারে তার নানা কল্যাণকীর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্তকালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে নমস্কার, তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

শান্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা (British Review):—

জগতে যুদ্ধবিগ্রহ মানুষকে দানব করে। এইজন্য আধুনিক সভ্যজগতের জনহিতৈষী মনীষীগণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বারা মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার ফলে বহুদিন হইতেই (১৮৯৯, ২০শে জুলাই) ওলন্দাজ শহর হেগ নগরে এক সার্ব্বজাতিক শান্তিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় সেই সমিতির বৈঠক হয় এবং তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিবদমান জাতির অভিযোগের কারণ বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। বিগত কয়েক বৎসরে এই হেগ শহরে শান্তি-সমিতির সালিসীতে বহু আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসিত ও শান্তি সংস্থাপিত হইয়া সন্ধিশর্ত্ত স্বীকৃত হইয়াছে।

শান্তির মন্দির।

ওলন্দাজ জাতি এককালে জগতের অগ্রণী জাতি ছিল; তাহারা এককালে ইংলণ্ড বিজয় করিয়াছিল, ভারতের একাংশ ও বহির্ভারতের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিল, বাণিজ্যসম্পর্কে সমস্ত পরিজ্ঞাত দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইয়াছিল। অথচ এই দেশ অতি ক্ষুদ্র; দেশ সমুদ্রের জলতলের অপেক্ষাও নীচু বলিয়া বাঁধ দিয়া সমুদ্রের কবল হইতে দেশটুকু কোনো রকমে কাড়িয়া লইয়া তাহারা পৃথিবীপৃষ্ঠে টিকিয়া আছে। কিন্তু এই জাতি শিক্ষায় স্বাধীনতায় শিল্পে বাণিজ্যে জগতের সকল শ্রেষ্ঠ জাতির সমকক্ষতা করিয়া আসিতেছে। এই জাতিও নেপোলিয়নের সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া বড় হীনবল ও নষ্টবাণিজ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারা অতি সত্বর তাহাদের নষ্ট সামর্থ্য পুনর্ব্বার অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে।

ওলন্দাজেরাই আন্তর্জাতিক বিধিনিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তাহাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নগরে আন্তর্জাতিক শান্তিসমিতি প্রতিষ্ঠা

উপযুক্তই হইয়াছিল। এক্ষণে ওলন্দাজেরা তাহাদের নষ্টস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে হেগ্ নগরে স্বাধীনতার প্রতিকাগার স্বরূপ এক শান্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

স্কচ-আমেরিক্যান বদান্য ধনকুবের এণ্ড্রু কার্নেগী ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করিয়া শান্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করেন। এই সংকল্পের পোষকতা স্বরূপ ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টও ৯ লক্ষ টাকা দিয়া একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া শান্তিসমিতিকে দান করেন।

এই মন্দিরভিত্তিতে খোদা হইয়াছে এই কথাগুলি—Paci Justitia Firmandae Hanc Aedem Andreae Carnegii Munificentia Dedicavit, অর্থাৎ এই মন্দির এণ্ড্রু কার্নেগীর বদান্যতায় ন্যায়সঞ্জিত শান্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হইল। মন্দিরটি ফরাসী স্থপতি কর্দনীয়ে কর্ত্তৃক ওলন্দাজ ও ফ্লেমিশ সৌধসংগঠন-রীতিতে গঠিত হইয়াছে। এই নক্সাটি ২১৬ খানি নক্সার ভিতর হইতে, গ্রেট ব্রীটেন, হলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি ছয়জন শ্রেষ্ঠ কারিগর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে দুটি ন্যায়কক্ষ আছে—একটি বড়, একটি ছোট, এবং উহাদের পাশে পাশে বিচারকক্ষ। বড় ন্যায়কক্ষটি ৭০ ফুট লম্বা, ৪০ ফুট চৌড়া, ৩৩ ফুট উচ্চ; তাহার একদিকে তিনটি প্রকাণ্ড জানালা, অপরদিকে তিন থাক গ্যালারী, অপর একদিকে আর একটি বড় জানালা এবং তাহার বিপরীত দিকে বিচারকদের বেদীপীঠ। ছোট ন্যায়কক্ষটি বড় কক্ষের অর্দ্ধেক। সমস্ত মেঝে গ্রীস ও ইটালী দেশের শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে মণ্ডিত; ছাদতল ধনুকাকৃতি ও কারুকার্য্যে-সুসজ্জিত। এই কক্ষদ্বয়ের পাশে পাশে পাঠাগার, মানচিত্রাগার, মন্ত্রণাগার প্রভৃতি আরো অনেক কক্ষ আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণচত্বর ১৪৪ ফুট লম্বা ও ১১১ ফুট চৌড়া; তাহার মধ্যস্থলে ফোয়ারা ও নিশ্বাস গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য বায়ুশোধনের যন্ত্রাদি আছে। সেখান হইতে প্রকাণ্ড ও বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী উপরতলে উঠিয়াছে। উপরতলে স্থায়ী শান্তিসমিতির আফিস, দু লক্ষ পুস্তক ধারণক্ষম লাইব্রেরী-ঘর আছে; লাইব্রেরী হইতে নীচের পাঠাগারে বই দিবার জন্য একটি লিফ্‌ট্ আছে। ছাপাখানা, টেলিগ্রাফ- ও পোষ্ট-আফিস, হোটেল, প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত আছে। হোটেলে একত্র খাইতে বসিয়া বিভিন্ন প্রদেশের শান্তিদূতদের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায় বলিয়া হোটেলটির অত্যন্ত সমাদর।

এই মন্দিরটিকে সার্ব্বজাতিক আকার দিবার জন্য প্রত্যেক স্বাধীন ও সভ্য জাতি নিজের নিজের দেশের দ্রব্যসামগ্রী দিয়া মন্দির সজ্জিত করিয়াছে। গ্রেট ব্রীটেন রঙিন কাচের বড় জানালা চারটি ও জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মূর্ত্তি উপহার দিয়াছে; ফ্রান্স ও হলাণ্ড স্বদেশী ওস্তাদ চিত্রকরদের চিত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়াছে; জার্ম্মানী দিয়াছে মন্দিরের প্রবেশ-তোরণগুলি; ইটালি মর্ম্মর প্রস্তর, অষ্ট্রীয়া পিত্তল ও বেলওয়ারী ঝাড় ও বাতিদান, নরওয়ে ও সুইডেন প্রবেশপথে পাতিবার জন্য গ্রানাইট প্রস্তর, ডেনমার্ক ফোয়ারার পোর্সিলেন, সুইজারল্যাণ্ড ঘড়ী, রুষিয়া ১১ ফুট উচ্চ একটি মণিপাত্র, আমেরিকার যুক্তরাজ্য "ন্যায়ের দ্বারা শান্তি" সূচক মর্ম্মরমূর্ত্তি, জাপান কিংখাবের পর্দ্দা, ও অন্যান্য দেশ অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী দিয়াছে। এই মন্দির হইতে যত জীবন রক্ষা হইবে যে জগতের শ্রেষ্ঠ হাসপাতালেও এত জীবন রক্ষা হয় নাই বা হইবে না।

১৮৯৯ সালে শান্তিসমিতি প্রতিষ্ঠার বৎসরই যে প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আলোচনার জন্য সম্মিলন হয় তাহা রুষিয়ার জারের আহ্বানে। এবং জারের শান্তিপ্রচেষ্টা জাগ্রত হয় ব্যারনেস ভন সাটনারের "অস্ত্র ত্যাগ কর" নামক একটি গল্প পাঠ করিয়া। সাটনার একমাত্র স্ত্রীলোক যিনি আন্তর্জাতিক শান্তিসংস্থাপনচেষ্টার জন্য নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং তিনি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের লিখিত ক্রিমিয়ান যুদ্ধের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শান্তি-বিষয়ক রচনা লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রত্যেক ৮ বৎসর অন্তর এক একটি রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার-আলোচনাসম্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সম্মিলনও রুষিয়ার জারের আহ্বানে হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৯১৫ সালে তৃতীয় সম্মিলন হইবে।

এইরূপ আলোচনা দ্বারা সভ্যজাতিদিগের পরস্পর সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইবে, বিবাদ কলহের কারণ উপস্থিত হইলে সহজে মীমাংসা হইবে, এবং তাহার ফলে যুদ্ধ অনাবশ্যক হইয়া উঠিলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইবে ও যে অর্থে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি মারণোপায় সংগ্রহ করিতে হইতেছে তাহাতে মনুষ্যজীবনের বহু অভাব মোচন হইতে পারিবে।

সাহিত্য-সেবিকার প্রণয়পত্র

(Current Opinion, Literary Digest):—

প্রসিদ্ধ স্ত্রী-ঔপন্যাসিক শার্লট ব্রণ্টে তাঁহার শিক্ষক ব্রুসেল্‌সের অধ্যাপক হেজারকে মনে মনে ভালো-বাসিতেন বলিয়া সাহিত্যিক মহলে একটা কানাঘুষা শুনা যাইত। ব্রণ্টের "ভিলেৎ" Villette নামক উপন্যাসের নায়ক পল ইমানুয়েল নাকি তাঁহার প্রণয়ী অধ্যাপকেরই অমর চিত্র।

সম্প্রতি অধ্যাপক হেজারের পুত্র চারখানি পত্র ব্রিটিশ মিউজিয়মকে উপহার দিয়াছেন; সেগুলি শার্লট ব্রণ্টে অধ্যাপক হেজারকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলি আবিষ্কার হওয়াতে য়ুরোপের সাহিত্যিক মণ্ডলীতে একটা খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মের সম্পদ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

শার্লট ব্রণ্টে ফ্রেঞ্চ ভাষা পড়িবার জন্য ব্রুসেল্‌সে গিয়া অধ্যাপক হেজারের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। সেই সময় তিনি বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু বৃদ্ধ, শিষ্যার প্রতি কোনো রূপ আসক্তির পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে ভগ্নহৃদয় ব্রণ্টে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ অধ্যাপককে পত্রে প্রণয়নিবেদন করিয়াছিলেন। এই পত্রগুলি মানবাত্মার বুকফাটা দুঃখের করুণ ক্রন্দন। এই চিঠিগুলিতে ব্রণ্টের সমগ্র প্রাণের আশা, আশঙ্কা, বেদনা, বাসনা প্রণয়াস্পদকে নিবেদিত হইয়াছে। চারখানি পত্রই ফরাসী ভাষায় লেখা, কেবল শেষের খানিতে ইংরাজিতে একটু পুনশ্চ আছে।

লণ্ডনের নেশান পত্র বলেন—এমন মহিমান্বিত স্বভাবের অধ্যাপককে যে-শিষ্যা ভালো-বাসিতে না পারে সে নির্ব্বোধ মূর্খ। একদিকে এমন মহিমান্বিত অধ্যাপক, অপর দিকে শার্লট ব্রণ্টের তুল্য প্রতিভাময়ী ছাত্রী, তাহাতে আবার একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার না হইয়া যায় না। ইহা গুরুর প্রতি শিষ্যের পবিত্র ভক্তির আতিশয্য ছাড়া কলুষিত কিছু নহে। চিঠিগুলিতে এই পবিত্র ভক্তিরই আতিশয্যের পরিচয় আছে, লালসার লেশ নাই। ব্রণ্টের নিঃসঙ্গ একক

জীবনের বেদনা তাঁহার মনীষী গুরুর সাহচর্য্যের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া যদি থাকেই তবে তাহা স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম, তাহাতে নিন্দার কিছু নাই। যদি কেহ ইহাকে অর্দ্ধোন্মত্তের প্রলাপ বলিতে চান বলুন, এমন অবস্থায় কে না পাগল হইতে চায়?

শার্লট্ ব্রন্টের জীবনীলেখিকা শ্রীমতী মে সিনক্লেয়ার বলেন—"ব্রন্টের বন্ধুত্ব-বন্ধনের অদ্ভুত প্রতিভা ছিল; তিনি পরিচিত নরনারী মাত্রকেই ভালো-বাসিতেন। অধ্যাপক হেজারের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহার হইয়াছিল সেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহার কোনো স্ত্রীবন্ধুর সহিত হইলে তাহাকেও তিনি ঐরূপই উচ্ছ্বসিত প্রণয়-পত্র লিখিতেন। তিনি তাঁহার ভগিনী এমিলী ব্রন্টেকে যেমন ভালো-বাসিতেন তেমন উন্মত্ত ভালোবাসা কোনো ভগিনী ভগিনীকে বাসে না।

অধ্যাপক হেজার বৃদ্ধ ছিলেন; তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল। সুতরাং প্রায়ই বিনষ্ট হইত। এই জন্য বৃদ্ধ চিঠিগুলি রক্ষা করিতে পারিতেন না।" কিন্তু কলহান্তরিতা বৃদ্ধা গৃহিণীর কৌতূহল সেই ছিন্ন পত্রাংশ আঁঠা ও কাগজ দিয়া জুড়িয়া, সুতা দিয়া সেলাই করিয়া নূতন কলহের সুযোগ খুঁজিত। ছিন্নপত্রও স্ত্রীর হাতে পড়ে দেখিয়া ব্রন্টেকে অধ্যাপক হেজার তাঁহার পাঁসিয়োনা বা স্কুলের ঠিকানায় পত্র লিখিতে বারণ করিয়া আতেনে রোয়াইয়ালের ঠিকানায় লিখিতে অনুরোধ করেন। অধিকন্তু পাঠসমাপ্তির পর যখন ব্রন্টে ব্রুসেল্‌স্ ছাড়িয়া ইংলণ্ডের গৃহে ফিরিবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ও বিবাহিত বলিয়া, যুবতী অনূঢ়া ছাত্রীর প্রতি নিজের অনুরাগ সংযত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্রন্টের প্রণয়পত্রগুলির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শার্লট্ ব্রন্টে।

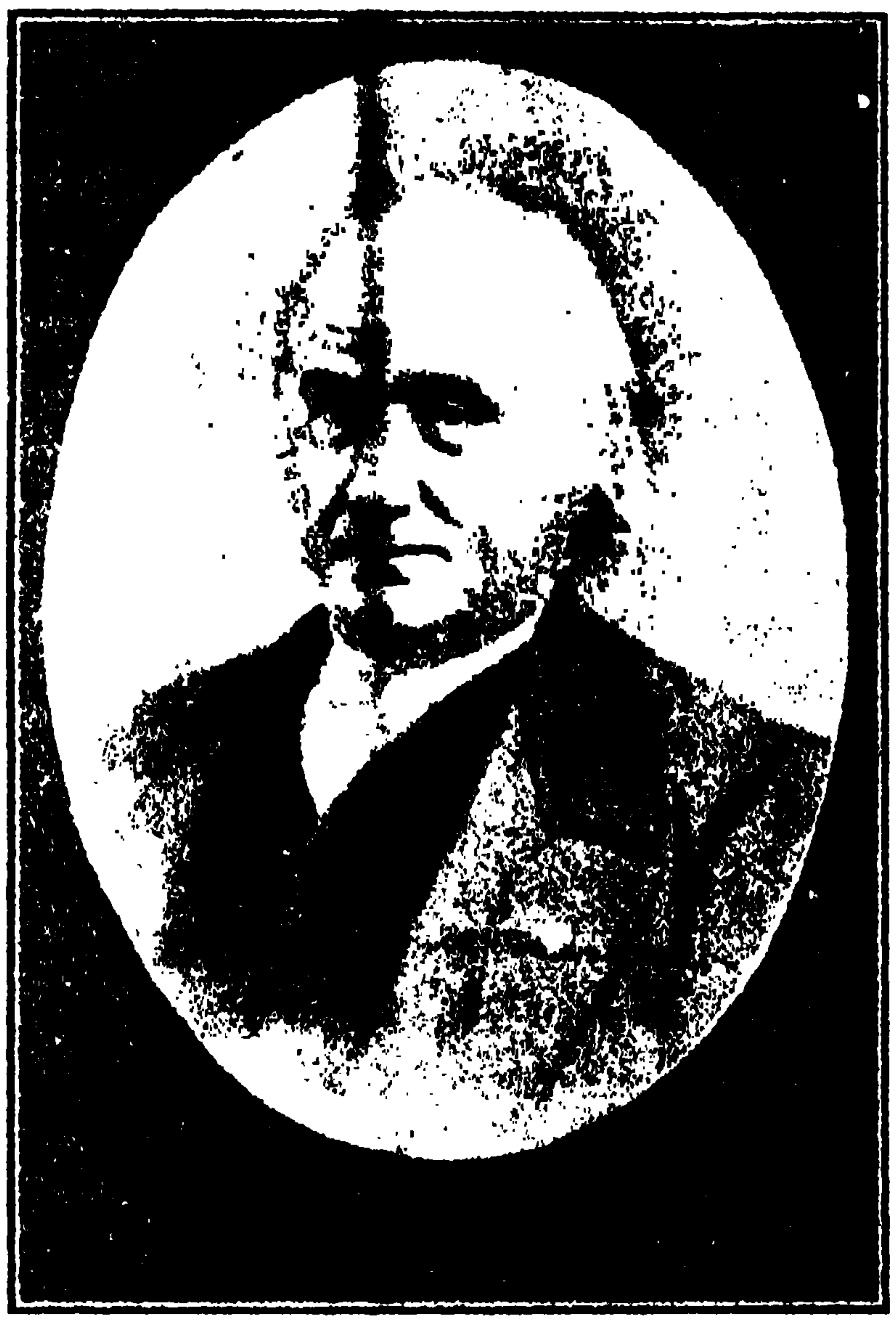

অধ্যাপক হেজার।

তাঁহার দিকের আসক্তি যুবতী অনূঢ়া ব্রন্টের ন্যায় উচ্ছ্বসিত আবেগময় ছিল না। অনেকে যে বলেন, যে, তিনি ব্রন্টের প্রণয়-নিবেদনের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন, সে কথাও সত্য নয়। যদিও ব্রন্টের প্রণয়লিপির মার্জিনে অধ্যাপকের হাতের লেখায় জুতার হিসাব টুকা আছে দেখা যায়, যদিও ব্রন্টের চারখানি চিঠির উত্তরে হেজার কেবল একবার মাত্র সাধারণ কথায় ছাত্রীকে অত "উচ্ছ্বসিত" হইতে বারণ করিয়া জবাব দিয়াছিলেন, যদিও ব্রন্টের চিঠিগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা না করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, তথাপি ইহা হইতে ব্রন্টের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা প্রমাণিত হয় না। অধ্যাপক হেজারের পত্নী শ্রীমতী হেজার, ব্রন্টের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ব্রন্টেকে লইয়া হেজার-দম্পতির পারিবারিক শান্তি

(১)

"পূর্ব্বে আমি সমস্তদিন, সমস্ত সপ্তাহ, সমস্ত মাস লিখিতাম, একেবারে নিষ্ফল লেখা নহে, কারণ আমাদের দেশের দুজন শ্রেষ্ঠ লেখক শেলী [সাউদে? শেলীর মৃত্যুর সময় ব্রন্টের বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল] এবং কোলরিজ আমার লেখা দেখিয়া অনুমোদন করিতেন। এখন আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, আমি আর লিখিতে পারি না। যদি লিখি তবে অন্ধ হইয়া যাইব। এই ক্ষীণদৃষ্টি আমার বিষম বাধা হইয়াছে। নতুবা গুরুদেব, জানেন কি আমি কি করিতাম?—আমি একখানি বই লিখিয়া আমার সাহিত্যের মন্ত্রদাতা, আমার একমাত্র গুরুর চরণে উৎসর্গ করিতাম।—সে গুরু আপনি। আমি পরকীয় ফরাসী ভাষায় অনেকবার আপনাকে জানাইয়াছি আপনাকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা

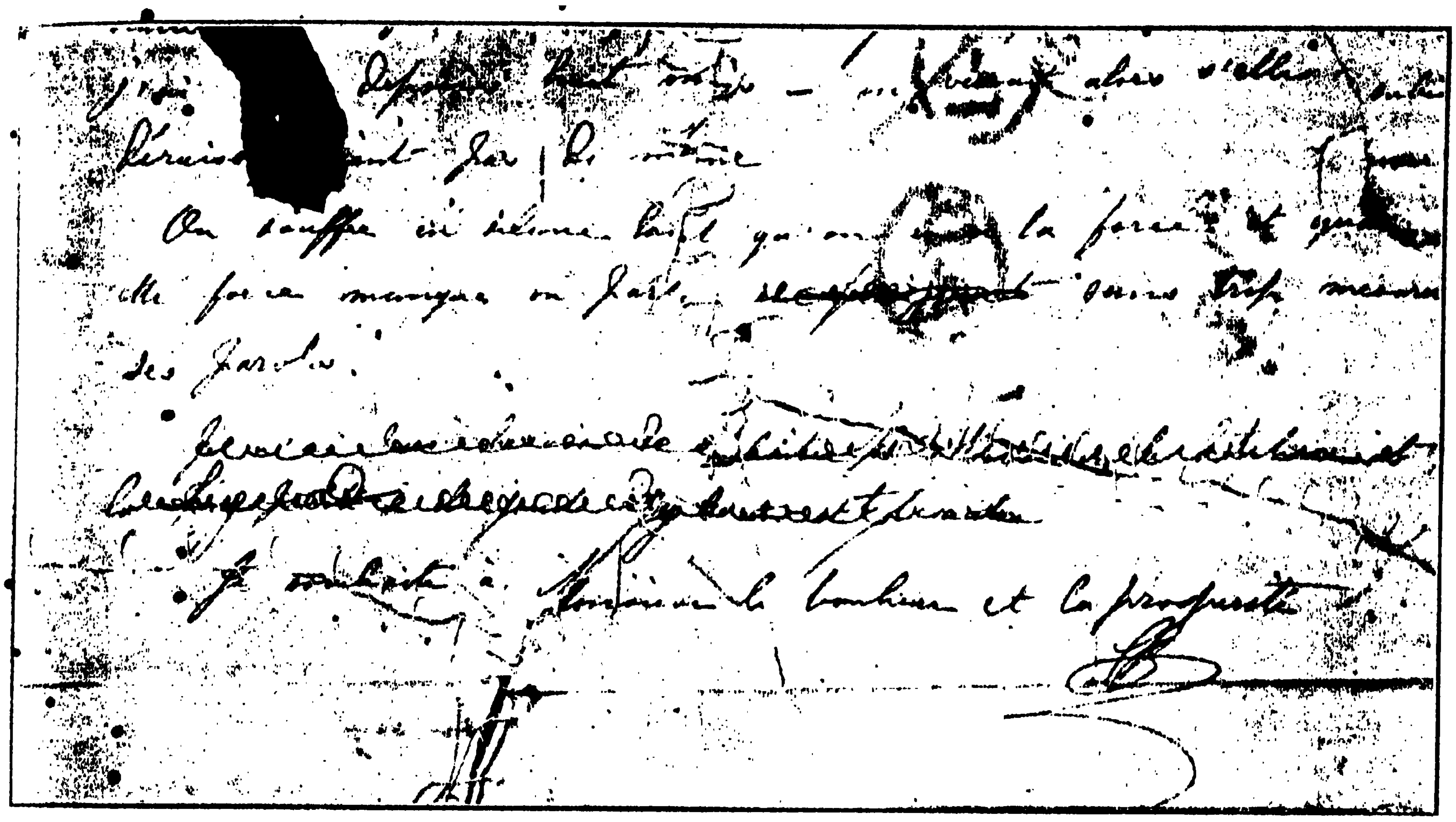

শার্লং ব্রন্তের প্রণয়-লিপি।
(এই ছবিতে দ্বিতীয় পত্রের শেষাংশ দেখা যাইতেছে)

করি—আমি আপনার সদাশয় উপদেশের কাছে কতখানি ঋণী; সেই কথাটা একবার আমার নিজের ভাষায় প্রাণ খুলিয়া বলিতে আমার বড় সাধ। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইবার নয়, তাহা চিন্তা করা মিথ্যা। সাহিত্যের স্বর্গদ্বার আমার কাছে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

"আমি ভয়ে আপনাকে চিঠির জবাব দিতে অনুরোধ করিতে পারি না, পাছে আমার নির্ব্বন্ধে আপনি বিরক্ত হন। কিন্তু আপনি দয়া করিয়া ভুলেন নাই যে আমি মুখ ফুটিয়া না চাহিলেও অন্তরে কিরূপ উৎসুক—বাস্তবিক আপনার চিঠি পাওয়া আমার পরম ও চরম অভিলাষ। যাক্; আপনার যেমন অভিরুচি তাহাই করিবেন। যদি আমি বুঝিতে পারি আপনি কেবল দয়া করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তবে আমি বিষম আঘাত পাইব—তেমন দয়ার দানে আমার কাজ নাই।"

(২)

"মিঃ টেলার ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার নামে কোনো চিঠি আছে কি না। না, নাই, কিছু নাই। আমি মনকে প্রবোধ দিলাম,—ধৈর্য্য ধর, উঁহার ভগিনী শীঘ্রই আসিবেন। মিস টেলার আসিলেন, বলিলেন—শ্রীযুক্ত হেজার তোমাকে ত কিছুই দেন নাই, না চিঠি, না সংবাদ।

ইহার পর আমি মনকে প্রবোধ দিলাম—যে-শান্তি পাওয়া তোমার উচিত ছিল না তাহা পাইয়াছ বলিয়া ব্যথিত হইও না, যা হয় হোক। আমি অশ্রু রোধ করিতে চেষ্টা করিলাম, উদ্গত অভিযোগের ভাব দমন করিলাম।

কিন্তু যখন কেহ অভিযোগ করে না, যখন কেহ নিজেকে স্বেচ্ছাচারী কুরাজার ন্যায় অত্যাচার করিয়া দমন করিতে চায়, তখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং বাহিরের শান্ত ভাবের অন্তরে যে বিষম সংগ্রাম চলিতে থাকে তাহা অসহ্য বোধ হয়।

দিবারাত্রি আমার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। তন্দ্রা আসিলে ভয়ঙ্কর কষ্টকর স্বপ্নে আপনাকেই দেখি—কি কঠিন, কি গম্ভীর, কি ক্রুদ্ধ সেই মূর্ত্তি।

অতএব ক্ষমা করিবেন, আবার আপনাকে চিঠি লিখিতেছি। প্রাণের বেদনা ব্যক্ত যদি না করি তবে প্রাণ ধারণ করিব কেমন করিয়া?

আমি জানি এই চিঠি পড়িয়া আপনি বিরক্ত হইবেন। আপনি হয়ত বলিবেন যে আমি উন্মাদ, আমার মন কুচিন্তায় পরিপূর্ণ। যাই বলুন, আমি নিজেকে সকল রকম লাঞ্ছনা তিরস্কারের হাতে সঁপিয়া দিয়াছি, নিজেকে কোনো রকমে সমর্থন করিতে চাই না। আমি এইমাত্র জানি যে আমি আমার গুরুর বন্ধুত্ব হারাইতে পারি না, হারাইতে দিব না। আমার অন্তর বেদনায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহার চেয়ে শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট সহনীয়। যদি আমার গুরু আমাকে তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন, আমি আশাশূন্য হইয়া পড়িব; যদি এতটুকু—কেবল এতটুকু—পাই তবেই আমি সন্তুষ্ট—সুখী। তবেই আমি বাঁচিবার, কাজ করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইব।

দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা অতি ক্ষুদ্র, তাহার অভাব সামান্য—ধনীর প্রসাদ যাহা ছড়াইয়া পড়ে তাহা খুঁটিয়াই তাহারা বাঁচিতে পারে। তাহাও যদি না পায় তবে দারুণ ক্ষুধা তাহাদিগকে সংহার করে। আমিও যাহাদের ভালোবাসি তাহাদের ভালোবাসা খুব বেশী চাই না। আমি খুঁজিয়া পাই না একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড প্রণয় লইয়া আমি কি করিব—আমি ত তাহা কখনো পাইও নাই। কিন্তু আপনি আপনার ছাত্রীর প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমি সেই একটুই ধরিয়া থাকিতে চাই, সেই একটুই আমার জীবন।

আপনি হয়ত বলিবেন—কুমারী শার্লং, তুমি ত আমার কেহ

নও, তোমার মতো কত ছাত্রী আসে যায়, আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার প্রতি আমার এতটুকু মমতা নাই।

ভালো, তাই স্পষ্ট করিয়া বলুন। ইহা বড় বাজিবে। তাহাতে কি? ইহা অনিশ্চিতের চেয়ে অল্প ভয়ানক।

এ চিঠি আমি পড়িতে পারিব না। যেমন লিখিয়া গেলাম, তেমনি পাঠাইতেছি। আমার অন্তর চুপি চুপি বলিতেছে, কেহ কেহ বলিবে, মেয়েটা আবোল-তাবোল বকিয়াছে। তাহাদিগকে আমি অভিসম্পাত আর কি দিব, এই আট মাস ধরিয়া যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি তাহারা মাত্র-একদিন সেই যন্ত্রণা ভোগ করুক। তখন দেখা যাইবে সেই-সব বিজ্ঞ লোকেও আবোল-তাবোল বকেন কি না।

যতদিন শক্তিতে কুলায় ততদিন নীরবে সহ্য করা চলে; যখন শক্তি টুটে তখন বেদনার ভাষা ওজন করিয়া বলা চলে না।

আপনার সুখসমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।"

(৩)

"গ্রীষ্ম শরৎ বড় দীর্ঘ লাগিয়াছে; সত্য কথা বলিতে কি, যে-আত্মত্যাগ ব্রত করিয়াছি তাহা বহন করিতে বিশেষ কষ্ট ও বেগ পাইতে হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, আমি আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। না খুঁজিয়াছি এমন উপায় নাই; আমি কর্ম্মের আশ্রয় যাচিয়াছি; এমন কি এমিলীর সঙ্গেও আপনার প্রসঙ্গ আলাপ-করার আনন্দ বর্জ্জন করিয়াছি; তথাপি আমার বেদনা ও অধৈর্য্য দমন করিতে পারি নাই। এ বড় লজ্জার কথা—নিজের চিন্তাকে বশ করিতে না পারা; শোকের, স্মৃতির, একটা কোনো প্রবল ভাবের দাস হওয়া। আমার প্রতি আপনার যেমন অনুরাগ আমারও কেন ততটুকু হয় না, না বেশী না কম? আপনার শেষ চিঠিখানি আমার ছমাস ধরিয়া অবলম্বন ও আশ্রয় হইয়া আছে। আর উহাতে চলে না, আর-একখানি চাই, আপনাকে দিতে হইবে, আমার প্রতি বন্ধুত্বের বা স্নেহের খাতিরে নয়, সে ত আপনার থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আপনি সদাশয়, নিজের কয়েক মুহূর্ত্তের অসুবিধার জন্য একজনকে দীর্ঘ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া আপনি সহ্য করিবেন না বলিয়া। আমার পত্র-লেখা বারণ করিলে, উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে, আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ কাড়িয়া লওয়া হইবে—এই আমার শেষ অধিকার আমি সহজে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারিব না। হে আমার গুরু, বিশ্বাস করুন, আমাকে পত্র লিখিলে আপনার পুণ্যকর্ম্ম করা হইবে। যতদিন জানিব আপনি আমার উপর প্রীত আছেন, যতদিন আপনার সংবাদ পাইবার আশা থাকিবে, আমি নিশ্চিন্ত থাকিব, বেশী দুঃখ বোধ করিব না। কিন্তু যখনই দীর্ঘ নীরবতার অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার গুরুর সহিত বিচ্ছেদের বিভীষিকা দেখাইতে থাকে—যখন দিনের পর দিন পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিয়া বার বার দারুণ নিরাশার দুঃখ অভিভূত করিয়া ফেলে—এবং আপনার মধুর লিপির উপদেশবাণীর আশা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইয়া মিলাইয়া যায়, তখন আমার জ্বর আসে—আমার আহার নিদ্রা দূরে যায়—আমি দিনের দিন শুষ্ক শীর্ণ বিবর্ণ হইতে থাকি।"

আদর্শ সংবাদপত্র (Economist) :—

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় ব্যবসায় খাতিরে সংবাদপত্র পরিচালিত হয়; সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী বুঝে শুধু টাকা; সংবাদপত্র কেমন ভাবে চলিতেছে, দেশের কিছু উপকার করিতেছে কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ্য করা তাহার কার্য্যসীমার বহির্ভূত মনে করে। কিন্তু সংবাদপত্রের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের সেবা, দেশবাসীকে সত্যের ও মঙ্গলের সন্ধান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। সুখের বিষয় এরকম ধরণের সংবাদপত্র-স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক দুই চার জনও দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক যাঁহারা উঁচুদরের সম্পাদক তাঁহারা স্বত্বাধিকারীর মুখ চাহিয়া, স্বত্বাধিকারীর টাকার থলির পেট কতখানি স্ফীত হইতেছে না-হইতেছে বিচার করিয়া দেশের জনসাধারণের স্বীকৃত মতামত অনুসারে পত্র-সম্পাদন করেন না; যাহা তাঁহার নিজের সত্য বলিয়া, মঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস, তদনুসারেই চলিয়া থাকেন। স্বত্বাধিকারীরা প্রায়ই নিষ্ঠা অপেক্ষা টাকা, খ্যাতি ও সম্মান অপেক্ষা ঘৃণ্য অশ্লীল বিজ্ঞাপন অধিক পছন্দ করে, তাহাদের চাকর বলিয়া সম্পাদকদিগকেও পেটের দায়ে তাহাতেই সায় দিয়া চলিতে হয়। যতদিন কাগজখানার কাটতি থাকে ততদিন সম্পাদক মহাশয় হয়ত নিজের সত্যসঙ্কল্প প্রকাশ করিতেও বা পারেন, কিন্তু যখন গ্রাহক-সংখ্যা ঘটতি হয় তখন তিনি স্বত্বাধিকারীর মুখ চাহিতে বাধ্য হন, তখন ধর্ম্মবুদ্ধি ও স্বার্থ—সোজা কথায় আত্মসম্মান ও রুজি—দুইয়ের মধ্যে কাহাকে ধরিয়া থাকিবেন তাহা সমস্যা হইয়া উঠে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সম্পাদকই অধিকাংশ গণ-নায়কদের মতো,—দায়ে পড়িলে তাঁহারা "ছেড়ে দেন পথটা আর বদলে যায় মতটা।" তাঁহারা দুকূল বাঁচাইয়া মাঝ পথ ধরিয়া সন্তর্পণে দড়ির-নাচ নাচিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে গণসাধারণ সততা সরলতা এবং তেজকে সম্মানের চক্ষে দেখে; অতএব সম্পাদকের নির্ভীক স্বাধীনতা কস্মিন কালেও ক্ষতিকর হয় না। যদি তিনি স্বত্বাধিকারীর শ্রদ্ধা না পান, তিনি পাঠকদের শ্রদ্ধা পাইবেন নিশ্চয়। স্বচ্ছ স্বাধীন চিন্তা ও স্পষ্ট লেখা পাঠককে মুগ্ধ করিয়া আকৃষ্ট করেই। নিজের দলের ও সরকারের মুখ চাহিয়া রাষ্ট্রনৈতিকদের নিজের মত প্রকাশ করিতে হয়; মক্কেলের স্বার্থ দেখিয়া উকিলদের সমস্ত বুদ্ধি চালিত করিতে হয়, কিন্তু পত্রিকাসম্পাদকের কাহারো তোয়াক্কা রাখার আবশ্যক দেখা যায় না। পত্রিকাসম্পাদক ত আর এ-দল ও-দলের লোক নন, তিনি সমগ্র দেশের প্রতিনিধি, কাজেই সত্যের মুখ চাহিয়া মঙ্গলের পথে চলা ছাড়া তাঁহার নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। যদি তিনি পূর্ব্বাপর-সঙ্গত মত অনুসারে সত্যনিষ্ঠ ভাবে ঘটনা ও মতের সমালোচনা করিয়া চলিতে পারেন তবে তাঁহার পক্ষে লোকের অভাব কখনো হইবে না। নীচ ঈর্ষায় ঘৃণ্য অশ্লীল ছাবলামীর ক্ষণিক বাহাদুরীর উপর অপ্রমত্ত স্থিরধী যে জয়ী হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না।

শহরের দেখাদেখি মফস্বলের কাগজগুলাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শহরের ও মফস্বলের কাগজের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়া উচিত; মফস্বলের কাগজ স্থানীয় ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকে ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে প্রচারে বাধা হইবার কোন ভয় নাই; স্থানীয় সংবাদ ও অভাব অভিযোগ, কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সুসঙ্গত ও সুসংযত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলে তাহা নিঃসম্পর্কীয় লোককেও আকৃষ্ট করিবে।

আজকাল সংবাদপত্র-স্বত্বাধিকারীরা নিজেদের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য কি দুশ্চেষ্টাই না করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে কাগজের লেখার গুণপনাই তাহার সফলতার প্রধান কারণ ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন। বিলাতের অনেক কাগজ খবর অপেক্ষা তাহাদের সুলিখিত সুচিন্তিত নিরপেক্ষ মন্তব্যের জন্য বেশী সমাদৃত ও বিক্রীত হয়। খবরের-কাগজের সফলতার আর একটি উপায়

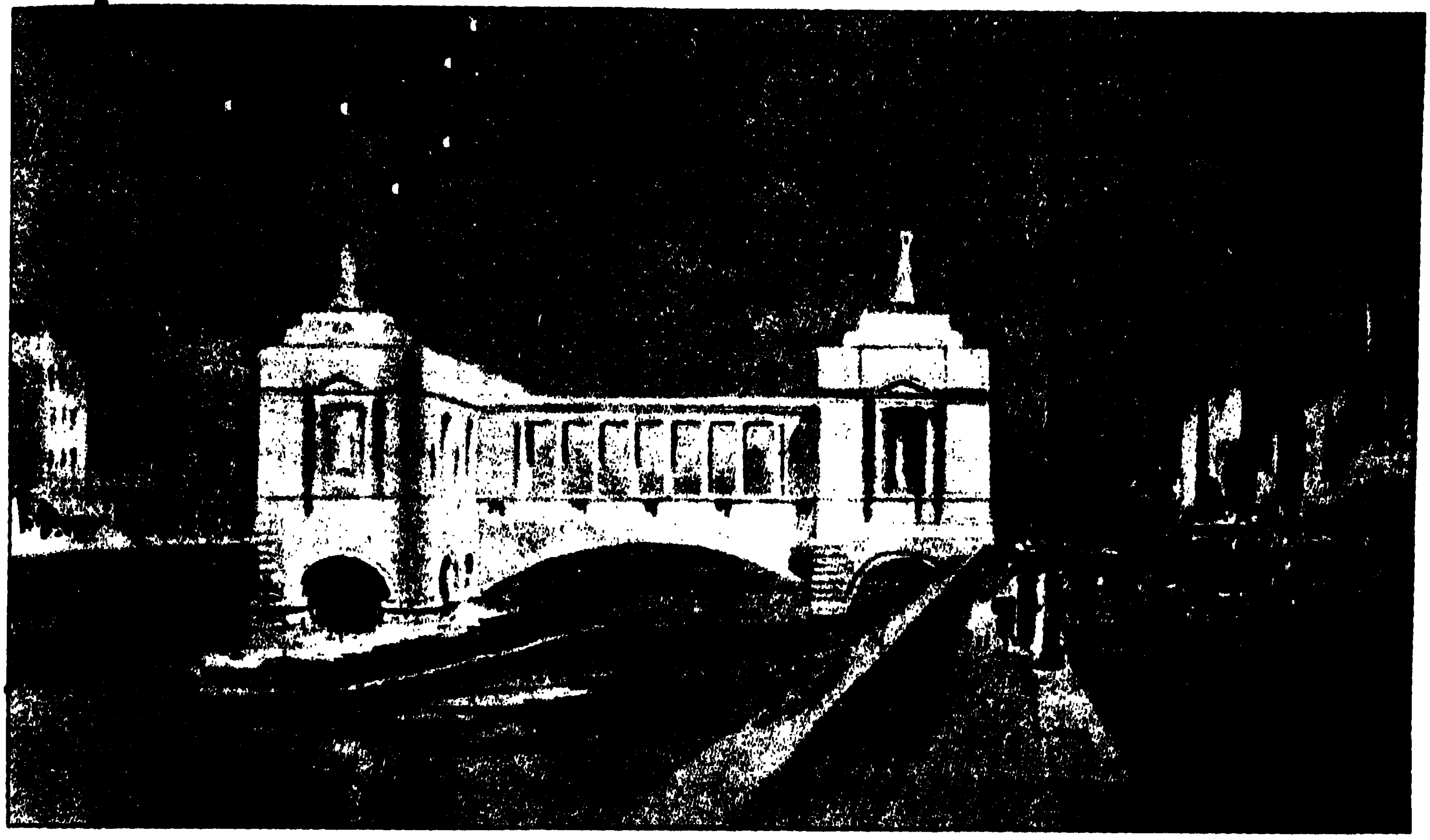

সেতু-শিল্পাগার।

হইতেছে ভালো লোক দেখিয়া পরিচালক নিযুক্ত করা; সকল ক্ষেত্রেই সত্যের তিন অবস্থা ধরা কথা।

বিলাতের সংবাদপত্রগুলিকে সত্যের সারথী করিবার জন্য যেরূপ অসম্ভব উদ্যম ও অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে তাহাতে কালে উহারা একটি মহাশক্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

ভবিষ্যতের সংবাদপত্র হয়ত এইরূপ হইবে—উহার ঢাউস আকার ভদ্র রকমে ছোট করিয়া আনা হইবে অথচ লেখা অল্প হইবে না; ভাঁজা, সেলাই, ছাপা সুন্দর হইবে, সুদৃশ্য রঙিন ছবি থাকিবে। ত্বরিত বিলি করিবার ব্যবস্থা হইবে; দূরে বিলি করিবার জন্য আকাশ-তরী, মোটর গাড়ী, তাড়িৎ ট্রেন নিযুক্ত হইবে। তখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবারাত্রি কাগজ বাহির হইবে; অ-তার টেলিফোনে খবর আসিবে, রিপোর্টারদের পকেটে পকেটে টেলিফোনের যন্ত্র থাকিবে। লোকেরা বায়স্কোপ, থিয়েটার, বা নাচগানের মজলিসে গিয়া বায়োস্কোপে সংবাদের ঘটনা দেখিবে, গ্রামফোনে কথা শুনিবে। তখনকার বাবু-লোকদের কষ্ট করিয়া সংবাদ পড়িতে হইবে না; কলের জল বা গ্যাস তাড়িতের আলোর মতন চাবি ঘুরাইলেই তাঁহার ঘরে কানের কাছে বিশ্বের সংবাদ কথায় ব্যক্ত হইতে থাকিবে।

এমন কলের কারখানা হইলেও তখনও সেইসব লোকের কদর কমিবে না যাহারা তুচ্ছ টাকার লোভে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য বুদ্ধিচিন্তা লইয়া বেশ্যাবৃত্তি করিয়া বেড়ায় না, যাহারা দায়িত্ব ভুলিয়া তাড়াতাড়ি যা-তা লিখিয়া কাগজ ভরাইতে পারিলেই কর্ত্তব্য হইতে খালাস মনে করে না। এবং তখন জনসাধারণও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া মেকি আবর্জ্জনা পাইয়া ভুলিবে না, তাহারা দাম দিয়া পূরা কাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

আর্ট শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা (Sphere):—

আয়ার্লাণ্ডের ডাবলিন শহরে লিফে নদীর উপর একটি সেতু-গৃহসংলগ্ন শিল্পশালা নির্ম্মাণের জন্য একজন কলারসিক, সার হিউ লেন, তাঁহার জীবনব্যাপী সঞ্চয়—অর্থ ও শিল্পসামগ্রী—দান করিয়াছেন। লিফে নদীর উপরকার কদর্য্য কুদৃশ্য লোহার পুলের বদলে সুদৃশ্যগৃহসংযুক্ত সেতু নির্ম্মিত হইবে, এবং সেই গৃহে বিচিত্র সুন্দর শিল্পসামগ্রী রক্ষিত হইবে। তাহাতে পথিকজন সেতু অতিক্রম করিতে করিতে আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়া পথশ্রম লাঘব করিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত এডুইন লুটিয়েন্স এই সেতু-শিল্পগৃহের নক্সা করিয়াছেন। অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে আয়ার্লাণ্ডের এই স্বদেশী প্রচেষ্টার উদ্বোধনের দিনে ইংরেজকে সেতু প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু লুটিয়েন্স খাঁটি ইংরেজ নহেন, তিনি ইংলণ্ডের অধিবাসী হইলেও তিনি ওলন্দাজ জাতীয় এবং তাঁহার মাতা আইরিশ; অধিকন্তু শিল্পশালার বিদেশী শিল্প চিত্র প্রভৃতিও যখন স্থান পাইবে তখন স্বদেশী আপত্তি খাটিতেছে না। একশত বৎসরের মধ্যে ডাবলিন শহরে কোনো বিশিষ্ট ইমারত প্রস্তুত হয় নাই; তাই ম্যুনিসিপালিটিও দাতার সহিত একযোগে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই শিল্প-সেতু গঠন করিতে মনস্থ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। এমনি করিয়াই ক্রমে ক্রমে দেশ সুন্দর ও সম্পন্ন হইয়া উঠে। আমাদের দেশের নিঃসন্তানেরা সম্পত্তি দেশকে না দিয়া একজন নিঃসম্পর্কীয় পোষ্যপুত্রকে দেন; ইহা অপেক্ষা ভুল কিছু হইতে পারে না। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ যে মহদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহা আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবে। বিশেষতঃ পালিত মহাশয় নিঃসন্তান নহেন; এই জন্য তাঁহার দানের মাহাত্ম্য আরো অধিক।

১ম অবস্থা।

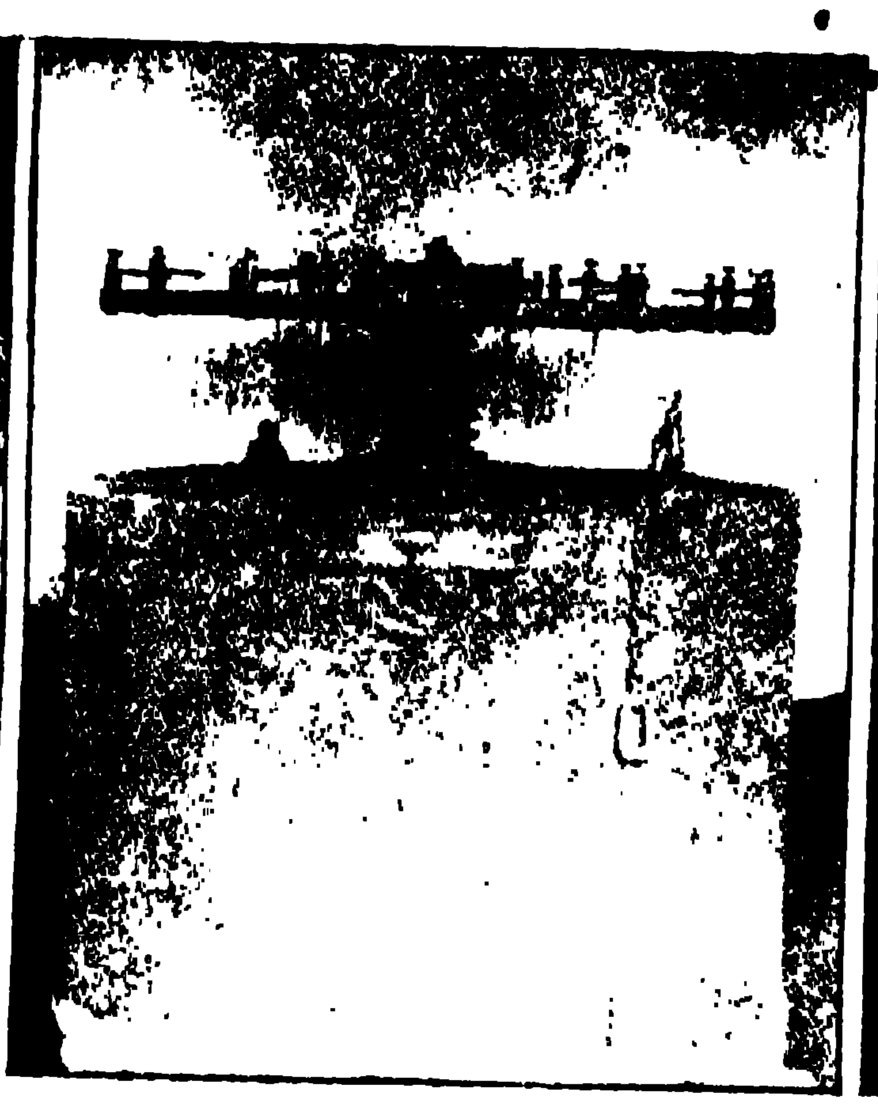

২য় অবস্থা।

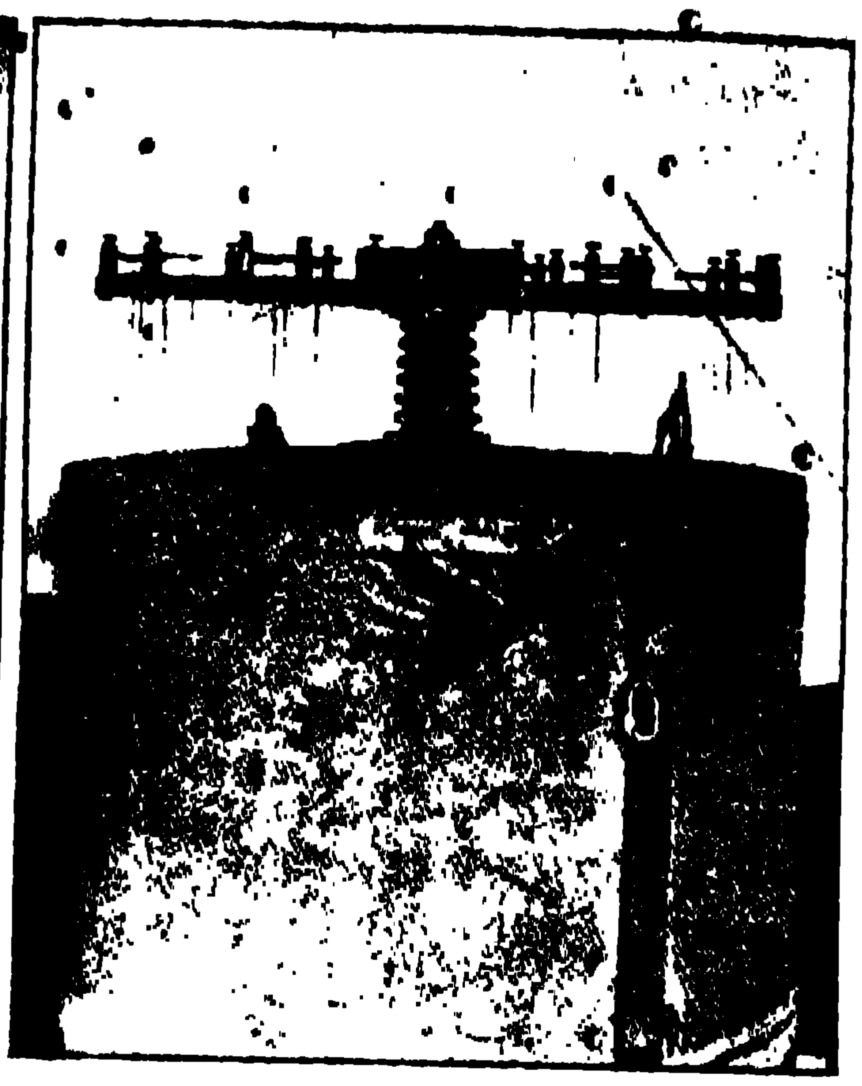

৩য় অবস্থা।

ধূম-প্রতিকার।

ধোঁয়ার উৎপাতের প্রতিকার (Scientific American Supplement):—

বড় বড় শহরগুলা আজকাল কলকারখানার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; কলকারখানা চলে আগুনের জোরে; এজন্য কতশত মণ কয়লা প্রত্যহ পুড়াইতে হয়; তাহার ফল হয় ধোঁয়া, ধোঁয়ার ফলে নগরবাসীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ঘর দ্বার ভুষা লাগিয়া ময়লা হয়, কাপড়চোপড় কালিকুষ্টি হয়; লণ্ডন নগরের ধূমকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ, তাহার নামই Black London অর্থাৎ কালো লণ্ডন। শীতকালে কলিকাতাতেও ধোঁয়ার উৎপাত কম নয়; নাকের ভিতরে, হাতে মুখে, কাপড়-চোপড়ে, বাড়ী ঘরে কালির ভুষা জমিয়া সমস্ত কুশ্রী কুৎসিত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। শীতকালের বাতাস গ্রীষ্মকালের বাতাস অপেক্ষা হিমে ভারী হইয়া থাকে বলিয়া ধোঁয়া উপরে উড়িয়া যাইতে পারে না, নীচেই কুণ্ডলী পাকাইয়া পথ ঘাট জুড়িয়া অন্ধকার জমাইয়া লোককে জ্বালায়। কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বড় লাটের আমলে ইংলণ্ড হইতে একজন ধূম্রপ্রতিকার-উপায়ের বিশেষজ্ঞ (Expert) দরিদ্র ভারতবাসীর ট্যাক্সের টাকায় জেব ভরিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া গেল, কিন্তু ধোঁয়ার উৎপাত (smoke nuisance) যেমনকার তেমনি রহিয়া গেল। এখনো মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যাল বৈঠকে ধোঁয়া প্রতিকারের আলোচনা শুনা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। কলিকাতার ধোঁয়া বিনা প্রতিবাদে একাধিপত্য করিতেছে। লণ্ডন প্রভৃতি পাশ্চাত্য নগরগুলিতে ধোঁয়া শুধু বাহিরেই উপদ্রব করে; কিন্তু আমরা আতিথের জাতি, আমরা পরম আত্মীয় ভাবে সকলকেই একেবারে ঘরে ডাকিয়া বসাই—ধোঁয়া আবর্জ্জনা সব কিছুই আমাদের সহিত ঘর ভাগ করিয়া লইয়া বাস করে। যতই অসুবিধা হোক আমরা শত্রুকেও একবার ঘরে দখল করিয়া বসিতে দেখিলে আর তাড়াইতে পারিও না, চাহিও না। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজিতে যাইতে হইবে না। আমরা সকলেই বেশ জানি ধোঁয়া আমাদের ঘরের মধ্যেও কম আধিপত্য করে না; রান্নাঘর হইতে ধোঁয়ার নির্গমনের জন্য যে, চিমনি প্রভৃতি সুড়ঙ্গপথ রাখা অত্যাবশ্যক তাহা আমরা মানি না, আমরা বাড়ীর ধোঁয়া বাহির করিব এমন লক্ষ্মীছাড়া আমরা কখনো নহি; আমরা ধোঁয়া লইয়াই ঘর করি, কতক নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে বোঝাই করিয়া যক্ষ্মা ক্ষয় রোগের আসন প্রতিষ্ঠা করি, কতক চোখে লাগাইয়া চোখের জলে নাকের জলে হইয়া দৃষ্টি ক্ষীণ করি, এবং কাপড়চোপড় ময়লা হইলেও ধোবার খরচ কুলাইবার সামর্থ্য না থাকাতে ময়লা কাপড়েই বাবু সাজিয়া বেড়াই।

লর্ড কার্জ্জনের আনীত ধূমবিশেষজ্ঞ যে কোনো প্রতিকার করিতে পারে নাই তাহা সে বেচারার তত দোষ নয়; কারণ কলকারখানা শহর হইতে দূর করা ছাড়া ধূমপ্রতিকারের অন্য উপায় তখনো সফলতার মুখ দেখে নাই। সম্প্রতি তাড়িৎ-প্রয়োগ দ্বারা ধূম-প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

তাড়িৎ-প্রয়োগে ধূমপ্রতিকারের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই হইতেছিল কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। এই প্রণালীর মূল তত্ত্ব হইতেছে এই—ধূম ভুষা-কণিকার সমষ্টি বই ত আর কিছু নয়; প্রত্যেক ভুষা-কণিকাকে তাড়িৎ-যুক্ত করিলে বিচ্ছিন্ন কণিকাগুলি আ-সিক্ত হইয়া মোদক-গুটিকার মতো দলা পাকাইয়া যায়; তখন ভারী হইয়া সেগুলি নীচে ঝরিয়া পড়ে, বাতাসে আর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। ষ্ট্রং নামক একজন আমেরিকান বলিতেছেন যে, এই উপায়ের মূলতত্ত্বটি ঠিক; কিন্তু যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত যথোপযুক্ত আকারের না হওয়াতে এতদিন সম্যক ফললাভ হইতেছিল না। তিনি তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত (electrodes) অঙ্গুরীয়াকার করিয়া ধূমপ্রতিকারে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বে সূক্ষ্ম বা ধারালো তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত ব্যবহৃত হইত; তাহাতে সূচীমুখ বা ধারের চারিদিকে সমানভাবে তাড়িৎ বিকিরিত হইত না; সেইজন্য তাড়িৎ-প্রয়োগে ধাকা খাইয়া ধূমের ভুষা-কণাগুলি তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্তের সেই স্থানেই সরিয়া থাকিত যেস্থানে তাড়িৎ-বিকিরণ ক্ষীণ অথবা একেবারেই নাই। কিন্তু ষ্ট্রং অঙ্গুরীয়াকার তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত ব্যবহার করিয়া সর্ব্বত্র সমান সুসমঞ্জসভাবে তাড়িৎ-প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন; তাহাতে ভুষাকণাগুলি আর পরিত্রাণের পথ পায় না। ঋণাত্মক প্রান্তই ধূম-প্রতিকারে বিশেষ দক্ষ। ৩৭০ ওয়াট্‌স্ সেল্-সংযুক্ত ব্যাটারী এক মিনিটে ৮০০ হইতে ১০০০

ঘনফুট প্রগাঢ়তম ধূম বা ধূলি পরিষ্কার করিতে সক্ষম। তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত হইতে ৪ ফুটের মধ্যে ধূম থাকিলেই হইল।

সংলগ্ন চিত্রের ১ম ছবিতে ৪ ফুট উচ্চ ও ৩ ফুট ব্যাসের একটি চিমনি হইতে ঘন কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইতেছে; এক মিনিটে ৯০০ ঘনফুট ধূম ক্রমাগত উঠিতেছে। ২য় ছবিতে চিমনি-সংলগ্ন অঙ্গুরীয়-তাড়িৎ-বিকিরণ-প্রান্ত হইতে মাত্র এক সেকেণ্ড তাড়িৎ-প্রয়োগের পর ধূমনিরাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ছবিতে কিছুক্ষণ তাড়িৎ-প্রয়োগের পর দেখা যাইতেছে যে চিমনির মুখ দিয়া ধূম মোটেই নির্গত হইতেছে না, অথচ চিমনির অভ্যন্তরে ধূম যথেষ্টই উঠিতেছে। তাড়িৎ-স্পৃষ্ট ভুষার দলাগুলি চিমনির ভিতরে একটা পাত্রে গিয়া পড়িতে থাকে, এবং চিমনির মুখ হইতে কেবল মাত্র সুপরিষ্কৃত গ্যাস নির্গত হয়। ৪র্থ ছবিতে অঙ্গুরীয়-প্রান্ত হইতে রাত্রিকালে তাড়িৎ-বিকিরণের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

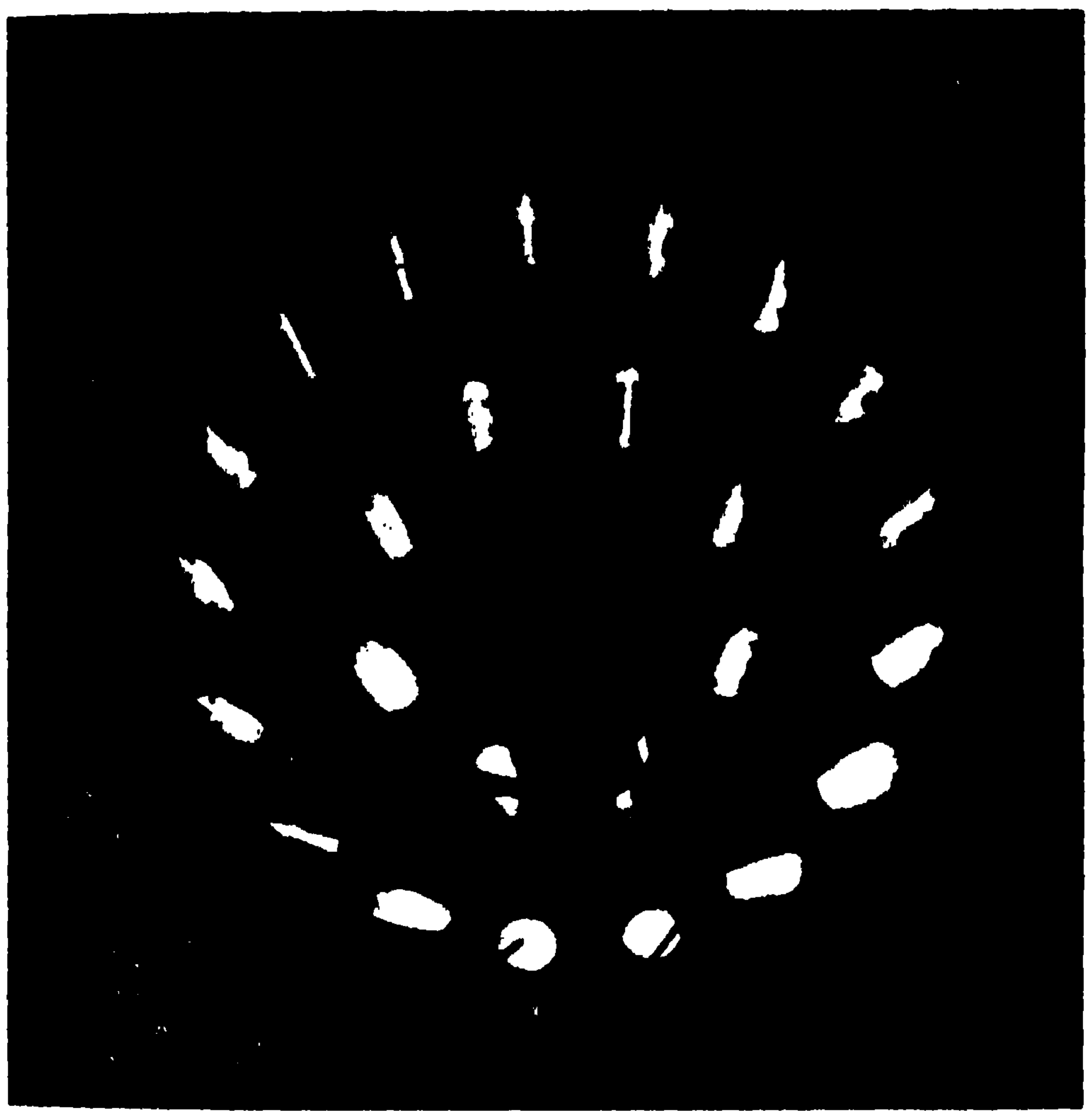

ধূম-প্রতিকারের যন্ত্রের তাড়িৎ-বিকিরণ।

এখন আশা হইতেছে এই উপায়ে নগরগুলি সত্বর ধূলিধূমের উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। অধিকন্তু এই উপায়ে যে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাতে নগরের বায়ু অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা হইতে অনেক দেরী লাগিবে, কারণ ব্যবস্থার ভার আমাদের নিজেদের হাতে নাই, এবং যাঁহাদের হাতে আছে তাঁহারা ধোঁয়ার উপদ্রবে বিব্রত নন। সেজন্য নিশ্চেষ্ট আমরাই দোষী—আমরা কেবল "ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

রুষীয় ঔপন্যাসিক ডষ্টোয়েভস্কী (Times, London):

ডষ্টোয়েভস্কীর নভেলের পাত্রপাত্রীগুলি আমাদের চেনা-শোনা লোকদের মতো কথাবার্ত্তা বলে না বলিয়া নভেলগুলি আমাদের কাছে একটু উদ্ভট রকমের লাগিতে পারে। কিন্তু তবু যে আমরা মুগ্ধ হইয়া সেগুলি পড়ি নূতন কিছু পাই বলিয়া নহে; যেমন একটি গন্ধ কি কথা কি দৃশ্য কোনো এক বহুবিস্মৃত ব্যক্তির বা স্থানের স্মৃতি আমাদের মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরে, তেমনি ডষ্টোয়েভস্কীর নভেলগুলি আমাদেরই ভোলা-আমিকে স্মরণ করাইয়া নূতন করিয়া ফিরাইয়া আনে।

ডষ্টোয়েভস্কীর নভেলের উদ্ভট বিশেষত্ব তাঁহার রচনার প্রণালীতে। সাধারণ নভেলের রচনার সফলতা নিষ্ফলতা তাহার প্লটের উপর নির্ভর করে; নায়কের একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য থাকে, সেই কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের উপর সমস্ত পুস্তকের সফলতা নিষ্ফলতার বিচার হয়। এমন কি যে-সমস্ত নভেলে চরিত্র-সৃষ্টিই প্রধান সেখানেও তাহারই সফলতা ও নিষ্ফলতা হইতেই প্লটের সফলতা নিষ্ফলতা বুঝা যায়। যেমন, নায়ক হয়ত কাহারো প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার সেই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই প্লট গড়িয়া উঠে; অথবা, নায়ক বিবাহিত, তাহাদের সুখদুঃখই সমস্ত প্লটের উপাদান। কিন্তু ডষ্টোয়েভস্কীর শ্রেষ্ঠতম নভেলগুলিতে (যেমন, The Brothers Karamazov, The Idiot) পাঠকের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য নায়কের সুখদুঃখের উপর নির্ভর করে না, কারণ ডষ্টোয়েভস্কীর কাছে সুখদুঃখ মানবজীবনের বাহিরের বস্তু, খোসা মাত্র, ইহার সহিত তাঁহার সৃষ্ট মানবজীবনের সফলতা-নিষ্ফলতার সম্পর্ক নাই। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে মানবের আত্মা ও নিসর্গনিয়ম এমন দৃঢ় সুশৃঙ্খল, যে, মানুষের সুখদুঃখ আসল মানুষকে টলাইতে পারে না। সকল নভেল-লেখকেই জীবন-সমস্যার একটা সমাধান করিয়া দিতে চাহেন; এবং এই জন্যই জোরালো প্লট আমাদের অত ভাল লাগে; কারণ আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে যে-একটি গুপ্ত দুর্ব্বলতা আছে নভেল-লেখকেরা নানাবিধ পরীক্ষা বিচার বিতর্ক ও ফলাফল রচনা করিয়া সেই দুর্ব্বল বিশ্বাসেরই অনুকূল একটি মায়া সৃষ্টি করেন। কিন্তু ডষ্টোয়েভস্কী সুখদুঃখ লইয়া একটা নিশ্চয় সমাধানের মায়া সৃষ্টি করিতে চাহেনও না, সৃষ্টি করেনও না। আত্মার সুখদুঃখ-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তাঁহার গভীর বিশ্বাস আছে; তিনি জীবনে গভীর দুঃখ ভোগ করিয়াই দেখিয়াছেন আত্মার শান্তির কাছে বাহিরের সুখদুঃখ মিথ্যা মায়া মাত্র। এই স্থানে তাঁহার সহিত টলষ্টয়ের পার্থক্য; টলষ্টয় এই শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এইজন্য টলষ্টয়ের কাছে মানবজীবন মানে বিশ্বাস ও কার্য্যের দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং এই জন্যই তিনি নিজে ও মানবসমাজকে দিয়া অসম্ভব সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সুখকেই ধ্রুব-আদর্শ স্থির করিয়া লইয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইবার চেষ্টায় যে-সমস্ত অর্দ্ধসফলতা ও অর্দ্ধনিষ্ফলতার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহার পুস্তকে তাহারই পরিচয় আছে। কিন্তু ডষ্টোয়েভস্কীর কাছে সুখই পরম বস্তু নহে, সাধনার চরম ধন নহে; তাঁহার নিকট সুখের জন্য সংগ্রামের কোনো মূল্য ছিল না; সুতরাং সুখী বা দুঃখী দেখিয়া তিনি কাহারও আত্মার অবস্থা বিচার করিতেন না। আত্মা তাঁহার নিকট উপাধি-রহিত, অবস্থার অতীত, এবং কর্ম্মের দ্বারা অনাসক্ত, স্বাধীন। তিনি আত্মাকে নির্ম্মুক্ত নিরঞ্জন জ্ঞান করিতেন; কর্ম্ম যাহা তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দেহের লালসার ফল মাত্র। কর্ম্ম দ্বারা আত্মা প্রকাশমান অথবা প্রচ্ছন্ন হয় বলিয়া কর্ম্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়ে। এই জন্য তাঁহার নভেলের উদ্দেশ্য আত্মাকে প্রকাশ করা মাত্র; মানুষের কর্ম্মের সমালোচনা বা মানুষের জগতের সুখদুঃখের ইতিহাস নহে। ইহাই তাঁহার নভেলের বিশেষত্ব। তিনি শরীর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আত্মার পরিচয় দেন না, কিন্তু শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মার বেদনা ও মিথ্যা প্রকাশ আত্মার কাছেই কেমন হইয়া দেখা দেয় তাহারই সত্য পরিচয় তাঁহার নভেলে পাওয়া যায়। তাঁহার

পাত্রপাত্রীরা একসঙ্গে জগৎস্রোতে ভাসিয়া চলে এবং এমন সব কথা বলে যাহার সহিত পুস্তকের প্লটের কোনোই সম্পর্ক নাই। তাহারা হাওয়া খাইয়া খাওয়া করে, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে, তাহারা লজ্জার ধার ধারে না, তাহাদের ব্যবহার বাস্তব জীবনের পক্ষে অসহ্য, ঘৃণ্য। কিন্তু যখন তাহাদের কথা পড়ি আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে পারি না, বরং তাহাদের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া তাহাদের অন্তরালে আমাদের নিজেদেরই ছবি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। রুষীয়ান লেখকেরা বড় খোলাখুলি কথা বলে; ডষ্টোয়েভস্কী তাহাদের অগ্রগণ্য। ডষ্টোয়েভস্কীর পাত্রপাত্রীর খোলাখুলি কথাবার্তা বিস্ময় আনে, কিন্তু অবিশ্বাস আনে না; সেই-সব কথাবার্তার ভিতর দিয়া তাহাদের পরিচয় তাহাদের অজ্ঞাতসারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। এইজন্য তাঁহার নভেলের প্লট মনে রাখা দুষ্কর; মনে রাখিবার চেষ্টা না করাই ভালো; কেবল নরনারীর আত্মার পরিচয় যাহা পাওয়া যায় তাহাই পরম লাভ।

ডষ্টোয়েভস্কীর পাত্রপাত্রীগণ বাহিরের পর্য্যবেক্ষণের ফল নহে, উহারা লেখকেরই নিজের অন্তরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁহার নভেলে মন্দচরিত্রের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, এবং তাহারা সকলেই লেখকেরই অন্তরের ছবি অর্থাৎ তাহারা মানুষেরই প্রতিনিধি—মানুষে মানুষে গরমিল অপেক্ষা মিল অনেক বেশী। সেই জন্য তিনি অতি পাষণ্ড পাপীকেও শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন; ডিকেন্সের ন্যায় তিনি উদ্ভট চরিত্র সৃষ্টি করিয়া রঙ্গ করেন নাই, তিনি চরিত্রগুলির সহিত সমবেদনায় কাতর হইয়াছেন, কারণ মানুষের স্বভাব যেমনই পৃথক হোক তাহাদের সকলের আত্মাই সমান, তা সে পুরুষই হোক কি নারীই হোক। এইজন্য ডষ্টোয়েভস্কী নারীকে নারী বলিয়া পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন নাই; স্ত্রীপুরুষের যে দেহের প্রভেদ তাহাতে আত্মার প্রভেদ ত সূচিত হয় না। যৌন-সম্পর্কে নরনারীর লীলা তাঁহার নিজের হৃদয়বৃত্তিকে স্পর্শ করে আলোড়িত করে বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাহার ভিতর দিয়া মানুষের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার নিকট নরনারী-সম্পর্কের মূল্য।

বিথোভেনের বধিরতার ন্যায় তাঁহার আত্মা নির্লালস ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছিল বলিয়া সে যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অমন গভীর ও আধ্যাত্মিক রসমধুর হইয়াছে। বিথোভেনের সঙ্গীতের সুর সুধু যেমন শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, শ্রবণাতীত সূক্ষ্ম আর কিছুর অনুভূতি, ডষ্টোয়েভস্কীর রচনাও তেমনি পাঠকের হৃদয়বৃত্তির গ্রাহ্য নয়, তাহা জীবনাতীত আত্মার অনুভূতি।

তিনি যোগীদের ন্যায় দুঃখের তপস্যায় নির্ম্মল নিকল ঋষিশিল্পী; দুঃখের সাধনাতেই তিনি নির্দ্বন্দ্ব নিরহংকার নিঃস্বার্থপর হইয়া তাঁহার মনের—মনের নহে আত্মার—কথা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। যতক্ষণ একজন শিল্পী নরনারী বা বস্তুসামগ্রীকে আপনার অহঙ্কার ও লালসা বাসনার সহিত মিলাইয়া দেখে ততক্ষণ তাহারা তাহার হাতে শিল্পের সাধন হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। ডষ্টোয়েভস্কী আপনাকে ভুলিয়া সমস্তকে দেখিতে পারিয়াছিলেন; এমন আর কোনো শিল্পী পারিয়াছেন কিনা জানি না। ডষ্টোয়েভস্কীর মধ্যে প্রাচ্যপ্রদেশের জ্ঞান মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার নায়ক নায়িকা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অনাসক্ত। য়ুরোপীয় চিত্রে সাধুদিগের মূর্ত্তি যেমন একটা অর্থশূন্য নির্ব্বুদ্ধিতার চিহ্ন জ্যোতিশ্চটা দিয়া ঘিরিয়া চিত্রিত হয় এবং একটা মূঢ় পবিত্রতার ছলনা সৃষ্টি করে, ডষ্টোয়েভস্কীর সাধুরা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কাঁদিয়া নিজেদের পরিচয় দিবার জন্য তেমন ভাবে ব্যগ্র হন না। তাঁহাদের যে সাধুতা তাহা আত্মার বিমল বিকাশ মাত্র, অন্তরের জিনিস, তাহা ধ্যানের সামগ্রী, বাহিরের কর্ম্মে প্রকাশ হইবার বস্তু নহে। ইহা প্রাচ্য ধ্যানরসিক মরমিয়াদের আদর্শ। ইঁহারা নিজেদের সাধুতা বা জগতের অসাধুতা সম্বন্ধে তুল্য উদাসীন, তুল্য অনভিজ্ঞ; তাই যাহারা তাঁহাদের সংসর্গে আসে তাহারা তাঁহাদিগকে মনে করে বোকা (Idiot), ক্ষেপা, ভণ্ড।

রুষীয়ার অপর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক গোরকী কিন্তু ডষ্টোয়েভস্কীর রচনার নিতান্ত বিরোধী। তিনি মনে করেন ডষ্টোয়েভস্কীর উপন্যাস পাঠ ও অভিনয় দর্শন করিয়া লোকের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। ডষ্টোয়েভস্কীর বুদ্ধির অলসতা যে আধ্যাত্মিক আবরণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রুষীয়ার উপর ধর্ম্মানুশাসনের ফল যে নির্জ্জীবতা তাহার ফল; ইহাতে মানুষের মন কর্ম্মবিমুখ স্বপ্নবিলাসী ও দুঃখবাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে মানুষের অন্তরাত্মা ও ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রান্তিতে জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু সকল দেশের সুধীসম্প্রদায় গোরকীর ন্যায় প্রতিভাবান লোকের এই ভ্রান্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। গোরকী ডষ্টোয়েভস্কীর সূক্ষ্ম শিল্পসৌন্দর্য্য একেবারেই ভুল বুঝিয়া বসিয়া আছেন।

চারু।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসই ভারতবর্ষের অধঃপতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। আর বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীসম্প্রদায় সংস্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছিল।

মনুপ্রচলিত সন্ন্যাস সমাজের অপকারক নহে। বরং উহা সমাজের হিতকরই। পঞ্চাশের পর সন্ন্যাস মনুর সাধারণ বিধি ছিল। ক্বচিৎ কোনও ক্ষেত্রে মনুতে যুবকের সন্ন্যাসী হওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রতিভার যখন অত্যধিক বিকাশ হইয়াছে তখন তাদৃশ ব্যক্তির সন্তান উৎপাদন করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। অতএব সেরূপ লোকের সন্ন্যাসে সমাজের ক্ষতি হইত না। বরং তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারা সমাজের সবিশেষ উন্নতিই হইত।

মানুষ যখন বিবাহ না করিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির

ভরণপোষণের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি বা শক্তির অধিকাংশভাগ ব্যয় করিতে বাধ্য না হয়, তখনি তাহার কোনও নূতন মত, নূতন কার্য্য বা ধর্ম্ম সংস্থাপনের প্রচুর সময় ও সুবিধা থাকে। অতএব সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি বিবাহ না করে তবে তাঁহার কার্য্যসাফল্যের গৌরব জগতকে বিস্মিত করিতে পারে। তাহাদের পরার্থপরতা, তাহাদের কার্য্যকুশলতা সকলকে প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতিকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সন্ন্যাসীর বংশ থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে নিদারুণ অপকার করিয়াছে তাহার কে হিসাব রাখিবে? উহার উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া আমরা উহার অপরাধের কথা ভুলিয়া যাই।

যেমন কৃপণ পিতার বহুকালের সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি তাহার অমিতব্যয়ী পুত্র কর্ত্তৃক মহোদ্যমে ব্যয়িত হইয়া উজ্জ্বল আড়ম্বরের পরিচয় দিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষ হয়, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের সুব্যবস্থার গুণে দেশের মধ্যে যে প্রতিভার রাশি জন্মিয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদিগকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া মহৎকার্য্যসমূহ সম্পাদন পূর্ব্বক ভারতের তাৎকালীন ইতিহাসকে এক অভূতপূর্ব্ব শ্রীবিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষ চিরকালই বশীকরণ-বিদ্যার বশ। তাহাকে যখন যেরূপ কার্য্য বা আচরণ ভাল বলিয়া খুব জোরে জোরে প্রেরণা (suggestion) দেওয়া যায় সে সেই রূপই ভাল বলিয়া বুঝে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভিক্ষু-জীবনকেই মানবের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিল ও বুঝাইয়াছিল। তাই দলে দলে সেকালের যুবকগণ ভিক্ষু হইয়া বংশ রক্ষায় বিরত হইত।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বর্ষের পর বর্ষ, ভারতের প্রতিভাশালী যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। যাহাদের বংশে রাজনীতিক, সেনানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হইয়া উত্তরকালে ভারতবর্ষকে পরাক্রান্ত করিতে পারিত তাহারা সকলেই বংশ রক্ষায় বিরত ছিল।

ঐ কয় শতাব্দী ধরিয়া সমাজের যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করা হইয়াছে এবং সমাজের যাহারা অপেক্ষাকৃত কাপুরুষ, স্বার্থপর ও হীন তাহাদেরই বংশ রক্ষা করা হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে দূর হইল; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম দেশমধ্যে যে সন্ন্যাসের আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছিল তাহা দূর হইল না। সংসারের অধিকাংশ লোকই নির্ব্বোধ। বাহিরে যাহা দেখা যায় তাহা অপেক্ষা কোনও গূঢ় বিষয় ভাবা তাহাদের কুষ্ঠিতে লেখে না। অধিকাংশ লোকে ভাবিতেই জানে না। সন্ন্যাসী আসিয়া বলে "আমার স্ত্রী-পুত্র নাই। পরোপকারের জন্যই আমি আত্মত্যাগ করিয়াছি। অতএব তোমরা আমাকে চাঁদা দাও, সম্মান প্রদর্শন কর।" আর অমনি চারিদিক হইতে সন্ন্যাসীর উপর চাঁদা ও সম্মান বর্ষিত হইতে থাকে। একজন গৃহস্থ ঐরূপ করিতে চাহিলে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। লোকে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে না যে, গৃহস্থ লোক ভাল হইতে পারে এবং সন্ন্যাসী মন্দলোকও হইতে পারে। গৃহস্থের স্ত্রীপুত্রের জন্য সমাজের যে খরচ হইবে, সন্ন্যাসী অসাধু হইলে, তাহার উপপত্নীগণ ও গুপ্ত বিলাসের জন্য তদপেক্ষাও অধিক খরচ হইতে পারে।

যাহা হউক জনসাধারণের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য শঙ্কর হিন্দুধর্ম্মকে স্থাপন করিতে পারিলেও মনুপ্রচলিত সন্ন্যাস-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকেও বালকসন্ন্যাসীর দল স্থাপন করিতে হইল। তাই ভারতবর্ষে আজি পর্য্যন্ত দলে দলে যুবকসন্ন্যাসী রহিয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেব একবার সন্ন্যাসের বিপক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য হন। তবে তিনি কয়েকজন সংসারী শিষ্যকে উচ্চপদ দিয়া—মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেও যে সংসার পরিত্যাগ করা প্রয়োজনীয় নহে তাহা প্রচার করেন। ঐ কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক বঙ্গদেশে সন্ন্যাসের প্রাদুর্ভাব অধিক হয় নাই। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান উন্নতির উহা একটী শ্রেষ্ঠ কারণ।

সন্ন্যাসবাদের ফলে ভারতবর্ষের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজেই আলোচনা করা যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদেশী পদার্পণ

করিতে পারে নাই। ইহাই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সত্যতার প্রধান প্রমাণ। ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতের সৈনিক, কৃষক ও শিল্পীগণ পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সৈনিক, কৃষক ও শিল্পীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এমন কি এখনও নহে। ভারতীয় সৈনিকের সাহায্যে ইংরেজ ও মুসলমান উভয়েই বড় বড় সামরিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছে। ভারতবর্ষে শুধু অভাব দেখা গিয়াছিল—পর্য্যাপ্ত-সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তির—রাজনীতিজ্ঞ, সৈন্য-পরিচালক, শাসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতির।

প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সমাজমধ্যে বংশ বিস্তার করিতে বিরত থাকিলে সমাজের কি দারুণ ক্ষতি হয় তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে কতকটা অনুমিত হইতে পারে। মানুষের বংশ ধীরে ধীরে বাড়িলেও পঁচিশবৎসরে উহা সাধারণত দ্বিগুণ হয়।* ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন বর্ষে মানুষের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—(দশজন লোকের বংশের হিসাব ধরা যাউক)

১ম	বৎসরে—	১০ জন
২৫	"	২০
৫০	"	৪০
৭৫	"	৮০
১০০	"	১৬০
১২৫	"	৩২০
১৫০	"	৬৪০
১৭৫	"	১২৮০
২০০	"	২৫৬০
২২৫	"	৫১২০
২৫০	"	১০২৪০
২৭৫	"	২০৪৮০
৩০০	"	৪০৯৬০

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ একজন প্রতিভাবান লোককে সন্ন্যাসী করিলে তাহার বংশে তিনশত বৎসর পরে যে তিন হাজার লোক জন্মিতে পারিত তাহা জন্মিবে না। চৈতন্য রঘুনাথ প্রভৃতির বংশ থাকিলে আজ কয়েক সহস্র প্রতিভাবান ব্যক্তি বঙ্গদেশে বিদ্যমান থাকিত।

যে সময়ে ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বংশ বিস্তার করেন নাই, সেই সময়ে কিন্তু সাধারণ লোকের বংশবিস্তার-কার্য্য স্থগিত থাকে নাই। আমরা পরে দেখাইব যে নিম্নশ্রেণীর জনগণের বংশবিস্তার উচ্চশ্রেণীর অপেক্ষা প্রায়শঃ অধিক হইয়া থাকে। অতএব সন্ন্যাসের ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমাজ-মধ্যে প্রতিভাশালীর অনুপাত জনসাধারণের অনুপাতের অপেক্ষা অত্যন্ত কম হইয়া উঠে। এইরূপ অনুপাতও সমাজের সমূহ ক্ষতিকর। কোন পল্লীতে যদি উৎসাহী উদ্যোগী ও কর্ম্মতৎপর ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় তবে তাহারা নিজেদের উৎসাহের আধিক্য দ্বারা সমাজের জড়ভরতগুলিকেও অনুপ্রাণিত করিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কিন্তু যদি এরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা জড়ভরতগণের সংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম হয় তবে তাহারা ঠাট্টা আলস্য ও ঔদাসীন্য দ্বারা উহাদিগকেও নিজেদের দলে টানিয়া লয়। এরূপ ঘটনা সকলেরই নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হয়। বলকানযুদ্ধে তুর্কদিগের পরাজয়ের একটী প্রধান কারণ, তুর্কদিগের সৈন্য অনেক ছিল কিন্তু সৈন্য পরিচালন করিবার উপযুক্ত নেতা পর্য্যাপ্ত সংখ্যক ছিল না।*

Monasticism বা সন্ন্যাসবাদ শুধু যে ভারতবর্ষেরই অপকার করিয়াছে এমন নহে। উহা যে-দেশেই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল সেই দেশেরই অপকার করিয়াছে। সেই-সকল দেশের সন্ন্যাসবাদ যখনই বিধ্বস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার পর হইতেই দেশের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস এবিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইতালী ইউরোপীয় সন্ন্যাসবাদের আদি-ভূমি; সেই সর্ব্বশেষ হইয়াছে; আর সেই উন্নতির পূর্ব্বে জনসাধারণ, ধর্ম্মের রাজা পোপ অপেক্ষা ঐহিকের রাজা-

* Darwin's Origin of Species. Chap. III.
Even the slow-breeding man has doubled in twenty-five years.

* General Von Der Goltz in the *Fornightly Review*, May 1913.

দিগকে অধিকতর খাতির করিতে শিখিয়াছিল। সন্ন্যাসবাদ স্পেন ও পর্টুগালের অবনতির প্রধান কারণ। ঐ-সকল দেশের উন্নতির পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের উপর লোকের ভক্তি কমিয়াছে এবং অনেক দেশ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সন্ন্যাসীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ইংলণ্ড রোম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে বলিয়া সেখানে সন্ন্যাসবাদ অধিক পরাক্রান্ত হইতে পারে নাই। এবং সন্ন্যাসবাদ সেই স্থান হইতেই প্রথম উঠিয়া যায়। উহাই ইংলণ্ডের উন্নতির প্রধান কারণ। অবাধ বংশবিস্তারই যে ইংলণ্ডের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ তাহা ঐ দেশের বিপুল কার্য্য দেখিলেই অনুমিত হইবে। ঐ ক্ষুদ্র দেশ যে বর্ত্তমান সময়ের যে-কোনও দেশ অপেক্ষাও অধিকতর-সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহা নিজ দেশের অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়াও আমেরিকা, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহুদেশে বহুসংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, বণিক, শাসক, রাজনীতিজ্ঞ, শিক্ষক প্রভৃতি পাঠাইয়া ঐ-সকল দেশের সুশাসন বিধান করিয়াছে।

ফরাসীদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের বহুপূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতের লেখনী সন্ন্যাসবাদ বিধ্বস্ত করে। সন্ন্যাসবাদ যখন দেশমধ্যে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিল, সন্ন্যাসী হওয়াটাই যখন একটা শ্রেষ্ঠকার্য্যের মধ্যে গণ্য রহিল না, তখন দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস গ্রহণে বিরত হইল এবং দেশের উন্নতি আরম্ভ হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

সভ্যতা ও বিলাস।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে বিলাসের বৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রথম প্রথম মানুষের যে-সকল সামগ্রীতে জীবনযাত্রা চলিতে পারিত এখন আর সে-সকলে চলে না। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আরও অনেক অধিক সংখ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন। কাজেই জন্য আরও অধিক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। অসভ্য অবস্থায় মানুষে যে পরিশ্রমে নিজের জীবনোপায় নির্ব্বাহ করিয়া নিজ স্ত্রীপুত্রেরও জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সভ্য অবস্থায় অনেক সময় সেই পরিশ্রমে নিজের জীবনোপায়ের সংস্থান করাই দুরূহ। অসভ্য মানুষের সামান্য কুটীর ও সামান্য তৈজসপত্রের ব্যবস্থা হইলেই চলিবে। সভ্য মানুষের ভাল গৃহ, আসবাবপত্র, খাট, টেবিল, চেয়ার, (আরও সভ্য হইলে) পিয়ানো, গ্রামোফোন, পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদির আবশ্যক। এ-সকল পাইতে গেলেই পরিশ্রমের প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত অল্প সভ্য অবস্থায় ঐ-সকল দ্রব্যের জন্য যে পরিশ্রম তাহা আহার্য্যাদি সংগ্রহের জন্যই ব্যয়িত হইত। কাজেই আরও অধিক সংখ্যক লোকের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা হইত।

আমার মনে হয় ইতিহাস একটা প্রকাণ্ড Reversible equation. রাসায়নিক অনেক ঘটনা দ্বিমুখী হইয়া থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই গ্যাসের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিলে উহা জলে পরিণত হয়। আবার জলের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোত প্রেরণ করিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও এই প্রকার। কোন জাতির মধ্যে বিবিধ কারণের সংযোগ হইয়া প্রতিভাবানের বংশবিস্তার হইলে সেই জাতির উন্নতি আরম্ভ হয়। উন্নতির প্রধান লক্ষণ ধনবৃদ্ধি: হয় সেই জাতি নিজের দেশের পদার্থ সমূহের সম্যক্ ব্যবহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি করে, কিম্বা অন্য জাতিকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের ধন লুণ্ঠন করে বা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদিগের পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের ধনবৃদ্ধি করে, কিম্বা ঐ-সকল উপায়ের সকলগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার ফলে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। ধনবৃদ্ধির ফল দেশে নানাবিধ শিল্পকলার আবির্ভাব অর্থাৎ বিলাসের বৃদ্ধি। বিলাসের বৃদ্ধির ফল সমাজের প্রতিভাশালীগণের বংশবৃদ্ধির হ্রাস ও ক্রমশ সভ্যতার পতন।

বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল দেশ সভ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থিত তাহাদিগের মধ্যেও এক্ষণে পতনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ফ্রান্সের বংশবৃদ্ধি স্থগিত রহিয়াছে।

ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীরও বংশবৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছে। জার্ম্মানীর বংশবৃদ্ধির হ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা কম, তথাপি জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া বংশবৃদ্ধি হ্রাসের কারণানুসন্ধান ও তৎপ্রতিকারের জন্য কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন।

আর এই বংশবৃদ্ধির হ্রাস দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সমূহের বংশবৃদ্ধি এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে নানাবিধ বিলাস-দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ঐ-সকল দ্রব্য না পাইলে তাহারা নিজেদের এবং নিজেদের স্ত্রী পুত্রাদির জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বিবেচনা করে। কাজেই তাহারা অনেক স্থলে বিবাহ করে না এবং বিবাহ করিলেও বংশবৃদ্ধি যাহাতে বেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাহারা অলস, উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ভবিষ্যৎবোধহীন তাহারা অবাধে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে সমাজে প্রতিভাশালী ব্যক্তির হার ক্রমাগত কমিতে থাকে, অর্থাৎ ক্রমশঃ একটী অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়। *

সভ্যদেশ সমূহে স্ত্রীলোকদিগকে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ লেখাপড়া শেখান হয় তাহাও দেশের প্রতিভার বংশ-বিস্তারের পক্ষে অনুপযোগী। উহা ব্যক্তির জীবনের পক্ষে যতই ভাল হউক না কেন, জাতির জীবনের পক্ষে যে সমূহ অকল্যাণকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভাবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই যদি জাতীয় উন্নতির সর্ব্বপ্রধান কারণ হয় তবে স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষিত করা অপেক্ষা তাহাদিগকে অল্পশিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ রাখা সমাজের পক্ষে হিতকর। † খুব বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী রমণীর উচ্চাভিলাষ বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে তাহাদের বর পাওয়া শক্ত। একারণ সভ্যদেশ সমূহে তাহাদের অনেককে বহুকাল এবং কাহাকেও চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাছাড়া সন্তান-জনন ও পালনের কাজগুলি একবারেই কবিত্বজনক নহে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিবার সময় প্রসূতির সৌন্দর্য্যহানি হয় ও অনেক শারীরিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারপর ছেলে মানুষ করা—সেও কম গুরুতর ব্যাপার নহে; উহা অতীব Dull অর্থাৎ একঘেয়ে রকমের ব্যাপার। একটী অপোগণ্ড শিশুকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চোখে চোখে রাখিতে হয়। সে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাঁদিয়া উঠে, তাহাকে খাইতে দিতে হইবে। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবার যো নাই, সে কাঁদিয়া উঠিলে তাহার বিছানা বদলাইয়া দিতে হইবে। সময়ে সময়ে বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত গাত্রাদি পরিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। তদ্ব্যতীত তাহার অসুখ আছে, আবদার আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঐ ভাবে তাহাকে লইয়া চলিতে হইবে। শিশুপালনে যে কিছু আনন্দ আছে তাহার ভিতর বৈচিত্র্য নাই। শিশু দিনের পর দিন ধরিয়া একই রকম অঙ্গভঙ্গী করিবে, এক আধটী কথা উচ্চারণ করিতে শিখিবে ইত্যাদি। এ-সকল হইতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে সন্তান প্রতিপালনাদি কার্য্যের পক্ষে সুশিক্ষিতাদিগের অপেক্ষা কম শিক্ষিতাদিগের কতকটা সুবিধা আছে। অধিকাংশ সভ্যদেশেই সুশিক্ষিতা মহিলাগণ নিজেদের সন্তান প্রতিপালনের ভার বেতনভুক অশিক্ষিতা মহিলার উপর

* "They recommend, as we do, the employment of anticonceptional measures, they do so without any discrimination. They address themselves to the altruistic and intelligent portion of the public and induce the most useful members of society to procreate as little as possible, without recognising that with their system, not only the Chinese and Negroes, but, among European races, the most incapable and immoral classes of the population are those who trouble the least about their maximum number of children. Hence the result they attain is exactly the opposite of what they intend.

Among the North American and New Zealanders with whom neo-malthusianism is very prevalent, the number of births among the intelligent classes is diminishing to an alarming extent, while the Chinese and Negroes multiply exceedingly. In France the practice of neo-malthusianism is chiefly due to reasons of economy. Page 464, The Sexual Question, By August Forel, M.D., Ph.D., LL.D., Former Professor of Psychiatry at and Director of the Insane Asylum in Zurich (Switzerland).

† মানবসমাজে কোন একটা নূতন ব্যাপার ঘটিলেই, তাহাতে প্রথম প্রথম অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য সেই জিনিষটাকেই অপরিহার্য্য অনর্থের মূল মনে করা ভুল। স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা জিনিষটা সব দেশেই আধুনিক। অতএব ইতিমধ্যেই উহার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। লেখক মহাশয়ের মত অনেকে কেবল অনুমান করিয়া কথা বলেন। আমরা কিন্তু বহুসন্তানবতী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা অনেক দেখিয়াছি।—প্রবাসী-সম্পাদক।

দিগ্য নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। কাজেই যখন ঐরূপ আদর্শই একটা সমগ্র দেশের আদর্শে পরিণত হয় তখন সেদেশে হয় বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পায় নয় বিবাহ হইলেও সন্তান জন্মিতে দেওয়া হয় না।*

আর স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া না শিখাইলে ব্যক্তিগত জীবনের যতই অসুবিধা হউক বংশের পক্ষে তত অসুবিধা নাই।† কারণ বাইসমানের মতানুসারে নিজের চেষ্টায় অর্জ্জিত গুণগুলি সন্তানে সংক্রমিত হয় না।

সভ্যতা বৃদ্ধির পর সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের বংশবৃদ্ধি হ্রাস হইবার আর একটী কারণ আছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধনবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই ধন অসমভাগে সমাজমধ্যে বিভক্ত হয়। ইহার ফলে মনোনয়ন দ্বারা সমাজে প্রতিভার বিকাশের অসুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট পুরুষের সহিত উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া যে-সকল সন্তান হয় তাহাদের উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবনা। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের মিলনের ফল অপকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে প্রথমোক্ত রূপ মিলনের দ্বারাই সমাজের স্বার্থ সর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে রক্ষিত হইতে পারে। সমাজের কোনও কোনও অবস্থায় প্রতিভাবান স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিবাহবন্ধনে মিলনের বিশেষ সুবিধা হয়, আবার কোনও কোনও অবস্থায় এরূপ মিলনের পক্ষে অনেক অন্তরায় ঘটে। পূর্ব্বোক্ত সময়ে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর এবং শেষোক্ত সময়ে জাতি অবনতির পথে অগ্রসর হয়। সভ্যতার প্রাক্‌কালে সমাজমধ্যে অধিক ধনসঞ্চয় হয় না এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অর্থগত পার্থক্য অধিক থাকে না। তখন সমাজে গুণেরই অধিক আদর। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তি-সকল তখন সদৃশ প্রতিভাবান ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা বন্ধনে আবদ্ধ হন। এইরূপ সম্মিলনের ফলে প্রত্যেক পরবর্ত্তী বংশের লোক পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের লোকদিগের অপেক্ষা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতর হইতে থাকে। কিন্তু দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়; ধন একটা নূতন অবস্থা দেশমধ্যে আনয়ন করে। যে নির্ব্বোধ কিম্বা দুর্নীতিগ্রস্ত ছেলেটীকে নিজের জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিতে হইলে আহারাভাবে মারা যাইতে হইত, পয়সা থাকিলে তাহারও এক্ষণে খুব সদ্বংশীয় পাত্রী লাভে অসুবিধা ঘটে না। তদ্রূপ বড় লোকের নানাবিধ দোষাশ্রিত কন্যারও সুপাত্র জুটিবার কোনও বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ বিবাহ যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আইন কিম্বা চিকিৎসা ব্যবসায়ে আপাততঃ মনে হয় যে শুধু প্রতিভারই জয় হয়, অর্থের উহাতে কোনও প্রভাব নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। একটী বড়লোকের ছেলে ও একটী দরিদ্রের ছেলে, শেষোক্তটী প্রতিভায় প্রথমটীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রথমটীর অপেক্ষা বড় ডাক্তার বা উকীল হইবে এমন কোনও কারণ নাই। অর্থ থাকিলে ভাল ভাল পুস্তক অনায়াসে পাওয়া যায়, যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায়, ভাল ভাল শিক্ষকেরও সাহায্য পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ভাল হইবার পক্ষে এ-সকল কম সাহায্য করে না। ব্যবসায়-কালেও যাহার পৃষ্ঠপোষণ (Back) করিবার লোক আছে সে সহজে মক্কেল বা রোগী পায়। অধিক সংখ্যক রোগী বা মক্কেলের কাজ করিতে করিতে তাহার চিকিৎসা বা আইনে অধিকার যে বেশী জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এই কৃতকার্য্যতা সত্ত্বেও সমাজের পক্ষ হইতে দেখিলে দরিদ্রের ছেলেটীই সৎপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধনীর পুত্রটীর সহিত যে প্রতিভাশালিনী পাত্রীটীর বিবাহ হইয়াছে তাহার সহিত দরিদ্রের ছেলেটীর বিবাহ হইলে সমাজ আরও শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর সন্তান পাইত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের বাল্যমাতৃত্ব হয় না, এবং তাঁহারা অশিক্ষিতাদিগের অপেক্ষা সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বেশী জানেন। এবম্বিধ এবং অন্যান্য কারণে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় নিরক্ষর এবং ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা প্রায় শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা সাত জন কিন্তু ইংলণ্ডের সাড়ে দশ জন বাড়িয়াছে।—সম্পাদক

† লেখক কিন্তু নিজেই পরে বলিয়াছেন যে সাধারণ নারী অপেক্ষা বুদ্ধিমতীর বংশে বেশী প্রতিভাশালী লোক জন্মে। কিন্তু শিক্ষা ব্যতিরেকে বুদ্ধির উৎকর্ষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

গীতাপাঠ

অতঃপর বাস্তবিক সত্তার সহিত জ্ঞান-প্রেম এবং আনন্দের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনায় তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক সত্তাই বস্তুসকলের জ্ঞেয়ত্বের নিদান। "জ্ঞেয়ত্ব" কিনা জ্ঞানগোচরে প্রকাশ-যোগ্যতা। জ্ঞান-গোচরে যাহা যখন প্রকাশ পায়—তাহার বাস্তবিক সত্তার গুণেই তাহা প্রকাশ পায়। স্বপ্নে আমরা যে-সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি তাহা তো এক-প্রকার কিছুই না; প্রকাশ পায় তবে তাহা কিসের জোরে? সেই মিথ্যা বস্তুগুলার কাল্পনিক সত্তার মূলে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা গূঢ়ভাবে কার্য্য করে অবশ্য, নতুবা আর-কিসের জোরে তাহা প্রকাশ পাইবে? বাস্তবিক সত্তা যদি তলে তলে কার্য্য না করিত, তবে এ তো বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা মুহূর্ত্তকালের জন্য ও প্রকাশ পাইতে পারিত না। বাস্তবিক সত্তার কার্য্যই হ'চ্চে বিদ্যমান হওয়া। বিদ ধাতুর অর্থ—জ্ঞান; "বিদ্যমান" কিনা জ্ঞান-গোচরে প্রতীয়মান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানের অসাক্ষাতেও বাস্তবিক সত্তা বিদ্যমান হইতে পারে না, বাস্তবিক সত্তার অবর্ত্তমানেও জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। জ্ঞান না থাকিলে বাস্তবিক সত্তা নিষ্ফল হয়; বাস্তবিক সত্তা না থাকিলে জ্ঞান নিষ্ফল হয়। বাস্তবিক সত্তা চায় জ্ঞান'কে—জ্ঞান চায় বাস্তবিক সত্তাকে—উভয়ের দোঁহার প্রতি দোঁহার এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রেম; আর, সেই জন্য দোঁহার সম্মিলন অতিশয় আনন্দের ব্যাপার। খুবই তো তাহা আনন্দের ব্যাপার—কিন্তু তাহা ঘটে কই? সর্ব্বত্রই তো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, চখাচখীর ন্যায়—জ্ঞান রহিয়াছে ভবনদীর ওপারে, সত্তা রহিয়াছে ভবনদীর এপারে, আর, দোঁহার মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে সারারাত্রি অবিরাম! এরূপ যে হয়—তাহার অবশ্য একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। দাঁত থাকিতে যেমন দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না—তেমি মিলনই যদি কেবল একটানা স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকে তবে মিলনের মর্য্যাদা লোপ পাইয়া যায়। মিলনও চাই—বিচ্ছেদও চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি যাহা চাই সেইটিই হ'চ্চে সেরা জিনিস। বিচ্ছেদ এবং মিলনের মাত্রা তালমান-সঙ্গত হওয়া চাই। বিচ্ছেদ যদি মাত্রা অতিক্রম করিয়া মারাত্মক হইয়া ওঠে, তবে তাহার মতো শোচনীয় বস্তু ত্রিজগতে নাই;—তা'চেয়ে আমি বলি মৃত্যু ভাল! চখাচখীর মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাহা নহে! তাহাদের বিচ্ছেদ মিলনেরই একপ্রকার অনুপান। ডাকাডাকিতেই তাহাদের ভরপুর আনন্দ, এমন কি সেই আনন্দে তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জ্ঞান এবং সত্তার বিচ্ছেদ-মিলনের বিশাল রঙ্গশালা কী চমৎকার! বাস্তবিক সত্তা কোথাও বা তমোগুণের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া মান-ভরে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে; কোথাও বা রজোগুণের নেশার ঘোরে সোণা মনে করিয়া মাটির ঢ্যালা স্তূপাকারে গাদা করিতেছে—সূর্য্যকান্ত মণি মনে করিয়া প্রস্তরখণ্ড মস্তকে ধারণ করিতেছে—আর, আপনার মন হইতে একটা মায়ামূর্ত্তি গড়িয়া দাঁড় করাইয়া সেই অবিদ্যাটাকে বলিতেছে "তুমিই আমার পরম জ্ঞান—আমার মস্তকে পদধূলি প্রদান কর"। আবার—কোথাও বা বাস্তবিক সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে প্রেমপূর্ণ মধুরস্বরে। কিন্তু তা বলিয়া—এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বাস্তবিক সত্তা যে-অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন—কোনো অবস্থাতেই তাহার গভীর অন্তরে জ্ঞানের প্রতি মনের লক্ষ্য এবং প্রাণের টান চুপিচুপি কার্য্য করিতে এক মুহূর্ত্তও বিরত হয় না। দেখিতেও তো পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানের অসাক্ষাতে বিদ্যমান হইতে পারে না—আনন্দের সঙ্গচ্যুত হইয়াও বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানই বাস্তবিক সত্তার চক্ষের জ্যোতি—আনন্দই বাস্তবিক সত্তার প্রাণের সম্বল। পূর্ব্বতন ঋষিমনীষীদিগের কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ স্বরে এই যে

…কটি হৃদয়ের মর্ম্মগত আকিঞ্চন উদ্‌গীত হইয়া উঠিয়া-ছিল—

"অসতো মা সদ্‌গময়" "তমসো মা জ্যোতির্গময়"

"মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"—

"অসৎ হইতে আমাকে সতে পৌঁছাইয়া দেও" "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে পৌঁছাইয়া দেও" "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে পৌঁছাইয়া দেও" ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা সৎ'কে চায়, তমোগুণের অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানজ্যোতিকে চায়, রজো-গুণের বিষজ্বালা আনন্দামৃত চায়।

প্রশ্ন ॥ তুমি বলিতেছ যে, বাস্তবিক সত্তা সৎ'কে চায়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ যে, বাস্তবিক সত্তা সত্ত্বগুণেরই আর এক নাম। এটাও তুমি বলিয়াছ যে, সত্ত্বগুণের প্রধান দুইটি ধর্ম্ম জ্ঞান এবং আনন্দ। ইহাতে ফলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, যে, সত্ত্বগুণ আত্মারই আর এক নাম। তা ছাড়া—বেদান্ত শাস্ত্রে বলে আত্মাই সৎশব্দের বাচ্য। সৎ এবং সত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ তবে যে কোন্‌খানটিতে তাহা তো আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর ॥ এটাও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, কবি এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ—সৎ এবং সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ। এ কথা খুবই সত্য যে, কবিত্ব যেমন কবির মর্ম্মগত ভাবের আবির্ভাব—সত্ত্বও তেমনি সতের মর্ম্মগত ভাবের আবির্ভাব; কিন্তু তা' বলিয়া—কবিত্বও কবি নহে, সত্ত্বও সৎ নহে। কবির হৃদয়ে যখন কবিত্বের ঢেউ খেলিতে থাকে, তখন তাহা হইতে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু কবির মনোমধ্যে আনন্দের যে এক বাঁধা রোস্‌নাই গোড়া হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই তাহা প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো কিছুই নহে। তেমি, সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—জ্ঞান এবং আনন্দ, যাহার কথা এক্ষণে হইতেছে, তাহা সৎস্বরূপ আত্মার চিরন্তন জ্ঞান এবং আনন্দের প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো-কিছুই নহে। বেদান্তশাস্ত্রে অন্তঃকরণের প্রধান দুইটি পীঠস্থানকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ বলা হইয়াছে ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কাহারো অবিদিত নাই, আর তাঁহাদের মধ্যে এটাও কাহারো অবিদিত নাই যে, বেদান্তদর্শনের মতে ও-দুইটি কোষ আত্মার দুইটি উপাধি বই ও-দুটার কোনোটাই সাক্ষাৎ আত্মা নহে। আনন্দময় কোষ আনন্দময় বই না—কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ; বিজ্ঞানময় কোষ বিজ্ঞানময় বই না—কিন্তু আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের গুণেই জ্যোতির্ম্ময়—নিজ গুণে নহে, সত্ত্বগুণ তেমি আত্মার গুণেই বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—তাহার নিজগুণে নহে। সত্ত্বগুণ যদিচ সাক্ষাৎ আত্মা নহে, কিন্তু তাহা প্রকৃতির আত্মা-ঘ্যাঁসা সারাংশ এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রই একবাক্য।

কালিদাস কেমনতর কবি ছিলেন তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে—শকুন্তলা নাটকের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—মেঘদূতের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—কুমারসম্ভবের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—তাহার প্রতি যেমন মনঃসমাধান করা আবশ্যক হয়, সৎস্বরূপ আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, তেমি, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের কোন্ কোন্ স্থানে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি কী কী প্রকার তাহার প্রতি মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এটাও দেখা চাই যে, শকুন্তলা মেঘদূত কুমারসম্ভব প্রভৃতি কালিদাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থ-সকলের মধ্যে যেখানে যত সুন্দর সুন্দর কবিত্ব ছড়ানো রহিয়াছে সমস্ত এক জায়গায় জড়ো করিলেও তাহা দৃষ্টে কালিদাসের মর্ম্মস্থানীয় কবিত্বরসের উপরের উপরের তরঙ্গলীলার রসগ্রহণই এক-যা-কেবল সম্ভবে, তা বই, তাহার গভীর প্রদেশের অন্ধিসন্ধি তলাইয়া পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন—এটা সত্য যে, কালিদাসের লেখনী দিয়া সেরা সেরা কবিত্ব যাহা শকুন্তলাদি পুস্তকে বাহির হইয়াছে তাহা কালিদাসের মর্ম্মস্থানীয় কবিত্ব-রসের বিমল দর্পণ। সেই দর্পণে কালিদাস নিজেও তাঁহার সেই মর্ম্মস্থানীয় অকথিত কবিত্ব যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না তাহার আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, আর, তাঁহার পাঠকবর্গও সেই দর্পণেই সেই তাঁহার অকথিত কবিত্বের যথাসম্ভব আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ আত্মার সেই

রকমের দর্পণ। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, এক আত্মার দুই পৃষ্ঠ ; এক পৃষ্ঠ জ্ঞাতা, আর এক পৃষ্ঠ জ্ঞেয়। সত্ত্বগুণের দর্পণে আত্মার দুই পৃষ্ঠই কিছু আর প্রতিবিম্বিত হয় না ; প্রতিবিম্বিত হইতে—আত্মার জ্ঞেয় পৃষ্ঠই কেবল প্রতিবিম্বিত হয়—আত্মার জ্ঞাতৃ-পৃষ্ঠ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ২০শ সূত্রে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছেও তাই ; তা'র সাক্ষী ঃ—

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" ॥২০॥

ভোজরাজকৃত টীকায় ইহার অর্থ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ঃ—

"দ্রষ্টা পুরুষঃ। দৃশিমাত্রশ্চেতনামাত্রঃ। স শুদ্ধোঽপি—পরিণামিত্বাদ্যভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোঽপি—প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানানি। তানি স্বাব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—জাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধানমাত্রেনৈব পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বমিতি।"

ইহার অর্থ।

"দ্রষ্টা" কিনা পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। "দৃশিমাত্র" কিনা চেতনামাত্র। আত্মা পরম পরিশুদ্ধ, পরিণামরহিত, এবং স্বপদে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইলেও প্রত্যয়ের যোগে জ্ঞেয় বস্তুসকল উপলব্ধি করেন। "প্রত্যয়" কিনা বিষয়োপরক্ত জ্ঞান *। আত্মা স্বস্থান হইতে না নড়িয়া বিষয়োপরক্ত জ্ঞানসকল (বা প্রত্যয়সকল) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করেন। [ভাব এই যে, আত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘটপ্রত্যয় (কিনা idea of ঘট) উপলব্ধি করেন, আর, ঘটপ্রত্যয়ের দ্বার দিয়া (through the idea of ঘট) দৃশ্যমান ঘট উপলব্ধি করেন]। কথা হ'চ্চে এই যে, বুদ্ধি যখন বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তখন সেই বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির (কিনা প্রত্যয়ের) সন্নিধানমাত্রেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। [ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আত্মা বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিরই—প্রত্যয়েরই—সাক্ষাৎ জ্ঞাতা।]

আমি তাই রূপকচ্ছলে বলিতেছি যে, আত্মার জ্ঞাতৃ-পৃষ্ঠ (বৈদান্তিক ভাষায়—কূটস্থ চৈতন্য) স্বরূপে স্থির-প্রতিষ্ঠ, আর, আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ (বৈদান্তিক ভাষায়—আভাস চৈতন্য) সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধির দর্পণে—আত্ম-প্রত্যয়ের দর্পণে—প্রতিবিম্বিত। (আমি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই রূপকের ভাষা ব্যবহার করিতেছি—সাধ করিয়া তাহা করিতেছি না ইহা বলা বাহুল্য।)

প্রশ্ন॥ একটু পূর্ব্বে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছিলে, আর, তাহার পরে রূপকচ্ছলে আত্মার দুই পৃষ্ঠের কথা এখন এই যাহা বলিলে, এই দুই কথার এটার সঙ্গে ওটা মিলাইয়া দেখিয়া আমার মনে হইতেছে এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ-ঘ্যাঁসা প্রকৃতি-রাজ্যে অভিনীত হওয়া যে-কারণে আবশ্যক—আত্মার জ্ঞাতৃপৃষ্ঠ-ঘ্যাঁসা স্বরূপ-রাজ্যে তাহা অভিনীত হওয়াও সেই কারণে আবশ্যক। সে কারণ এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মিলনের আনন্দ একটানা স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া গিয়া বিষাদেরই আলয় হইয়া ওঠে। আমি তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মার জ্ঞাতৃপৃষ্ঠ-ঘ্যাঁসা স্বরূপ-রাজ্যেও সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্য-লীলা অভিনীত না হয় কেন?

উত্তর॥ যদি বলা যায় যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে এম্নি ঘোরতর মর্ম্মান্তিক রকমের পার্থক্য যে, কোনো জন্মেই দোঁহার সহিত দোঁহার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেও নাই—ঘটিতে পারেও না ; তবে তাহা বলা'ও যা,

* প্রত্যয় শব্দের মুখ্য অর্থই হ'চ্চে ঐ—কি না "বিষয়োপরক্ত' জ্ঞান। তবেই হইতেছে যে, প্রত্যয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ হ'চ্চে—ইংরাজীতে যাহাকে idea বলে। যে-জ্ঞান বস্তুদ্বারা উপরক্ত তাহাকেই বলা যায় বস্তু-প্রত্যয় কি না idea of substance। তেম্নি কারণ-প্রত্যয়'কে ইংরাজিতে বলা যাইতে পারে idea of cause। আত্মপ্রত্যয়কে বলা যাইতে পারে idea of self। যদি বলা য'য় যে, "আমরা আত্মপ্রত্যয়দ্বারা আপনা-আপনাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করি" তবে তাহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ হ'চ্চে "We cognize our individul selves through the idea of self"। শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যের উপক্রমণিকার গোড়াতেই আছে যে, বিষয়ী (কিনা আত্মা) অস্মৎপ্রত্যয়ের (কি না idea of selfএর) গোচর (কিনা বিষয়ীভূত)। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, অস্মৎপ্রত্যয় (কি না idea of self) আত্মোপরক্ত জ্ঞান। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলিবা মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় আভাস-চৈতন্য, আর, অস্মৎপ্রত্যয়ের জ্ঞাতা কূটস্থ চৈতন্য। অর্থাৎ Self as it appears to itself is the phenomenal object of the idea of Self; Self as the knower is the noumenal subject of the idea of Self.

আর, জ্ঞানও নাই—সত্তা'ও নাই—কিছুই নাই, তাহা বলা'ও তা, একই; কেননা, জ্ঞানের অসাক্ষাতে সত্তা বিদ্যমানই হইতে পারে না, আর, পাতঞ্জল-দর্শনে এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তাগর্ভ বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির অসাক্ষাতে জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হয় না। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞান-বিরহে সত্তা সত্তাই হয় না—সত্তা-বিরহে জ্ঞান জ্ঞানই হয় না। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে, জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অবশ্য কিছু-না-কিছু যোগ গোড়া হইতেই আছে, তবে সেরূপ একটা স্তোক-বাক্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। তাহা হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে অগত্যা এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যাহাকে তুমি বলিতেছ "কিছু-না-কিছু যোগ" তাহা কোথা হইতে আসিল? তাহা কি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে—অথবা তাহা ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে? শেষোক্ত কথাটাই যুক্তিসঙ্গত ইহা বলা বাহুল্য। এটা যখন স্থির যে, সত্তা এবং জ্ঞানের ভিতর হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তা এবং জ্ঞান যেখানে একীভূত সেইখান হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, সকলের মূলে সত্তা জ্ঞান এবং উভয়ের মিলন-জনিত আনন্দ তিনই একসঙ্গে একীভূত; আর, সেই যে সকলের মূল তিনি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। পরমাত্মাতে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দ একীভূত ভাবে পরিপূর্ণ মাত্রায় চিরবর্ত্তমান। যিনি সৎস্বরূপ তিনিই চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি চিৎস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি আনন্দস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। গীতাশাস্ত্রে আছে যে, পঞ্চভূত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার অপরা প্রকৃতি, তা ছাড়া, জীবভূতা আর এক প্রকৃতি আছে, তাহা আমার পরা প্রকৃতি। তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতি পরমাত্মার পর নহে; প্রকৃতি পরমাত্মার আপনারই প্রকৃতি; তা ছাড়া, জীবভূতা পরা প্রকৃতি, সংক্ষেপে—জীবাত্মা, পরমাত্মার দ্বিতীয় আত্মা। প্রকৃতিরাজ্যে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা যাহা অভিনীত হয়, তাহা তাঁহারই অভিনীত হয়। তিনিই তাঁহার এই নানা রসযুত প্রকৃতিসঙ্গীতে চিরমিলনের সদানন্দ'কে বিচ্ছেদের তালমানসঙ্গত মাত্রা সংযোগে নিত্য নিত্য নূতন নূতন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন।

অতঃপর প্রকৃতিরাজ্যের কোন্‌খান দিয়া কিরূপে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দের—এক কথায় সত্ত্বগুণের—অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

আমাদের এই সাগর-বেষ্টিত, বায়ুগর্ভস্থিত, চন্দ্রসূর্য্য-তারকা-প্রদীপিত আশ্চর্য্য বাস-দ্বীপে, অর্থাৎ পৃথিবী-মণ্ডলে, সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি-সোপানের প্রথম ধাপ হ'চ্চে জীবের উৎপত্তি। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যাদির অধিকার-প্রদেশে সত্ত্বশব্দ জীব-অর্থেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তা'র সাক্ষী—শকুন্তলা নাটকের যে শ্লোকটিতে দুষ্যন্ত রাজা তাঁহার মৃগয়া-প্রেয়সীর গুণ গাহিতেছেন তাহার প্রথমার্দ্ধ এই:—"মেদশ্ছেদ কৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।" ইহার অর্থ এই যে, মেদহ্রাসে শরীর কৃশোদর লঘু এবং উদ্যমশীল হয়, আর তা' ছাড়া—ভয় ক্রোধের আবির্ভাবে সত্ত্বদিগের, কিনা জীবদিগের, চিত্ত কিরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন হয় তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৫২শ অধ্যায়ে—স্থূলশরীরী মনুষ্যের ভিতরে যে-এক সূক্ষ্মশরীরী মনুষ্য আছে সেই সূক্ষ্মশরীরী অতিমানুষকেও সত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে;—বলা হইয়াছে এই যে,

"শরীরাদ্ বিপ্রমুক্তং হি সূক্ষ্মভূতং শরীরিণং
কর্ম্মভিঃ পরিপশ্যন্তি শাস্ত্রোক্তৈঃ শাস্ত্রবেদিনঃ ॥
যথা মরীচ্যঃ সহিতাশ্চরন্তি
সর্ব্বত্র, তিষ্ঠন্তি চ দৃশ্যমানাঃ।
দেহৈ বিমুক্তানি চরন্তি লোকান্
তথৈব সত্ত্বান্যতিমানুষানি ॥"

ইহার অর্থ:—

শাস্ত্রজ্ঞেরা, শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা, স্থূলশরীর হইতে বিমুক্ত সূক্ষ্মশরীরী মনুষ্য দর্শন করেন। এই যে-সকল ভূপতিত সূর্য্যরশ্মি যাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচরে

ভাসমান, এই-সকল সূর্য্যরশ্মি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তেম্নি স্থূলদেহ-বিমুক্ত অতি-মানুষ সত্বেরা (অর্থাৎ ইহলোকে যাহারা মানুষ ছিল—এখন অতিমানুষ হইয়াছে—সেই-সকল সত্বেরা) লোকে লোকে বিচরণ করে। *

প্রশ্ন ॥ কিন্তু তুমি বলিয়াছ সত্বের আর এক নাম বাস্তবিক সত্তা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—বাস্তবিক সত্তা নাই কা'র? ঐ অচেতন দেয়ালটারও তো বাস্তবিক সত্তা আছে। সংস্কৃত ভাষায় তবে অ্যাকা কেবল জীবকেই সত্ব বলা হয় কেন? জড়বস্তু কী অপরাধ করিল? এ যে দেখিতেছি এক যাত্রায় পৃথক ফল!

উত্তর ॥ তুমি তো দেখিতেছ এক যাত্রা! আমি যে দেখিতেছি দুই যাত্রা!

দেখিতেছি যে জীবের বাস্তবিক সত্তা যাত্রা করিয়া বাহির হয় আগে; আর, তাহা অভিব্যক্তি-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দৃশ্যমান জড়বস্তু-সকলের যাত্রারম্ভ হয় পরে। তুমি যে বলিতেছ—ঐ দেয়ালটারও বাস্তবিক সত্তা আছে, কিসের জোরে বলিতেছ? দেয়ালটার রূপ তুমি চক্ষে দেখিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়াল-টার রূপ চৌকোণ শ্বেতবর্ণ; দেয়ালটার গাত্র তুমি স্পর্শ করিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়ালটার গাত্র কঠিন। কিন্তু দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা তুমি চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে ছুঁতে পাইতেছ না। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কিসের জোরে তুমি বলিতেছ যে, দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা আছে?

প্রশ্ন ॥ তা যদি বলো তবে উভয়তই গতির্নাস্তি! আমারও যে দশা—তোমারও সেই দশা! তুমিও তো জীবের বাস্তবিক সত্তা চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে-ছুঁতে পাইতেছ না—অথচ বলিতেছ যে, জীবের বাস্তবিক সত্তা আছে;—কিসের জোরে বলিতেছ?

উত্তর ॥ জ্ঞানের জোরে! আমার আত্মসত্তা যেমন আমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি, তোমার আত্মসত্তাও তেম্নি তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছ; আর তাহারই জোরে তোমাতে আমাতে দুজনায় মিলিয়া সমস্বরে বলিতেছি যে, আমাদের উভয়েরই আত্মসত্তা জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞানের সত্য, সুতরাং তাহা বাস্তবিক সত্তা।

প্রশ্ন ॥ তুমি কি বলো যে, ঐ দেয়ালটার—মূলেই বাস্তবিক সত্তা নাই।

উত্তর ॥ না, আমি তাহা বলি না। তা' ছাড়া—সাংখ্যাদি কোনো শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে ঐ দেয়াল-টার ভিতরে সত্বগুণ মূলেই নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উল্টা আরো বলে এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই ত্রিগুণাত্মক; আর সেই সঙ্গে এ কথাও বলে যে, মনুষ্যজাতির মনোমধ্যে সত্বগুণ তমোগুণের অন্ধকারময় পাতাল-গর্ত্ত হইতে অভিব্যক্তি-সোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; পক্ষান্তরে, জড়বস্তু-সকলের ভিতরে সত্বগুণ তমোগুণের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অত কথায় কাজ কি? এই সোজা কথাটি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, জগতে যদি জীব না থাকে তবে জ্ঞান দাঁড়াইবে কোথায়? জ্ঞানের যদি দাঁড়াইবার স্থান না থাকে, তবে বাস্তবিক সত্তা দাঁড়াইবে কোথায়? আমি তাই বলি যে, পৃথিবী-মণ্ডলে জীবের অভিব্যক্তি হয় আগে—বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে বিদ্যমান হয় পরে।

প্রশ্ন ॥ পৃথিবীস্থ জীবেরা তো সে-দিনের জীব বলিলেই হয়। তাহাদের জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবী যে, কতশত যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তুমি কি বলো যে ততটা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বাস্তবিক সত্তা ছিল না?

উত্তর ॥ দীর্ঘ কাল! তোমার আমার মতো অজ্ঞানান্ধ জীবদিগের নিকটেই উহা দীর্ঘ কাল। ব্রহ্মার নিকটে উহা পৃথিবীমাতার দশমাস দশদিন; আর, সেইজন্য, ততটা কাল পর্য্যন্ত সত্ব (কিনা জীব) তাঁহার গর্ভমধ্যে প্রসুপ্ত ভাবে বা অনভিব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিবারই কথা। তা' শুধু না—ভূগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে

* অধুনাতন কালের spiritualist সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠিক্ ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন।

protoplasm সেই সমুদ্রগর্ত্তস্থিত সূতিকাগারে সত্ত্ব গোকুলে বাড়িতেছিল *। তোমার প্রশ্নের সীধা উত্তর এই যে, পৃথিবীমণ্ডলে জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে পৃথিবীর বাস্তবিক সত্তা ছিলই না যে, তাহা আমি বলি না; ছিল—কিন্তু তাহা না থাকিবারই মধ্যে। রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছিলেন "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" †, আমি তেম্নি বলি যে, পৃথিবীর তখন সত্তাও ছিল, চেতন্যও ছিল, আনন্দও ছিল—

ছিল সবই—অনভিব্যক্ত। এটা বোধ করি তুমি দেখিয়াছ যে, দূর্বিণের সোজা দিক দিয়া দেখিলে ছোটো জিনিস্ যেমন বড় দেখায়—দূর্বিণের উল্টা দিক দিয়া দেখিলে বড় জিনিস্ তেম্নি ছোটো দেখায়। মনো-দূর্বিণেরও তেম্নি উল্টা দিক্ দিয়া দেখিলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একটা বৃহৎ কথা আবালবৃদ্ধ বনিতার চির-পরিচিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কথার সামিল হইয়া দাঁড়ায়। তার সাক্ষী:—দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, তখন আমার সন্নিধানে—আমিও আছি—আমার মুখ চক্ষু হস্ত পদও আছে—খাট পালঙ্কও আছে—বিছানা বালিশও আছে;—**আছে সবই** অনভিব্যক্ত। তুমি হয় তো বলিবে "পৃথিবী জড়বস্তু বই আর তো কিছু না! একটা মশার শরীরে যতটুকু প্রাণ আছে—পৃথিবীর শত সহস্র যোজনব্যাপী দিগ্‌গজ শরীরে তাহার সিকির সিকি মাত্রাও প্রাণ নাই; যাহার প্রাণই নাই, তাহার আবার **চেতনা**—তাহার আবার **আনন্দ**!" তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, চেতনাবান্ দ্বিপদ জীবেরা বোল আওড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া তাহারা সবাই মিলিয়া যা'দিগে জড়বস্তু বলিয়া খোঁটা দ্যায়, তাহারা সত্য সত্যই কিছু আর বৃত্তিশূন্য নিশ্চেষ্ট পদার্থ নহে। ঐ স্তব্ধ দেয়ালটার ভিতরেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়া নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে: আর, আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার সে যে স্পন্দন তাহা প্রাণস্পন্দনেরই পূর্ব্বলক্ষণ। প্রাণস্পন্দন তেম্নি-আবার মনঃস্পন্দনের বা আনন্দের পূর্ব্বলক্ষণ; এমন কি—প্রাণস্পন্দন এক প্রকার আনন্দের নৃত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তাই বলিতে চাহিতেছি এই যে, ঐ দেয়ালটার মর্ম্মস্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণক্রিয়া চাপা দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাও বলি—নিতান্তই চাপা দেওয়া রহিয়াছে বলা **এখন** আর চলে না! কেন যে বলিতেছি "এখন আর চলে না" তাহার ভিতরের কথাটা তোমাকে তবে বলি:—

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ কামিখ্যার অনেকটা নিকটবর্ত্তী তাহা তুমি অবশ্য জানো। সেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কামিখ্যাদেশীয় বিদ্যার যে-এক মহাপণ্ডিত মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্র-সহ বাহির হইয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কার্য্যই নাই! তিনি সোণার কাটি ছোঁআইলেই * নির্জীব ধাতু প্রস্তরাদি সজীব হইয়া উঠে—রূপার কাটি ছোঁআইলে আবার-তাহারা যেমন-কে-তেম্নি অসাড় হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে। এইমাত্র আমি তোমার নিকটে যে-একটি রহস্য-কাহিনীর

* পিতা-বাসুদেব সদ্যপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা রাণীর নিকটে রাখিয়া আসিয়া যশোদা রাণীর নবপ্রসূত কন্যাটিকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া কংশরাজার নিকটে পরিচয় দেওয়ায় কংশরাজা সেই কন্যাটিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটি শঙ্কর চিল হইয়া আকাশে উড়িয়া গিয়া তথা হইতে কংশরাজাকে বলিল

"আমাকে মারিছ তুমি!
তোমাকে মারিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।"

এই পৌরাণিক উপাখ্যানটির সহিত তান মিলাইয়া আমি তাই বলিলাম যে, পৃথিবীর সেই আদিমকালে—তমোরাজার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপকে যে করিবে পদতলে দলিত, সেই সত্ত্বমহাপুরুষ সমুদ্রগর্ভে গোকুলে বাড়িতেছিল।

† আমাদের দেশের কথক-মণ্ডলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই সংস্কৃত বোল্'টির পরিবর্ত্তে "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এই বাংলা বোল্'টি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত অবিতর্কিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙালীর মুখে শেষোক্ত বোল্‌টিই শুনায় ভাল। শুনায় তো ভালই, তা ছাড়া—"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এটা যেমন শুদ্ধ সংস্কৃত, "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এটা তেম্নি শুদ্ধ বাংলা। কেননা বাংলাভাষা প্রাকৃত ভাষারই সহোদর। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষার বিভক্তিঘটিত বিসর্গের স্থানে ওকার হয়; তার সাক্ষী—"ইতঃ" সংস্কৃত, "ইদো" প্রাকৃত। এই জন্য বলি যে, "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এইটিই শুদ্ধ বাংলা, আর, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" এটা না সংস্কৃত না বাংলা—আর তাহারই নাম অশুদ্ধ বাংলা বা ভ্রষ্ট বাংলা।

* ছোঁয়া—ছোঁya সুতরাং অশুদ্ধ।
ছোঁআ—ছোঁa সুতরাং শুদ্ধ॥

ইঙ্গিত করিলাম সেই কথাটি—অর্থাৎ "দেয়ালটার মর্ম্ম-স্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণস্পন্দন চাপা দেওয়া রহিয়াছে" এই কথাটি—ঐ মায়াবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মাটির মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্রের খোঁচাখুঁচির জ্বালায় প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়া বিজ্ঞানের বাঁধা রাস্তায় ধীরে ধীরে পায়চালি করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার জন্য এখন আর ভাবনা নাই। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি পরমাশ্চর্য্য রহস্যকাহিনী যাহা আমি তোমাকে চুপি চুপি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারিবার মতো জিনিস্ই নহে; কেননা তাহা একেবারেই যন্ত্রতন্ত্রাদির আয়ত্ত-বহির্ভূত। সে কথা এই যে, ধাতু প্রস্তরাদির প্রাণস্পন্দনের ভিতরে চেতনা এবং আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। যদি বলো "কেমন করিয়া তুমি তাহা জানিলে?" তবে বলি শোনো—কেমন করিয়া আমি তাহা জানিলাম। এটা যখন স্থির যে, কেহই মরিতে চাহে না—সকলেই বাঁচিতে চাহে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, কামিখ্যাঘ্যাঁসা প্রদেশের মহাত্মাটি মায়াবিদ্যার মহাপণ্ডিত যদিচ, তথাপি তাঁহার শরীরে মায়াদয়ার লেশ মাত্রও নাই! মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যে-একটি গরিব বেচারী তাম্রখণ্ড দিব্য সুখে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া ছিল তাহাকে ঠগীদের মতো গলা টিপিয়া যমালয়ে পাঠাইতে একটুও তাঁহার দ্বিধা হয় না। বড় হো'ক্—ছোটো হো'ক্, মানুষ হো'ক্—জন্তু হো'ক্, ধাতু হো'ক্—পাষাণ হো'ক্, যেমনই যে-কোনো পদার্থ হো'ক্ না, যাহার শরীরে প্রাণ আছে—সেই প্রাণের প্রতি তাহার প্রাণের টানও আছে; কেননা প্রাণের প্রতি যাহার প্রাণের টান নাই—প্রাণে তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহাকে বলে প্রাণের টান তাহাকেই বলে ভালবাসা। যেখানে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, সেইখানেই ভালবাসার আসন জমে। ধাতুপ্রস্তরের প্রাণ আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, তাহাদের প্রাণের প্রতি তাহাদের প্রাণের টান আছে; তাহাদের প্রাণের প্রতি প্রাণের টান আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের আনন্দের অনুভব হয়; আর, আনন্দের অনুভব বিনা-চেতনে তো হইতেই পারে না। দৃশ্যমান বস্তু-সকলের যবনিকার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলেই যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পা'ন যে, সেই যবনিকার আড়ালে জীবনীশক্তি হ্লাদিনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি সখীত্বের প্রেমসূত্রে গাঁথা। আমার ভয় হইতেছে—পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিপরম্পরার সহিত দৌড়িয়া চলিতে পাছে আমার সহযাত্রীরা হাঁপাইয়া যা'ন। দুর্দ্দমনীয় যুক্তির অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নাবিয়া—আমি তাই শাস্ত্রের পথ ধরিয়া চলিয়া গম্যস্থানাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বোধ করিতেছি; অথচ আবার রাজ্যের পুঁথি ঘাঁটিয়া পুঁথি বাড়াইতে মূলেই আমার ইচ্ছা নাই। এইরূপ যখন উভয়-সঙ্কট, তখন কর্ত্তব্য হ'চ্চে আমার—, মধ্যপথ অবলম্বন করা; অর্থাৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মুখ্য মন্তব্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিতে যত সংক্ষেপে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখা। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে!

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত-স্বরের গতিপদ্ধতির ক্রম যেমন অবরোহী এবং আরোহী এই দুই খণ্ডে বিভক্ত, সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতে তেম্নি সমগ্র প্রকৃতির গতি-পদ্ধতির ক্রম অনুলোম এবং প্রতিলোম এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাহার মধ্যে—পৃথিবীর উৎপত্তি অনুলোম সোপানের শেষের ধাপ; জীবের উৎপত্তি প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ। ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের প্রথম খণ্ডে, কিনা অনুলোম খণ্ডে, রজস্তমোগুণের বন্ধন ক্রমশঃ ঘনীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া তমপ্রধান পৃথিবীতে পর্য্যবসিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে—কিনা প্রতিলোম খণ্ডে রজস্তমোগুণের বন্ধন ক্রমশঃ আল্‌গা আল্‌গা হইয়া খুলিয়া খুলিয়া গিয়া মনুষ্যজাতীয় মহাপুরুষ-দিগের অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের উৎকৃষ্টতম অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। কিন্তু নীচের ধাপের সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্যদিগের পক্ষে রজস্তমোগুণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ন্যূনাধিক পরিমাণে দীর্ঘকালসাপেক্ষ। কিন্তু এটা সত্য যে, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্যই নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক-চূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন

"তস্মান্ মনঃ কারণমস্য জন্তোঃ
বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।

বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ
মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কং ॥"

ইহার অর্থ এই যে মনই জীবের বন্ধ-মোক্ষের কারণ। রজস্তমোগুণে মলিনীভূত মন বন্ধের কারণ, আর রজস্তমোবিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ মন মুক্তির কারণ। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষদিগের কথার ধারাই এইরূপ। ইঁহাদের অন্তঃকরণের ভিতরকার অভিসন্ধি আর কিছু না—সংসারের বাধাবিঘ্নের প্রতিস্রোতে যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টায় মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে এইরূপ অভয় বাক্যে উৎসাহিত করা—যে, "তোমার আপনারই মন তোমার বন্ধের কারণ, সুতরাং বন্ধ টুটিয়া ফ্যালা তোমার আপনারই হস্তে। অতএব অবিদ্যা-রাক্ষসীর মায়ামন্ত্র-সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মুক্তিপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও।" শঙ্করাচার্য্যের ঐ শ্লোকটি শুনিয়া কোনো অভিনব ব্রতী যদি মনে করেন যে, "বন্ধ-মোক্ষের কারণ আপনারই তো মন, তবে আর ভাবনা কি?" তবে তিনি তাঁহার মন'কে এখনো পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই; যদি চিনিতে পারিতেন তাহা হইলে বরং এ কথা তাঁহার মুখে কতকটা শোভা পাইত যে, তবে আর ভাবনা কি? মাছিরা যদি মাকড়্সার জাল চক্ষে দেখিতে পাইত, তবে মাছিদের মুখে এ কথা কতকটা শোভা পাইত যে, মাকড়্সা তো আমাদেরই এক সম্পর্কে বড় দাদা—উহাকে ভয় কিসের? কিন্তু কোনো জালান্ধ মাছির আসন্ন কালে যদি এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয় যে, আমি মাকড়্সার চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেলেও সে আমাকে ধরিতে পারে না—যে হেতু তাহার পাখা নাই, তবে তাহার মরণ ঘুনাইয়া আসিয়াছে। অর্জ্জুন কিন্তু তাঁহার মনকে পাকা জহরির ন্যায় ভাল-মতে চিনিয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥"

ইহার অর্থ:—

মন, কৃষ্ণ, বড়ই চঞ্চল, বিষম দুর্দ্দান্ত এবং শক্ত বলবান্। বায়ুকে যেমন হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য—মনকে তেমনি বশে রাখা দুঃসাধ্য। অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এইরূপ একটি কথা যাহা মনের খেদে বাহির হইয়াছিল তাহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মনকে বিধিমতে চিনিতে পারিলেও তাহার হস্ত হইতে পার পাওয়া সুকঠিন। আমার বাল্যকালে, আমার মনে পড়ে, প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য আমরা যখন সকল ভ্রাতায় একত্রে মিলিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতাম, তখন আমাদের চাকর-বাকরেরা পথের মধ্য হইতে আর-পাঁচরকম খ্যালনার সঙ্গে আমাদের জন্য মুখোস্ কিনিয়া আনিত। তাহার পরে আমরা নানাবিধ খ্যালনা হাতে করিয়া মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কিঙ্কর-শ্রেণীর কোনো কোনো ব্যক্তি যখন মুখোস্ মুখে দিয়া আমাকে ভয় দেখাইত তখন আমার মন'কে আমি যতই বলিতাম "ও তো অমুক—ওকে কী ভয়!" আমার মন ততই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত, আর তাহার কিয়ৎ পরেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিত। আমি বেস্ জানিতাম যে, মুখোসের আড়ালে অমুকের হাস্যমুখ ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে—কিন্তু তাহা জানা-তে করিয়া আমার ভয়ের স্বল্পমাত্রও লাঘব হইত না। প্রকৃত কথা এই যে একটা প্রবল সংস্কার-সিংহ যখন মনের গুহার মধ্যে প্রসুপ্ত থাকে তখন জ্ঞান-ধনুর্দ্ধর তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার মনকে এইরূপ প্রবোধ দ্যান যে, ওটা একটা অমূলক সংস্কার বই আর কিছুই না—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান! কিন্তু সেই সিংহটার নিদ্রা ভাঙিয়া গেলে সে যখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া গুহার মধ্য হইতে বাহির হয়, তখন জ্ঞান তাহার কাছে এগো'বে কি—তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই জ্ঞানের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, ঐ, দেয়ালটা বটে একটা সত্যিকের জিনিস—কিন্তু মনের সংস্কারগুলা মিথ্যা মায়া বই আর কিছুই নহে। কিন্তু ফলে কী দেখা যায়? ফলে দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত! রাজমজুর ডাকাইয়া আনিয়া দেয়ালটার মধ্য হইতে উহার ইষ্টকাদি সমস্ত গঠনোপকরণ বাহির করাইয়া লইয়া সেই রাশীকৃত ইষ্টকাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে পাঠানো অতি সহজে হইতে পারে; কিন্তু তুখোড় বিষয়ী ব্যক্তিদিগের

মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, ধন মান প্রতিপত্তিই সমস্ত মঙ্গলের মূলাধার, অথবা স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির চরিতার্থতাই মনুষ্যজীবনের সার সর্ব্বস্ব; এই-সকল অমূলক সংস্কার মনকে যখন রীতিমত পাইয়া বসে তখন সেগুলাকে মন হইতে নড়ানো কঠিন হইতেও কঠিন। আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ভৌতিক শক্তি যেমন জড়পরমাণুগণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করে, তেম্নি —সাংখ্যদর্শনে যাহাকে বলে "আকৃতি" অর্থাৎ বাছুর আসিতেছে দেখিয়া যেমন গোরুর বাঁট হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে তেম্নিতর-সব সংস্কারমূলক প্রবৃত্তি-স্রোত আমাদের **প্রাণের** উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; পুরাতন গ্রীক দর্শনকারেরা যাহাকে বলিতেন পরমাণুগণের পরস্পর "sympathy antipathy" সম্বেদ নির্ব্বেদ বা অনুরাগ-বিরাগ, তাহা আমাদের **মনের** উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; বেদান্ত-দর্শনে যাহাকে বলে "মায়া" (অর্থাৎ অসত্যকে সত্য মনে করা—ক্ষণস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখ মনে করা—সংসারকে সার মনে করা—ইত্যাদি) তাহা আমাদের **বুদ্ধির** উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এইরূপে আমরা রজস্তমোগুণের বন্ধনে আপাদ-মস্তকে জড়িত হইয়া রহিয়াছি।

ধরিতে গেলে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন "আকর্ষণ-বিকর্ষণ" তাহাও "মায়া" "আকৃতি" অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতির ন্যায় অন্থিতর ধাঁচা'র এক রকম সংস্কার-মূলক শক্তি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, অনবগাহ্যতা (Impenetrability) * জড়পদার্থের একটি অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে বায়ু এবং জলীয় বাষ্প পরস্পরের যতই গা ঘেঁসিয়া অবস্থিতি করুক্ না কেন—সমুদ্র অঞ্চলে লবণ এবং জল পরস্পরের সহিত যতই মাখামাখি-ভাবে সংলিপ্ত থাকুক্ না কেন—তথাপি দোঁহার মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান থাকিতেই চায়। তবেই হইতেছে যে, জড়বস্তু-সকল যখন আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, তখন পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়াই কার্য্য করে, তা বই পরস্পরের সহিত সংলিপ্ত হইয়া কার্য্য করে না। কাজেই বলিতে হয় যে, আকর্ষণ-বিকর্ষণশক্তি একপ্রকার মায়ামন্ত্র—একপ্রকার "আকৃতি"—একপ্রকার sympathy antipathy—একপ্রকার অনুরাগ বিরাগ। সাংখ্যদর্শনের মতে—সূক্ষ্ম আকাশ যখন অনুলোম-ক্রমে অনিলানল-সলিলের মধ্যদিয়া পৃথিবীরূপে পিণ্ডীভূত হয়, তখন তাহা-সে হয় একপ্রকার আকৃতির প্রবর্ত্তনায়। "আকৃতি" আর কিছু না—মেঘ ডাকিলে যেমন ময়ূর না-নাচিয়া থাকিতে পারে না, তেম্নি কতকগুলি পরমাণু যখন একসঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, তখন পার্শ্বস্থ পরমাণুরা তাহাদের সহিত নৃত্যে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না;—ইহারই নাম "আকৃতি", ইহারই নাম "Sympathy", ইহারই নাম মায়ামন্ত্র।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

অনুলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক যেমন আকৃতি, বা অবিদ্যামূলক সংস্কার—প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক তেম্নি প্রেম। জীবজগতের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে রজস্তমোগুণের মায়া-হ্রদের মধ্য হইতে সত্ত্বগুণ যতই উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে, ততই আকৃতির বা অন্ধসংস্কারের কার্য্য ফুরাইয়া যাইতে থাকে, আর, সেই সঙ্গে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকে। আকৃতি এবং প্রেমের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, আকৃতি অবিদ্যার রাজসী শক্তি, প্রেম আত্মার সাত্ত্বিকী শক্তি বা দৈবী শক্তি। অবিদ্যার সম্মোহনী শক্তি রূপার কাটি, প্রেমের উদ্বোধনী শক্তি সোণার কাটি। অবিদ্যার সংস্পর্শে চক্ষুষ্মান্ জীবের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়—প্রেমের সংস্পর্শে অন্ধজীবের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। নেপোলিয়নের রাক্ষসী মায়াশক্তি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যসামন্তের উপরে কিরূপ প্রবল পরাক্রমের সহিত

* Impenetrability শব্দের অবিকল অনুবাদ "অনবগাহ্যতা" তাহাতে আর ভুল নাই। তা ছাড়া—Impenetrability কথাটার শব্দার্থ এবং ভাবার্থের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, অনবগাহ্যতা কথাটারও শব্দার্থ এবং ভাবার্থের মধ্যে অবিকল সেইরূপ প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামকরণে ঐরূপ প্রভেদ'কে খাড় পাতিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কার্য্য করিত তাহা কাহারো অবিদিত নাই, আর, চৈতন্য মহাপ্রভুর দৈবী মায়াশক্তি নবদ্বীপের অধিবাসীদিগের উপরে কেমন স্বর্গীয় মাধুর্য্যের সহিত কার্য্য করিয়াছিল তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। দুয়ের মধ্যে কত না প্রভেদ! নেপোলিয়নের অধীনস্থ সৈন্যেরা "Glory" নামক একটা মিথ্যা প্ররোচনা-বাক্যের ভেরী-নিনাদে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তেরা হরিনাম-কীর্ত্তনের মধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে মৃত শরীরে প্রাণ পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রেম জীবকে রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে উঠাইয়া দেয়, অবিদ্যা জীবকে রজোগুণ হইতে তমোগুণে নাবাইয়া দেয়। প্রেম-সোপানের দুইটি ধাপ। নীচের ধাপটি রজোগুণ-ঘ্যাঁসা—এটি হ'চ্চে সকাম প্রেম; উপরের ধাপটি সত্ত্বগুণ ঘ্যাঁসা—এটি হ'চ্চে নিষ্কাম প্রেম। নিষ্কাম প্রেম মুক্তির দ্বার-স্বরূপ। উপনিষদে আছে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" ইহার অর্থ এই যে, অন্তরতর এই যে আত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয়—সকল হইতে প্রিয়।" প্রিয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে যত কিছু প্রিয়বস্তু আছে সবই আত্মার কারণেই প্রিয়, কিন্তু আত্মা আর কোনো-বস্তুরই কারণে প্রিয় নহে—আত্মা স্বতঃই প্রিয়; আত্মা প্রেম-স্বরূপ! এরূপ যদি দেখ যে, একজনের মুখচক্ষুর ভিতরে আত্মা সাতহাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—আর-এক জনের মুখচক্ষুর মধ্য দিয়া আত্মা উঁকি দিতেছে, তবে সে-দুজনের কাহাকে তুমি সুন্দর বলিবে—কাহাকে তুমি সুবুদ্ধিমান বলিবে—কাহার সহিত তোমার প্রথম-পরিচয় হইবামাত্র তুমি বলিবে "আজ আমার শুভদিন?" জহরী যেমন জহর'কে চেনে—আত্মা তেম্নি আত্মাকে চেনে। পূর্ব্বতন কালের যোগিঋষি মহা-পুরুষেরা আত্মাকে চিনিতেন বলিয়া—প্রস্তর-পাষাণের সাতপুরু অন্ধকারাবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া তাহার মধ্যেও তাঁহারা আত্মাকে দেখিতেন, আর সেইজন্য তাঁহাদের প্রেম কোনো-কিছুরই অবরোধ মানিত না। চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে ক্রোড় পাতিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—ইহা সকলেরই জানা কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি ঃ—

(১) জীবের উৎপত্তিই প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রথম সোপান।

(২) প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক প্রেম।

(৩) নিষ্কাম প্রেম প্রতিলোম-পদ্ধতির চরম সোপান।

(৪) নিষ্কাম প্রেমের দৈবীশক্তির প্রভাবেই সত্ত্ব-গুণের অন্তর্নিগূঢ় সুবিমল স্থান এবং আনন্দের দ্বার উদ্ঘা-টিত হইয়া যায়।

(৫) নিষ্কাম প্রেমের দ্বার দিয়া যখন সত্ত্বগুণের রীতিমত অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহাই মুক্তির সোপান।

ষষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, প্রকৃতির গতি-চক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া উদ্‌গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যেহেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরা প্রকৃতিকে বিশেষ-মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে "জীবভূতা" পরা-প্রকৃতি। এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা; আর, সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সত্ত্বই পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রের ভোজ-রাজকৃত টীকায় একটি নিগূঢ়তম তত্ত্বের সন্ধান যাহা অতীব সংক্ষেপে দুইচারি কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহা এই ঃ—

"তস্য চ (অর্থাৎ ঈশ্বরস্য চ) তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ। সত্ত্বোৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদ্‌ এব। ন চানযো র্জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়ো রিতরেতরাশ্রয়ত্বং পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ।

ইহার অর্থঃ—

ঈশ্বরের সেই যে ঐশ্বর্য্য তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ; আর, অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষের গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এই যে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত।

রূপকচ্ছলে আমি যাহাকে বলিলাম জীবভূতা পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার

মহাত্মা ভোজরাজ তাঁহাকে বলিতেছেন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বরের মহিমা। তিনি বলিতেছেন "অনাদি সর্ব্বোৎকর্ষ ঈশ্বরের মহিমা." ভোজরাজ যাহাকে বলিতেছেন "অনাদি সর্ব্বোৎকর্ষ", —গীতাশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকে তাহাকেই বলা হইয়াছে নিত্যসত্ব, আর, শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত নানা পুস্তকের নানা স্থানে তাহাকেই বলা হইয়াছে শুদ্ধ সত্ব। পাতঞ্জলের টীকাকার মহাত্মা ভোজরাজ আরো বলিতেছেন এই যে, ঈশ্বরের সেই যে মহিমা—কি না শুদ্ধ সত্ব, ঈশ্বরের জ্ঞান তাহা হইতে নির্লিপ্ত। নির্লিপ্ত কেন? না ঈশ্বরের জ্ঞান যেহেতু তাঁহার স্বরূপের অন্তঃপাতী, আর তাঁহার মহিমা যেহেতু প্রকৃতির অন্তঃপাতী. সেইজন্যই উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত। কিয়ৎ পূর্ব্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে জড়পরমাণু-সকল পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়া পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, অথবা, যাহা একই কথা—পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া আকর্ষণাদি-শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে; এক্ষণে তেম্নি আমরা দেখিতেছি যে, পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্ত-মতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার মহিমা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া শক্তি-যোগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে কার্য্য করিতেছেন। আবার উপনিষদে আছে "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি—স্বে মহিম্নি" ইহার অর্থ এই যে, যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবান্‌-তিনি কিসে 'প্রতিষ্ঠিত' তবে তাহার উত্তর এই যে, তিনি তাঁহার আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের এই কথাটির সঙ্গে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পাতঞ্জল দর্শনের ঐ কথাটির তান মিলাইয়া রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে পদ্মপত্র যেমন নির্লিপ্ত ভাবে সরোবরের নীরাসনে অধিষ্ঠান করে—পরমাত্মা তেম্নিতর নির্লিপ্ত ভাবে আপনার মহিমাতে—জীবভূতা পরাপ্রকৃতির হিরণ্ময় পরম কোষে—পরম পরিশুদ্ধ সত্বগুণের অনুপম দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলে অধিষ্ঠান করিতেছেন। উপনিষদে এ কথাও বলে যে,

"তাবানস্য মহিমা ততো
জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"

ইহার অর্থ এই:—

এত যে তাঁহার মহিমা—পুরুষ-তিনি তাহা অপেক্ষাও বড়।

এই উপনিষদ্‌-বাক্যটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে লিখিত হইয়াছে

"তথাহস্য দ্বিরূপাং স্থিতি মাহ আম্নায়ঃ"

ইহার অর্থ যে, পরমেশ্বরের দুইরূপ স্থিতির কথা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে দুইরূপ স্থিতি যে, কী, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তাহা এই:—

(১) স্বরূপে স্থিতি।
(২) মহিমাতে স্থিতি।

শাস্ত্রোক্ত এই-সকল নিগূঢ় কথার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা খুব ঠিক্ বলিয়া আমার মনে লাগিতেছে তাহা সংক্ষেপে এই:—

পরমাত্মা একদিকে আপনার মহিমাতে নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আর, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার প্রভাবে—তাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতমাত্রে—কোটি কোটি জগৎ মহাব্যোমে ভ্রাম্যমান হইতেছে; আর এক-দিকে তিনি আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অনাদি অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং গভীর। একটি উপমার অবতারণা করিতেছি—তাহা দৃষ্টে বোধ করি বা উহার মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ প্রকারে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

(১) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল নিস্তরঙ্গ।

(২) সমুদ্রের উপরের তল তরঙ্গসঙ্কুল।

(৩) সমুদ্রের ঐ দুই তলের মাঝের জায়গায় আর-একটি তল আছে যাহা তরঙ্গিত প্রদেশের সমাপ্তি-স্থান এবং নিস্তরঙ্গ প্রদেশের আরম্ভ-স্থান।

(৪) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল যেমন নিস্তরঙ্গ—তাহার ঐ মাঝের তলটিও তেম্নি নিস্তরঙ্গ; অথচ সেই মাঝের তল হইতেই তরঙ্গ-সকল উত্থান করিতেছে—উত্থান করিয়া আবার সেই মাঝের তলেই বিলীন হইতেছে।

(৫) সমুদ্রের মাঝের তলটি-যে-বড় ছোটো খাটো জিনিস্ তাহা নহে। সমুদ্রের যেমন কোথাও কূলকিনারা নাই, তাহার মাঝের তলটিরও তেম্নি কোথাও কূলকিনারা নাই। অথচ সেই মাঝের তলটি সমুদ্রের একাংশ বই নহে। এই গেল উপমা। প্রকৃত কথা যাহা—তাহা এই:—

(১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এপারে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তরঙ্গ উত্থান পতন করিতেছে।

(২) ওপারে বুদ্ধিমনের অগম্য প্রদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

(৩) এপার এবং ওপারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সেই মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটিই সৃষ্টির উত্থান-স্থান, স্থিতির আশ্রয়-স্থান এবং প্রলয়ের বিরাম-স্থান। এই মধ্যস্থানটি ঈশ্বরের মহিমা। তাঁহার এই মহিমার মধ্যেই ঐশীশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। নিপুণ অশ্বারোহী যেমন অশ্বে অধিষ্ঠিত—কিন্তু অশ্বের বশীভূত নহে; অশ্বই অশ্বারোহীর বশীভূত। ঐশীশক্তিতে তেমনি ঈশ্বর নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি তাঁহার ঐশীশক্তির বশীভূত নহেন, পরন্তু তাঁহার ঐশীশক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশবর্ত্তিনী। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ মাঝের তলটি যেমন সমুদ্রের একাংশ—তেমনি ঐশীশক্তি ঈশ্বরের একাংশমাত্র; অথচ সেই ঐশীশক্তির যোগে তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সপ্তম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মার অংশ যদিচ নাই, অথচ যেমন একভাবে বলা যাইতে পারে যে, মানব-দেহের মস্তিষ্কের সারাংশই জীবাত্মার জ্ঞানাংশ, তেম্নি অখণ্ড পরমাত্মার প্রকৃত পক্ষে যদিচ অংশ নাই, তথাপি এক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বা মহিমা তাঁহার একাংশ মাত্র। গীতাশাস্ত্রে বলা হইয়াছেও তাই। তার সাক্ষী গীতাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের শ্লোক-দুটিতে বলা হইয়াছে

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবং॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

ইহার অর্থ:—

যেখানে যত কিছু ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রীমান্ এবং বলবীর্য্যবান্ সত্ত্ব আছে সমস্তই জানিও আমার তেজাংশ * হইতে সমুদ্ভূত। অথবা অত কথা কী হইবে তোমার জানিয়া অর্জ্জুন—আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

সে একাংশ যে, কি, তাহার সন্ধান সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞাপন করা হইয়াছে এইরূপ:—

"ভূমি রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়ং—ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ইহার অর্থ:—

আমার এই যে অষ্টধাভিন্না প্রকৃতি—ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, ইহা অপরা প্রকৃতি; এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকৃতি আছে যাহা জীবভূতা, তাহাই জানিও আমার পরা প্রকৃতি, সেই-পরাপ্রকৃতি যাহা সমস্ত জগত ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্লোকদুটির শেষে রহিয়াছে "আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি"; আর, অত্র-প্রদর্শিত শ্লোকদুটির শেষ রহিয়াছে "আমার জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই পরমাত্মার সেই একাংশ, যাহাতে-করিয়া তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, বাল্মীকি মুনির রামায়ণ-গান প্রথম উপক্রমে যদিচ অবরোহি-ক্রমে রামের রাজ্যচ্যুতি হইতে ক্রমশ নীচে নাবিয়া সীতাহরণের হাহাকারে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক্

* বাংলা ভাষায়—তেজাংশই ভাল।

তাহার বিপরীত। তাহা কী? না রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসনে রামের পার্শ্বে বসানো। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তেমি, সত্ত্বগুণের দৈবী শক্তিকে রজস্তমোগুণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবরাজ্যের সিংহাসনে আত্মার পার্শ্বে বসানো। ষষ্ঠ দ্রষ্টব্যের গোড়াতেই আমি তাই বলিয়াছি এবং এখানে আরেক বার বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, প্রকৃতির গতিচক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া উদ্গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যে-হেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরাপ্রকৃতিকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে "জীবভূতা পরাপ্রকৃতি।" এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা; আর, সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সত্ত্বই—পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি।

গীতাশাস্ত্রের অস্থি-সন্ধির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল নিগূঢ় কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আমি সাধ্যানুসারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু আমার সাধ্যই বা কতটুকু—আর যাহা আমি বিবৃত করিলাম তাহাই বা কতটুকু! সবই সমুদ্রে অর্ঘ্য দান! তত্ত্বানুসন্ধানে আমি যতই অগ্রসর হইতেছি ততই দেখিতেছি যে, সকলই অকূল অপার, অনির্ব্বচনীয়, এবং আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য। বহুপূর্ব্বে ঝিঁঝিঁটের সুরে আমি একটি গীত বাঁধিয়াছিলাম—এইখানে তাহার কয়েকটি ছত্র আমার মনে পড়িতেছে। সে কয়েকটি ছত্র এই :—

"উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে
অন্ত কোথায় তাঁর অন্ত কোথায় তাঁর
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
কর তাঁর নাম গান—
যতদিন রহে দেহে প্রাণ— কর তাঁর নাম গান।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পারি।
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে
কর তাঁর নাম গান—যতদিন রহে দেহে প্রাণ—
কর তাঁর নাম গান।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলন্ধর কন্যা-বিদ্যালয়

আমরা প্রতি বারেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধিবেশনে বঙ্গীয় বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে থাকি, এবারে জলন্ধর কন্যা-মহাবিদ্যালয় ও পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে আপনাদের কিছু বলতে ইচ্ছা করি। আমি এ পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়টি দেখি নাই, কিন্তু গত সালে আর্য্যসমাজের যে পাঁচটী মেয়ে সেখান থেকে আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপে ও কথাবার্ত্তায় যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছি তাই আজ আপনাদের জানাব।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমে এটী বালিকাদের দৈনিক স্কুলই ছিল; ক্রমশঃ ইহার সঙ্গে কন্যাশ্রম (বোর্ডিং), বিধবাশ্রম ও অনাথাশ্রম যুক্ত হওয়াতে বিদ্যালয়টীকে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী ক'রে তোলা হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে এখানে ৪২৫টী বালিকা ও বয়স্থা মহিলা শিক্ষা পাচ্ছেন। তার মধ্যে ১৫০টী কন্যাশ্রমে থাকে, ৫০টি বিধবাশ্রমে ও ১০০টী অনাথাশ্রমে বাস করে। অবশিষ্টগুলি দৈনিক ছাত্রী। এই মহৎ শিক্ষাকার্য্যে ১০ জন পুরুষ শিক্ষক ও ১৫ জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সকলেই সেখানকারই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, সেজন্য তাঁরা ঐ কাজ ব্রতস্বরূপ গ্রহণ ক'রে উহার উন্নতির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন

আর্য্যসমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে বা ভিক্ষা দ্বারা চাঁদা তুলে এই স্কুলটী চালাচ্ছেন। বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ বড় হওয়াতে স্কুল-কমিটি জলন্ধর সহরের এক ক্রোশ দূরে প্রায় ৫০ বিঘা জমি কিনেছেন। সেখানে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য নানা স্থান হ'তে অর্থ সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন। এ দেশ থেকেও তাঁরা প্রায় দশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গেছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ন্যায় তাঁদেরও মুখ্য বাক্য—ভগবানে নির্ভর ক'রে যে যার কর্ত্তব্য ক'রে যাও, তিনিই ফলাফলের কর্ত্তা।

* গত ডিসেম্বর মাসে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শেষ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জলন্দর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের ধর্ম্ম নীতি ও ব্রহ্মচর্য্য শিখান হয়। কন্যা-শ্রম ও বিধবাশ্রমের মেয়েরা প্রত্যহ বেদপাঠ, স্তবগান প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করতে বাধ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে শেখে। এইরূপে আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ হওয়াতে এই অল্প সময়ের মধ্যে পাঞ্জাবী নারীদের ভিতরে যে কিরূপ স্ত্রীশক্তি জেগে উঠেছে তা দেখলে বাস্তবিক আমরা আনন্দের সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ করি। এই ১৮ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-জাতির যেরূপ উন্নতি হয়েছে, বাঙ্গালা দেশে ৬০ বৎসরে তা হয় নাই।

ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কুমারী ও বিধবা কন্যারা অল্প বয়স হতেই ত্যাগে অভ্যস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বদেশের জন্যে ও স্বজাতির উন্নতির জন্যে সুখারাম বিসর্জ্জন দিতে পারেন। আর্য্যসমাজের শিক্ষিতা মহিলারাই সর্ব্ব প্রথম প্রচারিকা হয়ে মহলায় মহলায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়ে মূর্খ ও দরিদ্র নারীদের মধ্যে ধর্ম্ম নীতি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। সেই সমাজের মেয়েরাই কত কষ্ট ও অসুবিধা সহে দেশে দেশে চাঁদা সংগ্রহ করে' বেড়াচ্ছেন। কি তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা! কি তাঁদের মনের তেজ! কি তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে, বিনা আত্মবিসর্জ্জনে, বিনা ত্যাগে আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এ শক্তি কোথায় পাব?

ঐ পাঞ্জাবী মেয়েদের উদাহরণ দেখে কি আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি না যে আর্য্যসমাজের জলন্দর-মহা-বিদ্যালয়ে যে প্রথা অবলম্বন করে' স্ত্রীশিক্ষা চলছে উহাই ঠিক পথ। আমাদেরও সেই শিক্ষাপন্থা ধরে' চলা উচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে পাঞ্জাবের চেয়েও কত বেশি শিক্ষা বিস্তার হয়েছে, এ প্রদেশে শতকরা ৪ জন মেয়ে লিখতে পড়তে পারে, সে দেশে ২০০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র। আমাদের মধ্যে কত মেয়ে উপাধি পেয়েছেন, কত বালিকা সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ হয়েছেন, কতজন ডাক্তারও হয়েছেন—কিন্তু বঙ্গমহিলার সে মনের বল, হৃদয়ের উচ্চতা, প্রাণের গম্ভীরতা কোথায়? প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষকে মানুষ করা' মানুষের ভিতর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা, মানুষকে পার্থিব লাভা-লাভের উপরে তুলে দেবতার আসনে বসান। ঐ পাঞ্জাবী মহিলাগুলি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দ্বারা দেহের শক্তি ও আত্মার তেজ লাভ করেছেন, যাহা দ্বারা তাঁরা শত শত পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন, কত পথ হেঁটে পল্লীতে পল্লীতে পরিদর্শন করে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কত মিতাহারে কঠোর শয্যায় দিবারাত্রি যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, দেশের কাজের জন্য, নারী জাতির উদ্ধারের জন্য, তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা ভারতীয় জননী গঠন করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমরা বাঙ্গালীর মেয়েরা এত শিক্ষিতা হয়ে ও এত শিক্ষার সুযোগ পেয়েও আমরা পাঞ্জাবী ভগিনীদের ন্যায় মনের বল ও হৃদয়ের তেজ সঞ্চয় করতে পারছি না কেন? প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে একটা কথা বল্‌তে হলে আমরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি, রাস্তায় এক পা চল্‌তে হলে আমাদের যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়! তাঁদের সাদাসিদে পরিচ্ছদের কাছে আমাদের পোষাকটা পর্য্যন্ত যেন আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়! এই-সব দেখে স্পষ্টই বোধ হয় আমরা যে-পথ ধরে' চলেছি, ভারতীয় নারীর পক্ষে তাহা প্রকৃত আদর্শস্বরূপ ঠিক পথ নয়। এ পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা কেবল পাশ্চাত্য বা বিলাতীর অনুকরণেই হয়েছে; অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে শিক্ষা পাচ্ছেন। তার ফলে অনেক মেয়ে ড্রইংরুমে অতি সুন্দর ইংরেজী কথা কইতে ও পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারেন; অনেক মহিলা বিলাতী আদবকায়দায় অতি সুন্দর ভাবে নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারেন—কিন্তু জীবনের কঠোর ব্রতসাধনে জয়ী হতে পারবেন কয়জন? প্রকৃত আদর্শ নারীর উচ্চাসনে বসবার যোগ্য হয়েছেন কয়জন?

অবশ্য আমি ২।৪টী বঙ্গমহিলা বাদ দিচ্ছি, যাঁরা সকল বিষয়েই পারদর্শিনী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ উচ্চ-

শিক্ষিতা মেয়েদের দেখে আমাদের ইহা স্পষ্ট বোধ হয়েছে যে পাশ্চাত্য অনুকরণে শিক্ষা আমাদের ভারতীয় রমণীর পক্ষে কিছুমাত্র হিতকরী নয়। আমরা বহুকাল অশিক্ষা ও অবরোধের মধ্যে থেকে দেহের শক্তি ও মনের বল ও সাহস হারিয়েছি। আমরা যে-শিক্ষা দ্বারা সেই স্ত্রীশক্তি ফিরে পাব, যার চর্চ্চায় ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে যাবে, যে-সংযমের দ্বারা আমরা সকল অবস্থায় নিজেদের সমান ভাবে চালাতে পারব, যাতে আমাদের সংকীর্ণ মন প্রশস্ত ও উদার হয়ে সকলকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারবে—যাতে আমরা পরস্পরের দোষ ক্ষমা ও গুণ গ্রহণ করতে শিখব—সেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষাপ্রথা আমাদের মধ্যে চলিত করতে হবে।

পাঞ্জাবী মেয়েদের দেখে ইহাও স্পষ্ট বুঝা গিয়েছে যে, আমাদের এ প্রদেশের নারীর উচ্চশিক্ষা বাহিরের দিকে খুবই ভাল হয়েছে, কিন্তু আপনারা তলিয়ে দেখবেন ইহা অন্তঃসারশূন্য। এ শিক্ষা দ্বারা আমাদের মনের বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি না বেড়ে আরো কমে যাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় যতই শিক্ষার অভিমান করি না কেন, যতদিন না আমরা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী বর্জ্জন করে' ভারতীয় বা প্রাচ্য ভিত্তির উপর শিক্ষাপ্রথা স্থাপিত করব, আর্থিক শিক্ষার সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার যোগ করব, ততদিন আমাদের প্রকৃত শিক্ষা বা উন্নতি কখনই হতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ২।১ টী মেয়ের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু জাতিগত ভাবে বাঙ্গালীমেয়েরা কখনই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

উপসংহারকালে মাননীয় লর্ড বিশপের কথাগুলি উদ্ধৃত না করে' থাকতে পারছি না। গত সপ্তাহে ডায়োসিসন বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাইজ-বিতরণ-উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন—ভারতীয় নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী কখনই ঠিক হবে না। আদর্শ রমণীর উদাহরণ খুঁজবার জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে যাবার দরকার নাই। এ দেশের মহিলারা যে রকম উচ্চ ধর্ম্মের, সতীত্বের ও শাসনকার্য্যের পর্য্যন্ত আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, সে রকম জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। সেই-সব উন্নত নারীচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের অনুসরণ করে' চললেই বর্ত্তমান ভারতীয় কন্যাদের শিক্ষা যথেষ্ট ফলপ্রদ হবে।—তিনি বিদেশী হয়েও বুঝেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাচ্য মহিলাদের পক্ষে কখনই প্রকৃত উপকারী হতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা অনেক সময় ছায়াটা ধরে প্রকৃত বস্তুকে হারিয়ে ফেলি। সে কারণে প্রথম থেকেই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল যাতে পাঞ্জাবী মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করে বাঙ্গালী মেয়েদেরও তাঁদের মত শক্তিশালিনী করে গড়তে সক্ষম হয়, আমাদের সকলেরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

লাঞ্ছিতা *

রামহরি বাবু চাপকানটি পরিয়া তালি-দেওয়া জুতাটিতে পা গলাইয়া দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা সাড়ে নটা। ঊর্দ্ধশ্বাসে না ছুটিলে আর ১০টার মধ্যে আফিসে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। তাড়াতাড়ি জুতা পরিয়া ছাতাটি লইয়া ছুটিয়া বাহির হইবেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন "বলি, চল্লে কোথা? যত জ্বালাতন সব কি আমি একা ভোগ করব? তোমার কি একটু হুঁস্ নেই? এমন ঝঞ্ঝাটে কি মানুষে পড়ে? একে ত কাজ করে করে অবসর নেই, তার উপর আবার এ রকম উৎপাত হ'লে বাঁচ্‌ব কি করে?"

রামহরি বাবুর তখন কণ্ঠশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও চলে। কারণ তিনি দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ব্যাপারটা বুঝিতে গেলে আজ আর আপিসে যাওয়া হয় না। কাজেই বুক্ ঠুকিয়া ছাতা লইয়া নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য সদর দরজা খুলিলেন। দরজার সামনে পথের উপর একটি দশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। মেয়েটি এক হাতে কাপড় দিয়া রক্ত

* Jean Marat রচিত ফরাসী গল্প হইতে।

মুহূর্তে মুচ্ছিতে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। মেয়েটি রামহরি বাবুর মৃত ভ্রাতার কন্যা।

রামহরিবাবু বলিলেন "কি হয়েছে রে পুঁটি? কপাল কাট্‌ল কি করে? দেখি, ওঃ এতখানি কেটেচিস্? চ', চ', বাড়ীর ভেতর চ', পটি বেঁধে দিই গে। রক্তে কাপড়খানা ভেসে গেল যে। কাট্‌লি কিসে? এ্যাঁ?"

পুঁটি কেবল কাঁদে, কথা কয় না। রামহরিবাবু তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গামছা ভিজাইয়া মাথায় পটি বাঁধিয়া দিলেন। 'কি হয়েছে?' পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কাকিমা মেরেছে।"

পুঁটি আজ এ অভিযোগ কেন করিল জানি না। ইতিপূর্ব্বে কাকার কাছে কাকিমার নামে কোনও অভিযোগ করিয়া কখনও কিছু ফল সে পায় নাই। যে দিন কাকিমার অসাবধানতায় বিড়ালে দুধ খাইয়া যাওয়ার পর তাহার কাকিমা খানিকটা দুধ জলে মিশাইয়া রান্নাঘরের মেঝেয় ঢালিয়া দিয়া রামহরিবাবুকে শুনাইয়াছিল "এমন হতভাগা মেয়ে ত বাপু বাপের জন্মেও দেখি নি। যত হুড়োহুড়ি খেলা রান্নাঘরের ভেতর এক কড়া দুধ গেল, ছেলেপুলে সব খায় কি?" সে দিন পুঁটি কাকাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ব্যাপারটা কি। কাকা বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে উত্তরে কেবল বলিয়াছিলেন "চুপ্ কর্। চুপ্ কর্।" আবার যেদিন তাহার কাকিমা তাক হইতে পাথরবাটি পাড়িতে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও রামহরিবাবুর কাছে নালিস করিলেন "এত বড় মেয়ে, একটুও শাসন নেই। আমি ত আর পারি না। সকাল থেকে আবদার ধর্‌লে পাথর বাটি নিয়ে খেলা কর্‌ব। কত বারণ কর্‌লুম, ভেঙ্গে যাবে। ওমা, তা কি মেয়ে শোনে! না হয় নিগ্‌গে বাপু, এই বলে ত বাটিটা দিলুম। তিলেকৃকে সেই বাটিটাকে টুকরো টুক্‌রো করে ফেল্‌লে। এমন কর্‌লে কি সংসারে লক্ষ্মী থাকে?" সে দিনও পুঁটি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নির্দ্দোষিতার কথা কাকাকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কাকাবাবু তাহাতে একটিও কথা কন নাই। কেবল কাকিমা গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন "আবার মিথ্যে কথা? অতটুকু মেয়ের ভেতর এতখানি সয়তানী?"

এইরূপ অনেক দিন গিয়াছে কিন্তু আজ আবার কি প্রত্যাশায় পুঁটি এ কথা বলিল তাহা বুঝিতে পারি না। হয় ত মনে করিয়াছিল কাকিমা তাহাকে যে কাঠের বাড়ি মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাহার কাকা-বাবুর দয়া হইবে। হয় ত তাহার আঘাত দেখিয়া কাকা-বাবু বুঝিবেন যে দোষ তাহার কিছুই নাই। কি ভাবিয়া পুঁটি বলিল 'কাকিমা মেরেছে' তাহা জানি না, কিন্তু যেই সে এই কথা উচ্চারণ করিল অমনি ঝড়ের মত তাহার কাকিমা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"আমি মেরেছি। ওগো দেখে যাও একবার মেয়েটার কাণ্ড দেখে যাও। তোমার ঘড়িটার কি অবস্থা করেছে একবার দেখ।"

"এ্যাঁ? আমার ঘড়ির কি করেছে?"

রামহরিবাবু ছুটিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার একমাত্র ক্লক ঘড়িটি ব্রাকেট-সমেত দেওয়াল হইতে মেঝেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে একখানি উঁচু টুল। তাহার উপর উঠিয়া কেহ ব্র্যাকেট টানিয়াছে।

রামহরিবাবু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। পুঁটির আঘাতের কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। উচ্চ কণ্ঠে "পাজি মেয়ে, দাঁড়া আজ তোকে বাড়ী থেকে দূর করে দেবো তবে আমার অন্য কাজ।"

এই বলিয়া রামহরিবাবু দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

তখনও কাকিমার ঝঙ্কার উঠিতেছিল। প্রায় একঘণ্টা গালাগালির পর কাকিমা আহারাদি করিলেন। পুঁটিকে কেহ খাইতে ডাকিল না। মাথার বেদনায়, ক্ষুধার জ্বালায় সে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় তাহার কাকিমার উচ্চকণ্ঠ শুনিতে পাইল "বলি, পড়ে থাক্‌লে সংসার চল্‌বে কি? যা চট্ করে দোকান থেকে এক পয়সার হলুদ কিনে নিয়ে আয়। খোকা কাঁদছে, কোলে করে নিয়ে যা।"

পুঁটি গালাগালির ভয়ে পয়সা লইয়া খোকাকে

কোলে করিল। খোকা তাহার কাকিমার ছেলে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। হাতে দুগাছি ছোট সোনার বালা। গায়ে একটি ফ্লানেলের জামা।

পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া রাস্তায় বাহির হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে রোদনবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে কিছুদুর অগ্রসর হইলে একজন লোক তাহাকে বলিল "কি হয়েছে খুকী? কাঁদ্‌ছ কেন?"

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, লাল র‍্যাপার গায়ে টেড়িকাটা একজন যুবক। তাহার পায়ে বার্ণিশ-করা জুতা। কোঁচান কালাপাড় কাপড় পরা। পুঁটি কিছু বলিল না।

আগন্তুক বলিল "কাঁদ্‌ছ কেন? খিদে পেয়েছে? চল তোমায় খাবার কিনে দিই গে।"

পুঁটির সেদিন সকাল হইতে কিছুই আহার হয় নাই। ক্ষুধায় তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দুই তিনটি রাস্তা পার হইয়া একটি গলির মোড়ে পৌঁছিয়া আগন্তুক পুঁটিকে বলিল "ঐ দোকান থেকে দু আনার খাবার নিয়ে এস। খোকাকে আমার কোলে দাও। খাবার নিয়ে এখানে এনে এই রকে বসে খাও। তারপর খোকাকে নিয়ে যাবে।" পুঁটি খোকাকে আগন্তুকের কোলে দিয়া গলির ভিতর ঢুকিল। খানিকটা দূরেই একখানা বড় খাবারের দোকান।

খাবার কিনিয়া গলির মোড়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, খোকা রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। আগন্তুক নাই।

সর্ব্বনাশ! খোকার হাতের সোনার বালা? পুঁটির গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। খোকার বালা কি হইল?

পুঁটি আর দাঁড়াইতে পারিল না। রকে বসিয়া পড়িল। রকে বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পাশে খাবারের ঠোঙা পড়িয়া রহিল। তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। খোকা একখানা জিলিপি টানিয়া লইয়া কামড়াইতে লাগিল ও মুখের লালে ও জিলিপির রসে জামা ভিজাইয়া তুলিল।

শেষে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। পুঁটি তখন খোকাকে কোলে লইয়া থামাইবার চেষ্টা করিল। খোকা কিছুতেই থামিল না। ক্রমশঃই তাহার কান্না বাড়িতে লাগিল। তখন পুঁটি খোকাকে কোলে করিয়া খাবারের ঠোঙা লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী ঢুকিতে আর তাহার পা উঠে না। শেষে, কি ভাবিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে পুঁটি প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। দরজা পর্য্যন্ত তাহার পিছনে কে দৌড়াইয়া আসিল, তাহার পর সদর দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। খিল পড়িল। পুঁটি তাহা দেখিল না সে তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

তাহার কাকিমার ছেলে-মেয়েরা তখন মহা উল্লাসে খাবারগুলি খাইতেছিল।

সন্ধ্যাকালে কলিকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলের সম্মুখে মহা জনতা। চতুর্দ্দিক বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত। কত মোটর গাড়ী, কত বিচিত্র যান, সাহেব বিবিদের আনিয়া হোটেলের সম্মুখে নামাইয়া দিতেছে। রাজপথের দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচের ভিতর দিয়া হোটেলের ভিতর সজ্জিত কত কি জিনিস দেখা যাইতেছে। ভিতরে ভোজনের মহা আয়োজন। শত শত পরিচারক সুদৃশ্য কাচপাত্রে উষ্ণ খাদ্যসামগ্রী বহন করিতেছে। কত মদ্য; কত পানীয়। কতই না ভোজনের উল্লাস।

বাহিরে শীতের কন্‌কনে বাতাসে একখানি কাপড়ে কম্পান্বিত দেহখানি জড়াইয়া ক্লান্তচরণে ঘূর্ণায়মান মস্তকে পুঁটি সবিস্ময়ে হোটেলের গবাক্ষগুলির দিকে চাহিয়া ছিল। সে সমস্তদিন পথে পথে ছুটিয়াছে। পরিধানে সেই রক্ত-সিক্ত বসন। সে দূর হইতে হোটেলের মোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবিতেছিল "ঐ বুঝি স্বর্গ। ওখানে গেলে বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ থাকে না।"

"এইও! হট যাও। হট যাও।" দরোয়ান্ হাঁকিল।

পুঁটি অবসন্নপদে লোলুপ দৃষ্টিতে হোটেলের সজ্জিত কক্ষ দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা রামহরি বাবু দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার পাড়ার গোবিন্দ বাবু বলিলেন "কি রামহরি বাবু! কোথা যাচ্ছেন?"

"একবার থানায় যাচ্ছি। আমার ভাইঝিটিকে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বলেন কি? সর্ব্বনাশ! এই যে কাগজে পড়ছিলুম—"

"কি? কি?"

গোবিন্দবাবু সংবাদপত্রে একটী প্যারা দেখাইয়া দিলেন।

"সন্দেহজনক মৃত্যু। গত কল্য রাত্রি বারটার সময় জনৈক সাহেব গড়ের মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষতলে এক বালিকার মৃতদেহ দেখিতে পান। বালিকার বয়ঃক্রম দশ এগার বৎসর হইবে। পরিধেয় বসন রক্তাক্ত। দেখিলে সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূতা বলিয়া মনে হয়। পুলিস এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছে। বোধ হয় অলঙ্কারের লোভে কেহ ইহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

কষ্টিপাথর

প্রতিভা (আশ্বিন-কার্ত্তিক)।

ভাটিয়াল গান—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত—

(১)

মন পাগেলা রে, আরে হরদমে গুরুজির নাম লইও।
(ওরে লইও নামটী পরম যতনে)
ওরে দিবা নিশি লইও নাম,
কামাই নাহি দিও।
ওরে ভাই বল, বন্ধু বল, সব সম্পদের সাথী,
ওরে অসময় নিদানকালে গুরুর নাম সারথি।
ওরে টাকা বল, কড়ি রে বল, সব পুরাণ হয়ে যায়;
আমার গুরুজির নাম সদা নতুন রয়।

(২)

আমি দোষী হইয়াছি,—
দোষী হইয়াছি—আমি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গপদে
প্রাণ স'ইপাছি গো।
দোষী হইলাম ভাল হইল গো,—
তাতে ক্ষতি নাই;—
ওগো যার জন্যে হইলাম গো দোষী—
তারে যদি পাই গো।
পায়ের বন্দ পুষ্প-চন্দন গো,—
ওগো অলঙ্কার গায়,—
নেইচে গেয়ে ব্রজে গো যাব—
নিতাই বাঞ্চির নায় গো।

(৩)

ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাইরে পারাপার।
আমি যেই দিকে চাই সেই দিকে দেখি অকূল পাথার।
উন্দুধন্দু নইরাকারে, সে কথা মনে পইলে কাপর করে,
চিন্তায় জর জরে—না দেখি উপায় (গুরু বিনে)।

(৪)

দুস্‌খু কইও রে—
নিঠুরের কাছে সই দুস্‌খু কইও রে।
সই গো সই, যেই কালে পীরিতি করলাম
যমুনার ঘাটে,—
ছাড়ুম না ছাড়ুম না বইলা—
হাত দিল মাথে রে।
সই গো সই, যখন গো পীরিতি করলাম
তুমি আমি জানি।
এখন কেন সে-সব কথা
লোকের মুখে শুনি রে।
সই গো সই, বট বিরিক্ষের তলে গেলাম
ছেওয়া পাইবার আশে,
পাতা ভেইদা রৌদ্ গো লাগে
আপন করম-দোষে রে।

(৫)

পাখী তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি
আর আমায় জ্বালাইও না—আমার মাথা খাও
জ্বালাইও না—"বউ কথা কও" ব'লে গো ডাইকো না।
পাখী ডাকে সন্ধ্যাকালে,
আমি সন্ধ্যা দিতে যাই গো ভুলে;
যদি ডাক নিশি কালে
আমি কাইন্দা ভিজাই বিছানা।

(৬)

দিবা নিশি হরি বলে কে
—বান্ধবীর মায়রা
অহর্নিশি হরি বলে কে।
হরি বলে কে, গৌরাঙ্গ বলে কে,
ওরে মনের সাধে হরি বলে কে
—বান্ধবীর মায়রা।
কে শুনাইলা এই হরির নাম,
গুণের বান্ধব বলি তারে,
ওরে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কইরা
দয়াল নিতাই এইসেছে রে
—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি হরি রবে মায়া-ঘুমের ঘনে
উঠ্‌লাম জেইগে;—
হরির নামে পাষাণ গলে।
—বান্ধবীর মায়রা।
হরি হরি বইলে আমার নিতাই নাচে
বাহু তুইলে,
হরির নামে মন প্রাণ হরে
—বান্ধবীর মায়রা।

(৬)

এই না কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো—
কলঙ্ক রইল্ জলে।
ভরা না দুইফরের কালে জল ভরিবার যাই,
জলের ছায়ায় কৃষ্ণরূপ গো—(যেমুন) দেখিবারে পাই গো,
কলঙ্ক রইল জলে।
সব সখী লাল গো, নিল,
গউর্ বরণ্ সাড়ি;
শ্রীরাধার পৈরণে শোভে গো—
কৃষ্ণ নীলাম্বরী গো—
কলঙ্ক রইল্ জলে।

(৭)

আ-গো মা কালো জামাই ভাল লাগে না—
একে ত চিকন কালা, গলে দোলে বনমালা,
ওগো আমাবশ্যা রাইতে গো মা,
আমি চক্ষে তারে দেখি না।

ভারতী—(মাঘ)।

নোবেল প্রাইজ—বীরবল—

সব জিনিষেরই দুটি দিক আছে—একটি সদর আর একটি মফস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে বহু লোক যে খুসি হয়েছেন তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সকলে যে সমান খুসি হননি এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। এই বাঙ্গলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখক-সম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক, সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত: যখন একজন বাঙ্গালী লেখক এই পুরস্কার লাভ করেছেন, তখন আর-একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে তা উপড়ে ফেলতে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে। অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড় জোর তাঁর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ, তাই বলে' পড়তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে নোবেল প্রাইজ পাব না এ হতে পারে না। সাহিত্যের রাজটীকা লাভ করা যায়—কপালে। তাই বলছি আশার আকাশে দোদুল্যমান এই টাকার থলিটি চোখের সুমুখে থাকাতে লেখা জিনিষটে আমাদের কাছে অতি সুকঠিন হয়ে উঠেছে।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয়, আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে, তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চলাফেরা দূরে যাক্, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়, এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি নোবেল প্রাইজের সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি, লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে আমরা আর হালকা ভাবে কলম ধরতে পারি নে।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র সুইডিশ একাডেমির মুখ চেয়ে লিখতে বাধ্য। অথচ যে দেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত সে দেশের লোকের মন যে কি করে' পাব তাও বুঝতে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে আমাদের রচনায় অর্দ্ধেক আলো আর অর্দ্ধেক ছায়া দিতে হবে, কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে দেয়? সুইডেন যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোঁচড়া দিয়ে যেতে পারতুম; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয় ভরসা করে সাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হওয়াতে আমরা উভয়সঙ্কটে পড়েছি।

দ্বিতীয় মুস্কিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী ভাবে লেখা চলবে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তর্জমার দিকে এক নজর রেখে,—এক নজর কেন পুরো নজর রেখেই—আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য গড়তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী, আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তর্জমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখী মেরে উঠতে পারি নে। আমরা যখন বাঙ্গলা লিখি তখন ইংরেজির তর্জমা করি, কিন্তু সে না-জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি তখন বাঙ্গলার তর্জমা করি, সেও না-জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে, মুস্কিল ত ঐখানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে, আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোষাক পরিয়ে সুইডিশ একাডেমির সুমুখে উপস্থিত করতে হবে। এবং এর দরুণ মনোভাবটির চেহারাও এমনি ত'য়ের করতে হবে যে, শাড়ীতেও মানায় গাউনেও মানায়।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে, যুগপৎ, দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্যসাধন করতেই হবে। একটি বাঙ্গালী আর একটি বিলাতি—এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তা ছাড়া এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি চাইকি মানুষের হতেও পারে, কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হৃদয় শুধু একটি। স্ত্রৈণ হতে হলে একটি মাত্র স্ত্রী চাই। এমন কি, দুই দেবীকে পূজা করতে হলেও পালা করে করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্দ্ধেক সময় আমাদের বাঙ্গলা লিখতে হবে, আর অর্দ্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই সুইডেনের কথাই এল। অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।

তৃতীয় মুস্কিল এই যে, সে তর্জমার ভাষা চলতি হলে চলবে না; সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না। দেশী আত্মা এমনি ভাবে বিলাতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার পাখায় রং থাকা চাই দেশী পোকার। এক কথায় আমাদের পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে। এহেন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।

কাজেই যে কার্য্য আমরা একদিন বাঙ্গলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছি—রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ—তাই আবার দোকর করে ইংরেজিতে করতে হবে। ইউরোপে আসল জিনিষটি গ্রাহ্য হচ্ছে বলে নকল জিনিষটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা

মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে', আমরাও যে সে দেশে মেকি চালাতে পারব এমন ভরসা আমার নেই।

ফলে আমরা সাদাকে কালো, আর কালোকে সাদা যতই করি না,—আমাদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ শিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে শিকে যদি ছিঁড়ে? সেও আবার বিপদের কথা হবে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এ ক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎসংসৃষ্ট গৌরবটুকু। বাঙ্গলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাট্-টুক্। স্বদেশের শুভইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে' ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা পরিয়ে দেয়, তাহলে তার ফলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন, যে, নোবেল প্রাইজের তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়বার কিম্বা গড়বার অবসর আর আমাদের থাকবে না। এক কথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফুলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্রের রচনা করতে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে নোবেল প্রাইজ লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্য-জীবনের মোক্ষ লাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব জিনিষটে ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশসুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে "গৌরবে বহুবচন।" কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে কোন একটা নজির নেই বলে', এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অপর পক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এই কথা বেরিয়ে যায় যে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এবং ও কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলে, তার ফলে, কবিকে কেঁদে মরতে হবে।

তাই বলি আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ হচ্ছে দিল্লির লাড্ডু, যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (মাঘ)।

সত্যের দীক্ষা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ তার চারিদিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারি মধ্যে বেশ আরামে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ তার বেদনাবোধ থাকে না। যেমন যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোট খাঁচায় ঘুমলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। কিন্তু একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড় আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্বোধিত হ'লে ব'লে ওঠে—"কি হবে আমার এই চির-কালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে, এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোন ভাবনা চিন্তা নাই, এতেই সংসার চলে যাচ্চে তা জানি। কিন্তু এ আমার নয়।" সংসারের পনেরো আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হ'য়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে আছে, তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু একবার যদি কোন আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়, অমনি মনে হয় এ কী কারাগার! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোন আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড় বড় আঘাত এসে পৌঁছোয় আবরণ ভাঙবার জন্যে—এবং তাঁরা সংসারে, যাকে অভ্যস্ত আরাম ব'লে লোকে অবলম্বন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে, তাকে কারা-গার বলেই নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন—আমার পিতাকে আমি জানতে চাই; দশজনের মত ক'রে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না। সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, দশজনের মুখের কথায়, শাস্ত্রবাক্যে, আচারে বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেন। সেই তাঁর দীক্ষা গ্রহণ, সে মুক্তির দীক্ষা গ্রহণ। যে দিন পক্ষিশাবকের পাখা ওঠে সেইদিনই পক্ষিমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারিদিকে জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চান।

আমরাও তাঁদের কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা জীবনে উপলব্ধি করব; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হ'তে দিচ্ছে না, তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয়, তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হ'বে।

সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোন নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন—যাঁরা মানুষকে এই সব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনেই জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি, তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পূজো সুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্ম্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। স্বাস্থ্যলাভ করলে বিদ্যালাভ করলে মানুষের নাম যেমন বদলায় না, তেমনি ধর্ম্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্ম্মের দীক্ষা পাব, সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

যে-কোন দেশ থেকে, যে-কোন সমাজ থেকে যেই আসুক না কেন, আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ দেশান্তর দূর দূরান্তর থেকে যে-কোন ধর্ম্মবিশ্বাসকে অবলম্বন

করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোন সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোন সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সঙ্কুচিত না হয়।

আমাদের দীক্ষামন্ত্রটি ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখ। সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোন সম্প্রদায় বল্‌তে পার্‌বে না যে সে সত্যকে শেষ ক'রে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে আনন্দিত হই।

উৎসব-দেবতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কতদিন নিভৃতে এখানে তাঁর নাম শুনেচি। আজ এই জন-কোলাহলেও তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্চে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকেই চারিদিকে বেষ্টন করে উঠেছে। আজ অন্তরের অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্যামীকে বিরলে স্মরণ করবার দিন নয়—সংসার-তরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন, আজ তাঁকে দেখবার দিন। এই কোলাহলে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে রয়েছেন। কোলাহলের মর্ম্মে যেখানে নিস্তব্ধ তাঁর আসন, আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য চিত্তকে উদ্বোধিত করি।

আমাদের উৎসব-দেবতা কোলাহল নিরস্ত করেননি, তিনি মানা করেননি। তাঁর পূজা তিনি সবশেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, কারণ তাঁকে না মেনে কোন উপায় নেই। কিন্তু যিনি রাজার রাজা তাঁর কোন আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক—তাঁর কোন তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক—এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা তাঁর কাছে কোন ভয় নেই। বিশ্বের আর সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মান্‌তে হয়। কিন্তু কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোন ভয় নেই—তিনি বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও কোন ক্ষতি নেই। তিনি কি দেখ্‌ছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত? কিন্তু তাঁর শাসন নেই। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে' কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি—তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্ব-মন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে পরকালে গিয়ে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না—তারি জন্য তিনি যুগযুগান্তর ধ'রে অপেক্ষা করে রয়েছেন। যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে—এতেও তিনি ধৈর্য্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনই ক্ষতি নেই।

কিন্তু এতে কার ক্ষতি হচ্ছে? ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্য্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমানী লোকের, কোন ক্ষতি হচ্ছে না—কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। এই যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে জ্ঞান নিয়ে কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব? সেই সার্থকতার জন্যেই যে তৃষিত হ'য়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু ভয় নেই, কোথাও কোন ভয় নেই। কারণ যদি ভয়ের কারণ থাক্‌ত, তবে তিনি উদ্বোধিত করতেন। তিনি বল্‌ছেন—আমি ত জোর ক'রে চাইনে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙ্‌বে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আস্‌তে হবে, এই জন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বল্‌ব—আমার হ'ল না, আমার হৃদয় ভর্‌ল না। যে দিন সত্য ক'রে চাইব, সে দিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু এ ভুল তবে রয়েছে কেন? আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁছেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে ব'সে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত ক'রে দিচ্ছে—অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে। কোথা থেকে হঠাৎ বসন্ত সমীরণ আসে—যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব ফুটব করে ওঠে। তাই দেখ্‌ছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষবিদ্বেষ, চারিদিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ মানবের ধর্ম্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের চৈতন্য যে কেবলি জেগে জেগে উঠ্‌ছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখ্‌ছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনা গান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না? তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠ্‌ছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে—শোনো, একবার শোনো। এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা যে অনন্ত পথের পথিক—আমরা যে কত যুগ ধ'রে চলেছি। যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাই যদি না পৌঁছায় তবে কি নিয়ে আমরা থাক্‌ব? এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে? এই জন্যেই কি জন্মেছিলুম? এই যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি—এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে—তা কি আমরা দেখ্‌ছি না? কেবলি কি দেখব পদমর্য্যাদা, টাকাকড়ি, বিষয়বিভব—আর কিছুই নয়? যিনি সকল মানবের বিধাতা, একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না? পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না?

কিন্তু ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি—তবু বলা যায় না,—শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কি জানি যদি মন ফিরে যায়! তিনি যে ডাক ডাক্‌ছেন—তাঁর প্রেমের ডাক—যদি শুভক্ষণ আসে,

শুনতে পাই! সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি—এই মুহূর্তেই হয় ত তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলেনি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। আমাদের সত্য প্রার্থনা—যা চিরদিন অন্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক। অসতো মা সদ্গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যা জাল ছিন্ন ক'রে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক।

উৎসব-দিন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

আজ আমাদের উৎসবের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক্। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র—প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যে জন্যে আমরা ঘরের অন্নকে একটু দূরে নিয়ে যাবার জন্যে বনভোজনে যাই। প্রত্যহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই আজ আমরা আমাদের প্রতিদিনের অন্নকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্যে আয়োজন করেছি।

কিন্তু বনভোজনের আয়োজনে যখন খাদ্যসামগ্রী দূরে এবং একটু বড় করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তাহলে সে দিন দেখব টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত অন্নের বনভোজনের আয়োজনে হয় ত অভাব দেখতে পাব। যদি পাই তবে সেই অন্তরের অভাবকে বাইরের কি দিয়েই বা ঢাকা দেব? কিন্তু ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখীর বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে, বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অন্যমনস্কতায় সেই রসুনচৌকি ভালকরে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শান্ত করে বসি; অঞ্জলি করে হাত পাতি; তাহলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারিদিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকিনি বলেই যাঁকে দেখিনি, আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায় ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। কেননা তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের ভিতরের রস যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে; সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে ক্ষণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা। তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্বোধিত করি। ক্ষণকালের জন্যও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্যও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সত্য কোনো দিন মরবে না—সেই অমৃতবীজ চিরকালের মত আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমত করে একবার আমাদের চিত্তপ্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি তাহলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু জ্বলে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক্,এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হৌন, ধরণীর শ্যামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে, আজ চিরসুন্দর দেখা দিন। শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে, তেমনি করেই আজ সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক। যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তার ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয়, তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি।

নূতন গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

মিশ্র বিভাস—কাশ্মীরি খেমটা।

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে
ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে
খাওয়াও না!

নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গনে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন
গাওয়াও না!

বিশ্বকমল ফোটে চরণ চুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায়
উন্মনে।
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া
চাওয়াও না।

আকাশ ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরাম-হারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবন-ধারা নিত্য কেন
ধাওয়াও না।

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ;
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ,
(ওগো) তেমনি করে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ
পাওয়াও না!

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

সনাতনধর্ম্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্ম্মবিশ্বাস একেবারে গোড়াঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি ব'লে মানুষকে স্বীকার কর্‌তে হয় তা স্বীকার করা এখন অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে মন্দিরে যাওয়া অসম্ভব হয়েছে। ধর্ম্ম মানুষের জীবনের বাইরে প'ড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেই জন্য ধর্ম্মকে আঘাত দেবার আনন্দ বুদ্ধিমান্ লোকদের খুব একটা কাজ হয়েছে। অথচ ধর্ম্মকে আঘাত মাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন ক'রে? তাতে কিছু দিনের মত মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে কিন্তু তাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবী জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন, সে দিন চলে গিয়েছে। ধর্ম্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলো যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়—নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধর, আমাদের দেশে চার্ব্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিলে যে চলে না—এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ওদেশের লোকেরা মনে করছে যে ঐ-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলেই ধর্ম্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ঐ-সব ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্ম্মের সত্যতাকে তারা খুঁজছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপারে তারা যদি বিশ্বাসের মূল না পায় তবে অন্য কিছুতে এমন কি ভিত্তি পাবে? ওরা বাইরের দিক্ থেকে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেই-জন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে—যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখ্‌ছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি, তেমনি একটা অধ্যাত্ম-দৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়—তাহ'লে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্‌স্ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে mystic ব'লে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন—তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড় আশ্চর্য্য।

অতএব ধর্ম্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্ম্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। Dogmaর কোন অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—সে বড় খারাপ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোন বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোন দেশের কোন লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা কিছু কাব্য বা ধর্ম্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভাল লাগ্‌বার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্ব্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না ব'লে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্যে খৃষ্টান অত্যন্ত খৃষ্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক এক জাতি নিজের ধর্ম্মকে আয়রন-চেষ্টে শিলমোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আস্‌ছে ততই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সব রকম সাহিত্যরস সবাই নিজের ব'লে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন—ধর্ম্ম—সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না—সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্ম্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে ধর্ম্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক্।

তুমি এস, আরো কিছু দেখবার আছে—এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোন জায়গায় ঈশ্বর বদ্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে, ভাবে, কর্ম্মে, সমাজে, সকল দিকে স্বর্গ থেকে উপর থেকে ডাক আস্‌ছে—তোমরা চলে এস, তোমরা ব'সে থাকতে পারবে না। ইহলোকের মধ্যেই সেই পরে-যা-হবে তার ডাক মানুষ শুনেছে ব'লেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করেছে। যেখানে তার সঙ্কীর্ণতা সেখানে ক্রমাগতই আহ্বান আসছে—আরো কিছু আছে, আরো আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে, এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই "আরো আছে"র ডাককে অমান্য করি, তাহলে মানুষের ধর্ম্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তাহলে মানুষের মূঢ়তায় পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তা'হলে জড়তায় পতন। কালে কালে মহাপুরুষরা কি দেখান? তাঁরা দেখান যে তোমরা যাকে ধর্ম্ম ব'লে ধ'রে রয়েছ ধর্ম্ম তার মধ্যে পর্য্যাপ্ত নন্। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন্—তাঁরা বলেন, চল্‌তে হবে। কিন্তু মানুষ তাঁদেরিই আশ্রয় করে খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে যায়, আর চল্‌তে চায় না। মহাপুরুষেরা যে পর্য্যন্ত গিয়েছেন, তারো বেশি তাঁদের অনুগামীরা যাবে এই তো তাঁদের ইচ্ছা—কিন্তু তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং পথে বসলে গম্যস্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটাই আসছে। সেই বাণীই বলছে—তুমি ব'সে থেকে কিছু পাবে না। চল, আরো চল, আরো আছে, আরো আছে। মানুষের ধর্ম্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি—ধর্ম্ম আমাদের কোন সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখী যেমন আকাশে ওড়ে, এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না, তেমনি আমরা অনন্তের মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই

...তে থাকব। পাখী পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করে তার কারণ ...নয় যে সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই সেখানে পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার—অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে-ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার ষ্টার্ক্‌কে উত্তরপাড়ার নিকট ভদ্রকালী স্কুলের একটি তের বছরের ছেলে রাস্তায় বলে, "সাহেব, সেলাম, সেলাম, সেলাম"। এই জন্য তিনি তাহাকে বার বেত মারিবার হুকুম দিয়াছেন, এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিষ্টার হর্ণেল এই হুকুম বাহাল রাখিয়াছেন। ছেলেটি মিষ্টার ষ্টার্ককে ক্ষ্যাপাইবার জন্য ঐ কথা বলিয়াছিল কি না, তাঁহার কথা ছাড়া তাহার আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে সে দুরন্ত বা অশিষ্ট, এবং তাঁহাকে ক্ষ্যাপানই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলেও এই অশিষ্টতার জন্য চোর বদমায়েসের মত বার বেত মারা শাস্তিটা খুব গুরুতর হইয়াছে বলিতে হইবে; ইহাকে নিষ্ঠুরতা বলিলেও চলে। শুনিতে পাই, ইংরেজেরা স্বদেশে একটা কথা বলেন যে boys will be boys, "ছেলেরা ছেলেমানুষী, দুরন্তপনা, বাঁদরামি করিবেই," এবং সেই জন্য তাঁহারা তাহাদের এই রকমের ব্যবহার প্রশংসনীয় মনে না করিলেও অনেকটা স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বালকস্বভাব সর্ব্বত্রই এক প্রকার। এই হেতু অশিষ্টতার জন্য শাস্তি দিবার সময় এদেশে ইংরেজেরা যদি ইহা মনে রাখেন যে তাঁহাদের নিজের দেশে একটা তের বছরের ছেলে কাহাকেও "good morning, Sir, good morning, good morning" বলিলে তাহার কি শাস্তি হইত, তাহা হইলে ভাল হয়। লোকে বলে যাঁহারা বধূ অবস্থায় শাশুড়ীর দ্বারা উৎপীড়িত হন, তাঁহারাই পরে বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী হন। সেইরূপ যে ছেলে ছাত্রাবস্থায় খুব মার খাইয়াছে, সে শিক্ষাসম্পর্কীয় কাজ পাইলে হয়ত খুব প্রহার দিবার পক্ষপাতী হয়। মিঃ ষ্টার্ক ও হর্ণেলের মনস্তত্ত্বের ইতিহাস এরূপ কিনা জানি না; কিন্তু ছোট ছেলের অশিষ্টতা, দুরন্তপনা বা বাঁদরামির এইরূপ গুরুতর শাস্তি দেওয়া তাঁহাদের শিক্ষানীতির যদি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করিবার ভার দিলে ভাল হয়। কারণ, শিক্ষাদান অপেক্ষা এই কাজটি তাঁহাদের দ্বারা সুচারুতররূপে নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা। বালক ও যুবকদিগের সর্ব্ববিধ দুরন্তপনা, বাঁদরামি বা দুর্ব্বৃত্ততা দূর করিবার অন্যতম উপায়, তাহাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা পরিহার।

একটি ১৪ বছরের মেয়ের একজন "শিক্ষিত" যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। ছেলের বাবা যে পণ চায়, মেয়ের বাবা তাহার সমস্তটা যোগাড় করিতে না পারিয়া শেষে নিজের বসতবাটীটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার বিবাহের জন্য পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত ও গৃহহারা হইতেছেন, এই চিন্তা বালিকাকে ব্যাকুল করে। সে বাপমাকে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্তি দিবার জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। নিষ্ঠুর সামাজিক রীতির যূপকাষ্ঠে এই যে নিরপরাধ উন্নতমনা পিতৃমাতৃভক্ত বালিকাটি আপনাকে বলি দিল, তাহাতেও কি আমাদের চেতনা হইবে না? অনেকে এই বলিয়া অহঙ্কার করেন যে অন্য অনেক জাতির বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র, কিন্তু হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। হিন্দু বিবাহের মন্ত্র হইতে যে আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাতে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু অধুনা যেরূপ পণ লইয়া বিবাহ চলিতেছে, তাহা অতি তামসিক ও জঘন্য। ইহা একটা জাতীয় কলঙ্ক।

প্রতিকার যুবকদের হাতে। বিবাহ কি, প্রেম কি, পৌরুষ কি, তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝুন। শুনিয়াছি, বঙ্গসাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত। তবে, বাঙ্গালী অনেক যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্থপিশাচ, কাপুরুষ কেন? অনেকে বলিবেন, তাহারা কি করিবে? এটা তাদের বাপ-মায়ের দোষ। আমরা

বলি, এক দিকে যেমন ছেলের ধর্ম্মবুদ্ধির উপর হস্তক্ষেপ করা বাপমায়ের পক্ষে অকর্ত্তব্য, অপর দিকে তেমনি যুবকদেরও একমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। বাপমাও যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তাহা করা উচিত নয়। কিন্তু বিদ্রোহী হইবার পূর্ব্বে ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহার প্রেরণায় পিতা মাতা বা অন্য গুরুজনের অবাধ্য হইতে যাইতেছেন, তাহা ধর্ম্মবুদ্ধি, না প্রবৃত্তি, না খেয়াল।

যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হায়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপমাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি? বঙ্গের যুবকেরা নানা প্রকারে আপনাদের পৌরুষ, মনুষ্যত্ব, আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন। এই সামাজিক কুরীতির সহিত সংগ্রামেও তাঁহারা জয়ী হউন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

"ডেলি নিউস্ ও লীডার", নামে একখানি প্রসিদ্ধ বিলাতী দৈনিক কাগজ আছে। তাহাতে আর্চার নামক একজন লেখকের, ২০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, একটি "স্বপ্ন" মুদ্রিত হইয়াছে। স্বপ্নের সার কথাটা এই যে তখনকার রাজপ্রতিনিধি বা বড় লাট ভারতবর্ষের রাজন্য ও প্রকৃতিপুঞ্জের উপর ভারতশাসনের ভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ নৃপতির দ্বিতীয় পুত্র পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করিবার জন্য ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতেছেন। স্বপ্নে একথা লেখা নাই, যে, এই ইংলণ্ডীয় ভারতেশ্বরের নিজের এবং পুত্রকন্যাদির বিবাহ ইউরোপের লোকদের সঙ্গে হইবে, না ভারতবর্ষের লোকদের সঙ্গেও হইবে; তাঁহার ও তাঁহার বংশীয় রাজাদের সভাসদ পারিষদ প্রধানতঃ বিলাত হইতে আসিবে, না ভারতবাসীরাই হইবে; তাঁহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিলাতী না ভারতীয় হইবেন; এক কথায়, এই রাজবংশও তাঁহাদের দরবার মন্ত্রিসভাদি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইয়া যাইবেন, না প্রধানতঃ বিদেশীই থাকিবেন। এসব কথার উত্তর না পাইলে ত বুঝা যাইবে না যে এই বিলাতী স্বপ্নে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে কতটা স্বাধীন ও কতটা পরাধীন কল্পনা করা হইতেছে।

অনেকে বলিবেন, এটা যে স্বপ্ন, এটা লইয়া এত গম্ভীর ভাবে আলোচনা কর কেন? আমরা বলি, যদি এটা স্বপ্নই হয়, তাহা হইলে যেমন আমাদেরই স্বদেশীয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "বিদ্যাবিষয়ক" "ন্যায়-বিষয়ক" প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রকাশ করিয়াছিলেন' তেমনি আমাদেরই কেহ ভবিষ্যৎ ভারতের "রাষ্ট্রবিষয়ক" স্বপ্ন দেখিলে ভাল হয়। ইংরেজ আমাদের বাস্তব ইতিহাস গড়িতেছেন; আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলাও তাঁহারাই দেখিবেন, এতটা পরের বোঝা তাঁহারা নাই বহিলেন, আমাদের প্রতি এতটা দয়া নাই করিলেন। তাঁহারা ত বলেনই যে আমরা স্বপ্নদর্শকের জাতি (a race of dreamers); অতএব অন্যান্য সকল বিষয়ে যেমন আমাদের স্বপ্ন দেখার পুরুষানুক্রমিক অধিকার আছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও এই অধিকারটা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমাদের হৃদ্গত বাসনা। সত্য বটে আমাদের (political rights) রাষ্ট্রীয় অধিকার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন দেখাটা বোধ করি সে-জাতীয় অধিকার নহে।

এখন হয়ত কোন ইংরেজ বলিবেন, "তোমাদিগকে স্বপ্ন দেখিতে দিলে তোমরা অসম্ভব স্বপ্ন দেখিবে; সেটা অবৈধ।" কিন্তু সম্ভাব্যতার বা অন্য কোন রকমের বাঁধনে স্বপ্নকে বাঁধা যায় না। শ্বেতকায়, পীতকায়, কৃষ্ণকায়, প্রভৃতি সকলেরই রক্ত যেমন লাল, সকলের স্বপ্নও তেমনি পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ। "গল্প করি ত অল্প নয়;" স্বপ্নই যদি দেখিব, ত তাহাতে আবার সম্ভব অসম্ভবের বিচার কেন? উপবাসী ভিখারী যদি স্বপ্ন দেখে,

তাহা হইলে, ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘরে মাটীর গর্ত্তে লবণ-বিহীন পান্তা ভাত খাওয়ার স্বপ্ন না দেখিয়া স্বপ্নযোগে প্রাসাদে স্বর্ণপাত্রে পোলাও খাওয়াই ত তাহার পক্ষে প্রশস্ত। অতএব, ইংরেজদের কাছে এই মিনতি, আমাদের ত অনেক সুখই নাই, স্বপ্ন দেখার সুখটা যেন থাকে; এবং এই স্বপ্নে যদি সকল বিষয়ে, এমন কি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও, আমরা বহু বৎসর পরে তাঁহাদের ঠিক্ সমান বা তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়াছি, এইরূপ কল্পনা করি, তাহা হইলে আমাদের উপর তাঁহারা যেন রাগ না করেন। স্বপ্ন, স্বপ্ন বই ত আর কিছু নয়।

লর্ড ব্রাইস্ একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। তিনি আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদূত ছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে শ্বেত-অশ্বেত জাতিদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ বাড়িতেছে; অতএব অশ্বেত জাতিদের বিদেশ-যাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশে থাকাই ভাল। কেননা শ্বেত-অশ্বেতের সংস্পর্শ না ঘটিলে সংঘর্ষও নিবারিত হইবে। পরামর্শটা মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে দুটি ছোট খুঁৎ আছে। একটি এই যে অশ্বেতদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শ্বেতকায়দের উপনিবেশসমূহে চাষের ক্ষেত,খনি, কারখানা, কোথাও কাজ চলিতে পারে না; সুতরাং এই পরামর্শ অনুসারে চলা দুষ্কর। দ্বিতীয়টি এই, যে, সবাই যদি নিজের নিজের ঘরে থাকিলেই আপদ বালাই দূর হয়, তাহা হইলে কেবল অশ্বেতদের পক্ষেই বিদেশ-যাত্রা নিষিদ্ধ কেন? শ্বেতকায়েরাও নিজের নিজের দেশে থাকুন না? সেই বিধিই ন্যায়বিধি যাহা সকলের উপর সমানভাবে বর্ত্তে। যাহা একচোখো ব্যবস্থা, তাহা বিধাতার বিধানে কখনও স্থায়ী বা মঙ্গলকর হইতে পারে না। আসল কথা এই, যতদিন অশ্বেতেরা দাসের মত পশুর মত শ্বেত ঔপনিবেশিকদের জন্য খাটে, ততদিন কোন আপত্তি হয় না; কিন্তু অশ্বেতেরা সামান্য একটু মানুষের মত হইয়া শ্বেত ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে চাষ বাস ব্যবস্থা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করিতে গেলেই তাঁহাদের দারুণ ক্রোধ জন্মে।

অতীত ইতিহাসের কথার পুনরুল্লেখ করিয়া জাতীয় বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব জাগাইয়া তুলা কাহারও কর্ত্তব্য নয়। আমরাও শ্বেত-অশ্বেতের সংস্পর্শের ইতিহাসের উল্লেখ করিতেছি কেবল তুলনা করিবার জন্য। অশ্বেতকায়েরা উপনিবেশাদিতে স্থান চাহিতেছে, জীবিকা সংগ্রহ করিতে চাহিতেছে, যুদ্ধ দ্বারা নহে, বল প্রয়োগ দ্বারা নহে; তাহারা পরিশ্রম দ্বারা, অবিলাসিতা দ্বারা, মিতব্যয়িতা দ্বারা, প্রবৃত্তিনিরোধ দ্বারা, জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে চাহিতেছে। ইহাতে আপত্তি করা, ইহাতে বিঘ্ন জন্মান ধর্ম্মসঙ্গত নহে। এরূপ বাধার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবেই যাইবে। যে অধিকতর পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্, সংযমী, তাহার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। শ্বেতকায়েরা অশ্বেতদিগকে বলপ্রয়োগ দ্বারা দূরে রাখিতে চেষ্টা না করিয়া, পরিশ্রমে, বুদ্ধিতে, মিতব্যয়িতায়, সংযমে, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করুন; তবেই তাঁহাদের স্থায়ী উন্নতি হইবে। নতুবা এখন ত তাঁহারা অশ্বেতদিগের নিকট কার্য্যতঃ হা'র মানিতেছেন। কোনও জাতিই সর্ব্বগুণাকর নহে, কাহারও সভ্যতা সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ ও নিখুঁৎ নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির চরিত্র ও সভ্যতার বৈচিত্র্যের কারণ এবং উদ্দেশ্যই এই যে যাহাতে পরস্পরের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আদান প্রদানাদি দ্বারা সকলেরই উন্নতি হয়।

যে অপরকে অস্পৃশ্য মনে করে, সে নিজেই অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াও কি শ্বেতকায়দিগের চোখ খুলিবে না?

বেথুন কলেজ ও স্কুলের উন্নতিসাধনের জন্য সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার দশ জন বঙ্গমহিলার সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, ও তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিরূপ পরামর্শ হইয়াছে, কে কি মত দিয়াছেন, শেষ সিদ্ধান্তই বা কি হইল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কাগজে নানারূপ কথা বাহির হইয়াছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া কিছু লেখা দরকার। কারণ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, আরও হইবে এবং হওয়া আবশ্যক। এইজন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাবও দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেথুন কলেজ নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য

একমাত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজ। ইহার উন্নতি না হইলে, কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে, আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা না জন্মিলে, প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইবে না। এইহেতু বেথুন কলেজের উন্নতিতে কেবল কলিকাতাবাসীদের নয়, কেবল ব্রাহ্মদের নয়, কেবল দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের নয়, পরন্তু দেশবাসী সকলেরই স্বার্থ আছে।

দেশীয় বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, বেথুন কলেজের উন্নতির চেষ্টা। সুতরাং উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যে দেশবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ডিরেক্টার সাহেব কয়েক জন মহিলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যে-সকল মহিলা কষ্টস্বীকার করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য ডিরেক্টার সাহেবের পরামর্শসভায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দেশের মত জানার পক্ষে এইরূপ পরামর্শসভা যথেষ্ট নহে। কারণ, বেথুন কলেজে যাঁহাদের মেয়েরা পড়িয়াছে বা এখনও পড়ে, যাঁহারা নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, এরূপ সকল শ্রেণীর মহিলাদের মত জানা দরকার। অবশ্য যাঁহারা বা যাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা বেথুন কলেজে শিক্ষা পান নাই, তাঁহাদের মত যে অবজ্ঞেয়, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি মনে করা ভুল। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের অভিভাবকদের মতই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাস্য। হিন্দুসমাজের, ব্রাহ্ম সমাজের ও খৃষ্টীয় সমাজের মত নির্দ্ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ডিরেক্টার একটা কিছু উপায় স্থির করিলে তাহাতে দেশবাসীর আস্থা হইবে না।

শুনা যায় কোন কোন মহিলা এবং ডিরেক্টার নিজে কোন ইংরেজ মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করিবার পক্ষে। ইহাও শুনা যাইতেছে যে এই নিয়োগ অস্থায়ী ভাবে হইবে, ডিরেক্টার এইরূপ কথা দিয়াছেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া কেহ কেহ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আমরা ডিরেক্টারের অকপটতায় কোন সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও বলিতেছি তাঁহার এই অঙ্গীকারের বেশী কিছু মূল্য নাই। ডিরেক্টার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চেয়ে বড় নন। মহারাণী সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ১৮৫৮ অব্দে যে ঘোষণা করেন, তাহা মুখের কথা নয়; তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে মুদ্রিত আছে। তাঁহার পুত্র সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও পৌত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই ঘোষণা-পত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি, তাঁহাদের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা ইহাতে লিপিবদ্ধ অঙ্গীকার-সমূহ পালন করিতেছেন, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এমন অবস্থায় মিঃ হর্ণেলের মত একজন অধস্তন কর্ম্মচারী গোপনীয় মন্ত্রণাগৃহে মুখে কি বলিলেন, তাহা প্রতিপালিত হইবে, মনে করিতে হইলে শৈশবসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতার প্রয়োজন। আমাদের ধারণা, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে একবার ইংরেজ মহিলার দখল জন্মিলে তাহা কায়েমী হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা।

ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলে আমরা তাহার বিরোধী হইতাম না। কিন্তু তাহা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। শিক্ষাবিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে বাঙ্গালী মহিলা প্রিন্সিপ্যালের অধীনে কলেজে পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছে, ছাত্রীসংখ্যা বাড়িতেছে, ছাত্রীদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় নাই। শুনা যায়, একজন শিক্ষয়িত্রী এবং অপর এক কর্ম্মচারিণী নিয়মানুগত্য দেখান নাই; কিন্তু শিক্ষাবিভাগ তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় না দিয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাসের ন্যায্য কর্তৃত্বকে বলবৎ রাখিলে এই দোষ লক্ষিত হইত না, আমরা এইরূপ অবগত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলেই সত্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। আরও শুনা যায়, হিসাবে সামান্য গোলমাল হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অন্যান্য কোন কোন বড় কলেজে বহুসংখ্যক কেরাণী, ও হিসাবরক্ষক থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। তাহাতে ত কোন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অপসারিত হন নাই, বা তাঁহাদের যায়গায় ফরাসী প্রিন্সিপ্যাল রাখার কথা উঠে নাই। আর বেথুন কলেজে ১৯০২ হইতে প্রায় ৬ বৎসর একজনও কেরাণী বা হিসাবরক্ষক ছিল না,

একজন বাজার-সরকারের সাহায্যে প্রিন্সিপ্যালকেই হিসাব রাখিতে হইত। তাহার পর ১৯০৮ আগষ্ট হইতে ১৯১২র ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত একজন মাত্র ৩৫ টাকার কেরাণী ছিল, হিসাবরক্ষক ছিল না।" ১৯১২ ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ মাস এই কেরাণীটিও ছিল না, ছাত্রীনিবাসের হিসাবে-অনভিজ্ঞ একজন কেরাণীর দ্বারা হিসাব রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়াকে হিসাবে সামান্য গোলমালের জন্য কোন মতেই দোষ দেওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর ছেলে বা বাঙ্গালীর মেয়ে ঠিক্ ইংরেজদের মত বাঁকা উচ্চারণ করিয়া ইংরেজী বলিবে, বা তাহাদের গায়ে ফিকে গোলাপী রং মাখাইয়া দিলে তাহাদিগের চালচলন ও কথাবার্ত্তায় তাহাদিগকে ইংরেজ বলিয়া ভ্রম হইবে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহাকেই চূড়ান্ত আদর্শ আহাম্মকেরাই মনে করিতে পারে। হাজার হাজার ছেলে ও বহুসংখ্যক মেয়ে দেশী লোকের কাছে শিক্ষা পাইয়া নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানও বাদ পড়ে নাই। জ্ঞান লাভের জন্য ইংরেজ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী একান্তপ্রয়োজনীয় নহে। বাকী থাকে, চরিত্র-গঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ, সভ্যতা।

এ বিষয়ে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্র, সমাজ, পরিবার বা সভ্যতার কোন তুলনা করিতে অনিচ্ছুক। প্রত্যেক সভ্য জাতির চরিত্রে, পরিবারে, সমাজে, সভ্যতায় গুণের ভাগ আছে। কিন্তু উন্নতির জন্য কাহারও নিজ আশ্রয়- বা প্রতিষ্ঠা-ভূমি ছাড়িয়া অন্য আদর্শ ধরিতে যাওয়া ভুল, ধরিতে যাওয়া সর্ব্বনাশের হেতু। নিজের যাহা ভাল, তাহা ছাড়িও না; তাহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যের গুণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হও, তাহাকে নিজ অস্থি-মজ্জাগত কর; তবেই উন্নতি, তবেই মঙ্গল হইবে।

পাশ্চাত্য সমাজের নিন্দা করিবার জন্য নয়, কেবল আমাদের মতটি বুঝাইবার জন্য দুএকটি দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যুবকদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজের কতকগুলি দোষের অনুকরণ করিতে গিয়া ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরুষদের মত নারীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যসন ও কুঅভ্যাস আছে। যেমন—মাতাল হওয়াটা নিন্দনীয় হইলেও, কি নারী কি পুরুষ, উভয়ের মধ্যেই ভদ্র সমাজেও মদ্যপানটার চলন আছে। মেম সাহেবরা পর্য্যন্ত ধূমপান করাটা হাল-ফ্যাসান মনে করেন। বাঙ্গালী-সমাজে খুব নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন স্ত্রীলোক মদ খায়, হুকা টানে ও বিড়ি খায় বটে, কিন্তু ভদ্র সমাজের স্ত্রীলোকদের যে এরূপ করা অনুচিত, এ কথাটা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বলা অনাবশ্যক, বলিতে গেলে তাঁহারা জীব কাটিয়া কানে আঙুল দিবেন এবং রাগ করিবেন। এইখানেই দেখুন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের কত প্রভেদ। অনেক মেম জুয়া খেলে, শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রমহিলাদের এই ব্যসন নাই।

এগুলা গেল দোষের কথা। নির্দ্দোষ ব্যাপারেও প্রভেদ দেখাইতেছি।

বাঙ্গালীর মেয়েকে অধিকাংশ স্থলে শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেবর ননদ জা ও তাঁহাদের সন্তানাদি লইয়া ঘর করিতে হয়। ইংরেজ-সমাজে তাহা হয় না। দাম্পত্য প্রেম ও পূর্ব্বরাগের কোন কোন লক্ষণ পাশ্চাত্য সমাজে বিনা নিন্দায় সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে; আমাদের দেশে তাহা হয় না। আমাদের দেশে নারীর পক্ষে আত্মস্থ হইয়া মনের ভাব মনের মধ্যে রাখাই শিষ্টাচারের আদর্শ। ইংরেজীতে বলিতে গেলে reserve ও dignity আমাদের নারীদের চরিত্রের ভূষণ। গুরুজনের প্রতি ভক্তি বিষয়ে আমাদের দেশে যে আদর্শ আছে, তাহা অক্ষুন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পাশ্চাত্য জীবন অপেক্ষা কম জটিল ও অধিক সাদাসিদে। টাকা উড়াইবার পন্থা আমাদের দেশে আমাদের মেয়েদেরও পক্ষে দুরবলম্বনীয় নহে; কিন্তু আমাদের প্রাচ্য ছাঁচের ভদ্র পরিবারের জীবন যাপন প্রয়োজন হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যেরূপ অনাড়ম্বর ভাবে চলিতে পারে, পাশ্চাত্য প্রণালীতে ততটা সাদাসিদে ভাবে হয় না।

আমাদের মহিলাদের যে ভক্তি, নিষ্ঠা, তপশ্চর্য্যার শক্তি, যে শুচিতা, পরিবারের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা

জীবসেবায়. সমাজসেবায়, জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শের শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া আমরা মনে করিব। কিন্তু ইহার জন্যও ত ইংরেজ মেম প্রিন্সিপ্যালের প্রয়োজন নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে হয়ত কোন পার্সি মহিলা প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইবেন। ইহাতেও আপত্তি আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যেই পার্সিদের সমান উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছেন; ছাত্রীরা বাঙ্গালী; তাহাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ও তাহাদের মাতৃভাষা ও চালচলন এক রকমের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পার্সিরা বড় বেশী পরিমাণে ইংরেজভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহা আমাদের মেয়েদের অনুকরণযোগ্য ত নহেই, বরং সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য। শেষ কথা এই, ঘরপোড়া গরু যেমন সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়, আমরাও তেমনি ঢাকার ইডেন স্কুলের পার্সি শিক্ষয়িত্রীদের কথা কাগজে পড়িয়া, পার্সি নামেই ভয় পাইতেছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখানে যেন ইডেন স্কুলের ব্যাপারগুলির পুনরাবৃত্তি না হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ, সভ্যতার আদর্শ, পুরুষ অপেক্ষা নারীদের দ্বারাই বেশী রক্ষিত হইতে পারে ও হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, পুরুষদের মধ্যে বিলাতী পোষাক পূরামাত্রায় চলিতেছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তেমন চলিল না। আমাদের বিলাতী পোষাকের উপর কোন রাগ বা বিদ্বেষ নাই। কিন্তু, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া, প্রাচ্য ভাবটা রাখার পক্ষে প্রাচ্য পরিচ্ছদ সাহায্য করে, এবং বিদেশী পরিচ্ছদ না পরিলে দেশের লোক আমাদিগকে আপনার জন মনে করিয়া একটু বেশী গা-ঘেঁসা ও আত্মীয় হয়, আমাদিগকে উচ্চতর বা স্বতন্ত্র জীব, বা পর মনে করে না; জাতীয়তার পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বাহিরের খোসাটার উপর ঝোঁক দিয়া থাকি। আমাদের দেশের সাধারণ ও ভদ্রলোকদের দেশী পোষাকও যদি এক ধরণের হইত, তাহা হইলে খুব ভাল হইত।

আদর্শের পালিকা ও রক্ষয়িত্রী নারী। নারীতে ফিরিঙ্গিয়ানার ঘুণ যাহাতে না ধরে সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজ শিক্ষকদের সামাজিক দোষগুলির প্রভাবে এবং ভিন্ন ছাঁচে গড়া সভ্যতার আদর্শে আমাদের ক্ষতি হইয়াছিল। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য মেমের একান্ত আবশ্যক থাকিলে, আমরা অনিষ্টের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাতে মত দিতাম। কিন্তু যখন সেরূপ প্রয়োজন নাই, তখন আশঙ্কার মধ্যে যাই কেন? বেথুন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীনিবাস আছে; অর্থাৎ একটা গৃহস্থালী আছে। তাহা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত চলা নিশ্চয়ই উচিত; কিন্তু বাঙ্গালী ধাঁচেই তাহা হইতে পারে, এবং হওয়া চাই। ভবিষ্যতের গৃহলক্ষ্মীদের অবাঙ্গালী হওয়া উচিত নয়। বাঙ্গালীর কর্তৃত্বাধীনেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষার অধিকতর সম্ভাবনা।

বেথুন কলেজ ও স্কুল কোথায় থাকা উচিত এবং একত্র থাকা উচিত কিনা, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করিব। এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণতঃ যাঁহাদের মেয়েরা বেথুনে পড়ে তাঁহাদের সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত। ছেলেদের স্কুল কলেজ এক যায়গায় রাখিলে, ছোট ছেলে ও বড় ছেলে এক ছাত্রাবাসে রাখিলে, কোন কোন অসুবিধা এবং কুফলের আশঙ্কা আছে। মেয়েদের বেলায় সে-সব আশঙ্কা কম। অধিকন্তু ছাত্রীনিবাসের ছোট ছোট মেয়ের ভার বড় মেয়েদের উপর থাকিলে ছোটগুলির অধিকতর যত্ন হয়, বড়গুলির স্বাভাবিক স্নেহশীলতা রক্ষিত হয়, এবং বাড়ীতে থাকিয়া ছোট ভাইবোনদের জন্য ঝঞ্ঝাট সহ্য করার অভ্যাসটা লোপ পায় না। মেয়েদিগকে ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া পারিবারিক জীবনের অযোগ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াটা ত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই বিষয়টি একটু ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শুনা যায় যে মেম প্রিন্সিপ্যালকে পরামর্শ দিবার জন্য ৬জন বঙ্গমহিলাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। কলেজের জন্য অধ্যক্ষসমিতি (governing body), স্কুলের জন্য পরিচালক সমিতি (managing committee) এবং তাছাড়া কয়েকজন পরিদর্শক (visitors) আছেন। তাহাই কি যথেষ্ট নয়? আবার পরামর্শ-সমিতির প্রয়োজন কি? ইহা গঠিত হইলেও ইহার পরামর্শ বাস্তবিক লওয়া হইবে কিনা এবং

লইলেও তাহার অনুসারে কোন কাজ হইবে কিনা, বলা যায় না। কেননা, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়াকে প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে কুমিল্লার সহকারী ইন্স্পেক্‌ট্রেসের পদে স্থানান্তরিত করিবার মত গুরুতর কাজ ডিরেক্টার হঠাৎ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ-সমিতিকে একবার জিজ্ঞাসামাত্রও করেন নাই। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, শক্তিশালী ও জেদী লোক এই সমিতির সভ্য। তাঁহাদেরই যদি এই দশা, তখন কয়েকটি নিরীহ মহিলাকে লইয়া গঠিত পরামর্শসমিতির কথা কেহ শুনিবে বলিয়া ত বিশ্বাস হয় না। আর ডিরেক্টার যে কিরূপ মহিলাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাও ত বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, নানা প্রকারে মান্যগণ্য কোন কোন বাঙ্গালী-পরিবারে ছেলে-মেয়েরা হয় ইংরেজী বলে, নয় হিন্দী বলে, বাঙ্গালা বলে না। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ; তাঁরা ইংরেজীটা কেমন বলেন, সেবিষয়ে মত প্রকাশ করিতে ভয় পাই; কিন্তু হিন্দী উর্দ্দুটা তাঁদের চেয়ে আমরা অনেক ভালই শুনিয়াছি। সুতরাং বলিতে পারি যে তাঁদের হিন্দী শুনিলে খাস্ হিন্দুস্থানের লোকেরা তারিফ করিবে না। যাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে নিজ নিজ পরিবারে এবম্বিধ ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বালিকা-শিক্ষালয়ের পরামর্শদাত্রী মনোনীত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয় কিনা, ভাবিবার বিষয়।

গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুসারেই তাঁহার যোগ্যতার বিচার করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়ার উপর অবিচার করা হইয়াছে। কলেজের উন্নতি কি করিলে হয় তাহা যে তিনি বুঝেন না, তাহা ত নয়। তিনি ১৯১২ সালে ১৯০৭ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, এবং যাহা গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কলেজকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে এবং উদ্ভিদবিদ্যায় বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিতে অনুরোধ করেন; একজন গণিতের অধ্যাপক চান; ইণ্টারমীডিয়েট পর্য্যন্ত ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন; ছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরীতে পড়িবার যায়গা করিয়া দিয়া অধ্যাপকদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রামাগার করার প্রস্তাব করেন; একজন লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করিতে বলেন; কেরাণীদের সংখ্যা বাড়াইতে বলেন; মেয়েদের ব্যায়াম ও ক্রীড়ার জন্য আরো যায়গার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন; কলেজে স্থানাভাবের কথা বলেন; ছাত্রীনিবাসের আয়তন বাড়াইতে বলেন; এবং অধ্যাপিকারা ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইলে কলেজটি যে ক্রমে সাশ্রম শিক্ষাগারে (residential institutionএ) পরিণত হইতে পারিবে, এইরূপ মত প্রকাশ করেন। কলেজটির উন্নতি করিতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাঁহার সময়ে না করিয়া তাঁহাকে এবং প্রকারান্তরে সমুদয় বাঙ্গালী মহিলাকে অযোগ্য বলা, এবং মেম প্রিন্সিপ্যাল আনিয়া ও উন্নতির সমুদয় আয়োজন করিয়া দিয়া ইংরেজ মহিলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা, কখনও সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে না। তাঁহাকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সমুদয় উন্নতির ব্যবস্থা করিবার মত অর্থ দিয়া, তাঁহার ন্যায়সঙ্গত প্রত্যেক আদেশের পশ্চাতে শিক্ষাবিভাগ আছেন, ইহা বুঝিতে দিয়া, তাঁহাকে শিক্ষালয়টির উন্নতি করিবার অধিকতর সুযোগ যদি দেওয়া হইত, তবেই সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইত।

আমাদের শেষ কথা এই:—যাহারা সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্ব্বর তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার জন্য ভিন্নদেশীয় ও সভ্য মানুষের শিক্ষকত্ব ও নেতৃত্ব যতটা দরকার, আমাদের জন্য সেরূপ প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেই আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে মানুষ করিব, বাহিরের সাহায্য যতটুকু দরকার, তাহা আমরাই প্রয়োজন-মত সংগ্রহ করিয়া লইব। আমাদের মঙ্গলের দিকে আমাদেরই ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহা লাভের জন্য ছেলেমেয়েদিগকে গড়িবার যে গুরুতর দায়িত্ব তাহা অপরকে দিতে পারি না, সে উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চাই না। যার দরদ বেশী সেই ত ঠিক্-মত গড়িতে পারে।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে এই তৃতীয় বার লণ্ডনের রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশন নিজ আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই অসাধারণ সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি ও গৌরব বোধ করিতেছি। উক্ত বিজ্ঞানমন্দির ফ্যারাডে প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তার বক্তৃতাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বসু মহাশয় অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, সম্ভবতঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও, এবং ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

জ্ঞানভিক্ষু হইয়া জগতের সর্ব্বত্র যাহারই দ্বারে যাইতে হউক না কেন, তাহাতে অপমান বোধ করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা চিরকাল সর্ব্বত্র জ্ঞানভিক্ষুই থাকিব, জ্ঞান-দাতা হইব না, ইহা কখন সম্মানকর হইতে পারে না, এবং ইহাতে প্রকৃত শক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। সত্য বটে পুরাকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক জাতি ভারতবাসীর নিকট বিদ্যার্থী হইতেন। কিন্তু নিঃস্ব জমিদারতনয়ের পূর্ব্বপুরুষের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিলে যেমন পেট ভরে না, তেমনি আমাদেরও পুরাকালের জ্ঞান-গৌরব ঘোষণা করিলে আমাদের বর্ত্তমান অজ্ঞানতিমির দূরীভূত হয় না। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখন তুমি কি হইতেছ, কি করিতেছ, কি রত্ন সংগ্রহ ও বিতরণ করিতেছ? ইহার উত্তর আমরা অল্প অল্প করিয়া দিতে পারিতেছি, ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু শুধু আনন্দ করিলে ত চলিবে না। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণও করিতে হইবে।

আনন্দের সঙ্গে দুঃখের কথাও আছে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বসু মহাশয়কে তাঁহার আবিষ্কৃত বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন নাই। বোধ হয় তাঁহারা ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ইহাকেই বলে, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের জন্য কয়েক জন অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইলেন, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের উচ্চতম অঙ্গে ভারতে কেহ যাঁহার কাছ ঘেঁসিতেও পারেন নাই, সেই আচার্য্য বসু মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানা চিঠি দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল কি? ইহার একটা পরিষ্কার উত্তর পাওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্য বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত সী, ভী, রামন্, এম-এ., শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ, ডি, এস্-সী; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, (কলিকাতা), পী, এইচ-ডী, (বার্লিন); এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু, এম্, এ, (কলিকাতা), বী, এস্-সী, (লণ্ডন), অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেই হয়।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

আচার্য্য রায় মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামন্ গবর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন; তাহাতে তাঁহার বেতন ক্রমে দু হাজার টাকার উপর হইতে পারিত। কিন্তু অর্থের আকর্ষণ অপেক্ষা বিজ্ঞানানুশীলনের আকর্ষণ তাঁহার পক্ষে প্রবলতর হওয়ায় তিনি অধ্যাপকতা গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি তারের কম্পন, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ কাশীর কুইন্স কলেজের অধ্যাপক; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ, ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্ সী, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কেম্ব্রিজে গণিতবিদ্যায় উচ্চ সম্মান লাভ করেন, এবং পরে জার্ম্মেনীতে জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতাধ্যাপক ক্লাইনের (Klein) নিকট উচ্চতম গণিত শিক্ষা করেন। তিনি উচ্চগণিত বিষয়ে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন, এবং তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন, এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া বার্লিন বিশ্ব-

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু।

বিদ্যালয়ে পী এইচ-ডী, উপাধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বী, এস্-সী পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পান, তৎপরে গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত গবেষণাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কেম্ব্রিজ গিয়া তত্রত্য বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে অধ্যাপক সার্ জে, জে, টমসনের অধীনে গবেষণা করেন, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বী, এস্-সী, পরীক্ষায় সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বৎসর কেবল আর একজন ছাত্র ঐ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী নর্ম্মীবাঈ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। প্রায় দুই কোটি লোকের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গবাদি পশুর খাদ্যও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মানুষ ও পশুর সাহায্য যথাসাধ্য করিতেছেন। গত ৩১ শে জানুয়ারী নব্বই হাজারেরও উপর লোক নানা ভাবে সরকারী সাহায্য পাইতেছিল। তাহার পর তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকারে মানুষের প্রাণ রক্ষার মাত্র ব্যবস্থা করেন;

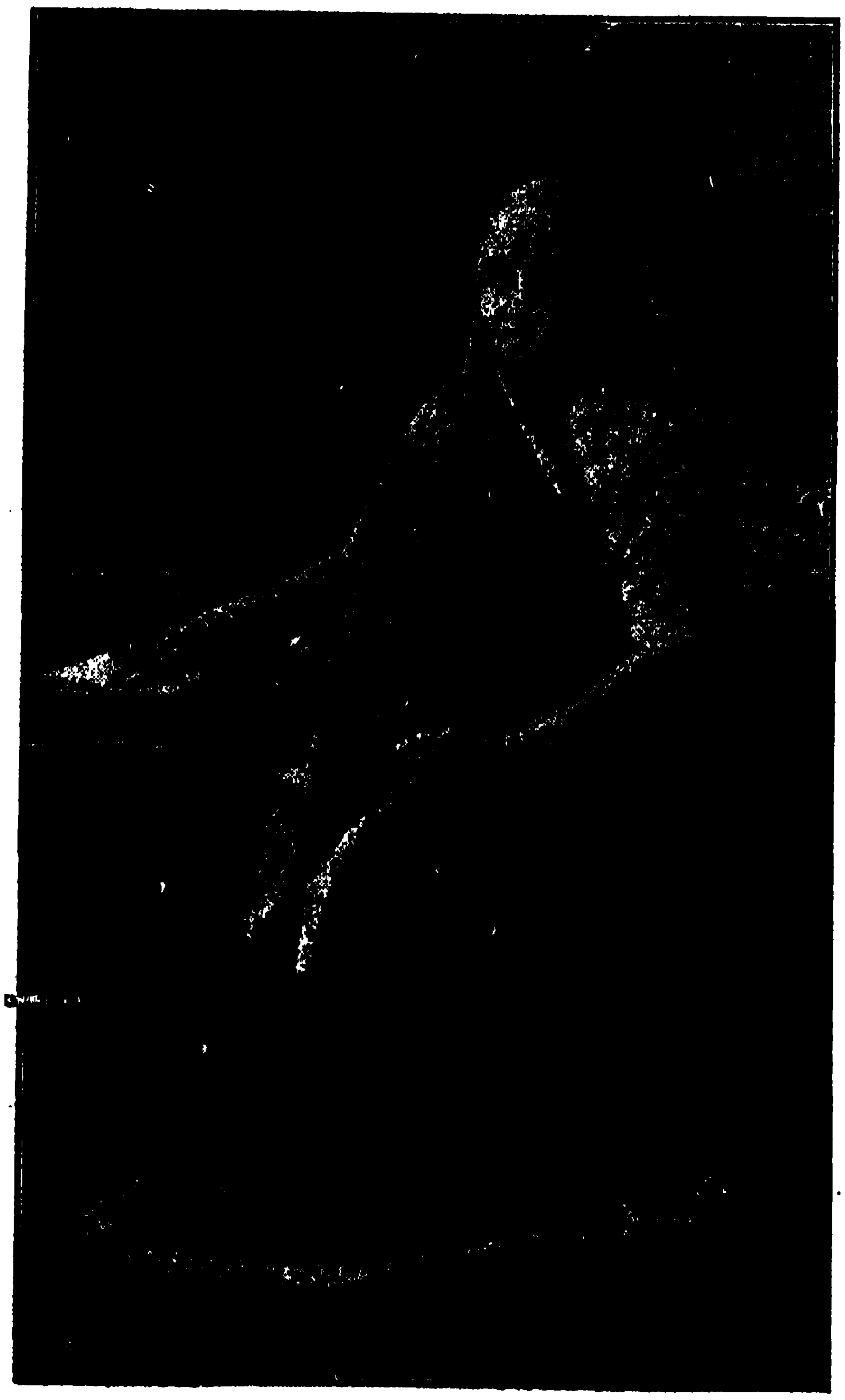

শ্রীমতী যমুনাবাঈ সকাই।

তাহাও আবার পর্দ্দানশীন ভদ্রলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে করিতে পারেন না। অতএব আমাদের এ সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বাঁদা জেলায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কয়েক শত টাকা দিয়া পাঠাইয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গত দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একদল উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে এই প্রকার কাজ নিষ্ঠার সহিত সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই জীবসেবা কার্য্য সকল ধর্ম্মের অনুমোদিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। যিনি যাহা পারেন, সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়কে কলিকাতার ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

১৯১১ ১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে শ্রীমতী যমুনা বাঈ সকাই, অধ্যাপক গজ্জরের ভগিনী শ্রীমতী ননীবাঈ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, পানাহারনিদ্রা সম্বন্ধে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও নারীহৃদয় নিশ্চয়ই কাঁদিবে। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত না থাকায় তাঁহারা সর্ব্বত্র অবাধে গিয়া সৎকার্য্য করিতে পারেন। উত্তরভারতে বোম্বাইবাসিনীদের মত কাজ করিবার জন্য কোন মহিলারই সাহায্য কি পাওয়া যাইতে পারে না?

চিত্রপরিচয়

শেষ বোঝা।

চিত্রকর শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রখানিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা আমাদের অনুরোধে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"চলিয়াছি, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে; আসিতেছি, কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে।

"চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবনবন্ধ, জানু নত হইতেছে তোমার আসার পথে বার বার; আকাশ তোমার নেশায় রাঙিয়া উঠিতেছে দিনের পর দিন; দুই আঁখি তোমার আসার পথে চাহিয়া ঘুরিতেছে কতনা বিরহে যুগ যুগান্তে।"

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

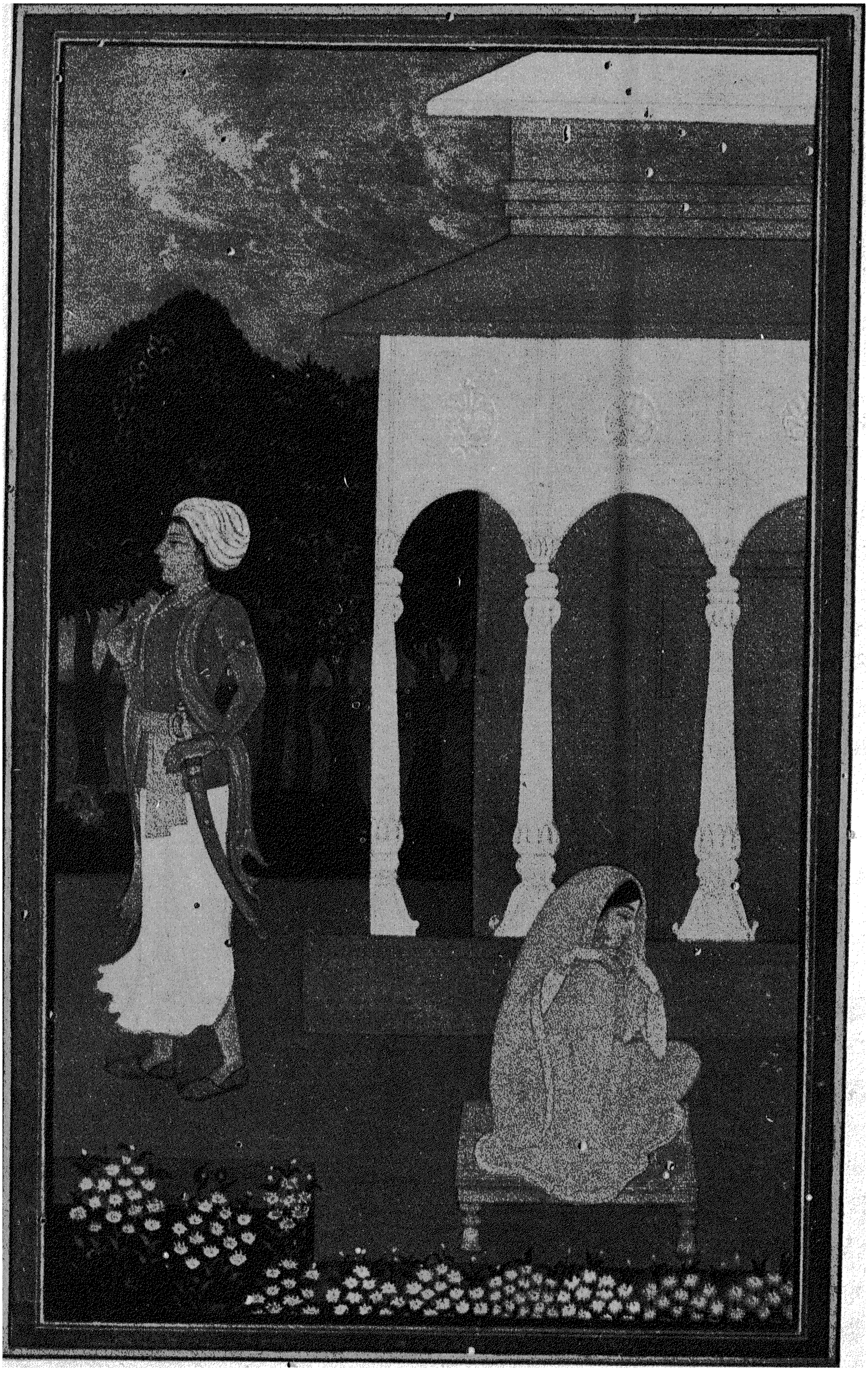

হিরণ্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায় গ্রহণ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয়ের একটি দৃশ্য)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কবি বলিয়াছেন—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?" যে-সকল জাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহারাই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে যে মানবের পক্ষে সকল বিষয়ে উন্নতির কত প্রয়োজন। একটা শহরে যদি একটা পাড়াও অপরিষ্কার এবং রোগবীজের আকর স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেমন সে শহরের অন্য সমস্ত পাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেও, তথায় সংক্রামক রোগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে; একটা শহরে যদি একটা পাড়াতেও দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষ নারী বাস করে, তাহা হইলে যেমন উহার অন্যান্য পাড়াতে সচ্চরিত্র লোকেরা থাকিলেও, তথায় চরিত্রস্খলনের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকে; যেমন কোন পরিবারের লোক কেবল নিজের ছেলেদের নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না; তেমনই পৃথিবীতে একটি জাতিও যতদিন অনুন্নত থাকিতেছে, ততদিন সমগ্র মানবজাতির স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে, এরূপ মনে করা যায় না।

ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কেবল বাঙ্গালী বা মরাঠা বা গুজরাটীর উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে না। সকল প্রদেশের লোকের উন্নতি চাই। কেবল হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ানের উন্নতিতে দেশ উন্নত হইবে না, সাঁওতাল, কোল, ভীল, এবং তাহাদের চেয়েও অনুন্নত যে-সকল জাতি আছে, তাহাদেরও উন্নতির প্রয়োজন। যে-সকল জাতির চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্ম্ম করাই কৌলিক ব্যবসা, তাহাদেরও সংশোধন এবং উন্নতি আবশ্যক। হিন্দুর উন্নতি বলিলে কেবল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির উন্নতি বুঝিলে চলিবে না। যাহাদিগকে "অস্পৃশ্য" মনে করা হয়, যাহাদিগের জল "আচরণীয়" জ্ঞান করা হয় না, তাহাদেরও উন্নতির প্রয়োজন। একটা দড়ির একটা যায়গাও যদি কম শক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মজবুত বলা যায় না।

ভারতবর্ষের কোন জাতি বা কোন প্রদেশের লোক শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবে, অপরেরা তাহাদের নিম্নস্থানীয় হইয়া থাকিবে, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। কিন্তু যিনি যে জাতির বা যে প্রদেশের লোক, সেই জাতি বা সেই প্রদেশ অপরের নীচে পড়িয়া থাকিলে, তাহাতেও তাঁহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

বঙ্গদেশ সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে এবং অন্য কোন কোন বিষয়ে ভারতের অন্য প্রদেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর। অন্য প্রদেশগুলি এই-সকল বিষয়ে আমাদের মত উন্নতি করুন। আমরাও, অল্প যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া চলি। কিন্তু সকল প্রকার সাহিত্যিক ব্যাপারেই আমরা অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের সমকক্ষও নহি। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা যেরূপ বিস্তৃত হিন্দী অভিধান প্রকাশ করিতেছেন, বাঙ্গলা সেরূপ কোন অভিধান

প্রস্তত করিবার সমবেত চেষ্টা বঙ্গে হইতেছে না। বড়োদায় বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাল ভাল বহি অনুবাদ করাইবার যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, বঙ্গে সেরূপ কিছু নাই। বোম্বাইয়ের একখানি মাসিকপত্রের বিশেষ সংখ্যা বার হাজার পর্য্যন্ত ছাপা হয়। বঙ্গের কোনও শ্রেষ্ঠ মাসিক ছয় হাজারের বেশী ছাপা হয় না। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলকের "কেশরীর" মত কাট্‌তি বাঙ্গালা কোন সাপ্তাহিকের হয় নাই। বড়োদায় যেরূপ পাঠের ও পুস্তক ধার দিবার সুবন্দোবস্ত সম্বলিত সেণ্ট্র্যাল (অর্থাৎ কেন্দ্রীয়) লাইব্রেরী আছে, এবং নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিনা ব্যয়ে পাঠসৌকর্য্যার্থ ফ্রী লাইব্রেরী আছে, বঙ্গে সেরূপ নাই। বোম্বাইয়ের সামাজিক সেবা সমিতি (Social Service League) যেমন জঙ্গম লাইব্রেরী (Travelling Library) স্থাপন করিয়া দরিদ্র লোকদিগকে জ্ঞানালোক দিতেছেন, বঙ্গে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। নাগরীতে ছোট বড়, মোটা সরু, সিধা বাঁকা, নানা ছাঁদের যত প্রকারের ছাপিবার অক্ষর আছে, বাঙ্গলা সেরূপ হরফ নাই।

আমরা অনেক বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সুতার ও কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত। এই সকল কলের অনেকগুলি দেশী লোকের। বাঙ্গালা দেশ পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু একটিও পাটের কল বাঙ্গালীর নহে। সাক্‌চীতে তাঁতার লৌহইস্পাতের বিশাল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সাক্‌চী প্রাকৃতিক দেশবিভাগ অনুসারে বঙ্গের অন্তর্গত। ইহার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে যে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যাইবে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববেত্তা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু। কিন্তু কারখানা স্থাপিত হইল বোম্বাইবাসী পার্সি জামষেদজী নসেরবাঞ্জী তাতার উদ্যোগে।

বাণিজ্যশিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হইয়াছে বোম্বাইয়ে, বঙ্গে হয় নাই। বোম্বাইয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য যেরূপ ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেক্নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট আছে, বঙ্গে সেরূপ কোন শিক্ষালয় নাই

শিক্ষাবিস্তারের জন্য ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত বঙ্গের বাহিরে যেরূপ দেখা যাইতেছে, বঙ্গে সেরূপ দেখা যাইতেছে না। পুণার ফার্গসন কলেজে পূর্ব্বে বাল গঙ্গাধর টিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, প্রভৃতি মনীষিগণ, অধ্যাপকগণ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন ৭৫৲ টাকা, ২০ বৎসর কাজ করিবার পর মাসিক ৪০৲ পেন্সান এবং মৃত্যুর পর অধ্যাপকের পরিবার জীবনবীমা হইতে ৩০০০৲ টাকা পাইবেন, এই বন্দোবস্তে কাজ করিয়াছেন। এখন, বোধ হয় খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায়, অধ্যাপকদের বেতন মাসিক ১০০৲ হইয়াছে। সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই বেতনে কাজ করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের একটি কলেজও কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট এইরূপ ত্যাগী অধ্যাপকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না।

সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আদর্শ অনুসারে চলিবার শক্তি চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। হরিদ্বারে আর্য্যসমাজীদের যে গুরুকুল বিদ্যালয় আছে, তাহা হইতে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া কোন সরকারী চাকরী পাওয়া যায় না, উকীল বা ডাক্তার হওয়া যায় না। বালকগণকে ৭ বৎসর বয়সে তথায় প্রবেশ করিয়া ১৬ বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যার্থীরা বাড়ী আসিতে পারে না। এরূপ বিদ্যালয়ে দুইশত ছাত্র পড়িতেছে! এই বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী ভাল কিনা, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে; কিন্তু যে প্রদেশের লোকে সাংসারিক অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া এরূপ বিদ্যালয়ে এত ছেলে পাঠাইতে পারে, তাহাদের আত্মিক শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না। যেখানে পড়িলে সাংসারিক কোন প্রকার সুবিধা হয় না, এবম্বিধ উক্তরূপ কোনও বিদ্যালয় বাঙ্গালা দেশে আছে কি?

গত ডিসেম্বর মাসে করাচীতে ভারতীয় নানাজাতির এবং আগ্রায় মুসলমানদের নানা সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার একটিতেও বাঙ্গালী সভাপতি ছিলেন না। ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা? না ইহার কোনও গূঢ় কারণ আছে? যদি কোনও কারণ থাকে, তাহা হইলে উহা দুই প্রকারের হইতে পারে

এক এই হইতে পারে যে বাঙ্গালী দেশহিতকর কোন প্রকার প্রচেষ্টারই আর অগ্রণীশ্রেণীভুক্ত নহেন। দ্বিতীয় এই হইতে পারে যে আমরা কোন কোন বা সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সমকক্ষ হইলেও, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পারেন না বলিয়া কোনও সভা-সমিতিরই নেতৃত্বে আমাদিগকে বরণ করিতে চান না। দুটি কারণের কোনও একটি সত্য হইলে, বা উভয়ই অংশতঃ সত্য হইলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা যদি বাস্তবিক অযোগ্য হইয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আর কি ঘুমান উচিত? আমরা যদি যোগ্য হইয়াও, অহঙ্কারের জন্য, অপরকে অপজ্ঞা করার জন্য, তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন বা বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকি, তাহাও কি সাতিশয় পরিতাপের বিষয় নহে? "অন্যেরা আমাদের হিংসা করে", বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে পরিবারে সৌভ্রাত্র থাকে, তথায় সকল ভাই সমান গুণী না হইলেও ত কেহ পরস্পরের হিংসা করে না। আমরা বাস্তবিকই যদি শ্রেষ্ঠ হই, তাহা হইলে আমাদের সপ্রেম, বিনীত, শিষ্ট ব্যবহারে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকা চাই। বাস্তবিক যাঁহার মনটা বড়, হৃদয়টা উদার, তিনি কাহাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন না।

কিন্তু আমরা যে বাস্তবিকই সব বিষয়ে ভারতের সেরা, তার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের পক্ষে মোটের উপর হিতকর কি না, তাহার বিচার এখন করিব না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে শিক্ষাদানের এই দুই আয়োজন সব প্রদেশের জন্য হইতেছে এবং সকল প্রদেশের লোকই ইহাতে টাকা দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর বা বাঙ্গালী মুসলমানের নেতৃত্ব ইহাতে নাই। বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশ্যনে যদি যান, সেখানে ভারতের রাজনৈতিক যে-কোন বিষয় অনুশীলন করিতে চান, তথায় তাহার উপযোগী যথেষ্ট উপকরণ পাইবেন। আমাদের কলিকাতার ভারত-সভার লাইব্রেরী দেখিলে যুগপৎ হাসি পাইবে এবং কাঁদিতেও ইচ্ছা হইবে। গত বৎসর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যখন সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়বিবরণ সভ্যগণের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয়, তখন শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে অনুপস্থিত থাকায় ভারতগবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব সার্ গাই ফ্লীটউড উইলসন্ বলিয়াছিলেন যে সেবারকার তর্ক-বিতর্ক "রামবিহীন রামায়ণের" (the play of Hamlet without Hamlet) মত হইবে। রাজস্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানে ব্যবস্থাপকসভার কোন বাঙ্গালী সভ্য গোখলের সমান যোগ্যতা লাভ করা দূরে থাক্, তাঁহার নিকটেও পৌঁছিয়াছেন কি? গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগে বাঙ্গালী অনেক দিন হইতে প্রশংসার সহিত উচ্চপদে কাজ করিতেছেন। গণিতে বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব খেলে। সুতরাং এ বিষয়ে বাঙ্গালীর যে কোন স্বাভাবিক শক্তিহীনতা আছে, তাহা নয়। কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই, রাজস্ব ও অর্থনীতি বিষয়ে দাদাভাই নৌরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রাণড়ে, জি. ভি. জোশী, দীনশা এদুলজি বাচা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুব্রহ্মণ্য আইয়ার, প্রভৃতির মত যোগ্য বাঙ্গালী কেহ নাই। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম এই দলের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। এই কারণে রাজস্ব ও অর্থনীতিঘটিত কোন বিষয় সম্বন্ধে বাঙ্গালীর লেখা খুব উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাঙ্গালা দেশের ইংরেজী বা বাঙ্গালা খবরের কাগজগুলিতে বাহির হয় না। এতৎসদৃশ কারণে পুরাতন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত বাঙ্গালীর পরিচালিত কোন ব্যাঙ্কও নাই।

মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নয় বৎসর পূর্ব্বে যে "ভারতভৃত্য সমিতি" (Servants of India Society) স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমতুল্য বঙ্গদেশে কিছু আছে কি? ইহার সভ্যগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত শক্তি ও সময় ভারতের রাষ্ট্রীয়, শিক্ষাবিষয়ক এবং বৈষয়িক উন্নতির জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। গোখলে এই সমিতির প্রথম সভ্য। বাঙ্গলা দেশের কেবল একটি যুবক এই সমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

কংগ্রেসের সেক্রেটরীদ্বয় বহু বৎসর ধরিয়া বোম্বাই হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন, গত ডিসেম্বরে মান্দ্রাজ হইতে

হইয়াছেন। শিল্পোন্নতি সমিতির (Industrial Conference) সম্পাদক প্রথম হইতেই অমরাবতীর রাও বাহাদুর মুধোলকর মহাশয় আছেন। ভারতীয় সমাজসংস্কার সমিতির (Indian National Social Conference) নেতা আগে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণড়ে, এখন হইয়াছেন সার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর। উভয়েই বোম্বাইয়ের লোক। জাতীয় জীবনকে নানা দিকে অগ্রসর করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যে-সকল ব্যক্তির নাম করিলাম, তাঁহারা কেহই অযোগ্য নহেন। কিন্তু আমরা কেবল ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বাঙ্গালী কোন দিকেই মাথা উঁচু করিতেছে না, ইহার কারণ কি? অনুন্নত শ্রেণীর (Depressed Classes) লোক-দিগকে শিক্ষা ও অন্যান্য উপায় দ্বারা উন্নত করিবার চেষ্টায় বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে এবং পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লাজপৎরায়ের নাম যেরূপ শুনা যায়, কোন বাঙ্গালী তত বড় কাজ করিতেছেন বলিয়া শুনা যায় কি? পুণায় অধ্যাপক দ্বারকানাথ কাশীনাথ কার্বে কুড়ি বৎসর ধরিয়া হিন্দুবিধবাশ্রমে বিধবাদিগকে শিক্ষাদানপূর্ব্বক স্বাবলম্বিনী ও দেশসেবাসমর্থা করিতে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার সমতুল্য কোন কাজ বাঙ্গলাদেশে হই-তেছে কি? ঐ শহরেই উক্ত মহাত্মা মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত "নিষ্কামকর্ম্মমঠ" নামক ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদিগের আশ্রম দ্বারা উহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। উহার মত কোন কাজ বাঙ্গলা দেশে হইতেছে কি? পঞ্জাবের জালন্দরে কন্যামহাবিদ্যালয়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগ বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া বালিকাদের শিক্ষাদান এবং তদ্দ্বারা শিক্ষয়িত্রীর অভাবপূরণ যে ভাবে হইতেছে, বাঙ্গলা দেশে কোনও বিদ্যালয়ে তেমন কাজ হইতেছে না। বোম্বাই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সেবা করিবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করেন। বঙ্গে এরূপ কাজ কোন মহিলা এ পর্য্যন্ত করেন নাই।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে, বা থিয়সফিক্যাল সভায় অন্য প্রদেশের লোকদের যেরূপ নেতৃত্ব আছে, বাঙ্গালীর সেরূপ নেতৃত্ব দেখা যায় না। অন্যান্য কোন কোন প্রদেশে হিন্দুসভা আছে; বঙ্গদেশে কিন্তু ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা আদি থাকিলেও সমুদয় হিন্দুর সম্মিলিত কোন সভা নাই।

ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিস্, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিস্, রাজস্ব-বিভাগের এন্‌রোল্‌ড্‌ লিষ্ট (Enrolled List) প্রভৃতির পরীক্ষায় ভারতবাসীদের মধ্যে যে কেবল বাঙ্গালীই উত্তীর্ণ হন, বা বাঙ্গালীই উচ্চ স্থান অধিকার করেন, তাহা আর বলিবার যো নাই। কেম্ব্রিজে কোন বাঙ্গালী সীনিয়র র‍্যাংলার হয় নাই, অন্যান্য প্রদেশের দুই জন হইয়াছে।

বঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকেরা অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের চেয়ে ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী মাসিক ত্রৈমাসিক পত্রাদি কম পড়েন (আমরা পরীক্ষার পুস্তকের কথা বলিতেছি না), ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি "গৃহস্থ" পত্রেও এই কথা লেখা হইয়াছে। অপর অনেকেরও অভিজ্ঞতা এইরূপ। তাহা হইলে বাঙ্গালীর জ্ঞানপিপাসা কি কম হইয়া গিয়াছে? কারণ শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-কার্য্যে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের ন্যায় বাঙ্গালীরও খ্যাতি আছে; কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালী যে শীর্ষস্থানীয় তাহা বলা যায় না। কারণ বঙ্গের বাহিরে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভাউ দাজী, ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী, প্রভৃতির নাম করা যায়।

ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কণে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্বীকার্য্য; কিন্তু গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রের মত প্রস্তর-মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা বঙ্গে একজনও হন নাই।

জাতীয় জীবনে যতদিকে মানুষের প্রতিভার ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া, যে যে দিকে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ নহে, তাহার প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালী সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠস্থানীয় নহে। যে-সকল বিষয়ে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তাহাতে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে কম নহি। কিন্তু কূপমণ্ডূকতায় অহঙ্কারে,

বিলাসে, ফ্যাশনে, হুজুকে, কলুষিত থিয়েটার প্রভৃতির আমোদে লঘুচিত্ত হওয়ায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষায়, নারীকে অবরুদ্ধ ও অশিক্ষিত রাখিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য রাখায়, বরপণাদি কুপ্রথা দ্বারা নারীর অপমান করায়, ইত্যাদি নানা কারণে বাঙ্গালী বড় হইতে পারিতেছে না। ইহার উপর ম্যালেরিয়া রূপ সর্ব্বনাশী কারণ ত আছেই।

আমরা নৈরাশ্যের ভাব হইতে এতগুলি কথা লিখি নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভায়, শক্তিতে, ও তপঃক্ষমতায় আমাদের বিশ্বাস আছে। তাই জাগিবার ও জাগাইবার জন্যই এই আলোচনা।

পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বাধা সত্ত্বেও তাঁহাদের উৎসাহ জয়যুক্ত হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আতিথ্যে কোন ত্রুটি হয় নাই।

"সঞ্জীবনী" বলেন :—

কর্ম্মকর্ত্তা সেক্রেটারী সীতানাথ অধিকারী মহাশয়ের কন্যার সন্তানসম্ভাবনা ছিল। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চিঠিতে তাঁহার কন্যার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে। তিনি দুই দিবস চিঠি খুলিয়া পাঠ করেন নাই, কি জানি কোন মন্দ সংবাদ থাকিতে পারে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সভা শেষ হইলে চিঠি খুলিয়া তিনি এই মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি চিঠি খুলিতাম, তাহা হইলে সভার কাজ করিতে পারিতাম না। এইরূপ কর্ম্মবীর কয় জন পাবনা সহরে আছেন, তাহা জানি না।

নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অভিভাষণে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করেন। বঙ্গদেশে ইংরেজের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের কথাই তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" কেন বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়াছিল, তাহার কারণ তাঁহার মতে এই :—

'বঙ্গদর্শন' তখন যথার্থই বঙ্গদর্শন রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ তখন আপন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে দেখিতে পাইল; এবং আত্মদর্শন করিল বলিয়াই তাহার এই আনন্দ। এতকাল পরের লেখার উপর "মক্স" করিয়া কেবল পরকেই চোখের সামনে রাখিয়াছিল, আজ নিজের আনন্দ-প্রকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া, এক মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের বন্ধনদশা ঘুচিয়া গেল।

বাঙ্গলাসাহিত্যে কোন্‌টি দেশী জিনিষ, কোন্‌টি নয়, তদ্বিষয়ে বক্তার মত প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকে ভাবেন যে, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তরকালে যাহা কিছু হইবে তাহা যদি কৃত্তিবাসী বা কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয়, কিম্বা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্ত্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশের জিনিষ হইল না; তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, এবং তাহা দ্বারা আমাদের আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা ঘটে। জড়বস্তুর সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে বটে, কারণ যাহা তাহার পূর্ব্বের পরিচয়, তাহার উত্তর পরিচয়ও তাহাই; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। প্রাণবান্ পদার্থের যথার্থ পরিচয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাব্য-সাহিত্য যদি আবহমান কাল কেবল কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের পুরাতন বুলিই পুনঃ পুনঃ আওড়াইত, তবে তদ্দ্বারা আমরা প্রাণহীন কলের পুত্তলিকারই পরিচয় পাইতাম, সাহিত্যের সজীব সত্তার পরিচয়ে কখনই নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না। ইংরাজি সাহিত্যের সজ্ঘাতে যখন এমন স্থানে আঘাত লাগিল, যেখানে আমাদের প্রাণপুরুষ বাস করে, তখন সে প্রাণপুরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই জাগরণ জানিলাম কিসে? দেখিলাম ইংরাজীর সাহিত্যরসকে সে সাত্ম্য করিয়া লইয়াছে। নির্জ্জীবের সহিত বাহিরের পদার্থ সংযোগ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু এক করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। জীবিত মনুষ্যই বাহির হইতে খাদ্যরস গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হয়; মৃতের পার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর আহারীয় রাখিয়া যুগযুগান্ত অপেক্ষা করিলেও সঞ্জীবনক্রিয়া দেখিবার আশা করা যায় কি? এই গ্রহণ-ক্ষমতাই আমাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারাই আমাদের রসভোগের তৃপ্তি হয় এবং ইহা দ্বারাই আমাদের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া আত্মপরিচয়ের সহায়তা করে। যতদিন ইংরাজি সাহিত্যকে পাঠশালার ছাত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেছিলাম, যতদিন তাহার সত্তাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ বস্তুতঃ নিজের করিয়া লইতে পারি নাই, ততদিন নিজের প্রাণশক্তির অনুভব করিতে পারি নাই। বাহির হইতে এই সাহিত্যের রসধারা নিজের অন্তরের গভীর তলে সঞ্চিত হইয়া উৎস আকারে যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন নিজের অন্তরের সেই প্রাণবান্ বেগটিকে অনুভব করিতে পারিলাম। সেই জ্ঞানই আমাদের যথার্থ আত্মপরিচয়ের জ্ঞান। প্রাচীন বাণীর প্রতিধ্বনিকে যদি চিরদিন বিস্তার করিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিতাম, তবে নিজের সজীব সত্তার পরিচয় তাহাতে পাইতাম না। সকলেই জানেন ইটালীতে একদিন যখন নব সঞ্জীবন-বেগ (Renaissance) আইসে, এলিজাবেথের রাজত্বকালের ইংলণ্ডও সেই বেগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের নবজাগরণের আবির্ভাব হয়। এরূপ না হইলে ইংলণ্ডের প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাইতাম না। সেক্সপিয়ার যদি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক চসর প্রভৃতির অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গুণিগণগণনায় আজ তাঁহার নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত কি না সন্দেহ।' তিনি তদানীন্তন ইতালির সাহিত্য হইতে তাঁহার বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি খাঁটি ইংরাজী কবি নহেন, এ কথা বলিবার সাহস কি কাহারও

হয়। দেশদেশান্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাতে লেখকের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারবাহীর স্কন্ধে ঝাঁকার মধ্যে যে উপকরণ থাকে, তাহা তাহার দৈন্যেরই পরিচয় দেয়, কিন্তু সেইগুলিই আবার ধনীর গৃহসজ্জায় নিয়োজিত হইয়া তাহার সমৃদ্ধিরই সাক্ষ্য দান করে। উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম তাহা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না; সেই উপকরণগুলিকে আপনার করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিলেন, তাহার মধ্যে স্কটের প্রভাব কতখানি সে কথা মুখ্যভাবে আলোচনার বিষয় নহে। কাদম্বরী, বাসবদত্তা বা দশকুমারচরিতের ছাঁদে বঙ্কিমের পুস্তক রচিত হইলে সাঁচ্চা ভারতবর্ষের পরিচয় দিত কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির কোন পরিচয় পাইতাম না। যদি দেখিতাম ইউরোপের জীবনবেগের অভিঘাতে ভারতবর্ষ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, আঘাতের পর আঘাত বাহির হইতে আসিতেছে, কিন্তু ভিতর হইতে তাহার কোন জবাবই নাই, তাহা হইলে বুঝিতাম আমরা নিঃশেষে ও নিরুপায় ভাবে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছি। সে মৃত্যুর পরিচয় ত আনন্দের পরিচয় নহে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের উপন্যাস পাঠ করিয়া বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি যে তাহার রস ও ছাঁদকে আপন করিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছে ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। বাহিরের উপকরণকে আত্মসাৎ করার দ্বারাই তিনি আপনার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহার সুললিত ছন্দে আমাদের সাহিত্যও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা যখন এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখনই বঙ্গসাহিত্য-লক্ষ্মীর উটজপ্রাঙ্গণে আনন্দময় মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক গবেষণার যে চেষ্টা কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে, তন্মধ্যে বক্তা আনন্দের কয়েকটি যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিল না, সেকথার বিচার তখন মনে আইসে নাই। তিনি যে সাহসপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে লইয়া দেশকে অনুসরণ করিতে ডাকিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট। ইহার মধ্যে যে যৌবনোচিত পৌরুষ ছিল, যে আত্মনির্ভরতা ছিল, যে আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ ছিল, উহাই দেশের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এতদিন, আমরা দেশের বিষয়ে মুখের কথায় গৌরব করিব, কিন্তু সেই গৌরব করিবার অধিকার যে তপস্যার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে তাহাতে পরাঙ্মুখ রহিব, এই অসত্য আমাদিগকে বহুকাল ধরিয়া লোকসমাজে লাঞ্ছিত করিয়াছে; সে লাঞ্ছনা যাঁহারা দূর করিয়াছেন, আপনার শক্তির প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইয়াছেন, অনুসন্ধানের পথ পুস্তকের মধ্যে নিহিত নহে, উহা দেশের অরণ্যে, কান্তারে, ভূগর্ভে নানাশাখায় নানাদিকে প্রসারিত, সেই পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, অদ্যকার সাহিত্যসম্মিলন সভায় আমরা তাঁহাদের জয়কীর্ত্তন করি। সত্য চেষ্টা দ্বারাই সত্য ফল লাভ করা যায়। সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায়-প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্রঅনুসন্ধান-সমিতিপ্রমুখ সভাসমিতির সমবেত চেষ্টায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেশের সত্য ইতিহাস যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে অতীত গৌরবের চিত্র আমাদের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছে, তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে, মিথ্যার আবরণ শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহা আবৃত করিতে পারিবে না।

ভ্রমপ্রমাদশূন্য ইতিহাস হয় কি না বলা কঠিন। যে-সমস্ত ঘটনা চক্ষের উপর ঘটিতেছে, তাহাই বর্ণনা করিতে বসিলে লেখকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহার উপর যেখানে জেতাজিত সম্বন্ধ আছে, সেস্থলে কল্পিত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা মানবমনের একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম, শত্রুর গুণকথন ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও সে বিষয়ে উৎসাহ জগতে দুর্লভ। এরূপ স্থলে পুরাতন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সত্যমূলক করিবার একমাত্র উপায়—পুরাতন ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির আবিষ্কার ও রক্ষা এবং সেই সব উপাদানের সাহায্যে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাসের রচনা। দেশের যে-সকল সুসন্তান এই পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নানা ক্লেশ ও বিবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া দেশের চিরন্তন অভাব মোচন করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর ললাট হইতে দুরপনেয় চির-কলঙ্ক মুছাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম ভক্তিভাজন। বরেন্দ্রের বনে প্রান্তরে, ভূগর্ভে ভূধরে, যে-সকল প্রস্তরমূর্ত্তি শিলালিপি ও তাম্রফলকে অনুশাসন অনুসন্ধান করতঃ বাহির করিয়া রাজসাহীর কলা-ভবনে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে যথার্থই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এলোরা, অজন্তা, সাঁচি ও সারনাথের মূর্ত্তিগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, অনুসন্ধানসমিতির সংগৃহীত বাঙ্গালী ভাস্কর ধীমানের গঠিত মূর্ত্তির সহিত তুলনায় সেগুলি সৌন্দর্য্যে হীন বলিয়াই অনুমিত হইবে। এই দেশহিতকর মঙ্গলময় দুঃসাধ্য কর্ম্ম যাঁহাদের অক্লান্ত শ্রমে ও অকাতর অর্থব্যয়ে সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাস চিরদিন তাঁহাদের এই অক্ষয়-কীর্ত্তির ঘোষণা করিবে। কেবল ইহাই নহে, ইউরোপীয় মনীষা-সম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গালার মধ্যযুগের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধার একরূপ অসাধ্যসাধন বলিয়া নিরাশার সহিত উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণ বিচারশক্তির গুণে সেই ইতিহাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দুষ্কর তপশ্চরণ করিয়া যে-সকল মহানুভব মনীষিগণ দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করতঃ আমাদের চির-লাঞ্ছনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, এই তপস্যার যথাযথ ফল তাঁহারা এখন না পাইলেও আমাদের উত্তরপুরুষদিগের জীবনের সর্ব্বপ্রকার সফলতার মধ্যে ইহার সাফল্যের বীজ নিহিত হইয়া রহিল।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ যাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁহার কথায় যে দুই চারিটি কথা যোগ করিতে যাইতেছি, হয়ত তাঁহারই বক্তব্যকে যে স্ফুটতর করিতে যাইতেছি, তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দিগকে বিন্দুমাত্রও প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নহে, কেবল ২০ টি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। আমরা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের বিশেষ-খবর রাখি না, কারণ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি। ভ্রম হইলে বিশেষজ্ঞেরা কৃপা করিয়া সংশোধন করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তকে ভয় না করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্রসর হইয়াছিলেন বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি প্রধানতঃ ইংরেজিতে লিখিতেন বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। কালানুক্রম, গুণানুক্রম বা বর্ণানুক্রম না ধরিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান-ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি নাম করা যাইতে পারে; যথা, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাধেশচন্দ্র শেঠ, শরচ্চন্দ্র দাস, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার, ইত্যাদি। যদি অনধিকারচর্চ্চাজনিত ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞদিগের নিকট হইতে আবার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছি।

গ্রামনির্ম্মাণ সম্বন্ধে শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী দেবীর লেখা একটি প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে আনন্দিত হইবার দুটি কারণ আছে। নারী দেশের সকল কার্য্যে যোগ দেন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে নারীর মাতৃহৃদয়ের সেবাপ্রবৃত্তি ও কল্যাণচিকীর্ষা যখন নিজ পরিবারের মঙ্গল করিয়া তাহার বাহিরেও কার্য্যক্ষেত্র খোঁজে, তখন সমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়। নারীকে আমরা গৃহেই জননী বলিয়া জানি; যখন তাঁহাকে অধিকন্তু লোকমাতা বলিয়াও জানিব, তখন তাঁহার শক্তির নব পরিচয় পাইয়া সমাজ ধন্য হইবে। যিনি গৃহস্থালির গৃহলক্ষ্মী, তিনি গ্রামে গ্রামলক্ষ্মী হইয়া কিসে গ্রামের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও শুচিতা বাড়ে, তাহার ব্যবস্থা-কার্য্যে সাহায্য করিবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক।

গত পৌষমাসে শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পাটনা-গমন করেন। তদুপলক্ষে তথাকার বাঙ্গালীদের সুহৃৎপরিষৎ তাঁহাকে যে "অভিভাষণ" প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহারা যে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তাহা সকল বাঙ্গালীরই জানা কর্ত্তব্য। শুধু জানিলে হইবে না, প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহকারিতা ও সহযোগিতা করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

বঙ্গবিযুক্ত বিহারের স্কুল কলেজে এখনও বঙ্গভাষার চর্চ্চা চলিতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিহারের সারস্বত-আয়তনসমূহ হইতে আমাদের মাতৃভাষার নিষ্কাশিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি জেলার আদালত হইতে বঙ্গভাষা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি বঙ্গভাষী জেলা বাঙ্গালা হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এই-সকল কারণে এ অঞ্চলে বঙ্গভাষার প্রসার-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। এখন হইতে প্রতীকারের উপায় না করিলে বিবিধকারণ-সমবায়ে ভবিষ্যতে বিহারে বঙ্গভাষার চর্চ্চা লুপ্ত হইতে পারে। যে ভাষায় প্রথমে 'মা' উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইয়াছি, সে ভাষা ভুলিলে প্রবাসী বাঙ্গালী থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা আর বাঙ্গালী থাকিব না। সেই শোচনীয় জাতিগত মৃত্যুর প্রতিষেধকল্পে বিহারের স্থানে স্থানে—

(১) বঙ্গভাষীদের জন্য স্বতন্ত্র সারস্বত-আয়তনসমূহের প্রতিষ্ঠা,

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য,—প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যের সহিত সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, পরিষৎ প্রভৃতির স্থাপন,

(৩) বঙ্গভাষীদের পরস্পর মিলন, সামাজিক সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা-সাধন প্রভৃতির জন্য মিত্রগোষ্ঠী, আলোচনা-সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা,

(৪) এবং এইরূপ বিবিধ পথে উপনিবেশী বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি ও রক্ষা জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও বিবর্ত্তের জন্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহারাজ! 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা,' নদীমেখলা বিহগকূজনমুখরা বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালাদেশ বিদ্যমান। Greater Britainর মত Greater Bengal অতীতের স্বপ্ন নহে, সত্য। আজ বাঙ্গালী অন্ধকূপচারী মণ্ডূকের সহিত উপমিত হইতেছে বটে, কিন্তু অতীত যুগে এই বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ ত্রিকলিঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং 'নীলসিন্ধুজল-ধৌতচরণতল—অনিলবিকম্পিতশ্যামল-অঞ্চল' কলিঙ্গের 'তমালতালীবনরাজিনীলা' বেলা হইতে এই বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ী বংশধরগণ সুদূর যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোজ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিহারের সারস্বত তীর্থ নালন্দার ইতিহাসপ্রথিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মনীষী জগদ্বাসীকে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিতেন। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীরা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের প্রচারক

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে কিছু টাকা দিয়া বাঁদাজেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ অর্থসংগ্রহের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট নিম্নে মুদ্রিত ভিক্ষাপত্র উপস্থিত করিয়াছেন।

এক্ষণে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে, ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের মাননীয় ছোটলাট শ্রীযুক্ত স্যার্ জেমস্ মেষ্টন মহোদয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ আহূত সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বহু সহস্র পুরুষ ও রমণী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং এই সংখ্যা যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সভাতে তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বৎসরে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ১১০০০ বর্গমাইল স্থানের উপর ব্যাপ্ত হইবে এবং প্রায় ৭৫০০০০ পুরুষ ও রমণীকে সাহায্য করিতে হইবে। সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০০০০ বর্গমাইল স্থানে প্রায় ১৪০০০০০০ জনকে ভীষণ অন্নকষ্ট হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বাঁদা এবং জলৌনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ কষ্ট দেখা যাইতেছে।

মাননীয় ছোটলাট মহোদয় আরও বলিতেছেন যে এই ভীষণ অন্নকষ্টের সময় সাধারণের দানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যাহা দান করিবেন বা করিতেছেন তাহা জীবন ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখস্বচ্ছন্দতা আছে, যাহা জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও জীবনকে অনেক পরিমাণে মধুর করে। সেই-সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের জন্য সাধারণের দান একান্ত আবশ্যক। এমন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে দান গ্রহণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞান করেন। ইঁহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিবার জন্য এই সাধারণ দান ব্যয়িত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই মহৎ কার্য্যে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী কিঞ্চিৎ কার্য্য করিবেন, ইহা স্থির করিয়া লাহোরপ্রবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বাঁদাতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর এই সাহায্য দানের ভার অর্পণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইজন্য দেশের সহৃদয় নরনারীর নিকট এই কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাঁহারা স্বদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনী, সন্তান সন্ততির সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করুন। এই জন্য যিনি যাহা প্রদান করিবেন, তাহা নিম্নস্বাক্ষরকারী সাদরে গ্রহণ করিবেন এবং প্রকাশ্য পত্রে তাহা স্বীকার করিবেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৪এ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত
সম্পাদক,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

অবিনাশবাবু বাঁদায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি বিধবার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এরূপ নিঃস্ব ও অসহায় যে দুর্ভিক্ষের সময় কেন, তাঁহাদিগকে চিরদিন সাহায্য দিলে ভাল হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে যত বেশী টাকা পাওয়া যাইবে, তত অধিক কাজ করিতে পারা যাইবে। আগামী মাসে তাঁহার ঝান্সীতে আর একটি সাহায্যদানকেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। দুই চারি আনা পয়সা দিলেও একজন মানুষকে দুই এক দিন অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায়। এই পুণ্যলাভ করিতে সকলেরই ব্যগ্র হওয়া উচিত।

একজন এটর্নী সংখ্যাসংগ্রহ (Statistics) দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের পক্ষে যৌবনপ্রাপ্তির পর বিবাহ অপেক্ষা বাল্যবিবাহ ভাল ; কেননা, তাঁহার মতে বাল্যে বিবাহিতা মাতার শিশুসন্তান অপেক্ষা যৌবনপ্রাপ্তির পর বিবাহিতা মাতাদের শিশুসন্তান অনেক বেশী মারা পড়ে। কিরূপ বিবাহজাত শিশু বেশী মারা পড়ে, তাহা তিনি কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্ট আদি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তির গোড়াতেই গলদ। তাঁহার যুক্তি এই :— কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক প্রচলিত ; কলিকাতাবাসী ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত। সুতরাং যদি হিন্দুমুসলমান শিশু অপেক্ষা কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, প্রভৃতিদের শিশুগণের মৃত্যু বেশী হয়, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করিবার কতকটা কারণ জন্মিবে, যে, বাল্যবিবাহ অপেক্ষা যৌবনবিবাহই শিশুমৃত্যুর প্রবলতর কারণ। এটর্নীমহাশয় মনে করেন যে কলিকাতার হিন্দুমুসলমান শিশু অপেক্ষা কলিকাতাবাসী ইংরেজআদি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিশুদের মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাস্তবিক সত্য কথা তাহা নয়। ১৯১০-১১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপালিটির রিপোর্টের পরিশিষ্টের ১৩৮ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখুন। তাহাতে দেখিবেন—কলিকাতাজাত হিন্দু শিশু হাজারকরা ২৫২ জন মরিয়াছে ; কলিকাতাজাত মুসলমান শিশু হাজারকরা ৩৪৩ জন মরিয়াছে ; কিন্তু কলিকাতাজাত ইউরোপীয় আদি (Non-Asiatic) শিশু হাজারকরা ১৪১ জন মাত্র মরিয়াছে। সুতরাং এটর্নী মহাশয়ের যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে যৌবনবিবাহোৎপন্ন শিশুরাই বেশী বাঁচে, সুতরাং এইরূপ বিবাহই ভাল!

এটর্নী মহাশয়ের ভুল হইবার কারণ এই:—তিনি কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথমভাগের ৮০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি মানচিত্রে দেখিয়াছেন যে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাণিকতলায়, এবং ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ সংখ্যক অঞ্চলে (ward); এবং তিনি ঐ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আর একটি মানচিত্রে ইহাও দেখিয়াছেন যে কলিকাতার যে যে অংশে খৃষ্টীয়ানেরা প্রধানতঃ বাস করে ১৬ ও ১৭ সংখ্যক অঞ্চল (ward) তাহার অন্তর্গত। তজ্জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেহেতু খৃষ্টীয়ানেরা যৌবনবিবাহ করে, যেহেতু তাহারা ১৬ ও ১৭ সংখ্যক অঞ্চলে প্রধানতঃ বাস করে, এবং যেহেতু যে যে অঞ্চলে শিশুরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মারা পড়ে ঐ দুই অঞ্চল তাহার অন্তর্ভূত, অতএব যৌবনবিবাহ বাল্যবিবাহ অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর প্রবলতর কারণ। কিন্তু এটর্নী মহাশয় ঐ সেন্সস্ রিপোর্ট পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দেখিতে পাইতেন যে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতি দশহাজারে ৭০৭২ জন হিন্দু ও মুসলমান, বাকী খৃষ্টীয়ান আদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, এবং ১৭ নং ওয়ার্ডে প্রতি দশহাজারে ৬২৫৯ জন হিন্দু ও মুসলমান, বাকী খৃষ্টীয়ান আদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। ঐ দুই ওয়ার্ডে যে হিন্দুমুসলমানদের সংখ্যা বেশী, বেশী শিশু-মৃত্যু তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের জন্য নয়, পরন্তু খৃষ্টীয়ান আদি যাহাদের সংখ্যা কম, অধিকতম শিশু মৃত্যু তাহাদেরই মধ্যে ও তাহাদেরই জন্য, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত তিনি কোন্ যুক্তির সাহায্যে করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। মাণিকতলায় এবং ৫, ১২, ১৬, ১৭ ও ২৫ সংখ্যক ওয়ার্ডে অর্থাৎ জোড়াবাগান, ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, বামনবস্তী ও ওয়াটগঞ্জে শিশুমৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার প্রত্যেক অঞ্চলেই হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কলিকাতার সেন্সস্ রিপোর্টের ১ম ভাগের ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ঐ ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রতি দশহাজারে কত তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। মাণিকতলায়—৯৯৬৫, জোড়াবাগানে—৯৮৬১, ওয়াটার্লু ষ্ট্রীটে—৭১৩৬, পার্ক ষ্ট্রীটে—৭০৭২, বামনবস্তীতে—৬২৫৯ এবং ওয়াটগঞ্জে—৯৮১০।

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে এটর্নী মহাশয়, প্রমাণ কাহাকে বলে, বোধ হয় বুঝেন না। সুতরাং তাঁহার অন্যান্য কথা পরীক্ষা করিয়া দেখা অনাবশ্যক। তিনি আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষি সুশ্রুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু তদুপযোগী যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

সুশ্রুত বলেন :—

"ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

(সুশ্রুত, শারীরস্থান, ১০ম অধ্যায়।)

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তমীজ্ খাঁ এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন বালিকার, অন্ততঃ ষোড়শবর্ষীয়া যত দিন না হইতেছেন ততদিন, বিবাহ দেওয়া কখনও উচিত নয়। আর যদি ইহার চেয়ে বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা নারী ও তাঁহার ছেলেমেয়ের বিশেষ কল্যাণ হইবে। ডাক্তার ডি বি স্মিথ মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ষোল বৎসর নিরূপণ করেন। তাঁহার মতে ষোড়শ বর্ষের পরও দুই তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিলে বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা। ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু অষ্টাদশবর্ষ নারীগণের বিবাহের যোগ্যকাল মনে করেন; কিন্তু যখন এদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত বিপরীত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার মতে অন্যূন পনের বৎসর বিবাহকাল আপাততঃ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ কুড়ি ও তাহার কাছাকাছি বয়সকে বিবাহের বয়স বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ডাক্তার এ ভি হোআইটের মতে আঠার মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, ষোল।

অর্দ্ধ-বা-বারআনা-সরকারী যে সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা কয়েক বৎসর হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এবং কোন কোন অধ্যাপক যেরূপ সরকারী অর্থসাহায্য পাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীনতা কিছু যে কমিয়াছে, তাহা সম্মতি-আইনের ও বিদেশী-বর্জ্জনের আন্দোলনের সময় বুঝা গিয়াছিল। যাহা হউক, এই বিষয়ে এখন জাতীয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির দিক্ দিয়া কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। টোলের শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি অবনতির কথাই আলোচনা করিব। টোলের শিক্ষার চিরন্তন প্রণালীর আর দোষ যাহাই থাক্, পল্লব-গ্রাহিতা ইহাতে প্রশ্রয় পাইত না। যে ছাত্র যাহা পড়িতেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করা এবং ভাসা ভাসা ভাবে কয়েকটা বিষয় জানিয়া পল্লবগ্রাহিতার দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রশ্রয় পায়। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ দোষ টোলে প্রবেশ করিয়া বদ্ধমূল না হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। টোলের অধ্যাপকগণ এখন পর্য্যন্ত, কৃতী ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও আচরণে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে উপাধি দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এই চিরন্তন অধিকার যেন লুপ্ত না হয়। সকল অধ্যাপকের যোগ্যতা সমান নয়; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত উপাধির মূল্যও সমান নয়। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানদানেই সন্তুষ্ট দরিদ্র অধ্যাপকের পরিবারে বাস করিয়া যে সব ছাত্র বিদ্যালাভ করে, ও তাহার পর উপাধি পায়, তাহাদের সে উপাধির মূল্য কেবল মাত্র পরীক্ষালব্ধ উপাধির অধিক। কি আধুনিক, কি প্রাচীন, উভয়বিধ শিক্ষাপ্রণালীতেই, জ্ঞান এবং জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকের জীবনের প্রভাব, উভয়েরই স্থান থাকা আবশ্যক। এইজন্য বলিতেছিলাম যে অধ্যাপকদের উপাধি দিবার অধিকার যেন কোন প্রকারে হ্রাস না পায়।

সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষার অধ্যক্ষসভা (Board) এই রূপ একটি প্রস্তাব মঞ্জুরীর জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে বাঙ্গলা বা হিন্দী সাহিত্যেও পরীক্ষা দিতে পারিবে। ইহাতে পাশ ফেল হওয়ার উপর উপাধি-লাভালাভ নির্ভর করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা উহাতে পাশ হয়, ত, তজ্জন্য সার্টিফিকেট পাইবে। আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। অধিকন্তু ইহাও বলি যে বাঙ্গলা বা হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, ভূগোল, ইতিহাস এবং পাটীগণিত যুক্ত হওয়া উচিত। এই এই বিষয়ে স্বতন্ত্র এক এক খানি বহি হইলেই ভাল হয়। ন্যূনকল্পে, একখানি সাহিত্যিক বহিতেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কতকগুলি পাঠ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, অপর একখানি হিসাবের বহি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেই চলিতে পারে। অবশ্য কেবল একজন গ্রন্থকারের বহিই পঠিত হইবে, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত নয়। আদর্শানুযায়ী ভাল বহি যত পাওয়া যাইবে, সবগুলিই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া দরকার।

সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা ভবিষ্যতেও মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেগুলি শিক্ষার অঙ্গীভূত থাকা উচিত। কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া এখন আর মানুষ বর্ত্তমান যুগে জীবনযাপনের উপযোগী যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে না। কেবল বুদ্ধির প্রখরতা সাধিত হইলে, বা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান লব্ধ হইলেই শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না; যে যুগে মানুষ বাস করে, সে যুগের মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে বা ঘটিতে পারে, সকল ব্যাপার বুঝিবার, এবং শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কোন কোনটিতে যোগ দিয়া সমাজসেবা করিবার ক্ষমতা মানুষের জন্মান উচিত। বর্ত্তমানে টোলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কতকগুলি সংসারানভিজ্ঞ, কোন কোন স্থলে নিজের গৃহস্থালির পর্য্যন্ত হিসাব রাখিতে অক্ষম, মানুষ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। অধ্যাপকেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে মনোরথে আরোহণ করিয়া সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাস্তব-জীবন এই কলিযুগে। অধুনা এই পৃথিবীতে কোথায় কি আছে, কি ঘটিতেছে, কেন ঘটিতেছে, এ সকল জানা নিশ্চয়ই চাই। হিন্দুসমাজের সামাজিক ও ধার্ম্মিক নেতা

তাঁহাদেরই হইবার কথা। কিন্তু আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুরা মুখে তাঁহাদিগকে সমাজশিরোমণি বলিয়া মানিলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্যই প্রদর্শন করেন। তাঁহারা যদি আধুনিক পার্থিব ব্যাপারের কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভাব নিঃসন্দেহই বর্দ্ধিত হইবে।

—•—

পূর্ব্বে কোন কলেজে না পড়িয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষা দেওয়া চলিত। পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, যে কলেজের বি এ সেই কলেজেরই এম্ এ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বিশ্ব-

অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ।

বিদ্যালয়ের নূতম নিয়ম হওয়ার পর আর সেরূপ ভাবে পরীক্ষা দেওয়া চলে না। সুতরাং প্রথমশ্রেণীর অন্ততঃ কয়েকটি কলেজে নানা বিষয়ে এম্ এ পড়াইবার বন্দোবস্ত করা পূর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ২।১টি মাত্র কলেজের আছে; তাহাও কেবল ২।১ বিষয়ে। এই কলেজগুলি আবার অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া থাকেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং অনেকগুলি বিষয়ে এম্ এ অধ্যাপনার ভার লইয়া ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রায় এক হাজার ছাত্র নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষা করিতেছেন। ছাত্রসংখ্যা এরূপ অধিক হওয়ায় আরও অধ্যাপক নিয়োগ এবং পূর্ব্ব হইতে নিযুক্ত কোন কোন অধ্যাপক যাহাতে সমস্ত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যেই দিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তাহা করিয়া ছাত্রদের ও দেশের মঙ্গল করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সী, ভী, রামন্।

সেনেটের সভায় এরূপ বন্দোবস্তে ৩।৪ জন ইংরেজ অধ্যাপক আপত্তি করেন। যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সকল বিষয়ে নিখুঁত হয় নাই, তাহা হইলেও একথা বলা অসঙ্গত যে

হয় সম্পূর্ণ নিখুঁত বন্দোবস্ত কর, নতুবা এম্এ অধ্যাপনার কোন ব্যবস্থাই করিও না। বড় বড় অধ্যাপনাকক্ষ, সুন্দর আসবাব, মোটা বেতনভোগী ইংরেজ অধ্যাপক, আর প্রতি শ্রেণীতে উর্দ্ধ সংখ্যায় জন কুড়ি ছাত্র, এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে লেখা পড়া শিখা যায় না,ইহা আমরা স্বীকার করি না। আমরা যখন এম্এ পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তখন কোনও অধ্যাপকের নিকট একদিনও পড়ি নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এইরূপে যাঁহারা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা লেখাপড়া শিখেন নাই, ইহা বলিতে পারি না। আর এখন বিশ্ববিদ্যালয় বহুসংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন; যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত যোগ্য অধ্যাপক কয়েক জন আছেন। যাঁহাদিগকে আমরা চিনি না, তাঁহাদেরও অযোগ্য হইবার কথা নহে। এরূপ বন্দোবস্তে ছাত্রেরা লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না, বলা সঙ্গত নহে।

যে-সকল ছাত্র বিজ্ঞানে উচ্চ পরীক্ষা দিতে চায়, অনেক দিন হইতে তাহাদের বড় অসুবিধা চলিতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার অধিকারপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা কম। তাঁহারা আবার ভর্ত্তি করেন অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র। মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে বেশী ছাত্র লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু, পরে উহার অধ্যাপক কমিয়া যায় নাই,যন্ত্রাদিও কমে নাই, পড়াইবার ঘর এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারগুলিও ছোট হইয়া যায় নাই, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়।

এই-সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একচেটিয়া অধিকার থাকায় যাঁহাদের ব্যবহারে সহৃদয়তা ও বিবেচনার অভাব কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হইত, তাঁহারাও সাবধান হইতে পারিবেন।

আজকাল বিবাহের মধ্যে এমন একটা জঘন্য অর্থ-গৃধ্নুতা ঢুকিয়াছে যে সচরাচর দেখা যায় যে গয়নার ও টাকারই আদর, বধূর আদর যদি হয়ও তাহা ঐ গয়না ও টাকারই জন্য। বিবাহের পরও বধূর ও তাহার বাপমার নিষ্কৃতি নাই। পূজাপার্ব্বণে বরের বাপমার যথেষ্ট প্রাপ্তি না ঘটিলে তাঁহারা বধূর খুব লাঞ্ছনা করেন। তাহার ফলে সেদিন একটি পনের বৎসরের বধূ শ্বশুর বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা পিতৃগৃহে পুড়িয়া মরাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছে। সে গঞ্জনা ও উৎপীড়নের উত্তাপ কিরূপ দুঃসহ যাহার তুলনায় আগুনও সুশীতল!

একটা কৃত্রিম কুপ্রথা মানুষকে ভুলাইয়া দিতেছে যে নারীর যেমন বিবাহের দরকার পুরুষেরও তেমনি দরকার। তাহাতেই বালিকাদের এত লাঞ্ছনা হইতেছে।

হিন্দুবিবাহের মন্ত্র দেখিলে মনে হয় যে পুরাকালে বিবাহের আদর্শ এরূপ নীচ ছিলনা। বধূর কি উচ্চ সম্মান ছিল দেখুন। তাঁহাকে বলা হইতেছে—

যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥
যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি ॥

"ইন্দ্রের শচী যেমন, বিভাবসুর স্বাহা যেমন, চন্দ্রে রোহিণী, নলে দময়ন্তী, বৈবস্বতে ভদ্রা, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, এবং নারায়ণে লক্ষ্মী যেমন, তুমি তোমার পতিতে তদ্রূপ হও।"

তুমি তোমার স্বামীর ও তাহার পিতামাতার অর্থপিশাচতা চরিতার্থ করিবার যন্ত্ররূপিণী হও, ইহা বলা হইত না।

বধূকে পতিকুলে ধ্রুব করিয়া রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারিত হইত :—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলেভূয়াসম্।"

এখন বধূর ও তাহার বাপমার লাঞ্ছনাই বিবাহের মধ্যে ধ্রুবতম সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাচীন হিন্দুবিবাহের মন্ত্র অনুসারে বর বিবাহান্তে বধূকে গৃহে আনিয়া বলিতেন :—"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাম্ ভব, ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা।" বধূর এত বড় উচ্চ সম্মান আর কোন জাতির বিবাহপদ্ধতিতে আছে বলিয়া শুনি নাই;—তাঁহাকে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর, সকলের মধ্যে, সকলের হৃদয়ে, সম্রাজ্ঞীর স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা অর্থপিশাচ হইয়া

বধূর এরূপ লাঞ্ছনা করি, যে কেহ আগুনে পুড়িয়া, কেহ জলে ডুবিয়া, কেহ বিষ খাইয়া, কেহ বা গলায় দড়ি দিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারলাভ করে। যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানেও সচরাচর বধূ বলিয়া বধূ সম্মানিত ও পূজিত হন না, তাঁর বাপ মা টাকা দিতে পারিলে তবে তিনি বিবাহযোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হন। দেশের এ কলঙ্ক আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। যুবক বৃদ্ধ সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, যে, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ", "যেখানে নারীগণ পূজিত হন, দেবতারা তথায় আনন্দে বিহার করেন" আমাদের গৃহে গৃহে এই শাস্ত্রীয় বচনের দৃষ্টান্ত অচিরেই পরিলক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ এরূপ অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিতেছেন যে বালিকাদিগকে খুব অল্প বয়সে বিবাহিত করিলে তখন তাহারা মাবাপের দুঃখ বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং স্নেহলতার মৃত্যুর মত দুর্ঘটনা আর ঘটিবে না। চমৎকার যুক্তি! যেন দুর্ঘটনা ঘটাটাই একমাত্র দুঃখের বিষয়; যে জঘন্য সামাজিক রীতির জন্য লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনান্তর ঘটিতেছে, দায়ে পড়িয়া পণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য বা এড়াইবার জন্য লোকে প্রতারণা করিতেছে, বালিকারা আত্মঘাতী হইতেছে, সেই রীতিটাই যেন ঘোর পরিতাপের বিষয় নয়। তা ছাড়া, বাপমায়ের টাকার যোগাড় হয় না বলিয়াই ত অনেকস্থলে অবিবাহিতা কন্যার বয়স বাড়িয়া চলিতে থাকে। ফোঁড়া হইলে যদি কোন ডাক্তার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে বলে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিলে তাহাকে আফিং খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিতে বলে, কিন্তু রোগ বিনাশ করিবার কোন চেষ্টা করে না, তাহার ব্যবহার যেরূপ, এই যুক্তির স্রষ্টাদের আচরণও তদ্রূপ।

যাঁহারা মেয়েদের বাল্যবিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য, এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বরপণপ্রথা উন্মূলিত করিতে পারিবেন মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমাদের কোন ঝগড়া নাই। কিন্তু আমাদের নিজের ধারণা এই যে এই প্রথাকে উন্মূলিত করিতে হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যেমন অবশ্যকর্ত্তব্যতার নিয়ম নাই, বয়স সম্বন্ধেও কঠিন নিয়ম নাই, সকলকেই সেই অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য; ব্রাহ্মণাদি জাতি যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বৈবাহিক আদান প্রদান তাঁহাদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বরকন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করা উচিত; * কন্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থাতে অবিবাহিত থাকিলে তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থা, এবং, প্রয়োজন হইলে, অপরের গলগ্রহ না হইয়া নিজের ভরণপোষণ করিতে পারেন; এবং পুত্রের মত কন্যাও যাহাতে পিতৃধনে অধিকারিণী হন, এরূপ ব্যবস্থা পিতার করা উচিত।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আমাদের দেশের মত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে এরূপ সামাজিক মত নাই, জাতিভেদ নাই, অথচ সেখানেও ত টাকার জন্য অনেকে ধনীর কন্যা বিবাহ করে, সুতরাং প্রকারান্তরে বরপণ প্রথা ত সে সব দেশে রহিয়াছে। ইহা সত্য কথা। কিন্তু এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে টাকার জন্য বিবাহ আছে, কিন্তু সামাজিক রীতির সাহায্যে **পণ-আদায়-রূপ উৎপীড়ন নাই**। কি আমাদের দেশ, কি অন্য দেশ, টাকার জন্য বিবাহ ততদিন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে না, যতদিন পর্য্যন্ত, পূর্ব্বোল্লিখিত সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত, পুরুষ ও নারীর ধর্ম্মবুদ্ধি না জাগিবে, আত্মসম্মানজ্ঞান সজাগ না হইবে, এবং দম্পতির পরস্পরের প্রতি প্রেমই বিবাহের প্রকৃত ভিত্তি বলিয়া গৃহীত না হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি এইরূপও মনে করেন, এত খরচ করিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলাম, কন্যার বাপের কাছে টাকা লইব না? তাহা হইলে এই গুণবানেরা কি মনে করেন যে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধেই কালিদাস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে "পিতরস্তেষাম্ কেবলম্ জন্মহেতবঃ"? সন্তানদের লালনপালন শিক্ষাদানটা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নয়, অন্যলোকদের

---

* এইরূপ পরিবর্ত্তন অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিয়াছেন।

কর্ত্তব্য? তাই যদি হয় তাহা হইলে ছেলের বাপ বঙ্গের বেয়াইরা ছেলের নিকট হইতে ভক্তি, সেবা, বার্দ্ধক্যে ভরণ পোষণ আদির আশা করেন কেন? শ্বশুরই যদি পাতা ও শিক্ষাদাতা হইলেন, তাহা হইলে তিনিই ঐ ছেলের, শুধু ভক্তিসেবা কেন, উপার্জ্জনেরও অধিকারী।

শিক্ষিত যুবকেরা প্রকারান্তরে পশুর মত বিক্রীত হন, অথচ তাহাতে তাঁহাদের পৌরুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠে না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যে ক্রয় করে, ক্রীত বস্তুতে তাহার স্বত্ব জন্মে না, ইহাও "উল্টো রাজার দেশে"র ব্যবস্থা।

কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি যে কলিকাতায় বিস্তৃত-হাতা-যুক্ত একটি বড় বাড়ী লইয়া বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বিলাতী পব্লিক স্কুলের মত একটি সাশ্রম বিদ্যালয় (Boarding school) স্থাপিত হইবে। ইহার সম্বন্ধে ঠিক সমস্ত খবর জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, ইহার জন্য বিলাত হইতে ইংরেজ শিক্ষক আনা হইবে, এবং বালকদিগের নিকট হইতে মাসিক ৫০৲ কিম্বা ৭৫৲ টাকা হিসাবে ব্যয় লওয়া হইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে জ্ঞানদান, মানুষের অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা বিকশিত করিয়া তুলা, মানুষের চরিত্রগঠন, এবং মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের ক্ষমতা জন্মান। আমরা দেখিতেছি যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষকেরা শিক্ষার এই কয়েকটি অঙ্গেই আপনাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তকে লিখিত বিদ্যা ছাত্রদের আয়ত্ত করিয়া দিতে বাঙ্গালী শিক্ষকেরা ভাল রকমেই পারেন, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগে আবিষ্কার- ও উদ্ভাবন-ক্ষমতা বিকশিত করিতে ইংরেজ অপেক্ষা বাঙ্গালী বেশী সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বাদ দিলে দেখা যায় যে উকীল ও ব্যারিষ্টারেরা সকলের চেয়ে বেশী রোজগার করেন। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালী উকীল ও বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বেশী টাকা পান, তাঁহারা বাল্যকালে বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকটই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের উপার্জ্জন-ক্ষমতা কম হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকের প্রভাব যে সব ছাত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও সাক্ষ্য দিবার জন্য জীবিত আছেন। জীবিত শিক্ষকদের নাম করিতে চাই না। কিন্তু ইহা বলাই যথেষ্ট যে সৎশিক্ষকের অত্যন্ত অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। মানুষ চিনিবার ক্ষমতা থাকিলে এবং কার্য্যতঃ গুণের আদর করিলে এখনও পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় সুশিক্ষক পাওয়া যাইতে পারে।

একপক্ষে ক্ষমতা ও অপর পক্ষে ভয়, ইহাতে মানুষ গড়ে না। চরিত্রগঠন এ উপায়ে হয় না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে ছাত্র স্বভাবতঃ শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণসকলের প্রভাবে ছাত্রের সদ্‌গুণ-সকলের বীজ অঙ্কুরিত ও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্বেত ও অশ্বেত জাতির পরস্পর মনের ভাব ও সম্বন্ধ যেরূপ, তাহাতে বাঙ্গালী শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে যতটা হৃদয়ের যোগ হইতে পারে, ইংরেজ শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ততটা হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় সাশ্রম বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শিক্ষক রাখাই কর্ত্তব্য।

আমরা ও আমাদের ছেলেরা সকলেই শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, শ্রদ্ধাবান্, আস্তিকশুচিতাসমন্বিত, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলা বোধ হয় অপ্রকৃত হইবে না যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোমল গুণাবলী অপেক্ষা দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রভৃতি পৌরুষব্যঞ্জক গুণের অভাব বেশী; এবং আমাদের মধ্যে আত্মীয়প্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমের অভাবই বেশী। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বিবেচ্য এই যে আমাদের বালকদের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময়, অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশে অবহেলা না করিয়া, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিকশিত করিয়া তুলিবার

বিশেষ ব্যবস্থা ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না। যদি তাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের মনের গতি, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য মনে করেন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন, যে ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে আমাদের এই-সকল সদ্গুণ বাড়িবার সম্ভাবনা? অতিমানুষ ব্যতিক্রমস্থল ইংরেজ কেহই নাই, বা থাকিতে পারেন না, ইহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সত্য যে ইংরেজেরা আমাদের ছেলেদের মধ্যে বাধ্যতা, সেলামপটুতা, তাঁহাদের সমক্ষে সভয় ব্যবহার, ইত্যাদি যতটা দেখিতে চান, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম সেরূপ দেখিতে চান না, সহ্য করিতেও পারেন না। স্বদেশে তাঁহারা দৃঢ়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতির বিকৃতি- ও বাড়াবাড়ি-জনিত বাঁদরামি ও ছেলেমানুষি যে চক্ষে দেখেন, এখানে তাহা দেখেন না; বরং তাঁহারা এগুলিকে বিদ্রোহিতা বা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞান করেন। সুতরাং ছেলেদের মনের উপর ইংরেজ শিক্ষকের শাসনভয়ের চাপ চাপাইয়া দিলে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেম বাড়িবে বলিয়া ত মনে হয় না। কুফলের আশঙ্কা একেবারেই থাকিবে না এরূপ বন্দোবস্তে কেহ কখন সুফল পায় নাই। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া চোট লাগিতে পারে, এমন কি অঙ্গহানি বা প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এটুকু মানিয়া না লইলে, পাকা ঘোড়সোয়ার প্রস্তুত হয় না। আমাদের ছেলেরা পুরুষবাচ্চার মত হয়, ইহা যদি আমরা চাই, তাহা হইলে কেহ কেহ রূঢ় হইয়াও যাইতে পারে, এ আশঙ্কার পরিহার একেবারে করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকেরা যদি এরূপ জাতির লোক হন, যাঁহারা নিজেদের অলক্ষিতেও ভাবিতে বাধ্য হন, "We must teach them their place", "তাদের স্থান যে আমাদের নীচে তা তাদের শিখাতে হ'বে," তাহা হইলে কেমন করিয়া মানুষ তৈয়ার হইবে? আসল কথা এই যে শিক্ষক যদি এইরূপ মনে করিতে পারেন যে "আমার ছাত্র যত বড় পণ্ডিত, যতই তেজস্বী, সাহসী, দৃঢ়চিত্ত হউক না, তাহাতে আমার বা আমার দেশের লোকদের কোন স্বার্থে ঘা পড়িবে না, প্রত্যুত তাহাতে আমার ও আমার স্বদেশের গৌরব, শক্তি, ও অধিকার বাড়িবে ও উন্নতি হইবে", তাহা হইলেই তাঁহার দ্বারা ছাত্রদের চরিত্র অভীষ্টরূপে গঠিত হইবে; অন্যরূপ শিক্ষকদের নিকট হইতে মনুষ্যত্বের অনুপ্রাণনা লাভের আশা সুদূরপরাহত।

বিলাতের পব্লিক্স্কুল হইতে যে-সব বালক মানুষ হইয়া বাহির হয়, তাহারা বাধা বিঘ্নের মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ উদ্ধার করিতে পারে, সঙ্কটে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করিতে পারে, এইজন্য, যে, তাহারা খুব স্বাধীনতা পায়, এবং সে দেশের সামাজিক হাওয়া ও রাজনৈতিক হাওয়া এইরূপ স্বাধীনতার পক্ষে। ঐ-সকল স্কুলের শিক্ষকদিগকে যদি রুশিয়ায় বা চীনে শিক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে ঠিক্ বিলাতের ছাত্রদের মত মানুষ তাঁহারা গড়িতে পারিতেন না। বিলাতে ঐসব স্কুলের ছাত্রদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় অনেক ছেলে যে বিগড়াইয়া যায় না, তাহা নয়; কিন্তু যাহারা উত্‌রায় তাহারা ভারী ভারী কাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে। পব্‌লিক স্কুলগুলির শিক্ষা-পদ্ধতি বা তাহাদের আদর্শ যে সব দিক্ দিয়াই ভাল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, দেশে দেশী শিক্ষকদের দ্বারা চালিত যে-সব স্কুল আছে, তৎসমুদয়ের দ্বারা বক্ষ্যমাণ আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র গঠিত হইতেছে কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে মোটের উপর তাহা হইতেছে না বটে; কোথাও যে একটুও হইতেছে না, তাহাও নয়। কিন্তু অনেক টাকা বিদেশীর পকেটে ঢালিয়া দিয়া, চরিত্র-গঠন হিসাবে অধিকাংশ দেশী স্কুলগুলিরই মত অথবা তদপেক্ষা অধম আর একটি স্কুল বাড়াইবার কি প্রয়োজন? ইংরেজ শিক্ষক রাখার মানেই এই যে দেশী ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। না পাওয়া দেশের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। দেশী ভাল শিক্ষক পাইবার সম্যক্ চেষ্টা না করিয়া দেশের এরূপ অগৌরব হইতে দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

শিক্ষার মধ্যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া নির্ভুল ইংরেজী বলা, এবং ভাল ইংরেজী লেখার কথা উঠিতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে স্কুলে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট পড়েন নাই বা শিক্ষা লাভার্থ বিলাত যান নাই, এমন অনেক বিখ্যাত লোক ইংরেজী বেশ বলেন ও লেখেন। ইংরেজী বলা ও লেখা শিখিবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। তবে, এটা ঠিক্ বটে যে যাহারা ইংরেজের কাছে না পড়িয়াও ভাল উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারা ইংরেজের কাছে পড়িলে হয়ত আরও ভাল উচ্চারণ করিতে পারিত; এবং ইংরেজের কাছে শৈশবে ইংরেজী কহিতে ও পড়িতে শিখিলে যতটা খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ হয়, দেশী শিক্ষকের নিকট শিখিলে ততটা হয় না। যথাসম্ভব খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ যদি শিক্ষার একটা খুব দরকারী অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য নীচের দু একটি ক্লাসে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী রাখাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের দ্বারাই ইংরেজ শিক্ষক অপেক্ষা ভাল কাজ অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে পাওয়া যাইবে। গ্রামোফোন দ্বারা বিদেশী ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইতেছে। যে-সব স্কুলের অর্থবল নাই, তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

যে ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, সেই ভাষা *ঠিক* তাহাদের মত উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারা শিক্ষার একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ফাদার লাফোঁর উচ্চারণ ইংরেজের মত ছিল না, ডাক্তার থিবর উচ্চারণ ইংরেজের মত নয়। ভারতপ্রবাসী আরও অনেক ফরাশিশ ও জার্ম্মেন পণ্ডিতের উচ্চারণে দোষ আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা কমে নাই, গুণবত্তারও লাঘব হয় নাই। ভারতপ্রবাসী অনেক স্কচ্ ও আইরিশ রাজকর্ম্মচারীরও উচ্চারণ ত আদর্শ ইংরেজী উচ্চারণের মত নহে। সত্য বটে ইংরেজী আমাদের রাজভাষা, ফরাসী ও জার্মেনদের রাজভাষা নহে। কিন্তু আমাদের দেশী ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রভৃতি কাহার উচ্চারণ *ঠিক* ইংরেজের মত নহে বলিয়া বিন্দুমাত্রও কাজের ক্ষতি হইতেছে? আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধ উচ্চারণেরই পক্ষপাতী; কিন্তু উচ্চারণটাকে এত উচ্চ স্থান দিতে পারি না যে তজ্জন্য অকারণ অর্থব্যয়, এবং সময় ও শক্তি নিয়োগ করিব, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহেলা করিব।

বিলাতী আদবকায়দা শিখাইবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক রাখা দরকার, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ছেলেবেলা ইংরেজশিক্ষকের কাছে না পড়িলেও যে উক্তরূপ আদবকায়দা শিখা যায়, উদ্যোক্তাদের মধ্যেই ত তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান। বিলাতী ফ্যাশনদুরুস্ত্ পোষাক পরিতে শিখিবার জন্যও বাল্যে ইংরেজ শিক্ষকের অনাবশ্যকতার অনেক শরীরী প্রমাণ চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও অন্যত্র অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আদবকায়দা ও পোষাকের মধ্যে গুরুতর কথা প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা পাশ্চাত্য আদবকায়দা ও পোষাকের নিন্দা করি না, অন্তরেও কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি না। পাশ্চাত্য লোকদের সঙ্গে মিশিতে হইলে তাঁহাদের শিষ্টাচার জানা দরকার, তাহাও স্বীকার করি। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে আমাদের নিজের দেশের আদবকায়দা ও পোষাককে আমরা হীন মনে করি না, তাহার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিতও নহি। যদি গায়ের রঙ্গে ও আর সব বিষয়ে আমাদের ইংরেজদের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা মিশিয়া যাইতে চাহিতাম না। তাহার কারণ অনেক। প্রথম কথা ত এই যে বাহিরে মিশিয়া গেলেও অন্তরের অনুভূতিটা মরিত না যে আমরা ইংরেজ নহি, আমরা বাহিরে যা বস্তুতঃ তাহা নহি। তা ছাড়া, বিধাতা যে সবাইকে ইংরেজ করেন নাই, ভারতবাসীও গড়িয়াছেন, ইংরেজও গড়িয়াছেন, তাহার কারণই এই যে তাঁহার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিবে; ভারতবাসীর সাধনা ও সিদ্ধি যাহা তাহা ছাড়িয়া সে নকল-জিনিষ কেন সাজিবে, ইংরেজই বা তাহার সাধনা ও সিদ্ধি ছাড়িয়া নকল ভারতবাসী কেন সাজিবে? যে সৈনিক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান (post of duty) ছাড়িয়া অন্যত্র যায়,

তাহাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না, বরং সে দণ্ডিত হয়। আমরা ভারতবাসী হইয়া জন্মিয়াছি; তাহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, লাঞ্ছনা আছে। ভারতবাসীই থাকিয়া নিজের পৌরুষ দ্বারা আমরা সে সব দূর করিব, কোন রকম সোজা উপায়ে সংগ্রাম পরিহারের চেষ্টা দেখিব না। একজন মানুষ কোথায় জন্মে, তাহাতে তাহার নিজের কোন কৃতিত্বও নাই, অপমানও নাই। একজন শাসকদেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই বড় ও শ্রদ্ধেয়, আর একজন অধীন দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই ছোট ও অবজ্ঞেয়, ইহা কেন মনে করিব? নিজের জীবনে কে কি করিল, বিধাতা যাহাকে যে দেশে পাঠাইয়াছেন তাহার অবস্থা-বেষ্টনীর মধ্যে সে মনুষ্যত্বের কি পরিচয় দিল, ইহাই জিজ্ঞাস্য। তদনুসারেই সে ছোট বা বড়।

আমি যে ভারতবাসী হইয়াছি, তাহাতে আমার দোষও নাই, গুণও নাই। আগে হইতে আমি পরাজয় মানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট কেন করি? চিরকালের জন্য, এমন কি একবারও, প্রত্যেক ভারতবাসীর চেয়ে প্রত্যেক ইংরেজের বা ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়া যায় নাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের দেশ ও জাতি পরাজিত বা জয়ী, ছোট বা বড় হইতেছেন। আমাদিগকে যদি বড় হইতে হয়, ভারতীয় থাকিয়াই হইতে হইবে; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে,—অন্য পথ নাই। নকল হইতে ও নকল করিতে গিয়া আগে হইতেই আপনাকে ছোট বলিয়া মানিয়া লই কেন?

শুধু প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের নিকট হইতে নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস-কাল ধরিয়া নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মীর মিলিত চেষ্টা ও সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সভ্যতার একটি আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এখনও বিকাশ পাইতেছে। উহার আভাস আমরা দিতে পারি কি না জানি না; পারিলেও এখন তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এই আদর্শ এত বড় জিনিষ, উহা এত মূল্যবান্, যে, প্রভুত্বের গৌরবের বিনিময়েও, উত্তরাধিকারসূত্রে উহাতে আমাদের দাবী আমরা ছাড়িতে পারি না। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষে মন স্তম্ভিত হয়, যে, নানাজাতি দ্বারা ভারত আক্রমণ ও তজ্জনিত জাতি-সংঘর্ষ ও সভ্যতা-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াও আমাদের জাতীয় সভ্যতা পুষ্টি লাভ করিতেছে।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি তোমরা এই চাও যে চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ থাকিয়া যাক? সব জাতির মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব না হউক? না, আমরা ঐক্য চাই, বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু "আমরা" "তাহারা" হইয়া গিয়াছি বা হইব, এইরূপ ভাণ বা চেষ্টা করিয়া অনৈক্য ও বিরোধ এবং তজ্জনিত অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার পাইতে চাই না। ল্যাংড়া আম ও বোম্বাই আমের ঐক্য এইখানে যে উভয়েই আম; কেহ ত বলে না যে ল্যাংড়া আম ও বোম্বাই আমের আম্রত্ব বিষয়ে একতা ততদিন প্রতিপন্ন হইবে না যতদিন ল্যাংড়া বোম্বাই বা বোম্বাই ল্যাংড়া না হইতেছে। "বিশ্বমানব" বলিয়া যে একটি ধারণা ও আদর্শ আছে, তাহা এই জন্য বিরাট ও মহৎ যে কত রকমের কত প্রকৃতির কত বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট মানুষের খণ্ড আদর্শ ও ধারণা তাহার অঙ্গীভূত। প্রত্যেক বিশেষ মানবের মধ্যেই বিশ্বমানবের অভিব্যক্তি; বিশ্বমানব বলিয়া স্বতন্ত্র একটা কোন জিনিষ নাই। একত্ব মানে একঘেয়ে অভিন্নত্ব নয়।

এক একটি জাতি বিশ্বমানবের এক একটি বড় অঙ্গ। এই এক এক অঙ্গের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্বৈষম্য লুপ্ত না হইলে বিশ্বমানবের ঐক্য সুদূরপরাহত। যাহারা চীন তাহাদের কেহ কেহ ইংরেজ হইয়া যাইতে চাহিলে, বাহিরে ভদ্রতার খাতিরে ইংরেজেরা তাহাদিগকে কিছু না বলিলেও তাহাদিগকে অভিন্ন আত্মীয় বলিয়া কখনই মনে করিবে না। অধিকন্তু চীন জাতির অধিকাংশের সঙ্গেও ঐ চীনদের একটা অমিলের রেখা গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে চীন জাতির চীন থাকিয়া উন্নতি হইলে, তাহাদের পক্ষে ইংরেজের অকপট শ্রদ্ধা লাভ অসম্ভব নহে।

শক্তিশালী ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে হইলে আমাদেরও সমস্ত দেশটা জাতিটা এক হওয়া চাই। আমরা জানি, যে-সকল নিরক্ষর চাষার অন্নে অক্ষরজ্ঞ শুভ্রবসনপরিহিত আমরা প্রতিপালিত, তাহাদের মধ্যে

তাহাদের হৃদয়ের গুণে ভক্তিভাজন অনেক লোক আছেন। অথচ আমরা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছি বলিয়া, পা হইতে গলা পর্য্যন্ত আমাদের শরীরের অধিকাংশ আবৃত থাকে বলিয়া, আমাদের ঘরবাড়ী চাষাদের ঘরবাড়ীর চেয়ে ভাল বলিয়া, আমাদের কথা-বার্ত্তা শহুরে বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছাসত্বেও যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ইহার উপর পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, পাশ্চাত্য আদবকায়দা, পাশ্চাত্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্ব্বাহপ্রণালী, পাশ্চাত্য গৃহস্থালির ছাঁচ আমদানী করিয়া, আর-একটা অমিলের সৃষ্টি করা আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। ছোটখাট বিষয়ে পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারে, এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকও আছে, কিন্তু আসল ছাঁচ, ঠাট বা কাঠামো (যাহাই নাম দাও) দেশী থাকা চাইই চাই।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি যেরূপ ব্যয়সাধ্য হইবে, তাহাতে ইহাতে কেবল বেশ সচ্ছল অবস্থার লোকদের ছেলেরাই পড়িতে পারিবে। তাহার কুফল প্রধানতঃ দুই প্রকার হইবার কথা। প্রতিভা ধনীর গৃহে যেমন, গরীবের ঘরেও অন্ততঃ সেই পরিমাণে জন্ম গ্রহণ করে। বোধ হয়, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের গৃহেই অধিকসংখ্যক প্রতিভাশালী লোক জন্মিয়াছে। যত বেশী নানা শ্রেণীর প্রতিভাশালী ছাত্রদের প্রতিযোগিতা ও সাহচর্য্য ঘটে, শিক্ষার ও শক্তির স্ফুরণের তত বেশী সুবিধা হয়। কেবল ধনশালী লোকদের ছেলেরা একটি স্কুলে পড়িলে যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রতিযোগিতা ও সাহায্য ঘটিতে পারে না। জন-কতক অনুগ্রহভাজন দরিদ্রতর বৃত্তিভোগী ছাত্র লইয়া এই দোষ সংশোধন করা যায় না। কেবল ধনশালী ছাত্রেরা এক সঙ্গে পড়িলে তাহাদের পার্থক্যবোধজনিত একটা সংকীর্ণ শ্রেণীগত অহঙ্কার জন্মান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভাল নয়।

যে যত বেশীসংখ্যক মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করিতে পারে, সে তত মহৎ ও শক্তিশালী হয়। ঐক্যের অনুভূতিই বড় জিনিষ। অনৈক্য মানুষকে ছোট ও দুর্ব্বল করে। তিনি তত বড় কবি, যিনি যে পরিমাণে বিশ্বমানবের হৃদয়ের অনুভূতিকে নিজের করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। তিনি তত বড় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যিনি যে পরিমাণে বিশ্বমানবের আত্মার ক্ষুধা নিজে অনুভব করিয়া সাধনার দ্বারা তাহার নিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন ঋষিকবি যে বলিয়াছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং
সংবো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

তাহার মধ্যে জাতীয় শক্তি লাভের অমোঘ উপায় নিহিত রহিয়াছে।

কাগজে এইরূপ বাহির হইয়াছে যে কালীঘাটে সম্প্রতি যে ব্রাহ্মণ মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে যে-সকল ব্রাহ্মণ সমুদ্র পার হইয়া বিদেশ যাত্রা করে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তথাকার গবর্ণমেণ্ট যে-সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত হইতে ব্যবস্থাপক সভায়, জনসাধারণের সভা সমিতিতে এবং সমুদয় দেশী সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণ নিরস্ত্র প্রতিরোধের (Passive resistance) পথে প্রতিকার খুঁজিতে গিয়া দলে দলে জেলে গিয়াছেন। তাঁহাদের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেণীর লোক ২।১ মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর চাঁদা দিয়াছেন ব্যবস্থাপক সভার প্রতিবাদকারী সভ্যদের মধ্যে, প্রতিবাদ সভার বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে, প্রতিবাদকারী সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক, লেখক ও গ্রাহকদের মধ্যে অতি নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির হিন্দু আছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী হিন্দুদের মধ্যেও বিস্তর ব্রাহ্মণ আছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই যে প্রতিবাদ হইল তাহা

ভূয়োঃ এত যে চাঁদা উঠিল তাহা কি, নিরর্থক ? তাহা নয়। দেশের লোকেরা নিশ্চয়ই চান যে, যে যে দেশে ভারতবাসীর প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হইতেছে, সেই সব দেশে,—দক্ষিণ আফ্রিকায়, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, মার্কিন সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A.), সর্ব্বত্র, ভারতবাসীর জন্য দ্বার খোলা থাকে। তাহা হইলে যাঁহারা কালীঘাটে বিদেশযাত্রীদিগকে বর্জ্জন করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের প্রতিনিধি তাঁহারা নহেন। কারণ দেশের লোক আপনা হইতে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিতেছে, "হে বিদেশী শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকেরা, আমাদের জা'ত্-ভাইদিগকে তাড়াইয়া দিও না। তাহাদের জন্য দ্বার খুলিয়া রাখ। তাহারা তোমাদের দেশে গিয়া, বা যাইবার ইচ্ছা করিয়া, কোন অন্যায় কাজ করে নাই। তাহাদের যাওয়া আবশ্যক।" পক্ষান্তরে কিন্তু কালীঘাটে সম্মিলিত পণ্ডিতেরা পরোক্ষভাবে ইহাই বলিতেছেন, "হে বিদেশী শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ, তোমরাই হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম ঠিক্ বুঝিয়াছ। যে হিন্দু সমুদ্র ডিঙাইয়া বিদেশে যায়, সে অধর্ম্ম করে। এই অধর্ম্ম যাহাতে আর তাহারা করিতে না পারে, তোমরা তাহার উপায় করিয়া হিন্দুর পরম বন্ধুর কাজ করিতেছ। তোমরা বাঁচিয়া থাক।" আমাদের বিবেচনায় এই পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা দরখাস্ত যাওয়া উচিত যে সরকার বাহাদুর যেন দয়া করিয়া হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়া দেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, প্রভৃতির গবর্ণমেণ্ট যে হিন্দুদিগকে তাড়াইবার নানা ফন্দী আঁটিয়াছেন, তাহার সমর্থন করেন।

শিক্ষার জন্য, বাণিজ্যের জন্য, নানা দেশের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হৃদয়মনের সংকীর্ণতা দূর ও উদারতা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিদেশযাত্রার প্রয়োজন। যে মানুষ আপনাকে গৃহের বদ্ধবায়ুতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, বাহিরের মুক্ত বাতাসে বিচরণ করে না, সে সুস্থ সবল থাকিতে পারে না। যে জাতি, কূপমণ্ডূকবৎ, সমুদয় বিদেশের সঙ্গে সংস্পর্শ যথাসম্ভব পরিহার করে, তাহা সতেজ ও সজীব থাকিতে পারে না।

ধর্ম্মের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে বলি, যাহাতে হিন্দুকে শক্তিশালী করে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। সংখ্যাবৃদ্ধিও শক্তিবৃদ্ধির একটা পথ এবং শক্তিশালিতার একটা লক্ষণ। মুসলমানের ও খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, হিন্দুর সংখ্যা সেরূপ বাড়িতেছে না। বরং হাজার হাজার হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। তাহার উপর সমুদ্রযাত্রার "অপরাধে", এবং সমুদ্রলঙ্ঘকের সংস্পর্শরূপ "অপরাধে" যদি পণ্ডিতবর্গ কতকগুলি হিন্দুকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আত্মঘাতী নীতি আর কি হইতে পারে? মানবের হিতকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জগতের নানাদেশে, নরহত্যাকারীদিগকেও ফাঁসী না দিয়া উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা আবার যে তাহাদিগকে সমাজের অঙ্গীভূত করা যায় এবং করা উচিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। সমুদ্রলঙ্ঘকেরা কি নরহন্তার চেয়েও অধম যে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণসভা একেবারে সংশোধনের বাহিরে ফেলিয়া বর্জ্জনের পরামর্শ দিতেছেন? আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা একঘরে করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা নিজেই দুর্ব্বল ও একঘরে হইয়া পড়িবেন। তাঁহাদিগকে এখনই লোকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ভবিষ্যতে মোটেই পুছিবে না।

অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিবেন। কিন্তু শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার সমর্থক বিধিরও অত্যন্তাভাব নাই। তা ছাড়া, শাস্ত্র সমুদ্রবৎ। অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষ পাইলেন, দেবতারা অমৃত ও নানা রত্ন উদ্ধার করিলেন। শাস্ত্র হইতে যাঁহারা হিন্দুজাতির জীবনীশক্তি নাশের বিষ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর বন্ধু নহেন।

হিন্দু সমুদ্রপারে যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বলীদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। জাপানকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের গর্ব্ব করিব, আবার প্রকারান্তরে তাহাদিগকে ও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসারকদিগকে পাতকীও বলিব, এটা কেমন ব্যবহার?

এ বিষয়ে শাস্ত্রিক বিচারও একজন শিক্ষিত হিন্দু বৈশাখের প্রবাসীতে করিবেন। এবার স্থান হইল না।

পূর্ব্বে দামোদরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে বাঁধ ছিল। তদ্দারা উভয় পার্শ্বের গ্রামগুলি বন্যাহইতে রক্ষিত থাকিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। নদীর দুই দিকে বর্দ্ধমানরাজের জমীদারী থাকায় বাঁধ রক্ষার ভার বর্দ্ধমানের মহারাজাদের উপরই ছিল। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট এই ভার লন, এবং তজ্জন্য বর্দ্ধমান রাজ হইতে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬০,০০১ টাকা খাজনা গ্রহণ করিতে থাকেন। এখন বার্ষিক ৫৭৩৯০৷৷১০ লইতেছেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দামোদরের পশ্চিমতীরের কুড়িমাইল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। অতিরিক্ত খাজনাটা কিন্তু এখনও গবর্ণমেণ্ট লইতেছেন। বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলার উদ্দেশ্য বোধ হয় গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোড্ নামক রাস্তা ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রক্ষা, এবং দামোদরের বন্যার সহিত বালি আসিয়া কলিকাতার বন্দর যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। কারণ এক দিকে বাঁধ না থাকায় বন্যার জল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তথাকার মাঠের উপর ঐ বালির স্তর স্তূপীকৃত হইতে থাকে।

গবর্ণমেণ্ট যে সর্ত্তে বর্দ্ধমানরাজ হইতে বার্ষিক ৫৭০০০৲ লন, সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করায় প্রধানতঃ বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার আটশত গ্রামে প্রতি বৎসর বন্যার জল ঢুকে। তাহাতে বালি পড়িয়া লোকের ধানের ক্ষেত নষ্ট হয়, ঘর বাড়ী ভাসিয়া বা পড়িয়া যায়, শস্য নষ্ট হয়, উঁচু যায়গায় সাপ আশ্রয় লওয়ায় সর্পাঘাতে অনেকের প্রাণ যায়, পানীয় জলের পুকুরে বন্যার কর্দ্দমাক্ত জল ঢুকায় লোকের ওলাউঠা, আমাশয়াদি হয়, নানা স্থানে জল জমিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করিয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ও প্রাণনাশের কারণ হয়, ইত্যাদি। প্রজাদের এবম্বিধ কষ্ট সত্ত্বেও আবার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদিকের আরও দশ মাইল বাঁধ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লোকের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি দেশের জনহিতকর সভা, জমীদার- ও ব্যবস্থাপকসভার সভ্য কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি অনেক বার আকৃষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও মধ্যে মধ্যে "সহানুভূতিপূর্ণ" জবাব দিয়াছেন, এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ প্রজাদের দুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নাই। এই সব এবং আরও অনেক কথা প্রমাণপ্রয়োগ সহ এবং গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র প্রভৃতির নম্বর ও তারিখ উল্লেখ পূর্ব্বক সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় মৌলবী মজহরুল আনোআর চৌধুরী মহাশয় স্পষ্টবাদিতার সহিত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজও মন খুলিয়া দু চার কথা বলেন। শেষে গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে ফিনিমোর সাহেব বলেন যে মিষ্টার এ, উইলিয়মস্ এই গুরুতর বিষয়টির তদন্ত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন; রিপোর্ট পাইলে যাহা করা সম্ভব, তাহা করিবেন। ফলেন পরিচীয়তে।

ভারতসাম্রাজ্যের ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেল যে ভারতগবর্ণমেণ্ট শিক্ষার জন্য নয় লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছয়লক্ষ টাকা, রেলওয়ে বাড়াইবার জন্য আঠার কোটি টাকা, সৈনিকবিভাগের জন্য ত্রিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, এবং দিল্লী নির্ম্মাণের নিমিত্ত এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি গবর্ণমেণ্ট কিরূপ দরকারী মনে করেন, তাহা ব্যয়ের বরাদ্দ হইতেই বুঝা যাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী। তাহাও শতকরা আট জন নহে। ভারতবর্ষে লেখা পড়া শিখিবার বয়সের প্রত্যেক এক হাজার বালক ও যুবকের মধ্যে কেবলমাত্র ২৬৮ জন শিক্ষালয়ে যায়, ঐ বয়সের প্রত্যেক হাজার বালিকার মধ্যে কেবল ৪৭ জন বিদ্যাগারে যায়। এইরূপ যে-দেশের অবস্থা তথায় শিক্ষার জন্য নয় লক্ষ টাকা, একটা অনাবশ্যক রাজধানীর জন্য এক কোটি টাকা, যুদ্ধবিভাগের জন্য ত্রিশকোটি-টাকা, এবং রেলের জন্য আঠার কোটি

টাকা ব্যয় কেমন কেমন শুনায়। অথচ শুনিতে পাই, ইংরেজ রাজভৃত্যেরা আমাদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বড়ই উৎসুক, কেবল টাকার অভাবে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে না। ২।১০ বৎসর রেল অল্প অল্প করিয়া বাড়াইলে কি ক্ষতি ছিল? লক্ষ লক্ষ লোক প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে মরিতেছে। তাহার জন্য কেবল ছয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা কি সঙ্গত?

আয়ব্যয়-বিবরণ হইতে একটা বড় চমৎকার খবর পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগে ব্যয় করিবার জন্য যত টাকা দিয়াছিলেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি তাহার সমস্ত ব্যয় করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা দেশে নিরক্ষর বালক বালিকা বা রুগ্ন নিঃসম্বল মানুষ বা অস্বাস্থ্যকর শহর ও গ্রাম আর একটিও খুঁজিয়া পান নাই। আমরা জানিতাম না যে আমরা এরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত নিরাময় স্বর্গপুরীতে বাস করি। ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বা তাঁহাদের জন্য গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত যদি এই টাকা মঞ্জুর হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই তাহা খরচ করা এত কঠিন হইত না। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় বাহির হয়!

আমরা যুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে গিয়া মাঝে মাঝে বড় উভয়সঙ্কটে পড়ি। কখন কখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরেরা বলেন, যে যথেষ্ট টাকার অভাবে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না*। অথচ দেখিতেছি, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি টাকা পাইয়াও খরচ করেন না। এ রহস্য বুঝা ভার।

আমরা অবগত হইলাম, বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার হার্বার্ট এ ষ্টার্ক বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া রিপোর্টে উহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"concreted in this School a scheme of studies which retained the traditional ideals of India without rejecting the best features of English public schools.... The Bidyalay, removed from the busy haunts of men, is picturesquely set amid groves of shady trees on the healthy uplands of Bolpur. It has 180 boarders—all the sons of Indian gentlemen. They wake in the early morning, get ready for the day, tidy their beds, say their private prayers......and then assemble to recite together petitions from the Upanishads and other sacred books. The teachers meet for supplication before they enter upon and after they have completed the duties of the day. In addition to their general studies the boys are taught to be self-reliant, to be helpful to one another, to be courteous to all, to attend on visitors, to be dutiful, unselfish and God-fearing. The monitorial system has been introduced with marked success, and the senior boys are given an important share in maintaining discipline and enforcing good conduct, through their own courts of enquiry, from which their lies an appeal to the Council of Masters............Studies proceed by a self-contained syllabus, which gives a sound and generous education,...........Indeed, examinations of all sorts are tabooed, as also everything savouring of cram.......................

Remarkable as is the entire conception and organisation of the school, more striking for Bengal is the attitude of the pupils to agrarian studies. They tend the farm cattle, and take a pride in doing so. They were not ashamed to groom and milk the cows they exhibited at the Annual Exhibition this year at Suri.

And yet, sad to tell, for some time this school was under a political cloud."...........&c.

ষ্টার্ক সাহেব শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কোন কোন ইংরেজকে আনিয়া আশ্রম দেখাইয়াছেন ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের আফিসের অন্যান্য বিদ্যালয়পরিদর্শকদিগকে এস্থান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুকূল ভাব থাকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে এ বৎসর গত বৎসরের মত ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ছেলেরা সহজেই অনুমতি

* যথা—"It has been customary at the end of this chapter to utter a jeremiad about the want of funds." U. P. Public Instruction Report, 1912. "But the attainment of this ideal depends, of course, largely on the extent of the grants that will be available." *Do.*, for 1913.

পাইয়াছে। * আমরা শুনিয়াছি যে তিনি বীরভূম জেলার অন্যত্র স্কুলের অধ্যক্ষদিগকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদিগকে পাঠাইয়া তথাকার শিক্ষাপ্রণালী দেখাইয়া আনিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার বিভাগের স্কুলগুলির এবং ছাত্রদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বি এ পর্য্যন্ত পড়াইবার অনুমতি পাইবার জন্য উহার ঘরবাড়ী বড় করা এবং অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে উন্নতি করা আবশ্যক, ভারত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সব উন্নতি করিবার জন্য যত টাকার প্রয়োজন মৈমনসিংহের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি এক কমিটী তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। এ পর্য্যন্ত ছাব্বিশ হাজার টাকা উঠিয়াছে। এ দিকে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বিলম্ব করিলে আগামী জুন মাস হইতে বি এ শ্রেণী খুলিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইজন্য কমিটির সভ্যগণ নিজেদের দায়িত্বে বাকী চব্বিশ হাজার টাকা ধার করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া ফেলিয়াছেন। দেশভক্তের মত কাজই ত এই।

এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার প্রশ্নপত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছিন্ন পত্র" হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে বলা হইয়াছে—"Rewrite the following in chaste and elegant Bengali," "নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিকে মার্জ্জিত শুদ্ধ সুন্দর বাংলায় লেখ"। হওয়া করা প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যের আর সমুদয় অংশ যতই সংস্কৃতের মত হইবে, বাংলাটা ততই শুদ্ধ মার্জ্জিত সুন্দর হইবে এই সংস্কার এখনও বদ্ধমূল হইয়া আছে। প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথিত বাংলায় লিখিয়াছেন, তাহা কেতাবী বাংলায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। কিন্তু কথিত বাংলা chaste এবং elegant হইতে পারে না, কেতাবী বাংলা হইলেই chaste ও elegant হয়, ইহা মনে করা ভুল।

অনেক ছাত্রের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। এক মাসের মধ্যে আরও অনেকের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কি করিবে? পরীক্ষার অতিরিক্ত পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অনেকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কাহারও কাহারও নানা প্রকার পীড়া হয়। পরীক্ষিতদের প্রথম কর্ত্তব্য বিশ্রাম চিকিৎসাদি দ্বারা আবার সুস্থ সবল হইয়া উঠা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য দেশকে জানা। যাঁহারা বেশী কিছু পারিবেন না, তাঁহারা নিজ গ্রাম বা শহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সকলের বিষয় নিজ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে চেষ্টা করুন। তথাকার নদীর উৎপত্তি কোথায়, কোন্ কোন্ স্থান দিয়া উহা গিয়াছে, কোথায় পড়িয়াছে, উহার স্রোতের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, উহার সহিত গ্রামের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধির সম্পর্ক কি, জানিতে চেষ্টা করুন। গ্রামে বা শহরে বা তন্নিকটে পুরাতন মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ থাকিলে তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করুন। গ্রামের ও শহরের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী, তত্রত্য বিখ্যাত পরিবার ও লোকদের সম্বন্ধে গল্পআদি সংগ্রহ করুন। সর্ব্বাগ্রে নিজ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলুন; স্থানীয় নৈসর্গিক ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের খবর লউন। তাহার উন্নতি করিবার ও কাট্‌তি বাড়াইবার উপায় চিন্তা করুন। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেমন করিয়া ভাল হয় বা থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখুন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, বিশেষতঃ নিরক্ষর গরীব লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অবস্থা জানুন ও তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করুন। এ সকল একটা শুষ্ক কর্ত্তব্যের তালিকা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। ইহাতে ছাত্রগণ আনন্দ পাইবেন, জন্মভূমিকে নূতন চোখে দেখিতে শিখিবেন, স্বদেশপ্রেম একটা ভাসা ভাসা ভাবুকতার মত জিনিষ না থাকিয়া স্পষ্ট অনুভূতির বিষয় হইবে।

যাঁহাদের সুবিধা হইবে, তাঁহারা নিজের জেলার

---

* শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত নহে বলিয়া উহার ছাত্রদিগকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মত অনুমতি লইতে হয়।

… করিয়া দেখিয়া চিনিয়া লইবেন। যাঁহাদের …র্থক এবং অন্যান্য সুবিধা আরও বেশী তাঁহারা বঙ্গের …া স্থানে, কেহ কেহ বা বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া, ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা করিবেন। তাহা হইলে প্রদেশে প্রদেশে নানা পার্থক্যের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য-…এর সন্ধান তাঁহারা নিজে সাক্ষাৎ ভাবে ধরিতে পারিবেন, দেশমাতা তাঁহাদের নিকট মূর্ত্তিমতী হইবেন, ইতিহাস সজীব হইয়া উঠিবে, শিরায় শিরায় তাহার শক্তি …া করিতে থাকিবে। পর্ব্বত আরোহণ ও পর্ব্বতে ভ্রমণে যেমন শরীর সবল ও দৃঢ় হয়, মন যেমন উন্নত ও বিমল আনন্দে পূর্ণ হয়, সাহস, বিপদে উপস্থিতবুদ্ধি, এবং পৌরুষও তেমনি বৃদ্ধি পায়। পর্ব্বত বাঙ্গালী ছাত্রদের অনধিগম্য নহে।

দেবঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতির কথা আমরা শুনিয়াছি। দেশঋণও একটি প্রকৃত ঋণ। ইহা কল্পনা নহে। কেবল শিক্ষার ঋণই ধরুন। আগে কলেজে শিক্ষার ব্যয়ের কথা বলি। সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে একটি ছাত্রকে কলেজে শিক্ষা দিতে বৎসরে ১৭৫৲ এক শত পঁচাত্তর টাকা খরচ পড়ে। প্রত্যেক ছাত্রের নিকট গড়ে ৬৮৷/০ আটষট্টি টাকা পাঁচ আনা বেতন পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বাকী ১০৭ টাকা আর কেহ দেয়। তাহা সরকারী খাজনাখানা হইতেই আসুক, দেশের লোকের চাঁদা হইতে আসুক, বা ধনীদের প্রদত্ত প্রভূত অর্থের সুদ হইতেই আসুক, শেষে গিয়া দাঁড়াইবে এই যে …া দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকেরা দিতেছে। কারণ গবর্ণমেণ্টের খাজনার অধিকাংশ নিরক্ষর চাষারা দেয়, জমীদারের, উকীল ব্যারিষ্টারের আয়ও এক আধ হাত ঘুরিয়া আসে, কিন্তু আসে এই নিরক্ষর চাষাদের নিকট হইতে। সুতরাং আমরা আমাদের শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ের জন্য ঋণী দেশের নিরক্ষর চাষাদের নিকট।

এই ঋণের কথা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। যাঁহারা কলেজে পড়েন, তাঁহারাই যে কেবল ঋণী তাহা নহে; যাঁহারা এণ্ট্রেন্স স্কুলে, মাইনর স্কুলে, ছাত্রবৃত্তি স্কুলে, পাঠশালায় পড়েন, তাঁহারাও প্রত্যেকে ঋণী।

সমস্ত ভারতবর্ষে গড়ে এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য বৎসরে ২৬৷/০ ছাব্বিশ টাকা পাঁচ আনা খরচ হয়। প্রত্যেক ছাত্র বেতন দেয় গড়ে ১৪/১০। সুতরাং বাকী বার্ষিক ১২৷৵১০ প্রত্যেক ছাত্রের ঋণ।

পাঠশালায় ছাত্র-প্রতি বার্ষিক ব্যয় হয় ৪৷৵০, প্রতি ছাত্র বেতন দেয় ৮৵১০, বাকীটা ঋণ।

পাঠশালায় ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবং কলেজে ছাত্রদের জন্য যে মাসিক বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট আছে, ধনীর ছেলেও তার চেয়ে বেশী বেতন দেন না। সুতরাং তিনিও নিজের শিক্ষার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ নিজে করেন না। তিনিও নিরক্ষর দরিদ্র চাষার কাছে তাঁহার শিক্ষার জন্য ঋণী।

ইহাই একমাত্র ঋণ নহে। আমরা সত্যসত্যই দরিদ্রদের শ্রমজাত অন্নে প্রতিপালিত। তদ্ভিন্ন কত লোকে বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে স্নেহ করিয়াছে, কত লোকের নিকট আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কত প্রকার উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

এই দেশঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যদি সমস্ত দেশের শিক্ষিত লোকেরা ও ছাত্রেরা একপরিবারভুক্ত হইতেন, তাহা হইলে বলিতাম, আপনারা ঋণ পরিশোধের জন্য আপনাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পাঁচজনকে দেশের শিক্ষা ও অন্য প্রকার সেবার জন্য উৎসর্গ করুন। অথবা প্রত্যেকে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্ততঃ প্রথম একটি বৎসর শিক্ষাদান কার্য্যে বা অপর দেশহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করুন। আমরা সকলে রক্তের সম্পর্কে একপরিবারভুক্ত না হইলেও, স্বেচ্ছায় উক্ত প্রকারে ঋণশোধের চেষ্টা করিতে পারি। তাহা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। ঋণী হইয়া থাকা কি ভাল?

যাঁহাদের শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাঁহারা এখন পরীক্ষান্তে ও পুনর্ব্বার শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি কয়েকজন নিরক্ষর বালকবালিকাকেও লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের ঋণ কিছু শোধ করা হইল মনে করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

আমাদের ছেলেরা অর্দ্ধোদয় যোগের সময়, গত দামোদরের ভীষণ বন্যার সময়, এবং আরও কত সঙ্কট-

কালে দেখাইয়াছে যে তাহারা সাহসে হীন নয়, আত্মোৎসর্গে পশ্চাৎপদ নয়। সুস্থপ্রকৃতির বালক ও যুবক যখনই সত্য কোন দুঃখ, সত্য কোন অভাবকে সাক্ষাৎ ভাবে সত্যরূপে জানিয়াছে, তখনই তাহা মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা এই দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে নিজ অধ্যয়নাদি কর্ত্তব্যে অবহেলা ত করিবেনই না। অধিকন্তু দেশের সত্য অবস্থা,—জলাভাব, পীড়া, অজ্ঞতা,—জানিতে সচেষ্ট হইবেন। সত্যের উপলব্ধি হইলেই আপনা হইতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা "নোয়াখালী-সম্মিলনী"তে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ বা বিজ্ঞাপন (যাহাই বলুন) দেখিতে পাইলাম।

"বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কনফারেন্স উপলক্ষে,—
কৃষি পশু ও সাহিত্য প্রদর্শনী।

সকলেই অবগত আছেন, আগামী ২৮শে ২৯শে মার্চ্চ মোতাবেক ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র ময়মনসিংহ জামালপুর সবডিবিসনের অন্তর্গত কামারের চরে বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কন্‌ফারেন্স বসিবে। সেই বিরাট ব্যাপার উপলক্ষে কন্‌ফারেন্স পেণ্ডালের সন্নিহিত স্থানে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের অনুমোদনে

কৃষি, পশু ও সাহিত্য-প্রদর্শনী

খোলা হইবে এবং প্রদর্শনকারীগণকে তাঁহাদের প্রদর্শিত বস্তুর শ্রেষ্ঠতা ও উপযুক্ততা অনুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল এবং বিলাতী কৃষিযন্ত্রাদি পুরস্কার প্রদান করা হইবে। বঙ্গের প্রত্যেক দেশহিতৈষী ও কৃষির উন্নতিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণকে উক্ত প্রদর্শনীতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও পশু প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমরা সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছি। আশা করি সকলেই আমাদের এ দেশহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি—

কৃষিজাত— ধান ও ধান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি, সরিষা, কলাই, ডাইল, চাউল, তুলা, পাট, শণ, ইক্ষু, শাক, সবজী, তরিতরকারী, নানাবিধ-ফুল, পাতাবাহার ক্রোটন, পরগাছা, বিবিধ ফল মূল, আয়কর বৃক্ষাদি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রদর্শনযোগ্য ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য-সকল প্রদর্শনী খুলিবার ৭ দিন পূর্ব্বে নাম ঠিকানা লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

পশু পক্ষী—গরু, মহিষ, তৎদুগ্ধ-উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ছাগল, ভেড়া, খচ্চর, গাধা, ঘোড়া, হাঁস, মুর্গী ও মুর্গী এবং হাঁসের ডিম, ছানা ইত্যাদি প্রদর্শন ও পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। পশু পক্ষী প্রদর্শনী খোলার পূর্ব্বদিন ভোরে লোকসহ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত রাখিতে হইবে।

সাহিত্য সম্বন্ধে—কৃষি ও পশু চিকিৎসা ও পশু পালন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রাদি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইবে। অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থাদিও প্রদর্শনীতে গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যেক গ্রন্থকারকে ৩ তিনখানি করিয়া গ্রন্থ প্রদর্শনীতে দিতে হইবে। কৃষি ও পশু পালন এবং ঐতিহাসিক নূতন তত্ত্ব-সম্বলিত গ্রন্থাদিও গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে। কৃষক বালকগণের শিক্ষোপযোগী উপযুক্ত গ্রন্থনিচয় পাঠ্য ও প্রাইজলিষ্টভুক্ত হওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করা হইবে। ঘোড়দৌড় কুস্তি কসরৎ ও কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রদর্শনীতে কৃষি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি পরিচালন পূর্ব্বক উহার ব্যবহার এবং সুবিধা সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরন্তু ম্যাজিক ল্যাণ্টারণের সাহায্যেও যন্ত্রাদি-পরিচালন-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইবে। কৃষক এবং কৃষিকার্য্যে-অভিজ্ঞতা-লাভ-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত। ভরসা করি এ সম্বন্ধে স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপ সুবিধা হেলায় উপেক্ষা করিবেন না। প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ প্রদর্শনীয় বস্তু এখন হইতে প্রস্তুত রাখুন।"

প্রদর্শনীর ২৭শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকাল স্থায়ী থাকিবে, অতঃপর প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ প্রদর্শনকারীগণ ফেরৎ পাইবেন। কিন্তু পশু পক্ষী প্রদর্শনীর পরেই ফেরৎ লইতে হইবে।

সরাফৎ আলী খান
মোহাম্মদ আবদুল রহমান
খোস মোহাম্মদ
শ্রীকামিনীকুমার তালুকদার
শ্রীপ্যারীমোহন গুহ রায়
শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী (ম্যানেজার)
মুরুলহোসেন কাশিমপুরী (সম্পাদক)।"

প্রদর্শনীটির উদ্দেশ্য বুঝা সহজ। কিন্তু "বঙ্গীয় মৌলবী ও কৃষক সম্মিলিত কন্‌ফারেন্স" জিনিষটি কি এবং উহার উদ্দেশ্য কি, লিখিত নাই, অনুমানও করিতে পারিতেছি না। বঙ্গের বোধ হয় এমন কোন জেলাই নাই, যেখানকার সমুদয় কৃষকই মুসলমান। মৌলবীদের সঙ্গে মুসলমান কৃষকদের কন্‌ফারেন্সের আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু হিন্দু কৃষকের সঙ্গে, হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতকে বাদ দিয়া, মুসলমান মৌলবীর কন্‌ফারেন্স কিরূপ হইবে এবং কেন হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না। প্রদর্শনীটি গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের অনুমোদনে ও সাহায্যে খোলা হইবে। কন্‌ফারেন্সটিতেও গবর্ণমেণ্টের যোগ আছে কি না জানা দরকার, এবং থাকিলে কন্‌ফারেন্সটির কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা, তাহাও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে তিনটি হিন্দু নামও দেখিতেছি। তাঁহারা কন্‌ফারেন্সেরও কর্ত্তৃপক্ষ কিনা, বলিতে পারি না।

হিন্দুমুসলমানের একযোগে কাজ করা খুবই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মৌলবী ও হিন্দুমুসলমান কৃষক আছেন; অথচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিত নাই, ইহাতে জিনিষটা একটু রহস্যাবৃত মনে হইতেছে।

বিশ্বস্ততা।

জে, বি, গ্রিউজ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

Colour-Blocks and Printing by
U. RAY & SONS, Calcutta.

গান

(১)

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে' গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে ॥
মনে হ'ল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে,
মনে হ'ল সকল দেহ
পূর্ণ হ'ল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশির-নত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে ॥

(২)

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র,
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি।
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য।
নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান,
ছাড়্‌ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ।

(৩)

বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।

যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে
সেই সুরে মোরে বাজাও ॥

সাজাও আমারে সাজাও
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

সন্ধ্যা-মালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও ॥

(৪)

জানি গো দিন যাবে,
এ দিন যাবে এ দিন যাবে।
একদা কোন বেলা-শেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া
আমার মুখের পানে চাবে।

পথের ধারে বাজবে বেণু
নদীর কূলে চর্‌বে ধেনু
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু
পাখীরা গান গাবে,
তবুও দিন যাবে
এ দিন যাবে এ দিন যাবে।

তোমার কাছে আমার এ মিনতি
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী!
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি!
তোমার কাছে আমার এ মিনতি।

সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভর্‌তে পারি ডালা!
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা!
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা।

(৫)

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা আসে, পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।
চল্‌চে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি কাল বেয়ে।
কতকালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির-স্বয়ম্বরা॥

(৬)

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দ তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব;
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণ-রেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা;
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফলে;
রাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু।
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

(৭)

প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে,
ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
হেথায় কারো ঠাঁই হবে না
মনে ছিল সেই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে
রেখেছিলাম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধূলায় লুটেছে।

(৮)

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো, আরো আলো,
মোর নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশী পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
দাও মোরে আরো চেতনা,
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে,
মোরে কর ত্রাণ, মোরে কর ত্রাণ॥
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে,
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান॥

(৯)

প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কি গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্ত-গগন-পারে॥
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা॥
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা
ঐ মহিমা
আর রবে না ঢাকা॥
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নব জীবন পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে॥

(১০)

তোমারি নাম বল্‌ব, আমি বল্‌ব নানা ছলে।
বল্‌ব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।
বল্‌ব বিনা ভাষায়,
বল্‌ব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে,
বল্‌ব চোখের জলে॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌ব তোমার নামে।
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম॥
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

(১১)

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে'
সুগন্ধ ধন লুটবে॥
আমার লজ্জা যাবে, যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন॥
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার টুটবে॥

(১২)

অসীম ধন ত আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে,
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে!
দিয়ে তোমার রতন মণি
আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক,
রয়েছি দ্বার এঁটে।
আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে।
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে,
নাম্‌বে ধুলা-পথে,
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

(১৩)

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে,
তুমিই আমার বন্ধু!
লও যে টেনে কঠিন হাতে,
তুমি আমার আনন্দ।
দুঃখ-রথের তুমিই রথী,
তুমিই আমার বন্ধু!
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি,
তুমি আমার আনন্দ॥
শত্রু আমারে করগো জয়,
তুমিই আমার বন্ধু।
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়,
তুমি আমার আনন্দ॥
বজ্র এস হে বক্ষ চিরে,
তুমিই আমার বন্ধু!
মৃত্যু আমারে লও হে ছিঁড়ে,
তুমি আমার আনন্দ॥

(১৪)

নয় এ মধুর খেলা
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি, গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরি ঠেলা॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে,
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা॥

(১৫)

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে;
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু চিত্তে যেন এই কথাটি মানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
আমার জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানিগো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ ॥

(১৬)

হিন্দী আরতি

(অমৃতসর গুরুদরবারে গীত)

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর সির নবেঁ ॥
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাকে বেদন বেদন,
সুখী জনাকে আনন্দ এ ॥
বনা বনামেঁ সাবঁল সাবঁল,
গিরি গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর সাগর গম্ভীর এ।
চৌন্দ সূরয বরৈ নিরমল দীপা
তেরো জগমন্দির উজার এ ॥

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
মস্তক নমি তব চরণ-পরে।
সেবক জনের সেবায় সেবায়,
প্রেমিক জনের প্রেম-মহিমায়,
দুঃখী জনের বেদনে বেদনে,
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে;
মস্তক নমি তব চরণ-পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
সাগরে সাগরে গম্ভীর হে;
মস্তক নমি তব চরণ-পরে।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বালে নির্ম্মল দীপ,
তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-পরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগুনের ফুল্‌কি

(২১)

যে ডবল গুলির ব্যাপার লইয়া সমস্ত পিয়েত্রানরা গ্রামখানি মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহার কয়েক মাস পরে, একজন যুবক বিকাল বেলা ঘোড়ায় চড়িয়া বাস্তিয়া শহর হইতে বাহির হইয়া কার্দো গ্রামের দিকে যাইতেছিল। এই কার্দো গ্রাম তাহার ঝরণার জন্য বিখ্যাত; গ্রীষ্মকালে সৌখীন শহুরে বাবু-লোকেরা সেই গ্রাম হইতে সেই মধুর শীতল জল আনাইয়া পান করিত। যুবকটির বাঁ হাত-খানি গলার সহিত ঝুলাইয়া বাঁধা। তাহার সঙ্গে একটি তন্বী সুকুমারী অপরূপ সুন্দরী, একটি কালো রঙের ছোট টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল; ঘোড়াটিও তাহার সোয়ারের ন্যায় মহিমার শ্রীতে দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার বাঁ কানটা একেবারে কাটা। গ্রামে পৌঁছিয়াই সেই তন্বী তরুণীটি অতি লঘু লম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং তাহার সঙ্গী বন্ধুকে তাহার ঘোড়া হইতে ধরিয়া নামাইয়া, জিনের সঙ্গে বাঁধা একটা ভারী ব্যাগ খুলিয়া লইল। ঘোড়া দুটিকে একজন চাষার জিম্মা করিয়া দিল। সেই তরুণীটি ওড়নার ভিতরে ব্যাগটি লুকাইয়া লইয়া ও যুবকটি দো-নলা একটা বন্দুক লইয়া এমন একটা আবড়ো-খাবড়ো রাস্তা ধরিয়া পাহাড়ের উপর চলিল যে, সে রাস্তা যে কোনো লোকালয়ে লইয়া যাইবে এমন বোধই হয় না। পাহাড়ের একতলায় উঠিয়া তাহারা থামিল, এবং দুজনেই ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। বোধ হয় তাহারা কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কারণ তাহারা ক্রমাগত পাহাড়ের উপর দিকে চোখ তুলিয়া তুলিয়া চাহিতেছিল, এবং তরুণীটি ক্ষণে ক্ষণে একটি সুন্দর সোনার ঘড়ী বাহির করিয়া করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি সময় দেখা অপেক্ষা তাহার এই নূতন-পাওয়া গহনাটির সৌন্দর্য্যের দিকেই অধিক নিবিষ্ট মনে হইতেছিল। তাহাদিগকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। বনের ভিতর হইতে একটা কুকুর বাহির হইয়া আসিল এবং তরুণীটি "ব্রিস্কো" বলিয়া ডাকিতেই সে তাহাদের কাছে ছুটিয়া

আসিয়া সোহাগ জানাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দুজন দাড়িওয়ালা লোক হাতে বন্দুক, গলায় কার্তুজ, আর কোমরে পিস্তল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের জামা কাপড় ছেঁড়া, শত-তালি-লাগানো; কিন্তু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক তাহার উল্টা—চকচকে ঝকঝকে, মজবুত, জবর রকমের, য়ুরোপের মধ্যে বিখ্যাত কারিগরের হাতের। পূর্ব্বাগত ও আগন্তুক দুই দলের পোষাক পরিচ্ছদে শিক্ষা সহবতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও তাহারা চার জনে বেশ আত্মীয় ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

আগন্তুকদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি বলিয়া উঠিল—ভ্যালা অর্সো আন্তো! আপনার মকদ্দমা ত চুকে বুকে গেল। একেবারে বে-কসুর খালাস। আমাদের মনটা যে কী খুসি হয়ে গেছে তা আর কি বলব! দারোগা সাহেব দেশ ছেড়ে চম্পট দিলে, তার রাগের গসগসানি আর দেখতে পাব না বলে' ভারী দুঃখু হচ্ছে। হ্যাঁ, তোমার হাত কেমন আছেন?......

যুবক বলিল—ভালো হয়ে এসেছে। ডাক্তার বলছে আর দিন পনর পরে হাতের বাঁধন খুলে দেবে।--ব্রান্দো, বন্ধু, কাল আমি ইটালীতে চলে যাচ্ছি, তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি, আর পণ্ডিতজী আপনার কাছেও।

ব্রান্দো বলিল—এত শীগগির? গেল কাল খালাস পেলে আর আসছে কালই চল্লে?

তরুণীটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া বলিল—ওরে বিশেষ জরুরী তলব আছে রে তলব আছে!... তোমাদের জন্যে আমি কিছু খাবার এনেছি, খেয়ো; আমার বন্ধু ব্রিস্কোকে যেন ভুলে যেয়ো না।

—কলোঁবা ঠাকরুণ, আপনি নাই দিয়ে ব্রিস্কোর মাথা খেয়ে দিচ্ছ; ও কিন্তু সে জন্যে খুব কৃতজ্ঞ আছে, হয় না হয় আপনি দেখে নেও।

তারপর ব্রান্দো তাহার বন্দুক পাতিয়া ধরিয়া বলিল —আও আও ব্রিস্কো, বারিসিনিকো সেলাম কর।

কুকুরটা নড়িল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাক চাটিতে চাটিতে প্রভুর দিকে তাকাইতে লাগিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেলা রেবিয়াকো সেলাম কর।

কুকুরটা অমনি দুই পা আবশ্যকেরও অতিরিক্ত উঁচু করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

অর্সো বলিল—দেখ বন্ধু, তুমি বড় বদ ব্যবসা ধরেছ; হয় ঐ বাস্তিয়ার জেলখানায় ফাঁশীকাঠে তোমার লীলা সাঙ্গ হবে, তাও যদি হয় ত ভালো—নয় কোনো বনে জঙ্গলে পুলিসের গুলিতে সব নাচুনি কুঁদুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শাস্ত্রীজী বলিল—হলই বা? এও মৃত্যু, ওও মৃত্যু! বিছানায় পড়ে জ্বরে ভুগে ভুগে, নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর সত্য মিথ্যা চোখের-জলের ধরানি দেখতে দেখতে, নাকী কান্নার প্যানপ্যানানি শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে মরার চেয়ে তাজা টাটকা টপ করে মরে' এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে বুকিয়ে যাওয়াটা ঢের ভালো, ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়। যারা আমাদের মতো মুক্ত হাওয়ার স্বাধীন জীব, তাদের পক্ষে জুতো জামা পরে' মরার চেয়ে আর কিছু কি বেশী রুচিকর আছে?

অর্সো বলিতে লাগিল—আমার ইচ্ছে তোমরা এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে বেশ শান্ত শিষ্ট হয়ে থাক। তোমরা কেন সার্ডিনিয়া দ্বীপে গিয়ে বাস কর না? তোমাদের মতন অনেক লোকই ত তা করেছে। আমি তার সব জোগাড় যন্তর করে দিতে পারব।

ব্রান্দো বলিয়া উঠিল—সার্ডিনিয়াতে! কথায় না বলে বোকা সার্দো! তারা কেঁই মেই করে' কি যে বলে তা বোঝাই যায় না। তাদের সঙ্গে বাস করা ঝকমারি।

পণ্ডিতজী বলিল—সার্ডিনিয়ায় যাওয়া সুবিধা হবে না। আমার কথা বলতে কি আমি সার্দোদের ঘৃণা করি। ফেরারীদের তাড়া করবার জন্যে তাদের একদল ঘোরসওয়ারই আছে; এই থেকেই ত দেশের আর ফেরারীদের অবস্থাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ধিক্ থাক সার্দোদের! দেখুন মশায় দেলা রেবিয়া, আমার একটা ব্যাপার ভারী আশ্চর্য্য ঠেকছে যে, আপনার মতন একজন আক্কেলমন্ত আর সৌখীন লোক একবার বনবাসের মজা নিজের জীবনে সম্ভোগ করেও চিরকালের জন্যে বনবাস স্বীকার না করে' থাকতে পারে কেমন করে!

অর্সো হাসিয়া বলিল—হাঁ, আপনাদের সঙ্গে পরম মিত্রতায় বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেও আমি আপনাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে তেমন কিছু প্রলোভন দেখতে পাই নি। সেই এক রাত্রে আমার বন্ধু ব্রান্দো আমাকে একটা বস্তার মতো ঘোড়ার খালি পিঠে লেদে যে রকম খাড়া পাহাড় বেয়ে ছুটিয়ে নামিয়েছিল, তা মনে করলে এখনও আমার হৃদয়ের অবস্থাটা বেশ স্বাভাবিক থাকে না।

শাস্ত্রী বলিল—আর অনুসরণকারী শত্রুর কবল থেকে প্রাণে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যাওয়ার সুখটা বুঝি কিছু না? আমাদের মতন মুক্ত স্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার যে মাধুর্য্য ও আনন্দ আছে তা আপনি কেমন করে ভুলে যাচ্ছেন তাই ভাবছি। এই যে রামসুন্দরী কোঁৎকা (সে বন্দুক তুলিয়া দেখাইল) দেখছেন, যতদূর এর গুলির পাল্লা ততদূর পর্য্যন্ত আমরা রাজার রাজা, সম্রাটেরও সম্রাট্। আমরা এরই প্রতাপে হুকুম করি, বিচার করি, অন্যায়ের প্রতিকার করি। এই যে আমাদের খেলা, এতে মশায়, দুঃখ কিছু নেই, আমোদ আছে প্রচুর।—এ থেকে আমরা কিছুতেই বঞ্চিত হতে চাইনে। এই যোদ্ধার জীবনের চেয়ে আর কোন্ জীবন তেমন আনন্দের—যদি সেই যোদ্ধা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ডন-কুইক্‌সোর চেয়ে একটু বেশী বুদ্ধিমান আর একটু ভালো রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়? ধরুন না কেন, এই সে দিন, আমি খবর পেলাম যে, লীলার বুড়ো কিপটে কাকাটা তার বিয়েতে কিছু যৌতুক দিতে চাচ্ছে না বলে' তার বিয়ে হচ্ছে না; আমি অমনি তাকে পরোয়ানা পাঠালাম, কোনো রকম ভয় টয় দেখিয়ে নয়, সে রকম আমার রীতিই নয়, শুধু হুকুম। ভালো। তার পরে হ'ল কি জানেন, লোকটা একেবারে কাবু; মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিতে শেষে পথ পায় না। এতে করে আমি দুটি তরুণ প্রাণকে খুসী করে দিলাম। বিচার করে দেখুন, অর্সো মহাশয়, বুনো ডাকাতদের সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে না মোটেই। খুব সম্ভব আপনি আমাদের দলেই ভিড়ে যেতেন, কেবল, একজন ইংরেজ সুন্দরী যদি মাঝখানে পড়ে' বাগড়া না দিত। তাঁকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু বাস্তিয়াতে সকলেই তাঁর শতমুখে তারিফ করে শুনতে পাই।

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—হাঁ, আমার যিনি বৌ-দি হবেন, তাঁর বনজঙ্গল ভালো লাগে না, বনে জঙ্গলে তাঁর ভারী ভয়।

অর্সো বলিল—যাই হোক, তা হলে আপনারা এইখানেই থাকতে চান? তাই থাকুন। বলুন, আমি যদি আপনাদের কোনো রকম কিছু কাজ করে দিতে পারি।

ব্রান্দো বলিল—আমাদের কিছু চাইনে, কেবল তোমার ব্যবহারের কোনো একটা ছোট খাটো জিনিস আমাদের দিয়ো, আমরা তোমার স্মরণচিহ্ন রাখব। তুমি ত আমাদের দয়া দিয়ে একেবারে ডুবিয়ে রেখেছ। শিলিনার বিয়ের যৌতুকের থিতি করে রেখেছি, তাতেই তাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা চলবে; এখন আমার বন্ধু পণ্ডিতজী শুধু একখানি ভয় না-দেখিয়ে চিঠি লিখে দিলেই ওর বিয়েটা হয়ে যাবে। আমরা জানি তোমাদের প্রজা পাইকেরা আমাদের দরকার মতন রুটি আর বারুদ জোগাবে। তবে আর তোমার করবার বাকী কি আছে? বিদায়। আশা করি এরই মধ্যে আবার তুমি কর্সিকায় ফিরে এসেছ দেখব।

অর্সো বলিল—টানাটানি কি বিপদের সময় গোটাকতক সোনার চাকতি কাছে থাকলে ঢের সুবিধা হয়। আমরা যখন পুরোণো বন্ধু, তখন তুমি এই ছোট্ট থলিটা নিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না, তোমাদের দরকারী জিনিস জুটিয়ে দিতে এ কিছু সাহায্য করতে পারবে।

ব্রান্দো দৃঢ় স্বরে বলিল—না লেফ্‌টেনাণ্ট, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে টাকার বিষ এনো না।

শাস্ত্রী বলিল—টাকা সংসারী লোকের দরকার; বনবাসীদের বুকভরা সাহস আর হাতভরা অস্ত্র ছাড়া আর কিছুর দরকার হয় না।

অর্সো উত্তর করিল—তোমাদের কিছু-না-কিছু না দিয়ে চলে যেতে আমার মন সরছে না। বল ব্রান্দো, আমি তোমাদের কি দিতে পারি?

ব্রান্দো মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অর্সোর বন্দুকের দিকে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিল—দুর্

হোক গে ছাই! লেফ্‌টেনাণ্ট...যদি আমাকে বলতেই হয়...যাকগে, তুমি যা ভালো বোঝ কর।

—তুমি কি চাও? বল।

—না না কিছু না... সে তুচ্ছ জিনিস...সে জিনিস পেতে হলে ব্যবহার করবার হিকমত্‌ হিম্মত থাকা চাই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সেই সর্বনেশে ডবল গুলি এক হাতে ছোড়ার কথা।... উঃ! তেমন ঘটনা দুবার ঘটে না!

—সেই বন্দুকটা তোমার চাই?... ...আমি তোমাকে সেটা এনে দেবো। কিন্তু যত কম পার সেটা ব্যবহার কোরো।

—আমি তোমার কাছে একেবারে স্বীকার করতে পারিনে যে, সেটাকে তুমি যেমন কাজে লাগিয়েছিলে আমি তেমন কাজে মোটেই লাগাব না; কিন্তু নিশ্চিন্ত থেক, সে আর-একবার ঐ রকম শিকার পেলেই তুমি জানবে যে, ব্রান্দো বন্দুক বাঁ হাতে তুলে রেখেছে।

—আর আপনি, শাস্ত্রী মশায়, আপনাকে কি দেবো?

—যখন আপনি নিতান্তই কোনো স্মৃতিচিহ্ন দেবেন ঠিক্‌ করেছেন, তখন আমি গৌরচন্দ্রিকা না কেঁদে সোজাসুজি বলি—আপনি আমাকে একখানা খুব ছোট আড়ার পকেট-এডিশনের হোরেসের কাব্য পাঠিয়ে দেবেন। এতেই আমার সময় কেটে যাবে আর আমার লাটিন ভাষারও চর্চা থাকবে। বাস্তিয়ার পুলের উপর একটি মেয়ে চুরুট বেচে; তাকেই দিলে আমি পাব।

—পণ্ডিতজী আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ পাবেন; আমি আপনাকে যে যে বই দেবো মনে করেছিলাম তার মধ্যে ঠিক্‌ ঐ রকম একখানি বই আছে। —আচ্ছা বন্ধু, এখন তবে বিদায় নি। দাও, হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় দাও। যদি কখনো সার্ডিনিয়ায় যাবার খেয়াল হয় আমায় চিঠি লিখো; আমার উকিলের কাছে আমার ঠিকানা পাবে।

ব্রন্দো বলিল—লেফ্‌টেনাণ্ট, কাল যখন তুমি বন্দর থেকে বেরিয়ে যাবে এই পাহাড়ের এইখানটায় একবার নজর কোরো; আমরা এইখানে থাকব, আমাদের রুমাল উড়িয়ে আমরা তোমার শুভযাত্রা কামনা করব।

তাহারা বিদায় লইল; অর্সো ও তাহার ভগিনী কার্দ্দোর পথ ধরিল এবং বনবাসী দুজন পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল।

(২২)

এপ্রেল মাসের এক সুপ্রভাতে কর্ণেল সার টমাস নেভিল, তাঁহার নব-বিবাহিতা কন্যা লিডিয়া, অর্সো এবং কলোঁবা একখানা গাড়ী চড়িয়া পিজা হইতে ভূগর্ভে নবাবিষ্কৃত একটি প্রাচীন সমাধি-মন্দির দেখিতে রওনা হইলেন। সেই মন্দিরটি সমস্ত বিদেশীরাই দেখিতে যাইতেছিল। সেই মন্দিরের মধ্যে নামিয়া গিয়া অর্সো ও তাহার স্ত্রী দুজনেই পেন্সিল কাগজ বাহির করিয়া সেই মন্দির-দৃশ্যের আরেখন নক্সা আঁকিতে লাগিয়া গেল; কিন্তু কর্ণেল ও কলোঁবা দুজনেই প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তুল্য উদাসীন, তাহারা দুজনে বাহিরে বেড়াইতে গেল।

কর্ণেল বলিলেন—দেখ কলোঁবা, আমাদের খাবার সময়ে আমরা পিজায় ফিরে যেতে পারব তার ভরসা নেই। তোমার খিদে লাগে নি? অর্সো ত তার বৌকে নিয়ে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় লেগে গেছে; তারা যখন দুজনে একসঙ্গে নক্সা করতে লেগে গেছে, তখন সে নক্সা আর এ জন্মে শেষ ত হবে না।

কলোঁবা বলিল—হ্যাঁ, সত্যি, ওদের নক্সার শেষ আর হবে না।

কর্ণেল বলিতে লাগিলেন—তাই আমি বলি কি, চল ঐ ছোট হোটেলটায় যাই। আমরা রুটি ত পাব, আর চাই কি একটু আস্তুরিনা সরবৎও মিললেও মিলতে পারে, আর একটু দুধের সর আর ফলটা পাকুড়টা। তা হলেই আমরা আমাদের চিত্রকরদের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করতে পারব।

—ঠিক্‌ বলেছেন কর্ণেল। আপনি আর আমি, এই গৃহস্থালীর মধ্যে যদি কারো একটু বুদ্ধি থাকে ত সে আমাদের। ঐ প্রণয়-পাগল দম্পতিটির কাব্য আর প্রণয়সুধা ছাড়া আজকাল আর ত কিছু রোচে না; ওঁদের জন্যে আমাদেরও শুকিয়ে মরাটা কিছু নয়। নিন, আমার হাত ধরে নিয়ে চলুন। আমি এখন বেশ শিষ্ট শান্ত হয়ে শুধরে উঠছি, নয়? আমি এখন লেডির মতন হাত ধরে

না নিয়ে গেলে চলতে পারি নে, টুপী পরি, ফ্যাশান-দুরুস্ত পোষাক পরি, গহনাগাঁটিও দু একখানা গায়ে তুলেছি, কত রকম ভালো কথা শিখেছি; আমার মধ্যে বন্য বর্ব্বরতা আর নেই, না ? দেখুন এই শালখানা কেমন সৌখীনী কায়দায় এলোমেলো করে' গায়ে দিয়েছি ! বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, না ?......সেই যে আপনার সৈন্যদলের একজন অফিসার, সেই যে বেশ ফিটফাট ছিপছিপে লম্বা ফুটফুটে সুন্দর মতন, যে দাদার বিয়ের সময় ছিল......আ হরি ! তার বিকট নামটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না......সেই যে যার মাথায় দিব্য কোঁকড়া কোঁকড়া, বড় চুল, যে বাবু যোদ্ধাটিকে আমি এক ঘুষিতে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারি......

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—কে, চ্যাটওয়ার্থ ?

—হাঁ হাঁ ঐ বটে, ঐ বিদ্‌ঘুটে নাম আমার মুখ দিয়ে কখনো উচ্চারণ হবে না। সেই। সে ত আমার প্রেমে একেবারে পাগল !

—বা কলোঁবা, তুমি যে বেশ পাকা লীলাবতী মেয়ে হয়ে উঠেছ দেখছি......আমরা শীগ্‌গিরই তা হলে আর একটা বিয়ের ভোজ খাচ্ছি !

—বিয়ে ! আমার ! আমি বিয়ে করব ? তা হলে আমার ভাইপোকে কে মানুষ করবে ?......দাদার খোকাকে কর্স ভাষা বল্‌তে কে শেখাবে ?......সত্যি, তাকে আমি কর্স বলতে শেখাব, আর একটা সুচল টুপি পরিয়ে আপনাকে খুব ক্ষেপাব।

—আগে তোমার ভাইপোই হোক, তারপর তোমার মন হয় তাকে ছোরা খেলতে শিখিয়ো।

কলোঁবা হাসিয়া বলিল—ছোরা ছুরী বিদায় দিয়েছি; এখন লেডির হাতে হাতপাখা উঠেছে, আপনি যখন আমার দেশের নিন্দে করবেন অমনি সেই পাখা দিয়ে আপনার আঙুলের গিরের ওপর ঠুকে দেবো।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহারা সেই হোটেলে গিয়া সরবৎ সর ও ফল পাইল। কর্ণেল যখন সরবতের গেলাস লইয়া ব্যস্ত, তখন কলোঁবা হোটেলওয়ালীর সঙ্গে গিয়া গাছ হইতে গোলাপজাম পাড়িতেছিল। কলোঁবা দেখিল একটা গলির মোড়ে একজন বৃদ্ধ একটা কশাড়ের মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতেছিল, দেখিয়া বোধ হইতেছিল পীড়িত; তাহার গাল দুটা বসা, চোখ দুটা কোটরগত, শরীর তাহার কঙ্কালসার, এবং তাহার নিষ্পন্দ বিবর্ণ অপলক দৃষ্টি দেখিলে তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে হয় না, ঠিক্ একটা যেন মৃতদেহ। কয়েক মিনিট ধরিয়া কলোঁবা তাহার দিকে এমন উৎসুক কৌতূহলের সঙ্গে তাকাইয়া ছিল যে, হোটেলওয়ালী তাহা লক্ষ্য করিল।

হোটেলওয়ালী বলিল—আ মা, ঐ বুড়ো বেচারা তোমাদেরই দেশের লোক,—তোমার কথা শুনে টের পেয়েছি তোমাদেরও বাড়ী কর্সিকায়। বেচারার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; দেশে ওর দু দু বেটা বেঘোরে মারা গেছে। তোমাদের দেশের লোকেরা—লোকে বলে মা, আমি সত্যি মিথ্যে কি জানি,—নাকি তাদের শত্রুতা সাধবার বেলা একটুও দয়া দেখায় না। কিছু মনে করো না মা, লোকে বলে তাই শুনি। বেচারা বুড়োমানুষ, ছেলেদের হারিয়ে একলা পড়ে গেছে, তাই দেশ ছেড়ে পিজায় এসে আছে, দূর সম্পর্কের এক কুটুমের বাড়ীতে থাকে, এই হোটেল তারই। আহা ! বেচারার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা, শোকের দুঃখের আক্রোশের এই কাণ্ড ! ...আমার মুনিবেরই মুস্কিল, তার দোকানে নিত্যি নিত্যি কত দেশের কত লোক আসে; সে ত আর দোকানপাট ছেড়ে বুড়োর কাছে সদা সর্ব্বদা থাকতে পারে না, তাই ওকেই এই দোকানের কাছাকাছি এনে রেখেছে। বুড়োর কিন্তু কোনো হাঙ্গাম নেই; সমস্ত দিনে তিনটে কথা কয় কি না সন্দেহ। হপ্তায় হপ্তায় ডাক্তার আসে, তারা বলছে যে ওর ভীমরতি হয়েছে, আর বেশী দিন বিলম্ব নেই।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—আঃ ! তা হলে মরণ ওর ঘনিয়ে এসেছে ? অমন অবস্থায় মরণই মঙ্গল !

—আহা মা, বুড়ো বেচারার সঙ্গে তুমি যদি গিয়ে একটু কর্সভাষায় কথা কও তা হলে দেশের ভাষা শুনে হয়ত বুড়োর মনটা একটুও খুসী হতে পারে।

কলোঁবা ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, দেখা যাক।

কলোঁবা বুড়ার এমন কাছে গিয়া দাঁড়াইল যে, তাহার ছায়া বুড়ার গায়ের রোদটুকু কাড়িয়া লইল। তখন

সেই বৃদ্ধ মাথা তুলিয়া কলোঁবার দিকে চাহিয়া রহিল। কলোঁবাও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধ হাত দিয়া কপাল মুছিল, এবং কলোঁবার দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদিল। ক্ষণেক পরে আবার চোখ খুলিল কিন্তু তাহা ভয়ে বিস্ফারিত বিচঞ্চল; তাহার ঠোঁট থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; সে হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কলোঁবার দৃষ্টির আঘাতে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়া সে মোড়ার উপরে জোড়া লাগিয়া অনড় অচল বসিয়া রহিল, একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির হইল না। অবশেষে তাহার দুই চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহার বুক খালি করিয়া কয়েকটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

হোটেলওয়ালী বলিল—এই প্রথম ওকে আজ এমন কাতর দেখছি।... ..শুনছেন, ইনি আপনাদের দেশের লোক, আপনাকে দেখতে এসেছেন।

বৃদ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—ক্ষমা দাও ওগো ক্ষমা দাও! এখনো তোমার সাধ মেটেনি? সেই খাতার পাতাখানা..... আমি ত পুড়িয়ে ফেলেছিলাম......তুমি তা কি করে পড়েছিলে?......কিন্তু দুজনকে কেন নিলে?......অর্লান্দিকুসিয়ো, তার নামে তাতে ত কিছু লেখা ছিল না।... একজন, মাত্র একজনকেও যদি আমার থাকতে দিতে!...অর্লান্দিকুসিয়ো ..... তার নামে ত তুমি কিছু পাওনি......

কলোঁবা গম্ভীর স্বরে কর্স্ ভাষায় বলিল—দুজন, দুজনই গেছে, ঠিক্ হয়েছে! শাখা কাটা পড়েছে; গুঁড়িতে এখনো চোপ পড়ে নি, আমি তাকে শুকিয়ে পচিয়ে মারব বলে! যাক্, আর দুঃখ কোরো না; আর বেশী দিন কষ্টভোগ করতে হবে না। আমাকে দু দু বছর কষ্ট পেতে হয়েছিল।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার মাথা ঢলিয়া তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। কলোঁবা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তাহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া ধীর পদে হোটেলের দিকে ফিরিতে ফিরিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল।

যখন সেই হোটেলওয়ালী তাড়াতাড়ি বুড়া বেচারার শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত, তখন কলোঁবা দীপ্ত প্রফুল্ল মুখে আগুন-জ্বালা চোখ লইয়া কর্ণেলের সম্মুখে টেবিলে গিয়া খাইতে বসিল।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—অ্যাঁ কি হয়েছে তোমার? তোমার মুখে ও কী ভাব! ঠিক্ এমনি তোমায় দেখেছিলাম পিয়েত্রানরায়, সেই যেদিন আমরা খেতে বসেছিলাম আর বন্দুকের গুলি এসে খাবার-টেবিলের চটা উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

—এ কর্সিকার একটি পূর্ব্বস্মৃতি মাথায় জেগে উঠেছে মাত্র। যাক, সব চুকে বুকে গেছে। আমি পিসিমা হ'ব, কেমন কিনা? আমি খোকার খুব ভালো দেখে একটি নাম রাখব—ঘিল্‌ফিকুসিয়ো-তোমাজো-অর্সোলেয়ন!

হোটেলওয়ালী আসিল।

কলোঁবা নিতান্ত সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—কি খবর? মরে গেছে, না শুধু মূর্চ্ছা?

—না মা, ও সব কিছু নয়; আশ্চয্যি মা আশ্চয্যি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ওর খুব ভালো হল বলতে হবে।

—আর ডাক্তারেরা না বলেছিল যে, ওর আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না?

—হ্যাঁ, বড় জোর দু মাস।

—ওর মরণে কারো কোনো ক্ষতি হবে না!

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—কার কথা তোমরা বলাবলি করছ, অ্যাঁ?

কলোঁবা পরম উদাসীন ভাবে বলিল—ও আমাদের দেশের একটা লেলাখেপা, পেন্সন নিয়ে এখানে এসে আছে। মাঝে মাঝে তার খবর আমার নিতে হবে। ......কর্ণেল সাহেব, ওকি, দাদা আর বৌ-দির জন্যে গোটাকত গোলাপজাম রাখুন।

যখন কলোঁবা হোটেল হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল, তখন হোটেলওয়ালীর দৃষ্টি কিছুক্ষণ নীরবে তাহার অনুসরণ করিল; তার পর সে তাহার কন্যাকে বলিল—ঐ যে সুন্দর মেয়েটা দেখছিস, ওর নজর যেন আগুনের ফুল্‌কি! * সমাপ্ত

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* প্রস্পার মেরিমে রচিত কলোঁবা নামক উপন্যাসের মূল ফরাসী হইতে অনুবাদিত।

পূর্ণতা

আজিকে চন্দ্রের আলো যেমন করিয়া
আকাশ পৃথ্বীর শূন্য দিয়াছে ভরিয়া,
তেমনি তোমার প্রিয় আঁখির আলোকে
বিরহ ঘুচিয়া যাক মম চিত্ত-লোকে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ

অষ্টম অধ্যায়।

বর্ণসঙ্কর।

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তিও যে দেশের প্রতিভাসংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষে হানিকর তাহা বলিয়াছি। * এক্ষণে সে বিষয়ের আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। রসায়ন শাস্ত্রের Reversible Equation মতটী ইতিহাসে প্রয়োগ করিতে আমার বড় ভাল লাগে। আমি দেখি কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ এক সময়ে যেরূপ কাজ করে আর এক সময়ে ঠিক তাহার বিপরীত রূপ কাজ করে। জাতিভেদ এক সময়ে সমাজের উন্নতিসাধন করে, অপর সময়ে আবার উহা জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়া উঠে। তদ্রূপ সাম্যবাদও এককালে জাতীয় মহা উপকার করে, অপর সময়ে উহা আবার জাতির মহা অপকার করে।

বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির কারণ সাম্যবাদ—অর্থাৎ সকল মানব সমান, সমাজের মধ্যে এরূপ একটা জ্ঞানের বিকাশ। সকল জাতীয় লোকে যখন অবাধে পরস্পরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হয় তখনই সমাজে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করের প্রভাবে সমাজের average বা সাধারণ লোকের অনেকটা উন্নতি হইয়া থাকে। সমস্ত দেশের লোকের শারীরিক গঠন, মনোবৃত্তি প্রভৃতি একই প্রকার হইয়া থাকে; তাহাতে সমাজের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্যই দেখা যায় না। প্রায়শঃ সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এইরূপ অসাধারণ মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীতে যদি এক জাতি ও এক সাম্রাজ্য হইত তাহা হইলে বর্ণসঙ্করের প্রাচুর্য্যের ফলে বোধ হয় সমাজের তত অনিষ্ট হইত না। কিন্তু যতদিন পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত থাকিবে, ততদিন যে-জাতি নিজেদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রশ্রয় দিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত অবাধে মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রতিভার বৈচিত্র্য বিনাশ করিবে, ততদিন তাহাদিগের অবনতি অপরিহার্য্য। *

বংশক্রম সত্য বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই কারণেই সকল সভ্য দেশেই জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদের অস্তিত্ব। ইউরোপে জাতিভেদ নাই কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। সেখানেও কেহ নিজের শ্রেণীর বাহিরে বিবাহ করিতে পারে না। † এবং এরূপ করিলেও তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয়। তবে উহা ভারতের জাতিভেদের মত অত কঠোর নহে। ‡

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় একবার সেই দেশের সমাজ-মধ্যে সর্ব্ববিষয়ের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লাভোসিয়রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার সময় বিচারকগণ বলিয়াছিল,—"সাধারণতন্ত্রের প্রতিভায় কোনও প্রয়োজন নাই।" পরে তাহারা দেশরক্ষার জন্য প্রতিভার কত প্রয়োজন তাহা বুঝিয়াছিল। কার্ণোর নূতন সামরিক প্রণালী, লেব্র্যাঙ্কর প্রভৃতির রাসায়নিক প্রণালীসমূহ ফ্রান্সের কত উপকার

* ঐ অধ্যায়ে সম্পাদকীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—প্রবাসী-সম্পাদক।

* ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড আদি দেশে জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের প্রভাব কম, সুতরাং সে-সব দেশে বর্ণসঙ্কর ভারতবর্ষ অপেক্ষা খুব বেশী হইয়াছে। অথচ তাহারা উন্নত ও শক্তিশালী, আমরা অবনত ও দুর্ব্বল। সুতরাং বর্ণসঙ্কর হওয়া জাতীয় অবনতির কারণ, এরূপ একটা সাধারণ নিয়ম কোন ক্রমেই বাঁধা যায় না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

† ইহা ভারতবর্ষে যেরূপ ব্যাপকভাবে সত্য, ইউরোপে তাহার শতাংশের একাংশ ব্যাপক ভাবেও সত্য নহে।—প্রবাসী-সম্পাদক।

‡ Ribot's Heredity নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু রাষ্ট্র-বিপ্লবকালে ফরাসীজাতির বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বিনাশ করায় দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা ১৮৭০ সালে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এত চেষ্টার ফলেও ফ্রান্সদেশে সাম্যবাদ সম্যক্ প্রচারিত হয় নাই। বর্ত্তমান-কালে প্রতিভাশালী মধ্যশ্রেণীই ফ্রান্স দেশ শাসন করিতেছে। তাহাদিগের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য সোসিয়ালিষ্ট্‌গণ এখনও সবিশেষ চেষ্টা করিতেছে। *

ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে, এবং মুসলমান ধর্ম্ম বহুপরিমাণে বিবাহে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ উঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। উহাতে যে ঐ দুই সম্প্রদায়ের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান জাতিসমূহের অধঃপতনের উহাই আমি একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করি। কোন মুসলমান জাতি যে-দেশ জয় করিয়াছে সেই দেশীয়দিগের সহিত উহারা অবাধ রক্তসংমিশ্রণ করিয়াছে। উহার ফলে বিজিতজাতির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও জেতৃজাতির ক্রমশঃ অবনতি অপরিহার্য্য হইয়াছে। † ঐ প্রথার ফলে যে-মিশ্রজাতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে যে বিজেতৃ-জাতির প্রতিভা থাকিতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বে যে-সকল আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মও যে এই কারণে জাতি-ভেদের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিয়া ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

Chicago University Press হইতে প্রকাশিত Heredity and Eugenics নামক গ্রন্থে বংশক্রম সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।— ‡

(১ম) ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে রিচার্ড এডওয়ার্ডস নামক এক সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এলিজেবেথ টুটল নামক এক তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে এক পুত্র ও চারি কন্যা হয় ও পরে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ হয়। কিন্তু ঐ পুত্রের বংশে আমেরিকার প্রায় কুড়িজন বিখ্যাত নরনারী একাল পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, রাজনীতিক, যোদ্ধা, এবং ব্যবসায়বীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এলিজেবেথ টুটলের কন্যাগণের বংশেও বহুসংখ্যক খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

(২য়) রিচার্ড এডওয়ার্ডস পরে মেরী ট্যালকট নামক এক সাধারণ রমণীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বংশে একটীও খ্যাত্যাপন্ন লোক একাল পর্য্যন্ত জন্মে নাই; অর্থাৎ ঐ বংশের কোনও ব্যক্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হয় নাই। *

(৩য়) ঐ গ্রন্থে বহুসংখ্যক অসৎলোকের বংশতালিকা উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহাদের বংশে ক্রমাগত অসৎ লোকই জন্মিয়াছে। এই-সকল লোকের দ্বারা নানাবিধ দুষ্ক্রিয়াই সংঘটিত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থে আমেরিকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বিবাহ না করায় সমাজের কি ক্ষতি হইতেছে ও ভবিষ্যতে কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থ হইতে এ স্থলে কয়েক ছত্র উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"A Harvard class does not reproduce itself, and at the present rate, one thousand graduates of to-day will have only fifty descendants two hundred years hence. On the other hand, recent immigrants and the less effective descendants of the earlier immigrants still continue to have large families; so that from one thousand Roumanians to-day in Boston at the present rate of breeding, will come a hundred thousand two hundred years hence to govern the fifty descendants of Harvard's sons." Page—309.

* Prince Kropotkin's History of the French Revolution দ্রষ্টব্য।

† লেখকের উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দেন নাই। ইংলণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে কেল্ট, এঙ্গল্, স্যাক্সন, জুট, ডেন, নর্ম্ম্যান প্রভৃতির রক্তমিশ্রণ বহুপরিমাণে হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ইংলণ্ড প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী, না প্রতিভাহীন ও শক্তিহীন হইয়াছে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

‡ Heredity and Eugenics—Page 300.

* লেখক কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা থাকিলে বংশের পক্ষে অসুবিধা নাই। তিনি কি মনে করেন যে শিক্ষা দ্বারা তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ে, না কমে?—প্রবাসী-সম্পাদক।

নবম অধ্যায়।

যুদ্ধ ও ব্যাধি।

যুদ্ধ ও ব্যাধি দেশের মধ্যে প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাস করিবার অন্যতম কারণ। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইবে যে, দেশের মধ্যে প্রতিভার অভাব হইলেই উহা দেশের প্রতিভাধ্বংসের বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ জাতিকেই ঐ দুই কারণ আরও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়।

বিবিধ নৈসর্গিক কারণ দেশমধ্যে ব্যাধি উৎপাদন করিয়া দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে পারে। কিন্তু প্রায় ঐ-সকল নৈসর্গিক কারণ বা তজ্জাত ব্যাধিসমূহ যে মানুষের চেষ্টার ফলে নিরাকৃত হইতে পারে তাহা ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। হলণ্ড একটী ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশের অধিকাংশ ভাগ পূর্ব্বে সাগর-জলে প্লাবিত থাকিত। কিন্তু সে দেশের অধিবাসীগণ বুদ্ধি ও শ্রমের বলে সাগরকে দেশমধ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া প্রচুর চাস ও বাসের ভূমি আদায় করিয়া লইয়াছে। স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে পরম প্রয়োজনীয় তত্ত্বগুলি অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেশ শুক্‌না খটখটে জায়গা যেখানে কৃমি কীট নড়িতেছে না, জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিতেছে না, যেখানকার জল বর্ণ- ও গন্ধহীন স্বাদ-হীন ও নির্ম্মল, তাদৃশ স্থানই যে স্বাস্থ্যকর তাহা মনুর সময়েও ঠিক হইয়াছিল। প্রাচীনকালে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না; কোন স্থানে কোন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে, লোকে অন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পলায়ন করিয়া বসবাস করিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহার উপায় নাই; ঐ-সকল স্থানকেই স্বাস্থ্যকর করিয়া লইতে হইবে। এ-সকল করিতে পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধির আবশ্যক। যে জাতির মধ্যে তাহা নাই তাহাদিগকে যে ক্রমশঃ রোগের আক্রমণে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ দ্বিবিধ উপায়ে দেশের প্রতিভাশালীর লোক-সংখ্যা হ্রাস করে। ১ম, এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ হইয়া; ২য়, একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া।

এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ হইলে, যে দেশের প্রতিভাবানের সংখ্যা ও উৎকর্ষ অধিক সেই দেশই জয়লাভ করে। যুদ্ধকালে ও পরাজয়ের পরে বিজিত জাতির বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিনাশ ঘটে, ও পরবর্ত্তী বহু কাল ধরিয়া তাহাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তি-বর্গের বংশবৃদ্ধির সুবিধা হয় না। আহারাভাবই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া বিজিত জাতির যে কোন কালেই উন্নতি হইবে না, এমন বলা যায় না। পূর্ব্বকথিত দ্বিবিধ কারণে জেতৃজাতিরও ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে পারে। অবাধে অন্য জাতির সহিত রক্ত মিশ্রণ * করিয়া তাহাদের জাতীয় গুণসমূহ তিরোহিত হইতে পারে। এবং তাহারা বিলাসী ও অলস হইতে পারে। উহার ফলে তাহাদের প্রতিভাশালীদিগের বংশবৃদ্ধি হয় না। এবং তাহারা আমোদে মগ্ন হইবার জন্য নিজেদের অধিকাংশ কার্য্যের ভার বিজিত জাতির উপর অর্পণ করে। ইহাতে বিজিত জাতি ক্রমশঃ কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমসহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী হইয়া উঠে। এইরূপে তাহারা ক্রমশ জেতৃজাতির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

কিন্তু যখন একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশ পরস্পরের সহিত প্রাণান্তকর যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় তখনই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হয়। এক শিক্ষিত খাসিয়া ভদ্রলোক একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ কর্ত্তৃক খাসিয়া দেশ জয় হওয়ার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ও বংশের খাসিয়াগণ পরস্পরের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিত। ইহার ফলে তাহাদের লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসনে আসার পর হইতে তাহাদের লোকসংখ্যা এখন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, দেশমধ্যে বহুসংখ্যক স্বাধীন খণ্ডরাজ্য থাকা অপেক্ষা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যস্থাপন দেশের বিশেষ হিতকর। খণ্ডরাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া

* এই যুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে।—প্রবাসী সম্পাদক

দেশের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে হত্যা করে ও তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করে। সাম্রাজ্যে ঐরূপ ঘটিতে পারে না।

যুদ্ধ ও ব্যাধি এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাধি অপেক্ষা যুদ্ধই দেশের প্রতিভার অধিক ক্ষতিকর। যুদ্ধ দেশের সুস্থ সবল ও সাহসিক সম্প্রদায়কে নষ্ট করে, ব্যাধি প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোককে নষ্ট করে।

দশম অধ্যায়।

পূর্ব্ব কথার আলোচনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে-সকল কথা বলিয়াছি তাহাতে ভারতবর্ষের অধঃপতন সম্বন্ধে আমাদের কি মত তাহা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। আমরা এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

আমরা দেখাইয়াছি যে, কোন জাতির উন্নতি তাহার প্রতিভাশালী লোকদের সংখ্যা ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। যদি পাঁচশত সাধারণ লোকের মধ্যে একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি থাকে তবে তাহার কার্য্য করিবার কোন সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ জন সাধারণ লোকের মধ্যে ঐরূপ ব্যক্তি একজন থাকিলে অর্থাৎ সমস্ত দেশের মধ্যে প্রতিভাবানের সংখ্যা ঐ অনুপাতে হইলে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে নবীন সন্ন্যাসী দলের সৃষ্টি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণ বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতিভাবানের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিল।* চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রতিভায় ভারতবর্ষে যে বিশাল ও সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে সেরূপ সাম্রাজ্য আর পরবর্ত্তী ভারতে গঠিত হইতে পারে নাই। † বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষে অহিংসামূলক ধর্ম্মের অত্যন্ত বিস্তৃতি হইয়া দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলির অত্যন্ত বিকাশ হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠ মহৎ গুণগুলিও সম্যক বিবেচনার সহিত প্রযুক্ত না হইলে দেশের কি ক্ষতি করে বৌদ্ধধর্ম্মই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মন্বাদি স্মৃতি আলোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে, প্রাচীন ভারতে দান ও আতিথেয়তা ছিল, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃকই উহা এদেশে প্রচলিত হয়। আতিথেয়তা নিজেরই মত বিপন্ন গৃহস্থকে সাহায্য দান। দানের সময়ে লোকে পাত্র সম্বন্ধে অনেকটা বিচার করে। কিন্তু মুষ্টিভিক্ষার কালে কেহই এরূপ বিবেচনা করে না। এ কারণে মুষ্টিভিক্ষাই বিশেষরূপ ক্ষতিকর। উহাতে দুঃস্থদিগের কিছু কিছু সাহায্য হইলেও অলস ও দুষ্কৃতিশীল ব্যক্তিগণেরই বিশেষ সুবিধা। তাহারা সমাজের কোনওরূপ হিত না করিয়াও এবং অনেক সময়ে অহিত করিয়াও অবাধে নিজেদের বংশ বিস্তার করিতে পারে। সকল দেশেই দায়িত্বজ্ঞানহীন জনগণেরই বংশবিস্তার অধিক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে আবার সে বিষয়ের আরও অধিক সুবিধা। এদেশে সামান্য পর্ণকুটীরেই বাস করা যায়; বৎসরের অধিকাংশ সময় অতি সামান্য খাদ্য খাইয়াই জীবন ধারণ করা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। এই-সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলির বংশ ধ্বংস করিবার সহায়তা করিয়াছিল তেমনই উহা আবার সমাজের অপদার্থ লোকগুলির বংশবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত হইলেও অকাল-সন্ন্যাসবাদ দূরীভূত হয় নাই। উত্তর ভারতে আজিও সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। কাশীর সন্ন্যাসীগণ অল্পকাল মাত্র হইল, শুধু ভেলের জোরে নহে, প্রকৃতই বিদ্যা বুদ্ধিতে অসাধারণ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামীর বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য দেখিয়া Mark Twain প্রমুখ অনেক ইউরোপীয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী আগমন করিত। এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ঐ-সকল লোক যদি বংশরক্ষা করিতেন তবে তাঁহা

* রক্ত-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্পাদক।

† চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রায় সংতশত বৎসর পরে সমুদ্রগুপ্তের আবির্ভাব। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ও প্রভাব চন্দ্রগুপ্তের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন ছিল না।—সম্পাদক।

দের বংশে দুই তিন শত বৎসর পরে অনেকগুলি প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিত। বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে সেখানকার মোহান্তের কতকগুলি চেলার সুকুমার মূর্ত্তি, অল্প বয়স, উজ্জ্বল চক্ষু ও বুদ্ধিমান মুখ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহাদের একজন বলিল মোহান্তজীর এরূপ চেলার সংখ্যা সর্ব্বসমেত পাঁচ শত। ভাল চেলার সংখ্যা সম্ভবত অত অধিক নহে। যে যাহাই হৌক, ঐ-সকল লোক যদি সমাজে থাকিত তবে তাহারা দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইতে পারিত। কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপনের জন্য তাহাদের অনেকেই হয়ত ভণ্ড ও দুষ্ট হইয়া উঠিবে।

পরবর্ত্তী কালের হিন্দু ভারতের প্রত্যেক পরাক্রান্ত রাজা, যাহারই অর্থবল ও শৃঙ্খলা-শক্তি অধিক হইয়াছিল, তিনিই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক মঠ সংস্থাপন করিয়া কিম্বা পুরাতন মঠগুলির সুব্যবস্থা করিয়া দেশে সন্ন্যাস বিস্তারের সুবিধা করিয়া দিয়া দেশের মহা অপকার সাধন করিয়াছেন। যেখানে সন্ন্যাস মানেই কোনও কালে প্রভূত ভূসম্পত্তি ও অর্থশালী মঠের উত্তরাধিকার, অন্যান্য বিবিধ ক্ষমতা ও সম্মান লাভ, বিনা পরিশ্রমে যথেষ্ট আহারের সংস্থান, বিবিধ লোককে আজ্ঞা করিবার সুবিধা, সেখানে যে বহুসংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষাযুক্ত বা শ্রমভীত লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! রাজাদিগের অনুকরণে দল দল ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অর্থশালী লোক সন্ন্যাসীদলের হস্তে প্রভূত সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অজ্ঞাতসারে দেশদ্রোহ করিয়া আসিয়াছে।

যে-কোনও উপায়ে সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতা দূর করা যায় তাহাই যে সমাজের অকল্যাণকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাই যে সমাজের অনেক কর্ত্তব্যভীত, শ্রমভীত লোককে কর্ত্তব্য লঙ্ঘনে ও আলস্যে প্রশ্রয় দেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে সন্ন্যাসের আদর্শ কিরূপ কঠোর ছিল তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক হইতেই প্রমাণ হইবে।

(১) খাদ্য যদি আপনা হইতে সম্মুখে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মহাসর্প যেমন তূষ্ণীভাব অবলম্বনেই বহুদিবস স্বস্থানেই পড়িয়া থাকে, আহার সংগ্রহার্থ অন্যত্র কোথাও গমন করে না, সেইরূপ উদাসীন যোগীগণও এক প্রারব্ধকে মাত্র আহারের প্রতিবন্ধক জ্ঞান করিয়া অনাহারেই দিন সমূহ অতিবাহিত করিয়া থাকেন, আহারার্থ কোনও চেষ্টা বা উদ্যম করেন না। ভাগবত। ৩।৮অ।১১ স্ক। শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।

(২) সন্ন্যাসীর সঞ্চয়ী হওয়া উচিত নহে; তিনি যে ভিক্ষান্ন একদিনের উপযুক্ত গ্রহণ করিয়া আবার পরদিনের জন্য সঞ্চয় রাখিবেন তাহা যেন কখনই না করেন। হস্তই তাঁহার ভোজনপাত্র এবং উদরই তাঁহার সঞ্চয়স্থালী; পৃথক সঞ্চয়ভাণ্ডের আর আবশ্যক করে না। সন্ন্যাসী সঞ্চয়ী হইলে মধুমক্ষিকার ন্যায় বিনষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। ঐ ১১।৮।১১।

(৩) অনেকে বসতি করিলেই কলহ জন্মে; এবং দুই জনে বাস করিলেও বৃথা কথালাপে কালাতিপাত হইয়া থাকে; অতএব কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকী অবস্থান করিলে কলহ বা বৃথা জল্পনায় কালাতিপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

সন্ন্যাসের ঐরূপ আদর্শ দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত থাকিলে প্রকৃত সন্ন্যাসী ব্যতীত বাজে লোকের দল যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে বিদূরিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত কারণের ফলে হিন্দু ভারতেও উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ন্যায় * বিরাট সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তখন বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই-সকল রাজ্য ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া দেশের যোগ্য লোকদিগের বংশের ধ্বংসসাধন করিত।

ধনবৃদ্ধির সহিত বিলাসিতাবৃদ্ধি-রূপ কারণ, সকল সভ্যদেশেই বিদ্যমান আছে। তবে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা

---

(১) শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনমেদ্‌গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্‌॥

(২) সাস্তনং স্বস্তনংবা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতং।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥

(৩) বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ॥

* পূর্ব্বে সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

মাঙ্গমান সম্প্রদায়কে দরিদ্র রাখিয়া এ বিষয়ের কতকটা প্রতিবিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এবং হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে দারিদ্র্য সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় যে তৎকালেও সমাজ-মধ্যে ধনহীন জনকে বর্ত্তমান কালেরই ন্যায় নানাবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত এবং দারিদ্র্য তখনই অপরাধের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাভারত বা রামায়ণে কিন্তু দারিদ্র্যের এরূপ কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডের উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত মতবাদের সপক্ষেই প্রমাণ পাই। অ্যাংগ্লোস্যাকসন ও নর্ম্মান এই দুই পরাক্রান্ত জাতি ইংলণ্ড অধিকার করে ও তথায় অবাধে বংশবিস্তার করিতে থাকে। ইংরেজদিগের মধ্য হইতে সন্ন্যাসবাদ শীঘ্র উঠিয়া যায়, আর উহা তথায় খুব বেশী পরাক্রান্ত হইতেও পারে নাই। ইংলণ্ডের ফৌজদারী আইন অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত ছিল; অনেক স্বল্প অপরাধেই লোকের প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের দুষ্ট ও অলস লোকদিগের বংশ ধ্বংস করিয়া জাতির উন্নতিবিধানই করিয়াছে। ইংলণ্ডের দারিদ্র্য-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলও তাই। সেখানে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদের প্রাখর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং এখনও অনেক পরিমাণে আছে। তদ্ব্যতীত ফ্রান্স হলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কতিপয় দেশের হুগনোট প্রভৃতি বহু শ্রমপটু ও শিল্প- ও বাণিজ্য-পটু লোক স্বদেশীয় রাজার ধর্ম্মসংক্রান্ত অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে বসবাস করিতে থাকে। তাহাদের বংশধরগণের কর্ম্মপটুতার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে কম সুবিধা হয় নাই। ঐ-সকলের ফলেই ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী লোকদের সংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ইংরেজদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে প্রতিভার প্রাখর্য্য পূর্ব্বের অপেক্ষা কম পড়িয়াছে বলিয়া একটা প্রকাণ্ড সোরগোল উঠিয়াছে। শুধু ইংলণ্ডে কেন পৃথিবীর সকল দেশেই পূর্ব্বের তুলনায় প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতিভাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (Eugenists) ইংলণ্ডের প্রতিভা হ্রাস হইবার নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দ্দেশ করেন। অর্থবাহুল্যের ফলে বিলাসবাহুল্য হইয়াছে; আবশ্যক দ্রব্যাদির মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে; ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ দান করা ও বাসস্থান দান করিবার খরচ এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে অনেক উৎকৃষ্ট নরনারী পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেই পারে না। অথচ ছেলেরা শিক্ষা পাউক নাই পাউক, খাইতে পাউক বা নাই পাউক এসকল ভাবনা যাহাদের নাই তাহাদের বংশবৃদ্ধির কমতি নাই। অনেক ক্ষীণ, কুচরিত্র বা ব্যাধিগ্রস্ত অর্থবান নরনারী অনায়াসে বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। স্বাস্থ্য-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি হওয়ার জন্য এবং সমাজে দয়ার আতিশয্য থাকাতে নানাবিধ দানের প্রবর্ত্তন হইয়া এবং ফৌজদারী আইনের সংশোধন হইয়া অযোগ্যদিগকে জীবিত রাখিবার পক্ষে ও তাহাদের বংশবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উন্নতির কথা আলোচনা করিলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথারই যথার্থ্য প্রমাণ হইবে। ইংরেজশাসনে দেশমধ্যে প্রগাঢ় শান্তি সংস্থাপিত হওয়াতে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষির সুবন্দোবস্ত হইয়া এই দেড় শত বর্ষের মধ্যে এ দেশের লোকসংখ্যা অসাধারণ রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে কোনও কালে এত অধিকসংখ্যক লোক ছিল বলিয়া বোধ হয় না (অন্ততঃ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে ছিল না ইহা ঠিক)। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সন্ন্যাসের প্রতি লোকের ভক্তি অনেক কমিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ অনেক গৃহী, লোকের মনোরাজ্যের উপর অধিকতর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রভৃতির আর যাহাই দোষ থাকুক উহারা যে এককালে হিন্দুজাতির প্রতিভার সংরক্ষা ও বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের যৌথ পরিবার প্রথাও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতে কয়েক বার

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুর্ভিক্ষে দেশের প্রতিভাবান সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না, সাধারণ লোকেরই অধিক ক্ষতি হয়। প্লেগ প্রভৃতিও উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের ফলে ভারতবর্ষে যে এক্ষণে সাধারণ লোকের অনুপাতে প্রতিভাশালীর সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং উহার উৎকর্ষও হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।* অতএব রাজনীতিবিদগণকে ভারতের অশান্তির আলোচনার সময় আর্থিক বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় কারণ অপেক্ষা প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধীয় কারণটীকেই (Biological cause) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তদ্বিষয়েই অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়।

শেষ কথা।

বুদ্ধিমান পাঠকগণ দেখিবেন যে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা বাকলের "সভ্যতার ইতিবৃত্ত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক অধ্যায় স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ চারিপার্শ্বের অবস্থাকেই জাতীয় উন্নতি বা অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তখন ডারউইন ও তদনুগামী প্রতিভা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা লোকসমাজে প্রচলিত হয় নাই। তাঁহাদিগের কথা বর্ত্তমান সময়ে লোকমধ্যে বিশেষরূপ প্রচারিত হইতেছে। অতএব ইতিহাসেরও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বের অধ্যায় সমূহে সে পরিবর্ত্তন কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। জীব-বিদ্যাসম্বন্ধীয় কারণই জাতীয় উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারণ এবং চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা অপ্রধান কারণ।

কিন্তু মানুষের শক্তি, সকল আলোচনাতেই কিছু দূর মাত্রই অগ্রসর হইতে পারে। এই কিছু দূরের পরই এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের জ্ঞানদৃষ্টির পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিয়া সে পথের কিছু দূর আবিষ্কার করিয়াই কিয়ৎক্ষণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন, কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞানরাজ্যের অনাবিষ্কৃত দেশের বিশালতা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন। আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতিতে অনেক অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমরা শক্তি কি, প্রাণ কি, পরমাণু কি, এ-সকল কথার কোনও উত্তর জানিনা। আমরা অণুবীক্ষণ যোগে কোন দ্রব্যের আয়তন দশ হাজার গুণ বর্দ্ধিত করিলে কিরূপ হয় বলিতে পারি, কিন্তু উহা লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয় তাহা বলিতে পারি না। সেইরূপ ইতিবৃত্ত-বিজ্ঞানেও আমরা জাতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি কিন্তু সেই কারণের কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেই আমাদের বুদ্ধি ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আইসে।

যে সকল কারণে জাতীয় প্রতিভা উদ্ভূত হয় এবং যে-সকল কারণে জাতীয় প্রতিভার ধ্বংস হয় তাহা অধ্যয়ন করিয়া কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, ঐ-সকল নিয়মের প্রয়োগ করিয়া একটা জাতির উন্নতিবিধান ত সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু কাজটা প্রকৃতই অত সহজ নহে। জাতীয় উন্নতি ও অবনতি এখনও নিয়তির হস্তে। তত্ত্বজ্ঞগণ বুঝিতে পারেন কোন্ নিয়মে একটা জাতি উঠিতেছে এবং কি কি কারণের বশেই বা একটা জাতি পড়িতেছে। কিন্তু একটা পতনোন্মুখ জাতিকে উত্থিত করা এবং একটা উত্থানোন্মুখ জাতিকে পতিত করা এ উভয়ই তাঁহাদের শক্তির অতীত। একটা জাতি যেন একটা প্রকাণ্ড নদী, মানবগণ যেন এক-একটী জলকণা। নদী যখন চলিতে থাকে তখন এক-একটী জলকণা ঊর্দ্ধে বা এদিকে ওদিকে ছিটকাইয়া যায়, তাহারা ভাবিতে পারে নদীকে এই দিকেই লইয়া যাইব, কিন্তু তাহা হয় না; তাহাদিগকে নদীর সহিতই যাইতে হয়।

যখন দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ দেশমধ্যে হীন ছিল তখনই দেশমধ্যে কৌলীন্যপ্রথা চলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন নহে। যে সময়ে সমাজ বর্ব্বর ভাবে জাতির অপদার্থদিগের ধ্বংসসাধন করিতেছিল তখন সমাজের

* লেখক এই উক্তির কোন প্রমাণ দেন নাই। দেশে ২।১ জন কবি ও বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছে বটে; কিন্তু মোটের উপর মানবজীবনের নানা বিভাগে এবং নানা বিদ্যায় প্রতিভাশালীর সংখ্যা বাড়িয়াছে কি?—সম্পাদক।

উন্নতি হইতেছিল এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।* কিন্তু ঐ-সকল উপায়ে বর্ত্তমান কালে অযোগ্যদিগকে বিনাশ করিলে যে সমাজের উন্নতি হইবে তাহা খুব কম পণ্ডিতই ভরসা করিয়া বলিতে পারে। যে সময়ে সমাজ নৃশংসতা ও স্বার্থপরতাকে হেয় গুণ ভাবিতে শিখিয়াছে সে সময়ে যদি সমাজ অযোগ্যদিগের ধ্বংসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ কঠোর বিধান করে তাহা হইলে সমাজ-মধ্যে যে নৃশংসতা ও স্বার্থপরতার আতিশয্য হইয়া উহার ফলে সমাজ ধ্বংস না হইবে তাহা কে বলিল? দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়া দেশের লোকসংখ্যা কমিয়া দেশে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা কমিয়া যায়, জাতির কতকটা উৎকর্ষ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে-ব্যক্তি দেশ-মধ্যে দুর্ভিক্ষের কামনা করে, যে-জাতির মধ্যে তাদৃশ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, সে জাতির অধোগতি যে অনিবার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাই আমার ধারণা জাতীয় উন্নতি ও অবনতি মানুষের বুদ্ধির অতীত এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির বলে পরি-চালিত হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিকে নিয়তি, এবং ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবান বলিয়া থাকেন।

যখন কোনও পতিত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমন নিয়মিত হয় যে তাহার প্রতিভাশালীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়; তাহার উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

তেমনই যখন কোনও উন্নত জাতি পতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমনই নিয়মিত হইতে থাকে যে তাহাদের মধ্যে প্রতিভা ক্রমাগত কমিতে থাকে ও তাহার পতন কেহ রোধ করিতে পারে না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* এই উক্তির প্রমাণ কি? এবং যোগ্যাযোগ্য নির্ণয়ের মাপ-কাঠি কি?—সম্পাদক।

রিয়ার চাষ

উদ্ভিজ্জ হইতে যে-সকল আঁশ বাহির হয় রিয়া তাহা[illegible] মধ্যে একটি। ইহাঁর অপর নাম রেমী (Ramie) ইংরেজীতেও ইহাকে রেমী বা রিয়া (Ramie or Rhea) বলে। এই রিয়া গাছকে ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে 'বোমেরীয়া নিভিয়া' (Boehmeria Nivea) বলিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার ঘাস জাতীয় গাছ। ইহার অপর আর একটি নাম China-grass plant। আমাদের ভারত-বর্ষে লোকে ইহাকে 'রিয়া' বলিয়াই জানে। ইহা আরটিকা (Urtica) বংশ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে যে বোমেরিয়া বলিয়া একটি উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উপশাখা (Sub-division) হইতে রিয়ার জন্ম। রিয়া বহু প্রকারের দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই প্রকারই সর্ব্বোত্তম। তাহাদের একটির নাম বোমেরিয়া টেনাসি-সিমা (Boehmeria Tenacissima); ইহাই সবুজ-বর্ণের-পত্র-বিশিষ্ট রেমী। দ্বিতীয় প্রকারের নাম বোমেরিয়া নিভিয়া (Boehmeria Nivea)। ইহাই রিয়ার সাধারণ নাম। এই শেষোক্ত রিয়ার পত্র এমত চাকচিক্য-শালী যে ইহার পত্রের নিম্নভাগ পর্য্যন্তও যেন রজতময় বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই প্রকারের রিয়া অধিকাংশই ভারতবর্ষে, চীন দেশে এবং ফরমোজাদ্বীপে জন্মে। প্রথম জাতীয় রিয়া (Tenacissima) যাবা, সুমাত্রা, বোর্ণীয়ো, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং মেক্সিকো দেশে এবং আরও অপরাপর কতিপয় দেশে জন্মিয়া থাকে। এই রিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। ভারতগবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্যের অর্থনীতি উপদেষ্টা সার জর্জ্জ ওয়াট এই রিয়ার নাম সম্বন্ধে বলেন—যদি মালয় ও ভারতে জাত রিয়া অথবা রেমীর সূত্র পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে এই দুইটিকে একজাতীয় বলা যায় না। এতদুভয়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করিলে সূত্রের বিস্তর পার্থক্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু চীনারা এই দুইটিকে এক নামেই অভিহিত করিয়াছে তাহাদের ভাষায় ইহাকে "চু-মা" (Tchow-ma) কহে। কোন্ দেশে ইহাকে কি বলে আমরা নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম—

দ্রব্যের নাম		দেশের নাম
১। চু-মা—	Chu-ma (Tchow-ma)	চীন
২। কেগাই ও পামা—	Cay-gai and Pama.	কোচিন চীন
৩। কানখুরা বা কুঙ্কুরা—	Kankhura or Kunkhura	বঙ্গদেশ (সর্ব্বত্র নহে)
৪। কুন্দ—	Kund	বগুড়া (বঙ্গদেশ)
৫। কুরকুন্দ—	Kurkunda	জলপাইগুড়ি (বঙ্গদেশ)
৬। রীহা, রিসা	Reeha (Riha), Risa,	আসাম
৭। রুসা ও সুমসা	Rusa and Sumsha,	নাগা (পার্ব্বত্য প্রদেশ)
৮। কঙ্কুরা (বাঙ্গালা নাম)	Kankura,	আসাম উপত্যকা (গারো পাহাড়, ও কামরূপ প্রভৃতি স্থানে)

গারো পাহাড় ও কামরূপ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গদেশ-প্রচলিত নামেই উক্ত দ্রব্যের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

বোমেরিয়া নিভিয়া (Boehmeria Nivea) জাতীয় রিয়া ভারতে নিতান্ত কম নহে। এই জাতীয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও তাহার শাখাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ইহার গুঁড়ী কেশের ন্যায় কোমল এবং সরস। পত্রগুলি প্রশস্ত, ডিম্বাকৃতি, মস্তক তীক্ষ্ণধার এবং পার্শ্ব করাতের ন্যায় দন্তর এবং ধারাল। পত্রের নিম্নভাগ কাণ্ডের দিকে কর্ত্তিত। ইহার নিম্নার্দ্ধ ভাগে তিনটি শিরা দেখিতে পাওয়া যায়। পত্রের উপরিভাগের সমতলক্ষেত্রে যেন রজতাভ পশম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পত্রের মধ্যে আরও বহু শিরা নয়নগোচর হয় কিন্তু সেগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট। এই বৃক্ষ পুষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকে। রিয়া হইতে যে সুতা বাহির হয় তাহা সর্ব্বোপরি-ত্বকের নিম্নভাগে অবস্থিত। তথায় সূত্রগুলি আঠা এবং রঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে। রাম্ফ নামে একজন উদ্ভিদ-বিদ্যাপারদর্শী দিনেমার সর্ব্বপ্রথম এই সূত্র র্যামিয়াম মেগাস্ (Ramiaum Magus) নাম দিয়া আবিষ্কার করেন। সেই হইতেই ইহার নাম "রেমীসূত্র" হইয়াছে। তিনি অনুমান ১৬৯০ খ্রীঃ বানোয়া দ্বীপে এই সূত্র আবিষ্কার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার নমুনা ইউরোপখণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতে বোমেরিয়া নিভিয়ার বৃক্ষ দেখিয়া ১৮০৭ সালে ডাক্তার বুকানান হামিল্‌টন তাহার নাম রাখেন কাঙ্কুরা।

যত প্রকার সূত্র দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে এই সূত্রেরই স্থায়িত্ব অধিক। ইহা অতিসূক্ষ্ম। ইহা চাকচিক্যে রেশমের সমতুল্য। পূর্ব্বে যে বোমেরিয়া টেনাসিসিমা জাতীয় রিয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বোমেরিয়া নিভিয়া জাতীয় রিয়াই অধিক উত্তম, ইহা কিন্তু উহা অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। এই সুতা চরকায় কাটা যায়। ইহার সুতা কাটিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের রিয়ার সূক্ষ্মতার সঙ্গে শেষোক্তের তুলনা হইতে পারে না। টেনাসিসিমার সূতা কিছু মোটা। সেই জন্য শ্বেতজাতীয় বা নিভিয়া জাতীয় রিয়ার ন্যায় উহার সুতা বাহির হয় না এবং ঐ সুতা কাটাও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বা নিভিয়া জাতীয় রিয়ার সুতা তত মজবুত বা স্থায়ী না হইলেও তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম সুতা বাহির হয়, কিন্তু সুতা বাহির করিতে কিঞ্চিৎ যত্ন লইতে হয়। এই উভয় প্রকার সূত্রের দৈর্ঘ্যে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। রিয়ার সূত্র সহজেই নমনীয় এবং উহা শনের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। স্থানের জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে উহার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গজের ·০৮৮ হইতে ২·১০ গজ পর্য্যন্ত আঁশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহিঃত্বক পৃথক করিয়া সূত্র বাহির করিতে হইলে কলের সাহায্যেই কাজ ভাল হয়। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকারের কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেম্যান ও ফাউয়ার (Lehman and Faure) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কল। ইঁহারা বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই কলের উন্নতি করিয়াছেন। লেম্যান কল দুই প্রকারের। প্রথম কল স্থাবর, কারখানাদিতে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয় কল সচক্র ও সচল। ফাউয়ারের কল 'রেমী'-প্রধান স্থানে ব্যবহৃত হয়। বিহার প্রদেশে ডালসিংসরাই নামক স্থানে ঐ কল চলিতেছে।

যখন সুতা বাহির করিবার জন্য পত্র হইতে ত্বক পৃথক করিয়া বস্তায় বস্তায় মাল কারখানায় আসিতে থাকে তখন সর্ব্বপ্রথম তাহা হইতে আঠা বাহির করিতে হয়। তাহাকে নির্য্যাস-নিষ্ক্রামণ (Degumming) প্রক্রিয়া বলে। এই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বস্তাগুলি খুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে উহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির বর্ণ, দৈর্ঘ্য, আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া গুণাগুণ স্থির করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে

রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে প্রকারে তুলা পরিষ্কার করিতে হয়, ইহাও সেই প্রকারে রাশীকৃত করিয়া কলের সাহায্যে বাষ্প, জল এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার আঠা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কল-সাহায্যে ধৌত করা, চাপ দেওয়া এবং পম্প করা প্রভৃতি বহু ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। আঠা-বহিষ্করণ-প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সামর্থ্য, কোমলতা, ঔজ্জ্বল্যের কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্ষতি হয় না—পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ ইহার চট্‌চটে ভাবটা দূর হয়। এই কার্য্য শেষ হইয়া গেলে অপরাপর কার্য্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এই প্রকারে উত্তমরূপে ইহার প্রস্তুতপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেলে এবং সুন্দররূপে সূতাগুলি সজ্জিত বা বিন্যস্ত করা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় দুই প্রকার কার্য্য সম্পূর্ণ হইল বলিতে হইবে।

আঠা বাহির করা শেষ হইয়া গেলে হস্ত দ্বারা রিয়া-গুলি গিল-স্প্রেডিং (Gill-spreading) কলে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ঐ কল হইতে সূতা এলো-মেলো ভাবে বাহির হইতে থাকে। পরে তাহা বহুসংখ্যক গিল-মেসিনের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর আঁশ বাহির করিবার কার্য্য আরম্ভ হয়। কতকগুলি ভ্রাম্যমান গিল-ড্রইং ফ্রেমের মধ্য দিয়া সেই বিন্যস্ত আঁশগুলি প্রবিষ্ট করাইতে হয়। তথা হইতে ফিতার ন্যায় দ্রব্যগুলি রোভিং ফ্রেমের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়। তথায় ফিতা-গুলি ধুনুরি দ্বারা অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। এই কল দ্বারাই সূতা বাহির করা এবং গুটানো হয়। ইহাকে রোভিং প্রসেস বলে। স্পিনিং প্রসেস বা সূতা কাটিবার রীতির সঙ্গে রোভিং প্রণালীর কিয়ৎ পরিমাণে সমতা দৃষ্ট হয়। রোভিং প্রণালীতে সূতা বাহির করা হয় এবং স্পিনিং প্রণালীতে সূতা গুটানো হয়। স্ক্রুগিল রোভিং ফ্রেমে (Screw gill roving frame) ৪০টি চরকা থাকে। কোন কোনও কলে ২৪টি দেখা যায়। ডাণ্ডী রোভিং ফ্রেমে ১০০টির কম থাকে না। যাহা হউক, এই প্রকারে রিয়া পরিষ্কার গুটানো এবং বাণ্ডিল প্রস্তুত হইলে সূতা বয়নোপযোগী হইয়া থাকে। রেমী সূতা যে-কোন তাঁতে বয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যকিরণ এই সূতার উপর পতিত হইলে উহার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সূতা বয়ন করিবার কলঘরের জানালাদিতে পরদা টাঙাইয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে রিয়ার চাষ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কেহই ইহার প্রতি মনোযোগী হন না বা চাষ করিবার জন্য অর্থব্যয় দ্বারা লোক নিযুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হন না। এইদিকে কাহারও কাহারও মনোযোগ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগণপতি রায়।

ভবিষ্যতের ধর্ম্ম

পুরাতন "সাধনা"য় "ভবিষ্যৎধর্ম্ম" শীর্ষক একটি রচনা পাঠ করিতেছিলাম। একজন চিন্তাশীল ইংরেজ ইংরেজী ভাষায় উক্ত রচনাটি লিখিয়াছিলেন; কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে ভবিষ্যতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাই মনে জাগ্রত হইয়াছে; সেই কথাগুলিই এই রচনার মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে যে রকম জ্ঞানের উন্নতি বিস্তার হইয়াছে, আর কোনকালেও সে রকম হয় নাই। এখন মুদ্রাযন্ত্রের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে; পৃথিবীর যেখানে যে-কোন জ্ঞানের তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, অথবা যে-কোন নূতন সত্য প্রকাশিত হইতেছে, জ্ঞানীগণ তাহাই সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ছাপাইতেছেন। রেলওয়ে ও ষ্টীমার ঐ-সকল নানা দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষ আপনার ঘরে বসিয়া সমস্ত জগতের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে এবং উহা হইতে সত্য সংগ্রহ করিতেছে। সংবাদপত্রের এমনি উন্নতি হইয়াছে যে, প্রত্যহ উহা পাঠ করিয়া জগতের সংবাদ অবগত হইতেছি এবং কোথায় কোন্ জ্ঞানী কোন্ নূতন তত্ত্বটি আবিষ্কার করিলেন, তাহাও জানিতে পারিতেছি। এই জন্য দিনের পর দিন মানুষের জ্ঞানের বিকাশ

হইতেছে; চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, বিচার-বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এবং মানুষ স্বাধীন ভাবে তত্ত্ববিচার ও সত্যনির্দ্ধারণ করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মত গঠন করিতেছে;—সেই মতানুসারে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইতেছে। কাজেই সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত দেশের ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, এ সকলেরই আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে এবং ঐ-সমস্ত এক নূতন আকারে গড়িয়া উঠিতেছে। পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী ও পুরাতনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ এই-সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছেন, সর্ব্বদাই হায় হায় করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই পরিবর্ত্তনের স্রোতকে ফিরাইতে পারিতেছেন না।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মের মধ্যেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইবার অগ্রেই ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইল; তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহা শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিস্তর শিক্ষিত লোক ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পঞ্জাবে মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সমাজের সভ্যগণ অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন পঞ্জাবে শিখধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে। খালসাশিখগণ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের গত যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বর্গীয় মনস্বী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকল সমাজেরই সুশিক্ষিত চিন্তাশীল দেশহিতৈষী ধার্ম্মিকগণ হুবহু পুরাতন ধর্ম্ম লইয়া আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মই যে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক নূতন আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভবিষ্যতে যদি অনেক ধর্ম্মই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করে, তাহা হইলে সেই-সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইবে? কোন্ কোন্ সত্য বিকশিত হইয়া উঠিবে?

এ প্রশ্ন অতিশয় দুরূহ। ভবিষ্যতের কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? তবে এ বিষয়ে কালের একটা ইঙ্গিত আছে। ধর্ম্ম ভবিষ্যতে কি হইবে, আমরা বর্ত্তমান কালের মধ্যেই তাহার একটা অস্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকি। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাহার একটি লোহিত আভা পূর্ব্বাকাশে পরিলক্ষিত হয়; তেমনি ভবিষ্যতে ধর্ম্ম কি আকার প্রাপ্ত হইবে, তাহারও একটুকু আভাস উদারচিত্ত মানবহিতৈষী ধার্ম্মিকদিগের চিন্তার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি বর্ত্তমান কালের যবনিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করে; তাই তাঁহারা শুধুই বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে চিন্তাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; ভবিষ্যতে যে সত্য, যে আদর্শ আসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিবে, তাঁহারা সেই বিষয়ে চিন্তা করেন এবং চিন্তার অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমরা এই শ্রেণীর ধার্ম্মিক ও মনস্বী ব্যক্তিদিগের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে এবং কালের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ হইলে, ভবিষ্যতের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কতকগুলি সত্য উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের রচনার প্রথমেই "সাধনা"য় প্রকাশিত "ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে প্রশ্ন করা হইয়াছে "ভবিষ্যতের ধর্ম্মে দেবতা স্থান পাইবেন কি না? দেব দেবী ত প্রতিদিন লোপ পাইতেছে—ঈশ্বর কি থাকিবেন?" মূল প্রবন্ধের লেখক ডাক্তার মোমারি সাহেব বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে নিশ্চয়ই একমাত্র ঈশ্বরের অর্চ্চনা ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা কালের ইঙ্গিতে এই সত্যই উপলব্ধি করিতেছি। ধর্ম্মজগতের গতিই একেশ্বরবাদের দিকে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বহুদেববাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জন্মিতেছে; চিন্তাশীল ধার্ম্মিকদিগের

অন্তরে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের ভাবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের পরিচিত যে-সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইউরোপে ও আমেরিকায় গমন করিয়াছেন এবং মনস্বী ও উদারচিত্ত ধর্ম্মপিপাসু লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন খ্রীষ্টান সমাজের বিস্তর শিক্ষিত লোক আর অবতারবাদের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছেন না। ঐ-সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টকে আদর্শ মানুষ মনে করিয়া তাঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের পূজার পুষ্পাঞ্জলি একমাত্র ঈশ্বরের চরণেই অর্পিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মনীষী ব্যক্তি উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন।

আমাদের ভারতবর্ষে আমরা কি দেখিতে পাইতেছি? এখানে মুসলমানগণ বহুদেববাদ লুপ্ত করিয়া দিয়া একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপন করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর। তদ্ভিন্ন পঞ্জাবে শিখধর্ম্ম রহিয়াছে। শিখধর্ম্মাবলম্বীগণ নিরাকার ঈশ্বরের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যসমাজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতেছেন। এই দুই ধর্ম্মেরই লোকসংখ্যা অল্প বটে; কিন্তু শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। দেশের অনেক সুশিক্ষিত শক্তিশালী ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এই দুই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিস্তর শিক্ষিত লোক এই দুই ধর্ম্মের সঙ্গে অন্তরের যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যসমাজ দেশের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য এই উভয় ধর্ম্মের অনেক সত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইতেছে।

বৃহৎ হিন্দুসমাজে যে-সকল প্রাচীন ভাবাপন্ন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারাও আর পুরাতন বহুদেববাদ সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। ইংরেজী শিক্ষা, উপনিষদ ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র এবং প্রত্নতত্ত্ব, একেশ্বরবাদের প্রতিই তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ঈশ্বর কি আর এক ভিন্ন দুই হইতে পারে? তবে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে ধারণা করা যায় না বলিয়াই দেবমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দু কখনই পৌত্তলিক নহে; হিন্দু, গ্রীকদের মত, বহু দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে পারে না; শুধু উপাসনার সুবিধার জন্য সম্মুখে কল্পিত মূর্ত্তি রাখিয়া তন্মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করেন। নতুবা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার অর্থ কি?

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বজনমান্য প্রবীণ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত বঙ্গীয় সমাজ একজন নিষ্ঠাবান প্রাচীনভাবাপন্ন হিন্দু বলিয়া মনে করেন। তিনি তাঁহার প্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" শীর্ষক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের "মূর্ত্তিপূজা নিবারণ" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—

"কেহ যদি মূর্ত্তিই ঈশ্বর মনে করে, তাহা নিতান্ত ভ্রম। কিন্তু যদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ কঠিন বলিয়া তাঁহাকে সাকার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার কার্য্য গর্হিত বলা যায় না। হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা যে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ও শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই যে তাহা সেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু পূজাপ্রণালীতেই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। হিন্দু যখন যে-মূর্ত্তির পূজা করেন তখন সেই মূর্ত্তিই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করেন। * * হিন্দুর সাকার উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, তৎসম্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ একটী সুন্দর শ্লোক আছে।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার।
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আছ সম ভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে।
করেছি এ তিন দোষ আমি মূঢ়মতি
ক্ষমা কর জগদীশ, অখিলের পতি।

অতএব হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা বা বহু-ঈশ্বরবাদ-দোষে দূষিত বলা উচিত নহে।"

মহাত্মা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিবার সময় এই উৎকৃষ্ট বচনটি আবৃত্তি করিতেন। আমাদের মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সমাজের একজন আদর্শ হিন্দু হইয়াও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম্ম

যে পৌত্তলিকতা-দোষ-শূন্য ও তাহার লক্ষ্য যে একেশ্বরবাদ, তাহাও বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন সুশিক্ষিত ও উদারচিত্ত চিন্তাশীল হিন্দুগণ এই রকম মতই পোষণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধদিগের মুখে এ রকম কথা শুনিতে পাই নাই। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করেন নাই, উচ্চতর দর্শন বিজ্ঞানও পাঠ করেন নাই; কাজেই তাঁহাদের বিশ্বাসও অন্য রকম ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও কালী দুর্গাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা ও দেবী বলিয়াই মনে করিতেন। এখনও এ দেশের বিস্তর লোক উক্তরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই দেব-দেবীর অর্চ্চনা করেন ও তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পশুবলি প্রদান করেন।

যাহা হউক, বহু দেবতার অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; প্রতিমার মধ্যে শুধুই তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিয়া অর্চ্চনা করা হয়;—এই বিশ্বাসই যদি আপামর সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে বহুদেববাদ ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ মনুষ্যকল্পিত ও মনুষ্যনির্ম্মিত মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করার চেয়ে ঈশ্বরনির্ম্মিত জীবন্ত এবং মনোমুগ্ধকারী বিশ্বমানব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করা সহজ, স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক। তাহা ছাড়া আপনার প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণস্বরূপকে উপলব্ধি করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই এই জীবনের বিবিধ ক্রিয়া ও নানা ঘটনার মধ্যে আমার অতীত এক মহাশক্তি এবং মহাজ্ঞানের কার্য্য অনুভব করিতেছি; এই আমার আত্মার মধ্যেই ত পরমাত্মার সঙ্গে নিগূঢ় যোগ। এই সাক্ষাৎ যোগ উপলব্ধি না করিয়া পরোক্ষভাবে একটি কল্পিত প্রাণহীন মূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করা কখনই সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্যই উপনিষদের ঋষিরা স্বীয় আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভাব মানুষের মনে যতই প্রবল হইয়া উঠিবে, ততই যে বহু দেবতার পূজার প্রতি লোকের অনুরাগ হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন দেব-প্রতিমাকে ঈশ্বর মনে না করিয়া তন্মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাও যে এক রকম একেশ্বরবাদ, সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গতি যে একেশ্বরবাদের দিকে, তাহা অতি উত্তম রূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।

একেশ্বরবাদই যে ভবিষ্যতে ধর্ম্মের একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে আরও গুটিকয়েক কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের ধর্ম্মধারণার মূলে কি? আমরা ঈশ্বরকে চাহি কেন? কেনই বা শ্রম স্বীকার করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হই? চিন্তাশীল ঈশ্বরবিশ্বাসী পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন? তাঁহারা বলেন—সসীম মানুষ অসীমকে পাইবার জন্য, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণ পুরুষের মধ্যে গিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য, অনন্তের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; নরনারীর অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে অসীমের জন্য আকুলতা রহিয়াছে; মানবাত্মার স্বাভাবিক গতিই অনন্তের দিকে। অনন্তের আকাঙ্ক্ষা হইতেই মানবের ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

—"পরাণ শান্তি না মানে
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে।"

পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর বলিয়াছেন—

"অনন্তের ধারণা সকল ধর্ম্মের মূলে লক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত, বিশ্বাসও সেইরূপ সীমাবদ্ধের অধঃস্থিত অসীমের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। * * আমরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে যতদূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, উহা কেবল সীমাবদ্ধের আবরণের পশ্চাতস্থিত অনন্তের বিবিধ নামকল্পনা-চেষ্টার-ইতিহাস মাত্র।" *

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত চতুর্থ সংস্করণের ৫৫৩।৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"রাজা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং

* পরলোকগত রজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত "ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি" শীর্ষক গ্রন্থের ৮২।৮৩ পৃষ্ঠা।

ইহা স্বাভাবিক। * * বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ প্রকার উপাসনা-প্রণালীতে বিশ্বাস শিক্ষার ফল। এ-সকল স্বাভাবিক নহে। জনশ্রুতি, শাস্ত্র ও চতুঃপার্শ্বের অবস্থা দ্বারা এই-সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

সমস্ত মানবের অন্তরাত্মা অনন্তকে পাইবার জন্য এবং অনন্তের অভিমুখে যাইবার নিমিত্ত কি রকম ব্যাকুল, তাহা আমরা আমাদের জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি। দার্শনিকেরা বলেন, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা এই তিনটি মানবাত্মার স্বরূপ —এই তিন লইয়াই মানবজীবন। এই তিনটির গতি কোন্ দিকে? আমাদের জ্ঞান জগতের রহস্যাবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত সত্যকে জানিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আছে। দিনের পর দিন কত সত্যই জানিতেছে, কিন্তু তবুও জ্ঞানের তৃপ্তি নাই। ঐ স্রোতস্বিনী যেমন অনন্ত সাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়াই কৃতার্থ হইতে চায়, তেমনি মানবের জ্ঞান পূর্ণ সত্য অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। আবার মানবহৃদয়ের প্রেম, নিরন্তর জগতের স্নেহ প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছে, তবুও তাহাতে তৃপ্তি নাই; আমাদের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কোন সীমাবদ্ধ বস্তুতেই তৃপ্তিলাভ করে না; হৃদয়ের মধ্যে কেবলই অতৃপ্তি! ইহাতেই বুঝিতে পারি, নরনারীর অন্তরের প্রীতি সেই অসীম প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। আমাদের ইচ্ছাও এক মঙ্গলময়ী মহা ইচ্ছারই অনুসরণ করিতে চাহিতেছে। সুতরাং অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে না পাইলে, কিছুতেই আমাদের কৃতার্থ হইবার উপায় নাই। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভিক্তর কুজ্যাঁ এই বিষয়ে বলিতেছেন—

"জ্ঞান যেরূপ সত্যের চরম মূলতত্ত্বে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে, ভাবও সেইরূপ অনাদি অনন্ত পুরুষে আসিয়া তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হয়। * * আসলে আমরা সেই অসীমকেই ভালবাসি। আমরা এতই অসীমে আকৃষ্ট, অসীমে মুগ্ধ, যে, যতক্ষণ না অসীমের অমৃত উৎসে উপনীত হই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তিলাভ করি না। আমরা অসীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের প্রচণ্ড আবেগ-সমূহের অন্তঃস্তলে—লঘু বাসনা-সমূহের অন্তঃস্তলে, এই অসীমের ভাবরস—এই অসীমের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান।" *

মানবের ধর্ম্মধারণার মূলে অনন্তের জ্ঞান; মানবের অনন্তোন্মুখী গতির নামই ধর্ম্ম; মানুষের গূঢ় মর্ম্মস্থানে অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা রহিয়াছে বলিয়াই উপাসনা; উপাসনার মধ্য দিয়া মানুষ অনন্তের সঙ্গে মিশিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উচ্চতর ধর্ম্মধারণাই যদি মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, তবে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই যে ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভবিষ্যতে ভ্রাতৃভাব, উদারতা ও সমদৃষ্টি ধর্ম্মের যে আর একটি লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানীগণ উদার ও উন্নত দৃষ্টিতে ধর্ম্মকে দেখিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্ম পৃথিবীর ন্যায় বিশাল ও সাগরের ন্যায় সুগভীর। পৃথিবী আপনার বক্ষে বৃহৎ বনস্পতিকেও ধারণ করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র তৃণকেও আশ্রয় দান করিয়াছেন; তাঁহার ক্রোড়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নিকৃষ্ট কীটও বাস করিতেছে; সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি ও সুগভীর স্নেহ। সাগরের মধ্যে সামান্য বালুকণা ও মহামূল্য রত্ন উভয়ই রহিয়াছে। সেইরূপ উদার ধর্ম্ম শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, এবং হিন্দু, খ্রীষ্টান্ ও মুসলমান সকল জাতিকেই আপনার মধ্যে স্থানদান করিবেন এবং সমান ভাবে করুণা বিতরণ ও সমান অধিকার প্রদান করিবেন। নচেৎ ধর্ম্ম যদি শ্বেতবর্ণ লোকদিগকে অথবা ব্রাহ্মণজাতিকে আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ জাতি অথবা শূদ্রদিগকে দূরে সরাইয়া রাখেন, ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকেন, ম্লেচ্ছ কাফেরের ভেদ উপস্থিত করেন, তবে আর সে ধর্ম্মকে উন্নত বলিয়া মনে করিতে পারি না। এইজন্য বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের মধ্যে আর জাতিভেদ রাখিতে চাহেন না। এ যুগের মহাত্মা রামমোহন রায়, মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জাতিভেদ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্র "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১৮৯১ সালের ১৮ই নবেম্বর নিউইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন—

---

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" গ্রন্থ দেখুন।

"আমার মনে হয় ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। * * প্রাচীন বা অধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।"

রাজা রামমোহন রায় তৎপ্রণীত "ব্রাহ্মণ সেবধি" গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।"

এই-সকল মহামনা মনস্বী ও মানবহিতৈষী ব্যক্তিদিগের উক্তি পাঠ করিয়া আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ধার্ম্মিকদিগের অন্তরে ভেদবুদ্ধির চেয়ে প্রীতি ও মিলনের ভাবই প্রবল হইয়া উঠিবে। মানুষ যেখানে কূটরাজনীতি, বিষয় বাণিজ্য ও আপন আপন স্বার্থ লইয়া কলহ ও মারামারি করিতেছে, সেখানে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে ত করুক, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকিতে চায় ত থাকুক; কিন্তু সমস্ত মানুষ যে ধর্ম্মের ঘরে আসিয়া মুক্ত হইবে, স্বাধীনতা লাভ করিবে, শান্তি পাইবে, হৃদয় জুড়াইবে,—সেখানে আবার কুটিল ভেদবুদ্ধি কেন? সেখানে ঘৃণাবিদ্বেষ অবজ্ঞা ও অশান্তি কেন? ধর্ম্মের মধ্যে ঘোর বৈষম্য দেখিয়া প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তিরা ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহারা ধর্ম্মের এক উদার বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে সকল সম্প্রদায়কে মিলিত করিতে চাহিতেছেন। এই ত কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে পড়িতেছিলাম, মনস্বী আবদুল বাহা একখানি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদককে লিখিয়াছেন—

"আমেরিকার বড় বড় সহরে আমি বক্তৃতা দিয়াছি এবং যাহাতে জগতে শান্তি স্থাপন হয়, ঈশ্বরের পুত্র এই সমগ্র মানবজাতি এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং জগতে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তাহার দিকে আমার শ্রোতাদের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। * * *

তাঁহারা আমার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। আমেরিকা এবং লণ্ডনে অনেক মহানুভব দেবতুল্য মহাত্মার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং আনন্দের সঙ্গে আমি এই কথা বলিতেছি যে, তাঁহারাও এই পথের যাত্রী এবং জগতের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের অন্ত নাই। ধন্য তাঁহারা। ধন্য ঈশ্বরের করুণা।"

তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধের শেষ কথা এই—

"সমগ্র মনুষ্যজগৎ একটি মহাপরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, * * জগৎ জুড়িয়া ঐক্যের সুর অচিরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, নূতন ভাবে জগৎ অনুপ্রাণিত হইবে।"

অতএব ভবিষ্যতে ধর্ম্মের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব, উদারতা ও সমদৃষ্টি পরিলক্ষিত হইবে, সে কথা মুক্তকণ্ঠেই বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে ধর্ম্মজীবনই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। পূর্ব্বে ধর্ম্মমত এবং অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতিই লোকের প্রখর দৃষ্টি ছিল। ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মরক্ষকগণ চতুর্দ্দিকে বহু মতের ও বহু অনুষ্ঠানের লৌহপ্রাচীর-বেষ্টিত অচলায়তন নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আপন আপন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। পাছে বা কোন নূতন সত্য ও নূতন ভাব আসিয়া পুরাতনের একটি ক্ষুদ্র মত, একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানকেও বিলুপ্ত করিয়া দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতেন। শুধু তাহাই নহে। ধর্ম্মসমাজের কোন লোক অতি সামান্য একটি মতকেও অতিক্রম করিয়া কোন নূতন সত্য গ্রহণ করিলে এবং তাহা প্রচার করিলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। এই বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে একেবারে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মহাত্মা মার্টিন লুথার পোপেরও পুরাতন ধর্ম্মমতের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া দুই একটি নূতন সত্য প্রচার করিলেন এবং নিকৃষ্ট অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা অধর্ম্ম ভিন্ন যে ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে না, তাহাও যাজকদিগের চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর কি রক্ষা আছে! এই অপরাধের জন্য পোপের অভিসম্পাত এবং স্পেনের সম্রাটের তলোয়ার তাঁহার মস্তকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার পর ঐ সকল সামান্য সামান্য মতের অনৈক্যের জন্য অসামান্য ধার্ম্মিকদিগকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। অসার ধর্ম্মমত ও অসার ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষার জন্য মানুষের এমনই প্রয়াস! এই অল্প দিন হইল, ফরাসীদেশের ধর্ম্মশীলা ও শক্তিশালিনী নারী ম্যাডাম্ গেঁয়োর জীবনচরিত পড়িতেছিলাম। তিনি ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাধ্বী নারী কঠোর সাধনার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু গোঁড়া ধর্ম্মযাজকদিগের দুই একটা কুসংস্কারপূর্ণ অসার ধর্ম্মমত স্বীকার করিতে পারিলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইল। শুধু খ্রীষ্টান্ সমাজের কথাই বলি কেন? অধিকাংশ ধর্ম্মসমাজেই খুঁটিনাটি মতের উপর এবং অনেক অসার অনুষ্ঠানের প্রতি সমাজরক্ষকদিগের প্রখর দৃষ্টি। জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মের জন্য উহা লঙ্ঘন করিলেও কঠোর শাস্তি!

কিন্তু জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অন্যায় গোঁড়ামি কমিয়া আসিতেছে, মানুষ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদার ভাব পোষণ করিতেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, এ যুগের মূলমন্ত্র আত্মার স্বাধীনতা। এ যুগে প্রাচীন কালের কতকগুলি অনিষ্টকর ধর্ম্মমত ও নিষ্ফল অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়া মানুষের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ করিলে, বিবেকবুদ্ধি বিলুপ্ত করিতে চাহিলে এবং উন্নতির পথে বাধা দিলে, মানুষ পুরাতন ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি একেবারে যে দৃষ্টি রাখা হইবে না, ইহা নির্ব্বোধের কথা। পুরাতন ও নূতন বহু মত ও বহু অসার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করা হইবে না বটে; কিন্তু ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস, সমস্ত মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব, নৈতিক নিয়ম পালন এবং নামকরণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান রক্ষা করিতে হইবে। সেগুলি সকলেরই মান্য করিয়া চলা আবশ্যক। কারণ আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক কয়েকটি গুরুতর নিয়মে মানুষকে বাধ্য না করিলে সমাজ গঠিত হয় না। মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও পাপাচার নিবৃত্ত হয় না। সমাজনিয়ম মানুষের আত্মার স্বাধীনতা ও নির্ম্মল বিবেকবুদ্ধির উপর হস্তার্পণ করিবে না বটে; কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপকার্য্য নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নচেৎ সমাজের ঘোর অকল্যাণ হইবে। অতএব উদার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সমাজিক ও নৈতিক মূল সত্যগুলিকে ধর্ম্মমত রূপে পরিগণিত করিয়া, উহাতে মানুষকে বাধ্য করা হইবে; তাহা ছাড়া আর সকল মতেই মানুষের স্বাধীনতা থাকিবে। 'মানুষ কি খাইবে, কোন্ কাজ করিবে, কাহার কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া লইবে, কোন্ দেশে যাইবে, কোন্ দেশে যাইবে না, কাহাকে ভক্তি করিবে, কাহাকে ঘৃণা করিবে—এ-সমস্ত বিষয়ে সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিগণ সকলকে উপদেশ দিতে পারেন; কিন্তু কোন ধর্ম্মমত খাড়া করিয়া বলপূর্ব্বক মানুষকে তৎসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেই উল্টা উৎপত্তি হইবে—মানুষ সমাজের অন্যায় নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে গিয়া অত্যাবশ্যক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মের বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে।

ঐ-সকল কারণে এবং কালের গতি ও মানুষের মতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, ভবিষ্যতে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অসংখ্য মতের ফাঁদে আটকাইয়া ধর্ম্মের মধ্যে রাখা যাইবে না। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়াও ধর্ম্মের বিচার করা হইবে না। ভবিষ্যতের ধর্ম্ম মানুষকে বলিবেন, তোমার বহু ধর্ম্মমত ও বহু অনুষ্ঠানের বিষয় জানিতে চাহি না; তুমি প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের দ্বারা জীবনকে কতটা উন্নত করিতে পারিয়াছ, তাহাই জানিতে চাহি; তুমি গৃহে ও কর্ম্মক্ষেত্রে, ব্যবহারে ও কার্য্যে, প্রতিদিনের দৈনিক জীবনে যথার্থ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিতে পার কি না, তাহাই জানা আবশ্যক; তদ্দ্বারাই তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় কথা বুঝিয়া লইতে পারিব।

ভবিষ্যতে ভক্তি, নীতি ও পরসেবাই ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে অধিক কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মজীবনের ঐ তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্তরের পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, সরল ব্যবহার প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার পরই ধর্ম্মলাভার্থী সাধকের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভক্তির পরে হৃদয়ে মানবপ্রীতি ও পরসেবার ভাব জাগ্রত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক শুধুই নীতি এবং পরসেবাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু প্রকৃত সাধকেরা তাঁহাদের মতের সঙ্গে একমত হইতে পারেন না। একজন নাস্তিকের জীবনও নৈতিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠে এবং তিনি পরসেবায়ও প্রবৃত্ত হন ; অথচ ঐ নাস্তিকের জীবনকে যথার্থ ধর্ম্মজীবন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি না।

ভাবিয়া দেখিলে ভক্তিই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ ভাব। মানুষ যখন অন্তরের স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণায় আকুল হইয়া গভীর উপাসনায় মগ্ন হয় ও ঈশ্বরকে অসীম সুন্দর রূপে উপলব্ধি করে, তখনই হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; এবং মানুষ ঈশ্বরকে জীবনের স্বামীরূপে বরণ করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মসমর্পণ করে। এই রকম অবস্থাকেই প্রকৃত ভক্তির অবস্থা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই হৃদয় পরিতৃপ্ত এবং মানবজন্ম সার্থক হইয়া যায়। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ উক্তরূপ ভক্তির অধিকারী হন, তাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল ও প্রাণ মানবপ্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অনেকের এ রকমও ধারণা আছে যে, ভক্তির সঙ্গে পরসেবার কোন সম্পর্ক নাই। বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক, তাঁহার কোমল মন নরনারীর দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না ; তাঁহার অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠে, তাঁহার মর্ম্মস্থান প্রেমে পূর্ণ হইয়া যায় ; তিনি আপনার সুখস্বার্থ ভুলিয়া গিয়া নরনারীর দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন।

বস্তুতঃ ভক্তি, নীতি ও পরসেবাই ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ উক্তরূপ ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। অতএব ভবিষ্যতে ভক্তি, নীতি ও সেবাসমন্বিত ধর্ম্মজীবনই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মিয়াকো ওদোরি

মাঘ দারুণ শীতের অবসানে শ্যামল উত্তরীয় উড়াইয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হিমক্লিষ্ট অসাড় ধরণী তাহার স্পর্শনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল—রিক্ত শাখায় হরিৎ পত্র বিকশিত করিয়া পুষ্প মুঞ্জরিত করিয়া নরনারীর প্রাণে আনন্দের লহর তুলিয়া বসন্ত গাহিতেছিল—

"বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে!"

সে গান শুনিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এপ্রেল মাসের প্রথম সপ্তাহ। এই সময়েই জাপান দেশে চেরি ফুলের মেলা। কেবল ফুল, কেবল ফুল, কেবল ফুল! কিওতো আসিয়াছিলাম। জাপানের প্রাচীন রাজধানী—বহু স্মৃতি-বিজড়িত—রূপসী রমণীর জন্য প্রসিদ্ধ এই কিওতো শহর। আধুনিক সভ্যতার বন্যার মধ্যেও কিওতো আপনার প্রাচীনত্ব বজায় রাখিয়াছে। লোকজন রাস্তায় চলিতেছে—তাহাদের মধ্যে ব্যস্ততা নাই, চাঞ্চল্য নাই—তাহারা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই চলিয়াছে—কিন্তু তাও যেন প্রাচীনের ভিড়ে পড়িয়া আধুনিকত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ধীর মন্থর গতিতে চলে—একবার দাঁড়াইলে আর সহজে চলিতে আরম্ভ করে না—এমনি ভাব। বিদ্যুৎ তাহার অদ্ভুত চাঞ্চল্য যেন এখানকার অখণ্ড অবসরের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে! অপ্রশস্ত ধূলিধূসর পথ, বিশৃঙ্খল বিপণি-শ্রেণী, প্রাচীন দেবালয়, নদী পাহাড় প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া বেশ একখানি চিত্রের ন্যায় এই শহর।

শহরের পূর্ব্বভাগে কামো নদী। তাহারই তীরে একটি থিয়েটার। প্রতি বৎসর এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে এই থিয়েটারে মিয়াকো-ওদোরি নামক নৃত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পঞ্চাশ বা তদূর্দ্ধসংখ্যক নর্ত্তকী, যাহারা এই নৃত্য প্রদর্শন করে, তাহারা সকলেই এই পল্লীতেই বাস করে। দেহের সৌন্দর্য্যে তাহারা জাপানের সকল নর্ত্তকীর সেরা—তাহাদের অন্তরও যে সৌন্দর্য্যরসে অবগাহন করিয়া আছে, তাহাদের প্রদর্শিত নৃত্যেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সন্ধ্যার সময় আমরা থিয়েটারে গিয়া পৌঁছিলাম। টিকিট কিনিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। সেখানে আরো অনেক লোক—নরনারী, তুলাভরা আসনের উপর

জাপানী প্রথায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সম্মুখে এক-একটি আগুনের বাক্স রাখিয়া হাত তাতাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বের ঘরে আমাদের ডাক পড়িল। বিস্তীর্ণ কক্ষে মুখোমুখি করিয়া দুইসারি আসন পাতা। প্রত্যেকে এক-একখানি আসনে বসিলাম। কক্ষের একটি সুপ্রকাশ্য স্থানে চানোয়ু নামক বিশেষ জাপানী প্রথায় চা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম-সকল রক্ষিত। কিছুক্ষণ পরে এক তরুণী নর্ত্তকী আবির্ভূত হইলেন এবং বিবিধ প্রকারে হস্ত সঞ্চালন করিয়া চা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। সকলে দুই হাতে মুখের কাছে

জাপানী চা-উৎসবে চা প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম।

পেয়ালা তুলিয়া ধরিয়া তিন চুমুকে পানীয় নিঃশেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিলেন। বলিয়া রাখি, চা দিয়া এরূপে আপ্যায়িত করা হয় কেবল প্রথম শ্রেণীর দর্শকগণকে।

কোন্ নিগূঢ় কারণে সে রাত্রের তিক্ত জাপানী চা বিস্বাদ লাগিল না তাহা ঠিক বুঝি নাই!

এইবার সকলে নৃত্যের আসরে গিয়া বসিলাম। রঙ্গমঞ্চের তিন দিক শ্বেতবর্ণ সাটিনে আবরিত। রঙ্গমঞ্চের মধ্যভাগে একটি দেবদারু বৃক্ষ, দক্ষিণে একগাছি বাঁশ ও বামে একটি "পাম" গাছ। খিলানটি স্বর্ণ, রক্ত ও ঈষৎ বাদামি বর্ণের রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত এ ভিতরকার ছাদ হইতে গোলাপী, বাদামি ও শ্বেত বর্ণ ক্ষুদ্র পতাকা ও কৃত্রিম পুষ্প বিলম্বিত।

সাধারণত দিনে পাঁচবার নৃত্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এক দল নর্ত্তকী দিনে একবারের অধিক নৃত্য করে না। প্রত্যেক বারে নূতন নূতন দল আসে। প্রত্যেক দল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। সামিসেন বাজাইয়া দশজন নর্ত্তকী একত্রে গান করে—ইহারা হইল থিকাতা বা গায়িকার দল। তার পর দশজন ঐক্যতান বাদিকার দল—ইহারা বাঁশী, ক্ষুদ্রাকার ঢাক ও ডমরু বাজায়। বাকি বত্রিশ জন নৃত্য করে। রঙ্গমঞ্চের উপর সর্ব্বসুদ্ধ বায়ান্ন জন স্ত্রীলোক আবির্ভূতা হয়।

রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণে গায়িকার দল বসিয়া গান আরম্ভ করিল, বামে বাদিকার দল ঐক্যতান বাজাইতে লাগিল, মধ্য দিয়া নর্ত্তকীর দল দর্শকের চোখে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের ঝিলিক্ হানিয়া একের পশ্চাতে অন্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। মনে হইল যেন এক বিচিত্রবর্ণ সরীসৃপ আসিতেছে! অথবা যেন একটা বর্ণস্রোত রঙ্গমঞ্চের উপর বহিয়া আসিতেছে!

প্রায় একঘণ্টা সময় কেমন করিয়া কোথা দিয়া গেল বুঝিতে পারি নাই। সুখ দুঃখ প্রেম; বীরের বীরত্ব দেশভক্তের দেশভক্তি ও আত্মবলিদান;—মানবমনের বিবিধ বিচিত্র ভাবলীলাকে নৃত্যে এমন করিয়া রূপদান করা যাইতে পারে এ অভিজ্ঞতা সেদিন প্রথম লাভ করিয়াছিলাম। আর বুঝিয়াছিলাম প্রকৃত নৃত্য উন্মাদের ন্যায় লম্ফঝম্ফ বা জীম্‌ন্যাষ্টিক্ নয়—উহা কবিতা ও চিত্রের ন্যায়ই একটি ললিতকলা—বিশ্বনৃত্যের সৌন্দর্য্য এবং বিশ্বের গতি বা প্রাণের আনন্দ ও বেদনা প্রকাশ করাই উহার উদ্দেশ্য বা চরম সার্থকতা।

জাপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল

জাপানী নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গী।

জাপানী নৃত্যোৎসবে বাদিকার দল।

জাপানী নর্ত্তকীর নৃত্যভঙ্গী.

নৃত্যবর্ণিত কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করি—"নববর্ষের তুষার," "রাজসভাসদের পুষ্পচয়ন," "ফুশিমি দুর্গের মধ্যে পুষ্পবিকাশ," "নদীতীরে জোনাকি-ধরা," "চন্দ্রালোকে মন্দির," "পর্ব্বতে মেপল্ বৃক্ষ," "সম্রাজ্ঞীর দরবারে তুষার-দৃশ্য," "নদীর তীরে চেরি পুষ্প," "নদীতীরে শরতের পাতা ঝরা" ইত্যাদি। বিষয় অনুসারে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করা হয়।

প্রত্যেকটি নৃত্য এক-একটি কবিতার মত। কবিতায় আমরা যেমন কোনো একটি বিশেষ ভাবকে বা ঘটনাকে সরস সুমধুর কথার সাহায্যে ললিত ছন্দে প্রকাশ করি, এ-সব নৃত্যেও তেমনি এক-একটি ভাব বা ঘটনাকে বিচিত্র লীলায়িত ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। আবার এ নৃত্যকে চিত্র বলিলেও ভুল হয় না—এ নৃত্য রঙের খেলাতেও দর্শকের প্রাণ রঙাইয়া তোলে।

প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করিতে করিতে, অভ্যস্ত কর্ম্ম ও অভ্যস্ত আলাপে মগ্ন হইয়া বিশ্বসাগরের তরঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে যে বহুবিচিত্র ভাবরাশি উছলিয়া পড়িতেছে তাহার দিকে আমরা দৃক্‌পাতও করি না। দেখি কেবল লোকজন গাড়ি ঘোড়া—শুনি কেবল একঘেয়ে কর্ম্ম-কোলাহল—ভাবি কেবল অন্নচিন্তা। সহসা একদিন প্রতিভাবান কবির কবিতা পড়িয়া, শিল্পীর চিত্র দেখিয়া, ওস্তাদের সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শুনিয়া বা নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মনে পড়িয়া যায়, বিশ্বে কেবল ইট চুন সুরকি প্রধান হইয়া নাই, বুঝিতে পারি যে, সকল তুচ্ছতা কদর্য্যতার উপর বিশ্বের অসীম অখণ্ড সৌন্দর্য্য ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য বুঝিতে পারাতেও আমাদের পরম লাভ—মহৎ সান্ত্বনা।

তাই বহুদিন পূর্ব্বে একদা বসন্তের জন্মলগ্নে ক্ষণকালের দেখা সেই অপরূপ নৃত্যের কথা কিছুতেই ভুলিবার নহে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিকিৎসা

(গল্প)

"নমস্কার মশায়, আপনি অমন ভাবে বসে আছেন কেন?"

আমি ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া ছিলাম। বাতের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে একজন ভদ্রলোক আমার কামরায় প্রবেশ করিয়া উক্ত কথা বলিলেন।—লোকটী আমার অপরিচিত।

আমি কষ্টে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলাম, "আর মশায়, বাতের জ্বালায় গেলাম। প্রাণ ওষ্ঠাগত!"

ভদ্রলোকটী আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বটে, আপনি বাতে ভুগছেন? কোথা থেকে আসছেন?"

"আজ্ঞে এই সিমলেয় চাকরী করতুম, সম্প্রতি ফার্লো নিয়ে দেশে যাচ্চি! চিকিৎসার ত' ত্রুটি করিনি কিন্তু এ পোড়া রোগ ত কিছুতেই সারতে চায় না! এবার ছুটি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে একবার শেষ চেষ্টা বেয়ে ছেয়ে দেখি!"

"বটে, আপনি চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল পাননি? তা,—না,—থাক!"

"আজ্ঞে?—"

"না না, আমি বলছিলুম বাতের চিকিৎসা করা আমার অভ্যাস আছে, তা আপনি বিশ্বাস ক'রে আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন কি?"

আমি সাগ্রহে বলিলাম,—"বিলক্ষণ, এওকি আবার একটা কথা? তা আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করতে হ'লে কি খরচ পড়বে?"

"হ্যাঁ, তা আপনার ব্যথাটা কোথায় বলুন দেখি!"

"এই—এই—এই হাঁটুতে, গোড়ালিতে আর এই—পিঠের শিরদাঁড়ায়।"

"হুঁ, কোথায় বললেন? পায়ের গোড়ালিতে? ও! মশায় সে কথা আর বলবেন না, আমি কি ওতে কম ভোগানটা ভুগেচি! যাক্ তারপর হাঁটুতে না? এই—এই এইখানটায়? নাকি, এ-এ-এইখানে!"

"উঃ উঃ উঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ—ঐখানটায় !"

"আর কোথায় বল্লেন এই পিঠের শিরদাঁড়ায়, বটে ? আচ্ছা দেখি"—তিনি আমার পিঠ টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"এই—এই—এইখানটায় কি ?"

আমি বলিলাম,—উঁ হুঁ, আর একটু—আর—আর —হ্যাঁ ঐখানটায় !"

"হুঁ, এ ত' অতি সহজে আরাম হ'য়ে যাবে।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অতি সহজে সেরে যাবে ?—অ্যাঁ ? বলেন কি মশায় ? তা কত খরচ পড়বে ?"

"হুঁ, এ অতি—অতি সহজ রোগ !"

"তা খরচটা কি রকম পড়বে ?"

"—আর অতি অল্প সময়েই আরাম হ'য়ে যাবে !"

"কিন্তু—"

"হ্যাঁ, সবাই বাত রোগটাকে সারাতে পারে না—অর্থাৎ সবাই বাতের চিকিৎসাটা ভাল জানে না। আমিই কি আগে জানতুম নাকি ? ওঃ কত জায়গায় গিয়ে যে এ রোগটার চিকিৎসা শিখেছি তা আর বলতে পারিনা !"

"তা আমার চিকিৎসাটা করুন না।"

"তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে তার আগে একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে।"

"তা দেখুন না। আমার তাতে আপত্তি নেই, তবে খরচটা কি রকম পড়বে বললেন না ত ?

"ও ! খরচের কথা বলচেন ? তা এতে আপনার এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।"

আমি সাগ্রহে উৎসাহের সহিত বলিলাম,—"বলেন কি মশায়—এ্যাঁ ? এক পয়সাও খরচ হবে না ? তার মানে ?"

হাস্য করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"তার মানে টানে কিছু নেই, এ আমার সখের চিকিৎসা।"

"তবে আপনি পরীক্ষা করবেন বলছিলেন তা এখুনি করুন না, গাড়ীতে ত' আর কেউ নেই, আপনি আর আমি।"

"বেশ, আমি রাজি আছি, আপনি জুতোটা খুলুন।"

আমি তাহাই করিলাম। তিনি গম্ভীর মুখে বহুক্ষণ ধরিয়া আমার বাত পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আপনি বল্লেন ত' আমি চিকিৎসা আরম্ভ করে দি। কলকেতায় পেঁছবার আগেই আমার কাজ হ'য়ে যাবে।"

"বেশ ত, আরম্ভ করে দিন না।"

তিনি উঠিয়া গাড়ীর জানালা দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"বেশ এইবার আপনি একে একে সব জামাগুলো খুলে ফেলুন।"

আমি তাহাই করিলাম।

তখন শীত কাল। দারুণ শীতে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমার একখানি কাপড় লইয়া অনতিবিলম্বে সেখানি সিক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমার গায়ে সেই সিক্ত বস্ত্রটী উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন।

তারপর আমার স্তূপীকৃত বিছানার বস্তা খুলিয়া বলিলেন,—"এইতে শুয়ে পড়ুন।"

নির্ব্বাকভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।

"আচ্ছা, বেশ, এইবার আপনাকে বিছানা চাপা থাকতে হবে। কিছু ভয় নেই, ঘণ্টা দু'য়েক, তার পর আপনার রোগ সেরে যাবে।"

তিনি আমায় বিছানার সহিত উত্তমরূপে বাঁধিলেন। গাড়ী তখন পূর্ণ বেগে ছুটিয়াছে।

"আচ্ছা, এইবার হাঁ করুন দেখি !"

আমি তাঁহার আদেশ-মত কার্য্য করিলাম। তিনি আমার গেঞ্জিটী তাল পাকাইয়া আমার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন।

"এই থাকুন, আর চেঁচাতে পারবেন না। আচ্ছা আমি এদিকের কাজটা সেরে নিই।"

তিনি আমার জামার পকেট হইতে মনিব্যাগটী বাহির করিলেন।

"এ্যাঁ ! জাতও গেল পেটও ভরল না ! মোটে পঁচিশ টাকা ! আপনি সিমলেয় কাজ করতেন বল্লেন না। আচ্ছা তোরঙ্গটা দেখি।"

জামার পকেট খুঁজিতে খুঁজিতে আমার তোরঙ্গর চাবি বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে বাক্স খুলিয়া

টাকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। অল্লায়াসেই আমার পথের সম্বল ২৫০৲ টাকা বাহির হইয়া পড়িল।

"এই এতক্ষণে তবু কিছু পাওয়া গেল। আচ্ছা রসুন, আপনি বোধ হয় নোটের নম্বরগুলো টুকে রেখেছেন। আচ্ছা দেখছি।"

তাড়াতাড়ি তিনি আমার বুক-পকেট হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন। তাহার কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়া বলিলেন,—"এই যে পেয়েছি! বা! ঘড়ির নম্বরটাও টোকা রয়েছে যে! বেশ, বেশ!

তিনি পাতাখানি ছিঁড়িয়া দেশালাই জ্বালিয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দারুণ শীতে ভিজা কাপড় গায়ে দিয়াও আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল।

লোকটা আমার বাক্স খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া জামার পকেটে চাবিটী রাখিয়া দিল। তাহার পর নোট-গুলি ও সোনার ঘড়ি ঘড়ির চেনটী পকেটে রাখিয়া বলিল, —"দেখুন, আমার চিকিৎসা শেষ হয়েছে। এখন আমি পরের ষ্টেসনেই নেবে যাব। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানার বাণ্ডিলের মধ্যে ঘুমুন;—হাওড়া না পৌঁছলে আর আপনার মুক্তির আশা নেই। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার ইচ্ছা-মতই কাজ করেছি। দেখুন, চিকিৎসা করবার আগেই আপনি বার বার ক'রে কত খরচ পড়বে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন আমার ইচ্ছা ছিল অমনিই আপনার চিকিৎসা করব। কিন্তু এখন আমার মনের ভাব বদলে গেছে। তাই আমার এই অমূল্য চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আমি আপনার ২৭৫ টাকা নিয়ে চললুম। বুঝুন, ঠিক আপনি যেমনটী চেয়ে-ছিলেন আমি ঠিক তেমনই করেছি। যাক ঐ ষ্টেসন এল, এই বেলা আপনাকে ভাল ক'রে চাপা দিয়ে নি।" —এই বলিয়া লোকটা আমার জামাগুলি লইয়া মাথা ও পায়ের দিকে উত্তমরূপে গুঁজিয়া দিল। আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। এমন সময়ে রেলওয়ে কুলি হাঁকিল—"বাণ্ডিল! বাণ্ডিল!"

গাড়ী থামিতেই আমি দরজা খোলার শব্দ পাইলাম, বুঝিলাম জুয়াচোর ডাক্তার নামিয়া যাইতেছে! আমার শরীর ভয়ে হিম হইয়া আসিল।

ক্রমে বাহিরের অস্তিত্ব আমার নিকট লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে তাহা একেবারে থামিয়া গেল। আমার সংজ্ঞা লোপ পাইল!

* * * * *

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম একজন হিন্দুস্থানী কুলি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সহকর্ম্মী-দিগকে বলিতেছে,—"আরে ভেইয়া, ইয়ে কেঁয়া হ্যায়! কিস্ মাফিক্ ইস্কা হাল হৈ দেখো!

সাগ্রহে আমার চতুর্দ্দিকে কুলির দল আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সারা অঙ্গে দারুণ বেদনা হইয়াছিল। আমি কষ্টে বলিলাম,—"থোড়া পানি ভেইয়া।"

তাহাদিগের মধ্যে একজন লোটা ভরিয়া এক লোটা জল আনিয়া দিল। আমি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। কাতর কণ্ঠে আবার বলিলাম,—"মুমে থোড়া ঢাল দেও, হামারা হাল একদম আচ্ছা নেহিঁ!"

একজন দয়া করিয়া অল্পে অল্পে আমার মুখে জল ঢালিয়া দিল। আমি তৃষিত প্রাণ শীতল করিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম।

কুলির দল আমায় ঘেরিয়া ধরিয়া সকল কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল কিন্তু তখন আমার অবস্থা এরূপ নহে যে তাহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তি করি।

তাহারা আমাকে অবশেষে রেলওয়ে পুলিসের নিকট উপস্থিত করিল। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সে স্থানে প্রায় তিন চারি দিন থাকিবার পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার দারুণ বাতের ব্যথা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু-বিবাহে পাত্রী নির্ব্বাচন

সকলকেই জীবনে অন্ততঃ একবারও কাহারও না কাহারও কনে দেখিতে যাইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা দেখেন কি? মেয়েটীর রঙ্ কাল না ফর্সা, চোখ ছোট না বড়, নাক উঁচা না বসা ইত্যাদি। বড় জোর কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন মেয়ে পড়িতে জানে কি না এবং হয় ত মেয়ের জেঠা শুনাইয়া দিলেন যে, মেয়েটী গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম শিখিয়াছে। কনে পছন্দ হইবার পর টাকার চুক্তিটা ঠিক্ হইয়া গেলেই বিবাহ ধার্য্য হইয়া গেল।

কিন্তু বাস্তবিকই কি অত সহজে পাত্রী নির্ব্বাচন সুসম্পন্ন হইতে পারে? হিন্দুবিবাহে ডাইভোর্স নাই, হিন্দুবিবাহে কোর্টশিপ নাই, কাজেই পাত্রীনির্ব্বাচন করিবার সময় অনেক বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমে দেখিতে হইবে পাত্রীর চরিত্র, তার পর তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, সর্ব্বশেষে তাহার রূপ। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কেমন করিয়া একটী ক্ষুদ্র অপরিচিতা বালিকার চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির নির্ণয় হইবে? নানা উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। মানুষের চরিত্র ও বুদ্ধির নিদর্শন তাহার মুখের আকৃতিতে বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যেকের উচিত মুখ দেখিয়া লোকের স্বভাব নির্ণয় করিতে শিক্ষা করা। কাহারও উজ্জ্বল চক্ষুর মধ্যে বুদ্ধির জ্যোতি দেখা যায়, কাহারও চক্ষুর ভিতর দিয়া স্নেহপ্রবণ হৃদয়টী উঁকি মারে, কাহারও চাহনি ও অধর দেখিলেই চরিত্রহীনতার সন্দেহ হয়, কাহারও উন্নত ভ্রূযুগল, প্রশস্ত ললাট ও অধরোষ্ঠের গঠন দেখিলেই চিন্তাশীলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি ভূয়োদর্শন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে মুখ দেখিয়া লোক ঠিক করিতে পারেন, তাঁহার মত লোককেই কনে দেখিতে পাঠাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আর এক উপায়, আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে পাত্রীর সম্বন্ধে খবর লওয়া। অবশ্য খবরগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, কেননা অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে খবর দিবে না। তবে পাত্রীর সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের মত জানিতে পারিলে একটা সামঞ্জস্য করা যায়। আর এক কথা, অপরিচিতা কন্যা অপেক্ষা পরিচিতা কন্যা নির্ব্বাচন অনেক সহজ। তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীর যে হাস্যমুখী মেয়েটীকে সুশীলা ও বুদ্ধিমতী বলিয়া জান, অপরিচিতা রূপবতী ধনীকন্যা ত্যাগ করিয়াও তাহাকে বিবাহ করিও, তোমার গৃহস্থজীবন সুখের হইবে।

তৃতীয় হইতেছে পাত্রীর পিতা, ভ্রাতা ও মাতুলগণ কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা অবধারণ করা। পাত্রীর কতকগুলি গুণ বংশানুক্রমিক এবং অপর কতকগুলি যে-সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই তাহার পুরুষ আত্মীয়গণের পরিচয় পাইলেই, তাহার নিজের পরিচয় কতকটা ঠিক করা যায়। যে বাড়ীর পুরুষেরা মূর্খ ও কুচরিত্র সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া, যে বাড়ীর পুরুষেরা সচ্চরিত্র ও বিদ্বান্ সেই বাড়ী হইতে কন্যা আনিবে।

এখন কন্যার রূপ সম্বন্ধে কথা। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Health is beauty, স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। বাস্তবিক স্বাস্থ্যই রূপের প্রধান অবলম্বন। নীরোগ শরীর ও প্রফুল্ল মনের জন্য যে অঙ্গের লাবণ্য তাহা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহার অধিক রূপ থাকিলে ভাল, না থাকিলেও কোনও ক্ষতি নাই। আর আগেই যেমন বলিয়াছি যে, মনের সদ্বৃত্তিগুলির নিদর্শন মুখে বিকাশ পাইয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে—কেবল চক্ষুর বিস্তৃতি ও নাসিকার উচ্চতার উপর যে সৌন্দর্য্য নির্ভর করে না, সেই সৌন্দর্য্য বুঝিবার উপযুক্ত শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে রূপজ মোহ ও গুণজ প্রেমের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীর রূপ অপেক্ষা গুণের মূল্য কত অধিক। *

---

* আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিয়া প্রায় এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি বরপণের উৎপীড়নে একটী উচ্চহৃদয়া বালিকার জীবনবিসর্জ্জনের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়া প্রবন্ধটী অবিলম্বে প্রকাশিত করিলাম। এই পাত্রীটীর সহিত যাহারা সম্বন্ধ স্থির করিতেছিল, তাহারা কি নির্ব্বোধ! ভদ্রলোককে কষ্ট দিয়া সামান্য দু'এক হাজার টাকা আদায় করিতেই তাহারা ব্যস্ত হইল, কিন্তু এরূপ তেজস্বিনী বালিকা যে বাস্তবিকই একটী রমণীরত্ন তাহা তাহারা বিস্মৃত হইল। উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্তা হইলে ইনি স্বার্থত্যাগী বীরপুরুষের জননী হইতে পারিতেন।—প্রবন্ধ-লেখক

তার পর পাত্রীর শিক্ষার কথা। শুধু পড়িতে জানিলেই ত আর শিক্ষা হইল না। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছি মিশনরীর বিদ্যালয়ের উপর—সেখানে মেয়েরা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও গৌরবের কথা কিছুই শেখে না, বরং প্রতিদিন "খৃষ্টের রক্তে পরিত্রাণ হয়," "আমি বাইবেল ভালবাসি", প্রভৃতি মুখস্থ করিতে থাকে। আবার অন্য বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পড়াইতে খরচ আছে, কাজেই অনেকে দারিদ্র্যবশতঃ তাহা পারিয়া উঠেন না। অনেকে এমনও মনে করেন যে, মেয়ের বিয়েতে যখন এক কাঁড়ি টাকা লাগিবেই তখন তাহার শিক্ষার জন্য উপরন্তু খরচ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, আজ-কালকার বরেরা সুশিক্ষিতা কন্যাকে অল্প টাকায় বিবাহ করিতে সম্মত হইবে; কাজেই শুধু টাকার দিক দিয়া বিচার করিলেও মেয়ের শিক্ষার খরচটা অপব্যয় নহে।

কিরূপ শিক্ষা বাঙালীর মেয়ের পক্ষে উপযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। তবে মোটামুটি ভাবে এই বলা যাইতে পারে যে, স্কুলে ও বাড়ীতে মেয়েকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে বিবাহের পর সে আদর্শ গৃহিণী হইতে পারে—এক দিকে স্বামী ও অন্যান্য পরিজনের সেবা ও সাহচর্য্য করিতে পারে, অপর দিকে সন্তানগণকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে লালনপালন করিতে ও শিক্ষিত করিতে পারে। তজ্জন্য তাহাকে কোনও প্রবীণা মহিলার নিকট গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে শিখিতে হইবে, অভিভাবকের নিকট বা পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সাহায্যে বর্ত্তমান কালে যুবকগণের চিন্তাপ্রবাহ কোন্ প্রণালীতে বহিতেছে তাহার সন্ধান জানিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও শিশুশিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সহজ সহজ পুস্তক পড়িতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ব্রতপরিপালন দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। এরূপ সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিতে অনেক শিক্ষিত বর উৎসুক হইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় হিন্দুদিগের মধ্যে খুব কম লোকই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন বা তাহার জন্য কোনও ব্যবস্থা করেন। উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও আদর্শ-স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির সযত্ন হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

পাত্রী পরীক্ষার পর পাত্রীর বংশপরিচয় লওয়া আবশ্যক। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থাটী মোটামুটী গ্রহণ করা যায়। যাহাদের বংশে উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বংশানুক্রমিক ব্যাধি আছে, যে বংশ নির্ব্বোধ ও অধার্ম্মিক, এরূপ বংশ ধনী হইলেও তাহাকে বিবাহ বিষয়ে বর্জ্জন করিতে হইবে। যে বংশে অনেক পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, বিবাহে সেই বংশই প্রশস্ত, সেই বংশই কুলীন;—কেবল কুলগ্রন্থ দেখিয়া কৌলীন্য বিচার করা বড়ই ভ্রান্তি। পূর্ব্বে কুললক্ষণ নয়টী ছিল, তাহার পর সেই আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি কিছু না দেখিয়া কেবলমাত্র বৈবাহিক আদান প্রদান দেখিয়াই যে কুল নির্ণীত হইতেছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর মেলবন্ধনের নাগপাশ হইতে ব্রাহ্মণসমাজ যে কতদিনে মুক্তিলাভ করিবেন তাহা ভগবানই জানেন।

শেষ কথা—কন্যার যৌতুক। যৌতুকগ্রহণ মাত্রেই অন্যায় এমন বলা যায় না—যখন হিন্দু-আইনে পুত্র-বর্ত্তমানে কন্যা পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না, তখন বিবাহের সময় কন্যাকে কিছু অর্থ দেওয়া পিতার উচিত বলিয়াই মনে হয়। তবে যাহারা দরিদ্র ব্যক্তিকে নির্য্যাতন করিয়া বরের পণ আদায় করে তাহারা যে নীচাশয় লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বরপণের অত্যাচার রহিত করিবার জন্য কেবল এই প্রথার নিন্দাবাদ করিলে কোনও বিশেষ ফল হইবে না—একটু নিন্দার ভয়ে লোকে টাকার লোভ ছাড়িবে কেন? ইহার একমাত্র প্রতিকার পাত্রীনির্ব্বাচনের প্রকৃত নিয়মগুলি সাধারণের মধ্যে সুপরিচিত করা। মনে করুন একজন ভাল পাত্রের বিবাহের জন্য দশটী পাত্রীর কথা আসিল। এখন তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকে নির্ব্বাচন করিবে? কয়জন পাত্রের পিতা বুঝেন যে, পাত্রীর শারীরিক মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী দেখা কর্ত্তব্য, পাত্রীর শিক্ষা ও তাহার বংশপরিচয় জানা আবশ্যক? ভাবী সন্তানের গুণাবলী কিরূপ হইবে

তাহার উপর বংশক্রমের কতদূর প্রভাব রহিয়াছে তাহা কয়জন জানেন? কয়জনের, ধারণা আছে যে, উত্তর কালে তাঁহার বংশে প্রতিভাবান্ সন্তান জন্মিবে কিম্বা অপদার্থ সন্তান জন্মিবে তাহা এই কন্যার ও কন্যার বংশের গুণ-পিকলের উপর আংশিক ভাবে নির্ভর করিতেছে? এ-সকল কথা তাঁহারা যদি বুঝিতেন তাহা হইলে কিছু টাকার খাতিরে নির্ব্বোধ বা কুচরিত্র ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ না করিয়া দরিদ্র হইলেও বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ভদ্রলোকের কন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এইজন্য আধুনিক Eugenics বা বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।*

পরিশেষে পাত্রীনির্ব্বাচনের আর একটী অসুবিধার উল্লেখ করিব। বর্ত্তমান কালে বাংলার কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি জাতিগুলি এত উপজাতিতে (subcastes) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, এক-একটী উপজাতি সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। একটী উপজাতিকে তাহার নিজের মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়, এজন্য অনেক স্থলে উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। আবার কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর রক্তসম্বন্ধ নিকট হইয়া পড়ে, মনুর নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। এই-সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য সকল হিন্দুরই কর্ত্তব্য এই উপজাতিগুলিকে বিবাহ দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট করা। ইহা দ্বারা সমাজের যে মহা উপকার হইবে বংশোৎকর্ষবিজ্ঞান তাহা প্রতিপাদিত করিতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই সংস্কারকার্য্যে অগ্রণী হইয়া উন্নতিকামী হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বারান্তরে পাত্রনির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞানের মোটা কথাগুলি ১৩১৮ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে "সমাজতত্ত্বের এক অধ্যায়" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা মাধব দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে কন্যাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও তাহার শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে পড়িবার জন্য পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।]

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তৎপরে পিতার দুরবস্থার সময়ে সে তাঁহার সহকারী রূপে তাঁহার দোকানে বসিত। ক্ষেত্রনাথ নগেন্দ্রকে আরও উচ্চশিক্ষা দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নে সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথাপি অবসর মত গৃহে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে তিনি শিথিল-যত্ন হয়েন নাই। নগেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে বেশ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত এবং সহজ ধরণের ইংরেজী চিঠিপত্রও লিখিতে পারিত। নগেন্দ্র কার্য্যদক্ষ ও পরিশ্রমী এবং তাঁহার স্বভাবও পবিত্র ছিল। সকলের সঙ্গে সে মিশিতে মিশিতে পারিত এবং সেই জন্য অল্পদিনের মধ্যে বল্লভপুরে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথের অবস্থা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে, তিনি নগেন্দ্রকে আরও কিছুদিন স্কুলে ও কলেজে পড়াইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই কঠোর জীবন-সংগ্রামে নগেন্দ্রই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। নগেন্দ্র না থাকিলে, তিনি কৃষিকার্য্যাদি কিছুই একাকী চালাইতে পারেন না। এই-সমস্ত কথা ভাবিয়া তিনি নগেন্দ্রকে সহকারী রূপে আপনার কাছেই রাখা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে তাহার মনের এবং চিত্তের কর্ষণ হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অমনোযোগী ছিলেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নগেন্দ্র পিতার কাছে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত। ক্ষেত্রবাবু একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন; তাহাও সে পড়িত। এক্ষণে অমরনাথ বল্লভপুরে আসায়, সে তাহার সহিত একত্র পুস্তক পাঠ করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইল। উভয়েই অবসর মত বিদ্যার চর্চ্চা করিত।

এই প্রথম বৎসরে, ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র উভয়কেই কৃষিকৌশল অবগত হইবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অতঃপর আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে না। কেবলমাত্র সকল বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেই, অল্প পরিশ্রমে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে; কেবল মধ্যে মধ্যে নগেন্দ্রের সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ স্থলে, অন্য কোনও কার্য্য করিবার জন্য নগেন্দ্রের অবসর থাকিবার সম্ভাবনা।

নগেন্দ্র বল্লভপুরে কোনও একটী কারবার খুলিবার জন্য জননীকে অনেক বার বলিয়াছে। কিন্তু সেদিন ব্যতীত আর কোনও দিন মনোরমা স্বামীর নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সুযোগ না পাইলেও, ক্ষেত্রনাথ যে তদ্বিষয়ে কোনও চিন্তা করেন নাই, তাহা নহে। ক্ষেত্রনাথ মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু কি কারবার করিলে সুবিধা হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ভূমিতে উৎপন্ন অতিরিক্ত শস্যসমূহ বিক্রয় করার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া, তিনি মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন। এ দেশের প্রজাবর্গ তাহাদের অতিরিক্ত শস্যাদি নিজ নিজ গোযানে ও শকটে বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যায় এবং সেখানকার আড়তে তাহা বাজার-দরে বিক্রয় করে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের পক্ষে তদ্রূপ করা তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই কারণে তিনি স্থির করিলেন যে তিনি অতিরিক্ত শস্যগুলি একটী গুদামে রক্ষা করিয়া পরে উচ্চদরে তৎসমুদায় বিক্রয় করিবেন। তদনুসারে তিনি সাহেবদের পরিত্যক্ত গুদাম-ঘর ও বাবুর্চ্চিখানা প্রভৃতির সংস্কার করাইলেন। আস্তাবলটি পাঠশালার জন্য ও খানসামাদের থাকিবার ঘরটি ডাকঘরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই প্রদেশের ব্যবসায়ীরা এবং কলিকাতার মহাজনেরাও সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকগণের নিকট শস্য ক্রয় করেন। ক্ষেত্রনাথের গুদামে শস্য সঞ্চিত আছে, ইহা জানিলে তাঁহারাও তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবেন। এই উপায়ে শস্য-বিক্রয় হইতে পারে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনও কারবারের সুবিধা হইবে না।

কারবার চালাইতে হইলে, বল্লভপুরে একটী আড়ত খুলিতে হয়। কিন্তু বল্লভপুরে কোনও গঞ্জ বা বাজার না বসাইলে, আড়ত কিরূপে চলিবে? লোকে বিক্রয়ের জন্য কেন বল্লভপুরে শস্য বহন করিয়া আনিবে? বল্লভপুরে ক্রেতা না থাকিলে আড়ত স্থাপন করা ব্যর্থ হইবে। বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে ইছাকোণা গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসে। অনেকে সেই হাটে শস্য বিক্রয় করিতে যায়। বল্লভপুরে যদি একটী হাট স্থাপন করা যায়, এবং সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তাহা বসে, তাহা হইলে এখানেও বহু লোকের সমাগম ও বহু শস্যের আমদানী হইবে। তখন আড়ত খুলিলে, তাহা চলিতে পারে, এবং এই প্রদেশের লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিলে, একটী দোকানও চলিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠে একটী হাট বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে এক দিন গ্রামের প্রজাবর্গকে আহ্বান করিলেন।

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমাদের গ্রামের অনেক অভাব আছে। গ্রামে একটী পাঠশালা ছিল

না; তা আমি স্থাপন কর্‌লাম। ডাকঘর নাই; যা'তে শীঘ্র একটী ডাকঘর হয়, তা'রও চেষ্টা কর্‌ছি।' তারপর আমাদের গ্রামে কোনও হাট নাই। জিনিষ-পত্র ও মাল বিক্রয় কর্‌তে হ'লে, তোমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে, কিম্বা ইছাকোণার হাটে তা ব'য়ে নিয়ে যাও। বর্ষাকালে কালী নদীতে বান হ'লে, তোমরা ষ্টেশনেও যেতে পার না; তখন ইছাকোণার হাটে যেতে হয়। কিন্তু ইছাকোণা যাবার পথও বড় দুর্গম। এই-সমস্ত কারণে আমার মনে হয়, এই বল্লভপুরে যদি একটী হাট স্থাপন করা যায়, তা হ'লে সকলেরই বিলক্ষণ সুবিধা হ'তে পারে। এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় কি, তা আমি জান্‌তে চাই।"

প্রজাবর্গ হাট স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা বলিল, বল্লভপুরে একটী হাট হইলে, শুধু বল্লভপুর গ্রামের কেন, নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোকের বিশেষ সুবিধা হইবে কিন্তু হাট কোন্ স্থানে বসিবে?

প্রশ্নের উত্তরে, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে কাছারী-বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ মাঠটি দেখাইলেন। সকলেই আহ্লাদ-সহকারে সেই স্থানটি অনুমোদন করিল, কিন্তু বলিল যে হাটের জন্য অনেক ছোট ছোট চালাঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। কেননা, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় এবং বর্ষা-কালে বৃষ্টির সময় লোকের আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "পাহাড়ের ও জঙ্গলের কাঠ, বাঁশ, উলুখড় দিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমরা সকলে যদি সেই-সমস্ত কেটে এনে ঘর বাঁধতে সাহায্য কর, তা হ'লে অনায়াসেই চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর প্রস্তুত হ'য়ে যাবে। কিন্তু তোমরা সাহায্য না কর্‌লে, আমি একাকী এত ঘর বাঁধাতে পার্‌ব না।"

মণ্ডলেরা একবাক্যে বলিল যে, কাঠ, বাঁশ ও উলুখড় পাইলে, তাহারা পরিশ্রম করিয়া ঘর বাঁধিয়া দিবে।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আগামী ১৫ই ফাল্গুন তারিখে আমাদের গ্রামে একটী শুভ বিবাহ হবে, তা তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। ভট্টাচার্য্য মশায়ের কন্যা সৌদামিনীর সহিত আমার বন্ধু পুরুলিয়ার ডেপুটী সতীশবাবুর বিবাহ হবে। এই বিবাহটী হ'লে, আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য। এখানে ডেপুটী বাবুর শ্বশুর-বাড়ী হ'লে, এই গ্রামের ক্রমশঃ অনেক উন্নতি হবে। এই বিবাহটি হ'য়ে গেলে, তোমরা হাটের জন্য ঘর প্রস্তুত কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌বে। উপস্থিত, এই বিবাহের সময়, কল্‌কাতা থেকে কয়েক জন ভদ্রলোক আস্‌বেন। কিন্তু আমাদের গ্রামের রাস্তা ঘাট বড় খারাপ। তোমরা সকলে মিলে যদি রাস্তাটি একটু মেরামত কর্‌তে পার, তা হ'লে ভাল হয়।"

লুটন সর্দ্দার বলিল, সরকার বাহাদুর রাস্তা মেরামত করিবার হুকুম দিয়াছেন। পুরুলিয়া হইতে ওভারসিয়ার বাবু আসিয়া রাস্তা মাপিয়া গিয়াছেন, আর রাস্তার ধারে ধারে কাঁকর পাথর ফেলাইতেছেন। গ্রামের অনেক প্রজা আজ দুই তিন দিন হইতে কাঁকর পাথর বহিয়া মজুরী লইতেছে। সেই বাবুটি বলিল যে, ডেপুটী কমিশনার সাহেব রাস্তা মেরামত করিতে হুকুম দিয়াছেন।

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তবে ভালই হয়েছে। তোমাদের আর কষ্ট কর্‌তে হবে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সেদিন সভা ভঙ্গ হইল। ডেপুটী বাবুর সহিত সৌদার বিবাহ হইতেছে, ইহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গৃহে গমন করিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুরের প্রাচীর রান্নাঘর ও পায়খানার চুন বালির কাজ বাকী ছিল। রাজমিস্ত্রীদিগকে এখন সেই কাজে লাগাইলেন। তিনি অপরাহ্নে তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নগেন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবী-পোষাক-পরা একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাইকেলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। ক্ষেত্রনাথ তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। আগন্তুক বলিলেন "মশায়, আপনারই নাম ক্ষেত্রবাবু? আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাক্‌লেও আপনার নাম আমি শুনেছি। আমার নাম হরিগোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায়; আমি পুরুলিয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার। সতীশ বাবু যখন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজের কৃষি বিভাগে পড়তেন তখন আমিও ঐ কলেজে পড়তাম। তখন থেকেই সতীশের সঙ্গে আমার আলাপ। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব সতীশকে সঙ্গে নিয়ে এই বল্লভপুরে এসেছিলেন। বল্লভপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে, এই রাস্তাটি আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার অন্তর্গত নয়; অন্ততঃ এই রাস্তাটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই। কাজেই এর অবস্থা খুব শোচনীয়। সে দিন ডেপুটী কমিশনার সাহেব বল্লভপুর থেকে যেতে যেতে গ্রামের বাহিরে রাস্তার উপর একটী খালের মধ্যে সাইকেল সুদ্ধ প'ড়ে যান। তা'তে তাঁর কিছু চোটও লেগেছিল। আমিও সাহেবের সঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেশনে এসেছিলাম; কিন্তু সে দিন আমি তাঁর সঙ্গে এদিকে না এসে অন্যদিকের রাস্তা দেখতে গিয়েছিলাম। সাহেব তো ডাকবাঙ্গালাতে এসেই আমাকে তলব ক'রে বল্লেন 'বল্লভপুরের রাস্তা ভয়ানক খারাপ; এই রাস্তা মেরামত হয় নাই কেন, তার কৈফিয়ৎ দাও।' আমি বললাম 'ঐ রাস্তাটি এর পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে কখনও মেরামত হয় নাই।' সাহেব কি সে কথা শোনেন? তিনি বললেন 'পূর্ব্বে কখনও মেরামত হয় নাই ব'লে যে আর কখনও মেরামত হ'বে না, তার কোনও কারণ নাই; আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না, এক মাসের মধ্যেই আমি রাস্তা মেরামত দেখতে চাই। আমি মার্চ্চ মাসে আবার বল্লভপুরে যাব, তখন যেন রাস্তা ঠিক্ থাকে।' সতীশ সে দিন আপনার এখানেই ছিল; কাজেই তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই; কেননা, সেই দিন বিকালেই আমি স্থানান্তরে যাই। তারপর পুরুলিয়ায় গিয়ে সতীশের সঙ্গে দেখা হ'লে সতীশকে সব কথা বলুলাম। সতীশ বল্লে 'চমৎকার হয়েছে; সাহেব তোমাকে এক মাসের মধ্যে রাস্তা তৈয়ের করতে হুকুম দিয়েছেন; আর আমি তোমাকে হুকুম করছি, তুমি পনর দিনের মধ্যে রাস্তা তৈয়ের কর।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমার এত তাড়া কেন হে?' সতীশ বল্লে 'এই ফাগুন মাসে বল্লভপুরে আমার বিয়ে। যদি তার আগে রাস্তা তৈয়ের না হয়, তা'হ'লে সাহেবের কাছে তোমাকে নাজেহাল করব।' মশায়, সতীশের কথা আমি আদবে বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু আজ এখানে রাস্তার কাজ তদারক করতে এসে আপনার প্রজাদের মুখে শুনলাম যে, আগামী ১৫ই ফাল্গুন তারিখে এখানে পুরুলিয়ার ডেপুটীবাবুর বিয়ে হ'বে। সতীশের কথাটা তবে সত্য না কি, মশায়? আমি মনে করলাম, একবার আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, আর সংবাদটাও জেনে আসি। ব্যাপার কি, বলুন দেখি?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "সতীশ আপনাকে সত্য কথাই বলেছে।"

হরিগোপালবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "অ্যাঁ? বলেন কি, মশায়? সতীশ বিয়ে করবে? আর শেষকালে এই বল্লভপুরে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, সতীশ এই বল্লভপুরেই বিয়ে করবে।"

"ঘটকালী করলেন কে? আপনি বুঝি?"

"না, আমি করি নাই। সতীশ নিজের ঘটকালী নিজেই করেছে।"

"বটে? যা হোক্, ছোক্‌রার যে শেষকালে সুমতি হয়েছে, এতে আমি বাস্তবিক বড় সুখী হলাম। মশায়, বিয়ে করতে সতীশকে রাজী করবার জন্য এর আগে কত লোকে যে কত সাধ্য সাধনা করেছে, তা আপনাকে বলতে পারি না। শেষকালে ছোক্‌রা নিজেই ফাঁদে পা দিয়েছে, দেখছি। চমৎকার হয়েছে—কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে ব'লে রাখছি। আমার অনুমান হচ্ছে, সতীশ ভায়া এখানে চুপি চুপি বিয়ে করতে আসবে। কিন্তু, আমিও রাস্তার তদারকে ঠিক্ সেইদিনে এখানে হাজির হ'ব; আর তার বিয়েতে কিছু বাদ্য ভাণ্ডেরও ব্যবস্থা করব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "মশায় এখানে আসবেন, সে তো আহ্লাদেরই কথা। কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি বাদ্যভাণ্ডের ব্যবস্থাটী করবেন না। তা হ'লে, সতীশ বিয়ে না ক'রেই পালাবে।"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "কেন, মশায়, কাড়া-নাগরা আর ঢাক-ঢোল না হ'লে কি আর বাদ্যভাণ্ড হয় না? আমি একদল ব্যাগ-পাইপ পাঠিয়ে দেব। যা খরচ হবে, তা আমার। (এই বলিয়া হরিগোপালবাবু নিজ প্রশস্ত বক্ষের উপর জোরে করাঘাত করিলেন)। সতীশ এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করবে, আর বাদ্যভাণ্ড হবে না? আপনি বলেন কি? বাদ্যভাণ্ড আলবাৎ হবে। ব্যাগ্‌পাইপ আমি আন্‌বই আন্‌ব।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "কাড়ানাগরা ও ঢাকঢোল অপেক্ষা ব্যাগ্‌পাইপ অবশ্য সভ্য রকমের বাজনা। কিন্তু সতীশের মত না হ'লে, আমি আপনার ব্যবস্থায় মত দিতে পারি না। শেষকালে সে আমার উপর হাড়ে চটে যাবে, আর একটা গোল বাধাবে। আপনি তো সতীশকে চেনেন?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "তা বিলক্ষণ চিনি। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। সতীশকে ঠাণ্ডা কর্‌বার ভার আমার উপর রইল। ব্যাগ্‌পাইপ আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌ব।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা হ'লে আপনার ব্যবস্থা আমি সতীশকে জানাব কি?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "আরে মশায়, না-না-না। তা হ'লে আপনি সব মাটী করবেন। আপনি কারেও কিছু বল্‌বেন না। দেখুন, এটা বিয়ের সময় একটা মজা করা মাত্র। মজা না হ'লে বিয়ে কি? সতীশ চুপি চুপি আস্‌বে, আর বিয়ে ক'রে যাবে? আর আমরা কিছু মজা কর্‌তে পাব না? তা হ'তেই পারে না।"

হরিগোপালবাবুর তাৎকালিক অবস্থাটি ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং ব্যাগ্‌পাইপ সম্বন্ধে আর কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আপনি কি আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে গ্রামের রাস্তাটি মেরামত কর্‌তে পার্‌বেন?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "নিশ্চয়ই না; অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব; তবে কতকটা রাস্তা মেরামত হ'তে পারে। আপনার বাড়ীর আগে যে একটা মস্ত বড় গর্ত্ত আছে, সেটা আগে মেরামত করিয়ে দিচ্ছি। সতীশ বোধ হয় আপনার এখানেই থাকবে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা নইলে এ গ্রামের মধ্যে আর স্থান কোথায়?"

হরিগোপালবাবু বলিলেন "তবে আপনার বাড়ীই তো বিবাহবাড়ী, মশায়। আমিও তো আপনার এখানেই এসে উঠছি। বে-আদবী কর্‌ছি ব'লে কিছু মনে কর্‌বেন না।"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "এ তো আপনাদেরই বাড়ী। আপনি আজ এখানে অবস্থিতি করুন।"

হরিগোপালবাবু সাইকেল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন "না, ভাই, আজ আর না। সেই দিনেই নিশ্চয় ব্যাগ্‌পাইপ নিয়ে আসব আর এখানে থাক্‌ব। বিয়ে বুঝি ১৫ই ফাল্গুন তারিখে হচ্ছে? ভারি চমৎকার, সে দিনটি রবিবার। বাঃ বাঃ। আপনার কাছে আজ চমৎকার সংবাদ শুন্‌লাম। একবার পুরুলিয়াতে সতীশের সঙ্গে দেখা হ'লে হয়! আজ তবে আসি; এখন আমি তার বাঙ্গলাতে চল্‌লাম।" এই বলিয়া হরিগোপালবাবু সাইকেলে চড়িলেন এবং ক্ষেত্রবাবুর দিকে ঈষৎ মাথা নোওাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের মুখে মনোরমা এই আগন্তুকের বৃত্তান্ত ও প্রস্তাব অবগত হইয়া বলিলেন "বেশ্‌ তো। বিয়ের সময় বাজনা না হ'লে মানাবে কেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি বুঝি সতীশকে এখনও চেন নাই? সে হয়ত পাগ্‌লামী ক'রে একটা গোল বাধাবে, আর হয়ত ব'লে বস্‌বে 'আমি বিয়ে কর্‌ব না'।"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, অনেক লোক তা বলে। বাজনাই হোক্, আর ধরাখানা রসাতলেই যাক্, সতীশবাবু সেদিন সৌদামিনীকে বিয়ে না ক'রে কোথাও যাবে না; তা দেখ্‌তে পাবে।"

সন্ধ্যার সময় ডাক-পিয়ন সতীশচন্দ্রের একখানি পত্র দিয়া গেল। তাহাতে সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, ১০ই ফাল্গুন হইতে তিনি এক মাসের ছুটী লইবেন। ঐ তারিখেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন এবং ১৩ই তারিখে আহারাদির পর তাঁহার পিস্‌তুতো ভ্রাতা, দুই তিন জন জ্ঞাতি এবং পুরোহিত ও নাপিতের সহিত বল্লভপুরাভিমুখে

যাত্রা করিবেন। ষ্টেশনে ভোর রাত্রিতে যেন অন্ততঃ চারিখানা পাল্কীর বন্দোবস্ত থাকে এবং গো-গাড়ীও দুই তিন খানা থাকে। সতীশচন্দ্র সাইকেলেই বল্লভপুরে পঁহুছিবেন। তাঁহারা বল্লভপুরে পঁহুছিয়া গাত্রহরিদ্রার তত্ত্বাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। সুরেন্দ্র ভাল আছে ও মন দিয়া পড়িতেছে। ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে ক্ষেত্রনাথ, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পাল্কীর কথা তাঁহাকে বলায়, তিনি বলিলেন "তার জন্য চিন্তা কি? মাধবদত্তের দুইখানা পাল্কী আছে; আর ময়নাগড়ের জমীদারও আমার যজমান, তাঁকে ব'লে পাঠালে তিনিও দুইখানা পাল্কী পাঠিয়ে দিবেন।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেহারা পাওয়া যাবে তো?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "যথেষ্ট, যথেষ্ট। এদেশে বেহারার অভাব নাই। চারিখানা কেন, দশখানা পাল্কীরও বেহারা পাওয়া যায়।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেশ কথা; আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আপনি তবে পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্ত করুন, আর তাদের বায়না দেবার জন্য এই দশটা টাকা নিয়ে রাখুন। ১৩ই তারিখে বৈকালে এই কাছারী-বাড়ীতে পাল্কীবেহারা উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাদের ষ্টেশনে পাঠাব।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; তারা যথাসময়ে এখানে আসবে।"

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভট্টাচার্য্য মশায়, বিয়ের যোগাড় কি রকম করছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "কি আর করব, বাবা? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—বুঝ্তেই পারছ? কেবল মেয়েটিকে আমি কোনও রকমে দান করব মনে করেছিলাম। কিন্তু বরাহভূমের রাজার আমি সভাপণ্ডিত। পুরুলিয়ার ডেপুটীবাবু আমার জামাতা হবেন, এই কথা শুনে তিনি জামাতার জন্য একজোড়া বেনারসী চেলী, মেয়ের জন্য একটী বেনারসী শাড়ী ও একছড়া সোনার হার দিয়েছেন। পঞ্চকুট কাশীপুরের মহারাজা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি জামাতার জন্য একটী মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরী ও সোনার চেইন্ ঘড়ী, আর বিয়ের খরচপত্রের জন্য নগদ দুইশত টাকা দিয়েছেন। গড়-জয়পুর ও ঝাল্দ্যার রাজা নগদ একশত টাকা ক'রে দুইশত টাকা দিয়েছেন। বাঘমুণ্ডীর রাজাও নগদ একশত টাকা দিয়েছেন। এ ছাড়া ময়নাগড়ের জমীদার ও আমার অন্যান্য যজমানেরা প্রায় দুইশত টাকা দিয়েছেন। পিত্তল কাঁসার দানসামগ্রীও কিছু সংগ্রহ করেছি। ইছাগড়ের রাজা জামাতার জন্য রূপার ডিবে, গ্লাস ও থালা দিয়েছেন এবং মেয়ের জন্য দুইটী জড়োয়া দুল দিয়েছেন। বাবা, এই অঞ্চলে আমি অনেক দিন আছি, আর সকলেই আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুগ্রহ করেন; তাই এই-সমস্ত দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করতে পারলাম। সতীশবাবুর মতন ব্যক্তিকে যে আমি কখনও জামাতা করতে পারব, সে দুরাশা কখনও করি নাই। সকলই হরির ইচ্ছা। তাঁরই উপর সমস্ত ভার। আমি কয়দিন নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি। সবেমাত্র কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেছি। এসে শুন্লাম, আপনি এবৎসর সরস্বতী পূজা করেছিলেন, আর এখানে একটী পাঠশালাও স্থাপন করেছেন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমাদের সৌভাগ্যগুণেই এখানে এসেছেন, বিশেষতঃ আমার আর সৌদামিনীর। আপনার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না। আর সৌদামিনী যে বাল্যকাল থেকে নিত্য শিবপূজা করে, তাও তার সফল হবে। বাবা, এখন আপনি দাঁড়িয়ে থেকে যা'তে শুভকার্য্য সম্পাদন হয়, আর সকলের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, তা করবেন। আমি অক্ষম, কিছুই জানি না, বা করতে পারব না।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় অশ্রুনয়নে ক্ষেত্রনাথের হাত দুইটী ধরিলেন।

ক্ষেত্রনাথ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "আঃ, ভট্টাচার্য্য মশায়, করেন কি? করেন কি? আমি আপনারই আজ্ঞাবহ; আপনি আমায় যা আদেশ করবেন, তাই করব! এখন আপনার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কতগুলি হবে, মনে করেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "এই অঞ্চলে আমাদের কুটুম্ব ও পরিচিত ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশজন হবে। অন্যান্য

ভদ্রলোকও পঞ্চাশ জন হবে ; পাঁচশত লোকের আয়োজন করতে হবে। আমাকে কেবল ময়দা, কিছু ঘৃত আর মিষ্টান্নের যোগাড় করতে হবে। মিষ্টান্ন বাড়ীতেই প্রস্তুত কর্‌ব, তার জন্য পুরুলিয়া থেকে একজন ভাল ময়রা আন্‌তে পাঠিয়েছি। উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর, মৎস্য ও তরকারী আমার যজমানেরাই দেবেন। মাধবদত্ত মশায় এবিষয়ে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করবেন। তাঁর পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য আছে ; আর তাঁর নিজের এবং প্রজাদের ঘরেও যথেষ্ট দুগ্ধ হয়। এইরূপে বাবা, ভিক্ষা ক'রে কোনওরূপে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার পাবার আশা করছি।"

ক্ষেত্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে, তাহার সমাদর এখনও আছে। ব্রাহ্মণই সমাজের গুরু। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সমাজ এখনও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যজমানগণের নিকট চাহিবামাত্র তাঁহারা ইঁহার কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্য প্রচুর যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং দরিদ্র ; কিন্তু ধনবান্ লোকের ন্যায় ইনি কন্যার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "অনেক লোকের সমাগম হবে। বিবাহের সভা কোন্ স্থানে করবেন ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "বাবা, আপনি একবার স্বয়ং গিয়ে এই সকলের ব্যবস্থা ক'রে দিলে ভাল হয়। আমার বৈঠকখানার সম্মুখে যে খোলা মাঠটি প'ড়ে আছে, আমি মনে করেছি, ঐ স্থানের উপরে একটী চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে ও দুইদিক্ কানাত দিয়ে ঘিরে বিবাহের সভা কর্‌ব। নিকটবর্ত্তী জমীদারেরা কেহ চাঁদোয়া কেহ কানাত, কেহ সতরঞ্চ, কেহ ঝাড়লণ্ঠন, কেহ অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত দ্রব্য এখানে এসে পড়বে। লোকজনকে খাওয়াবার ব্যবস্থা এইরূপ করেছি—বাড়ীর মধ্যে উঠানের উপর আর একটী বড় চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে তার তলে ভদ্রলোকদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌ব। আর আমার খামারবাড়ীর উঠানে একটী শালপাতার ছামলা বেঁধে তার তলে ইতর লোকজনকে খাওয়াব। বাবা, আমি তো এইরূপ ব্যবস্থা করেছি ; এখন আপনি একবার নিজে দেখে শুনে যা ভাল হয়, তাই করুন।"

বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী গিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার সকল ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।　　(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

বাল্যবিবাহ ও বর-পণ

ভগবানের সৃষ্টিলীলা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন-সকল অদ্ভুত বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় যাহাতে হৃদয় বিস্ময়রসে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই যে সৃষ্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়ারূপ একটা ব্যাপার নিয়তই সংঘটিত হইতেছে তাহার তথ্য কি কেহ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? কি জড়, কি জীব, কি চেতন—কি জড়জগৎ, কি মনোজগৎ, কি আধ্যাত্মিক জগৎ, সর্ব্বত্রই এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয়। সৃষ্টি একটি কার্য্যপ্রবাহ। সর্ব্বত্রই কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। যখনই কোন একটি বিষয় তাহার যথার্থ সীমা অতিক্রম করে অমনি তাহার বিপরীত দিকে গতি আরম্ভ হয়। এই গতির উদ্দেশ্য ঐ কার্য্যপ্রবাহকে টানিয়া সীমার মধ্যে আনয়ন করা। এই সীমাকেই প্রাচীন গ্রীক ঋষি এরিস্ততল্ শ্রেয়ঃ মধ্যপথ (golden mean) বলিয়াছেন। ভগবান সৃষ্টিকে এমনই করিয়া গড়িয়াছেন, তুমি কিছুতেই তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" এই লোক-সকল যাহাতে ধ্বংসমুখে পতিত না হয়, সে জন্য তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মানুষ কার্য্য করে, তাহার কার্য্যশক্তি রহিয়াছে। কিন্তু সে সর্ব্বশক্তিমানও নয়, সর্ব্বজ্ঞও নয়। সুতরাং গড়িতে যাইয়া তাহার পক্ষে ভাঙ্গিয়া ফেলা আশ্চর্য্য নয়। তাই ধ্বংসের মধ্যে ভগবান্ এমন একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে, ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে হইতে তুমি দেখিতে পাইবে, একটা সময়ে মুখ পরিবর্ত্তন না করিয়াই ঠিক গঠনের নিকটে আসিয়াছ,

যেন গঠন করিতে করিতেই আসিয়াছিলে। ধ্বংস করিতে করিতেই গঠন করিয়া ফেলিতেছ। সৃজনই কর আর বিনাশই কর, একই দিকে যেন অগ্রসর হইতেছ। যতই ধ্বংসপথে অগ্রসর হইবে, ততই ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ার নিকটবর্ত্তী হইবে, এবং ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া ও গড়ন একই কথা। কোন বৃত্তের পরিধির মধ্যগত কোন বিন্দু হইতে পরিধি ধরিয়া যতই দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই যেমন অন্য রাস্তায় ঐ বিন্দুরই নিকটবর্ত্তী হওয়া হয়, প্রতিক্রিয়া কার্য্যটিও ঠিক সেইরূপ। যে বিন্দু হইতে আপাততঃ দূরে চলিয়া যাওয়া হইতেছে সেই বিন্দুতে আসিয়া উপনীত! ইহা নানা আকারে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হইতেছে। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, এক প্রকার জৈব বিষে ডিপথিরিয়া রোগ জন্মে। কিন্তু ঐ বিষ কিছুদিন শরীরে কার্য্য করিলে ঐ বিষ বিনাশের জন্য শরীরে আর এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিপথিরিয়া বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই প্রতিক্রিয়া। সমাজে এইরূপ ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে। এই যে পণ-প্রথা, উহা কি? ইহার নিদান কোথায়? ইহা আর কিছুই নহে, বাল্যবিবাহ-বিষের প্রতিক্রিয়া মাত্র। মানুষ, তুমি মনে করিয়াছিলে ভগবানের সৃষ্টি বিনাশ করিবে? কি সাধ্য! তিনি যে লোকরক্ষার জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া সৃষ্টির মধ্যে বাস করিতেছেন। মনে করিয়াছিলে সকল যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ রাখিয়া দিবে, কিন্তু দেখ—বাহির হইতে আসে নাই—বিষের ঔষধ বিষ ভিতরেই প্রস্তুত হইয়াছে। যখন বাল্য-বিবাহের নিগড় গলায় পড়িল, কন্যার বিবাহের ঊর্দ্ধ বয়স নির্ণীত হইল, তখন পুত্রের পিতা কন্যার পিতার গলা টিপিয়া ধরিলেন, পণ-প্রথার সৃষ্টি হইল। কন্যার পিতা সবুর করিতে পারেন না, তাঁহার জাতিকুল মান যায়। কিন্তু পুত্রের পিতার সে দায় নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের এই সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা যাঁহারা আশা করেন, তাঁহাদিগকে মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। যাঁহারা জানেন "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী", তাঁহারা ইহাও জানেন, পণ লওয়া অধর্ম্ম এই ধর্ম্মোপদেশে পুত্রের পিতা পণ লওয়া হইতে বিরত হইবেন না। পণ-প্রথা বাল্যবিবাহ-বিষের প্রতিষেধক; বিষ যতক্ষণ বিনষ্ট না হইবে, প্রতিষেধক ততক্ষণ ক্ষেত্র ছাড়িবে না। ইহা ভগবানের নিয়ম, মানুষের জারি এখানে খাটে না। পণ প্রথার বিষ অতি তীব্রবিষ, বাল্যবিবাহরূপ সমাজ-বিধ্বংসী বিষকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কন্যাদায়রূপ ফাঁশ কন্যার পিতার জন্য সমাজ হস্তে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কন্যার বয়স যখন দশ, পিতার গলায় তখনই এই ফাঁশ পড়ে। তারপর এক একটি বছর যায়, আর এই ফাঁশ একটু একটু করিয়া আঁটে। পরে যখন শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত, তখন দয়া করিয়া পুত্রের পিতা আসিয়া সর্ব্বস্বের বিনিময়ে কন্যার পিতাকে উদ্ধার করেন। ইহাই বর্ত্তমান সমাজের বিবাহতত্ত্ব। যিনি জাতি কুল মান দিতেছেন, তিনি তার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ লইতেছেন মাত্র, ইহাতে আপনারা এত বেজার হন কেন? "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়া একজনের দোষের জন্য অন্যকে দোষী করিয়া আপনারা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনারা তো চান বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাক্। সেই জন্যই না হিন্দুসমাজের এক দল (Marriage Reform League) বিবাহসংস্কার সমিতি গড়িয়া বিদেশীকে আপনাদের স্বদেশী সমাজ সংস্কারের জন্য হয়রান করিয়া মারিতেছেন। এই বাল্যবিবাহ বিনাশে কে আপনাদের সর্ব্বপ্রধান সহায়? এই বহুনিন্দিত পণ-প্রথা,—বিষের ঔষধ বিষ। যখন একটী দশ বছরের মেয়ের বিবাহে ঘরবাড়ী বন্ধক হইল, তখন দ্বিতীয়টীর বয়স চৌদ্দ বৎসর না হইয়া যায় না। ঘরবাড়ী খালাস করিয়া আবার বন্ধক দিতে অন্ততঃ পাঁচ বছর লাগিবে। তারপর ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও যখন কন্যাদায় যায় না তখন বাধ্য হইয়াই কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারই নাম বিষের দ্বারা বিষের নাশ। "একটী কণ্টক বড় হস্তেতে লইয়া, পদবিদ্ধ কণ্টকেরে ফেল উপাড়িয়া।" আজকাল যে অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ হইতেছে, তাহা দায়ে পড়িয়া; কোনও উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে বা সংস্কারপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নহে। অধিকাংশ স্থলেই বাধ্য হইয়া। সম্প্রতি

একটী বাইশ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দেখিলাম। এত বয়স কেন? বর মিলে না, তাই। ভদ্রলোক পাঁচ ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন, অষ্টাদশবর্ষীয়া ষষ্ঠ এখনও মজুত। কিন্তু সুবিধা হইলে 'গৌরী' দানও বন্ধ থাকে না। একটী শিক্ষিত পরিবারে নবমবর্ষীয়া রোহিণীর বাগ্‌দান আমার চক্ষের সম্মুখেই হইয়াছিল। এ বিবাহে পণের কঠোরতা নাই—উভয় পক্ষই জমিদার। তাই বলিতেছিলাম পণপ্রথাই বাল্যবিবাহ বিনাশ করিতেছে। কেন না, গরজ (Necessity) বড় শক্ত পেয়াদা। সে কিছুই মানে না। তাই কন্যা বড় হইতেছে! একবার যাহা সহিল, দশবার তাহা সহিবার পথ খুলিয়া গেল। ভয় পাইলেও একটা জিনিষ সম্ভব এই সংস্কার অনেক কুসংস্কার দূর করিয়া দেয়। এক জায়গায় যাহা সহিল, বাধ্য হইয়া দশ জায়গায় তাহা সহিতেছে। সুতরাং পণপ্রথা ধীরে ধীরে বাল্যবিবাহের মূল কাটিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত বা ইংরেজী শিক্ষা অপেক্ষা এই পণ-প্রথা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সহস্রগুণ অধিক কার্য্য করিতেছে। বিষে বিষক্ষয় হইতেছে।

কিন্তু এই ঔষধরূপী বিষেরও প্রতিক্রিয়ার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সময়ে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর না হইলে সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দেশ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা সতীদাহ অপেক্ষাও কঠিনতর সমস্যা। আমাদের কন্যারা আর এখন আট দশ বৎসরে বিবাহিতা হন না। তাঁহারা চৌদ্দ পনের সময়ে আঠার কুড়িও হইতেছেন। সুতরাং পিতা-মাতার দুরবস্থা তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। তাঁহাদের হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় ইহাও অতি সহজ কথা। কাজেই মা-বাপের দুঃখ বিমোচনের জন্য তাঁহারা আত্মদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু এ বিপদ হইতে উদ্ধারের পন্থা কি? কেহ কেহ ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, বাল্যেই বিবাহ দিয়া বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের মেয়েদের হৃদয় ও মন বিকশিত হইবার পথ বন্ধ করিয়া দাও! আমরা দেখিয়াছি পণপ্রথা দূরীভূত না হইলে তাহা হইবে না—আবার পুরাতন পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া চলিবে না। ইহার মূল কারণ যতক্ষণ না নিবারিত হইতেছে ততক্ষণ এই কুমারীদাহ নিবারণ অসম্ভব। যে কারণে সতীদাহের প্রসার হইয়াছিল সে কারণ প্রবলতর রূপে এখানেও বর্ত্তমান। যে ত্যাগের সঙ্গে প্রশংসা আছে এবং যে ত্যাগে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে ত্যাগ সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হইবেই। "সতীর" যতই প্রশংসা থাকুক, তাঁহার কার্য্যের প্রণোদক ছিল পারত্রিক স্বার্থ। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দিয়াছেন ইহা তন্মধ্যে প্রধান। "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" (রঘুনন্দন)! কিন্তু কুমারীর উদ্দেশ্য একেবারে নিষ্কাম। যে-দেশে সতীদাহ প্রচলিত হইয়াছিল—সে আগুন এখনও নিভে নাই—সে-দেশে কুমারীদাহ প্রচলিত হইতে সময় লাগিবে না। সুতরাং এ বিষফলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা নিস্তার নাই। পণপ্রথাকে এই উৎপাতের মূল কারণ মনে করিয়া সকলে তাহারই বিনাশে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ যে-উপায়গুলি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার দ্বারা কি ফল আশা করা যায়।

পণ লইয়া অর্থোপার্জ্জন অধর্ম্ম, সুতরাং ইহা পরিত্যাজ্য। এই এক যুক্তি। ইহাতে পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে না। যেখানে আইনে বাধে, পুলিশে ধরে, অর্থোপার্জ্জনের সেই-সকল পথও মানুষে ছাড়ে নাই। আর এটা তো আইন-সঙ্গত! কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি অনুকম্পা!! এটা একটা ব্যবসা। একজনের ক্ষতি, অপর একজনের লাভ, ইহা ব্যবসায়ের নিয়ম। অমুকের ক্ষতি হইল বলিয়া ব্যবসায়ে কেহ আপনার লাভ ছাড়ে না। সংসারে আত্মত্যাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী বেশী নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের কাছে সেটা আশা করাই অন্যায়। ছেলের অধ্যয়নের ব্যয় দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেকে ধার কর্জ্জ করিয়া ছেলে পড়ায় এই আশ্বাসে যে বিবাহের সময় ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবে। ধর্ম্মে পদেশে বা নরকের ভয়ে সে পথ বন্ধ হইবে না। "আয় চাঁদ" বলিলে যেমন চাঁদ হাতে আসে না, পণ লইয়া বিবাহ বিবাহই নয় বলিলেও পণপ্রথা রহিত হইবে না। তাই সেদিন এক

সভায় পণপ্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব উঠিবামাত্র পুত্রের পিতাগণ, কাপড়ে বান্ধা কইমাছের বন্ধন খুলিয়া দিলে তাহারা যেমন চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে তেমনই করিয়া সরিয়া পড়িলেন, অতি বড় ভারী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারও তাঁহাদিগকে স্বস্থানে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দস্তখৎ করিলেন আহম্মক কন্যার পিতাগণ। আহম্মক, কেননা কন্যার বিবাহে পণ দিতে হইবে না, সে পথ তো খুলিলই না। যে একটী আধটী পুত্র আছে, তাহাদের বিবাহে পণ লইবার পথও বন্ধ হইল—অবশ্য যদি শপথ রক্ষা করেন। মানুষ যতদিন কেবল স্বার্থান্বেষী মানুষই আছে— ততদিন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পণপ্রথা রদ হইবে না।

কেহ কেহ সরকারী আইনের দ্বারা পণপ্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন! কিন্তু আইন সতীদাহ নিবারণ করিয়াছে বলিয়া কুমারীদাহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। পণপ্রথা আইনতঃ রহিত হইলেও কোন সুসার নাই। কন্যার পিতাকে কন্যাদায় হইতে রেহাই না দিলে, সব চেষ্টা নিষ্ফল। কন্যার পিতাকে যখন কন্যা পাত্রস্থ করিতেই হইবে, তখন প্রকাশ্য ভাবে পণদান না করিয়া তিনি পুত্রের পিতার সঙ্গে গোপনে রফা করিতে বাধ্য হইবেন। প্রকাশ্যে হইলে হয় তো অল্পে হইত, গোপনে চক্ষুলজ্জার খাতির চলিয়া গিয়া একটু বেশীই লাগিবে। কন্যার পিতার গলার ফাঁস একটু আঁটিয়া যাইবে মাত্র। ঔষধ রোগ বাড়াইবে, সুতরাং কুমারীর আত্মহত্যার প্রেরণা বাড়িবে। যে রোগের যে ঔষধ, তাহা না হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এমন আইন করা তো চলিবে না যে পুত্রের পিতাকে অমুক বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতেই হইবে? তিনি তাঁহার সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন। কিন্তু কন্যার পিতার অপেক্ষা চলেনা। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কুমারীদাহের কারণ কন্যাদায়, পণপ্রথা উপকারণ মাত্র। স্নেহলতা আত্মহত্যা করিয়াছেন কেন? বাপের ঘরে তাঁহার আর স্থান ছিল না, তাঁহাকে বাহির হইতেই হইবে।

"যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়" এবং সেইখানেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। নতুবা সবই কি পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে না?

কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, কন্যার বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দাও। তাহাতে লাভ কি? এখানেও যে দায়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট রহিল। বরের পিতাও আপনার পুত্রের বয়স বাড়াইয়া দিয়া ছোঁ মারিতে বসিয়া থাকিবেন; তাঁহার দাঁও তো একদিন আসিবেই। কন্যা যখন দায়, তখন বয়স বাড়াইলেই আপদ চুকিল না। বয়স তো বাড়িয়াছেই, বেশীর ভাগ বাইশ বছরের মেয়েকে চৌদ্দ বছর বলিয়া বিবাহবাসরের শান্তি নষ্ট করা হইতেছে। কন্যার বাপের স্কন্ধে অন্যায্য দায়িত্ব চাপান হইয়াছে, তাহা না নামাইলে এ ব্যথা সারিবে না। বয়স বাড়াইলেও কন্যা যে দায়ই থাকিয়া যাইতেছে। সমাজের যত জঞ্জাল ঐ একটী কথার উপর আসিয়া ঝুঁকিয়াছে। এ রোগে অন্য ঔষধ ধরিবে না। এই আন্দোলনে "শকুন্তলার" মাধব্যকে মনে পড়িতেছে—নেত্রমাকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি? চোখে খোঁচা দিয়া জল পড়িতেছে কেন ভাবিয়া আকুল। এই খোঁচা বারণ না হইলে জলপড়া নিবারিত হইতেছে না। সমাজ কন্যার পিতার মস্তকে বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। গুরুভারে বেচারীর পিঠ দমিয়া গিয়াছে, তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ। বোঝা নামাইলেই ঝঞ্ঝাট মিটে। তাহা না করিয়া, দেশশুদ্ধ লোক আহা! আহা! করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে প্রলেপ লাগাইতে লাগিয়া গিয়াছেন। এ দয়ার অভিনয় মন্দ নয়!

আর এক উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে ছাত্রগণের নিকট শপথ গ্রহণ, তাঁহারা পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। প্রশ্নটী অতি গুরুতর। তাঁহারা পিতামাতার বিনা অনুমতিতে, এমন কি তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অনেকে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করিতেছেন। মহা উত্তেজনায় পতিত হইয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অনেক সময়ে লজ্জার খাতিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া পারিতেছেন না। ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি? অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন এবং জীবনের প্রতি হতাশ হইয়া পড়িবেন। কেহ পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সৎকার্য্য করিতে

সমর্থ হইলেও তাহা নিরাপদ নহে। যাঁহাদের জীবনে ইহা পরীক্ষিত সত্য, তাঁহারা ইহার গুরুত্ব সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইবেন তাঁহারা নমস্য। কেননা তাঁহারা প্রহ্লাদের বংশধর। কিন্তু যে সমাজে কোন একটা সংকার্য্য সাধন করিতে হইলে বালকগণকে প্রহ্লাদের মত বাপকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, সে সমাজ যে একটা অস্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না কেন? এক অস্বাভাবিকতা প্রতিষেধ করিতে যাইয়া আর এক অস্বাভাবিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, সুতরাং হয় সমস্ত আন্দোলন নিষ্ফল হইয়া যাইবে, না হয় সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে। পণপ্রথা যে-বিষবৃক্ষের ফল সেই বৃক্ষ বিনাশ করুন, সব স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। যুবকগণের প্রতিজ্ঞা সমস্যাপূরণ করিতে পারিবে না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। পিতামাতার বিনানুমতিতে বিবাহ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সুতরাং বড় জোর তাঁহাদের বিবাহ স্থগিত থাকিবে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বিবাহ করিবার শক্তি বহু দূরের কথা। তাহাতে কুমারীর কুমারীত্ব ঘুচিবে না। কাজেই এই প্রতিজ্ঞায় কুমারীদাহের কোন প্রতিকার পাওয়া গেল না। পুত্র অনেক দিন অবিবাহিত থাকিতে পারে, কন্যা পারে না, রোগের নিদান এইখানে। বালকগণের প্রতিজ্ঞা রোগ বাড়াইবে। কন্যার পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করিতেই হইবে—নতুবা তাঁহার জাতিকুল মান থাকে না—এই জন্যই স্নেহলতা আত্মহত্যা করিয়াছে। সুপাত্র না পান, তাঁহাকে কুপাত্রেই কন্যা সমর্পণ করিতে হইবে। যে-সকল যুবক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহারা সুপাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং কুমারীগণকে এই সকল সুপাত্র হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে অথচ পিতাকেও আসান দেওয়া হইতেছে না। কেননা, বাজারে যখন ভাল জিনিস না থাকে তখন খারাপ জিনিষই ভাল জিনিসের দরে কিনিতে হয়।' ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বরং যুবকগণের নিকট হইতে এই শপথ গ্রহণ করা হউক তাঁহারা যখন কন্যার পিতা হইবেন তখন পণ দিয়া কখনও কন্যার বিবাহ দিবেন না, ইহাতে কন্যা চিরকুমারী হইয়া গৃহে থাকে তাহাও স্বীকার! আমি যদি পাঁচ বৎসরে কন্যার বিবাহ দি, তাহাতে দোষ নাই। কন্যা ষষ্ঠ বৎসরে বিধবা হইয়া যদি আজীবন আমার গৃহে থাকে তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমার অবিবাহিতা কন্যা আমার গৃহে দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিলেই সমাজ আমার গলায় ফাঁশি লাগাইবার জন্য উপস্থিত। এই কুসংস্কাররূপ মহা রাক্ষস আপনাদের স্নেহলতার বুক চিরিয়া রক্ত পান করিয়াছে। নতুবা পিতার আনন্দ, মাতার আশ্রয়, স্বর্ণপ্রতিমা পুড়িয়া ছারখার হইত না। যদি স্নেহলতার মৃত্যুর কারণ দূরীভূত করিবার জন্য দেশ উত্তেজিত হইয়া থাকে, যদি কোন কুপ্রথা নিবারণের স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে এই যে অসুর সমাজের রক্ত পান করিতেছে ইহাকে দূরীভূত করিয়া দিন। পণের দায়ে বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহের বিষদাঁত এখনও ভাঙ্গে নাই। আমি আমার কন্যাকে যতদিন ইচ্ছা পালন করিতে পারিব না, তাহাতে আমার কলঙ্ক, নারীজাতির প্রতি এই যে কঠোর তিরস্কার সমাজ হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, পিতাকে এই দায় হইতে মুক্তি দিন, নারীকে চিরকুমারীত্বের অধিকার দিন —পুরুষের যেমন আছে—তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সকল বিপদ দূরীভূত হইবে। পুরুষের অবিবাহিত থাকিবার অধিকার সত্ত্বেও যেমন একজন পুরুষও অবিবাহিতা থাকে না, তেমনই কোন নারীকেও অবিবাহিত থাকিতে হইবে না। আপনাদের ক্রোধবহ্নি যদি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে তবে এই পাপ পুড়াইয়া ভস্মীভূত করুক। নতুবা হাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া সে বহ্নি বৃথাই প্রজ্বলিত হইয়া বৃথাই নির্ব্বাপিত হইবে। পশ্চাৎ কেবল শক্তি ও সময়ের অপচয়-জনিত একটা আক্ষেপ পড়িয়া থাকিবে।

মহর্ষি মনু কন্যার পিতাদিগকে যে অধিকার দিয়াছিলেন, সমাজ সেই অধিকার হরণ করিয়াই তো যত বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। মনু বলিয়াছেন, কন্যা চিরকুমারী থাকে তাহাও স্বীকার তবুও অপাত্রে কন্যা

দান করিবে না। যে আমার কন্যাকে চায় না, টাকা চায়—যে-হৃদয়ে এতটা মমতা যে পিতামাতার দুঃখে সে আত্মদান করিতে পারে, সে-হৃদয় যে-পশু চায় না, চায় আমার ঘরবাড়ী বেচা-অর্থ, সেই অর্থপিশাচ কি আমার কন্যার সুপাত্র? কন্যার পিতাকে মনু-দত্ত অধিকার প্রদান করুন, আপদ্ বালাই পালাইবে। আমার একটী বন্ধু সেদিন গল্প করিলেন যে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া শ্যালিকার বিবাহের প্রস্তাব হইলে চার হাজার পাঁচ হাজারের রব উঠিল। তখন সে বালিকা বলিয়াছিল, "দাদাবাবু, আপনাদের এই ইত্‌রামি আমরা ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। আমরা যদি বিয়ে না করি, তবে আপনারা খুব জব্দ হন।" এই বালিকা হাসিতে হাসিতে যাহা বলিয়াছে, সকল রোগের ঔষধ ঐখানেই নিহিত রহিয়াছে। পিতাকে শুধু বলিবার অধিকার দিতে হইবে—পণ দিয়া কন্যা বিবাহ দিব না, ইহাতে কন্যা কুমারী থাকে তাহাও স্বীকার—আর দেখা যাইবে ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে পণ-প্রথা দূরীভূত হইয়া স্রোত অন্য দিকে ফিরিয়াছে। আপনারা যদি শুনেন যে এমন দেশ আছে যেখানে যে বছর যত বেশী ফসল হয় শস্যের দরও সে বছর তত বেশী হয়, তবে নিশ্চয়ই বলিবেন উহা হবচন্দ্র রাজার দেশ—কোন অস্বাভাবিক নিয়ম সেখানে আছেই, নতুবা এরূপ হয় না। অস্বাভাবিক নিয়মে আমাদের সমাজও হবচন্দ্র রাজার দেশ হইয়াছে। আদম-সুমারী বলে বঙ্গে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। তাহাতে আবার একা হিন্দুর মধ্যেই বিধবার সংখ্যা ২৬ লক্ষ। সুতরাং দু'এ দু'এ যেমন চার, তেমনই পুরুষের বিবাহই কষ্টকর হওয়া উচিত। তা না হইয়া হইয়াছে আমাদের কন্যাদায়। ইহা ঐ অস্বাভাবিক নিয়মের ফল। তাহা কি ভীষণ অস্বাভাবিক নিয়ম নয় যাহা ক্ষণকালের জন্যও পিতা-মাতার মনে এই ভাব আনয়ন করে যে মেয়েটা যদি বালবিধবা হইয়া ঘরে থাকিত বা শৈশবে মরিয়া যাইত তবুও ছিল ভাল? পণের দায়ে বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহের বিষদাঁত ভাঙ্গে নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিষদাঁত ভাঙ্গিতে হইবে। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ। কুলীন আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং গুরুর গুরু। কুলীনের গৃহে কন্যা চিরকুমারী থাকিলে যদি জাতি না যায়, তবে অন্যের যাইবে কেন? সকলকেই এ বিষয়ে কৌলীন্য প্রদান করা হউক। 'কোন বিশেষ বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে না, বাল্যবিবাহের এই বিষদাঁত ভগ্ন হউক দেখিবেন স্রোত ফিরিয়াছে। যেখানে নারী অপেক্ষা বিবাহার্থী পুরুষ লক্ষ লক্ষ বেশী সেখানে সর্ব্বত্র যাহা স্বাভাবিক নিয়ম তাহাই ফিরিয়া আসিবে। বরের বাপ এই মুহূর্ত্তেই কন্যার বাপের বাড়ীতে হাজির হইবেন, কেননা, আমাদের পুত্রগণের যেমন "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের অনুসরণ করিবার মত মেজাজ দেখিতেছি না, তেমনই পিতাগণও পৌত্রমুখ নিরীক্ষণের লোভ ছাড়িয়াছেন বা পিণ্ডলোপের ভয় অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে মুহূর্ত্তে আমাদের কন্যারা বলিবার অধিকার পাইবেন—

"থাকুক আমার বিয়ে,
কার্পেণ্টার নাইটিঙ্গেল তোরা, লিটল্ সিষ্টার হব মোরা,
থাক্‌ব বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়ে,
দেশের হবে সুখ সুবিধা, বজ্জাতেরা হবে সিধা,
নারীর গৌরব বৃদ্ধি হবে, পশুর গৌরব গিয়ে।"

সেই মুহূর্ত্তে সকল মেয়ের বর জুটিয়া যাইবে; কেননা বিবাহার্থিনী নারীর সংখ্যা কম। একটা কৃত্রিম উপায়ে নারীর গৌরব হৃত হইয়াছে, তাই কন্যার বাপ বরের বাপের পায়ে ধরেন। কন্যার বাপকে মনুনির্দ্দিষ্ট অধিকার দেওয়া হউক, অতি সহজ উপায়ে নারীর অপহৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে—পাত্রপক্ষ হইতেই পাত্রীপক্ষের নিকট বিবাহের আবেদন উপস্থিত হইবে। বিবাহকে সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার সত্যতায় সন্দেহ করি না। কিন্তু ভাবের উত্তেজনায় সমাজসংস্কার হয় না। বুদ্ধিজীবী জীব মানবের পক্ষে জ্ঞানসম্মত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা উত্তেজনা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইব, যেখানে ছিলাম সেখানেই রহিয়াছি, বেশীর ভাগ একটু অধিক অবসন্ন হইয়াছি মাত্র। দেশের বিবেক

যদি বাস্তবিক জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে এই উৎপাত দূরীভূত করিবার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে। বিবেকের অনুসরণ করুন, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। সকল দোষ বরের পিতার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। পণ গ্রহণ যদি অন্যায় হয়, পণ প্রদান অন্যায় হইবে না কেন? উৎকোচ দান ও গ্রহণ উভয়ই দোষ। সকলে জাগ্রত বিবেকের অনুসরণ করুন, তাহাকে অগ্রাহ্য না করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলুন, ঘুষ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিব না, তাহা অন্যায়; তাহাতে আমার মেয়ের না হয় বিবাহ না হইবে। বিবেকের আদেশ মস্তকে লইয়া, ফলাফল ভগবানের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইলে, ভগবান্ দেশকে এ সঙ্কটকালে পরিত্যাগ করিবেন না। প্রতিকার কন্যার পিতার হস্তে। কিন্তু এই জাগ্রত বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিলে উদ্ধার নাই। সব ভস্মে ঘৃতাহুতি।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে স্নেহলতার মৃত্যুর কারণ পণপ্রথা।—কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে মূল কারণ তাহা নহে। বিষবৃক্ষ পুঁতিয়াছি, তাহাতে বিষফল ফলিয়াছে। তাহার একটী ফল খাইয়া মানুষ মরিল, রাগ করিয়া সব ফল বিনাশ করিলাম। গাছ রহিল। আবার যখন ফসল হইবে তখন এই উত্তেজনা থাকিবে না—তখনও কিন্তু মানুষ মরিবে। একমাত্র উপায় বিষবৃক্ষের উন্মূলন। একজনের পক্ষে আমার কন্যাকে বিবাহ না করিবার শত বাধা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা আমার কন্যার আত্মহত্যার যথেষ্ট কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পণ স্নেহলতার মৃত্যুর আসল ব্যাখ্যা নহে। আমি যে আমার কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট বয়সের উপরে আমার ঘরে রাখিতে পারি না, রাখিলে আমার মাথা যায়, সুতরাং শত আদরের ধনকেও যেমন করিয়া হউক ঘরের বাহির করিতেই হইবে; যে তাহার আদর জানে না, যে তাহাকে চায় না, তাহারই হাতে দিতে হইবে; সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও আমি ইহা করিতে বাধ্য;—বালিকা আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে এই অভিমানে। ইহাই বাল্যবিবাহের বিষদন্ত। এই দন্তাঘাতে স্নেহলতা মরিয়াছে—পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সত্ত্বেও শত স্নেহলতা মরিবে। ইহাই বিষবৃক্ষ! দেশ যদি ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকেন, তবে, হায়! স্নেহলতা বৃথাই আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী

ভারতবর্ষ হস্তীর প্রাচীন জন্মভূমি। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই লোকে হস্তীর ব্যবহার জানিত। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় হস্তীর উল্লেখ আছে এবং রামায়ণ মহাভারতের যুগে লোকে হস্তীর পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে যাইত। হস্তীর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় লোকে হস্তী-দন্তের ব্যবহারও শিখিয়াছিল; কারণ রামায়ণে দেখিতে পাই যে ভরতের সঙ্গে যে-সমস্ত লোক রামের অন্বেষণে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে হস্তীদন্ত খোদাই করিতে দক্ষ লোকও ছিল। রঘুবংশে হস্তীদন্তনির্ম্মিত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতা, হরিবংশ, বাৎসায়নের কামসূত্র প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত সামগ্রীর উল্লেখ দেখা যায়। এই-সমস্ত গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে হাতীর দাঁত খোদাই করার কারুকৌশল অতি প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল।

কিন্তু বঙ্গদেশে এই শিল্প মুসলমান আমলের পূর্ব্বেও ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির লেখার মধ্যে নানা প্রকারে হস্তীর উল্লেখ আছে এবং গজমতি হারের কথা ত সকল পাঠকই জানেন, কিন্তু হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত কোন দ্রব্যের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্ব্বত্য দেশসমূহে হস্তী প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং হস্তীদন্তের ব্যবহার এদেশের লোকের খুব প্রাচীনকাল হইতেই জানা সম্ভব। কিন্তু হস্তীদন্তের বহুল প্রচলন না হওয়ার এক কারণ আছে। প্রচলিত হিন্দু মতে হাড়ের দ্রব্য মাত্রেই অশুচি, সুতরাং হস্তীদন্ত-

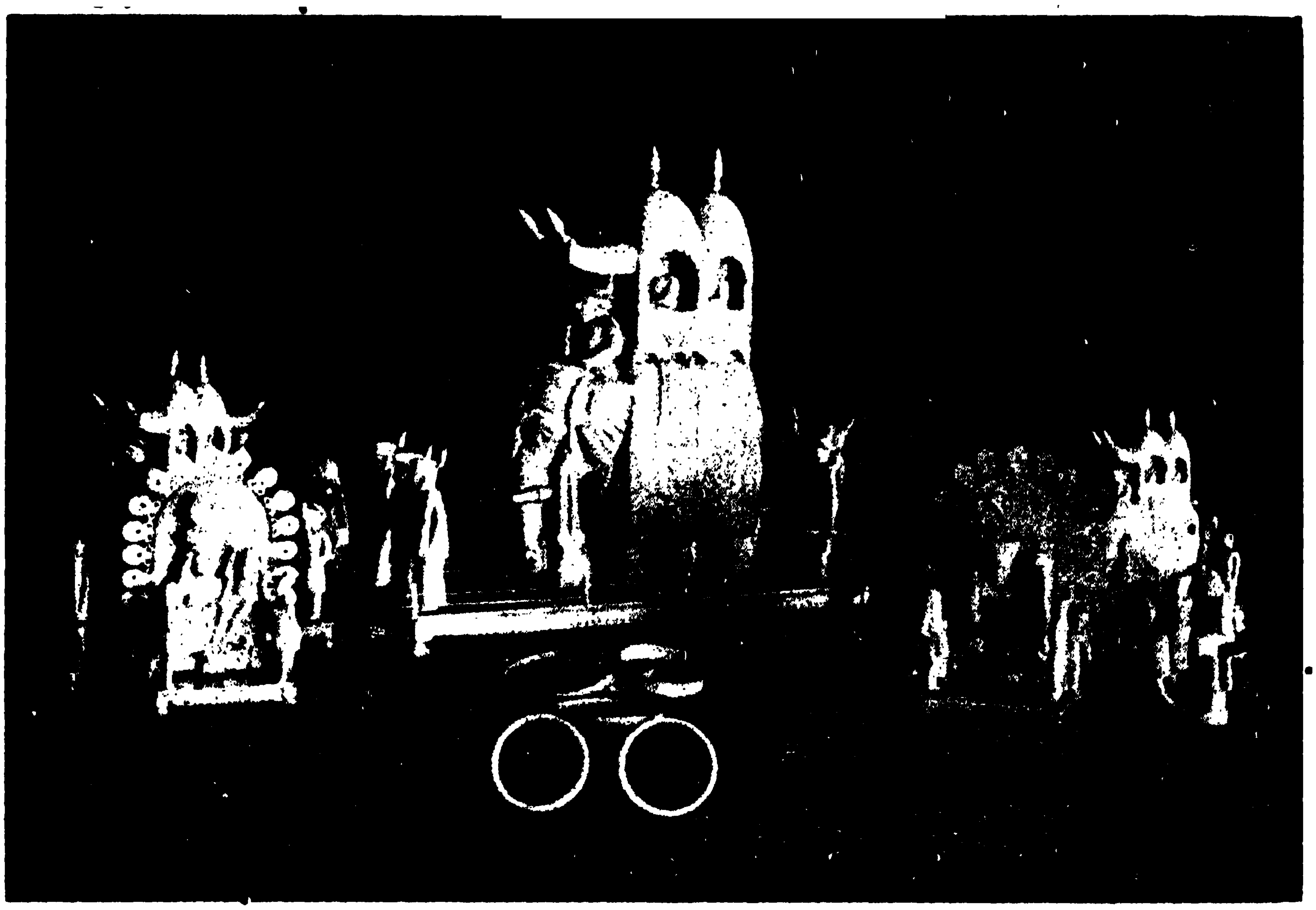

গজদন্ত-নির্ম্মিত পুতুল, মূর্ত্তি, প্রতিমা ইত্যাদি।

নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করা নিষিদ্ধ। ধনীর গৃহের আসবাব অথবা সখের জিনিষ বলিয়াই হস্তীদন্তনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের আদর হইত, সাধারণ গৃহস্থ ইহার কোন অভাব অথবা আবশ্যক বোধ করিত না এবং উহা বহুমূল্য বলিয়া সাধারণ লোকের আয়ত্তেরও অতীত ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এই শিল্প বাঙ্গলাদেশের কেবলমাত্র দুই জেলায় দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ ইহাদের অন্যতম। রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত পাঙ্গা গ্রামে মাত্র ৫।৬ টি খোঁদকার পরিবারের বাস আছে। পূর্ব্বে নাকি ১০। ১২ ঘর ছিল। স্থানীয় ভূস্বামী ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বিহার হইতে আনিয়া লাখেরাজ জমি দিয়া গ্রামে বসাইয়াছিলেন। এখন তাহাদের বংশধরদিগকে সেই জমির খাজনা দিতে হয়। শিল্পের অবস্থাও এখন আশানুরূপ নহে। সকলেই প্রায় চাষবাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, জমিদার অথবা রাজকর্ম্মচারীর আদেশ পাইলে অবসর মত হস্তীদন্তের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে শিল্পদ্রব্যও আর সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না। সিন্দুরমাটি ও মীনসকুড়ার মেলাতে ইহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাঙ্গার খোঁদকারেরা সকলেই মুসলমান। সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের সহিত ইহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে।

১৮৩৩ সালের কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা, বড়বাড়ী প্রভৃতি স্থানেও খোঁদকারদের বাস ছিল। এখন এইসব স্থানে তাহাদের আর কোন চিহ্নই নাই।

মুর্শিদাবাদে এই শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিরূপে ইহা এই স্থানে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নিম্নলিখিত লোকপ্রবাদে বর্ণিত আছে।

মুর্শিদাবাদের কোন নবাব একবার কান খুঁটিবার জন্য একটি কাঠি চাহেন। তাহাতে তাঁহাকে একটি ঘাস আনিয়া দেওয়া হয়। নবাব অসন্তুষ্ট হইয়া হস্তীদন্ত-

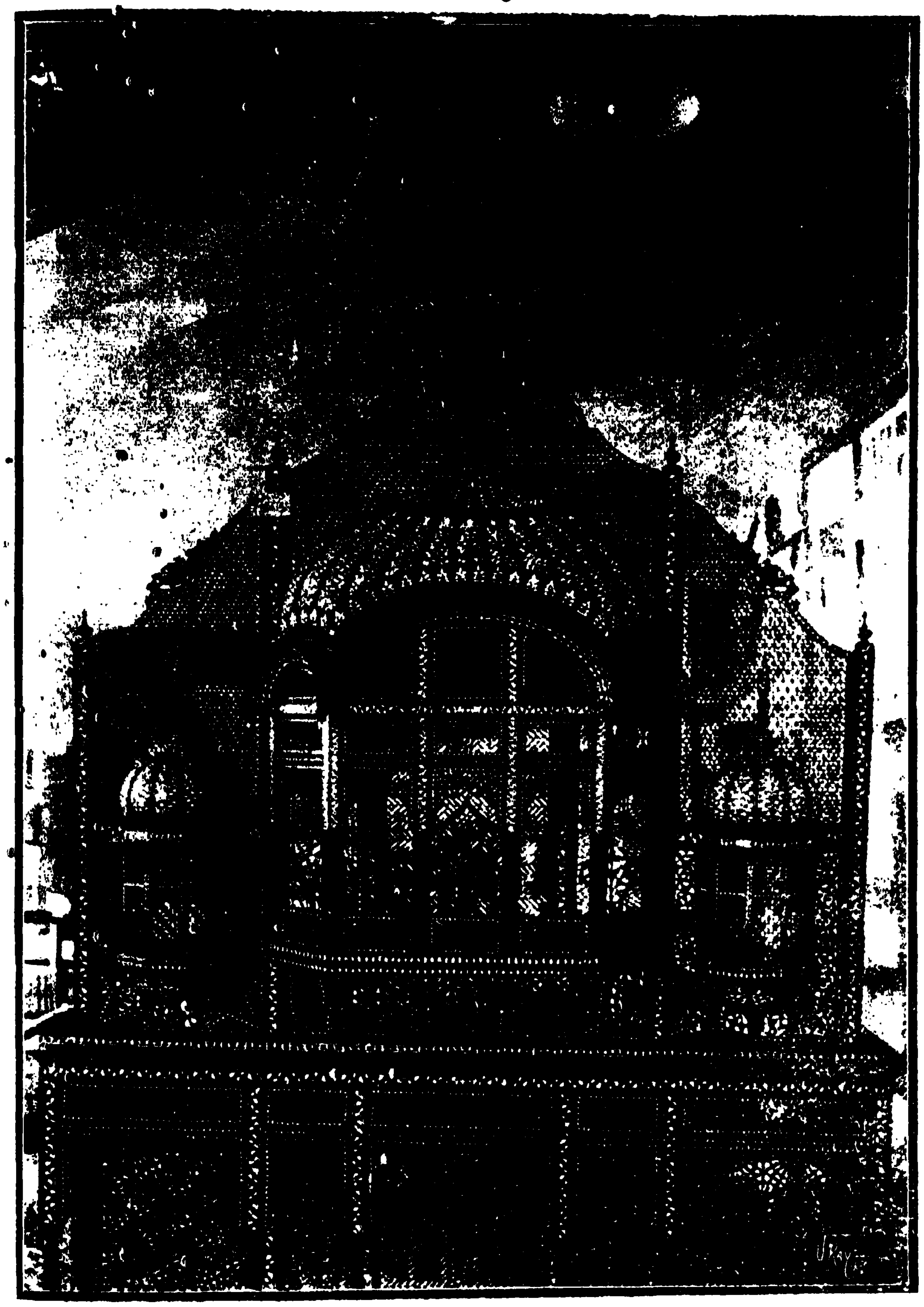

গজদন্ত প্রতিবপন করা দারুশিল্প।

নির্ম্মিত কানখুস্কি আনিতে হুকুম দেন। নবাবের আজ্ঞায় একজন শিল্পী মুর্শিদাবাদে আনীত হয় এবং এই শিল্পীর নিকট হইতে তুলসী খাতুন্দরের পিতা এই শিল্প শিক্ষা করে।

তুলসী মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এখনও ইহার নাম করিলে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা ভক্তিতে মস্তক অবনত করে। তুলসী একজন ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং তীর্থ ভ্রমণে তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। কিন্তু নবাব তাঁহার শিল্পের এত আদর করিতেন যে তুলসীকে কখনও চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। তুলসী একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে ভাগীরথীতে স্নান করিতে গিয়া নদী পার হইয়া রাজমহলে পলায়ন করেন। সেখানে ২।১ টা সামান্য সূত্রধরের যন্ত্র ধার করিয়া একটি কাঠের ঘোটক প্রস্তত করিয়াছিলেন এবং তাহা পাঁচ টাকাতে বিক্রয় করিয়া গয়া যাইবার পাথেয় সংগ্রহ করেন। সেখানেও উপরোক্ত প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কাশী তীর্থে যান। কাশী হইতে কিছু হস্তীদন্ত কিনিয়া লইয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং স্থানীয় কর্ম্মকারদিগের নির্ম্মিত ২।৪টি যন্ত্র দ্বারা কএকটি দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার লভ্যাংশ হইতে জয়পুর যাইতে সমর্থ হন। সেখানে গিয়া জয়পুরের মহারাজকে তিনি যে-সমস্ত দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। জয়পুরে অবস্থান-কালে তুলসী মহারাজের একটি পোষা ছাগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে এত সন্তুষ্ট করেন যে মহারাজ নিজের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া তুলসীকে উপহার দেন এবং নগদ ২০০০ টাকা পুরস্কার দেন। মহারাজের অনুরোধে তুলসী কিছুদিন জয়পুরে বাস করেন।

এই প্রকারে ১৭ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তুলসী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাৎকালীন নবাব তাঁহার গুণগরিমার কথা পূর্ব্বেই অবগত থাকায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। নবাব তুলসীকে ভূতপূর্ব্ব নবাবের প্রতিকৃতি হস্তীদন্তে খোদিত করিতে অনুমতি করেন। প্রতিকৃতি এমনি অবিকল হইয়াছিল যে নবাব তাহা দেখিয়া তুলসীকে গত ১৭ বৎসরের সমস্ত বেতন দিতে

আজ্ঞা দেন এবং মহাজনটুলিতে তাঁহাকে বাসগৃহ দান করেন। তুলসীর দুই শিষ্য—মাণিক ভাস্কর এবং রামকিশোর ভাস্কর। রামকিশোর বালুচরের সন্নিকট এনায়েৎ-উল্লা বাগের লালবিহারী ভাস্করের খুল্লতাত ছিলেন। লালবিহারী এখন জীবিত নাই, তাঁহার পুত্র নীলমণিই এখন নিজামতের শিল্পী। এই বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদের শিল্প আধুনিক। কেহ কেহ বলেন যে শ্রীহট্ট জেলাতেই এই শিল্প সর্ব্বপ্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। এই স্থানের হস্তীদন্তনির্ম্মিত পাটী, পাখা প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পদ্রব্য বহুদিন হইতে বিখ্যাত। মুসলমান আমলে রাজধানী যখন প্রথমে ঢাকায় ও তারপর মুর্শিদাবাদে নির্দ্ধারিত হয়, তখন শিল্পীরাও রাজধানীতে অর্থাগমের আশায় গিয়া বাস করিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা সকলেই জাতিতে সূত্রধর এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা ভাস্কর বলিয়া অভিহিত। হস্তীদন্তের কাজ শিখিবার পূর্ব্বে ইহারা মাটির এবং পাথরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিত এবং কাঠের উপর খোদাই ও

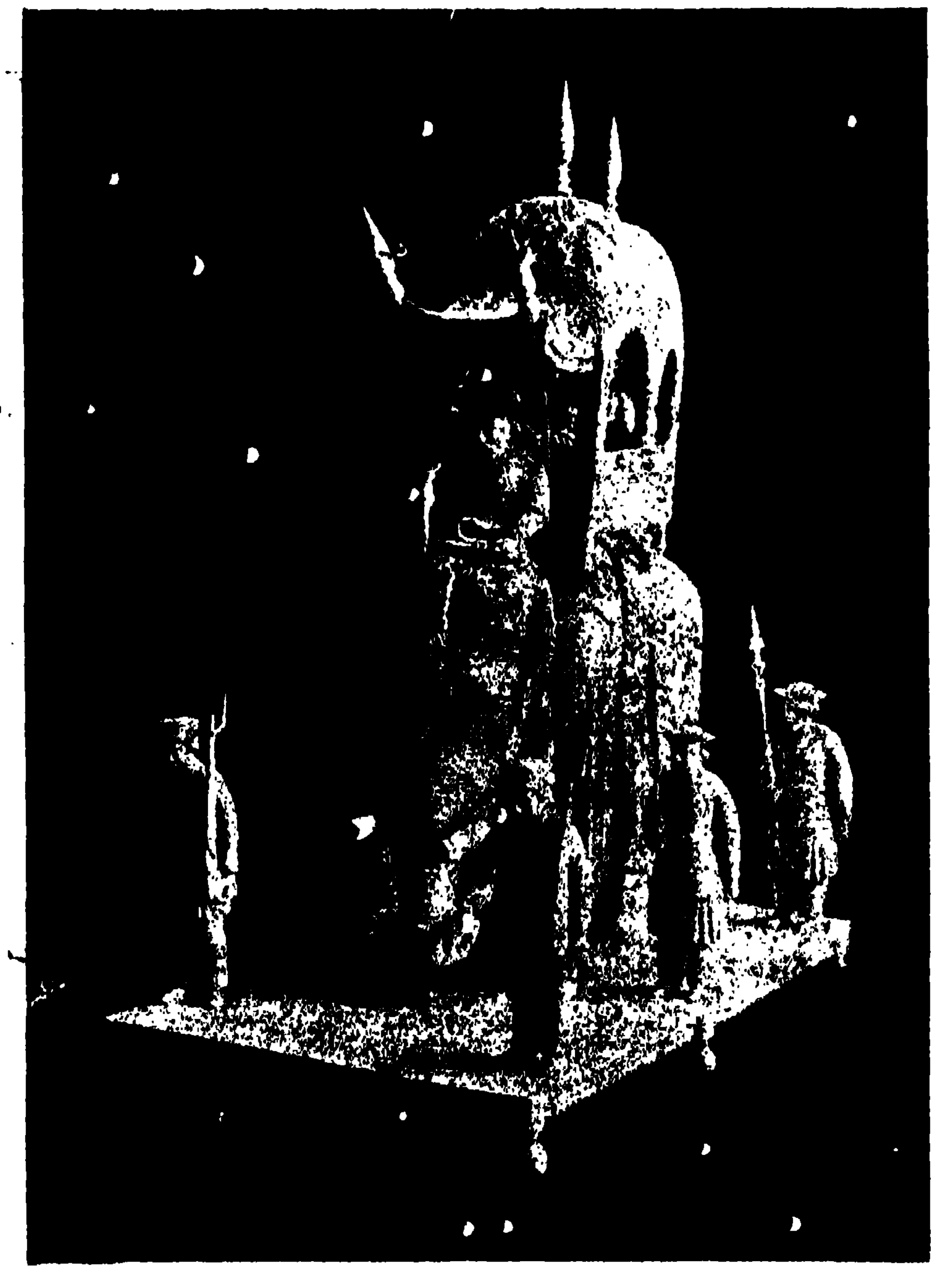

গজদন্ত-নির্ম্মিত হাওদা-সওয়ারী হাতী।

দেওয়ালে অঙ্কনের কার্য্য করিত। ভাস্করেরা অন্য জাতির লোককে নিজেদের শিল্প কখনও শিক্ষা দেয় না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইহাদের খুব সহানুভূতি আছে। কোন ভাস্কর কাজ শিখিতে ইচ্ছুক হইলে ইহারা তাহাকে শিক্ষা দেয় এবং ব্যবসায় করিতে সাহায্য করে। ভাস্করেরা সাধারণ সূত্রধরদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করে না, তাহারা আপনাদিগকে সাধারণ সূত্রধর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে।

ভাস্করদের আর্থিক অবস্থা খারাপ নহে। তাহারা মধ্যবিত্ত লোকদের ন্যায় পাকা বাড়ীতে বাস করে; সাধারণ চালচলনেও ইহারা ভদ্রলোকের ন্যায়। ইহাদের বাৎসরিক আয় ৬০০ শত হইতে ৮০০ শত টাকা হওয়া সত্ত্বেও ইহারা কিছুই জমাইতে পারে না; যাহা উপার্জ্জন করে তাহার প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলে। এই শিল্পে নিযুক্ত মজুরেরাও তাহাদের প্রভুদের ন্যায় অমিতব্যয়ী। ইহাদের আয় মাসিক ১২ হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত। ইহা ব্যতীত মজুরেরা নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া কাজ করে এবং তাহা হইতেও তাহাদের বেশ আয় হয়।

কলিকাতার হাড়কাটার গলিতে ২।৩ ঘর ভাস্কর ছিল। তাহারাও জাতিতে সূত্রধর, কিন্তু তাহারা বোতাম, চেন, চিরুনি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের শিল্পকার্য্য করিতে অক্ষম। মুর্শিদাবাদের ভাস্করদের ন্যায় ইহারা মজুর দিয়া কাজ করাইত না—নিজেরাই খোদাই এবং বিক্রয় উভয়ই করিত। এক্ষণে তাহারা কলিকাতার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং স্থানে স্থানে মুসলমান শিল্পীও ব্যবসায় করিতেছে দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদের ভাস্করেরা আসামজাত কিম্বা ব্রহ্মদেশের হস্তীর দন্তের উপর খোদাই করিতে পছন্দ করে, কারণ এই দুই প্রকার দন্তই অন্যান্য স্থানের হস্তীদন্ত অপেক্ষা নরম। আজিমগঞ্জের রায় মেঘরাজ বাহাদুর ইহাদিগকে দন্ত দিয়া থাকেন এবং বানি দিয়া বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করান; শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইলে শিল্পীদের নিকট ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় পাঠান।

খগপুরের খোদকারদের অবস্থা বড় শোচনীয়। হস্তী-

দন্ত কোথায় পাওয়া যায় তাহা তাহারা জানে না এবং আসামের জমিদারগণ ইহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া বানির সহিত পুরস্কার স্বরূপ কখনও কখনও হস্তী-দন্ত দান করিলে ইহারা তাহা দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। শিল্পদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধেও ইহাদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্থানীয় লোকে হস্তীদন্তের দ্রব্য অল্পই কিনিয়া থাকে এবং গ্রামের বাহিরে গিয়া ক্রেতা অন্বেষণ করিবারও তাহাদের সাহস নাই।

হস্তীদন্ত তিন রকম দরে বিক্রয় হয়। নক্সী-দন্ত বা দন্তের অগ্রভাগ, খোক্সী-দন্ত বা মধ্যভাগ, এবং গহ্বর-দন্ত বা ফাঁপা শেষাংশ, যথাক্রমে ৮॥০ হইতে ১০৲, ১৫ হইতে ১৬৲ এবং ৭ হইতে ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। মুর্শিদাবাদের ভাস্করেরা এই তিন রকম দাঁতই ব্যবহার করিয়া থাকে। বোম্বাইএ বিদেশ হইতে আমদানী দন্ত দামে ২৷৩ টাকা করিয়া কম হইলেও ইহারা তাহা ব্যবহার করে না, কারণ উহা অত্যন্ত কঠিন। মুর্শিদাবাদের ভাস্করেরা অতি সাধারণ যন্ত্র দিয়া নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করে। নিম্নলিখিত যন্ত্র দিয়াই তাহারা প্রায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।

১। রেতী বা উখা	৭। কম্পাস।
২। আড়ি বা করাত	৮। পাক সাঁড়াশী।
৩। রুখানি বা ছোটবাটালি	৯। কাঠের মুগুর।
৪। পেঁচকস	১০। টি স্কোয়ার।
৫। তুরপুণ	১১। ভ্রমিযন্ত্র বা কুঁদ।
৬। কাতুরি (সাঁড়াশীর মত যন্ত্র)	

ভাস্করেরা মাছের আঁশ ও চাঁছাড়ি দিয়া মূর্ত্তি পালিশ করিয়া থাকে। কাজ করিতে করিতে যদি তাহাদের কোন নূতন যন্ত্রের আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ একটা নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া ফেলে এবং কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করে।

বর্ত্তমান সময়ে এই শিল্পের অবস্থা ভাল নয়। ইহা কেবল শিল্পীদেরই দোষে নহে। এখনও মুর্শিদাবাদে এমন শিল্পী আছে যাহারা নমুনা দেখিয়া যে-কোন জিনিষের অনুকরণ করিতে পারে। সাধারণতঃ শিল্পী-

গজদন্ত-নির্ম্মিত দুর্গাপ্রতিমা।

দের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহে একটা আড়ষ্টভাব, একটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, সব সময়েই শিল্পের অবস্থা এইরূপ ছিল। অধ্যাপক জে, এফ, রয়েল সাহেব "Lectures on the Arts and Manufactures of India" 1852 নামক পুস্তকে বহরমপুরের ভাস্করদিগের খুব প্রশংসা করেন। তাঁহার পুস্তকের ৫১১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়েকটি উদ্ধৃত হইল—

"A variety of specimens of carving in ivory have been sent from different parts of India and are much to be admired whether for the size or minuteness, for the elaborateness of detail or for the truth of representation. Among these the ivory carvers of Berhampur are conspicuous. They have sent a little model of themselves at work and using as is the custom of India only a few tools. The set of chessmen carved from the drawings in Layard's 'Nineveh' were excellent representations of what they could only have seen in the above work, showing that they are capable of doing new work when required; while their representation of the elephant and other animals are so true to nature that they may be

considered the "works of real artists and should be mentioned rather under the head of fine arts than of mere manual dexterity."

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে হস্তীদন্তে নির্ম্মিত শিল্পসামগ্রীর যে-সমস্ত নমুনা দেখিয়াছি সে-সমস্তই আকার, ভঙ্গী, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, স্বভাবানুকরণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ প্রসংশার যোগ্য। তাহাদের মধ্যে (মুর্শিদাবাদ) বহরমপুরের নমুনাগুলিই সর্ব্বপ্রধান। সেখানকার শিল্পীরা ভারতশিল্পীর স্বাভাবিক কুশলতায় সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়াই অমন সুন্দর শিল্পসামগ্রী গঠন করিতে পারে। তাহারা নূতন জিনিসের হুবহু নকল করিতে সক্ষম; এবং হাতী ঘোড়া প্রভৃতির মূর্ত্তিতে স্বভাবানুকরণ এমন সুন্দর যে সে-সমস্ত মূর্ত্তিকে ললিতকলা বলিতে হয়, কেবলমাত্র হাতের কাজের বাহাদুরী বলা চলে না।

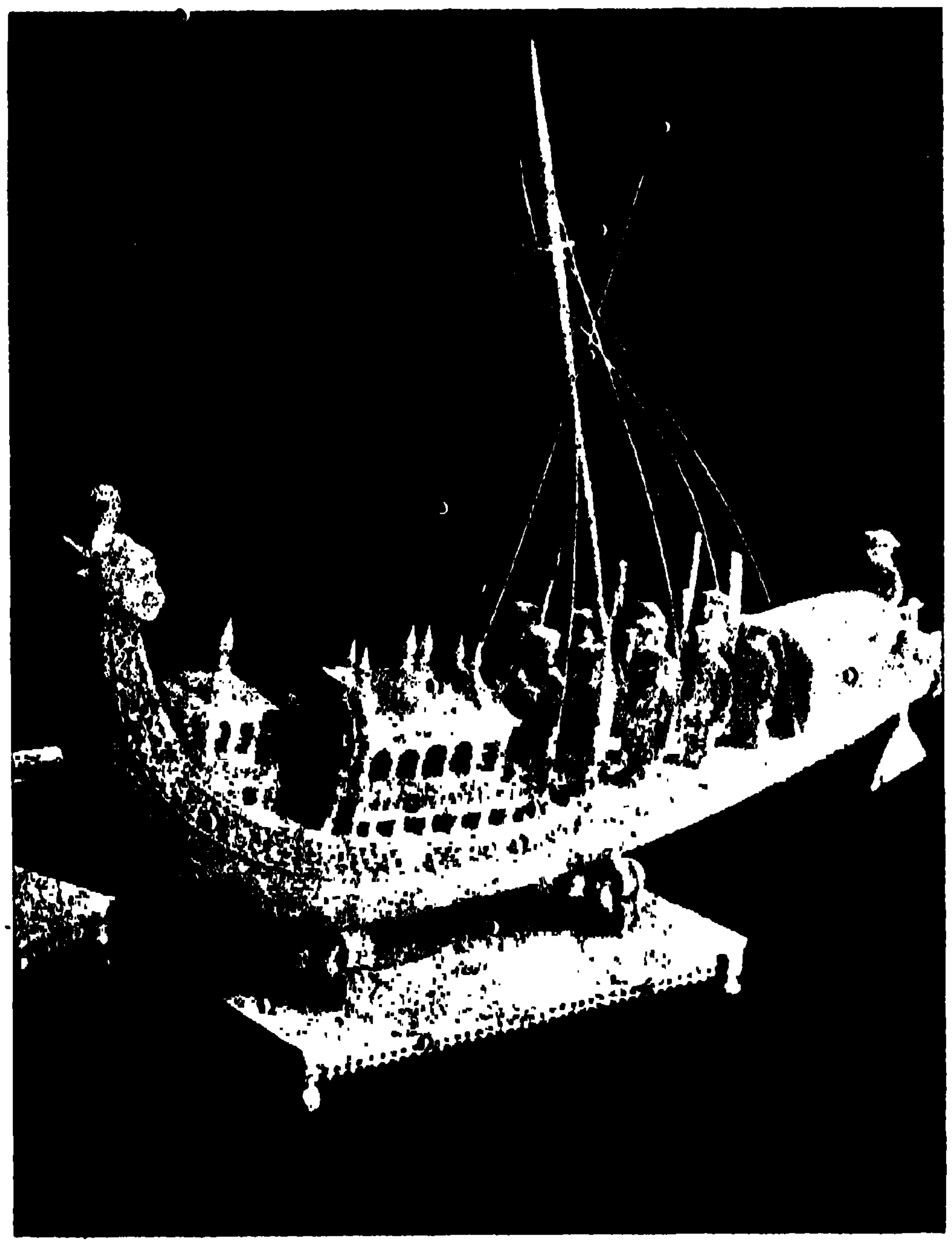

গজদন্ত-নির্ম্মিত ময়ূরপঙ্খী।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে গত শতাব্দীতে এই শিল্প কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখন আর শিল্পীর সেরূপ আদর নাই। সুতরাং তাহারা জীবিকার জন্য ভাল কলাসম্মত জিনিস না করিয়া সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। বহরমপুরে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপিত ছিল তখন এই শিল্পের সাহেব ক্রেতার অভাব ছিল না, সুতরাং শিল্পের অবস্থাও ভাল ছিল। বহরমপুরের গৌরব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পের অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ সরকার পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য শিল্পী-দের দ্বারা অনেক ভাল ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করাইতেন। এখন আর তাহা করেন না। তৎপরিবর্ত্তে রাজা মহারাজাদের নিকট হইতে ভাল ভাল জিনিস চাহিয়া লইয়া কাজ সারেন। ইহা সরকারের গৌরবের কথা নহে।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মথুরা দৌলতবাজার রণসাগর প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেক ভাস্কর-পরিবার ছিল। এখন সেই-সমস্ত স্থানে একজন ভাস্করও নাই। অনেকে ম্যালেরিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, আবার কেহ কেহ সে-সমস্ত স্থান ছাড়িয়া বহরমপুর, বালুচর প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে নিম্নে কয়েক জনের নাম ধাম প্রকাশিত হইল—

১। গিরিশচন্দ্র ভাস্কর ২। নিমাইচন্দ্র ভাস্কর ৩। গোপালচন্দ্র ভাস্কর ৪। দুর্লভচন্দ্র ভাস্কর ৫। হরিকৃষ্ণ ভাস্কর ৬। নারায়ণচন্দ্র ভাস্কর	খাগড়া, বহরমপুর
৭। গোপালচন্দ্র ভাস্কর ৮। গোপীকৃষ্ণ ভাস্কর ৯। নীলমণি ভাস্কর ১০। মুরারীমোহন ভাস্কর ১১। গোকুলচন্দ্র ভাস্কর (বড়) ১২। উমেশচন্দ্র ভাস্কর ১৩। মহেশচন্দ্র ভাস্কর ১৪। শ্রীরামচন্দ্র ভাস্কর	এনায়েৎ-উল্লা বাগ, জিয়াগঞ্জ।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই শিল্পের ভাবী উন্নতির জন্য এখন দুইটি জিনিস আবশ্যক। মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণ পুরাতন পন্থা ছাড়িয়া এখন নূতন পথে অগ্রসর হউন। বাঁধা রাস্তা, পুরাতন প্রণালী ছাড়িয়া এখন শিল্পে নূতন আদর্শ আনয়ন করুন। যাহা চিরন্তন কাল হইতে গড়িয়া আসিতেছেন তাহা

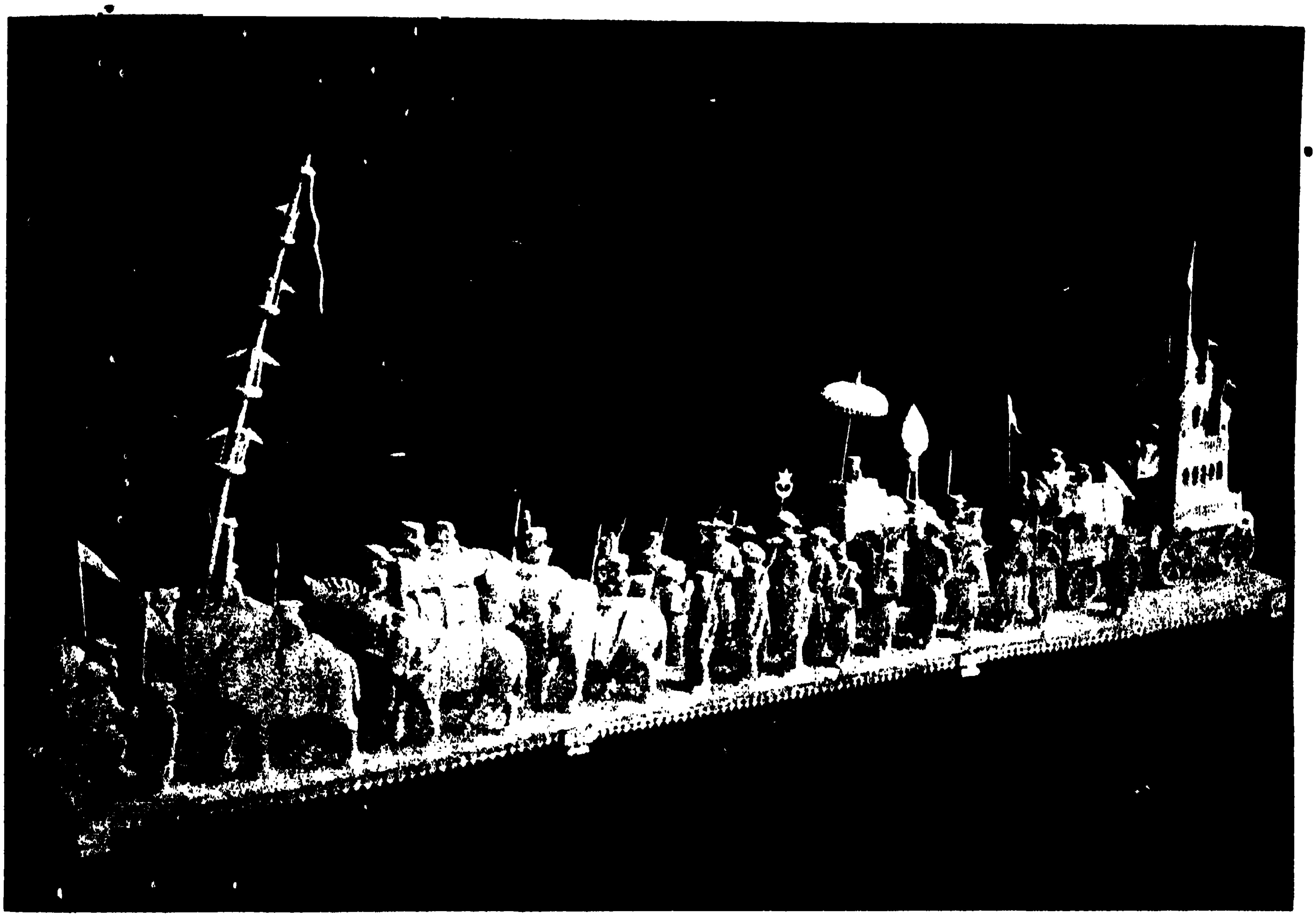

গজদন্ত-নির্ম্মিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

ছাড়িয়া এখন স্বভাবের সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করুন।

ইহা করিতে হইলে নূতন ভাব ব্যতীত আরও একটি জিনিস আবশ্যক। আমাদের শিল্পীরা অতি অল্পসংখ্যক যন্ত্র দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে কিন্তু আর চলিবে না। নূতন যুগের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় যন্ত্র সমূহের ব্যবহার শিখিতে হইবে। তাহাতে কাজ যেমন ভাল হইবে তেমনি দ্রুত হইবে। জিনিসের মূল্য কমিয়া গেলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে এবং শিল্পী লাভবান হইতে পারিবেন।

মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত হাতীর দাঁতের কতকগুলি দ্রব্যের নাম ও আনুমানিক মূল্যের তালিকা দেওয়া হইল—

১।	বর্ণমালার অক্ষর (প্রতি অক্ষর)	⁄০ হইতে ⁄১০
২।	দুর্গাপ্রতিমা এক অখণ্ড হস্তীদন্ত হইতে খুদিয়া প্রস্তুত প্রতিমা ১৫০৲ টাকা মূল্যেই পাওয়া যায়।	৫০৲—৩০০৲
৩।	কালী-প্রতিমা	৪০৲—১২০৲
৪।	জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা	৫০৲—১২৫৲
৫।	জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	৫০৲—১৫০৲
৬।	পাল্কী	১৫৲—১০০৲
৭।	শতরঞ্চের বল	২৫৲—২৫০৲
৮।	বাক্স	২৫৲—৩০০৲
৯।	হাতী	৫৲—১৫০৲
১০।	ঘোড়া	২৲—৩০৲
১১।	গরুর গাড়ী	৮৲—৫০৲
১২।	ময়ূর-পঙ্খী	১০৲—১০০৲
১৩।	উট	৪৲—৪০৲
১৪।	গরু	৩৲—২০৲
১৫।	কুকুর	২৲—৮৲

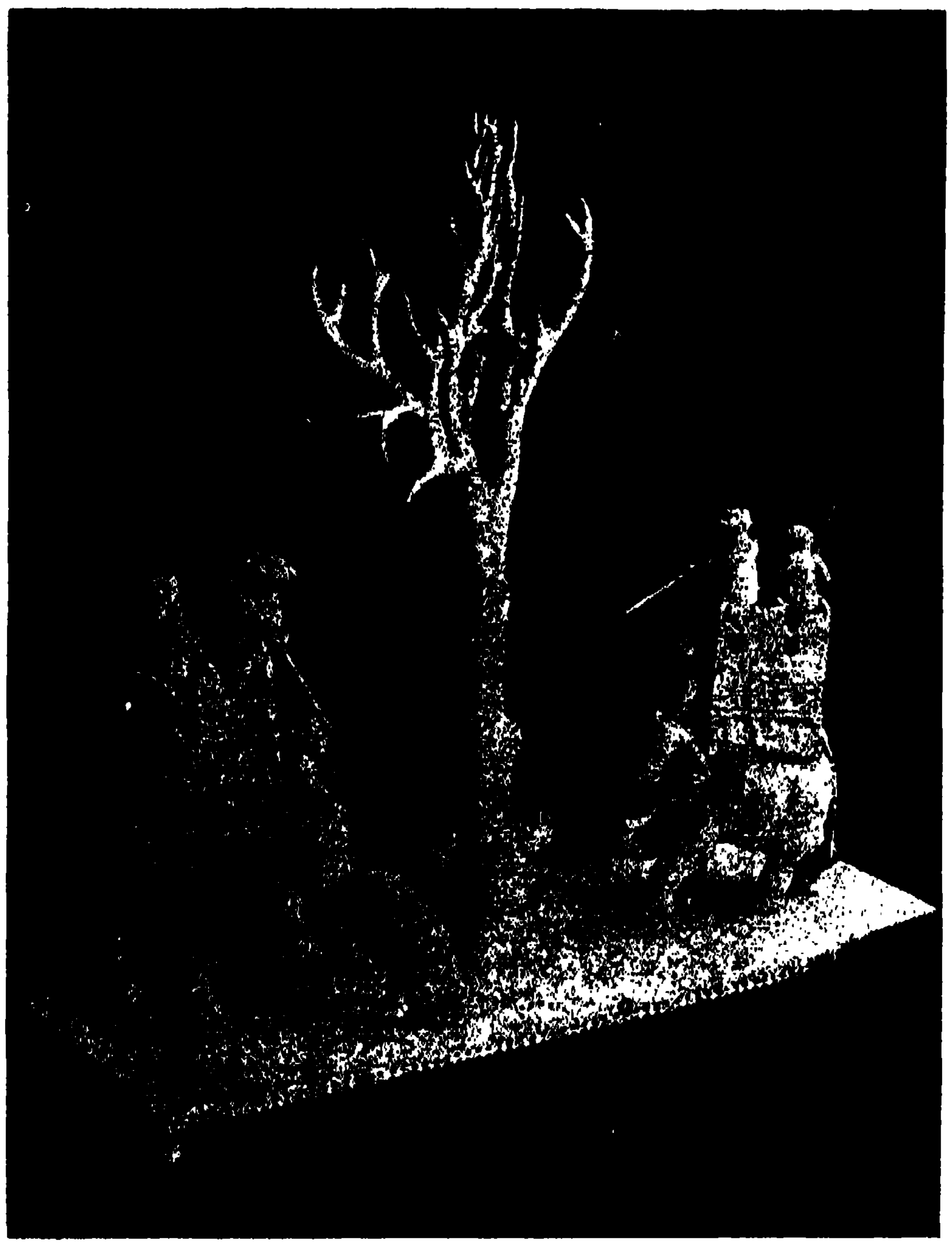

গজদন্ত-নির্ম্মিত শিকারদৃশ্য।

১৬।	শূকর	২৲— ১০৲
১৭।	মহিষ	২৲— ১০৲
১৮।	কুমীর	৫৲— ২০৲
১৯।	হরিণ	২৲— ১৫৲
২০।	চাষার লাঙল দেওয়া	৩৲— ২০৲
২১।	ঘড়ীর চেন	৫৲— ৫০৲
২২।	কানের দুল	৪৲— ১০৲
২৩।	বধূ, পুরুত ঠাকুর, ধোবা, ভিস্তি, পিয়ন, পেয়াদা, দর্জ্জি, সিপাহি, ফকির, পুলিসম্যান প্রভৃতির মূর্ত্তি	২৲— ৫৲
২৪।	কাগজ-কাটা	১৲— ৩০৲
২৫।	বালা, চুড়ি	২০৲— ঊর্দ্ধ
২৬।	কার্ড-কেস	৬৲— ১৫৲
২৭।	পশম-বোনা কাঠি	।৵ আনায় ৪টি
২৮।	কুরুস কাঠি	১৲
২৯।	ফটোগ্রাফের ফ্রেম	১৫৲— ৬০৲
৩০।	চোঙা	৩০৲—১০০৲
৩১।	ছড়ি	২৫৲— ৭৫৲
৩২।	চামর	?
৩৩।	চিরুণী	১৲ হইতে ঊর্দ্ধ

জিনিসের আকার, মূর্ত্তির সংখ্যা, কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা ও বাহুল্য, বেজোড় অখণ্ড দাঁতের তৈরী বা খণ্ড খণ্ড জোড় দিয়া তৈরী প্রভৃতি অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়। *

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা শব্দকোষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্কলিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।

আজ তিন মাস হইতে প্রত্যহ এই শব্দকোষখানি লইয়া যতই আলোচনা করিতেছি ততই ইহার অসাধারণ সংগ্রহ ও সম্পূর্ণতার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইতেছি। একটি সামান্য শব্দেরও যত প্রকার অর্থ থাকিতে পারে তাহা দৃষ্টান্ত সহিত দেওয়া হইয়াছে (যেমন, 'ত' দেখুন); একটি শব্দ বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইলে কত প্রকার বিভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহাও ধরা পড়িয়াছে (যেমন, 'জল', 'ধরা' প্রভৃতি শব্দ); একটি দ্রব্যের বা বিষয়ের বিভিন্ন আকার প্রকারের ও অংশের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে (যেমন, 'জাল,' ঢেঁকি, তাল ইত্যাদি); বঙ্গদেশে পরিচিত গাছগাছড়া, পশুপক্ষী প্রভৃতির নাম, পরিচয়, আকার, স্বভাব প্রভৃতিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে (যেমন, আলু, নেবু ইত্যাদি)। ইহা যোগেশ বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিতের জ্ঞান, জিজ্ঞাসা, অন্বেষণ ও ধৈর্য্যের উজ্জ্বল পরিচয়। ইহার সমকক্ষ বাংলা অভিধান দেখি নাই, শীঘ্র দেখিবার সম্ভাবনাও দেখি না।

কিন্তু এই সুসংগৃহীত শব্দকোষেও আমার জানা দুই দশটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে; কোনো প্রদত্ত শব্দের অর্থান্তর বা ব্যুৎপত্তি আমার হয়ত অন্যরূপ বলিয়া জানা আছে। তাহারই কয়েকটি যথাজ্ঞান নিম্নে আলোচিত হইতেছে। তবে খুব সম্ভব আমার প্রদত্ত অনেক শব্দ বা অর্থ শব্দকোষে দেওয়া আছে, আমার চোখ এড়াইয়া যাওয়াতে আমি সেগুলিকেও অধিকন্তু ন দোষায় মনে করিয়া পুনর্ব্বার লিখিতেছি। সে ত্রুটি কোষকার ও পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। তবে ইহার জন্য কোষকারও কতকটা দায়ী; কারণ অনেক শব্দই ঠিক বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয় নাই; অনেক শব্দ এমন ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছে যে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। এবং ইহার জন্য বাংলা ছাপাখানাও কতকটা দায়ী,—সমস্ত শব্দ, অর্থ, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ, একই রকম হরপে দেওয়াতে কোন্‌টি যে কি তাহা সহজে পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া যায় না।

* এই প্রবন্ধটি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত "বাঙ্গালায় হাতীর দাঁত খোদাই" নামক ১৯০১ সালের রিপোর্ট হইতে সঙ্কলিত।

কতক শব্দ বা কোষকারের ও আমার উচ্চারণ-পার্থক্যে আমার যেখানে খোঁজা উচিত সেখানে খোঁজা হয় নাই বলিয়া চোখে পড়ে নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কোষকার শব্দের যে রূপ কোষ- ও ব্যাকরণ-সঙ্গত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অর্থ দিয়া অন্যত্র প্রচলিত রূপও দেওয়া উচিত ছিল; এবং তিনি সেরূপ অনেক স্থলে দিয়াছেনও; এমন কি গ্রাম্য স্ত্রীজনের ব্যবহৃত অতি অপভ্রংশ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। তিনি যাহাকে ভাখা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক শব্দ কোষ-লিখিত উচ্চারণে ব্যবহৃত হয় না; কোষকার বলিতে পারেন যোজনান্তে ভাখা, কত রকম উচ্চারণ দিব? কিন্তু আমার মনে হয় আজকালকার cultureএর কেন্দ্র কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ দিলেই কাজ চলিতে পারিত। অবশেষে আর একটি কথা নিবেদন করিবার আছে; কোষ বিদেশীর জন্য সঙ্কলন করিতেছি মনে করিয়া শব্দ সজ্জিত করা উচিত, তাহার অর্থ লেখা উচিত। এই কোষে বিদেশী লোক অনেক শব্দ সহজে খুঁজিয়া পাইবে না। প্রত্যেক ইংরেজি অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, ধাতুর মোটামুটি সর্ব্ব কাল ও পুরুষ সম্পর্কে রূপ পরিবর্ত্তন, একবচনের বহুবচন রূপ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা থাকে; ইহাতে বিদেশী লোক অভিধান হইতে ব্যাকরণেরও অনেক খুঁটিনাটি জটিলতা বুঝিতে পারে এবং একই শব্দের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কত রকম রূপ-বিপর্য্যয় হয় তাহা ধরিতে পারে। এই কোষখানিতেও সেরূপ কতকটা আছে; আর একটু বিশদ হইলে অধিকতর উপাদেয় ও উপকারী হইত। যোগেশ বাবু যে বলিয়াছেন তিনি কোন্ ভাষার শব্দ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই খালাস, তাহা আমার সমীচীন মনে হয় না। আগেকার অভিধানে সঙ্কলন-কর্ত্তারা যাবনিক ও দেশজ বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন; যোগেশ বাবু তাহার স্থলে আরবী ফারসী ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে ইতর-বিশেষ কি হইল? প্রত্যেক বিদেশী শব্দের আদিম ও ধাতুগত অর্থটি দিয়া তাহা ব্যংলায় কি অর্থে দাঁড়াইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত। রুমাল শব্দটি ফারসী, ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে না, রু—মুখ, মাল (মালিদন)—মোছা, মোট অর্থ মুখ-মোছা বস্ত্রখণ্ড, জানিতে পারা চাই। ইংরেজি যে-কোনো অভিধানে এইরূপ ব্যুৎপত্তি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া থাকে; এমন কি অনেক অভিধানে সমাসবদ্ধ শব্দের প্রত্যেক বীজ-শব্দ বুঝিবার সুবিধার জন্য মধ্যে হাইফেন দিয়া লেখা হয়; বাংলা শব্দকোষেও সেই প্রণালী গ্রহণ করিলে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসুর যথেষ্ট উপকার করা হয়। বরকন্দাজ=বন্দুক-অন্দাজ, জাগীরদার=জাগীর-দার চুগলীখোর = চুগল-খোর, ছেপায়া = সে-পায়া, পিল্পা = পিল-পা ইত্যাদি প্রকারে লিখিয়া বীজ-শব্দের অর্থ দিয়া সমগ্র শব্দের অর্থ দিলে ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহা যে-ভাষার শব্দ সেই ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের কর্ত্তব্য বলিয়া অবহেলা করা যায় না; ইহা বাংলা ভাষার অভিধানে না থাকিলে সে অভিধান অসম্পূর্ণ। এত পরিশ্রম করিয়া এত দিন পরে এমন সুন্দর শব্দ-কোষ সঙ্কলন যদি হইতেছে, তবে তাহা সুসম্পূর্ণ নিখুঁৎ না হইবে কেন? শব্দকোষে অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ঐরূপেই দেওয়া হইয়াছে, এবং এত বিস্তারিত বিভিন্ন রকমে দেওয়া হইয়াছে যে সঙ্কলন-কর্ত্তার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়; কিন্তু সমস্ত শব্দের দেওয়া হয় নাই, ইহাই আমাদের দুঃখ। সহজে বুঝা যাইবে বলিয়া কোনো কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি ছাড়িয়া যাওয়া কোষকারের কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের আপশোষ হইতেছে যে যোগেশ বাবু একখানি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার অভিধান সঙ্কলন করিলেন না কেন? বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলি জুড়িয়া দিয়া, ইংরেজির ওয়েবেষ্টার কি সেঞ্চুরী ডিক্সনারীর ন্যায় একখানি অভিধানের অভাব, এই বাংলা শব্দকোষের দ্বারা যোগেশ বাবু দূর করিতে পারিতেন, এবং তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তিনি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভাষার এই দারুণ অভাব মোচন করিয়া নিজের অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিবেন ও বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইবেন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে নূতন শব্দ যে দুই দশটা আছে তাহা কলিকাতা ও হুগলির গঙ্গাতীর অঞ্চলে ব্যবহৃত। কয়েকটা শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের ও মালদহের যাহা আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। এই সমস্ত শব্দ ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি যোগেশবাবুর বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি মাত্র।—

অগস্ত্য-যাত্রা—অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যকে অবনত করিয়া দক্ষিণে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; তাহা হইতে, এমন যাত্রা যে আর ফেরা না যায়।

অয়েল ক্লথ—Oil-cloth.

অফুরন্ত—অ-শেষ।

অলবড়েড—অ-গোছালো, হাবলা, লক্ষ্মীছাড়া।

অসামাল—অসাবধান, রক্ষা করিতে অসমর্থ। কাপড়ে অসামাল হওয়া—কাপড়ে বাহ্যে করিয়া ফেলা।

অতিষ্ঠ—থাকিতে অশক্য।

অঠেল—যাহা ঠেলিয়া সরানো যায় না, প্রচুর, অনেক। যথা, অঠেল জিনিস বা কাজ। যাহা অমান্য করা যায় না; যথা, অঠেল কথা।

অসোরস, অস্বরস—(অ-সরস?) ঝগড়া, কলহ, মনোমালিন্য।

অবাক্ জলপান—যে জলপান খাইলে এমন ভালো লাগে যে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়।

অগত্যা—এই শব্দটি সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত অবস্থাতেই অব্যয় রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। তুলনীয়—দৈবগত্যা, হঠাৎ, দৈবাৎ, যদিস্যাৎ।

অভঙ্গ—তুকারামের রচিত শ্লোক।

অমায়িক—(সং), যে মায়া বা মিথ্যা ছলনা জানে না, সরল।

অজু, ওজু,—আঃ, ব্রজু—স্নান, প্রক্ষালন।

অাঁটুল বাঁটুল—ছেলেদের খেলা; পা ছড়াইয়া বসিয়া পায়ের উপর হাত আঘাত করিতে করিতে বলে—অাঁটুল বাঁটুল (?) শামলা শাঁটুল, শামলা গেছে হাটে; শামলাদের দুটি মেয়ে পথে বসে কাঁদে; আর কেঁদনা আর কেঁদনা ছোলা-ভাজা দেবো, আর যদি কাঁদবে বাছা তুলে আছাড় দেবো।

অঙ্গুস্তানা—Thimble,

অটুট—অভগ্ন। } এই দুটি শব্দ টুট ও টোল শব্দের negative রূপ হইলেও শব্দ দুটি
অটোল—নিটোল। }

(বিশেষত অটুট) বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এজন্য ইহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক।

অতুল—তুলনা-রহিত; তাহা হইতে, প্রচুর।

আবজা—(আওজা শব্দকোষে) ভেজাইয়া দেওয়া, কপাট বন্ধ করা কিন্তু খিল না দেওয়া, শুধু দুই বাইল কপাট মুখে মুখে ভিড়াইয়া দেওয়া। শব্দকোষে ইহার বিপরীত অর্থ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ প্রয়োগ কখনো শুনি নাই।

আসর—ফারসী শব্দ। ফারসী কেতাবে (আলিফ, সে, রে বানানের) আসর শব্দ পাইয়াছি, কিন্তু অভিধানে পাইলাম না।

আজ্জা—ধাতু, গাছের বীজ বা চারা বপন করা।

আবখোরা—ফাঃ আব্ (জল)—খোরী (খুর্দন=খাওয়া), জল খাওয়ার পাত্র। পাথরের বড় বাটি।

আত্তি—"ছেলেকে আত্তি করা" মানে ছেলেকে আদর যত্ন করা। বোধ হয় আত্মীয়তা শব্দজ।

আঘাটা—যাহা ঘাট নয়।

আঁশ—ধাতু, অল্প শুষ্ক হওয়া; যথা, কাপড়খানা অল্প আঁশিয়েছে।

আফলা—যে গাছে এখনো ফল ধরে নাই।

আঁধি—ধুলার ঝড় যাহাতে লোককে অন্ধ করিয়া তোলে।

আপ্‌সা, আফ্‌সা—ধাতু, আস্ফালন করা, রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করা। ফারসী শব্দ? না আস্ফালনের অপভ্রংশ। ফারসী আফ্‌শান=ছড়ানো, বিস্তারিত করা। আরবী আফীদন=কুকুরের খেঁক্-খেঁকানি।

আপাস ধাপাস—রুদ্ধ ক্রোধ স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া ইঙ্গিতে আচরণে কাজে কর্ম্মে প্রকাশ করা।

আলপিন—আল বা মাথা-ওয়ালা pin বা সূচ।

আলটপকা—আলগোছে সমস্তটা গোটা গিলিয়া ফেলা।

আলাত পালাত, আতারি কাতারি—রোগ-যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করা।

আর্সা—অপরিষ্কার গলিঘুঁজি স্থান, যেখানে সাপখোপের ভয় আছে। আরবী আর্সা—স্থান।

আল্‌তারাফ—বাক্স আলমারীতে তালা লাগাইবার জন্য যে আঙ্গুঠা ও কব্জা দুই বাইল কপাটে লাগানো থাকে। (আঃ, আল্-তরুফ্=যাহা একদিকে থাকিয়া অপর দিককে বন্ধ করে।)

আঁক-বাড়ি—আঁক (অঙ্ক)-বাড়ি (লাঠি), যে লাঠিতে আঁক কাটিয়া মূর্খ বেপারীরা রোজের জোগান দেওয়ার হিসাব রাখে।

আদত—আস্ত, গোটা, অখণ্ড; মোট, সমষ্টি।

আদদ—আরবী, সংখ্যা।

আগুড়ি—যাহা সময়ের পূর্ব্বে হয়।

আজল, আজুলি—আরবী, অত্যন্ত নীচ বা হীন; তাহা হইতে বাংলা অর্থ, ন্যাকা, বোকা, যে বুঝিয়াও না বোঝার ভান করে।

আদেখলা—যে কিছু দেখে নাই বলিয়া অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়া প্রত্যেক জিনিসই স্বয়ং চাখিয়া দেখিতে চায়; তাহা হইতে অর্থ—লোভী, ক্যাওলা।

আজর গাজর—যা-তা; যথা, আজর-গাজর কতকগুলো খেয়ে পেটের অসুখ করেছে।

আলাদ—(বোধ হয় আরবী শব্দ) বড়া, মোটা কাছি, (জাহাজের মুসলমান মাল্লারা ব্যবহার করে)। মালদহ জেলায় কেউটিয়া সাপের নাম আলাদ; দড়ীর মতো বলিয়া? গোক্ষুর সাপের নাম মালদহে গোহমা। হিন্দুস্থানীরাও বলে। অর্থ কি? আলগর্দ্দ কোন্ ভাষার শব্দ?

আছিল—সং আসীৎ। ছিল শব্দের প্রাচীন রূপ, পদ্যে ও মালদহ জেলার কথায় এখনো ব্যবহৃত হয়। আছ ধাতুর অতীত কালের আছিল এখন ছিল, হয় ইহা শব্দকোষে নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

আড়বাদলা—আড়া-আড়ি তির্য্যক ভাবে কোনো জিনিস বিশৃঙ্খলায় পড়িয়া থাকার ভাব; যথা, অমন আড়বাদলা হয়ে শুলে কেন, সোজা হয়ে শোও।

আধক্ষুধী—অধিক খাইতে পারে যে; তাহা হইতে অর্থ—লোভী যথা, অমন আধক্ষুধীর মতো গিল না।

আকচকানো—হঠাৎ ভয় পাইয়া থতমত খাওয়া।

আড়ি—ছোট সরু করাত। (ফারসী আরাহ্)

আবডাল—আড়াল।

আফর—ধান্যের বীজ।

আকরা, উকরা—ধান্যের রোগ বিশেষ; পোকা লাগা।

আর্ট—Art, আজকাল বাংলায় খুব চলিয়া গিয়াছে।

আগেকার—পূর্ব্ববর্ত্তী, সম্মুখবর্ত্তী।

আসকৎ—হিন্দি শব্দ? আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা।

আস্তর, অস্তর—ফারসী শব্দ. The lining of a garment.

আইডিগরে—নাবডিগরে; যে লাফাইয়া ডিঙাইয়া চলে, দুরন্ত।

আঙটা, আংঠা—অঙ্গার-শকটী আগুন পোহাইবার আগুনের ধাতুপাত্র, প্রায়ই লোহার হয়, পেটটা হাঁড়ির মতো, উপরে ধরিয়া তুলিবার জন্য একটা বড় আংঠা সংলগ্ন থাকে এবং তলায় তিনটা ছোট ছোট পায়া থাকে। মাটির কলসী ভাঙিয়া কানাটা বৈঠক ও খোলাটা থালী করিলে যে অঙ্গারশকটী হয় তাহাকে বলে "খাপরা"। কাঁচা মাটির "আলগ্-চুলা" বা "তোলা-উনুনের" ন্যায় অগ্নিপাত্রকে বরুষী বলে। এই শব্দগুলি মালদহ জেলায় সমধিক প্রচলিত।

আওড়—আবর্ত্ত।

আওরা—ধাতু, inflammation; যথা, ফোড়াটা বড় আওরেছে।

আচমনী যে খাদ্য খাইয়া আচমন করিতে হয়,—লুচি, রুটি, পরোটা জাতীয় ও মুড়ি জাতীয় খাদ্য, যাহা বিধবা ও যতী ব্রাহ্মণের একাধিকবার খাইতে নাই।

আঁজন—অঞ্জন।

আঁজুপাঁজু—কালীপূজার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে পাটকাঠি জ্বালাইয়া যে উৎসব হয়। মালদহ প্রভৃতি জেলায় ছুঁকাছুঁকি বলে। উহার মন্ত্রের প্রথম কথাটি মাত্র মনে পড়িতেছে—ছুঁক্করে ছুঁকিরে। ছুঁকা ধাতু মানে আন্দোলিত করা, যথা, পাখা ছুঁকানো। শব্দকোষে ইজল-পিজল শব্দ দ্রষ্টব্য।

আঁড়্‌মাড়্, আঁড়্‌বাঁড়্—গা বমি বমি করা। পেট আঁড়্‌মাড় করে, কিন্তু গা বমি বমি করে।

আঁদরসা—চালের গুঁড়া গুড়ে মাতাইয়া জল বিনা ঘিয়ে মালপো আকৃতি পিষ্টক হয়।

আগ তোলা—কোন খাদ্যসামগ্রী খাইবার পূর্ব্বে দেবতার জন্য উদ্দিষ্ট সামগ্রী অগ্রে তুলিয়া সরাইয়া রাখা।

আগালে—বাঁশের ডগ্‌লা অংশ।

আজনাই—আঞ্জনী চক্ষুরোগ।

আহিঙ্গে—ফাঃ আহঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য।

আটপলা—octagonal.

আটকাল—আন্দাজ; যথা প্রবচনে, তুমি যতই যাচ বাজ আমার হাতের আটকাল আছে।

আটল—মাছ ধরা বিত্তি বা ঘুণী।

আটলা—হাঁড়ি কলসী বসাইবার বিঁড়ে।

আড় করা—অন্তরাল করা।

আড় হওয়া—শয়ন করা।

আড় ভাঙা—অস্পষ্টতা দূর হওয়া; আলস্য ত্যাগ করা।

আড়ামোড়া ভাঙা—গা মুড়িয়া আলস্য ত্যাগ করা।

আড়কাটি—Pilot, যাহারা জাহাজের কাপ্তেন বা সারেংকে জল

চিনাইয়া লইয়া যায়। তাঁতির যন্ত্র যাহা দ্বারা সে পড়েন সূতা ঠিক করে।

আড়ং-ছাঁটা—যে চাল আড়ঙে বা চাল প্রস্তুতের স্থানেই ছাঁটা হইয়াছে; যাহা ঢেঁকিছাঁটা নহে।

আড়পাপড়া—ছোট খাটো লাঠি; খেটে।

আড়পার—ঠিক নদীর ওপারে। সালখিয়া কলিকাতার আঁড়পার।

আড়া আড়ি—বাদাবাদী, পরস্পরে বিবাদ; এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আড়ুলি, আড়ুরী—নদীর কাছাড়, অর্থাৎ যে পাড় ভাঙিতেছে সেই ভাঙা খাড়া পাড়।

আদার—সং শব্দ, না আরবী 'আদা' শব্দ? খুব সম্ভব আরবী শব্দ। তুলনীয় 'বিদায়' আরবী 'বিদা'। প্রাচীন সংস্কৃতে বিদায় আছে কি?

আণ্ডিল—(অণ্ডল? অণ্ড-ওয়ালা?) প্রায়ই টাকার আণ্ডিল—অতি ধনী।

আতেলা—তৈলহীন, অতৈল। যথা, আতেলা রান্না বা নাওয়া।

আধ আধ, আদ আদ—অর্দ্ধস্ফুট।

আধবয়সী, আধবুড়ো—যে সম্পূর্ণ বয়স পায় নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ বুড়ো নয়।

আদাড়িয়া, আদাড়ে—যে লোক আদাড় বা আঁদাড় ঘাঁটিয়া বেড়ায়, নোংরা, অপরিষ্কার, ম্লেচ্ছ।

আধাবিগড়া—আধা খেচড়া, অর্দ্ধেক সম্পন্ন ও অর্দ্ধেক নষ্ট।

আনারসী—আনারসের ন্যায় অম্লমধুর স্বাদযুক্ত।

আনী—এক আনা মূল্যের মুদ্রা।

আফা, আফানি—মাছ ধরিবার বাড়ের কাছে মাছের গাঁধি লাগিলে মাছ বাড় ডিঙাইবার জন্য লাফাইতে থাকে, সেই লম্ফ।

আবা—খেলায় থুড়ি, খেলা অল্পক্ষণ বন্ধ রাখিবার সন্ধি শব্দ, মুখে হাতের তালু ঠুকিয়া ঐরূপ শব্দ করে। আরবী ইবা—নিষেধ।

আবুআ—যাহার আব আছে।

আমান—Amen, আরবী শব্দ। সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে ব্যবহার আছে।

আমড়াগেছে (করা)—খোসামোদ করা। নিষ্ফল অর্থে ব্যবহার শুনি নাই।

আরবী—আরব সম্বন্ধীয়।

আরিশ—হারিশ, অর্শ।

আলুনী—লবণশূন্য।

আলগোছী (দেওয়া)—শিশুর প্রথম হাঁটিবার জন্য পা তুলিবার চেষ্টা। যথা, খোকা আলগোছী দিচ্ছে।

আজাড়—ফাঃ আজাদ (মুক্ত) হইতেও হইতে পারে।

আলতো আলতো—উপর উপর, তলার জিনিস না ঘাঁটিয়া বা ঘুলাইয়া উপরের জিনিস তুলিয়া লওয়া।

আমেজ—মিশ্রণ, মিশ্রিত।

আঞ্জুমন—সমিতি, সভা, দল, সমাজ। (ফারসী)

আপ্তগরজে—(সং + ফাঃ) স্বার্থপর।

আলেয়া—মাঠে বা জলায় বাষ্পসম্ভূত আলোক।

আস্কারা—ফাঃ প্রকাশিত অর্থেও বাংলায় ব্যবহার আছে। যথা, খুনের আস্কারা হয়েছে।

ইঁচলা—শব্দকোষে অর্থ দেওয়া হইয়াছে বড় চিংড়ি মাছ বিশেষ। রবিবারে মাছ খাওয়া নিষেধ; সেই নিষেধ অবহেলা করা হইল কিনা ইঁচলা খাইয়া। ইহা হইতে অর্থ মনে হয় ঘুসো চিংড়ি।

ইঙ্গবঙ্গ—যে বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজ সাজিয়া দেশে ফিরে।

ইঞ্জিল—মুসলমান শাস্ত্রে বাইবেলের নাম।

ইটা ভিটা—ভিটার ইট পর্য্যন্ত। যথা, ইটা ভিটা উজাড় করে তবে ছাড়ব।

ইকড়ি মিকড়ি, ইচকি মিচকি—বালকদের খেলা; দুই হাতের আঙুল উবুড় করিয়া পাতিয়া প্রত্যেক আঙুলের উপর চিমটি কাটিতে কাটিতে যে ছড়া বলিতে হয়—"ইচকি মিচকি" তাহার আদিতে আছে বলিয়া খেলারও ঐ নাম হইয়াছে।

ইউনানী—ফাঃ, Ionian, গ্রীসসম্পর্কীয়। হকিমী চিকিৎসা।

ইনকম ট্যাক্স—Income Tax.

ইস্পিরিট—Spirit.

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা—নানাবিধ কথা বলিয়া করুণ সুরে কাঁদা।

ইঁদুরজালি—যে ফলের কচি অবস্থাতেই ভিতরটা ঝুরঝুরে হইয়া যায়।

ইংলিশ—হরপের আকার-বোধক নাম; পাইকা অক্ষরের ঠিক বড় সাট।

ঈষ—তুলনীয় ফাঃ হীশ, লাঙ্গলের দণ্ড।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে—প্রবাদের মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। বলরাম ঠাকুর (মুখোপাধ্যায়) বংশীয় উদো ও বুধো নামক দুইজনের পিণ্ডের গোলমালে কি একটা বংশগত গোলমাল ঘটিয়াছিল। সমস্ত কাহিনীটা মনে পড়িতেছে না; কোনো কুলজী গ্রন্থও এখন কাছে নাই।

উদম, উদাম, উদলা—উলঙ্গ, নগ্ন, অনাবৃত, খাদুড়। "তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উদলা করে ফেলা।" (গোবিন্দচন্দ্র দাস)। লোকটা যেন উদম ষাঁড়—এখানে উদম উদ্দাম শব্দের অপভ্রংশ।

উরসুনি—বর্ষণ শব্দজ; বৃষ্টির পর চালের ছাঁইচ দিয়া যে আবিল জল পড়ে; তাহা হইতে রং-করা জল। যথা, দুধ ত নয় যেন উরসুনি জল।

উষ্ণা—সিদ্ধ চাউল, যাহা উষ্ণ করিয়া তৈয়ারী হয়।

উলসা—ধাতু, উল্লসিত হওয়া, আনন্দবিহ্বল হওয়া।

উঁকি (মারা), উঁকিঝুঁকি—গোপনে থাকিয়া চুরি করিয়া ঝুঁকিয়া দেখা।

উজবুক—আহাম্মক, নির্ব্বুদ্ধি, বোকা (উজবক জাতির ন্যায়)।

উথলা, ওথলা—মেঘ পরিষ্কার হইয়া যাওয়া, বাদলা কাটিয়া যাওয়া।

উড়ুখুড়ু—উড়ুক্কু, যে পাখীর ছানা অল্প অল্প উড়িতে পারিতেছে।

উবু চুড়ুচুড়ু, উভুচুভু—পরিপূর্ণ কোনো পাত্র এমন ভরা যে দ্রব্য পাত্রের কানা ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধ হইয়া উঠিয়া যত ধরে তত ধরিয়াছে।

উচাটন—উৎকণ্ঠিত; উন্মনস্ক। (সংস্কৃত উচ্চাটন)।

উরুলি ঝুলুরি—এমন ছেঁড়া (কাপড়) যে ঝালরের ন্যায় ফালি ফালি হইয়া গিয়াছে।

উড়ন্ত—যে জিনিস উড়িতেছে।

উপুড়হস্ত—দানের ভঙ্গী; যথা, লোকটা কখনো উপুড়হস্ত হয় না।

উস্কুরো—কোনো চাপ জিনিস শুকাইয়া ঝুরো হইয়া থাকিলে তাহাকে উস্কুরো বলে; প্রায়ই শুষ্ক বিষ্ঠার সম্পর্কে কথিত হয়।

উঠে পড়ে লাগা—শরীর পতন কিংবা স্বকার্য্য সাধন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্ম করা।

[illegible]

উঠবোস—উঠিয়া বসিয়া কসরৎ বা ব্যায়াম বা শাস্তি।
উণ্টাবাজি—ডিগবাজি।
উনকোটি চৌষট্টি—আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রীর খুঁটিনাটি বড় হইতে ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত। যথা, তোমার উনকোটি চৌষট্টি জোগাড় করে দেবো তবে তুমি রাঁধবে, এমনি ত তুমি রাঁধুনি।
উকুন-বাড়ি—(উৎকার) ধান মাড়িবার সময় শস্য হইতে খড় পৃথক করিয়া লইবার দণ্ড।
উগা—ধাতু, কোনো জিনিসের ঠেলিয়া উঠা।
উটকা—যাহা পরিচিত নহে; উচকা; যথা, একটা উটকা বিড়ালে সব দুধ খাইয়া গিয়াছে।
উকড়ি, উড়কি—উড়ি ধান; যথা, উড়কি ধানের মুড়কি দেবো পথে জল খেতে।
উতলা—তুলনীয় আরবী উতল—নিঃস্ব।
উড়া-বাও—অসংস্পর্শ-জনিত ব্যাধি বিশেষ।
উতর-ডাঙ্গা—গাছের চারের জায়গা।
উতর-খানা—সরাই।
উনানো—গলানো, দ্রব করা। উনা-ধাতু।
উনুই—উৎস।
উন্দধুন্দ—শশব্যস্ত।
উপর তলা—বাড়ীর উপরের তল।
উস্কা—উর্দ্ধে ফুঁড়িয়া তোলা; যথা, ফোড়ার মুখটা একটু উস্কে দাও না, পূয বেরিয়ে যাবে। তাহা হইতে উস্কা খুস্কা—যাহা শুষ্ক এবং উর্দ্ধমুখ।
উস্তং ফুস্তং, উস্তংখুস্তং—উদ্বাস্ত করিয়া তোলা, জ্বালাতন করিয়া তোলা।
এক-জিদ্দি—যে একই বিষয়ে জিদ ধরিয়া থাকে। (ফারসী)
একানে—যাহা একাকী পৃথক হইয়া আছে। ফাঃ এগুনা—এক।
এণ্ডু পিণ্ডু—নিম্নশ্রেণীর সঙ্কর ফিরিঙ্গি।
একেলা—একলা।
এক না এক—অনেকের মধ্যে অন্তত এক।
একনলা—যে ব্যাধ এক নল দিয়া পাখী শীকার করে; সাতনলা নহে।
একদৃষ্টে—দৃষ্টি এক দিকে স্থির নিবদ্ধ করিয়া।
এটর্ণি—Attorney, অপভ্রংশে টর্ণি।
এলাকাঁড়ি—আঁকড়ানো-এলানো; ঢিল দেওয়া; মনোযোগ না দেওয়া।
এড়াচে—যাহা এড়াইয়া বা আড় হইয়া পড়িয়া থাকে বা পালাইয়া থাকে।
এরারুট—Arrowroot,
এলবার্ট—এলবার্ট কর্তৃক প্রবর্ত্তিত টেড়ি।
এসেন্স—গন্ধসার।
এসেসার—Assessor.
এনভেলাপ—খাম।
এবড়ো খেবড়ো—আবুড়া খাবুড়া।
এক্যানড়িয়া, একানড়ো—যাহার একটা নড়ি বা লাঠি আছে; তাহা হইতে এক-ঠেঙ্গুয়া, এক-পেয়ে ভূত।
এঁষে ঘা—গবাদির ক্ষত।
এক আধ—অল্প স্বল্প।
একখান—এক খণ্ড।
এক-গাছ—এক খণ্ড দীর্ঘ জিনিস; এক বৃক্ষ ভরা। যথা, এক গাছ আখ; এক গাছ আম ধরে আছে।
এক গেঁয়ে—এক গ্রামের।
এক ছুট—এক বস্ত্র; এক দৌড়।
এক সঙ্গে—একত্র।
এস্তেজারী—আরবী, অপেক্ষা, আশা, অধীনতা।
এঙ্গা পেঙ্গা—(অঙ্গ+উপাঙ্গ) নানা প্রকার। এঙ্গা পেঙ্গা করা—আদর করা।
এড়া—বাসি, ছাড়া, আধোয়া; যথা এড়া কাপড়, এড়া মুখ।
এদিক ওদিক, এপাশ ওপাশ—একবার একদিকে আরবার অন্যদিকে।
এফোঁড় ওফোঁড়—কোনো বস্তু এপার ওপার বিদ্ধ (করা)।
এপার ওপার—একবার নদী প্রভৃতির এক পাড়ে আরবার অপর পাড়ে।
এমুড়া ওমুড়া একবার একদিককার শেষ এবং আরবার অপর দিককার শেষ।
ওর-ঘোর—শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা দেওয়া, আপাদ মস্তক মুড়ি দেওয়া; আবল্যের একশেষ; যথা, জ্বরে লোকটার ওরঘোর নেই।
ওড়া—কাদাগোবর-লেপা বেতের ঝুড়ি।
ওতে যাতে চলা—গুপ্ত থাকিয়া শীকারকে আঘাত করিবার চেষ্টায় চলা।
একদম—ফাঃ, এক নিশ্বাস, এক মুহূর্ত্ত; তাহা হইতে অর্থ, কিছু, অল্প। যথা, তোমার কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না।
এক রা—এক কথা, এক রব। যথা, সব শিয়ালের এক রা।
একসা—ফাঃ একসা—সমান, একাকার; ফাঃ একসু—এক দিকে।
একলা—তুলনীয় ফাঃ একলু—একক, একমাত্র।
এক কলম—ফারসী ও আরবী, এক সঙ্গে, একলাগাড়ে। যথা, লোকটা এক কলমে বিশ বৎসর ঐ আপিসে চাকরী করলে, আজ কিনা তার জবাব হল।
একায়েক—ফাঃ, একে একে, অকস্মাৎ, বরাবর। যথা, আমি বাড়ী থেকে একায়েক তোমার কাছে আসছি।
এক্কা—ফাঃ এক্কা=এক; এক ঘোড়ার গাড়ী।
ও—সমুচ্চয় অর্থের 'ও' ফার্সী শব্দ। নারীর স্বামীর উল্লেখে।
ওসার—আরবী ওসী'—বিস্তীর্ণ।
ওয়েষ্টকোট—Waistcoat.
ওয়াচ—টেঁক ঘড়ী।
ওয়াক—বমির শব্দ।
ওপর—উপর।
ওথলা—উথলা, বাদল অপগম।
ওলট পালট উলট পালট।
ওদো—এক প্রকার ধান ও তাহার চাল।
ওসান—ঢেঁকিতে ধান ভানিবার সময় ধান নাড়িয়া দেওয়া।
ওলী—আরবী, বন্ধু, প্রায়ই ওলী অল্পি যুগ্ম ব্যবহার হয়; সাধু পুরুষ।
ওস—প্রাকৃত অবস্থায় শব্দজ; হিম, শিশির।
কচ—বক্রতা, ফার্সী কজ্; প্রায়ই ঘর বাড়ীর বক্রতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। কপাট চৌকাঠ প্রভৃতির বক্রতাকে বলে কানিট। অন্যান্য দ্রব্যের বক্রতা—আড়মাদলা, ক্যারাচে, তেরছা।
কঞ্চি—ফার্সী কম্চী—চাবুক; তাহা হইতে বাঁশের সরু ডাল, যাহা পাড়াগাঁয়ে ঘোড়ার চাবুক রূপে ব্যবহৃত হয়।
কিটকিট—অতি মিষ্ট স্বাদ; মিষ্টিতে গলা কিটকিট করে।
কুনকুন—অতি তীক্ষ্ণ অথচ অপ্রবল বেদনার অনুভূতি। এইরূপ

কনকন, দপদপ, টনটন, কটাস কটাস, চিনচিন, চনচন, ঝনঝন, দপাস্ দপাস, প্রভৃতি বহু বেদনা-বোধক শব্দে অনুভূতির সূক্ষ্ম তারতম্য প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহা বাংলা ভাষার একটি লক্ষ্য করিবার বিশেষত্ব।

কটকী—কটক নগর সম্বন্ধীয়; যথা, কটকী জুতা।

কটকী বাড়ী—যে বাড়ীতে কটক বা বহু লোক থাকে, অতিথিশালা।

কটকটিয়া, কটকটো—ব্যাং বিশেষ।

কড়মা—কদমা বা কর্দ্দম শব্দের রূপান্তর; দইকড়মা ফলার, সহচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কং—কলমের মোচ বা কচ। খুব সম্ভব ফারসী কজ্ শব্দ; মানে বাঁকা।

কত্তা—দোকানী পসারীকে সম্বোধনের শব্দ।

কপাট আওজানো বা আবজানো—শব্দকোষের মানে 'ঈষৎ মুক্ত করা' ঠিক নহে। ভেজাইয়া দেওয়া, দুই বাইল কপাট ভিড়াইয়া বন্ধ করা কিন্তু খিল না লাগানো।

কপাল ঠোকা—কপালে যা আছে হইবে মনে করিয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া গোঁ-ভরে কোনো কাজে লাগিয়া যাওয়া, to take a chance; যথা, কপাল ঠুকে করে ত ফেলি তারপর যা হয় হবে।

কফ—জামার হাতার শক্ত সম্মুখভাগ, ইংরেজি cuff, না আরবী কফ্ হইতে; আরবী শব্দটির অর্থ হাত, হাতের চেটো বা তেলো। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে যদি এই শব্দ ভাষায় আসিয়া থাকে তবে আরবী হইতেই আসিয়াছে।

কলি চুন—আরবী Alkali শব্দের কলি হইতে হইয়াছে। কলি মানেই Alkali.

কোহিনূর—ফারসী প্রসিদ্ধ হীরক।

কষি—কাঁচা কমপোক্ত আমের আঁঠি।

কাগজ—এই শব্দের প্রসঙ্গে বাংলা পুস্তকে ব্যবহৃত সর্ব্ব প্রকার কাগজের আড়ার নাম ও মাপ দেওয়া উচিত ছিল; ক্রাউন, রয়াল, সুপার রয়াল; ও তাহাদের সকলের ডবল। কাগজী—কাগজ সম্বন্ধীয়, যাহারা কাগজ তৈয়ারী বা বিক্রয় করে। কাগজী বাদাম—যাহার খোসা কাগজের ন্যায় পাতলা।

কাচ—ছল (বিশেষ্য ও ক্রিয়া); ছদ্মবেশ।

কাচপোকায় তেলাপোকা ধরা—(ন্যায়ে) ছোটর দ্বারা বৃহতের পরাভূত বা অভিভূত হওয়া; কাঁচপোকা তেলাপোকার চোখ কাণা করিয়া দিয়া শুঁয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যায় এবং নিজের বাসার মধ্যে পুরিয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে; সেই ডিমের ছানা বাহির হইয়া আরসুলা খাইয়া বড় হয় এবং বাহির হইয়া আসে। লোকে মনে করে কাণা আরসুলা একমনে কাঁচপোকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে একমনে ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্তি (ন্যায়)।

কাছ—কুঁচকি; লেঙ্গট।

কেটকেটে—যে কড়াকড়া জবাব মুখের উপর শুনাইয়া দেয়।

কাণ্ডজ্ঞান—মানে, সাংসারিক ব্যাপার-জ্ঞান, না ক্রিয়াকাণ্ডের জ্ঞান? যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডে কোন্ যজ্ঞ কি দ্রব্য দিয়া কি প্রণালীতে করিতে হয় তাহার জ্ঞান।

কাপা—মালদহের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা দুই খানা ছোট ছোট কাপড় পরিত, একখানা কটিবস্ত্র, একখানা উত্তরীয়। উত্তরীয়ের নাম কাঁপা; পরিধেয় বস্ত্রের নাম পোঁথা। কুচবিহারের কোচেরাও বোধহয় এইরূপ পরে ও বলে।

কাবার—ফারসী শব্দ।

কাঁসী—কাঁসার কানা-উঁচু চিটকে পাত্র। কাঁসার নির্ম্মিত বলিয়া কাঁসী, না আরবী কাসী (কটোরা, বাটি) শব্দ?

কুড়ুল—মালদহের জাতি বিশেষ, যাহাদের কুড়াল দিয়া কাঠ কাটা ব্যবসা; কুঠারকর্ম্মী।

কুচা, কাচ্চা—বোধ হয় ফারসী কুচক্ (ছোট) শব্দের অপভ্রংশ।

কুলা—সং কুলা, ফারসী কুলাহ্—টুপী, টুপীর আকারের সূর্প।

কোলা—আরবী কলা—বেঙ্। যশোর জেলায়, কোলা—পেট-মোটা জালা।

কোদা—কোনো কোনো জেলায় খোকাকে কোকন (রাজসাহী) ও কোদা (যশোহর) বলে। ফার্সী কুদক্—বালক। স্ত্রীলিঙ্গে কুকী, কুদী।

কুলি ঘর ছাইবার পূর্ব্বে খড়ের আঁটি খুলিয়া খুলিয়া মিশ্রিত করাকে খড় গলদানো বলে; ইহাতে খড়ের গোড়া ও ডগা উল্টা-পাল্টা মিশ্রিত হইয়া সমস্ত গোড়া বা ডগা একই দিকে থাকিতে পায় না। তাহার পর আঁটি বাঁধাকে খড় কুলি করা বলে।

কুলী—যাবনিক শব্দ, অর্থ শ্রেষ্ঠ, যথা হোসেন কুলী খাঁ, মুর্শীদ কুলী খাঁ। আমাদের প্রাচ্য দেশে Dignity of Labour বুঝাইবার জন্য যে যত ছোট কাজ করে তাহার নাম তত উচ্চ, যথা—মেহতর—শ্রেষ্ঠতর, প্রধান, রাজা!

কেব্‌লা—আরবী, Cynosure, পিতৃতুল্য মান্য। তুলনীয়—কেবলা হাকিম (দীনবন্ধু); কিন্তু এই শব্দ বাংলায় বিদ্রূপাত্মক হইয়া হাবলা (বোকা) শব্দের প্রায় তুল্যার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কোক—Coke, পোড়া কয়লা।

কোনাচ—পিতলের বা লোহার V আকৃতির right angular পদার্থ, যাহা বাক্স পেঁটরার কোণে বসাইয়া কোণগুলিকে মজবুৎ করা হয়।

কঁইলা—কপিলা, না কোমলা? কচি বাছুরকে কঁইলা বাছুর বলে, তা সে স্ত্রী বা পুং যাহাই হোক।

কানট—(ছুতারের পারিভাষিক শব্দ) দরজা জানলার ফ্রেম ঠিক rectangular না হইলে যে কোণ acute angle হয়, তাহাকে কানট (কানের ন্যায় সরু) বলে; right angle করিয়া ঠিক করাকে কানট মারা বা কানট ভাঙা বলে।

কড়ার কাঠি—শাঁখ ঘষার যন্ত্র।

কড়ুয়া—(হিন্দী) কড়া, ঝাঁঝালো; যথা কড়ুয়া তেল—সরিষার তেল।

কলসা—মাছের কানকুয়া।

কাটালকুশী—মাছ।

কাঁথি—নদীর উচ্চ পাড়। শব্দকোষে কাঁথ দেখুন।

কাঁদাড়ি—চালের ছাঁচের তলে তলে জল যাইবার পথ।

কাঁধালি বাড়ি, কাঁধ নড়ি—কাঁধে বহিয়া লইতে হয় এমন বড় লাঠি।

কাঁধা—নদীর কিনার।

কাঁধাড়ি—পাহাড়ের চূড়া।

কাঁধ ছাড়ানো—পাল্কীবাহকের বাথিত কাঁধকে বিশ্রাম দিয়া সুস্থ করিয়া লওয়া।

কাটকুয়া—(কাষ্ঠ-কূপ) নৌকার জল সেঁচিবার সেউনী।

কাটাই, কাটানি—কাটনা কাটার মজুরী; কাটনা দ্বারা উপার্জ্জিত ধন।
কাঠগোলা—কাঠের আড়ত।
কানখড়কে—যে অল্প শব্দও শুনিতে পায়।
কানপাটা, কানের পাতা,—কর্ণেন্দ্রিয়ের বহিরবয়ব, বা কানের নীচের মুড়মুড়ি।
কান মোচড়া—কান মলা।
কানাড়ি পাতা—আড়ি পাতা, লুকাইয়া দেখা ও শোনা।
কানের খৈল—কানের ময়লা।
কান মাগুর—মাছ।
কাতলা পড়া—শীকার পড়া। ডাকাতের সঙ্কেত শব্দ।
কাদা—ধাতু, কাদা করা; ক্ষেতে বীজ বপনের জন্য কাদা করা। বধূর দ্বিতীয় সংস্কারের সময় কদর্য্য অশ্লীল উৎসব, অধুনা প্রায় লুপ্ত।
কামড়ান্তে, কামড়-কাটা—যে জন্তুর কামড়ানো রোগ আছে।
কামড়ানি—কামড়ের ভাব; যথা, পেট কামড়ানি।
কালকিষ্টি, কালিকিষ্টি—কালো+কৃষ্ণ, অতি কালো।
কালচে—ঈষৎ কালো।
কেলে—(বিশেষ্য) কাল'র অনাদরের ডাক। (বিশেষণ) কৃষ্ণবর্ণ; যথা, কেলে জিরে, কেলে কুকুর।
কিচড়—(কচ্ছর) পাঁক, কাদা।
কিষতে—কেমন করিয়া।
কিলদাগড়া—কিল খাইয়া খাইয়া যাহার গা দাগড়া দাগড়া হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে, কিল-proof, হিজল-দাগড়া।
কুজড়া—তরকারী বিক্রেতা, ফড়িয়া।
কুজড়া-পনা, কুজড়ামি—ফড়িয়াগিরি, অর্থাৎ ফড়িয়ারা wholesale দামে জিনিস লইবার সময় যে রকম বাক্যজাল বিস্তার করিয়া চাষার নিকট হইতে ভুলাইয়া অল্প দামে বেশী জিনিস লয়; বাচালতা।
কুড়কুড়, কুড়মুড়—কড়মড় শব্দের ন্যূনতাবাচক; ঈষৎ শক্ত জিনিস চর্ব্বণ বা ভঙ্গ করিবার শব্দ।
কুচুর মুচুর, কুচমুচ, কচমচ, মচমচ—পাতলা কড়া জিনিস চর্ব্বণের শব্দ। "চাল ভাজা কুড়মুড় করে; বড়ী ভাজা কুড় কুড় করে; কাঁচা লঙ্কা কচমচ বা কচকচ করিয়া চিবায়; পাঁপর ভাজা কুচুর বা কুচমুচ করিয়া খায়।
কুঁদবাটালি—ভ্রমিযন্ত্রে খরাদ করিবার বাটালি।
কুঁচুই কাঁচা—কণ্টক-লতা, অনেকটা বাবলা পাতার মতো পাতা গাছ ঝোপ পারা হয়।
কুকুর-মাছি—যে মাছি কুকুরের গায়ে থাকিয়া কুকুরকে কামড়াইয়া জ্বালাতন করে।
কূটকচালে—যে কাজ সম্পন্ন করিতে ভজকট; জটিল। যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কুচক্র আছে, কুটিল, কুচুটে (কুচক্রী)।
কুটিকুটি—অতি ক্ষুদ্র অংশে ছিন্ন বা কর্ত্তিত।
কুড়—শেষ, ওর। আঃ, কুল—সমস্ত। উরকুড় হয়ে যাবে—সমস্ত ওর (শেষ) হইয়া যাইবে, বা সমস্ত উড়িয়া যাইবে। উরকুড় যুগ্ম শব্দ।
কুমড়াবড়ি—যে বড়িতে কুমড়া-কোরা দেওয়া হয়।
কুমড়াসুক্তনি—যে সুক্তাতে কুমড়া দেওয়া হয়।
কুলুপকাঠি—চাবিকাঠি।
কুনী—নখের কোণ বসিয়া গিয়া আঙুলের ক্ষত।
কাছিম-পিঠে—কূর্ম্মপৃষ্ঠ, Convex.
কাইবীচী—যে বীজ দিয়া কাই তৈয়ারী হয়, তেঁতুলের বীজ।
কলতানি—কোনো জিনিস-ধোয়া আঠালো জলস্রাব। (শব্দকোষে কতলা ধাতু দ্রষ্টব্য)।
কেদুয়ানি—কোনো জিনিস-ধোয়া কর্দ্দমাক্ত জলস্রাব।
কোঁকড়-সোঁকড়, কোঁকড়া-সোঁকড়া } —কুঞ্চিত জড়সড় হইয়া থাকা।
কুঁকুড়ি-মুঁকুড়ি
যথা, শীতেনাহং কুঁকুড়ি-মুঁকুড়ি মাঘ-মাসস্য রাত্রৌ। (উদ্ভট)
কুপকাপ—ক্রমাগত তাড়াতাড়ি অনায়াসে গিলিবার শব্দ।
কুমারিয়া পোকা } —যে পোকা মুখে করিয়া কাদা বহিয়া আনিয়া ঘর করে, এবং তাহার মধ্যে খাদ্য-কীট সংগ্রহ করিয়া নিজেকে অবরুদ্ধ করে এবং সেই সংরুদ্ধ অবস্থায় ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়; ডিম হইতে ছানা বাহির হইয়া সংগৃহীত কীট খাইয়া বড় হইলে ঘর কাটিয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। কুম্ভকারের ন্যায় মাটি দিয়া গড়ে বলিয়া ঐ নাম।
কুমীরে পোকা
কোপাকুপি—পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করা।
কেঁউ কেঁউ—কুকুরের পরাজয় শীকারের কাতরোক্তি; যথা, সকলের বেলা ভ্যা ভ্যা, আর আমার বেলা কেঁউ কেঁউ (এক মাতাল ছাগ ভ্রমে কুকুর বলি দিতে গিয়া বলিয়াছিল)।
কোলাৎ—তাল-বালদো-ছেঁড়া দড়ির ন্যায় দীর্ঘ সরু অংশ।
ক্রুশ—Cross, ঢেরা।
কুচুটিয়া, কুচুট্যে—কুচক্রী, কুটিল।
কাঁহাতক—(হিন্দী) কোন্ পর্য্যন্ত।
কহতব্য—কথনীয়।
কচলান্ত—প্যাঁচাল পাড়া।
কাঁদকঁদ—প্রায় কান্নার জোগাড়।
কপাৎ—বড় জিনিস হঠাৎ গিলিয়া ফেলার শব্দ।
কাছাকাছি—দুই বস্তুর পরস্পরের নিকটে সংস্থান।
কোন্তা—ঝাঁটা, ঝাড়ন।
কোন্তাকুস্তি—পরস্পরে ধ্বস্তাধ্বস্তি (শব্দকোষে কস্তাকস্তি)।
কনসার্ট—Concert, ঐকতান বাদ্য।
ক্রিকেট—খেলা।
কেরা—তালিকার কোনো কথা বা বাব বাদ যাইয়া যাওয়ার চিহ্ন তির্য্যক্ রেখা।
কোরস—Chorus, সাধারণী বাক্।
কেদাত্ত—কৃতার্থ।
কেউ-কেটা—সামান্য।
কারপর্দাজ—(ফাঃ) কর্ম্মচারী।
কোলকুঁজো—যে কোলের দিকে অবনত।
কুনুই—কাঁকর।
করণা করা—সেবা করা।
কল্লা করা—(কল্লা ফারসী শব্দ) মুখ করা, বচসা করা; তাহা হইতে অর্থ হইয়াছে, ছলনা করা, ছেনালি করা। আঃ, কল্লাশ ধূর্ত্ত, শঠ।
ক্যারাচে—তেরছা, তির্য্যক্, কোণাকুণি।
কপ্‌নি—কৌপীন।
কজাই—ঘোড়ার লাগামের কড়িয়ালি। (ফারসী)
কাতারি—অগভীর হাঁড়ি; প্রায়ই দই ক্ষীরের হাঁড়ি।
কাকনিদ্রা—অল্পনিদ্রা, কপটনিদ্রা।
কাটছাঁট—জামার কাপড়ের কাটা ও ছাঁটা।

কুঞ্জদার—গুল্ তোলা ফুলকাটা কল্কা দেওয়া (শাড়ী), ফারসী কুঞ্জ্ (কোণ) দার (থাকা), কোণে আঁচলায় কাজ-করা কাপড়।

কসর্ৎ, কস্রৎ—আঃ কিসুম,—প্রকার, রকম।

কষা—আঁট, খাটো। যথা, কষা জুতা জামা। আরবী কসীর্—খাটো, ছোট।

কাজিয়া—আঃ, ঝগড়া, মামলা, মোকদ্দমা।

কিমা—ফাঃ, থ্যাৎলা মাংস, থোড়া মাংস।

কাহিনী—আঃ, কাহিন—দৈবজ্ঞ; কাহিনী—দৈবজ্ঞের কথা, প্রায়ই কল্পিত মিথ্যা বলিয়া শেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে গল্প।

কেতাবতী, কিতাবতী—কেতাব সম্বন্ধীয়। যথা, কেতাবতী ভাষা, কেতাবতী লোক (বিজ্ঞলোক)।

কুরুস—Crochet; হুক-ওয়ালা কাঠি দিয়া পশমে বোনা বস্ত্রাদি।

কটকিনা—ফাঃ কৎকিনা=খামারের একাংশ ভাড়া দেওয়া, তাহা হইতে অর্থ কার্পণ্য; কষাকষি, অতি সাবধানতা, কষ্টকর নিয়ম পালন।

কসবী—আঃ কসব্—ব্যবসা, কসবী=পেশাকর।

কফিন—আঃ কফ্ন্, ইং Coffin,—শবাধার।

কুঁজা—ফাঃ কুজা—কুঁজ।

কাচুমাচু—অপ্রতিভ ভাব। মুখ কাচুমাচু করে।

কশাড়—মোটা কাশ জাতীয় তৃণ; উহার দণ্ডে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় মিষ্ট-রস থাকে।

কষাকষি—পরস্পরে কষা।

কিলাকিলি—পরস্পরে কিল মারা।

কাচি কাপড়—মোটা সূতার ঘন বুনন গপ্‌স কাপড়।

কাচামিঠা—(আম) যাহা কাচাতেও মিষ্ট লাগে।

কাগাবগা | কাগের ছা বগের ছা —এক স্থানে কালো এক স্থানে শাদা; যথা, কাগাবগা করিয়া চুল কাটা, অর্থাৎ কোথাও চুল বড় আছে (কাগা) এবং কোথাও চুল এত ছোট কাটা হইয়াছে যে, মাথার শাদা চামড়া (বগা) দেখা যাইতেছে। কোনোটা এক আকারের কোনোটা অন্য আকারের; কাগের ছা বগের ছা লেখা (খারাপ লেখা)।

ক্ষেতি—ক্ষেতের কাজ; চাষ আবাদ।

ক্ষেতখোলা—ক্ষেত ইত্যাদি।

ক্ষেতার—চাষ আবাদ তদারক।

ক্ষীরমোহন—ক্ষীরের পুর দেওয়া রসগোল্লা।

খচখচ—পায়ে কাটা খচখচ করে; তাহার অর্থ কি?

খটমট—ক্রুদ্ধ চাহনির ভাব; খটমট করিয়া তাকায়।

খদ্‌খদ—ঈষৎ তরল পদার্থের ফুটিবার বা মাতিয়া উঠার ভাব (শব্দকোষের অর্থ 'খাও খাও ধ্বনি' সব জায়গায় খাটে না); যথা, চোখে পিঁচুটি খদখদ করছে; পথে কাদা খদখদ করছে।

খইন, খয়েন, খোয়াই—খদ, গর্ত, গভীর।

খাওয়া দাওয়া—পূর্ববঙ্গে খাওয়া লওয়া।

খাঁচা—বোধ হয় আরবী কফস্ (খাঁচা) শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী খপঞ্চী আরবী শব্দের খুব নিকট।

খাজা—বোকা, নির্বোধ, নীরস; যথা, খাজা গুণ্ডা, লোকটা কী খাজা। ফাঃ খ্বাজা শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; প্রায়ই ধনী ব্যক্তিই সম্ভ্রান্ত হয়, এইজন্য দ্বিতীয় অর্থ ধনী; ধনীরা প্রায়ই মূর্খ, নির্বোধ, নীরস হয়, তাহা হইতে বর্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে বোধ হয়।

খাঞ্চাপোষ—খাঞ্চা ঢাকা দিবার বস্ত্র। (ফারসী)

খড়িকা—তুলনীয় ফারসী খিলাল।

খুনসুটি | খুনসুঁড় —তাক্তবিরক্ত করা; প্রায়শ শিশুর সহিতই খুনসুটি করা হয়।

খেই—সূত্রের গুটিকার শেষ বা আরম্ভ-প্রান্ত।

খোল—ওয়াড়; বালিশের লেপের খোল।

খুচুৎ—অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সহজে কিছু কাটার শব্দ।

খুচুর খুচুর—খুচরা খুচরা, অল্প অল্প; ছোট জিনিসের নড়ার শব্দ।

খুপরী, খুবরী—ছোট ছোট ঘর; ছাদের আলিসায় খুবরী কাটা থাকে।

খেশ্‌টা-মারা—অসুন্দর, বিশ্রী। (মালদহে)

খরজালি—রৌদ্র-তাপে জ্বাল দিয়া জল শুকাইয়া যে নুন পাওয়া যায়।

খড়মপায়া—যে লোকের পা খড়মের মতন আগে পিছে মাত্র ভূমি স্পর্শ করে, কিন্তু মধ্যদেশ ভূমি হইতে উর্দ্ধে থাকে। অলক্ষণিয়া।

খড়া—ইটের দেয়ালের ইট গাঁথার দুই ইটের মধ্যে যে ফাঁক খাঁজ বা দাগ থাকে। ডাকাতেরা খড়া বাহিয়া বাড়ীর প্রাচীর ডিঙাইত। খড়া-কাটা—দাগ কাটা।

খড়া দেওয়া—খড় খড় করিয়া সঙ্কেত করা যেমন করিয়া মাছ ঘুনিতে পড়িলে শব্দ করিয়া জানায় যে মাছ পড়িয়াছে। ডাকাইতি সঙ্কেত—খবর পাওয়া।

খড়িকামুঠি—এক মুষ্টি খড়িকার ন্যায় যাহার গায়ে ডুরে আঁজি থাকে; খড়িকামুঠি মাছ ও কাপড় আছে।

খড়ী—জ্বালানি কাঠ।

খড়ুর—শুঁদি নারিকেল; কাঁচা বেলায় পাড়িয়া শুকাইলে জল শুকাইয়া শাঁস মালা হইতে আপনি ছাড়িয়া একটি গোলার মতো হইয়া থাকে।

খ'তো-মারা—ক্ষতপ্রাপ্ত হওয়া বা যাহা ক্ষতদুষ্ট হইয়াছে।

খতো—চক্ষুরোগ। চোখের পাতা খাইয়া যায় ও পিঁচুটি পড়ে।

খিমচি—চিমটি।

খয়রা—যে মেয়ে বাচাল ও চকিল।

খরসা, খরসা-মুখো—যে লোক কটুভাষী। সূতা পাকাইবার সময় টাকু যে ঝিনুকখোলার উপর রাখিয়া ঘুরানো হয় তাহাকেও খরসা বলে।

খোকসা—ডুমুর।

খাকড়ি—কোনো জিনিস রন্ধনের পর পাত্রে যে অংশ অতি তাপে অঙ্গারবৎ হইয়া লাগিয়া থাকে; যথা ঘিয়ের খাকড়ি।

খাকড়া—খাতু, কোনো জিনিসের গায়ে কোনো কিছু লাগিয়া থাকিলে চাঁছিয়া চাঁছিয়া তোলা। দুধের কড়াই খাকড়াইলে চাঁছি, ও ঘি জ্বাল দিয়া কড়াই খাকড়াইলে খাকড়ি পাওয়া যায়। অনুনাসিক উচ্চারিতও হয়।

খাকসীপেটা—গরম ও শ্রমে ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা। এখানে পেটা মানে বোধ হয় ঠোকা (যেমন হাতুড়ী পেটা), কিন্তু খাকসী কি?

খাকুই—তুলার বীচি ছাড়াইবার যন্ত্র। কাঁকই (কঙ্কতিকা) শব্দজ বোধ হয়।

খাটো করা—অপদস্থ করা।

খাটো হওয়া—অপদস্থ হওয়া।

খাটোদৃষ্টি—short sight বা short sighted; খাটোদরশন (রজনী সেন)।

খাটুলি—ছোট খাটিয়া।

খাড়া—সরল, upright, straightforward; খাড়া লোক।

খাড়াখাড়া, খাড়াকখাড়া—অতি শীঘ্র; কোথাও গিয়া না বসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাজ সারিয়া ফেরা।
খাড়া হুণ্ডি—যেহুণ্ডি দেখানো মাত্র টাকা শোধ দিতে হয়।
খাত্তাই—(ফার্সী খতা-দোষ) দোষী, অপ্রতিভ।
খামরই—যে খামার রাখে।
খিটকাল—গোলমাল, গণ্ডগোল, কেলেঙ্কার, নোংরা, অপরিষ্কার। মালদহে খিচাটো।
খালুই—বাখারী শলায় তৈয়ারী মাছ-রাখিবার সরুমুখ মোটাপেট ঝুড়ি।
খুঁচি—পুরাণো খ'ড়ো চালের খড় উঁচাইয়া নূতন করিয়া না ছাইয়া নূতন খড়ের গুঁজি দেওয়া।
খুঁটরা—ধাতু, খোঁটা, গভীর জিনিসের মধ্য হইতে সরু কিছুর সাহায্যে খুঁটিয়া কিছু বাহির করা।
খুঁটনি, খুঁচনা—যে কাঠি দ্বারা খুঁটা যায়।
খোন্দল—খোন্দার আকার, খোঁদল।
খেটে—ছোট মোটা লাঠি।
খোআর—(ফারসী) দুর্দ্দশা। শতেকখোয়ারী গালি।
খোশখৎ—যাহার হাতের লেখা ভালো (ফারসী)।
খাম—দোষ-গ্রস্ত। জিনিস খাম হয়।
খাম্বা—স্তম্ভ।
খেনখেন—ঘেনঘেন; ভাঙা কাঁসার বাদ্যশব্দ।
খাজরি—ইট না পাতিয়া খাড়া ভাবে শোয়াইয়া গাঁথা; ইহাতে গাঁথনি মজবুত হয়।
খুবি—ছোট ছোট গর্ত্ত (করিয়া শস্যের বীজ বপন)।
খেঁড়ো—তরমুজ জাতীয় ফল, রাঢ়ের প্রসিদ্ধ তরকারী।
খর্শামুখো-(খরশাণ-মুখো)—কটুভাষী।
খ্রীঃ অঃ, খৃঃ অঃ—খ্রীষ্টাব্দ শব্দের সংক্ষেপ লিখন।
খালাসী—যাহারা জাহাজ খালাস করে; আমাদের দেশে মুসলমান মাল্লারা এই কাজ করে বলিয়া মুসলমান নাবিক।
খিজালৎ, খেজালৎ—আঃ, গণ্ডগোল, বিরক্তিকর অবস্থা।
খিজলা—(ধাতু)—যথা, মনটা ভারী খিজলে আছে। আরবী, দুর্ব্বল হওয়া; তাহা হইতে, বিরক্ত হওয়া।
খুনখারাপি, খুন-খা'রী (খুন-খোয়ারী)—রক্তপাত ও বিনাশ হওয়া।
খরাদ—আঃ, ভ্রমীযন্ত্র, কুঁদ। খরাদী—যে খরাদ করে।
খড়ম—ফারসী খরম শব্দের অর্থ গমন-সৌষ্ঠব (graceful in walking), খড়ম পরিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতে হয় বলিয়া খড়মের নাম হইয়াছে (?)।
খিরখিচ—ফাঃ খরখিষা—গণ্ডগোল, হাঙ্গাম, মারামারি।
খঞ্জনী—ফাঃ খঞ্জরী।
খন্দ—আঃ, খন্দক্—গর্ত্ত।
খুরী—ফাঃ কুরী—চায়ের পেয়ালা। সুতরাং খোরার ক্ষুদ্রতাবাচক শব্দ না হইয়া কুরী শব্দও হইতে পারে।
খুর্সী পিঁড়ি—কুর্সীর ন্যায় উঁচু খুরা-ওয়ালা পিঁড়ি।
খাজ, খাজা—মেসো, মাসি। (মুসলমানী ভাষায়)
খুবলা (ধাতু)—খাবলা ধাতুর অল্পতা-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বড় জিনিসে খাবলায়, সরু জিনিসে খুবলায়।
গাদ (ধাতু)—ফারসী গায়দন্ হইতে গাদন হয় নাই ত?
গরান—ফাঃ, ভারী; যে কাঠ ভারী সেই কাঠ?
গড়া (ধাতু)—ফারসী গরা—প্রবণতা।
গাজর—ফারসী।
গিলা—ফাঃ গিল—কর্দ্দম। কর্দ্দমবৎ আ-তরল।
গু—ফারসী গু—বিষ্ঠা।
গৌড়—বঙ্গদেশের নাম। ব্যুৎপত্তি কি? আরবী গৌর—নাবাল ভূমি। কোন সম্পর্ক আছে কি?
গম—ফাঃ গুন্দম্—সং গোধূম।
গোঙা, গোঁগা—ফাঃ, গুঙ্—বোবা।
গঙ্গাজলী—শাড়ী, যে শাড়ীতে শাদা ডুরে গঙ্গার ঢেউয়ের মতন থাকে।
গপ্‌স—মোটা খাপী। ঢাকার তাঁতিরা খুব ব্যবহার করে। যাবনিক শব্দ বোধ হয়। কিন্তু শব্দটি কি?
গদাই-লস্কর—ভিক্ষুকের দল; তাহাদের উদ্দেশ্যহীন জীবনে কোনো তাড়া থাকে না, এজন্য মন্থরগামী। লস্কর মানে দল, সৈন্যদল, লোকলস্কর শব্দেও পাই। গদাধর লস্করের সহিত কোনো সম্পর্ক নাই।
গজা—আরবী খিজা—খাদ্য।
গজাল—যে গোঁজের উপরে আল বা মাথা থাকে।
গেঁতো—অলস, দীর্ঘসূত্রী, (শব্দকোষে গতুয়া, কলিকাতার আশে পাশে গেঁতো বলে)।
গন্ধমাদন আনা—হনুমান বলিয়া ইঙ্গিতে গালি।
গম্ভীরা—মালদহের প্রসিদ্ধ নৃত্যগীতোৎসব। শিব ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে গাজনের সময়ে হয়।
গলাবন্দ—শব্দের সমস্তটাই ফার্সী, গলুবন্দ শব্দ একটুখানি সংস্কৃত রূপ ধরিয়া ছদ্মবেশে চলিতেছে, গলা এবং বন্ধ নহে। গলুই শব্দও ফারসী গলু হইতে হইয়াছে। শব্দকোষের গলুই ঠিক নহে।
গাবা—ধাতু, গর্ভ হওয়া; প্রায়ই গোরু গাবায়।
গাহক—গ্রাহক।
গুজিয়া—ছোট ছোট ক্ষীর-শলাকা পাকাইয়া গোল-করা সন্দেশ।
গুমসা (মুখ)—যে মুখ হইতে কথা বাহির হয় না।
গির্দে—(ফার্সী) গোল বালিশ, তাকিয়া।
গিমলেট—Gimlet.
গাঁধি লাগা—(বোধ হয় গাদী লাগা) এক স্থানে অনেক জিনিস (প্রায়ই মাছ) জড়ো হওয়া। চারের গন্ধাকৃষ্ট হইয়া একত্র জমা।
গার্ড—Guard, যে রেলগাড়ী চলিবার সময় তত্ত্বাবধান করে।
গার্জেন—Guardian, অভিভাবক।
গোটা—সুক্তা রাঁধিবার ভাজা মসলার গুঁড়া।
গুলা—বহুবচনের প্রত্যয়; শব্দকোষে ইহার উল্লেখ মাত্র আছে গুলি গুলিন, গুলান শব্দে; কিন্তু আসল শব্দটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।
গা ভারি—গর্ভ হওয়া; অসুস্থ বোধ করা।
গা ভারা—শরীর স্ফূর্ত্তিহীন বোধ করা।
গায়ে থাকা—জমা থাকা, কথা বা ব্যবহার বা ঋণ তোলা থাকা।
গা শোঁকাশুঁকি—কুকুরেরা অপরিচিত কুকুর দেখিলেই ঝগড়া করে, আপোষ হইলে পরস্পরের গা শোঁকে। তাহা হইতে অর্থ, ভাব করা, to come to an understanding.
গাছে তুলিয়া মই কাড়া—কোনো কাজে কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাকে আর সাহায্য না করা।
গুটালো—যাহাতে গুটাইয়া থাকার ভাব আছে; যথা, গুটালো মতন মুখ।

গাবল—বড় গ্রাস ; খাবল। যথা, এক গাবলে দুটা সন্দেশ খাইয়া ফেলিল।

গড়ন-পিটন—make and shape, make and finish.

গোসলখানা, গুসলখানা—আরবী, স্নানের ঘর।

গোসাঘর—আঃ গুস্‌সা—ক্রোধ, ধনীগৃহিণীর ক্রোধ হইলে যে ঘর আশ্রয় করেন সেই নির্দ্দিষ্ট ঘর।

গু কাটা—গু সাফ করা ; চরম সেবা।

গু ঘাঁটা—পাগল হওয়া। পাগলেরা প্রায়ই গু ঘাঁটে, সেই লক্ষণায়।

গিলা করা—কাপড়ে গিলার ফল দিয়া চুনট করা।

গিদার, গ্যাদার—দন্ত-জনিত অরুচি।

গাড়ুরগুপ্প—গাড়ুরের ন্যায় গপ্প বা মোটাসোটা।

গ্রামভারী—প্রাণভারী, যাহার গাম্ভীর্য্য দেখিলে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ভয় হয়। গীতের গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

গু-ডিম—পাখীর বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াও কিছুদিন মলত্যাগ করে না ; সে বাচ্চা যেন বিষ্ঠার ডিম মনে করা হয়। পাখীর অতি কচি ছানা। গুডিম ভাঙ্গা—কচি বাচ্চার বাহ্যে হইতে আরম্ভ হওয়া। অর্থাৎ শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়া।

গলদা—বড় চিংড়ি।

গলদা—ধাতু, ঘর ছাইবার জন্য ছোট বড় মিশাইয়া ছাইবার উপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য সমস্ত খড়ের আঁটি খুলিয়া মিশাইয়া বাছিয়া পুনরায় আঁটি বাঁধা। গলদ শব্দের সহিত কোনো সম্পর্ক আছে কি ? ফারসী গল্লা—দল, গল্লানো—দলে ভিড়াইয়া দেওয়া ?

গোঙ্গা, গোংরা—ধাতু, বেদনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করা।

গোঙানি, গোঙ্গানি—গোঁ গোঁ শব্দ।

গ্রামফোন—Gramophone.

গুলেল—গুলতি ধনুক।

গর্ভসূতী—এক রকম কাপড়।

গজগিরি—দেয়ালে বা মেঝেয় বালিচুন ধরানো।

গাড়—হিন্দী গাঢ়া—গর্ত্ত। এক গাড় হওয়া—এক গর্ত্তে পড়িয়া মরা।

গম্ (খাওয়া)—নিঃশব্দ (হইয়া থাকা)। আরবী গম্ (দুঃখ) খাওয়া (নীরবে হজম করা)?

গর্ভদাস—দাসীর পুত্র, যে গর্ভে থাকার সময় হইতেই দাস।

গলান্—গোরুর গলার দড়ি। গলাসি। (শব্দকোষে গলানী আছে)।

গলাসি-গেরো—গলাসি দড়িতে যেরূপ গ্রন্থি থাকে ; দড়ির এক দিকে একটা গোল কড়ার মতো ও অপর দিকে একটা বড় গিরা বা গেরো থাকে, সেই গিরাটা গোল ছিদ্রের মধ্যে ঠেলিয়া পরাইয়া দিতে হয়।

গেঁজে—(শব্দকোষে গাঁজিয়া শব্দ দেখিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু গাঁজিয়া ত খুঁজিয়া পাইলাম না।) টাকা পয়সা রাখিবার থলিয়া।

গাঁটা দেওয়া—আড়ি পাতা, লুকাইয়া দেখা বা শোনা।

গাছ-দা—গাছ কাটিবার দা, চাঁচ দা।

গাছ-কোমর বাঁধা—গাছে উঠিবার সময় যেমন করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া বাঁধে।

গুঁজরা—ধাতু, অতিরিক্ত নত বক্র বা প্রবিষ্ট হওয়া। যথা—
"পানিমে ডুব গায়া ভসম ভুসুড়ি খায়া, গুঁজড়ি মুজড়ি করি গুপ।"—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

গুজগুজিয়া, গুজগুজে—(বিশেষণ) যে লোক মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না অথচ ভাবে ভঙ্গিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

গুনকার—বেশী লোকে বলে না, গুনাগার শব্দ দেওয়া উচিত ছিল। যেখানে এক শব্দের একাধিক উচ্চারণ আছে সেখানে একাধিক স্থানে শব্দ দিয়া অর্থ একস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই চলিতে পারে।

গুপো—চোরা আঘাত ; গুপ্ত আঘাত যাহাতে ত্বক্ ছিন্ন বা চিহ্নিত হয় না। গুপা—ধাতুও আছে।

গোঘাসি—গোরুর পেটের অজীর্ণ ঘাস।

গোছাল—যে ব্যক্তি সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া সাজাইয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পারে।

গোবরা—ধাতু, গোরুর বিষ্ঠা ত্যাগ করা ; লক্ষণায় কর্ম্ম পণ্ড করা।

গোলা—মটর কলাইয়ের শস্য-শূন্য শুটী, শুষ্ক গাছ ইত্যাদি।

গোটা নাল—মুখের ঘন লালা।

গুঁতা—আরবী ঘোতাহ্—ডুব দেওয়া, ঝাঁপাইয়া পড়া, plunging, diving : এমন আঘাত যে শরীরে আঘাতের দ্রব্য ডুবিয়া যায়।

গেঁড়া দেওয়া, গেঁড়া মারা—গেণ্ডু বা গোলা দিয়া অপর গোলাকে মারিয়া জিতিয়া লওয়া ; ছেলের হাতে গেণ্ডু দিয়া অলঙ্কার ভুলাইয়া লওয়া হইতে অর্থ হইয়া থাকিবে ঠকাইয়া লওয়া। তুলনীয়—ছেলের হাতের মোয়া। ভাষার শব্দপ্রয়োগের শুচি অর্থ বাহির করিতে পারিলে ভাষার বলপুষ্টি হয় ; অর্থ অশুচি জানিয়া কোনো ভদ্রলোক তাহা ব্যবহার করিতে পারে না, অতএব পারকপক্ষে অশুচি অর্থ না দেওয়াই ভালো।

গাজী—আঃ, যোদ্ধা।

ঘড়ঘড়—আঃ ঘড়্‌ঘড়া—gargle শব্দতুল্য শব্দ।

ঘুম—ফাঃ ঘমুদন্—ঘুমানো। তাহা হইতে হইয়া থাকিবে।

ঘুষ্‌টা, ঘুষকা, ঘুষড়া (ধাতু)—গোপন স্থানে গুঁজিয়া রাখা। ফাঃ গুষা—কোণ হইতে ?

ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি—ছেলে-ভুলানো ছড়ায় অজ্ঞাত কোনো মাসি পিসি যাহারা ঘুম দিয়া যায়।

ঘোপ, ঘোপঝাপ—ঝোপঝাঁপ, অন্তরাল : সুবিধাজনক স্থান (ডাকাতের)। যথা, ঘোপেঝাপে ফেরা ; ঘোপ দেখিয়া কোপ মারা।

ঘোড়ামুগ—নিকৃষ্ট বড় জাতের মুগ।

ঘোড়ানিম—নিকৃষ্ট নিম।

ঘেঁচড়া—একগুঁয়ে।

ঘোরাল—গভীর, ঘন। ঘোরালো মিষ্ট ; রং ইত্যাদি।

ঘোরেঘারে—ঠারেঠোরে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া।

ঘোঙট, ঘুঙট—ঘোমটা।

ঘুরণ জাল—যে জাল মাথার উপর ঘুরাইয়া ফেলিতে হয়।

ঘুরণ পাক, ঘুরপাক—আবর্ত্তন।

ঘাই—আঘাত ; বঁড়শীর টোপে মাছের ঠোকর।

ঘাড়া—ধাতু, ঘাড় দেওয়া, স্কন্ধে ভার বা লাঙ্গল বা গাড়ীর বাঁক লওয়া। তাহা হইতে দায়িত্ব গ্রহণ।

ঘুরণি—ঘুরা, ভ্রমণ ; যথা, আজকে কি কম ঘুরুনিটা হয়েছে।

ঘিসকাপ—ছোট রাঁদা, কাঠ চাঁছিবার যন্ত্র। কি শব্দ ?

ঘুঁকা—ধাতু, জলের মধ্যে হাত ডুবানো, নথানি করা।

ঘণ্টমঙ্গল—যা-তা অম্প, শুক্ত ঘণ্টের ন্যায় মিশ্রিত (ছত্রিশ জাত) অথচ মঙ্গল বলিয়া মানিয়া সকলের সংস্পর্শে আসা।

ঘুসড়া—কাঁচা গাছগাছড়া আগুনে সেকিয়া ঔষধের নিমিত্ত রস করাকে কবিরাজী ভাষায় ঘুসড়া বলে।

ঘেঁস, ঘাস—ভাঙা বাড়ীর চুনসুরকী কাঁকর কুল্লই।

ঘাটিয়া, ঘেটো—(হিন্দী) নিকৃষ্ট।

ঘুণ—যে লোক কোনো বিষয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানে।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—আমি ইহার অন্যরূপ allusion জানি—দুই ভাই ছিল ঘুঘু আর ফাঁদ। ঘুঘু গোবেচারা রকমের; এক গৃহস্থের বাড়ীতে চাকরী করিতে গিয়া চাকরীর সর্ত্ত হইল—দাঁড়াইলে ছেলে ধরিবে, বসিলে পাট কাটিবে, আজ খাইবে কাল খাইবে, খাওয়ার আগে এক খোরা আমানি খইয়া যত পারে ভাত খাইবে। যদি ঘুঘু চাকরী ছাড়ে তবে মনিব তাহার কান কাটিয়া লইবে, আর যদি মনিব ছাড়ায় তবে ঘুঘু মনিবের কান কাটিবে। অল্প দিনেই ঘুঘু বেচারা খাটিয়া খাটিয়া ও না খাইতে পাইয়া কান দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। তখন ফাঁদ আসিয়া চাকরী লইল সেই সর্ত্তে। সে দাঁড়াইলেই গিন্নি ছেলে দেন; সে ছেলের একটা হাত বা পা ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখে, ছেলে কাঁদে; কোলে করিতে বলিলে ফাঁদ বলে কোলে করিবার সর্ত্ত নাই, ছেলে ধরিবার সর্ত্ত আছে মাত্র। বসিলে পাট দেয়, ফাঁদ দা লইয়া কুচিকুচি করিয়া কাটে, কেহ কিছু বলিলে বলে পাট পাকাইবার সর্ত্ত ত ছিল না, কাটিবার সর্ত্তই আছে। খাইবার সময় সে কলাপাত পাতিয়া তাহাতে এক খোরা আমানি ঢালিয়া দেয়, কারণ খোরায় করিয়া খাইতে হইবে এমন সর্ত্ত ছিল না; পাতায় যেটুকু আমানি থাকে তাহাই গণ্ডূষ করিয়া গণ্ডেপিণ্ডে ভাত গিলে। গৃহস্থ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন বলিলেন—যা, বেরিয়ে দূর হইয়া যা। ফাঁদ অমনি একখানি ক্ষুর বাহির করিয়া মনিবের কান কাটিয়া বলিল—ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখনি। লক্ষণায়, সহজ সরল লোক বা অবস্থা দেখিয়াছ, কিন্তু বিপদ ও ভয়ানক লোকও আছে এ জ্ঞান যেন থাকে।

ঘুঘুঘুঘু খেলা—শিশুকে পায়ে বসাইয়া দুলাইতে দুলাইতে ছড়া বলিয়া খেলা—ছড়ার প্রথম শব্দ ঘুঘুঘু হইতে খেলার নাম।

চরকা—ফাঃ চরখ।

চিরকুট—ফাঃ চির্‌ক্—ময়লা, অপরিষ্কার। যথা—ময়লা চিরকুট কাপড় (ছেঁড়া না হইতেও পারে)।

চুপসা, চোপসা—যথা, গাল চুপসে গেছে; আম চুপসে গেছে। এখানে আর্দ্র হওয়া অর্থ খাটে না; এখানে অর্থ বসিয়া গিয়াছে, তুবড়াইয়া গিয়াছে। ফাঃ চস্পীদন ধাতুর অর্থ লেগে থাকা; চসপা হইতে চুপসা হওয়া সম্ভব। চোপা+সা অর্থও বোধ হয় ঠিক নয়।

চাকলা—ফাঃ জেলা।

চিনি—ফারসীতে চিনি (শর্করা) শব্দ আছে। চীনী—(চীনদেশীয়) শব্দ পৃথক।

চীনা—ফাঃ চীনা—শস্য।

চ—চল ধাতুর মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার এক বচনে অনাদর বা স্নেহ ঘনিষ্ঠতা পরিচায়ক। তুই চ।

চটাই—বাঁশ কাঠ প্রভৃতির পাতলা স্তর দিয়া বোনা শয্যা।

চড়াও—আক্রমণ, উপরে গিয়া পড়া।

চড়চড়ি ও সড়সড়ি শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক উল্টা হইয়াছে। চড়চড়ি—নীরস ব্যঞ্জন; সড়সড়ি—অল্পরসযুক্ত ব্যঞ্জন।

চোনা—গোরু ছাগলের মূত্র। চোনা ধাতু—মূত্র ত্যাগ করা।

চালিশা, চালশে—চল্লিশ সম্বন্ধীয়; চল্লিশ বৎসর বয়স্কের দূরদৃষ্টি, নিকটের বস্তু দেখিতে না পাওয়া।

চেলা—লম্বা বিছা। পূর্ব্ববঙ্গে কাঁকড়া বিছাকে বিছা বলে, লম্বা বিছাকে বলে চেলা।

চিনিপাতা দই—দুধে চিনি মিশাইয়া পরে দই জমানো হইয়াছে।

চেকমুড়ি—দাখিলার যে অংশ দাতার নিকট থাকে, Counterfoil.

চার—ফাঃ শব্দ, সং চত্বারির অপভ্রংশ নহে। তুলনায় হাজার। চার-পায়, চার-পাই—ফারশী সমাসবদ্ধ শব্দ।

চাটনি—ফাঃ চাশনি—স্বাদ।

চর (ধাতু)—ফাঃ চরা—to graze; তাহা হইতে চরা-গাহ... pasture, meadow হইয়াছে। অতএব বাংলার চর ধাতু সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর নিকট জ্ঞাতি।

ছাপ—ফাঃ চাপ।

ছিনালী—ফাঃ চিন্‌নালী হইতে কি?

ছবি—ফাঃ শবীহ্—resembling; চিত্র; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ছবিই আছে।

ছেবলা—ছাবালিয়া, না ফাঃ সিফ্‌লা—নীচ, মন্দ?

ছিরকট—ধাতু, বিস্তার বা বিকাশ করা; যথা দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকা।

ছব্বা—(শব্দকোষে ছব্বি) শোভা (হুগলির গঙ্গার ধারে মালদহে কথিত)।

ছাঁত—(শব্দকোষে ছাঁক) হঠাৎ ভয় লাগিলে যে ভাব হয়। (কলিকাতা ও হুগলির গঙ্গার ধারে কথিত)।

ছাঁট—বমি, ন্যাকার (মালদহে কথিত)।

ছিরি—মঙ্গলকর্ম্মে পিটালি দ্বারা প্রস্তুত ও চিত্রবিচিত্র কারুকার্য্য-বিশিষ্ট কোণাকার মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ, শ্রী। (সর্ব্বত্র কথিত)।

ছুট—(শব্দকোষে ছোট) কাপড়ের কোঁচার বস্ত্রাংশ।

ছেমড়া—বালক, ছোঁড়া (পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

ছুঁচকা, ছেঁচকা—লোভী, যে ছোঁক ছোঁক করিয়া ছুঁচার মত সমস্ত জিনিষে নাক দিয়া বেড়ায়।

ছোঁক ছোঁক করা—লোভে মন ব্যাকুল হওয়া।

ছাতলা, ছ্যাতলা—কোনো বস্তুতে স্যাঁতা লাগিয়া যে সাদাটে ভাব হয়; দাঁত না মাজিলে দাঁতে যে ময়লা জমে।

ছান—মেটে ঘরের মেঝের উপর জল মাটি গোবর ইত্যাদির প্রলেপ।

ছোটা—বৃক্ষত্বকের দীর্ঘ সরু অংশ; যেমন কলার ছোটা দিয়া বারুই পান বাঁধে।

ছত্তরকার—ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া যাওয়া বা ফেলা।

ছতরছাই—পুড়িয়া ছাই হইয়া ছত্রাকার হইয়া, ছড়াইয়া পড়িয়া যাওয়া বা ফেলা।

ছোঁ ঘা—চীল বা সাপ যেরূপে অতর্কিতে ছোঁ মারিয়া ঈষৎ স্পর্শ করিয়াই আঘাত দিয়া যায় সেইরূপ ঘা; লক্ষণায় ঈষৎ স্পর্শ, ঈষৎ ঘনিষ্ঠতা: যেমন, লোকটা আর ছোঁ ঘা দিচ্ছে না।

ছাড়তক—ঘোড়ার ঊর্দ্ধশ্বাস দৌড়।

ছিড়, ছিড়ান্, ছিট (শিষ্ট শব্দজ) — কোনো কাজের বা বস্তুর লাগাড় সূত্র বা অবশেষ; যেমন, তোমার কথার যে আর ছিড় মরে না; ভোজের ছিড় কবে যে শেষ হবে কে জানে। এত পিঁপড়ে আসছে যে মেরে ছিড় মারা যাচ্ছে না।

ছোলন্, ছোলং, ছোলঙ্—নৈবেদ্যের মাথার উপর বসানো কোণাকার চিনী বা সন্দেশ।

ছোলদার, ছোলদারী—ত্রিভুজাকৃতি তাঁবু বা বস্ত্রগৃহ; ইংরেজী soldier শব্দজ।

ছুটো, ছুটকো—যাহা কাহারও সহিত সংলগ্ন নহে।

ছুনু—শিশুর প্রস্রাব, ছুন ছুন শব্দ হয় বলিয়া।

ছিপ—মাছ ধরিবার বংশদণ্ড।

ছিপছিপে—ছিপের ন্যায় কৃশ ও দীর্ঘ, ছিপের ন্যায় লকলকে।

ছট্‌কাফট্‌কা—কর্ব্বুর, বিবিধ-বর্ণ-বিশিষ্ট, বিচিত্র, বাঘা-ভাল্‌কো।

ছড়—দীর্ঘ সরু বংশদণ্ড, বর্শা, বল্লম।

ছিটনী—যে স্ত্রীলোক জাফরী বেড়া বুনে।

ছিমড়ী—শিম্বী শব্দজ, সুঁটী।

ছে—ধাতু, ছে দেওয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা, ছেয়ানো।

ছেমো—খেঁকী, খেঁকখেঁকে ভাব। যথা, ছেমো-চাপা ছেলে।

ছোঁচানি—শৌচ সম্বন্ধীয়; যেমন ছোঁচানি জল—শৌচের নিমিত্ত জল বা শৌচদুষ্ট জল।

ছোড়ান—চাবি, যাহা দ্বারা ছাড়ানো যায়।

জবাব—শেষ উত্তর অর্থাৎ ফারখতি, ত্যাগ; যথা, কাজে জবাব দেওয়া।

জোত্র—সম্পত্তি; জোত্রমন্ত—সম্পত্তিশালী, ধনী।

জল দেওয়া—বিসর্জ্জন দেওয়া; জলাঞ্জলি দেওয়া অর্থাৎ কোনো জিনিসের বিনাশের পর তাহার মরণকৃত্য করা: যথা, এই ব্যবসায়ে আমি দশ হাজার টাকায় জল দিয়েছি।

জলান—পশুর (বিশেষত গাভীর) সন্তান প্রসবের পর যে ফুল (placenta) পড়ে।

জালজেলে—জালের ন্যায় সূত্রশূন্য (বস্ত্র)।

জাব্দা—(শব্দকোষে জাবেতা দেখুন)। যে খাতায় পাঁচমিশালী খরচ দিনকার-দিন টুকিয়া রাখা যায়।

জগদ্দল—(শব্দকোষে জগদল) জগৎ দলন করিতে সক্ষম। রবি বাবু সর্ব্বত্র জগদ্দল ব্যবহার করিয়াছেন, জগদল ব্যবহার কাহারও দেখি নাই।

জঙ্গল—ফারসী শব্দ।

জুস—ফাঃ যুশ—উত্তাপ, সুরুয়া; juice.

জাত—ফারসী জাত শব্দ আছে, অর্থ caste. তবে খুব সম্ভব বাংলায় জাতি শব্দের অপভ্রংশ চলিতেছে।

জী, জু—ফাঃ, মহাশয়, প্রভু। প্রভু অর্থে বাংলাতেও ব্যবহার আছে, —যথা, গোঁসাইজী, গোঁসাইজু।

জাদা—ফাঃ অর্থ জাত। যথা,—হারামজাদা।

জমজমাট—আরবী জমজমা শব্দের অর্থ murmur; তাহা হইতে?

জওজে—আঃ, স্ত্রী। জওজ—স্বামী।

জীরা—ফাঃ; জীরক সং।

জেরবার—ফাঃ জের (নীচে) বার (বুর্দ্দিন-বহন করে যে, ভার)।

জটল্লা—(শব্দকোষে জটলা), চুলের জটের মতো একত্র অনেকের ভিড় ও মিশ্রণ।

জিআলা—(শব্দকোষে জাওলা), বড় মাছ ধরিবার জন্য বঁড়শীতে জ্যান্ত মাছ গাঁথিয়া যে ছিপ জলের ধারে মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া দেয়। জীয়ন্ত মাছ গাঁথিয়া টোপ করে বলিয়া নাম জিআলা বা জীআলা। অপরন্তু ফারসী জাওলা মানে a globular mass of leaven. সেইরূপ টোপ থাকে বলিয়া?

জিওল, জিয়ল, জীওল, জীঅল, জিঅল—জীবন্ত; যথা—পড়শী জিয়ল মাছ (চণ্ডীদাস)।

জাগ দেওয়া—(শব্দকোষে জাঁক বা জাঁত দেওয়া), ইহার অর্থ চাপা দেওয়া নয়, জাগ্রত করা। কাঁচাফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানোকে জাগ দেওয়া অর্থাৎ জাগ্রত করা বলে।

জাবড়ানো, জোবড়ানো—ডুবানো, নিমজ্জিত করা; যথা, গরু গামলায় মুখ জুবড়ে ফেন বা জাব খাচ্ছে (শব্দকোষের অর্থ অতিসিক্ত)। ছড়াইয়া পড়া, ধ্যাবড়াইয়া যাওয়া; যথা, ব্লটিং কাগজে লেখা যায় না, কালি জুবড়ে যায়।

জামেয়ার, জামীয়ার—ফার্শী জামা-ওার শব্দ।

জারি—যশোহর জেলায় প্রচলিত তর্জা শ্রেণীর গান, ফাঃ জারী—বিলাপ, শোক; কাঁদুনে সুরে গীত বলিয়া জারী। একপ্রকার মুখরোগ, জারি যা।

জাসু—চরস বা গুলি খাইবার চিলম বা কল্কে (মালদহ জেলায় ব্যবহৃত)।

জাহাঁবাজ, জাঁবাজ—ফার্শী জাহাঁ (পৃথিবী) বা জাঁ (প্রাণ) + বাজ (লইয়া খেলা করে যে); দুঃসাহসিক, adventurer, দুর্গমচারী, প্রাণের মমতাশূন্য; তাহা হইতে, ধূর্ত্ত, বদমায়েস।

জিবে গজা, জিবিয়া গজা—যে গজা (আরবী খিজা—খাদ্য) আকারে জিবের ন্যায়।

জুই—জিয়া বা জিএনী পিঁপড়া, ঢাকা জেলার নাম।

জিরজিরে—জীরার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র; যথা তেঁতুলের পাতার মতো জিরজিরে। বুকের হাড় জিরজির করছে, এখানে কি অর্থ? জীর্ণ শব্দজ?

জুড়িদার—পাহারাওয়ালার সঙ্গী।

জেঠী—জেঠার স্ত্রী, জেঠাই।

জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটে অনেক জেলাতে বলে। অর্থাৎ জ্যোৎস্না যেন ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিতেছে।

জহুরী—শব্দকোষের জোহরী অপ্রচলিত, জহুরী প্রচলিত।

জনে জনে—প্রত্যেক জনে।

জরদ্‌গব—স্থবির বৃষ; পঞ্চতন্ত্রের বৃদ্ধ গৃধ্রের নাম: তাহা হইতে অতি বৃদ্ধ, অলস, কর্ম্মে অপটু, শ্লথ-শরীর।

জাপটাজাপটি—পরস্পর জড়াজড়ি।

জামুড়া, জামড়ো—পায়ের কড়া (corn); কোনো ফলের ভিতর সমভাবে সুপক্ক না হইলে শক্ত অংশ, দরকচা।

জালী পড়া—লতায় ছোট ছোট ফল ধরা। (শব্দকোষে জালী আছে)।

জি—জিহ্বা।

জীঅ ধাতু,—জিআনো, জীয়ানো—জীবন্ত করা বা রাখা; যথা, মাছ জীয়ানো।

জিগির—(আরবী), Details, বিস্তারিত বিবরণ। যথা, জিগির দিয়া খরচ লেখা উচিত।

জুৎসই, জুতল—সুবিধা মাফিক; উপযোগী।

জুতাজুতি—পরস্পর জুতা প্রহার।

জেঠ—জ্যেষ্ঠ; যথা "প্রকৃতি যাহার জেঠ, আকৃতি কনেঠ।" (প্রমথ চৌধুরী)। জেঠ শব্দের প্রয়োগ যথা—জেঠশ্বশুর, জেঠশাশুড়ী; জেঠাস (জেঠশাশুড়ী)।

জার—Jar, বোতল সদৃশ ফাঁদালো মুখওয়ালা পাত্র। রুষিয়ার সম্রাট।

জমাট—দেয়ালের গায়ে বালি চুনের পলস্তারা।

জালসা—কোনো পদার্থে ঠাণ্ডা লাগিয়া গুমিয়া গেলে তাহাতে যে জালবৎ গুঁয়া দেখা যায়।

জলে পড়া—অসহায় হওয়া, নিরাশ্রয় হওয়া; কোনো জিনিব ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হইয়া যাওয়া।

জোটেবুড়ি—জটওয়ালা বুড়ী, শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য কাল্পনিক কুদৃশ্য বুড়ী।

জেঁকো—জাঁক বা গর্ব্ব আছে যাহার; দাম্ভিক।

জুজ—(আরবী যুজ, অংশ, কোরানের অধ্যায়); অংশ, বইয়ের ফর্ম্মা; দপ্তরীদের বই বাঁধিবার সময় ফর্ম্মা ফর্ম্মা করিয়া সেলাই। জুজ বাঁধা বই, জুজ সেলাই।

জুতি—জুতা, পাদুকা।

জুতুয়া—জুতা; যথা, খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে।

জিন্দা—জীবন্ত (হিন্দী?)

জঞ্জাল—ঐতিহাসিক আর্ভিন (William Irvine) সাহেব রহস্য করিয়া আরবী যজাইল শব্দ হইতে জঞ্জাল ব্যুৎপন্ন স্থির করিয়াছেন। যজাইল মানে প্রচুর, প্রাচুর্য্যের উদ্বৃত্ত অংশ, আর এক অর্থ ধনী লোক। ধনী লোকেরা প্রায়ই সমাজের জঞ্জাল হয়, তাহাতেই কি আবর্জ্জনা অর্থ শেষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে? হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়, তুলনীয় খাজা—বড় লোক, তাহা হইতে বোকা। প্রাচুর্য্যের উদ্বৃত্ত অংশ হইতে তৎসহজেই আবর্জ্জনা বা অকেজো অর্থ পাওয়া যায়।

ঝিকিনি—ঝিমানো।

ঝুঁজকো বেলা—ভোর বেলা।

ঝাঁটানি—ঝাঁটা দ্বারা সমাহৃত আবর্জ্জনা।

ঝাড়ু—ফাঃ, জারু—ঝাঁটা।

ঝাম বা ঝান খাওয়া—দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া নেতাইয়া পড়া। (সং ধ্মা ধাতু অগ্নিসংযোগে?)

ঝাঁপালো—যাহা ছড়াইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

ঝাঁমরো—যাহার মাথার চুল লম্বা ও উস্কোখুস্কো।

ঝনাৎ—অনুকার শব্দ।

ঝক্কি—উপদ্রব।

ঝিলিক—আলোকের অকস্মাৎ ও ক্ষণিক তীব্র প্রকাশ; যথা, বিদ্যুতে ঝিলিক হানে।

ঝিঁটকী নড়া, ঝিরকুট নড়া—শব্দকোষে ঝিকুর নড়া।

ঝড়ি—বৃষ্টি (মালদহ জেলায় কথিত)।

ঝরঝরে—পরিচ্ছন্ন; যথা, ঘরখানি ঝরঝর করিতেছে। জীর্ণ, যথা, পরকাল ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে। (শব্দকোষে প্রদত্ত উজ্জ্বল অর্থ ঠিক মনে হয় না)।

ঝাণ্ডা—পতাকা-দণ্ড।

ঝাল ঝাড়া—(ঝাল রাশী করা নহে) ঝাল ত্যাগ করা, উষ্মা প্রকাশ করা, ঝাল ঝাড়িয়া ফেলা।

ঝাঁঝালো—ঝাঁঝ বিশিষ্ট।

ঝুরঝুরে—ধূলার ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু অসংলগ্ন সামগ্রী। যথা ঝুরঝুরে বালি, ঝুরঝুরে বাতাস।

ঝামরানো—রসপ্রাচুর্য্য হওয়া। যথা সর্দ্দি ঝামরে আসে, নুন লঙ্কা দিয়া ছেঁচা আম ঝামরায়।

টাঁরা কাণা—যে কাণা বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (টগরঃ হেলা বিভ্রমগোচরে" অর্থ হইতেই পাওয়া যায়)।

টিক—লক্ষ্য, তাগ, যথা, হাতের টিক, বন্দুক বা ধনুকের টিক—ঠিক (?)।

টিলা—আঃ তলা, ছোট পাহাড়।

টিকটিকী (তর্জ্জনীর উপর মধ্যমাঙ্গুলি চড়াইয়া বালকের ক্রীড়াভঙ্গি) ও আঘাতে প্রভেদ আছে; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জ্জনী তদুপরি মধ্যমা, তদুপরি অনামিকা ও তদুপরি কনিষ্ঠাঙ্গুলি চড়াইলে অঙ্গুলির যে আকার হয় তাহাকে আদা বলে, এইরূপ অঙ্গুলিসংস্থান দেখিতে আদার চাপের মতো হয় বলিয়া।

টুকনী—জল পানের ছোট ঘটী (মালদহ জেলায় কথিত)।

টেঁপাটোপা—হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, রসপূর্ণ।

টেঁপারি—যাহা টেঁপাটোপা?

টেঁস—যে ফিরিঙ্গী জাত্যংশে অতি হীন; শব্দকোষের ব্যুৎপত্তি মনে লাগিতেছে না, অথচ উৎকৃষ্টতরও কিছু মনে আসিতেছে না।

টানা হাঁটা—টানার সূতা খাটাইবার জন্য তাঁতির ইতস্তত ভ্রমণ; তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ একই স্থানে যাতায়াত।

টুক—ধাতু, (১) কোনো কাজের মধ্যে কথা বলিয়া বাধা দেওয়া বা ছল ধরা। যথা, মাঝে মাঝে টুকলে তার মুদ্রাদোষ সেরে যেতে পারে। (২) অল্প অল্প করিয়া গ্রহণ, যথা, কাঙলা ছেলেটা একটা রসগোল্লা এক ঘণ্টা ধরে টুকছে। এই অর্থ হইতেই টুকিয়া রাখা মানে অল্প লিখিয়া রাখা হইতে পারিয়াছে।

টেঁসো—কচি ফল শুকাইয়া পাকা।

টুকি টাকি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য।

টরটরিয়া, টুটুনিয়া—যে থরথর করিয়া চলে, ক্ষুদ্রকায়ের ব্যস্ততার সহিত চলার ভঙ্গি।

টাঁক—লক্ষ্য, লোভ। যথা, ঐ ছড়ি গাছটার উপর অনেক দিন থেকে আমার টাঁক ছিল।

টেঁক—দেমাক, দম্ভ। তাহা হইতে টেঁকথর—অতি দাম্ভিক, খর দম্ভ যাহার। peevish, যে অল্পেই চটিয়া মুখের সামনে জবাব করে।

টুসি—টুসকি।

ঠ্যাংঠেঙে—যে কাপড় ঠ্যাং ঢাকে না।

ঠাট্টা বটকিয়া (বাটখারা নহে)—ঠাট্টা ও বৈঠকী রসিকতা। যশোহর জেলায় কেবল বটকিয়া শব্দই ঠাট্টা অর্থে চলিত আছে।

ঠেকার—দেমাক, দম্ভ।

ঠমক ঠমক—নূপুরের শব্দ। শব্দকোষে ঠমক দেখুন।

ঠাউকা—দৃষ্টি দ্বারা আন্দাজি পরিমাণ স্থির করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ, তুল দাঁড়িতে ওজন না করিয়া মূল্য নিরূপণ। ঠাহর শব্দজ বোধ হয়। শব্দকোষে থাউকা দেখুন।

ডামাডোল—উৎসন্ন যাওয়া; যথা, কলেরায় গ্রামখানা একেবারে ডামাডোল হয়ে গেল। ব্যুৎপত্তি কি?

ডড করা—কাতর হইয়া ব্যাকুল শব্দ করা; যথা, ছেলেটা ক্ষিদেয় ডড করছে।

ডেঁপো—ডিম হইতে সদ্য-জাত সাপের ছানাকে ডাঁপ বলে; সেই কচি ছানাও ফণা তুলিয়া আস্ফালন করে। তাহারই তুলনায় ডাঁপুয়া—ডাঁপ সদৃশ, বালকের দ্বারা বুড়োর বাক্য-কর্ম্ম-আচরণের অনুকরণ ডেঁপোমি, এবং যে ডেঁপোমি করে সে ডেঁপো বা ডাঁপুয়া।

ডিবে, ডিবিয়া—উর্দ্দু শব্দমাত্র নয়, উর্দ্দুতে ফারসী দব্বা—তৈলকুপী শব্দ হইতেই আসিয়াছে।

ডিপুটী ঘটিরাম—শব্দকোষে প্রদত্ত কাহিনীটি ঠিক হয় নাই। এক ডিপুটীর এজলাসে মুচিরাম নামক একজন ফরিয়াদীর নালিশ ছিল: ডিপুটী বাবুর বাংলা-জ্ঞান চমৎকার, তিনি মুচিরামের স্থলে পড়িলেন ঘটিরাম। পেয়াদা হাঁকিতে লাগিল ঘটিরাম

ফরিয়াদী হাজির, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির। কেহ সাড়া দিল না। ডিপুটি বাবু মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। তার পর ফরিয়াদী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, হুজুর আমার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়, তাই আমি বুঝতে না পেরে হাজির হইনি, আমার আর্জি শুনানির হুকুম হোক। কিন্তু ডিপুটি বাবু নিজের prestige বজায় রাখিবার জন্য বলিলেন—না, তা হতে পারে না, তোর নাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে ঘটিরাম, আর তুই বলিস মুচিরাম। সেই হইতে ডিপুটি বাবু ঘটিরাম ডেপুটি নামে পরিচিত হইলেন। তাহা হইতে অর্থ অকর্ম্মণ্য হাকিম। (দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী দেখুন)।

ডেস্থর—দেড় (সার্দ্ধ)-বৎ ভাব; কোনো জিনিস খরচের চেয়ে কিছু বেশি জমা রাখিয়া নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে আবার জোগান দেওয়া।

ডম্বল—dumb bells. ব্যায়াম-যন্ত্র।

ডেগ—এক পদবিক্ষেপ যতদূর বিস্তার করা যায়। হিন্দী?

ডিস্—dish, রেকাব।

ডায়ারী, ডায়েরী—diary, রোজনামচা।

ডেমকুলা—কলার বালদো, কলাপাতার মধ্যকার দণ্ড। মালদহে কথিত।

ডিঙ্গিমারা—পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া দাঁড়ানো। ডেগ্ শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে কি?

ডেরি ডামরী—কুচোকাচা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খণ্ড বিখণ্ড।

ডেঙ্গরা, ডেংরা—ঢেঁচরা, ডঙ্কা।

ডিম ডিম—ডিমের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র সামগ্রী; যথা, জলে ডিম ডিম কি ভাসছে।

ঢিকচাল, ঢেকচাল—চাল সিদ্ধ করিয়া ভাত রাঁধিবার সময় অর্দ্ধেক ফুটিয়া সুসিদ্ধ হইয়া গেলে ও অর্দ্ধেক অসিদ্ধ থাকিলে ঢেকচেলে পড়িয়াছে বলে। ঢেক (ঢের, অনেক) চাল?

ঢিট—সংশোধন, সমঝানো, জব্দ; যথা, ওর বড় বাড় বেড়েছে, এক দিন এমন মার মারব যে ঢিট হয়ে যাবে।

ঢক্ ক'রে খাওয়া—অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ এক ঢোকে গিলিয়া ফেলা; যথা, ওষুধটুকু ঢক করে' খেয়ে ফেল।

ঢোলাই—পাতিত করার বেতন নহে, বহন করার বেতন। হিন্দী ঢুয়ানা হইতে?

ঢল্‌ক, ঢলঢলে—কোনো জিনিসের বড় আবরণের ভাব। যথা, ঢল্‌ক জামা, ঢলঢলে জোব্বা।

ঢল্‌কে দেওয়া—কোনো তরল পদার্থ হঠাৎ অনেকখানি ঢালিয়া দেওয়া।

ঢাকে ঢোলে—চড়ক ও দুর্গোৎসবের সময়ে, আশ্বিনে ও চৈত্রে, ছয় মাস অন্তর। যথা, তুমি কি ঢাকে ঢোলে স্নান কর নাকি? অর্থাৎ যখন ঢাক বাজে এবং যখন ঢোল বাজে এমন উৎসবে।

ঢস্‌কা—অশক্ত, কমজোর।

ঢিপ্‌লে—শব্দকোষে ঢিবরী, nut।

ঢাউস—প্রকাণ্ড; যথা, ঢাউস ঘুড়ি; আজকালকার বাংলা খবরের কাগজগুলো ঢাউস হয়ে উঠেছে। শব্দকোষে খাউস (?)।

ঢেবুয়া—পশ্চিমের অমুদ্রিত পয়সা।

ঢিপকপালী—যে স্ত্রীলোকের কপাল উঁচু ঢিপি পারা।

তাওয়া—ফারসী তাবা—ভাজনা-খোলা; তামাকের উপর ও আগুনের নীচে যে খোলা-খণ্ড থাকে।

তাজিয়া—আরবী শব্দের অর্থ শোক।

তার—ফারসী তার—ধাতুসূত্র।

তারাজ—ফাঃ, লুট; প্রায়ই লুটতারাজ যুগ্মরূপে ব্যবহৃত।

তলাও—ফাঃ তালাব—পুষ্করিণী।

তাহুৎ—সেবা-শুশ্রূষা।

তত্তার—জ্বতি।

তুর্কী নাচন—তুর্কীদের উদ্দাম নৃত্য। যথা, কেউ যে কারে চিনি নেক সেটা মস্ত বাঁচন, নইলে সবাই দেখিয়ে দিত বিষম তুর্কী নাচন। (রবীন্দ্রনাথ)।

তকসির—আঃ, বর্ণবিপর্য্যয়ে তস্কির,—অপরাধ।

তালা—আঃ, উচ্চ; তাহা হইতে বাড়ীর ঘরের উপর থাক।

তকাবী—আঃ, প্রজাকে বীজ খরিদের জন্য অগ্রিম দাদন।

তকদির—আঃ, অদৃষ্ট।

তন—ফাঃ, তনু। যথা, তন্ মন ধন দিয়ে চেষ্টা

তামাক—ফাঃ, তম্বাকু, ফরাসী Tabac.

তুরন্ত—হিন্দী, শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ।

তদ্‌বী-নবিশ—আঃ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

তুঁত, তুৎ—আঃ, তুত।

তুতিয়া—ফারসী শব্দ।

তোসদান—ফারসী তুষদান।

তীর—ঘরের ছাদের কড়িকাঠ অর্থে, ফারসী শব্দ।

তেজ-আব—ফাঃ, Aqua fortis.

তিন করা—(হিন্দী দেনী—কিছু?) তিরস্কারে কথিত; যথা, ছেলের নেই তিন করেছে।

তুখোড়—কর্ম্মপটু, ধূর্ত্ত, চালাক।

তুলা—শব্দকোষে 'তুলা' বানান লেখা উচিত বলা হইয়াছে; কিন্তু 'তুলা' তুলনা ও তুলদাঁড়ি অর্থে ব্যবহৃত হয়; সং তূল হইতে তূলা রূপ রাখিলে তুলা ও তূলার আকারগত পার্থক্য রাখা যায়। তুলার বেলা ধুলা লিখিলেও ক্ষতি নাই।

তনতনিয়া, তনতনে—তারের বাদ্যযন্ত্রের তার কসিয়া বাঁধিলে যে ভাব হয় সেইরূপ; যথা—সর্দ্দিতে মুখ তনতন করছে, মুখ তনতনে হয়েছে; ওর গলা তনতনে।

তমতম—অতি রসে পূর্ণ হওয়া; যথা সর্দ্দিতে মুখ তমতম করছে।

তোবড়া, তুবড়া—তুম্ব শব্দজ? ঘোড়ার মুখের সঙ্গে সংলগ্ন দানা ভুষির থলিয়া।

তসনস, তহনছ—আরবী তহস্ (সংগ্রহ, জমা), নস্‌হ্ (ছড়ানো) হইতে অর্থ কোনো বস্তু নষ্ট করিয়া ফেলা।

তর্—ফার্সী শব্দ, তাজা; তাহা হইতে মুগ্ধ। যথা—তোমায় দেখিলে প্রাণ তর্ হইয়া যায়।

তাড়স—sympathetic symptoms of any disease; কোনো রোগের জন্য আনুষঙ্গিক উপসর্গ। যথা, ফোড়ার তাড়সে জ্বর হয়েছে।

তেপায়া, তেপায়া—Tripod, তিন পদ বিশিষ্ট কাঠের ছোট টেবিল। তে সে (ফার্সী সিহ্—তিন) পায়া (নির্জীব পদার্থের পদ)।

তড়পা—হিন্দী তড়প্‌না—লাফানো। তাহা হইতে যে রোগে রোগী লাফাইতে থাকে; মৃগী, অপস্মার, শিশুর Convulsions.

তাহদ্দ—ফার্সী তা (পর্য্যন্ত) আরবী হদ্দ্ (সীমা), যৎপরোনাস্তি।

তিরন্দুৎ—ছুতারের কাঠে ছিদ্র করিবার তীর ও ধনুক। ফার্সী তীর (বাণ) জদন্ (আঘাত করা)—যে যন্ত্র দিয়া তীর বিদ্ধ করা যায়।

তুরুম—ফরাসী Tronc (উচ্চারণ ত্রঁ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। মানে গাছের গুঁড়ি, তাহা হইতে ইংরেজিতে যাহাকে বলে stock (গুঁড়ি)। গাছের গুঁড়ি (stock বা tronc) কাটিয়া হাত পা বদ্ধ করিবার যন্ত্র তৈয়ারী হয় বলিয়া যন্ত্রেরও ঐ নাম।

তাইরে নাইরে—তাহা এবং তাহা নয় করা, অর্থাৎ মিছাকাজে সময় কাটানো। তা—না—না—না করা। গান গাহিবার কথা না পাইয়া বাজে কথায় সুর জুড়িয়া গাওয়া।

তবলদার—কাঠুরিয়া, কাঠছেদক, যে লোক কাঠ কাটিয়া দেয়। ফার্সী তবর্ (কুঠার)+দাশ্‌তন (রাখা)=যে কুঠার রাখে। মালদহে এক জাতি আছে যাহাদের ব্যবসা কাঠকাটা, তাহাদের নাম কুড়োল, কুড়ালি দ্বারা কাজ করে যাহারা। তবলদার শব্দ হুগলির গঙ্গাধারে খুব প্রচলিত।

তবিয়ৎ—আরবী, স্বাস্থ্য।

তই, তৈ—চিটুকে রন্ধনপাত্র, frying pan, মাল্‌পো ভাজিবার পাত্র।

তর—বিলম্ব, যথা, তোমার যে একটু তর সয়না দেখছি। আরবী তরহ =ভিত্তি (?)।

তলাসী আলো—search-light.

তাই—তাহাই ; যথা—আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই ওগো তুমি তাই গো (রবীন্দ্রনাথ)। ফাঃ তাই=like, resembling.

তোলা আটপৌরে—যে জিনিষ তুলিয়া রাখিয়া অনরে সবরে ব্যবহৃত হয় এবং যাহা অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত হয়।

তলাঙ্কে—জানলা দরজার নীচে যে পীঠ কার উঁচু অংশ থাকে ; তলানির ভাব—যথা, কাপড়ের তলা দিয়ে যেও না তলাঙ্কে লাগবে।

তে-নর—তিন হালি, তিনটি মালাযুক্ত গহনা।

তকমা—ফার্সী তকমা=বোতাম, চাকতি, জরির কাজ করা কোনো পদার্থ। তুষমা (আঃ)—মেডেল।

তৎক্ষণাৎ—সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত বাংলা অব্যয় শব্দ। সেইক্ষণেই।

তক—পর্য্যন্ত। ফার্সী তলক্ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী তলক্।

তামাদী—শব্দকোষে তমাদী আছে।

তায়ফা—এক অর্থ দল, অপর অর্থ পরিক্রমণ, প্রদক্ষিণ, তাহা হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ। তায়ফাওয়ালী—যে স্ত্রীলোকের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাই ব্যবসা।

তেড়িয়া—তেড়া (হিন্দী টেঢ়া), তাহার ভাব ; বক্রভাব, উগ্রভাব। যথা, তোমার মতন তেড়িয়া মেজাজের লোক ত দেখিনি। এই শব্দটি প্রায় মেজাজ শব্দের সহযোগে ব্যবহৃত হইতে শোনা যায়।

তেলে বেগুনে জ্বলা—মানে কি তেলে বেগুনের মতো ক্রোধে পুড়িয়া মরা, না তেলে বেগুন দিলে যেমন সশব্দে জ্বলিয়া উঠে তেমনি হঠাৎ গর্জ্জন করা।

তেমাথা—অতি বৃদ্ধ। যথা উপকথায়, তেমাথার কাছে বুদ্ধি নিয়ো। বৃদ্ধের হাঁটু উঁচু হইয়া মাথার সমান হয়, তখন মাথার দুই পাশে দুই হাঁটু দুই মাথার ন্যায় দেখায়।

তে-সাঁধি—ত্রিসন্ধি, অতি সঙ্কীর্ণ স্থান।

তে-এঁটে—তিন আঁঠিযুক্ত (তাল)।

তাক—কোলঙ্গা অর্থে আরবী ফারসী শব্দও আছে।

থান—গোটা ; যথা, থান ইট ; থান রক্ত ; থান কাপড়।

থৈকল, থয়কল—কোনো এক ঔষধসামগ্রীর নাম।

থাড়ু—খাড়া। থাড়ুব্রত—যে ব্রতের সঙ্কল্প যে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাড় বা খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিব ; সূর্য্যব্রত, মালদহ জেলায় প্রচলিত ছিল।

থতানো—থতমত খাইয়া যাওয়া, থ হওয়া। থত ধাতু।

থোঁতা মুখ ভোঁতা—অপ্রস্তুত হওয়া, কাহারো নিকট লজ্জা পাওয়া বা অপমানিত হওয়া। পশুর মুখকে থুঁতি বলে ; থুঁতি প্রায়ই সূচালো লম্বা ধরণের হয় ; সেই থুঁতি ভোঁতা বা খর্ব্ব হইয়া যাওয়া মানে মুখের সামনে আঘাত পাওয়া।

থক—ধাতু, শ্রান্ত ক্লান্ত হওয়া।

দাঁড়—দণ্ড, গুণাহগার, গচ্ছা। দাঁড়-মুষা—ধাতু, কাড়িয়া চুরি করিয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে লওয়া। দণ্ড করিয়া ও মুষ করিয়া লওয়া। ডাঁর উচ্চারণও হয়।

দেখ—ধাতুর অর্থান্তর, অপেক্ষা করা ; যথা, আটটা পর্য্যন্ত আমি তোমাদের জন্যে দেখব, তার পর চলে যাব।

দং—দরুণ শব্দের সংক্ষেপ লিখন। (শব্দকোষে দরুণ শব্দের সঙ্গে আছে, পৃথকও থাকা উচিত ছিল। পরিশিষ্টে সমস্ত সংক্ষেপ লিখন একত্র করিয়া দিলে আরো সুবিধা হয়।)।

দমদম পাকের বালা বা মল—যে বালা বা মলের জোড়েন খুব দূরে দূরে এলানো মতন অথচ পাকের মোচড়গুলার ধার খুব উঁচু। ফারসী-দমদমা—উঁচু তোলা দুর্গপ্রাচীর।

দম্বল—কেবলমাত্র কলিকাতার শব্দ নয় ; হুগলির গঙ্গার ধারে, মালদহে প্রচলিত শুনিয়াছি। রাঢ় বলিতে যোগেশ বাবু বর্ত্তমান কোন্ কোন্ জেলা বুঝেন জানি না।

দর—দাম, আরবী দরাহিম (মুদ্রা) বা ফার্সী দিরাও (ফসল) শব্দ হইতে আসে নাই ত ?

দশকোশী—যে গানের সুর এমন চড়া যে দশ ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত শোনা যায়। আধুনিক কীর্ত্তনিয়ারা এই অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার করে।

দিলাসা—ফার্সী সান্ত্বনা অর্থেও ব্যবহার হয় ; ঘোড়ার গলায় থাপড় মারাকে দিলাসা দেওয়া বলে।

দুধ—স্তন ; বীরভূম, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় ব্যবহৃত, আধেয় অর্থে আধার।

দুলদুল—মহম্মদ-জামাতা আলীর প্রসিদ্ধ ঘোটক। ফার্সী শব্দ।

দেয়া—মেঘ ; যথা, গুরু গুরু দেয়া ডাকে (রবীন্দ্রনাথ), রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে (জ্ঞানদাস)। দেবা শব্দজ ?

দোতলা, দোতালা—দ্বিতল গৃহ।

দোমনা—দ্বিমনা, দ্বিধান্বিত। (শব্দকোষে দুমনা আছে এবং সমাসে দু=দো তাহাও আছে)।

দুলমা, দোলমা—যে নারিকেলের মধ্যে নরম শাঁস হইয়াছে। দোমালা শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ে ?

দাদী—দাদার (ঠাকুর দাদা) স্ত্রী, মাতামহী।

দোহর—দোহারা শব্দজ। গাত্রবস্ত্র, দোলাই। মালদহে কথিত।

দাঁতাল—দন্তুর, দন্তবিশিষ্ট ; যথা, দাঁতাল হাতী, দাঁতাল আর মাতাল।

দাঁত থামাটি মারা—অধর কামড়াইয়া উপরের দন্তপংক্তি বিকাশ করা ক্রোধে বা ভয় প্রদর্শনে।

দমসম—শব্দকোষে দম শব্দের অন্তর্গত 'সমেদম' দেখুন। দমসম প্রচলিত, সমেদম শুনি নাই।

দারুণ—ভয়ানক। সং

দৃষ্টিদেওয়া—(প্রায়ই) কুদৃষ্টি দেওয়া, নজর দেওয়া, লুব্ধ দৃষ্টি দেওয়া।

দমনি—কপাটের হাঁসকল যে কীলক আশ্রয় করিয়া ঝুলে।

দাণ্ডি—দাণ্ডী-সংযুক্ত চেয়ারের আকারের পাল্কির অনুরূপ মনুষ্যবাহ্য যান।

দম্‌সানো, ধাম্‌সানো—দমানো, পা দিয়া থেঁৎলানো ; যথা, বিছানা ধাম্‌সো না বলছি।

দিয়ারা—আরবী দিয়ার, নদীর কিনার, চর জমি।

দাপ্‌সানো—দাপনা ধাতু, দর্প প্রকাশ করা, আস্ফালন করা ; তুং—আপ্‌সানো।

দই-কড়মা—শুভকর্ম্মের আনুষ্ঠানিক চিঁড়া মুড়কি ও দধির ফলার। প্রতিমাপূজার বিসর্জ্জনের দিন, বিবাহের পূর্ব্বদিন প্রতিমা বা বরকনেকে দইকড়মা খাইতে দেওয়া হয়। দই + কড়মা (কদ্‌মা বা কর্দ্দম ?)

দলুয়া, দলো—দল সম্বন্ধীয় ; যেমন এই পুকুরের জলে দলো গন্ধ ; ঐ লোকটা ভয়ানক দলো অর্থাৎ দল বাঁধিতে ওস্তাদ।

দাঁতে দড়ি—দাঁতে দড়ি বাঁধিয়া থাকা যেন কিছু খাইতে না পারা যায় ; তাহা হইতে অর্থ অনাহার, যথা, লোকটা আজ তিন দিন দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে' আছে।

দৌড়ঝাপ—ধাবন ও লম্ফন।

দাদুয়া, দেদো—দদ্রু রোগগ্রস্ত ; যথা, দেদো জানে দেদোর মর্ম্ম।

দাঁতি লাগা—মূর্চ্ছাবস্থায় দাঁতে দাঁত জুড়িয়া যাওয়া।

দখলাত্তি—দখল + আয়ত্ত। অনধিকারে স্বত্বাধিকারীর ন্যায় উপদ্রব।

দেধান—একপ্রকার শস্য ; তাহা ভাজিয়া খৈ হয়।

দীন—ধর্ম্ম। আরবী শব্দ। যথা, ছুটিল মোগল রক্ত-পাগল দীন দীন গরজনে (রবীন্দ্রনাথ)।

দারচিনি—ফারসীতে হুবহু এই শব্দ আছে, সুতরাং দারুচিনির অপভ্রংশ না হওয়াই সম্ভব।

দাই—ফারসী দাই—ধাত্রী, পরিচারিকা।

দুরমুশ—আরবী দবুস—নাদনা, মোটা লাঠি।

দমাদম—যথা, দমাদম মারতে লাগল—মুহুর্মুহু মার ; ফারসী দম-আ-দম—প্রতি নিশ্বাসে।

দানাদার—ফা; যাহাতে দানা বা বীজ আছে ; বিশেষ করিয়া কড়া পাকের রসগোল্লার নাম।

দোবারা—ফারসী শব্দ।

দূরবীন—ফারসী শব্দ।

দৌড়—তুলনীয়, আরবী দৌরাহ্—circuit.

দিহাত, দেহাত—গ্রাম, শহরের দূরবর্ত্তী স্থান। ফারসী শব্দ। দিহাতী—পাড়াগেঁয়ে।

ধরা (হাতে)—মিনতি করা ; যথা, তাহাকে হাতে ধরিয়া বলিলাম তবু সে শুনিল না।

ধরা (হাত)—বশীভূত, আয়ত্তের মধ্যে ; যথা, লোকটা আমার হাতধরা।

ধানী—ধানের তুল্য, যথা, ধানী রং, ধানী লঙ্কা।

ধোকড়—মোটা বস্ত্র ; যথা—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। তাহা হইতে বিশেষণ ধোকড়া=মোটা, গপ্‌স। মালদহে ধোকড় বাপ = step father, ধোকড় বেটা=step-son, কিন্তু 'ধোকড় মা' শুনি নাই, কিংবা বাপ ও বেটা শব্দের সহিত ছাড়া অন্য প্রয়োগও শুনি নাই। ধোকড় দোকর শব্দের রূপান্তর।

ধপল—কোনো স্থানে বা বিষয়ে উপস্থিত হইয়া নিজের দাবী ব্যক্ত করিয়া আসা।

ধিম—ধাতু, ধীর হওয়া ; যথা, আঁধা ধিমচ্ছে, লোকটা ধিমিয়ে পড়েছে।

ধড়মড়—ব্যস্ত হওয়া ; যথা, ঘুমের ঘোরে আচমকা ডাক শুনে লোকটা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ধরধরিয়া—অতি উজ্জ্বল, যাহা সমস্তকেই ধরিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া ফেলে ; যথা—ধরধরে আঁচ, অর্থাৎ যে আগুন সমস্ত ইন্ধনে ধরিয়া উঠিয়াছে তাহার আঁচ ; ধরধরিয়া বাহে, যাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

ধরাট—নৌকার খোলের উপর বাঁশের বাখারীর বাঁধা পাটাতন-খণ্ড।

নয়-ছয়—নষ্ট।

নাগরী—মানে খেজুর গুড় নহে ; গুড় যে কলসীতে থাকে, ডাবরী। যথা, এক নাগরী গুড়—এক কলসী বা ডাবরী গুড়, তা সে খেজুরো বা এখো দুই হইতে পারে।

নাদ—ধাতু, পশুর বিষ্ঠাত্যাগ।

নাদী—পশুর বিষ্ঠা।

নিখেকো—যে ব্যক্তি অধিক খাইতে পারে না। স্ত্রীলিঙ্গে নিখাকী।

নিজ—নির্দ্দিষ্ট, proper : যথা, নিজ হুগলিতে (অর্থাৎ in Hughly proper) আমার বাড়ী।

নেঙ্গড়া, নেংড়া—খঞ্জ। ফাঃ লঙ্গ্, হিন্দী লঙ্গ্‌রা।

নেঙ্গচা, নেংচা—লম্বা আকারের পান্তুয়া মিষ্টান্ন।

নেঙ্গা, নেঙা—যে বাঁ হাতে সকল কাজ সহজে করে, নেটা।

নেঙ্গার—গণ্ডগোল, জঞ্জাল, যাহা মানুষকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। লঙ্গর, লেঙ্গুড় শব্দের সহিত সম্পর্কিত ? ফাঃ ইঞ্জার—বিরক্তি, তাহার সহিত যোগ সম্ভব নয়।

নকুল্যে, নকলিয়া—যে নকল করিতে দক্ষ, যে রহস্যে পটু।

নিমকী—লেবুর আচার, লোণতা জিনিস।

নেকার বাঁত—সহচর শব্দ।

নিকেল—nickel ধাতু।

নেতা বা নাতাজোবড়া—নাতা বা নেতা জুবড়াইয়া বা ভিজাইয়া রাখা, অর্থাৎ ঘরনিকানো শেষ না করিয়া গোলার হাঁড়িতে নাতা রাখিয়া দেওয়া ; তাহা হইতে লক্ষণায়, কাজ শেষ না করিয়া ফেলিয়া রাখা।

নেপানে, ন্যাপানে—(লিপ্ত শব্দজ ?), যে গায়ে পড়িয়া আদর করে বা জানায়। চব্বিশ পরগণায় কথিত। শব্দকোষে নাপানি শব্দের সহিত অভিন্ন হইতেও পারে।

নিশান সই—ঢেড়া সই, লিখিতে অশিক্ষিত লোকের নাম সই করিবার বদলে কোনো চিহ্ন অঙ্কন।

নতুন খাতা—কারবারের বৎসরান্তে নূতন খাতা প্রবর্ত্তনের উৎসব। প্রায় ১লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হয়, কদাচিৎ রাম-নবমীতেও হয়।

না-ওয়ারিশ—যাহার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী নাই। ফার্সী শব্দ।

নিশ্চিন্তপুর—যমের বাড়ী যেখানে গেলে লোক নিশ্চিন্ত হয়।

নির্ণিমিখ—নির্ণিমেষ।

নাস্তি—ন + অস্তি, নাই।

নেজে গোবরে—গোরুর নেজ গোবরে সিক্ত হইলে যেরূপ হয়, অর্থাৎ অপরিষ্কার।

নেজে খেলা—মাছ যেমন সময়ে সময়ে পাখা না নাড়িয়া, কেবল মাত্র নেজ নাড়িয়া নিজেকে ভাসাইয়া স্থির হইয়া থাকে, তেমনি, অর্থাৎ গোপনে গোপনে কাজ করা—ধূর্ত্ততার লক্ষণ।

নেঙুর, লেঙ্গুর—ল্যাজ, লেজুড়। যথা, বানরের মতো আকার প্রকার নেঙুর দিতে ভুলেছে (অজ্ঞাত রচয়িতা)।

নিটপিটে—(শৃঙ্খলাহীন বা ধ্বন্যোষর্ণায় নহে); অলস, মন্থরকর্ম্মী, যাহার কাজে বিলম্ব হয়, লিড়বিড়ে। লটপটে শব্দজ?

নাড়া (মুখ, নাক, নথ, হাত)—খোঁটা দেওয়া, তিরস্কার করা।

নাজেহাল পেশমাল—প্রায় এই শব্দ একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

নাবড়িগড়ে—দুরন্ত, চঞ্চল, যে লাফাইয়া ডিঙ্গাইয়া চলে।

ননদশামী—নববধূ কর্ত্তৃক ননদের তুষ্টি বিধানের জন্য দেয় দক্ষিণা। ননদ+ক্ষেম সম্বন্ধীয়।

ননদপেটারী—নববধূ কর্ত্তৃক ননদকে দেয় বস্ত্রাভরণের পেটারী।

নবাত—আরবী নবাৎ—উদ্ভিজ্জ। তাহা হইতে?

নঙ্গর—ফার্সী লঙ্গর, নৌকা আটকাইবার কাঁটা-যন্ত্র।

নাকে কাঁদা—নাকি সুরে খুঁৎখুঁৎ করা।

নিকামাইয়া, নিষ্কামাইয়া—যাহার সময় নিষ্কর্ম্মে কাটে।

নাস্তা থাস্তা—ফা: না-খাস্তা, না চাওয়া, দরকার না থাকা। তাহা হইতে, নষ্ট ও বিকৃত করিয়া ফেলা। নাস্তা নাবুদের সাদৃশ্যে বা অনুপ্রাসে না-খাস্তা নাস্তা খাস্তা হইয়া গিয়াছে।

নাকচ—ফা: না-কস—অপদার্থ; বাতিল, অগ্রাহ্য। শব্দকোষে নাখচ; কিন্তু নাখচ বলিতে কাহাকেও কখনো শুনি নাই।

নাও—ফা:; সং নৌ, নৌকা। নাও অনেক জেলায় প্রচলিত শব্দ।

নইচা—ফা:, নৈচে, হুকার কাঠ।

নাকাল—আরবী নকাল—শাস্তি, কাহাকেও এমন শাস্তি দেওয়া যে সে আর সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে।

নওরোজ—ফা:, নব বৎসরের উৎসব।

নেওয়ার—আরবী শব্দ, হিন্দীতে পরে আসিয়াছে।

নিক, নেক—ফা:, উত্তম, সদয়, যথা, নেকনজর।

নেতা, নাতা—ঘর নিকাইবার বস্ত্রখণ্ড। নেতি, নেত্তি, লেত্তি—শ্লেট মুছিবার সিক্ত বস্ত্রখণ্ড; লাট্টু ঘুরাইবার দড়ি। cf. H. লত্তা, P. লৎরা—টুকরা।

নোল—লোল; আলগা, চলকো। টানটান বাঁধা সূতা প্রভৃতিতে নোল দিলে সূতা ঝুলিয়া পড়ে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-স্বয়ম্বর

নূতন বিধান বঙ্গভূমে নূতন ধারা চল্‌ল রে,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের আগুন জ্বল্‌ল দেশে জ্বল্‌ল রে।
কুশণ্ডিকার নয় এ শিখা, এ যে ভীষণ ভয়ঙ্কর,
বঙ্গ-গেহের কুমারীদের দুঃখহারী রুদ্র বর।
মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুন তখন শরণ-ঠাঁই,
মৃত্যু তখন মিত্র পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই।
মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুন তখন শীতল হয়,
ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে শান্তিময়।

* * *

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হ'তে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে।
আগুনে সে প্রাণ স'পেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে ; বেঁচে আছে পুরুষজাতির অপৌরুষ।
অগ্নি তুমি পাবক শুচি, আজকে তুমি রত্নধা,
পরম পুণ্যে লাভ ক'রেছ নারীকুলের এই সুধা।

* * *

চলে গেছে মায়ার পুতুল শূন্য ক'রে মায়ের কোল,
চলে গেছে শুব্ধ ক'রে পণ্য-পণের গণ্ডগোল।
বাপের ভিটা রইল বজায়, হ'ল না সে বেচতে আর,
দায় আপনি বিদায় হ'ল জীবন-লীলা সাঙ্গ তাঁর।
না জানি কোন্ স্বর্ণ-হাঙর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলেছে,
(আজ) লুপ্ত-লজ্জা লোলুপতার ভাগ্যে ক্ষোভের
ক্ষার মিলেছে।

* * *

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়হীন
করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত বার করেছে তে-পায়া।
ধার করেছেন পুত্রবন্ত উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ম্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!
এদের নিশাস লাগলে গায়ে বুকের রক্ত যায় থামি ;
চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করে সমাজ-মান্য গুণ্ডামি।
স্নেহ যাদের দেহের ধাতু, মমতা যার প্রাণের কথা,
সঙ্কোচে সেই নারী মরে চক্ষে হেরে নির্ম্মমতা।
মনে মনে যাচ্ছে মরে কসাই-হাটের কাণ্ড দেখে,
শ্বশুর খোঁজেন বাপের মান-রূপের গলায় চরণ রেখে।

* * *

ক্ষীণ যে পুরুষ সেই অমানুষ, হৃদয় তাহার নিষ্করুণ,
উদারতার ধার ধারে না, বীর্য্যবিহীন সে নির্গুণ।
অক্ষমে কি জানবে ক্ষমা? চির-কৃপার পাত্র সে,
প্রত্যাশী সে,—পরগাছা সে,—বৃহৎ উকুন মাত্র সে।
কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা!—পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই নয়!
ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদগতি,
কামড় তাঁদের অর্দ্ধ রাজ্য,—পরের ধনে লাখপতি।
হায় অভাগ্য! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলচাঁদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।

বিয়ে ক'রে কিন্‌বে মাথা,—তাতেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড়পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ্' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে খুদ সাঁধিয়ে,
আসবে শ্বশুর সোনাপাখী, সোনায় দেবে দাঁত বাঁধিয়ে।
চাই শ্বশুরের সোনার কাঠি সুপ্তভাগ্য চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা জীয়াতে।

* * * *

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।—(সঞ্জীবনী হইতে)

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপ রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি ?
যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ,—
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,—
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ,—যারাই গৃহ,—কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জ্জন,—
পুরুষ জাতির প্রথম পুঁজি দুঃখ-ভোলা যাদের মন,

উচ্চে তাদের করবে বহন, উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত না'ক ভিখ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।
যৌবনও সে সত্য ছিল,—প্রতিষ্ঠিত পৌরুষে,
ছিল না'ক লোলুপ দৃষ্টি শ্বশুর-বাড়ীর মৌরুশে।
যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান ;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

বাংলা দেশের আশার জিনিস্! ওগো তরুণ সম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায় ;
হাতে তোমার রাখীর সুতা, কণ্ঠে তোমার নূতন গান,
জগৎজুড়ে নাম বেজেছে, রাখ গো সেই নামের মান ;
অপৌরুষের শেষ-রেখাটি নিজের হাতে মুছতে হবে,
কন্যা-বলির এই কলঙ্ক লুপ্ত কর তোমরা সবে।
সকল প্রজার প্রজাপতি পরিণয়ে প্রসন্ন,
তাঁর আসনে কদাচারী কুবের কেন নিষণ্ণ ?
তোমরা তরুণ ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক
মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ বিসর্জ্জন।
পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদির হাট।
তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্ব জনে দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা
পোষণ—পাপ।
সতীদাহ গেছে উঠে কন্যাদাহ থাকবে কি ?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, কলঙ্কের শেষ রাখবে কি ?

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বঙ্গভূমির নন্দিনী,
রাজপুতানার কিষণ-কুয়ঁার আজকে তাহার সঙ্গিনী।
অম্বা তাহার চুমে ললাট,—উপেক্ষিতা সেই নারী,—
য়ুদীয়া-গ্রীস্-রোম-কুমারী স্বর্গপথে দেয় সারি।
বাপের ব্যথার ব্যথী মেয়ে কোমল স্নেহের লতিকার
ফুরিয়ে গেছে মর্ত্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতিকার,
নারীর মান্য কর্‌তে বজায় গেছে মরণ পায় দলি
দেশের দশের অপরাধের নিরপরাধ এই বলি।

* * *

স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী, মৃত্যু তাহার বিফল নয়,
আত্মদানের সার্থকতা ওতঃপ্রোত বিশ্বময়!
মৃত্যু দানে নূতন জীবন মৃত্যুঞ্জয়ী নারী নরে,
জট্-পাকানো সংস্কারের নাগপাশে সে ছিন্ন করে।
হায় বালিকা! তোমার কথা জাগ্‌বে দেশের অন্তরে,
তোমার স্মৃতি লজ্জা দিবে পরপীড়ক বর্ব্বরে।
দেশাচারের জাঁতার তলে জীবন দেছ কল্যাণী!
টল্‌ল এবার বিধির আসন তোর মরণে রোষ মানি।
দশের মুখে ধর্ম্ম আজি তাইতে জেগে উঠ্‌ল রে!
টনক্ নড়ে' উঠ্‌ল জাতির, পাপের প্রভাব টুটল রে!
স্বর্গে গেছ পুণ্য-শ্লোকা! মৃত্যু তোমার অভিজ্ঞান,
মৃত্যু-স্বয়ম্বরের স্মৃতি দহুক দেশের অকল্যাণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরপণ

(গল্প)

১

মহেশ বাবুর একমাত্র পুত্র সতীশ যখন এম-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইল তখন মহেশ বাবু পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘটকেরা কত মেয়ের সংবাদ লইয়া আসে, মহেশ বাবু কত মেয়ে দেখিলেন, কিন্তু কোনটিকেই তাঁহার আর পছন্দ হয় না। ছেলে তাঁহার এম-এ পাশ করিয়া হাকিম হইয়াছে, তাহার যোগ্য মেয়ে হওয়া চাই ত। মেয়েটি প্রথমত নিখুঁত সুন্দরী হইবে, নতুবা ছেলের মনে ধরিবে কেন? তাহার বেশ লেখাপড়া জানা চাই, নতুবা সে এম-এ পাশ-করা হাকিম স্বামীর মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে কেন? তাহার পিতার মেয়েকে গা-ভরা অলঙ্কার এবং অন্তত পক্ষে হাজার পাঁচেক বরপণ দিবার সঙ্গতি থাকা চাই, নতুবা তাঁহার পুত্রের বিদ্যার উপযুক্ত সম্মান হইবে কেন?

এমন রাজযোটক মেয়ে শীঘ্র মেলা দুষ্কর; সুন্দরী হয় ত লেখাপড়া জানে না; লেখাপড়া-জানা সুন্দরী হয় ত তাহার বাপ গা-ভরা অলঙ্কার এবং পাঁচ হাজার টাকা পণের দাবী শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

সতীশ একদিন আস্তে আস্তে পিতার কাছে আসিয়া বলিল—"বাবা, বিয়েতে পণটন কিছু নিয়ো না।"

মহেশবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

সতীশ লজ্জিত সম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পণ নেওয়া মানে ত ছেলে বেচা!"

মহেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যা যা, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। বেচা ত বেচা! তোর ওপরে ত আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তোকে আমি বেচেই টাকা নেবো। তোকে পড়াতে যে একগঙ্গা টাকা জলের মতন খরচ হয়ে গেছে, সে আমি আদায় করে নেবো না। চিরটাকাল পণ নেওয়া চলে আসছে আমাদের কুলিনের, এখন উনি দুপাতা ইংরিজি পড়ে বাপপিতমর চাল সব একদিনে পাল্টে দেবেন! তোর সঙ্গে শুধু বিয়ে করার সম্বন্ধ। যে দিন বলব, টোপর 'পরে' বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়ে করতে যাবি। আর কোনো কথা আমি তোর শুনতে চাইনে।"

সতীশ মাথা নত করিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

তাহার বন্ধুরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল—"কি হে সমাজ-সংস্কারক ভায়া! লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে' শেষে রাতারাতি পাঁচহাজারী মনসবদার হবার চেষ্টা! বক্তৃতার চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো—লোকে বলে। দৃষ্টান্তের বেলায় পঞ্চ-হাজার, বক্তৃতাতেও বাক্য দেদার!"

সতীশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলে—"কি করব বল! বাবার ওপরে ত আমি কথা বলতে পারিনে। আমার যখন ছেলে হবে তখন আমি কথায় কাজে মিল থাকে কিনা দেখিয়ে দেবো!"

সকলে তাহাকে পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া দস্তুর মতো লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

কিন্তু সতীশ পিতাকে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মা মারা যাওয়ার পর পিতা যে কী কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তাহা ত সে জানে। বাহিরের লোকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার উপর তাহার পিতার যে ষোল আনা স্বত্ব আছে তাহা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহার মায়ের সমস্ত গহনা একে একে বন্ধক পড়িয়াছে; প্রায় দু হাজার টাকা তাহার পিতার ঋণ। তিনি যদি পুত্রকে বিক্রয় করিয়াও ঋণমুক্ত হইতে চাহেন তবে তাহার আপত্তি করা শোভা পায় না। সতীশ নীরবে বন্ধুদের সকল বিদ্রূপ সহ্য করিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর মহেশবাবুর মনের মতন একটি মেয়ে মিলিল। তাহারই সহিত সতীশের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়া গেল।

২

বিবাহের পরদিন সতীশের শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ে জামাই বিদায় করিবার ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সতীশের বাড়ী যাইবার জন্য কোনো রকম ইচ্ছা বা উদ্যোগ প্রকাশ পাইতেছিল না—সে চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াই ছিল।

পাল্কীতে বৌ তুলিয়া মহেশবাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন—"সতীশ, সতীশ কৈ?"

সতীশকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। সতীশকে খুঁজিতে চারিদিকে লোক ছুটিল। দেখিল সতীশ বিছানায় শুইয়া পায়ের উপর পা চড়াইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে পা নাড়াইতেছে—যাহারা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে যেন বলিতেছিল, না, না, না।

তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার শ্বশুর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা, অসুখ বিসুখ কিছু করেনি ত?"

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে না।"

শ্বশুর বলিলেন—"তবে এস; তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন।"

সতীশ দিব্য প্রশান্ত সহজ ভাবেই বলিল—"তাঁকে বলুন গে আমি ত এখন বাড়ী যেতে পারছিনে। আমার কিছুদিন এখন এখানেই থাকতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সতীশের শ্বশুর মনে করিলেন জামাই ও বেহাই দুজনে কিছু ঝগড়া ঝাঁটি হইয়া থাকিবে বোধ হয়। তাই তিনি জামাতাকে আর কিছু না বলিয়া বেহাইকে গিয়া বলিলেন—"বেয়াই মশায়, সতীশ বলছে সে এখন বাড়ী যেতে পারবে না।"

মহেশ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

সতীশের শ্বশুর বলিলেন—"কেন, তা ত জানি নে, জিজ্ঞাসাও করলুম না। মনে করলুম হয় ত আপনার সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়া টগড়া করে' অভিমান করেছে; তাই আপনাকে বলতে এলুম।"

মহেশ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ঝগড়া? না! আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার মতন ছেলে ত সে নয়। কি হয়েছে চলুন ত দেখি। কোথায় সে?"

মহেশ বাবু বৈবাহিকের সঙ্গে সতীশের নিকট আসিয়া বলিলেন—"সতীশ, বৌমা পাল্কীতে বসে রয়েছেন, আর তুই এখানে বসে রয়েছিস? রকম কি! বাড়ী চ।"

সতীশ বলিল—"আমি ত এখন কিছুদিন বাড়ী যেতে পারছিনে বাবা। তুমি তোমার বউ নিয়ে বাড়ী যাও, আমি কিছুদিন পরে যাব।"

মহেশ বাবু অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কিছুদিন পরে যাবি কি? হয়েছে কি তোর?"

সতীশ মাথা নত করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—"আমি এঁদের ক্রীতদাস হয়েছি—তুমি ত আমায় পাঁচ হাজার টাকায় এঁদের বেচে গেলে। আমি রোজগার করে' এঁদের পাঁচ হাজার টাকা সুদ সমেত শোধ করব আগে; তারপর এঁরা আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে

আমি তোমার কাছে ফিরে যাব। তার আগে ত আমার যাবার জো নেই।"

মহেশ বাবু অবাক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; সতীশের কথা শুনিয়া তাহার শ্বশুরের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেশ বাবু মনে মনে একবার কল্পনা করিলেন তাঁহার সেই নিরানন্দ নির্জ্জন পুরী—সেখানে তাঁহার পত্নী নাই, সতীশ নাই; একা তিনি আর তাঁহার বৌমাটি! এই বালিকা বধূকে যত্ন করিবার ও সঙ্গ দিবার কেহ নাই, তাঁহার সতীশ পরের বাড়ীতে দাসত্ব স্বীকার করিয়া খাটিয়া খাটিয়া মাসে মাসে অল্পে অল্পে তাহার পণের ঋণ শোধ করিতেছে! মহেশ বাবুর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। একবার সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সতীশের শ্বশুরকে পাঁচ হাজার টাকার তোড়া ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"বেয়াই মশায়, আপনার টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, সতীশকে আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে অনুমতি করুন!"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিংশশতাব্দীর বর

(১৩০৮ সালের "প্রবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত)

"উলু, উলু, উলু, উলু!" উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে, বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা!
সে হাসি-নির্ঝরে ভাসি যত দাসদাসী
দেয় উলু।—রাঙা দিদি, মহাক্রোধে আসি,
রাঙাইয়া দুই আঁখি, কহেন, "সাবাসি
তোদের উলুর কাণ্ড! হারাইলি জ্ঞান,
ওলো বিন্দি! বহাইয়ে আনন্দ-তুফান,
বহাইয়ে দিবি কি লো সমস্ত কাটরা * ?
সাবাসি বুকের পাটা! হাসির কি গর্‌রা!
কোথা বিয়ে! কোথা বর! কিছু নাহি ধার্য্য!
হ্যা দেখ হাসির ঘটা, উলুর ঐশ্বর্য্য!"
দত্তজা (বাড়ীর কর্ত্তা) সে মধ্যাহ্নকালে
অন্তঃপুরে নিজকক্ষে, আলুবোলা গালে
পুরি, ছিলেন আরামে। তাম্রকূট-ধূম
আনিত মুহূর্ত্ত-পরে আনন্দের ঘুম!
এ উলু-চীৎকার শুনি নাসিকার ডাক
গেল থামি; ধায় বুড়া, হইয়া অবাক্!
"কি হয়েছে? কি হয়েছে?"
"বর আসিয়াছে।"
গৃহিণী রাগিয়া ক'ন, "যমে কি ধরেছে
তোদেরে লো বিন্দি দাসী?" বিন্দি হাসি কয়,
"বাহিরে এসেছে বর,—এসেছে নিশ্চয়!—
উলু, উলু, উলু, উলু!—কন্যা তব ধন্যা;—
এমন সুন্দর বর!"
"এ হাসির বন্যা
থামাইব ঝাঁটা পিটি!" রাঙা দিদি রাগি
ছুটিলেন গৃহকোণে, সম্মার্জ্জনী লাগি!
গৃহিণী হাসিয়া ক'ন, ধীরে ঝাঁটা কাড়ি,
"ছোট খুড়ি! বিন্দি দাসী এত বাড়াবাড়ি
করিতেছে, আছে কিছু ইহার ভিতর!
চল জানেলার কাছে, চল মা সত্বর।"

এখনো বিবাহ-দিন হয় নাই ধার্য্য।
এখনো টাকার পণ (আসল যা কার্য্য)
হয় নি জোগাড়। কর্ত্তার ভাবী বেয়াই
(ম'রে যাই ল'য়ে তাঁর গুণের বালাই!)
চাহিয়াছিলেন পূর্ব্বে বিশ হাজার মুদ্রা!
দত্তবাবু-চক্ষু হতে পলাইল নিদ্রা
সে প্রস্তাব শুনি; বহু বাক্যব্যয়,
বহু পত্র-লেখালেখি করিল উভয়
পক্ষ। লক্ষ কথা পরে হইল নিশ্চয়,
বরকর্ত্তা লইবেন দশ হাজার মুদ্রা
কন্যাকর্ত্তা-ভাণ্ডার হইতে! এবে নিদ্রা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় দত্তবাবু-চক্ষে;
চিন্তা-রাক্ষসীটি কিন্তু দিবানিশি বক্ষে
শুষিছে রুধির! বাপু, টাকাটা কি কম?
বঙ্গের বেয়াই! তুমি মানুষ?—না যম?

---

* কাটরা এলাহাবাদ সহরের একটি পাড়া।

বিংশশতাব্দীর বর।

"উলু, উলু, উলু, উলু!" সে আনন্দধ্বনি
ঘটাইল অন্তঃপুরে রঙ্গ-রণু-রণি!
না হইতে 'আশীর্ব্বাদ' আসিয়াছে বর—
বধূ ও কন্যার দল ভাবিয়া ফাঁফর।
তবু এ উলুর নেশা ধরিল সবারে।
পাড়ার রূপসীদল কাতারে কাতারে
ছুটিল গবাক্ষদ্বারে, জানেলার ধারে!

এ মধ্যাহ্নকালে তারা বিন্তি, গ্রাবু, পাশা,
খেলিতে আসিয়াছিল। হেরিতে তামাসা
ছুটিল সকলে! বল কোন্ বাঙ্গালিনী
নীরবে বসিতে পারে, শুনি উলুধ্বনি?
কাহারো মোহন খোঁপা হইয়া চঞ্চল
ধরিল ভুজঙ্গবেশ! কাহারো অঞ্চল
ভূমিতে লুটায়ে পড়ি', মাথা খুঁড়ি বলে,
"হে সুন্দরি, ধূলি পরে তুমি যাবে চ'লে;—

তাও কভু হয় ? পাদপদ্ম দয়া করি
মহিমাগৌরবে রাখ, হে বর-সুন্দরি,
এ দেহ-উপরি ! মম এ ক্ষৌম-জীবন
হউক সফল, ধরি ও রাঙা চরণ !”
কোনো ধনী, স্বামীর বিনামা হস্তে ধরি',
ধূলি ঝাড়ি', রাখিতেছিলেন যত্ন করি'
সজ্জা-গৃহে। অকস্মাৎ উলুধ্বনি শুনি'
(হরিণী শুনিল যেন বাঁশরীর ধ্বনি !)
অন্যমনা হ'য়ে ধনী, মাথায় বহিয়া
জুতাজোড়া, তীরবেগে চলিল ছুটিয়া !
কোন বধূ তাম্বূলটি সাজিয়া যতনে
আনিতেছিলেন হর্ষে, দিতে সখী জনে।
কোথা সখী ? অকস্মাৎ উলুর মুরলী
শুনি ধনী, শিষ্টাচার সব গেল ভুলি !
পুরি দিয়া সাজা পান আপন অধরে
অন্যমনে উল্কাবেগে ছুটিল সত্বরে !
কোনো ধনী আনিবারে ল্যাভেণ্ডার-জল,
কক্ষে পশি, উলুধ্বনি শুনিয়া চঞ্চল,
ছুটিল বগলে করি কালীর বোতল !
তনয়বৎসলা কোনো লজেঞ্জেস্‌গুলি
মুখে পুরি (হর্ষে, আকুলি ব্যাকুলি,
শুনি' সে উলুর ধ্বনি !) চলিল ছুটিয়া !
পিছে ক্ষুদ্র শিশু ধায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া !

বাহিরে অদ্ভুত দৃশ্য ! লোকে লোকারণ্য !
উপস্থিত তথা কত গণ্য আর মান্য
বঙ্গের কৃতী সন্তান ! একি রে তামাসা !
সকলে অবাক, কারো মুখে নাই ভাষা !
কর্ত্তা ক'ন হাত যুড়ি, “ভায়া অবিনাশ, *
কর দেখি ডায়েগ্নোস্ ! একি সর্ব্বনাশ !
ভবিষ্য জামাই মম, হ'ল কি পাগল ?
দড়াদড়ি দিয়ে এর প্রত্যঙ্গসকল
বেঁধেছে কি ল'য়ে যেতে বাতুল-আগারে ?”
সহাস্যে ডাক্তার ক'ন, “এ মস্ত ব্যাপারে
নাহি মম হস্ত ! Your son-in-law is sound.
Can't guess why with ropes he is bound.”
ছিলা বসি মধ্যস্থলে শ্রীরাম দারোগা।
কৌতুক-বিষাদে ক'ন, “আমি কি অভাগা !
এত দড়াদড়ি, তবু মাথায় টোপর !
অপরের করধৃত, তবু নহে চোর !”

এতক্ষণ চুপ করি, সব রসিকতা
লোকটি শুনিতেছিল, বিনা কোন কথা।
সহাস্যে পিয়ন কহে, “ডাকের পেয়াদা
আমি। বাবু, আপনারা নূতন কায়দা
শোনেন কি ? এ বৎসর হইয়াছে জারি।
আমারে বক্‌শিশ্ দাও, যাই অন্য বাড়ী।
সন্ধ্যা হবে ; লও এই নূতন দুলাহা *।
তৃষ্ণায় বরের মুখ শুকায়েছে, আহা !
দশহাজার টাকা দিয়া, ভি-পি প্যাকেট্
লও বাবু ; আমি যাই, হইতেছে লেট্।”
পিয়নের কথা শুনি' হাসিল সকলে
উচ্চশব্দে ! অনেকেই ভি-পি পার্শেলে
শুধাইল, “ওহে বর ! দ্বিতীয় পিক্‌উইক,
ওহে ডন কুইক্সোট, অঙ্গদ রসিক,
কথা কও, শুনি অঙ্গদের রায়বার,
কেমনে লাঙ্গুলদণ্ডে, লোভেতে কলার,
অপার সমুদ্র লঙ্ঘি', আইলে এ পার ?”
পাশে ছিলা বসি' তথা সাহিত্য-আনন্দ,
“প্রবাসী”র সম্পাদক, বন্ধু রামানন্দ।
তাহারে বলিনু আমি, “এত দিন পরে
তোমার ভবিষ্যবাণী, অক্ষরে অক্ষরে,
ফলিয়াছে ! তুমি যারে “সঞ্জীবনী”-পত্রে †
কল্পনায় হেরেছিলে, এ প্রয়াগক্ষেত্রে

* এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ডাক্তার বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* দুলাহা—বর।

† ১৩০৮ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীর সম্পাদক সঞ্জীবনীতে ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে বর প্রেরণ সম্বন্ধে একটি নক্সা লিখিয়াছিলেন।

এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর,
ভি-পি পার্শেলেতে মরি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।"
বন্ধু ক'ন, "ধন্য এই postal invention !
Truth is surely stranger than fiction."
বালকেরা দিল সবে মহা হাততালি।
বরের কানের কাছে গিয়া শত গালি
দিল কেহ—"বর, তুমি বড়ই উল্লুক,
বিংশ শতাব্দীর তুমি কেলুয়া ভল্লুক।
কোন্ মুল্লুকের "জু"র কোন্ জানোয়ার
বর তুমি? কানমলা খাও দশহাজার।"
"উলু, উলু, উলু, উলু!" একি গণ্ডগোল !
অদ্ভুত পার্শেল দেখি সবাই পাগল !
এত উলুউলুধ্বনি, এত যে আনন্দ,
গৃহকর্ত্তা রামদত্ত তবু নিরানন্দ।
ছেলেটি কার্ত্তিক যেন, বড়ই সুন্দর,
পুষ্পসম সুপ্রফুল্ল, হাস্য মনোহর,
এমু-এ পাশ, ওকালতী অতি শীঘ্র দিবে—
এহেন জামাই-রত্ন ভাগ্যে কি ঘটিবে ?
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কর্ত্তা, কহিলা গম্ভীরে
ডাকের পেয়াদাটিরে স্তুতি ধীরে ধীরে,
"প্যাকেটে জামাই আসা, এ বড় অদ্ভুত !
পাঁচটি হাজার টাকা কেবল প্রস্তুত
আছে আজি; কালি দিব ধারধোর করি;
জামায়েরে খুলে দাও, কাটি দড়াদড়ি।"
ডাকের পিয়াদা ছিল ইংরাজি-নবিশ।
সে বলিল, "দেখ বাবু কি strict notice.
"To your address the bridegroom is sent,
Can't be delivered without full payment.' "
কথা শুনি কর্ত্তাটির সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বহিল। আমরা তাঁর মাথায় বাতাস
করিয়া, কহিনু চুপে, "লিখুন 'refused';
কাশীর কসাই তব বেয়াই কি goose !
নালিশ করিবে যবে, দেখে লব সবে,—
যা করে গোসাঞি, এবে ভাবিয়া কি হবে ?"

এত বলি ক্ষুদ্র এক কাগজ উপরে
লিখিয়া Refused কথা, বৃহৎ অক্ষরে,
গঁদ দিয়া আঁটি দিনু বরের কপালে।
হাসিয়া উঠিল সবে।

বাতায়ন-জালে
(হেরিনু) কন্যার মাতা কাঁদিলা নীরবে;
মূর্ত্তিমতী কাতরতা সে হাসি-উৎসবে।
বৈঠক হইল খালি, সবে গেল চলি।
বিন্দি দাসী, চুপে চুপে, হ'য়ে কুতুহলী
রাস্তায় ধরিল গিয়া ডাক-পেয়াদায়।
কহিল সহাস্যে বিন্দি, বাক্যের ছটায়.
ভুলাইয়া পেয়াদায়, "এই দুটি টাকা
লও বাপু—সোজা কথা,—বিন্দি আঁকাবাঁকা
কথা নাহি জানে—একবার গুপ্তদ্বার
দিয়া, খিড়কির দ্বার দিয়া, একবার
জামাতারে দেখাইয়া যাও। শাশুড়ির
বড় সাধ দেখিবারে তাঁর জামা'য়ের
চাঁদমুখ।"

ধন্য ওহে রূপার চাকৃতি !
আকাশে পাতালে মর্ত্ত্যে অব্যাহত গতি !
তোমার ডাকিনী মন্ত্রে কেল্লার ফাটক
যায় খুলি। যাও দেখি, কে করে আটক ?
পোষ্ট-দূত হইল রাজি; প্যাকেট লইয়া
খিড়কির দ্বার দিয়া, দুইজনে গিয়া
উপস্থিত অন্তঃপুরে। মুখ ফিরাইয়া,
কিছু দূরে, পোষ্টদূত রহিল বসিয়া।
রাঙা দিদি মৃদুহাস্যে নাতিনীরে টানি
আনি কহিলেন রঙ্গে, যোড় করি পাণি,
"ওহে চোরচূড়ামণি! প্রাচীর লঙ্ঘিয়া
সিঁধকাটি হাতে করি, কার ঘরে গিয়া
পাইলে সুন্দর শাস্তি ? দড়াদড়ি দিয়া
বাঁধিল তোমার দেহ, আদরে আঁটিয়া।
এই মোর নাতিনীর মন করি চুরি
যাও যদি, তবে বুঝি তব বাহাদুরি।"
লাজনতনেত্রে বালা চঞ্চল চরণে
পলাইল—যুবা চাহে আকুল নয়নে।

প্রেম বিশ্বনাথ কিন্তু লভিলা বিজয়।
সে শুভমুহূর্ত্তে, মরি উভয়ে উভয়
বাসিল রে ভাল, হ'ল চিত্ত-বিনিময়!
কতক্ষণ পরে ফিরি, দুষ্টা রাঙা দিদি
আইলেন, গৃহিণীরে লয়ে;—যথাবিধি
দধি, চিনি, থালে করি! মঙ্গল-আচার
সারিয়া চিবুক ধরি ভাবী জামাতার,
কহিলা গৃহিণী—"বাছা, রাগ করিও না;
টাকা নাই, তাই হ'ল এ ঘোর লাঞ্ছনা।
তুমিই জামাই হবে, ইহাতে অন্যথা
নাহি হবে।' আহা বাছা পাইয়াছ ব্যথা!
মা বলিয়া ডাক, বাবা, জুড়াক পরাণ।
আহা কি মধুর বাণী!—তোমার কল্যাণ
হোক্ বাছা, থাক তুমি চিরজীবী হ'য়ে।"
"কার্ত্তিক এসেছে বটে, দড়াদড়ি ব'য়ে।"
রাঙা দিদি হাসি কন। "থাকিতে ময়ূর
কেন এত হাঁটাহাঁটি? এত ঘোড়দৌড়?"
তারপর, একরাশ ফল আর মিষ্টি
আইল। জামাই ভাবে, একি সুধাবৃষ্টি!
পার্শেলের-রূপ-ধারী বলে সে জামাই
মনে মনে "কন্যা ছাড়া কিছুই না চাই!
সৃষ্টিছাড়া আজগুবি বাবার ব্যাভার।
আমি চাই ঐ কন্যা। ড্যাম্ দশ হাজার।"

সেই রাত্রে পোষ্ট্যাল নিয়ম অনুসারে
জামাই-ব্যারাকে বর, দিব্য কারাগারে
রহিলেন বন্দী। কিন্তু যবে রাত্রি শেষে
প্রহরী ও সান্ত্রী সব, দ্বারদেশে এসে,
নেহারিল, নাহি তথা সে পোষ্ট্যাল বর!
খোঁজ্! খোঁজ্! প্রহরীরা ভাবিয়া ফাঁফর।
ছিন্ন শুধু দড়াদড়ি মাটির উপর
প'ড়ে আছে। একি কাণ্ড! পলায়েছে বর!"
চূড়ান্ত মাতাল এক, সুরার পয়সা
না থাকিত যবে হস্তে, রঙ্গে নিজ পোষা

(দুগ্ধফেননিভবর্ণ, মুক্তাসম আভা;
টগর পুষ্পের মত লাবণ্যের প্রভা)
বিলাতী বিড়ালটিকে রাখিয়ে বন্ধক
কিনিত মদিরা! কিন্তু হ'য়ে পলাতক
বিদায়-মুহূর্ত্তে, দুগ্ধপাত্রে মুখ দিয়া,
চতুর মার্জ্জারবর যাইত ফিরিয়া
স্বামিগৃহে। সেইরূপ কারেও না বলি,
বিংশ শতাব্দীর বর গেল কিরে চলি?
কোতওয়ালি, চৌকি আর থানায় থানায়
প'ড়ে গেল হুলস্থূল। কোথা সে? কোথায়?

বুভুক্ষু শিকার-হারা ব্যাঘ্রের মতন
লোহিত নয়নযুগ, করিয়া ঝম্পন,
বরের মহৎ পিতা, কাশীর বেয়াই,
ল'য়ে সঙ্গে দশজন গুণ্ডা আর চাঁই,
আক্রমিল শ্বশুগৃহ। কিন্তু তথা একা
বিন্দি দাসী উড়াইয়া ঝাঁটার পতাকা,
হইল রে বিজয়িনী! গুণ্ডারা বলিল,—
"মহিষমর্দ্দিনী পুনঃ প্রয়াগে কি এল?"

তার পর মহাক্রুদ্ধ বরের বেয়াই,
উড়ায়ে বুদ্ধির ঘুড়ি, ঘুরায়ে লাটাই,
বুঝাইতে গেল কেস্ সতীশ ডাক্তারে*।
"ড্যামেজের নালিশ হইতে কি না পারে
হাইকোর্টে, on the original side;
যে হেতু ইহাতে আছে bridegroom, bride.
ডাক্তার সতীশ কন, "শুন মহাশয়,
বুদ্ধিতে তুমিই বড় একথা নিশ্চয়।
আমি কত পরিশ্রমে দশটি হাজার
পাইলাম। তুমি প্রতিভার অবতার
তুমি বিংশ শতাব্দীর প্রেমচাঁদ ছাত্র!
হেরি তোমায়, হিংসায় দহিছে এ'গাত্র।
একেবারে এক প্যাকেটে দশটি হাজার মেরে
নিতে প্রভু, মারাত্মক প্রতিভার জোরে!

* এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, এল্ এল্ ডী, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত।

Tush! I have no time to attend to your pranks.
Take away those silver coins! Declined with thanks.

অনন্ত স্ফুলিঙ্গ সেই বঙ্গের বেয়াই,
জেদের সে অবতার, মহাধূর্ত্ত চাঁই,
সদরামীনের কোর্টে "দশ হাজার চাই"
বলিয়া করিল রুজু ড্যামেজের কেস্।
অগ্নিশর্ম্মা হইলা শেষে ভস্ম-অবশেষ!
যথাকালে জজ্‌মেণ্ট হইল বাহির
একেবারে বেয়া'য়ের চক্ষু হ'ল স্থির!
"বাদী পাঠাইল এই অপূর্ব্ব প্যাকেট
প্রতিবাদী-পাশে বটে, কিন্তু এই ভেট
পাঠানর পূর্ব্বে, কেন না দিল নোটিশ?
এই হেতু মোকদ্দমা সমূলে ডিস্‌মিস্
হইতেছে। বাদী দিবে সমস্ত খরচা।"
বিন্দি দাসী হাসি বলে, "আচ্ছা হ'ল বাছা।"
চারিধারে হাস্যরোল! সবে বলে, "উল্লু
কোথা হ'তে এল হেথা? এ যে মহামল্লু!
বিংশ শতাব্দীর এ যে অপরূপ কল্লু!"

বর কোথা? বর কোথা? লুকায়ে কাশ্মীরে,
ছয়মাস মহানন্দে ঝরণার নীরে
স্নান করি, পাহাড়ের দৃশ্য হেরি নানা,
খাইতেছিলেন বর আঙুর বেদানা!
যবে পাইলেন টের পিতৃ-রোষাগ্নির
নাহি অবশেষ, পুত্র হইলা হাজির।
শালি শালাজেরা হেরি আহ্লাদে অস্থির।
বলে তারা, "বন থেকে হইল বাহির
সোনার টোপর মাথে বিহঙ্গ রুচির।"
বঙ্গের বেয়াই, তব কুলাপানা চক্র
কোথা গেল? কোথা গেল চাল তব বক্র?
"বিনা পণে দিব বিয়া।" হায় কি উদার!
কোথা গেল সেই শব্দ "দশটি হাজার"?
বর এল! বর এল! বাজিছে সাহানা
সানাইতে, কলহাস্যে ধায় পুরাঙ্গনা।
বিংশ শতাব্দীর বর আবার এসেছে।
এবার পার্শ্বেল নয়, মানুষ সেজেছে!
পড়ে গেল হুলস্থূল!—উৎফুল্ল নয়ন
দত্তজায়া জামাতারে করিলা বরণ।
খোলা হতে নামে লুচি, টগ্‌বগ্ ভাজা,
জিবেগজা, পানতুয়া, ছানাবড়া, খাজা,
মোতিচুর, সরপুলি, আর সরভাজা।
বিবাহ-উৎসব তুই পার্ব্বণের রাজা!
রাঙা দিদি হাসিছেন বদনে অঞ্চল;
কহিছেন, "থাম কবি, মুখে আসে জল।"
"উলু, উলু, উলু, উলু!" উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে। বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

একটি মন্ত্র

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্চে, অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন? সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে? সে কত পূজার অর্ঘ্য, কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে? তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে, কত যাদুমন্ত্র পড়েছে, তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে দেখা দিচ্চে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যং। অর্থাৎ যা-কিছু দেখ্‌চি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখিনে কেন? কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত "একটি," তাহলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখ্‌তে পেতুম। কিন্তু সে যে হল "এক," তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড় আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ

হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কি? বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ। তাতে বল্‌চে, জগতে কোনো জিনিষ একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে সুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠ্‌চে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করচে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয়, এ কথা বার বার চিন্তা করে কোন লাভ নেই। কিন্তু যেগুলি মানুষের অমৃত বাণী, সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে। মানুষের সেই রকম একটি অমৃতমন্ত্র কোন এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

কিন্তু মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে? কোথাও কিছুই ত স্থির হয়ে নেই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক আর হয়ে উঠ্‌চে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই-সমস্ত অরণ্য শ্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজি-বিজির মত কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে যাচ্চে। পাহাড় পর্ব্বতকে আমরা বলি ধ্রুব, কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য্য তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মত অন্ধকার-সমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এই জন্যই ত সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোনখানে?

সত্যের ত প্রকাশ এম্‌নি করেই, এই চির চঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গীও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলি তা নানা-খানা হয়ে উঠ্‌চে। তবু যে দেখ্‌চে সে আনন্দিত হয়ে বল্‌চে আমি নাচ দেখ্‌চি। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গীই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করচে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গীকেই মুখ্য করে দেখচি নে, আমরা দেখচি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুসি হয়ে উঠ্‌চি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে, সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে, কিন্তু যে গাড়ি চল্‌চে, তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়ত প্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার করে' তাদের যুক্ত করে' তাদের অতিক্রম করে' যদি সত্য না থাকে, তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলি বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বল্‌চে সমস্তই স্বপ্ন, নয় বল্‌চে সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ অতি ভীষণ। সে, হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে, নয় ভীষণ বিশ্বের দেবতাকে দারুণ উপচারে খুসি করবার আয়োজন করচে। কিন্তু যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গীর ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সঙ্গীতটি দেখতে পাচ্চে, সেই ত আনন্দের সঙ্গে বলে উঠ্‌চে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যবসা যখন চলে তখনি বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনি তা সম্ভব। সংসারে সমস্ত কিছু চলচে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্টো কথা; আসল কথা—সত্য বলেই সমস্ত চল্‌চে। তাই আমরা চারিদিকেই দেখচি—সত্য আপনাকে স্থির রাখতে পারচে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেচে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চল্‌চে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে? এ ত তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না। এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখছি। সত্যের রহস্য সবচেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায়, পশুপাখীতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত, তবে তার এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে ত একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই গ্রাসটুকুর মধ্যে আমরা কি দেখছি? যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলেছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করচে, মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক একটি ছোট ছোট তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে—ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখা দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখীতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মত ছুটে ছুটে বেরয়, সে হচ্চে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কি তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটে ঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সবচেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেই জন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। একদিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল, আর একদিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে' প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্ত্তে আছে। বস্তুত সেই বর্ত্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্ত্তে না-থাকা এবং বর্ত্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়-শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই ত চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মত পাথর করে' স্থির করে' রাখে, তবে বুঝি যে, সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্ত্তগুলিকে কেউ চকমকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মত বর্ষণ করতে থাকে, তাহলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে' পাইনে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্ব্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত; যা আপনাকে আপনি কেবলি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে; যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্চে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জান্‌তে পারচি। বুঝতে পারচি, এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতি-ক্রম করে আছে বলে' বিশ্বসংসার কেবলি চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এই জন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্চে বিনাশ—কেননা স্থিরত্বই হচ্চে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এই জন্যই বলা হয়েছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্চে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ, আর অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা-ফেলা একটা বাধায় ঠেকে, কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও একদিকে বাধা, আর একদিকে বাধামোচন; সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়;—সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে ঠেলাচ্চে এবং চালাচ্চে।

যে দিন এই কথাটি আমরা ঠিক-মত উপলব্ধি করতে পেরেছি, সে দিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সে দিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সে দিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু সত্যের পূজা ত কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে ত বর

পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্চে, তার দৈন্য দূর হচ্চে, তার তেজ বেড়ে উঠচে। কোথায় দেখেছি? যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়; যেখানে তার নব নব উদ্যোগ; যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি; যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই; যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্ব্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণ তেজে জ্বলে না, তখন সে ধোঁয়ায়, কিম্বা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে; তেমনি দেখা গেছে যে-জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলি বাঁধতে চেয়েছে, তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জ্জীব করে; কেননা সত্যের ধর্ম্ম জড়ধর্ম্ম নয়, প্রাণধর্ম্ম; চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে, তখনি বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারিদিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে; তখন তার রথ পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সঙ্কটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝরণার কলগান যেমন আরো জেগে ওঠে, তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর যারা মনে করে, স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলি জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটা-ক্ষেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম; নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়; একথা ভুলে যায় যে, যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল, সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কি, তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগতে পারলে না, সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম্ম কি, তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয়, সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে। কেননা, চলাই সত্যের ধর্ম্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই—কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড় করে দেখায়,—যেখানে আজও সে পৌঁছয়নি সেখান-টিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দ্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্যতাকে চলার দ্বারাই জানাচ্চে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্চি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ, সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে। সেই জন্যেই মন্ত্রে আছে সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ সত্য যার বাহিরের বিকাশ, জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলি হয়ে উঠচে মাত্র, অথচ সেই হয়ে ওঠা আপনাকেও জানচে না, কাউকে কিছু জানাচ্চেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে, অমনি যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারেনি বলেই মানুষ বলেছে, সত্যং জ্ঞানং, সত্য সর্ব্বত্র, জ্ঞানও সর্ব্বত্র। সত্য কেবলি জ্ঞানকে ফল দান করচে, জ্ঞান কেবলি সত্যকে সার্থক করচে, এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই ত হল যা-কিছু—এই ত হল জগৎ। চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্চি—বল কাজ করছে,—স্বাভাবিক এই কাজ—

অর্থাৎ আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলচে। এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কি জিনিষ তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য! তারি সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমার বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্ব্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলচে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করচে। "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না যদি নিজের মধ্যে এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এই জন্যই গায়ত্রী-মন্ত্রে একদিকে বাহিরের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী, উভয়কেই একই পরম শক্তির প্রকাশ-রূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোট শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ, তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ; তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর গোলার মত আকারটি আমাদের চোখে সমতল বলে' ঠেকে; তেমনি বৃহতের মধ্যে যে জ্ঞান বিরাজ করচে, আমাদের কাছে তার চেতন ছোট, আমার মধ্যেই চেতনার পরিচয় সহজ। কিন্তু সেটি যদি সমগ্রের না হত তবে সে আমার হতে পারত না।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্য্যকে ওজন করচে এবং বলচে আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্চে। কিন্তু এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত, তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারচে। মানুষ অহঙ্কার করে' বলে, আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্চি—কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেই জন্যে যে দিন মানুষ বল্লে সত্যং, সেই দিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরের সর্ব্বত্র দেখতে পেলে। যে দিন বল্লে জ্ঞানং, সেই দিন সে বুঝলে যে, সে যা-কিছু জানচে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে, সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এই জন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে, তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলি বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ যাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়—অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা কর, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্চে—অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্ব্বত্র দেখচে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্ব্বত্র জানচে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলেছে—অনন্তং ব্রহ্ম।

কোথায় সেই পরিচয়? আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই যেখানে আমরা আপনাকে দান করে' আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি, সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ; কিন্তু দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেইখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্য্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি, তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপকরণকে তখন দু'হাতে আঁকড়ে ধরি, মনে করি বস্তু-পুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড় হব। আর, যখনি কোনো বৃহৎ প্রেম, বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনি আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এই জন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়; আমাদের সমস্ত নিত্য কীর্ত্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই, মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং—ভূমাই আমার সুখ; ভূমাত্বেব

বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকেই আমার জানতে হবে; নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে, তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না; এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে, তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে-সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম্ম বলে শেখায়, সে-সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না; এই জন্যই সে-সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানিনে, যখন তাকে আমরা ছোট করে' জানি—মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেখানে কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত, সেখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বল্‌তে, অক্ষম বল্‌তে লজ্জা বোধ করে না; সত্যকে মতে মানি কিন্তু কাজে করতে পারিনে, এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সঙ্কোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচারগত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না; সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠ্‌বে, তখন মানুষ, আনন্দরূপমমৃতং আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্ব্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মত আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে' মানুষ অনন্ত স্বরূপকে বলেছে "আত্মদা" তিনি আপনাকে দান করচেন—সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই। সত্যং জ্ঞানমনন্তং।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্চে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করচেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে'? তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্য সত্য গতিবান। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলি আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চল্‌তে থাকে, কোনো সীমায় এসে সে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে' অনন্ত আপনাকেই জানচেন—এই জন্যই মন্ত্রের এক প্রান্তে সত্যং, আর একপ্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম—তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বল্‌তে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে—কিন্তু সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা, সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই; তাই সীমা কেবলি অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্চে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম, সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলি সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্চেন। সত্যও অসীমকে বর্জ্জন করে' সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জ্জন করে' শূন্য হয়ে বিরাজ করচেন না। এই-জন্য ব্রহ্ম, সীমা এবং সীমাহীনতা, দুইয়েরই অতীত—তাঁর মধ্যে রূপ এবং অরূপ দুইই সঙ্গত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে "বলদা,"—তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্চে;—আবার আত্মদা—সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটেনি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্চেন—এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের অপরূপ মিলন ঘটে গেছে,—সত্যং এবং অনন্তং অনির্ব্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একইকালে প্রকাশমান হচ্চে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ-মিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দ্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে—এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্য যোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজ-স্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত মিলনে শান্তং শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠচে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের

মর্ম্মনিহিত শান্তি; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জ্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়নজাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয়, সমস্ত বিরোধ-বিচ্ছেদের সমাধানকারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি "বলদা আত্মদা", সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলি আপনাকে দান করচেন।

সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—এই মন্ত্রটি ত কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কি? আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটচে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সঙ্কীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্ম্মের মধ্যে শান্তকে পাইনে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে, এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,—অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চল্‌চে অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করচে, তাদের সেই চলা, সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মত, তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্ম্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিম্বা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায়, তাদেরও এই ধ্যানের কিম্বা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা, হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে, নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে! যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশ-পথে চলবে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করচে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যংজ্ঞানমনন্তং এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহঙ্কারের ঔদ্ধত্য থেকে নির্ম্মুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে—তা না হলে আমাদের কর্ম্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে' আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে, তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু—তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে, তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকবে, তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রস্তুত হবার সময় আসবে, তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে, তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে, তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক, তাহলেই আমাদের জ্ঞান নির্ম্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চল্‌তে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসঙ্গীত বাজে, আমাদের জীবন তেমনি প্রতিক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃত বাণীটি সঙ্গীতের মত বাজতে থাকে সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করেচেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দমন্ত্রটি হোক্ সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আর আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক্ অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মামৃতংগময়—জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও। অবিরাম

হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরম আনন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক্, জয় হোক্ তোমার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুস্তক-পরিচয়

অনুপ্রাস—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ও পুত্র। ডঃ ক্রাঃ ১৩৭ পৃষ্ঠা মূল্য আট আনা। মুখপাতে একখানি রঙিন ছবি আছে—বাগর্থের ন্যায় সংযুক্ত পার্ব্বতী পরমেশ্বরের।

এই পুস্তকে অনুপ্রাস বিষয়ক ১২টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) ধর্ম্মকর্ম্মে অনুপ্রাস, (২) বিদ্যামন্দিরে অনুপ্রাস, (৩) দেবভাষায় অনুপ্রাস, (৪) মুসলমানী শব্দে অনুপ্রাস, (৫) সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৬) খাঁটি সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৭) সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাস, (৮) নরনারীর নাম নির্ব্বাচনে অনুপ্রাস, (৯) অনুপ্রাসের অধিকার বিচার, (১০) প্রবাদবাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাস, (১১ ও ১২) অনুপ্রাসের অট্টহাস।

অনুপ্রাসে বাক্য সরস ও শ্রুতিসুভগ হয়; এজন্য ভাষার ঝোঁক অনুপ্রাসের দিকে। ললিত বাবু অত্যাশ্চর্য্য ধীরতা ও অনুসন্ধানের ফলে ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুপ্রাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সংগ্রহ কেবল মাত্র শব্দের তালিকা নয়; ললিত বাবু বিচিত্র শব্দকে সংলগ্ন ভাবের মালায় গাঁথিয়া রসিকতায় সরস করিয়া তুলিয়াছেন; ইহাতে যাহাদের ভাষাতত্ত্ব রূপ জটিল গহনে প্রবেশ করিতে একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক আছে তাহারাও এই অনুপ্রাস আলোচনায় যোগ দিতে প্রলুব্ধ হইবে।

তথাপি একই বিষয়ের এত দীর্ঘ আলোচনা পাঠকের একঘেয়ে লাগিতে পারে এবং রসিকতা কষ্টকর কসরৎ মনে হইতে পারে, মনে করিয়া লেখক ভূমিকায় বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকদের জন্য উপায় ও বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "প্রবন্ধগুলি একটানে পড়িলে কতকটা একঘেয়ে লাগিবে। তজ্জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন একটানে একটির বেশী না পড়েন; ......যাঁহারা তরলপ্রকৃতি, শুদ্ধ মজা লুঠিবার জন্য পুস্তক-পাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যেন কেবল 'অনুপ্রাসের অট্টহাসে' মনোযোগ দান করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা গম্ভীরপ্রকৃতি, কাযের কথা শুনিতে চাহেন,......তাঁহারা যেন কেবল 'অনুপ্রাসের অধিকার বিচার' লইয়া নাড়াচাড়া করেন। আর যাঁহারা ব্যস্ত-বাগীশ......তাঁহারা যেন 'সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাসে' বা 'প্রবাদ-বাক্যপ্রবচনে অনুপ্রাসে' একবার চোখ বুলান। বলা বাহুল্য, যথার্থ বিচারক পাঠক, দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে সংক্রমণশীল সূর্য্যের ন্যায়, দ্বাদশটি প্রবন্ধে যথাক্রমে বিচরণ করিবেন।"

অনুপ্রাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই পুস্তকে এত খাঁটি বাংলা শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে যে কোষকার, ব্যাকরণকার, ভাষার অন্তর্নিহিত ধাঁচা অনুসন্ধানকর্ত্তা ইহার মধ্যে অনেক মসলা পাইবেন। যাঁহারা উপরে উপরে, না তলাইয়া সাহিত্যরসসম্ভোগ করিতে চান, তাঁহারাও অল্প অল্প করিয়া চাখিলে অনুপ্রাসে প্রচুর রস পাইবেন।

বাণান-সমস্যা—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত, প্রকাশক বঙ্গবাসীকলেজ-স্কুল বুক্-ষ্টল। ৪৩ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা।

বাংলা শব্দের বানান লিখিতে সচরাচর কি কি ভুল হয় এবং লেখকের মতে কি প্রণালীতে বানান লেখা উচিত তাহাই এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। (১) হসন্ত চিহ্নের আবির্ভাব তিরোভাব হওয়াতে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানে বিঘ্ন জন্মে। বহু উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় সংস্কৃতের খুঁটিনাটি চলা উচিত কিনা বিচার্য্য। (২) বিসর্গ বিসর্জ্জন সম্বন্ধে অভিযোগের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য—বাংলায় পদান্তের বিসর্গ লোপ হওয়াই নিয়ম; অধিকন্তু বাংলা শব্দ যদি সংস্কৃতের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া স্ব-রূপে দেখা দেয় তাহাতে তাহাকে নিন্দা না করিয়া সমাদর-করা উচিত; বাংলায় ধনুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ, যশঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ওকালতির জোরেও চলিবে না। সন্ধি ও সমাসের বেলাও বাংলা ভাষার ধাত মানিয়া চলাই আমাদের মত। তবে যে-সমস্ত সন্ধিনিষ্পন্ন বা সমাসনিষ্পন্ন সংস্কৃত পদ সমগ্রভাবে চলিয়াছে তাহার বেলা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। (৩) আকার গ্রহণ। অনেক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আকারান্ত হইয়াছে দেখিয়া লেখক ক্ষুব্ধ। এ-ক্ষেত্রেও আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বাংলা সংস্কৃতের কন্যা হইতে পারে কিন্তু দাসী নহে, তাহার সজীব স্বাধীনতা মানিয়া লইয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু লেখক এমন-সমস্ত উদাহরণ দিয়াছেন যেগুলি অজ্ঞ লোকের জিহ্বার জড়তার দৃষ্টান্ত, যেমন পরমন্ন, দুরাবস্থা, ভয়াঙ্কর প্রভৃতি। ইহা সাহিত্যের অন্তর্গত রূপ নহে। তবে চলিত কথায় শব্দবিকার যদি ঐ ভাবেই স্থায়ী হইয়া যায় তবে কালে উহাই আবার সাহিত্যের আসরও জবরদখল করিবে ইহা নিশ্চিত; এবং কোনো বিদ্যারত্ন বৈয়াকরণের চোখরাঙানি সে মানিবে না। (৪) চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়। এ বিভাগেও লেখক প্রাদেশিক কথার বিকৃতিকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়া খুঁত ধরিয়াছেন। তথাপি চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম ও তদন্তর্গত উদাহরণগুলি সকল লেখকেরই সাবধানে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। (৫) হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান। উচ্চারণের দোষে আমরা সংস্কৃত শব্দের হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান হারাইয়াছি। কেবল ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হয়। এ ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশের বেলা কিরূপ বানান লেখা উচিত ইহা একটা সমস্যা। আমাদের মতে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখাই সঙ্গত ও ভাষাতত্ত্বের সম্মত পদ্ধতি। স্থানে স্থানে প্রচলিত রীতি মানিয়া লইয়া রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। (৬) অকার ওকারে গোঁলযোগ। এই প্রসঙ্গে লেখকের সহিত একমত হইয়া আমরা অকার চালাইবার পক্ষপাতী; তাহা হইলে য়-এর সংস্কৃত উচ্চারণ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে কাজে লাগিতে পারে; আমরা বায়ু, আয়ু, য়ুরোপ প্রভৃতি শব্দে য়-এর যথার্থ উচ্চারণ পাই, অন্যত্র অ চালানোই বিধি। (৭) ঋ ও রি রী। ঋ স্বরের যে কি উচ্চারণ কেহ বলিতে পারে না; সংস্কৃত শব্দের খাতিরে ঐ

বাহুল্যটা স্বীকার না করিয়া রি রী দিয়া কাজ সারাই উচিত বলিয়া মনে হয়। (৮) ব ৱ। বর্গ্য ব ও অন্তঃস্থ ব আকারে পৃথক হইলে ওয়া দিয়া বানান, লেখার ঝঞ্ঝাট অনেকটা সহজ হইয়া আসিতে পারে। (৯) জ য। অপভ্রংশের বেলা ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া জ হইবে কি য হইবে স্থির করাই সঙ্গত আমাদেরও মনে হয়; তবে সমস্ত জ একশা করিয়া ফেলিতে পারিলে কোনো ল্যাঠাই থাকে না, কারণ জ ও য উচ্চারণে আমাদের নিকটে কোনো পার্থক্য নাই। পদ-মধ্যস্থ বা অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ য় হয়; এজন্য ব্যুৎপত্তি-অনুসার বানান রক্ষা করা সব সময় সুবিধাজনক নহে। (১০) র ড়। এই দুই অক্ষরের উচ্চারণে পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় ভুল করেন; তাঁহাদের পক্ষে র ও ড় নির্ণয়ের নিয়মগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে। (১১) খ ক্ষ। সংস্কৃত ক্ষ বাংলার খ, লেখায় এবং উচ্চারণে। (১২) সংযুক্তবর্ণ। য-ফলা ও ব-ফলা, ত্ত ও ত্ব, ক্ক ও ক্ব, ন্ন ন্য ও ন্ব প্রভৃতির পার্থক্য বাংলা উচ্চারণে নাই, ম-ফলা প্রায়ই উচ্চারিত হয় না, ম-যুক্ত অক্ষর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় মাত্র। প্রাকৃত-সংস্কৃতের মতো বানান উচ্চারণানুযায়ী একবিধ করিয়া ফেলিলে সকল লেঠাই চুকিয়া যায়। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ব্যুৎপত্তির দিকে নজর রাখিয়া বর্ণশুদ্ধি বাঁচানো ছাড়া উপায় নাই। (১৩) ণ ন। (১৪) শ ষ স। ষত্ব ণত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের মত—মূল শব্দের ষত্ব ণত্ব দেখিয়া অপভ্রংশের বানান লিখিব তা সেখানে ষত্ব ণত্ব বিধানের অবসর থাকুক আর না থাকুক। এ ত বড় জুলুম দেখিতেছি; এক বাংলা ভাষা শিখিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষাও নিয়ত অর্থাৎ com-pulsory! বাংলায় ষত্ব ণত্ব বিধান যে খাটে না তাহা লেখক পিসি মাসি রাণী কোরাণ প্রভৃতি শব্দ বিচার করিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বাংলায় বানানের বালাই সহজ করিয়া আনাই সঙ্গত মনে হয়। অবশ্য "ভাষায় বানানের একটা নিয়ম ও সুসঙ্গত শৃঙ্খলা থাকা উচিত।" (১৫) বর্ণবিপর্য্যয়। আমরা অনেক শব্দ লিখি একরকম, উচ্চারণ করি অন্য রূপ, কোনা কোনো শব্দের আদিম বর্ণপর্য্যায় পাল্টাইয়া ফেলি। (১৬) অকারের 'ও'-উচ্চারণ। ইহা বাংলা উচ্চারণের দোষ হইলেও বিশেষত্ব। অনেকে মতো কালো লিখেন দেখিয়া লেখক শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত যে, কারণটা ঠাহর করিয়াও করিতে পারেন নাই ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। বাংলায় এক বানানের কতকগুলি জোড়া জোড়া শব্দ আছে, যাহাদের রূপ এক, অর্থ ভিন্ন, তাহাদের একটি হলন্ত, অপরটি ওকারের টানযুক্ত অকারান্ত উচ্চারণ হয়। অর্থবিভ্রাট ও পাঠব্যতিক্রম নিবারণের জন্য কোনো কোনো লেখক ওকারের টানযুক্ত অকারান্ত শব্দে ওকার যোগ করেন, যেমন—কাল কালো, ভাল ভালো, মত মতো, কখন কখনো, কোন কোনো, বার বারো, বল বলো, ইত্যাদি। কাল শব্দ কৃষ্ণত্ববাচক সংস্কৃত হইলেও এখন বাংলা, তাহার বাংলা রূপপরিবর্ত্তনে আপত্তি টিকিতে পারে না। বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করাও যে চলে না, তাহা অল্প অনুধাবনেই লেখক স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিবেন। (১৭) 'এ'র 'য়্যা' উচ্চারণ। এ সমস্যার মীমাংসা কি? আমাদের মনে হয় অ্যা চালানো উচিত, নয় ত কোনোরূপ নূতন অক্ষর উদ্ভাবন করা উচিত। (১৮) উচ্চারণানুযায়ী বানান। ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া উচ্চারণানুযায়ী বানানের বিরুদ্ধে লেখক কোমর কষিয়া ওকালতী করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার যুক্তি টেঁকসই মনে হইতেছে না। ভাষায় একটা কৃত্রিমতা থাকিবে কেন? যাহা সহজ, যাহা স্বচ্ছন্দ, তাহাই ত ভাষা, তাহাতেই ত ভাষার প্রাণ। ভগবানকে ভাব নিবেদন করিবার বেলা সংস্কৃত করিয়া বলিবার মতো প্রহসন ত আর নাই, অথচ লেখক তাহার উল্টা পক্ষকেই ঠাট্টা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি নিজের রসজ্ঞতা ও রসিকতার পরিচয় দেন নাই। এ সম্বন্ধে বীরবল ওরফে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে চিন্তার খোরাক পুঞ্জিত হইয়া আছে। সাহিত্যিক মাত্রেরই ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ ও বিচার করিয়া দেখা উচিত।

শব্দ শিক্ষা—

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত। নবদ্বীপ। ডিমাই ১২ অং ১৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা।

ভাষার শব্দ-বিশেষের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জাতির আচার ব্যবহার ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, শব্দ-পরম্পরার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও জাতীয় প্রকৃতির ছাপ লুক্কায়িত থাকে। এই পুস্তকে বাংলা ভাষার বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি ও দ্যোতনা নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। পুস্তকখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) শব্দশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ভাষার প্রাধান্য, (২) শব্দে কবিত্ব, (৩) শব্দে নীতি, (৪) শব্দে ইতিহাস, (৫) বৈদেশিক ও অপভ্রষ্ট শব্দ, (৬) শব্দের ব্যবহার (৭) নূতন শব্দের অভ্যুদয়, শব্দসূচী। সমস্ত পুস্তকখানি ভাষার বিচিত্র লীলা প্রকটনে কৌতুককর ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। বিশেষত এইরূপ চেষ্টা বাংলা ভাষায় একরূপ নূতন ও প্রথম বলিলেও চলে। বহু শব্দের মূল নির্ণীত, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার ও তদন্তর্গত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শব্দবিচার যাচাই করিয়া দেখিতে না পারিলেও বহুস্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইল। 'কাণ্ডজ্ঞান' মানে বৃক্ষকাণ্ডের জ্ঞান নহে, ক্রিয়াকাণ্ডের জ্ঞান; যজ্ঞকর্ম্মে কোন্ যজ্ঞে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, কি কি দ্রব্য আবশ্যক, তাহার জ্ঞান। 'উড়ানি' যাহা দ্রুত যাইবার সময় উড়ে তাহা নহে, যাহা উড়া (হিন্দী শব্দ, অর্থ ঢাকা বা গায়ে জড়ানো) যায় তাহা। 'মেয়ে' কি মায়া শব্দজ? টাকা পাইলে লোকে মুদিত বা আহ্লাদিত হয় বলিয়া টাকা 'মুদ্রা' নহে, মুদ্রিত বা ছাপা হয় বলিয়া মুদ্রা; অগঠিত ও অলিখিত ঢেবুয়া পয়সা মুদ্রা নহে। 'চৌকস' শব্দের মূল চাক্ষুষ না চক্ষুষ্মান না হিন্দী চৌকশ-সহি (square)?

যাঁহারা শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ভাষার রীতি-পদ্ধতি জানিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকে প্রচুর আনন্দ শিক্ষা ও উদাহরণ সংগৃহীত পাইবেন। বিভিন্ন শব্দের সহযোগে বাংলা ভাষার ক্রিয়া-পদের অর্থব্যতিক্রম লক্ষ্য করিবার জিনিস, যথা, খাওয়া (জল, হাওয়া, মার, গাল, হোঁচট; ঘুমড়ি, ডিগবাজী, বকুনি, দোল, মাথা); দেওয়া (সাঁতার, হামাগুড়ি, গাল, শাপ, হাত, হিসাব, বাতাস, বেদনা, বলি, চোখ, দুয়ার, মাথা); তোলা (গা, মাথা, চাঁদা, রাগ, ননী, ছাত, ফুল, পটল, নাক, দাদ্); মারা (ভাত, পাক, পথ, থাবড়া, পাড়ি, গুড়ি, লাফ, ফাঁক, লাভ, ডঙ্কা)। চিমটি কাটা, পাশ ফেরা, দাঁত খিঁচান ভাষার idiom, সুতরাং তাহার ক্রিয়া অপরিবর্ত্তসহ নহে। ত, গো, কেন, না প্রভৃতি ভাষার বিশেষ ভঙ্গি লক্ষ্য করিবার জিনিস। পদসমষ্টি (phrase), সমার্থক যুগ্মশব্দ (মাথা মুণ্ড, হাসিখুসি, খোঁজখবর), এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ (গণ, গুণ, দণ্ড, পক্ষ, পদ, ভেদ) প্রভৃতির ব্যবহারপ্রণালী ও দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষা হইতে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে সংস্কৃত হইতে কত নূতন শব্দ যে আমদানী

ও উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার পরিচয়ও বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও আনন্দজনক। শক্তিমান কবিদিগের দ্বারা নূতন শব্দ উদ্ভাবন ও প্রচলনের দৃষ্টান্তও বাদ পড়ে নাই! এই গ্রন্থখানি ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে।

কুবলয়—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম-এ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও পুত্রগণ। ডঃ ক্রাঃ ২৪ অং ১০০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য আট আনা।

এখানি খণ্ডকবিতার পুস্তক। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কবিতাগুলি প্রায়ই আড়ষ্ট। ছন্দ, সরসতা, ভাববৈচিত্র্য এবং কবিত্ব অতি অল্পই আছে।

বিল্বদল—

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী ও চাটুজ্জে কোম্পানী। ৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

খণ্ডকবিতার বই। বইখানি তিনটি পর্বে বিভক্ত; প্রত্যেক পর্বেই অনেকগুলি করিয়া কবিতা আছে। কবিতাগুলি তাজা বিল্বদলের মতো সরস ও সুন্দর; কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের তরলতা ও ভাবের সূক্ষ্মতা মিলিয়া কবিতাগুলিকে যে একটি পল্লবপেলবতা দান করিয়াছেন তাহা রমণীয় ও উপভোগ্য। কবিতাগুলি তাহাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্য-সুষমার বারিশীকর চমকাইয়া শীর্ণা গিরিনদীর মতো লঘু অথচ ত্বরিত গতিতে বহিয়া গিয়াছে। ইহা অতিমাত্রায় 'লিরিক', শুধু একটু সুর, মুগ্ধ করে কিন্তু বেশী কিছু দেয় না বলিয়া পড়িয়া মন ভরে না, তৃপ্তি হয় না।

মালঞ্চ—

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত, চুঁচুড়া আলোচনা-সমিতি হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অংশিত ১১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ ভালো নয়।

খণ্ডকবিতার বই। প্রথমে সরস্বতী বন্দনা হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, সমগ্র কাব্য ও কবিসমাজের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পয়ারছন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। অবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত।

জাপানের অভ্যুদয়—

খিদিরপুর একাডেমীর হেডপণ্ডিত শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এখানি পদ্যপুস্তক। পাঁচটি সর্গে জাপানের ইতিহাস পদ্যে বিবৃত হইয়াছে; কোনো বিশেষ ঘটনা ইহার কেন্দ্র নহে; বিশেষ করিয়া রুষজাপানের যুদ্ধের লড়াইপরম্পরা তালিকার ন্যায় বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। রচনার ভাষায় অনেক আভিধানিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে হয়ত গাম্ভীর্য্য বাড়িয়াছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রসাদগুণ নষ্ট হইয়াছে। ইহাকে খণ্ডকাব্য নামে চিহ্নিত করা গ্রন্থকারের সমীচীন হয় নাই; পদ্যে বিবৃত হইয়াছে ছাড়া কাব্য-লক্ষণ ইহার মধ্যে কিছুই নাই; কবিত্ব এ পাড়া দিয়া হাঁটে নাই।

আত্মদেবতা—

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৫৪ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, কাপড়ে বাঁধা মলাট। মূল্য বারো আনা মাত্র।

লেখকের অভিমত যে মাতৃভক্তিই চরিত্রগঠনের প্রধান উপকরণ। সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি মাতৃমাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক ও আধুনিক মাতৃভক্ত বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও রমণীর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে মাতৃভক্তি হইতেই সন্তানের চরিত্র কেমন করিয়া ক্রমশ পুণ্য ও ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত হইয়া উঠে। এই গ্রন্থে এগারটি পরিচ্ছেদ—মা, মাতৃমাহাত্ম্য, মাতৃপ্রভাব, মাতৃ-আরাধনা, মাতৃস্নেহ, মাতৃভক্তি, মাতৃসেবা, মাতৃ-আশীর্ব্বাদ, মাতৃপ্রসাদ, মাতৃ-অর্চনা, মাতৃস্তোত্র—বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যায়িকার অনৈসর্গিক যুক্তিতর্কবহির্ভূত এমন অনেক কথা আছে যাহা বালকদিগকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান না করিয়া পড়িতে দেওয়া উচিত নয়; আমাদের দেশের মহামহা পণ্ডিতেরাও যুক্তিতর্কের বিষয়ে এমনই অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে যেমন-তেমন যুক্তিতর্কবিরুদ্ধ অনৈসর্গিক উদ্ভট কল্পনা প্রাচীন শাস্ত্রে থাকিলেই তাঁহারা তাহা বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে বিনা আলোচনায় স্বীকার করিয়া বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লন। সেই কুসংস্কারের কুয়াসা আমাদের দেশের যুক্তিতর্ক আচ্ছন্ন করিয়া ছাওয়ায় ভাসিতেছে; আমাদের সন্তানেরা তাহার প্রভাবে নিমজ্জিত হইয়া আছে; তাহার উপর যদি আধুনিক ছাপার বই ও লেখক সেই শিক্ষাই দিয়া বালকবালিকাদের যুক্তিতর্কের মূল উচ্ছেদ করিতে থাকেন তবে—বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! প্রাচীন পৌরাণিক অনৈসর্গিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া ছাড়া একালেরও যে-সব মাতৃভক্ত-মনীষীদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহারও মধ্যে তর্ক ও যুক্তির সিদ্ধান্ত অনুসৃত হয় নাই। অধিকন্তু পল্লবিত উচ্ছ্বাসে এবং ধীরতার ও শৃঙ্খলার অভাবে বইখানি সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। ভাষাও অত্যন্ত কৃত্রিম ও নীরস।

তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, অনেক মনীষী ব্যক্তির জীবনকাহিনী হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব ও উন্নতির মূলসূত্র বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা একটু বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে পাঠ করিতে দিলে তাহারা ইহা হইতে অনেক উপকার পাইবে।

নারীজীবনের কর্ত্তব্য—

শ্রীবসন্তকুমারী বসু প্রণীত, ৪নং উইলিয়মস্ লেন হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৩০ পৃষ্ঠা; পাইকা অক্ষরে ছাপা; কাপড়ে বাঁধা মলাট; মূল্য বারো আনা।

প্রকাশক গ্রন্থভূমিকায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে এই পুস্তকের লেখিকা বালবিধবা, কোনো স্কুল বা কলেজে পাঠাভ্যাস করেন নাই, নিজ দুরদৃষ্টবশতঃ স্বামীর কাছেও শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। চিরদিন রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় লেখকের রচনার মধ্যে অকপট আন্তরিকতা ও স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পরিচয় ছাড়া পরকীয় ভাব ও মত অধিক স্থান পাওয়ার কথা নয়। এজন্য লেখিকা স্ত্রীজাতি

অনুন্নত বলিয়া যে ব্যথা পাইয়াছেন তাহা তাঁহার নিজেরই ব্যথা, তাহা সংস্কারকের উচ্চাসনে দাঁড়াইয়া পাদ্রীগিরি নহে। সুতরাং আমাদের দেশের যে একদল সনাতনপন্থী লোক নিজেদের মাতা কন্যা ভগিনী ভার্য্যাকে অশিক্ষিত রাখিয়া বাঁদীর কাজ করাইয়া মুখে দেবী লক্ষ্মী প্রভৃতি বড় বড় কথা বলেন, তাঁহারা শুনুন একজন অন্তঃপুরিকা নিজের মনের ভাব কি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন—

"অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ও এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজ ও বিজ্ঞান দর্শনের অনেক অমূল্য সত্য আবিষ্কৃত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং স্ত্রীজাতিরও নানা প্রকারের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যাহাই হউক, কিন্তু দুই চারিটী সুশিক্ষিত স্ত্রীলোক ব্যতীত স্ত্রীজাতির যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে, ইহা ত অনুভবই হয় না। স্ত্রীজাতি আজিও সেই চরিত্র গঠনের অসামঞ্জস্যতাকারিণী। সেই স্বাভাবিক বিমল স্বাধীনতার অপব্যবহাররূপিণী। সেই—সাংসারাতীত কার্য্যে পুরুষের সহায়তা প্রদানে অনধিকারিণী। সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ, ও আত্মোন্নতিতে উদাসিনী। সেই—সাধ্য সত্ত্বেও জগতের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে বিমুখিনী। সেই—অল্প-শিক্ষার অনিষ্টকারিতায় অনিষ্টবিধায়িনী। সেই—জ্ঞানের অসীমতা ও অতলস্পর্শ গভীরতা ধারণে অপারদর্শিনী। সেই—স্বাবলম্বহীনতায় পরমুখাপেক্ষিণী ইত্যাদি। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীজাতির হিতৈষী মহাত্মাগণের আশা পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অবশ্য, জ্ঞানের গভীরতার অভাব-নিবন্ধনই তাঁহাদের উক্ত শোচনীয় অবস্থার অপনয়ন হইয়াও হইতেছে না। তন্নিমিত্ত অধুনা যাঁহারা শিক্ষার্থিনী হইয়া জ্ঞানরূপ পরম রত্ন লাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানালোকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ভগিনীগণকে শ্রেয় পথ সত্য পথ দেখাইয়া চলিতে সমর্থ হইবেন, এবং যাঁহারা চরিত্রের সামঞ্জস্যতা, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বনতা প্রভৃতির সুদৃষ্টান্তস্বরূপিনী হইবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীজাতির শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ ও উত্তর কালের ভগিনী-গণের উন্নতির পথ বিশেষভাবে প্রমুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া যাঁহাদের দিকে ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণনয়নে চাহিয়া আছে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইলেও আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে সমস্ত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যাহা সুযুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল। এই পুস্তকখানি দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভগিনীগণের করকমলে সাদরে সমর্পণ করিলাম।"

এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

স্ত্রীজাতির অল্প শিক্ষার অনিষ্টকারিতা, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা, স্ত্রীজাতির দৈনিক কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মপরায়ণতা, স্ত্রীচরিত্রের সামঞ্জস্য ও স্ত্রী-প্রকৃতিগত তেজস্বিতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির স্বাবলম্বন, স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান শিষ্টাচার, স্ত্রীজাতির সমিতির আবশ্যকতা, স্ত্রীজাতির বিশ্বসেবা-ব্রতে সহকারিতা, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মে ঔদাসীন্য, মনুষ্য ও পশুগণের প্রতি দয়া, বৈরাগ্য, সাজায়ে দাও মা আর একবার, ধ্যানমগ্না গৃহস্থ রমণী। শেষের তিনটি পদ্যে রচিত।

এই পুস্তকের ভাষা একটু সেকেলে ধরণের কৃত্রিমতাপূর্ণ হইলেও তাহাতে প্রবাহ ও গাম্ভীর্য্য আছে এবং বক্তব্য সুপ্রকাশ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণভুল রহিয়াছে, তাহা উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতেই জানা যাইবে।

এই পুস্তকখানির মধ্যে সুগৃহিণী ও পুরুষের সহধর্ম্মিণীর শিক্ষার উপযোগী বহু কথা আলোচিত ও পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা রমণী-গণ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং তাঁহাদের মন উদার বৃহৎ ভাবে পূর্ণ হইবে।

নারী পঞ্চ-চত্বারিংশ—

শ্রীশরৎকুমারী সিংহ কর্ত্তৃক বিরচিত। কানপুর ২৪।৩৯ নং মল-রোড শান্তিআশ্রম হইতে প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা।

হিন্দু নারীর মধ্যে সচরাচর যে যে গুণ ও দোষ দেখা যায়, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক কত দিকে, তাহা একে একে বর্ণনা করিয়া, কি করিলে গুণ বৃদ্ধি ও দোষ পরিহার করিয়া নারী পরিবারে ও সমাজে মঙ্গলরূপিণী রূপে সমাদৃত ও সম্মানিত হইতে পারেন তাহার উপায় গদ্যে ও পদ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রচনার মধ্যে বিশেষ কোনো কারুকার্য না থাকিলেও বিবিধ উপদেশের সমাবেশে ও সরল ভাষার গুণে বালিকাদের সুখপাঠ্য মনে হইবে। লেখিকা স্বয়ংশিক্ষিতা, স্কুলের শিক্ষা পান নাই, সুতরাং "নারীজীবনের কর্ত্তব্য"-রচয়িত্রীর ন্যায় ইঁহারও রচনা আন্তরিকতা ও নিজের মনের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। ইঁহারও ভাষারচনাপদ্ধতি সেকেলে ধরণের কৃত্রিমতাপূর্ণ কিন্তু বিশুদ্ধ।

এই পুস্তকের নাম যে "নারী পঞ্চচত্বারিংশ" কেন হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না।

আকাশের গল্প—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬০অং ১৯৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা মলাট। সচিত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা সহিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—"চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যাহা রচিত হইত, এখন আর যেন তাহা হয় না। অথচ সেকালের চেয়ে একালে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। পাঠকের সংখ্যা, ছাপাখানার সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। ছাপিবার খরচও সম্ভবতঃ বিস্তর কমিয়াছে।...পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল এখন তাহাও নাই কি?"

বাস্তবিকই নাই। আগেকার দুএকখানি, সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য, ভূতবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক বই যাহা আমি দেখিয়াছি তেমন বই আজকাল কৈ দেখিতে পাইতেছি? নূতন বই প্রস্তুত হওয়া ত দূরের কথা পুরাতন বইগুলিরও পুনর্মুদ্রণ হয় না। আগে-কার বইগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় লেখক আগে লিখিতব্য বিষয়টি বেশ করিয়া হজম করিয়া লইয়া আমাদের নিত্য পরিচিত ঘরোয়া জিনিষের দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্য সুপরিস্ফুট করিয়াছেন আর আজকালকার স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানপাঠগুলি প্রায়ই অব্যবসায়ীর গরহজম উদ্গিরণ এবং অধিকাংশই ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ বলিয়া বিলাতী দৃষ্টান্ত উদাহরণে অধিকতর জটিল-করা। আমাদের দেশের পাঠক পাঠিকারা হইয়াছেন সৌখীন ও বিলাসী—শিক্ষার জন্য তাঁহারা পাঠ করেন না, অবসর কালটা একটু স্ফূর্ত্তিতে কাটাইবার জন্য তাঁহারা বাংলা গ্রন্থ দয়া করিয়া স্পর্শ করেন, কাজেই এম-এসসি পাশকরা বৈজ্ঞানিক এবং এম-এ পাশকরা দার্শনিক গল্প

লেখেন, সমালোচনার চেষ্টায় রসিকতা করেন, কিন্তু যে কর্ম যাঁহাকে সাজে সে কর্ম তিনি কিছুতেই করেন না। স্কুল পাঠশালায় কয়েকজন মার্কামারা লোক ভিন্ন অপরের রচিত বই যতই কেন ভালো হোক না পড়ানো হয় না; সেই মার্কামারা লোক কয়টি একা হাতে সাহিত্য বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস অঙ্কশাস্ত্র স্বাস্থ্যতত্ত্ব সব লিখিবেন—তাঁহারা সবজান্তা! কাজেই ছাত্রপাঠ্য বইগুলি অপাঠ্য এবং বিশেষজ্ঞেরা বেকার হইতেছে। এমনতর অনাদর ও উপেক্ষা সম্মুখে করিয়াও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন বিষয়ে, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও যোগেশচন্দ্র পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে বহুকাল পূর্ব্বে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সম্প্রতি জগদানন্দ বাবু অক্লান্ত ভাবে নিরবচ্ছেদে মাসের পর মাস ধরিয়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকী প্রকাশ করিয়াছেন; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রবাসীর প্রথম বয়সে বৈজ্ঞানিক, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষিক, প্রবন্ধ লিখিতেন; তাঁহার লেখনী ক্লান্ত হইয়াছিল মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি জানিলাম তাঁহার একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। সংখ্যায় অল্প অথচ বিদ্যা ও কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠদিগের এই দলে আজ একজন নূতন লেখককে তাঁহার রচিত অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

এই গ্রন্থের নামেই প্রকাশ যে ইহাতে আকাশের গল্প বলা হইয়াছে। আমাদের আকাশের সঙ্গে অপরিচয় লইয়া অল্পদিন পূর্ব্বেই প্রবাসীতে আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি সেই পরিচয় সাধন করিতে কতক পরিমাণেও সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা ইহাকে অভিনন্দন করিতেছি। ইহাতে সৌরজগৎ অর্থাৎ সূর্য্য, নবগ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, প্রভৃতির প্রকৃতি, গতিনিয়ম, পরস্পর সম্পর্ক ইত্যাদি এবং প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিচয় খুব সহজ ভাবে আনাড়িরও বোধগম্য হইবার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে য়ুরোপীয় জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্যোতিষেরও পরিচয় দেওয়াতে গ্রন্থের উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রন্থবর্ণিত বিষয় বুঝাইবার জন্য ৪২ খানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে; চিত্রগুলি খুব ভালো না হইলেও কাজ চলিবে। এই গ্রন্থখানি সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—

শ্রীচুনীলাল বসু, এম্-বি, এফ্-সি-এস প্রণীত। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৩২৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য দেড় টাকা। ছাপা কাগজ বাঁধাই উত্তম।

এই পুস্তকখানির সমস্ত বিষয় ধারাবাহিক ভাবে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; আমরাও প্রতি মাসে কষ্টিপাথর বিভাগে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিয়া আসিয়াছি। সুতরাং পাঠকেরা ইহার উপাদেয়তা সম্যক অবগত আছেন। এই পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্পর্কে অতি বিশদ ও সহজ ভাষায় সংস্কারবিমুক্ত স্বাধীন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সংক্রামক ব্যাধির কারণ ও নিবারণের উপায় ও সহজ চিকিৎসা প্রকরণটি বিশেষ ভাবে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং—অতএব শরীররক্ষার উপায় জানা সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহা ধর্ম্মের অঙ্গ, ধর্ম্মসাধনের প্রথম সোপান। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এমন বিশদ ও সম্পূর্ণ পুস্তক বাংলা ভাষায় আর বোধহয় নাই; সুতরাং এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যই হওয়া উচিত—ইহা লেখকের প্রতি অনুকম্পার বশে নহে, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই।

পল্লীসেবক—

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি হইতে প্রকাশিত। ৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ আনা।

পল্লী ভারতের সভ্যতা সমাজ ও প্রাণের কেন্দ্র ছিল; য়ুরোপীয় সভ্যতার আঘাতে সেই পল্লী উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। তাহা রক্ষার জন্য পল্লীসেবকের প্রয়োজন; তাঁহারা কৃষক ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, যৌথ ঋণদান সমিতি গঠন করিয়া কৃষকদিগকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, এবং শহরের ঘূর্ণীপাক হইতে পল্লীকে দূরে বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

রাধাকমল বাবু এই মত নানা প্রবন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়ই প্রচার করিতেছেন। তাঁহার এই মত যে সমীচীন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ—

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটুয্যে কোম্পানি। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ৮২ পৃষ্ঠা। পাইকা অক্ষরে এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। স্বামীজীর চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ৷৷০।

ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের কথা, মত, শিক্ষা, উপদেশ প্রভৃতি সংক্ষেপে স্থূল ভাবে লিখিত হইয়াছে। স্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষের জীবনকথা যাঁহারা মোটামুটি জানিতে চান তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন। এই গ্রন্থের লভ্যাংশ বন্যা-পীড়িতের সেবা ও বেলুড়মঠে স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে। অতএব এই গ্রন্থ ক্রয় করিলে সকলে মহৎ জীবনীর আলোচনা ও পুণ্যকর্ম্মের সাহায্য করিতে পারিবেন।

এমার্সন সন্দর্ভ----

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল বি-এ কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক মিনার্ভা লাইব্রেরী, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২২২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

জগতের দু চার জন শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভ-লেখকের মধ্যে আমেরিকার মহামনীষী এমার্সনের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার গম্ভীর ভাষা, গভীর ভাব, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, এবং বিষয়ের পূর্ব্বাপরে সমদৃষ্টি ও অনুপ্রবেশ, প্রচলিত সংস্কারবিমুক্তি ও জানা কথাও নূতন করিয়া বলিবার শক্তি অসাধারণ। তাঁহার কতিপয় সন্দর্ভ অনুবাদ করিয়া লেখক বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু লেখক নিজের ভাষা এমার্সনের ভাষার ন্যায় গম্ভীর করিতে গিয়া কৃত্রিম সংস্কৃতশব্দবহুল রচনারীতি অবলম্বন করাতে তাহা এমন দুর্বোধ ও কঠিন কর্কশ হইয়াছে যে অনেক স্থলে মনে হয় যে ইহার চেয়ে ইংরেজিতে বুঝা যায় ঢের সহজে। ভাষার নমুনা-স্বরূপ দুই একটি পদ যেখান-সেখান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"কি ঘটনির্ম্মাণ, কি কাব্যপ্রণয়ন, কি মূর্ত্তিসমুৎকিরণ, ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মই স্বস্থ পরিপক্ববৃত্তি মানবের সমুচিত অর্থাৎ সম্যক্-রুচির এবং নিসর্গরম্য হইত; সর্ব্বকালে এই-সমস্ত সুকুমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সমুচিত দেহবিধানই যেখানে

অধুনাও অনপচিত অবস্থায় বর্ত্তমান, সেখানে তাহা অদ্যাপিও অনুষ্ঠীয়মান।" "কোন্ বঞ্চক, ঋণহর, বা গূঢ়তনিষ্ঠ কারুজনের সাধু-যত্নপরিশ্রমলব্ধ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক, জ্ঞান বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সক্ষম।" "সাধারণতঃ তুলাবিপর্য্যস্ত মনে তন্নির্ণীত বিধিমালা অচিরেই দেবত্ব লাভ করে; এবং লঘু পর্য্যবসায্য, উপাদানস্থলে অভ্যর্থিত ফলরূপেই পরিগৃহীত হয়।" ইত্যাদি। ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ; দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন "এবার অনেক দুর্গম স্থান পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এবং একটী দীপিকাও যোগ করা হইয়াছে। আশা করি এবার পুস্তকখানি সকলেরই সুগম হইবে।" না জানি প্রথম সংস্করণের ভাষা কিরূপ দুর্গম অপরিষ্কার ছিল! গ্রন্থে একটি সূচীপত্রের অভাব আছে।

সাধনা—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটুয্যে কোম্পানি। ১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত ভূমিকা সহিত। গ্রন্থের মূল্য প্রথম সংস্করণের অর্দ্ধেক করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলি আছে—বঙ্গে নবযুগের শিক্ষা, হিন্দু ও মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর অধিকার, সমাজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব, আমাদের কর্ত্তব্য, নেতৃত্ব, আধুনিক বঙ্গসমাজ ও মালদহ, আমাদের জাতীয় চরিত্র, ভাবুকতা, আলোচনা প্রণালী, ধর্ম্মের প্রকৃতি, অসীমের উপলব্ধি, ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্যসেবী, সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব, হিন্দুসাহিত্য-প্রচারক।

যুবক লেখকদিগের মধ্যে সকলেই আজকাল গল্পলেখক; সন্দর্ভ-লেখক প্রায়ই কাহাকেও দেখা যায় না। বিনয়বাবু সেই সর্ব্বপরিত্যক্ত পথ অবলম্বন করিয়া সাহস ও সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা একটু জটিল, পদরচনা দীর্ঘ, তথাপিও তাঁহার স্বাধীনচিন্তা দ্বারা সমাহৃত ভাবপরম্পরা সমস্ত সন্দর্ভগুলিকে সুখপাঠ্য করে। আজকাল ভাবুক লোক দেখা যায় খুব কম, কিন্তু বিনয় বাবু দেশের অবস্থা ও সমস্যা সমাধানের উপায় ভাবিয়াছেন, বিভিন্ন মত নিজের প্রজ্ঞা ও মতের আলোকে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং নিজের ধারণাগুলি পাঠকের বিচারের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন; ইহাতে পাঠককেও ভাবিতে হইবে, ফাঁকি দিয়া উপর উপর ভাসিয়া গেলে চলিবে না। তারপর নিজে ভাবিয়া পরের মত মানা না-মানা তাঁহার নিজের হাতে; ভাবিতে পারাটাই মস্ত লাভ। আমরা এইরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রচার ও নব নব আবির্ভাব সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

নানান্ নিধি—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত, ৪০।১এ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২১৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য এক টাকা।

বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই সমষ্টির এই বইখানি। বঙ্গবাসীর ভাষাপদ্ধতি পল্লবিত আতিশয্যের জন্য প্রসিদ্ধ, ভাবরস তাহাতে থাকে এক কণা কিন্তু ভাষার ফেনা হাঁড়ি ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়ে, তাড়িও হার মানে। পরম ভাগবৎ পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়ও সেই পদ্ধতি বজায় রাখিতে গিয়া এমন ভাষার মুদ্রাদোষ আয়ত্ত করিয়াছেন যে তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁহার রচনা সহ্য করা কঠিন। যে পরিমাণে বাজে কথা লইয়া উল্টা পাল্টা করা হইয়াছে, সে পরিমাণে ভাব বা তথ্য বা সত্যমীমাংসা ইহাতে না পাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষুন্ন হইয়াছি।

সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত—

শ্রীমফিজল হাসান প্রণীত। ৪২নং মেটকাফ ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। ডঃ ক্রাঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে সুন্দর বাঁধা, এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। একখানি মানচিত্র ও ৬১ খানি নক্সা, আরবের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নগর, ফলফুল বৃক্ষলতা, ইমারত প্রভৃতির চিত্র আছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ইতিহাসখানি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) আরবদেশ ও জীবজন্তুর বিষয়; (২) আরবদেশের বিভাগ ও প্রধান প্রধান নগরের বিষয়; (৩) আরব-অধিবাসী; (৪) ইসলামের পূর্ব্বে আদিম অধিবাসীর আচারব্যবহার; (৫) হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস।

এই পুস্তকখানি ঠিক ইতিহাস নহে, আরবদেশের দিগ্দর্শন পুস্তক (Guide Book) বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যাপার ও ঘটনা অপেক্ষা শহর মসজিদ প্রভৃতির বর্ণনা, কুসংস্কারমূলক কিংবদন্তী ও প্রবাদগল্প প্রভৃতির মুসলমান-ধর্ম্মবিশ্বাস-অনুযায়ী বৃত্তান্ত অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান হজ তীর্থযাত্রা করিতে আরবদেশে যাইয়া থাকেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ দক্ষ পাণ্ডার কাজ করিবে; এবং অমুসলমান ইহা পাঠ করিয়া আরবদেশের বহু তথ্য ও মুসলমান ধর্ম্মসম্পর্কীয় কিম্বদন্তী ও প্রবাদবাক্য অবগত হইয়া আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। বিশেষত চিত্রগুলি অতি সুন্দর; আরবদেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের দ্রষ্টব্য কীর্ত্তিগুলির সহিত পরিচয় চিত্র দেখিয়া খুব সহজেই করা যায়।

হজরত মহম্মদ ঘোরতর পৌত্তলিক দুর্দ্দান্ত আরবজাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মের সংস্কার সাধন করিতে গিয়া বহু বিষয়ে রফা বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার দূরদর্শী বিচক্ষণতারই নিদর্শন। যথা, য়িহুদিদিগের খৎনা করা রীতি, আরবের বহুবিবাহ রীতি এবং কাবা মন্দিরের হেজরল আস্ওয়াদ নামক উল্কাপ্রস্তর মসজিদে পবিত্র জ্ঞানে রক্ষা ও পূজা। তিনি একগুঁয়ে আরবদের সমস্ত কুসংস্কার একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহা যতদূর পারিয়াছিলেন কমাইয়া আনিয়াছিলেন;—অগণিত বিবাহের স্থলে চারিটি বিবাহ, জড়মূর্ত্তি পূজার অবশেষ কাবা প্রস্তরের পূজা-স্বীকার, প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। কিন্তু হজরত মহম্মদ শেষ পয়গম্বর বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় সেই অবশিষ্ট কুসংস্কারও আর নিরাকৃত হইতেছে না; এবং যাঁহারা ইতিহাস-লেখক মুসলমান তাঁহারাও নানাবিধ আজগুবি অতিপ্রাকৃত ও অবিশ্বাস্য গল্প সাজাইয়া সত্যের অমর্য্যাদা করিতেছেন। মুসলমানী গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় এই বইখানি বহু তথ্যপূর্ণ ও চিত্রব্যাখ্যাত আরবদেশের সুন্দর পরিচয়-পুস্তক হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রচনার ভাষা অত্যন্ত কৃত্রিম ও আড়ষ্ট; এবং ব্যাকরণভুলও যথেষ্ট আছে।

লালসিংহ—

বা পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়। শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি-এল প্রণীত। পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ অং ১২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

যাহাদিগকে আমরা রেড়ো, জঙ্গলী, বুনো, চোয়াড় বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করি তাহারা একদিন বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে বহু

স্বাধীন-রাজ্য, ও প্রজার ভোট অনুসারে যদৃভুয়সিক রাজ্যশাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মানভূম জেলার অন্তর্গত জঙ্গল-মহলের বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত সত্তেরখানি মৌজার সর্দ্দার লালসিংহের বীরত্বকাহিনী ও দিগ্বিজয়-বৃত্তান্তের সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে জঙ্গলমহালের ভূমিজ রাজাদিগের বীরত্ব ও রাজ্য সম্পর্কীয় বহু তথ্য এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই-সমস্ত স্বাধীন রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে ইংরেজদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং বিনা যুদ্ধে কোনো রাজা ইংরেজকে সূচ্যগ্র মেদিনীর অধিকার ছাড়িয়া দেন নাই। এই ইতিহাসখানি পাঠ করিলে সেই স্বাধীনচেতা বীর জাতির পরিচয় লাভ করা যায়। গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। স্বদেশের বীরত্বকীর্ত্তিজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গের অবজ্ঞাত একাংশের সহিত পরিচয় দ্বারা স্বদেশপ্রীতি ব্যাপ্ত ঘনিষ্ঠ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা উচিত।

জীবনের সুখ—

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চট্টোপাধ্যায় কোম্পানি, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১২ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য আট আনা।

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়টের Scenes of Clerical Life নামক পুস্তকের অন্তর্গত তিনটি ছোট গল্পের প্রথম গল্পটি The Sad Fortunes of the Rev. Amos Burton এই গ্রন্থে অনুবাদিত হইয়াছে। জর্জ ইলিয়ট মনস্তত্ত্বচিত্রণে ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অগ্রণী ও সর্ব্বপ্রধান; তাঁহার রচিত এই ছোট গল্পটির মধ্যেও সেই মনস্তত্ত্বের লীলা প্রচুর করুণরসাভিষিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পটি অতি মধুর এবং এমন স্বাভাবিক যে পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

গল্পটির অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে। কিন্তু যথাযথ অনুবাদ করিবার চেষ্টা করাতে রচনা ঠিক বাংলাধাতসঙ্গত ও খিচশূন্য হয় নাই, অনুবাদের আড়ষ্টভাব অনেকটা থাকিয়া গিয়াছে। অথচ অনুবাদের ভাষা খুব বাংলা-ঘেঁষা, প্রায় সংস্কৃতগন্ধশূন্য, ঝরঝরে। তথাপি যে অনুবাদ বেশ সরস ও বাংলা হয় নাই, তাহার কারণ অনুবাদক নিজেই নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"An elegant translator who brought something to his work besides mere dictionary knowledge যখন বর্ত্তমান উপন্যাসখানির অনুবাদ আরম্ভ করি তখন ডিকেন্সের ঐ উক্তি মনে হইয়াছে এবং সর্ব্বদাই ঐ উন্নত আদর্শের কাছে পরাজয় অনুভব করিয়াছি। ভাবকে যখন ভাবান্তরের কলমের (prism) মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হয় তখন তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হয়, তাহার উপর যদি অনুসরণ বা ভাবার্থ প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে মূল হইতে সে অনেকটা দূরে গিয়া পড়ে। এই দূরাবস্থানের দ্বারা একটা স্বাধীন সৌন্দর্য্য বা শিল্পচাতুর্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু মূলটি যে চিত্রকরের প্রাণপরিচয় আনয়ন করে আমরা ইহাতে তাঁহার সেই সমগ্র পরিচয় হইতে বঞ্চিত হই। কলার হিসাবে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আদরের সামগ্রী হইলেও শেষোক্ত কারণে অনুবাদের পরিসরকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলা চলে না। বস্তুতঃ অনুবাদের সপক্ষে ইহা একটি প্রধান যুক্তি স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুবাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকও উপেক্ষণীয় নয়; অনেক স্থলে অনুবাদের পরিবর্ত্তে অনুসরণ ভাষান্তরীকরণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দেয়; দেশের জ্ঞান বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা না করিয়া অজ্ঞানতাই বাড়াইয়া তুলে; এইরূপ অনুসরণ আমোদ বা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহা মূলে বর্ণিত সমাজ, রীতিনীতি লোকচরিত্র ও দেশপ্রকৃতির জ্ঞানকে ফুটিয়া উঠিতে দেয় না। 'অনুসরণ' না করিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিবার পক্ষে ইহা আর একটি প্রধান যুক্তি।"

এই যুক্তি আংশিক সত্য। হুবহু নকল করিলে মূলের খুঁটিনাটি, বিদেশের রীতিপ্রকৃতি, কথাবার্ত্তার ঢং প্রভৃতি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা অনুবাদিত ভাষার সাহিত্য হয় কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় মূলানুগত করিয়াও অনুবাদ নিজের ভাষার ধাতে গড়িয়া তুলিতে পারাতেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। এজন্য স্থানে স্থানে ভাব সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে হয়, স্থানে স্থানে কথা ছাড়িতে ও জুড়িতে হয়, বিদেশী প্রকাশভঙ্গিমা স্থানে স্থানে বদলাইয়া দেশী করিয়া লইতে হয়। ইহাতে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা সহ্য করিতেই হইবে; কেবল শব্দানুসরণে অনুবাদ নীরস ও আড়ষ্ট হয় বলিয়া তাহা যথাযথ হইলেও অসহ্য।

কিন্তু অনুবাদক শব্দানুসরণ করিয়াও অনুবাদে যতটুকু সরসতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহাতে নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থপ্রারম্ভে জর্জ ইলিয়টের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও চিত্র-পরম্পরায় গল্পটি বুঝিবার ও উপভোগ করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

ঘনরামকাহিনী—

শ্রী অ-কথিত ছন্দচিত্র। সত্য ঘটনা অবলম্বনে। প্রকাশক সেন ও লাহিড়ী ২১৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য চার আনা।

পয়ারছন্দে দুশ্চরিত্র মাতালের চিত্র। কুৎসিত।

গুরুদক্ষিণা—

শ্রীমহিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা ব্যাপার অবলম্বনে ছাত্রগণের অভিনয়োপযোগী দৃশ্যকাব্য। গিরিশ-ছন্দে রচিত।

উদ্ধার—

শ্রীতরণিকান্ত দাস প্রণীত। মূল্য তিন আনা। উপন্যাস।

আর্যরামায়ণে বাল্মীকি—

শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ প্রণীত ও হেডমাষ্টার, রাথুরা বান্ধব হাইস্কুল, বানিয়াজুড়ি ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৷০ আনা।

বাল্মীকি রামায়ণের বিষয়, চরিত্র, ঘটনাসংস্থান প্রভৃতির বিচার, বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত বৃক্ষ, পক্ষী, পশু ও মৎস্যের নাম প্রভৃতির পরিচয় ও বিচার ও সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি রামায়ণ ও বাল্মীকির প্রতিভা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

লতার বাঁধন—

প্রফুল্লকুমার ও ভক্তিলতার পরিণয়ে রচিত কবিতাগুচ্ছ।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ বিবিধ কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রফুল্লকুমারের ও অপূর্ব্বের রচিত কবিতাদুটি কবিত্ব হিসাবে মন্দ নয়।

মিলন মঙ্গল—

গৌরসুন্দর রায় ও সুরুচিবালার শুভপরিণয়ে রচিত কবিতা ও গদ্য রসরচনা।

ইহার প্রায় সকল রচনাই রসমধুর ও সুখপাঠ্য। কেবল কচি খোকাখুকির ভাষায় যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বয়স্ক লোকের উপযুক্ত ভাব দেওয়াতে কবিতাটির রসহানি হইয়াছে। বুড়োমানুষে যেন ন্যাকামি করিয়া আদ-আদ কথা বলিতেছে। যেমন ভাষা তাহার অনুরূপ ভাব না থাকিলে সে রচনা ব্যর্থ হয়।

স্নেহলতা—

শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য চার আনা। ১নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীসূর্য্যকুমার দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

বিবাহপণের বলি স্নেহলতা দেবীর জীবনের পরিচয়।

কন্যাদায়—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৩ তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা। মূল্য তিন আনা।

এই পুস্তকে কন্যাদায়ের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় আলোচিত হইয়াছে। দায়ের কারণ (১) অস্বাভাবিক বিবাহপ্রথা, বিবাহপ্রস্তাব বরপক্ষ হইতেই হওয়া বিধাতার নিয়ম। (২) পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে পাত্র স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতে পারে না এবং নিজে উপার্জ্জন করিতে পারে না বলিয়া পরের ধনে লোভ করে। (৩) কন্যার বিবাহ নির্দ্দিষ্ট বয়সেই দিতে হয়। এই-সমস্ত কারণের নিরাকরণ করিলে কন্যা আর দায় হইবে না।

অজন্তা—

শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য ও পুত্র। মূল্য এক টাকা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, ছবি, সৌষ্ঠব শিল্পী গ্রন্থকারের উপযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন।

চিত্রশিল্পী অসিতকুমার অজন্তায় গিয়া অজন্তার শিল্প এবং ভাস্কর্য্য- ও চিত্র-রচনাপদ্ধতির পরিচয় লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেই অভিজ্ঞতা চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া সহজ সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় আর্ট সম্বন্ধে পুস্তক নাই বলিলেই হয়। সুতরাং এই পুস্তকখানি বিশেষ সমাদর লাভের যোগ্য। যাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অন্তরের পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক অধ্যয়ন করিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

বিদ্যারম্ভ—

শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত। ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চিত্র-সম্বলিত। মূল্য চার আনা।

পয়ার ছন্দের ছড়ায় ছেলের হাতেখড়ি হইতে বিবিধ শিক্ষার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অর্ঘ্য—

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরসরঞ্জন সেন। ডি: ফু: ১৬ অং ৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা।

বরিশালের শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে ৪৩টি কবিতা ও গান আছে; সকলগুলিই ভগবদ্-বিষয়ক। লেখক প্রসিদ্ধ গায়ক ও বক্তা। তাঁহার রচনায় তত্ত্বকথা ও সুভাব যথেষ্টই আছে। কবিত্বেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই। ছন্দ সব স্থলে রক্ষা পায় নাই; তবে এগুলি প্রায়ই গান বলিয়া কবিতার মানদণ্ডে মাপ করা চলে না।

সাগর-সঙ্গীত—

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ফুলস্ক্যাপ অষ্টাংশিত ১০২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকে সাগর সম্বন্ধে ৫৯টি সনেট আছে। বইখানি আগাগোড়া অতি উৎকৃষ্ট পুরু আর্ট কাগজে ছাপা; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সাগরের ঈষৎ আভাস ভিন্ন ভিন্ন রঙে ছাপিয়া সেই জমির উপর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৪ লাইন বা ৬ লাইন করিয়া কবিতা ছাপা হইয়াছে। সাগরাভাসগুলি কবিতার ভাবের অনুরূপ করিয়া কল্পিত ও যথাস্থানে মুদ্রিত; কোথাও জ্যোৎস্নালোকের প্লাবন, কোথাও রৌদ্রোজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ণ; কোথায় কুজ্ঝটি ঢাকা ধূসরতা, কোথাও সন্ধ্যার আভাস, কোথাও ঊষার পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কোথাও সাগরের অনন্তবিস্তারী নীল আর নীল আর শুধু নীল দেখানো হয় নাই; কোথাও সমুদ্র শান্ত স্তব্ধ, কোথাও ঈষৎ চঞ্চল, কোথাও ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল। সাতখানি বিচিত্র বর্ণের সাগরের ছবি আর্ট কার্ডে ছাপা; টাইটেল পেজ ও ভূমিকাও বিচিত্র রঙিন জমির উপর ছাপা; সূচী, মলাটের ভিতর বাহির, মলাট-আচ্ছাদনের কাগজখানা পর্য্যন্ত সাগরের দৃশ্যে মণ্ডিত। আষ্টেপৃষ্ঠে ছবি, রং, সৌন্দর্য্য ও বাহার; অকাতরে পয়সা খরচ করিয়া এবং সু-রুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা নিয়মিত হইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যতদূর উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। বইখানি হাতে পড়িলেই বলিতে হয় বাঃ!

এমনি বাহ্যসৌষ্ঠবসম্পন্ন বইখানির মূল্য দশ টাকা হইলেও অসঙ্গত হইত না; কিন্তু বিক্রয় হইতেছে বোধ হয় দুই টাকায়,—বোধ হয় বলিলাম, কারণ পুস্তকের কোথাও মূল্যের উল্লেখ নাই। এই সুদৃশ্য নয়নরঞ্জন বইখানি কাহাকেও উপহার বা পুরস্কার দিবার যোগ্য—দিয়াও সুখ, পাইয়াও আনন্দ।

কিন্তু এরূপ ভাবে বাহ্য সৌষ্ঠবে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দর্শকের মন-ভুলানো বই বাহির করা আর বসনে ভূষণে আপাদমস্তক মুড়িয়া মেয়ে দেখানো সমান; দর্শক ভূষণের চটকেই মুগ্ধ হইয়া থতাইয়া যায়, তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই চোখের নেশায় অনুকূল ও পক্ষপাতী হইয়া উঠে, যাহা আসল—সেই অন্তরের দোষগুণ বিচারের নিরপেক্ষতা আর থাকিতে পায় না। এমন করিয়া সমালোচকের চোখে সোনার ধুলা দেওয়া উচিত কিনা বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিবার কথা।

চিত্তরঞ্জনের বই নয়নরঞ্জন একশবার। চিত্তরঞ্জন কিনা তাহা বলা সুতরাং বড় শক্ত। প্রথমেই ত দেখিতে পাই তাঁহার বই আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গানের প্রায় অবিকল পংক্তি দিয়া—

'আজিকে পাতিয়া কান শুনিছি তোমার গান।'

তার পরও অনেক পংক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনা স্মরণ করাইয়া দেয়; তাহারও মধ্যে দুটি স্থান সবিশেষ—

"ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন দেশে।—'

ইহা রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' নামক কবিতাটি স্মরণ করায়।

'আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলালে।'

রবীন্দ্রনাথের 'আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে' পংক্তিটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, double বলিলেও চলে। "সন্ধ্যা আসে ওই শান্তিময়ী" রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা কবিতাটি স্মরণ করায়। এমনি করিয়া অনেক পংক্তিই রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি বলা যাইতে পারে। অনেক অর্ব্বাচীন লেখক আছে যাহারা রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইয়া বড়াই করে যে ইহা তাহাদেরই স্বোপার্জ্জিত ধন, তাহাদের বই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পরে প্রকাশ হইয়া থাকিলেই বা কি, তাহাদের বই রচিত হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বে। চিত্তরঞ্জন বাবু সেরূপ ধরণের লোক নহেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের অকপট অনুরাগী; রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি-আলোচনার ফলে তাঁহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত হইয়াছে হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই। তা হোক, তথাপিও স্বীকার করিতে হইবে চিত্তরঞ্জন বাবু কবি; তাঁহার কবি-হৃদয় বহু পংক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সে প্রকাশে নূতনত্ব ও নিজস্বের ছাপ-মারা।

"সূর্য্যকররাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজল উছল জলে কুসুম ফুটায়।"

চমৎকার কবিত্বময় ছবি। এরূপ ছবি অনেক আছে।

সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজি মোর গীত হয়ে উঠে।
* * *
আমার পরাণে আজি কাঁপিছে কেবল,
জ্যোছনা-তরঙ্গে শত স্মৃতি-পুষ্পদল।
* * *
সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।
* * *
অনাদি কালের বুকে সৃষ্টি-শতদল,
আপনারি সুখ দুঃখে করে টলমল।
* *
অধরে নয়নে ভাসে জীবন-ইঙ্গিত।

প্রভৃতি বহু পংক্তি কবির কবিত্বের নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই কাব্যখানি একই সাগরের বিভিন্ন রূপের আরতি হইলেও, ইহাতে একতারার সুরই বাজিয়াছে, ভাবের ভাষার ছন্দের বৈচিত্র্য ইহাতে নাই; একসঙ্গে সমস্ত বইখানি পড়িতে অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে। দুচার দিন অন্তর অন্তর একটি একটি করিয়া কবিতা পড়িলে তবে তাহার রসসম্ভোগ করিতে পারা যায়। ইহা সাগর-সঙ্গীত বটে কিন্তু ছবিতেও যেমন সাগরের অনন্ত নীল বিস্তারের ভাব ফুটে নাই, কবিতাতেও তেমনি সাগরের বিরাট গম্ভীর অনন্ত লীলা নাই—সমস্তটা একটানা মিয়ানো সুরে ক্ষীণধারা নদীর মতো ঝুর ঝুর করিয়া বহিয়া গিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনবাবু সুদক্ষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। তিনি যে নীরস আইনচর্চ্চা ও মক্কেলের অর্থই পরমার্থ জ্ঞান না করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চারও অবসর করিতে পারেন ইহা পরম সুখের ও আনন্দের বিষয়। এবার তিনি একতারা বাজাইয়াছেন; ভবিষ্যতে সপ্ত সুরের বিচিত্র রাগিণী শুনিতে পাইব আশা করি।

সন্তানের চরিত্র গঠন—

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল প্রণীত। প্রকাশক ফ্রেণ্ডস ইউ-নিয়ন, ৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬অং ৯৮ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে নীল কালিতে পরিষ্কার ছাপা। মূল্য আট আনা, উৎকৃষ্ট বাঁধানো দশ আনা। ঐ পুস্তকের লভ্যাংশ কোনও সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কেমন করিয়া সন্তানের চরিত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুকূল করিয়া সংগঠন করিতে পারা যায় তাহারই উপদেশ রুসো, স্পেনসার, ফ্রোবেল, লক প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিবিদ্ পণ্ডিতদিগের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ হইতে সঙ্কলন করিয়া সন্তানের পিতা মাতা ও অভিভাবকদিগের জন্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সূচী এই:—সূচনা, আত্মসংগঠন, বাধ্যতা, প্রভুত্বের অপব্যবহার, আকস্মিক ঘটনা, অজ্ঞানতা ও অসতর্কতাজনিত অপরাধ, লঘুশাস্তি, তিরস্কার, আদর ও প্রশ্রয়, কায়িকদণ্ডের আবশ্যকতা, কায়িক দণ্ডের অপকারিতা, সাধারণ ব্যবহার, স্পেনসারের উদ্ভাবিত দণ্ড—প্রকৃতির শাসন, প্রকৃতির শাসনের বিশেষত্ব, স্পেনসারের মতের সমালোচনা, স্বাধীন ইচ্ছা, অভ্যাস, ভাঙ্গিবার অভ্যাস, নির্দ্দয়তা, অভিযোগ, কান্না, মিথ্যাকথা, বিলাসিতা, প্রশংসা, পুরস্কার, প্রতিযোগিতা, গুণ প্রদর্শন, বঞ্চনা, ভয়, অনুসন্ধিৎসা, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, আত্মনির্ভরতা, ত্যাগাভ্যাস, শিষ্টাচার, মাতার প্রতি সম্মান, ভালবাসা, সঙ্গ, গল্প, বিন্দু ধারণ, ধর্ম্ম শিক্ষা, দেশ-প্রীতি, উপসংহার।

যাঁহারা সন্তানের হিতচিন্তা করেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে একত্র অনেক পণ্ডিতের চিন্তালব্ধ ফল সমাহৃত দেখিতে পাইবেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবুক ব্যক্তির অভিমত অনুসন্ধান করিয়া পাঠ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং এই পুস্তকখানি যে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পুস্তক সকলেরই পাঠ করিয়া সন্তানের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লওয়া উচিত।

মুদ্রারাক্ষস।

শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে আমরা "শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধে কলিকাতা, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান বিখ্যাত স্থানসমূহের বহুশাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকবর্গের সম্মতি- ও স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ব্যবস্থাপত্র ছিল। ঐ ব্যবস্থাপত্রের "সিদ্ধান্ত" নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"সাত্বিকী পূজা কেবল জপ, হোম এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা বিধেয়।

রাজসী এবং তামসী পূজায় পশুবলির বিধি থাকিলেও অনেক শাস্ত্রকার উহার নিন্দা ও নিষেধ করিয়াছেন, অতএব উহা কর্ত্তব্য নহে।"

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর, আমি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যভারতের অনেক মহানুভব ব্যক্তির নানা-প্রকার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে ঐ-সকল পত্র উদ্ধৃত হইল না। তদ্ভিন্ন ১৮৩২ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তত ও তুলোটকাগজে দেবাক্ষরে মুদ্রিত হয়। তাহার পর, বিখ্যাত অধ্যাপক মহোদয়গণের স্বাক্ষরিত হইলে নানাস্থান হইতে অনেকে উহা চাহিয়া পাঠান। গত তিন বৎসরের মধ্যে দুইশত খণ্ডের অধিকাংশ বিতরিত হইয়াছে, সামান্য কয়েক খণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ছিল—ছাগাদি বলি ব্যতীত শক্তিপূজা হয় না। এই ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর, সে কুসংস্কার তিরোহিত হওয়ায় অনেক স্থান হইতে ছাগবলি উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালের লোকেরা যেমন নির্বিচারে চিরাচরিত সংস্কার পালন করিয়া আসিতেন, এখন আর সে দিন নাই, এখন জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচার-শক্তি তীক্ষ্ণ হইতেছে সুতরাং যাঁহারা অতিশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, তাঁহারাও দেবীর আরাধনা-স্থলে অতি অসহায় রোরুদ্যমান ছাগশিশুর গলদেশে খড়্গাঘাত করিবার পূর্ব্বে পরস্পরবিরোধী শাস্ত্রাদেশসমূহের কোন্ পক্ষ সমীচীন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। তবে দেবীর অর্চ্চনায় ছাগাদি বলির ব্যবস্থাদাতা এবং ঐরূপ কার্য্যের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণেরও যে একান্ত অভাব হইয়াছে, তাহা নহে।

বিগত ১লা আশ্বিন তারিখে প্রবাসী পত্রে আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর, কয়েক দিন পরেই "শাশ্বতী" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসিদ্ধ বাগ্মী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় "জগদম্বার প্রধান আহার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি "রুধিরই যে জগদম্বার প্রধান আহার" তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি শাশ্বতী পত্রিকা পাই না, সুতরাং উহাতে কি প্রকাশিত হইয়াছে জানিতাম না। বিগত কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে বলেন, "শাশ্বতী পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।" তাহার পর, আমি ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিবার জন্য শাশ্বতী পত্রিকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই কিন্তু কোন স্থানেই উহা পাওয়া গেল না। একজন সাহিত্যসেবীর মুখে শ্রুত হইলাম 'রিপন্-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম্, এ, মহাশয় উহার একজন লেখক।' তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম, তিনিও দিতে পারিলেন না। অবশেষে মাঘ মাসের অর্দ্ধাংশ গত হইলে আমার পুরাতন বন্ধু এবং কাশীমবাজারের অনারেবল্ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শাশ্বতী-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের কুটুম্ব, কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত পত্রিকাখানি সংগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি শাশ্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম; যদিও ঐ প্রবন্ধে আমাদের প্রবন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহাতে যে-সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের প্রবন্ধোক্ত মূল বিষয়েরই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ আমাদের প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। এত বিলম্বে প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হওয়ার কারণও পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"জগন্মাতার ভোগের উপহার বিষয়ে শ্রুতির পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা যতদূর বিদিত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে রুধিরই যে উৎকৃষ্টতম এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ্য, ইহা বিশ্বাস করিতে হইতেছে। অন্যান্য নৈবেদ্যাদি যে-সকল ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করা হয়, তাহা তাহার আপেক্ষিক নিকৃষ্ট এবং পরম্পরা সম্বন্ধে ভোজনীয় পদার্থ, ইহা বুঝিতে পারা যায়।" (আশ্বিন—শাশ্বতী ৩৭৯ পৃঃ)

অন্য এক স্থলে তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"অতএব জগন্মাতা কথার মধ্যেও জগৎপিতা অন্তর্নিহিত থাকেন; আবার জগৎপিতা কথার মধ্যেও জগন্মাতা অন্তর্নিহিত থাকেন, অতএব একটীকে আর একটীর উপলক্ষণ বলা যায়। কাজেই এখন বুঝিতে হইল, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বা নরায়ণ নারায়ণী উভয়েরই মুখ্যতম ভোগের দ্রব্য শোণিতরাশি, আর অন্যান্য দ্রব্যমাত্রই উভয়ের নিকৃষ্ট ভোগ্য

শ্রব্য, ইহাই শ্রুতিকুলের সম্রাট্ বা সর্ব্বশ্রুতির খনিস্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে অবগত—'ইন্ধোহবৈ নাম এষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। অথৈতদ্বামে অক্ষিণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ, অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকমিব" ইত্যাদি।

পাঠক! শ্রুতির সুদারুণ সিদ্ধান্ত তো শুনিতে পাইলে, লোহিত (শোণিত) নারায়ণীর অন্ন এ কথা শ্রুতিমুখে বিদিত হইলে, এখন কি করিবে? প্রসন্নচিত্তে ছাগাদি বলিদান করিয়া নারায়ণ নারায়ণীকে কবে কি রুধির দান করিতে পারিবে কি? রুধির উপহারের অপবিত্রতা ভ্রম অপনোদিত হইবে কি? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বশতঃ পশুহিংসায় পাপের আশঙ্কা দূর করিতে পারিবে কি? তাহা তোমাকে অবশ্য করিতে হইবে; যদি না কর তবে তুমি বেদ বিশ্বাস করিতে পারিলে না, বেদে বিশ্বাসীকে আস্তিক বলে, "আস্তিক্যং বেদবিশ্বাসঃ;" আর তাহা না হইলে নাস্তিক বলে। বেদে অবিশ্বাসী হইলে তুমি চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির ন্যায় নাস্তিক মধ্যে পরিগণিত হইবে, অহিন্দু বলিয়া আখ্যাত হইবে। এরূপ তিরস্কার কখনই কোন হিন্দুসন্তানের পক্ষে সহনীয় নহে।

কোন কোন পুরাণে "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মাংস-শোণিত-বর্জ্জিত উপহারকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং "রাজসী মাংস শোণিতৈঃ" ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মাংস শোণিত রাজস পূজার উপহার বলা হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু ঐ উক্তি সম্ভবতঃ জ্ঞানী উপাসকের নিমিত্ত নহে, উহা সাধারণ লোকের সহজজ্ঞানের অনুবাদমাত্র।" আশ্বিন—শাশ্বতী ৮০পৃঃ, ৮১ পৃঃ

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রধান প্রধান অংশ উদ্ধৃত হইল। এখন ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বিবৃত করিতেছি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উক্তি পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম, তিনি পুরাণের প্রমাণ মানেন না; কারণ পুরাণে যাহা সাত্ত্বিক উপহার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার মতে তাহা সাত্ত্বিক উপহার নহে। একমাত্র রুধিরই তাঁহার মতে সাত্ত্বিক উপহার। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরাও বলি "তথাস্তু", শ্রুতির দ্বারাই তিনি প্রমাণ করুন, 'রুধিরই একমাত্র সাত্ত্বিক উপহার এবং তাহা না প্রদান করিয়া সাত্ত্বিকীপূজা সম্পন্ন হয় না।' এই বার আমরা তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্রুতির প্রমাণটী পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উহা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মতের অনুকূল কি না? কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে "শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদানের অবশ্য কর্ত্তব্যতা" বিষয়ে কোনই সাহায্য পাইতে পারেন না। এমন কি শ্রুতির অর্থ দ্বারা সাত্ত্বিকী পূজায় ছাগরুধির কিংবা অন্য কোন প্রাণীর রুধির দেবীকে প্রদান করিতে হইবে, এরূপ কোন আভাসও পাওয়া যায় না। ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যদি ঐ শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিম্নে উহার ভাষ্য এবং টীকা সন্নিবেশিত করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় কি? কিন্তু বুদ্ধিমান্ তর্কচূড়ামণি মহাশয় এখানে বিলক্ষণ চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়া উহার কোনরূপ ব্যাখ্যা না করিয়াই একেবারে বলিয়া বসিয়াছেন,—

"পাঠক! শ্রুতির নিদারুণ সিদ্ধান্ত তো শুনিলে।"

কি আশ্চর্য্য! পাঠকগণ যেন সকলেই উপনিষদ্বিদ্যার পারগামী, পাঠমাত্র ঐ শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন! একে বৈদিক সংস্কৃতভাষা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা দুরূহতর, তাহাতে যে প্রসঙ্গে ঐ শ্রুতিটি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে অতি দুরবগাহ তত্ত্ব, মূলশ্রুতি পাঠমাত্র অর্থবোধ দূরের কথা, গুরুর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং ভাষ্য টীকার সাহায্য লইয়াও বহু বিলম্বে উহার মর্ম্ম হৃদ্গত হয়। তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক "লোহিতপিণ্ডঃ" পদ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন "উহা ছাগ বা তাদৃশ কোন পশুর শোণিত," কিন্তু আমরা উপনিষদ্বিদ্যার ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রাচীন গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এবং আনন্দগিরির টীকা ও আধুনিক বেদ-বেদান্তবিৎ বিখ্যাত অধ্যাপকগণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া বলিতেছি "তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্রুতিতে যে "লোহিতপিণ্ডঃ" পদ আছে, উহার অর্থ ছাগাদির রুধির নহে। ইহা নিশ্চয়। যে প্রসঙ্গে ঐ শ্রুতি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সহ ঐ শ্রুতি, তাহার শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও তদনুযায়ী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এখানে সন্নিবেশিত করিলাম। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উল্লিখিত শ্রুতিটি আছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা ঐ ব্রাহ্মণটি সম্পূর্ণ ও উহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(অথ চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্)

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্ মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥১॥

বিদেহরাজ জনক (যখন দেখিলেন তাঁহার পরিজ্ঞাত নিখিল ব্রহ্মই যাজ্ঞবল্ক্যের অপরিজ্ঞাত নহে, তখন তিনি) কূর্চ (একপ্রকার আসন) হইতে উঠিলেন এবং (ঋষির) চরণে পতিত হইয়া বলিলেন ;—"হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে উপদেশ করুন।" তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, "হে সম্রাট্ যে প্রকার সংসারী লোক-সকল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলে রথ বা নৌকা সংগ্রহ করে, সেইরূপ আপনিও এই-সকল উপনিষদ্ দ্বারা সমাহিতাত্মা হইয়াছেন, আর আপনি (সাধারণের) পূজ্য ও প্রভু হইয়াছেন। আপনি বেদ-সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং (আচার্যগণ) আপনাকে উপনিষৎ-সকলের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আপনি দেহত্যাগের পর কোথায় গমন করিবেন ?" (জনক উত্তর করিলেন) "হে ভগবন্! কোথায় গমন করিব, তাহা আমি জানি না।" (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) "যেখানে গমন করিলে আপনি কৃতার্থ হইবেন, আমিই আপনাকে সেই স্থান বলিব।" (জনক বলিলেন) "যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন বলুন।" (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) "শ্রবণ কর ॥"১॥

ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥২॥

যিনি পূর্ব্বে (আদিত্যান্তর্গত পুরুষ উক্ত হইয়াছেন) যাঁহাকে এখন সত্যনামক চক্ষুর্ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। জাগরাবস্থায় যিনি দক্ষিণ চক্ষুতে ইন্ধ নামে অবস্থিতি করিতেছেন, দীপ্তিগুণত্ব বশতঃ যাঁহার ইন্ধ এই প্রত্যক্ষ নাম হইয়াছে, তাঁহাকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয় ; কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রত্যক্ষদ্বেষী ॥২॥

অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাঽস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সংচরণী যৈষা হৃদয়াদূর্ধ্বা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ ॥৩॥

(ভাষ্যম্) অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাঽস্য পত্নী যং ত্বং বৈশ্বানরমাত্মানং সম্পন্নোঽসি তস্যাস্যেন্দ্রস্য ভোক্তুর্ভোগ্যৈষা পত্নী বিরাড়ন্নং ভোগ্যত্বাদেব। তদেতদন্নং চাত্তা চৈবং মিথুনং স্বপ্নে। কথং। তয়োরেষ ইন্দ্রাণ্যা ইন্দ্রস্য চৈষ সংস্তাবঃ সংভূয় যত্র সংস্তবং কুর্ব্বাতে অন্যোন্যং স এষ সংস্তাবঃ। কোঽসৌ। য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশো ঽন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডস্য মধ্যে। অথৈনয়োরেতদ্বক্ষ্যমাণমন্নং ভোজ্যং স্থিতিহেতুঃ। কিং তৎ। য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডো লোহিত এব পিণ্ডাকারাপন্নো লোহিতপিণ্ডঃ। অন্নং জগ্ধং দ্বেধা পরিণমতে যৎ স্থূলং তদধোগচ্ছতি যদণু তৎপুনরগ্নিনা পচ্যমানং দ্বেধা পরিণমতে। যো মধ্যমো রসঃ স লোহিতাদি ক্রমেণ পাঞ্চভৌতিকং পিণ্ডং শরীরমুপচিনোতি। যোঽণিষ্ঠো রসঃ স এষ লোহিতপিণ্ড ইন্দ্রস্য লিঙ্গাত্মনো হৃদয়ে মিথুনীভূতস্য। যং তৈজসমাচক্ষতে সন্তয়োরিন্দ্রেন্দ্রাণ্যো হৃদয়ে মিথুনীভূতয়োঃ সূক্ষ্মাসু নাড়ীষ্বনুপ্রবিষ্টঃ স্থিতি হেতু র্ভবতি। তদেতদুচ্যতে ঽথৈনয়োরেতদন্নমিত্যাদি। কিং চান্যৎ। অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্। ভুক্তবতোঃ স্বপতোশ্চ প্রাবরণং ভবতি লোকে তৎসামান্যং হি কল্পয়তি শ্রুতিঃ। কিং তদিহ প্রাবরণম্। যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবানেকনাড়ীছিদ্র বহুলত্বা জ্জালকমিব।

টীকা। এবকৈব বৈশ্বানরস্যোপাসনার্থং প্রবিবিক্তাহারশেন্দ্রনা চেতি মিথুনং কল্পয়তি অথেত্যাদিনা। প্রাগাস্তি নাধ্যাধিকারো-ঽথ শব্দঃ। যদেতন্মিথুনং জাগরিতে বিশ্বশব্দিতং তদেবৈকং স্বপ্নে তৈজসশব্দবাচ্যমিত্যাহ —তদেতদিতি। কচ্ছাক্ষিকং তেজসাধিকৃতা পৃচ্ছতি—কথমিত্যাদি। কিং তস্য স্থানং পৃচ্ছ্যতে ঽন্নং বা প্রাবরণং বা মার্গো বেতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ তয়োরিতি। সংস্তবং সংগতিমিতি যাবৎ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ অথেতি। অন্নাভিরেকেন স্থিতেরসম্ভবাৎ তস্য বক্তব্যত্বাদিত্যর্থ শব্দার্থঃ। লোহিতপিণ্ডং সূক্ষ্মান্নরসং ব্যাখ্যাতুং ভক্ষিতস্য অন্নস্য তাবদ্বিভাগমাহ অন্নমিতি। যদন্নাৎ পুনরিতি যোজনীয়ম্। ইত্যেতাবাংস্তু যো মধ্যম ইত্যাদি গ্রন্থো যোজ্যঃ। উপাধ্যুপহিতয়োরেকত্ব মাশ্রিত্যাহ যং তৈজসমিতি। তস্যান্নমুপপাদয়তি সতয়োরিতি। ব্যাখ্যাতেঽর্থে বাক্যমাস্থিতাবয়বমাহ তদেতদিতি। যদি প্রাবরণং পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ কিঞ্চান্যদিতি। ভোগশ্যাপানন্তর্য্যমথ শব্দার্থঃ। প্রাবরণপ্রদর্শনস্য প্রয়োজনমাহ ভুক্তবতোরিতি। ইহেতি ভোক্তৃভোগ্যয়োরিন্দ্রেন্দ্রাণ্যোরুক্তিঃ। হৃদয়জালকয়োরাধারাধেয়ত্ব মবিবক্ষিতং তস্যৈব তদ্ভাবাৎ।

ভাষ্যম্। অথৈনয়োরেষা সৃতির্মার্গঃ সংচরতোঽনয়েতি সংচরণী স্বপ্নাজ্জাগরিত দেশাগমনমার্গঃ। কা সা সৃতিঃ। যৈষা হৃদয়াদ্ধৃদয় দেশাদূর্ধ্বাভিমুখী সত্যুচ্চরতি নাড়ী। তস্যাঃ পরিমাণমিদমুচ্যতে। যথা লোকে কেশঃ সহস্রধা ভিন্নোঽত্যন্তসূক্ষ্মো ভবত্যেবং সূক্ষ্মা অস্য দেহস্য সংবন্ধিন্যো হিতা নাম হিতা ইত্যেবং খ্যাতা নাড্যস্তাশ্চান্তর্হৃদয়ে মাংসপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি হৃদয়াদ্বিপ্রকীর্ণাস্তাঃ সর্বত্র কদম্বকেশরবদেতাভির্নাড়ীভিরত্যন্তসূক্ষ্মাভিরেতদন্নমাস্রবদাস্রবতি গচ্ছতি। তদেতদ্দেবতা শরীরমনেনান্নেন দামভূতেনোপচীয়মানং তিষ্ঠতি। তস্মাদ্যস্মাৎ স্থূলেনান্নেনোপচিতঃ পিণ্ড ইদং তু দেবতাশরীরং লিঙ্গং সূক্ষ্মেণান্নেনোপচিতং তিষ্ঠতি। পিণ্ডোপচয়করমন্নং প্রবিবিক্তমেব মূত্রপুরীষাদি স্থূলমপেক্ষ্য লিঙ্গস্থিতিকরং অন্নং ততোঽপি সূক্ষ্মতরম্। অতঃ প্রবিবিক্তাহারঃ পিণ্ডঃ। তস্মাৎ প্রবিবিক্তাহারাদপি প্রবিবিক্তাহারতর এষ লিঙ্গাত্মৈবৈব ভবত্যস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরমেব শারীরং তস্মাচ্ছারীরাৎ আত্মনো বৈশ্বানরাত্তৈজসঃ সূক্ষ্মান্নোপচিতো ভবতি ॥৩॥

টীকা। মার্গশ্চেৎ পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ অথেতি। নাড়ীভিঃ শরীরং ব্যাপ্তস্যাত্মনঃ প্রয়োজনমাহ—তদেতদিতি। তস্মাদিত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। তথাপি প্রবিবিক্তাহার ইত্যেব বক্তব্যে প্রবিবিক্তাহারতর ইতি কস্মাদুচ্যতে তত্রাহ পিণ্ডেতি। যস্মাদিত্যাস্যাপেক্ষিতং কথয়তি—অত ইতি। শারীরাদিতি শ্রূয়তে কথং শারীরাদিত্যুচ্যতে তত্রাহ শরীরমেবেতি। উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—আত্মন ইতি ॥৩॥

এই বাম অক্ষিতে যে পুরুষাকার দৃষ্ট হয়, ইনি সেই বৈশ্বানরের পত্নী। তুমি যে বৈশ্বানর আত্মাকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছ, ইনি তাঁহার পত্নী। বৈশ্বানর পুরুষ ভোক্তা, ইনি তাহার ভোগ্য অন্ন। জাগ্রদবস্থার এই ভোক্তৃ ভোগ্য রূপ মিথুন স্বপ্নাবস্থায় একীভাবে তৈজস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী যে স্থানে পরস্পর স্তব করেন, তাহাকেই তদুভয়ের সংস্তাব বলা হয়। এই হৃদয়াখ্য মাংসপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ আকাশই ঐ সংস্তাব। এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পিণ্ডাকার শোণিতখণ্ড ইহা উঁহাদের অন্ন। এই অন্ন স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। ভুক্ত অন্নের মলভাগ স্থূল এবং রসভাগ সূক্ষ্ম ; ঐ রসভাগই শোণিত এবং উহাই উঁহাদের স্থিতিকারণ অন্ন। এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জালবৎ নাড়ী-সকলই

উঁহাদের গাত্রাবরণ। হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত নাড়ী-সকলই উঁহাদের স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরণাবস্থায় সঞ্চরণের পথ। ঐ-সকল নাড়ীর নাম হিতা এবং উহারা শতধা বিভক্ত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। উহারা হৃদয়-মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। কদম্বকেশরের ন্যায় সূক্ষ্ম ঐ-সকল নাড়ী দ্বারাই ভুক্তান্নের রসভাগ সর্ব্বশরীরে গমনাগমন করে। শরীর আত্মা বৈশ্বানর পূর্ব্বোক্ত শোণিত রূপ অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থকেন। তৈজস আত্মা বৈশ্বানর হইতে সূক্ষ্মতর; অতএব তিনি যে অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েন, তাহা ঐ শোণিত রূপ সূক্ষ্ম অন্ন হইতেও সূক্ষ্মতর ॥৩॥

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্ধ্বা দিগূর্ধ্বাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতে ঽসিতো ন ব্যথতে নরিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তে ঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥৪॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

"এই হৃদয়ভূত তৈজস আত্মা প্রাণ দ্বারা বিধৃত হয়েন বলিয়া স্বয়ংও প্রাণস্বরূপই প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রাণাত্মার পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণপ্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধপ্রাণ, অধোদিক্ অধঃপ্রাণ এবং সকল দিক্ সকল প্রাণ। এইরূপ প্রাণাত্মার বা প্রাজ্ঞের উপাসক সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই নেতি নেতি শব্দ দ্বারা নিষেধমুখে নির্দ্দেশ্য তুরীয় আত্মা, এই আত্মা অগৃহ্য, অতএব ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অশীর্য্য, অতএব শীর্ণ হয়েন না। ইনি অসঙ্গ; অতএব কোথাও সঙ্গ পান না। ইনি অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত হন না। ইনি হিংসিত হন না। হে রাজন্ জনক! তুমি জন্ম মরণাদি ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছ।" রাজা বলিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি যখন আমায় অভয় আত্মা জ্ঞাপন করিলেন, তখন ঐ অভয় আপনারও উপস্থিত হউক। আমি ভবদুক্ত বিদ্যার নিষ্ক্রয়ার্থ আর কি প্রদান করিব? আপনাকে নমস্কার করি। এই বিদেহ রাজ্য আপনার এবং আমিও আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ॥৪॥"

(চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ)

উদ্ধৃত শ্রুতির দ্বারা বুঝা গেল জীবমাত্রেরই ভুক্তান্ন পরিপাকজাত শরীরস্থ শোণিত দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বৈশ্বানর আত্মা কি? এ বিষয়ে বেদান্তসার-প্রণেতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র লিখিয়াছেন;—

"ভূরাদি চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত চতুর্বিধ স্থূলশরীরসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যের নাম বৈশ্বানর বা বিরাট্। যে-হেতু তিনি সর্ব্ব নরাভিমানী অর্থাৎ সকল প্রাণীতেই তাঁহার 'অহংজ্ঞান' আছে সেই-হেতু তিনি বৈশ্বানর এবং তিনি বিরাট্; কেননা বিবিধভাবে প্রকাশমান্। চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত যাবতীয় চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) স্থূল শরীরসমষ্টিই সেই বৈশ্বানর আত্মার স্থূল শরীর (১)।

অতএব যদি কোন একটি প্রাণিহত্যা করা হয়, তাহা হইলে বৈশ্বানর আত্মার (তৃপ্তি দূরে থাকুক) পুষ্টির ব্যাঘাত করা হয়। যেমন আমাদের স্থূল শরীরের কোন অংশের ধ্বংসসাধন করিলে আত্মার ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর আত্মার চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত জীবময় স্থূল শরীরের অন্তর্গত কোন একটি প্রাণীর বিনাশ করিলে সেই বৈশ্বানর আত্মার সেই পরিমাণে পুষ্টির ব্যাঘাত করা হয়। কেননা সেই প্রাণী জীবিত থাকিলে তাহার ভুক্তান্ন-পরিপাকজাত শোণিত হইতে তাঁহার আরও অনেক দিন পুষ্টি হইতে পারিত। শ্রুতি বলিতেছেন, জীবশরীরের শোণিত হইতে বৈশ্বানর আত্মার পোষণ হয়, অতএব জীবশরীরের শোণিতপাতজনক ছেদনব্যাপার শ্রুতিবিরুদ্ধ কার্য্য। এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, পশুবধ করিয়া তাহার শোণিত বৈশ্বানর আত্মার নামে উৎসর্গ করা শ্রুতির অভিপ্রেত; কেননা শ্রুতিতে পশুবধ করিয়া শোণিত উৎসর্গ করিলে বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হইবে, এ কথা নাই। যদি ঐরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে দুই একটি পশুবধ করিলে চলিবে না, চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত যাবতীয় জীব ও নিজেকে পর্য্যন্ত বলি দিতে হইবে, কারণ চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত নিখিল জীবসমষ্টিই বৈশ্বানর আত্মার স্থূল শরীর। বলিরং যে দুই চারিটি পশু, তাহার শোণিত হইতেই বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়, ইহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে শ্রুতি প্রাণিমাত্রের শরীরের শোণিত হইতে বৈশ্বানর আত্মার পুষ্টি হয়, এ কথা বলিতেন না। এতদ্ব্যতীত ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, বিশুদ্ধ পুষ্ট দেহেই আত্মার উন্নততর বিকাশ লক্ষিত হয়। অতএব প্রাণিগণের দেহ বিশুদ্ধ এবং পুষ্ট রাখিলেই বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করা হয়। এই জন্যই "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি"—কোন প্রাণীকেই হিংসা করিও না, ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর দৃষ্ট হয়।

(১) এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো বিরাড্ ইতি চোচ্যতে সর্ব্বনরাভিমানিত্বাৎ বিবিধং রাজমানত্বাচ্চ। অস্যৈষা সমষ্টিঃ স্থূলশরীরম্।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রুতির যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চান, তাহাতে যে শুধু দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির নিকটেই পশুবলি দিতে হইবে এবং ছাগাদি পশুই বলির একমাত্র উপকরণ, এইরূপ নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈশ্বানর আত্মার সহিত সর্ব্ব দেব দেবীর অভিন্নতা স্বীকার করিয়া ঐরূপ নিয়ম স্থির করিতে গেলে সকল দেব দেবীর পূজাতেই ছাগাদি বলির অতি-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু আবহমানকাল হইতে প্রচলিত কাশীর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার পূজায়, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের পূজায়, বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর পূজায়, দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজায় এবং আরও ভারতবর্ষময় অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় ছাগাদি বলি হয় না। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, ভারতীয় মনীষিগণ উল্লিখিত শ্রুতির পশুবলি দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করিতে হইবে এরূপ অর্থ করেন নাই! আর এক কথা এই যে, চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ) যাবতীয় প্রাণীর সমষ্টিময় (বৈশ্বানর আত্মার) স্থূল শরীরান্তর্গত একটি ছাগের বিনাশের দ্বারা তাঁহার প্রীতি হয়, এরূপ যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ শরীরান্তর্গত একখানি ইক্ষুদণ্ড (উদ্ভিজ্জ) দ্বারাই বা কেন তৃপ্তি হইবে না? আর জগতে এত প্রাণী থাকিতে ছাগই বা বলির উপকরণ হয় কেন? বস্তুতঃ জীব বিনাশ করিয়া তাহার রুধিরাদি দ্বারা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতি সাধন করিতে হইবে, এরূপ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, যে প্রাণী যেখানেই থাকুক, তাহার জন্ম অন্নের পরিপাকজাত মধ্যম রস পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপচয় সাধন করে এবং যাহা অণিষ্ঠ রস তাহাই লোহিতপিণ্ড-পদবাচ্য এবং উহাই ইন্দ্রইন্দ্রাণী অথবা বৈশ্বানর আত্মার প্রীতিসাধন করে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শঙ্কর-ভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ অণিষ্ঠরস সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বৈশ্বানর আত্মার স্থিতি-হেতু হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাণিবধ করিয়া ঐ অণিষ্ঠ রসকে সূক্ষ্ম নাড়ীতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে না দিলে শ্রুতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়।

এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক অনেক হইতে পারে কিন্তু সরল-ভাবে শ্রুতির অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায় উল্লিখিত শ্রুতি হইতে পশুবলির বিধি কোন প্রকারেই উপলব্ধ হয় না। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বর, আনন্দগিরি প্রভৃতি ঋষিকল্প মনীষিগণ ঐ শ্রুতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব, যদি তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রতিভাবলে কোন নূতন ব্যাখ্যা করেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি এবং অন্যান্য শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণও তাহা গ্রহণ করিবেন না। কেননা প্রয়োজন অনুসারে যদি শ্রুতির নূতন নূতন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে ব্যাখ্যার অনন্তত্ব উপস্থিত হয়, শাস্ত্রার্থের কোন স্থিরতা থাকে না, তদ্দ্বারা বেদবিধির বিলাপ ঘটিতে পারে।

৩০শে মাঘ, ১৩২০ সাল। } শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

পঞ্চশস্য

তামাক ছাড়াইবার চিকিৎসা (Current Opinion)

আমেরিকার শিকাগো শহরে একটি চুরুট-নিবারিণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ডাক্তার ক্রেস তামাক ছাড়াইবার চিকিৎসায় সুদক্ষ জানিয়া তাহারা তাহাদের আপিসের সহিত একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ডাক্তার ক্রেসকে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছে। এবং ডাক্তার ক্রেসও (Dr. D. H. Kress, General Secretary of the Anti-Cigaret League, Chicago, U. S. A.) তাহার বিস্তৃত ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া লোকহিতকর এই পুণ্যব্রত আনন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যহ এত তামাকখোর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চিকিৎসার জন্য আসিতেছে যে ডাক্তারের পক্ষে সকলের চিকিৎসা করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; চারিবৎসরের শিশু, স্কুলের বালক-বালিকা, যুবক যুবতী, অভিনেত্রী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকল বয়সের ও সকল অবস্থার নরনারী এই অনাবশ্যক ও ক্ষতিকারক ব্যসন হইতে মুক্তি লাভের জন্য সমিতির শরণাপন্ন হইয়াছে। ডাক্তারের চিকিৎসায় ২৫।৩০ বৎসরের পাকা তামাক-খোরও নিষ্কৃতি পাইয়াছে; যে-সমস্ত স্ত্রীলোক গোপনে চুরুট খাওয়া অভ্যাস করিয়া স্বামীর নিকট সেই অভ্যাস গোপন রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ও কুণ্ঠিত ছিল, তাহারা পুনরায় নিজেদের আত্মসম্মান ও অসঙ্কোচ সরলতা ফিরিয়া পাইতেছে।

চিকিৎসার প্রণালী অতি সহজ।—তামাকের মধ্যে নিকোটিন বিষ আছে; তাহা শরীরের মধ্যে গিয়া সেই বিষের পিপাসা দুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলে, এবং তাহার ফলে মানুষকে মুহুর্মুহু তামাক সেবা করিতে হয়। ডাক্তার ক্রেস দেখিয়াছেন যে সিল্ভার-নাইট্রেট দ্রাবণ (silver nitrate solution) নিকোটিন বিষের

সহিত মিশ্রিত হইলে নিকোটিন বিষের বিরুদ্ধে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়; তখন নিকোটিন-বিষাক্ত শরীরে নিকোটিন আর সহ্য হয় না। সুতরাং তামাক-খোর যদি মাঝে মাঝে সিলভার-নাইট্রেট দ্রাবণ দিয়া কুলকুচা করে, তবে চুরুট, সিগারেট, গুড়ুক, দোক্তা, যে-কোনো প্রকারের তামাক খাইতে গেলেও তাহা তাহার অত্যন্ত বিস্বাদ লাগিবে; অভ্যাসবশত খাইতে গেলেই এক টানের বেশী খাওয়া তাহার পক্ষে রুচিকর বোধ হইবে না। এইরূপে কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তামাকের লালসা দূর হইয়া মানুষ আবার স্ব-অধীন হইতে পারে।

এই চিকিৎসা-প্রণালী ডাক্তার ক্রেসের উদ্ভাবন নহে। ইহা ১৯০৮ সালে প্রচারিত হইলেও কেহ ইহার প্রতি মনোযোগ করে নাই। পরে একদিন ডাক্তার ক্রেস একজন রোগীর মুখের ঘা চিকিৎসা করিতে গিয়া কষ্টিক লোসন বা সিলভার-নাইট্রেট দ্রাবণ দিয়া তাহার মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে তিনি লক্ষ্য করেন যে সেই লোকটার তামাকে ভয়ানক বিতৃষ্ণা

তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার চিকিৎসা।

জন্মিয়া গিয়াছে। সেই হইতে তিনি তামাক ছাড়াইবার সহজ উপায়ের হদিস পাইয়াছেন। ডাক্তার ক্রেস আরো দেখিয়াছেন যে তামাকখোরেরা চা, কাফি, ও মাংস প্রভৃতি গুরুপাক মসালাদার খাদ্যের বড় ভক্ত: সেই-সব লোককে যদি দুগ্ধ, মটরকলাই সিদ্ধ, ফলমূল প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য খাওয়াইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহাদের তামাকের তৃষ্ণা অনেক কম থাকে। সেই জন্য ডাক্তার ক্রেস তাঁহার চিকিৎসার সময় পথ্যনিয়মন করিয়া অধিকতর ফললাভ করিয়াছেন।

ডাক্তার ক্রেস একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা কোনো তামাকখোরের মণিবন্ধে নাড়ীর উপর ধরিলে ভুষামাখা কাগজে আঁক কাটিয়া জানাইয়া দেয় সে লোক কতখানি তামাকখোর। তিনি বলেন যে তামাক সেবনের যত রকম প্রণালী আছে তাহার মধ্যে সিগারেটই অপকৃষ্টতম। সিগারেট খুব ঠাস পাকানো হয় না বলিয়া উহার মধ্যে যে বাতাস থাকে তাহা সিগারেট পুড়িবার সময় কার্ব্বনিক অক্সাইড গ্যাস ও অপরাপর গ্যাস উৎপন্ন করে; সিগারেটের কাগজ পুড়িয়া এক্রোলেইন (Acrolein) বিষ উৎপন্ন করে, তাহাতেই সিগারেটের ধোঁয়ার স্বাদ কিটকিটে হয়; এই সমস্ত বিষ নিকোটিন বিষ অপেক্ষাও অধিক অপকারী; ফুসফুসের মধ্য দিয়া রক্তে গিয়া মানুষের শরীর জীর্ণ করিয়া তোলে; বিশেষতঃ বালক ও যুবকদের স্নায়ুমণ্ডলী কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া তাঁহাদিগকে চঞ্চল ও অমনোযোগী করে।

এখন আমেরিকার সকল ষ্টেটেই ক্রমে ক্রমে ক্রেসের চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে; বিদেশের বড় বড় ডাক্তারেরা ক্রেসের তামাকনিবারণের প্রণালী অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতেছেন। ইহার সহকারীরূপে সরকারী এক আইন হইয়াছে। তাহাতে ১৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের সিগারেট খাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ; এজন্য স্কুলের ছেলেরা সিগারেট ছাড়িতে বাধ্য হওয়াতে শিকাগোর সিগারেট ব্যবসা শতকরা দশভাগ (অর্থাৎ দৈনিক ৮৫০০ সিগারেট বিক্রয়) কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্টের ও ডাক্তারদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পরাধীন জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ (Literary Digest) :—

পরাধীন জাতি যদি নিজের চেষ্টায় জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে উদ্যমে কর্ম্মে চেষ্টায় সাহসে বলে বিজেতা জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে তবে বিজেতা জাতি কখনই সেই জাতিকে আর অধীন করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক অন্তত সমকক্ষ পদবী দিয়া তাহার বন্ধুত্ব তাহাকে সবহুমানে স্বীকার করিতেই হয়। আমেরিকা এককালে ইংরেজের অধীন ছিল; তাহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত সাম্য ও অধিকার প্রার্থনা করিয়া করিয়া যখন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল তখন তাঁহারা ইংলণ্ডের অধীনতা অস্বীকার করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের সাহস বীরত্ব ত্যাগ দেখিয়া ইংলণ্ড তাহাদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ইংরেজের অধীন উপনিবেশ-রাজ্য, ক্ষমতায় দক্ষতায় ইংরেজের সমকক্ষ, ইংরেজ সরকার তাই তাহাদের মুখ চাহিয়া তাহাদের অসন্তোষ বাঁচাইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা করেন এবং সেই ভয়ে-ভক্তিকে নাম দেন Diplomacy বা রাজ-নীতি। দক্ষিণআফ্রিকার বোয়ারেরা অবশেষে পরাজিত হইয়াও ইংরেজকে এমন কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল যে ইংরেজ সরকার সানন্দে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া অন্যতম শত্রু-সেনাপতিকেই সেই দেশের প্রথম অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করেন এবং নামে মাত্র ইংলণ্ডের রাজাকে সম্রাট স্বীকার করিয়া বোয়ারেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। বোয়ারদের সহিত যুদ্ধ করার কারণ-পরম্পরার মধ্যে ইংরেজ তরফ হইতে অন্যতম কারণ এই দেখানো হইয়াছিল যে, বোয়ারেরা তাহাদের দেশে উপস্থিত ভারতবাসীদিগের প্রতি বর্ব্বর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া থাকে; এখন ত বোয়ারেরা ইংরেজেরই অধীন, তথাপি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

ফিলিপিনোদিগকে ব্যাটবল খেলা শিখানো হইতেছে।

ভারতবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিকার হইতেছে না। কিন্তু তাহারও শুভসূচনা দেখা দিয়াছে, ভারতবাসীর পক্ষে গান্ধী ও গোখলের ন্যায় নেতা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় ন্যায়বান নির্ভীক পৃষ্ঠপোষক অধিনায়ক ভারতবাসীকে ন্যায্য দাবী আদায় করিয়া লইবার মহামন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। প্রকৃতির নিয়মই এই যে অভাববোধ উগ্র না হইলে তাহার প্রতিকার আসন্ন হয় না; অধীন জাতি যদি ন্যায্য দাবী জোর করিয়া করিতে পারে তবে বিজেতা ইচ্ছায় না হোক দায়ে পড়িয়া সে দাবী সম্পূরণ করিতে বাধ্য হয়। নতুবা অক্ষম ও অযোগ্য যদি দয়ার দান কুড়াইয়া মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ করে, অন্তরের ব্রহ্মকে সঙ্কুচিত করে, তবে কোন পক্ষেরই কল্যাণের কারণ হয় না।

কিন্তু বিজেতা জাতি যদি স্বেচ্ছায় অধীন জাতিকে স্বাধীনতা দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, যদি অক্ষম অধীন জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া নিজেদের সমকক্ষ হইবার পক্ষে সাহায্য করে তবে, সেই বিজেতা জাতির মহত্ত্ব প্রকাশ পায় যথেষ্ট। এইরূপ মহত্ত্ব ইংরেজ জাতি কার্য্যে না হোক কথাতেও আমাদের সম্বন্ধে বহুবার প্রকাশ করিয়াছে। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশ বাহুবলে জয় করে নাই। বাদসাহদের শাসনপ্রণালী যখন বিশৃঙ্খল ও অন্যায় অত্যাচারে পরিণত হইল, যখন স্বেচ্ছাচারী কুরাজাদিগের সংশোধন অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন দেশের লোক স্বেচ্ছায় বিদেশীর হাতে রাজ্য-ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। সেকালের ইংরেজ রাজ-পুরুষেরাও জানিতেন যে তাঁহারা চিরকালের জন্য এদেশ অধি-কার করিয়া থাকিবার জন্য আসেন নাই। ভারতবাসীকে সমস্ত বিশ্বের চিন্তা ও কর্ম্মের সহিত পরিচিত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিলেই এদেশে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য লই-য়াই লর্ড মেকলে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরাও অকপটে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়া স্বীকার করেন। ভারত-বর্ষের অন্যতম অধিনায়ক মার্কুইস হেষ্টিংস তাঁহার রোজনামচায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, যেদিন ইংরেজজাতি ভারতবর্ষকে জ্ঞানে শিক্ষায় দক্ষতায় আপনাদের সমকক্ষ করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিতে পারিবে সেদিন ইংলণ্ড ও ইংরেজ জাতির অতি গৌরবের দিন; প্রত্যেক সহৃদয় ইংরেজ উৎসুক হইয়া সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া সম্প্রতি একজন ইংরেজ (Edwyn Bevan, *Indian Nationalism.* Macmillan & Co., 2s. 6d.) বলিয়াছেন "I should like the end to be that Indians stood up strong and free among nations: I don't think any consummation could be more honorable to my countrymen, than that." অর্থাৎ, আমি চাই ভারতবর্ষ জগতের মহাজাতির গোষ্ঠীতে স্বাধীন ও সমর্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারে; ইহা অপেক্ষা আর কোনরূপ ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা আমার স্বদেশীয়দের পক্ষে অধিক গৌরবের কারণ হইতে পারে না।

সেকালের রাজপুরুষদের ন্যায় একালের রাজপুরুষদের মধ্যে কিন্তু তেমন অকপট উদার লোক বেশী দেখা যায় না। লর্ড মর্লের ন্যায় মনীষী ব্যক্তিও বলিয়া ফেলিলেন—সুদূর ভবিষ্যতে যতদূর কল্পনা চলে কোনো কালেই ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মানুষের স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিগত, এবং কল্পনা বা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ সেই দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকে। পুষ্পপুটের উপর সূর্য্যালোক-সম্পাতের মতো মানুষের হৃদয়পুটে জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হইলেই তাহা আপনা হইতেই ধীরে ধীরে আপনার সকল দলগুলি মেলিয়া ধরে, তখন তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র গন্ধ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অতএব আমরা বিশ্বচিন্তা, বিশ্বের ইতিহাস, স্বাধীনচিন্তাপ্রণালীর সহিত যতই পরিচিত হইয়া উঠিতেছি, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাও ততই একটা নির্দ্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দাবী

করিতে শিখাইতেছে। এবং আমরা দেখিতেছি ঠিক বিধিসঙ্গত উপায়ে করিয়া চাহিতে জানিলে পাওয়াও কঠিন হয় না।

কিন্তু না চাহিয়াও পাওয়ার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। আমেরিকা স্পেনের অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া দখল করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকা ইংলণ্ডের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী নয়, স্বাধীনতা তাহাদের রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র, এজন্য তাহারা নিজের দেশকেও যেমন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, চিন্তায়, কর্ম্মে স্বাধীন করিয়া তুলিতে চায়, অপরকেও তেমনি স্বাধীন দেখিতে ইচ্ছা করে; পরের ছেলে মাকড় মারিলে ছ-কাহন কড়ি ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ স্বয়ং ব্যবস্থাপক পুরোহিত-ঠাকুরকে দিবার দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া নিজের ছেলের বেলা মাকড় মারিলে ধোকড় হয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া স্বাধীনতা-বাদীদের সাজে না, তাহারা জগৎবাসী প্রত্যেক পৃথক জাতিকে স্বাধীন দেখিতে চায়, ইহাই তাহাদের ব্রত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের নিজের দেশের বেলা যে নিয়ম,

ফিলিপিনোকে কলের গান শুনাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পরের দেশের বেলা ঠিক তাহা পালন করা শক্ত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জয় করার পরেই আমেরিকা প্রচার করিল যে বিজিত জাতিকে স্বাধীনতা-রক্ষায় শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে রাষ্ট্রব্যবহারে নানা উপায়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই আমেরিকা ফিলিপিনোদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় সম্বহুলতা (majority) দান করিয়াছে এবং ফিলিপিনোরা যে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পুণ্যমন্ত্রের দীক্ষায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপের শাসনকর্তা স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"We regard ourselves as trustees, acting not for the advantage of the United States, but for the benefit of the people of the Philippines. Every step we take will be taken with a view to for that independence of the islands and as a preparation for that independence."

"The Administration will take one step at once. It will give to the native citizens of the islands a majority in the appointive commission, and thus in the upper as well as in the lower house of the legislature.

"We place within your reach the instruments of redemption. The door of opportunity stands open, and the event, under Providence is in your hands."

"The triumph is as great for us as it is for you!"

অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্যের দ্বার তোমাদের সম্মুখে আমরা উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম, শক্তি থাকে তোমরা জয় কর। এই জয় আমাদের ও তোমাদের উভয়ের পক্ষেই তুল্য গৌরবের।

কিন্তু যে ফিলিপিনোদিগকে স্বাধীনতার এই অমৃত প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে তাহারা সভ্যতায় ভব্যতায় শিক্ষায় শক্তিতে উন্নত নহে। এবং সেই অছিলায় অনেক সঙ্কীর্ণচেতা আমেরিকান ফিলিপিনোদিগের মনে স্বাধীনতার আশা জাগ্রত করিয়া তোলা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া ধুয়া ধরিয়াছে। তথাপি প্রেসিডেণ্ট উইলসনের গভর্ণমেণ্ট অদম্য উৎসাহে ফিলিপিনোদিগকে নানা উপায়ে শিক্ষা দিয়া রাষ্ট্রপরিচালনে শক্তিমান করিয়া তুলিতেছে।

মুক্তির মহোৎসব (The Crisis):—

পঞ্চাশ বৎসর হইল আমেরিকার কাফ্রিরা দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। সেই স্বাধীনতালাভের পঞ্চাশৎ-তম বার্ষিক উৎসব বা জুবিলি আমেরিকার কাফ্রিরা খুব আড়ম্বর ও উল্লাসের সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার নাম দিয়াছে তাহারা মুক্তির উৎসব (Emancipation Exposition)। ইহা কাফ্রি-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাতে চারলক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শহরে কয়েকটি মেলা হইয়াছিল। সেই-সকল মেলার মধ্যে মহাসভা গঠন করিয়া কাফ্রি জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সম্পৎ সম্বন্ধে কতদূর উন্নতি হইয়াছে; অধিকতর উন্নতির জন্য কি করা উচিত; তাহার আলোচনা হয়। তাহারা কাফ্রিজাতির আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ইতিহাসের অভিনয় করিয়া সাত দল মিছিল বাহির করিয়াছিল; তাহাতে এবং বায়স্কোপে আফ্রিকার বন্য জীবন, আমেরিকায় দাসত্ব এবং পরে দাসত্ব-মুক্তিতে স্বাধীনতার স্বর্গসুখ, সমস্তই ক্রমপরম্পরায় প্রদর্শিত হয়। সেই সঙ্গে

মেলায় কাফ্রিজাতির দ্বারা প্রস্তুত কলাসামগ্রী, শিল্পসম্ভার, সাহিত্য, যন্ত্রপাতি, ও নব নব ক্ষেত্রে নব নব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ইতিহাস ও নমুনা প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

সেই প্রদর্শনীতে তেরটি বিভাগ ছিল। (১) আফ্রিকা মধ্যদেশে কাফ্রিদের অবস্থান; তাহাদের দেশীয় ও জাতীয় ইতিহাস-সম্বলিত মানচিত্র, কারিগরী, শিল্প। (২) কাফ্রি জাতির জগতের দেশে দেশে বিস্তার লাভের ও বিশেষ করিয়া আমেরিকায় উপনিবেশের ইতিহাস। (৩) স্বাস্থ্য ও শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কাফ্রিপ্রচেষ্টা। (৪) কাফ্রির ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির দৃশ্য চলন্ত ছবির দ্বারা উদাহৃত। (৫) বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন। (৬) শিক্ষা সম্পর্কে কাফ্রির উন্নতি ও প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত। (৭) ধর্ম্ম। (৮) নগর ও গ্রামে বাস করিবার বিবিধ ব্যবস্থা, কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় প্রভৃতি। (৯) কাফ্রি নারীদিগের কর্ম্ম ও প্রচেষ্টার নমুনা ও ইতিহাস। (১০) কাফ্রিদিগের প্রস্তুত চিত্র ও তক্ষণ-শিল্প। (১১) কাফ্রি লেখকদের রচিত সাহিত্য—পুস্তকাদি, সাময়িক পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির একটি লাইব্রেরী। (১২) স্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যায় কাফ্রিদিগের পারদর্শিতার নমুনা ও নক্সা প্রভৃতি। এই বিভাগের সমস্ত নমুনা মেলার মধ্যস্থলে কাফ্রি স্থপতির পরিকল্পিত নক্সা-অনুসারে কাফ্রি মিস্ত্রীর তৈয়ারী একটি মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহসজ্জার জন্য আবশ্যক যাবতীয় দ্রব্য, দেওয়ালচিত্র, ছবি, প্রভৃতিও, সংগৃহীত ছিল। (১৩) সঙ্গীত—কণ্ঠ্য, যান্ত্রিক,—আনদ্ধ ও তন্ত্রীক—সকল প্রকারের।

কাফ্রিরা প্রাচীন ঐতিহ্যহীন অসভ্য বর্ব্বর দাসের জাতি হইলেও মাত্র এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতার মুক্ত সুস্থ আব-হাওয়ায় মানবজীবনের সকল প্রকার আবশ্যকের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রচুর দক্ষতা ও মৌলিকতা দেখাইয়াছে। কাফ্রিরা কবি, দার্শনিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, তক্ষণশিল্পী, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ব্যবসাদার, রাষ্ট্রশাসক, রাষ্ট্রব্যবস্থাপক প্রভৃতি সমস্তই হইয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা বিশেষ দক্ষতা, বিশেষত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছে। সর্ব্বোপরি, নিয়ম ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার সহিত কোনো ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়া পরিচালনা করার অসাধারণ শক্তি তাহাদের সঞ্চিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতায় অসভ্য দাসের জাতি যদি এমন অদ্ভুত সফলতা দেখাইতে পারে, তবে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যে পরমধনী, একটু সুবিধা পাইলে না করিতে পারি কি। সেই সুবিধা আমাদিগকে জোগাড় করিয়া লইতে হইবে—এই দিকেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনার মুখ ফিরাইতে হইবে। আমাদের মানুষ হইতে হইবে, মানুষের মধ্যে মাথা তুলিয়া সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে,—এই হইবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

কাফ্রিরা এই মেলার অনুষ্ঠান করিয়া শ্বেতকায়দিগকে দেখাইলেন যে তাঁহারা অমানুষ অক্ষম ঘৃণ্য অপদার্থ নহেন; জগৎকে মানব-সমাজকে দিবার মতন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাদেরও আছে, তাঁহা-দিগকে বাঁদ দিয়া শ্বেতাঙ্গদের চলিবে না। ভগবানের রাজ্যে তাঁহারা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহারা মানুষ হইয়াই সকল মানুষের সমকক্ষ হইয়াই থাকিবেন। তাঁহারা এই মেলায় আপনাদের চিন্তা ও কর্ম্মের, চেষ্টা ও সাধ্যের সাফল্য ও সম্ভাব্যতা দেখাইয়া জগতের, বিশেষ ভাবে শ্বেতকায়ের, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম সহানুভূতি বন্ধুত্ব লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। গায়ের চামড়া কালো হইলেই যে সে অপদার্থ হয় না, সে শ্বেতাঙ্গের চেয়ে অপকৃষ্ট হয় না, তাহা কাফ্রিরা প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে প্রাচীন ঐতিহ্যহীন কাফ্রিজাতিকে আমাদের ন্যায় জাতিও হেয় মনে করিয়া কৃপার চক্ষে দেখে তাহারাও আজ জগৎকে জ্ঞানের ও কর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতেছে; তাহারা সকলের সমকক্ষ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আর আমরা পিতৃধনে অশেষ ধনী হইয়াও আজ দেউলিয়া হইয়াছি বলিয়া কি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? নষ্ট পিতৃধন কি উদ্ধার করিয়া আবার মানুষের মতো মানুষ হইব না? চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

আসমান-ঝোলায় কাশ্মীর-যাত্রা (Literary Digest): —

ভূস্বর্গ বলিয়া যে কাশ্মীরের খ্যাতি সেই সুন্দর শোভাময় দেশে যাওয়াটা কিন্তু বিশেষ সহজ ও সুখের ব্যাপার নয়। হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তবে কাশ্মীরের বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় উপত্যকায় উপস্থিত হইতে হয়। ১৮৮৬ সালে হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে গায়ে ২০০ মাইল দীর্ঘ এক পথ প্রস্তুত করা হয়; এই পথ প্রস্তুত করিতে ৫৪ জন মজুর পাথর-চাপা পড়িয়া মারা পড়ে এই পথটি। ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্মকুশলতার একটি উৎকৃষ্ট ও আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত বলিয়া সমঝদার লোকেরা বিশেষ তারিফ করিয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়ের উপর ২০০ মাইল হাঁটাপথে চলা বিশেষ কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ, তা সে পদব্রজেই হোক, কিংবা ঘোড়া, দাণ্ডী প্রভৃতি যান বাহনে চড়িয়াই হোক। সেইজন্য কাশ্মীর রাজসরকার হইতে ঐ পথে কলের গাড়ী,

কাশ্মীরে যাইবার আসমান-ঝোলার নমুনা।

ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম বা মোটর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু কাশ্মীরের পাহাড়ের আলগা মাটির মধ্যে বড় বড় পাথরের খণ্ড থাকায় ঐ সমস্ত ভারী গাড়ী চালানো নিরাপদ নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ আলগা মাটিতে ভারী গাড়ী চলার নাড়া ও দমক লাগিয়া শিলাখণ্ড খসিয়া পথের উপর খসে পড়িতে পারে কিংবা পথই ধসিয়া যাইতে পারে। তার পর ব্রেনান (Brennan) যখন এক-রেল (monorail) কলের-গাড়ী উদ্ভাবন করেন, তখন কাশ্মীর রাজসরকার আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে এইবার কাশ্মীরের পথকষ্ট দূর হইবে; এবং সেই

কাশ্মীর রাজ-সরকার ব্রেনাঁকে তাঁহার আবিষ্কার সম্পূর্ণ করিবার জন্য মুক্তহস্তে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে এক-রেল কলের-গাড়ী কাশ্মীরের পথে চালানো সম্ভব হইবে না, কারণ একরেল কলের-গাড়ী মোড় ফিরিবার সময় খুব সূক্ষ্ম কোণ করিয়া মোড় ফিরে, বহুদূর হইতে ক্রমে ক্রমে বাঁকিয়া ঘুরিয়া মোড় ফিরিতে পারে না। সেইরূপ পথ পাহাড়ে দেশে হওয়া শক্ত। এবং তাহারও বেলা পাহাড় ধসিয়া পড়ার সম্ভাবনা সমানই আছে। অবশেষে কানাডা গভর্ণমেণ্টের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারকে কাশ্মীর রাজ-সরকার আনাইয়া কাশ্মীরে যাইবার সুবিধা উদ্ভাবনে নিযুক্ত করেন। এই ইঞ্জিনিয়রের প্রস্তাব অনুসারে পাহাড়ের চূড়া ডিঙাইয়া তার টাঙাইয়া সেই তার বাহিয়া দোলা চালাইবার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এক বে-সরকারী ইংরেজ কোম্পানী এই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে মাত্র ৭৫ মাইল পথ সোজা তার টাঙাইলে হিমালয় ডিঙাইয়া একেবারে কাশ্মীরের কোলে গিয়া পড়া যাইবে; এবং তাহাতে খরচও বেশী হইবে না—মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে। তারে ঝুলাইয়া দোলা চালাইতেও খরচ বেশী পড়িবে না; কাশ্মীরের বেগবতী নদীর স্রোত হইতে তাড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া দোলা ঠেলিয়া চালানো হইবে। সেই তাড়িৎ-প্রজনন-ক্ষেত্র স্থির হইয়াছে রামপুরের নিকটে; আমেরিকা হইতে তাড়িৎ-যন্ত্র আমদানী হইবে বলিয়া আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সিমলা শৈল হইতে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিয়া আমেরিকায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

আস্মান-ঝোলার আকাশ-লম্বিত তার ১০০ ফুট উচ্চ বড় বড় লোহার জাফরী-বোনা থামের মাথায় মাথায় বাঁধিয়া টাঙানো হইবে; এবং এক থাম হইতে অপর থাম পর্য্যন্ত তারের বিলম্বিত ব্যবধানের বিস্তার হইবে প্রায় ৮০০ গজ বা ১৬০০ হাত। পাঁচ পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর এক একটা ষ্টেসন বা ঘাঁটি থাকিবে, এবং যাতায়াতের জন্য দুই প্রস্ত তারপথ ৯ ফুট ব্যবধানে পৃথক থাকিবে, ইহাতে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা থাকিবে না। আস্মান-ঝোলা টাঙাইবার তারের স্থূলতা হইবে দেড় ইঞ্চি ব্যাস। এই তার হইতে প্রতি মাইলে ৩০ খানি করিয়া ঝোলা গাড়ী চলিবে, এবং প্রত্যেক গাড়ীর বোঝাই লইবার শক্তি হইবে ৪ মণ হইতে ৫ মণ ২০ সের পর্য্যন্ত। এই-সমস্ত গাড়ী গভীর খদ ও উত্তুঙ্গ খাড়া পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া যাইবে, এবং স্থানে স্থানে আস্মান-ঝোলা হইতে ভূমিপৃষ্ঠ ১২০০ ফুট নীচে থাকিবে। এক ষ্টেসন হইতে অন্য ষ্টেসনে গাড়ী চালান্ হইবে আপনা-আপনিই, তাহাতে এক খুঁটির এপার হইতে গাড়ীর আঁকড়া খুলিয়া গাড়ী খুঁটি প্রদক্ষিণ করিয়া খুঁটির অপর পৃষ্ঠের তারে গিয়া আবার আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিবে এমন স্বয়ংক্রিয় কলের ব্যবস্থা থাকিবে। ধাতু গরমে বড় হয়, ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়; তজ্জন্য তার গরমের সময় বড় হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া নোল হইয়া যাইতে পারে; এবং শীতের সময় সঙ্কুচিত হইয়া টান টান হইয়া ছিঁড়িয়া যাইতেও পারে। এই অসুবিধা প্রতিকারের জন্য তারের মধ্যে নানাবিধ জটিল স্প্রিং হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার বিলম্বিত থাকিবে, এবং তাহাতে তার, বারমাস সকল ঋতু ও আবহের অবস্থায়, সমান থাকিবে, বাড়িবে না, কমিবে না।

এই তার ঝিলম নদের উপর দিয়া বরাবর যাইবে এবং মাঝে মাঝে খদ উত্তীর্ণ হইয়াও বিস্তৃত থাকিবে এবং স্তম্ভগুলি যেখানে সেখানে ধস পড়িবার সম্ভাবনা নাই এমন নিরাপদ স্থান দেখিয়া প্রোথিত থাকিবে। তার খদ ও পাহাড়ের মাথার উপর দিয়া বিস্তৃত থাকাতে পাহাড়ের ধস হইতে ঝোলার কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

সম্প্রতি এই আস্মান-ঝোলায় মানুষ যাত্রী লওয়া হইবে না; কেবলমাত্র মাল আমদানী রপ্তানী চলিবে। বৎসর দুই ঝোলা নিরাপদে চলার পর মানুষ বহনের ব্যবস্থা করা হইবে।

এখন পাহাড়ের ২০০ মাইল হাঁটা পথে এক টন (২৭ মণ) জিনিস লইয়া যাইতে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় ও ৪৫৲ টাকা খরচ হয়। আস্মান-ঝোলায় ৭৫ মাইল মাত্র পথ ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল চলিয়া ১৫ ঘণ্টায় কাশ্মীরে পৌঁছানো যাইবে। এবং খরচও খুব কম পড়িবে।

চারু।

দোল

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তার
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।
আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা অতলা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।